ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

১৩৩০

কার্ত্তিক হইতে চৈত্র

ভারতী কার্য্যালয়

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৶০]

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

[বার্ষিক মূল্য ৫৲

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

কার্ত্তিক—চৈত্র

বিষয়-সূচী

ভারতী



সম্পাদক
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বার্ষিক মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা
প্রতি সংখ্যা ।৵০ সাত আনা

কার্য্যালয়
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতীর স্থচী কার্ত্তিক ১৩৩০

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয় সূচী

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

ভারতীর নিয়মাবলী

গ্রাহক

১। বৈশাখ হইতে ভারতীর বর্ষ আরম্ভ হয়। কেহ ইচ্ছা করিলে যখন ইচ্ছা গ্রাহক হইতে পারেন, কিন্তু বৈশাখ হইতেই কাগজ লইতে হইবে। বার্ষিক মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা অগ্রিম দিতে হয়। পত্র পাইলে গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত করিয়া ভি, পি, ডাকেও বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া থাকি। যিনি লোক-মারফৎ বা মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া—ম্যানেজার "ভারতী" ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন।

২। ভারতীর প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য সাত আনা। নমুনা বিনামূল্যে দেওয়া হয় না। প্রতি মাসের ভারতী নগদ বিক্রয়ের জন্য—ভারতী কার্য্যালয়, ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং কলিকাতার অন্যান্য বুকষ্টলে রাখা হয়।

৩। ভারতী প্রতি বাংলা মাসের পহেলা তারিখে বাহির হয়। ১০ই তারিখের মধ্যে কোনো গ্রাহক ভারতী না পাইলে ডাকঘরে ও আমাদিগকে সে কথা জানাইবেন; নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে।

৪। অল্পকালের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পোষ্ট অফিসের সহিত বন্দোবস্ত করিলে সুবিধা হয়; দীর্ঘকালের জন্য হইলে আমাদিগকে মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইবেন।

৫। আমাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় চিঠিতে গ্রাহকের নম্বরের উল্লেখ থাকা এবং নাম ও ঠিকানা খুব স্পষ্ট করিয়া লেখা দরকার। রিপ্লাই-কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

প্রবন্ধাদি

১। ভারতীতে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি অনুগ্রহ করিয়া ভারতী-সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

২। প্রবন্ধের সঙ্গে ডাকটিকিট ও ঠিকানা থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় এবং রচনা মনোনীত হইলে তাহাও লেখককে জানানো হয়।

বিজ্ঞাপনের মূল্য

১। ভারতীর বিজ্ঞাপনের মূল্য মাসিক এক পৃষ্ঠা ১২৲ বারো টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬॥০ সাড়ে ছয় টাকা, এবং সিকি পৃষ্ঠা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা। বিজ্ঞাপন সিকি পৃষ্ঠার কম হইলেও সাড়ে তিন টাকা মূল্য দিতে হয়। সাড়ে তিন টাকার কম মূল্যের বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

বিশেষ জায়গার দর

২য় কভারের সামনের পৃষ্ঠা		...	১৮৲
ঐ আধ পৃষ্ঠা		...	১০৲
৩য় কভারের			
সামনের পৃষ্ঠা		...	১৬৲
ঐ আধ পৃষ্ঠা		...	৯৲
পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠার			
সামনের পৃষ্ঠা		...	২০৲
সূচীর পার্শ্বে			
আধ পৃষ্ঠা	...	...	৯৲
সূচীর নীচে আধ পৃষ্ঠা		...	৯৲
তিন রঙের ছবির			
আগের পৃষ্ঠা	...	...	২০৲

২। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। যাঁহারা এক বৎসর কিংবা ছয় মাসের বিজ্ঞাপনের মূল্য এক-সঙ্গে অগ্রিম দিবেন, তাঁহাদের বিজ্ঞাপন মাসিক এক পৃষ্ঠা ১০॥ সাড়ে দশ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৫॥০ সাড়ে পাঁচ টাকা, এবং সিকি পৃষ্ঠা তিন টাকায় লওয়া হয়।

৩। বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে ভারতীর ম্যানেজারকে চিঠি লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। নূতন বিজ্ঞাপন দিতে হইলে কিম্বা বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন বা বন্ধ করিতে হইলে মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়; পরে জানাইলে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন কিংবা বন্ধ করা সম্ভব হয় না।

ম্যানেজার ভারতী—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের নূতন উপন্যাস] [ছেলেমেয়েদের নূতন উপন্যাস

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

সচিত্র

খাতাঞ্চির খাতা

বাহির হইয়াছে।

এই ধরণের শিশুপাঠ্য উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে

এই প্রথম।

দাম মাত্র এক টাকা।

অবনীন্দ্রবাবুর অন্যান্য পুস্তক

রাজ কাহিনী

(পঞ্চম সংস্করণ)

ইহাতে ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া রাজস্থানের ঐতিহাসিক গল্প সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র।

শকুন্তলা

(চতুর্থ সংস্করণ)

সেই বিখ্যাত শকুন্তলা উপাখ্যান ছেলে মেয়েদের জন্য লিখিত, নিখুঁত বর্ণনাগুলি এমনি সুন্দর যে মনে হইবে ছবির চেয়ে জীবন্ত। মূল্য ।৵০ আনা।

ক্ষীরের পুতুল

(চতুর্থ সংস্করণ)

সেই দুয়ো সুয়ো রাণীর গল্প অবনীন্দ্রবাবুর হাতে পড়িয়া সোনার কাঠির স্পর্শে যেন নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। মূল্য আট আনা।

নালক

ইহাতে বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনী সরল ভাবে শিশুদের উপযোগী করিয়া লেখা। মূল্য ॥০ আট আনা।

ভূতপত্রীর দেশ

(সচিত্র)

অদ্ভুত মজার উপন্যাস। পাতায় পাতায় মজার মজার ছবি আছে। ছাপা কাগজ খুবই সুন্দর। মূল্য ॥০ আট আনা।

বাংলার ব্রত

বাংলা দেশের নানা স্থানের বহু দুষ্প্রাপ্য আলপনার নক্সা সম্বলিত এবং মেয়েলী ব্রতের ইতিহাস আছে। ১২২খানি রঙ বেরঙের বড় বড় আলপনার নক্সা আছে। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

১৩৩০

কার্ত্তিক হইতে চৈত্র

ভারতী কার্য্যালয়

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৶০] ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা [বার্ষিক মূল্য ৫৲

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

কার্ত্তিক—চৈত্র

বিষয়-সূচী



নব-দম্পতী

ভারতী

৪৭শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৩০ { সপ্তম সংখ্যা

ছেলেমানুষী বিদ্যে

"সাত-কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী,—
বাঙ্গালী করেছ শুধু; মানুষ করনি—"

জননীর হাতে দিলে তো ভাল ছিল, সাতকোটি কেন, সাতাশ কোটিকে মানুষ করে তোলাই বিশ্বজননীর কায— তা তো পারিনে,—গুরু দিয়ে মানুষ করতে যাই, ইস্কুলে দিয়ে মানুষ করতে যাই ছেলেকে! মালি জানে, গাছের অঙ্কুরটা সে গাছ হয়ে উঠবেই! কাযেই সে এ কথা বলেনা—গাছ করছি! কিন্তু ছেলে সে মানুষ হয়ে উঠবে না, এ ভয়টা হয়তো বা আমরা করি—তাই বলে থাকি ছেলে মানুষ করা চাই! ছেলেটা মানুষ হতেই হয়েছে, মানুষ হয়ে ওঠার সমস্ত আয়োজন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছেলের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এবং বাইরেও আলো বাতাস ইত্যাদির মধ্যে ছেলের মানুষ হয়ে ওঠার ঠিক উপযোগী বস্তু সমস্ত ধরা হয়ে গেছে যখন, তখন ব্যস্ত হয়ে ছেলে মানুষ করতে যাওয়ার একমাত্র কারণ বোধ হয় যে আমরা চাইনে যে আমাদের ইচ্ছামতো একটি মানুষ না হয়ে ছেলে একটা স্বাভাবিক মতিগতি ধরে মানুষ হয়ে যায়। মালী গাছের খবরদারি করে চলে—পাছে ছাগলে মুড়ায়, জলাভাবে মরে; কিন্তু মানবক, তাকে লালন পালন করেই মানুষ ক্ষান্ত হয় না—গোড়া থেকেই তাড়ন সুরু করে দেয় ছেলেকে স্বাভাবিক মায়া থাকেই—পাছে তাড়ন করা ভাল রকমে হয়না, এই জন্যে বাইরে থেকে গুরুমশায় ডেকে তাড়না করে নেওয়া হয়—চট্‌পট্‌ ছেলেকে মানুষ করার জন্যে; পশু-পক্ষী—তারা বাচ্ছাদের লালন পালন এবং তাড়নও করে, কিন্তু নিজেরা, বাচ্ছাদের শিক্ষার মধ্যে বাইরের কাউকে আসতে তারা একেবারেই দেয়না—কতক শিক্ষা বাপ কতক মা দিয়ে চলে। মানুষের ছেলের শৈশবটা সাত বছর কিন্তু অনেক জানোয়ার তাদের সাত মাসের বেশি একটি দিনও মা-বাপের কোলে-পিঠে থেকে লালিত পালিত হবার উপায় নেই! বেড়াল-ছানার দেখতে দেখতে ইঁদুর-শিকারে পাকা হয়ে বাঘের মাসি হয়ে পড়া চাই! না হলে ছানাটার মুস্কিল! মা বাপ তার জন্যে একটি ইঁদুরও শিকার করে দেবে না বয়স হলে, সুতরাং অতি শিশুকাল থেকেই পশুপক্ষীর মধ্যে শিশুশিক্ষার তাড়া রয়েছে দেখা যায়। বনের মধ্যে কি ভাবে পশুপক্ষীরা নিজের নিজের শাবকদের শিখিয়ে তুলছে, তা নানা জীবতত্ত্ববিদ্‌ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ধরে চলেছেন একেবারে বন্য জন্তুদের ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে! গৃহপালিত জন্তুদের শিক্ষা-প্রণালীর সঙ্গে বন্য জন্তুদের শিক্ষাপ্রণালীর একটা পার্থক্য ধরা পড়ে গেছে এখন তাঁদের কাছে, এবং তাঁরা বলছেন—পশু-জগতে

তাদের মা বাপের কাছে, না হলে বাচ্ছারা জীবন-সংগ্রামে একেবারেই অক্ষম থেকে যায়। পশুপক্ষী ওরা জেনে-শুনে বাচ্ছাদের নানা শিক্ষা দিয়ে যত শীঘ্র পারে মজবুৎ করে তোলে, বাচ্ছা আপনি মজবুৎ হবে—দৌড়তে শিকার করতে—এটা ভেবে ওরা বসে থাকে না, ভুলিয়ে ভালিয়ে মেরে ধরে যেমন করে পারে পশুপক্ষিরা বাচ্ছাকে শিক্ষা দিয়ে চলে বড় হওয়া পর্য্যন্ত, তারপর তাদের ছেড়ে দেয় নিজের কাছ থেকে। তখন দেখা যায়, বাচ্ছারা নিজের উপরে নির্ভর করতে শিখে গেছে—হাওয়ার খবর শব্দের খবর, আহারের বিহারের সংগ্রামের আত্মরক্ষার সব হিসেব জানা হয়ে গেছে—নিখুঁতভাবে বাচ্ছাদের! এই সব প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা পশু-পক্ষীর চাল-চোল চোখে দেখে বলেছেন—সহজাত বুদ্ধি এবং কুলানুগত জ্ঞান (instinct এবং heredity) নয়, গোড়া থেকে রীতিমত ওদের মা-বাপের শিক্ষার ফলেই পশু-পক্ষীরা নানা বিষয়ে চতুর হয়ে ওঠে—"Personally, after many years of watching animals in their native haunts, I am convinced that instinct plays a much smaller part than we have supposed; that an animal's success or failure in the ceaseless struggle for life depends, not upon instinct, but upon the kind of training which the animal receives from its mother." (School of the Woods, M. J. Long.) এটা দেখা যায় ঘটনাক্রমে বাচ্ছার শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে মা বাপ চলে গেল, কিম্বা কোন বাচ্ছাকে মানুষ ধরে নিয়ে নিজের মতো করে শেখালে, এই দুই দলই বিপদ আপদ-থেকে আত্মরক্ষা করতে অক্ষম থেকে গেল, সহজাত বুদ্ধি কুলানুগত জ্ঞান কিছুই বড় একটা এদের কাযে এল না—পোষা পাখীর তো কথাই নেই,—খাঁচা ছাড়লেই সে মরলো! পশুপক্ষীদের শিশুশিক্ষার হিসেব ইউরোপীয় শকুন-তত্ত্বের পণ্ডিতেরা চোখে দেখে পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করে যা বলেছেন, তা থেকে দেখা যায়—মানুষ আমরা যে ভাবে মানব-শিশুকে উপায়ে শিশুশিক্ষা চলেছে বনের মধ্যে—জন্তু-জানোয়ারদের! এক সময়ে সব সুসভ্য জাতির মধ্যেই প্রায় এক ভাবেই ছেলে পড়ানো চলতো—"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ প্রাপ্তেতু ষোড়শেবর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ"—পাঁচ বছর গায়ে হাত বুলিয়ে লালনপালন, দশবছর কাল পর্য্যন্ত তাড়ন বেত্রাঘাত ইত্যাদি—তার পর পিঠ চাপড়ে ষোল বছরের সব দুঃখু মুছে দেওয়া—আইবুড়ো-ভাত খাইয়ে! আবার একটা চাণক্য শোলোক এও বলে—"লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ!" জানোয়ারেরা এর চেয়ে ভাল শিক্ষা এবং তার উপায় দেখাচ্ছে। তাদের মধ্যে যারা চাণক্য তারা বলেছে—লালন কর, শিক্ষা দাও, না শিখতে চাইলে বার বার করে শেখাও, এক আধবার তাড়না করতেও ছেড়ো না, বয়স প্রাপ্ত হলে পুত্রের সঙ্গে শত্রুতা করেও তাকে বাসা-ছাড়া করবে, নিজের চারিদিকে চ'রে খেতে দেবে না, পৃথক বনে তাড়িয়ে দেবে। এই হল বনের শিক্ষার নিয়ম। তাড়না করা, শত্রুতা করা হয়—যাতে বাচ্ছা আত্মনির্ভর করতে শেখে, সম্পূর্ণভাবে বড় হতে না হতেই। আমাদের তাড়না ইত্যাদি সব হচ্ছে, পাছে ছেলেটি সভামধ্যে না শোভা ধরে, বড়দের সভায় এসে পাছে ছেলেটা বোকা বনে যায়, এই ভয়। সভার শোভা হল তো সুপুত্র, নয় তো কুপুত্র—এ হল মানুষের কথা। জানোয়ারদের কথা স্বতন্ত্র—সতর্ক হল, সবল হল, সুচতুর হল, সুশিক্ষিত হল, আত্মনির্ভর করতে পারলে,—ব্যস, চুকে গেল কায বাপ-মায়ের! বাপ-মায়ের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে জীবজন্তুদের আর গুরুমশায়ের হাতে পড়তে হল না, একেবারে হয়তো বাঘের সামনেই গিয়ে পড়তে হল, সুতরাং শিক্ষা অত্যন্ত পাকা হল তো সে বেঁচে গেল, না হলে পড়ল গিয়ে মৃত্যুর কবলে। জানোয়ারদের বেলা না শিখলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি, মানুষের বেলা না শিখলে মূর্খ বলে একটু লজ্জা! তাও সেরে নেওয়া যায়,—কথা না কয়ে গম্ভীর হয়ে বসে থাকলে কিম্বা পয়সা থাকলেও।

তখন এদের শিশু-শিক্ষার ধারা ব্যাহত হয়ে অনেকখানি অস্বাভাবিক রকমে মানুষের ইচ্ছা-মতো পথ ধরলে। হাঁসকে ডুব দিয়ে মাছ ধরতে শিখতে হল না, মুরগীকেও মাটি খুঁড়ে খাবার সন্ধান করতে হল না, মুখের কাছেই তারা খাবার পেলে। শত্রু-ভয় তাদের রইলো না, মানুষ তাদের রক্ষা করে চল্লো অনেক দিক দিয়ে। মানুষ মাথার উপর থাকলেও এই সব গৃহপালিত জীবরা সহরের উপযোগী নানা শিক্ষা—যেমন মটর চাপা পড়া থেকে আরম্ভ করে মনিবকে খুসি রাখা পর্য্যন্ত দখল করে চল্লো, আপনা হতেই। বনের মধ্যে এই সব জীবরা অন্য শিক্ষা পায় সেটা বলা যেতে পারে—কুলানুগত শিক্ষা বা জাতীয় শিক্ষা—। বনে হাঁসের ছানা এবং উদ্বিড়ালের ছানা দুজনেই মৎস্য-জীবি ও উভচর হলেও একই শিক্ষা পায় না দুই জাতীয় শিক্ষা দুজনকে দেওয়া হয় এবং সে শিক্ষা দেয় বাপ মা, গুরু-মশায় নেই! হাঁস এবং কাক দুই এক পক্ষীজাতি হলেও কাকের সাঁতার শিখতে হয় না, হাঁসকেও এ ডালে ও ডালে উড়ে বসতে হয় না। এক পক্ষীজাতি হলেও দুয়ের শিক্ষা হল সম্পূর্ণ আলাদা। কাকের মা তার মায়ের কাছ থেকে এবং কতকটা নিজেও যে শিক্ষা লাভ করেছে তাই দিয়ে গেল নিজের বাচ্ছাদের—হাঁসও এই কুলানুগতভাবে শিখিয়ে গেল আপনার সন্তানদের। এই ভাবের জাতীয় শিক্ষা রয়েছে বলে সেটাকে বলতে পারি কুলানুগত শিক্ষা, যার মূল হল স্বধর্ম্ম ও স্বজাতীয়তার মধ্যে! বনে যতক্ষণ, ততক্ষণ এই প্রকার শিক্ষারই নিয়ম হলেও এও লক্ষ্য করা গেছে যে স্থান-কাল-ভেদে শিক্ষা-প্রণালীতে অদল বদল ঘটায় জানোয়ারেরা। এক জাতীয় হরিণ, তারা ছিল উত্তরাখণ্ডের সমতল ক্ষেত্রের অধিবাসী; নানা কারণে যখন তাদের গরম দেশের বনে এসে আশ্রয় নিতে হল, তখন সমতল ক্ষেত্রের চাল-চোল লম্বা দৌড় দেওয়া ইত্যাদি নানা শিক্ষার সার্থকতা কোনই রইলো না; বনে এসে দৌড়োনোর অপেক্ষা লাফিয়ে চলা শিক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। তখন দেখি, সনাতন কালের শিক্ষা প্রণালী পরিবর্ত্তিত করে নিয়ে নতুন প্রথার শিক্ষা দিতে থাকলো এই জাতীয় হরিণের মা-গুলি আপনার

দেখা গেল—কয়েকটি শাবককে নিয়ে কয়েকটি মৃগী বনের মধ্যে একটি খোলা জায়গায় উপস্থিত করে দিয়ে নিজেরা গা ঢাকা হয়ে বাচ্ছাদের ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করতে থাকলো, এর বাচ্ছাতে ওর বাচ্ছাতে পরিচয় যখন চলেছে তখন মৃগীরা বাচ্ছায় বাচ্ছায় যাতে মারামারি না করে সদ্ভাবে থাকতে পারে, তার জন্যে ওদের মধ্যে কিছু গোলযোগ হবার উপক্রম হতেই দুষ্টকে তাড়ন এবং শিষ্টকে রক্ষা করে চল্লো। এইভাবে শীতে বনের মধ্যে দলবদ্ধ হতে যখন বাচ্ছারা শিখে গেল, তখন মায়েরা খেলাচ্ছলে বাচ্ছাগুলিকে ভেঙ্গে পড়া গাছ উঁচু নীচু খানাখন্দ ইত্যাদি টপ্‌কে চলা এর লাফানো ঝাঁপানো শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিলে। সমতল ক্ষেত্রের জীব বনের উপযুক্ত শিক্ষা-প্রণালী দখল করে নিলে। আবার দেখি, বনের জীব মানুষের বিদ্যায়ও পাকা হয়ে উঠলো। চটপট শেখা ইতর জীবদের পক্ষে স্বাভাবিক। শিক্ষা পাবার এবং শেখবার ক্ষমতা এবং আনন্দ ইতর জীবদের নেই, এ কথা বলা চলে না। মানব-শিশুর সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারের বাচ্ছার শিক্ষার যেখানটায় তফাৎ, তা ধরার চেষ্টা করলে দেখি, ওদের বাচ্ছার শিক্ষা হল নানা ইন্দ্রিয়ের নানা ক্রিয়া-শক্তির বিকাশ ধরে এবং মানুষের শিশুর শিক্ষা হল তার ভাবনা এবং কল্পনার ক্রমশঃ বিকাশের পথে! শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়ে দুই জাতের শিশুর একটা হিসেব নিলেই এটা আরো পরিষ্কার ধরা পড়ে।

ইতর জীবের বাচ্ছাদের শিক্ষার মূল হল—

১। মায়ের ডাকে অবিলম্বে সাড়া দেওয়া। এটা ডিমের মধ্যে যে বাচ্ছা, সে পর্য্যন্ত মেনে চলে!

২। মা যদি বল্লে, সাবধান! অমনি বাচ্ছাও সে সময়ে নিজেকে নানা উপায়ে শত্রুর চোখের আড়াল করলে। রং-এ রং মিলিয়ে অদৃশ্য হল, নয়তো মাঠির তলায় গাছের খোপে এমন লুকোণো যে দেখবারই জো নেই, কিম্বা চুপ করে পড়ে রইলো মড়ার মতো। অনবধান অবাধ্যতার একটুও প্রশ্রয় দেওয়া হয় না শিক্ষার সময়ে। এর পর অন্য শিক্ষার উপদেশও রয়েছে; যেমন—

৩। স্থির থাকা বা "বিপদি ধৈর্য্যম্।" ধীর নিঃশব্দ

৪। দ্রুত গমনাগমন, উল্লম্ফণ, সন্তরণ, ও উড়তে শেখা।

৫। বাতাস চেনা, গন্ধ চেনা।

৬। দূরদৃষ্টি ও সর্ব্বদা সজাগ থাকা।

৭। আহার্য্য-সংগ্রহ ও আহার্য্যের ভাল-মন্দ বিচার।

৮। শিকার করা এবং শিকার হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা।

৯। ডুবে মাছ ধরা এবং মাছ মাংস ইত্যাদি কাঁটা বেছে খেতে শেখা।

১০। সুপরিচ্ছন্ন থাকা এটা খুব ছোট বেলায় বাসাতে থেকেই পশুপক্ষীরা শিখে নেয়।

১১। নানা বিদ্যার অভ্যাস ও চর্চ্চা খেলতে খেলতে।

এই যে সব শিক্ষা এ একদিনে হয় না সবটা একসঙ্গে ও সেখানো চলে না দিনের পর দিন পাঠ দেওয়ার মতো করে এই সব শিক্ষা দিচ্ছে বাচ্ছাদের পশুরা পক্ষিরা—এটা লক্ষ্য করা গেছে।

জল-জন্তুদের পক্ষে সাঁতার, পাখীদের প্রায় সকলের পক্ষে ওড়া, এবং চতুষ্পদদের দৌড়োনো ইত্যাদি একেবারে শেখা না হলে নয়। সুতরাং এইগুলো প্রথমে শিখিয়ে দেওয়া নিয়ম। ওড়বার জন্তে বেশী সময় দেওয়া হয় না, ডানা সবল হতে হতেই পাখীরা বাচ্ছাদের ওড়াবার চেষ্টা করে নানা উপায়ে—ভুলিয়ে ভালিয়ে, মেরে ধরে যেমন করে পারে। প্রথমে ডানা খেলানো সুরু হয় বাসার ধারে বসে, তার পরে একেবারে আকাশে ঝাঁপিয়ে বাতাস কেটে চলা নির্ভয়ে। বাচ্ছা না চাইলে জোর করে ঠেলে ফেলে বাসা থেকে—এইভাবে সাঁতার এবং চলা-ফেরা প্রথম পাঠ সাঙ্গ হয়।

তার পর আসে নানা বিদ্যার নানা কৌশল শেখা—উড়তে উড়তে শীকার ধরতে শেখা; সাঁতার দিতে দিতে ডুবে মাছ তোলা, পায়ে পায়ে গা ঢাকা দিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া কিছুর উপর,—এই সব কৌশল মা-বাপ তাদের বাচ্ছাদের সঙ্গে নিয়ে শিখিয়ে বেড়াচ্ছে দেখা গেছে। বাচ্ছাদের ওড়বার সময় অমন করে ঘাড় ধরে বাসা ছাড়া কিন্তু দেখা গেছে, এই প্রথম ওড়বার সময় বাচ্ছার মা-বাপ একবারে উদাসীন থাকে না; তারা বাচ্ছার পাছে বিপদ হয় সে বিষয়ে সজাগ থেকে কাজ করে। এক জাতীয় সমুদ্রের পাখী তারা জল থেকে চার পাঁচশত ফিট উচ্চে পাহাড়ের গায়ে বাসা বাঁধে, বাচ্ছা ডানা খেলানোতে মজবুৎ না হতে হতেই তারা তাকে বাসা ছাড়া করে, গগনস্পর্শী পর্ব্বতের চুড়া থেকে অক্ষম শাবকটি যখন সমুদ্রের দিকে পড়তে থাকে তখন মা এবং বাপ দুইদিক দুইজন ক্রমান্বয়ে পতনোন্মুখ বাচ্ছার পেটের তলায় ডানা মেলে তার পতন-বেগ সামলে চলে—এই ভাবে শাবককে আস্তে আস্তে তারা সমুদ্রের কোলে নামিয়ে দেয়, সেখানে ওড়ার পালা সাঙ্গ হয়ে সাঁতার শেখানোর পালা পড়ে।

এই ভাবে হিসেব-মতো নানা উপায় ও শিক্ষার ভিতর দিয়ে ইতর জীবেরা তাদের শাবকগুলিকে সব দিক দিয়ে সুপটু সুচতুর করে তুলতে চলে। যে সব পশু-পক্ষী মানুষের হাতে একবার পড়ে তাদের বনের এই চমৎকার শিক্ষা একেবারেই হয় না। কাজেই মানুষের সঙ্গ হারালে তারা আত্ম রক্ষা করতে একেবারেই অক্ষম হয়ে থাকে। মানুষের পোষা পাখীর খাঁচার শিক হঠাৎ সরে গেলে পাখিটীর প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে! "আত্মানং আত্মনা রক্ষেৎ" ইতর জীবদের শিক্ষার আগাগোড়া এই লক্ষ্য ধরে চল্লো। জানোয়ারদের খেলাও বাজে রকমের খেলা নয় কাজের খেলা—যে শিক্ষা তারা পাচ্ছে তারি নানা কৌশল খেলতে খেলতে অভ্যাস—যেমন হাঁসের ছানাগুলো জলের ধারে খেলছে, কুটোকাটা জল থেকে তুলছে আবার ফেলছে, কিছু একটা লুকিয়ে রাখছে আবার কেউ সেটা খুজে বার করছে, দুই দলে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ, এমনি নানা কাজের খেলা নিয়ে বাপ মা বাসা ছেড়ে গেলে বাচ্ছাগুলো রয়েছে দেখা যায়।

মানব-শিশুর শিক্ষায় এর থেকে পার্থক্য রয়েছে দেখা যায়। শৈশবে মানুষ বাপ-মায়ের কাছে অল্পই শিক্ষা পাচ্ছে—যেটুকু হচ্ছে শিক্ষা তা প্রায় আপনা হতেই হচ্ছে—দাঁড়ালো খোকা আপনি, চল্লো আপনি, বলতে শিখলে

গুণাগুণ পরীক্ষা করতে শিখলে একা একা, মা বাপ থেকেও নেই! এটা দেখি, যা পেতে চায়, যা করতে চায়—তার জন্যে দুর্দমনীয় ইচ্ছা ও চেষ্টা রয়েছে। মানব-শিশুর ক্ষুধা পেলে রক্ষা নেই—মাকে কাছে এনে তবে নিস্তার! উঠুক পড়ুক তাকে দাঁড়াতে হবেই, বাধা মানতে চায় না! মেজাজ বলে জিনিষটার প্রাচুর্য্য মানব-শিশু গোড়া থেকেই প্রকাশ করে। সে প্রভুত্ব চায় সবার উপর, এই ভাব দেখায় গোড়া থেকেই।

তারপর আর একটা ভারি পার্থক্য ইতর জীবের বাচ্ছায় আর মানুষের ছানায়—সে একা-একা ভাবতে পারে, সে নানা কল্পনায় ডুবে থাকে, দেখা জগতের মধ্যে এবং না দেখা জগতের মধ্যে প্রবল কৌতুহল নিয়ে সে ক্রিয়া করে চলে অনেকখানি একা একা!

একে একে মানব-শিশুর মনের গতি ধরে চল্লেই কোনখানে ইতর জীবের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ তফাৎ, তা পরিষ্কার ধরা পড়ে। যখন থেকে ছেলে পাঠশালায় ভাবা শিখতে আরম্ভ করলে, তার আগে সমস্ত কালটা মোটামুটি এই ভাবেই সব ছেলে কাটায়, যথা—

(১) জড়েতেও সে সজীবের গুণ আরোপ করে দেখে। এই ভাবের দেখা বড় হয়েও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। আমরা কথায় বলি এটা এখানে কোথা থেকে এল, অমুক জিনিষটা কোথায় গেল? যেন জিনিষটা নিজেই আসা-যাওয়া করছে—! মূর্ত্তি-পূজার সবখানি এই নিয়ে।

(২) তার পর হল—পুরোনো দেখার স্মৃতি নতুন দেখার সঙ্গে মিলিয়ে জিনিষটাকে একটা নাম-রূপ দেওয়া—তারাকে আকাশের চোখ, এমনি অদ্ভুত অদ্ভুত নাম দেওয়ার চেষ্টা একএকটা সামগ্রীকে বর্ণন করার বেলায়।

(৩) নিজেকে অন্য কিছুতে অনুপ্রবিষ্ট ঠাওরানো—সত্যি সত্যি ঘোড়ার মতো ঘাস চিবানো, পাখীর মতো দাঁড়ে বসে ছোলা খাওয়া,—নিজেকে বাবা দাদা বলে ধ্রুব বিশ্বাস ছেলেরা প্রায়ই করে থাকে এবং তারি অনুসারে ক্রিয়া

(৪) নানা বস্তুর দিকে নিবিষ্ট ভাবে চেয়ে নানা রূপ কল্পনা করে চলা, মেঘের দিকে মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে জেগে স্বপন দেখা!

(৫) না দেখাকে দেখার চেষ্টা। আয়নার উল্টো পিঠে কি আছে,এর জন্যে একটা কৌতূহল, ইত্যাদি নানা কৌতূহল চালাচ্ছে আবিষ্কারের দিকে শিশুর মনকে।

(৬) নিজের আশপাশ থেকে নিজের একটা স্বাতন্ত্র অনুভব করা এবং নিজের একটা অতীতের কল্পনা করা—যেমন ছেলে বলে চলেছে কোন এক দূর দেশের খবর—যেখানে তার ঘর-বাড়ি ছেলেপিলে সব রয়েছে—তাদের হুবহু বর্ণনা দিতে সে অগ্রসর, কিন্তু সে জায়গায় যাওয়া ভারি কঠিন, এই ধারণাও রয়েছে তার!

(৭) সংসার পাতার প্রবল ইচ্ছা, মেয়েরা এটা খেলা-ঘর পেতে প্রকাশ করে।

(৮) পুতুলের সঙ্গে নানা সামাজিক বন্ধন ও সম্পর্ক পাতানোর ইচ্ছা।

(৯) মাতৃত্ব-বোধ—এমনি নানা দিক দিয়ে মেয়েরা ভবিষ্যতের জীবনের কল্পনা ব্যক্ত করে।

(১০) নানা ভয়ের সঙ্গে পরিচয় ও সংগ্রাম করে চলা।

(১১) নতুন আবহাওয়ায় আপনাকে নিক্ষেপ করা কল্পনা বলে। পাহাড় দেশের কল্পনা, সমুদ্রের মাঝে দ্বীপের মধ্যে বাসের কল্পনা,—কত কি!

(১২) অদ্ভুত জল্পনা—এবং মিছে কথা বলা। এটা সাধারণ ঘটনা ছেলেমেয়ের মধ্যে।

(১৩) নিজেকে শৈশব অতিক্রম করে সক্ষম মানুষের মধ্যে নিয়ে চলার ইচ্ছা। আপনাকে দৈত্য মারতে সক্ষম, সুর বীর পণ্ডিত এই রকম ভাবা—

বেড়াল-ছানা যতই খেলুক, নিজেকে বেড়াল ছাড়া আর কিছুই বোধ করে না; কিন্তু মানব-শিশু সে আপনাকে বেড়াল বাঘ রাজা বাদশার মধ্যে সহজে চালিয়ে দিতে পারে—গল্পের রাজত্বে গিয়ে বাস করে, ছেলে ভুলে যায় যে সে ছেলেই আছে।

সঙ্গ ভাবে পেতে। এই প্রবল সঙ্গপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় ছেলে-মেয়ের মধ্যে।

খেলার হিসেব করে দেখি মানুষের কতক খেলা শারীরিক ক্রীড়ার বাহুল্য নিয়ে, কতক কল্পনার প্রাচুর্য্য নিয়ে,—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে চল্লো!

এই ভাবে নিজে নিজে মানুষ হতে-হতে শিশুরা চিন্তা করতে, কায করতে শিখলো যখন, তখন পণ্ডিত মশায় এসে তাকে তাড়না সুরু করলেন—আর এক শিক্ষা দিতে। এই মানব-শিশুর মানুষ হবার ধারা—তার মধ্যে কল্পনার স্থান বেশী দেখি সেটা ইতর জীবের শিক্ষার মধ্যে একেবারে নেই বল্লেই ঠিক বলা হয়। গুরুমশায়ের শিক্ষা যতটা পারে এই কল্পনা ও নানা স্বাভাবিক শক্তি বিকাশের রাস্তা থেকে উল্টো মুখেই ছেলেকে চালাতে চল্লো, দাঁড়ে বেঁধে খাঁচায় পুরে পাখিপড়ানোর হিসেবে! বনের শিক্ষা জীবন-যাত্রার সমস্ত ক্রিয়াতে সুপটু করে তুল্লে বনচরদের, কিন্তু মানুষের শিক্ষা যদি সে শুধু পাখী-পড়ানোতেই শেষ হলো, ছেলেকে জীবন-সংগ্রামে অপটু রেখে শিক্ষা সমস্যা কিছুরই সমস্যা পূরণ করতে পারলে না, তবে সে কেমন শিক্ষা হল মানব-শিশুর পক্ষে! মুটে, মজুর, মিস্ত্রি, দর্জ্জি, কারিগর মানুষ এমন কি বেশির ভাগ গাইয়ে শুনি এরা—এ ধরণে শিক্ষা থেকে বেঁচে গেল কিন্তু একেবারে অকেজো হলোনা তো।

এখন এমন যদি হয়, মানুষের ছানা গিয়ে পড়লো কোন গতিকে জানোয়ারদের ইস্কুলে এবং সেখানে সে নানা পশুপক্ষীর কাছ থেকে নানা বিদ্যা অভ্যাস করে ফিরে এল, মানব-সমাজে অবাধ কল্পনা এবং অতি অদ্ভুত শক্তি সমস্ত নিয়ে, সে মানুষ ক' খ' গ' ঘ' ঙ' বল্‌তে না পারলেও যে মন্দ মানুষ হবে তা বলা যায়না। কোল ভীল এরা এই ধরণের মানুষের কাছাকাছি গেছে। Kipling-এর Jungle Bookএ এই আদর্শের মানুষের কল্পনা রয়েছে—তা থেকে প্রমাণ হয়, মানুষ সরল নির্ভীক সুগঠন সুস্থ শক্তিমান কর্ম্মপটু, এমনি নানা গুণ নিয়ে বর্ত্তে থাকতে চল্লো জগতে—জলে স্থলে সে অনেকখানি নির্ভর রইলো—শুধু খাপ খেলো না নগর-পালিত মানুষের সঙ্গে তার কোন দিক দিয়ে! এই বনের শিক্ষা এবং নগরের শিক্ষা-প্রণালী ধরে মানব-শিশুকে নিয়ে পরীক্ষা চলেছে ইউরোপে আজকাল। আমাদের আগেকার শিক্ষা গুরুগৃহ-বাস, আশ্রম-বাস কতটা কি ছিল, এবং এখনকার ইস্কুল-বাস ইত্যাদিও কি ভাবে হচ্ছে, তার মোটামুটি হিসেব ধরে দেখলে দেখবো, বনের শিক্ষার সঙ্গে তুলনাই হয় না আমাদের শিশু-শিক্ষার। আমাদের শিশুশিক্ষা কেমন একরকম ঢিলেঢালা ভাবে চলেছে—যাতে না হচ্ছি আমরা সুপটু কাযে—না হচ্ছি সুদক্ষ ভাবতে চিন্তোতে। শিশুবোধের একটা কবিতায় আমাদের শিশুশিক্ষার সবটা ধরা আছে—

"গহন কাননে কিম্বা পর্ব্বত-কন্দরে,
ভয়াল ভল্লুক সিংহ ব্যাঘ্র বাস করে॥
গভীর সাগর কিম্বা নদীর ভিতরে,
মকর হাঙ্গর নক্র থাকে জলচরে॥
ভূগর্ভে বিবরমাঝে কুণ্ডলিনী ফণী,
মেঘেতে তাড়িৎ রয় আকাশে অশনি॥
ওরা শত্রু বটে কিন্তু দেহের ভিতরে,
ঘোর শত্রু রিপুকুল সদা বাস করে॥

চরিদিকে ভয়ের বেড়া টেনে বেত হাতে গুরুমশায় শিশুবোধের পাঠ দিয়ে চল্লেন—এর আর ধারা বদলালো না এ দেশে!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্মৃতি

দীর্ঘ কয়েক বৎসর প্রবাসে কাটাইবার পর সেদিন পরেশ যখন এক অন্তরঙ্গ আত্মীয়েরএকান্ত অনুরোধে হঠাৎ কলিকাতা আসিয়া পড়িল, তখন এই বিরাট সহরের অনেক জায়গাই তার চোখে অভিনব ও বিচিত্র বলিয়া মনে হইল। বাল্যে প্রথম স্কুলে পড়িবার সময় সে অনেক দিন কলিকাতায় ছিল। কিন্তু গত সাত-আট বৎসর তার পিতা এখান হইতে বদলী হইয়া যাইবার পর তার আর এখানে আসিবার সুবিধা ঘটে নাই, ইচ্ছাও হয় নাই।

সেদিন বেলা প্রায় তিনটার সময় সে কি-একটা কাজে একা বাহির হইয়া একটা সরু গলির ভিতর দিয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, সূর্য্যের শেষ রক্তিম রশ্মিটুকু সামনের একখানা তিন-তলা বাড়ীর আলিসার কোণে তখনো ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। সেদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া পরেশ যেমন অন্যমনস্কে পিছন দিকে ফিরিতে যাইবে, অমনি তার দৃষ্টিটুকু পাশের একখানা বাড়ীর দ্বিতলের বারান্দার উপর বাধিয়া গেল। বারান্দার রেলিঙে হেলান্ দিয়া একটী সজ্জিতা যুবতী তার রূপের পশরা লইয়া রাস্তার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরেশ তার পানে চাহিতেই দেখিল, যুবতীর সেই আয়ত চোখদুটী পূর্ব্ব হইতে তাহারই উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে। মুহূর্ত্তকাল পরেশ মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া তাড়াতাড়ি তখনি চোখ নামাইয়া লইল। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য! দুই-এক পা গিয়াই সে পুনরায় তাহার পানে চোখ তুলিতেই যুবতীর রাঙা ঠোঁটদুটীতে একটা মৃদু হাসির বিজলী খেলিয়া গেল। পরেশ লজ্জায় লাল হইয়া নত মুখে হন্ হন্ করিয়া পা চালাইয়া দিল।

পরের দিন কিন্তু ঠিক ঐ সময়টায় পরেশ যখন বেড়াইতে বাহির হইল, তখন তার নিজেরই মন শত্রুর মত তাহাকে সেই গলিটার পানে টানিতে লাগিল। কাল সেই পতিতা মেয়েটার সেই হাসিটুকু পরেশ কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই! আজ তাই দুর্ব্বল হৃদয় তার কাণে কাণে কেবলি বলিতে লাগিল, দেখাই যাক্ না আজ, মেয়েটার অমন করিয়া হাসিবার মানে কি!

দূর হইতে ঠিক সেই জায়গায় তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া পরেশের বুকের ভিতর দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে মাথা নামাইয়া ক্ষণেক পরে আবার যেমন তার পানে চাহিয়াছে, অমনি উপর হইতে যুবতী তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। পরেশের দেহের রক্ত চঞ্চল হইয়া তার মুখ-চোখ আরক্ত করিয়া তুলিল।

বার-বার তিনবার পরেশ এইরূপে মুখ তুলিতে মেয়েটী তাহাকে একই ভাবে ডাকিল। কুড়ি-একুশ বৎসরের তরুণ যুবা পরেশের বুকের নীচে রক্ত নাচিয়া উঠিল। মনে-মনে সে কি কতকগুলা আলোচনা করিয়া নিজের কাছে তার অতিরিক্ত হৃদয়-বলের সাফাই পাড়িল। গলিতে তখন বড় একটা কেহ ছিল না। একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া কাছাকাছি কাহাকেও না দেখিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে পরেশ একেবারে সামনের দরজায় ঢুকিয়া পড়িল। উঠানের পাশে রোয়াকে দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক চাহিতে-চাহিতে তাহার মনে হইল, সে যেন তার চিরপরিচিত সেই পৃথিবী ছাড়িয়া এ এক কোন্ নূতন রাজ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! একবার মনে হইল, যেমন করিয়া আসিয়াছে, তেমনি চোরের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বেই উপরের বারান্দা হইতে গলা বাড়াইয়া মেয়েটী মিষ্ট স্বরেই ডাকিল,—এই যে, এই দিক্ দিয়ে সিঁড়ি! উঠে এস!

সে আহ্বানের কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার শক্তিমাত্র তখন পরেশের ছিল না। নিজের মনকে সে এই বলিয়া বুঝাইল, দোষ কি! সত্যই ত আর তার মনের ভিতর কোনো পাপ নাই!

সিঁড়ির মাথায় উঠিতেই সে দেখিল, মেয়েটী সামনেই দাঁড়াইয়া। পূর্ব্বদিনের মত মুখে-চোখে তেমনি হাসির লহর ছুটাইয়া সে পরেশকে নিজের ঘরের দিকে লইয়া চলিল।

পরেশ মন্ত্র-চালিতের মত তাহার পিছনে পিছনে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মেয়েটী একান্ত অপ্রতিভ ভাবে তার হাতখানি ধরিয়া বলিল,—বসো! পরে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কহিল,—তুমি যে একেবারে থতমত খেয়ে গেলে! আমি কি তোমায় খেয়ে ফেল্‌ব!...তবে বুঝি, তুমি আমায় চিন্‌তে পারোনি?

পরেশ মাথা নামাইয়া ছিল! এ কথায় মুখ তুলিয়া চাহিল। কিন্তু এই অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি সে কোনো অতীত যুগে দেখিয়াছিল কি না, তা সে কোনমতেই স্মরণ করিতে পারিল না। যুবতী সোজা তার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। পরেশ তাহাকে চিনিতে পারিল না দেখিয়া কহিল,—নাঃ! তুমি ভাই বড় বোকা! ভাগ্যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি!

পরেশের বিস্ময় দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। এ কি আগাগোড়াই পরিহাস করিতেছে, না, ইহার নীচে সত্যের সম্পর্কও কিছু আছে! বিদেশে থাকিতে যে-দু'একটী মেয়ের সহিত তাহার বিবাহের একটু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাদের কাহাকেও ত' সে নিজে চোখেও দেখে নাই! আর এ যে একটা সমাজ-পতিতা, গণিকা!...কেমন করিয়া এ সম্ভব যে......

মেয়েটী মুখখানি গম্ভীর করিয়া কহিল,—তুমি আমায় একেবারে ভুলে গেছ! ছেলেবেলায় যখন এই কলকাতায় তোমরা থাক্‌তে, তখনকার কথা বুঝি তোমার মোটেই মনে পড়ে না?

এবার সত্যই পরেশের মনে পড়িল। এবং ঠিক সেই সঙ্গে বিদ্যুতের মত মনে ফুটিয়া উঠিল, এ কটী ন'-দশ বৎসরের ছোট্ট মেয়ের কথা! সেই দীর্ঘকাল আগে তাহারা যখন বাড়ীভাড়া করিয়া কলিকাতায় থাকিত, তখন তাহাদের সাম্‌নের বাড়ীতে এক রমণী বাস করিত, এবং পয়সারও তার অভাব ছিল না। এই রমণীর এক মেয়ে ছিল,—পরেশের চেয়ে বছর দুয়ের ছোট! শৈশবে এই দুটী ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে কত খেলাধুলা করিয়া দিন কাটাইয়াছে। রমণী পরেশের জননীকে 'দিদি' বলিয়া

ছেলেটীকে আমি জামাই করব! পরেশের জননী তাহাতে প্রাণ-খোলা হাসি হাসিয়া বলিতেন,—বেশ তো, বোন্!

স্বপ্নের মত এখন পরেশের সেই সকল কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল। সে মুখ তুলিয়া কোনমতে শুধু বলিল,—তু—তুমি কি—

যুবতী হাসিয়া কহিল,—কে, বল দিকি? নামটা পর্য্যন্ত ভুলে যেতে হয়! কিন্তু, তোমার নাম তো পরেশ, না?

বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আসিয়া পরেশের সারা মুখখানাকে উত্তপ্ত করিয়া দিল। সে নিজের অন্তরের ছাই-চাপা পুরাণো স্মৃতিগুলাকে ওলোট-পালোট করিয়া দেখিয়াও কোথাও সেই ছোট্ট মেয়েটির নামটুকুও খুঁজিয়া পাইল না। পরে অপ্রতিভ ভাবে কহিল,—হ্যাঁ, ভুলে গেছি। তোমার নাম...

—আমার নাম স্বর্ণ—স্বর্ণলতা! কেমন, মনে পড়্‌ছে না?

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ, মনে পড়িয়াছে! এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণেকের জন্য তাহার মুখে-চোখে যে বিহ্বলতা আসিয়া পড়িল, তাহাতে যেন এইটুকুই স্পষ্ট করিয়া সে বলিতে চাহিল, তখন তো তোমায় চিনিতে পারি নাই, কিন্তু আজ বুঝিতেছি, 'স্বর্ণলতা' ছাড়া আর কোন নামই তোমায় মানাইত না!

মেয়েটী পূর্ব্বাপর তাহার সেই ভুবনমোহন হাসিটুকু বজায় রাখিয়া কহিল,—তোমায় এখানে ডেকে খুবই হয়ত অন্যায় করলুম, কিন্তু তার জন্যে কিছু মনে করো না। যতই হোক্ কতদিনের পুরাণো আলাপ, এটুকু দোষ তুমি অনায়াসে মাপ্ করতে পার্ব্বে। তাছাড়া, বিয়েটাই না-হয় পুরোপুরি হতে পায়নি, কিন্তু তার আগে তত্ত্ব-তাব্‌্যস যা-কিছু, তাও বড় কম হয়নিতো!

সে কথা ক্রমশঃ পরেশেরও মনে পড়িতে লাগিল। স্বর্ণর মাই একদিন হঠাৎ আপনা হইতে কোন পর্ব্ব উপলক্ষ করিয়া ভাবী জামাতাকে তত্ত্ব পাঠাইয়াছিল, এবং পরেশের জননীও বাধ্য হইয়া ভাবী বৌমার নাম করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ আদান-প্রদান কয়েক বারই চলিয়াছিল। হঠাৎ তারা সকলে বিদেশে

স্বর্ণ বলিল,—হঠাৎ কাল তোমায় বাড়ীর সামনে দেখেই আমার পুরোণো বরটিকে চিন্‌তে পারলুম। কিন্তু, তুমি কি মনে করেছিলে? কি মনে করেই বা আজ তুমি অমন ভাল মানুষটীর মত ওপরে উঠে এলে?

পরেশ হঠাৎ যেন কেমন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। সে যে কেন আসিল, তার জবাব কি আছে! জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া সে কহিল,—তুমি—তুমি যে আমায় ডাকলে!

স্বর্ণ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরে কহিল,—ওমা, তাহলে যে-কোন একটা পর মেয়ে তোমায় এম্‌নি করে' ডাক্‌লেই তুমি বরাবর তার কাছে ছুটে যাবে?

পরেশের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। স্বর্ণর এই কথায় তার মনের পঙ্কিল ইতিহাসের সমস্ত নগ্নতাই তার চোখের সামনে বীভৎস হইয়া ফুটিয়া উঠিল। কোন কথা বলিবার তার শক্তি রহিল না। মাথার ভিতরে কি যেন বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

স্বর্ণ খপ্ করিয়া তার দুখানা হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল,—ভয় নেই, এ কথা কেউ জান্‌তে পার্ব্বে না। তোমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছে, বুঝি? খুব ভয় হচ্ছে?···বাড়ী যাবে?

পরেশ তার হাত দুখানা ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—যাবো।

স্বর্ণর মুখ গম্ভীর হইল; সে বলিল,—আচ্ছা, তাহলে যাও। 'এসো' বল্‌বো না। কেন না, এখানে কি আর তোমার মত লোকের পায়ের ধুলো পড়বে!

পরেশ কোন কথা না বলিয়া শুধু একবার স্বর্ণর মুখখানির পানে চাহিল। সন্ধ্যার আঁধার তখন অনেকটা নিবিড় হইয়া আসিয়াছে; একটা অস্পষ্ট ম্লান সৌন্দর্য্য ছাড়া আর সে-মুখের বড়-একটা কিছুই দেখা গেল না। পরেশ নামিয়া চলিল; স্বর্ণ সঙ্গে সঙ্গে নীচে পর্য্যন্ত আসিল। দরজার কাছে আসিয়া পরেশ আর পিছন দিকে না ফিরিয়াই ছুটিয়া গিয়া রাস্তায় পড়িল।

করিল। প্রথমে তার নিজের উপর নিদারুণ ঘৃণাই সব চেয়ে-বড় হইয়া উঠিয়া অপর সকল অনুভূতিকে চাপিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ছি, ছি—তার নির্ম্মল জীবনের উপর কেন সে এম্‌নি করিয়া কলুষ মাখাইতে গেল! ছেলেবেলায় স্বর্ণর সহিত সে অনেকদিন খেলাধূলা করিয়াছে, সত্য! কিন্তু আজ? আজ তার পরিপূর্ণ যৌবন! আজ সে সহরের একটা গণিকা ছাড়া আর কিছুই নয় তো! তাছাড়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া সে ত তাহাকে স্বর্ণ বলিয়া চিনিতেও পারে নাই! তবে···তবে? নিজের মনের এই পাপটাকে সে কেমন করিয়া অস্বীকার করিবে?······

কোন রকমে আহার শেষ করিয়া সে যখন নিজের ঘরে বিছানায় আসিয়া শয়ন করিল, তখন কিন্তু সব ছাপাইয়া স্বর্ণর সেই মোহিনী মূর্ত্তিখানিই তার অন্তরে-বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে-মনে সে বলিতে লাগিল, হা ভগবান্, ঐ দেব-বাঞ্ছিত কুসুমটীকে যদি গড়িলেই, তবে তাহাকে এমন করিয়া নরকে টানিয়া ফেলিলে কেন? ঐ রূপ—ঐ বিশ্ব-ভুলানো হাসিটুকু লইয়া সে যাহার ঘরে পা ফেলিত, তাহারই ঘরে যে সোনা ফলিতে পারিত!

ভাবিতে-ভাবিতে পরেশের মনে কেমন যেন এক অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি, একটা অস্পষ্ট জড়তার মত তাহাকে ছাইয়া ফেলিতে চাহিল···একে-একে তার বিগত বাল্যজীবনের সেই তুচ্ছ কথাগুলাও রাশি-রাশি মাধুর্য্য লইয়া তার তরুণ মনখানিকে পরিপ্লুত করিয়া দিতে লাগিল, অথচ সেই মাধুর্য্যের নীচে যে কোথা হইতে এতখানি অস্বস্তি ধীরে-ধীরে জমা হইয়া উঠিল, তাহা সে বুঝিতেও পারিল না। ধীরে ধীরে একখানা অস্পষ্ট ছবি তার মনের আকাশে ক্রমশঃ রঙীন হইয়া ফুটিতে লাগিল! সেখানে সে দেখিল, স্বর্ণ যেন বধূ-বেশে আসিয়া তাহাদের ঘর-ময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই চাঁদ-মুখে স্নিগ্ধ হাসির জ্যোৎস্না ফুটাইয়া তার পাশে আসিয়া বসিতেছে, তার হাতের অমৃত স্পর্শে পরেশ তন্ময় হইয়া শুধু তাহারই মুখের পানে তাকাইয়া আছে!...

কল্পনায় নিজেই বিভোর হইয়া পড়িয়া ছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। পাশের ঘরের বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিতে তার যেন চমক্ ভাঙ্গিল। কিন্তু বুকের ভিতরটা তখন রীতিমত ভারী হইয়া উঠিয়াছে। কিসের একটা তীব্র বিষ যেন তাহাকে ক্রমশঃই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে বলিয়া মনে হইল। প্রথম যৌবনের পরিপুষ্ট বাসনারাশি হঠাৎ যেন ক্ষুধিতের মত তাহাদের নিদ্রা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়াছে!

পর দিন সকাল হইতে সর্ব্বক্ষণই পরেশের মনে যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত তার উন্মত্ত প্রবৃত্তিই বিজয়-মাল্য মাথায় লইয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে ভাল কাপড়-চোপড় পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইল, এবং বরাবর সেই গলির ভিতরকার ৯নং বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া বারান্দার পানে চাহিল; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। সে প্রথমটা কি করিবে তাহা লইয়া একটু যেন ইতস্ততঃ করিল, পর-মুহূর্ত্তেই কিন্তু সে একেবারে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

একখানা বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া স্বর্ণ একগাছা মোটা বেলফুলের মালা লইয়া খোঁপায় আঁটিতেছিল, হঠাৎ পায়ের শব্দে ফিরিয়া দেখিয়াই মুহূর্ত্তের জন্য সে গুম্ভিত হইয়া গেল; এবং ঠিক তার পরক্ষণেই মিষ্ট হাসির লহর ছুটাইয়া কহিল,—ওমা, শেষে কি না চুরি-বিদ্যে!

পরেশের বুকের ভিতরটা কিন্তু তখন আকণ্ঠ শুকাইয়া উঠিয়াছে, সে কোন কথাই বলিতে পারিল না। স্বর্ণ আসিয়া তার হাত ধরিয়া বলিল,—দাঁড়িয়ে রইলে যে! এসো।

পরেশ ধীরে-ধীরে আসিয়া পালঙ্কের উপর বসিল। স্বর্ণ দুষ্ট হাসি হাসিয়া কহিল,—তারপর? আজ তো আর আমি ডাকিনি! তবে আজ আবার—

এ কথায় পরেশের রাগ হইল। সে গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া কহিল,- বেশ, তোমার কি!

স্বর্ণ তেমনি হাসিতে-হাসিতে কহিল,—আমার কি? আমারই যে সব। বরটি যখন বয়ে' গেছে ...

পরেশ মুখ তুলিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল,—যাও!... বয়ে' ত আমি আগে যাইনি, যে বল্‌ছে সে গেছে!

উত্তরে স্বর্ণ শুধু মুখ টিপিয়া হাসিল মাত্র। পরে অন্য কথা পাড়িয়া কহিল,—সে কথা যাক্। এখন তুমি কি খাবে, বল?

পরেশ বিস্মিত হইয়া কহিল,—খাবো? খাবো আবার কি?

—কিছু না! গোটাকতক সন্দেশ? পান, চুরুট,—?

—চুরুট আমি কখনো খাইনা।

স্বর্ণ চোখ ঘুরাইয়া কহিল,—সত্যি নাকি? কিন্তু চুরুট খাওয়ার চেয়ে এ কাজটা যে আরও খারাপ, সেটুকু বুদ্ধি বুঝি তোমার নেই?

পরেশের সমস্ত মুখখানা হঠাৎ অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। সে আর কোনরকমে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। স্বর্ণ তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া কহিল,— কি গো, রাগ হলো?

পরেশ তার ম্লান ব্যথিত দৃষ্টি স্বর্ণর মুখের উপর তুলিল। সেই দৃষ্টির উপর দৃষ্টি রাখিয়া স্বর্ণও বুকে কেমন একটা ব্যথা অনুভব করিল। তার মুখের হাসি নিবিয়া গেল।

পরেশ একেবারে স্বর্ণর কাঁধের উপর একখানি হাত তুলিয়া দিয়া ডাকিল,—স্বর্ণ—

স্বর্ণ মাথা নীচু করিয়া রহিল। পরেশ গাঢ় কম্পিত স্বরে কহিল,—স্বর্ণ, তুমি আমায় কেমন করে' বার-বার এম্‌নি খোঁচা দিতে পারছ? আমি যে অন্যায়টুকু করেচি, তার জন্যে দায়ী আমিও—তুমিও। যদি ধরাই তুমি না দেবে, তাহলে কাল নিজে হতে আমায় ডেকে এ বিষ আমার বুকে কেন ঢেলে দিলে?

স্বর্ণ নিস্পন্দ বসিয়া রহিল। তাহার কবরীর ফুলের মিষ্ট গন্ধটুকু যেন পরেশের অন্তর অবধি স্পর্শ করিল। তার বুকের ভিতর বাসনার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, মাথাটা কেমন নেশার ঝোঁকে ঘুরিতে লাগিল।

অপরিস্ফুট গলায় সে কহিল,—স্বর্ণ, স্বর্ণ—আ—আমি

একেবারে তার দুই বাহু বাড়াইয়া দিয়া স্বর্ণকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। স্বর্ণ চকিতের মত মুখ তুলিয়া কহিল,—ও কি, ছি ছি, তুমি যে পাগল হয়ে গেলে!

পরেশ তাড়াতাড়ি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া অপরাধীর মত মাথা নীচু করিল। স্বর্ণ হাসিয়া কহিল,—তুমি আমায় চাও? কিন্তু জান তো, চাওয়া যত সোজা, পাওয়াটা ঠিক তত সোজা নয়!...শোনো, আমার পানে চাও ত'—বলিয়া সে পরেশের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার বাপ-মা—তাঁরা এখন কোথায়?

পরেশ ধীরে ধীরে বলিল,—পাটনায়।

স্বর্ণ কহিল,—আজই রাত্তিরে তুমি তাহলে সেখানে চলে' যাও। কি, মাথা নীচু করে' রইলে যে?—পরে সে একটু নীরব থাকিয়া কহিল,—দেখ, তুমি এতটা বাড়াবাড়ি করবে জান্‌লে কাল আমিও ছেলেমানুষীটুকু করতুম না। সেই ছেলেবেলা থেকেই আমি জানি তো তোমায়! তাই পাঁচজনের মত তোমাকে এম্‌নি করে' উচ্ছন্ন যেতে দিতে আমি কিছুতে পার্ব্বো না। আর মনে করে' দেখ দিকি, তুমি আজ যাকে পাবার জন্যে এমন পাগল হয়ে উঠেছো, তাকে পাওয়া কিছু শক্তও নয়, আর সে পাওয়াটা তোমার মত লোকের যোগ্যও হবে না!

আরও কিছুক্ষণ পরেশের মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া স্বর্ণ কহিল,—পরেশ, ছেলেবেলার সেই স্মৃতিটা আমার বুকে তারার মত ঝিক্‌ঝিক্ করছে, দিবারাত্রি! তাকে আর এম্‌নি করে' বিষিয়ে তুলে কাজ নেই, ভাই! কি বল? যাবে আজই কলকাতা ছেড়ে?

—যাবো—বলিয়া পরেশ একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। স্বর্ণ চকিতে তার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল,—একটু দাঁড়াও—বলিয়া সে দুই চোখে কেমন এক তৃষিত দৃষ্টি ভরিয়া তার পানে চাহিল। দুইজনে চোখোচোখি হইল। পরেশের বুকের মধ্যে কি একটা প্রচণ্ড দোল দিতেছিল! হঠাৎ তার হাত ছাড়িয়া দিয়া স্বর্ণ একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর তার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া অত্যন্ত ভারী গলায় বলিল,—বাড়ী যাও। এই ক্ষণটুকুর স্মৃতি বুকে ধরে আমি পরম শান্তিতে থাকব। তুমিও মাঝে-মাঝে এই ক্ষণটুকুকে মনে করো। তবে আমার কাছে আর এসো না···বলিয়াই স্বর্ণ সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

ভোরের ডাক

যখন আঁধার ঘনিয়ে এল,
রাতের শেষে;
আমার বিজন কুটীর-দ্বারে,
ভোরের আলো ফুট্‌লো না রে,
তখন তুমি আস্‌লে সেথায়,
মোহন বেশে।

বল্‌লে তুমি,—শ্রান্ত পথিক,
আরো খানিক
থাক্‌বে না কি ঘুমের ঘোরে!
বেরিয়ে এসো এই বেলা রে,
চিক্‌মিকি ঐ পথ দেখায়ে
জ্বল্‌বে মানিক।

—ভাব্‌চ বুঝি ওরা তোরই,
বড়ই আপন,
কাল সাঁঝেতে ওদের সাথে,
মিলন পরে, আঁধার রাতে,
কাটিয়ে দিলি ঘুমিয়ে জেগে,
মনের মতন।

—রাত পোহালে তখন কি আর,
ছাড়বে তোরে?
বল্‌বে, একা কোথায় যাবে?
আবার যে পথ চল্‌তে হবে,—
এই বলে যে বাঁধন দিয়ে
রাখবে ধরে।

প্রেম

রাজা সভা করলেন—প্রেমে কে ব্যথা পেলে, তাদের অভিযোগ শুন্‌বেন।...

একজন বল্লে—আমি তাকে সারা বুক দিয়ে ভালবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালবাসে না কেন? ভগবান এমন নিয়ম কেন করলেন না ভালবাস্‌লে মিল্‌তে পাবেই তার সঙ্গে?

তার চোখ্ ছাপিয়ে জল এল।......

আর একজন বল্লে—সে বলেছিল, আমাকে সে ভালবাসে। আমি তাকে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু সে টাকা আর রূপের মোহে পড়ে অন্যকে বিয়ে কর্‌লে। আমাকে এমন হতাশ অপমানিত করায় ভগবানের কি উদ্দেশ্য! আমার মত দুঃখী আর নেই।......

কত নারী বল্লে—আমি স্বামীকে এত ভক্তি করি, আর সে আমাকে রোজ লাথি মারে, ভৎর্সনা করে,—আমার মত দুঃখী আর নেই। কেউ বল্লে—আমার যৌবনের প্রথম মুহূর্ত্তেই আমি বঞ্চিতা হয়েচি, আমি বিধবা! আমার মত দুঃখী আর কে আছে?...

এম্‌নি হাজার ব্যথিত হাজার রকম কাঁদন-সুরে তাদের প্রেম-বেদনার বারতা বলে' গেল।...

সভা যখন প্রায় ভাঙ-ভাঙ, তখন দু'-দিক থেকে দুটি তরুণ-তরুণী এসে হেঁট হয়ে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

তাদের চারটি চোখে অশ্রু-ঝাপ্‌সা আকাশ-পারের স্তিমিত তারার আলো জ্বল্‌চে!

তরুণ-তরুণী এক সঙ্গে সমান সুরে বল্‌তে লাগ্‌ল—আমরা একে অন্যকে সারা জীবন্ দিয়ে ভালবাসি, কিন্তু আমরা মিল্‌তে পারচি না।...

বিশৃঙ্খল সভা উৎসুক হয়ে শুন্‌তে লাগ্‌ল, আর চম্‌কে উঠ্‌ল—এ কি, এ্যাঁ! এ যে রাজকন্যা!

তরুণ বল্‌তে লাগ্‌ল—আমাদের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে

তরুণী বল্লে—আর আমি মহামান্য সম্রাট্‌-দুহিতা। তাই, আমাদের মিলন হচ্ছে না! আমাদের মত দুঃখী আর কোথায় আছে? ..বল্‌তে বল্‌তে তরল মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রু তাদের ডাগর চোখের কোলে টল্‌টলিয়ে উঠ্‌ল!

তার পর অনেক বছর কেটে গেছে। মন্ত্রীর কাছে রাজা ব্যর্থ বিরহীদের কাহিনী শুন্‌চেন।...

মন্ত্রী বল্‌চেন—যে প্রিয়ার প্রেম পায়নি বলে ভগবানের বিরুদ্ধে নালিশ কর্‌ছিল, সে বিয়ে করেচে নারীর প্রেম পাবে বলে। বল্লে, এক নারীর ঘৃণায় জীবনটা বিষাক্ত হয়েছিল, এবার দেখি, আর-নারীর প্রেমে কেমন তা মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে!

রাজা বল্লেন—তারপর?

মন্ত্রী বল্লেন—যার প্রিয়া প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে অন্যের সঙ্গে পরিণীতা হয়েছিল, সে বল্লে নারীর মূর্ত্তির মাঝে আমার প্রিয়ার অনন্ত সত্তাকে আস্বাদন কর্‌তে হবে।...এই ভাবে মিথ্যা কথায় নিজেকে ফাঁকি দিয়ে সে এক সুন্দরী নর্ত্তকীকে বিয়ে করেচে।...

রাজা বল্লেন—তারপর?

মন্ত্রী বল্লেন—যে নারী স্বামীর পদাঘাত পেত, সে সাধারণ ভাবেই স্বামীর সঙ্গে ঘর কর্‌চে, অনেকগুলি সন্তানের জননী হয়েচে। সংসারের......

রাজা বল্লেন—তারপর?

মন্ত্রী বল্লেন—যে বিধবা, সে এক প্রতিবেশী যুবকের প্রলোভনে পড়ে...

রাজা অধীর হয়ে বল্লেন—চাষা ছেলে?

মন্ত্রী গভীর সুরে বল্লেন—সে বনে বনে বাঁশী বাজায়, কাঠ কাটে, রাজকন্যার জন্য বেছে বেছে ফুল তুলে মালা গাঁথে, নদীর জলে মালা ভাসিয়ে দায়, চাঁদের আলোয়

কখনো বুকের রক্ত দিয়ে রাজকন্যার নাম লেখে—রোজ সন্ধ্যাবেলায় রাজ-প্রাসাদের শেষ বাতায়নে রাজকন্যার জন্য একটু চোখের সজল চাহনি দিয়ে যায়……

রাজা পাগল সুরে বল্লেন—আর রাজ-কন্যা ?

মন্ত্রী বল্লেন—সে ও এমনি প্রেমের পরম ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌চে, দুঃখের তপস্যা কর্‌চে। সে তার সব বিলাস-ভূষণ ছেড়ে দিয়েচে, চাষা-ছেলের মতো ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে, সন্ধ্যা-নাগাদ ঠায় বাতায়নের পাশে বসে থাকে একটি দৃষ্টির মৌন ইসারা পাবার জন্য, রোজ দুপুরে খাঁচার ময়নাটাকে চাষা-ছেলের নাম শেখায়, চাঁদ্‌নী রাতে ছাতে উঠে চাষা-ছেলের বাঁশীর ইমন-পূরবী শোনে, আর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঘুমিয়ে পড়ে…

রাজা বল্লেন—আমি এবার একটা সভা কর্‌ব, প্রেমে আনন্দ পেল কে ?

মন্ত্রী অবাক্ চোখে চেয়ে রইলেন।

রাজা বল্লেন—আমি কি বুঝ্‌তে পারি না মন্ত্রী, প্রেমে আনন্দ পায় কারা ? যারা সত্যই একদিন দুঃখ পায়, তারাই সারা জীবন ভরে আনন্দ সৃষ্টি কর্‌তে পারে। সত্যকারের প্রেমে বৈষম্য নেই, বঞ্চনা নেই, বেদনা নেই, সেখানে শুধু উৎসব আর আনন্দ! সে সভার প্রথম পুরস্কার কে পাবে, জানো ?

মন্ত্রী বল্লে—কে ?

রাজা বল্লেন—রাজকন্যা চাষা ছেলেকে, আর চাষা ছেলে রাজ-কন্যাকে……

তখন মাঠের শেষে চাষা ছেলের করুণ বাঁশীর সুর কাঁদ্‌চে আর কাঁদচে,…আর কৃশাঙ্গী অনাহার-ক্লিষ্টা রাজকন্যা তার ছিন্ন ম্লান আঁচলে চোখের জল মুছচে আর মুছচে!

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

পর্দ্দার বাহিরে

কি একটা মাম্‌লার কথা লইয়া সেদিন বার-লাইব্রেরীতে বিষম তর্ক উঠিয়াছিল। তর্কের বিষয়, নারীর অধিকার। নীরদ বেচারা আমার কথায় সায় দিয়া বলিয়াছিল, নারী নিজের অধিকার নিজে সাব্যস্ত করিবে, পুরুষের ওদিকে মাথা ঘামানো অনধিকার-চর্চ্চা! আর যায় কোথা! অমনি একটা প্রবল দল সপ্তরথীর মত আমাদের দুইজনকে ঘিরিয়া ফেলিল—সে বূ্যহ ভেদ করা দায়! হঠাৎ তর্কের সে বূ্যহ ভেদ করিল, রামনাথ।

রামনাথ বলিল,—আচ্ছা, আমার একটা দুর্দ্দশার কাহিনী শোনো—শুনে তোমরা বিবেচনা করে বল, আমাদের দলে নারী যদি হঠাৎ এসে আবির্ভূতা হন্, তা-হলে পর্দ্দার ভিতরে-বাহিরে দু'জায়গাতেই বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটে কি না! আমাদের দশা তখন…?

সকলে মহা-উৎসাহে বলিয়া উঠিল,—বাজে কথা রাখো, বল তোমার কাহিনী।

নীরদ তামাসা করিয়া বলিল,—চাই কি, কাহিনীটা

আমি বলিলাম—বেশ! গোঁড়া-দলের সঙ্কীর্ণতা জাহির করে তাদের একবার অপর-পক্ষের তর্কের মধ্যে ফেলে দেওয়া যাক্।

রামনাথ বলিল,—এই সেদিনের কথা। পূজার ঠিক পরেই হঠাৎ একদিন খেয়াল হলো, দিল্লী, আগ্রা সব ঘুরে আসা যাক! কোর্টের কথা, মক্কেলের কথা মনেও রইল না। ভাবলুম, ও তো আছেই, ও-ধারটা যে একেবারে রহস্যাবৃত রয়ে গেল! যেমন ভাবা, অমনি উদ্যোগ সুরু!

প্রকাণ্ড মোট-ঘাট ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়লুম। একটা প্রোগ্রাম ছকে নিলুম—গিয়ে প্রথম নামবো, এলাহাবাদে। সেখানে এক আত্মীয়ের বাড়ী দুদিন বিশ্রাম করে যাব ওপারে—লক্ষ্ণৌ। এমনি করে কানপুর, মিরাট, আগ্রা, দিল্লী, হরিদ্বার সেরে ফিরবো, ফিরে আবার এই পুলিশ-কোর্টের ফটকে মাথা গলাব।

রওনা হলুম রাত্রের প্যাশেঞ্জারে। গাড়ীর কামরায় ভিড় ছিল না; তিনজন মাত্র। তাঁরাও বর্দ্ধমানে নেমে গেলেন। তাঁরা নামবামাত্র ভাবলুম, আরামে যাওয়া যাবে! বিছানায়

সীতাভোগ, মিহিদানাও কিনে রাখলুম। গাড়ী প্রায় ছাড়-ছাড়, এমন সময় আমার কামরার সামনে রমণী-কণ্ঠের ঝঙ্কার ভেসে উঠল,—যেন জুজু,—কি ও! রেলে যাবি, খরখর করে চলবি, না, এখানেও এক-গলা ঘোমটা টেনে অমন জুবুথবু! হোঁচট্ খেয়ে পড়ে মরবি যে!

চেয়ে দেখি, এক প্রৌঢ়া, সঙ্গে এক তরুণী। প্রৌঢ়াকে দেখে থিয়েটারের তাজ্জব-ব্যাপারের সেই কর্ণেল-নারীটিকে মনে পড়ল! প্রকাণ্ড বপু!—দেখে মনে হয়, বলি, Woman, thou art born to rule. তাঁর একটা কথা যেন রাজার হুকুম! না মানবার কথা মনে হলে হৃৎকম্প হয়!

কামরার দ্বার খুলে তাঁরা ভিতরে এলেন। সঙ্গে বিস্তর মোট। তরুণীটি উঠেই একপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসলেন, আর প্রৌঢ়া কুলিদের উপর তর্জ্জন চালিয়ে বললেন – এই, এই, সাম্‌লে!...ওরে, আচারের হাঁড়ি ওটা, পড়ে যাবে যে ...আঃ! কুঁজো, জলের কুঁজোটা কৈ?...হ্যাঁলা ও মেনি, কুঁজো না তোর হাতে দিলুম, ওতে খাবার জল—ওঠাতে পারলি না! ভ্যালা মেয়ে যা হোক্! এতখানি পথ, তেষ্টা পেলে কি করব বল্ দিকিন্!...সব তাতে ঘোমটা! কে আছে এখানে তোর—ভাসুর, না, শ্বশুর?...ওরে, সেই ছোট বাক্সটা এনেছিস? না, ফেলে এলি? না, না, এই যে, বাঁচলুম—দে, দে শীগগির—ঘণ্টা পড়ছে।.. বিছানাটা ব্রেকে দেছে তো? দেখিস বাবা, পড়ে থাকে না যেন।... আরো পয়সা? আবার কি দেবে? চার পয়সা করে? চারজনে চার আনা? বটে! আমি কখনো রেলে চড়িনি, না? বলে, রেলে চড়ে চড়ে হাড়ে কয়লা জমে গেল!...

কি বিষম হট্টগোল—যেন একটা প্রকাণ্ড মেলা বসেছে! চীৎকারে তিনি একাই একশ' জনের মহড়া নিতে পারেন। গাড়ী ছেড়ে দিলে তিনি বসলেন। তারপর বললেন—যাঃ, গামছাখানা বিছানার মোটের মধ্যে গুঁজে রাখলি! সেটা বার করবলি না? ব্রেকে গেল, কি পড়ে রইল, কে জানে! না বাবু, খালি তোর জন্তে! চটপট এসে চড়বি গাড়ীতে, না, থুপ্‌থুপ্! কেন, পা কি নেই? ভগবানের দেওয়া পা, তার ব্যবহার করবিনে?

ঘণ্টা কাটল। তরুণীকে বারবার তিনি গঞ্জনা দিলেন জলের কুঁজোর জন্ত—আর সে বেচারী একজন অজানা পুরুষ-মানুষের সামনে এ-ভাবে তাড়া খেয়ে আরো কুণ্ঠিত হয়ে কাপড়ের পুঁট্‌লির মতই পড়ে রইল!

তার পর প্রৌঢ়ার নজর পড়ল আমার দিকে। আমার নাম কি, কোথায় থাকি, কোথায় চলেছি, কি করি—এমনি খুঁটীনাটী প্রশ্নে এমন অতিষ্ঠ করে তুললেন যে তাঁর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্ত শেষ হাই তুলে চোখ বুজলুম।

ভাবো একবার অবস্থাখানা! এ ভাবে এতখানি পথ যাওয়া কি কষ্ট! হাতে ছিল একখানা নতুন নভেল—নায়িকা মস্ত এক সমস্তার মাঝখানে পড়ে যখন কি হবে ঠাওরাতে পারছে না,ঠিক তখনি এই গণ্ডগোল! সে বেচারীর কি হলো, জানবার জন্ত প্রাণ একেবারে আকুল! কি করি, দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়েই বই বন্ধ করে চোখ বুজতে হলো! এর চেয়ে হাজত-ঘরও বুঝি ঢের আরামের জায়গা!

ট্রেণ এসে দাঁড়ালো আসান্‌সোলে, ভোরে। টিকিট-চেকার এসে হাজির। টিকিট দেখালুম। প্রৌঢ়া চেকারকে দেখে একবার এ-কোমরে হাত দেন, একবার ও-কোমরে—তারপর এ-আঁচল আর ও-আঁচল—টিকিট নেই! তরুণীকে ডাকলেন,—হ্যাঁলা ও মেনি, টিকিট কৈ? টিকিট দু'খানা?

তরুণী ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসলো, বসে তেমনি নিঃসাড়! মুখের কথা শুনলুম না, শুধু ঘাড় নাড়া দেখলুম। তার মানে, নেই, বা সে জানে না! প্রৌঢ়া গর্জ্জন তুললেন,—ভ্যালা কাঁচের পুতুল সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছি! বাবা, বাবা—টিকিট দুখানা আঁচলে বেঁধে নে—না, তাও বুড়ো মাগী, আমার ঘাড়ে বরাত চাপিয়ে নিশ্চিন্তি! বুড়ো মানুষ, দু'দিক সামলাই বল দিকিনি?—তারপর চেকারের পানে চেয়ে বল্‌লেন,—ওগো বাবু, আমরা যাচ্ছি কাশী। কাশীর টিকিট কিনেওছি—বর্দ্ধমান থেকে। তা বাছা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। জেনানা-কামরায় উঠিনি, তার মানে যে চোরের ভয়! যাচ্ছি কাশী—সেখানেই আমি বাস করি। এটি আমার নাৎনী—একেই নিয়ে আসছি। এমনি ছোটলোক শ্বশুর-মিন্সে যে আমার কাছে পাঠায়, না, পয়সা-

তো আর কেউ নেই—নিজেই এলুম। বিশ্বাস না হয় যদি তো বর্দ্ধমানে টেলিগেরাফ করে তুমি জানো। এর শ্বশুর, ঐ যে বর্দ্ধমানে থাকে গো—শ্রীনাথ চক্করবর্ত্তী—ইষ্টিশানের কাছে মস্ত মদের দোকান। বামুনের ছেলে, এ ব্যবসাও করে! ছি, ছি—নজরও তেমনি...

চেকার বেচারা এই কথার বাণে সেকালের ঐরাবতের মত বিনা-বাক্যব্যয়ে ভেসে চলে গেল। সে চলে যাওয়ার পর তরুণী প্রৌঢ়াকে ইসারা করে কাছে ডাকলে। প্রৌঢ়া তার কাছে ঘেঁষে গিয়ে বসলেন—চুপি-চুপি কি কথাও তরুণী বললে, প্রৌঢ়া মুখখানা সিঁটকে রইলেন। আমি তাঁর ভাবগতিক দেখছিলুম। তার পর তরুণীর কথা শেষ হলে একেবারে তেলে-বেগুণে জ্বলে লাফিয়ে উঠলেন,—তাই তো, তাই ঠিক! সেই গামছার খুঁটে বেঁধে রেখেছিই তো বটে! তা এতক্ষণ মুখে পাথর চাপা ছিল কি? ভ্যালা মেয়ে যা হোক্—এম্‌নি করেই থাকিস্ চিরকাল! চেকার-মিন্সে জোচ্চোর না কি ভাবলে, বল দিকি! ঘটে কিছু বুদ্ধি নেই!

তারপর চকিতে একবার এদিকে একবার ওদিকে চেয়ে আমাকে বল্‌লেন,—একবার একটু উপকার কর না বাছা। বাবুটিকে ডেকে বল তো, ব্রেকে আমাদের একটা বিছানার গাঁটরি আছে, তার মধ্যে একখানা গামছা গুঁজে দিছি, তারি খুঁটে টিকিট আছে।

আমি মহা-বিরক্ত হয়েই বসেছিলুম। তার উপর এই বেয়াড়া ফরমাশ শুনে বললুম,—কোনো দরকার নেই। আপনি স্থির হয়ে বসুন। আপনার কথা শুনে গেছে তো যে টিকিট আছে সঙ্গে—

অনুরোধ, উপরোধ,—শেষে পাগল হবার জো! নামতে হলো। কোথায় চেকার? ফিরে এসে কামরায় আবার বিছানায় শুয়ে পড়লুম। ট্রেণও ছেড়ে দিলে।

বেলা প্রায় সাড়ে নটায় মধুপুর। মুখ-হাত ধুয়ে মাথায় জল ঢেলে কিছু খেয়ে নেব ভেবে নেমে গেলুম।—হাতে নিলুম তোয়ালে আর সাবান, কোটটা খুলে রেখে গেলুম।

ডাউন প্ল্যাটফর্ম্মে কেলনারের হোটেল। ওভারব্রীজ সময় ট্রেণ ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। টকাশ্ করে লাফিয়ে লাইনের উপর দিয়ে এসে একখানা থার্ডক্লাশ কামরায় ঢুকে পড়লুম। তারপর গাড়ীও ছেড়ে দিলে। যোশিদিতে গাড়ী থামতে নেমে নিজের কামরায় ঢুকলুম। ঢুকে দেখি, ফ্লানেলের কোট নেই! কি সর্ব্বনাশ! তার পকেটে যে মনিব্যাগ। আমি তো গোটা চারেক টাকা নিয়ে হোটেলে গেছলুম—আর মনিব্যাগে···চম্‌কে উঠলুম। প্রৌঢ়ার পানে চাইলুম—তাঁর মুখ যেন মরার মত সাদা! তবে কি······

কিছু বলবার আগেই তিনি খুব নরম গলায় বললেন,—তুমি তাহলে মধুপুরে পড়ে নেই! দেখ দেখি! আর...

হঠাৎ চেয়ে দেখি, আমার জিনিষপত্রও কিছুই নেই—বিছানা, বালিশ, সুটকেশ্ গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ, ইস্তক জলের কুঁজো, গ্ল্যাশ, নভেলখানা অবধি! মানে কি?

মানে তখনি জানলুম। প্রৌঢ়া বললেন—ট্রেণ ছাড়ে, তবু তুমি এলে না দেখে আমার এমন ভাবনা হলো, আহা, পাছে জিনিষের জন্যে তোমার অসুবিধে হয় বাবা, তাই আমরা দুজনে মিলে তোমার সব জিনিষ তাড়াতাড়ি প্লাটফর্ম্মে ফেললুম। কুঁজোটা একজন কুলির হাতেই দিয়েছি, ভাঙেনি। তা······

আর তা—! আমার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীখানা ছোট্ট মার্ব্বেলের মত বোঁ-বোঁ করে ঘুরে উঠল।··· মনিব্যাগে প্রায় বিশ-পঁচিশ টাকা—তাছাড়া রেলের টিকিট! গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগেও পাঁচ কেতা নোটে পাঁচশো টাকা নগদ—সে-সব···সর্ব্বনাশ!

মনে হলো, হোক্ নারী, দিই এই প্রগল্‌ভার মাথায় প্রচণ্ড ঘুষি! এমন রাগ হলো! সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করে কাঁপছিল! মনে হলো,—আগুনের মত জ্বলে উঠে বলি, কি তোমার দরকার ছিল বাপু, আমার উপর এ দরদের, এ সর্ব্বনেশে মমতার!

খুব কড়া রকমের কিছু একটা বলবো ভেবে তার দিকে একটু এগিয়ে দাঁড়াতেই চোখ পড়ল সেই তরুণীর পানে। সে বেচারী তার করুণ চোখদুটি মেলে আমারি পানে তাকিয়েছিল—জল-ভরা মিনতি-ভরা দুই চোখে কি সে কাতর দৃষ্টি!

ঘুরছিল। বসে পড়লুম। মাথার মধ্যে সারা ছুনিয়াখানা টলমল করে দোল খেয়ে ফিরছিল—যেন নাগর-দোলায় চড়েছি!

পরের ষ্টেশনে নেমে পড়লুম। মধুপুরে তার করে দিলুম। তারপর কত বেলায় ফিরতি-ট্রেণে আবার এলুম মধুপুরে! খুঁজে-পেতে কোট্‌টা পেলুম—মনিব্যাগ অন্তর্হিত! গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ব্যাগটা লাইনের ধারে গড়িয়ে পড়েছিল—কেউ নজর দিতে পারেনি তখনো! কাজেই সে পাঁচশো টাকায় আর ঘা পড়ল না! বালিশটা পেলুম, গোটা নয়, তার ছেঁড়া খোলটা শুধু—তুলো লাইন-ময় ছড়াছড়ি! সুটকেশের ডালাটা ছিঁড়ে কোথায় উড়ে গেছে! ব্যাগখানার যা দশা দেখলুম, তাতে আর তাকে হাতে তুলে নেওয়া চলে না! কুঁজো-গেলাসের সন্ধানও কেউ বলতে পারলে না। অর্থাৎ এক-রকম ছন্ন-ছাড়া দশা দাঁড়াল!

মন এমন বিগড়ে গেল যে সে-যাত্রা আর অগ্রসর হওয়া চল্‌লো না। অগ্রসর হওয়া অসম্ভব! সন্ধ্যার এক্সপ্রেশ ধরে বাড়ী ফিরে এলুম। তবে সে প্রৌঢ়াকে যদি কোনদিন পাই—! এক-একবার ভাবি, বর্দ্ধমানে সেই শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তীর মদের দোকানে গিয়ে সন্ধান নি—। কিন্তু সেই তরুণীর মিনতি-ভরা সজল দৃষ্টি আমাকে একদম মেরে রেখেছে—! তবে এ প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যে-কামরায় নারী আছে, রেলের সে-কামরায় আর কখনো চড়ছি না, তাতে কোথাও যাওয়া বন্ধ করতে হয়, সেও আচ্ছা!

রামনাথ চুপ করলে। সকলে হো-হো করে এমন আকাশ-ফাটা হাসির রোল তুললে যে নীরদ বেশ ঝাঁজালো সুরেই বলে উঠল—এর জন্যে কি বলতে চাও ...

আমি তাকে বাধা দিলুম, দিয়ে বললুম,—পাগল হয়েছ! এ নিয়েও তর্ক করে! এ একটা এ্যাড্‌ভেঞ্চার! আমাদের কপালে এ রকম এ্যাড্‌ভেঞ্চার জুটলো না বলে জীবন-ভোর একটা মস্ত আপশোষই রয়ে গেল যে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্বাস্থ্যের কথা

আমাদের দেশে একটু বেশ বলিষ্ঠ চেহারা থাকলেই কাঠ-খোট্টা বলে পরিচিত হতে হয়। কাঠ্-খোট্টা অর্থে দৃঢ় মাংস-পেশীযুক্ত গঠন। উক্ত চেহারা যে কেন কাঠখোট্টা উপাধি পেতে পারে, সে বিষয়ে এখনও মহিলা-মজ্‌লিসে তর্ক ওঠেনি এবং অনেক মার্জ্জিত পুরুষদের মধ্যেও নয়। সত্য কথা বল্‌তে গেলে বল্‌তে হবে, আমাদের মধ্য-বয়স্কা পিসিমা জ্যেঠাইমারা ছেলে-মেয়েদের ঠিক ভাল-ভাবে বেড়ে উঠ্‌তে দেন না! তার প্রধান কারণ, তাঁরা ছেলে-মেয়েদের এত বেশী স্নেহের চক্ষে দেখেন যে তাদের গায়ে সামান্য আঁচড়টুকু পর্য্যন্ত সহ্য কর্‌তে পারেন না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই চান যে তাঁদের ছেলে-মেয়েরা বেশ নধর-কান্তি হোক্! কিন্তু যাঁরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যায়াম করে থাকেন, তাঁদের

শরীরটা কিছুই নয়, মনটাই সব—এ কথা অনেক দিন থেকেই শুনে আস্‌ছি। মাথাটাই যে দেহের মধ্যে সব-চেয়ে বড় এবং কাজের কল, এ কথা মানি; কিন্তু তাই বলে শরীরটা কিছু নয়, এ কথা স্বীকার করা যায় না।

মাথা চালায় শরীর চলে। শরীর না থাক্‌লে মাথা দাঁড়ায় কোথা? বাঙ্গলা দেশ কেবল মাথার কাজ কর্‌তে কর্‌তে আজ এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে শরীরটাকে খুঁজে নিতে একটু কষ্ট হয়! অর্থাৎ খোঁটার কাঠির উপর আলু বসিয়ে দিলে যেমন আলুটাই আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পরে খুঁজে নিতে হয় সেটা কার উপর দাঁড়িয়ে আছে,—তেমনি আমাদের নব্য যুবকদের মাথা-নাড়া দেখে অনুভব করে নিতে হয় যে মাথাটা শূন্যে নেই!

পুরুষের কোমলতা চেহারায় ততটা দরকার নয় যতটা দরকার হয় মনে। পুরুষ যে বেশীর ভাগ জায়গায় বোঝা বইবে বলে জন্মেছে। তার শরীরের মধ্যে অনর্থক বেশীর ভাগ নরম ভাব রাখাটা আর কিছুই নয়, কেবল কোন বিশেষ দলের মন জোগানো মাত্র। কোন বিশেষ দলের মন জোগানোটা যে কেউ ইচ্ছা করে না, তা জানি। কিন্তু প্রকৃতির উপর চালাকি করতে গেলে তা যে লুকানো থাকে না, এটা তো জানা কথা।

আমরা শরীরকে যত্ন করি না বলেই, শরীরও আমাদের হয় না এবং অধিকাংশ জায়গায় চর্ব্বির বাহুল্য হয়ে পড়ে মাত্র। সুগঠিত সুসমঞ্জস গঠন দেখ্‌তে না পাওয়ার কারণ বোধ হয় আমাদের দেশের "আহা, বাছারে" বুলিটি! তার ফলে হয় এই, ছেলে-পিলেরা পড়ে গেলে আর উঠ্‌তে শেখে না, সামান্য আঘাত পেলে সহ্য করতে পারে না, অধিকন্তু সহ্য কর্‌তে চেষ্টা করবার আগেই পিসিমা জ্যেঠাইমারা "আহা, বাছারে" প্রলেপ দিয়ে যতটা পারেন চোখের জল নিঙ্‌ড়ে বার করে নেন।

শৈশব থেকে সব রকমের আঘাত সহ্য কর্‌তে না শিখ্‌লে যৌবনে তার দেহে এবং মনে পুরুষকার লাভ করা একটু শক্ত হয়ে পড়ে। পুরুষের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করতে গেলে মেয়েরা অনেক জায়গায় বলে থাকেন, "কি সুন্দর চেহারা দেখে এলাম ভাই, কার্ত্তিকের মত, যেন ননীর পুতুলটী! অমুকের সঙ্গে বিয়ে হলে ভারি সুন্দর মানাবে।" কিন্তু পুরুষের সৌন্দর্য্যের তুলনা কর্‌তে গেলে কার্ত্তিককেই উপমা স্থলে টেনে আনা হয়, অথচ কার্ত্তিক, যিনি দেব-সেনাপতি ছিলেন, তাঁর চেহারা যে কতটা ননীর পুতুলের মত হতে পারে, তা সহজেই আঁচ করে নেওয়া যায়।

এর উপরও আছে বেজায় পাকা পুরুষদের দর্শন-শাস্ত্র, যে জিনিসটা তাঁরা সুযোগ পেলেই বক্তৃতায় উল্লেখ করতে ছাড়েন না, যেমন—……ওহে বাপু, শালগ্রাম-শিলার মত যে গোল-গাল হাত পা সমস্ত শরীরের মধ্যে তৈরি করছ, ও-সব কতদিন থাক্‌বে? এ দেহটাকে কি চিরকাল ঠিক ঐ রকম রাখ্‌তে পার্‌বে? যার একদিন নিশ্চয় লয়,

চিন্তা একটু কর। কিন্তু আমাদের দেশেই বেজায় পাকাদের মত অনেকে পরকালের কাজ করে গিয়েছেন এবং তাঁরা মরে বাঁচেন নি, বেঁচেই বেঁচে ছিলেন— যেমন ভীষ্ম, ভরত ইত্যাদি।

শরীরটা রোগের আবাস। শরীর যত দুর্ব্বল হবে, তার ভিতরকার যন্ত্রগুলো তত কম-জোরি হয়ে আসবে। সুযোগান্বেষী রোগের বীজাণু সবল হলে শরীরের যন্ত্রগুলোকে আক্রমণ করতে এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করে না। তার ফলে দাঁড়ায় এই যে বাঙ্গলা দেশে খুব কম লোককেই প্রাণ খুলে হাস্‌তে দেখা যায়। হাসি জিনিষটা শরীরের পক্ষে খুব দরকারি। স্বাস্থ্য না থাক্‌লে সত্যিকারের হাসি বড় চট্ করে আসে না। সভ্যতার মন্দিরে এবং বেজায় পাকা লোকের কাছে চেঁচিয়ে হাসাটা না কি একটা ভয়ঙ্কর রকমের বেয়াদবি! যাক্‌গে, আমরা খুব সভ্য নই এবং এ স্থলে ও বিষয়ে কিছু বল্‌বার অধিকারও হয়তো আমাদের নেই।

মেয়েলি-ভাবে কথা বলা, হাঁটা, কাশা, গান গাওয়া ইত্যাদি খুব বেশী রকম নকল হয়ে থাকে, অধিকাংশ ভুঁইফোঁড় শিল্পী-মহলে। মেয়েদের নকল করা সব জায়গায় খারাপ না হতে পারে, কিন্তু ভগবান যেখানে পুরুষকে পুরুষ বন্‌তে চান, সেখানে সে যদি মেয়ে সাজতে যায়, তাতে করে প্রকৃতির উপর জবরদস্তি করা হয় না কি? এই সব তথা-কথিত মতে শরীর এবং মন খুব বেশী রকম হাল্‌কা না হলে না কি ভাবের জগতে যাওয়া যায় না এবং সৃষ্টিও হয় না! কথাটা মন্দ নয়। মন সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার নেই; কিন্তু শরীরকে হাল্কা করার উদ্দেশ্যও কি তাকে শূন্যে ঠেলে তোলা? বীণা যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ কেমন করে আকাশে উড়তে পারে, তা বোধ করি বাঙ্গলাই প্রথম আবিষ্কার করবে!

সুস্থ এবং সবল শরীর না থাকলে মনটাও যে তাজা হবে না, এ যুক্তি অবশ্য সব জায়গায় খাটে না, কিন্তু এটাও ডাক্তারি মতে খুব ঠিক যে শরীর তেজী হলে মনকেও সে প্রফুল্ল রাখতে পারে। মন এবং শরীর একসঙ্গে কাজ

এক-সময়ে খুব বেশী খেতে পারাটা না কি স্বাস্থ্যের লক্ষণ ; কিন্তু এক-সময়ে খুব বেশী খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই খারাপ এবং অনেক সময় বেশী খেয়ে বাহাদুরি নেবার পর, অনেক লোককে ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হতে দেখা গিয়েছে এবং অনেককে ভবলীলা পর্য্যন্ত সাঙ্গ করতে হয়েছে। শরীর রাখতে গেলে সব বিষয়ে সংযম রাখা দরকার। সংযম অর্থে, লোটা-কম্বল নিয়ে বেরুনো নয়, কিম্বা হোমিওপ্যাথি ডোজের ছেলে হওয়া নয়,—যেটা রয়-সয় সেইটেই মেনে চলা।

যে-কাজে কোন বিপদ নেই, সেই কাজেই আমরা ছেলেবেলা থেকে উৎসাহ পেয়ে থাকি। কাজে কাজেই সাহস আমাদের মনে গোড়া থেকেই জন্মাতে পায় না এবং সব বিষয়ে ভয় করতে শেখা একটা মস্ত গুণের জিনিষ হয়ে ওঠে। ভয় করা যে সব জায়গায় খারাপ, এ কথা বলা চলে না ; কিন্তু মানুষের জীবনে এমন সব ব্যাপার ঘটে, যেখানে ভয় করতে গেলে তার আত্ম-মর্য্যাদাটুকুও নষ্ট হয়।

ভয় একবার মজ্জাগত হয়ে গেলে, সামান্য ব্যাপারে যেমন, তেমনি অনেক সৎ কাজে বিপদ দেখ্‌লেও আমাদের মধ্যে অনেকেই পেছিয়ে পড়ে। ঐ সামান্য বিপদ পার হতে পারলে হয়তো একটা মানুষ তার জীবনকে সার্থক করতে পারতো! কিন্তু বিপদকে সাথী করতে অভ্যস্ত নয় বলেই তার জীবনটা মাটী হয়ে গিয়েছে, একটু সৎসাহসের অভাবে।

আজকাল শিল্পীদের মধ্যে একটা—"আমরা কিছু মানিনার" দল হয়েছে। তাদের কাজ হলো, সব কিছু না মেনে চলা। খাওয়া থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য যত রকমের ভোগ আছে, তা সবই খেয়ালের উপর সেরে নেওয়া! অনেক জিনিষ খেয়ালের উপর চলে এবং তাতে বাধা দেবার কেউ নাও থাক্‌তে পারে, কিন্তু খাওয়া সম্বন্ধে গোঁয়ার্ত্তুমি করতে গেলে প্রকৃতি তাকে কিছুতেই ছেড়ে কথা কইবে না।

এঞ্জিন ভাল কয়লাতেও চলে, খারাপ কয়লাতেও চলে। খারাপ কয়লা দিয়ে অনবরত চালালে এঞ্জিন মেরামত করতে হয়, অনেক বার ; এবং কল একেবারে বিগ্‌ড়ে যায় যখন, তাকে আর সারাবার তখন কোন উপায় থাকে না। সেই রকম মানুষের দেহের কলও খারাপ হয়ে যাবার সম্ভাবনা সেইখানেই খুব বেশী থাকে, যেখানে সে তার মাল-মশলা ঠিক-মত পায় না।

কোন গতিকে জীবনটাকে চালিয়ে নেওয়া হলো এ দেশের একটা চল্‌তি প্রথা। লোকে সুস্থ সবল দেহ নিয়েও বেঁচে থাকে এবং কেউ বা অনবরত রোগে ভুগেও শরীরটাকে কোন গতিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে। সুস্থ দেহে বাঁচাটাই যে বাঞ্ছনীয়, সে কথা নির্ব্বোধ ছাড়া কে অস্বীকার করবে?

বেজায় ফর্সা এবং ভয়ানক রোগা বাবুর দল আজকাল খুব বেশী রকম বেড়ে চলেছে। তাঁদের প্রত্যেক ভাব এবং ভঙ্গীতে এত বেশী কৃত্রিমতা স্পষ্ট ফুটে ওঠে, যা সহজ মানুষের কাছে একেবারেই লুকানো যায় না। এঁদের কাছে মাথাটা খুব নীচু করে চলা না কি নম্রতার নিদর্শন, সোজা হয়ে হাঁট্‌লে নাকি দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়, স্পষ্ট কথা বলা নাকি অসভ্যতা ইত্যাদি! ফলে এঁরা দেহে ও মনে আড়ষ্ট এবং সঙ্কুচিত হয়ে ওঠেন, তাঁদের দেহ-মন স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে না।

সব দেশই স্বাস্থ্যকে বজায় রাখা একটা নেহাৎ দরকারি জিনিষ মনে করে—কেবল বাঙ্গলা দেশ এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে! এদেশে ঠাণ্ডা ছেলের আদর খুব বেশী রকম, কাজে কাজেই জোয়ান ছেলে তৈরী করায় ব্যাঘাত আছে বিস্তর। ভারতী, Welfare, মৌচাক ইত্যাদি কাগজে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দু' একটা প্রবন্ধ বাহির হয় বটে কিন্তু তার সংখ্যা এই বিরাট Fashionable অম্ল-রোগীর দেশের পক্ষে অতি নগণ্য।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

দুর্দ্দিনে

কড় কড় মেঘ ডাকে
এই পড়ে বাজ
বয় হাওয়া বন্ বন্
দুর্দ্দিন আজ।
কাঁপে দোর, কাঁপে ঘর
ঝরে ধারা ঝর ঝর,
ভরা দিন দুপুরেতে
লেগে রয় সাঁজ।

ভাঙ্গা চাল্ উড়ে যায়
ঘর-ভরা জল,
সরে যাই কোণে নাই
দাঁড়াবার স্থল,
দিবসের দেনা শোধ
গেল ঘাট-ভরা রোদ
একা যাই ভাবি তাই
নাই কোনো কাজ।

চোখে জল, শুকাইয়া
উঠে তালু জিব্,
ভিজে শোলা চক্‌মকী
নিভে যায় দীপ।
জল যে উনান-ময়
আলো নাই ধোঁয়া হয়
ছেলে কাঁদে ভুলাতেও
আর লাগে লাজ।

বাসা নাই আশা নাই
ভাষা নাই আর,
বল দেখি ভাত পাতি
যাই ঘরে কার?
কাছে নদী ডাকে বান
প্রাণ করে আন্‌চান
জোরে যেন ঢেঁকী পড়ে
ভাঙ্গা বুক মাঝ।

কি যে পাবো কোথা পাব
ভরা বরষায়
জানিনাক, তবু আছি
কার ভরসায়!
মন কোথা পায় জোর
বলে হবে রাত ভোর
পাঠাবে নবীন ভেট্
রাজ-অধিরাজ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ব্যথিত-বেদন

ওগো,

জানি না, তুমি কোন্ কল্প-লোকের শোভনা আজ আমার আঁধার-হৃদয়ের শোভা বাড়াবার জন্যে মূর্ত্তিময়ী হয়ে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছ, তোমার ভুবন-ভোলানো মোহন রূপে লীলা-লাবণ্যের ঢেউ তুলে! এ হৃদয়টা যে শুধুই শুকনো পঙ্কের রাশি হয়ে রয়েছে, [illegible] কি তুমি সেখানে সেই শুক্‌নো পঙ্কের উপর সলিল ছড়িয়ে পদ্ম পুষ্পিত কর্‌তে? হয় তো, সেই পঙ্কের নীচে কোন্ গুপ্ত-সলিলা ফল্গু গুপ্তভাবেই বয়ে' চলেছে। কেবল মুখটা খুলে দেবার মত লোকের অভাবেই তা উৎসরূপে ফুটে উঠে সারা প্রাণটাকে স্নান করিয়ে স্নিগ্ধ করে' দিতে [illegible]

জীবনের এতদিনকার সুপ্ত কামনা-বাসনাগুলো নির্জ্জীবের মত এতদিন পড়ে' ছিল, প্রাণের কোন্ এক অাঁধারের আব্‌ছায়া অন্ধকারে। আজ তোমার চরণ-মঞ্জীরের মৃদু গুঞ্জনে সেগুলো সজীব হয়ে গা নাড়া দিয়ে উঠ্‌তে চাইছে। তুমি তাদের তৃপ্ত করতে পার্‌বে তো? যদি না পারো, তা হলে তাদের ঘুম ভাঙ্‌বার আগেই, যে চরণের স্পর্শে তারা জেগে উঠ্‌তে চাইছে, তারই পেষণে তাদের দলিত করে' চলে' যেও। কিন্তু এটা যে মনে কর্‌তেও গা শিউরে ওঠে! তোমাকে যে তাদের সজাগ কর্‌তেই হবে তোমার প্রাণ-মাতানো মদির স্পর্শে! তুমি যে প্রাণ-ময়ী! নিষ্ঠুরতা তোমার ভাব্‌বার সীমানার মধ্যেও আস্‌তে পারে না।

মনে হয়,—

"তোমারেই যেন ভাল বাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।"

হয় তো কোন্ অনাদি অনন্ত অতীত কালের এক বাদল-ছোঁয়া সজল কাজল-প্রাতে, কোন্ শেফালি-ঝরা শুভ্র শারদ-পূর্ণিমা-রাতে, কোন্ হেমন্তের শিশির-কান্নার নীরব সন্ধ্যায় তোমার আমার মিলন-মন্ত্র বিশ্বের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে গেছে। সেটা যুগের পর যুগ ক্রমাগত জীবন-বৈষম্যের সঙ্গে জড়িয়ে আস্‌ছেই বেশী করে'। ছাড়াতে তুমিও পার্‌বে না—আমিও না! উপরন্তু যত ছাড়াবার চেষ্টা কর্‌বে, ততই বেশী করে' জড়িয়ে পড়্‌ব দুজনেই। এটাই যে হচ্ছে বিশ্ববৈচিত্র্যের ধারা।

হারানো-পাওয়ার লুকোচুরির মধ্য দিয়ে আবার যে-দিন তোমায় নূতন করে' ফিরে পেলাম আমার গোপন হৃদয়ের মাঝে, সে দিনটা আমার জীবনের একটা শাশ্বত মুহূর্ত্ত। তোমার প্রাণ-মাতানো স্পর্শ লেগে আমার জীবনের ধারাটাই বদ্‌লে গেল। কি নিয়ে তুমি আমার জীবন-প্রভাতে এসে দাঁড়ালে সারা জীবনটাকে আনন্দ-স্রোতে প্লাবিত করে'। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে

সাড়া দেওয়ার মত আমার প্রাণটাও কি এক সবুজ রঙীন্ আনন্দে মাতাল হয়ে উঠেছে। ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—

"কোথায় সোনার নূপুর বাজে,
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,—"

ওগো শক্তিময়ী, তোমার মহিমা বোঝা আমার সাধ্য নয়। তোমার মহিমা বুঝ্‌তে না পেরেই তো বিশ্বদেব তোমার চরণ-তলে লুটিয়ে পড়েছিলেন। তবু কি তিনি তোমার মহিমা বুঝ্‌তে পেরেছিলেন—তোমায় কি ধর্‌তে পেরেছিলেন, যতক্ষণ না তুমি নিজে ধরা দিয়েছিলে? কিন্তু জানি না, কোন্ পুণ্য-বলে তোমার নিজ-ইচ্ছাকৃত-ধরা দেবার গৌরবকে নিজের বলে' গৌরব কর্‌তে পার্‌ছি আজ! সেটাই কি কম আনন্দের কথা! সেইটুকুতেই প্রাণ আমার, পাগল দখিন-হাওয়ার ফুলের গায়ে পরশ লাগিয়ে শিহরিত করার মত, আনন্দে নেচে উঠেছে।

না চাওয়ায় পাওয়া যেখানে, সেইখানেই তো মিলন হয়ে ওঠে বিশ্ব-মিলন! আর, সেইটাই হচ্ছে নিত্য ধ্রুব। কামনা-ভরা মিলন জানে কেবল প্রাণে ব্যথা দিতে, মোহন স্পর্শের তুলি বুলোতে সে মোটেই পারে না। না-পাওয়ার ব্যথায় প্রাণটা এতদিন কেবল ব্যথিয়ে উঠেছে। আজ তোমায় কোন্ এক শুভক্ষণের শুভদৃষ্টির ভিতর দিয়ে পেয়ে আমার প্রাণের সকল ব্যথা আনন্দের স্রোতে কুটোর মত ভেসে গেছে। মনে হচ্ছে,

"যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটেছে হাসি—"

তোমার আসন পাত্‌বার জন্য আমার হৃদয়-পদ্মের দলগুলি মেল্‌তে না মেল্‌তেই তুমি চলে' গেলে, তিন দিনের জন্য—পিছনে ফেলে রেখে গেলে শুধু প্রাণ-মাতানো তোমার স্মৃতি! সেইটুকুই আমার লাভ! পূরো পাওয়াটা যে আমার ভাগ্যে নেই! মন কেবলই তোমার জন্য আকুল হয়ে উঠ্‌ছে। কত কথাই মনে পড়্‌ছে আজ এই বাদল-সন্ধ্যায়। মনকে এত করে' বোঝাচ্ছি যে,—

"প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি বসে' বসে' গাঁথিনু নে আর,

কিন্তু সে কিছুতেই বারণ শুন্‌তে চায় না। পাগলের মত ছোটে, কেবলি তোমার স্মৃতির পিছনে।

মনে পড়ে সেই ফুলশয্যার রাত্রির কথা—সেদিনও ছিল এমনি আষাঢ়ের বাদল-ঝরা রাত্রি। বাইরে তখন বৃষ্টির রিম্‌-ঝিম্ বাজনা সুরু হয়েছে আমাদের মিলন-গীতে তাল জোগাতে।

তুমি যখন ঘরে এলে, তখন অনেক রাত। ফুটন্ত যুঁয়ের গন্ধ মৃদু হয়ে এসেছে, অথচ এক প্রাণ-মাতানো গন্ধে ঘর ভরিয়ে রেখে তোমার আগমনের অভ্যর্থনার জন্য কি সজাগ! তুমি লাজ-জড়িত চরণে ঘরে এলে,—তোমার মুখটা ঘোমটায় আধঢাকা করে'। তোমায় তখন দেখাচ্ছিল, ঠিক যেন চঞ্চল গতিশীল শুভ্র মেঘের লঘু আবরণে কিরণ-ছিটকে-পড়া শরতের চাঁদের মত।

আমি যখন তোমায় কাছে টেনে নিলাম, তোমার ঘোমটা জোর করে' খুলে' দিলাম, তখন তোমার মুখের সলাজ আধ-ফোটা হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠ্‌লো। সেই হাসিকে ঠোঁটের কোণে চাপ্‌তে গিয়ে সারা দেহে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তা' আরও বেশী করে' উপ্‌চে পড়্‌লো। সমস্ত মুখখানি রাত্রির অন্ধকারেও মনে হলো যেন একটি প্রস্ফুটিত রক্তপদ্ম! তারপর কথা চল্‌তে লাগ্‌লো পাগ্‌লা ঝড়ের মত উদ্দাম গতিতে এলোমেলো ভাবে।

তখন কি ছাই জানি যে আমাদের সেই মিলন-মুখর রাত্রি এমনি করে'ই নীরব হয়ে যাবে। আর সেই স্মৃতি-চিহ্নটুকুই হয়ে দাঁড়াবে আমার সারা জীবনের সম্বল! তা হলে হয়তো আমার গোটাকতক কথা কয়ে' প্রাণের বেদনাকে একটু সুস্থ করে' নিতাম। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। লোকে বলে—ভগবান্ যা করেন তা ভালর জন্য। আমার জীবনের আড়ালে তোমায় লুকিয়ে রেখে তাঁর কি ভাল উদ্দেশ্য তিনি সফল কর্‌লেন তা তিনিই জানেন! এক-একবার মনে হচ্ছে, এটা তিনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। মনের কাছে কিন্তু এর মোটেই সায় পাচ্ছি না। উঃ! আমার কি ধৃষ্টতা দেখ্‌ছ! আমি যাচ্ছি তাঁর কাজের সমালোচনা করতে।

"জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়—"

তবু যদি তুমি দয়া করে' সেখানে এসেছিলে প্রতি পদক্ষেপে পদ্ম পুষ্পিত করে', তবে আবার সেগুলোকে নিজেই ছিঁড়ে ফেলে দূর করে' দিলে কেন! আমার প্রাণ যে কি এক অব্যক্ত বেদনার কান্নায় অহরহ কেঁদে ওঠে তা আমি নিজেই সব সময় বুঝ্‌তে পারি না। এক এক সময় এত ব্যথিয়ে ওঠে যে ইচ্ছা হয়, খুব খানিকটা চীৎকার করে' কাঁদি। অজান্‌তে চোখ দিয়ে জলও গড়িয়ে পড়ে, মনও তখন কতক হাল্কা হয়ে যায়। ওগো, বল্‌তে পারো, আমার এ কান্না উদ্বেল হ'য়ে ওঠে কেন? প্রাণ কেন এমন হাহাকারে বিশ্বের চরণে আছাড় খেয়ে তার কঠিনতায় আহত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে বল্‌তে পারো, কেন? ওগো ক্ষণিকা! তোমার জন্যই নয় কি?

আমি কত কথা বল্‌তে চেয়েছি, কিন্তু পারিনি, আজ

"মনে হয় কি-একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়!"

কিন্তু পারি কই! তুমি কি এমনি করে'ই দূরে সরে' থাক্‌বে? কি করে' যে পার্‌ছ থাক্‌তে, এইটাই আশ্চর্য্য!

আজ আবার আষাঢ় এসেছে সজল কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে। কিন্তু তুমি আজ কোথায়! ইচ্ছা হচ্ছে, আষাঢ়ের এই সজল মেঘকে দূত করে' তোমার কাছে পাঠাই আমার এই বিরহ-বেদনা জানাতে। তারাও যেন আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে অঝোর-ঝোরে কাঁদ্‌তে সুরু করেছে। তারা আমার দুঃখের বোঝা নিয়ে তোমার উদ্দেশে ভেসে চলেছে, পাচ্ছো কি তুমি আমার বেদনার কাত্‌রানির করুণ কাহিনী শুন্‌তে তাদের মুখে? জানি না, সেখানে কেমন করে' আছ আমায় ছেড়ে? আমি যে আর পার্‌ছি না!

আজও এই মৌন সাঁঝে আমার জান্‌লার ধারেই সেই কামিনী-ফুলের গাছটা তেমনি ফুলে ফুলে সাদা হয়ে গেছে—মনে হচ্ছে, কে যেন গাছের উপর একখানা ধোয়াচাদর পেতে দিয়েছে! এই ফুলগুলি তুমি ভালবাস্‌তে বলে' সেও তোমার চরণে নিজেকে অঞ্জলি দেবার জন্যে আকুল আবেগে

পড়তো ঘরের ভিতর। গন্ধে ঘর ভরে' যেত। আজও ঠিক তেমনি ফুটে আত্মহারা হয়ে উঠেছে তারা, কেবল নেই তুমি! তোমার চরণে অঞ্জলি দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে তারা ঝরে' পড়ছে, কিন্তু তোমায় খুঁজে পাচ্ছে না। বাতাসের দোলা লেগে তাদের পাতায়-জমা জল ঝর্ ঝর্ করে' ঝরে' পড়ছে! মনে হচ্ছে, তোমায় খুঁজে না পেয়েই যেন আর কেঁদে উঠছে, আর চোখের জলে তাদের প্রাণের বেদনা শীতল করছে! গন্ধ তোমায় আকুল হ'য়ে ঘরের ভিতর খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমার দেওয়া বাসি মালাটা, তোমার অলকের মৃদু সৌরভ আজও ঘরে ভেসে বেড়িয়ে আমাকে পাগল করে' তুলছে!

"তোমার সাথে যে বিচ্ছেদে
ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে,
ক্ষণেক তরে ঘুচাতে তাই
তোমারে ডাকি।"

কিন্তু আর যে পারি না আমি এমন করে' সারাটা জীবন কেঁদে কেঁদে ডেকে বেড়াতে। সমস্ত জীবনটাই কি এই রকম একঘেয়ে কান্নার মধ্য দিয়ে কাটাবার জন্যই ভগবান্ আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন। সেই যে কবে থেকে দুঃখের কাঁদুনি সুরু করিয়েছেন আজও যে তার বিরাম দেখি না। ক্রমশ এ বেড়েই চলেছে। তুমি এলে সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু দিয়ে গেল কান্নাটাকেই আরো বাড়িয়ে। কাঁদ্‌তেই যখন জন্মেছি তখন কাঁদ্‌তে তো হবেই। তাকে এড়িয়ে চল্‌বার ক্ষমতা কোথায়! তুমিই যে এমনি করে' কাঁদাবে তা কি মনে কর্‌তে পেরেছিলাম কোনো দিন! কেন গেলে তুমি! কেবল··· একটা সান্ত্বনা যে,—

"তোমা লাগি আঁখি জাগে।
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।"

আর সেইটুকু সম্বল নিয়ে চলেছি এই কান্না-ভরা ব্যথার বীথি দিয়ে দুর্ব্বহ জীবন-পারে পৌঁছতে। জানিনা কখন্ হয়তো কোন্ ঝিল্লী-মুখরিত বাদল-ঝরা নিশীথে সব ভুলে তোমায় এমন করে' পাবো যে-পাওয়া সব হারানো-পাওয়ার একেবারে বাইরে! আর সেইটাই হবে আমার জীবনের জীয়ন-কাঠি! তারই স্পর্শ লেগে প্রাণটা মরে'ও অমর হয়ে উঠ্‌বে। সেদিন কি আস্‌বে জীবনে? এই একঘেয়ে কাঁদুনির শেষ হবে কি?

"কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে;"

কিন্তু তা তো হলো না! জীবন-নদীর ধারে দু'জনে গল্প কর্‌তে কর্‌তে এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম তোমার ভাবে, যে, আগে কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি কখন্ তুমি আমায় একলা ফেলে তরীতে উঠে বসেছ! যখন চমক ভাঙ্‌লো তখন দেখি, তুমি আমার কূলে একা ফেলে রেখে তোমার তরী মাঝ-দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছ,—কোন্ অকূলের কূলে তরী ভেড়াবার জন্য। তোমায় ধর্‌তে না পেরে কূলের উপর আছাড় খেয়ে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌লাম। যখন জ্ঞান হলো তখন আর কোনো চিহ্নই দেখ্‌তে পেলাম না তোমার। তুমি তখন অনেক দূরে চলে' গেছ। এইটাই আমার সব-চেয়ে আশ্চর্য্য মনে হয়, কি করে' তুমি আমায় ছেড়ে যেতে পার্‌লে!

আমার প্রাণটাকে তো আমি পাথরের মত শক্ত করে' রেখেছিলাম এতদিন। তুমি কেন এসে সেখানে গভীর করে' তোমার মূর্ত্তি অঙ্কিত কর্‌লে। সেটা যে আজ কিছুতেই ঢাক্‌তে চায় না। যত তাকে ঢাক্‌তে চাই সেটা যেন ততই উজ্জ্বল হয়ে চোখের সাম্‌নে পরিস্ফুট হয় ওঠে আর প্রাণটা ততই হাহাকারে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে। সাপকে তার মাঝখানে ফলা দিয়ে গেঁথে ধর্‌লে সে যেমন যাতনায় অধীর হয়ে-ফলাটার উপরই বার বার মাথা ঠুক্‌তে থাকে আর তা ছাড়া তার কোনো উপায়ও থাকে না তখন, আমারও ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে আজ! মরণকেই আঁক্‌ড়ে ধর্‌তে যাচ্ছি প্রধান সহায় ভেবে। বারবার সেইখানেই মাথা ঠুক্‌ছি বেশী করে', যেখানে ঠুকে আঘাত পাচ্ছি বেশী। রক্তে যত স্নান কর্‌ছি, ততই যেন প্রাণ

তলিয়ে যেতে। মজা তো এইখানেই। প্রবল স্রোতের মুখে নৌকা পড়্লে যেমন সে হালের মানা না মেনে উদ্দাম হয়ে ছুটে চলে মরণের কোলে শান্তি পবার জন্য, আমিও আজ ছুটে চলেছি ঠিক তেমনি উদ্দাম গতিতে। কিন্তু পৌঁছতে কিছুতেই পার্‌ছি না, শেষ সীমানার আবর্ত্তের মধ্যে তলিয়ে যেতে, আর তার দরুণ একটা ভীষণ আনন্দ হতেও বঞ্চিত রয়েছি।

আমার জীবনে তো কোনো সাধই পূর্‌লো না। আর এমন করে' কান্নার মধ্যে দিয়েও পূরণ কর্‌তে পার্‌ব না। যথেষ্ট হয়েছে। কেবল,

"চাই গো আমি তোমারে চাই
তোমায় আমি চাই—
এই কথাটি সদাই মনে বল্‌তে যেন পাই।"

তা হলেই জীবনে আমার সব পাওয়াই হবে। জীবনটা সফল হবে।

আমি কি পাগল হয়ে যাব এমনি করে'। তোমার কথা যখনই মনে পড়ে তখনই ভুলে যাই যে তুমি আর আমার কাছে নেই—সব-শোনা-দেখার বাইরে চলে' গেছ। তোমার সেই তিন দিন অনন্ত দিনের মধ্যে গিয়ে মিশেছে। কবে কোন্ যুগে তোমায় কি অবস্থায় ফের ফিরে পাবো তা এক ভগবানই জানেন! কিন্তু এমন করে'

"যা হারিয়ে যায় তা আগ্‌লে বসে,
রইব কত আর!"

জীবন একটা লুকোচুরি আর কাণামাছি খেলার আড্ডা। ছোঁয়া পড়্‌লেই চোর, নইলে সে-যাত্রা খেল্‌তে পেলে। কিন্তু বুড়ী-ছোঁয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না—আমারো ঘটে নি, আর ঘট্‌বে কি না তাও বল্‌তে পারি না। কেবল খেলেই চলেছি—একবার চোর, একবার খেলুড়ে।

নাঃ, আর পারি না। আমার হৃদয়ের সমস্ত বলটুকু হরণ করে' তোমার সঙ্গে নিয়ে গেছ। সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকুও নিঃশেষ করে' নিয়ে গেছ। ক্রমেই সব শরীর-মন অবশ শিথিল হয়ে আস্‌ছে। ওগো বল,

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?"

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মরিস্ মেটারলিঙ্ক্

ফরাসী সাহিত্যে মেটারলিঙ্ক্ যুগান্তর এনেছেন। তিনি সাহিত্য-জগতে আজ বেল্‌জিয়ান্ সেক্ষপীয়র নামে পরিচিত। তাঁর গ্রন্থাবলীর সঙ্গেই আমাদের পরিচয় হয়েছে, কিন্তু তাঁর সংসারিক জীবনের ওপর গাঢ় যবনিকা পড়ে আছে। তাই তিনি সমাজের কাছে 'hermetically sealed'। তিনি যশের জন্য লেখেন না, লেখেন সমাজের মঙ্গলের জন্য।

১৮৬২ সালে ঘেণ্টে তাঁর জন্ম হয়। এখানে Sainte Barbe Collegeএ ভর্ত্তি হন। রোমান কাথলিক শিক্ষকদের কড়াকড়িতে তাঁর ছাত্র-জীবন বড় অনুকূল ছিল না। কুড়িজন সহপাঠীর মধ্যে ১৪ জনের লক্ষ্য ছিল যাজকত্ব (Priest hood)। তাঁর তিনজন কবি বন্ধু ছিলেন সহপাঠী। এঁদের নাম, Gregoire de Roy, Charles von Lirberghe ও Georges Rodenbach. এঁরা সকলেই বাণীর বরপুত্র। ছাত্র-জীবনেই তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। কবি হলেও বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন।

দেশের প্রথায় বড় ছেলেকে আইন-জীবী হতে হয়। তিনি তাই প্যারীতে আইন পড়্‌তে আসেন। এখানে এসে Vilierside Lisle Adlm ও Barbeyd' Aureyvilleyর সঙ্গে আলাপ হয়। এই দুজনকে তিনি ফরাসী সাহিত্যের রত্ন বলে মনে করতেন। তিনি

নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়নি, কিন্তু আমাকে দেওয়া হলো! এটা একটা মস্ত কুলক্ষণ।' Le Peiade পত্রের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে Gregoire de Roy তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। এ কাগজে তাঁর 'The Massacre of the Innocent' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটী ছবির মতই সুন্দর। তবে এ ধরণের কবিতা এই শেষ ও প্রথম; তার পর ফিরে এলেন দেশে। বন্ধু Rodenbach তাঁকে 'La Jeune Bellgique-এর (The new Belgium) সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। এখানে তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশ হতে লাগ্‌লো। এই সময়ে Belgian Renaissance-য়ের আরম্ভ। ১৮৮৯ সালে তাঁর লেখা খুব বেশী বেড়ে গেল। তার প্রথম কবিতার বই Series Chandes (Hot house) গীতিকাব্য প্রকাশিত হোল। কিন্তু এর জন্যে তিনি অজস্র নিন্দার ভাগী হন। ঘেণ্টের মন্তব্য হোল—মেটারলিঙ্কের সম্প্রতি মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। বাঁধা নিয়মের গণ্ডী পার হয়ে এই অপযশের বোঝা মাথায় নিতে হল। তিনি এ-সব গ্রাহ্যও করলেন না। ধূমকেতুর মতই তিনি উদিত হয়েছিলেন! কিছুদিন পরে তাঁর প্রথম নাটক 'La Princesse Maleine প্রকাশিত হয়। এইবারে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। নিয়তি ও প্রেমের দ্বন্দ নিয়ে বইয়ের প্লট। নিয়তির অধীন হয়েও প্রেমের যে কত বল, তাই Princess Maleineএ দেখানো হয়েছে। Hamletয়ের সঙ্গে এর একটু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাঁর mystcism-এর প্রতিষ্ঠা এই নাটকে। বইখানি নূতন ধরণের ট্রাজেডি—কবির প্রথম প্রয়াস হলেও বেশ সুন্দর। তারপর ক্রমান্বয়ে 'Intruder' ও 'The Sightless প্রকাশিত হয়। এ দু'খানিও ট্রাজেডি, প্রিন্সেস্ মালিনের আদর্শে রচিত। তাঁর ট্রাজেডির উদ্দেশ্য মৃত্যু নয়, মৃত্যুর ভয়। তিনি দেখাচ্ছেন, মৃত্যু জিনিষটা মানুষের মনে কতখানি স্থান জুড়ে আছে। Intruder মস্কো-সহরে ও লণ্ডনে খুব সমারোহে অভিনীত হয় এবং খ্যাতি লাভ করে প্রচুর। 'The Sightless' নাটকেও মরণের বিভীষিকা বেশ পরিস্ফুট হয়েছে। মানুষ যে যমের হাতে কত নিরুপায়,তা বেশ চিত্রিত হয়েছে। মৃত্যু-

এটির বাঙ্গানুবাদ করেন 'দৃষ্টিহারা।' এইবার তিনি লিখলেন 'The Seven Princes' নামে একখানা ছোট নাটক; মানবাত্মার রহস্য নিয়ে লেখা হয়েছিল; কিন্তু লোকে বুঝ্‌তে না পেরে ভেবে নিলে,এ একটা ছেলে-ভুলোনো বই। কিছুদিন পরেই বেরুল 'Pellias and Melisanda', এতে তিনি দেখালেন আত্মা ও প্রেমের খেলা। Alladine and Palomides বইয়ে দেখালেন মৃত্যুর বুকে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন। Interior ও The Death of the Tintagailes নাটক দুটিতে আবার মৃত্যুর রহস্য দেখালেন। এ দু'খানিই করুণ চিত্র। মরণের পারে কি আছে, তাই জান্‌তে মানুষের প্রাণের আকুল ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি বাজ্‌চে এ বই দুটিতে। এ দুখানি নাট্যের বঙ্গানুবাদ ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছে। তারপরে Novalis'য়ের 'Annabella' র অনুবাদ করে, লিখ্‌লেন, 'The Treasure of the Humble'। এখানা নাটক নয়, প্রবন্ধ। এর পর লেখা হোল 'Agglavaine and Selysette',—এইবারে সমাজের দিকে তিনি লক্ষ্য কল্লেন। বিবাহ-সমস্যা নাটকখানির উপলক্ষ্য। নারীর দেবীত্বটুকু চমৎকার ফুটেছে। ইউরোপীয় সমাজে সপত্নীপ্রেম বড় বিরল, কিন্তু মেটারলিঙ্ক সেই ছবি তাঁর তুলিতে এঁকেছেন। এখানায় বঙ্কিমবাবুর দু'একখানি বইয়ের কথা মনে পড়ে, বিশেষ করে বিষবৃক্ষ। কুন্দ বিষপান করেছিল, Selysetteও সেইরকম চেষ্টা করেছিল। আত্মহত্যার চেষ্টা দুজনেই করেছে। ইউরোপে সপত্নীপ্রেম সম্ভব নয় তাও তিনি বুঝেছেন। তাই নায়িকা বলছে—'I love you, I love Meleandre. Meleandre loves me, he loves you too, you love us both, and yet we cannot be happy, because the hour has not yet come'......এখানে তাঁর খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আস্থার অভাব দেখা যায়। প্যারীতে বসে 'Wisdom and Destiny' লিখ্‌লেন ১৮৯৮ সালে। এবারে বোঝালেন, জীবনের প্রান্তে যে অজানা অন্ধকার আছে, তার জন্য মানুষের নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

মেটারলিঙ্কের সহস্রমুখী প্রতিভার পরিচয় হল 'The Life of the Bee'তে। লোকে দেখ্‌লে, তিনি শুধু idealist নন, তিনি বাস্তব জগতের সংবাদ খুব বেশী রাখেন, সমাজকে তিনি দূরে রাখ্‌লেও সমাজের উন্নতি চান। Ariadne and Blue Beardএ লিখেছেন, নারী জাতির ওপর পুরুষের যথেচ্ছাচার। Sister Beatrice কিছুদিন পরেই বেরুল। এতেও তিনি খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি তাঁর অনাস্থার পরিচয় দিয়েছেন। সন্ন্যাসিনীর জীবনের আদর্শ তিনি চান্ না। Beatriceকে তাই আশ্রম ত্যাগ করিয়ে সংসার ধর্ম্মে এনেছেন। তিনি বোধ হয় বল্‌তে চান্, যৌবন সন্ন্যাসের সময় নয়।

১৮৯৯ সালে তাঁর একখানি প্রবন্ধ-পুস্তকও প্রকাশিত হয়। তার নাম The Buried Temple; এতে তিনি আমাদের জানিয়ে দিলেন, প্রকৃতি-রাজ্যের সঙ্গে মানবের কি সম্বন্ধ; আর দেখালেন, মানুষ এই পৃথিবীতে ন্যায়ের অস্তিত্ব দেখ্‌তে পায় না, কারণ, সে নিজে অন্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি। মানুষ নিজের দোষেরই ফল ভোগ করে, আর সমাজকেও তার ফল ভোগ করায়। Buried Temple-এ আরও দেখালেন, সমাজে ধনীর ও নির্ধনের মিলনের প্রয়োজন। Buried Templeয়ের পর আবার একখানা নাটক লিখলেন। এ নাটকে mysticism-এর লেশ ছিল না। তারপর লিখলেন, Monna Vanna, এই বইয়ে মেটারলিঙ্কের যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আদর্শ প্রেমের ছবি নিয়ে Monna Vanna লেখা। এই আদর্শ প্রেমের নিখুঁত ছবিতে দেখি, প্রেমের মধ্যে সরলতা আছে, অবিশ্বাসের গর্ব্ব নেই। এই বইখানি অবলম্বন করে ভারতী-সম্পাদক সৌরীন্দ্রমোহন রূপসী নাটিকা লেখেন। সে নাটিকা ভারতীতে বার হয়েছে ১৩২৪ সালে। ইবসেনের সঙ্গে মেটারলিঙ্কের মত এখানে মিলে যায়। Double Garden এ তাঁর নীরব জীবনের অনেক কথা জানা যায়। এইবারে লিখলেন Blue Bird; এই নাটকখানি বোধ হয় এক হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক। এইখানা লিখে তিনি Belgian Triennd পেলেন। এই

ও Mytil এই 'সুখ'স্বপ্ন দেখে না, প্রত্যেক মানুষ এ স্বপ্ন দেখে থাকে। রুশিয়া ও ইংলণ্ডে Blue Birdএর অভিনয়ের খুব কদর হল। এ বইখানির তর্জ্জমাও ভারতীতে বার হয়েছে। তারপর ম্যাকবেথের তর্জ্জমা করলেন কিছুদিন পরে। এবং বাইবেলের ভিত্তির ওপর Mary Magdalen লিখলেন। কিন্তু তেমন নাম হলো না। ইংলণ্ডে এ বইয়ের প্রবেশাধিকারই মিলল না। মৃত্যুর ওপর বিজয়ী আত্মার কাহিনী নিয়ে লিখলেন 'Death'। এই সময়ে তিনি নোবেল প্রাইজ্ পেলেন। তাঁর জয়-জয়কার পড়ে গেল। তিনি ১৯০ ০০ ফ্রাঙ্কের এক কপর্দ্দকও নিলেন না, ফরাসী সাহিত্যের উন্নতি কল্পে সমস্ত টাকা দান করেন; তাঁর নামে একটা পুরস্কার স্থাপিত হোল, তার নাম দেওয়া হলো Materlinck Prize। মেটারলিঙ্কের সবই অদ্ভুত। বিশ্ব-সাহিত্যে সাহিত্যিকের অভাব নেই, অনেকেই নোবেল প্রাইজ পেয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁর মত চরিত্রের লোক বড় দেখা যায় না। বাণীর বরপুত্র হয়ে, তাঁর মত কেউ হয় নি; তিনি কেবল সাহিত্যিক নন্, একজন বেশ নিপুণ boxer. একবার Georges Carpentierএর সঙ্গে তাঁর প্রতিযোগিতার কথা হয়েছিল। তাঁর চুরুট খাওয়ার অভ্যাস খুব। তিনি খুব কুকুর ভালবাসেন। তাই বোধ হয়, Blue Birdএ কুকুরের কথা অত বেশী। ফুল, ফল, মৌমাছি যে তাঁর বড় প্রিয়, তা Life and Flowersএবং 'The Life of the Beeতে বেশ বোঝা যায়। এতে তাঁর দর্শন-শক্তিরও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মাঝে নিরামিষাশী হবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। একজন ভদ্রলোক তাঁর পাঠাগার দেখতে চাইলে এক ঘরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গিয়ে তিনি দেখ্‌লেন বইটই কিছুই নেই। অসংখ্য প্রজাপতি দেওয়ালে পিন দিয়ে গাঁথা রয়েছে। তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না! মেটারলিঙ্ক এসে তাঁকে দেখ্‌তে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি দেখ্‌ছেন?' তিনি বলেন, "আপনার পাঠাগারে এ প্রজাপতিগুলোই বই।" প্রত্যেক প্রজাপতির গায়ে এক-একটা নাম লেখা আছে। তিনি অবাক্

তাঁর প্রবন্ধগুলি পড়লে দেখা যায়, তিনি একজন মস্ত mystic (রহস্য-পরায়ণ)। বর্ত্তমান মিষ্টিক কবির দলে তিনিও একজন। মানুষের জীবনে মনে যত কিছু জটিল সমস্যা আছে, তার মীমাংসা নাকি মানুষের নিজের হৃদয়ের মধ্যে। সেই নিভৃত মন্দিরের দেবতার নিয়োগে মানুষ সব করছে। সেই অন্তরের দেবতার নাম মানুষ নানা রকম দিয়ে থাকে, যেমন Destiny, Sub-consciousness, Instinct, Intuition, মেটারলিঙ্কের "Buried Temple"-এ সেই অন্তর্দেবতার স্থান।

তিনি নাটক-লেখার প্রণালী বদলাতে বলছেন। লম্বা-চওড়া অনন্ত বক্তৃতার আবশ্যক নেই। তিনি (এবং ইবসেনও) চান্ ভাষার অনাড়ম্বর। দুজনেই interior dialogue-এর পক্ষপাতী। দৃশ্যপট দিয়ে শ্রোতাকে ভোলালে চল্‌বে না। তিনি তাই তাঁর নিজের নাটকের ওপর লিখেছেন, 'dramas for marionettes' pantomime' তাই তাঁর অভিপ্রেত।

মেটারলিঙ্ক সমাজের জন্য কি করেছেন তা বলা শক্ত, তবে কিছু যে করেন নি তা বলা যায় না। বইয়ের মধ্য দিয়েই তাঁর সমাজ-সংস্কার। সাহিত্যাকাশে প্রথমে তাঁকে যেখানে দেখা গিয়েছিল, আজ তিনি তার ঢের ওপরে। প্রথমে নিয়তির হাতে মানুষের অবস্থা দেখিয়ে আমাদের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করেছিলেন, তারপর আশার আলো আমাদের চোখের সাম্‌নে ধরলেন। দেখিয়ে দিলেন, মানুষের অনন্ত আশা ও উৎসাহ থাকা উচিত, কেননা তার শক্তিও অনন্ত। সমাজ-সংস্কারক হিসাবে তিনি Tolstoy ও Nietzscheর মধ্যবর্ত্তী। Tolstoyয়ের মত বর্ত্তমান ভেঙ্গে দিয়ে সুদূর অতীতকে জাগিয়ে তোলা, কিম্বা Nietzscheর মত বর্ত্তমান সমাজকে ভেঙ্গে চুরমার করে ভবিষ্যতের অলীক আদর্শে মানুষকে প্রলোভিত করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি চান মাঝের পথ,—যা হতে পারে। সমাজে সকলের যে সমান অধিকার, এইটে প্রচার করে তিনি সাহিত্য-জগতে বড় কম সহানুভূতি পাননি। দারিদ্র্য যে কত ভীষণ, তা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছেন; আর তার জন্য ধনীকে দায়ী করেছেন। তাই তিনি নির্ম্মম ধনীকে বিদ্রূপ করে বলেছেন—'Need we at the sight of unmerited wretchedness, look to the skies for a reason, as though a flash of lightning had caused it ?' আর এক জায়গায় শ্রমজীবিদের হয়ে বল্‌ছেন, ধনীর বিশ্রাম ও নির্ধনের ওপর অত্যাচার খুবই। তাই তিনি বলেন, All these we set in motion again, as we sit at our table, stroll idly through the town, or lie at night in a bed, that our own hands have not made ? কি ভয়ানক কথা! বিছানায় শোওয়াও অত্যাচার! তবে নিজে এ-সব কতটা মান্‌তেন, তার উত্তরে বলা যায়, Goethe যত বড় স্বদেশহিতৈষী ছিলেন, মেটারলিঙ্কও তত বড় Socialist; আর তিনি সমাজের দোষ দেখিয়ে ক্ষান্ত হননি, মানুষের হাতে যেটুকু প্রতিকার হতে পারে, তা'ও বলে দিয়েছেন। তিনি আদর্শবাদী হয়েও তাই এত প্রিয় হতে পেরেছেন। ফরাসী জাতি তাঁকে নিয়ে আজ ধন্য, ফরাসী সাহিত্য তাঁর লেখায় গৌরবান্বিত! বাংলা সাহিত্যে মেটারলিঙ্ক থেকে আরো যথেষ্ট নেবার আছে। সুখের বিষয়, আজও মেটারলিঙ্কের লেখনী বিরাম নেয়নি, এখনও তা অমৃত বর্ষণ করছে।

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ।

বায়োস্কোপের নাটক

বায়োস্কোপের নাটক লেখার সঙ্গে সাধারণ নাটক লেখার তফাৎ কিছু আছে কি না,—এবং যদি থাকে, তবে তফাৎ কোন্‌খানে,—কয়েকজন এমন প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন।

বায়োস্কোপ যে একটা সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছে, ও তুলিতেছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে সে সাহিত্য সম্বন্ধে এখন কোন অলঙ্কার-শাস্ত্রের বয়েদ তুলিয়া অকাট্য যুক্তি খাড়া করা সম্ভব নয়। কারণ, আগে সাহিত্য, তারপর তার অলঙ্কার বা দর্পণ। মানুষের আর্শী গড়িবার বহু পূর্ব্বেই মানুষের সৃষ্টি হইয়াছিল। বায়োস্কোপ-সাহিত্য আরো কিছুদুর অগ্রসর না হইলে তার প্রকৃতি বা ভঙ্গী সম্বন্ধে লাইন টানিয়া কোন আইন-কানুন নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া বাতুলতা এবং করিতে গেলেও সে চেষ্টা একেবারে নিরর্থক হইবে। তবে মোটামুটি একটা কথা বলা যাইতে পারে, সাধারণ নাটকের সঙ্গে বায়োস্কোপের নাটকে মূলে তফাৎ বিশেষ নাই। বায়োস্কোপের নাটক মানুষের চিত্তবৃত্তির বিবিধ বিকাশ দেখাইতে পারিলেই তার সার্থকতা—নাটকের মতই তার action। তবে এইটুকু তফাৎ যে, সাধারণ নাটকে মানুষের চিত্তবৃত্তির বিকাশের প্রত্যেক পরম্পরা দেখাইয়া যাওয়া সম্ভব নয়—বায়োস্কোপে তা চলে। তবে সেখানেও 'অতি'র দিকে সতর্ক নজর রাখিতে হয়—কোথাও না প্লট drag করে! দুই নাটকই যত suggestive হইবে, ততই উঁচু দরের হইবে, ততই তাহাতে আর্টের খেলা খুলিবে।

এ কথাটা বলিতে বসিয়া আর একটা কথা মনে পড়িতেছে। সেটা এই, বাঙ্‌লা উপন্যাস, গল্প বা নাটক লিখিতে বসিয়া লেখকরা একটা অসুবিধা বোধ করেন, এ কথা অনেকেই বলেন—সে অসুবিধা এই যে, বাঙালীর জীবনে বৈচিত্র্য নাই। জন্মিবার পর ছেলে-বয়সে বাঁধা টাইমে স্কুলে যাওয়া, তার পর পাশ করিয়া বা পাশ করিতে-করিতে বিবাহ! বিবাহের পর দুই-চারি বৎসর কারো ভাগ্যে মিলন, কারো-বা বিরহ! বিরহে কেহ বা ফুলিয়া মোটা হইল, কেহ বা নবোঢ়া পত্নীকে রাশ-রাশ চিঠি লিখিয়া ফেলিল—তারপর চাকরি, পুত্রকন্যার প্রবল বন্যা—তাদের শিক্ষা ইত্যাদি এবং সর্ব্বশেষে ফুরালো জীবন! শতকরা ৯৯ জনের এই হাল। বাকী একজন হয়তো স্কুলে প্রচণ্ড মারামারি করিয়া রাষ্টিকেট্ হইল—কেহ বা করিল চুরি কি জালিয়াতী—করিয়া জেলে গেল। কেহ বা পাটের কারবার করিয়া মস্ত ধনী হইয়া উঠিয়া বার-বিলাসিনীকে মস্ত বাড়ী কিনিয়া দিল, নয়তো কেহ বড়-জোর ভাইয়ে-ভাইয়ে লাঠালাঠি করিয়া ভারী মামলা-মকর্দ্দমা ফাঁদিয়া বসিল। এই তো ব্যাপার। ইহার মধ্যে নাটকে বৈচিত্র্য আসিবে কোথা হইতে!



রামফিশ্

আমরা বলি, ইহার মধ্যেও নাটকের উপাদান পাওয়া যায়। তবে সেটা একঘেয়ে হইতে পারে। এই জন্যই আমাদের বাঙালী নাট্যকার বুঝি নাটক বা কাব্য লিখিতে বসিলেই রাজপুতানায় ছোটেন!

ছুটুন, তাহাতে আপত্তি নাই। তবে কাল্‌চারের সঙ্গে সঙ্গে এটুকু সকলে বুঝিয়াছে যে ছন্দে যুদ্ধ বর্ণনা করিলেই মহাকাব্য রচনা হয় না! অনেক পয়ার-কার

বেচারা সাত-আট সর্গে স্বর্গের বা মর্ত্ত্যের যুদ্ধ বর্ণনা করিয়া ভাবিয়া বসেন, মহাকাব্য রচিয়াছেন, কিন্তু সে ভুল! কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং—এই বাক্যই যদি একটা মহাসত্য ফুটাইতে পারে, তবে সেটি এক সর্গে রচিত হইলেও তাকে আমরা মহাকাব্য বলিতে হঠিব না।



মিসরের ফ্যারো—আমেনিস

যাক্ ও কথা! এই বায়োস্কোপের নাটকে বিশেষত্ব কি—এবং বায়োস্কোপে এমনি নাটক ফুটাইতে হইলে কি করা দরকার—সে সম্বন্ধে দুই-চারিটা বিলাতী ফিল্মের কথা পাড়িলেই ব্যাপারটা সহজে বুঝা যাইবে।

সম্প্রতি কলিকাতার ম্যাডান কোম্পানির পিক্‌চার প্যালেসে The Four Horsemen of Apocalypes-নামে একখানি নাটক দেখানো হইয়াছে। নাটকখানি প্রসিদ্ধ লেখক Ibanez-এর রচনা হইতে চিত্র-নাট্যে গ্রথিত।

মাদারিগো একজন ব্যবসায়ী লোক। তার দুই মেয়ে। একজন বিবাহ করিয়াছে ফরাসীকে, আর একজন জার্ম্মাণকে। দুই জামাইই শ্বশুরের কাছে থাকে, শ্বশুরের কাজকর্ম্ম দেখে। জার্ম্মাণ জামাইয়ের তিন ছেলে; ফরাসী অপুত্রক। বুড়া ফরাসী জামাইকে ভালবাসে—কারণ দু'জনের রক্ত এক; জার্ম্মাণকে দেখিতে পারে না। শেষে ফরাসী জামাইয়ের এক পুত্র হইল। তার নাম রাখা হইল, জুলিও। মাতামহের আদরে জুলিও রীতিমত সৌখীন বিলাসী হইয়া দাঁড়াইল। জার্ম্মাণ দৌহিত্রগুলি বাপের শিক্ষায় মানুষ হইতে লাগিল—মাতৃভূমি জার্ম্মানির প্রতি তাদের অনুরাগ পিতার শিক্ষায় বাড়িয়াই চলিল। জুলিও জানিত, মাতামহের যা কিছু সম্পত্তি তাকেই সে দিয়া যাইবে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর দেখা গেল, বুড়া দুই মেয়েকে সমানভাগে বিষয় দিয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণ জামাই টাকাকড়ি লইয়া জার্ম্মানিতে গেল। ফরাসী প্রথমটা তা করিতে পারিল না; শেষে স্ত্রীর কথায় ফ্রান্সে চলিল। সেখানে তার বাতিক চাগিল, নীলামে নানা মাল কিনিয়া বাড়ী বোঝাই করা এবং পল্লী-প্রান্তে এক অপূর্ব্ব প্রাসাদ রচনা করা। জুলিও আর্টিষ্ট হইতে গেল। ষ্টুডিওতে যত নগ্ন নারীকে আনিয়া মডেল করিয়া সে ছবি আঁকে। খপর পাইয়া বাপ তাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করিল; মা লুকাইয়া টাকা দিতে লাগিল। শেষে পিতৃবন্ধু লরিয়র কিশোরী রোমান্টিক পত্নীর সঙ্গে জুলিওর আলাপ হইল। দুইজনে একসঙ্গে ট্যাঙ্গো-নাচ নাচিয়া পরস্পরের অনুরাগী হইল। লরিয় ছিল বয়সে প্রৌঢ়, এবং তার পত্নী সুন্দরী ও কিশোরী। বৃদ্ধ স্বামীকে দিয়া পত্নীর রোমান্সের ক্ষুধা মিটিত না। কাজেই দুজনের এ অনুরাগ (flirtation) বাড়িয়া চলিল। ক্লাবে



গ্রীকবাঁদী থিওনিশ

পাঁচজনে এ ব্যাপার লইয়া কানাঘুষা করে বলিয়া জুলিওর ষ্টুডিওতে দুইজনে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দেখাশুনা সুরু করিল। ব্যাপারটা লরিয়র কাণে গেল। সে একদিন জুলিওর বাপকে লইয়া ষ্টুডিওতে গিয়া হাজির। সেখাকে দুজনকে দেখিয়া দুজনেই ক্রুদ্ধ, মর্ম্মাহত। লরিয় স্ত্রীকে ডাই-ভোর্স করিবে বলিয়া শাসাইল। ওদিকে এমন সময় ভীষণ জার্ম্মাণ-যুদ্ধ বাধিল। সাজ-সাজ রব উঠিল। যে যেখানে

ফরাসী ছিল, সব যুদ্ধে মাতিল, লরিয়ও যুদ্ধে গেল। তার স্ত্রী তখন নার্শ হইল। জুলিও ফ্রান্সে জন্মায় নাই, কাজেই সে ঘরে রহিয়া গেল—তাকে আর যুদ্ধে যাইতে হইল না। তখনো দুজনে খুব দেখাশুনা, আশার উচ্ছ্বাসে ভবিষ্যতের স্বপ্ন-কল্পনা করিতেছে। এমন সময় হঠাৎ যুদ্ধে আহত অন্ধ লরিয়কে হাসপাতালে আনা হইল, আর ঘটনাক্রমে তার সেবার ভার পড়িল নার্শ মাদাম লরিয়র উপর। অন্ধ বেচারা স্বামীর উপর তার দরদ জাগিল। জুলিও ইহাতে জলিয়া উঠিয়া যুদ্ধে ছুটিল। তার পর যুদ্ধে জুলিও আর তার জার্ম্মাণ মাসতুতো ভাই—দুইজনে যুদ্ধ—এবং দুজনেই সে-যুদ্ধে প্রাণ দিল। মাদাম লরিয় ইহারই মধ্যে এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে স্বামীকে ত্যাগ করিয়া জুলিওর সন্ধানে যাইবে বলিয়া পত্র লিখিয়া বাহির হইবে, এমন সময় জুলিওর ছায়াচ্ছবি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, সেই মুহূর্ত্তে নিরুপায় নিরাশ্রয় বেচারা স্বামীর স্বরও তার কাণে গেল। স্বামী ডাকিতেছে! তখন সে স্বামীর সেবাকেই প্রায়শ্চিত্তের চরম ভাবিয়া তার পাশে রহিয়া গেল। এই যে চারজন ঘোড়সওয়ারের নামে বহির নামকরণ, ইহারা বাইবেলে-উক্ত চরিত্র। ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে প্রথমটি হইল যুদ্ধ, দ্বিতীয় হাহাকার, তৃতীয় দুর্ভিক্ষ এবং চতুর্থ মৃত্যু। এই চারজনে বিশ্বে কি উৎপাতের সৃষ্টি করে, এবং একজন অপরদের সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে অন্তরঙ্গ যে একজন আসিলে অন্যেরা তার পিছু পিছু ছুটিয়া আসিবেই। এই সুরটিও সমস্ত ছবিখানির মধ্য দিয়া আগাগোড়া বহিয়া চলিয়াছে।

এই প্লটটি actoinএ ভরপুর—ঘটনার পর ঘটনা মানুষের চিত্তে কি পরিবর্ত্তন আনিয়া দিতেছে—চোখের সামনে বিদ্যুতের গতিতে কেমন একখানি পরিপূর্ণ ছবি আঁকিয়া তুলিয়াছে! বায়োস্কোপের নাটকে চাই এমনি ঘটনার বিপুল সমারোহ! কিন্তু শুধু ঘটনা রচিয়া দিলেই চলিবে না—মানব-চিত্ত সে ঘটনার উপর ভাসিয়া চলিবে, আগাগোড়া। তার পর এইটুকু দেখাইতে, যুদ্ধের বীভৎসতা দেখাইতে ঘর-বাড়ী জ্বালানো, খুন, কামান, বন্দুকের অগ্নি-ক্রীড়া, নারী-নিগ্রহ, মানুষকে পিষিয়া মারা—সৈন্যের পর সৈন্য চলিয়াছে—আমোদের কণ্ঠ ছাড়িয়া ...

কাজ সে ঐ এক লক্ষ্য ধরিয়া,—খালি শত্রু মারো! তাবাও যে মানুষ এ কথা ভুলিয়া তাদের ঘর জ্বালাও, খোঁচাইয়া মারো, যত রকম পশুত্ব করিতে পারো—এই ভীষণতা, যুদ্ধ যে কত বড় দুর্গ্রহ, কতবড় অভিশাপ—এটুকু এমন বাস্তব বর্ণে দেখানো হইয়াছে—সাজ-পোষাক, আড়ম্বর সমস্তই এত নিখুঁত, এমন ঠিকঠাক যে দেখিলে মনে হয় না, অভিনয় দেখিতেছি! এ যেন চোখের সামনে যুদ্ধের ভীষণতা সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি, প্রাণ শিহরিয়া ওঠে!

আমাদের বাঙলা বায়োস্কোপ কোম্পানি এমনি setting প্রভৃতি দিয়া যেদিন পুরাণ ইতিহাসকে ছবিতে ফুটাইতে পারিবেন, সেদিন বুঝিব, বায়োস্কোপ এদেশে সিংহাসন পাতিল। অর্থাৎ বায়োস্কোপে সবটুকু ভারী নিখুঁৎ করিয়া দেখাইতে হইবে। দৃশ্যপট সাজসজ্জা, এগুলির মধ্যে কোথাও গোঁজামিল বা ফাঁকি চলিবে না, চলিতে পারে না। সেদিন এম্পায়ার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জনে'র অভিনয়ে দৃশ্যপট একটু suggestion-এর উপর দিয়া কেমন নিখুঁৎ ও artistic হইয়াছিল! কিন্তু ঐ 'বিসর্জ্জন'কে বায়োস্কোপের পটে ফেলিতে চাহিলে, দলকে দল লইয়া ত্রিপুরায় যাইতে হইবে, সেখানকার পথ-ঘাট ছবিতে নিখুঁত করিয়া আঁকিয়া ধরুন। সেকালের ত্রিপুরা! তার পারিপার্শ্বিক ফুটাইতে সে-আমলের প্রাচীন বৃহৎ মন্দির চাই, গোমতী নদী চাই—তারপর সংক্ষুব্ধ জনতা, বিরাট কোলাহল, সেই পথে বলির জন্য অসংখ্য ছাগ মহিষ ধূলা উড়াইয়া পথে চলিয়াছে—মহাকালীর রক্ত রসনা, শাণিত কৃপাণ—এ সবগুলা পরিপূর্ণ আয়োজনে দেখানো চাই—তবেই বায়োস্কোপের 'বিসর্জ্জন' জীবন্ত হইবে। এমনি বিরাট আয়োজনের মধ্যে জার্ম্মানির আর একখানি চিত্রনাট্য ইয়োরোপে বিজয়-মাল্য লাভ করিয়াছে। সেখানির নাম—Loves of Pharaoh. এখানে ম্যাডান কোম্পানি বহু দিন হইতে ঘোষণা করিয়াছেন, ঐ ছবি এখানে আসিতেছে। কবে সে ছবি আসিবে, জানিনা। কিন্তু সে ছবি একখানি দেখিবার ...

তার বিপুল সমারোহ, তার হিংসা, তার লালসা, তার মমতা, তার দর্প, তার অনুতাপ—সব লইয়া সজীব হইয়া দেখা দিয়াছে। এই নাটকের গল্পেও ঘটনার যেমনি ঘাত-প্রতিঘাত, মানব-মনের খেলাও তেমনি বিচিত্র বর্ণে দেখানো হইয়াছে। প্লটটি এই, আমেনিস মিশরের ফ্যারো pharaoh. এথিয়োপিয়ার শামলক তাঁর কন্যা মাকেদাকে লইয়া মিশরের দরবারে আসিলেন, ফ্যারোর সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিয়া দুই জাতির মধ্যে প্রীতির বাঁধন বাঁধিবেন। নগরের বাহিরে মাকেদার প্রসাধন চলিতেছে, এমন সময় মাকেদার গ্রীক-বাঁদী থিওনিশ একটা তুচ্ছ ব্যাপারে মাকেদার হাতে মার খায় ও চাকরি খোয়ায়। মিশরের আর্কিটেক্ট সোথিসের পুত্র রামফিস্ তাকে আশ্রয় দেয় ও দুইজনে প্রণয় হয়।

ওদিকে এথিওপিয়ানরা আমেনিসকে প্রচুর উপঢৌকন দেয়। সে সব উপহার মিশরের তোষাখানায় সংরক্ষিত হয়। থিওনিশ একদিন রাত্রে কৌতূহলী হইয়া রামফিশ্‌কে লুকাইয়া গোপনে তোষাখানা দেখিতে ছোটে। ওদিকে ফ্যারোর হুকুম, তোষাখানার কাছে যে আসিবে, তার দণ্ড, মৃত্যু। তা সে যেই হোক! থিওনিশ সেখানে গিয়াছে জানিতে পারিয়া রামফিশ তার পিছনে ছুটিয়া আসে, তাকে বাড়ী ফিরিতে বলে। থিওনিশ ফিরিতে চায় না। তখন দুইজনেই ধরা পড়ে ও দুইজনকেই আমেনিসের কাছে আনা হয়। আমেনিস থিওনিশের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাকে বিবাহ করিতে চায়, বলে, থিওনিশ যদি তাতে রাজী থাকে, তবেই রক্ষা পাইবে। থিওনিশ দারুণ রোষে বিবাহে অসম্মতি জানায়। তখন আমেনিস বলে, রামফিশের প্রাণদণ্ড মকুব হইবে ও রামফিস মুক্তি পাইবে যদি থিওনিশ মিশরের রাণী হইতে রাজী থাকে। রামফিশের প্রাণ রক্ষা করিতে থিওনিশ নিজের হৃদয় বলি দিয়াও এ প্রস্তাবে সম্মত হইল। রামফিশের প্রাণদণ্ড রহিত হইল; কিন্তু আমেনিস্ গোপনে তাকে বান্দা করিয়া রাখিল। এ সংবাদে শামলক রাগে জ্বলিয়া উঠেন ও প্রতিহিংসা লইবেন বলিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং সৈন্য লইয়া মিশর আক্রমণ করেন। ওদিকে থিওনিশকেও মিশরের রাণী

তখন দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে আমেনিস্ থিওনিশকে তোষাখানায় রাখিয়া যায়। তোষাখানার প্রবেশ-পথ শুধু সোথিস (রামফিশের পিতা) জানিত। আমেনিস হুকুম দিল, সোথিসের দুই চোখ অন্ধ করিয়া দাও। প্রজারা চটিয়া গেল; কিন্তু তখন যুদ্ধ বাধিয়াছে, তাই এদিকে কেহ আর মন দিল না।

সহরের বাহিরে মরু-প্রান্তরে দুই দলের সৈন্যে ভীষণ যুদ্ধ চলিল। মিশরীরা হারিয়া পলায়নে রত। যুদ্ধের সময় রামফিশ আসিয়া সৈন্যদলে যোগ দিয়াছে। সে কৌশল করিয়া এথিওপিয়ানদের নগরের মধ্যে আনিয়া বন্দী করিবার ফিকির আঁটিল। তখনি তাহাকে সৈন্যদলের নেতা করা হইল। রামফিশ ফন্দী খাটাইয়া এথিয়োপিয়ানদের বন্দী করিল এবং মিশরীদের জয় হইল।

যুদ্ধে ওদিকে আমেনিস পড়িয়া যায়। লোকে মনে করে, তার মৃত্যু হইয়াছে। প্রজার দল রণ-জয় ও আমেনিসের মৃত্যু-সংবাদে খুব খুসী—অত্যাচারী ফ্যারো মরিয়াছে, এবার নূতন ফ্যারো হইবে। রামফিশ অন্ধ পিতার সহিত গিয়া তোষাখানার দ্বার খুলিল ও থিওনিশকে উদ্ধার করিয়া আনিল। তারপর থিওনিশ রামফিশকে বিবাহ করিল এবং রামফিশ মিশরের রাজ-পদে অভিষিক্ত হইল।

আমেনিস কিন্তু মরে নাই, আহত হইয়াছিল মাত্র। সে প্রাসাদে আসিয়া আত্মপরিচয় দিল—লোকে তাকে মানিতে চায় না! তারা বলে, আমেনিস মরিয়াছে। তখন এই প্রচণ্ড বাধা দেখিয়া, ক্ষোভে আমেনিস হঠাৎ সিংহাসনের পায়ার কাছে মূর্চ্ছিত হইয়া মারা পড়ে। রামফিস এবং থিওনিশ সুখে রাজ্য-পালনে রত হয়।

মিশরের এই প্রাচীন রোমান্সের কাহিনীটি বায়োস্কোপে এমন নিখুঁত সাজ-সজ্জায় ও দৃশ্যপটে বিচিত্র রমণীয় করিয়া তোলা হইয়াছে আর অভিনয়ও এত সুন্দর ও নিখুঁত হইয়াছে যে অভিনেতাদের সাজা মানুষ বলিয়া মনে হয় না। দৃশ্যপট প্রভৃতিকে আঁকা মনে করিতে দ্বিধা ঠেকে। মিশরী সাজিতে বসিয়া অভিনেতারা টাক-টুপি মাথায়

চেহারায় বিস্তর অদল-বদল করিয়া একেবারে নিজেদের সেকালের মিশরী বনিয়া তুলিয়াছেন।

অভিনয়-ভঙ্গী কেমন, তাহা ছবিগুলি দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

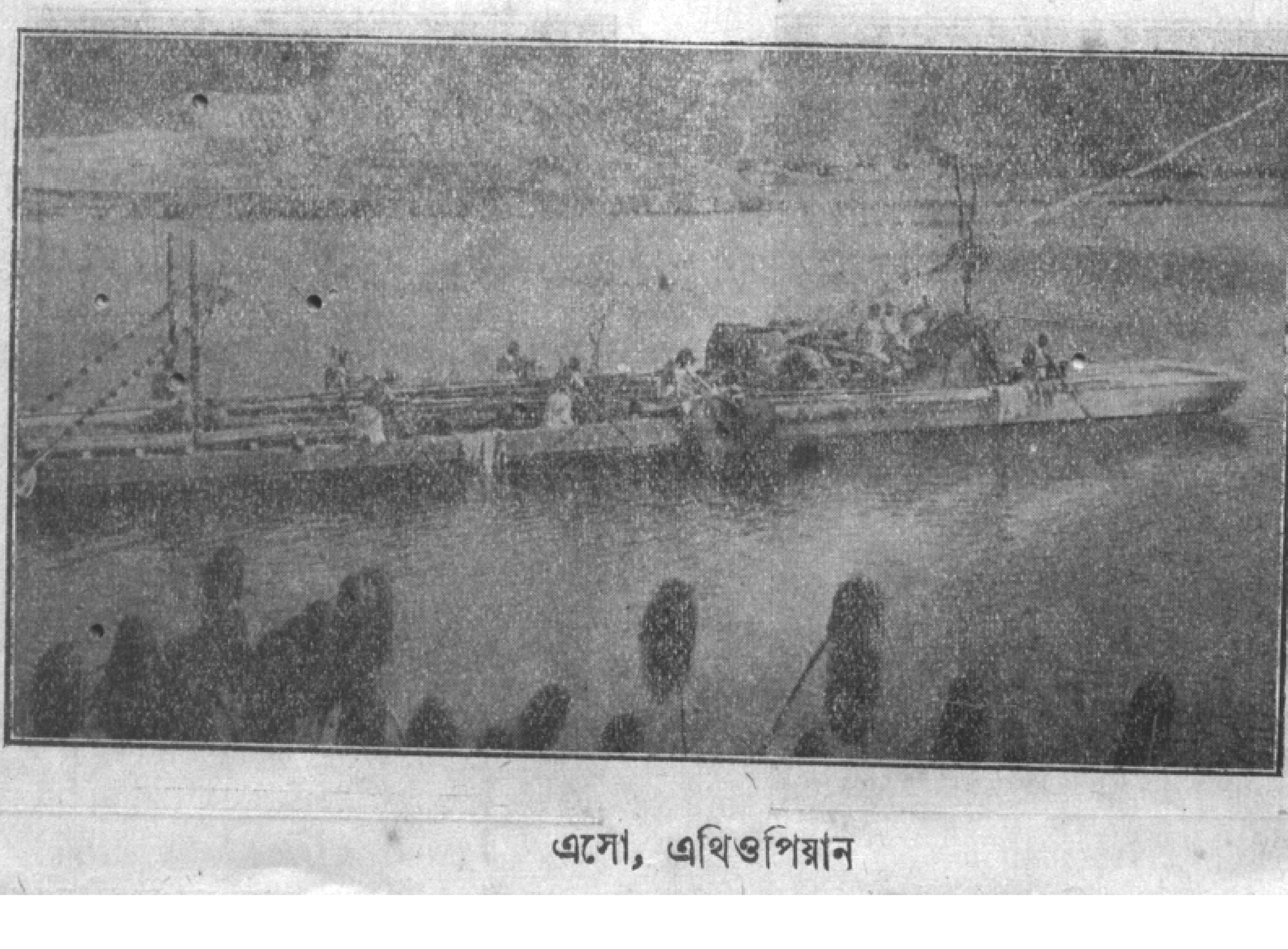
আমরা বহুবার বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি, বায়োস্কোপের নাটকে এতটুকু ফাঁকি চলিবে না। যা দেখাইতে চান, তা একেবারে সব দিক দিয়া নিখুঁত করিয়া দেখাইতে হইবে। যে-কালের বা যে-দেশের ছবি উঠানো হইবে, সেই দেশের, সেই কালের আব-হাওয়া ফুটাইতে হইবে, সে-দেশের সে-কালের নর-নারীর চলাফেরা, বিশেষ ভাবভঙ্গী একেবারে নিখুঁত নির্দ্দোষ করিয়া দেখাইতে হইবে। অভিনয়কে সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই বায়োস্কোপের ছবি আপামর সাধারণের তারিফ আদায় করিতে সক্ষম হইবে, ছবিও ছবি হইবে; এবং তেমন কোম্পানির তহবিল ভরিয়া তুলিতে দেশ-দেশান্তর হইতে পয়সা আসিবে। বিদেশী উৎকৃষ্ট কয়খানি চিত্র-নাট্য মন দিয়া দেখিলে খুঁটিনাটী অনেক তথ্য সহজেই জানা যায়।

বারান্তরে বিদেশী ফিল্‌ম-সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত বলিবার ইচ্ছা রহিল।

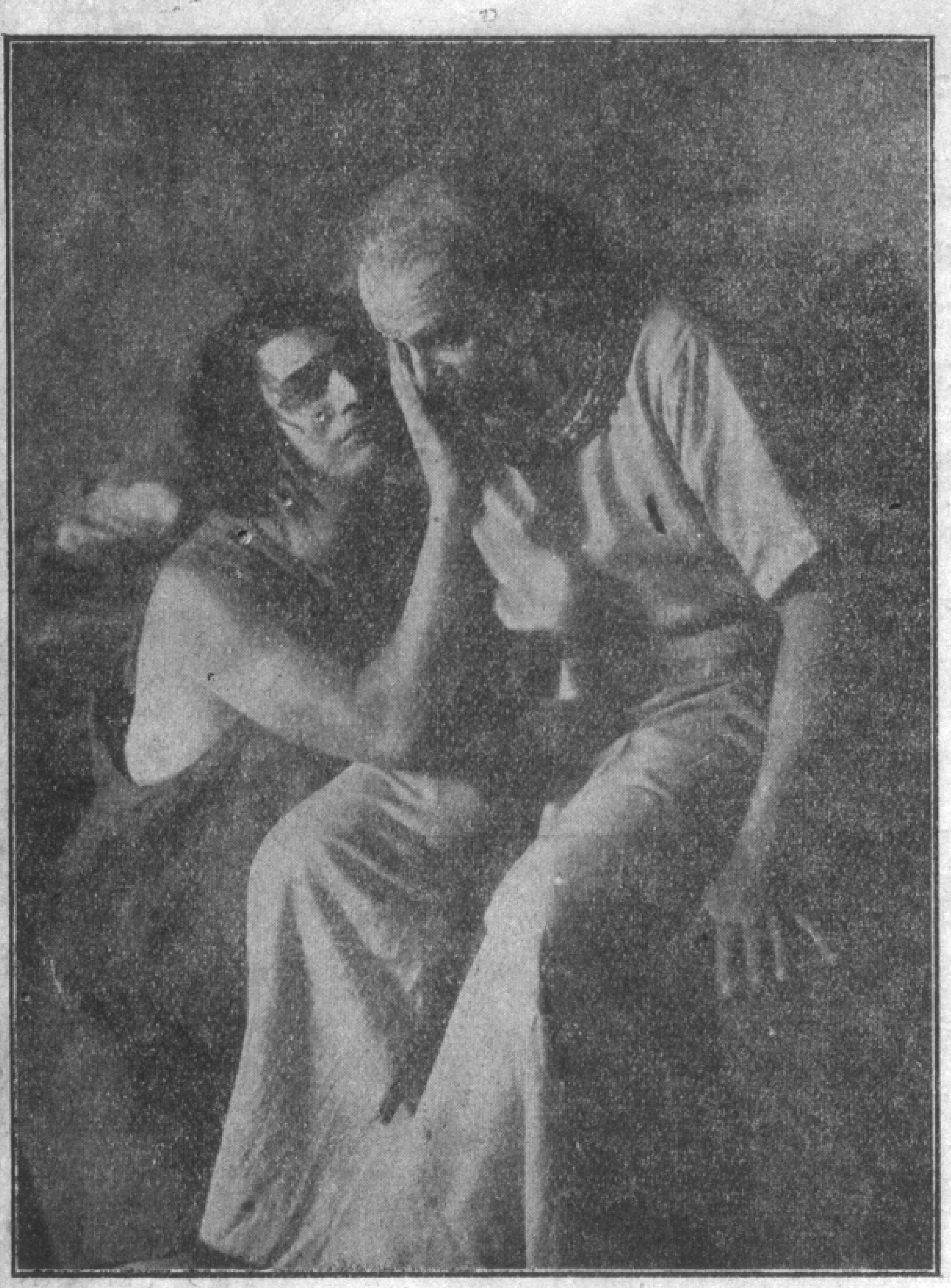
শিবসুন্দর।



শামলকের রণসজ্জা



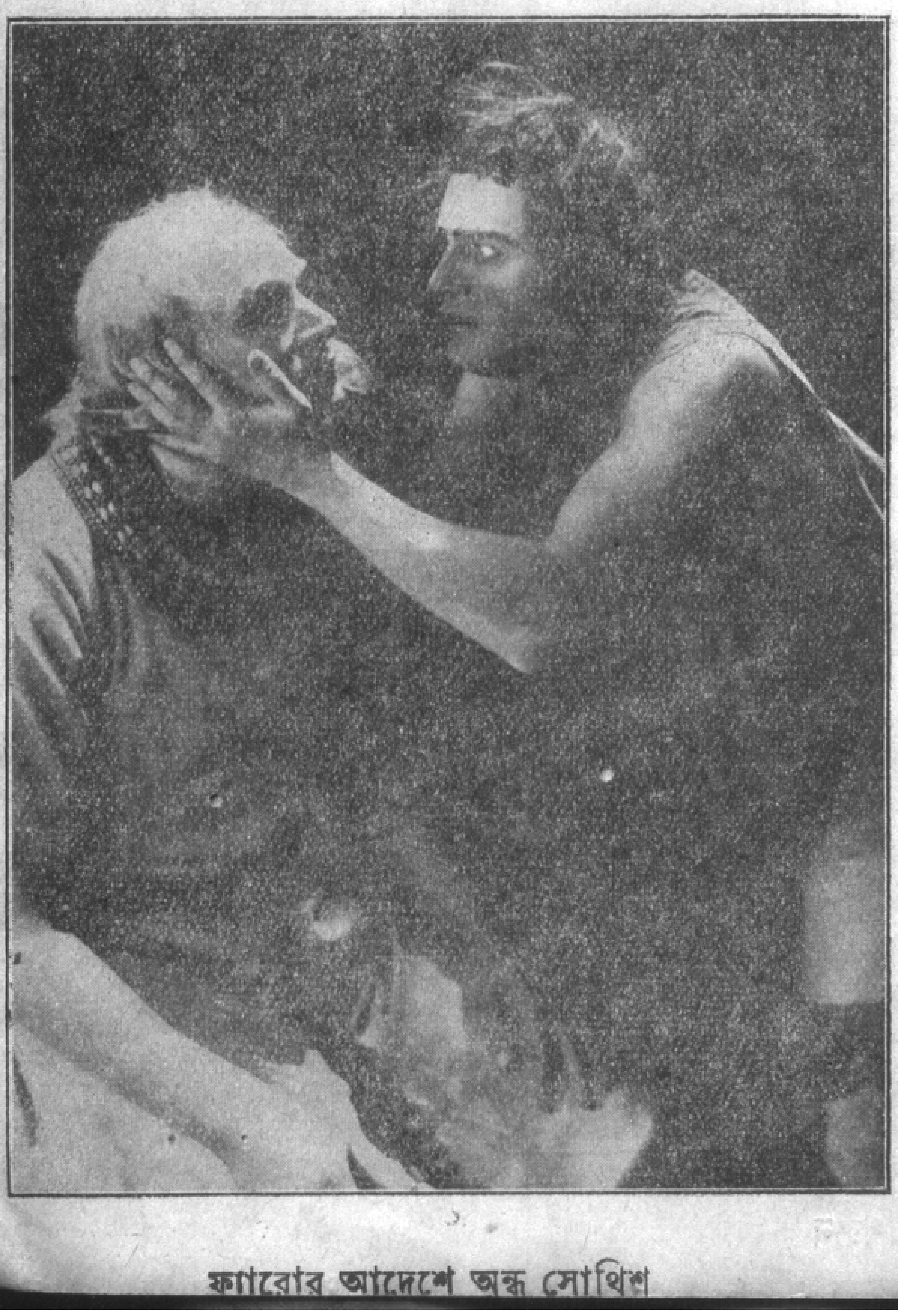
এসো, এথিওপিয়ান



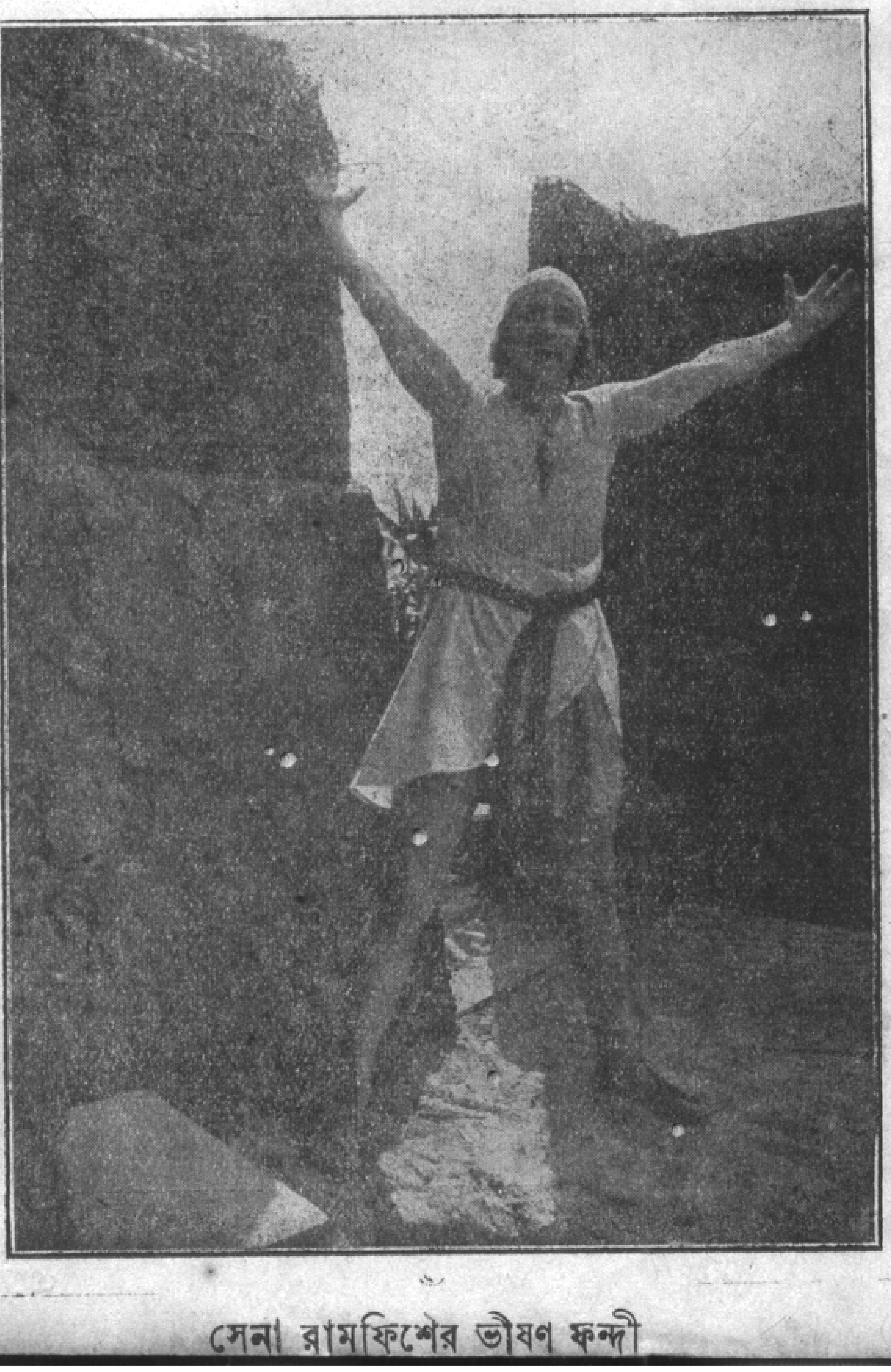
অন্ধ সোথিশ ও রামফিশ



রামফিশের মানা—"ও পথে যেয়ো না"



ফ্যারোর আদেশে অন্ধ সোথিশ



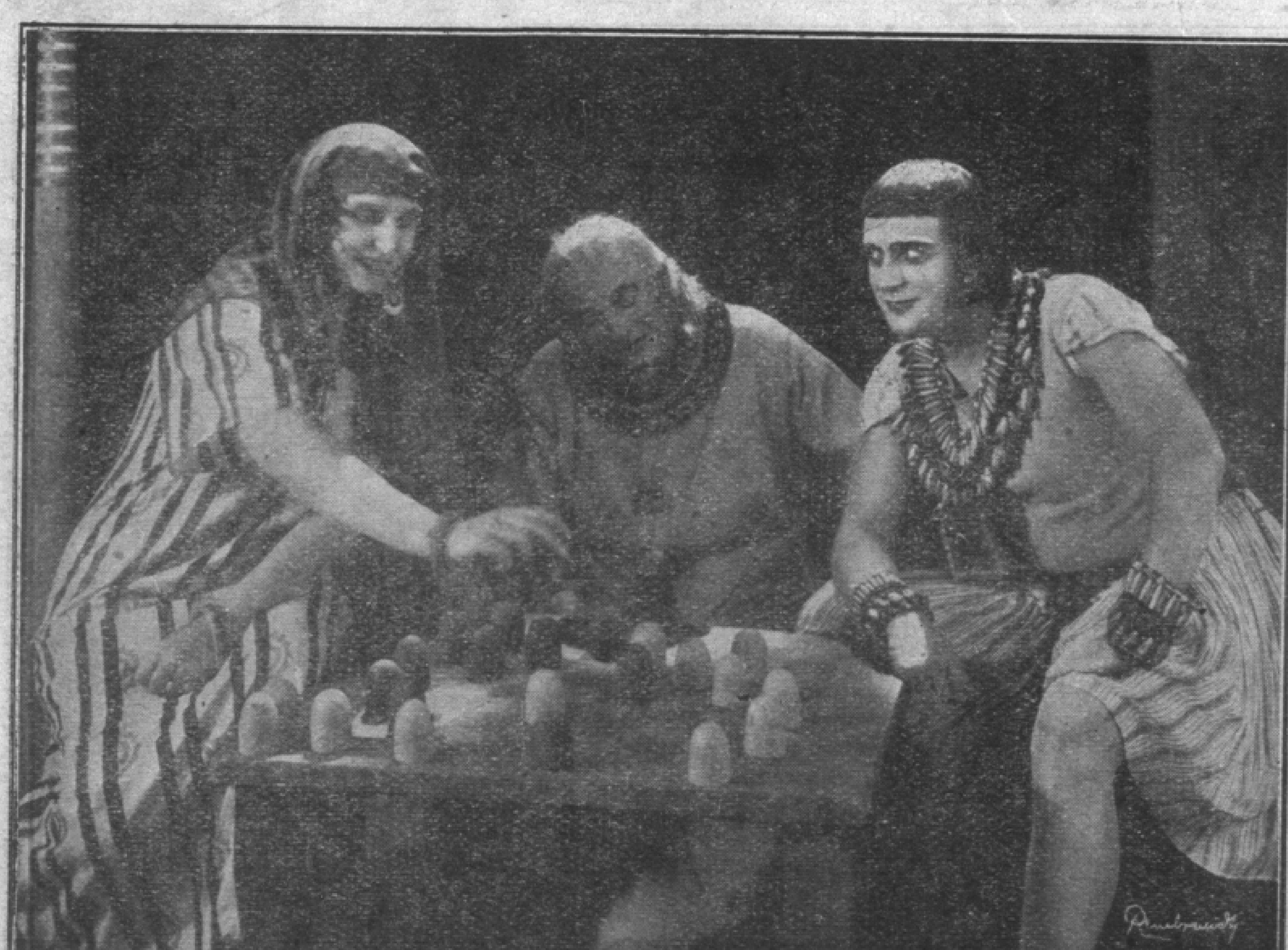
সেনা রামফিশের ভীষণ ফন্দী

"যদি বাঁচতে চাও ত আমায় ভজ"



রাসফিশ মরিয়াছে ভাবিয়া মিশরীদের আনন্দ-উৎসব

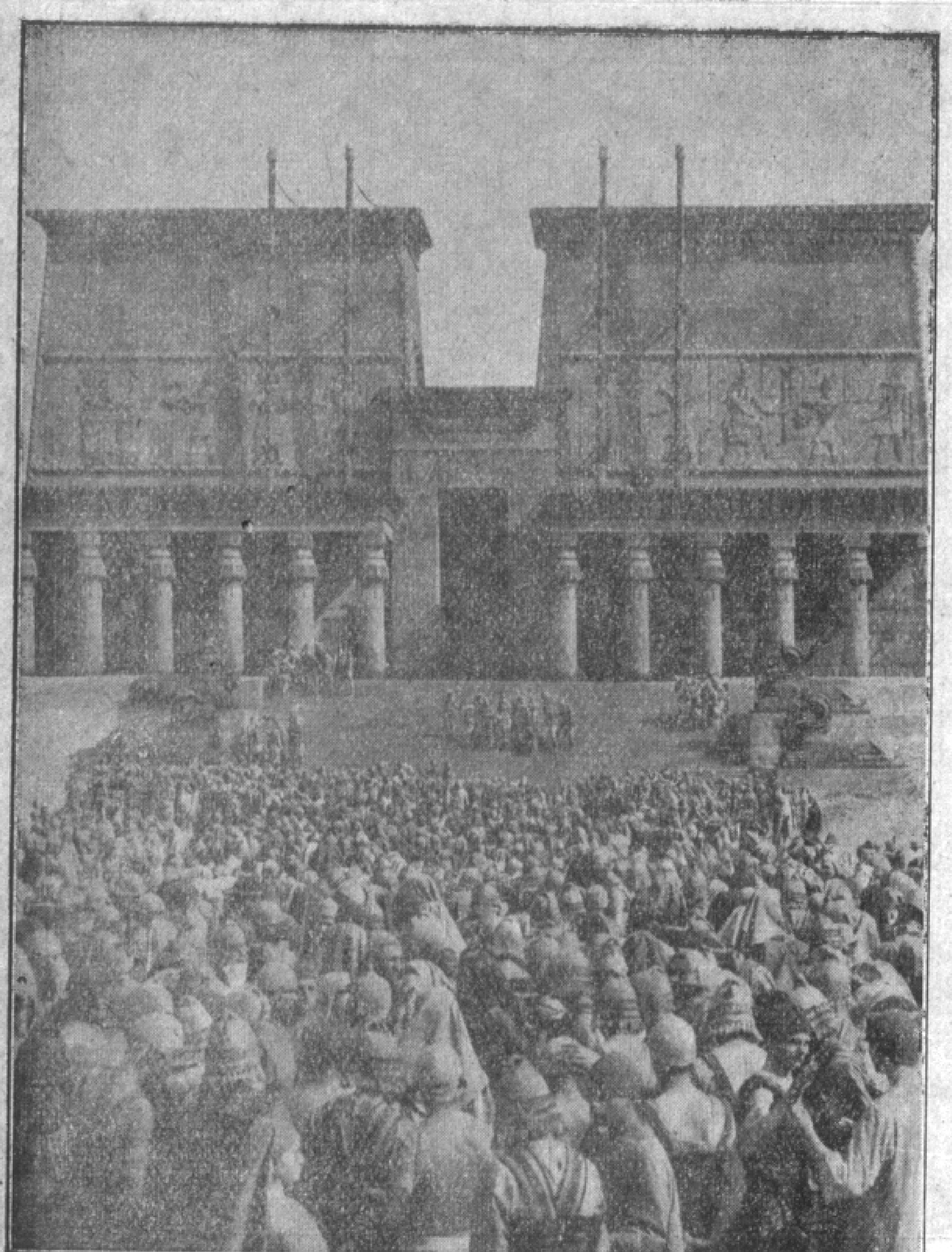




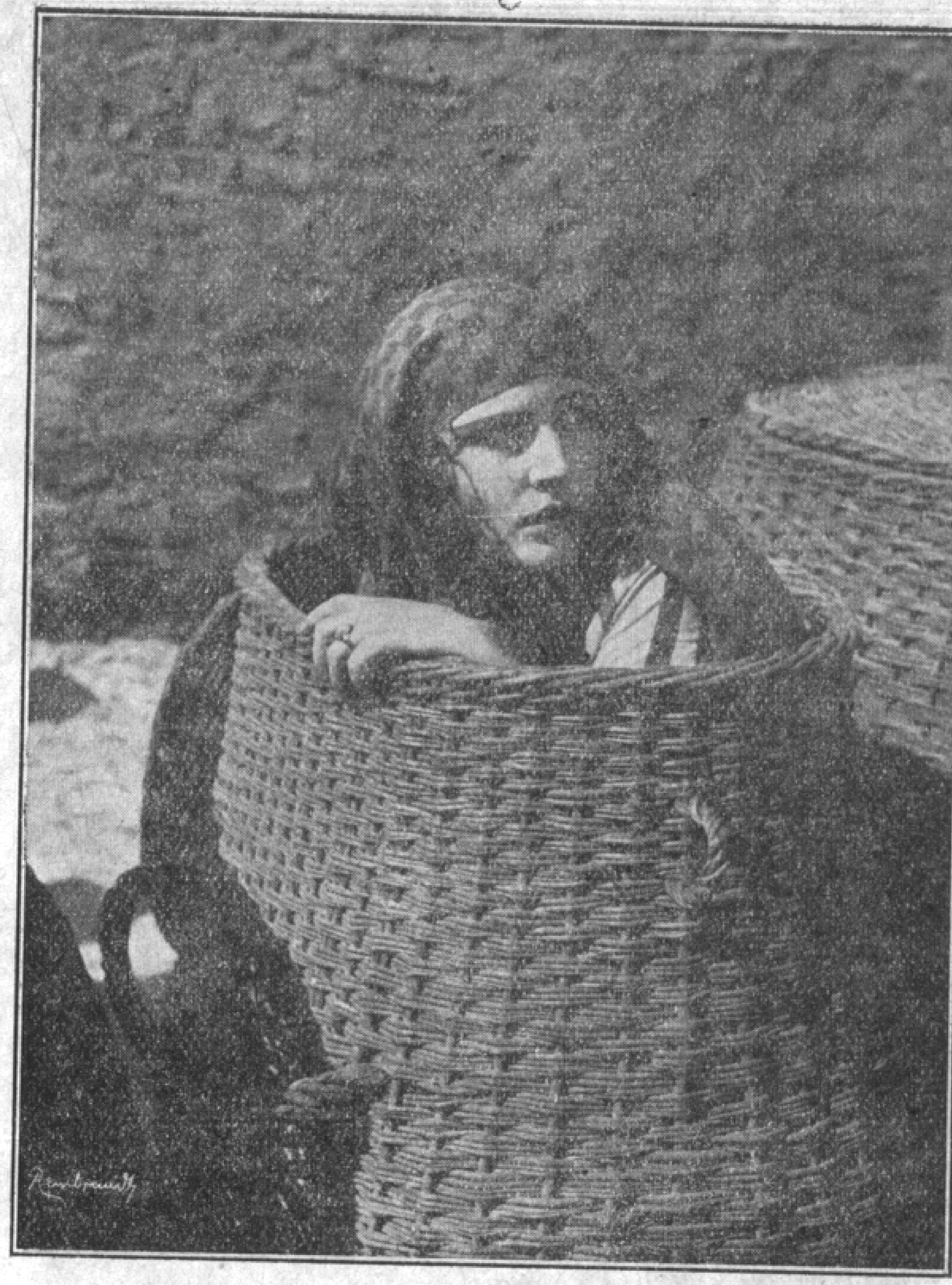
রামফিশ ও থিওনিশ—প্রণয়-সঞ্চার



রাসফিশের ফন্দিতে মিশরীদের জয়



ফ্যারো নিরুদ্দেশ—চাই নূতন ফ্যারো



থিওনিশ গোপনে তোষাখানায় যাইতে চায়

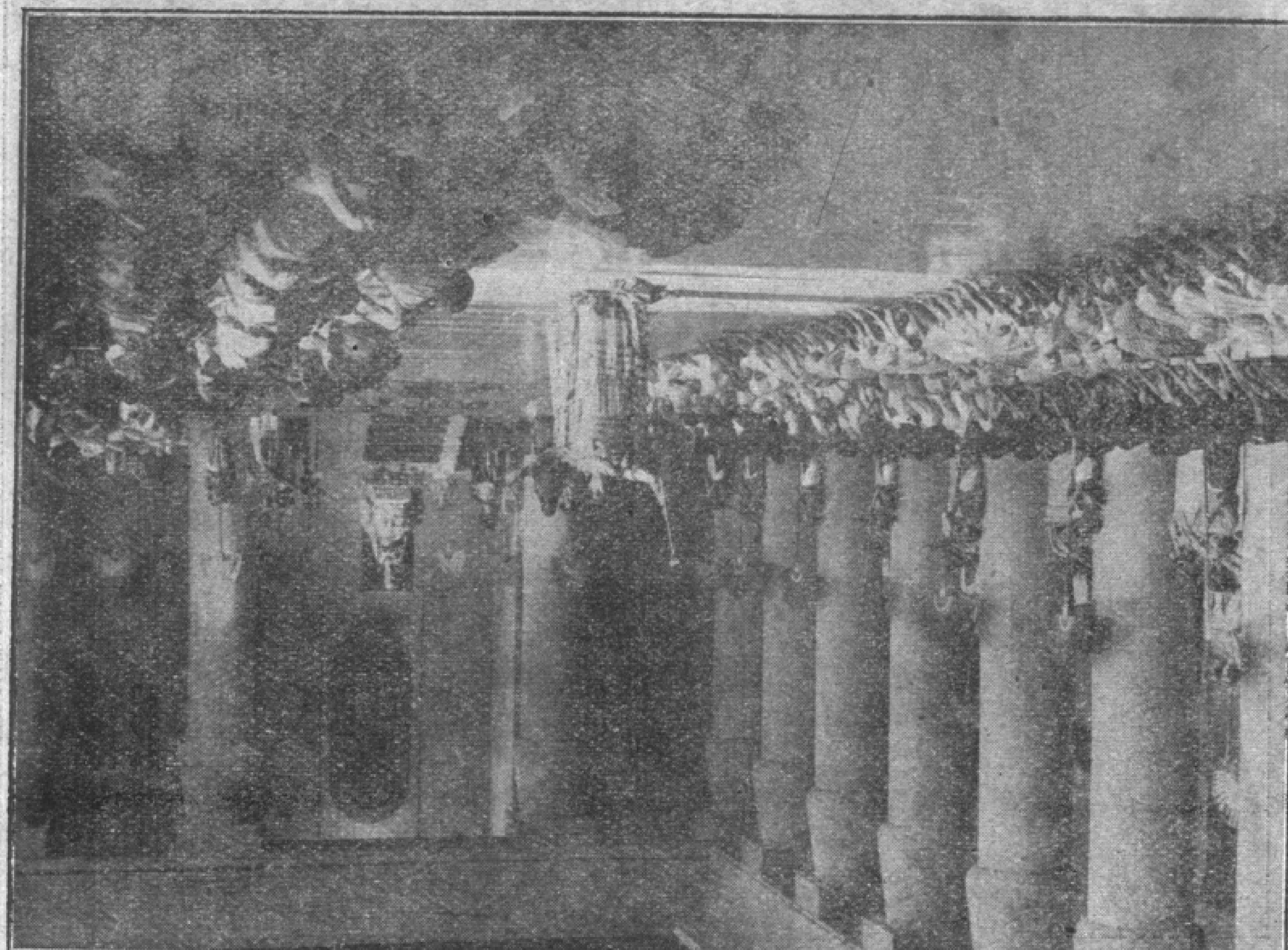


শামলকের ক্রোধ



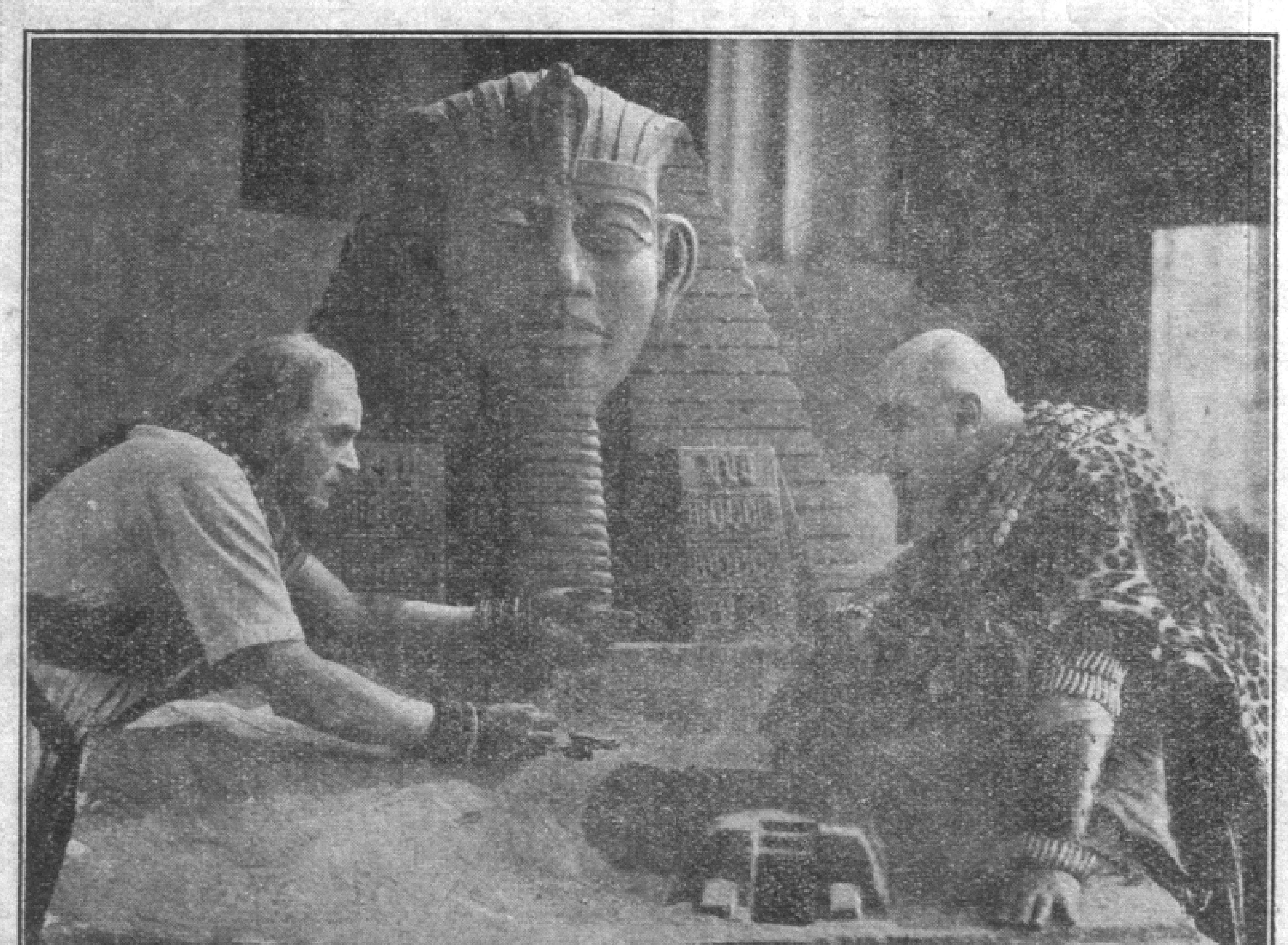
থিওনিশ মিশরের রাণী হলই

শামলকের উপঢৌকন তোষাখানায় রাখিবার হুকুম দেওয়া হই



[illegible] ফারাওর দরবারে শামলক

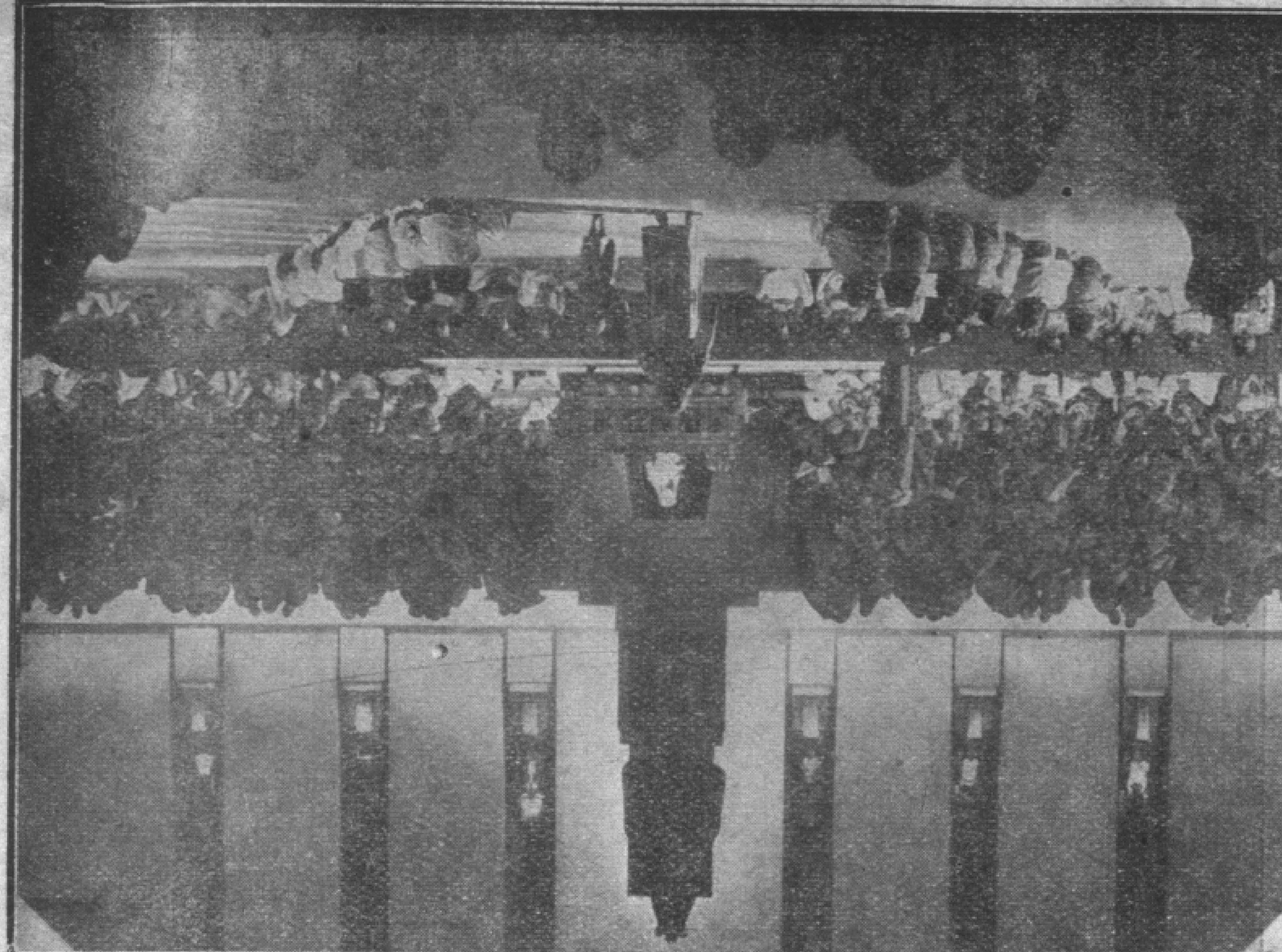


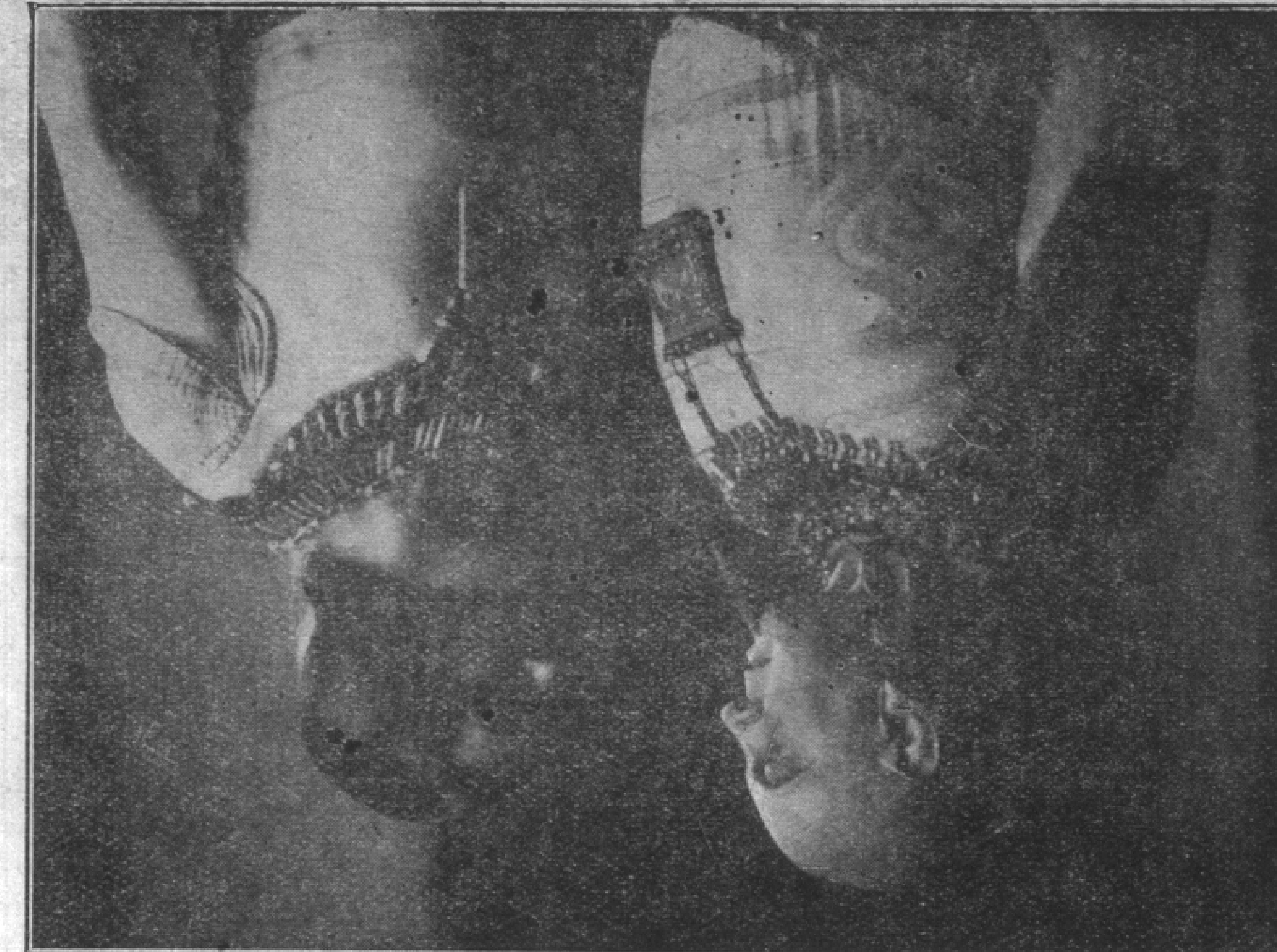


তোষাখানার দ্বার শুধু সোপিস জা ন



সিংহাসনের তলায় পড়িয়া আমেনিস প্রাণ হারাইল



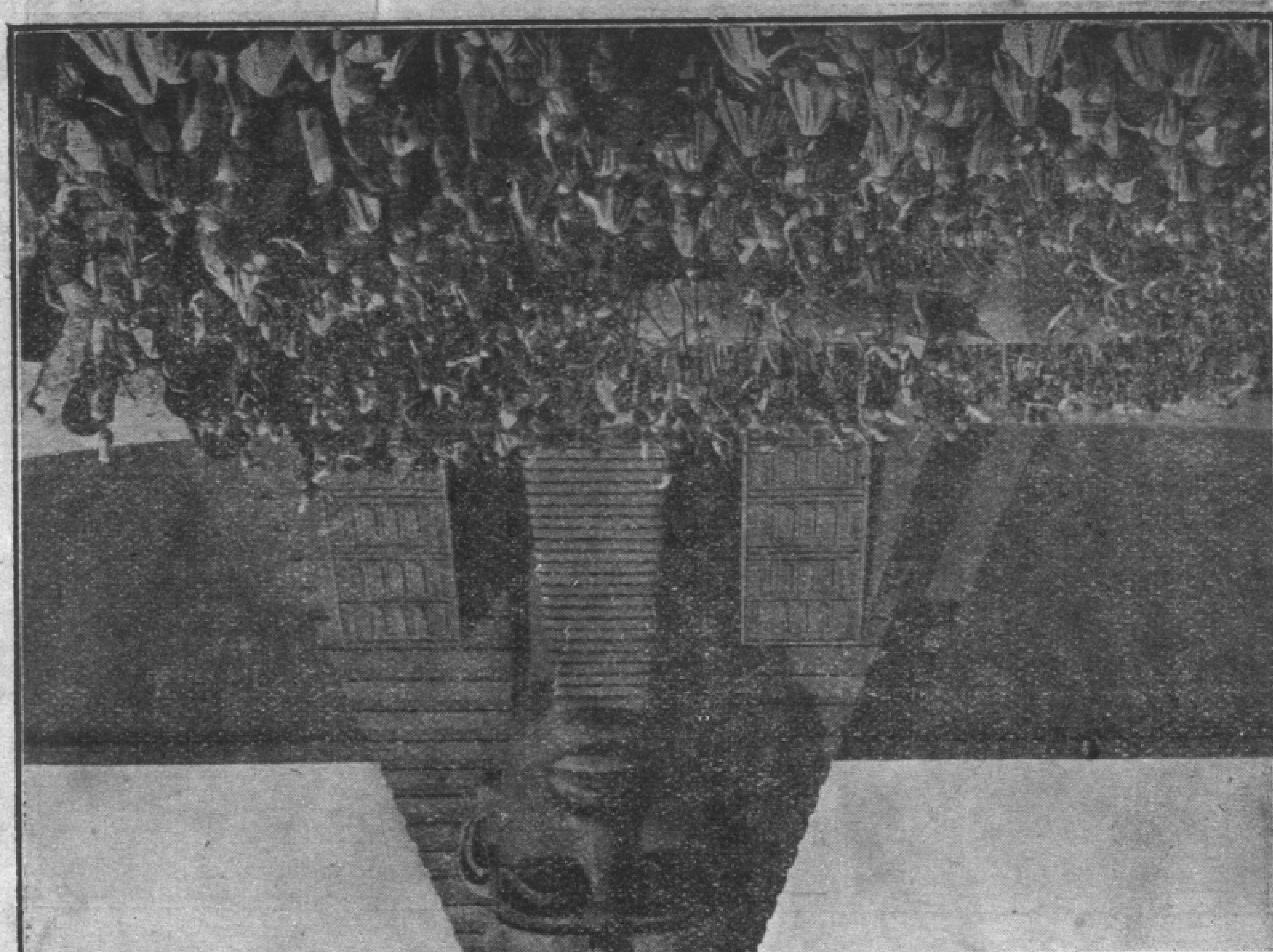




মিশরীদের যুদ্ধ-যাত্রা



প্রতিহিংসার বাসনায় শামলকের মিশর ত্যাগ



…তবু শত্রু যখন দ্বারে, তখন যুদ্ধে চল



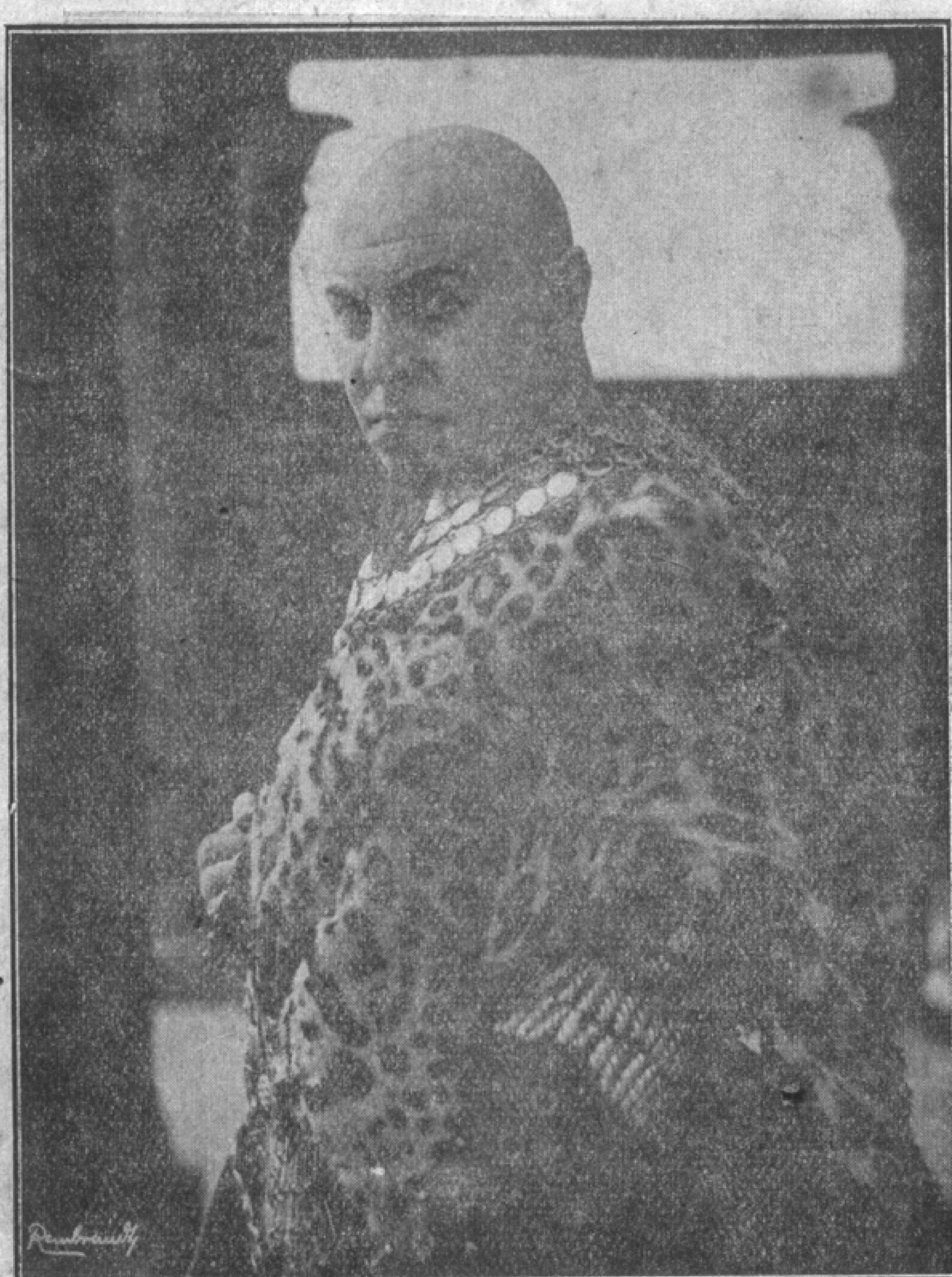
নগর-প্রান্তে সেনাদল-সেনায়



যুদ্ধের নামে দেশের লোক ক্ষেপিয়া উঠিল



তোষাখানার কক্ষে থিওনিশ ও রামফিশ



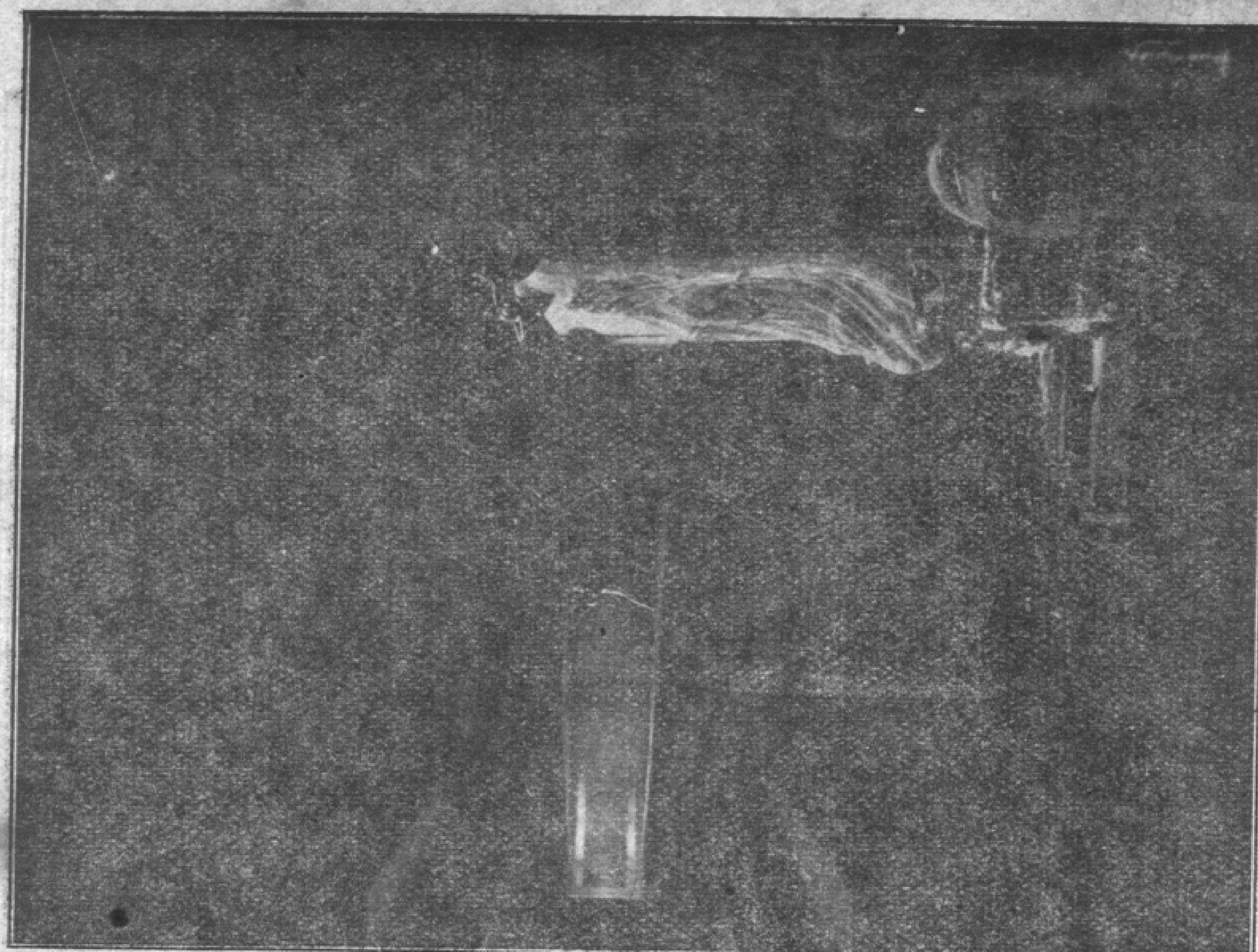


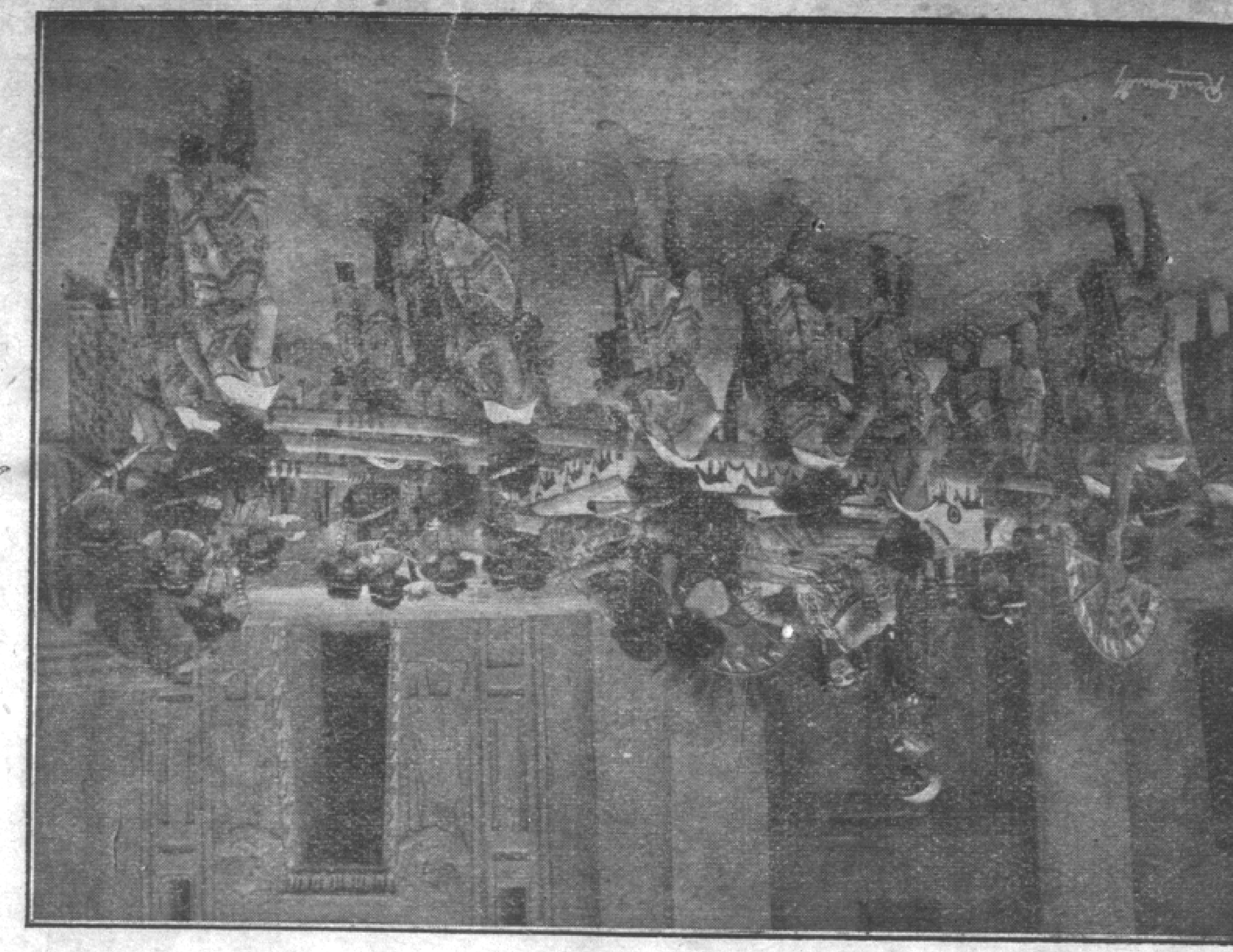
থিওনিশ ও রামফিসকে দুর্দ্দান্ত ফ্যারোর সাম্‌নে আনা হইতেছে

...তাহলে রামফিশ বাঁচে!...তবে তাই হোক











বন্দিনী থিওনিশ



রামফিশ থিওনিশকে আশ্রয় দিল



মিলনে প্রসন্ন-মুখ রামফিশ্



ম্যাকেদার রাগ—দূর হ' বাঁদী

আগড়া

যতন করে রতন আমার মিলেছে ভারী
রুক্ষতা তার উখো ঘসে সারাতে নারি
সাত শতবার রেঁদা দিয়ে
ঠাঁই ঠিকানা পাইনে যে হে,
দিস্তে দু তিন শিরীষ কাগজ হলো সাবারই।

এমনতর আগড়াতে 'আগর' কি চলে !
গুমর ভাঙ্গে 'ভোমর' ভাঙ্গে হাত যে পিছলে।
হাড়-হাবাতের ঘরের ঢেঁকি
'আন্দমানী' 'আঁকড়ো'-একি ?
চাই দুটী মণ সাজিমাটি করিতে খাড়ি।

এই বেলুনে হয় কি বেলা কচুরি লুচি
হয় মতিচুর সিঁড়ির লাড়ুর ঝাঝরাতে বুঝি ?
বিশ নম্বরের সুতায় কবে
মিহি ঢাকাই মসলিন হবে ?
রুল টানিতে খেজুর গড়ে ? কপাল আমারি !

ওতে চলে রোলার দেয়া কাদানে পথে
দাবী উহার পাণি ভূতের পা-দানী হতে।
করতে সিধা ঝুনোট ঝামা
পারব নাক, করুন ক্ষমা
বন্ধু নহে, বন্ধুর এটা অকর্ম্মার ধাড়ী।

কইত 'পলিন' পালিশ্রে এর জলুষ দেখি না।
ভাবছি এটা গলবে 'টাটার' 'ফারনেসে' কিনা ?
হতে পারে ঢালাই কড়া
'ডাম্বেল' এবং 'ঢুমুষ' গড়া
নায়ের 'নোঙর' হলে দিতে গঙ্গাতে পাড়ি।

ইস্পাত এতে নাইক মোটে 'নির্' ত হবে না—
ঠেঁটা বটে, 'টেঁটা হলে ভারটী স'বে না।
আনা এটা আন্‌সাটেতে
হবে নাক ল্যান্‌সেট এতে
করাত নহে খাঁজকাটা এ পিতল-কাটারী।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বাংলায় ইংরেজ ব্যবসাদার

বাংলায় ইংরেজের আগমন-বিষয়ে এক গল্প আছে। এক রাত্রে পিতৃ-গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে কক্ষ-পার্শ্বস্থ প্রদীপের অগ্নি পরিচ্ছদে লাগিয়া যাওয়াতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধা সাজাহান-দুহিতা জাহানারা বিশেষ ভাবে বিদগ্ধ হন্; তাঁর জীবনের আশা সম্রাট পরিত্যাগই করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রাউটন নামক জনৈক ইংরেজ ডাক্তার চিকিৎসা দ্বারা তাঁহাকে শীঘ্রই নিরাময় করেন। সম্রাট ডাক্তারের কার্য্যে বিশেষ আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে চাহিলে ব্রাউটন যাহাতে তাঁর স্বদেশীয়েরা বাংলায় বিনা-শুল্কে ব্যবসা করিতে পারেন সেই প্রার্থনা জানান। ডাক্তারের অভিপ্রায়-অনুসারে সম্রাট একখানী সনন্দ দান করেন এবং সেই সনন্দের বলে ইংরেজ বাংলায় আগমন করিয়া ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হন। অনেক ঐতিহাসিক এ ঘটনা মিথ্যা বলিয়া মনে করেন। (১) তবুও এটা ঠিক কথা যে দিল্লীতে ব্রাউটন সাহেব বিশেষ গণ্য-মান্য এবং সাহ সুজা প্রভৃতির নিকট পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর দ্বারাই পরিণামে স্বদেশীয়দের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছিল। এই ব্রাউটন সাহেবের ডায়েরী হেজেজ সাহেবের ডায়েরীর মধ্যে আছে। তাতে লেখা আছে, ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁরা প্রথম বাংলার দিকে ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করেন এবং প্রবল পর্ত্তুগীজের অত্যাচার সহ্য করিয়া উড়িষ্যায় (কটকে) আসিয়া সেখানকার নবাবের প্রতিনিধির পদদ্বয় চুম্বন করিয়া প্রথমবার উত্তরে পিপলি-তক ব্যবসা করিবার অনুমতি লাভ করেন ও ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হন; (২) ক্রমে তাঁহারা বালেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং হুগলী যাইয়া ব্যবসা করিতে মনস্থ করেন। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে নিজেদের জাহাজ প্রভৃতি বালেশ্বরে রাখিয়া দেশীয় নৌকা বাণিজ্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া প্রথমবার বণিক-বেশে ইংরেজ বাংলায় দেখা দিলেন এবং সংকল্প করিলেন যে খ্রীষ্টানোচিত ভাবে ধর্ম্মকে সম্মুখে রাখিয়া পবিত্র ভাবে, ন্যায়পরায়ণতার সহিত এ দেশে ব্যবসা করিবেন। (৩) বাংলায় আসিবার পর তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য থাকিল ওলন্দাজের বাণিজ্য-পদ্ধতি গোপনে জ্ঞাত হওয়া ও তাহাদের অপেক্ষা বেশী সুবিধায় যাহাতে বাংলায় ব্যবসা করিতে পারা যায়, তার জন্য সম্রাট বা নবাবের সনন্দ জোগাড় করা। তখন বাংলার সুবা ছিলেন সাহ সুজা; তাঁহার সঙ্গে ব্রাউটন সাহেবের দিল্লীতে বিশেষ পরিচয় ছিল, ব্রাউটন অনায়াসে বার্ষিক ৩০০০ টাকা নেক দিয়া তাঁহার নিকট হইতে ইংরেজের জন্য একখানি সনন্দ জোগাড় করিয়া লইলেন বিনা-শুল্কে ব্যবসা করিবার জন্য।

ওলন্দাজ তখন এদেশীয় ব্যবসায়ে বিশেষ অভিজ্ঞ; তাদের সঙ্গে ইংরেজ ব্যবসায়ে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। তা ছাড়া বাংলা অনেকটা দূর বলিয়া মাদ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষ বাংলার ব্যবসা তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেছেনা; এবং বাংলার ইংরেজ কর্ম্মচারীরা সেই সময় হইতেই অনিয়ম-অহঙ্কারে কাজ করিত এবং সকল প্রকার নিয়ম-পদ্ধতি অগ্রাহ্য করিবার একটা প্রবল স্পৃহা সেই আদিম কাল হইতেই ইংরেজ কর্ম্মচারীদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছিল। এই সব কারণে ব্যবসায় কোন প্রকার উন্নতি হইল না দেখিয়া মাদ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষ বাংলার ব্যবসা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে মনস্থ করিলেন। ইংলণ্ডে এই সময় ক্রমওয়েলের রাজত্ব। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দাবী মানিয়া লইলেন এবং কোম্পানিও এক কমিটী প্রেরণ করেন। কমিটী সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া উপদেশ দিলেন,—প্রত্যেক কুঠিতে এক এক কাউন্সিল গঠন করিতে হইবে; প্রত্যেক কাউন্সিলে একজন অধ্যক্ষ ও তিনজন করিয়া মেম্বর থাকিবে। প্রথম যুগে কোম্পানি হুগলী বালেশ্বর পাটনা মুর্শিদাবাদ ঢাকা

1 Vol III page. clxviii Diary of William Hedges. Edited by Henry Youle.

2 Broughton's Narrative in the early annals of the English in Bengal. By C. R. Wilson.

3 Hedges Diary Vol III page. clxxiv.

রাজমহল ও মালদহ প্রভৃতি স্থানে কুঠি নির্ম্মাণ করাইলেন। কুঠি স্থাপন ব্যাপার ও পরিণামে দুর্গ-স্থাপন ব্যাপারের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে, তাহা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় আলোচ্য নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম। এইখানে এটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে ইংরেজ যখন এই সব স্থানে কুঠি নির্ম্মাণ করেন, তখন ঐ সব স্থান রাজাদের ছিল। তাহারা প্রথমে তাহাদের ব্যবসা করিবার জন্য জায়গা দিয়াছিল; কিন্তু ইংরেজ প্রবল হইবার সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-রক্ষার্থ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে—সে সব রাজা তখন তাদের বাধা দিতে সক্ষম হয় নাই। বোম্বাই ব্যাপারে অবশ্য একটু তারতম্য আছে কিন্তু বাংলায় যখন ইংরেজ উপস্থিত হইল, তখন মোগলের নিযুক্ত রাজা অপ্রতিহত ক্ষমতায় বাংলা দেশ শাসন করিতেছিলেন; তাই সাহা সুজা ব অন্য কোন অরাজনীতিজ্ঞ যুবরাজদের নিকট হইতে অনেক প্রকারে তোষামোদ ও ঘুষ দিয়া যদিও ইংরেজ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ব্যবসা বিষয়ে অনেক সুবিধা ভোগ করিতে ছিলেন কিন্তু যেই আত্মরক্ষার্থ বা দস্যু বৃত্ত বা মোগল-পরিভাষিত আইন-কানুনের অবমাননা করিয়াছেন, তখনই নবাবেরা বা তাঁহার কর্ম্মচারীরা ইংরেজকে তাহার তৎকালীন পদ-মর্য্যাদা যে কি ছিল, তাহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিতে একটুও বিলম্ব করেন নাই। এইজন্য অনেক কাল ধরিয়া যদিও ইংরেজ আত্মরক্ষার্থ মাদ্রাজ প্রভৃতির ন্যায় একটা দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কোন নবাবই তাঁহাদের সে আবদার রক্ষা করা আদৌ যুক্তি-যুক্ত মনে করেন নাই। তাঁদের তখন ব্যবসা করিতে হইত মোগলের নাম করিয়া, বিপদের সময় পরিত্রাণ লাভ করিতে হইত মোগলের দোহাই দিয়া এবং অন্যায় করিলে খেসারৎ দিয়া মুক্তিলাভ করিতে হইত মোগলের রাজদ্বারে গিয়া।

সেকালে ইংরেজ ব্যবসার্থ যে মাল এদেশে আনিত তা প্রথমতঃ এক প্রকাণ্ড স্থানে লইয়া নিলামে চড়াইয়া বিক্রয় করিত এবং ক্রেতা মালের মূল্য-অনুসারে, কিছু দাম সেই সময় দিয়া গৃহে লইয়া যাইত এবং বাকী দাম পরে পরিশোধ করিত।

এ দেশ হইতে মাল ক্রয় করিবার পদ্ধতিও বিশেষ সরল ছিল। শোরা যেখানে ও যখন আমদানী হইত তখন প্রত্যেক কুঠির অধ্যক্ষ তাহা ক্রয় করিবার জন্য দালাল পাই-কার ও যাহারা সেই সব মাল আমদানী করিত তাহাদের আহ্বান করিতেন এবং কিছু "দাদন" দিয়া মাল চুক্তি করিয়া লইতেন এবং কুঠিতে মাল আসিলে তাহা যাচাই করিয়া বাকী দাম দিতেন। রেশমের জন্য তাঁতিরা কত মাল কি প্রকারের এবং কতদিনের মধ্যে দিতে পারিবে তাহা স্বীকার করিলে তার সেই মৌখিক কথার উপর নির্ভর করিয়া অধ্যক্ষ অগ্রিম দাদন দিতেন এবং ঠিক সময়ে নিজের কুঠিতে মাল পাইতেন। অন্যান্য যে সব তাঁতি ছিল তারা কোন প্রকার চুক্তিই করিত না, ঘরে বসিয়া কাপড় বুনাইয়া পাইকারদের নিকট বিক্রয় করিত; আর একদল ছিল তাহারা কাপড় বুনাইয়া সহরে যাইয়া বিক্রয় করিয়া প্রভূত লাভ করিত। কোন প্রকার অত্যাচার ছিল না, সরল ভাবেই সকলের দিন কাটিত; অথচ জাতিগত ভাবে ধন-বৃদ্ধিই হইতেছিল। এইজন্য বাংলা কোনদিন দিল্লীতে রাজস্ব পাঠা-ইতে বিলম্ব করে নাই, কোন প্রকার ওজর-আপত্তিও দেখায় নাই বা কোন প্রকার গোঁজামিল দিয়া বজেট গোল করে নাই। বাংলার রাজস্ব ব্যাপারে হিন্দুর প্রতি বাদশা বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন এবং যাহারা রাজস্ব লইয়া দিল্লীতে অসিতেন তাঁহারা সম্রাটদের নিকট হইতে প্রকৃত গুণগ্রাহিতার নিদর্শন-স্বরূপ নূতন নূতন খেতাব লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। বাংলার সুবাদারেরা বিলক্ষণ জানিতেন কাহাদের দৌলতে দিল্লীতে তাঁদের এত নাম; তাই তাঁহারা অতিযত্নে রেশম চিনি ও শোরার ব্যবসায়ীদের বিশেষতঃ তাঁতিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁতিদের প্রতি অত্যাচার করিলে আলীবর্দ্দী খাঁর যেন পুত্রশোক উপস্থিত হইত! পৃথিবীতে বোধ হয় এক ভগবৎ-শক্তি ভিন্ন আর কোন শক্তি ছিল না যাহা আলীবর্দ্দী খাঁর সময়ে তাঁর আদরের তাঁতিদের প্রতি অত্যাচার করিবার স্পর্দ্ধা রাখিত।

সুবাদারেরা যেমন তাঁতিদের প্রতি সু-দৃষ্টি রাখিতেন তেমনি যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন মাল সহজে

বিক্রয় হইয়া যায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে ভুলিতেন না। সেই আদিম কাল হইতে বিদেশী বণিকেরা যাহাতে ব্যবসা করিতে কোন প্রকার অসুবিধা বা বিপদ না ভোগে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। তাহাদেরই সুবন্দোবস্তের নিবিত্ত আরব পর্ত্তুগীজ ওলান্দাজ আর্ম্মেনী প্রভৃতি বণিকেরা বাংলার সুদূর প্রান্ত হইতে মাল ক্রয় করিয়া মক্কা মেদিনা রোম ইজিপ্ট প্রভৃতি প্রদেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতে পারিত। পর্ত্তুগীজ ফ্রেডেরিক সাহেব ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দের কথা লিখিয়াছেন যে এক সপ্তগ্রাম হইতেই তাঁহারা প্রতিবৎসর ৩০। ৩৫ খানা জাহাজ-বোঝাই মাল মালাবার উপকূলে পাঠাইতেন। দেশের সমস্ত বাণিজ্যও যে ভালো ভাবেই পরিচালিত হইতেছিল, তাহাও বৈদেশিকদের লিখিত বৃত্তান্তে অবগত হওয়া যায়। রাণী এলিজাবেথের দূত ফিচ সাহেব আগ্রা হইতে বণিকদের সহিত সপ্তগ্রামে যখন উপস্থিত হন তখন তাঁহাদের নৌকার সহিত ১৮০ খানা নৌকা দেশীয় নানা প্রকার দ্রব্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

বাংলায় ইংরেজ ফরাশী প্রভৃতির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসার চরম উন্নতি হয়; কিন্তু বাংলা অনেকদূরে অবস্থিত বলিয়া কোন দিনই কোম্পানির কাজ সুবিধামত পরিচালিত হয় নাই। ইহা ছাড়া কোম্পানি তার কর্ম্মচারীদের ব্যবসার প্রথম আমল হইতে নিজেদের জন্য ব্যবসা করিবার অনুমতি দেওয়াতে সকলেই কোম্পানির স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থ অপেক্ষা লঘুতর বলিয়া মনে করিতেন। প্রথম আমলে এত মাল আমদানী হইত যে কোম্পানির কর্ম্মচারীদের ঘুষ দিয়া তবে দেশীয় বণিকেরা মাল বিক্রয় করিতে পারিত। চার্ণক দস্তুরী লইয়া তবে দেশীয়দের মাল লইতেন। এই সব ব্যাপারে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে দেশে বিক্রয়ার্থ অধিক মাল আমদানী হইত। কোম্পানির চাকরেরা মাল-আমদানীর সুবিধা লইয়া দেশীয় বণিকদের নিকট হইতে ঘুষ লইত এবং ওজনের সময় দেশীয় বণিকদের প্রতারণা করিয়া যে লাভবান হইত তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এই সব কারণে নবাবেরা ইংরাজের বাণিজ্য-পদ্ধতিকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের কার্য্য-কলাপের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন। নবাব শায়েস্তা খাঁ ইংরেজ-দূতকে সভা হইতে তাড়াইয়া দেন কারণ ইংরেজ 'কলহ-প্রিয় অসাধু ব্যবসায়ী'। ইংরেজের বাণিজ্যের সেই প্রথম অবস্থায় নবাবদের মনে এই ভাব ছিল।

যখন সম্রাট ফরুকশিয়ার কোম্পানিকে বিনা-শুল্কে ব্যবসা করিবার অনুমতি দিলেন এবং কোম্পানির প্রত্যেক কুঠির নিকটে ৪০ বিঘা করিয়া জমি ছাড়িয়া দিলেন, তখনো কোম্পানি কোনরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। সে সময় পর্য্যন্ত এবং তার পরেও অনেক কাল ধরিয়া অন্য জাতীয় বণিক এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছাড়া আরও যে সব স্বাধীন ইংরেজ বণিক এদেশে ব্যবসা করিতে আসিত, সকলেই নির্ব্বিঘ্নে ব্যবসা করিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও অন্যান্য বণিকদের ব্যবসা করিবার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল। এই সমস্ত বণিকেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মত কেবল বার্ষিক নাম মাত্র ট্যাক্স দিয়া ব্যবসা করিবার অনুমতি পায় নাই। তাহাদিগকে অন্যান্য জাতির ন্যায় মালের নির্দ্দিষ্ট শুল্ক দিতে হইত ও মাল ক্রয়-বিক্রয়ার্থ নবাবের দস্তখতের প্রয়োজন হইত। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে ইহা স্বতঃ প্রতীয়মান হয় যে সম্রাট হইতে নিম্নতম কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত ইংরেজকে অন্যান্য জাতীয় বণিক অপেক্ষা বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। যদিও ইংরেজ যখনই অন্যায় কার্য্য করিয়াছে তখনই নবাব তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তবু পরক্ষণে আশুতোষের ন্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করিবামাত্র ক্ষমাও করিয়াছেন। চার্ণকের কাহিনী এই প্রকার। ব্যবসা সম্বন্ধে ইংরেজকে যে চক্ষে দেখা উচিত অন্য বণিকদেরও সেই চক্ষে দেখা উচিত কিন্তু কার্য্যতঃ ইংরেজেরই প্রতি সরকার কেবল অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ইহার ঐতিহাসিক কারণ খুঁজিলে দেখা যায় ইংরেজ মাত্রই বিশেষ তোষামোদকারী এবং কথায় কথায় ঘুষ দিতে তৎপর ছিল।

যা হোক পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে ইংরেজের ব্যবসা সিরাজের দ্বিতীয়বার কলিকাতা আক্রমণের সময় পর্য্যন্ত বেশ চলিল; কিন্তু সিরাজের দ্বিতীয়বার আক্রমণের সময়, নৈশ হাঙ্গামার জন্য মূর্খ মন্ত্রীগণের প্ররোচনায়

পরাজিতের ন্যায় সন্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের মন ও কার্য্যের মধ্যেও তাহাদের ব্যবসার পদ্ধতির পর্য্যন্ত বিষম পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। যাহাদের ব্যবসা কেবল যাহারই ইঙ্গিতে অপ্রতিহত ভাবে ও নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত হইতেছিল আজ তাহাদের নবাবের প্রতি ভাব ভাষা এমন কি ব্যবহার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইল। নবাব সন্ধি করিলেন যে তিনি বা তার কর্ম্মচারী কেহই ইংরেজের ব্যবসায় বাধা প্রদান করিবেন না এবং কেহ যাহাতে বাধা না দেয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখিবেন। সন্ধি করিয়া সিরাজ মুর্শিদাবাদে ফিরিলেন, ইংরেজের গোমস্তা ও এজেন্ট এবার বাংলার পল্লীতে ঢুকিল। এবার যে সব স্বাধীন ইংরেজ বণিক ব্যবসা চালাইত, যাহাদের সেকালে ইন্টারপ্রিটার বলা হইত, তাদের উচ্ছেদ হইল; কিন্তু অন্যান্য জাতির ব্যবসা নষ্ট করা বা তাদের প্রতি অত্যাচার কিছুই করা হইল না। এই সব এজেন্ট ও গোমস্তাদের ক্ষমতা সেকালের যে-কোন রাজা-মহারাজের অপেক্ষা বেশী ছিল। অত্যাচার যা আরম্ভ হইল তাহা বর্ণনা করিবার ইহা স্থান নয়। এই সময় হইতে র কাশিমের পদচ্যুতি পর্য্যন্ত ইংরেজের বাণিজ্যকে ইংরেজ অত্যাচারের সূচনা বলা যাইতে পারে।

মির কাশিম যখন অর্থ দিয়া নবাব হন তখন ইংরেজ প্রায় অপ্রতিহত ও অব্যাহত। কাশিম বাংলার শেষ স্বাধীনতা-পিয়াসী নবাব; নিজের ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত করিবার আশায় তিনি মুঙ্গেরে চলিয়া গেলেন। বাংলা এইবার সম্পূর্ণ-রূপে ইংরেজের মুখে অপরিতৃপ্ত বাণিজ্য-ক্ষুধার লোভনীয় খাদ্য বলিয়া নিক্ষিপ্ত হইল। প্রত্যেক ইংরেজ গভর্ণরের ও অধ্যক্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকিল আগেকার চেয়ে বেশী মাল ইংলণ্ডে যাহাতে পাঠানো যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজে-দেরও লাভ হয়। অধিক রেশমের কাপড় পাঠাইতে হইলে তাঁতিদের হাত করা প্রয়োজন। জোর করিয়া আইনের দ্বারা তাঁতি-শিল্পীকে একচেটে করা হইল। বোধ হয় পৃথিবী-পৃষ্ঠে ইহা এক অভিনব ঘটনা, ব্যবসা একচেটে হইবার বা করিবার কথা আমরা শুনিয়া থাকি! মানুষ একচেটে করিবার কথা কি রকম? তখন বাংলায় ওলন্দাজও ফরাসী বিধ্বস্ত কিন্তু তাদের ব্যবসা তখনও চলিতেছে। সমস্ত বাংলার তাঁতিকুলকে বিনা-পারিশ্রমিকে বা নামমাত্র পারিশ্রমিক লইয়া হুকুম করা হইল, কেবল ইংরেজ কুঠিতেই কাজ করিতে হইবে। আবার এই সব জোর জবরদস্ত আইনের দ্বারা প্রযুজ্য ছিল। সেকালের regulationগুলি পড়িলেই ইহার সত্যাসত্য হৃদয়ঙ্গম হয়। অন্যান্য জাতি বণিক তাঁতি না পাওয়ায় কলিকাতার অধ্যক্ষকে এই সব কথা লিখিলে কোন জবাব (১)। ঢাকা লক্ষ্মীপুর যে সব স্থান একদিন ব্যবসা-বাণিজ্যের নিমিত্ত দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, সেই সব স্থানে ইংরেজ কর্ম্মচারী যাইয়া উৎপাত উপদ্রব আরম্ভ করিল। শেঠেরা ইংরেজকে সিংহাসনে তুলিয়া দিবার জন্য যে সাহায্য করিয়াছিল, তার জন্য ইংরেজ চিরকাল তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল; জগৎ শেঠ দেশকে বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় আসিলে ইংরেজ তাহাকে নবাবের ন্যায় ভেট দিয়া তাঁহার সন্তোষ-উৎপাদনে ব্যস্ত থাকিত, জগৎ শেঠ পীড়িত হইলে ইংরেজ পরমাত্মীয়ের পীড়া হইয়াছে মনে করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিত। সেই শেঠেদের জমিদারীতে যাইয়া ইংরেজ এমন অত্যাচার আরম্ভ করিল যে বাঙ্গালীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু পিতৃ-পিতামহের বাস্তু-ভিটা তাহাই পরিত্যাগ করিয়া অধি-বাসীরা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইল (২)।

প্রথম অবস্থায় ইংরেজের বাণিজ্য কি প্রকারে চলিত তার আভাষ আমরা অন্য স্থানে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। সিরাজের সন্ধি করিবার পর ব্যবসা অন্য প্রকারে চলিত। ইংরেজ অধ্যক্ষ ও তার বণিক মাসিক বেতনে গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া তাহাদের অধীনে একজন মুহুরী, একজন তহশীলদার আর কয়েকজন পাইক ও পেয়াদা নিযুক্ত করিয়া গভর্ণরের একখানা পরোয়ানা দিয়া যেস্থানে মাল আমদানী ও উৎপন্ন হইত তথায় পাঠাইত। সেই সব স্থানের জমীদার বা রাজাদের উদ্দেশ্যে লেখা থাকিত, তাঁহারা যেন কোম্পানির কাজে কোন প্রকার বাধা না দেন, অপর পক্ষে যাহাতে সুসমাধা হয় তাহাই করিতে আদেশ থাকিত। মফঃস্বলের আড়ঙে যাইয়া পেয়াদা দ্বারা তাঁতি দালাল ও পাইকারদের ডাকানো হইত। তাঁতিদের কিছু দাদনী অগ্রিম দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল সরবরাহ করিতে হইবে।

এই মর্ম্মে চুক্তি হইত। তাঁতির সম্মতির আদৌ দরকার হইত না এবং তাঁতি স্বীকার করিতে না চাহিলে তার প্রতি অত্যাচার করিয়া তাকে স্বীকার করাইতে বাধ্য করা হইত। দালাল ও পাইকারদের প্রতিও কম অত্যাচার হইত না এবং তারাও সুবিধা পাইলে তাঁতির প্রতি অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাঁতির কাপড় বোনা হইলে তাহা গোমস্তার কাছারিতে আনা হইত এবং তাঁতির নামে যে খাতা থাকিত তাহাতে লিখিয়া লওয়া হইত। সমস্ত মাল কাছারিতে আসিলে গোমস্তারা যাচাইদার নিযুক্ত করিত। ইহাদের কাজ ছিল মাল কোন্ প্রকারের তাহাই যাচাই করা। গোমস্তাদের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া যা' তা একটা দাম ধরিয়া দেওয়া হইত এবং তাঁতিকে সে অত্যাচার ও অবিচার মাথা পাতিয়াই গ্রহণ করিতে হইত। এইজন্য তাঁতি তাহার মজুরী পোষাইবার নিমিত্ত অন্য জাতীয় বণিকদের নিকট বিক্রয় করিবার নিমিত্ত স্ব-কৃত মাল লইয়া যাইত; নিজেদের পরিবারস্থ মহিলারা চরকায় সুতা কাটিয়া দিয়াছে আর তাঁতি সেই সুতার দ্বারা নিজের পিতৃ-পিতামহের ভদ্রাসনে বসিয়া স্বীয় পরিশ্রমে কাপড় বুনাইয়াছে কিন্তু সে কাপড়ের উপর তাহার অধিকার আজ ইংরেজ কোম্পানির হুকুমে থাকিল না। সি-আই-ডি পাইকের দ্বারা সে কথা কাছারিতে পৌঁছিল; তাঁতিরবাড়ী পেয়াদা মোতায়েন হইল; মাল প্রস্তুত হইবামাত্র কাছারিতে তাহানীত হইতে লাগিল। মোগল যখন প্রবল ছিল, নবাবরা যখন "ক্লাইভের গাধা" হইয়া পড়েন নাই, তখন তাঁতিরা মনের সুখে তাঁত চালাইয়া কাপড় বুনাইত এবং কত ইংরেজ ও ফরাশী বণিক তাহাদের দ্বারের পাশে, বাড়ীর অলিতে-গলিতেসেই মাল কিনিবার জন্য লালায়িত হইয়া ঘুরিত! কিন্তু সে দিন আর নাই! সে-সময় অত্যাচার করিলে নবাবরা সে অত্যাচারের সুদ-সমেত ওয়াশীল দিতে জানিতেন, কিন্তু আজ সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই! তাঁতিদের আজ দোহাই দিবার মত কোন নবাব রাজাসনে নাই! গোমস্তা দালাল পাইকার কুঠিয়াল আজ সকলের কোপের ও লোভের নীচে দাঁড়াইল, সহায়-সম্বল ও নবাবের সেই স্নেহ-দৃষ্টি-বঞ্চিত তাঁতি, যে ঢাকা সহরে প্রতিদিন অসংখ্য মশলীন লইয়া প্রফুল্ল মনে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইত! তাহারাই সিরাজউদ্দৌলার সময়ে ইংরেজের অত্যাচারে গ্রাম ও ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া "ত্রাহি মধুসূদন" বলিয়া চীৎকার করিয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। মুচলেকা-অনুযায়ী মাল সরবরাহ না-করিতে পারায় চোখের সামনে নিরীহদের কুঠিগুলি ভস্মে পরিণত হইতে লাগিল! যে একদিন তাঁত চালাইয়া আনন্দ পাইত, অর্থ পাইত, চরকার দৌলতে যে দুয়ারে হাতি বাঁধিবার দুরাশা রাখিত, সে আজ তাঁত ও চরকার নামেই ভীত ও শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু ইহাই শেষ নয়! আশ্চর্য্য, দ্রোণ নিজ প্রিয়তম শিষ্য অর্জ্জুনকে সমস্ত প্রকারের অস্ত্র শিক্ষা দান করিয়াও দেখিতে পাইলেন, অর্জ্জুন স্বাবলম্বী একলব্য অপেক্ষা অপটু, তাই কৌশলে তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ লইয়া নিজের শিষ্যের গৌরব বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; হতভাগ্য বাংলার তাঁতি-কুলকে বিধাতা তেমন কোন পরীক্ষার সাম্‌নে আনেন নাই—তিনি আনিলেন আজ তাহাদিগকে অত্যাচারে উলঙ্গ মুর্ত্তির সাম্‌নে আর তাহারা লইয়া আসিল তাহাদের প্রিয়-সম্বল ভগবৎদত্ত হাত দুখানি; আদেশ হইল, বৃদ্ধাঙ্গুলি দাও! দরিদ্র কাঙালেরা ভগবানকে স্মরণ করিয়া তাদের সাধনার ধন, যার দ্বারা তারা এতকাল ইংরেজকে বস্ত্র প্রভৃতি যোগাইতেছিল, সেই ইংরেজকেই দান করিল। যে মুর্শিদাবাদে আলীবর্দ্দীর সময় সত্য সত্যই লক্ষ লক্ষ টাকার মসলীন উৎপন্ন হইত, যে বাংলায় বিদেশীয় বণিকেরা দেশের অর্থ লইয়া আসিয়া ঢালিয়া দিত, যেখানে তখন দুর্ভিক্ষ শব্দ কেবল অভিধানেই স্থান পাইত, সে দেশে যাদের পরিশ্রমে সাধনায় ও যত্নে অর্থ আসিত তাহাদের প্রতি এইরূপ অমানুষিক ও পৈশাচিক অত্যাচার আরম্ভ হইলে সে দেশের অধিবাসীদের স্কন্ধে পরিণামে ঝুলি উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? যে সোনার বাংলার শ্যামল স্নিগ্ধ বুকের উপর বাঙালী সত্য সত্যই পাখীর গানে ঘুমাইয়া পড়িবার অবকাশ পাইত, যে বাংলায় প্রভাতে বাঙ্গালীর ছেলে গাভীর বৎসের ন্যায় উদ্দেশ্যবিহীন ১২ অগষ্ট

নন্দ মাখিয়া চঞ্চলভাবে ছুটাছুটি করিয়া মাঠে নের উপর দিয়া প্রবাহিত হাওয়ায়, উপরে অনন্ত আকাশ নীচে বিরাট মাঠের মধ্যে জীবন কাটাইতে শিখিয়াছিল এবং সন্ধ্যায় রামায়ণ-পাঠ, কথকতা, গাজীর গান ও সত্য-পীরের কাহিনী শ্রবণ করিয়া চিন্তাশূন্য হৃদয়ে আবরের পিতামহ ও পিতামহীর শান্তিময় ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িত, কখনও বা বেহুলার কাহিনী ও সীতার বনবাস শ্রবণ করিয়া অশ্রুজলে তাহাদের বক্ষ ও শিক্ষাহীন হৃদয় সিক্ত করিয়া দিত আবার কখনও বা রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও মনসার প্রতি ন্যায়-শাস্ত্র-অনুমোদিত পন্থা অগ্রাহ্য করিয়া ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিত—আজ সেখানে অত্যাচারের পর অত্যাচারের ঢেউ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে অত্যাচারে বাংলা হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল সেকালের সেই রসিকতা রহস্য চাপল্য, সেই অমায়িকতা ও সামাজিকতা, সেকালের সেই সব দাদা ও দিদি এবং নাতী ও নাত্নির নবীন সংসার পাতাইবার প্রবল ইচ্ছা; ক্রমে ক্রমে হাসি আনন্দ চলিয়া গিয়া স্থান হইল দুঃখের ও গাম্ভীর্য্যের। দীনবন্ধু ছিলেন না, তাই সমগ্র জাতিটা মর্দ্দিত মথিত হইলেও তাহাদের গুমোট বেদনা প্রকাশিত না হইয়া তাহা অলক্ষ্যে মহারুদ্রের অভিশম্পাতের কারণ স্বরূপ হইয়া উঠিল।

ইংরেজ প্রথমে এদেশে রেশম চিনি সোরা প্রভৃতির বহি-র্বাণিজ্য করিত, তাদের ব্যবসা চালাইতে কোন প্রকার শুল্কের প্রযোজন হইত না কেবল বার্ষিক ৩০০০ টাকা করিয়া দিত। সম্রাট ফরেক্সায়ার তাদের বিনা-দস্তখতে বাণিজ্য করিবার আদেশ দিয়াছিলেন; সুচতুর মুর্শিদ কুলী খাঁ সম্রাটের এই আদেশ কেবল বহি-র্বাণিজ্য বিষয়ে খাটিবে বলিয়া ঘোষণা করেন; অন্তর্বাণিজ্য করিতে হইলে রীতিমত শুল্ক দিতে হইবে, এই আদেশ দিলেন। সে সময় ইংরেজের ভাগ্য আদৌ সুপ্রসন্ন নয় বলিয়া কুলী-খাঁর আদেশ ইংরেজ মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু তাদের চোখ চিরকাল এই অন্তর্বাণিজ্যের প্রতি ছিল, নিজে-দের যখন প্রতিপত্তি হইল, তখন ইংরেজের কর্ম্মচারীরা বিনা দস্তখতে কিন্তু একই দস্তখে এই দুই ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করেন। মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধ হইবার ইহাই এক-মাত্র কারণ। এই অন্ত-র্বাণিজ্য নূন পান সুপারী তামাক বাঁস ঘি প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া করিতে হইত। এই সব দ্রব্যের ব্যবসায়েও অত্যাচার চরমে উঠিত। যে সময়ের কথা আমরা লিপিবদ্ধ করিতেছি তখন বালেশ্বর হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত সমুদ্র-তীরবর্ত্তী জিলায় নূন উৎপন্ন হইত। যাহারা নূন তৈয়ারী করিত তাহাদের মৌলঙ্গী বলা হইত। এই সমস্ত জিলা বা পরগণার লোকেরা নূন বিক্রয় করিয়াই খাজনা প্রভৃতি পরিশোধ করিত। নূনের ব্যবসা আলি-বর্দ্দীখাঁর সময়ে আর্ম্মেনী বণিক খোজা ওয়াজেদ করিত তখন নূন ৩০। ৪০। ৫০৲ টাকায় ১০০ মণ বিক্রয় হইত; কিন্তু যখন কোম্পানির চাকরেরা এই সব ব্যবসা নিজেদের মধ্যে আইনের দ্বারা একচেটে করিয়া লইল তখন নূন ৩০০ টাকায় ১০০ মণ বিক্রয় হইত এবং এক সময় পাটনায় ৮৫০ টাকায় ১০০ মণ বিক্রয় হইয়াছিল। কোম্পানী এই সব ব্যবসা নিজেদের হাতে লইয়া জোর করিয়া অতি সামান্য মূল্যে এক স্থান হইতে ক্রয় করিয়া অন্য স্থানে সেই সব দ্রব্য অসম্ভব চড়া মূল্যে বিক্রয় করিত। এই সময় ব্যবসায়ীদের সহিত ইংরেজ সৈন্যও বাংলার মফস্বলে ঢুকিতে আরম্ভ করে এবং জনপদবহুল স্থান নির্জ্জন প্রান্তরে পরিণত করিতে আরম্ভ করে, আঙুল কাটিয়া, জাত নষ্ট করিয়া, মহিলাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া বাঙলার আকাশ বাতাসকে যখন ইংরেজ ভারী করিয়া তুলিল তখন কাশিমের আর ধৈর্য্য থাকিল না। তিনি মুঙ্গের হইতে এই সব অত্যাচারের কথা কলিকাতা কাউন্সিলে জ্ঞাত করাইলে তদন্ত করিবার জন্য ভ্যান্সিটার্ট নবাবের নিকট যান এবং ঠিক করিয়া আসিলেন যে অন্তর্বাণিজ্য করিবার জন্য নয় টাকা হারে শুল্ক দিতে হইবে। নবাব গভর্ণরকে আরও বলিয়া দিলেন যে এই চুক্তিমত কাজ না হইলে তিনি সমস্ত বাংলা হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিবেন। কলিকাতা কাউন্সিল এ চুক্তি মানিল না। এলিস্ সাহেব পাটনায় ছিলেন তিনি বিনা-শুল্কে ব্যবসা চালাইতে কৃত-সংকল্প হইলেন, ঢাকা মুর্শিদা-বাদে খুব অত্যাচার আরম্ভ হইল। অগত্যা বাধ্য হইয়া নবাব ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শুল্ক রহিত করিয়া রাজা নহবৎ

রামকে (Nowbet Ram) একখানা পত্র লিখিলেন।

পত্রখানির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ইহাতে বিশেষ করিয়া সেকালের রাজা-প্রজার মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল তাহা জানা যায়। যখন কলিকাতায় নবাবের শুল্ক-রহিতের কথা ইংরেজ বণিক শুনিতে পাইল তখন বুঝিতে বাকী থাকিল না যে এই শুল্ক রহিতে তাহাদের চির-সাধের ব্যবসার কি পরিণাম হইবে! কেবল এই শুল্ক রহিতের জন্য দেশীয় ও অন্যান্য বণিকেরা ইংরেজের সহিত ব্যবসায় আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। হেষ্টিংশ ও গভর্ণর ভ্যানসিটার্ট ফতোয়া দিলেন, নবাব মন্দ কাজ করেন নাই; কিন্তু স্বার্থপর বণিকের নিকট বিচার ও বিবেকের উল্লেখ করাই বাতুলতার কার্য্য। নিজেদের স্বার্থে আঘাত পাইয়া ইংরেজের জাতক্রোধ উপস্থিত হইল। ইহারই পরিণামে মীর কাশিম পলাতক, ইংরেজ বাংলার রাজা। মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধবিগ্রহের কথায় বিলাতের কোর্ট অফ ডিরেক্টরেরা আশঙ্কা করিলেন, পাছে তাঁদের মুখের গ্রাস নষ্ট হইয়া যায়! তখন সমুদ্রের এপার ওপার দুই পারেরই একমাত্র লক্ষ্য ছিল, বাংলাকে কিরূপ ভাবে শোধন করা যায়! কাজেই কোর্ট বীরকুল-চূড়ামণি ক্লাইভকে এ দেশে পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। ক্লাইভও শোধন করিবার আরও সুযোগ পাওয়া যাইবে বলিয়া পদগ্রহণ করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে নিজে নিজের জন্য কোনরূপ ব্যবসা করিবেন না এবং কোম্পানির কর্ম্মচারীরাও যাহাতে কোনরূপ ব্যবসা না করে তারও ব্যবস্থা করিবেন। কোর্ট ক্লাইভের সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বাংলায় পাঠাইলেন। কিন্তু যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ! সামনে লোভের সামগ্রী থাকিলে এবং অন্যায় ভাবে গ্রহণ করিবার সামর্থ্যও অধিকার থাকিলে তাহা গ্রহণ না করাই ইংরেজী শাস্ত্র অনুসারে মূর্খতা। ক্লাইভ এ দেশে আসিয়া দেখিলেন ইংরেজ কোম্পানির সর্ব্বাঙ্গ দূষিত; তাই মনস্থ করিলেন, পূর্ব্ব-অর্জ্জিত "জালিয়াৎ" নাম ঘুচাইয়া এবার ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হইবেন। ক্লাইভ নিজে-নূন তামাকের

ইহার বিরুদ্ধ মত দিলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার জন্য তিনি এক সমিতি করিলেন। (১) তখন স্বাধীন নবাব নাই; মীরজাফর খোদার নিকট জবাবদিহি হইয়াছেন, হলওয়েল প্রভৃতি সনাতন পদ্ধতি অনুসারে পকেট বোঝাই করিয়া যাহাকে নবাব করিয়াছিলেন ক্লাইভ তাঁর সম্মতির দরকার অনুভব করিলেন। এই পুত্তলিকার সম্মতি চাহিবার পূর্ব্বেই তিনি সম্মতি দিলেন; (২) এবং সকলের নিকট হইতে লিখাইয়া লইলেন, যাহাদের জমিদারীতে বা রাজ্যে নূন হয়, তাহাদের কেবল ইংরেজের নিকটই বিক্রয় করিতে হইবে এবং অন্য কেহ এই সব দ্রব্যের ব্যবসা করিতে পারিবে না; করিলে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে কোথায় নূন উৎপন্ন হইত। সেই সব স্থান হইতে নূন লইয়া দ্বারবঙ্গ গোয়ালপাড়া চৌলমারী রাজবাড়ী শ্রীহট্ট পাটনা প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করা হইত। অত্যাচার আবার চলিল। এবার দেশীয় গোমস্তারা গিয়া ইংরেজ এজেণ্টই সুদূর মফঃস্বলে প্লেগ মহামারী ন্যায় দেখা দিল। স্বাস্থ্যের জন্য যখন ক্লাইভ বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তিনি তাঁর অংশ বিক্রয় করেন এবং অন্যেরা ব্যবসা চালাইতে থাকে, ক্লাইভ নিজের অংশ বিক্রয় করিয়া এই ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিতে উপদেশ দিলেন। পরে কোর্ট বারবার লিখাতে কলিকাতা কাউনসিল এই অন্তর্বাণিজ্য দেশীয়দের হাতে ছাড়িয়া দিতে মনস্থ করিলেন। এই ঘোষণা শুনিবামাত্র পূর্ব্বে যাহারা নূন তৈয়ারী করিত, তাহারা আবার নূন-উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকায়ে যায়! বড় বড় ইংরেজ বণিকেরা ইংরেজেরা যে সব নূন উৎপাদন করিয়াছিল তাই বিক্রয় করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে যৌথ সমিতি গঠন করিয়া নূন বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছিল। তাহারা যখন এই হুকুমের কথা শুনিতে পাইল যে নূতন নূন উৎপাদন করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে তখন মহাপ্রভুদের পদতলে আসিয়া ভূমি অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া আব্দার করিয়া বলিতে লাগিল, কৃপা-নেত্রে চাহ সেবকে!—যদি নূতন নূন আসে, তবে আমাদের নূন বিক্রয়ের কোন আশা নাই। পরার্থপর, পরশুভ-কার্য্যে

তারিখে হুকুম দিলেন, নূতন নুন যেস্থানে আছে তাহা যেন কোন ক্রমে স্থানান্তরিত করা না হয়। মৌলঙ্গীরা ও নূনের ব্যবসায়ীরা মহা-কারে পড়িল। সেকালে যেখানে নূন তৈয়ারী করা হইত তাহা প্রায়ই বন্যার জলে ধৌত হইয়া যাইত, তাই নূতন করিয়াই অন্যস্থানে লইয়া যাইতে হইত। এই সর্ব্বনেশে হুকুমের কথা শুনিয়া সকলে একজোট হইয়া কলিকাতায় গভর্ণরের বাড়ীতে আসিয়া গললগ্নী-কৃতবাসে অষ্টাঙ্গ ভূমে পতিত হইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল তাহাদের নূন একটু সরাইয়া রাখিবার আদেশ দেওয়া হউক। হায়রে, ইহা অপেক্ষা কত বড় দাবী লইয়া ইংরেজ নবাবদের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে, আর তাহারা সম্পূর্ণ নির্লোভ অন্তরে তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। মৌলঙ্গীদের বলা হইল,বণিকদের নিকট আবেদন করিতে,অথচ তাহাদের বিরুদ্ধেই তাহাদের কাছে অভিযোগ! একবার গভার্ণা, এক বার বণিক, যখন সকলে মিলিয়া কলিকাতায় দরকার করিতেছিল, তখন খবর আসিল—তাহাদের নূন বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। চোখের সাম্‌নে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য প্রবলের হুকুমে মুহূর্ত্তের মধ্যে নষ্ট হইয়া গেল অনেকদিন পরে যদিও তাহারা নিজেদের ব্যবসায় আবার সুরু করিয়াছিল, প্রথমেই এই বাধা পাইয়া এই ব্যবসা করিবার দুঃসাহস আর হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে নাই। বাংলা হইতে ইংরেজ বণিকের অত্যাচারে দুইটী প্রধান ব্যবসা চিরতরে নষ্ট হইয়া গেল; নূনের ব্যবসাটী অবশ্য আরও দিনকতক নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় এদেশে অবস্থিত ছিল। এই সব ব্যবসা আজকালকার মত দালালী ব্যবসা ছিল না, তাতে বাঙ্গালীর কেবল কমিশনই লাভ হইত না, ইহার দ্বারা জাতীয় ধন-সম্পদ বৃদ্ধি হইত, বাঙ্গালীর মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত বাঙ্গালীর পেটের চিন্তা দূর হইত; বাঙ্গালীর সমাজ-ব্যাধি না থাকিলে বাঙ্গালী সমাজ ইহার দ্বারা আদর্শে পরিণত হইতে পারিত। অত্যাচারে কেবল ব্যবসাই নষ্ট হইল না; সেই সঙ্গে জাতটার সুখ-শান্তিও গেল। কোর্ট অফ ডিরেক্টরেরা বাংলার এই অবসাদ অসাড়তা ও জীবন্ত ভাবের অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তখনও একটু হাসি রহস্য ও চাপল্য ফোটে ও ব্যবসার উন্নতি হয়, বাংলার গাছের তলায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা চরকা লইয়া বসে, যুবক-যুবতীরা তাঁত লইয়া বসে, তারজন্য কলিকাতা কাউন্‌সিলকে উপদেশ দিলেন; কিন্তু যাহারা এত অত্যাচার সহ্য করিয়া পরোক্ষে অত্যাচারীর মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতেছিল, ভগবানের রুদ্র বিষাণ তাহাদের বিরুদ্ধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ভগবান সেই কাপুরুষদের ধারা জগৎ হইতে বিলুপ্ত করিতে উদ্যত হইলেন। যে বাংলায় বাঙ্গালী দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে জানিত না; যে বাংলায় চাষার ধানের খেতে ঘুরিয়া আসিলে কমলা নিজহাতে কৃষককে সম্বৎসরের আহার্য্য যোগাইতেন, যে বাংলার পাহাড় ভাঙ্গা দুকূল-চাপা নদীর উপর বাঙ্গালী একদিন গান ধরিত—মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারিনে—সেই স্থানেই ও ইংরেজ কোম্পানির অস্বাভাবিক বাণিজ্য ক্ষুধা ধীরে ধীরে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা জাগাইয়া তুলিল। অনাবৃষ্টি দেবমাতৃক দেশে যখন দেখা দিল। দেবতা জল দান করিলেন না, তখন হইতেই সন্দেহ হইল, জলকষ্ট হইবে।

বাংলার বড় বড় জমীদারেরা দুর্ভিক্ষের জন্য খাজনা দিতে অক্ষম হইলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজার এই দুর্ভিক্ষের শেষে শোচনীয় ভাবে মৃত্যু হইল। রাজসাহীতে রাণী ভবানী খাজনা দিতে না পারায় হেষ্টিংস তাঁহার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিবার ভয় দেখাইলেন। এত বড় শোচনীয় কাণ্ড হইলেও খাজনা কম আদায় হইল না। কি রকমে আদায় হইল, তাহা জানিতে হইলে মহামতি বার্কের বক্তৃতা পাঠ করা উচিত। প্রজারা জমিই চাষ করিতে পারে না তার, খাজনা দিবে! কোথা হইতে আবেদন নিবেদন অগাধ সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। পিশাচ দেবীসিংহ ও অন্যান্য যমদূতেরা শয়তানের পার্শ্বচরের ন্যায় হেষ্টিংসের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃত মাতার বক্ষের উপর চিতাগ্নি প্রজ্বলিত করিল। এত অবিচার অন্যায়ের ঢেউ প্রবাহিত হইলেও বাংলা হইতে কিছু মাল-তখনো বিলাতে যাইত। ক্রমে ম্যাঞ্চেষ্টারে কল বসিল। মাল চালান বন্ধ হইল ক্রমে বাংলার একটা

উৎসব-ব্যথা

আমাদের মেসের সাম্‌নের বাড়ীটীতে বৎসরের মধ্যে ছ'মাসে ন-মাসে ভাড়াটে আসে। সেদিন হঠাৎ বাড়ীটার দিকে চোখ পড়ায় দেখি, বাড়ীটায় লোক গিস্‌-গিস্ করছে। একটা গোলমাল কলরব আর বেসুরো সানাইয়ের আলাপে বাড়ী মুখরিত হয়ে উঠেছে। বিয়ের জন্য কারা বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছে।

সন্ধ্যাবেলায় দেখি, বাড়ীর সাম্‌নেটা সাজানো হয়েছে। ছাদে পাল খাটানো; সারা বাড়ী আলোর মালা গলায় ঢুলিয়ে হাস্‌ছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভালো কাপড় পরে, বাড়ীর সাম্‌নে সাজানো চেয়ারগুলোয় বসে আছে। সানাই-ওয়ালা মহা-উৎসাহে একটা অসময়ের রাগিণী ভাঁজছে।

রাত্রি ন'টা। বর এল, আর এল তাঁর সহযাত্রী প্রায় দু'শো। যে মুহূর্ত্তে বরের মোটর এসে বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াল, কর্ত্তীকর্ত্তার চীৎকার, শঙ্খধ্বনি, সানাইয়ের সুর আর বালকদের কলরোল, সেই শুভ মুহূর্ত্তটিকে শব্দ-মুখরিত করে এই অপরিচিত আগন্তুককে আবাহন করে নিলে।

বর একটু লজ্জানতভাবে একজন জোয়ান ভদ্রলোকের কোলে চড়ে সভায় গিয়ে বসল।

তারপর একদিকে চল্‌লো আহারাদির আয়োজন অন্যদিকে বিবাহের উৎসব। একদিকে যেমন রাজসিকতার আড়ম্বর, অন্য দিকে তেমনি সাত্ত্বিকতার শুভ্র শুচিতা!

পুরোহিত বিবাহ-সভায় বর আর কনেকে অবোধ্য মন্ত্র শুনিয়ে চল্‌লো। বর আর কন্যাকর্ত্তা, হয়ত না বুঝেও তাই আবৃত্তি করে চল্‌লো! কনেটি লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে কুঁজো-ভাবে বসে রইল।

দীপের দীপ্তি, শঙ্খ আর উলুরোলের মধ্য দিয়ে বরকে

তারপর বাসর-রাতি। দীপালি-উৎসবের রাত্রির মতো এ উৎসব কতক্ষণ, হয়ত সারা রাত ধরেই চল্‌লো।

পরের দিন—তখন সকাল ছ'টা হবে। কর্ম্মকর্ত্তা দু'চারজনের গলার আওয়াজ মাত্র শোনা যাচ্ছিল। আটটার আগে বাড়ীর উৎসব-জীবন জাগ্রত হয়ে উঠল না।

দশটার সময় বরের আত্মীয়েরা এসে উপস্থিত। বিয়ে-বাড়ীর কর্ম্মস্রোত তখনও শ্লথ গতিতে চলছে,—এদের আগমনে হঠাৎ কর্ম্ম-প্রবাহে একটা সজীব উদ্দাম গতি দেখা গেল।

ঘণ্টা দুই, একটা তাড়া-হুড়োর মধ্য দিয়ে যাত্রার ব্যবস্থা প্রায় ঠিক হয়ে এল। বাড়ীর মেয়েদের একদল কনেকে নিয়ে বসে গেল,—তাকে নানা সাজে সজ্জিত করে তোলবার কাজে; অন্যদল বরকে চন্দন-তিলকের ফোঁটায় মোহন করার চেষ্টায় রত হল।

শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সাজানোর খুঁটী-নাটি ত্রুটি সেরেও মেয়েদের মনে একটা না একটা খুঁৎ রয়ে গেল।

বিদায়ের সময় যতই ঘনিয়ে আসে, কর্ম্মব্যস্ত মেয়ের মা আর বাপের বুকের মধ্যে কি এক নিবিড় অব্যক্ত ব্যথা পুঞ্জীভূত হয়ে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলে ওঠে! মুখে তার একটা ছাপ ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে! তবুও তাকে দমন করে তাঁদের ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।

বিদায়ের সময় এল। সানাইয়ের সুর আর শঙ্খের ধ্বনির মধ্য দিয়ে বর-কনে এসে মোটরে বসল। কনের মুখ ঘোমটায় ঢাকা। সারা গায়ে গহনার বোঝা, পরণে ভারী বেনারসি কাপড়। থেকে থেকে সে হাতের রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম বা চোখের জল মুছে নিচ্ছিল।

শাঁখ বাজাচ্ছিল, কেউ বা শুধু দাঁড়িয়ে দেখছিল। কনের মা এ সময়ে কোথায়, কে জানে? হয়তো বাসর-রাত্তির তাক্ত শয্যায় মেয়েটির সেই ছেলেবেলার স্মৃতি মনে করে আজ এই বিদায়-ক্ষণের ব্যথায় মৌন ক্রন্দনে তিনি স্থির হয়ে বসেছিলেন!

কনের বাপ বিদায়-ব্যথা-ক্লিষ্ট মুখে মোটরের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর মেয়ের দিকে চেয়েছিলেন।

বরকর্ত্তা নমস্কার করে মোটরে বর-কনে নিয়ে চলে গেলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা যায়, ততক্ষণ কনের বাপ স্থির চোখে চেয়ে রইলেন; তারপর—যাক্ এখন ফুল-শয্যাটা পাঠাতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়! বলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন।

সানাইয়ের উৎসব রাগিণী বিদায়ের ব্যথায় কেঁদে থেমে গেল।

শ্রীভূপতি চৌধুরী।

শিখিবার কলা-কৌশল

৩

আমরা দেখিয়াছি, কেহই ভাল করিয়া শোনে না। অনেকেই বদ্-শ্রোতা। মুখা-মুখী কথাবার্ত্তায় আমাদের নিজের কথাই আমরা শুনিতে পাই। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে কখন কখন বক্তা কেবল আমাদের উদ্দেশেই কথা বলেন না—পরন্তু একটি মণ্ডলীর উদ্দেশে কথা বলেন—যে মণ্ডলীর অন্তর্গত আমরাও। সে কিরূপ স্থলে হয়?—না, যখন কোন অধ্যাপক তাঁহার গুরুর আসন হইতে অধ্যাপনা করেন, অথবা কথোপকথন সভার সভাপতি তাঁহার টেবিলের সম্মুখে বসিয়া অভিভাষণ করেন।

বাচনিক শিক্ষার দ্বারা যদি কোন লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে প্রথমে শুনিতে অভ্যাস কর। নচেৎ কিছুই শেখা যাইবে না—সময় বৃথা নষ্ট হইবে।

অনেকেই মনে করে, বিশেষতঃ মেয়েরা মনে করে, কোন বিষয়ে যেখানে ধারাবাহিক শিক্ষা দেওয়া হয় সেই শিক্ষার স্থানে উপস্থিত থাকিলেই শেখা যায়;—তাহাদের দেহ উপস্থিত থাকে বটে কিন্তু তাহাদের মন প্রাচীর টপকাইয়া পলায়ন করে। ধর্ম্মব্যাখ্যানের সময় ভক্তেরা নিদ্রা যাক্—যা ইচ্ছা তাই করুক, সে বিষয়ে তাহারা স্বাধীন। কিন্তু এই শিক্ষার স্থলে আমরা ত এইরূপ অনুমান করিয়া লই, শ্রোতার শুনিবার ইচ্ছা পূর্ণমাত্রায় আছে। তাহা হইলে আমি তাকে একটা অব্যর্থ অভ্যাসের প্রণালী বলিয়া দিতেছি।

প্রথমতঃ ধারাবাহিক অধ্যাপনার সময়, সহজ-বাহ্য লিখিবার সরঞ্জাম সঙ্গে আনিতে হইবে। আজকাল এইরূপ সরঞ্জাম সুন্দররূপে প্রস্তুত হয়। আর এখন দোয়াতের দরকার হয় না। হাতের নীচে লুকানো এক তাড়া শক্ত রকমের কাগজ, আর একটা ভাল ষ্টাইলোগ্রাফ্, বস্, আর কিছু চাই না। ষ্টাইলোগ্রাফের বদলে পেন্‌সিল কেন ব্যবহার করা হইবে না? পেন্‌সিল অপেক্ষা ষ্টাইলোগ্রাফ্ দিয়া লেখা ত আরও কঠিন। তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না? আমার কথা ভাল করিয়া শোনো। পেন্‌সিলের ব্যবহার একটু বেশী মাত্রায় সহজ, একটু বেশী আল্‌সে ধরণের। পেন্‌সিল হাতে থাকিলে, অস্পষ্ট রকম ঢিলেঢালা ভাবে শিখিবার দিকে মন যায়।

এই পেন্‌সিলের জ্যাবড়া লেখা তুমি তখনই পড়িতে পারিবে না। খুব মনোযোগের সহিত না দেখিলে সহসা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু কলমের লেখায় তাহা হয় না। কলমের লেখা ঠিক্ ঠাক্ বাহির হয়; পড়িতে কষ্ট পাইতে হয় না। অতএব অলস পেনসিলকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রমী কলমকে বরণ করিয়া লইবে।

"নোট্"-গ্রহণকারী শিক্ষার্থী এইরূপ ভঙ্গীতে বসিয়া

Stylograp -কলম হাতে, কাণ প্রসারিত করিয়া শ্রবণ। অধ্যাপক তাঁহার আসন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন।

কি টুকিয়া লইতেছ?

প্রথমে, সমস্তই।

সমস্ত, যদি তুমি পার।

অন্তত সমস্ত টুকিয়া লইতে চেষ্টা কর—অধ্যাপনা শেষ হইলে, তাহার সমস্তটাই যাহাতে তুমি পুনর্ব্বার প্রকাশ করিতে পার এইভাবে টুকিয়া লইতে হইবে।

—কিন্তু তাহা অসম্ভব!...... সে ত পশুর প্রণালী!

পশুর প্রণালী? আমার কাছে সবই সমান! আমি যে কাণ ও হাতের জিম্‌ন্যাস্‌টিকে তোমাকে অভ্যস্ত করিতেছি, তাহা সচরাচর জিম্‌ন্যাসটিকের অপেক্ষা বেশী পশুবৎ নহে। আসল কথা, তুমি কতটা সমর্থ তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ; বিষয়ের কাঠিন্যই বা কতটা, আর তোমার বুঝিবার সামর্থ্যই বা কতটা একবার পরিমাণ করিয়া দেখ। আমি বেশ জানি তোমার প্রথম নোট্‌গুলা একটা যাচ্ছে-তাই রকমের একটা হইয়া দাঁড়াবে, "জগা-খিচুড়ী" তাতে ২০ বার খেই হারাইবে, উপদেশ বক্তৃতার কতকগুলা অংশই তাহাতে বাদ পড়িয়া যাইবে! কিন্তু দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় তোমার অধ্যাপকের বাক্য অনুসরণ করিতে তেমন আর হাঁপাইতে হইবে না! তুমি তখন সংক্ষেপ করিবার কৌশলটা আপনা হইতেই উদ্‌ভাবন করিবে—শুধু লেখা সংক্ষেপ করা নয়—(idea) মর্ম্মভাবেরও সংক্ষেপ করিবে। বুঝিতে পারিতেছ? মর্ম্মভাবেরও সংক্ষেপ সাধন করিবে। আসল এইটাই দরকার—শুধু সাঙ্কেতিক-লিপিপদ্ধতি অবলম্বনে লেখা সংক্ষেপ করিলেই চলিবে না। বক্তার কথিত বাক্যের কোন্ অংশটা খুব দরকারী, তাহা চল্‌তি বক্তৃতার মুখে নির্ণয় করিয়া তাহাই কলমে লিপিবদ্ধ করা; এবং তাহার পর, সমস্ত বাক্যটা পুনর্ব্বার গড়িয়া তোলা; তাঁহার বক্তৃতার খুব-দরকারী বিভাগগুলা (বক্তা নিজে

উপদেশ-কথাগুলা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ঘসিয়া-মাজিয়া কালী-কলমে উহার কঙ্কালটা শুধু বজায় রাখা;—তখন এইদিকেই তোমার চেষ্টার গতি হইবে। অভ্যাস ভিন্ন এরূপ করা যাইতে পারে না; এ স্থলে সাঙ্কেতিক সংক্ষেপ-লিপি কোনও কাজে আসে না। বরং ইহাতে আরও অনিষ্ট হয়; শিক্ষার্থী অনির্দ্দেশ্যভাবে সমস্তই টুকিয়া লইবে—হয়ত না বুঝিয়া-সুজিয়া যন্ত্রবৎ যথাশ্রুত টুকিয়া লইবে। এই দোষ এড়াইবার জন্যই (সমস্ত টুকিয়া লওয়া অসম্ভব) "পশুর মত" আবার সমস্তটা পুনঃ প্রকাশ না করিয়া, অধ্যাপক বিবৃত শিক্ষার বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করিতে শিক্ষার্থীর অভ্যাস করিতে হইবে।

যদি শিক্ষার্থী বুদ্ধিমান হয় এবং যদি পাঠে তাহার অভিনিবেশ থাকে—তাহা হইলে তাহার নোটের প্রাচুর্য্য ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে, কিন্তু নোটগুলা আরও বেশী গোছালো হইবে—আরও বেশী সংশ্লিষ্ট হইবে, উপদেশের মর্ম্মভাবটা সারাংশটা আরও বেশী ব্যক্ত করিতে পারিবে। তখন এই আনন্দজনক ব্যাপারটা তাহার উপলব্ধি হইবে;—সে দেখিবে, যুগপৎ বিশ্লেষণের দ্বারা (শুনিয়া) এবং সংশ্লেষণের দ্বারা (লিখিয়া) সে শিক্ষার বিষয়টা শিখিয়া ফেলিয়াছে। যাহা শিখিয়াছে, তাহা অবশ্য তাহার মনেও থাকিবে; মনে আনিবার জন্য তাহার আর কিছুই করিতে হইবে না, শুধু নোট্‌গুলা আবার একবার পড়িতে হইবে,—সেই নোটকরা কাগজের একটা পৃষ্ঠা কিংবা কতকগুলা পৃষ্ঠা পড়িলেই হইবে। লেক্‌চার শুনিবার সময় যেরূপ শ্রম করিতে হইয়াছিল, আবার উন্টা প্রণালী ক্রমে নোট দেখিয়া লেক্‌চারটা লিপিবদ্ধ করিবার সময় পুনর্ব্বার সেই শ্রম করিতে হইবে। এই কাজটা স্বয়ং-চালিত যন্ত্রের মত সহজ হইয়া যাইবে।

শেখা কী সহজ যদি প্রণালীপূর্ব্বক শেখা যায়, আর যদি ঠিক্ যে মুহূর্ত্তটা খুব ফল-প্রদ সেই মুহূর্ত্তেই একটু প্রয়াস স্বীকার করা যায়! বাচনিক শিক্ষার স্থলে, এই মুহূর্ত্তটা পরে আসে না, পাঠের সময়ের মধ্যেই আসে। এই সত্যটা অধিকাংশ শিক্ষার্থীই উপেক্ষা করিয়া থাকে।

পর বই পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাহা হইলে, অধ্যাপকের লেক্‌চার শুনিয়া কী লাভ ?

*

* *

এই ধরণের শোনাটা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে, যদি কোনদিন কোন কারণে শিক্ষার্থী নোট লিখিবার সরঞ্জাম হইতে বঞ্চিত হয়, তখন লেক্‌চার শুনিয়া বাহির হইবার সময় দেখিতে পাইবে যে সে সমস্ত সরঞ্জাম না থাকা সত্ত্বেও তাহার নোট নেওয়া হইয়া গিয়াছে—তাহার মাথার ভিতরে। বাড়ী আসিয়া শিক্ষার্থী একটা কলম লইয়া, পোয়াঘণ্টার মধ্যেই, লেক্‌চারের পরিকল্পনাটা আবার গড়িয়া তুলিবে। এটা চমৎকার অভ্যাস। এইবার সে বলিতে পারিবে, সে একজন পরিপক্ক শ্রোতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবশ্যক হইলে বিনা নোটে কেমন করিয়া শুনিতে হয় তাহা জানা আবশ্যক। যেমন মনে কর, আলোচনা-সভায় (conference)। আলোচনা শিক্ষার একটা আধুনিক প্রণালী। এখানে লিখিবার সরঞ্জাম আনা দস্তুর নহে ; কলম থাকে শ্রোতাদের টুপির মাথায়। ঐখানে তাহার কলম তাহার প্রতিশোধ লইয়া থাকে।

আমি আমার কথা প্রসঙ্গে কন্‌ফারেন্‌সের কথা একবার উত্থাপন করিয়াছিলাম—এইখানে মুহূর্ত্তের জন্য থামা যাক—তাহার পর ইহার উল্লেখও আর করিব না।

আলোচনা-সভা আমি খারাপ মনে করি না। আমি আলোচনা-সভা করিয়াছি, পরেও করিব। কেবল আমার মনে হয়, খুব ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া উহা ব্যবহার করা আবশ্যক। কনফারেন্‌সে কন্‌ফারেন্‌সে কি ভেদ তাহা জানা দরকার, নচেৎ উহা বিপদজনক হইয়া দাঁড়ায়। যেমন মনে কর, একথাও কল্পনা করিলে চলিবে না যে, শ্রোতৃবর্গ নিজগৃহে অধ্যয়ন না করিয়া এই সভাতে আসিয়াই শিক্ষা করিবে,—গৃহ-শিক্ষার স্থান সভাই অধিকার করিবে। আর কিছু না হোক, কন্‌ফারেন্‌সের শিক্ষাকে একটা সুখের জিনিষ বলা যাইতে পারে, ইহাতেও কিছু কাজ হইতে পারে। ঐখানে চঞ্চলমতি শিক্ষার্থীদের মাথার ভিতর, জ্ঞানের যে সব টুক্‌রা ভূষিতে যারা সন্তুষ্ট তাহাদিগকে খড়-ভূষিই দেওয়া হোক্। কিন্তু জয় হোক জ্ঞানের পদ্ধতির, বিদ্যাবুদ্ধি অর্জ্জনের পদ্ধতির, চিত্তোৎকর্ষ সাধনের পদ্ধতির !—এই পদ্ধতি যদি মুষ্টিমেয় লোকের জন্য অবধারিত হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই।

আলোচনা সভার নামে, সভা আহ্বান-কর্ত্তা যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন তাহার ভিতর নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্য প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। বিপদ এইখানে। বিপদের শুধু আশঙ্কামাত্র নয়, কোন কোন কথোপকথন-সভার নিশ্চিত অনিষ্ট হইয়া থাকে। নির্ব্বাচিত বিষয়গুলা হইতে নিতান্ত হাস্যজনক অসঙ্গত জিনিসও বাদ পড়ে না। বিশেষত জনসাধারণকে বিস্ময়ের দ্বারা আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশেই সভাকর্ত্তা প্রায়ই বিষয় নির্ব্বাচন করেন। অনেক আলোচনা-সভা তাড়াতাড়ি গঠিত হয় ; সেই সুখের হাটে কেবল কতকগুলা খুচ্‌রামাল বিক্রী করা হয়···যে সভাকর্ত্তা খ্যাতনামা ও ধর্ম্মভীরু, বেশ "উৎরাইয়া যাইবার" লোভে যাহা নিতান্ত দরকার সেই সংযমকে বিসর্জ্জন দিবার দিকে প্রায়ই তাঁহারও প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝামাঝি-রকমের অধ্যয়নশীল জনসাধারণকে তিনি পরিতুষ্ট করিতে চান, যেন-তেন প্রকারেণ তাহাদিগকে আমোদ দিতে চান। কিন্তু, যেমন Alembert বলেন—গণিত বিদ্যার কোন রাজ-পথ নাই, এস্থলেও তদ্রূপ। প্রিয় পাঠক,ভাল আলোচনা-সভায় গিয়া শিক্ষণীয় বিষয় শ্রবণ করা, বিশেষত আলোচনা-সভা আহ্বান করা বড়ই শক্ত।··যে সভায় jean Pichepin গ্রীক সাহিত্য ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই সভাই আমার মনে হয় আদর্শ-আলোচনা-সভা।

শিক্ষক-প্রদত্ত শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা এইখানে শেষ হইল।

*

* *

শিক্ষার আর একটা বড় প্রণালী হচ্চে—পুস্তক। শিক্ষক অপেক্ষা কম প্রাচীন, কম অখণ্ডতা বিশিষ্ট—উদ্ভাবনা অপেক্ষা কম একান্ত প্রয়োজনীয় কম অব্যবহিত—এই

প্রকাশ্য-শিক্ষার প্রতীক ; কেবল ইচ্ছা করিলেই পুস্তক সর্ব্বজন অধিগম্য হইতে পারে। আমার অন্য এক গ্রন্থে বলিয়াছি যে, কতকগুলি কারণ বশতঃ শিশুদের শিক্ষায়, পুস্তকটা একটু দেরীতে প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক। শিশুদের পড়িতে শিখিবার বয়স ৭ বৎসর আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম—প্রায় ৮ বৎসর হইতে পুস্তকের দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ করা উচিত। শিশুদের সম্বন্ধে এখানে আমি আর কিছু বলিব না। যারা পুস্তকের সহিত আগেই সুপরিচিত তাহাদের সম্বন্ধেই এখানে আমার বলিবার কথা। যেরূপ, শিক্ষকের সুব্যবহার কিরূপ করিতে হয় ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেইরূপ পুস্তকের সদ্ব্যবহার কিরূপে করিতে হইবে এইখানে তাহার আলোচনা করিব।

শিক্ষক অপেক্ষা পুস্তকের সমধিক হীনতা আমরা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি ; পুস্তক হচ্চে অকর্ম্মক, আর শিক্ষক হচ্চে সকর্ম্মক। কার্য্যকারিতার হিসাবে পুস্তক শিক্ষকের সমান হইতে পারে না। পুস্তক শিক্ষার্থীকে দেখিতে পারে না, শিক্ষার্থীর কাছে যাইতে পারে না, তাহাদের আকর্ষণ করিতে পারে না, শিখিবার ইচ্ছাটা তার মনে আনিয়া দিতে পারে না, শিখিবার ইচ্ছাটা তাহার উপর চাপাইতে পারে না। পুস্তক, শিক্ষার্থীর জড়তা, বিশৃঙ্খলা, সময়ের অপব্যবহার উপেক্ষা করে—সহিয়া যায়। শিক্ষার্থী উদ্যমশীল হইলেও, শিখিতে ইচ্ছুক হইলেও, পুস্তক তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে পারে না! শিক্ষার্থী যখন কোন বিষয়ে ইতস্তত করে, ব্যক্তিগত কারণে কোন-কিছু ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তখন পুস্তক তাহাকে সুপরামর্শ দিতে পারে না। কোন একটা জায়গা শিক্ষার্থীর নিকট দুর্ব্বোধ্য হইলে, জীবন্ত শিক্ষকের মত, পুস্তক তাহার ভাষার কোন বদল-সদল করিতে পারে না, একটা নূতন দিক দিয়া তাহাকে বুঝাইতে পারে না। পুস্তক অপরিবর্ত্তনীয়।

কিন্তু আর এক হিসাবে, শিক্ষক অপেক্ষা পুস্তকের বেশী সুবিধা। প্রথমত পুস্তক ধ্রুবনিত্য ; কোন উত্তম শিক্ষক যদি নিত্যধর্ম্মী পুস্তকের হস্তে শিক্ষার ভার দিয়া না যান—তাহা হইলে, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শিক্ষারও

অনেক শিক্ষার্থীকে শিখাইতে পারে। ব্যাপকতা নিত্যতা—এই দুইটা গুণ বড় কম নহে। Lhomond-এর প্রণীত "ল্যাটিন্ ব্যাকরণের" যত ছাত্র, তত ছাত্র তাঁহার আছে বলিয়া কি কোন শিক্ষক গর্ব্ব করিতে পারেন ?

একথা সত্য, পুস্তক শিক্ষার্থীর কথায় প্রতিবাদ করিতে পারে না। কিন্তু, ঠিক সেই জন্যই, পুস্তক শিক্ষার্থীকে স্বাধীনবুদ্ধি চালনার একটু বেশী অবসর দেয়। শিক্ষার্থী কোন কিছু নিজে খুঁজিয়া বাহির করিতে অভ্যস্ত হয়। উত্তম শিক্ষানবীশিতে যাহা অপরিহার্য্য বলিয়া পূর্ব্বে সূচিত হইয়াছে, সেই উদ্ভাবনের রুচি তাহার চিত্তে উৎপন্ন হয়। রাজরাজড়ার শিক্ষার যে বদ-অভ্যাসের কথা, যে প্রধান দোষের কথা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছিলাম তাহা মনে আছে ত ? সেই মহামহিম রাজকুমারের সারা যৌবনকালটা কতকগুলি পরিশ্রমী সাহায্যকারী লোক তাঁহার হইয়া জ্ঞানের খাদ্য চর্ব্বন করিয়া দিয়াছে। তাহার ফলে, সেই মহামহিমের দন্তপংক্তি ভুলিয়া গিয়াছিল কিরূপে চর্ব্বণ করিতে হয়।

শিক্ষক অপেক্ষা পুস্তকের তৃতীয় সুবিধাটি এই !—পুস্তক সহিষ্ণু ; সেরূপ সহিষ্ণুতা কোনও রক্ত-মাংসে গঠিত শিক্ষকের থাকিতে পারে না। শিক্ষা কতদূর এগাইল তাহা পরিমাণ করিবার জন্য পুস্তক টেবিলের উপর ঘড়ি রাখে না। পুস্তকের শিক্ষা অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও, পুস্তক যতবার ইচ্ছা পুনরারম্ভ করিতে প্রস্তুত থাকে। পুস্তকের এই পুনরাবৃত্তির ধৈর্য্য, শিক্ষকের ভাষা বদলাইবার শক্তির তুল্যমূল্য। ইহাতে করিয়া শিক্ষার্থীর স্বাধীন বুদ্ধি খেলিতে পায়। পুস্তকই (শিক্ষক নহে) নূতন পথ দিয়া শিক্ষার্থীর মনের ভিতর প্রবেশ লাভ করে।

পরিশেষে কর্ত্তব্য—ভাল গ্রন্থ দুর্লভ হইলেও, উহা খুব সহজেই পাওয়া যাইতে পারে ; এবং উত্তম শিক্ষক অপেক্ষা, উত্তম পুস্তক ব্যবহার করা সহজ। শিক্ষক অপেক্ষা পুস্তকের এই শ্রেষ্ঠতাটা এতই বড় জিনিস যে আমাদের কালে, বিনা-প্রতিবাদে শিক্ষার উপায়-স্বরূপ পুস্তকই সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আধুনিক জ্ঞানানুশীলনের মধ্যে,

সমস্তেরই জন্য পুস্তকই দায়ী। কেননা, এমন কতকগুলি গ্রন্থও আছে যাহারা কু-শিক্ষক ; এবং কোনো পুস্তক উৎকৃষ্ট হইলেও, উহার অপব্যবহার বা অ-ব্যবহার হইতে পারে। পুস্তকের দ্বারা শিক্ষা—যাহা এর ২০শ শতাব্দীর একটা বড় জিনিস—সেই শিক্ষার সংক্ষিপ্ত প্রণালীটি এই :—

উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছাড়া আর কোন গ্রন্থ ব্যবহার করিবে না, এবং কিরূপভাবে উহার ব্যবহার করিতে হইবে তাহা জানা আবশ্যক।

*

* *

উৎকৃষ্ট পুস্তক কাহাকে বলে ? তাহা কিরূপে আবিষ্কার করা যায় ?—কি চিহ্ন দেখিয়া চেনা যায় ? (এখানে কেবল শিক্ষা-পুস্তকের কথাই ধরা হইতেছে।)

এক্ষণে, বাদ দিতে-দিতে অগ্রসর হওয়া যাক্।

প্রথমেই আমরা অতিদীর্ঘ ও প্রকাণ্ড বড় গ্রন্থগুলাকে বাদ দিব। একজন পাঠকের হস্তায়ত্ত বিশেষতঃ শিক্ষার্থী পাঠকের হস্তায়ত্ত সময়ের একটা সীমা আছে, পাঠে মনোনিবেশ করিবারও একটা সীমা আছে, তাহার ধীশক্তি ও তাহার স্মৃতিশক্তিরও একটা সীমা আছে। যে গ্রন্থ কার্য্যতঃ অফুরন্ত সে গ্রন্থ তাহার উপযোগী নহে। এবং যিনি অতিদীর্ঘ কোন শিক্ষা-গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তিনি গোড়াতেই তাঁহার অযোগ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

(যে-সকল ইতিহাস-গ্রন্থ উচ্চবিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয় তাহা প্রায়ই অতিদীর্ঘ—উহা না খুলিয়াই একদম বর্জ্জন করিতে হইবে।

তারপর আমরা বাদ দিব সেই সব গ্রন্থ যাহা পড়িতে বিরক্তি বোধ হয়। দর্শন শাস্ত্রকে ত্রিপদী কবিতায় পরিণত করিবার কথা কিংবা ভৌতিক বিদ্যাকে গাথায় নিবদ্ধ করিবার কথা এখানে হইতেছে না ; আমার বক্তব্য এই—যে কোন শিক্ষাপুস্তকই হোক্ না কেন, বিরক্তিজনকতা দোষ থাকিলে উহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। বিরক্তিজনক গ্রন্থ নির্ব্বোধ লোকেরই গ্রন্থ। কারণ, গ্রন্থকার যদি নির্ব্বোধ না হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার জানা থাকিত জানা সত্বে যদি তাঁহার গ্রন্থ বিরক্তিকর হয়, তাহা হইলেও প্রমাণ হইবে তিনি নির্ব্বোধ।

পরিশেষে, শক্ত বইগুলা বাদ দেওয়া যাক্। কোনো কঠিন শিক্ষার বই সব সময়েই যে নির্ব্বোধের রচনা তাহা নহে কিন্তু সব সময়েই উহা ভ্রান্তবুদ্ধির রচনা। গ্রন্থকার খুব পণ্ডিত হইতে পারেন কিন্তু হয়ত তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে তিনি শিক্ষা দিতে বসিয়াছেন, আর শিক্ষা দিতেছেন মাঝারিবুদ্ধিবিশিষ্ট ছাত্রদিগকে। আসলে, তিনি নিজের জন্য লিখিয়াছেন, শিক্ষার্থীর জন্য নহে।

আধুনিক শিক্ষা-গ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্তাদের এই দোষটি প্রায়ই দেখা যায়। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে বিদ্যানুরাগের পরিচয় দেন, কিন্তু শিক্ষাদিবার অনুরাগটা তাহাতে বড় একটা দেখা যায় না। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের (আমি যে অর্থে বলিতেছি) জন্য এইরূপ নির্দ্দোষ গ্রন্থের সংগ্রহ অতীব বিরল।

এইরূপে, আমরা দীর্ঘ, বিরক্তিজনক ও কঠিন শিক্ষা পুস্তকগুলা একদম্ বাদ দিলাম। কিন্তু কোন পুস্তক ছোট হইতে পারে, সহজ হইতে পারে অথচ তাহার কোনো সারবত্তা না থাকিতে পারে, উহা নিতান্ত মাঝারি রকমের শিক্ষকের কাজ হইতে পারে। যে সব পুস্তক অতিদীর্ঘও নহে, বিরক্তিজনকও নহে, কঠিনও নহে, তাহাদের মধ্যে হইতেও ত বাছিয়া লওয়া দরকার। যে শুধু শিক্ষানবীশ, সে কেমন করিয়া তাহা নির্ব্বাচন করিবে ? শিক্ষকের নির্ব্বাচন যে প্রকারে করা হয় ইহাও সেই প্রকারে করিতে হইবে।

ইহার একমাত্র যুক্তিমূলক উপায়—দীর্ঘতা, বিরক্তিজনকতা দুরূহতা এই তিন বর্জ্জনীয় জিনিস দৃঢ়তা সহকারে বাদ দিয়া তাহার পর নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি যে বিষয় অধ্যয়ন করিতে চাও সেই বিষয় সম্বন্ধে তোমাকে পরামর্শ দিতে পারেন, তোমায় নির্ব্বাচনের পথ বাৎলাইতে পারেন—এরূপ যোগ্য লোক মেলা নিতান্ত দুর্ঘট নহে। আর যদি সত্যই এরূপ কোন যোগ্য ব্যক্তির সহিত তোমার পরিচয় না থাকে, তাহা হইলে, একজন

সেই জিনিসের ভালমন্দ বিচার করিতে আপনাকে অযোগ্য মনে করে এবং যদি সেই সম্বন্ধে পরামর্শ দিবারও কোন লোকও তাহার না থাকে, তখন সে যে পন্থা অবলম্বণ করে তুমি তাহাই কর। ঐ বিবেচক ব্যক্তি কিরূপ পন্থা অবলম্বন করে? সে "মার্কা-মারা" জিনিস ক্রয় করে। তাহার ভুল হইতেও পারে। কিন্তু সেই এইরূপে ভ্রম-সম্ভাবনাগুলাকে নিম্নতম সংখ্যায় পরিণত করে। Michelet প্রণীত "ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার" একটা মার্কা-মারা গ্রন্থ। Lhomond-প্রণীত ল্যাটিন্ ব্যাকরণ (পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি)। ইহাও একটা মার্কামারা গ্রন্থ—আজকাল ক্লাসে যে সকল ব্যাকরণ ব্যবহার হয়—তাহাদের মধ্যে অনেকের অপেক্ষাই ইহা অতি-উৎকৃষ্ট। "বিশ্বজনীন ইতিহাস সম্বন্ধে ধারাবাহিক পাঠ"—প্রভৃতিও মার্কামারা গ্রন্থ··

ভাল শিক্ষার গ্রন্থ নির্ব্বাচিত হইলে পর উহা ভাল করিয়া কিরূপে পড়িতে হয়—এই কথার আলোচনা এখন অবশিষ্ট রহিল। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইহার আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সঙ্কলন

নৈতিক শিক্ষা না স্বাস্থ্যরক্ষা?

আমাদের এতদ্দেশের ছাত্রমণ্ডলীকে বাঁচাইতে হইলে শুধু বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিলে চলিবে না, তাহাতে সুফল দর্শিলেও তাহা নিতান্তই সামান্য, অল্পসংখ্যক ছাত্রই তাহা গ্রহণের অধিকারী হইবে। আমার মতে এবং এ সম্বন্ধে যে সব চিন্তাশীল ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ হইয়াছে তাঁহাদেরও মতে নৈতিক শিক্ষার বাঁধা-ধরা নিয়ম ছাড়িয়া দিয়া প্রথমতঃ ছাত্রদের ভিতর হইতে আলস্যজড়তা বিদূরিত করিতে হইবে। শ্রমবিমুখ ছাত্রকেই অধিক কুপথগামী দেখা যায়। ক্রীড়ায় যাহাদের আসক্তি আছে, প্রলোভনে বিপথগামী হইলেও, তাহাদের জীবন-শক্তি একেবারে নষ্ট হয় না। সেই জন্যই শ্রমজনক কোন সৎকার্য্যে আমরা তাহাদেরই সাহায্য পাই। নষ্টচন্দ্রে তাহারা দৌরাত্ম্য করিলেও কলেরা-বসন্তে শব-দাহের দরকার হইলে তাহারাই সর্ব্বাগ্রে কোমরে কাপড় বাঁধে। এই শ্রেণীর ছাত্রগণই সরস্বতী পূজায় স্কুল-গৃহ সাজাইতে অগ্রগামী হয়, স্কুলের সম্মান বজায় রাখিতে তাহারাই অনেক সময় প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত হয়। ক্রীড়া-কৌতুকে ইহারাই প্রাণ-খোলা হাসি-আনন্দে সজীবতার লক্ষণ দেখাইয়া থাকে। সেই-জন্যই বলিতেছি, ইহাদিগকে শ্রমসাধ্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত না করিতে পারিলে ইহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি বিপথেই ব্যয়িত হইবে। ছেলে-দিগকে আমরা নৈতিক শিক্ষাদ্বারা সাধু করিব এই ভাব মনে পোষণ না করিয়া ইহাদের অন্তর্নিহিত দুই একটী সুপ্ত সৎগুণকে আমরা জাগাইয়া তুলিব, এইরূপ ভাবিয়া কাজ করিলে তাহাতে সুফলের আশা অধিক করা যাইতে পারে। নানারূপ ক্রীড়ার দিকে ছেলেদের আসক্তি বাড়াইতে পারিলে—তাহাদিগকে একটু কর্ম্মঠ করিতে পারিলে—পাপ জীবনীশক্তি একেবারে নষ্ট হইতে দিবে না। দুর্ব্বলমস্তিষ্ক বালকদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কহিয়াছেন—"গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্ত্তী হইবে।" অন্য দেশের ছাত্রমণ্ডলীর অধিকাংশই যে নীতিবান্ এ কথায়ও আমি আস্থা স্থাপন করিতে পারি না, তবে এদেশের মত তাহাদের অধিকাংশেরই যে জীবনীশক্তি নষ্ট হয় নাই, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এদেশের ছাত্র যেমন অল্প বয়সে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে, তেমনি অতি অল্প বয়সে বিপথগামীও হইয়া থাকে। কলিকাতা নগরীর কতিপয় কলেজের ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যে নৈরাশ্যব্যঞ্জক রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতেই ছাত্রমণ্ডলীর দুর্দ্দশার একটী উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। এইভাবে যদি ছাত্রমণ্ডলীর দিন দিন তনু ক্ষীণ হইতে থাকে, তাহা হইলে অদূর-ভবিষ্যতে এজাতির অস্তিত্ব থাকিবে কিনা, অঙ্কপাত করিয়া দেখিলেই তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য দেশে সুপ্রজনন-বিদ্যাচর্চ্চাশীল ব্যক্তিরা দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কত মাথা ঘামাইতেছেন, আর "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!" এই কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গিবে না, যতদিন না পরিত্রাণায় সাধুনাম্, —আবার কেহ আবির্ভূত হন। আমার বিশ্বাস, এখন এদেশের শিক্ষা বন্ধ রাখিয়া কিয়দ্দিন ছাত্রদিগকে শুধু ব্যায়াম-চর্চ্চায় নিযুক্ত রাখা কর্ত্তব্য শরীরটা ইহাদের সাম্যের পথে না আসিলে ইহাদের দ্বারা কোন কর্ম্মেই সাফল্যের আশা করা যাইবে না, শিক্ষা-দীক্ষা ত দূরের কথা! প্রাচীন গ্রীস দেশের ছাত্রগণকে কিছুদিন সৈনিক-জীবন যাপন করিতে হইত। শরীর-রক্ষাই তাহাদের প্রধান ধর্ম্ম ছিল।

এদেশের ছাত্রদেরও বৎসরে অন্ততঃ

বাধ্য করিলে এদেশেরও নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হইতে পারে। এসম্বন্ধে শিক্ষাবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের চিন্তা করিয়া একটা পথ নিরূপণ করা কর্ত্তব্য, এবং এজন্য সরকার বাহাদুরেরও সহানুভূতি ও সাহায্য লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে অন্ততঃ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ব্যায়াম-চর্চ্চার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ইহাকেই আমি বলিব, নৈতিক শিক্ষা—ইহাই সকল শিক্ষার সার। ছাত্রগণ প্রতিদিন যাহাতে শরীরের সামর্থ্যানুসারে কিয়ৎকাল ব্যায়াম চর্চ্চা করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করিতে হইবে, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের প্রচলিত ড্রিল-কসরতেও উপকার হইতে পারে—যদি তাহা নিয়মিতরূপে করিবার বন্দোবস্ত করা হয়। হাডুডুডু, দাঁড়িয়া-বাঁধা, প্রভৃতি এদেশীয় খেলাগুলি স্বাস্থ্যের খুব অনুকূল হইলেও ছেলেদের কেন জানি না সেদিকে আসক্তি জন্মে না। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, প্রভৃতি খেলায় বেশী প্রতিযোগিতার ভাব আছে বলিয়া ছেলেরা এসব খেলার প্রতিই বেশী আসক্ত বলিয়া মনে হয়। ফুটবল খেলাটিতে বেশ ব্যায়াম হয়, কিন্তু ইহাতে শ্রমের মাত্রা অতিরিক্ত হয় বলিয়া অনেক সময় তাহা বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সময়ের মাত্রাটা কিছু কমাইয়া দিলে এরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকে না। ১৫ মিনিট খেলার পর ১৫ মিনিট বিশ্রাম এবং তৎপর আবার ১৫ মিনিট খেলা এদেশের সকল বালকেরই উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য বৈদেশিক ক্রীড়ায় সকলের সমভাবে তেমন শ্রম জন্মে না বলিয়া তাহাতে তত উপকার নাও দর্শিতে পারে। প্রতি বিদ্যালয়ে ছেলেদের জন্য একটা ব্যায়াম-আগার করিয়া ডনকুস্তির ব্যবস্থা করিলে উপকারের আশা করা যায়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, প্রতিযোগিতার অভাবে-হেতু এই খেলায়ও ছেলেদের তেমন অনুরক্তি জন্মে না। তবে বাধ্যবাধকতামূলক হইলে ইহা ফলপ্রসূ হয় কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। বিদ্যালয়ে ক্রীড়ার সময় একজন সুদক্ষ শিক্ষকের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। ইহাতে একদিকে যেমন খেলার শৃঙ্খলা সুরক্ষিত হয়, অপর দিকে অন্য কোনরূপ অন্যায় আচরণ প্রশ্রয় পাইতে পারে না। শিক্ষকগণ খেলায় উপস্থিত না থাকার দরুণই উচ্ছৃঙ্খল বালককেও কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু বিপথগামী অলস বালক-দের রক্ষার উপায় একেবারেই নাই, তাহারা দিনদিনই অধঃপতনের চরম সীমায় গমন করে।

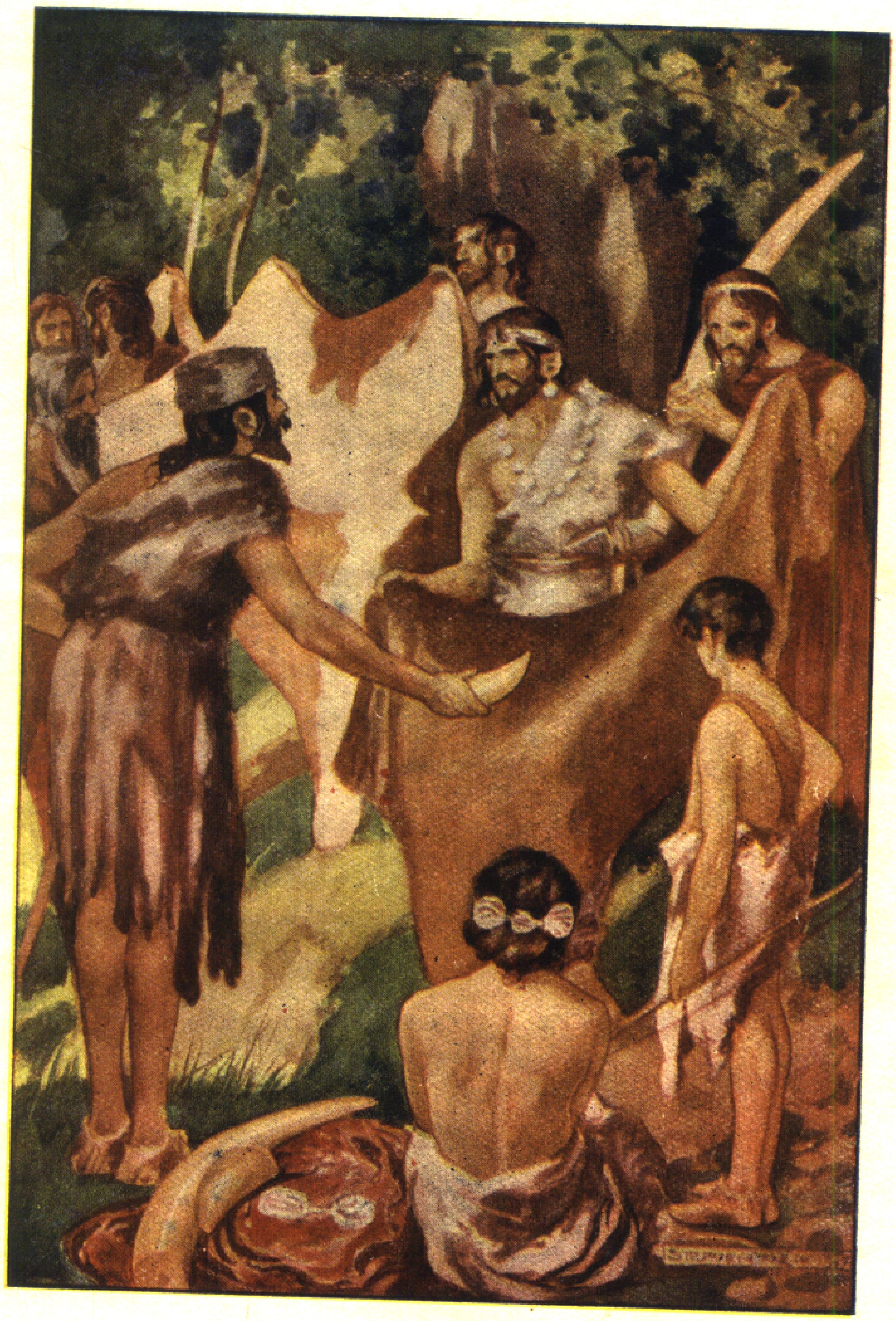
বিদ্যালয়ের ছুটী হইতে না হইতেই ছেলেরা ক্ষুৎপীড়িত হইয়া পড়ে, কাজেই এসময় তাহাদিগকে কোন খেলায় প্রবর্ত্তিত করা যুক্তিসঙ্গত নহে, এই অজুহাতে অনেকে ছুটির পর খেলা বা ড্রিল-কসরতের পক্ষপাতী নহে। কিন্তু বাড়ীতে পৌঁছিয়াও অভুক্ত অবস্থায় আবার খেলায় ... এমন বালকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। জলখাবার খাওয়া-না-খাওয়াও অনেকটা অভ্যাসের উপরই নির্ভর করে। যাহারা জলখাবার খাইতে অভ্যস্ত, তাহারা ইচ্ছা করিলে স্কুলে মুড়ি-মুড়কি প্রভৃতি কোন রকম খাবারের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারে। স্কুলে মিঠাইয়ের দোকান হইতে কোনরূপ মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণের মোটেই আমি পক্ষপাতী নই। এরূপ দোকান থাকায় ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী হয়—যদিও স্কুলবিভাগের কর্ণধারগণ ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন স্কুলের ছুটির পর এক পয়সার মুড়ি ও অর্দ্ধ পয়সার বাতাসায় যতদূর ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, দুই চারি আনার মিঠাই-মণ্ডায় তাহা হয় কি না, সন্দেহ। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়া স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে ছেলেদের এমন সামান্য জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া তাহার মূল্যটা ছেলেদের বেতনের সহিতই আদায় করিয়া লইতে পারেন। নিতান্ত যে সব ছেলে এরূপ সামান্য পয়সা দিতে না পারিবে, তাহাদের জন্য দরিদ্র ভাণ্ডারের একটা বন্দোবস্ত করিলেও মন্দ হয় না। ছাত্রগণ দলবদ্ধ হইয়া অল্পকাল কায়িক পরিশ্রম করিলেও কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে, তদ্দ্বারা একটা দরিদ্র ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠাও দুঃসাধ্য ব্যাপার নহে। যাহা হৌক মোটের উপর আমার বক্তব্য এই যে ছেলেদের মেরুদণ্ড আগে সোজা করিতে চেষ্টা করা যাউক, তারপর নৈতিক মেরুদণ্ড আপনা আপনিই সোজা হইয়া আসিবে।

শিক্ষক, ভাদ্র ১৩৩০।

গান

তোমার বীণায় গান ছিল, আর
আমার ডালায় ফুল ছিল গো।
একই দখিন হাওয়ায় সেদিন
দোঁহায় মোদের দুল দিল গো।
সেদিন সে ত জানেনা কেউ
আকাশ ভরে' কিসের সে ঢেউ,
তোমার সুরের তরী আমার
রঙীন ফুলে কূল নিল গো।
সেদিন আমার মনে হ'ল
তোমার তানের তাল ধরে'
আমার প্রাণে ফুল ফোটানো
রইবে চিরকাল ধরে,
গান তবু ত গেল ভেসে
ফুল ফুরাল দিনের শেষে,
ফাগুন-বেলায় মধুর খেলায়
কোন্‌খানে হায় ভুল ছিল গো!

শান্তিনিকেতন, আষাঢ়, ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



বিকি-কিনি

(প্রাচীন ভারত)

আকাশ-তলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায়
আয়, আয়, আয়,
জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই
যাই, যাই, যাই।
উড়ে যাওয়ার সাধ জাগে তার পুলক-ভরা ডালে
পাতায় পাতায়।
নদীর ধারে বারে বারে মেঘ যে ডেকে যায়
আয়, আয়, আয়,
কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই
যাই, যাই, যাই।
মেঘের গানের তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে
পাল তোলা পাখায়।

প্রাচী, ভাদ্র ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার আঁধার ভাল,—আলোর কাছে
বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে।
আলোরে যে লোপ করে খায়
সেই কুয়াসা সর্ব্বনেশে।
অবুঝ শিশু মায়ের ঘরে
সহজ মনে বিহার করে,
অভিমানী জ্ঞানী তোমার
বাহির দ্বারে ঠেকে এসে॥
তোমার পথ আপনায় আপনি দেখায়,
তাই বেয়ে, মা, চল্‌ব সোজা।
যারা পথ দেখাবার ভিড় করে গো
তারা শুধু বাড়ায় খোঁজা।
যারা ডেকে আনে পূজার ছলে
এসে দেখি দেউল-তলে
আপন মনের বিকারটাকে
সাজিয়ে রাখে ছদ্মবেশে॥

কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি
আঁধার তোমার সবই মিছে।
ভরসা কি তোর পাস্‌নে শুধু?
না হয় আমায় রাখ্‌বি পিছে॥
আমায় দূরে যেই তাড়াবি,
সেই ত ওরে তোর কাজ বাড়াবি,
তোমায় নীচে নামতে হবে

বাচাই করে নিবি মোরে
এই খেলা কি খেলবি ওরে?
যে তোর হাত জানে না মারকে জানে
ভয় জেগে রয় তাহার প্রাণে
যে তোর মারকে ছেড়ে হাতকে দেখে
আসল জানা সেই জানিছে॥

উপাসনা, ভাদ্র ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অগ্নিশিখা এস এস আনো আনো আলো!
দুঃখে সুখে ঘরে ঘরে গৃহদীপ জ্বালো।
আনো শক্তি, আনো দীপ্তি,
আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি
আনো স্নিগ্ধ ভালবাসা আনো নিত্য ভালো।
এস পুণ্যপথে বেয়ে এস হে কল্যাণী!
শুভ সুপ্তি শুভ জাগরণ দেহ আনি।
দুঃখ রাতে মাতৃবেশে
জেগে থাকো নির্নিমেষে
আনন্দ-উৎসবে, তব শুভ্র হাসি ঢালো॥

শান্তিনিকেতন, ভাদ্র ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কদম্বেরি কানন ঘেরি
আষাঢ় মেঘের ছায়া খেলে।
পিয়ালগুলি নাটের ঠাটে হাওয়ায় হেলে।
বরষণের পরশনে
শিহর লাগে বনে বনে,
বিরহী এই মন যে আমার
সুদূর-পানে পাখা মেলে।
আকাশ-পথে বলাকা ধায়
কোন সে অকারণের বেগে,
পূব হাওয়াতে ঢেউ খেলে যায়
ডাবার গানের তুফান লেগে।
ঝিল্লিমুখর বাদল সাঁঝে
কে দেখা দেয় হৃদয় মাঝে,
স্বপনরূপে চুপে চুপে
ব্যথায় আমার চরণ ফেলে।

শান্তিনিকেতন, ভাদ্র ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লঙ্কা ও সিংহল

"সিংহল" ও "লঙ্কা" এই দুইটী নাম আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতবাসীরাই যে উক্ত নামদ্বয়ের জন্মদাতা তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই। পরন্তু উক্ত নামদ্বয়ের নামী এক কি দুই তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কতকগুলি আধুনিক লোক একত্রিত হইয়া বলেন, লঙ্কা ও সিংহল এক। পূর্ব্বে যাহা লঙ্কা নামে প্রখ্যাত ছিল—তাহাই এক্ষণে সিংহল বা সিলোন্। পরন্তু সে কল্পনার মূল যে কি, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।

মহাভারতের সভা-পর্ব্বে উক্ত নামদ্বয় পাওয়া যায়। সর্ব্বজ্ঞ ব্যাস একটী শ্লোকেই ঐ দুইটী নামের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"তথা সিংহলবাসাশ্চ যে চ[illegible]ানিবাসিনঃ।"

এ শ্লোক দেখিলে কাহার না প্রতীতি হয় যে, সিংহল ও লঙ্কা স্বতন্ত্র? শ্লোকটীর অর্থ এই যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে সিংহলবাসী লোক আসিল এবং লঙ্কানিবাসীরাও আসিল।

উক্ত সভাপর্ব্বের অন্য স্থানেও উক্ত স্থানদ্বয়ের স্বাতন্ত্র্যবোধক কথা আছে। রাজসূয় যজ্ঞের সময় সহদেব দূত প্রেরণ দ্বারা লঙ্কেশ্বরের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিলেন এবং সিংহলেশ্বর-প্রেরিত লোকেরা ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন পূর্ব্বক নানাবিধ সামুদ্রিক রত্ন উপঢৌকন প্রদান করিল। এরূপ বর্ণনার দ্বারাও লঙ্কার ও সিংহলের ভিন্নতা অনুভূত হয়।

ভাগবতের ভূগোল-বর্ণনায় যাহা লিখিত আছে তাহা এই ;—

"অস্য জম্বুদ্বীপস্য অষ্টৌ উপদ্বীপাঃ সন্তি।
স্বর্ণপ্রস্থশ্চন্দ্রশুক্ল আবর্ত্তনো রমণকো মন্দহরিণঃ পাঞ্চজন্যঃ সিংহলো লঙ্কা চেতি॥"

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, পৌরাণিক সময়েও সিংহল ও লঙ্কা পৃথক ছিল।

বৃহৎসংহিতা নামক জ্যোতির্গ্রন্থে এবং অন্যান্য প্রামাণিক জ্যোতির্গ্রন্থেও সিংহলের ও লঙ্কার প্রভেদ বর্ণনা আছে। যথা—

"দক্ষিণে২বন্তিমাহেন্দ্রমলয়া ঋষ্যমূককাঃ।
চিত্রকুট-মহারণ্য-কাঞ্চী-সিংহল-কোঙ্কনাঃ॥
কাবেরী তাম্রপর্ণীচ লঙ্কা ত্রিকূটকাদয়ঃ॥"

এ দেশের অন্য শাস্ত্রগুলি যেরূপ হউক, জ্যোতিঃশাস্ত্র অনেকাংশে সত্য বা অভ্রান্ত। সেই জ্যোতিঃশাস্ত্র যখন সিংহলকে ও লঙ্কাকে পৃথক্ বলিতেছেন, তখন অবশ্যই তৎকালে উহার পার্থক্য ছিল সন্দেহনাই।

লঙ্কার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি বাল্মীকি স্ব-কৃত রামায়ণে লঙ্কার যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—আধুনিক সিংহলের সহিত তাহার মিল নাই, অর্থাৎ তৎগ্রন্থে যে সকল পর্ব্বতাদির উল্লেখ আছে—সিংহলের সেরূপ ভাবের পর্ব্বতাদি নাই। সে কারণেও আমাদের রাবণাবাস লঙ্কাকে কোথায়? তাহাতে আমরা এই মাত্র প্রত্যুত্তর দিতে পারি, তাহা আমরা কেহই জানি না। হয়ত রামায়ণ-বর্ণিত রাবণাবাস লঙ্কা এক্ষণে নাই, সমুদ্রমগ্ন হইয়া গিয়াছে। অথবা তথায় গতিবিধি করার পথ অজ্ঞাত আছে, তৎকারণে এখন তাহা আমাদের বিদিত নাই। বোধ হয় তাহা লোয়ার সার্কেলের নিকটস্থ কোন এক অজ্ঞাত প্রদেশে আছে।

এক মাত্র জ্যোতিঃশাস্ত্রই উল্লিখিত অনুমানের পোষক প্রমাণ হইতে পারে। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেদেরা লঙ্কাদ্বীপকে পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে অর্থাৎ নিরক্ষ বৃত্তের উপরিস্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—

"লঙ্কা কু-মধ্যে যমকোটিরস্যাঃ
প্রাক্ পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ
সৌম্যেঽথ যাম্যে বড়বানলশ্চ॥
কুবৃত্তপাদান্তরিতানি তানি
স্থানানিষ্ট্‌ গোলবিদো বদন্তি॥"

ভূ গোলকের মধ্যস্থলে লঙ্কা, তৎপূর্ব্বে যমকোটি পশ্চিমে রোমকপত্তন, অধঃ সিদ্ধপুর, উত্তরে সুমেরু ও দক্ষিণে বড়বানল অর্থাৎ কুমেরু। ভূগোলবিৎ পণ্ডিতেরা এই ছয়টী স্থানকে ভূ-পরিধির পাদান্তরিত অর্থাৎ সমানান্তরস্থিত বলিয়া নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।

উপরি-উক্ত প্রাচীন জ্যোতিষে লঙ্কা ভূ-মধ্যবর্ত্তী বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল ; কিন্তু আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে বর্ত্তমান লঙ্কা ঠিক মধ্যবর্ত্তী নহে ; মানচিত্র দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমান লঙ্কা অর্থাৎ যাহার অন্য নাম সিলোন্, সে স্থানটী নিরক্ষ বৃত্তের উত্তরে প্রায় ৭ অংশ ব্যবধানে অবস্থিত। প্রাচীন জ্যোতিষের সহিত প্রাচীন লঙ্কার সমতা এবং নব্য জ্যোতিষের সহিত তাহার অসমতা প্রমাণ হওয়ায় ইহাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, এক্ষণে আমরা যাহাকে লঙ্কা বলি—তাহা জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত লঙ্কা নহে। জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত লঙ্কাই পুরাতন লঙ্কা বা রাবণাবাস লঙ্কা। এই রাবণাবাস লঙ্কা পূর্ব্বে নিরক্ষবৃত্তের উপরেই ছিল, কালসহকারে বা প্রাকৃতিক বিপ্লবে হয়ত তাহা সমুদ্রগর্ভে লয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনন্তর হয়ত তাহার উত্তর ভাগ ক্রমে উত্তরে পরিবর্দ্ধিত হইয়া এক নুতন লঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে। অথবা পূর্ব্বে এই লঙ্কা দক্ষিণ ও উত্তর দ্বিভাগবিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে কেবল উত্তর ভাগই আছে। দক্ষিণ ভাগ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সে জন্য আমরা এক্ষণে রাবণাবাস লঙ্কা দেখিতে পাই না। কেবল সিলোন্‌কেই দেখিতে পাই এবং সেই সিলোনের উপরেই আমরা লঙ্কাবুদ্ধি আরোপিত করিয়া কত শত অনর্থ উদ্ভাবন করি। রাবণাবাস লঙ্কা এক্ষণে হয় সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছে অথবা লোয়ার সার্কেলের দিকে লোকের অজ্ঞাত ভাবে অবস্থিত আছে।

বাৎস্যায়নে অর্থনীতি

বাৎস্যায়ন অর্থশব্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, এই অর্থশব্দে শিক্ষা, ভূমি, সুবর্ণ, গৃহপালিত পশু প্রভৃতি দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ত্তমানে অর্থশব্দে যেরূপ বিনিময়যোগ্য সকল দ্রব্যই অন্তর্ভুক্ত হয়, অনেকাংশে বাৎস্যায়নের সূত্রেও সেইরূপ অর্থ হয়।

কামসূত্র গ্রন্থের অনেক স্থলে অর্থোপার্জ্জন ও অর্থ সংগ্রহ সম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া যায়। বিবাহের কন্যা সংগ্রহে পর্য্যন্ত কন্যা যাহাতে ধনীবংশজাত হন, তদ্বিষয়ে বাৎস্যায়ন উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আদর্শ স্ত্রী, তাঁহার মতে, ব্যয়কুণ্ঠা হইবেন। সহধর্ম্মিণী বাৎসরিক আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবেন। স্বামী অনুপস্থিত থাকিলে, স্ত্রী দৈনিক আয় ব্যয়ের উপর লক্ষ্য রাখিবেন। উপযুক্ত, বিশ্বাসযোগ্য ভৃত্যদ্বারা সময়ানুযায়ী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া রাখিবেন। ব্যয়-সঙ্কোচ বিষয়ে বাৎস্যায়ন পুনঃ পুনঃ গৃহিণীকে উপদেশ দিয়াছেন; এমন কি, মৃৎপাত্র ক্রয়েও উপযুক্তা গৃহিণী যথাসময়ে তৎপরা হইবেন; সময়ানুযায়ী তৈল, লবণ ক্রয় করিবেন; আহার্য্য গ্রহণের পরে যে দধি থাকিবে তাহাও যেন নষ্ট না হয়; উপযুক্ত সময়ে তিল হইতে তৈল, ইক্ষুদণ্ড হইতে গুড়, কার্পাস হইতে সূত্র যাহাতে সংগৃহীত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। অপিচ, ভৃত্যগণের বেতন, তৎকর্ত্তৃক ব্যয়, কৃষির উন্নতি এবং গোমহিষাদির যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানও গৃহিণীর অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল। দৈনিক আয় হইতে ব্যয় বাদ দিয়া কিরূপ উদ্বৃত্ত থাকে, সে বিষয়েও দৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয় ছিল। প্রকৃত গৃহিণীর এই সকল বিষয়েই লক্ষ্য রাখা সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন উপদেশ দিয়াছেন।

অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধেও বাৎস্যায়ন যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উপহার গ্রহণ, ক্ষত্রিয়ের রাজ্যজয় দ্বারা অর্থ-বৃদ্ধি, এবং ক্রয়-বিক্রয়ে বৈশ্যের ধনলাভ এবং বেতন-গ্রহণান্তর কর্ম্ম করা শূদ্রের কর্ত্তব্য ছিল।

তৎকালে কোন্ কোন্ জাতি বা উপজাতি ছিল, বাৎস্যায়নের গ্রন্থ পাঠে তাহাও অবগত হওয়া যায়। রজক, পরামাণিক, পুষ্পবিক্রেতা, গন্ধবিক্রেতা, শৌণ্ডিক, গোপালক, তাম্বুলি, সৌবর্ণিক, গল্পকথক এবং ভাঁড় ইহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজা অজাতশত্রু ও গৌতমবুদ্ধের কথোপকথনে আমরা বৌদ্ধযুগের জাতিসমূহের পরিচয় পাই—বাৎস্যায়ন পাঠেও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

অর্চ্চনা, আশ্বিন ১৩৩০। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

—

রবীন্দ্র সদনে

১৯শে আগষ্ট রবিবার সকালে রবীন্দ্রনাথের কলকাতার বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই এবং বর্ত্তমানে দেশের লোকের মনে যে সব প্রশ্ন প্রবল হয়ে উঠেছে, সেগুলি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জেনে আসি।

কংগ্রেসে দলাদলি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির ঘটনাসূত্রে প্রথমেই তিনি কংগ্রেসের দলাদলির কথা সুরু করলেন। তিনি বল্লেন, দলাদলির জন্য বা দলাদলির ফলে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে তার জন্য তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত নন। দলের উদ্ভব জীবনেরই লক্ষণ। লোকে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক একটিমাত্র প্রোগ্রাম নিয়েই যে সবাইকে কাজ করতে হবে এমন কথায় তাঁর মন সায় দেয় না। তিনি নিজে চিরদিনই মতের ও কাজের স্বাধীনতার বাণী শুনিয়েছেন, তার জন্য সংগ্রাম করে এসেছেন আর আজও এ সম্বন্ধে তাঁর মতের পরিবর্ত্তন হয় নি।

দুই বা ততোধিক দলের সত্যকার কাজ করবার যথেষ্ট জায়গা এদেশে রয়েছে। যে মুহূর্ত্তেই কারু সঙ্গে মতের অমিল দেখা যাবে সেই মুহূর্ত্তেই প্রমাণ করতে হবে যে প্রতিপক্ষ লোক অতি খারাপ আর অজানা কোন স্বার্থসিদ্ধির মতলবেই সে ওই বিশেষ মত পোষণ করছে, এমন মনোভাব, তিনি নিন্দার্হ বলেই মনে করেন। অপরের মনোভাব বুঝতে না পারা দুর্ব্বল মনেরই লক্ষণ। রাজনৈতিক ব্যাপারে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ অন্য প্রদেশের চেয়ে বাংলাতেই বেশী করে প্রকাশ পেয়েছে বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন।

কাউন্সিল প্রবেশ

কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে তিনি ব্যক্তির মতের ও কাজের স্বাধীনতার পক্ষপাতী। কাউন্সিলে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন দল যদি প্রবল হয়ে থাকে, তা'হলে তাদের কাউন্সিলে যেতে দেওয়াই ঠিক এবং সেখানে গিয়ে তাঁরা যা করতে পারেন তাই করতে দেওয়াই উচিত।

কাউন্সিলে ঢুকে তা ভেঙে দেবার চেষ্টার চেয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান গড়ে তোলবার চেষ্টা করা ভালো। কেননা নিজেদের এই সব অনুষ্ঠান গড়ে উঠলে দেশের লোকের সাহায্যের অভাবে সরকারী অনুষ্ঠানগুলি আপনা থেকে ধ্বসে পড়বে। কিন্তু কাউন্সিল ভাঙবার চেষ্টার চেয়েও পল্লীর পুনর্গঠন অনেক বেশী প্রয়োজনীয়।

গড়ার কাজ

রবীন্দ্রনাথ বল্লেন, আমাদের গোড়া থেকেই সবটা গড়ে তুলতে হবে। আমাদের নিজেদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খাড়া করতে হবে, আমাদের স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে, গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের নিজেদেরই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। দেশে যে সব সরকারী অনুষ্ঠান রয়েছে, তাতে করে দেশের লোকের উপর সরকারী প্রভুত্বই বেশী করে স্থাপিত হচ্ছে, দেশের জনসাধারণের মনের ভাব এমন করেই তৈরী করা হচ্ছে যাতে তারা বলতে পারে আমাদেরই মঙ্গল-কামনায় সরকার এত সব কাজ করছেন। সাধারণে অগোচরে কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে, লোকের মনের উপর

সরকারের এই যে প্রভাব বিস্তারিত হচ্ছে, এ দূর করে আমাদেরই প্রভাব বিস্তার করতে হবে।

কি করে আমরা তা করতে পারি? তা করবার প্রকৃষ্ট উপায়ই হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তাদের কর্ম্মকুশলতা দিয়ে সরকারী অনুষ্ঠানগুলিকে এমন অ-কেজো করে ফেলতে হবে, যাতে করে সেগুলি বন্ধ করে দিতে সবাই বাধ্য হয়। বরাবরই তিনি নিজেদের অনুষ্ঠান গড়ার আগেই সরকারী শিক্ষালয় বা অপর অনুষ্ঠান কয়কটের বিরোধী।

তিনি নবীন কংগ্রেস-কর্ম্মীদের গাঁয়ে গাঁয়ে কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহের কাজ করতে দেখেছেন—সত্যকার স্থায়ী ভাবের গঠন-কার্য্য তাঁরা খুবই কম করেছেন। গত কয়েক বছর যাবত যে কাজ হয়েছে তা একেবারেই ভাসা-ভাসা, তাই এই আন্দোলনও একেবারেই ভাসা-ভাসা রকমের হয়ে গেছে।

হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা

কবি তারপর বল্লেন, আজ দেশের সর্ব্বত্রই সব চেয়ে প্রবল ভাবে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান মিলন-সমস্যা। তাঁর মনে হয় যে আজো পর্য্যন্ত নেতারা কার্য্যোপযোগী কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প কেবল বিলাস-স্বপ্নই থেকে যাবে। কারু কারু মনে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের এমন একটা অস্পষ্ট ভাব রয়েছে, যাতে করে তাঁরা বলতে পারেন যে, বিদেশী প্রভুত্ব লোপ পেলেই মিলন সম্ভবপর হবে। তেমন বিশ্বাস তাঁর নেই। তিনি বল্লেন, ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে সঙ্ঘবদ্ধ ডেমোক্র্যাটিক মুসলমান কেন ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় আভিজাত্য-গর্ব্বিত শতধা-বিচ্ছিন্ন হিন্দুর সঙ্গে এক আসন গ্রহণ করবে? মুসলমান শক্তিমান এবং নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। তারা জানে, হিন্দু দুর্ব্বল!

মানব-স্বভাব আজ যেমন রয়েছে, তাতে করে কবি বিশ্বাস করেন না যে, অবস্থার দাবী নয়, মনের উদারতা দিয়েই মুসলমান আজ হিন্দুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ নির্ণয় করে নেবে।

কবি বল্লেন যে মোপ্লা-বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই তিনি মালাবার অঞ্চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখে এসেছেন চল্লিশ লাখ হিন্দু এক লাখ মুসলমানের ভয়ে মারাত্মক রকমে অভিভূত। হিন্দু আজ এত দুর্ব্বল, এমনি অসহায় ভাবে মুসলমানের দয়ার উপর সে বেঁচে আছে!

তিনি আরো বললেন, "আমি বিশ্বাস করতে পারিনা, মালাবারে ইংরেজের জবর শাসনের অধীনে থেকে যা সম্ভবপর হয়েছে, ইংরেজের শাসন অপসৃত হবার দরুণই তা আর সম্ভবপর হবে না।"

প্রধান ব্যাপার, তা হচ্ছে এই যে মুসলমানের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ দেশাত্মবোধ নেই। মোসলেম জগৎ গঠিত হয়েছিল ধর্ম্মের সৌভ্রাত্র অবলম্বনে, আর এই ধর্ম্মের বন্ধনই দুনিয়ায় এক প্রান্তের মুসলমানের সঙ্গে অপর প্রান্তের মুসলমানের মিলন সুদৃঢ় করে তুলেছে।

"আমি অনেক মুসলমান নেতাকে স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছি", কবি বল্লেন, "যে, আফগান বা অপর কোন মুসলমান শক্তি যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তা'হলে হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সে আক্রমণ প্রতিহত করতে তাঁরা প্রস্তুত কি না। "জবাব তাঁরা যা দিয়েছেন তাতে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। আমি বলছি, মহম্মদ আলির মত লোকও বলেছেন যে-কোন-অবস্থায়ই কোন মুসলমান, যে-দেশেই তার জন্ম হোক না কেন, অন্য কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে কখনো দাঁড়াবে না।"

আঙ্গোরায় আজ বিরাট এক মোসলেম-শক্তি প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে। নিখিল-মোসলেম ভাবকে এই অভ্যুদয় অনেকটা শক্তি জুগিয়েছে। এর জন্য আমরা হিন্দুরা ততক্ষণই আনন্দ প্রকাশ করতে পারি যতক্ষণ দুই সম্প্রদায়ের সাহাচর্য্যে আমাদের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সমাধান হয়।

সমস্যার সমাধান

এ সমস্যার সমাধান হবে না কেবল মাত্র হিন্দুর খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থনে। অমিলের প্রধান একটা কারণ একটা পরম্পরা বর্ত্তমান। বাইরের প্রলেপে কিছুই হবে না আর এতদিন পর্য্যন্ত কেবল আমরা তাই-ই করে আস্‌ছি।

"এই সমস্যা" কবি বল্‌লেন, "মানব মনকে এমন করেই গুলিয়ে দেয় যে, সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে হতাশ হয়ে, হাত পা ছেড়ে দেবার ভাবই প্রবল হয়ে ওঠে।

আমার অনেক সময় মনে হয় এ সমস্যার সমাধান কেবল তা হলেই সম্ভবপর হয়, যদি সব হিন্দু মুসলমান হয়ে যায় অথব সব মুসলমান হিন্দু হয়ে ওঠে!"

তারপর তিনি বল্লেন—"একমাত্র অর্থনীতিক ব্যাপার আশ্রয় করে একটা সত্যকার স্থায়ী মিলন সম্ভবপর করে তোলা যায় অন্য কোন ভাবে তা যায় না। এইখানে আমাদের স্বার্থ এক, আমরা একে অন্যের সাহায্যে পুষ্ট।

ক্ষুধা মুসলমানকেও কাতর করে, প্রতিবেশী হিন্দুকেও রেহাই দেয় না। ক্ষুন্নিবারণ দু' সম্প্রদায়ই সমানে উপভোগ করে। এই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই আমরা এক সঙ্গে কাজ করতে পারি। হিন্দু আর মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় পল্লীতে পল্লীতে যে অর্থনীতিক অনুষ্ঠানগুলি গড়ে উঠে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই কল্যাণ সাধন

দেবে এবং মিলনের বেদী গড়ে তুলবে যা আর কোন মতে সম্ভবপর হবে না।

পল্লী-সংগঠন ব্যাপারে এইভাবে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হবে।

হিন্দু মহাসভা

হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় রবীন্দ্রনাথ বল্লেন, কেবল মাত্র রাজনীতিক আন্দোলনের চেয়ে এ আন্দোলন তিনি অধিক প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। হিন্দু যদি বাঁচতে চায়, যদি মানব সমাজে অধঃপতিত অবস্থায় চিরদিন পড়ে থাকতে না চায়, তা হলে তাকে সঙ্ঘবদ্ধ হতেই হবে।

"কিন্তু হিন্দুদের এই সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা কি মুসলমানরা সন্দেহের চক্ষে দেখবে না? আর তার ফলে হিন্দু মুসলমানের অমিলের আর একটা কি বৃদ্ধি পাবে না?"—এ প্রশ্নের জবাবে কবি বল্লেন—"হ্যাঁ, তা হবে বৈ কি! কিন্তু সে বিপদের আশঙ্কা আমাদের মেনে নিতেই হবে। মুসলমানের যে স্বাধীনতায় আমরা বাধা দিইনি, সে স্বাধীনতা আমাদেরও প্রাপ্য। তারা নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে, তারা ইচ্ছামত হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করতে পারে আর তারা তা করেছে এবং এখনও করচে—আমরা তো কখনো বাধা দিতে দাঁড়াইনি! আমরা যখন দিয়েছি, তখন তারাই বা সে স্বাধীনতা কেন আমাদের দেবে না? আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাইলে তারা কেন তাতে বাধা দেবে?"

কবি তারপর মালকানা রাজপুতদের শুদ্ধি ব্যাপার সম্বন্ধে বল্লেন—তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না, মুসলমান যে স্বাধীনতার দাবী নিজে করছে, ঠিক সেই স্বাধীনতা অপরকে দিতে সে কেন নারাজ?

হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করা বড় কঠিন—যে সব বাধা-বিপত্তি আছে, তা অতিক্রম করা বড়ই শক্ত। সামাজিক ভেদ-নীতি হিন্দুকে মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দিচ্ছে।

কবি তারপর বল্লেন, "আমি আমার জমিদারীতে দেখেছি হিন্দু প্রজা কোনরূপ সংস্কারই বরণ করে নিতে পারে না কিন্তু আমার মুসলমান্ প্রজারা সহজেই সকল সংস্কার আয়ত্ত করে নিতে পারে। ফলে মুসলমান্ সংখ্যায় ক্রমেই বেড়ে চলেছে আর হিন্দুর অস্তিত্বই লোপ পাচ্ছে।"

কবি তারপর হিন্দুদের সামাজিক কতকগুলি ব্যবস্থার দোষ দেখিয়ে বল্লেন যে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি না হবার আরো কারণ হচ্ছে ওই সব সামাজিক ব্যবস্থা।

বিজলী, ১৪ ভাদ্র ১৩৩০।   শ্রীমৃণালকান্তি বসু।

শরৎ

এসো ফুলে ফুলে দুলিয়ে দিয়ে
তরল হীরার দুলগুলি—
এসো সিক্ত শ্যামল ঘাসের বনে
কাশের দলে ঢেউ তুলি!
এসো উষার প্রথম কিরণ-পাতে
রৌদ্র-ভরা আঙ্গিনাতে
উড়িয়ে দিয়ে তুহিন-মাখা
রুক্ষ তোমার চুলগুলি!

এসো ঝরঝরে এই বর্ষাধারা
শুকিয়ে দিয়ে চাউনিতে,
এসো সাজাও তোমার বাসক-শয়ন
নীল'আকাশের ছাউনিতে!

এসো বাঁধন কেটে সময়-স্রোতে
ভাসিয়ে তরী, ও-পার হতে,
বর্ষাশেষের বন্ধু এসো
বিশ্ব-হৃদয়-দ্বার খুলি!

আনো চমক্ মেরে চম্‌কে দিতে
চটুল হাতের চক্‌মকি—
আনো ঘুচিয়ে দিতে সব অবসাদ
অনল তোমার লক্‌লকি!
এসো কালো মেঘের আগল টুটে
ঘোর শ্যামলের বক্ষ লুটে—
তোমার অন্তরালে উঠবে ফুটে
ফাগ-মাখা ঐ ফুলগুলি!

বেলা আটটা বাজিয়া গেল, তবু সবিতার ঘুম ভাঙ্গে নাই।

তার মা অনেকক্ষণ আগে উঠিয়া দু-একটা কাজ সারিয়া গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় তাকে ডাকিয়া দিতে গেলেন.—সে তখনো ঘুমাইতেছিল। বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া মা ডাকিলেন,—সবি, ওঠ মা, বেলা হয়ে গিয়েছে।

সবিতা চোখ মেলিয়া চাহিয়া বলিল, -আমি উঠতে পারছিনে মা, আমার বড্ড মাথা ধরেছে।

—মাথা ধরেছে! ওমা,—জ্বরটর হয় নি তো? তুই বাপু যে ঠাণ্ডা লাগাস্!

সবিতা পাশ ফিরিয়া আবার ঘুমাইল। তার মায়ের আর সেদিন গঙ্গাস্নানে যাওয়া হইল না। তিনি বাড়ীতেই তোলা জলে স্নান করিয়া মেয়ের কাছে আসিয়া বসিলেন।

সবিতার দাদামশায় আসিয়া দেখিয়া বলিলেন,—জ্বরই হয়েছে, দেখ্‌ছি।

ডাক্তারের কথা তুলিলে সবিতা বলিল,—আমার জন্যে তুমি অত ভেবোনা মা, আমার এমন জ্বর কত হয়, আবার আপনিই সেরে যায়।

কিন্তু জ্বর তিন-চার দিন সমভাবেই থাকিল। ডাক্তারে দেখিয়া বলিলেন, সারিতে সময় লাগিবে।

সবিতা মনে মনে ভাবিল, ভাগ্যে এমন জ্বর তার সেখানে থাকিতে হয় নাই! ওঃ, তা হইলে কি বিড়ম্বনাই ভোগ করিতে হইত!

সাত-আট দিনেও যখন জ্বর ছাড়িল না, তখন সবিতার দাদামশায় চিন্তিতভাবে বলিলেন,—কি করবো,—ওর শ্বশুরকে খবর দেব নাকি? তাঁরা যদি পরে দোষ দেন?

সবিতা নিজেই ব্যস্ত হইয়া বলিল,—না, না, তা করবেন না,—কেন তাঁকে অস্থির করে তুলবেন!

—তবু একটা খবর দেওয়া ভাল। অরুণ বাড়ী আছে, সেও ইচ্ছে করলে আসতে পারে।

বারণ তো করিল! কিন্তু বিছানায় শুইয়া পড়িয়াও তার উৎসুক দৃষ্টি কেবল বাহিরেই চাহিয়া থাকিত।

বাহিরের মরা বাগানটিতে একটি শেফালিকা ফুলের গাছ ছিল। ভোরের সেই ঝরা ফুলের মিষ্ট গন্ধ ও মেঘ-ভাঙ্গা সোনালি রোদের একরাশ নির্ম্মল আলোর দিকে চাহিয়া কোন্ অকারণ মূঢ় আশায় তার মন উদ্‌গ্রীব উন্মুখ থাকিত! রোগ-বিকল মাথায় তার সে অসম্ভবকেও সম্ভব বলিয়া ভাবিতে আট্‌কাইত না। অল্পক্ষণ চোখ বন্ধ করিয়াই খুলিবার সময় মনে হইত, মুক্ত চোখের সুমুখে এমন কি কিছু আসিতে পারে না,—চোখ যাহা দেখিবে বলিয়া আশা করে নাই? দাদা মহাশয়কে অসময়ে ঘরে ঢুকিতে দেখিলেই তার ব্যাকুল দৃষ্টি সাগ্রহে তাঁর হাতের দিকে চাহিয়া দেখিয়া লইত, তাঁর হাতে কিছু আছে কি না। কিন্তু অসুখের কোন খবর তার শ্বশুরবাড়ীতে দেওয়া হইয়াছে কি না, সে কথা সে তার মাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

তার জ্বর যেদিন খুব কম ছিল, সেইদিন তার মা বলিলেন,—এইবারে সবির শ্বশুরকে খবর দিয়ে দেবেন বাবা, নইলে তিনিও ভাববেন।

সবিতা বলিল,—তোমরা তাঁকে সত্যি সত্যিই খবর দিয়েছ না কি মা?

—হ্যাঁ। তিনি উত্তর দিয়েছেন, ব্যারাম বেশী হলে তিনি নিজেই আসবেন।

—তবে আজই তাঁকে চিঠি লিখে দাও, নইলে যদি তিনি এসেই পড়েন!

—তা এসে পড়লেনই বা! তাতে কি হয়েছে?

—না, না,—সে কাজ নেই! তিনি আসতে আসতে আমি বেশ সেরে উঠ্‌বো,—তিনি এসে কি মনে করবেন, তা হলে!

সবিতার দাদামশায় একটা নিশ্বাস টানিয়া বলিলেন,—আমি আজই তাঁকে চিঠি দেব, অনর্থক সে ভদ্রলোককে

সবিতার মা বলিলেন,—আচ্ছা, বাবা, এর যে এই এমন ব্যারামের খবর গেল, তবু তো অরুণ একবারটী খবর নিলে না! তার বাপও তার কোন নাম-গন্ধ করেন না,—এ কি ব্যাপার এঁদের?

সবিতার দাদামশায়ের শিষ্যমহলে যত পণ্ডিতের খ্যাতিই থাক, এ-সব ব্যাপারের তিনি বড় কিছু বুঝিতেন না। ভগবান তাঁর সংসারটাকেও এত সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন যে, বেশী কিছু অভিজ্ঞতার সুযোগও তিনি পান নাই।

তাঁর দুটী চোখ সারাক্ষণ পুঁথি-পত্রেই সংলগ্ন থাকিত, পরের দেখিয়া শিখিবার বুঝিবার মত স্বভাবও তাঁর ছিল না। পছন্দ-মত লোক পাইলে তিনি অনেক গভীর গভীর তত্ত্বালোচনা করিতে বসিতেন, কিন্তু কারো ঘরের কথায় তিনি থাকিতে পারিতেন না।

বরং স্ত্রীলোকের স্বাভাবিকতার জন্যই হোক্ বা পাঁচ জনকার দেখিয়া-শুনিয়াই হোক্, সবিতার মায়ের সাংসারিক বুদ্ধি তাঁর পিতার চেয়ে বেশী ছিল। তাই তিনি কন্যার সন্দিগ্ধ প্রশ্নের উত্তরে কেবল বলিলেন—কি জানি!

আশার পত্রে সবিতা জানিল যে পুলককে প্রভাত রাখিয়া গিয়াছে। আশা লিখিয়াছে,—

"এবারে বোধ হয় তোমায় আসতেই হবে দিদি. পুলক এখন সব চেয়ে বেশী বিরক্ত করে বড়-ঠাকুরকে। তিনি দিনে হাজার বার বলেন, তাকে রেখে আসবেন তার বাপের কাছে, কিন্তু বাবার ভয়ে তা পারেন না। খুব মজা হয়েছে এখন,—পুলক একে রোগা ছেলে, দিন-রাত শুধু চেঁচায়, বাড়ীশুদ্ধ লোক তাকে নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে! এর মধ্যে যা একটু বেঁচে আছি আমি,—কেন না পুলক আমাকে একটুও দেখতে পারে না,—আর ভাসুরের কাছ থেকে আমি তাকে যখন-তখন টেনেও আনতে পারিনে। এখন তুমি কবে আসবে, তাই আমরা দিন গুণ্‌ছি।"

চিঠি পড়া শেষ করিয়া সবিতা সেখানি বালিশের নীচে গুঁজিয়া রাখিল।

শ্বশুর-বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছে যেদিন, সেদিন হইতে আজিকার দিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘটনাটী, প্রত্যেক দিনটি তার মানস-চক্ষে পঞ্জিকার পাতার মত করিয়া সে দেখিতে লাগিল। সে যখন সেখানে গিয়াছিল, তখন এই মায়ের কাছ হইতে যে অম্লান শুভ্র প্রাণখানি লইয়া গিয়াছিল, তাতে তখন এতটুকু দাগ ছিল না, ছোপ্ ছিল না। বর্ষা-নিশীথের মুকুলিত পদ্মের মত তার অবিকশিত হৃদয় নির্ম্মল ছিল। তার পর দ্বিতীয় অঙ্কের শরৎ-প্রাতে ফুটিতে গিয়া, সেই কত না বিড়ম্বনা, কত না দুর্দ্দশা ভোগে অম্লান পল্লবগুলি রোদের আঁচে আঁচিয়াছে! শরৎ-প্রভাতের স্বর্ণোজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলো তার ভাগ্যে নিদাঘের তাপ বর্ষণ করিয়াছে, তবু তার নারী-প্রাণের ফুল তো রাখিয়া ঢাকিয়া ফোটে নাই!

যেখান হইতে সেই অমলিন জীবন লইয়া গিয়াছিল, সেইখানেই তো এই একটী বছর আবারও কাটিল, কিন্তু, তবু তো কই বুকে আঁচড়ের দাগের গভীরতা কমিল না!

সেই যে সংসারে কেবল দুঃখ গ্লানি বহন করিয়াও সে এতটা দিন কাটাইয়া আসিল,—সেই তাঁরাই কি আজ তাকে এমন করিয়া পরিহার করিলেন যে, পুলকের কোনো খবরেও যে তার কিছু অধিকার আছে, তা তাঁরা মনেও করেন না!

অধিকার! কে তাকে সে অধিকার কোন্‌দিন দিয়াছে? তার যত কিছু সব যে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে, সে তবে কিসের অভাবে?

তার শয্যাগত অলস মাথায় কত কথাই জাগিল! কিন্তু ভাগ্য-বিপর্য্যয়, দোষ কারো কিছু খুঁজিয়া পাইল না। ভাগ্য! শুধু ভাগ্যেরই দোষ!

একবার মুহূর্ত্তের জন্যও তার কেমন ধারণায় আভাস জাগিল, যদি সে সময়ে শাশুড়ী কিছু প্রসন্না হইতেন?

পর মুহূর্ত্তেই অনুতপ্ত হইয়া সে ভাবিল, ছি, ছি, যিনি আজ স্বর্গে, তাঁরই কথা এ কি ভাবিতেছি আমি!

এমনি সব চিন্তার জালের সুতা ছিঁড়িয়া যখন তার চৈতন্য জাগিল, তখন দেখিল যে অকারণ অশ্রু-ধারায় তার চোখ-মুখ বহিয়া মাথার বালিশেরও খানিকটা ভিজিয়া গিয়াছে!

লজ্জায় সে যেন মরিয়া গেল! হয় তো এরি মধ্যে মা আসিয়া পাঁচবার ঘুরিয়া দেখিয়া গিয়াছেন,—জানুকীয়া

আসিয়া ঘরের গেলাস-বাটী সব কুড়াইয়া মাজিতে লইয়া গিয়াছে! সেই বা কি মনে করিয়া গেল?

একেই তো মায়ের মনে তীব্র সন্দেহের ছায়া আছেই,—তাতে তাকে এই অবস্থায় দেখিয়া থাকিলে আজ তাঁর জেরার জ্বালায় অস্থির হইতেই হইবে।

সে তাড়াতাড়ি মাথার বালিশ উল্‌টাইয়া ফেলিল। খাবার জলের গ্লাস হইতে জল হাতে লইয়া চোখ-মুখ ধুইয়া মুছিয়া ফেলিল। কেবল ক্রন্দনের সুদীর্ঘ শ্রান্ত নিশ্বাস সম্পূর্ণ গোপন করা সম্ভব হইল না।

দুটি বেদানা হাতে করিয়া তার দাদামশায় ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন,—সবি, এই দুটো বেদানা কিনে আন্‌লুম, তা জান্‌কীয়া বল্‌ছে পচা হবে, ছাখ্‌তো, পচা হবে কি?

সবিতা বেদানা দুটী ঘুরাইয়া দেখিয়া বলিল—না, পচা হবে কেন,—কিন্তু আমি তো কালই ভাত খাব, দুটো বেদানা কি হবে?

—ভাত খেলে কি বেদানা খাওয়া যায় না? তুই ভারি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিস্—এ ক'দিন তোকে আরো একটু যত্ন করা দরকার।

সবিতা হাসিয়া বলিল,—কেন, আমিও কি এখন কুটুম্ব হয়ে গিয়েছি না কি? অসুখ হয়ে দুর্ব্বল হয়েছি, সারলেই সবল হব।

—না, না, তুই এমনিও কেমন দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছিলি,—দেখছিলুম।

—সে আপনাদের চোখেরই দোষ, তা হলে!

দাদামহাশয় কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া কি যেন ভাবিলেন, পরে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—আচ্ছা সবি, তুই এখনো আমাকে তেমনি ভালবাসিস?

সবিতা একটু হাসিল, বলিল,—বাসি বৈ কি। কেন, বলুন তো?

—না—সত্যি সত্যি ভেবে বল্,—ভালবাসিস্ কি না?

—বাসি, দাদামশায়!

—আমি যা জিজ্ঞাসা করবো, তার জবাব দিবি?

—জানলে কেন দেব না?

আরক্ত মুখে সবিতা ঘাড় ফিরাইল। এই কিছুক্ষণ আগে যে চোখের জল অশ্রান্ত ধারায় ঝরিয়া গিয়াছে, আবার সেই চোখ ভরিয়া উঠিলম্। হায়, এঁরাও কি আর কোনো কথা খুঁজিয়া পান না? তাই এই এক কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলেন! সেখানে আর যাই থাক্, ইদানীং এই যন্ত্রণাটা আর দিল না।

—কই বল্‌লিনে কিছু? ও কি, কেঁদে ফেল্‌লি নাকি রে?

—না, কাঁদিনি তো! কাঁদবো কেন?

—তাই বল্—ছাখ্‌তো দিদি, তোর শ্বশুর কত আদর করে তোকে নিয়ে গেলেন! আর তোর মা কি না বলে যে, মেয়ে সুপাত্রে পড়েনি, আদর পায়নি,—অরুণ নাকি অহঙ্কারী, গোঁয়ার!

—না, তা কেন হবেন!

—তা নয় তো? তাই বল্,—তাই কেন তোর মাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলিস্‌নে! সে শুধু শুধু কত কি ভাবে!

সবিতা চুপ করিয়া রহিল।

তার দাদামশায় এতক্ষণে লক্ষ্য করিলেন যে সবিতা তাঁর প্রশ্নে অত্যন্ত সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে!

জান্‌কীয়া আসিয়া বলিল—আবার জ্বর এলো নাকি?

—না।

—ভালই। আমি চুপ্‌চাপ্ দেখে ভয় পেয়েছিলুম যে বুঝি আবার জ্বরই হলো!

দাদামশায় বেদানা দুটি রাখিয়া গেলেন। জানকীয়া বলিল,—বেদানার রস করে দেব, খাবে এখন দিদি?

—না, এখন আর তোর রস করতে বসতে হবেনা!

—তবে শুধুই ছাড়িয়ে দি, খাও।

—আঃ! আমাকে তোরা কি ছেলেমানুষ করে ফেলেছিস্ জান্‌কীয়া,—যেন আমার নিজের হাত-পা আর কিছু নেই—

—তুমি কি বুড়ী হয়ে গিয়েছ যে তোমাকে বুড়ী বল্‌বো!

জান্‌কীয়া ঘরের ভিতরই জাঁকিয়া বসিল দেখিয়া সবিতা বলিল,—এখানেই যে দিব্যি বসে গেলি রে।

কোনো কাজ করবার উপায় নেই,—বলিয়াই—ওই যাঃ, ঘুঁটেগুলো সব ভিজে গেল বুঝি! বলিয়া মাথায় গামছা চাপাইয়া সে রান্নাঘরের দিকে ছুটিয়া গেল।

বৃষ্টির শব্দে সবিতা মাথা তুলিয়া দেখিল,শেষ বর্ষার পাঁশুটে ঘোলা আকাশ ঘনাইয়া একেবারে মুষলধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে!

আর কোন শব্দ নাই, আলো নাই, আনন্দ নাই,—কেবল চারিদিক ধ্বনিত করিয়া ঝম্‌ঝম্ জলধারা ঝরিতেছে!

ক্রমশঃ

শ্রীনীহারবালা দেবী।

চয়ন

জব চার্ণক

প্রায় ২৬৭ বৎসর পূর্ব্বে জব চার্ণক প্রথম কলিকাতায় আসেন। তিনি ইংরাজ। জব চার্ণকের কোন জীবন-চরিত এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। তিনিই বর্ত্তমান কলিকাতা সহরের প্রতিষ্ঠাতা। ইণ্ডিয়া অফিসের কয়েকখানা রেকর্ডে তাঁর যে বিক্ষিপ্ত কাহিনী পাওয়া যায়, তা কতটুকুই বা তাঁর জীবন-কথার ইঙ্গিত দেয়! তাঁর বংশ-পরিচয়, জন্ম-তারিখ—এ সবের কোন পরিচয় তো তাহা হইতে মেলে না! ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ৩৭ বৎসর কাল প্রগাঢ় বিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রমের সহিত কাজ করার ফলেও তাঁর নামটাকে কেহ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পায় নাই। তাঁর কথা কতক পাওয়া যায় Hedges Diary-তে। কর্ণেল হেনরি ইউল সেকালের হাকলুইট সোসাইটির একজন সুধী সদস্য। তিনি জব চার্ণকের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

সেকালে যে-কয়জন ইংরাজ ব্রিটিশ-ভারতের সৃষ্টি-কল্পে প্রাণ-মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, জব চার্ণক তাঁহাদের অগ্রণী। অথচ তাঁর কোন জীবন-চরিত নাই! তিনি পাঁচ বৎসরের সর্ত্তে এদেশে কাজ করিতে আসেন্। তারপর ২৩শে ফেব্রুয়ারির (১৬৬৩-৪ খৃঃ অব্দ) মেমোরিয়াল হইতে জানা যায়, তিনি বিলাতে ফিরিতে চান—তবে এ কথাও জানান, যদি তাঁহাকে পাটনা ফ্যাক্টরির কর্ত্তা করা হয়, তাহা হইলে এখানে থাকিয়া যাইতেও পারেন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে এ পদ তাঁকে দেওয়া হয় এবং এই পদে ১৬৮০-৮১খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি কাজ করেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, চার্ণক ১৬৫৭।৫৮ খৃঃ-অব্দে ভারতবর্ষে আসেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০ এ সেপ্টেম্বর তারিখে কাশিমবাজারের কৌন্সিলে তাঁকে চতুর্থ সদস্য হিসাবে অভিনন্দন করা হয়। এই সদস্য-পদ লাভ করা হইতেই জানা যায় যে তিনি একজন গণ্যমান্য ও পাকা লোক ছিলেন। কাশিমবাজারে অল্পদিন থাকিয়া তিনি পাটনায় যান্ এবং ক্রমে কোম্পানির পাটনা ফ্যাক্টরির কর্ত্তা নিযুক্ত হন।

পাটনায় বিশ বৎসর তিনি কোম্পানির কাজ করেন। পাটনাতেই তাঁর তুই কন্যার জন্ম হয়। তাঁর পুত্র-সন্তান ছিল না। বড় মেয়ের বিবাহ হয় ফোর্ট উইলিয়মের অস্থায়ী গভর্ণর স্যর চার্লস আয়ার্সের সঙ্গে। ছোট মেয়ে বিবাহের পর ২১ এ জানুয়ারী ১৭০০ খৃঃ অব্দে মারা যান্ এবং সেণ্ট জন্স্ চর্চ্চ-ইয়ার্ডে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। এইখানেই পরে জব চার্ণকের দেহও সমাহিত হয়। তাঁর স্ত্রী ছিলেন হিন্দু নারী। বিবাহের মধ্যে একটু রোমান্স ছিল।

এক হিন্দু বালিকাকে তার মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় চড়ানো হয়। বালিকা চিতায় উঠিতে অনিচ্ছুক ছিল। জব চার্ণক খবর জানিতে পারিয়া তাঁকে উদ্ধার করেন ও আশ্রয় দেন। পরে তাহা হইতেই উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার এবং বিবাহ হয়। Hedges Diary-তে ইউল সাহেব বলিয়াছেন, পাটনার একজন ব্যবসায়ী ইংরাজের পক্ষে চিতা হইতে সতীকে উঠাইয়া আনা বড় কম সাহসের কাজ নয়।

জব চার্ণক ভারতবাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন—তার

প্রমাণ পাওয়া যায় Hedges Diary-তে এবং Littleton's Letters-এ। জিনিষটা সকলের চোখে তখন ভাল না ঠেকিলেও তাঁর কর্ম্মদক্ষতার গুণে চার্ণককে চাকরিতে উন্নতির পথ হইতে কেহ ঠেকাইতে পারে নাই; এবং চার্ণকের মেয়ের বিবাহও যে হইয়াছিল সম্ভ্রান্ত ঘরে, তাঁর সর্ব্বজনপ্রিয়তার ইহাও এক প্রমাণ। চার্ণকের মেয়েরা ভারতবর্ষ হইতে বিলাতের সম্ভ্রান্ত পরিবারে মশলিন প্রভৃতি যে সব উপহার পাঠাইতেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইত। চার্ণক ধুতি-চাদর পরিতেন মাঝে মাঝে, এবং শুনা যায়, গঙ্গা-পূজায় তাঁর অসীম অনুরাগ ছিল।

"Calcutta, old and new" গ্রন্থে মিঃ কটন বলিয়াছেন, চার্ণকের দুই কন্যা নয়—তিন কন্যা। মেরি, কাথরিন্ ও এলিজাবেথ। এলিজাবেথের বিবাহ হয় ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম বাউরিজের সঙ্গে। কিন্তু এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অফিসের কার্য্য-পরিচালনায় চার্ণকের কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল, তার বহু পরিচয় সেকালের কাগজপত্রে পাওয়া যায়। অবাধ বাণিজ্যের জন্য মোগলের দরবার হইতে ফার্‌মান্ তিনি নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করেন। তাঁর কর্ম্মদক্ষতায় তুষ্ট হইয়া ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি তাঁকে কাশিমবাজারের চীফ ও ফোর্ট-উইলিয়মের দ্বিতীয় সদস্যের পদ প্রদান করেন। এ ব্যাপার কাজে খাটাইতে নানা গোল বাধে। কৌন্সিল বলেন, সমস্ত এজেন্টকে ডিশমিশও যদি করিতে হয় সেও আচ্ছা, তবু চার্ণককে কাশিমবাজারের চীফ করা চাইই। পরে কোম্পানির অধ্যক্ষ ষ্টেনশাম্ মাষ্টারের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধে এবং তার ফলে চার্ণককে চীফের পদ পাইতে বেগ সহিতে হয়। কিন্তু কোম্পানি মাষ্টারের এই ব্যবহারে বিষম চটিয়া তাঁকে কড়া চিঠি পাঠায় এবং মাষ্টার অপদস্থ হইয়া চার্ণককে ঐ পদে অধিষ্ঠিত করে।

১৬৮১ খৃষ্টাব্দে চার্ণক কাশিমবাজারের কুঠির ভার গ্রহণ করেন। তিন বৎসর তিনি বেশ দক্ষতার সহিত কাজ করিবার পর নবাবের সঙ্গে ইংরাজের বিবাদ বাধে। নবাবের ক্রমাগত টাকা চাহিবার জন্য চার্ণক বিরক্ত হন; তবু নবাবের অন্যায় প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই। [illegible]

বাজারের কুঠী সকলে বয়কট্ করে ও চার্ণককে নজরবন্দীতে রাখা হয়—যেন কাশিমবাজার হইতে তিনি পলাইতে না পারেন। কড়া পাহারা সত্ত্বেও চার্ণক এক বৎসর পরে গোপনে কাশিমবাজার ত্যাগ করিয়া যান। পরে নবাবের সঙ্গে ছোট-খাট যুদ্ধ বাধে। চার্ণক ক্রমে সুতানুটীতে আসিয়া উপস্থিত হন্। তাংপর নবাব-সৈন্য কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া আজ থানা, কাল হিজলী, পরদিন বালেশ্বর, এমনি ঘুরিয়া ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আব্দুল সমদের যোগে সুতানুটী অধিকার করেন। তখন সন্ধির কথা চলিতেছিল। কাপ্তেন উইলিয়ম হীথ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে আসিয়া চার্ণকের সঙ্গে যোগ দেন এবং তাঁরা বালেশ্বর ও চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তারপর ১৬৮৯ সালে মার্চ্চ মাসে মাদ্রাজে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া প্রায় পনেরো মাস চার্ণক অপেক্ষা করিয়া থাকেন—তারপর সুতানুটীতে আসেন ১৬৯০ খৃঃঅব্দে আষাঢ় মাসে; এইখানে আসিয়া কলিকাতা শহরের পত্তন করেন।

১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী তারিখে চার্ণকের মৃত্যু হয়। তাঁর কবরে যে পাথর দেওয়া হয়, সেখানি ভারতীয় পাথর। চার্ণক নিজেই সেটি কবরের জন্য রাখিয়া ছিলেন।

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

কলিকাতায় শেষ নরবলি

শুনা যায়, সেকালে আমাদের কাপালিকদের মধ্যে নরবলি প্রচলিত ছিল। সেকাল কেন বলি, এই একালেও সেদিনই তো এক বাঙালী যুবাকে এক কাপালিক বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিল, সাঁওতালেরা পড়িয়া ছোকরাকে উদ্ধার করে। কলিকাতায় নরবলি সম্বন্ধে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখের Calcutta Gazette-এ এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়—

"আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিলাম, গত ৬ই তারিখ রবিবার অমাবস্যার রাত্রে চিৎপুরের কালীমন্দিরে একটি নরবলি হইয়াছে। কাহারা বলি দিয়াছে, রাত্রি অন্ধকার ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। পরদিন সকালে দেখা গেল,

প্রতিমার পায়ের কাছে মানুষের কাটা মুণ্ড, আর ধড়টা মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে। বলির পরণে খুব দামী নূতন কাপড়, গলায় সোনার হার, আরো নানা কণ্ঠাভরণ। পূজায় বাসন-কোসন ও সরঞ্জাম যা পড়িয়া আছে তা বেশ দামী। অর্থাৎ দেখিলে মনে হয়, বেশ ধনী লোকই এই পূজা করিয়াছে, শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিতকে দিয়া। যাহাকে বলি দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে দেখিলে চণ্ডাল বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের পুরোহিতকে ফৌজদার গ্রেপ্তার করিয়াছে। এখনো বিশেষ বিবরণ জানা যায় নাই।"

ইহার পর অপরাধী ধরা পড়িল কি না, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ গেজেটে বাহির হয় নাই। তবে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ২২ মে তারিখে ঐ কাগজেই একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানি এইরূপ,—"আপনার ২রা এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় নরবলি সম্বন্ধে যে বিবরণ বাহির হইয়াছে, তাহা পড়িয়া কেহ যেন মনে না করেন, হিন্দু জনসাধারণ এ নরবলির সমর্থন করে। এ কাজ কোন ধার্ম্মিকের দ্বারাও অনুষ্ঠিত হয় নাই—এ ডাকাতের কাজ। কোন লুঠের কাজ করিতে যাইবার পূর্ব্বে ডাকাতের দল কালীর কাছে নরবলি দেয় বিপদ কাটাইবার প্রার্থনায়। তাছাড়া শুনিয়াছি, চিৎপুরে ঐ কালী-মন্দিরেই দেবীর সম্মুখে গোবিন্দরাম মিত্র নরবলি দিয়াছিল। গোবিন্দরাম জমিদার ও কলিকাতার জমাদার। তাসত্ত্বেও লোকে সন্দেহ করিত যে, গোবিন্দ ডাকাতের দল পুষিয়াছে। বলির অঙ্গে দামী পরিচ্ছদ আর অলঙ্কার হইতে বুঝা যায়, এ ঐ ডাকাতেরই কাজ। কারণ, এমন খয়রাতী লোক অল্পই আছে, যাহারা অত টাকা নরবলিতে খরচ করিবে—তাছাড়া ধরা পড়িবার ভয়ও আছে ত!

তবে হাঁ, নরবলি সেকালে চলিত ছিল, এমন শুনা যায় বটে। কিন্তু তাহাতে মানুষ স্বেচ্ছায় বলি হইত, ধর-পাকড় করিতে হইত না। আর হিন্দুর শাস্ত্র বলে, কলিযুগে নরবলি অচল। ইতি—"

পত্র-প্রেরকের কথাটা মনে লাগে,—কেননা, তখন ডাকাতের সংখ্যা অল্প ছিল না। বহু ডাকাত ভদ্র বেশ ধরিয়া [illegible]

মার্শম্যানের এক প্রবন্ধ বাহির হয় কলিকাতা রিভিউ পত্রে—(vol III, 1845) তৃতীয় খণ্ড ১৮৪৫; তাহাতে টীটাগড় সম্বন্ধে তিনি একটা কথা লিখিয়াছেন। টীটাগড়ে তখন মস্ত ডক্ ছিল। মার্শম্যান লিখিয়াছেন,—"টীটাগড়ের ডকের খুব কাছে পুরাতন ডকের একটা ঘাট আছে তার উপরে কতকগুলা ভগ্ন মন্দির দেখা যায়। ডাক্তার কেরি কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা করিয়া এই ঘাটে নামিয়াই গৃহে ফিরিতেন। এই ঘাট হইতে একটা আঁকাবাঁকা পথ গিয়া গ্রেট ব্যারাকপুর রোডে মিশিয়াছে। এই পথে একটা পাকা বাড়ী আছে। সে বাড়ী মস্ত এক ধনীর। মানুষ খুন করিয়া সে এ ধন সংগ্রহ করিয়াছিল। পথিকের গলায় দড়ির ফাঁশ টানিয়া তাহাকে সে মারিত, মারিয়া তার যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইত। এই ধনী প্রকৃত পক্ষে ছিল একজন ঠগ!"

কাজেই পত্র-প্রেরকের কথা ঠিকও হইতে পারে যে উক্ত নরবলি ডাকাতের কাজ, ভদ্র বা ধার্ম্মিক সাধু ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রী ও পুরুষ

সংসারে স্ত্রীর প্রভাব কতখানি, পুরুষেরই বা কতটুকু, সেটা গবেষণার বস্তু। পুরুষ স্ত্রীকে গড়িয়া তোলে, না, স্ত্রী পুরুষকে গড়িয়া তোলে—এ কথার উত্তর চট্ করিয়া দেওয়া যায় না। পুরুষের মন পাইবার জন্য, পুরুষকে তৃপ্তি দিবার জন্য নারী বহু পরিশ্রমে অঙ্গের প্রসাধন করে, বেশ-বিন্যাসে নিত্য নব বর্ণ যোজনা করে এবং মতামতও গড়িয়া পিটিয়া প্রকাশ করে। নিজের মতকে একেবারে উল্টাইয়া পুরুষের মতে সায় দিতেও নারী দ্বিধা বোধ করে না। মনের খাঁটী কথাটুকু অকপটে যে স্ত্রী পুরুষের সামনে জোর-গলায় প্রকাশ করিতে পারে, তার মনের জোর তারিফ পাইবার যোগ্য; তবে তেমন স্ত্রী হাজার-করা একজন যদি মেলে! নহিলে বাকী ৯৯ জন স্ত্রী পুরুষের মতেই সায় দিয়া থাকে। তাছাড়া পুরুষের জন্য স্ত্রী যেমন আপনাকে

তেমন করে না, পারেও না। পুরুষ চায়, স্ত্রী তাকে সর্ব্বসময়ে সকল অবস্থাতেই যেমন-তেমন ভাবে পাইয়াও তৃপ্ত থাকিবে!

তবে খুব সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে স্ত্রীর প্রভাব সীমা ছাপাইয়া ওঠে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে, স্ত্রী যদি মনের শিক্ষায় পুরুষের চেয়ে খাটো হয়, কিম্বা মূর্খ হয়, তবেই সংসার অরণ্য হইয়া পড়ে। মূর্খ স্ত্রী সংসারের আপদ। কারণ, স্ত্রী যদি শিক্ষিতা হয়, বুদ্ধিমতী হয়, তবে যেমনই হৌক পুরুষ, তাকে টিট হইতেই হইবে। বুদ্ধিমতী স্ত্রী এমন অনায়াসে তার চপলচিত্ত বেয়াড়া স্বামীকেও শুধরাইয়া অনেকখানি মানুষ করিয়া তুলিতে পারে যে দেখিলে অবাক হইতে হয়। এমন দৃষ্টান্ত সংসারে আমরা অহরহ দেখিতে পাই। এমন স্ত্রীর হাতে স্বামী সত্যই মানুষ হইয়া ওঠে। কিন্তু পুরুষ যদি পণ্ডিত বা আর্টিষ্ট হন্, আর স্ত্রী হয় মূর্খ, তবেই গোল! সে স্ত্রীকে পুরুষ কিছুতেই দরদী করিয়া তুলিতে পারে না। পুরুষের মনোবৃত্তির সঙ্গে স্ত্রীর মনোবৃত্তি মোটেই খাপ খায় না— সেখানে তার না জাগে সহানুভূতি, না জাগে কোনরূপ মনের টান! মুখরা নীচমনা স্ত্রী পুরুষকে হীন করিয়া ফেলিতে পারে—তা সে পুরুষ যত বড় পণ্ডিতই হউক! কিন্তু পণ্ডিত পুরুষ মুখরা নীচমনা স্ত্রীকে কিছুতেই উঁচু ধাপে উঠাইতে সক্ষম হয় না। স্ত্রী যদি বুদ্ধিমতী বা আর্টিষ্ট হয়, আর স্বামী হয় মূর্খ, তবে সে মূর্খ স্বামী আর কিছু না বুঝিলেও স্ত্রীর শক্তিতে গর্ব্ব বোধ করে। কিন্তু বুদ্ধিমান আর্টিষ্ট পুরুষ মূর্খ স্ত্রীর কাছে অপদার্থেরই সামিল!

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

নারী-চরিত্র

কবি গাহিয়াছেন,—'কে বুঝিবে রমণীর মন?' কথাটা ঠিক!

আপনি পুরুষ, আমিও পুরুষ,—আপনি একটু মুস্কিলে পড়িয়াছেন, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আপনি কি করিবেন, সেটা আবছায়া ভাবে আমি কতক বুঝিতে বলা দুঃসাধ্য! দুই ভাই, বা দুই বন্ধু—দুইজনে রাগারাগি হইল—বুঝিলাম, এর ফলে বাক্যালাপটা হয়তো ক্ষণেক বন্ধ থাকিবে! কিন্তু স্ত্রী? তাঁর সঙ্গে কলহ হইলে তিনি বাপের বাড়ী যাইবেন, কি উপবাস দিবেন, কি স্বামীর সামনে গহনার ফর্দ্দ ফাঁদিয়া বসিবেন, কি ছেলেমেয়েদের বিনা-দোষে ঠ্যাঙাইয়া গৃহে কুরুক্ষেত্র বাধাইবেন, কি অগতির গতি গলায় ফাঁশ টানিবেন, তার কিছু আঁচ করা যায় না!

ইহার কারণ কি? নারী পুরুষকে ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিয়া তাকে যেমন পড়িয়া ফেলিতে পারে, পুরুষ নারীর বিষয়ে তেমন পারে না। তার কারণ, পুরুষ সেরূপ গভীর অভিনবেশে নারীকে বুঝিবার চেষ্টা পায় না। নারীকে সে ভাসা ভাসা ভাবে পাইয়াই খুসী। স্ত্রী কেমন চট্ করিয়া নিরীহ নির্দ্দোষ স্বামীকেও সন্দেহ করিয়া বসে! আর পুরুষ? কুচরিত্রা স্ত্রীকেও সে নিশ্চিন্ত আরামে বিশ্বাস করিয়াই তৃপ্ত থাকে! এটা অবশ্য একেবারে সঙ্গীন রকমের দৃষ্টান্ত!

নারীকে বুঝিতে পারা সত্যই সহজ নয়। নারীর চিন্তা করার ধারাই স্বতন্ত্র। যুক্তি নারীর কাছে ধরা দিতে বহু বিলম্ব করে।

একটা ছোট-খাট গল্প বলা যাক। গল্পটি বিলাতী। এক প্রণয়ীর কথা ছিল, বেলা দুইটার সময় তার প্রণয়িনীর সঙ্গে গিয়া দেখা করিবে। বেচারা আসিয়া বলিল, তাকে চারিটায় গিয়া একটা কাজের এন্‌গেজমেণ্ট রাখিতে হইবে। প্রণয়িনী অমনি অভিমানে সারা। সংশয়ের ঝড় বহিল, অভিমানের বৃষ্টি ঝরিল,—আমায় তোমার ভাল লাগে না, অরুচি ধরিয়াছে! আমার উপর তোমার আর আগেকার মত ভালবাসা নাই, যাও গো যাও,—তোমার মন যেখানে গিয়া সুখী থাকে, সেইখানে যাও—এখানে কেন?—এমনি নানা অভিযোগ নানা সুরে বাহির হইতে লাগিল। প্রণয়ী বেচারা কাহিল হইয়া বলে—ওগো, তা নয় গো, তা নয় প্রিয়তমে—তুঁহু মম পরাণ-অধিক! কিন্তু সে কথা কে শোনে! নারী কহিবে, যাও, যাও—আর ছলনায় কাজ কি! এমনি অভিমান আর কলহের বৃষ্টিতে দেড় ঘণ্টার উপর

কি করে! ওদিকে কর্ত্তব্যের ডাক—শেষে বিরক্ত হইয়া বেচারা যখন চলিয়া যায়, প্রণয়িনী তখন তার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া চুমার পর চুমা ঢালিয়া কি সোহাগ! মুখে বচন, রাগ করলে? না, না, রাগ করো না, আমায় মাপ কর!

বৃষ্টির পরে হাসির জ্যোৎস্না ফুটিল। কিন্তু এই যে মেঘ ও রৌদ্রের চকিত খেলা কাব্যের দিক দিয়া যত মিঠাই লাগুক, ওদিকে দুইটা ঘণ্টা মিথ্যা কাটিল তো! তাই বলিতেছিলাম, যুক্তির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক বড় কম। ভবিষ্যৎ বুঝিয়া চট্ করিয়া একটা সামঞ্জস্য করিয়া লইবে, এ চিন্তা নারীর মাথায় ঢোকে না—কাজ কি বাবু মিছা ঝগড়ায়? এরূপ রক্ষার ধারও নারী ধারে না!

পুরুষ যে নারীকে বুঝিবার চেষ্টা করে না, তার কারণ পুরুষ বড় বেহুঁসিয়ার আর ধড়ফড়ে! ঐ ছোট-খাট অভিমানগুলা যদি সে নজর করিয়া দেখে, তাহা হইলে তার মূল ধরিয়া প্রতিকারও করিতে পারে।

নারীর চিত্ত দুর্ব্বোধ ঠেকে আরো এক কারণে। এ জগতে পুরুষ শক্তিমান,—তার পয়সা, সুযোগ, শক্তি, সবই এত বেশী, আর নারীকে তার অধীনে এতটা থাকিতে হয়, যে ঘরের বাহিরেও পুরুষের উপর প্রভাব রাখিবে কি করিয়া—এইজন্য পুরুষকে গোড়া হইতে সে বেশ করিয়া পাঠ করিয়া বুঝিয়া তাকে তৃপ্তি দিবার উদ্দেশ্যে নারী নিজের স্বাতন্ত্র্য অনেক সময় হারাইয়া ফেলে। তার ফলে ছলনা ও মিথ্যার আশ্রয়ও তাকে অনেকখানি লইতে হয়। এইটুকুই তার যা কিছু অস্ত্র!

কাজেই এই ছদ্ম আবরণের মধ্যে নিজেকে নারী সর্ব্বক্ষণ ঢাকিয়া রাখিতে বাধ্য হয়। এবং পুরুষও ঐ আবরণে ঠেকা পড়িয়া নারীর চিত্তটাকে সঠিক খুঁজিয়া পায় না, চিত্তটাকে পরিপূর্ণ উন্মুক্ত ভাবে পাইবার চেষ্টাও করে না। সেইজন্যই জীবনের নানা সমস্যার মাঝে বেচারা পুরুষ একান্তে পড়িয়া ভাবে,—তাই তো, কেন ওর মন বিরস, কেন এ বিরাগ! কেন মন নাহি পাই আজ!

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

রাজার প্রবেশ-নিষেধ

বিলাতের হাউস্ অফ্ কমন্স্ অর্থাৎ প্রাকৃত সভায় রাজার যাবার অনুমতি নেই।

রাজ্যের একজন অতি-সাধারণ প্রজাও সেখানে গিয়ে বসে বক্তৃতা শুনতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ডের স্বর্ণ-সিংহাসনে রাজছত্রের তলায় যিনি একবার বস্‌বেন, তাঁকে সেখানে আর ঢুকতে দেওয়া হবে না। যুবরাজ-অবস্থায় অতিথি হয়ে গিয়ে বস্‌বার হুকুম আছে, কিন্তু রাজা হলে আর না।

ভিক্টোরিয়া যখন সিংহাসনে বসেন, তখন তাঁকে বালিকা বল্‌লেই হয়। তারপর ষাট বছরের ওপর তিনি যে রাজত্ব করে গেলেন, তার মধ্যে একটি দিনও তিনি তাঁর নিজের প্রাকৃত সভায় গিয়ে দেখ্‌তে পেলেন না, সেখানে কাজকর্ম্ম কি ভাবে চলে!

এ কঠিন নিয়ম কেন হয়েছে, জান্‌তে হলে অনেক শতাব্দী পিছিয়ে যেতে হবে। আজ বিলাতের রাজদণ্ড প্রজাদের আইন-কানুনের অধীন। কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যখন রাজার হাতে ছিল অপ্রতিহত প্রভাব। তখন প্রজাদের সভায় সশরীরে রাজা বসে থাক্‌লে অনেকের পক্ষে ভয়ে কথা বল্‌তে না পারাই স্বাভাবিক; এইজন্য নিয়ম হয়েছিল, সাধারণ সভায় রাজা আস্‌তে পারবেন না!

এখনও হাউস্ অফ্ কমন্স্‌এ রাজার নাম নিয়ে কোন আলোচনা করা চলে না।

একবার শুধু চার্লস্ দি ফার্ষ্ট এ নিয়ম অগ্রাহ্য করেছিলেন, সেজন্য সোনার মুকুট আর পৈতৃক প্রাণটার মায়াও তাঁকে হাতে হাতে ত্যাগ করতে হয়েছিল!

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু।

পারস্য গালিচা

পারস্যের গালিচা পৃথিবী-বিখ্যাত। সে দেশে প্রায় মেয়েরাই কার্পেটের কাজ করে থাকে; এক-আধ জায়গায় ছোট ছোট ছেলেদের দিয়েও করানো হয়। কিন্তু এমন একটা শিল্পকে যে সে দেশে খুব বেশী উৎসাহ দেওয়া হয়, তা নয়। এর দরুণ সাধারণতঃ যা মজুরী বরাদ্দ আছে, সে অতি সামান্য। সেখানকার মুসলমান

সামাজিক উন্নতি হলে, স্বভাবতঃই এত ছোট কাজ তারা কর্‌তে রাজী হবে না, কাজেই, সেই সঙ্গে কার্পেটের প্রচার বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কাও আছে।

কার্পেট প্রস্তুত করার পদ্ধতি খুব জটিল নয়। ছোট একটী পল্লী-কুটিরের ততোধিক ছোট তাঁতে টানা-পোড়েনের ফলে বিচিত্র রঙ্গীন কার্পেট ঝক্‌ঝক্ ক'রে তৈরী হয়ে উঠ্‌ছে—এ সেখানকার সাধারণ দৃশ্য। সুতো দিয়েই বেশী কাজ হয়। চার-পাঁচজন মেয়েতে এক একটা কার্পেট শেষ করে। গল্প করে তারা কিন্তু বড্ড কাজের ক্ষতিও করে।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু।



জাপানী নাচ

ব্রহ্ম-দেশের কথা

ব্রহ্মদেশের সহিত বাঙ্গলার ঘনিষ্ঠতা দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; যে ব্রহ্মদেশে দশ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর সংখ্যা অত্যল্প, এমন কি নাই বলিলেও চলিত, আজ সেই



জাপানী নাচ

স্থান বাঙ্গালী-বহুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অত্যল্প কালের মধ্যেই বাঙ্গালী তার সে কলঙ্ক মোচন করিয়াছে। আজকাল বাঙ্গালীর সেখানে নিত্য গতায়াত। আজ ক্ষুদ্র ব্রহ্মদেশ, কেরোসিন, পেট্রোল ইত্যাদি নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করিতেছে।

ব্রহ্মবাসীগণ একটী অখণ্ড জাতি নহে। কয়েকটী জাতির সংমিশ্রণেই বর্ম্মিজের সৃষ্টি। চীনবাসী ও মালয় এই দুই জাতির মেশ্‌লা বলিয়াই ব্রহ্ম-জাতি পরিগণিত। ইহা ছাড়া 'আইনু' জাতীয় লোকও ব্রহ্মে খুবই দেখা যায়।

ব্রহ্মদেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র প্রসূতি-দের প্রতি যেরূপ নৃশংস ব্যবহার করা হয়, কোন দেশেই সেরূপ হয় না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র প্রসূতির সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্রা দ্বারা মাজ্জিত করিয়া, পরে বহুসংখ্যক কম্বল বা শীতবস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত করিয়া তাহারই অদূরে একটী অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা হয়। ইহার অনতিবিলম্বে ধাত্রী একপ্রকার তরল ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রসূতিকে খাওয়াইয়া দেয়। এই তরল ঔষধটী উপর্য্যুপরি সাতদিন তাহাকে খাওয়ানো হয়; এবং কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহার চারিপার্শ্বে চুল্লী জ্বালিয়া রাখে। সপ্তম দিবস বা শেষদিন প্রসূতিকে একটী কম্বলে আবৃত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া অত্যুষ্ণ জলের উপর বসাইয়া রাখা হয়। ইহার এক ঘণ্টা পরে শীতল জলে স্নান করাইয়া তাহাকে

মুক্তিপ্রদান করা হয়। এই সকল অমানুষিক অত্যাচার অত্যন্ত ক্ষতিজনক। কারণ এই পৈশাচিক অনুষ্ঠানের পর প্রায় অধিকাংশ জননীকেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হয়। যে অল্পসংখ্যক মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পায়, তাহাদের যৌবন-শ্রী চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া যায়। দেখা গিয়াছে, এই নির্য্যাতনের পর একটী পনেরো-ষোল বৎসরের সুন্দরী যুবতীকে ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়ার মত দেখায়।



জাপানী নাচ

ব্রহ্মদেশে শিশুদিগের নামকরণ এক সুন্দর জিনিষ। সাধারণতঃ পনেরো দিন পরেই শিশুদিগের 'নামকরণ' হয়। আমাদের মত ব্রহ্মদেশেও শিশুর নামকরণের জন্য পুরোহিতকে দিন ও ক্ষণ স্থির করিতে হয়। এই উৎসবে নানা দেশ হইতে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসব-স্থলে আসিয়া ভোজে যোগদান করে। প্রচলিত আছে যে-শিশু যে-দিন জন্মগ্রহণ করে, সেই দিনের আদি অক্ষর লইয়া তার নামকরণ করা দরকার।



জাপানী নাচ

ব্রহ্মবাসীর একটা চিরন্তন বিশ্বাস আছে যে জন্মদিন অনুসারেই শিশুর প্রকৃতি গড়িয়া ওঠে। তাহাদের বিশ্বাস—

সোমবারে জন্মিলে শিশু হিংস্রপরায়ণ হয়।
মঙ্গলবারে … উন্নত-চরিত্র হয়।
বুধবারে … ক্রুদ্ধ-স্বভাব হয়।
বৃহস্পতিবারে … নম্র হয়।
শুক্রবারে … বাচাল হয়।
শনিবারে … কলহ-পরায়ণ হয়।
রবিবারে … কৃপণ হয়।

ব্রহ্মবাসীগণের নামের শেষে কোন উপাধি নাই। একজনের দশ-বারোটী পুত্র থাকিলেও তাহাদের কাহারও সহিত পিতার নামের সাদৃশ্য নাই। অধিকাংশ ব্যক্তিই বারংবার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। নিয়ম আছে, যে নাম পরিবর্ত্তন করিবে, তাহাকে প্যাকেটে করিয়া কতকগুলি লবণমিশ্রিত চা চতুর্দ্দিকে তাহার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের পাঠাইতে হইবে; এবং তাহার সহিত নিম্নলিখিত কথা গুলিও লিখিয়া দিতে হয়:—

—'আমি আমার পূর্ব্ব নাম পরিত্যাগ করিয়া লিখিত নামটী গ্রহণ করিয়াছি। এখন হইতে—অন্য অনুরোধ-পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত আমায় ঐ নামে অভিহিত করিবেন। আশা করি, এতৎসহ প্রেরিত লবণ-মিশ্রিত চা পান করিয়া সুখী হইবেন।'

ব্রহ্মে কি বিবাহিত কি অবিবাহিত সকল রমণীই 'Mah' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মের বিবাহ-প্রথার সহিত ইংলণ্ড ও ভারতীয় বিবাহের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পর্দ্দা প্রথা প্রচলিত না-থাকায় তত্রত্য যুবক-যুবতীগণ একসঙ্গে ক্রীড়ামোদে যোগদান করিয়া থাকে। সুন্দরী যুবতীরা নানা বেশে সুসজ্জিতা হইয়া বাজারে গিয়া চুরুট ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে থাকে। যুবকগণও ঐরূপ একটা অছিলায় তাহাদের সহিত মিলিত হয়। উভয়পক্ষের পিতামাতা যদিও সকল বিষয় বিশেষরূপে অবগত থাকেন, তথাপি তাহাদের ঐ 'মিলনে' কোনরূপ বাধা প্রদান করেন না। পরস্পরের প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হইবার পর তাহারা নিজ নিজ পিতামাতার সম্মতি প্রার্থনা করে। যদি তাঁহারা সম্মতি প্রদান না করেন, প্রেমিকযুগল কোন নিভৃত স্থানে পলাইয়া গিয়া নির্ব্বিঘ্নে বিবাহকার্য্য সমাধা করে, পরে পিতামাতার ক্রোধ প্রশমিত হইলে গৃহে স্থান পায়। দেখা গিয়াছে, তৎকালেও অনাদৃতা হইলে, কন্যা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে।

বিবাহ-কার্য্য পাত্রপক্ষের ব্যয়ে কন্যাপক্ষের গৃহে সংঘটিত হইয়া থাকে। উভয়পক্ষের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গ ঐ ভোজে নিমন্ত্রিত হয়। বিবাহের পর আরও তিন বৎসর ধরিয়া পাত্র কন্যার পিতৃ-গৃহে কালযাপন করে।

ব্রহ্মদেশে যদিও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, তথাপি অধিকাংশ ব্যক্তিই একবার বিবাহ করে। কথিত আছে, প্রাচীনকালে ঐ দেশে কোন এক রাজা তিপান্নবার বিবাহ করিয়াছিলেন ও একশত দশটী সন্তানের জন্ম দিয়াছিলেন।

নৃত্য-গীতে ব্রহ্ম মহিলারা যতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন এ পর্য্যন্ত জগতের অন্য কোন জাতি বোধ হয় ততদূর পারে নাই। ইহাদের নৃত্য-কলা দেখিবার জিনিষ। ব্রহ্মদেশে এমন কোন পুরুষ বা নারী নাই যে নৃত্য-গীত জানে না।

আমোদ-প্রমোদ বা অভিনয়েও ব্রহ্মদেশ তারিফ পাইবার যোগ্য। ও দেশে এমন একটী লোক নাই, যিনি জীবনে কখনও অভিনয় করে নাই। সারা জীবনের প্রতি শুভ-পলেই তথায় অভিনয় আরম্ভ হয়। যখন কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে, তখন অভিনয় হয়; আবার যখন তাহার নামকরণ হয়, তখনও অভিনয় হয়। এইরূপে বিবাহ-কালে, যৌবনে পদার্পণকালে, বিবাহচ্ছেদ-কালে, জলাশয়-খননে, বলিদানে, ঘোড়দৌড়ে অবধি অভিনয় হইয়া থাকে। অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বাদ্যকরেরা বাদ্য বাদন করিয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে অভিনেতা, অভিনেত্রীগণ রঙ্গমঞ্চের উপর আগমন করে। অভিনেতা, অভিনেত্রীগণ দর্শকের সম্মুখেই তাহাদের সাজসজ্জা পরিধান ও উন্মোচন করে; রঙ্গমঞ্চের উপর দাঁড়াইয়াই ধূমপান করিয়া থাকে। যে রাজা বা সম্রাটের ভূমিকা অভিনয় করে, সে অভিনয়-কালেই তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মদেশের নাটক গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও কার্য্যাবলী এবং প্রাচীন ভারতের নৃপতিগণের চরিত্র লইয়া রচিত। অভিনয় পরদিবস সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চলিতে থাকে।

অধিকাংশ দর্শকই সমস্ত রাত্রি তথায় থাকে। সকলে মাদুর ও কম্বল লইয়া আসে। কারণ মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অভিনয় হইয়া বিশ্রাম-লাভের জন্য ক্ষান্ত হয়, তিন চারি ঘণ্টা পরে আবার অভিনয় আরম্ভ হয়। ঐ তিন চারি ঘণ্টা দর্শকগণ ঘুমাইয়া কাটায়। এইরূপ রাত্রি-জাগরণে কোন কষ্টও নাই, অথচ পূর্ণ আমোদও পাওয়া যায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত।

শেষ কথা

—কে ?

আমি।

তুমি !

হাঁ, ভয় পেয়ো না।

না, ভয় পাই নি।—অন্ধকারের মধ্যে যতটুকু তোমায় দেখতে পাচ্ছি তা থেকে ত মনে হ'চ্ছে—এ তুমিই, তাই বড় আশ্চর্য্য লাগছে !—কতক্ষণ এসেছ ?

যতক্ষণ তুমি ও-ঘরে বসে সেতার বাজাচ্ছিলে।

সে ত অনেকক্ষণ ! আমায় ডাকোনি কেন ?

বিশেষ তাড়া ছিল না।—তা'ছাড়া, চুরি করে তোমার বাজনা শোন্‌বার লোভও একটু ছিল।

দাম দাও !

দাম আবার কি !—আমি ত 'কিনে নিতে' আসিনি।—'চুরি করেছি'; সাধ্য থাকে, শাস্তি দাও।

এ ভারি অন্যায়। তোমার কিন্তু একটা কথা মনে করে বড় খুসী হয়ে উঠেছি নিজের ওপর—

কিসে ?

বল্‌ব।—কিন্তু আগে কথা দাও, হাস্‌বে না—আমায় পাগল ভাব্‌বে না ?—

না, ও সবের কিছুই করব না।—বল।

হঠাৎ এক সময় আমার মনে হলো—

ও কি ! থাম্‌লে কেন ?—বল।

মনে হলো তুমি এসেছ ! কিন্তু ঠিক বিশ্বাস কর্‌তে পারিনি।—কি করে পার্‌ব ? এত অসম্ভব ওটা !—তাই মনকে অন্য দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সেতারটায় ঝঙ্কারের পর ঝঙ্কার তুলছিলাম। বাইরেটার দিকে তাকাইনি। তোমার আসার পথ চাইবার দরকারও ত ছিল না।—আজ সকালে এসে তুমি বিদায় নিয়ে গেছ, আর ছ'টা বেজে দশ মিনিটের সময় তোমার গাড়ীও যে ছেড়ে গেছে, তাও জান্‌তাম।

—তবু মনে হ'ল তুমি এসেছ। কোন মতে মনটাকে বাঁধ্‌তে না পেরে, ছুটে ও-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পর্দ্দাটা একটু সরাতেই মনে হল—এ ঘরে যেন কে রয়েছে !…ঠিক তোমারই মত বলে মনে হল !—তাই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।

—ওটা ভয়ে বা আনন্দে নয়, কিন্তু কিসে যে, তা'ও বোঝাতে পার্‌ব না।

—আমি আলো নিয়ে আসি, আমায় দেখতে দাও—'এ সত্যি তুমিই'।—না থাক্‌, তার দরকারই বা কি। এম্‌নি করে শুধু তুমিই ত আমার হাত ধরে কাছে টেনে নাও, এ-ত আমার সমস্ত দিয়ে জেনেছি—বুঝেছি…

—কি প্রকাণ্ড হাত তোমার গো ! ওরই মধ্যে শুধু আমার যা'কিছু সমস্তই বুঝি হারিয়ে গেছে—ডুবে গেছে-

—আমায় আর একটু কাছে টেনে নেবে ?—আরো ডুবিয়ে দেবে আমায় তোমার মধ্যে ?—না-না, উঠে যেয়ো না। থাক, আর চাইব না। যেটুকু পেয়েছি, তাই যথেষ্ট মনে কর্‌ব।—মনে কর্‌ব এই পাওয়ার শেষ, এর বেশী আর কিছুই পাবার নেই।—দরকার নেই আমার আলোতে। তোমাকে দেখ্‌তেও চাই না…আমি যদি অন্ধ হতাম, বেশ হ'ত।

—দেখনা, আমার চোখ দুটো কি উৎপাত কর্‌ছে !…যে ছায়াটুকু তোমার দেখ্‌তে পাচ্ছে, সেইটুকুর মধ্যেই তোমাকে আরো স্পষ্ট দেখবার জন্যে কি ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে ওরা !…

—দেখেছ ? শুধু নিজের কথাই বলে যাচ্ছি পাগলের মত !—তুমি আজ গেলে না ? এই অসম্ভব কাণ্ডটা যে কি করে হলো, তাই ভেবে উঠ্‌তে পারছি না !…

অসম্ভব ?—তা হবে, কিন্তু ভারি সহজে হয়ে গেল ওটা।…বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রায় ষ্টেশনের কাছে এসে আমার মটরখানার কল গেল বিগ্‌ড়ে। ড্রাইভার মেরামত কর্‌তে লেগে গেল,—তখন ট্রেণ ছাড়বার আর মাত্র সাত মিনিট

বাকী! তারপর কল সেরে নিয়ে সে আবার যখন ষ্টার্ট দিল, তার এগারো মিনিট পূর্ব্বে আমার ট্রেণ ছেড়ে গেছে।—তারপর?—এই নাও টিকিটখানা, আর—ও কি! তুমি কাঁদ্‌ছ?…

কৈ? না ত!—আর কাঁদ্‌লেও ত আমার চোখের জলে শোক নেই। শুধু কান্না পাচ্ছে বলেই কাঁদ্‌ছি।—মুছিয়ে দেবে? আচ্ছা, দাও। ভারি ঠাণ্ডা হাতের আঙুলগুলি তোমার! চোখের ওপর ওরা কি তৃপ্তি যে মাখিয়ে দিল…

দেখ, ভয়ানক অন্ধকার।—কাকেও আলো আন্‌তে বল না—

না।—এবার আমি চাই না। আলো আমি পেয়েছি। চোখের দেখার নেশা আমার কেটে গেছে। প্রাণ দিয়ে তোমায় দেখেছি—কি সুন্দর! কি অপূর্ব্ব তুমি!…

—যতক্ষণ নিজের সম্বন্ধে এতটুকু সংশয় তোমার মনে ছিল, ততক্ষণ এমন করে নিজেকে পরীক্ষা করে নিয়েছ, যার প্রত্যেকটি কথা এখন আমার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে…

—অবহেলার ভিতর দিয়ে যে আঘাত আমায় দিতে, সে যে শুধু নিজেকে বোঝবার জন্যেই, তা আগে জান্‌তে পারিনি।—এমন কি আজ সকালে যখন—অমন সহজ আর কতটা তাচ্ছিল্যভাবে বিদায় নিয়ে গেলে আমার কাছ থেকে, তখনও বুঝতে পারিনি যে সেই কথার সঙ্গেই তোমার নিজের শেষ পরীক্ষাও হয়ে গেল…তাই সমস্ত দিনটা আজ পড়ে পড়ে কেঁদেছি আর বলেছি—তুমি পাথর—একেবারেই পাথর…

—রাগ করলে?—তা কর; কিন্তু আমার তুমি ভুল বুঝো না। আমি যে বড় দুর্ব্বল। আমার মধ্যে তোমার মত অত গভীরতা, অত গাম্ভীর্য্য যে নেই, তাই একটুতেই আমি টলে যাই।

ভারি সত্যি কথাটা বলেছ কিন্তু! আমার মধ্যে গাম্ভীর্য্যটা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ভগবান দিয়েছেন।—অর্থাৎ কি না, যে পাথরটা একটু বেশী শক্ত, তারই কপালে হাতুড়ির ঘা একটু বেশীই বরাদ্দ থাকে—তাকে সইতে হয় একটু বেশী। কিন্তু দেখছি একেবারে বাজে জিনিষ এই সইতে পারাটা…এক ঘায়ে চুরমার হতে পারলেই আর গোল থাকে না।—'ভাঙ্গা'টাই হলো যখন চরম গতি, তখন 'সইতে' পারার বড়াই করে লাভ!—কিন্তু দেখ, তুমি যদি অমন কর, তা'হলে—

ওগো না, না, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমি ত কিছুই করিনি, শুধু আমার হাত দুটোকে মালার মত করে তোমার গলায় পরিয়ে দিয়েছি। অমন আড়ষ্ট হয়ে আছ কেন?…ওঃ, তোমার বুকটা কি ভয়ানক কাঁপ্‌ছে!..আমার মাথাটা কি খুব ভারী?—তোমার কি ব্যথা লাগ্‌ছে?—আমার মুখের ওপর কি পড়্‌ল? তোমার চোখের জল?…কথা বল্‌ছ না কেন? একটা কথা—শুধু একটা, যা খুসী তোমার, বল—

এবার পার্‌ব মনে হচ্ছে।

কি পার্‌বে?—

যেতে।

যেতে!—কোথায়?

তোমার কাছ থেকে দূরে।

এত কাছে আসার পর?—

হাঁ। যতদিন নিজেকে জানিনি, ততদিন যেতেও পারিনি। যেতে গিয়ে পথ থেকে ফিরে এসেছি! অমনি করে চলে গেলেও আমার যাওয়াটা বৃথাই হত।

—আজ সন্ধ্যে বেলা আমার চোখের সাম্‌নে যখন আমার ট্রেণ ছেড়ে গেল, সেই মুহূর্ত্তেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল…আমার দেহের প্রত্যেকটী রক্ত কণিকাও চীৎকার করে উঠ্‌ল—

কি? কি বলে চীৎকার করে উঠল?—থেমো না ঐখানে, আর একটু শুনতে দাও—

যে কথাটার ওপর আমার সব চেয়ে বেশী রাগ ছিল, সেই কথাটা,…যে কথাটাকে আমি সব চেয়ে বেশী অবিশ্বাস করতাম, সেই কথাটা…তাই ত একেবারে পথ থেকে সোজা তোমার কাছে চলে এসেছি হার স্বীকার করতে—আমি হেরে গেছি..

তাই চলে যাবে?—কিন্তু আমি যেতে দেবো না ত—যদি না দিই?—

কিন্তু যেতেই যে হবে আমায়—ছেড়ে তোমায় দিতেই হবে।

কেন ?

তা জানিনা ; কিন্তু—

ওঃ, এমনি জোর করে, তোমার গলা থেকে আমার হাত খুলে নিয়ে ?...বেশ, জোর করেই তুমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাও—আমি দেবো না।

—আমার লাগ্‌ছে...ভয়ানক লাগ্‌ছে কিন্তু...আচ্ছা, আর একটি কথার জবাব দাও—তুমি একদিন কথায় কথায় বলেছিলে, 'ফুলের গন্ধের চেয়ে চুলের গন্ধ মিষ্টি' সত্যি কি তাই ?—সেদিন তুমি আমার মাথায় মুখ রেখেছিলে।—সে কি আমার চুলের গন্ধ ফুলের চেয়ে মিষ্টি ছিল বলেই ? —আমার চুল বলে নয় ?—'

দেখ, একটা জিনিষের আমার বড় দরকার, সেইটে আমায় দিতেই হবে।

কি ?—

বিদায়।—আমার শক্তি হারাবার পূর্ব্বে।

দেখ, আমারও একটা জিনিষের বড় দরকার। আজ এই শেষ বিদায়ের ক্ষণে, বল, আমায় দেবে ?—নিরাশ করবে না ?

না।—কি চাও তুমি ?

তোমাকে।—আমার শক্তি হারাবার পূর্ব্বে।

মানে !...

হাঁ, এই আমার চাই। এই আমার চাওয়া। এই চাওয়া যদি আমার বিশ্বের নিয়মের বাইরেও হয়, তবুও আমার এই চাই-চাই।—আর বাকী যা রইল আমার চার-পাশে, তাতে আমার দরকার নেই—সে সব আমার মিথ্যে হয়ে গেছে।...

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

চুমো ও অশ্রু

যখন থাকি তোমার কাছে তোমার কাছে তোমার কাছে
যখন তুমি রওনাক তফাতে—
আমি তোমার কাছেই থাকি !
যখন তুমি দূরে থাক দূরে থাক দূরে থাক
তখনো যে থাকি তোমার সাথে !—
তুমি তখনো নও ফাঁকি,
যখন তুমি দূরে থাক
আমার হৃদয়পুরে থাক
অগীত গানের সুরে থাক গো !—
যদিও তোমার হাতটী না পাই মোর হাতে,
যদিও তোমায় দেখ্‌তে না পায় মোর আঁখি !
তোমায় আমি চাই—
গোলাপবাগে চাঁদ্‌নি রাতে
তোমার বাহুর বাঁধ্‌নি সাথে

মিলিয়ে বুকে খেয়াল-সুখে
স্বপ্নলোকে যাই !
স্বপ্নে দেখি হাস্‌চ তুমি—
স্বপ্নে আমি তোমায় চুমি !—
(ঘুমের মাঝে চুম্বনেই
যাই হারিয়ে ঘুম্‌-বনেই !)
দৈবযোগে হয় তো তখন
বাহিরেতেও তাই !
কি না, তোমার চুমো খাই !
এক সময়ে একটী বারে
দুইটী চুমো পাই !
চুমো সে যে স্বর্গের ফুল
মর্ত্ত্যে অতুল
নাই তাতে ভুল গো !

অধর দিয়ে যেম্‌নি অধর ছুঁই—
এম্‌নি চুমোটাই—
এক সময়ে খাওয়া খাওয়ান্!
চল্‌তে পারে দুই ;
এমন জিনিষ আর যে দুটী নাই !
নাই নাই নাই !

যখন আমি তোমায় দেখি তোমায় দেখি তোমায় দেখি
যখন তুমি থাক আমার পাশে
তুমি থাক কিসের সাধে !
না-জানি হায় কোন্ পুলকে কোন্ পুলকে কোন্ পুলকে
আকুল আমার দুইটী আঁখি হাসে—
কেবল মনের আঁখি কাঁদে ।
তোমায় দেখি মোর পুলকে—
তোমার মাঝে তুমি ও কে—
তাকেই দেখি তোমার চোখে গো !
সেই যে হাসি জড়ায় মোরে দুখ-ফাঁসে
সেই অ-বাঁধা অডোর দিয়ে বুকে বাঁধে !
তোমায় আমি চাই—
থাকো তুমি অনেক দূরে
অজানা কোন্ বনের পুরে,

তোমার লাগি রাত্রি জাগি
তোমার দেখা নাই !
কোথায় তুমি কোথায় আমি !
কেঁদে কাটাই দীর্ঘ যামি—
আকাশ জুড়ে লক্ষ তারা
কাঁদে নিথর পক্ষ-হারা !—
তাদের শিশির-অশ্রু-ধারা
বাহিরেতেও তাই—
কি না, ঝরচে সকল ঠাঁই !
ব্যথার মালা অশ্রু দিয়ে
গাঁথ্‌চে যে সবাই !
অশ্রু সে যে মর্ত্ত্যের ফুল
স্বর্গে অতুল
নাই তাতে ভুল গো !
নয়ন বেয়ে যেম্‌নি ঝরে ভুঁই—
এম্‌নি ব্যথাটাই—
এক সময়ে কাঁদা কাঁদন
চল্‌তে পারে দুই,
নাই নাই নাই !

শিবরাম চক্রবর্ত্তী ।

ফাঁড়ার খাঁড়া

শ্রীযুক্ত ভারতী-সম্পাদক-যুগলেষু,

বলতে পারেন, এতদিন ধ'রে নিরাপদে সম্পাদকী করচেন কেমন ক'রে ? দেখতে পাই, অনেক লেখকের বইকেই তো প্রথম শ্রেণীর রাবিস ব'লে আপনারা অকুতোভয়ে প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করেন। এও দেখেছি কখনো কখনো কোন কোন লেখককে ঈষৎ সান্ত্বনার সঙ্গে জানিয়ে দেন যে, তাঁর বইখানি একেবারে ছাইভস্ম না হ'লেও তার চেয়ে উঁচু-দরের জিনিষ নয় ! কিন্তু এমন ভাবে সমালোচনা ক'রেও আপনারা অদ্যাবধি ডবল গলার উপরে ডবল মাথা বজায় রেখেছেন কোন্ উপায়ে, আমি তো কিছুতেই সেটা আবিষ্কার করতে পারছি না ! বাঙালী লেখকরা কি এতই নিরীহ যে, হাটের মাঝখানে দাব্‌ড়ি খেয়েও ঘুসি পাকাতে নারাজ ?

কিন্তু মশাই, আমার দেখছি সম্পাদকী করা আর পোষালো না ! আমরা—দৈনিক কাগজের সম্পাদকরা, আপনাদের মতন ভাগ্যবান নই । অসহায়, মশাই, আমরা হচ্ছি একেবারে প্রথম শ্রেণীর অসহায় ! আগে ভাবতুম, কোম্পানীর

মূর্ত্তিগুলির মত অসহায় এ দুনিয়ায় আর কিছু নেই। দুষ্টরা অনায়াসে তাদের নাক-কাণ কেটে দিতে পারে, মুখে আলকাৎরা মাখিয়ে বা মাথায় গোবর-সুবাসিত গোবর ঢেলে দিতে পারে—আর কাক-চিল-চড়ুইরা প্রতিদিন তাদের সর্ব্বাঙ্গে যে কাজ ক'রে যাচ্ছে, তা আর ব'লে কাজ নেই! কিন্তু এখন দেখছি আমরা হচ্ছি তাদের চেয়েও অসহায়! এত দুর্দ্দশার মাঝেও তাদের সেবা-যত্ন করবার জন্যে সরকারি লোক নিযুক্ত আছে, কিন্তু আমাদের মাথার উপরে কেউ নেই, এক ভগবান ছাড়া—তাও না-থাকার মধ্যেই, কারণ বিপদে প'ড়ে প্রাণপণে ডাক্‌লেও কোনদিন তাঁর দেখা বা সাড়া পাওয়া যায় না।

আমরা সনাতন সমাজের বিরুদ্ধে একটি টুঁ করলেই গ্রাহকরা কাগজ বয়কট করবে—সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনও কমবে। ট্রাম-কোম্পানী বা বাংলা থিয়েটারের স্পষ্ট সমালোচনা করলেই 'ফ্রি-পাসে' বঞ্চিত হব। নেতাদের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ আলোচনা করেছি কি অমনি মানহানির মকদ্দমা রুজু হয়েছে! আর প্রজাপক্ষ ছেড়ে রাজপক্ষের দিকে চোখ চাইলেই হাতে লোহার বালা ও পায়ে বেড়ী পরতে হবে! তার উপরে কাগজের সত্ত্বাধিকারী মাহিনা দেবে না, তবু কি কুহকে ভুলে আমরা যে দৈনিকের সম্পাদকী করি, আমরা নিজেরাই তা জানি না!

আরে মশাই, খালি কি তাই? এর উপরে আবার উড়ো-আপদও আছে! দেখছেন তো, কল্‌কাতায় আজকাল কি-রকম গুণ্ডার উপদ্রব? ভাব্‌লুম, যাক্‌, বাঁচা গেল, রোজ তবু কলম ভরাবার একটা নিরাপদ বিষয় জুট্‌ল! বিপুল উৎসাহে রোজ গুণ্ডাদের অত্যাচার আর পুলিসের নির্ব্বিকার ভাব নিয়ে লিখে লিখে দোয়াতের পর দোয়াত খালি ক'রে ফেল্‌লুম—তার ফলে সহরে রাহাজানি কিছুমাত্র কম্‌ল না বটে, কিন্তু আমার কাগজের বিক্রী রীতিমত বেড়ে উঠ্‌ল।

একদিন গুণ্ডা-ডিপার্টমেণ্টের এক কর্ম্মচারী এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে বল্লেন, "মশাই, আমাদের বিরুদ্ধে এত লেখালেখি করছেন কেন?"

আমি সম্পাদকী-চালে গম্ভীর ভাবে বল্‌লুম, "ভদ্রলোকেরা ধনে-প্রাণে মারা যাচ্ছেন, তবু আপনারা হাত গুটিয়ে বসে আছেন ব'লে।"

—"আমরা কি করতে পারি, বলুন। প্রতি পাড়াতেই গুণ্ডার দল রয়েচে, আমরা তাদের নাম-ধাম সব জানি। কিন্তু জেনেও তাদের গ্রেপ্তার করতে পারি না—কারণ, পাড়ার লোকে তাদের বিরুদ্ধে ভয়ে সাক্ষ্য দিতে রাজি হয় না।"

আমি একটু ভেবে দেখলুম, কাগজের নাম জমাবার এই এক মস্ত সুযোগ! আমি যদি আমাদের রিপোর্টারকে পাড়ায় পাড়ায় পাঠিয়ে, গুণ্ডাদের অত্যাচারের কথা তাদের নামসুদ্ধ কাগজে প্রকাশ ক'রে দি, তবে আমার কাগজের নাম ও বিক্রী বাড়তে দেরি লাগবে না। বিলাতী কাগজ-ওয়ালারা পুলিসকে নানারকমে সাহায্য ক'রে থাকে, আমরাই বা করব না কেন? এতে সরকার-পক্ষও আমার উপরে তুষ্ট হবেন।

পুলিসের কর্ম্মচারীকে বল্‌লুম, "আচ্ছা, এবার থেকে আমরাও আপনাদের সাহায্য করবার চেষ্টা করব।"... ...

দু-চার দিন পরেই আমাদের রিপোর্টার দুজন নামজাদা গুণ্ডার নতুন দুটি অত্যাচারের কাহিনী সংগ্রহ ক'রে আন্‌লে। একজন বাঙালী, নাম হরেকৃষ্ণ সাহা; আর একজন বেহারী, নাম রাম-কানাইয়া। যাদের উপরে অত্যাচার হয়েছে, যারা অত্যাচার করেছে, আর যারা স্বচক্ষে দেখেছে,—সকলেরই নাম-ধাম আমি কাগজে প্রকাশ ক'রে দিলুম।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময়ে, আমি আপিসের একটি ঘরে, টেবিলের সাম্‌নে ব'সে হেঁটমুখে, এক মনে গুণ্ডা-দমনের নিশ্চিত সদুপায় সম্বন্ধে একটি প্রাঞ্জল ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করছি, হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত টেবিলের উপরে দড়াম্ ক'রে একটা বেজায় আওয়াজ হ'ল!

চম্‌কে মুখ তুলে দেখি, টেবিলের উপরে প্রায় আড়াই ইঞ্চি মোটা একগাছা লাঠি এসে পড়েছে,—এ লাঠি যদি আমার মাথায় লাগত, তাহ'লে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই এই সম্পাদকীয় মস্তকের চিহ্নটি নিশ্চয়ই নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যেত!

আরো-একটু মুখ তুলে লাঠির মালিককেও আমার সাম্‌নেই দেখতে পেলুম। মাথায় অন্তত ছ-ফুট এক ইঞ্চি উঁচু, চওড়াতেও দেহখানি বপু-বিশেষ, আর গায়ের রং যেন অমাবস্যার নির্য্যাসে প্রস্তুত! চোখদুটো ড্যাবডেবে, নাকটা থ্যাবড়া, ঠোঁট পুরু-পুরু, চোয়ালের হাড় মস্ত চওড়া,—যাকে বলে পাকা 'ক্রিমিন্যালে'র একটি মূর্ত্তিমান 'টাইপ'!

বুকটা কেমন দুদ্দুড় ক'রে উঠল!… …হঠাৎ আমার পায়ের উপরে কোঁশ ক'রে কে নিশ্বাস ফেল্‌লে—তাড়াতাড়ি টেবিলের তলায় চেয়ে দেখি, একটা বিতিকিচ্ছি বুলডগ বাঁকা বাঁকা চারখানা ঠ্যাঙের উপরে দাঁড়িয়ে একমনে, অত্যন্ত সন্দেহের সঙ্গে আমার পা শুঁকছে! তার সঙ্গে চোখোচোখি হবামাত্র সে গর্‌র্‌র্‌র্‌ ক'রে এক চাপা হুঙ্কারে আমাকে স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিলে, তার দিকে তাকালে আমার পক্ষে মোটেই ভালো হবে না! ভয়ে স'রে যেতেও পারলুম না—কি-জানি যদি ঘ্যাক্‌ ক'রে কাম্‌ড়ে দেয়?

আড়ষ্ট ও অসহায়ের মত চেয়ারের উপরে ব'সে, আমার সেই মানব-জাতীয় অনাহূত অতিথির দিকে চেয়ে করুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি কে মশাই?"

ঠিক যেন হাঁড়ির ভেতর থেকে আওয়াজ বের হ'ল—"আমার নাম শ্রীহরেকৃষ্ণ সা!"

হরেকৃষ্ণ সাহা? সেই বিখ্যাত গুণ্ডা—যার কীর্ত্তি-কাহিনী আজই আমি কাগজে জাহির ক'রে দিয়েছি? আমার দেহের রক্ত যেন বরফ হয়ে গেল—হরেকৃষ্ণর এখানে কি দরকার? নিশ্চয়ই সে নিজের কবিতা ছাপাবার জন্যে আমার খোসামোদ করতে আসে-নি!… …যে-জন্যেই আসুক, তাকে চিনেছি একেবারে সে ভাবই না দেখিয়ে যথাসম্ভব সহজ স্বরে আমি বললুম, "আপনি কি চান?"

—"এডিটারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

—"কি দরকার?"

সে লাঠিটা নিয়ে মাটির উপরে অধীরভাবে ঠুকে ক্ষাপ্পা হয়ে বললে, "অত কথার জবাব দিতে আমি পারব না, কাগজে আজ আমাকে বদনাম দিয়েচ" বল্‌তে বল্‌তে সে আমার দিকে উগ্রমূর্ত্তিতে কয়েক পা এগিয়ে এল!

প্রাণের ভয় বড় ভয়। আমি তাড়াতাড়ি মিথ্যা কথা বললুম, "না, না,—আমি এখানকার এক কেরাণী!"

—"তবে যাঃও—ডেকে আনো তোমাদের এডিটারকে!"

—"আজ্ঞে, এখনি ডেকে আন্‌চি, কিন্তু আপনার কুকুরটাকে আগে ধরুন!"

হরেকৃষ্ণ হেট হয়ে কুকুরের বগ্‌লস্‌ ধরে বল্‌লে, "যাও, বেশী দেরী হয় না যেন!"

—"আজ্ঞে না, আমি দু-'মিনিটের ভেতরেই এডিটরকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি!" বল্‌তে বল্‌তে আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম!

উঃ, কি বাঁচাই বেঁচে গেছি! হরেকৃষ্ণ নিশ্চয় প্রতিশোধ নিতে এসেছে! আমি আর দাঁড়ালুম না—প্রতি লাফে দু-দুটো ধাপ পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌তে লাগলুম।

হঠাৎ দেখি, সিঁড়ির নীচে থেকে লাঠি-হাতে আর একটা লোক লাফাতে লাফাতে উপরে উঠছে—তারও চেহারা হরেকৃষ্ণর মতই লম্বা-চওড়া! আমি দস্তুরমত দমে গেলুম, পাছে আমি পালাই, হরেকৃষ্ণ কি তাই এখানে একে পাহারায় রেখে গেছে?

তার পাশ কাটিয়ে নেমে যাচ্ছিলুম, সে কিন্তু আমায় ছাড়লে না। আমার একখানা হাত সবলে চেপে ধ'রে, ভাঙা-ভাঙা বাংলায় রুক্ষস্বরে সে যা বললে, তাতে বুঝলুম তার নাম রাম-কানাইয়া, সে এডিটর-বাবুর সঙ্গে এখনি 'মুলাকাৎ' করতে চায়!

রামকানাইয়া! এও এক বিখ্যাত গুণ্ডা, এরও কীর্ত্তির কথা আজকেই প্রকাশ ক'রে দিয়েছি! হরেকৃষ্ণ যে জন্য আমাকে খুঁজ্‌ছে, এরও উদ্দেশ্য যে তাই, তখনি সেটা বুঝে নিলুম।

ধাঁ-ক'রে মাথায় একটা ফন্দি জুটল! তাড়াতাড়ি বললুম, "সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ-দিকের প্রথম ঘরে এডিটর-বাবু ব'সে আছেন। কিন্তু সাবধানে ঘরে ঢুকো, বাবুর

উপরে উঠল, আমিও বেগে নীচে নেমে বাড়ী থেকে বেরিয়ে প'ড়ে হাপ ছেড়ে বাঁচলুম।

** ** ** **

ঘণ্টা-দুই পরে সন্তর্পণে ফিরে এসে আপিস-ঘরে ঢুকে দেখলুম, টেবিলের কাগজ-পত্তর সব তছ্‌নছ্‌ হয়ে গেছে! মেঝের উপর চেয়ারগুলো উল্টে প'ড়ে রয়েছে, এখানে ওখানে রক্তের দাগ, ছেঁড়া জামা-কাপড়ের টুক্‌রো, একগাছা ভাঙা লাঠি ও একপাটি জুতো!... ...হরেকৃষ্ণ আর রামকানাইয়া সেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে! কিন্তু আশা করি, আপাতত ছ-মাস ঝোল-ভাত না খেয়ে তারা কেউ আর এ-মুখো হবে না!

রামঃ! এই নাক মল্‌চি, কাণ মল্‌চি মশাই, আমার গুণ্ডা-দমনের চেষ্টা এই পর্যান্ত! সম্পাদকীয় সূক্ষ্মবুদ্ধির মহিমাতেই ফাঁড়ার খাঁড়া এবারে তাগ ফস্‌কে ঘাড়ের পাশ দিয়ে চ'লে গেল, নইলে কি হ'ত বলুন দেখি?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বাবাবেক্‌ ও সাধুসন্ন্যাসীর দল

(Voltaire)

ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন আবাসভূমি, গঙ্গাতীরস্থিত বারাণসী নগরীতে যখন আমি ছিলাম, তখন আমি কিছু খোঁজ-খবর লইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি হিন্দুস্থানী এক রকম মন্দ জানিতাম না; আমি অনেক শুনিতাম, আর, বেশ নজর করিয়া প্রত্যেক জিনিস দেখিতাম। আমার পত্র-লেখক ওমরির বাসায় আমি থাকিতাম। অমন ভাল লোক আমি আর কখনো দেখি নাই। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, আর আমি মুসলমান; তথাপি মহম্মদ ও ব্রহ্মার সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোন কথা-কাটাকাটি বা রাগারাগি হয় নাই। আমরা উভয়ে আমাদের শাস্ত্রানুসারে স্নানাদি করিতাম; কিন্তু দুইটি ভাইয়ের মত একই পাত্র হইতে সর্ব্বৎ পান করিতাম, একই থালা হইতে অন্ন গ্রহণ করিতাম।

একদিন আমরা দুজনে একসঙ্গে বিষ্ণু-মন্দিরে গেলাম। সেখানে কতকগুলি সন্ন্যাসীর দলকে দেখিলাম; তাহাদের মধ্যে কেহ বা ধ্যান-যোগী কেহবা হঠ-যোগী। সকলেই ত জানে, ইহাদের একটা পণ্ডিতী ভাষা আছে; ইহা প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের ভাষা; এবং এই ভাষায় লিখিত একটি গ্রন্থের নাম "বেদ"। ইহা নিশ্চয়ই সমস্ত এসিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ—জেন্দাবেস্তা অপেক্ষাও প্রাচীন।

একজন সাধু এই গ্রন্থ পাঠ করিতেছিল, আমি যখন তাহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলাম, সে বলিয়া উঠিল:—

"আঃ! হতভাগ্য ম্লেচ্ছ! আমি যে সকল স্বর-বর্ণ গণনা করিতেছিলাম তোমার এখানে আসার দরুণ, তার সংখ্যা হারাইয়া ফেলিয়াছি; ইহার ফলে,—তোতা পাখীর শরীরের মধ্যে না গিয়া আমাকে খর্গোসের শরীরের মধ্যে যাইতে হইবে।"

আমি তাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য একটা টাকা দিলাম। আর কয়েক পা অগাইয়া গিয়া, দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার একটা হাঁচি হইল। এই হাঁচির শব্দে ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইল। সে বলিয়া উঠিল:—

"কোথায় আমি? কি ভীষণ পতন! নাকের ডগাটি আর যে আমি দেখিতে পাইতেছি না; স্বর্গীয় জ্যোতি অন্তর্হিত হইয়াছে।" *

আমি বলিলাম;—আমার জন্য যদি এই ক্ষতি হইয়া

---

* এইখানে Voltaire-এর একটা টিপ্পনী আছে: যখন তপস্বীরা এই স্বর্গীয় জ্যোতি দেখিতে চাহেন, তখন তাঁহারা নাকের ডগার উপর তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন" Braid সাহের "সম্মোহন" ব্যাপারে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন।

থাকে, তাহা হইলে এই ক্ষতিপূরণের জন্য একটা টাকা দিতেছি; তোমার স্বর্গীয় জ্যোতি আবার ফিরাইয়া আনো।"

এই সঙ্কট হইতে কোন রকমে উদ্ধার পাইয়া, হঠ-যোগীদের নিকট উপস্থিত হইলাম। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ কতকগুলা পেরেক আনিয়া বলিল, ব্রহ্মার সম্মানার্থে, এই পেরেকগুলি তোমার বাহুতে, তোমার উরোতে গুঁজিয়া দেও। কিন্তু আমি এই পেরেকগুলি আমার কার্পেটে মারিবার জন্য খরিদ করিলাম। কেহ বা হাতের উপর ভর দিয়া নৃত্য করিতেছিল; কেহ বা শিথিল দড়ির উপর হাঁটিয়া চলিতেছিল। কেহ বা এক পায়ের উপর ভর দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়াইতেছিল। কেহ বা কণ্ঠে শৃঙ্খলের ভার বহন করিতেছিল, কারও বা পিঠে গুরুভার মোটের বোঝা, কেহবা শস্য-দানা-রাশির ভিতর মুখ গুঁজিয়া ছিল;—সাধু বলিয়া ইহাদের খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি।

আমার বন্ধু ওম্‌রি তাহার পর একজন প্রখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানীর কোটরে আমাকে লইয়া গেল। তাহার নাম বাবাবেক্। লোকটা বানরের মত একেবারে উলঙ্গ; তাহার কণ্ঠে একটা বৃহৎ শৃঙ্খল ঝুলিতেছিল—ওজনে প্রায় ৩০ মন হইবে। ছোট ছোট তীক্ষ্ণধার পেরেক-লাগানো একটা কাঠের চৌকিতে সে উপবিষ্ট—সেই পেরেকগুলা তাহার শরীরে বিদ্ধ হইয়াছে—তবু মনে হইতেছে যেন সে মখমলের আসনে বেশ আরামে বসিয়া আছে। দৈববাণীর বক্তা মনে করিয়া, পারিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাহার পরামর্শ গ্রহণ উদ্দেশে অনেক স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট আসিয়াছে। এক্ষণে ইঁহার অপরিসীম খ্যাতি প্রতিপত্তি। ওম্‌রির সহিত তাঁহার এইরূপ বাক্যালাপ চলিতেছিল, :—

ওম্‌রি বলিল!—

"বাবা! আপনার কি মনে হয় বার বার জন্মান্তর গ্রহণের পর আমি ব্রহ্মলোকে পৌঁছতে পারব?" সন্ন্যাসী বলিলেন:—

"কিরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছ, তাহার উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে।"

"আমি একজন ভাল নাগরিক, ভাল স্বামী, ভাল পিতা, ও ভাল বন্ধু হইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আবশ্যক হইলে আমি বিনা সুদে ধনীদিগকে টাকা ধার দিই এবং গরিবদিগকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকি। এবং আমার প্রতিবাসীদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপনেরও চেষ্টা করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"পেরেকের উপর উপবেশন কর কি?"

"না বাবা, তা করি না।" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন:— "বড়ই দুঃখের বিষয়; উনবিংশতিতম স্বর্গে তুমি কখনই প্রবেশ লাভ কর্‌তে পার্‌বে না। বড়ই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।" ওম্‌রি বলিল:—

"তাই হোক্। আমার অদৃষ্টে আমি সন্তুষ্ট আছি।

উনবিংশতিতম, বিংশতিতম স্বর্গ পাই বা না পাই তাতে কি আসে-যায় যদি আমার এই জীবন-তীর্থের সদ্ব্যবহার করতে পারি। এই সংসারে সৎপথে থেকে ভাল কাজ করলেই কি যথেষ্ট হয় না? তাহলেই ব্রহ্মধামে গিয়ে কি সুখী হওয়া যায় না?

তোমার এই সব শৃঙ্খল ও পেরেক-রাশি নিয়ে তুমি কোন্ স্বর্গে যাবার প্রত্যাশা কর?

বাবাবেক বলিল:—

"পঞ্চত্রিংশতিতম স্বর্গে।"

ওম্‌রি উত্তর করিল,—

বেশ মজার লোক ত তুমি; আমার চেয়ে তুমি উচ্চ লোকে যাবে? তোমার আশাটা বড় বেশী, তাই এই রকম মনে করচ। যারা ইহলোকে মানমর্য্যাদা চায় তাদের তুমি নিন্দা করে থাক, আর তুমি নিজে পরলোকের মান-মর্য্যাদার জন্য লালায়িত? তাছাড়া, আমার চেয়ে তোমার যে ভাল গতি হবে, এ প্রত্যাশা তুমি কেন করছ? আমি দশদিনে গরিবদের যা দান করি,—দশবৎসর ধরে তুমি যে পেরেকের উপর বোসো সেই পেরেকের মূল্যের চেয়ে তা ঢের বেশী। তুমি উলঙ্গ হয়েই জীবন যাপন কর, কিংবা গলায় শিকল ঝুলিয়েই জীবন যাপন কর, তাতে

প্রণালীটি কি চমৎকার! আমার মনে হয়, যে ব্যক্তি শুধু— শাকসব্জির বীজ বপন করে, যে বৃক্ষাদি রোপণ করে, তারাও তোমাদের মত নাকের-ডগা-দেখা, গায়ে-পেরেক-গোঁজা সাধুদের চেয়ে ঢের ভাল। তাদের অন্তরাত্মা ঢের উন্নত।"

এই কথা বলিয়া ওম্‌রি, বাবাবেককে সান্ত্বনা করিয়া, সাধ্যসাধনা করিয়া, মিষ্টি কথায় লওয়াইয়া, আপনার মতে আনিল। তখন বাবাবেক তাহার পেরেক ও শৃঙ্খল-রাশি সেইখানে ফেলিয়া দিয়া ওম্‌রীর সঙ্গে ওম্‌রির বাড়ীতে গিয়া ভদ্রলোকের মত জীবন যাপন করিতে লাগিল। ওম্‌রি তাহার গা বেশ ঘসা-মাজা করিয়া, তাহাতে অগুরু-চন্দন লেপন করিয়া, দিব্য বস্ত্র পরাইয়া সযত্নে আপনার নিকটে রাখিল। সে বলিল, পূর্ব্বাপেক্ষা সে সাতগুণ সুখে আছে। ১৫ দিন মাত্র এইভাবে ছিল। কিন্তু যখন তাহার কাছে লোক আসা বন্ধ হইল—স্ত্রীলোকদের আসা বন্ধ হইল, তখন তাহার পূর্ব্বখ্যাতি পুনরুদ্ধার করিবার জন্য সে সেখান হইতে পলায়ন করিয়া আবার পেরেকের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাব্‌লা

৮

গৌরীকে আর চিঠির জবাব দেওয়া হইল না। দেওয়ার কথা মনে হইলে শৈলর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে! মনে হয়, তারা যেন দুজনে জীবনের মধ্য-পথে হঠাৎ একদিন একটা দম্‌কা হাওয়ার বেগে মিলিয়াছিল—হাসি, আশা, আনন্দের উচ্ছ্বাসের মাঝে এক নূতন জগৎ রচনা করিবার কল্পনা লইয়া! সে পথে একটু চলিতেই প্রলয়-ঝড়ে তার যা-কিছু আশা-আনন্দ, সব ছিঁড়িয়া ঝরিয়া কোথায় মাটীর মধ্যে লুটাইয়া পড়িল! সে গল্পে শুনিয়াছে, নদীর জলে একটা নৌকা ডুবিলে তার চারি-ধারে জলের এমন ঘূর্ণী গড়িয়া ওঠে যে কাছাকাছি অন্য নৌকা থাকিলে সে ঘূর্ণী বেড়াপাকে টানিয়া ঘিরিয়া সেটিকেও ডুবাইয়া দেয়! শৈল ভাবিল, তার হাওয়া যদি গৌরীর গায়ে লাগে! সে কথা মনে হইলে তার-সর্ব্ব-শরীর শিহরিয়া ওঠে!

না, গৌরীর ধারও শৈল কোনদিন মাড়াইবে না, ইহাই সে ঠিক করিল। তার হাসি-ভরা মুখ অভিমানের কালো মেঘে ভরিয়া যাইবে? তা যাক্—সে সহা যায়, কিন্তু…না!

না হয় গৌরী ভাবিবে, শৈল নিষ্ঠুর, পাষাণ, কি শীঘ্রই তাকে ভুলিয়া গিয়াছে! ভাবুক তা,—গৌরীর জীবনের কোনোখানে সে কোনদিন আসিয়া পড়িয়াছিল, এ কথাও গৌরীর মন হইতে যদি মুছিয়া যায়, তাও শৈলর প্রাণে সহ্য হইবে! কিন্তু তার অদৃষ্টে যা ঘটিয়াছে, আর কারো…বিশেষ গৌরীর…না!

শৈল ভাবিল, সে-ও এখন হইতে গৌরীকে শুধু দারুণ দুর্দ্দিনের মাঝে, প্রলয়ের এই প্রচণ্ড অন্ধকার আর নানা দুঃখ-বেদনার মাঝে ছোট্ট একটু সুখ-স্বপ্নের স্মৃতির মতই মনের কোণে গুঁজিয়া রাখিবে! তার বেশী সে চায় না, চাহিতে সাহসও নাই তার!

গৌরী ওদিকে রোজই ভাবে, আজ দিদির চিঠি নিশ্চয় আসিবে! পিঠে ব্যাগ-ঝুলানো ডাক-পেয়াদার আসার সময়টায় সে এমন চঞ্চল হইয়া থাকে যে আর-কিছুতে মন লাগে না। তারপর সে-সময় উৎরাইয়া যায়, ডাক-পেয়াদার চিহ্নও যখন দেখা যায় না, তখন নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, চিঠি আজ আসিল না…কাল নিশ্চয় আসিবে। তার মন এমনি আশা করিয়া-করিয়া শেষে আশা করিবার শক্তিও যখন হারাইয়া ফেলিল, তখন সে একদিন স্বামীকে ধরিল,—ঠিকানা ভুল হয়েছে তোমার, নিশ্চয়—নৈলে শৈলদির চিঠি পেতেও দেরী হয়!

স্বামী বলিল,—না গো না, ঠিকানা ঠিক লিখেছি।

গৌরী অভিমানের সুরে বলিল,—হ্যাঁ, ঠিক লিখেচ! তাহলে চিঠির জবাব আসচে না কেন!

স্বামী বলিল,—লোকের কাজ-কর্ম্ম আছে তো—তোমার মত কেবলি পুতুল-খেলায় দিন কাটানোর ভাগ্যও নয়! জবাব আসবে'খন।

গৌরী অভিমানের ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল,—আবার কবে আসবে! এত দিন হয়ে গেল…

স্বামী বলিল,—আর-একখানা চিঠি না হয় লেখো…সে চিঠি না পৌঁছলে এতদিনে ফিরে আসত।

গৌরী অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া রহিল। স্বামীর উপর অভিমান হইল, শৈলর উপর অভিমান হইল—কেন সে চিঠির জবাব দিল না? এখানে তার প্রাণটা কি রকম আকুল হইয়া আছে! জবাব পাইলেই যে সে যেমন করিয়া পারে, কলিকাতায় তার বাড়ীতে যায়!

গৌরী আবার বসিয়া আর-একখানি চিঠি লিখিল। সে চিঠিতে কত আকুলতা, কত অভিমান, বেদনার কত অশ্রুই যে ঢালিয়া দিল!

চিঠি লিখিবার পর একদিন, দুই দিন, তিন দিন করিয়া পনেরোটা দিন কাটিয়া গেল, তবুও কোনো জবাব আসিল না। গৌরীর অভিমান হইল, তারপর সে রাগিয়া গেল—দিদি এমন যে তাকে ভুলিয়া গেল!

অভিমানের ব্যথাটা যখন খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তখন ওদিক হইতে আর একটা কথা মনে জাগিল,—দিদির অসুখ হয় নাই তো? বাবলা-মণি…? তখন নিমেষে সব অভিমান সব রাগ কোথায় উবিয়া গেল—দারুণ দুশ্চিন্তায় মন পাগল উঠিল—কিছু ভালো লাগে না! স্বামীর আদর, স্বামীর সোহাগ, তরুণ যৌবনের কুঞ্জে বিহ্বল পাখীর মদির গান, দুনিয়ার আলো,—মনে হইল, এগুলা কিছু না, কিছু না! এ দুশ্চিন্তার মধ্যে কাঁটার মত সেগুলা মনে ফুটিয়া তার মনকে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত করিয়া তুলিল। সমস্ত প্রাণ তার বেদনায় টাটাইয়া উঠিল। সে গিয়া স্বামীকে ধরিল,—ওগো, তুমি একদিন কলকাতায় ঘুরে এসো না।

কার সঙ্গে নিমেষের দেখা—একটা চিঠির জবাব দিবার যে তোয়াক্কা রাখে না, তার সময়ও হয়তো নাই,—তার পিছনে এ-ভাবে ঘোরা—এ যে নিতান্ত ছেলেমানুষী!

কিন্তু গৌরী তো তা বুঝিতে চায় না! মুহূর্ত্তের দেখা সে কি—সে যে শৈল-দি, আর বাব্‌লা…স্বামী কি বুঝিবে, তারা গৌরীর প্রাণখানার মধ্যে কতখানি জায়গা জুড়িয়া আছে, তাদের খবর না পাইলে সে কতখানি হাঁফাইয়া ওঠে…! বিশেষ এই নির্লিপ্ততা, এই অবহেলা…এ যে তার বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ ছুরির মত বিঁধিতেছে, সর্ব্বক্ষণ!

একটা রবিবারে স্বামীকে শেষ যাইতে হইল। কিশোরী প্রিয়ার চোখের জল, বেদনার কাতরতা, এ বয়সে উপেক্ষা করার নয়! স্বামী এখনো তরুণ, তরুণীর বেদনা প্রাণে বেশী করিয়াই বাজে—বিশেষ যে তরুণী আবার জীবনের কুঞ্জে নিত্য নব ফুলের রাশি ফুটাইয়া তুলিতেছে—রূপে রসে গন্ধে ফুলের সাজি ভরিয়া তার অতৃপ্ত চিত্তের সাম্‌নে ধরিতেছে…

কিন্তু কলিকাতা হইতে যে খবর লইয়া সে ফিরিল, সে খবর গৌরীকে সে দিতে পারিল না। তৃষিতের অধরে জলের পরিবর্ত্তে এ যে জ্বলন্ত আগুন দিতে হয়! এর হল্‌কায় তার গৌরীর প্রাণটুকু যে তাতিয়া জ্বলিয়া ছাই হইবে! তার জীবন-কুঞ্জের যত ফুল তার তাপে জ্বলিয়া মরিবে, সে বেচারারও মধুর পাত্র অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে! মাঝে হইতে নানা দুঃখ, নানা অশান্তির সৃষ্টি হইবে। স্বামী তাই মিথ্যা করিয়া বলিল, তারা সে বাড়ী ছাড়িয়া আর কোথায় গিয়াছে। কোথায় যে গিয়াছে, বাড়ীর কেহ তা বলিতে পারিল না।

শুনিয়া গৌরীর অভিমান হইল,—রাগও হইল। হাসির রেখা মন হইতে ঝাড়িয়া মুছিয়া সে একেবারে পাথরের মত কঠিন হইয়া রহিল, রুক্ষ মুখ, বিরস মন,—স্বামীর সোহাগে মনের মুখের সে ভাব ঘুচিল না।

পড়িয়া পড়িয়া কেবলি সে ভাবিতে লাগিল, কেন দিদি এত অকরুণ হইল! এত আশা দিয়া, বুকের মধ্যে অমন

গৌরীর দুই চোখে জল ছাপিয়া আসিল। এ কি সম্ভব! দিদিও এমন করিয়া তাকে ভুলিয়া যাইতে পারে! এই অবহেল…!

৯

সেদিন শোকের অশুচি কাটাইবার জন্য বাব্‌লা আর শৈলকে লইয়া ভগবতী গঙ্গার ঘাটে গিয়াছিলেন। স্নান করিয়া সাদা থান পরিয়া শৈলর মনে হইল, ঐ ময়লা শাড়ীখানার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর যা-কিছু স্মৃতি, স্বামীর যা-কিছু সম্পর্ক সব সে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। এ বেশে এই যে নূতন শৈল আজ জগতের বুকে দাঁড়াইল, ইহাকে দেখিয়া স্বামী কি আর চিনিতে পারিবেন! সমস্ত জগৎটা মুহূর্ত্তে দুই ডাগর চোখের আকুল দৃষ্টির মাঝে বিলুপ্ত হইয়া গেল। শৈল যেদিকে চায়, কিছু নাই, শুধু কার দুটি আকুল চোখ ব্যাকুল সন্ধানে খুঁজিয়া ফিরিতেছে, কোথায় তার সেই শৈল, সেই শৈল গো! বেদনার ভারে মন তার এমন ভারী হইয়া উঠিল যে সে আর নিজেকে দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারিল না—বেদনার ভারেই ঝুঁকিয়া সে বসিয়া পড়িল। তাদের স্নান করাইয়া ভগবতী তখন স্নানে নামিয়াছেন।

গঙ্গার জলে কত লোক স্নান করিতেছে! একটা মিশ্র কলরবের প্রবল উচ্ছ্বাস জলের কোল হইতে উঠিয়া সারা আকাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সে কলরব অস্ফুট গুঞ্জন-রবের মতই শৈলর কাণে আসিয়া লাগিতেছিল। চোখ তার গঙ্গার অবাধ প্রসারের উপর দিয়া ভাসিয়া ছুটিল—ঢেউয়ের হাসি ফুটাইয়া গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে—কোথায় কোন্ সীমাহীন সুদূরে কোন্ অজানা লোকের তটের উদ্দেশে…! ওপার কালির রেখার মত জাগিয়া আছে! ঐটাই যেন জগতের শেষ সীমা! ঐ সীমার প্রান্তে গেলে তাহাকে পাওয়া যায় কি! ঐ সীমাহীন প্রসারের একেবারে শেষে…!

জল-ভরা দুই চোখের সামনে, নদীর জলে ঢেউয়ের মাথায়, ঐ ধূসর আকাশের পটে মাঝে মাঝে পূর্ণর মুখের ছায়া যেন ফুটিয়া ওঠে—আর শৈলর মন অমনি ছুটিয়া চলে তাকে ধরিবার জন্য,—তার কাণে বেদনার একটি অতি-ক্ষীণ মিনতির বাণী শুনাইবার জন্য! কিন্তু হায়, সে যে সুদূরের, সুদূরেই মিলাইয়া যায়!

পাশে কোথা হইতে সহসা এক বেদনাতুর নারীর কণ্ঠে শোকের প্রবল আর্ত্তনাদ জাগিয়া উঠিল। বিলাপের কি মর্ম্মভেদী আকুল কণ্ঠস্বর! সে স্বর বাজের মত শৈলর বুকে ধাক্কা দিল, বিষম বেগে। অমনি তার মর্ম্ম হইতে চিন্তার বিচ্ছিন্ন আল্‌গা টুকরাগুলা কোথায় মিলাইয়া গেল। সে আর্ত্তনাদ ছুরির ফলার মত এই লোক-ভরা হাসি-ভরা স্থানটাকে চিরিয়া একেবারে রক্তময় করিয়া তুলিল,—বাতাসে শুধু রক্তের ঢেউ ছুটিয়াছে, সারা দুনিয়ায় কেবলি রক্তের মাতন! মৃত্যুর রক্ত-নিশান আর-সব ঢাকিয়া বিজয়-গর্ব্বে আপনাকে সবার উপরে খাড়া করিয়া ধরিয়াছে! সব কলরব তার কানের পাশে মূর্চ্ছিত স্তব্ধ হইয়া গেল। সে চক্ষু মুদিল। তারপর কখন চোখ খুলিয়া ভগবতীর হাত ধরিয়া আবার গাড়ীতে চড়িয়াছে, ও সে-গাড়ী হইতে নামিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়াছে—সে-সব যেন একটা অস্পষ্ট স্বপ্ন!

সারা দিন মন কেমন নিঝুম আচ্ছন্নের মত রহিল। মন হইতে সব চিন্তা সরিয়া গিয়াছিল—কেবল একটা কথা জাগিয়া ছিল। তার জীবনে মহা-প্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে! তার যা-কিছু সে গুছাইয়া তুলিয়া রাখিতে পারে নাই—সে প্রলয় সব লইয়া গিয়াছে! ভিতরকার যা-কিছু আসল পদার্থ সব লইয়া রাখিয়া গিয়াছে, শুধু একটা জীর্ণ খোলস—সে ঐ-সবেরই মধুময় ছোট্ট একটু স্মৃতি! আর থাকিয়া থাকিয়া কাণে বাজিতেছিল, ঘাটের ধারের সেই আকুল আর্ত্তনাদ! নিরুপায়তার কি সে প্রচণ্ড আর্ত্তরব!…তাহারি মধ্যে পাক খাইয়া মনটা ফুলিয়া মরিতেছিল—এ কি সম্ভব! পূর্ণকে কোন দিন কি সে আপনার পাশটিতে পাইয়াছিল, প্রাণের মাঝে, বুকের মাঝে—আপনার এক, আপনার সব বলিয়া? না, পূর্ণ একটা স্বপ্ন!

অঙ্গের এই সাদা থানখানা ওদিকে আগুনের জ্বা ধরাইয়া দিয়াছিল! এ যে রিক্তের সাজ—সব-হারা চির-দুঃখীর সাজ…শোকটা নূতন করিয়া শ্রাবণের ঘন কালো মেঘের মত সমস্ত মনকে অমনি জুড়িয়া বসিল। মনের ভিতরে

তার যা-কিছু ছিল, আশা, হাসি, ব্যথা, অশ্রু—সব একেবার তার আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল।

আশ-পাশের লোকের আহ্বানে এক-একবার এ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, চেতনা জাগে,—বাব্‌লাকে খাওয়ানো, তাকে শোওয়ানো, তাকে দেখা, এগুলা স্বপ্নের জাল ছিঁড়িয়া দেয়। এই বেদনার মধ্যে হাত-পা আবার নড়িয়া-চড়িয়া সংসারকে আঁকড়াইয়া ধরে, কলের মত চলা-ফেরা করিয়া আবার তাকে ছাড়িয়া ফিরিয়া আসে, সেই স্বপ্ন-লোকেরই দ্বারের পাশে! মন অমনি চকিতে সেই আঁধারে-ছাওয়া অজানা লোকের মধ্যে ঢুকিয়া নিজেকে মুহূর্ত্তে হারাইয়া ফেলে!

কিন্তু এমন করিয়া মানুষের দিন চলে না, চলিতে পারে না। কর্ম্মচক্রের দুর্লঙ্ঘ্য ইঙ্গিত মানুষের মনকে নাড়া দিয়া দিয়া এমন করিয়া তোলে যে এ-স্বপ্ন সেখানে আসন পাতিয়া বসিবার সুযোগ পায় না,—সে ঐ চকিত-পরশের দোলা দিয়া যায়! কর্ম্মের রথচক্রের দারুণ ঘূর্ণীপাকে সে ছিট্‌কাইয়া পড়ে!···এ কার বিধান, জানি না! তবে এ বিধান না থাকিলে মানুষের পক্ষে দুনিয়ায় টিঁকিয়া থাকা অসম্ভব হইত! জগৎও যুগ যুগ ধরিয়া নিশ্চল পড়িয়া থাকিত!

এমনি একটা ইঙ্গিত আসিয়া তড়িৎ-রেখার মত শৈলকে একদিন স্পর্শ করিল। হঠাৎ সে চেতনা পাইয়া দেখিল লালবিহারীর বড় জ্বর। ভগবতী কাঁদিয়া বলিলেন,—কে দেখে! আর কি আমার পূর্ণ আছে যে ছুটে গিয়ে ডাক্তার আনবে, ওষুধ আনবে!

চোখের জল মুছিয়া শৈল বলিল,—আমি আছি মা।

সনাতন গিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। রোগী দেখিয়া ডাক্তার বলিল, ব্যারাম শক্ত—নিউমোনিয়া।

ডাক্তারের মুখে এই কঠিন রায় শুনিয়া বাড়ীতে আতঙ্ক পড়িয়া গেল। মৃত্যু এই সেদিন আসিয়া এ-বাড়ীতে হানা দিয়া গিয়াছে! কে জানে, সেই ফাঁকে সে হয়তো দেখিয়া গিয়াছে, এখানে লইবার মত প্রাণ-বস্তু আরো একটি আছে! সর্ব্ব-হারা বেচারী নারীর একমাত্র আশার কাঠি, ঐ যার মুখ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে পিপাসার দল···! শৈল শিহরিয়া উঠিল।

তারপরেই সে আপনার মনকে শক্ত করিয়া ফেলিল। এসো তো মরণ, তোমায় দেখি এবার! সেবারে আমার চোখের আড়াল ছিল বলিয়াই সব লইয়া পলাইয়াছে,—এবার আমার এই সজাগ চোখের সাম্‌নে হইতে লও দিকি এই ছোট্ট প্রাণটুকুকে! একবার তোমার সঙ্গে লড়িয়া দেখি,—দেখি, তুমি আমার অত-বড় শত্রু—এসো, তোমার সে চুরির শোধ দি, এসো, এই ছোট্টটুকুকে তোমার গ্রাস হইতে ছিনাইয়া লই!

তার শরীরে-মনে কোথা হইতে প্রচুর বল আসিল। মন বলিতে লাগিল, প্রাণপণে যোঝো, মরণকে হঠাও!

সে যেন সত্যই মরণের সঙ্গে যুঝিতে বসিল। শোক ভুলিল, বাবলাকেও সে ভুলিয়া গেল। রোগ-তপ্ত শিশুকে বুক পাতিয়া মৃত্যুর সামনে আড়াল করিয়া ধরিল। মন যখন মাঝে মাঝে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন সে কাতর চিত্ত স্বামীর উদ্দেশে উজাড় করিয়া দিয়া ডাকে,—ওগো, তুমি একে বাঁচিয়ে তোলো, তুমিই শুধু পারো একে বাঁচাতে! তোমায় চোখের সামনে রাখতে পারিনি—তাই মরণ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এখন ওপারে তুমি, আর এপারে নিরুপায় আমি—ওপার থেকে আমায় তুমি শক্তি দাও, মরণকে যেন আমি হঠাতে পারি!

এ আকুল সংগ্রাম ব্যর্থ হইল না। লালবিহারী বাঁচিল। যেদিন ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন, আর ভয় নাই, সেদিন ভগবতী শৈলকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া ডাকিলেন,—মা—

তাঁর মুখে কথা বাধিয়া গেল। ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন,—সত্যিই তুমি আমার মা। তুমি না হলে কেউ একে ফেরাতে পারত না! তাই ভাবি, তোমার কপালেও এই ছিল, মা!···

এই দীর্ঘ প্রাণ-পণ সংগ্রামে শৈলর শক্তি একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিল। আজ সব কাজের অবসানে শরীর-মনের অবসাদে শ্রান্তিতে সে একেবারে

শৈল লালবিহারীর পানে চাহিল—তার ছোট্ট দেহখানি শীর্ণ একটা পাতের মত বিছানায় মিশাইয়া গিয়াছে! শৈল চাহিয়া চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল! মরণের সর্ব্বগ্রাসী থাবার যা আঁচড়ের দাগ ঐ যে ছোট্ট শিশুর সর্ব্বাঙ্গে ঐ লেপিয়া রহিয়াছে! তার মনে পড়িল, ছেলেবেলার একদিনকার দৃশ্য—গ্রামের পুকুর-ঘাটে তার খেলার সাথী জুবি ডুবিয়া গিয়াছিল, দশ বছরের মেয়ে জুবি। তারি চীৎকারে সকলে আসিয়া পড়ে পুকুর-ধারে, আসিয়া টানিয়া জুবিকে তীরে তোলে। তার নির্জ্জীব স্পন্দহীন দেহখানি তালগাছের গুঁড়ি-ফেলা ঘাটের কোলে পড়িয়া ছিল—তারপর কত কষ্টে ধীরে-ধীরে প্রাণটুকু ফিরিয়া আসে, সে আবার চোখ মেলিয়া চায়! এও ঠিক তারি মত! ঐ স্পন্দহীনের মতই দেহখানি পড়িয়া আছে—তাকে যেন কোন্ অতল জলের তল হইতে সে টানিয়া তুলিয়াছে! ঐ শীর্ণ ম্লান দেহ! এখন উহাতে প্রাণটুকু জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই তার কাজ সম্পূর্ণ হয়!

সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তাক হইতে একটা বেদানা পাড়িয়া বসিল—তারপর লালুর পানে চাহিয়া চাহিয়াই বেদানাটা ছাড়াইতে লাগিল। ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কনকাঞ্জলি

এ কি দিলে ঢেলে অমৃত মদিরা
　　অধীর অধরে মোর;
বহে বিদ্যুৎ বেপথু অঙ্গে
　　আঁখিতে ঘনায় ঘোর!
বিপুল পুলক শিহরণে ঘন
　　দেহ মন ওঠে কেঁপে,
জাগে আনন্দ অনুভূতি অতি
　　সব অন্তর ব্যেপে!
এ কি অনুরাগ নিবিড় সোহাগ
　　নিবেদিয়া দিলে তুমি,
এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষে মোরে
　　নিঃস্ব করিলে চুমি!

কোন্ হোম-হবি সোম-রস-ধারা
　　তৃষিতে করালে পান?
কোন্ দুর্লভ দ্রাক্ষা-আসব
　　বুভুক্ষে দিলে দান?
তোমার অধর-ভৃঙ্গারে একি
গাঢ় মিলনের মোহন-মুদ্রা,
　　অন্তর-ক্ষুধা-হরা?
নন্দন-বন-বসন্ত যে গো
　　বক্ষে উঠিল ফুটে,
নিখিল কোকিল-কুহরণে যেন
　　শ্রবণ ভরিয়া উঠে!

কি ছিল লুকানো কোন্ মায়ামধু
　　সিধু ধারা বিধুমুখে,
পান ক'রে প্রাণ মেতে ওঠে আজ
　　অসহ্য কোন্ সুখে!
এ কি অপূর্ব্ব প্রীতি-রোমাঞ্চ
　　জাগে প্রতি রোম-কূপে
সুর-স্বপনের গোপন কুঞ্জে
　　টানে যেন চুপে চুপে!
শোণিতে সহসা জ্বলে উঠে এ কি
　　রঙীন ফাগুন বিষ
তোমার অধর-আদর আমার

পদ্ম-অধর মন্থন-মদে
উন্মাদ আজি প্রাণ!
এ কি অকুণ্ঠ নীল-কণ্ঠের
আকণ্ঠ বিষ-পান?
তোমার সরস অধর-পরশ
করে কি সঞ্জীবিত,
নিখিল সৃজন কামনার বীজ
জীবন অনিন্দিত?
তাই কি ও মুখ-মধু-আস্বাদে
লুব্ধ কাঙাল সম,
তীব্র তৃষার হাহাকারে মরে
লালায়িত চিত মম?

সরম দ্বিধার সব সঙ্কোচ
নিমেষে হয়েছে দূর
মর্ম্ম-বীণায় তারে তারে আজ
অবাধ মিলন-সুর!
অধর-তীর্থে দু'টি চিত্তের
বিচিত্র বিনিময়,
বন্দিত ঘন মন-মন্দিরে
শাশ্বত প্রেম জয়!
তরুণ তনুর চৌদিকে আজ
যৌবন যেন জাগে,
সার্থক করি সকল সাধনা
বিহ্বল অনুরাগে!

জীবন-উষার অভিষেক আজ
অধর-প্রয়াগ-তীরে!
তোমার প্রণয়-প্রসাদ-মুকুট
গৌরবে শোভে শিরে!
তব চুম্বন-প্রেম-অঞ্জনে
রঞ্জিত দু'টি আঁখি,
ললাটে চিবুকে কপোলে কণ্ঠে
ধন্য হয়েছি মাখি!
ও গো, এ মিলন-মহামুহূর্ত্তে
দেহ মনে শুধু চাই,
তোমাতে আমাতে বুকে মুখে যেন
নিঃশেষ হয়ে যাই!

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

অজানার চিঠি

গল্প

তার এই চিঠিগুলিকে আমি যত্ন করে তুলে রেখেছি। কেন? তার উত্তর দিতে হলে অনেক কথা বল্‌তে হয়। এগুলি যে কে লিখেছে, তা আজও আমি জানি না। কোথা থেকে যে লিখ্‌ত, তাও জানি না। ক'মাস ধরে এই চিঠিগুলি একখানার পর একখানা এসে আমার কাছে জমা হয়েছে। কত মিষ্টি-মধুর কথা এদের কাছে আমি শুনেছি। এ সব চিঠি পড়ে কতদিন চিঠিগুলির যে লেখক, সে তার কলম বন্ধ করেছে! আমার কাছে চিঠি আসাও বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রথম সে দিনকার কথা বেশ মনে আছে। দিদি এসে বললে—খুকী, তোর কাছে এ চিঠি কোথা থেকে এলো রে? দিদির হাতে ছিল একখানা চৌকো খাম; ভিতরে তার বেশী কিছু আছে বলে মনে হলো না! ওপরের ঠিকানা একটু মেয়েলি ছাঁদে লেখা—কিন্তু একেবারে

বাড়ীর ঠিকানা। দিদিকে বল্লাম—বুঝ্তে পারছি না। কিন্তু কি যেন মনে হলো! দিদি যতক্ষণ ঘরে রইল ততক্ষণ সে চিঠি খুল্লাম না। খামের মধ্যে কি অজানা বার্ত্তা আছে, জানবার জন্য খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল—তবুও খুল্লাম না তখন। দিদি চলে গেলে তখন আস্তে আস্তে খামখানা খুল্লাম! দেখি, এতটুকু একখানি কাগজ, তাতে লেখা আছে—তোমার কাছে চিঠি লিখ্তে চাই। আমাকে না জেনে আমার চিঠি পাওয়া বা চিঠির উত্তর দেওয়াতে তোমার আপত্তি আছে কি? উত্তরটুকু পোষ্টাপিসের ঠিকানায় জানিয়ো!

আমি উত্তর দিয়েছিলাম,—হ্যাঁ। তখন সবে ম্যাট্রিক শেষ হয়েছে—অতখানি পরিশ্রমের পর একেবারে কর্ম্মহীন—তার অবসাদ সমস্ত শরীর-মনকে ছেয়ে ফেলেছিল। ভাবলাম, মন্দ কি! একটু নতুন কিছু করা—দোষ কি? যদি সবাই জেনে ফেল্ত? হ্যাঁ—তাহলে একটু লজ্জায় পড়তে হতো বটে! কিন্তু অত ভাববার অবসর পাইনি!

তাকে প্রথমে খুব সাবধানে দুটো তিনটে কথা জানিয়েছিলাম—চিঠি পেতে বা লিখতে আমার আপত্তি নেই! কিন্তু যিনি চিঠি লিখেছেন, তিনি আমায় চিন্লেন কি করে? বা আমার ডাক-নাম যে 'খুকী,' জানলেন কি করে?

এ প্রশ্নের জবাব আমি কোনদিন পাইনি! যে ক'দিন এই চিঠিগুলি একখানার পর একখানা আসছিল, সে ক'দিন পৃথিবী যেন এক নতুন রঙে রঙিয়ে উঠেছিল! আমার সেই অজানা বন্ধুর পরশ এসেছিল তার চিঠির মধ্য দিয়ে। সে স্পর্শে যে কি মাধুরী ছিল, তা আমি বোঝাতে পারব না। চিঠি লিখতে সে জানত। তাকে জানবার জন্য আমার আগ্রহ কি কম হয়েছিল! সে যে কে, তা আমি কতবার কত রকমে জিজ্ঞাসা করেছি! অভিমান করে জিজ্ঞাসা করেছি, রাগ করে জিজ্ঞাসা করেছি, অনুনয়-বিনয় করে জিজ্ঞাসা করেছি! ভয় দেখিয়েছি, যদি না বল, তা হলে আর চিঠি লিখব না! সে উত্তর দিত; কিন্তু কেমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উত্তর দিত—মনে হতো, বুঝি, উত্তর সত্যিই দিয়েছে। কিন্তু তার উত্তর দেওয়া সত্ত্বেও তাকে চেন্বার পথে আমি এতটুকুও এগুতে পারিনি। চিঠির মধ্যে সে মায়াজাল বুন্ত! এমন মিষ্টি এমন সুন্দর কথা দিয়ে সে থাকার পর থাকা তার চিঠি লিখ্ত যে সে সব চিঠি যে কতবার আমি কত রকমে পড়তাম, তার ঠিকানা নেই। যে-সময়টিতে তার চিঠি আসত, পিয়ন আসতে একটু দেরী করলে আমি অধীর হয়ে উঠতাম। বারে-বারে ঘর-বার করতাম—কখন তার চিঠি আসে! চিঠি এলে তখনি তার উত্তর লিখে দিতাম! তারপর থেকে যতক্ষণ তার আর একখানা চিঠি না আস্তো, ততক্ষণ তার সে চিঠি আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। আর যখনই সুযোগ পেতাম, প্রথম থেকে শেষ অবধি পড়ে নিতাম।

তার মনটা খুসী থাকলে এমন হাসির কথা লিখত যে হাস্তে হাস্তে পেটে খিল ধরে যেত। দুষ্টামি করে আমি মাঝে মাঝে লিখ্তাম,—আবার ভারি অসুখ করেছে! অমনি এমন ব্যস্ততা-ভরা জবাব আস্ত যে আমার ভারী ভাল লাগত তার সেই ভাবটাকে! একবার দুষ্টামি করে দুদিন চিঠির জবাব দিই নি! এমন ব্যথা মাখিয়ে সে চিঠি লিখেছিল যে আমি না কেঁদে থাকতে পারিনি। আর সেদিন কত করে যে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম।

এমন সুন্দর করে, এমন হৃদয় দিয়ে সে চিঠি লিখ্তো যে ক'মাস আমার কেমন করে যে কেটে গিয়েছিল, তা আমি বুঝতেও পারিনি।

তারপর হঠাৎ একদিন তার চিঠি আর এলো না। ক'মাসে তার চিঠি যে আমার কতখানি জুড়ে বসেছিল, তা আগে ভেবে দেখিনি। কিন্তু তার আধিপত্য বুঝতে পারলাম সেইদিন, যেদিন তার চিঠি যে-সময় আসত, সে সময়ের অন্য চিঠির সঙ্গে তার সুপরিচিত 'খুকী' লেখা চিঠি এল না! কি অধীর হয়ে উঠেছিলাম আমি! তার পর সারা দিন—সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার ডাকের সময় না যাওয়া পর্য্যন্ত আমি শুধু ঘর আর বার করেছিলাম। সেদিনের শেষ ডাকেও যখন চিঠি এল না, তখন একেবারে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। দিদি জিজ্ঞাসা করলে,—কি হয়েছে, খুকী? আমি বল্লাম—আজ শরীর ভারী খারাপ বোধ হচ্ছে। মিছে কথা কি আমরা আমাদের মেয়েদের শেখাই না?

তারপর দিনও চিঠি এল না। তার পর দিনও না!

বল্‌তে পারি না। ঠিকানা সে আমায় কোনদিন জানায়নি যে খোঁজ নেব! অসুখ করে নি ত?

দিদির যে কিছু সন্দেহ হয়েছিল, তা আমি বুঝতে পারছিলাম! আমার মনের ঘট্‌বটানি বাইরেও প্রকাশ হয়ে পড়েছিল বোধ হয়। তিনদিনের দিন রাত্রে দিদি আমার বিছানার পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে,—খুকী, আমরা দুটি বোনের সুখ-দুঃখের কথা ত কারো কাছে লুকুই না! আজ তোর যেন কি হয়েছে! আমার কাছে বল্‌বি না?

দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে আমার সাধ করে ডেকে আনা সব দুঃখের কথা বলে ফেল্‌লাম।

দিদি আমাকে অনেকক্ষণ কাঁদতে দিলে—বারণ করলে না! অনেকক্ষণ পরে বল্‌লে—খুকী, তার খোঁজ নেবার কোন দরকার আছে, তুই মনে করিস?

কে জানে! খোঁজ নেবার কোন চেষ্টাও করিনি, কিন্তু তার চিঠিগুলি ফেলবার মত কঠিনও আমি হতে পারিনি! যেই হোক্—সে আড়ালে থেকে যে আমার কতখানি জুড়ে বসেছিল, তা তো আমি বুঝতে পারি না। চিঠিগুলি আজও সেই অতীত দিনের স্মৃতি মনে জাগিয়ে তোলে—অতীত,—সেই আশা-আনন্দের স্মৃতিতে ঘেরা মধুর অতীত!

শ্রীসোমনাথ সাহা।

ঘর ও বাহির

রাজনীতি

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সেন নাভা-রাজ্যের চীফ-সেক্রেটারী ও রাজস্ব-মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি বহু বৎসর নাভার রাজস্ব-মন্ত্রী ছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ সুর পররাষ্ট্র বিভাগের সহকারী মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছেন।

—সঞ্জীবনী

ভারতবাসীর যদি লজ্জা থাকে, তবে যে যে উপনিবেশে ভারতবাসীর লাঞ্ছনা হইতেছে, তথাকার দ্রব্য অপবিত্রজ্ঞানে বর্জ্জন করিতে হইবে। কানাডা হইতে বহু লক্ষ টাকার মোটর গাড়ীর আমদানি হয়, সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করুন, কানাডা যদি ভারতবাসীকে নাগরিক অধিকার না দেয়, তবে তাহার গাড়ী কেহ ক্রয় করিবে না।

কেনিয়া একটা ক্ষুদ্র দেশ। তাহাতে ১০,০০০ শ্বেতাঙ্গ, ২২০০ ভারতবাসী, ৩২০০০ আরবী ও ২৫ লক্ষ আদিম নিবাসী বাস করে। ১০ হাজার শ্বেতাঙ্গের প্রভুত্ব সেখানে স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং শ্বেতাঙ্গেরা যে সকল দ্রব্য ভারতবর্ষে রপ্তানি করে তাহা স্পর্শ করা উচিত নয়। এই একমাত্র উপায়, যদ্দারা আমরা ভারতবাসীর মান রক্ষা করিতে পারি। ভারতবাসী কি জাগিবে? আপনার সম্মান রক্ষার জন্য কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে? —সঞ্জীবনী

এই যে দেশে, সহরে-বন্দরে ও পল্লীগ্রামে প্রত্যহ ভীষণ ভীষণ ডাকাতি হইতেছে, লোকের ধন-মাল লুণ্ঠিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কি? এই সকল চুরি ডাকাতির জন্য কি গভর্ণমেণ্ট দায়ী নহেন? গভর্ণমেণ্ট অস্ত্র-আইন চালাইয়া দেশের লোককে বিকলাঙ্গ, অকর্ম্মণ্য ও অক্ষম করিয়া দিয়াছেন।

কর্ত্তৃপক্ষের ইহাই যথেষ্ট অনুগ্রহ যে এ-যাবৎ আমাদের মাছ কোটার বঁটি ও ভোঁতা দায়ের উপর তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে নাই। কিন্তু কখনও যদি কোন লোক বঁটি লইয়া কাট্‌ফিরিঙ্গিকে ঝগড়া-বিবাদের সময় আক্রমণ করে এবং তাহাতে সে আহত হয়, তাহা হইলে সে দিন যে 'বঁটি'ও অস্ত্র-আইনভুক্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। এই যে বন্য পশু-পক্ষী নিরীহ কৃষককুলের কৃষি পয়মাল করিতেছে, তাহাদের প্রাণের ধন শস্য বিনাশ করিতেছে, ব্যাঘ্র-সকল কৃষকদের গো-মহিষ ও ভেড়া-ছাগল ধ্বংস করিতেছে, স্থানে স্থানে বন্য-শূকর ও ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক মানুষ খুন জখম হইতেছে, ডাকাতেরা যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও ঘরের মালিক ও রক্ষকদিগের প্রাণবধ করিয়া যাইতেছে, এ সকল কি অস্ত্র আইনের ফল নহে? দেশবাসীর হাতে অস্ত্র থাকিলে কি এ সকল মহা অনিষ্ট সাধিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল? যতদিন দেশ হইতে অস্ত্র আইন না উঠিয়া যাইবে, ততদিন দেশের চুরি-ডাকাতি দমনের কোন উপায় নাই। দেশবাসী অস্ত্র-আইন উঠাইবার উপায় চিন্তা করুন এবং তৎপ্রতি মনোনিবেশ করুন। আমাদের মনে হয়, ডাকাতিতে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তি ভারত-সচিবের বিরুদ্ধে ক্ষতি-পূরণের নালিশ করিলে মজা দেখা যায়! এই ক্ষতির জন্য যে গভর্ণমেণ্ট দায়ী তাহা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা যায়।

সমাজ

সুশীলা নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-বিধবা সন্ধ্যার পর ঘরের বাহির হইয়া তাঁহার শিশু পুত্রের মুখ ধোয়াইয়া দিতেছিলেন। এই সময় শ্যামলাল, মুন্সী মণ্ডল ও শশধর ঘোষ উক্ত বিধবাকে জোর করিয়া লইয়া যায়। সুশীলার অভিভাবক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াও সক্ষম হয় নাই। দুর্ব্বৃত্তেরা সুশীলা দেবীর মুখে কাপড় বাঁধিয়া তাঁহাকে গ্রামান্তরে লইয়া যায়। সেখানে শ্যামলাল ও শশধর উক্ত বিধবার সতীত্ব নষ্ট করে। যাহাই হউক একদিন পরে কোন প্রকারে সুশীলা দুর্ব্বৃত্তদের হাত হইতে মুক্ত হন। যশোহর সেসন জজের বিচারে শ্যামলাল ও মুন্সী মণ্ডলের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অনেকের নামে মামলাও উঠে নাই ; কিন্তু ইহাও ঠিক ইহাদের সাজা না হইলে গ্রামের লোকের, দোষী জানিয়াও ইহাদের সাজা দিবার কর্য্যতঃ ইচ্ছা প্রকাশ পাইত না। সমাজের কর্ত্তারা অত্যাচারিতা সুশীলার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া হয়ত বন্ধ করিয়াছে—অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণ হয়ত সুশীলার হাতের জল আর গ্রহণ করিতে পারিবেন না—কিন্তু অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণই সুশীলার প্রতি যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের বাড়ী যাতায়াত করিবেন (বিশেষ যদি তাহারা ধনী ব্যক্তি হয়)। তাহাদের অপরাধ যে অপরাধ তাহা ক্রমে ভুলিয়া যাইবেন। দুইদিন না যাইতেই এই সমস্ত দুর্ব্বৃত্ত সমাজে মাথা উঁচু করিয়াই হাঁটিবে, কেহবা হয়ত শেষকালে ধর্ম্মোপদেষ্টা হইবে—কিন্তু অত্যাচারিতা নিরপরাধিনী সুশীলাকে চিরকাল সমাজে মাথা হেঁট করিয়াই থাকিতে হইবে। যে সমাজ সুশীলাকে দুর্ব্বৃত্ত কামুকের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না, যে সমাজ দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ডদের সাজার ব্যবস্থা করিতে জানে না, যে সমাজ জানিয়া শুনিয়া এই দুর্ব্বৃত্তদের সমাজে পূর্ব্বের মতই স্থান দিবে, ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে না—সেই পঙ্গু সমাজও সুশীলাকে শাসনের বেলায় সোজা হইয়া দাঁড়াইবে—মত্ত হস্তীর বল ধারণ করিবে। —স্বরাজ



কুমারী নাভাজ বাই বি-এ
ইনি বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা সদস্য
নির্ব্বাচিত হইয়াছেন
(বাঁশরীর সৌজন্যে)

মনুষ্যত্ব

বরিশালের বেতাগী নামক বন্দরের কাছে বিশখালী নদীতে ঝড়ের মুখে পড়িয়া কিছুদিন পূর্ব্বে একখানা নৌকা ডুবি হয়। নৌকায় চারিজন পুরুষ ও পাঁচজন স্ত্রীলোক ছিল। ঘাটে আর একখানিও নৌকা ছিল না যে, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহা লইয়া অগ্রসর হইতে পারা যায়। নদীর অবস্থাও ছিল ভীষণ। সুতরাং সাঁতরাইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে যাওয়া যথেষ্ট রকমেরই বিপজ্জনক ছিল। এই জীবন-মরণের সমস্যা-স্থলে সমস্ত বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া বেতাগী বন্দরের জনকয়েক যুবক সেই অশান্ত নদীর বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তাঁহারা এই মগ্নপ্রায় নরনারীগুলিকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। ইঁহাদের সৎসাহস, ইঁহাদের পরোপকার-স্পৃহা বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরব করিবার জিনিষ। বাঙ্গালীর জীবনের গতি যে ধীরে ধীরে ফিরিতেছে, তাহার পরিচয় এই ধরণের দৃষ্টান্তগুলির ভিতরে পাওয়া যায়—যদিও এ কথাও ঠিক যে, এরূপ দৃষ্টান্ত দুই চারিটির বেশী মেলে না। কিন্তু স্রোত যে ফিরিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে এরূপ দৃষ্টান্ত বাঙ্গালীর ভিতর কচিৎ কখনও দুই একটি মিলিত কি না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বাঙ্গালীর সাহস বাড়িতেছে, জন-সেবার স্পৃহা বাড়িতেছে, এ কথা আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। —স্বরাজ

কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার শ্রীযুত প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় কর্পোরেশনের হস্তে ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন। এই টাকা দরিদ্র ও বৃদ্ধ জরাজীর্ণ অক্ষম আতুরের সেবায় ব্যয় হইবে। এজন্য কর্পোরেশনের কমিশনারেরা দাতাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। আমরাও বলি, "দাতা শতং জীবতু"। —হিন্দুস্থান।

মিঃ এস, পি, বড়ুয়া এম, এল, সি জোড়হাট ডিস্পেন্সারী ও দুইটী দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের জন্য ২০০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ সকল ডিস্পেন্সারী ইত্যাদির নাম দাতার পিতা রায় বিষ্ণুরাম বড়ুয়া বাহা-

ছয়ের নামানুসারে হইবে। আসাম-গবর্মেণ্ট বড়ুয়াকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্ত ইঞ্জিনিয়ারকে আদেশ দিয়াছেন। গত বৎসর ব্যবহারী শিক্ষার জন্ত মিঃ বি, বড়ুয়া ৩ লাখ টাকা দান করিয়াছেন। —স্বরাজ

জন-গণ-মন

সংবাদ রটিয়াছিল যে, পুশিফুট জনসন সত্বরই ভারতে আসিতেছেন। এ সম্বন্ধে পুশিফুট জনসন বলেন যে, তিনি বর্ত্তমান বৎসরে ভারতবর্ষে আসিবেন। ভারতবর্ষেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মদ্য-নিষেধ-বিধি কার্য্যকর হইবার উপযুক্ত স্থান। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে আমি যেরূপ আন্তরিকতার সহিত অভিনন্দিত হইয়াছিলাম, তাহা আমি ভুলিতে পারি নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন বর্ব্বর ছিল, এবং পর্ব্বতের গহ্বরে বাস করিত, ভারত তখনই মদ-বর্জ্জনের নীতি প্রচার করিয়াছে। এখনকার মদ্য নিষেধ-বিধি ভারতের সেই প্রাচীন শাস্ত্র-বিধির একটা অপেক্ষাকৃত লঘু বিধান ; আর কিছুই নয়। আমার শুধু ইহাই বলিবার আছে যে, ভারত যে সত্য যুগ হইতে প্রচার করিয়া আসিতেছে, জগত আজ সেই সত্য আংশিকভাবে উপলব্ধি করিতে শিখিতেছে। —হিন্দুস্থান

পাটনার একটি খবরে প্রকাশ, যে সেখানে ধোপারা ব্রাহ্মণদের কাপড় কাচা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ধোপাদের গৃহে পূজা-অর্চ্চনা করিতে যায় না—এই জন্তই নাকি তাহারা এই পথ অবলম্বন করিয়াছে। সমাজের আদেশ অমান্ত করিয়া ব্রাহ্মণের কাপড় কাচিয়াছিল—এই অপরাধে ধোপী পঞ্চায়েৎ একজন ধোপাকে ১৫৲ টাকা অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত করিতেও ইতস্ততঃ করে নাই। এইরূপেই ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের উন্নত সম্প্রদায়ের সহিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতেছে। যে ভেদ রেখা হিন্দু জাতির দুর্ব্বলতার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ, এইরূপে তাহা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই ধরণের আত্মকলহ কেহই সমর্থন করে না—করাও সঙ্গত নহে। কিন্তু আমরা অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করি, অপমানের গ্লানি দিয়া তাহাদিগকে যেরূপ ভাবে ঢাকিয়া দেই—তাহাতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষে এই সব আত্মকলহে প্রবৃত্ত হওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে? তাহাদের ন্যায্য অধিকারের দাবী ব্রাহ্মণ-প্রমুখ উন্নত সম্প্রদায় ছাড়িয়া দিতে নারাজ—সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাদের উন্নত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে হয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে উন্নত সম্প্রদায়ের প্রাধান্তও বাড়িতেছে না, জাতিরও সর্ব্বনাশ হইতেছে। অবনত সম্প্রদায় দুই দিন আগেই হোক্‌ আর দুইদিন পরেই হোক, এই অপমানের বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিবেই। মাঝ হইতে কেবলমাত্র হিন্দুদের সংহতি-শক্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। উন্নত সম্প্রদায় যদি এখনও সাবধান না হন, তবে আখেরে তাঁহাদিগকেই ইহার জন্ত অনুতাপ করিতে হইবে। —স্বরাজ

হাওড়া ষ্টেশনের কুলিরা মাঝে মাঝে ধর্ম্মঘট করিয়া ভারী গোল বাধায়। হাওড়া ষ্টেশনের কুলিরা সকলেই হিন্দুস্থানী। বাঙলার গ্রামে খাইতে পায় না এমন লোকের অভাব নাই, তাহারা আসিয়া যদি হাওড়া ষ্টেশনে কুলীর কাজ করে, তাহা হইলে অনেক কেরাণী অপেক্ষা বেশী টাকা রোজগার করিতে পারে। বাঙ্গালার ছোট খাট ষ্টেশনে এখনও বাঙালী কুলি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু দু দিন পরে বোধ হয় তাহাও পাওয়া যাইবে না। বাঙলা দেশের ষ্টেশনের কুলী বাঙালী হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তাহাতে কাজেরও অনেক সুবিধা হয়। —হিন্দুস্থান

বাঙালীর মধ্যে অন্ন-সমস্যা দিন দিন বাড়িতেছে। বিশেষ করিয়া বাঙালী ভদ্রলোকেদের মধ্যে এই সমস্যা এমন আকার ধারণ করিয়াছে যে শীঘ্রই ইহার ব্যবস্থা না করিলে ভবিষ্যতে যে কি হইবে তাহা অনুমান করা যায় না। অন্ন সমস্যা যে কিসে মিটিতে পারে বাঙালী কি তাহা জানে না? বাঙলায় মাড়োয়ারী, ইংরেজ উড়িয়া, বেহারী ও অন্যান্ত জাতির অন্ন-সমস্যা মিটিতেছে আর বাঙলায় বাসিন্দা বাঙালীর মধ্যে সে সমস্যা দিনে দিনে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার কারণ কি? এই অন্ন সমস্যার কারণ কি এবং তাহার প্রতিকারই বা কি তাহা লইয়া ইতিপূর্ব্বে অনেকবার আলোচনা করা হইয়াছে। এখনো মাসিকে সাপ্তাহিকে ইহা লইয়া আলোচনা হয় এবং মধ্যে মধ্যে এ সম্বন্ধে বেশ সুযুক্তি পূর্ণ প্রবন্ধেও দেখিতে পাওয়া যায়। মোট কথা কিসে অন্ন-সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহা শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই জানেন, কিন্তু তাহারা প্রতিকারের চেষ্টা করেন না এই যা দুঃখ। —হিন্দুস্থান

বিবিধ

কলিকাতা যাদুঘরের চার পয়সা করিয়া দর্শনী স্থির করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ভারতবর্ষের কোন যাদুঘরে এ পর্য্যন্ত কান দর্শনী দিবার ব্যবস্থা নাই। বিলাতের বড় বড় যাদুঘরেও দর্শনী নাই, এ অবস্থায় চৌরঙ্গীর যাদুঘরেই বা দর্শনীর বরাদ্দ হইতেছে কেন? কলিকাতার যাদুঘর যাহারা দেখিতে যায়, তাহারা অধিকাংশই গরীব—মফঃস্বলের লোকেরা সহরে আসিলে একবার যাদুঘর দেখিতে যায়। এই শ্রেণীর লোকদের পক্ষে চার পয়সা করিয়া দর্শনী দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে। এই ফী বসাইবার ফলে যাদুঘরে দর্শকের-সংখ্যা কমিয়া যাইবে। কর্ত্তারা যে আশা করিতেছেন, কাজে তাহা হাসিল হইবে না। যাদুঘরের অন্য কাজে কত বাজে ব্যয়ও হইতেছে, সেইগুলি কিছু কমাইলেই ত কাজ চলিতে পারে, গরীবদের উপর এমন নজর কেন? গবর্মেণ্টও যাদুঘরের সাহায্য বন্ধ করা ছাড়া অন্য খরচ কমাইবার কি অন্য কোন জায়গা পাইলেন না? —হিন্দুস্থান

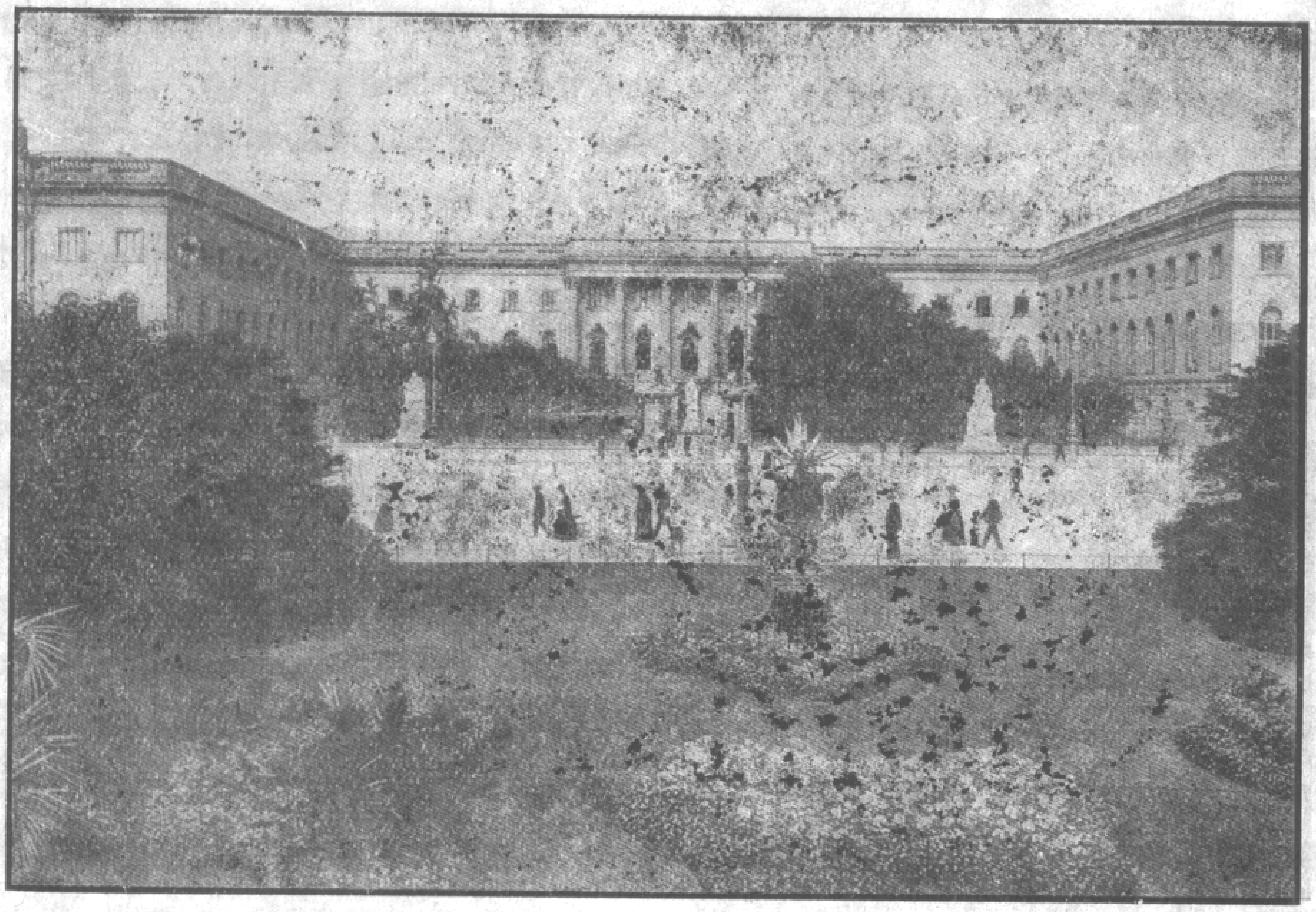


বার্লিনের প্যারিসিয়ান প্যালেস ও ব্রাণ্ডেনবার্গ কলম



বার্লিনের প্যালেস ব্রিজ, যাদুঘর এবং গির্জ্জা

(বাঁশরীর সৌজন্যে)



বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়



জার্ম্মান পার্লিয়ামেণ্ট এবং ভিক্টোরিয়া কলম
(বাঁশরীর সৌজন্যে)

বাংলার সাহিত্যে, আগাছার মত অশ্লীল পুস্তকের প্রচার অল্প কিছুদিনের ভিতরেই অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। দুই একজন প্রকাশক এই সব বই দেশের অশিক্ষিত জন-সাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছেন—সঙ্কোচ করিতেছেন না—দ্বিধা করিতেছেন না। এসব পুস্তক পাঠের ফল দেশের পক্ষে যে ভাল হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। শিক্ষিত সমাজেই অনেক সময় পাপের খপ্পরে অতি অনায়াসেই অনেকেই ধরা পড়িয়া যায়। আর যাহাদের শিক্ষার সম্পদ নাই, সুতরাং বিচার করিবার শক্তিও নাই, তাহাদের পক্ষে এই সব পাপের ছবি তুলিয়া ধরার পরিণাম সে কি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রকাশিত পুস্তক যদি জাতির পক্ষে শিক্ষার সোপান না হইয়া তাহার অশিক্ষার উপাদানই সরবরাহ করিয়া বেড়ায়, তবে যে দেশের শতকরা জোর ছয়জন মাত্র লোক কলমে কালির রেখা টানিতে জানে, সে-দেশের পক্ষে পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে কড়া আইন করা ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না। কিন্তু কেবল মাত্র ইহাই নহে। এই সব অশ্লীল পুস্তকের বিজ্ঞাপন এত লোভনীয় করিয়া দেওয়া হয় এবং সে বিজ্ঞাপন এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয় যে যাহাদের ইচ্ছা না থাকে, তাহারাও এই সব বই কিনিতে বাধ্য হয়। অবশ্য এ ব্যবস্থার দ্বারা এই সব অশ্লীল পুঁথির প্রকাশকেরা অর্থে ফাঁপিয়া উঠিতেছেন, কিন্তু দেশের সর্ব্বনাশের বিনিময়ে। যাহারা এ পথের পথিক তাহাদের কাছে দেশের সর্ব্বনাশটা বিশেষ কোন ক্ষতিকর জিনিষ নহে—হইতেও পারে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত জনসাধারণেরও একটা কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা কি ইহার কোনই প্রতিকার করিতে পারেন না?

—স্বরাজ

ডাঃ ষ্টানলী ক্যাম্প লণ্ডনে একটী সভায় বলিয়াছেন যে তিনি আসামের গারো পাহাড়ে তিন পোয়া মাইল গভীর একটী রহস্যময় গুহা দেখিয়াছেন। উহাতে তিনি বিড়ালের ন্যায় এক প্রকার প্রাণী দেখিয়াছেন। ঐগুলি জলে সাঁতরাইতে পারে এবং গণ্ডারের ন্যায় শব্দ করে। তিনি ঐ গুহাতে খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বেঙ, সন্তরণশীল বাদুড়ও এক প্রকার চিংড়ি মাছ দেখিয়াছেন। ঐগুলি ডাঙ্গায় উঠিয়া নৃত্য করিতে পারে। প্রাণীতত্ত্ববিদগণ আশা করেন যে ঐগুলি হইতে অনেক নূতন তত্ত্ব জানা যাইবে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

কোচিনের একটী খবরে প্রকাশ যে ট্রাভাঙ্কোর পাহাড় অঞ্চলের উদুম্বাকোলাতে একটী ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটী বাড়ীতে পরিবারের দশ জন লোক রাত্রে ঘুমাইতেছিল, এমন সময় বিস্ফোরণের আওয়াজের ন্যায় একটী শব্দ শুনিয়া তাহারা হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখিতে পায় যে বাড়ীর নিকটে মাটীর নীচে একটু জায়গা হইতে কাদা, বালি জল ইত্যাদি প্রবল বেগে ক্ষিপ্ত হইতেছে। তাহারা পলাইবার পথ না পাইয়া চাপা পড়ে। ভীষণ শব্দ শুনিয়া প্রতিবেশীগণ জড় হয়, এবং কাদা বালি সরাইয়া আট জনকে অজ্ঞান বস্থায় উদ্ধার করে ও দুই জনের মৃত দেহ পাওয়া যায়।

—মোসলেম জগৎ

ঢাকা হইতে জনৈক সংবাদ-দাতা পত্রান্তরে সংবাদ দিতেছেন যে, বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামে একটি মন্দিরের নিকট হইতে প্রাচীন-কালের একটি স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভটী ঢাকার যাদুঘরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার ওজন আন্দাজ ২০০ মণ। এই স্তম্ভটী আনিতে প্রায় ৫ শত টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই স্তম্ভটী মুসলমান রাজত্বকালেরও পূর্ব্বের—অন্ততঃ এক হাজার বৎসরের বলিয়া মনে হয়।

—হিন্দুস্থান

স্বাস্থ্য

চব্বিশ পরগণা জেলা বোর্ডের এক সভায় সম্প্রতি কালা জ্বর এবং ম্যালেরিয়া তাড়াইবার উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই আলোচনা-সভায় ডাঃ বেণ্টলিও উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘকাল আলোচনার পর একটি ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে। এজন্য জেলাবোর্ড পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। কালাজ্বর আসামে ছিল, বাংলায় আসিয়া সে মৌরসী পাট্টা গাড়িয়াছে। আজ কালাজ্বর এবং ম্যালেরিয়ায় ভেদ-রেখা টানিয়া দেওয়া কঠিন। এই দুইটি ব্যাধিতে বাংলার প্রায় ১০ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে। কলেরা প্লেগের মত ব্যাধিটি আশু মৃত্যুর বাহন না হইলেও এই কারণে ইহা কলেরা প্লেগ প্রভৃতি হইতেও দেশের পক্ষে বেশী অমঙ্গলজনক। ইহার প্রতিকারের জন্য জেলাবোর্ড প্রভৃতির যথাসাধ্য চেষ্টা করা সঙ্গত, কিন্তু কেবলমাত্র জেলা-বোর্ডের চেষ্টাতেই ইহার প্রতিকার সম্ভবপর নহে। জেলাবোর্ডের সঙ্গে জনসাধারণের ভিতরেও এজন্য তাগিদ জাগা দরকার। এই চব্বিশ-পরগণায়ই পানিহাটি, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জনসাধারণ ম্যালেরিয়া প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। এ যুদ্ধে তাহারা যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহা হইতেই বোঝা যায়, এদিক দিয়া জনসাধারণ কত কাজ করিতে পারে। আমরা এই জন্য জনসাধারণকে সজ্ঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ করিতেছি।

—স্বরাজ

বাঙ্গালী ছাত্রগণ একুশ বৎসর বয়সেই সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ ও পুষ্ট থাকে। তাহার পর হইতেই তাহাদের

১৬ বৎসর বয়স হইতেই চক্ষের রোগ, দন্তরোগ ও কর্ণরোগ বাড়িতে থাকে। ইহার অর্থ এই যে কম বয়সের ছাত্রগণ যে শ্রম করিতে সক্ষম তাহাপেক্ষা অধিক শ্রম করিতে হয় বলিয়াই এরূপ ঘটে। ইহাদিগের চেহারা ও শরীরে খর্ব্বতাও সেই কথাই প্রমাণ করে। ২১ বৎসর বয়সের পর হইতেই ছাত্রগণের রোগাধিক্য হয়। ইহাতে তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। যে সকল রোগ দূর করা যায়, তাহারও হার অত্যন্ত বেশী। প্রতি দশজন ছাত্রের মধ্যে সাতজনই রোগগ্রস্ত। ছাত্রগণের এই অবস্থা দেখিয়া অবিলম্বে ইহাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা উচিত। চক্ষের দোষ সহজেই চিকিৎসিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা অবহেলা করা হয়। এই অবহেলা দূর করিবার জন্য ছাত্রগণকে সুপরামর্শ দেওয়া উচিত। যদিও ছাত্রগণকে ক্রয় মূল্যে চশমা দেওয়া হইতেছে তথাপি এই সুবিধা অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রই গ্রহণ করিয়াছে। দন্তরোগের জন্য অনেকেরই অজীর্ণ রোগ জন্মিয়াছে। ইহা সহজেই দূর করা যায়। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেরই প্লীহা বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু তাহারা সেই বিষয়ে উদাসীন। ইহাতে বুঝা যায় যে, ছাত্রদিগের প্রতি-দশজনের মধ্যে একজনের ম্যালেরিয়া রোগ আছে। এই রোগ যদিও সহজে আরাম হয় তথাপি ছাত্রগণ ও তাহাদিগের অভিভাবকগণ এ সম্বন্ধে অবহেলা করিয়া থাকেন। দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্যই ছাত্রগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকা উচিত নহে। —শিক্ষা-সমাচার

লোকসেবা

সেদিন বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড লিটন ২৭-১নং নেবুতলা লেনে বালকদের জন্য শশীভূষণ দে অবৈতনিক প্রাইমারী স্কুল এবং বালিকাদের জন্য রাজরাজেশ্বরী অবৈতনিক স্কুলের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উৎসব উপলক্ষে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্কুল দুইটি এবং তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণ অতি মনোহর সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিল।

গবর্ণর বাহাদুরকে স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে অনুরোধ করিতে যাইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক বলিয়াছেন যে, এই স্কুলটীতে মোট দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই টাকার অর্দ্ধেক গিয়াছে জমি খরিদ করিতে। জমি খরিদের এক-চতুর্থাংশ ব্যয় এবং বাড়ী তৈরীর সম্পূর্ণ ব্যয় রায় বাহাদুর শশীভূষণ দে বহন করিয়াছেন। বাকী টাকা কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে দেওয়া হইয়াছে। এই দুইটী স্কুলে মোট ৬০০ বালক-বালিকার পড়াশুনার ব্যবস্থা হইয়াছে। রায় বাহাদুর শশীভূষণ দে আরও কিছু টাকা দিয়া একটী ফণ্ড তৈরী করিয়াছেন এবং ঐ ফণ্ডের দ্বারা স্কুলের বাৎসরিক ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ কুলাইয়া যাইবে। —স্বরাজ

নারী-প্রসঙ্গ

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ লেডি ডাক্তার শ্রীমতী কাশীবাই নৌরঙ্গে এম, বি তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আমাদের দেশের কোন নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নিযুক্ত হন নাই। বোম্বাইয়ের গভর্ণর, শিক্ষা-মন্ত্রী ডাক্তার পরাঞ্জপ্যে ও বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলার এজন্য ভারতবাসীর ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা দেশেই সর্ব্বপ্রথমে নারীরা উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অথচ বাঙ্গালার কোন নারী এ পর্য্যন্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভ্য হইতে পারেন নাই। বাঙ্গলার গবর্ণর লর্ড লিটন নারীর সর্ব্বপ্রকার উন্নতি-বিধানে অগ্রসর, শিক্ষা-মন্ত্রী নারীহিতৈষী, ভাইস চেন্সেলার উদারমতাবলম্বী, তবে কেন কোন নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য হইতেছেন না? ডাক্তার কাদম্বনী গাঙ্গুলী বি, এ, শ্রীমতী কামিনী রায় বি, এ, শ্রীমতী রাজকুমারী দাস এম, এ প্রভৃতি নারীগণকে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য করা উচিত।

—সঞ্জীবনী।

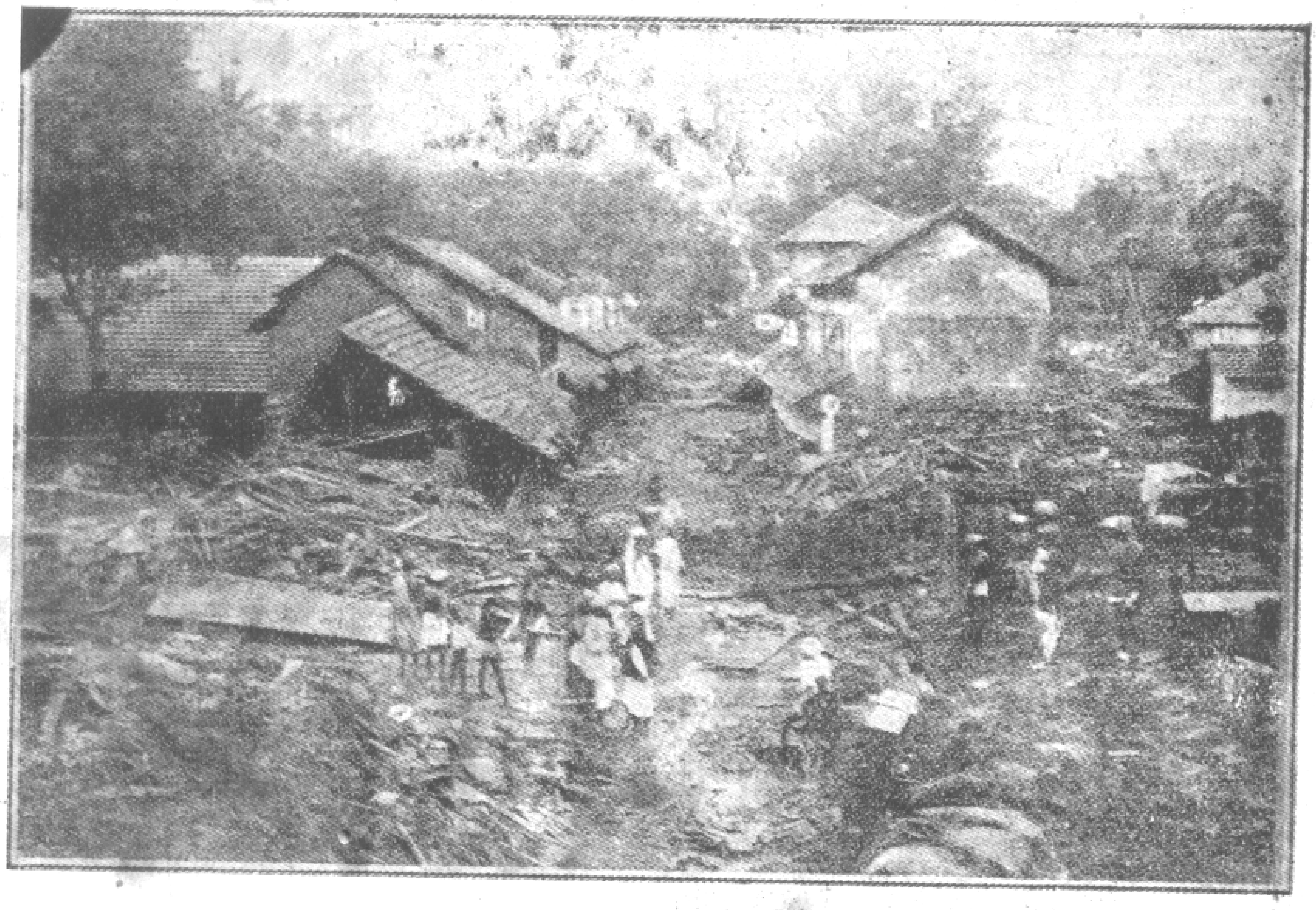
ময়মনসিংহ জিলা বোর্ড হইতে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষার জন্য ১২ টাকার যে বৃত্তি দেওয়া হইত, তাহা ১৫ টাকায় বৃদ্ধি করিয়া স্থানীয় সূর্য্যকান্ত হাসপাতালে প্রতিষ্ঠিত নার্শিং ও ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষালয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নার্শিং কমিটী হইতে ২০ টাকার দুইটী বৃত্তি প্রার্থনা করা হইয়াছিল, বোর্ড সম্প্রতি ১৫ টাকার একটী বৃত্তিই প্রদান করিবেন বলিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আর একটী বৃত্তিও দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

—ঢাকা প্রকাশ

আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রে আজও প্রকৃত পক্ষে নারী-স্বাধীনতা আইনতঃ স্থাপিত হয় নাই। সম্প্রতি উৎসকন্সিন প্রদেশে আইন জারী করা হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আইন-অনুসারে নারী জাতি যথার্থ স্বাধীনতা পাইতেছে না; অন্যান্য নারী-স্বাধীনতা-বিষয়ক আইন এখনও জারী হয় নাই। আলাবোমা প্রদেশের নারীরা সন্তানের অভিভাবক বিবেচিত হন না; পুরুষেরাই আইন-সঙ্গত অভিভাবক। আকান্সাস প্রদেশে নারীরা পিতা-মাতার সম্পত্তিতে পুরুষের সমান অধিকার পায় না; কন্যা অপেক্ষা পুত্রের একতিয়ার এবং ভোগস্বত্ব বেশী। ফ্লোরিদা প্রদেশে সন্তানগণের আয়ের উপর পিতার অধিকার এক-চেটিয়া; মাতার কোন অধিকার নাই। এমন কি সন্তানেরা কোথায় কিরূপ কাজ করিয়া রোজগার করিবে, সে সম্বন্ধেও পিতার মতই একমাত্র গ্রাহ্য। মাতার মতের কোনও আইনসঙ্গত দাম নাই। লুইসিয়ানা প্রদেশে বিবাহিত নারীকে নাবালক ও ...



বাস্তোয়ালনামক সহরটীর অবস্থা আরও শোচনীয়। বন্যায় এই সহরের সহস্র সহস্র লোক একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে



নেত্রাবতী নদীর বন্যায় কানাড়ার পানিমাঙ্গালোর সহরটী একেবারে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে

(বাঁশরীর সৌজন্যে)

সামিল বিবেচনা করা হয়। নারীরা স্বাধীনভাবে কোনও কারবার চুক্তি করিতে অধিকারী নয়। মেরীল্যাণ্ড প্রদেশের আইন-অনুসারে পুরুষেরা দরকার হইলে তাহাদের স্ত্রীদিগকে ডাইভোর্স বা বর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু কোন স্ত্রী তাহার স্বামীকে বর্জ্জন করিতে চাহিলে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হয়। ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ প্রদেশে নারীরা জুরির আসনে বসিতে অনধিকারী। ভারমণ্ট প্রদেশে বিবাহিত নারীর রোজগার পুরাপুরী স্বামীর তহবিলে আসিতে বাধ্য। ভার্জিনিয়া প্রদেশেও এই আইন। এই সকল আইনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে আন্দোলন চলিতেছে।

বক্তারা ও লেখকেরা বলিতেছে, যতদিন এই মত আইন আমেরিকায় থাকিবে ততদিন মার্কিন নরনারীরা মান্ধাতার আমলের বিলাতী আইনের আওতায় জীবন যাপন করিতেছে এরূপ বুঝিতে হইবে।

—শঙ্খ।

—

মধ্যপ্রদেশস্থ জব্বলপুরের অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনর সৈয়দ আবদুল রহমান সাহেবের পৌত্রী ও সৈয়দ আবদুল হাফিজের কন্যা কুমারী নুরন্নেসা এবার লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটি হইতে সম্মানের সহিত বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ইংরাজী রচনায় বিশেষ পারদর্শিতার জন্য ইনি স্বতন্ত্র পুরস্কার পাইয়াছেন। মধ্য প্রদেশ হইতে ইতিপূর্ব্বে আর একজন মুসলমান মহিলা বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

—মোস্‌লেম হিতৈষী।

—

চব্বিশ পরগণা জেলার ছোট জাগুলিয়ার অধিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বসুর কন্যা শ্রীমতী সুজাতা বসু এম, এ (কলিকাতা) লীডস্‌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাষ্টার অব এডুকেশন ডিগ্রী পাইয়াছেন। তিনি সার মাইকেল স্যাড্‌লারের শিক্ষাধীনে থাকিয়া "ভারতে শিক্ষার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব" নামে একটী গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

—

রাজসাহীতে একটী মহিলা-সমিতি সংগঠনের উদ্দেশ্যে গত ২৩শে আষাঢ় রাজা প্রমথনাথ বালিকা বিদ্যালয়-গৃহে স্থানীয় মহিলাবৃন্দের একটী সভা আহূত হয়। এই অধিবেশন প্রায় ২৭।২৮ জন ভদ্র মহিলা ও কতিপয় বালিকা উপস্থিত ছিলেন। দিঘাপতিয়ার ছোটরাণী শ্রীযুক্তা হেমলতা রায় মহাশয়া সভানেত্রীর পদে বৃতা হন। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান, শিক্ষা-প্রচার ও সর্ব্ববিষয়ক উন্নতি-বিধানের উদ্দেশ্যেই এই মহিলা-সমিতি সংস্থাপন। প্রায় ২৫। জন মহিলা উক্ত সমিতির সভ্যা মনোনীতা হন। —হিন্দুস্থান

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ, ও আই এস-সি পরীক্ষায় বেথুন কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী বাণী চাটার্জ্জি উদ্ভিদ বিজ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছেন। এজন্য তিনি সারদাপ্রসাদ পারিতোষিক ও অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রদত্ত মাসিক বৃত্তি লাভের অধিকারিণী হইয়াছেন।

—স্বরাজ।

—

গত শুক্রবার সন্ধ্যাকালে শিয়ালদহ ষ্টেশনে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। ফরিদপুর-যাত্রী এক ভদ্রলোক তাঁহার ভগ্নীকে মেয়েদের কামরায় রাখিয়া নিজে পুরুষদের গাড়ীতে বসিয়াছিলেন। ভগ্নীর সঙ্গে তাঁহাদের গ্রামের কয়জন স্ত্রীলোক ছিলেন। একটা বদমায়েস লোক কিন্তু সুযোগ পাইয়া তাঁহার সেই ভগ্নীকে অত লোকের মধ্য হইতেও হস্তগত করিবার বেশ কৌশল খাটাইয়াছিল। ভগ্নীটির বয়স বেশী নয়, ১৫।১৬ বৎসর, দেখিতে সুন্দরী। প্রকাশ সে যখন ট্রেনে বসিয়াছিল, সেই সময় তাহার হাত হইতে কি একটা জিনিষ পড়িয়া যায়। প্লাটফরমে নামিয়া সে যখন সেই জিনিষটি সন্ধান করিতেছিল, সেই সময় একটা অপরিচিত লোক তাহাকে ডাকিয়া অন্য দিকে লইয়া যাইতে থাকে। যুবতীটি পল্লীবাসী বলিয়া সহরের ব্যাপারে সেরূপ অভিজ্ঞ ছিল না, সেই কারণেই হউক, অথবা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াই হউক প্রথমে আপত্তি করে নাই, কিন্তু রেলের (টিকিট দেখিবার) ফটক পার হইবার পরই তাহার চমক ভাঙ্গে। তখন তাহার গোলমালে অন্যান্য লোকজনের সহিত পুলিশও ঘটনাস্থলে যাইয়া পড়ে। রেল-পুলিশের একজন দারোগা ঘটনা আদ্যোপান্ত শুনিয়া বদমায়েসটাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

— বসুমতী

—

শিক্ষা

মাদারীপুরের রায় সাহেব বাবু হীরালাল মৌলিক ফরিদপুর বালিকা বিদ্যালয়ে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। প্রদত্ত টাকার সুদ হইতে প্রতি বৎসরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রীকে কাউন্টেস লিটন প্রাইজ নামে একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। লাট বাহাদুরের ফরিদপুর গমন চিরস্মরণীয় করবার জন্য তিনি এই দান করিয়াছেন।

—শিক্ষাসমাচার

—

শ্রীহট্ট ছাতক জুনিয়ার মাদ্রাসার গৃহনির্ম্মাণের জন্য গৌরীপুর ষ্টেটের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহোদয় কিছু জমি দান করিয়াছেন এবং মাদ্রাসার গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিয়া মুসলমান সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। —মোহম্মদী

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



প্রথম দরশে এ কি এ সরম !
সখী বলে, সখি চাও !
(প্রাচীন চিত্র হইতে)

ভারতী

৪৭শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ { অষ্টম সংখ্যা

ছেলেমানুষি শিক্ষা

ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষত্রিয়ের ছেলে ধনুর্বিদ্যা এমনি জাত-ব্যবসা হিসাবে ছেলেদের শিক্ষা দীক্ষা চলেছে এদেশে পুরাকালে,কিন্তু সে শিক্ষা ঠিক শিশু-শিক্ষা বল্‌তে যা বোঝায় অর্থাৎ শিশু-চরিত্র বিচার করে যে সহজ শিক্ষাপ্রণালী সমস্ত ইউরোপে চল্‌তি হল আজকাল, সে রকমের শিক্ষা কি না – সন্দেহ আছে। ইতর সাধারণের শিক্ষা কুলানুগত ; তাতে পেশা-অনুসারে ছেলে পাকা কামার, কুমার, তাঁতি ইত্যাদি হ'য়ে উঠ্‌তো। এসবের জন্যে সাধারণ স্কুল কি পাঠশালার খবর পাইনে প্রাচীন কালে। পাঠশালা যা ছিল আশ্রমে বা রাজধানীতে সেগুলো ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের ছেলেদের জন্যেই রয়েছে দেখা যায়। গৌতমের কাছে বালক সত্যকাম যখন ব্রহ্মবিদ্যার জন্য এসেছিল তখন জাতের কথা প্রথমেই উঠেছিল, পরে তাকে উপনীত করে গৌতম শিক্ষা দিয়েছিলেন। ক্ষত্রিয়ের ছেলের বেলায় এত কড়া নিয়ম নেই—রাজা-রাজড়ার ছেলেকে শিষ্য পেয়ে বরং গুরু খুসিই হচ্ছেন দেখা যায়! বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, সান্দিপনি, ষণ্ডামার্ক দ্রোণাচার্য্য এমনি সব বড় বড় গুরুর নামজাদা ছাত্র অনেকেই,—কার গুরু রাজধানীতে এসে শেখাচ্ছেন,কেউ বা কিছুদিনের জন্য গুরুর কাছে রয়ে যা শেখা দরকার শিখে

অন্য জাতের ছেলে প্রায় নেওয়াই হতো না পাঠশালায়। এই সব বালকদের শিক্ষার বন্দোবস্ত কিছুই ছিল না, গুরুর দয়ার উপরে নির্ভর। দ্রোণাচার্য্য একলব্যের উপর কি নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছিলেন এই বিদ্যা শেখানো নিয়ে তা মহাভারতে রয়েছে লেখা! গুরুদক্ষিণা এবং গুরুভক্তি আদায় করা হতো পুরোপুরি শিক্ষার পরে, এই ছিল নিয়ম যতদিনে পার শেখো গুরুর বাড়ীতে থেকে। এখন আগে মাইনে দাও, শেখো না শেখো ক্ষতি নেই! ক্ষত্রিয়ের ছেলেদের পক্ষে গুরু-গৃহবাস ব্রাহ্মণের ছেলের মতো বেশী কঠোর ছিল না বলেই দেখা যায়। তারা চটপট যা শেখবার তা শিখে কিছুদিনের জন্য কষ্টকর গুরু-দক্ষিণা যা দেবার তা চুকিয়ে রাজধানীতে ফিরে আস্‌তো নানা বিদ্যায় পাকা হয়ে বিশেষকরে ধনুর্বিদ্যাতে হাত পাকিয়ে; কিন্তু বেচারা ব্রাহ্মণের ছেলেদেরই উপর গুরু-গৃহের কাজ-কর্ম্মের চাপটাই বেশী করে পড়তো দেখা যায়! বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে লড়াই শেখাতে বনে নিয়ে গেলেন যখন, তার আগেই দশরথের ছেলে-কটি রাজধানীতেই অনেকটা শিক্ষালাভ করে মজবুদ হয়েছেন দেখা যায়। তেচাপি মনুজব্যাঘ্রা বৈদিকাধ্যয়নে রতাঃ, পিতৃশুশ্রূষণরতা ধনুর্বেদে চ

কৃতবিদ্য রাম-লক্ষ্মণকে নিতে এলেন বিশ্বামিত্র, অনেক বোঝানোর পরে এমন কি ভয় দেখানোর পরে তবে দশরথ ছেড়ে দিলেন মুনির সঙ্গে রাম লক্ষ্মণকে। মুনির কাছে বলা অতি-বলা বিদ্যা শিখতে রাজপুত্রদের বেশী দূর হাঁটতে হয়নি—অযোধ্যা থেকে ছয় ক্রোশ সরযূ-তীরে এসেই গুরু বল্লেন—"গৃহাণ বৎস সলিলং মাভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ, মন্ত্রগ্রামং গৃহাণ ত্বং বলামতিবলাং তথা। ন শ্রমো ন জ্বরো বাতে ন রূপস্য বিপর্য্যয়ঃ।"—বলা অতিবলা নাম্নী দুই বিদ্যা গ্রহণ কর, অনর্থক সময় নষ্টের প্রয়োজন কি? তাত রাঘব এই বিদ্যা তোমাকে শ্রান্তি জ্বর ও রূপবিকার থেকে রক্ষা করিবে। ব্রাহ্মণের ছেলের পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ এতটা সুলভ করা হয় নি কোন দিন—আয়োদস্ত ধৌম্য গুরু নিজের লোহার দাঁতগুলোর মতোই শক্ত গুরু—উপমন্যু,আরুণী, বেদ তিন নিরীহ ছাত্রকে নাস্তা-নাবুদ করে ছেড়ে ছিলেন বিদ্যে দেবার বেলায়। একলব্য দ্রোণাচার্য্যের কাছে তাড়া খেয়ে ধনুর্বিদ্যা স্বাধীনভাবেই শিখে ফেলেছিল কিন্তু গুরু ছেড়ে বিদ্যা লাভের ফল তাকে ভাল রকমেই ভোগ করতে হল।

বিদ্যা পেতে এখনো আমাদের শিশুদের কিছু কম ভুগতে হয় না। গুরু-দক্ষিণা দিয়ে ফতুর হয়েছে কত ছেলে অথচ পুরো বিদ্যে পায়নি এমন কত হচ্ছে তার ঠিক নেই। আগেকার শিক্ষার একটা ভাল ছিল—কঠোর করে বিদ্যা পেলে তো সে ছেলের আর মার নেই কিছুতে। "ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা ধর্ষয়ন্তি" তা ছাড়া বিদ্যে পাওয়ার পরে তবে গুরু-দক্ষিণার কথা, সেও যত দিনে পারো চুকিয়ে দেওয়া এও একটা মস্ত সুবিধে ছিল তখনকার কালে! দক্ষিণা চাওয়ার ভার ছিল গুরু-পত্নীর, তিনি কখন অদীতির কুণ্ডল চেয়ে বসতেন, মরা ছেলে ফিরিয়ে চাইতেন, এমনি নানা শক্ত শক্ত দক্ষিণা—বেরিয়ে পড়ত কৃতবিদ্য ছাত্রেরা অমূল্য দুর্মূল্য সামগ্রী সমস্তের সন্ধানে, এতে তাদের উৎসাহই দেখা যেতো a ventureএর গন্ধ পেয়ে ছুটতো ছেলেরা দক্ষিণার তল্লাসে। গরীব ব্রাহ্মণের ছেলেদের উপর শক্ত শক্ত দক্ষিণার ভার বড় একটা দেওয়া হত না তারা গুরু-গুরুপত্নীর সেবাতে দিন কাটাতো,—কাঠ কাটতো কুটনো কাটতো, জল তুলতো পুঁথির নকল করতো মায় গরু চরাণো তামাক সাজা পর্য্যন্ত —তারপর শিক্ষা শেষ করে সাধ্যমতো অল্প-সল্প দক্ষিণা কিছু দিয়ে বিদায় পেতো! আজকালের ইস্কুল-বাসের তুলনায় সেকালের গুরু গৃহবাস অনেক অংশে ভাল বই মন্দ ছিল না! গুরুর ঘর নিজের ঘর হয়ে উঠতো, সেখানে বনে বনে কাট কাটা, নদীতে জল তোলা, অনেক ছেলে-মেয়ে মিলে খেলা-ধূলো ইত্যাদি আশ্রম-বাসের নানা বৈচিত্র্য নিয়ে প্রবাস প্রায় নিজেদের গাঁয়ে থাকারই মতো মনোরম হয়ে উঠতো।বাদলায় ছুটি, অতিথি এলে ছুটি,—এমনি নানা ছুটি-ছাটার মধ্যে ছেলেরা হেসে-খেলে নিচ্ছে। উত্তর-চরিতে দিব্যি একটি ছবি পাই, যথা:—প্রথম—বলি ও সৌধাতিক! দেখ্‌না মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমটা কেমন দেখতে হয়েছে! অতিথির ভিড় লেগে গেছে, রান্নার ধূম পড়ে গেছে!

ভাতের মণ্ড মধুর উষ্ণ
হরিণের মা পেয়ে পরিতুষ্ট
নিজে খায় খাওয়ায় বাচ্ছায়
পরে এসে হরিণেরা উদয় ভরায়!
শাক ভাজা চমৎকার
মিষ্টি কুলচুর—
ঘী-ভাতের গন্ধে আজ
দিক্ ভরপুর।

সৌধাতকী। আজ দেখচি পাকা পাকা দাড়িওয়ালা বুড়োগুলো বেদ পাঠ বন্ধ করেছে,—বিশেষ কিছু একটা কাণ্ড আছে বোধ হচ্ছে।

প্রথম। আজ একজন বড় গোছের অতিথি এসেছে—তাই তো পাঠ বন্ধ তার খাতিরে।

সৌধাতকী। বলি ও ভাণ্ডায়ণ—ওই যে কপনি-আঁটা বুড়োদের সর্দ্দার, ওঁর নামটা কি হে?

ভাণ্ডা। আরে চুপ্ চুপ্! উনি হচ্ছেন বশিষ্ঠ-ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম থেকে দেবী অরুন্ধতী আর রাজা দশরথের পরিবারদের নিয়ে এসেছেন। অমন যা তা বলিস্‌নে—

সৌ। ঐ বশিষ্ঠ!

ভা। হাঁরে হাঁ।

সৌ। আমি বলি একটা বাঘ হবে বা!

ভা। আঃ থাম্ বলছি—

সৌ। ইনি এসেই আমাদের সেই বেচারা বকনাটির মড়-মড় করে চিবিয়ে উদরসাৎ করেছেন ভাই!

ভা। জানিস্‌নে বেদে আছে, মধুপর্কের সঙ্গে মাংস দিতে হয় ওদের মতো লোকেদের আতিথ্য করবার সময়। অতিথি গৃহস্থ কিম্বা শ্রোত্রীয় হলে বড় বড় বাছুর বড় এব ষাঁড় বড় বড় ছাগ উপহার দেবে,—এ যে শাস্ত্রে রয়েছে। বেদ ছাড়া তো আর ধর্ম্মশাস্ত্র নয়।

সৌ। না ভাই, তোর কথা তো ঠিক নয়, সবার বেলাতে তো এ সব আয়োজন হয় না দেখি।

ভা। কেন—

সৌ। বশিষ্ঠ এলে বাছুরটি মারা হল, কিন্তু জনক যখন এসেছিলেন তখন মহর্ষি বাল্মীকি শুধু দই আর মধু দিয়েই কাজ সারলেন, বাছুর তো দিলেন না!

ভা। যারা মাংস খায় তাদের জন্যেই এই নিয়ম। জনক যে ও-সব ছোঁন না—

সৌ। না খাওয়ার কারণটা কি অমন জিনিষ?

ভা। আরে সীতার বনবাস হয়েছে শুনে তিনি মনের দুঃখে চন্দ্রদ্বীপে যে তপস্যা করছেন বারো বছর ধরে, মাছ-মাংস খাচ্ছেন না—জানিসনে?

সৌ। তবে এখানে আজ হঠাৎ কি মনে করে!

ভা। প্রিয়বন্ধু বাল্মীকিকে দেখতে এসেছেন।

সৌ। তাঁর বেয়ানদের সঙ্গে দেখা নিশ্চয় হয়েছে, কেমন?

ভা। অরুন্ধতীকে পাঠিয়েছেন বশিষ্ঠ তাঁদের ডাকতে—এলেই দেখা হবে।

সৌ। বুড়োগুলো তো এক সঙ্গে মিল্লো! চল, আমরা বামুনের ছেলেগুলোর সঙ্গে মিলে ছুটিটা খেলাতে কাটাই, চল!

দু রকমের ছাত্র একদল শাস্ত্রে পাকা আর ভাল মানুষ, আর একদল ডান্‌পিটেই রয়েছে দেখি। এই সেকালের আশ্রমের একটা কোণ কবির লেখায় ফুটলো, এর সঙ্গে এরি পাশে শকুন্তলার আশ্রম-বাসের চিত্র ধরলেই পুরো একটি সেকালের আশ্রমের ছবি পাই। সেটা অনেকটা দেখি এখনকার আমাদের শান্তি-নিকেতনের আশ্রম! হরিণ গাছ-পালা ফুল-পাতা পশু-পক্ষী সবায় এক সঙ্গে মিলে মিশে—মেয়েরা রয়েছে ছেলেরা রয়েছে,—মনের আনন্দে খেলা-ধূলো পড়া-শুনো যেন একটি পরিবারের অন্তর্গত হয়ে! ছেলেদের শিক্ষা সব বড় বড় শাস্ত্র ব্রহ্মবিদ্যা ধর্ম্মশাস্ত্র এমনি শক্ত শক্ত ব্যাপারের কুটক চাল, মেয়ের শিক্ষা পদাবলী এবং নানা সুকুমার শিল্পকলা ধরে অগ্রসর হচ্ছে ক্রমে ব্রহ্মবিদ্যা পর্য্যন্ত এর আভাস পাই নানা কাব্যে উপনিষদে। একটি ঋষি-বালক সে দেখি বালকই রয়েছে অনেকদিন পর্য্যন্ত কিন্তু মেয়েরা দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল এবং তাদের মুখে সব পাকা পাকা কথা হঠাৎ যেন ফুটলো, এও দেখি! শকুন্তলা আর তার সখীদের কথায়-বার্ত্তায় এটা স্পষ্ট হয়েছে।

শকুন্তলা।—আমাকে একলা রেখে যেওনা সখি একজন আমার কাছে থাক!

সখীরা।—একলা কেন! স্বয়ং পৃথিবী-পতি তোমার কাছে রইলেন।

শকুন্তলার চরিত্র কবির সৃষ্টি সুতরাং সেটার মধ্যে তিনি ইচ্ছামতো নগরের মেয়েদের হাব ভাব অনেকখানি মিলিয়েছেন—একেবারে নিখুঁত আশ্রমের ছবি বলে ধরা চলে না, কিন্তু এর থেকে একটা আভাস পাওয়া যায় যেন, ছেলেদের শিক্ষায় মেয়েদের শিক্ষায় একটু তফাৎ রয়েছে! মেয়েলী রকম শিক্ষা হলেও তার মধ্যে দিয়ে বেশ একটু নিজেকে সামলে চলায়, নানা কর্ম্ম সুচারুভাবে নিষ্পন্ন করায় তৈরী হয়ে উঠছে মেয়েরা। অনসূয়ার একটি কথা থেকে এটা ধরা যায়—

অনসূয়া—আমরা তপোবনে থাকি,লোক-ব্যবহার যদিও ভাল বুঝিনে তবু আমার মনে হয়, শকুন্তলার প্রতি রাজর্ষি বড়ই অশিষ্ট ব্যবহার করেছেন।

নিত্য কাযের মধ্যে দেখা যায়, অতিথি-সেবা রাঁধা-বাড়া গাছে জল দেওয়া, পালিত পশু-পক্ষীর সেবা-

হাতে! বালকদের নিত্য কায তাও আর এক প্রস্থ রয়েছে দেখা যায়। কণ্বমুনির আশ্রমের প্রভাত দৃশ্য—শিষ্য—(স্বগত) প্রবাস হতে ফিরে এসে মহর্ষি কণ্ব প্রাতঃকালের হোম-বেলা নির্দ্ধারণ করতে আমাকে আদেশ করেছেন। এখন তবে বাহিরে গিয়ে দেখা যাক রাত্রি প্রভাত হল কি না! এ কি একেবারে সকাল হয়ে গেছে যে!

ঘড়ি ধরে কায করানো হতো ছেলেদের এবং লোক-ব্যবহারে এদের অনেকখানি অভিজ্ঞ করে তোলা হতো—একেবারেই বুনো রকম থাকতে দেওয়া হতো না; যথা—

কণ্ব। বৎস,এখন তোমাকে কিছু উপদেশ দিই শোনো। বনবাসী হলেও আমরা লোক-ব্যবহার সমস্তই অবগত আছি।

গুরুজনকে শুশ্রূষা করবে, সপত্নীর সঙ্গে সখির মতো ব্যবহার করবে, অপমানিত হলেও পতির প্রতিকূল আচরণ করবে না—এমনি নানা উপদেশ যা বধূজনকে দেওয়া উচিত তা গৌতমী দিচ্ছেন, কণ্ব দিচ্ছেন শকুন্তলাকে।

অসুখ-বিসুখ হলে দেখা-শোনার ভার ছিল আশ্রমের যাঁরা প্রাচীনা ও প্রধানা তাঁদের উপর। শকুন্তলাকে দেখতে গৌতমী আসছেন।—

সখীরা। পিসিমা এইদিকে চল

গৌতমী। (শকুন্তলাকে) বাছা, তোর শরীরের তাপ কিছু কমলো কি?

শকুন্তলা। কিছু বিশেষ হয়েছে—

গৌতমী। এই কুশের জলে সব অসুখ সেরে যাবে। সন্ধ্যা হল চল এখন কুটীরে।

ঠিক যেন ঘরের ছেলে-মেয়ের মতো আশ্রমে ছেলে-মেয়েরা মানুষ হচ্ছে, যার পক্ষে যা উপযুক্ত শিক্ষা তাই লাভ করে। নানা কাব্য সাহিত্য থেকে এটাও স্পষ্ট দেখা যায়। শুধু লেখা-পড়া নয়, নানা রকম উপাখ্যান এবং নতুন নতুন রচনা সমস্ত পড়েও শোনাচ্ছেন ঋষিরা বালক-বালিকাদের—লব-কুশকে রামায়ণ গান শিখিয়ে বাল্মীকি সবার সামনে তার পরীক্ষা নিচ্ছেন, গান শুনে মুগ্ধ হয়ে নানা পুরস্কার আশীর্ব্বাদ দিচ্ছেন বালকদুটিকে

তার পর আশ্রমের কায শেষ হলে এক-একদিন ঋষি বেত্রাসনে বসে নানা উপাখ্যান বলে চলেছেন তারও বর্ণনা পাচ্ছি। কাদম্বরীতে এইভাবের একটি চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে. দেখি—

—চাঁদ আস্তে-আস্তে উঠ্‌লো, চাঁদনী পৃথিবীর উপরে যেন সুধার প্রলেপ ঢেলে দিলে! শিশির-শীতল বাতাসে পদ্মবনের মধুর গন্ধ ছড়িয়ে গেল! হরিণের চোখ ঘুমে ঢুলে আস্‌ছে—তারা আলস্য-ভরে রোমন্থ করছে, সুখে উপবিষ্ট আশ্রম-মৃগসকলের দ্বারায় অভিনন্দিত হয়ে রাত্রি আগত, রাতের বাতাস ধীরে বয়ে চল্লো! এই ভাবে রাত্রি যখন অর্দ্ধ যাম উত্তীর্ণ, তখন কৃতাহার আমাকে নিয়ে সবাই মুনির কাছে উপস্থিত! তপোবনের এক স্থান চাঁদের আলোয় আলো হয়ে গেছে সেইখানে বেত্রাসনে সুখোপবিষ্ট মুনি, জালপাদ নামে শিষ্য কুশ আর মৃগ-চর্ম্মের দ্বারা প্রস্তুত ব্যজনী নিয়ে তাকে বাতাস করছে! এর পর যখন সবাই ঋষি জাবালীকে ঘিরে বস্‌লো, তখন তিনি তাংশ্চসর্ব্বানেকাগ্রান্ শ্রবণ-তৎপরান্মুনীন্ বুদ্ধা শনৈঃ শনৈঃ বব্রবীৎ শ্রূয়তাং যদি কুতূহলম্—এই ভাবে গল্প চলতো—গান চলতো আশ্রমের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে!

দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে কচ-দেবযানীর উপাখ্যানটি গুরু-গৃহবাসের আর একটি দিক আমাদের দেখায় কাব্যের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে আশ্রমের শিক্ষা-ব্যাপারের একেবারে সঠিক হিসেব পাওয়া শক্ত; কিন্তু একটা জিনিষ যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হচ্ছে এখনকার ইস্কুলের সঙ্গে তখনকার আশ্রমের শিক্ষার সম্পূর্ণ প্রভেদটা। সহরে ছেলেমেয়েদের কিভাবে শিক্ষা চলতো এইবারে খানিক খানিক আভাস নানা বই থেকে নেওয়া যাক—সমান-বয়সী সমান-কুলশীল ছেলেদের সঙ্গে রাজার ছেলেরা শিক্ষা লাভ করছে নানা বিদ্যার, ব্রাহ্মণের ছেলেরাও কেউ কেউ রাজকুমারদের সঙ্গে এক পাঠশালে মানুষ হচ্ছে, তারপর কুমারের বয়স্য হয়ে উঠ্‌ছে। কৃষ্ণের সখা সুদামা এবং নানা রাজারাজড়ার সখাদের মধ্যে শিক্ষা-গত একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়—সুদামা

বিদূষকগুলো কিন্তু বড় লোকের ছেলেগুলোর সঙ্গে পড়তে গিয়ে জন্মের মত বয়ে গেল।

রাজার ছেলেদের জন্য ভাল ভাল গুরু খুঁজে আনা হতো এবং সহরের কাছাকাছি কোথাও বিদ্যামন্দির বানিয়ে সেখানে সমান কুলশীল আরো ভাল কতক ছেলের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হতো। কাদম্বরীর মধ্যে এই ধরণের একটি বিদ্যামন্দিরের সঠিক বর্ণনা দেওয়া আছে—

"তারাপীড়ঃ ক্রীড়াব্যাসঙ্গবিঘাতার্থং, বহির্নগরা-দনুশিপ্রম্ অর্দ্ধক্রোশমাত্রায়ামম্, অতিমহতা তুহিনগিরিশিখরমালানু-কারিণা সুধাধবলেন প্রাকারমণ্ডলেন পরিবৃতম্, অনুপ্রাকার-মাহিতেন মহতা পরিখাবলয়েন পরিবেষ্টিতম্ অতিদৃঢ়-কপাট-সম্পুটম্ উদ্ঘাটিতৈকদ্বারপ্রবেশম্, একান্তোপরচিতত্তুরগবাহ্যালী বিভাগম্, অধঃকল্পিতব্যায়ামশালম্, অমরাগারাকারং বিদ্যা-মন্দিরমকারয়ৎ। সর্ব্ববিদ্যাচার্য্যাণাঞ্চ সংগ্রহে যত্নমতিমহান্ত-মন্বতিষ্ঠৎ।" নগরের বাইরে নদীর ধারে প্রাচীর ঘেরা আধক্রোশ জুড়ে বিদ্যালয়, তার মধ্যে ব্যায়াম ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি নানা পুরুষোচিত শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, বাছা বাছা শিক্ষকগণ শিক্ষা দিচ্ছেন নানা বিদ্যা রাজপুত্র ও তাঁর সহচরদের। রাজকুমারীরা ঘরে রয়েছেন। উত্তরা, বাসবদত্তা যে-ভাবে শিক্ষা পেয়েছিলেন সেইভাবের শিক্ষার ব্যবস্থা রাজ-অন্তঃপুরেই করা হচ্ছে।

শিক্ষা শেষ হলে বিদ্যার পরীক্ষা হতো—তারপর দিক্-বিজয়, বিবাহ ইত্যাদির কথা। অজন্তা গুহায় শাক্য-কুমারদের শিক্ষাগারের একটী সুন্দর চিত্র রয়েছে—মুনিরা বালকের শিক্ষার এবং ক্রীড়ার নানা সরঞ্জামের মধ্যে বসে পাঠ দিচ্ছেন—ছবির দুটো অংশে উঠান আর পাঠশালার ভিতরের খানিক দেখা যাচ্ছে, উঠানে চৌকির উপরে ব্যায়াম ও ধনুর্ব্বেদের আচার্য্য বসে, সামনে ছেলেরা কেউ তীর ছুড়তে শিখছে, কেউ কুস্তি করতে লেগেছে, কেউ বা শ্রান্ত হয়ে বসে পড়েছে! ঘরের মধ্যে একজন ওর মধ্যে চালাক-ছেলে পুঁথি নকল করছে' বাকি সবাই ছোট ছোট জল-চৌকির উপরে গুরুর সামনে বসে কাঠের তক্তির উপরে লিখছে অঙ্ক কস্‌ছে,—ঘরের দেওয়ালে শিক্ষার নানা সামগ্রী, রকম রকম পশু-পক্ষীর মেপ বাঁধা ছবি, একটা দাঁড়ে জেন্ত টীয়া পাখী ঝুলছে, ঘরের কোণে ধনুক একরাশ, দেওয়ালে তূণগুলো ঝোলানো রয়েছে, একদিকে দু'তিন রকম বাদ্য-যন্ত্র! দেওয়ালের গায়ে ছেলেরা খড়ি দিয়ে কি সব মাথা-মুণ্ড এঁকেছে লিখেছে তা পর্য্যন্ত এই চমৎকার পাঠশালার ছবিতে ধরা হয়েছে। মস্ত একটা জাল-আঁটা পায়রার খোপ ঘরের ছাতে রয়েছে এবং ছেলেদের টিফিনের জন্য জল-খাবার একটি হাঁড়ি সিকেয় তোলা রয়েছে এটি পর্য্যন্ত চিত্রকর এঁকে রেখে গেছে,—রাজপুত্রদের পাঠশাল—যেমন হতে হয় তেমনি! এ ছাড়া আর এক ধরণের গুরু-শিষ্যের খবর পাওয়া যায়, যাদের বাঁধা আশ্রম বা পাঠশালা নেই, দুর্ব্বাসার মতো ষাট হাজার শিষ্য সঙ্গে তারা কেবল নানা দেশে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। হয়তো—এই ভাবে নানা তীর্থ নানা সহর দেখিয়ে বেড়ানো হতো আশ্রমবাসীদের এবং লোক-ব্যবহারে তাদের চতুর করে তোলা হতো দিনে দিনে। বুদ্ধদেবও দেখা যায় এই ভাবে নানা স্থানে শিষ্যদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং নগরে নগরে দেশে দেশে নূতন নূতন শিষ্যদের কাছে ধর্ম্ম উপদেশ করে চলেছেন, ছেলে মেয়ে সবাই আসছে উপদেশ পেতে নানা বিষয়ে। এই ভাবে ধর্ম্ম-উপদেশ নানা জন্তু-জানোয়ার ও অদ্ভুত সমস্ত আখ্যায়িকা ধরে বুদ্ধদেব দিয়ে গেলেন জন-সাধারণকে! কথকতা জিনিষটা এবং যাত্রা-গুলোও এইভাবে নিরক্ষর জনসাধারণকে ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-নির্ব্বিশেষে পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদিতে মোটা-মুটি অভিজ্ঞতা দিয়ে চল্লো, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চরিত্র গঠন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা নানা বৌদ্ধ জৈন মঠ ও বিহারের মধ্যে ধরা রইলো. তার পর নালন্দা বিদ্যাপীঠ সৃষ্টি হল—দেশ বিদেশের ছাত্র এসে সেখানে নানা বিদ্যা নানা শিল্প শেখার সুবিধা পেলে, এই রকম University কয়েকটার খবর পাওয়া যায় বৌদ্ধ যুগে। এই ধরণে University শঙ্কর মঠ, বৈষ্ণব মঠ, শৈব-শাক্ত মঠগুলোকে বলা চলে না, কেন না সেগুলো সবই সম্প্রদায়-বিশেষের আড্ডা মাত্র, সেখানে শাস্ত্র নিয়ে তারা-তর্ক বিতর্ক করতে শেখে, বিদ্যাপীঠ বলে

একটি মঠ সেখানে দেখে—এলেম মোহান্ত থাকেন এবং সেখানে ছেলে পড়ানোর পাঠশালা আছে মস্ত প্রাচীর ঘেরা আধ ক্রোশ জুড়ে বৃহৎ একটা ব্যাপার কিন্তু সেখানে গেলে কাদম্বরীর যে বিদ্যাপীঠের ছবি তার একটুও আভাস পাওয়া যায় না। নবদ্বীপের টোলের শিক্ষা অনেকখানি গুরুগৃহ-বাসের ধারায় গঠিত হয়েছে দেখা যায়, কিন্তু সে সব আশ্রমের বর্ণনা পাই কাব্যে সাহিত্যে, সেখানে বিদ্যার জন্ত তপস্যা চলেছে—তার মতো অনুষ্ঠান টোলগুলো নয়। এখনকার গ্রাম ও সহরের ইস্কুল আশ্রমের শিক্ষার সঙ্গে তার কোন মিলই নেই, টোলের সঙ্গেও নয়। আশ্রম এবং গুরু-গৃহের শিক্ষায় একটা হৃদয়ের সম্পর্ক আপনা হতেই আস্‌তো মানুষে মানুষে এবং মানুষে ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলনে হৃদ্য হয়ে উঠতো শিক্ষার দিনগুলো। ইস্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি হবার জো নেই—মস্ত মস্ত ইস্কুলবাড়ি দিনরাতের মধ্যে আঠারো ঘণ্টাই খালি পড়ে থাকে, হঠাৎ ঘণ্টা-কতকের জন্তে ঘড়ি ধরে সেখানে গুরু-মশায়রা বিদ্যা বেচতে আসে, বিদ্যা কিনতে আসে ছাত্ররা; জম-জমাট বিদ্যার হাট বসে যায়, তারপর বেলা চারটেতে ঘড়ি ধরে হাট ভাঙ্গে! গুরু-কুলে বাস করে শিক্ষা এবং আশ্রমে বাস করে শিক্ষা এই দুটো রকমের শিক্ষাই প্রচলিত ছিল আগে এসিয়া ইউরোপ সব দেশে। জাপানে এখনো শুনি বাপ-মা নিজের কাছে না রেখে ছেলেদের বন্ধুর বাড়ীতে একটা বয়স পর্য্যন্ত রেখে শিক্ষিত কোরে তোলে। ইউরোপে নানারকম convent ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে শিক্ষাগার সমস্ত রয়েছে দেখা যায় আগেকার আমলে! এই সব অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্ম-শিক্ষা তারি আনুসঙ্গিক ভাবে অন্য সমস্ত কলা-বিদ্যাও শেখানো হতো। ঠিক শিশু-শিক্ষা যাকে বলা যায় তেমন-তরো হিসেবে এই সব শিক্ষাগার গঠিত হয়নি। শিশু-চরিত্র ও শিশুকালটাকে মানুষ বরাবরই ধর্ত্তব্যের মধ্যে থেকে বাদ দিয়ে তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা করে এসেছে। ইউরোপ এ ভুলটা শীঘ্র শীঘ্র শুধরে শিশুদের জন্তে সহজভাবে নানা শিক্ষা-প্রণালীর কথা ভেবে গেল, সেখানে ফ্রোয়েবেল প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত শিশু-চরিত্র বিচার করে শিক্ষার ব্যবস্থা করে চল্লেন,

আমরাও শিশুশিক্ষা দিতে অগ্রসর হলেম—কিণ্ডারগার্টেন ইত্যাদি নানা উপায়ে,—কিন্তু সত্যিই এদেশের শিশুদের উপযোগী করে কোনো শিক্ষাগার হয়েছে কি না এ বিষয়ে এখনো আমার সন্দেহ আছে। প্রাচীন ভারতে এক বিষ্ণুশর্ম্মার নাম পাই, যিনি সত্যিই ছেলেদের দিকে চেয়ে কিছু করতে চেয়েছিলেন। এই একটা সময়ে দেখি বালকদের জন্যে কিছু কিছু চিন্তা বাপ মা এবং গুরুও করছেন—এ ছাড়া দ্বিতীয় উদাহরণ খুঁজে পাওয়া শক্ত এদেশের ইতিহাসে। মোগল আমলে যা শিশুশিক্ষা দেওয়া হতো তার সম্বন্ধে আরঙ্গজেব বাদশার সঙ্গে তাঁর গুরুমশায়ের কথাবার্ত্তা থেকে বেশ ধরা পড়ে—বাদশা স্পষ্টই তাঁর গুরুকে শুনিয়ে দিয়েছিলে যে কোন শিক্ষাই তাঁকে দেওয়া হয়নি। এর পর থেকে আজকের আমল পর্য্যন্ত শিশুশিক্ষার জন্য যা কিছু বই লেখা হল তার আদর্শ বলে ধরে নিতে পারি আমাদের ছেলে-বেলায় পড়া সেই শিশুবোধ! ভাষা-হিসেবে এখনকার ছেলে-ভুলোনোর বইগুলো শিশুবোধের চেয়ে একটু নেকামিতে মাখা এই যা প্রভেদ—শিশুকে কোন বিষয়ে একটুও শিক্ষা বা আনন্দ দেয় না দেখেছি এই সব বই। আমি তো দেখি এক হিসেবে আমাদের আমলের শিশুবোধক ধারাপাত শুভঙ্করীগুলো বড় মন্দ ছিল না—আর কিছু না হোক শিশুবোধক আজকালের শিশুপাঠ্য জিনিষগুলোর। মতো ভাঙ্গা ভাঙ্গা আধো আধো বুলি দিয়ে সত্যিকার ছেলেদের ভেংচাতো না। শিশু বোধকের ছবিগুলো ছিল ভারি মজার এখনকার সচিত্র পাতাগুলোর চেয়ে চেয়ে ঢের মনোরম—চাণক্য পণ্ডিত মস্ত টিকি নিয়ে একপাতা জুড়ে বসে আছেন—সে ছবিটা দেখলেই বলতে হতো পণ্ডিত বটে, সান্দিপণী মুনির পাঠশালা—মস্ত জটা মস্ত দাড়ি সান্দিপণী ঋষি, যেন একটা ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য্য মূর্ত্তিমান, ছেলেগুলো তাঁর সামনে যেন কেঁচো হয়ে বসে আছে গুটিসুটি! সেকালের অঙ্কশেখার ছড়া সমস্ত—কুড়বা কুড়বা কুড়বা নিজ্জে কাঠায় কুড়বা কাঠায় নিজ্জে, কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ, দশবিশ গণ্ডায় কাঠায় কাঠায় জান।" এমন মজার অঙ্ক ও হিসেব কোন ছেলে মুখস্ত না করে থাকতে পারে না। তারপর

বার মতো যে সামগ্রীও ছিলনা যে তা নয়-এ তিনমাসের পথ অবন্তিনগর তিনদিনে উত্তরিল হরি হলধর,বেলা অবসান হৈল অস্তযায় ভানু, সান্দিপণি মুনির দ্বারেতে রামকানু……দুই মাস চারিদিনে পাঠ সমাপন। বইখানার মাঝে মাঝে এমনি সব একটু আধটু রসের ছিটে ফোঁটা, শিশুবোধকের পত্র লেখার ধারা বুৎক্রম্ ব্যঞ্জন ইত্যাদি ভারি একটা শব্দচ্ছটা দিয়ে গম্ভীর, বেশী কিছু পদার্থ নেই শুধু লিখে পড়ে যেতেই মজ-মহামহিম শ্রীযুক্ত তরণীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বরাবরেষু, লিখিতং শ্রীহলধর দে কস্য কর্জ্জ পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে মহাশয়র ৫০, টাকা কর্জ্জ লইলাম—সুদ ।০ হিঃ দিব এক মাহার মধ্যে পরিশোধ, অথবা-শ্রীচরণ সরসি দিবানিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম, প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদ সরোরুহস্মরণ মাত্র অত্র শুভবিশেষ…একবার রসালো একবার খটমটে চাণক্য শ্লোক পড়িয়ে ছেলেদের দাঁত নানা জিনিষে যেন পরখ করিয়ে নেওয়ার মতো করে শিশুবোধক খানা রচনা হয়েছিল, উদ্দেশ্যটা ভাল কিন্তু শিক্ষার দিক দিয়েও গেলনা বইটা। আঙ্ক আঙ্ক প্রভৃতি কতকগুলো খটোমটো শব্দ লিখতে পড়ে-যেতে শিখিয়ে দিয়ে খালাস গুরুমশায়—! তারপর মেয়েরা গিয়ে ঠেকতো শাশুড়ির পাল্লায় ছেলেরা ঘটকের পাল্লায় এইছিল শিক্ষার শেষ এখন একটু ধরণ বদলেছে-মেয়েরা গিয়ে ঠেকছে নবেলে ছেলেগুলো গিয়ে ঠেকছে Examination হলে, ঠকছে ঠকছে সবাই ছেলে-মানুষি শিক্ষার ফলে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রণাম

চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-তারা!
আজ সকলে করচি নমস্কার।
নীলাকাশের জ্যোৎস্না-ধারা!
নাও গো প্রণাম—হে মোর চমৎকার!
মেঘের সখা হে হিমাচল!
হে প্রকৃতির অজর যোগীশ্বর!
ললাট তব তুষার-ধবল,
প্রণাম করে বিস্মিত নশ্বর!
অশ্রুত কোন্ শ্রুতির গাথা,
গাইছ সাগর, ভুবন-ভবনে,
তোমার তটে নুইয়ে মাথা,
শুব্ধ আমি, মুগ্ধ শ্রবণে।
আলোক-ছায়ার স্বপ্ন-গেহ!
উপত্যকার ফুলকারী ঐ বুক,
কঠোর শিলার স্ফূর্ত্ত স্নেহ!
করচি নতি ওগো নয়ন-সুখ!
মূর্ত্ত যেন বিশ্বপুলক!
সূর্য্যকরে জলন্ত প্রপাত!
নির্জ্জনতার ভাবের শোলক!
আনন্দ মোর করচে প্রণিপাত।
গহন-বনের মর্ম্মে মেতে,
নৃত্য করে নিত্য সজীব-জড়!
পত্র-বীণার কীর্ত্তনেতে
চিত্ত করে তৃপ্ত হয়ে গড়।
শরৎ-উষার মিষ্টি চাওয়া!
বিহগ-বাঁশীর গান-জমানো তান!
ঘুম-ভাঙানো ভোরের হাওয়া!
সবার পদেই নমিত মোর প্রাণ।
জল-কবরীর অলক খুলে,
'জলতরঙ্গ' বাজাও তটিনী!
প্রণাম করি শ্যামল কূলে,
মর্ত্ত্যে তুমি স্বর্গ-নটিনী!
বিশ্ব-ভ্রূণের ধাত্রী-মাতা!
মাটি,—জীবের প্রাণ-রসেরি সার!
কোল যে তোমার সদাই পাতা,
ধরিত্রী গো, তোমায় নমস্কার!
ছোট্ট ঘাসের অনামা ফুল!
শিরায় তোমার বাজচে অসীম সুর,
প্রণাম দিতে করবনা ভুল,
তোমার রূপে ম্লান যে কোহিনুর!

এর মাঝেতে তুমি মানুষ !
ছন্দে-লীলায় মহাকবিতা,
নওকো তুমি ক্ষণিক ফানুষ,
দীপ্তি-গতির অমর সবিতা !
সান্ত দেহে বিশ্বপতি !
মানুষ, তুমি জগৎ-সারথি !

নাও গো তুমি মোর প্রণতি,
মানবতার কর্‌চি আরতি।
সচল-অচল রূপের নাটে
ক্ষুদ্র এবং শ্রেষ্ঠতম গো !
সবার পূজায় জীবন কাটে,
এই নিখিলে নমো নমঃ গো।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

রমা। *

ভাদ্রমাসের শেষ সন্ধ্যা। শরতের গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসছে। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। এক পশলা বৃষ্টি পৃথিবীকে ন্যাইয়ে চলে গেছে। তাতে না ছিল বিদ্যুতের ঝিলিক, না ছিল বজ্রের গম্ভীর আওয়াজ। বাড়ীর সামনেকার বাগানটা বৃষ্টিবিন্দুর টোপর পরে অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভায় জ্বলে উঠেছিল।

রমা তখন ড্রয়িংরুমে বসে। স্বপ্নজড়িমা-মাখা চোখে সে বাগানের দিকে তাকিয়ে। তার মনের কোণে কালো মেঘ জমাট বেঁধেছিল, আমি তা জানতুম। আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম, রমা তার মনের সঙ্গে যুঝে-যুঝে হার মানছিল—নিঃসহায় স্রোতের ফুলের মত মনটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, এবং চকিতে খোলা দরজার পথে বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক ঘণ্টা কেটে গেল—দুঘণ্টা যায়, তবু তার দেখা নেই !

আমি উঠে দাঁড়ালুম ঘর ছেড়ে বাগানে ঢুকলুম। আঁধার তখন তার কোমল আর স্বপ্নভরা রথে ধরার বুকে নেমেছে। ভিজে বালির উপর সামনে একটা গোল জিনিষ আঁধারেও রাঙা হয়ে জ্বলে উঠছিল। আমি নুয়ে পড়লুম। এ যে সদ্যফোটা গন্ধ ভরা গোলাপ ! এই সন্ধ্যাতেই ত আমি তার শ্লথ কবরীতে ঐ ফুলটী গুঁজে দিয়েছিলুম।

কাদা থেকে ফুলটী সযত্নে কুড়িয়ে নিলুম,—ঘরে ফিরে তার টেবিলে ফুলদানীতে ফুলটীকে সাজিয়ে রাখলুম।

রমা ফিরে এল—খানিকক্ষণ পায়চারি করে টেবিলের সামনে বসে পড়ল। তার মুখখানি বিবর্ণ—সাদা গোলাপের মত তার চোখদুটীতে আঁকা ব্যথা, কালো মেঘের মত নিবিড় !

গোলাপটী তার চোখে পড়ল। সে সেটাকে হাতে তুলে নিলে—তার কাদামাখা পাপড়িগুলোর দিকে ম্লান নয়নে একবার তাকালে—আমার দিকেও একবার চোখ তুলে চাইলে।—তার গতি-হারা চোখ অশ্রুমুক্তার ঢাকনা পড়ে জ্বলে উঠছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—ও কি, তুমি কাঁদছ কেন ?

রমা কাঁদনের সুরে বল্লে,—এ গোলাপটীকে দেখ দিকিন। দেখ ত এর কি হয়েছে ?

কেন জানিনে অর্থ-ভরা সুরে আমি বলে উঠলুম,—তোমার চোখের জলে তার সব কাদা ধুয়ে যাবে।

চোখের জলের ধোবার ক্ষমতা নেই, তাতে আছে শুধু জ্বালা—

এই কথা বলে সে ফুলটীকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলে।

দিয়ে সে আনন্দে বলে উঠল,—অশ্রুর চেয়েও আলোর বেশী জ্বালা !

তার কোমল দুটি চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে এক অজানা আনন্দের শিহরণে কেঁপে উঠল। আমি বুঝলুম, সেও আগুনে পুড়ে খাঁটী সোনা হয়ে বেরিয়েছে !

শ্রীঅশোককুমার চন্দ।

---

* টুর্গেনিভ হইতে।

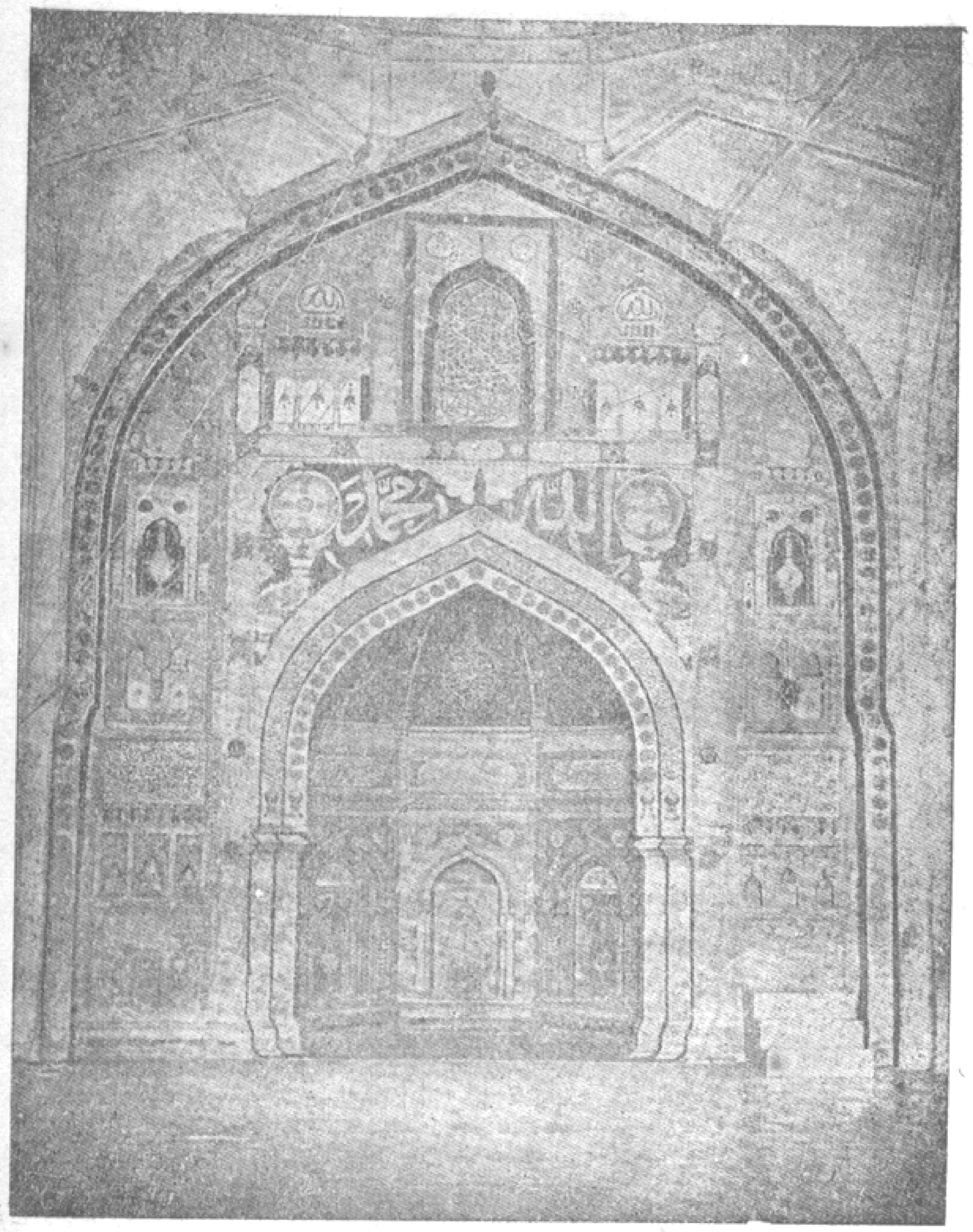
বিজাপুর

সেকালে মুসলমান-সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে বিজাপুর সহর, সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রভূমি ছিল। আজ যেমন কলিকাতার ফ্যাশন অনুকরণ করিবার জন্য অন্যান্য দেশ আকুল, তেমনি বিজাপুরের ফ্যাসনও এককালে সহুরে বলিয়া খ্যাত ছিল। মুসলমানদের অধিপত্য-বিস্তারের পূর্ব্বে বিজাপুরে চালুক্য-বংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। চালুক্য যুগের শিলালিপি পাঠে আমরা জানিতে পারি, ইহার নাম ছিল বিজয়পুর।

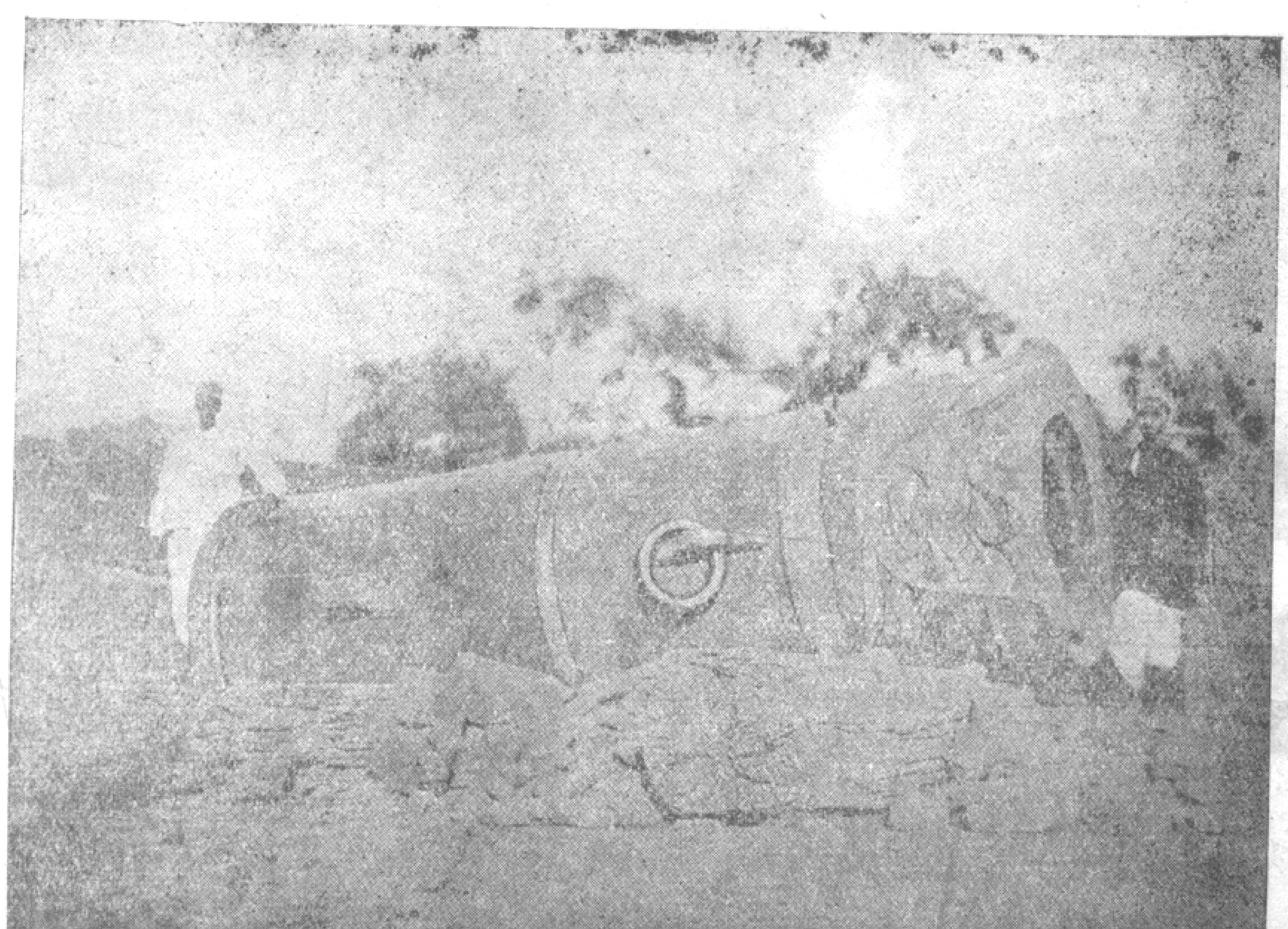
অতি-প্রাচীন বিজাপুর অর্থাৎ বিজয়পুরে হিন্দু আমলের প্রাচীন গৃহাদির চিহ্ন এখনো বর্ত্তমান আছে—সেগুলির নির্ম্মাণ-কৌশল ও নক্সার পরিপাট্য হইতে ইহা বেশ স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে বিজাপুর হিন্দু আমলেও এক প্রসিদ্ধ নগর ছিল। এবং মন্দিরের প্রাচুর্য্য এত বেশী ছিল যে মুসলমানেরা যে-সব মসজিদ ও ইমারত নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, তাহা ঐ মন্দিরেরই ইট-কাঠ আর পাথর লইয়া। মুসলমানের হাতে পড়িয়া মন্দিরের চূড়া মসজিদের মণ্ডপে রূপান্তর পাইল।

বিজাপুর রাজ্যের পত্তন হয় বাদশাহ আদিল শাহের হাতে। বাহমনী বংশ বিলুপ্ত হইলে সেই বংশেরই প্রভুভক্ত সর্দ্দার যুসুফ বিজাপুর ও কাছাকাছি আর-কয়েকটি প্রদেশ করতল-গত করিয়া নূতন বংশ ও নূতন সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেন। এই বংশের নাম আদিল শাহী-বংশ। এই সময়েই বর্ত্তমান বিজাপুর নগরের পত্তন হয়।

যুসুফের ইতিহাসে একটু রহস্য আছে। রুমের সম্রাট বজাজতের তিনি কনিষ্ঠ পুত্র। রুমের নিয়ম ছিল বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাদ্‌শাহী তখ্‌ত্‌ পাইবে অপর পুত্রেরা পাছে তখ্‌তের পথে বিঘ্নের সৃষ্টি

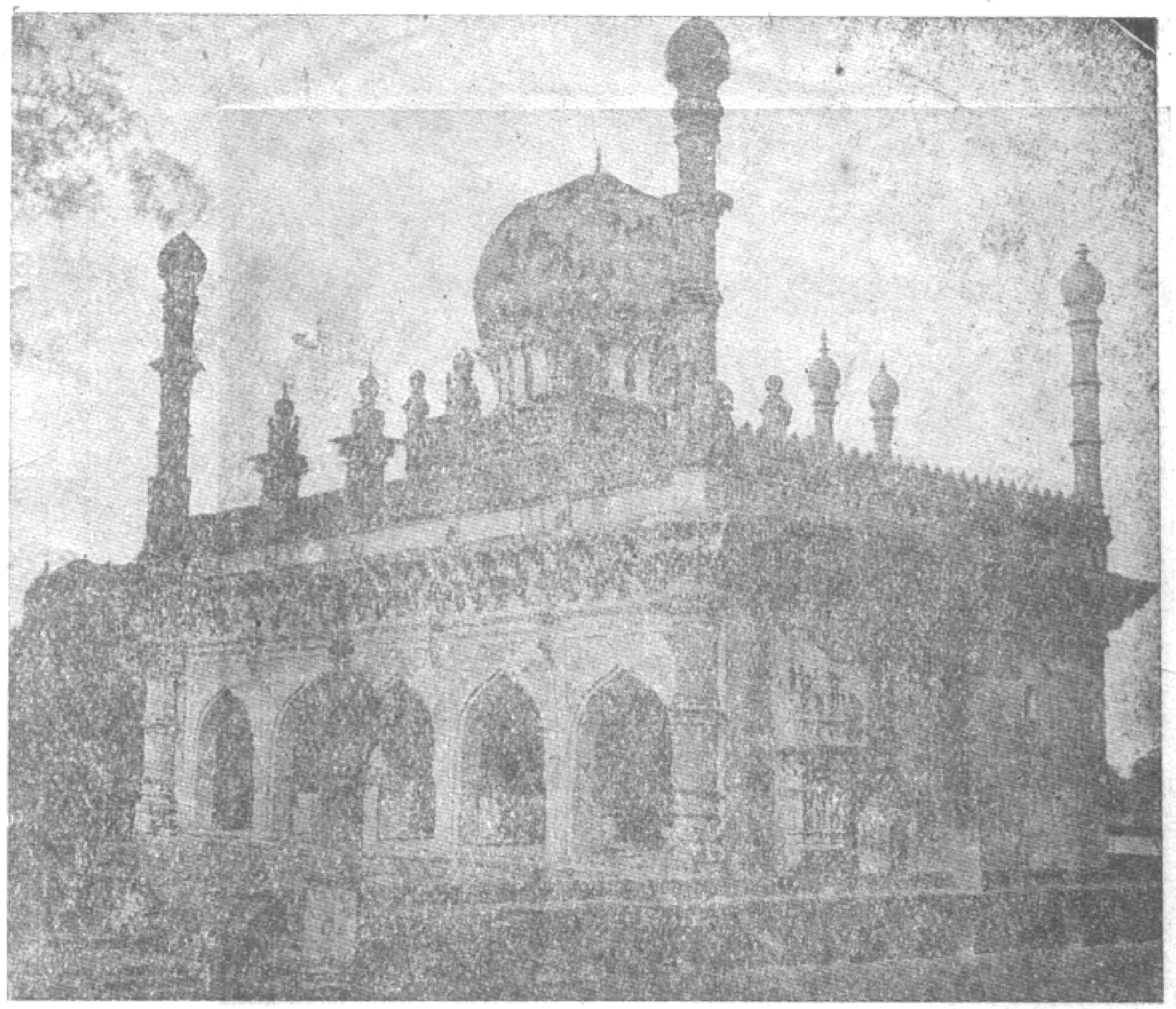


জুম্মা মসজিদ—ভিতরকার দৃশ্য



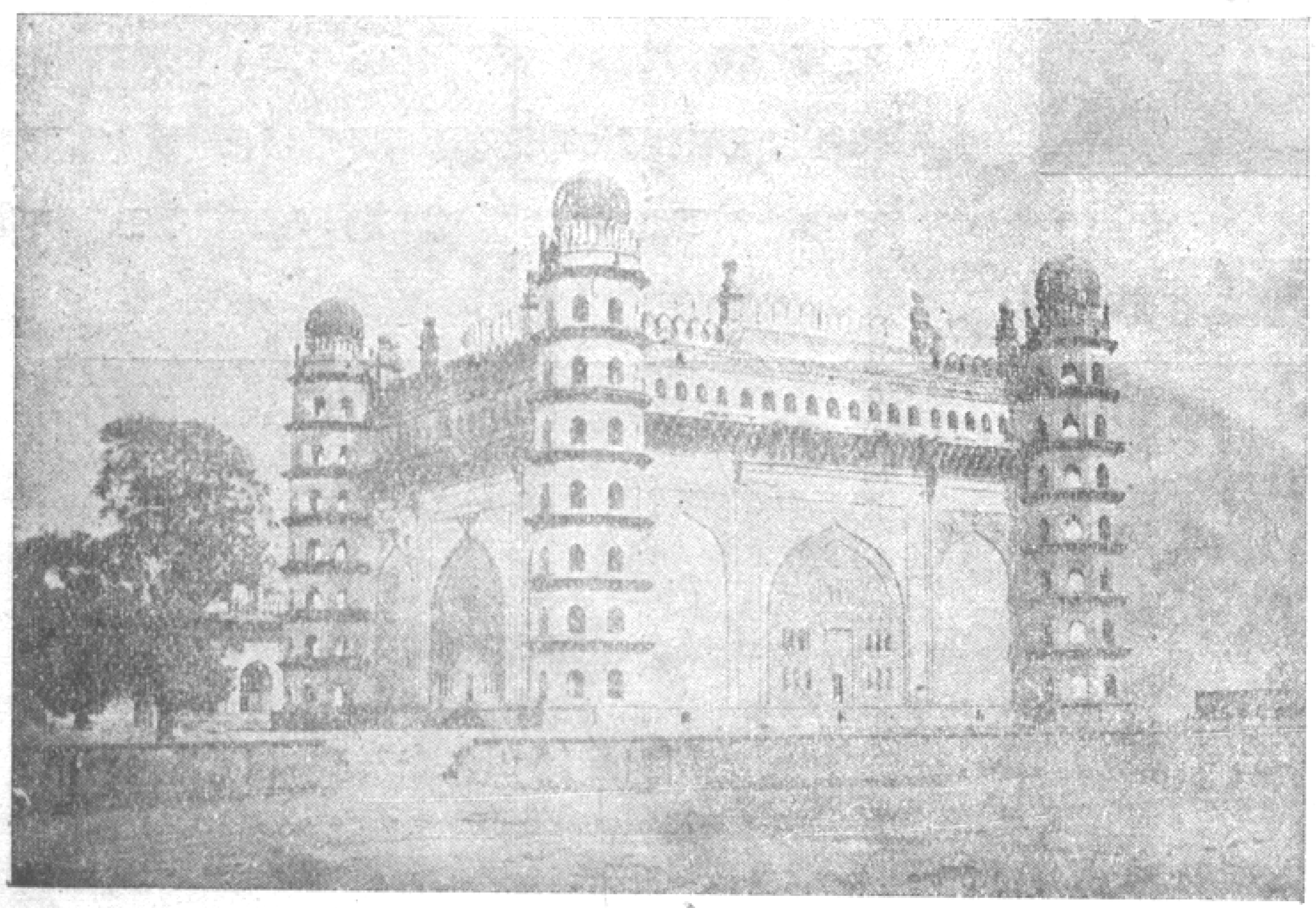
বিজাপুরের কামান

করে, এজন্য কাহারো হইত নির্ব্বাসন, কাহাকেও বা মারিয়া ফেলা হইত। য়ুসুফ মার বড় আদরের পুত্র ছিল; পাছে রাজার কঠিন নিয়মে তাকে মরিতে হয়, এই ভয়ে সম্রাজ্ঞী ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে লুকাইয়া রাখেন, এবং মূল্য দিয়া পরের ছেলে কিনিয়া তাহাকেই রাজ্যের নিয়মের খড়্গের নীচে সঁপিয়া দেন। য়ুসুফের আরো কিছু বয়স বাড়িলে তাহাকে পারস্যে পাঠানো হয়।



ইব্রাহিম-কী-রোজা

পারস্যে আসিয়া য়ুসুফ কিছুদিন মাত্র সিরাজে বাস করেন। সিরাজে তিনি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন, যদি ভারতবর্ষে আসেন তো একটা রাজ্যের মালিক হন্। এই স্বপ্নই তাঁহাকে ভারতে টানিয়া আনে। ভারতে আসিয়া য়ুসুফ বাহমনী-রাজ্যে চাকুরি গ্রহণ করেন। নিজের প্রতিভা ও চরিত্রগুণে অচিরেই তিনি সম্রাটের প্রিয়পাত্র এবং সাম্রাজ্য-পরিচালনে তাঁর ডান হাত হইয়া ওঠেন। তার পর বাহমনী বংশ বিলুপ্ত হইলে রাজ্যের সর্দ্দাররা মিলিয়া তাঁহাকেই রাজ-তখ্‌তে বরণ করে।



গোল গুম্বজ

য়ুসুফের জন্ম সম্বন্ধে আরো নানা গল্প আছে; কিন্তু এই স্বপ্নের কথাটা সব গল্পে পাওয়া যায়। তবে য়ুসুফ যে সুলতানের বংশধর তার আর এক অকাট্য প্রমাণ, রাজ-পতাকায় চন্দ্র-কলার চিহ্ন। এটি রুমের পতাকা হইতেই গৃহীত। ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বাহমনী বংশ রাজ্য করে। নয়জন বাদশাহ রাজ্য করিবার পর আদিল শাহী বংশ লোপ পায়।

১। য়ুসুফ আদিল শাহ

২। ইসমাইল আদিল শাহ

৩। মল্লু আদিল শাহ



যুসুফ আদিলশাহ—প্রথম বাদশাহ



ইব্রাহিম আদিলশাহ—চতুর্থ বাদশাহ



ইসমাইল আদিলশাহ—দ্বিতীয় বাদশাহ



আলি আদিলশাহ—পঞ্চম বাদশাহ

৪। ইব্রাহিম আদিল শাহ

৫। আলি আদিল শাহ

৬। ইব্রাহিম (দ্বিতীয়) আদিল শাহ

৭। মহম্মদ আদিল শাহ

৮। আলি (দ্বিতীয়) আদিল শাহ

৯। সেকন্দর আদিল শাহ

ইঁহাদের মধ্যে মল্লু এবং সেকন্দর ব্যতীত সকলেরই গৃহ-নির্ম্মাণের সখ ছিল প্রচুর। মল্লু বাদশা কয়দিন মাত্র তখ্‌তে বসিয়াছিলেন এবং সেকন্দরের রাজ্যকালে সাম্রাজ্যে নানা বিপ্লব বাধে। আরঙ্গজীব এই সেকন্দরের রাজ্য-

কালে বিজাপুর রাজ্য অধিকার করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে অপর কয়জনের রাজ্যকালে বিজাপুরের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য দিল্লীকে অবধি মুগ্ধ চকিত করিয়া তুলিয়াছিল।

নগরের তোরণেই অট্টালিকাসমূহ নয়নের কি তৃপ্তি সাধন করিত, তার অবশেষ দেখিয়া আজও সে তৃপ্তির আমরা কতক আভাস পাই! রাজমহল, মেহবরাবে, মকবরে, হৌজ, সিংহদ্বার—আজ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইয়াছে; তবু তার নির্ম্মাণ-কৌশল, তার নকাসীর কাজ প্রভৃতি তারিফের যোগ্য। দুর্গমধ্যে রাজমহল—আদিল শাহী বংশের জীবন্ত ইতিহাস।



ইব্রাহিম আদিলশাহ—ষষ্ঠ বাদশাহ



মহম্মদ আদিলশাহ—সপ্তম বাদশাহ



আলি আদিলশাহ—অষ্টম বাদশাহ



সেকন্দর আদিলশাহ—শেষ বাদশাহ

বিজাপুরের গোল গুম্বজ বাদশাহ মহম্মদের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি—তাঁর সমাধি-ভবন; তাঁর আদেশে ও কর্ত্তৃত্বে রচিত হয়। গুম্বজটী উচ্চতায় ১৯৮ ফুট ৯ ইঞ্চি।—ঘরগুলির মাপ লম্বে ও চৌড়ায় ১৬৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। গুম্বজের ব্যাস ১২৪ ফুট ৫

ইঞ্চি।—য়ুরোপীয় পর্য্যটকেরা এই গুম্বজটিকে কারুকার্য্যে ও সৌন্দর্য্যে রোমের প্যান্থিয়নের সমতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

গোল গুম্বজ ছাড়া এখনকার দর্শনীয় অট্টালিকা—জুম্মা মসজিদ, অস্বার মহল, হৈদর বুর্জ, আদালত মহল, অর্শমহল, আনন্দ মহল, গগনমহল, শতমঞ্জিল। এই সব শাহী মহল সম্বন্ধে এক ইংরাজ পর্য্যটক লিখিয়াছেন—বিশালতায় আর কারিগরিতে এগুলি অপ্রতিম! য়ুরোপের প্রসিদ্ধ প্রাচীন ভবনগুলি এদের পাশে নেহাৎ তুচ্ছ!

বিজাপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এক অপূর্ব্ব ভবন আছে—এটির নাম মুবারক-খাঁ মহল। এ ভবনটি তিন-মঞ্জিলা—একতলাটি চৌকা তারপর আটকোণা, উপরে চমৎকার গুম্বজ। ইহার মধ্যে সুদৃশ্য ফোয়ারা ও হামাম মানুষের হাতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই ফোয়ারা হইতে নল বহিয়া হামামে জল যায়,—সে নলের কারিগরিও চমৎকার।

ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে ইব্রাহিম-কী রাজা একটি প্রসিদ্ধ অট্টালিকা। ইহার প্রকাণ্ড ছাদ নিরাধার—অর্থাৎ নীচে কড়ি বরগা নাই। ছাদটি একখানি প্রকাণ্ড পাথরে তৈয়ারী বলিয়া মনে হয়। দুখানি পাথরে এমনি জোড় খাওয়ানো হইয়াছে যে কেশের মত একটি সরু রেখাও কোনখানে চোখে পড়ে না!

আর একটি অপূর্ব্ব দ্রষ্টব্য বস্তু, এখানকার প্রাচীন তোপ—মালিক ময়দান। কামানটার বিশাল অবয়ব দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না! এ কামান আহমদনগরে ঢালাই হইয়াছিল। এমন মজবুৎ কামান, আর ইহার গা এমন মসৃণ যে কোথাও এতটুকু টস্‌কায় নাই! মনে হয় যেন সদ্য তৈয়ার হইয়াছে! তালীকোটের যুদ্ধে এই কামান ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ-সব ছাড়া বিজাপুরে এক প্রাচীন গ্রন্থাগার আছে। এ গ্রন্থাগারে অসংখ্য অমূল্য গ্রন্থ আছে। গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়। তাছাড়া আইন, রাজনীতি, ব্যাকরণ, অর্থশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থেরও অভাব নাই। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থাগার হইতে বহু গ্রন্থ বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রেরিত হয়। আদিলশাহী বাদশাহগণের বিদ্যানুরাগ কিরূপ প্রবল ছিল, এই গ্রন্থাগার তার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেয়।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

শিখিবার কলা-কৌশল

৪

শিক্ষার জন্য "থ্রী-মস্কেটিয়ার" পড়া আবশ্যক নহে; পাঠককে শুধু আমোদ দিবার জন্যই সাধারণত যে সব বই লেখা হয়, তাহাও পাঠ করা আবশ্যক নহে। পাঠককে চিন্তা করিতে না দেওয়াই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। চিন্তা করিতে না হইলেই তাহারা মনে করে তাহাদের লেখা সার্থক হইয়াছে। তারপর, তাহাদের লেখা পাঠকের স্মরণে থাকে কি, না থাকে তাহাতে তাহাদের কিছুই যায়-আসে না। সুস্বাদু খাদ্যগুলি পেট ভার না করিয়া শুধু রসনাকে তৃপ্ত করিবে—শুধু ইহাই তাহারা চায়।

ইহার বিপরীতে,—কোন শিক্ষার গ্রন্থ পাঠ করা হইবে অথচ পড়িবার পর, জানিবার মত বিশেষ কিছুই মনে থাকিয়া যাইবে না,—এই যে ফাঁকি,—এ কেবল কতকগুলি জেঁকো নির্ব্বোধ লোক, সাহিত্যিক ফোতো নবাবীর হিসাবে অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহার পুরস্কার কি-অল্পই তাহারা পায়! বরং শিখিবার কোন চেষ্টা না করাও ভাল—তবু এরূপ লোক-দেখানো বিদ্যা-ফলানো শিক্ষা কোন কাজের নহে। কোন শিক্ষা-গ্রন্থ হইতে (লম্বা নহে, বিরক্তিজনক নহে, শক্ত নহে—তাছাড়া বেশ সারবান্ ও সুরচিত এরূপ কোন গ্রন্থ) ফল লাভ করিতে হইলে, শুনিয়া শেখার মতো

সেই নিয়মশাসন, সেই একই অভ্যাস-ক্রম অনুসরণ করা আবশ্যক হইবে। কাণ দিয়া শেখার মত, কাণ দিয়া মনোযোগ দিবার মত, চোখ দিয়াও শিখিতে হয়—চোখ দিয়াও মনোযোগ দিতে হয়। প্রকৃত পাঠক ও প্রকৃত শ্রোতা—উভয়ই বিরল।

*
* *

কত রকম ধাঁচার পাঠক আছে—একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

প্রথম ধাঁচার পাঠক :—অন্যমনস্ক। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে, তিনি তার নিজের কাজ-কর্ম্মের বিষয়, বৈষয়িক ঝঞ্ঝাটের বিষয়, আমোদ প্রমোদের বিষয়ও ভাবিয়া থাকেন। তথাপি পংক্তির পর পংক্তি, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠার উপর দিয়া তাঁর চোখ পার হইয়া যায়। তাঁর বিশ্বাস, তিনি পাঠ করিতেছেন। তিনি অবাক্ হইয়া যান, যদি তাঁহাকে বলা যায় তিনি পাঠ করিতেছেন না। কিন্তু তিনি যাহা পাঠ করেন, তাহা ক্ষীণভাবে খণ্ডিত আকারে তাঁর মস্তিষ্কে প্রবেশ করে; কাছাকাছি কোন জায়গায় আর্গিন বাজিতেছে, আর তুমি সেই সময় বেহালা বাজাইতেছ, তখন যেরূপ কতকগুলা সুরের টুকরা তোমার মাথায় প্রবেশ করে—এ সেইরূপ। অন্যমনস্ক পাঠক! তোমার নিজের চিন্তাই তোমাকে আকৃষ্ট করে, তোমাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখে; কেতাবের চিন্তা তোমাকে আকৃষ্ট করে না, আবদ্ধ করে না,…কোন শিক্ষার গ্রন্থ—সুরচিত হইলেও—এইরকমভাবে যদি পাঠ কর, তাহলে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, তুমি পড়িয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না—এইজন্যই বুঝিতে পারিতেছ না, যেহেতু উহা সুরচিত। কারণ, কোন ভাল শিক্ষা-গ্রন্থের কোন পৃষ্ঠা,—কোন পংক্তিই অকেজো নহে। তাহার বক্তব্য কথার শৃঙ্খলা একটু ওলটপালট হইলে তাহার সমূহ ক্ষতি হয়।

স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা একটু মানসিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ। রীতিমত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার সহিত সংগ্রাম করা আবশ্যক। কিন্তু যে পাঠক খুব স্থিরবুদ্ধি ও উদ্যমশীল তাহারও মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্কতা আসিতে পারে। বিশেষতঃ কোন পূর্ণবয়স্ক যুবক,—যে স্কুলের সরঞ্জামের দ্বারা আর পরিবেষ্টিত নহে—সেও মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়। যেমন মঠ সন্ন্যাসীর ভজন সাধনের অনুকূল, সেইরূপ স্কুলও অধ্যয়নের অনুকূল। অধ্যয়নের প্রতিকূল যে সব চিন্তা আবর্ত্ত নিজের জীবন-ধারা হইতে, নিজের গৃহ হইতে, নিজের পরিবার হইতে, নিজের ব্যবসায় হইতে নিয়ত সমুত্থিত হয়, সেই সব চিন্তা-আবর্ত্তের সহিত ঐ যুবকের যুঝাযুঝি করিতে হইবে—যদি শিক্ষাপুস্তক হইতে কিছু লাভ আদায় করিবার তাহার ইচ্ছা থাকে। এই উদ্দেশে ক্রমাগত তাহার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক। ইহা অপেক্ষা শক্ত কাজ আর কিছুই নাই। পাঠ করা একটা ক্রিয়াবিশেষ,—একটা ধারাবাহিক ক্রিয়াবিশেষ। অধিকাংশ লোকই কর্ত্তার ভাবে নহে—পরন্তু ভোক্তার ভাবে—নিষ্ক্রিয়-ভাবে (passive) পাঠ করিয়া থাকে। উহারা গ্রন্থের ভিতর দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত প্রবেশ না করিয়া, উহাকে কোমল কান্ত বাহুপাশে গ্রহণ করিবার জন্য শুধু কোল বাড়াইয়া দেয়। ভোক্তৃভাবাপন্ন নিষ্ক্রিয় পাঠকের অধ্যয়ন ত্যাগ করাই ভাল; কেন না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থ স্বভাবতই নিষ্ক্রিয়; এইরূপ দুই নিষ্ক্রিয় পদার্থের সান্নিধ্যে, কোন সক্রিয় ফল উৎপন্ন হইতে পারে না।

দ্বিতীয় ধাঁচার পাঠক :—খারাপ পাঠক : পল্লবগ্রাহী পাঠক। অনেক লোক (কখন কখন বুদ্ধিমান, সুশিক্ষা হীনও নহে এমন সব ব্যক্তি) মনে করে,—যাহাকে গম্ভীর ধরণের বই বলে সেই সব সমালোচনী পত্রিকার, সেই সব শিক্ষা গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট সারবান প্রবন্ধ সকল হইতে তাহারা পল্লবগ্রাহীর ন্যায় কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া শিক্ষালাভ করিতেছে; কিন্তু এই প্রণালী অনুসারে গ্রন্থ পাঠ করা তাঁহাকেই সাজে যাঁহার পাণ্ডিত্য ঐ পুস্তকেরই সমান; ঐ পুস্তকে নূতন তথ্য যদি কিছু থাকে তাহাই জানিবার জন্য তিনি ঐ পুস্তক তাড়াতাড়ি পড়িয়া থাকেন। তিনি নূতন তথ্যগুলি পড়িয়া বাকী সমস্ত অমনি রাখিয়া দেন। ইহা ছাড়া আর কোন স্থলে, একটা সারবান গ্রন্থের শুধু পল্লবগ্রাহী হইয়া [illegible]

তাহা অধ্যয়ন নহে। তা ছাড়া এই প্রণালীটা দৌর্ব্বল্য-জনক ;—ইহার ফলে শেষে পড়ার উপর,—কেতাবের উপর একটা বিতৃষ্ণা আসিয়া পড়ে। পাকা পল্লবগ্রাহী, গ্রন্থ পাঠ করিয়া লাভবান হইতে পারে না, সুতরাং গ্রন্থ হইতে কিছুই শেখে না।

আর এক ধাঁচার পাঠক :—চয়ন-কারী পাঠক।—এই ধাঁচার পাঠক, আজিকার দিনে খুব সাধারণ। নোট্ চয়ন জিনিষটা কি—তাহা ত তোমরা জান :—সমান আকারের ছোট ছোট কাগজ কাটিয়া, তাহাতে নম্বর বসাইয়া একটা বাক্সের ভিতর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখা—এবং পঠিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত নোটের দ্বারা উহা সমাচ্ছন্ন করা। মনে কর, Montaigneএর লেখার একটা শব্দকোষ প্রস্তুত করিতে হইবে—ইহা অপেক্ষা ভাল উপায় আর কিছুই হইতে পারে না। মোতাইন্যের গ্রন্থে প্রথমবার এই শব্দটা পাওয়া গেল :—"anonchalir"; অমনি উহা টুকরা-কাগজের মাথায় লিখিয়া রাখা হইল ; কোন্ জায়গায় ওটা পাওয়া গিয়াছে তাহা টুকিয়া রাখা হইল ; তারপর আবার যখন ঐ শব্দটা পাওয়া গেল, যেখানে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখা হয় সেই বাক্সো হইতে পূর্ব্বের টুকরা কাগজটা তুলিয়া লইয়া, যে-দ্বিতীয় জায়গায় ঐ শব্দ আবার পাওয়া গিয়াছে তাহা নোট করা হইল। এইরূপ ক্রমান্বয়ে চয়নের কাজ চলিতে থাকে। শব্দকোষ প্রস্তুত করিবার পক্ষে এই প্রণালী অতি উত্তম।

কার্ড-কাগজী চয়নকারীর ভুলটা এই,—আজকাল জর্ম্মাণ ধরণে পাণ্ডিত্যলাভ করিবার অনেকরই চেষ্টা—একটা শব্দকোষ প্রস্তুত করিতে পারিয়াছে বলিয়া চয়ন-কারীরা মনে করে তাহারা মহাপণ্ডিত। দো-কর ভুল। কার্ড কাগজের টুকরাগুলা কালো রং করা—গোছাইয়া রাখা—ইহা একটা যান্ত্রিক কাজ। ইহারও পিছনে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে—অন্যমনস্কতা, ঔদাসীন্য, অজ্ঞতা ও বিস্মৃতি ;—নির্ব্বুদ্ধিতা ত আছেই। আর একটা শোচনীয় ভ্রম এই—যাহা কিছু শেখা যায় তাহা ক্যাটালগে পরিণত করা। আমি জানি একজন "ডাক্তার উপাধিধারী" সাহিত্যিক পণ্ডিত Jean-jacques Rousseaur গ্রন্থে কতবার সূর্য্যাস্তের কথা আছে—তাহা এইরূপে নোট করিয়াছেন। ইনি সুন্দর সুন্দর এইরূপ প্রচুর কার্ড-কাগজ প্রস্তুত করিয়া, তাহার পর উহা হইতে বিস্তারিত ভাবে সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। এই জন্যই তিনি "ডাক্তার উপাধিতে"ভূষিত হইয়াছেন। কিন্তু আমার নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি,—এইরূপ ভাবে গ্রন্থ পাঠ করিবার কথা মনে করিলেই আমার যেন আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

শিক্ষানবীশ "ডাক্তার," তোমার নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই—জ্ঞান জিনিসটাকে ষ্ট্যাটিস্‌টিকের (তথ্যসংগ্রহ) হিসাবে সঙ্কুচিত করিও না। "Nouvelle Heloise" কিংবা "Les reveries d'un promeneur solitaire" গ্রন্থে পঠিত সূর্য্যাস্তের সংখ্যা তোমার কণ্ঠস্থ হইলেও, এই দুই অমর গ্রন্থের আসল জিনিসটা তুমি কখনই গ্রহণ করিতে পারিবে না। তুমি যে মনে করিতেছ কার্ড-কাগজের শিশু-সুলভ চয়ন-ব্যাপারে তোমার পড়া ভাল রকমই হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমার পড়া আদপেই হইতেছে না, কতকগুলা বাহ্য অনুষ্ঠানে আমোদে মাতিয়া, ঐ সব শিক্ষা-গ্রন্থের গভীর মর্ম্ম তুমি গ্রহণ করিতে পার না—একটা গভীর মর্ম্ম আছে বলিয়া তোমার সন্দেহ পর্য্যন্ত হয় না। নাজিরের পেয়াদার মত জিনিসের একটা ফর্দ্দ তাড়াতাড়ি খাড়া করিয়া তোলা অধ্যয়নের ভাল প্রণালী নহে। ২০টা পুস্তকালয় আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে, ভাল-ভাল ২০টা "গ্রন্থ-সংগ্রহের" পুস্তক হস্তগত হইয়াছে—শুধু ইহাতেই কি পণ্ডিত হওয়া যায় ?—গুণী হওয়া যায় ? অনেক কার্ড-কাগজী পাঠকদিগের মনোভাব নাজিরের পেয়াদার মনোভাবের মত।

* * *

অন্যমনস্ক, পল্লবগ্রাহী, কার্ড-কাগজী পাঠকদিগের পাঠ-প্রণালী যদি খারাপ হইল, তবে ভাল প্রণালীটা কি ? তাহা জানিতে হইলে, প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, আমরা গ্রন্থপাঠ করি কি উদ্দেশে ? যদি গ্রন্থটা খুব ভাল হয় (প্রায়ই আমরা তাহা ধরিয়া লই) তবে ইহা হয়ত বাঞ্ছনীয়ও হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা অসম্ভব। একবার পড়া হইয়া গেলে, উহার অবশিষ্ট মাথায় কি থাকে ? উহার প্রথমাংশটা কিংবা শেষ অংশটা, কিংবা মাঝখানের অংশটা ?

অথবা এখানকার ওখানকার কতকগুলা টুক্‌রা ? এইরূপ পরিণাম-ফল শোচনীয়। ভাল পরিণাম-ফল কি ?—না—গ্রন্থের একটা ছবি মাথার মধ্যে সংরক্ষিত করা ; আকারে ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ-ভাবাপন্ন হইলেও সেই ছবিটি সুস্পষ্ট হওয়া চাই, সম্পূর্ণ হওয়া চাই, আসলের অনুরূপ হওয়া চাই। মোট কথা, মনের ভিতর যদি গ্রন্থের সারাংশ, তাৎপর্য্য ও শৃঙ্খলা ধরিয়া রাখিতে পারি, তাহলে গ্রন্থপাঠের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এইজন্যই, গ্রন্থ ভাল করিয়া পড়িতে হইলে, শুধু যে মনোযোগের দরকার, ইচ্ছা-শক্তির দরকার তাহা নহে, বুদ্ধি খাটানোও দরকার। কারণ গ্রন্থ-পৃষ্ঠা হইতে তাৎপর্য্যটা সারাংশটা ছাঁকিয়া বাহির করিতে হইবে, গ্রন্থের পরিকল্পনাটা মনে রাখিতে হইবে।

ভাল করিয়া পড়িবার অর্থ হচ্ছে—গ্রন্থের বাক্যাংশ হইতে, প্যারাগ্রাফ হইতে, পরিচ্ছেদ হইতে গ্রন্থের সারাংশ ও শৃঙ্খলা স্বয়ং স্ফূর্ত্তভাবে, দ্রুতভাবে ও অভ্রান্তভাবে বাহির করিয়া সেই সমস্ত মস্তিষ্কের মধ্যে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করা। ভগবৎদত্ত শক্তি-সম্পন্ন কোন কোন মন বিনা শিক্ষায়, বেশ স্বাভাবিকভাবে এই কাজটা করিতে পারে। ইহার জন্য মাঝামাঝি ধরণের মনগুলার অভ্যাস ও সাধনা আবশ্যক।

এই অভ্যাস সাধনার দুইটি পদ্ধতি আছে ; যদি কেহ পর্য্যায়ক্রমে দুইটি পদ্ধতিই ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অচিরাৎ সুফল প্রাপ্ত হইবেন।

উহার মধ্যে একটি পদ্ধতি অনুসারে, চাই একজন অংশীদার কিংবা আরও ভালো—একজন শিক্ষক ; আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিক্ষার জন্য, শুধু গ্রন্থই যথেষ্ট নহে। শিক্ষক একটা পাতা তোমাকে পড়িতে দিবেন—প্রথমে উচ্চকণ্ঠে, একটু পরে নীরবে উহা পড়িতে হইবে ; তারপর তিনি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—"তুমি কি পড়িলে ?" পূর্ব্বেই যদি ভাল করিয়া শুনিতে তুমি অভ্যস্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে এই পাঠের অভ্যাসটাও তোমার সহজেই হইবে। ইহার উল্টা, ভাল করিয়া পড়িতে শিখিলে, ভাল করিয়া শুনিবার জন্যও প্রস্তুত হইতে পারা যায়। কিরূপে ভাল করিয়া শুনিতে হয় এবং কিরূপে ভাল করিয়া পড়িতে হয়,

শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এরূপ শিক্ষকের সাহায্যে, বাক্যাংশের, পৃষ্ঠার, পরিচ্ছেদের সারাংশ বিষয় চট্‌ করিয়া মুখে বলা যাইতে পারে। ক্রমে উহা মনের একটা অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায় ; তলোয়ার-খেলোয়াড় যেরূপ রঙ্গমঞ্চের উপর উঠিয়াই, সহজ-সংস্কার বশে আত্মরক্ষণে উদ্যত হয়, সেইরূপ পাঠকের মনেও গ্রন্থ উদ্‌ঘাটিত হইবামাত্রই অভ্যাসবশতঃ আপনাকে সাম্‌লাইয়া থাকে ; কিন্তু একজন শিক্ষক চাই, অন্তত একজন বুদ্ধিমান অংশীদার চাই। দুই বুদ্ধিমান পাঠক উভয়েই গ্রন্থ পাঠ করা শিখিতে পারে। একই টুক্‌রা উহারা একসঙ্গে পাঠ করে, একসঙ্গে পুস্তক বন্ধ করে, তারপর উভয়েই গ্রন্থপাঠে আঠার মত লাগিয়া থাকে।

তথাপি এ কথা ভুলিলে চলিবে না,—এখন শ্রমশীল নিঃসঙ্গ পাঠক থাকিতেও পারে, যাহার কোন শিক্ষক নাই, কোন অংশীদার নাই ;—যে শুধু পুস্তকের সহিত মুখামুখি করিয়াই অধ্যয়ন করে। সে কি-করিয়া পাঠ করিতে শিখিবে ?

যে শ্রোতা কানে শুনিয়া শেখে, সেও সেইরূপভাবে শিখিবে ; সে সেই সুলভ মূল্যের একান্ত অনুগত অংশীদারের আবার শরণাপন্ন হইবে :—সেই কলমের···

—"আবার সেই কার্ড কাগজের ব্যাপার ?"···

—না না, তা নয়। কার্ড কাগজের প্রণালীতে, পুস্তকের একটা বিষয়-তালিকা খাড়া করিয়া তোলা যায় মাত্র, এটা একটা বিশেষ শ্রমসাধ্য কাজ ; কোন কোন স্থলে কাজে লাগে ; পাণ্ডিত্যের পুস্তক প্রস্তুত করিবার পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। কিন্তু এই হস্তচালনার কাজে মন তেমন গড়িয়া ওঠে না। ইহার বিপরীতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি এই কাজে একটু ব্যাপৃত হন, ইহাতে তাঁহার একটু আত্মবিনোদন হইবে মাত্র ; যেমন অ্যালবমে ষ্ট্যাম্প আঁটিয়া দিবার কাজে হইয়া থাকে।

কলম হাতে করিয়া পড়িতে শেখা—ইহা ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির আর একটা প্রয়াস। মনোযোগী শ্রোতা, শিক্ষকের রচিত বাক্যের সম্বন্ধে যাহা করিয়া থাকেন,—ইহাও সেই একই রকম বিশ্লেষণের কাজ (পঠনে) তারপর

সম্পাদিত হইয়া থাকে। ধারাবাহিক লেক্‌চার নোট করিবার মত, প্রথমে পুস্তক হইতে প্রচুর রূপে সেই সমস্ত বিষয় নোট্ করিতে হইবে, যাহা পরে, পুস্তক বন্ধ করিয়াও, একবার নোট দেখিয়া ঐ পুস্তকের শৃঙ্খলা ও সারাংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং যাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে অপরিহার্য্য। (তোমরা বেশ ধরিতে পারিবে, "কার্ড কাগজের"প্রণালী হইতে এই প্রণালী কতটা তফাৎ।) কিন্তু এস্থলে চটপটে লেখকের কাজটা প্রথমে তোমাদের তত শক্ত বলিয়া মনে হইবে না; কারণ, মুখের "উড়ন্ত" কথা অনুসরণ করিতে তুমি বাধ্য হইতেছ না। কিন্তু ভুল বুঝিও না। আসলে এ কাজটাও শক্ত; হয় ত বেশী শক্ত। মানুষের মুখের কথায় এমন-একটা কিছু থাকে যাহা বিশেষ রূপে বোধগম্য হয়—যাহা মর্ম্মভেদী, যাহাতে রংএর বিচিত্র আভা আছে; ইহার দরুণই লিখিত কথা অপেক্ষা মুখের কথা আরও চট্ করিয়া ধরা যায়। পক্ষান্তরে, এমন কতকগুলি লোক আছে, যারা মুখের কথায় বেশ পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারে, কিন্তু লিখিতে গেলেই অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। বেশ পরিষ্কার করিয়া লেখা—এই ভগবদ্দত্ত গুণটি বড়ই বিরল। সৌভাগ্যক্রমে, পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলা,—সহিষ্ণু,—চার বার পড়িয়া বুঝিতে না পারিলে, পঞ্চম বার তাহারই আবৃত্তি করিতে প্রস্তুত থাকে।

ভাল করিয়া পড়িতে হইলে, ব্যারিষ্টারের মোকদ্দমার চুম্বকের মত, প্রত্যেক পঠিত পুস্তকের একটা চুম্বক গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রথমে এই চুম্বকের তল্পিটা বৃহদায়তন হইবে। যদিও এটা একটু দোষের কথা। কিন্তু অভ্যাসটা যে পরিমাণে পাকিয়া আসিবে, সেই পরিমাণে ইহার আয়তনও অজ্ঞাতসারে কমিয়া আসিবে। পংক্তির পর পংক্তি নোট্ করিয়া নহে পরন্তু একটা বড় রকম টুকরার উপর প্রথমে সাধারণভাবে একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কমাইবার চেষ্টা করিবে। তারপর বই না দেখিয়াই নোট্ করিবে। সে কার্ড কাগজের যে ভক্ত সে তাহার "নিকট-দৃষ্টি"টা বইয়ের পংক্তি হইতে কার্ড কাগজের পংক্তিতে অলসভাবে টানিয়া আনে ··পা-ঠকরা ও নোট-নেওয়া,—ইহার মাঝখানে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া তুমি বলিতে পার—"Os homini sublime dedit"

ক্রমশঃ শিক্ষা-গ্রন্থের চুম্বকের তল্পিটা কমিয়া কয়েক পৃষ্ঠায় পরিণত হইবে; এবং এই পৃষ্ঠাগুলায় পঠিত পুস্তকখানি এমন-একটা যথাযথ প্রতিরূপ থাকিবে যে, উহা আবার পড়িবার সময় নোট করিবার কাজ তোমার মনের ভিতর উল্টাভাবে সংশোধিত হইবে—পুস্তকখানা আবার পুনর্জ্জীবিত হইবে। তাছাড়া সজোরে আগাইয়া চল,—তাহা হইলে এই সংশ্লেষণের চেষ্টা সফল হইবে। প্রায় এমন-কোন গ্রন্থ নাই যাহার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলা ও শৃঙ্খলা, দেবার এক পৃষ্ঠার মধ্যে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে না পারেন। কিন্তু মাঝামাঝি গোছের পাঠক, তুমি যখন কোন পঠিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার এক পাতার মধ্যে লিখিতে পারিবে—এমন করিয়া লিখিতে পারিবে যে ঐ পৃষ্ঠা পড়িলেই সমস্ত গ্রন্থটা আবার তোমায় পড়া হইয়া যাইবে তখন জানিবে যে, তুমি কলম হাতে করিয়া পড়িতে শিখিয়াছ। আরও উন্নতি সাধন করিবার জন্য, কোন-একটা বই মাঝে মাঝে পড়িবে—একেবারে কলম না ছুঁইয়া। বইটা বন্ধ করিয়া তবে এক পৃষ্ঠায় নোট্ লইবে। যখন দেখিবে, বেশ স্বাভাবিকভাবে পৃষ্ঠার লেখাটা চলিয়াছে, পুস্তকের সারাংশ ও শৃঙ্খলা তোমার মনের ভিতর আপনা হইতেই বেশ জমিয়াছে, তখন জানিবে তুমি পড়িতে শিখিয়াছ।

* *
*

এমন-সব উঁচুদরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই আছে, যাহার সহিত শুধু শিক্ষাগ্রন্থের কোন সম্বন্ধ নাই। ফলত এ কথা যেন আমরা না ভুলি যে জগতে কেবল শিক্ষা-গ্রন্থই আছে এবং শিক্ষা গ্রন্থের দ্বারা যেরূপ হয় অন্তত অ-শিক্ষা গ্রন্থের দ্বারাও সেইরূপ, সুশিক্ষিত মনের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। এখন দেখ! এই মাত্র আমি যে শাসন-নিয়মে পাঠককে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তুলিয়াছি, এই শাসন নিয়ম যে কোন গ্রন্থের অধ্যয়নে পাঠকের কাজে লাগিবে। প্রথমত ইহার দরুণ পাঠক ভাল মন্দ বহির পার্থক্য চট্ করিয়া ধরিতে

পারিবে। সার-বস্তু নাই, শৃঙ্খলা নাই—ইহা সেই নিয়ম-শাসনে অভ্যস্ত মন সহজেই ধরিতে পারিবে। তাছাড়া যে সকল গ্রন্থের অধ্যয়ন অজ্ঞ পাঠকের পক্ষে শুধু একটা আমোদের বিষয়, সেই সব গ্রন্থ পড়িয়া নিয়ম শাসনে অভ্যস্ত পাঠক কিছু লাভ আদায় করিতে পারিবে। এ কথাটি তোমার মনে হয় না যে, "Eugenic Grandet" "Phidre", "Les dealogues des morts "L' odyssu" এই গ্রন্থগুলির অধ্যয়নে অন্ততঃ দুই প্রণালী আছে? পঠন সম্বন্ধে একটা দৃঢ় নিয়ম-শাসন পাঠকের পক্ষে একটা চিরন্তন সুখ ও সম্পদের উৎস।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাব্‌লা

১০

সহরের বুকের উপর এক সজ্জিত কক্ষে পিতা-পুত্রী বসিয়াছিল। পিতার বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। তিনি কলিকাতার একজন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট। পুত্রী তরুণী। পিতা বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—প্রমোদ বিলাত থেকে ফিরেচে, কিন্তু সাহেবী ছোপ তার মনে মোটেই লেগে নেই, এটা তারিফ করবার মত। কি বলিস্ বিভা?

বিভা বাপের মুখের পানে চাহিল; তার মুখে-চোখে লজ্জার একটা রক্তিম আভাষ ফুটিল। সে বলিল,—সবাই কি মনে-প্রাণে সাহেব হয়, বাবা! বিশেষ যে মানুষ হয়, সে পরের ছায়ায় নিজেকে আড়াল করে রাখতে ঘৃণা বোধ করে!

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—আজ যদি তিনি থাকতেন…!

বীরেন্দ্রবাবুর স্বর গাঢ় হইল। তিনি স্তব্ধ রহিলেন। পিতা ও পুত্রীর মনে অমনি একটা ভয়ঙ্কর দিনের ছবি তার সমস্ত সজীবতায় ফুটিয়া উঠিল। এক-বাড়ী লোক—ডাক্তার নার্শ বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে, সকলের মুখে দারুণ উদ্বেগ, বিষম উৎকণ্ঠা! বীরেন্দ্রবাবু—যাঁহাকে বিভা চিরদিন অটল দেখিয়া আসিয়াছে, তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া মুষড়াইয়া পড়িয়াছেন! আর বিভা? বেচারীর দুই চোখ তার অন্তিম-শয়নে-শায়িতা মার রোগ-কাতর মুখ ছাড়িয়া আর কোন দিকে ফেরে নাই। তার হাত-পা কাঁপিতেছিল, মাথার মধ্যে ঝিমঝিম্ করিতেছিল, আর বুকে সে কি ঝড়ই বহিতেছিল! হঠাৎ ডাক্তার-সাহেব আসিয়া সদলে সেখানে বসিয়া গেলেন—আর মার অঙ্গ ফুঁড়িয়া কি সব ঔষধ আর আরক পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর বীরেন্দ্র বাবুর কাতর ছল-ছল মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন,—এইটেই শেষ চেষ্টা—এতে যদি ফল পাই তবেই পেলুম—

বাকী কথাটা আর তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল না। বিভা কি মিনতি-ভরা চোখে সাহেবের পানে চাহিয়া ছিল—যদি তার প্রাণ লইয়াও মাকে মরণের পথ হইতে ফিরানো যায়…

তারপর কতক্ষণ বাদে মা চোখ মেলিয়া চাহিলেন—তাঁর শীর্ণ হাত বিভার হাতটাকে মুঠি ভরিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল। এই মরণ-সাগরের মাঝে মা ঐ হাতটাকে ধরিয়াই কূলে ফিরিতে চান—এমনি ব্যাকুল আবেগ তাঁর ঐ হাতের পরশে! তারপর কতক্ষণ তার পানে চাহিয়া চাহিয়া মার দৃষ্টি ফিরিল বীরেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে! দুই জনের চোখে চোখে তখন কি ভাষার তরঙ্গ ছুটিল! বীরেন্দ্রবাবুর বুক একেবারে উথলিয়া উঠিল! এতদিনের এই মধুর সঙ্গ, এই শত সুখের কত স্মৃতি—ছোট বুকটার মধ্যে বেদনার পাহাড় ঠেলিয়া তরঙ্গ-প্রবাহে ভাসিয়া উঠিল! এই ঘর ছাড়িয়া, এই স্নেহ প্রীতির বন্ধন কাটিয়া, কোথাকার ডাকে আজ কোন্ অজানা লোকে পাড়ি দিতে হইবে! আজ এই চোখের সামনে যাকে এখনো দেখা যাইতেছে…দুইদিন পরে তাকে

আর কোথাও মিলিবে না! ..বীরেন্দ্রবাবুর দুই চোখ ছলছলিয়া উঠিল। আর মা? বিভা দেখিল, মার চোখের কোলে দুই ফোঁটা জল টলটলিয়া উঠিয়াছে!

মার মুখে কথা নাই! কথা কহিবার কি চেষ্টা চলিয়াছে বুকের মাঝে, অথচ...সে কি ভীষণ মুহূর্ত্ত! বিভা অচঞ্চল নেত্রে সে দৃশ্য দেখিয়াছে! তার চোখে এক ফোঁটা জল আসে নাই! ভিতরকার তাপে সব জল শুকাইয়া গিয়াছিল!

...তারপর সেই এক বিপর্য্যয় রোল উঠিল! সিঁথিতে সিঁদুর, পায়ে আলতা, লাল পাড় নূতন গরদের শাড়ী পরিয়া ফুলের শয্যায় চড়িয়া মা তাদের মায়া কাটাইয়া ঘর ছাড়িয়া মহা যাত্রা করিলেন! শূন্য ঘর...!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বীরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—তাঁর সে আশীর্ব্বাদ মনে আছে, বিভা—? প্রমোদ যখন তাঁকে এসে প্রণাম করে?

বিভার মন অতীতের সেই স্মৃতির ভিড়ে এমনি দিশাহারা ঘুরিতেছিল যে তাকে ফিরাইয়া আনিতে বিভার দুই চোখে জল দেখা দিল। কোন জবাব না দিয়া সে শুধু বাপের পানে চাহিয়া রহিল।

বীরেন্দ্র বাবু গাঢ় স্বরে বলিলেন,—আমার কানে সে কথা এখনো বাজচে! প্রমোদের কথা মনে হলেই তাঁর সে আশীর্ব্বাদ···তিনি প্রমোদের মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, মানুষ হয়েই ফিরো, বাবা! এমনি মন নিয়ে, শুচিতা নিয়ে···

বীরেন্দ্রবাবু থামিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিলেন; পরে বলিলেন,—চমৎকার! তাঁর সবই ছিল চমৎকার!

বিভা এখনো কোন কথা বলিতে পারিল না।

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—কাল সন্ধ্যার পর প্রমোদ এখানে এসেছিল। দেশেই মার কাছে গিয়ে উঠেছিল সে—কাল সকালে। শুধু আমাদের সঙ্গে দেখা করবে বলেই এসেছিল, তা দাঁড়াতে পারলে না! তুমি বায়োস্কোপ দেখতে গেছলে, দেখা হলো না। সে চলে গেল। আজ হাইকোর্টের দিক সেরে এখানে ফের আসবে। আমি তখন বোধ হয় কোর্টে থাকব—

বীরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—আজ এখানে খাবে সে। আমি কাল নিমন্ত্রণও করেছি। এখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে সে আবার দেশেই ফিরবে, তার মার কাছে।

বিভা কেমন একটু আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। প্রমোদ! কত দিন পরে! বিলাত যাইবার পূর্ব্বে সে তার নিত্য-সঙ্গী ছিল! সে আজ তিন বৎসরের কথা! এ তিন বৎসরে তার মনের এ কি পরিবর্ত্তন হইল? তার কথা মনে হইতে এমনি একটা লজ্জা আসিয়া সামনে আড়াল তুলিয়া দাঁড়ায়! তার সঙ্গে একলা দেখা করিবার কথা মনে হইলে গা এমন ছমছম্ করিয়া ওঠে কেন, ভাবিয়া সে আরো লজ্জিত হইয়া পড়িল।

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—সে বাসা করবে এখানেই। আমাদের পাড়াতেই থাকতে চায়। আমি বলছিলুম, মন্দ হবে না। একজন বড় ব্যারিষ্টারের সঙ্গে থাকলে কাজ-কর্ম্মও শিখবে—তবে এ পাড়া থেকে সেটা কতদূর সুবিধা হবে, এইটেই ভাবনার কথা! বড় বড় ব্যারিষ্টাররা তো এ পাড়ায় থাকেন না—তাঁদের আস্তানা কারো বালিগঞ্জে, কারো বা আলিপুরে! তা, ও বলে, না হয় একটু ঘোরাঘুরি হবে, তা হোক্,—এখানেই সে থাক্‌তে চায়! আমি দু-একজনকে বলে দেব, তার জন্যে একটা বাড়ী খুঁজে দেখতে!

বিভা একটু আরাম পাইল; এ-কথাগুলার কোন জবাব দিতে হইবে না, এই মনে করিয়া! তার সমস্ত মন এমনি এলোমেলো হইয়া গিয়াছিল যে সব কথাগুলা সেখানে পরশ দিয়া গেলেও তেমন থিতাইতে পারিতেছিল না। বাপের কথাগুলার সঙ্গে তার মনের কথাগুলা এমনি তাল-গোল পাকাইয়া গিয়াছিল যে সে বিশৃঙ্খল ভাবটা সে স্পষ্টই লক্ষ্য করিল! নিজেদের সমস্ত জীবনে দুর্দ্দিনের রেখাগুলার ফাঁকে ফাঁকে প্রমোদের সান্ত্বনার সুর, প্রমোদের হাসি, প্রমোদের কলরব অতি-বড় দৃষ্টির পর সূর্য্যোদয়ের স্নিগ্ধ রশ্মির মত জাগিয়া দেখা দিতেছিল! সেই প্রমোদ···! মনকে সে বার বার শাসাইতেছিল, তার সামনে বাহির হইতে আবার লজ্জা কিসের আজ! পা দুইটাই বা এমন

১১

প্রমোদের পিতা হরিশ্চন্দ্র আর বীরেন্দ্র বাবু দুইজনে কলেজে সহপাঠী ছিলেন। তারপর দুই জনেই ডেপুটিগিরি চাকরীতে ঢোকেন। হরিশ্চন্দ্র রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—নৈহাটীর কাছে বাড়ী; আর বীরেন্দ্রবাবু বারেন্দ্র। তাঁর বাড়ী রাজশাহীর ওদিকে। চাকরির স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দুইজনে আবার একত্র হন হুগলিতে। তখন প্রমোদের বয়স বারো বৎসর, আর বিভার বয়স পাঁচ।

প্রমোদ এই মেয়েটীকেই খেলার সাথী পাইয়া বর্ত্তাইয়া গেল। তার ফাই-ফরমাশ শুনিয়া আবদার রাখিয়া সে-ও তার বয়সটাকে একেবারে সাত বৎসর কমাইয়া ফেলিল। ওদিকে দুই কর্ত্তার কলেজের বন্ধুত্ব এমন সুদৃঢ় সখ্যে পরিণত হইল যে দুই পরিবার মনে-প্রাণে মিশিয়া এক হইয়া গেল।

তার পর বীরেন্দ্র বাবু আরো কয়টা জায়গা ঘুরিয়া কলিকাতায় আসিলেন; হরিশবাবুকেও সরকার মেদিনীপুর বরিশাল ঘুরাইয়া আলিপুরে আনিয়া তুলিল। দুই বন্ধু আবার কলিকাতায় সিমলায় আসিয়া পাশাপাশি বাসা লইলেন। আবার সেই মেলামেশা সবেগে চলিতে সুরু করিল।

তারপর হঠাৎ একদিন কাছারি সারিয়া আসিয়া বেড়াইতে যাইবার সময় সিঁড়ির নীচে পড়িয়া গিয়া হরিশ্চন্দ্র মূর্চ্ছিত হইলেন—বিস্তর ডাক্তার আসিল যন্ত্রপাতি লইয়া। ডাক্তারের দল হিম্‌সিম্ খাইল; কিন্তু হরিশবাবুর সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। তিনি ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন।

বীরেন্দ্রবাবু তখন এই বিপন্ন পরিবারের ডান হাত হইয়া তাকে খাড়া রাখিলেন। তার পর প্রমোদ কলেজের পড়া সাঙ্গ করিল। পিতার সাধ ছিল, সে বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসে। বীরেন্দ্র বাবু সে কথা স্মরণ করিয়া তাকে বিলাত পাঠাইলেন। হরিশ্চন্দ্র অর্থও বেশ সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন—কোথাও কোন আটক পড়িল না। তার বিধবা মা কলিকাতার বাসা তুলিয়া দেশে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

তারপর দীর্ঘ তিন বৎসর বিলাতে কাটাইয়া কাল প্রমোদ গৃহে ফিরিয়াছে। ফিরিয়া প্রথমেই মার কাছে যায়—কিন্তু তবু কালই বীরেন্দ্র বাবুর পায়ে প্রণাম করিয়া যাইতে ভোলে নাই! অর্থাৎ এই দুই পরিবারের মধ্যে যে বন্ধন বহুকাল পূর্ব্বে আঁটা হইয়াছিল, আজো তাহা তেমনি অটুট, তেমনি পরিপাটী রহিয়া গিয়াছে!

বিলাতে বসিয়া প্রমোদ যখনই নর-নারীর বিচিত্র মেলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে, তখনি তার মানস-নয়নের সম্মুখে একখানি মুখ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কুঞ্চিত ঘন কৃষ্ণ কেশরাশির মধ্যে সদ্যফোটা গোলাপের মত সুন্দর একটি মুখ! সে মুখ বিভার!

সুদূর প্রবাসে বসিয়া এই বিভার কথা কতদিন কত ভাবেই যে ভাবিয়াছে সে, তার কোন ঠিকানা নাই! কতবার সে কল্পনা করিয়াছে, তার একটি সাজানো ঘর, সে ঘরে কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মীর সাজে বিভা!...কিন্তু তা কি হইবার! সে হইল রাঢ়ী, আর বিভার পিতা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ! এ মিলন তো হইবার নয়! এ কেন সে মিথ্যা বসিয়া আকাশ-কুসুম রচনা করে—বেদনা পাওয়াই যে তার সার হইবে।

শেষের কথাটা ভাবিতে গিয়া তার মন এমন ভারী হইয়া উঠিত যে কোথায় সরিয়া যাইত কাজ-কর্ম্মের যত উৎসাহ, যত আগ্রহ! সমস্ত প্রাণ নৈরাশ্যের ঘায় ব্যথিত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত—তবে হায়, কিসের জন্য, কিসের আশায় এ যুদ্ধ সে করিয়া মরিতেছে।

পরক্ষণে বীরেন্দ্র বাবুর পত্র আবার তার প্রাণে চেতনা সঞ্চার করিত। পিতার ইচ্ছা বীরেন্দ্র বাবুর সতর্ক দৃষ্টির মাঝ দিয়া তাকে আবার কর্ম্ম-চঞ্চল করিয়া তুলিত। তখন আবার নিরালা কোণ হইতে মনকে তুলিয়া সে ছুটিত বাহিরে কার্য্য-স্রোতের বিপুল আবর্ত্তে ঝাঁপ দিতে!

বিলাতে থাকিতে সে বীরেন্দ্র বাবুকে চিঠি লিখিত বরাবর প্রতি ডাকে; তাঁর জবাবও পাইত প্রতি মেলে। বিভাকে চিঠি লিখিবার কথা মনে হইলেও সে কোনদিন তাহা লিখিতে পারে নাই। দেশে থাকিতে-যাকে অতি স্নেহের পাত্রী

ব্যবধান ঠেলিয়া সে আজ নূতন যে বেশে প্রাণের দ্বারে আনাগোনা করিতেছে—এ ভাবের ইঙ্গিতও পাছে চিঠির ফাঁকে প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় সে একেবারে রাঙিয়া উঠিত। বীরেন্দ্র বাবুকে পত্র লিখিবার সময় মনকে সে অত্যন্ত সতর্ক রাখিত,—বিভার কথা বেশীনা লিখিয়া ফেলে, গণ্ডী ছাড়াইয়া! এ চেষ্টায় বুক বেদনায় ঘা খাইয়া টাটাইয়া উঠিত, সে বেদনা সে নীরবে সহিত! তার কাছে ছিল বীরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর একখানা অতি-পুরানো ছবি। বীরেন্দ্র বাবু ও তাঁর স্ত্রী চেয়ারে বসিয়া, আর তাঁদের কোলের কাছে হেলিয়া দাঁড়াইয়া বিভা। তার বয়স তখন ছয় কি সাত বৎসর! ছবিখানি হুগলিতে তোলা। যখন-তখন এই ছবির গায়ে সে নানা রঙের ফুল আনিয়া সাজাইয়া রাখিত। আর এই ছবি হাতে করিয়া সে কল্পনা-নেত্রে দেখিত, ঐ ছোট্ট মুখখানি তারুণ্যের স্পর্শে ধীরে ধীরে বাড়িয়া কি অপরূপ শ্রীতে লীলায়িত অরুণিম হইয়া উঠিয়াছে! ঐ ছোট্ট কোঁকড়া চুলের গোছা লম্বিত কৃষ্ণ বেণী হইয়া ফুটিয়াছে, আর ঐ চোখ, ঐ ঠোঁট, ঐ গাল, এমন নিরেট নিটোল হইয়া এক সুকুমার লাবণ্যে ভরিয়া গিয়াছে...! ভাবিতে ভাবিতে প্রমোদের দুই চোখ কি এক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইত! আবার কখন এক সময় সত্যের কঠিন-কঠোর ঘা খাইয়া তার স্বপ্ন টুটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত! এমনি ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়া প্রবাসের দিনগুলা ক্রমে ফুরাইয়া আসিল এবং সে দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিল।

আর বিভা? সে দিন গণিত, প্রমোদ কবে দেশে ফিরিবে! প্রতি মেলে বাপের কাছে বিলাত হইতে যে চিঠি আসিত, সেই চিঠিখানির জন্য কি উন্মুখ, কি অধীর থাকিত সে! তার তরুণ প্রাণের কুঞ্জবনে সেও বসিয়া কত ফুল লইয়া মালা গাঁথিত, কিন্তু সে মালা লইয়া সে কি করিবে! মন অজানা রাজ্যে ছুটিত, কার খোঁজে—সেখানকার পথ-ঘাট সবই তার অচেনা,—সে পথে বিষম ভিড়ের মাঝে মন তার ভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িত। অধীর পথিকের দলে তৃষিত দুই চোখ ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্রান্ত হইত, হাতের মালা হাতেই থাকিয়া যাইত,—এ সে কার গলায় পরাইবে গো!

মনটা হু-হু করিয়া উঠিত—কাণের কাছে কে যেন চুপি চুপি বলিত, সে কোথায়? সে কোথায়?

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মহারাজা নন্দকুমার

সুপ্রীম কাউন্সিলে মহারাজা নন্দকুমার-কর্ত্তৃক ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ-গ্রহণের অভিযোগ

(১৭৭৫ খৃ ১১ই মার্চ্চ)

রেগুলেটিং আইনের বিধান-অনুসারে ফ্রান্সিস্ ক্লেভারিং মনসন, বারওয়েল সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্য এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস পূর্ব্ব হইতেই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিয়োগ-ক্রমে গবর্ণরের পদে এবং বারওয়েল সভ্যের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

সুপ্রীম কাউনসিলের অধিবেশন আরম্ভ হইলে, নূতন সভ্যেরা কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের উৎকোচ-গ্রহণ সম্বন্ধে তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা উৎকোচ-গ্রহণে বৃহস্পতি ছিলেন। গবর্ণর জেনারেল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মসীজীবি শ্বেতাঙ্গটি পর্য্যন্ত কেহই দক্ষিণ হস্তের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশের দুর্গতির পরিসীমা ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের ফলে বঙ্গভূমি ইংলণ্ডের গোত্রহীন পরিবার-বর্গের ও চরিত্র-বিহীন সন্ততিগণের লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। হেষ্টিংস, বারওয়েল,

মিডল্‌টন, গ্রেহাম প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ ধনী ও জমিদার-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে দরবার-খরচ বলিয়া প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিতেন। নিম্ন-শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গগণ তাঁহাদের পদাঙ্ক-অনুসরণে ত্রুটি করিতেন না। এই সমস্ত কারণে ধনী, দরিদ্র, গৃহস্থ, কৃষক, ভূম্যধিকারী সকলেই উৎপীড়িত হইয়া অহরহ নবাবের নিকট আবেদন, নিবেদন করিত! কিন্তু তাহাদিগকে কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের হাত হইতে রক্ষা করেন এরূপ শক্তি নবাবের ছিল না। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ লণ্ডন হইতে মধ্যে মধ্যে উৎসব-নিবারণের নিমিত্ত কলিকাতায় পত্র লিখিতেন। কিন্তু কলিকাতা ও লণ্ডনের মধ্যে তৎকালে দশ সহস্র মাইল সমুদ্র ব্যবধান থাকায়, তাঁহাদের চেষ্টার কোন ফল হইত না। এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া বৃটীশ পার্লিয়ামেণ্ট রেগুলেটিং আইন প্রণয়ন করিলেন। উহাতে এইরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইল যে কোম্পানীর কোন কর্ম্মচারী উৎসবে উপঢৌকন বা নজর বলিয়া কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিলে তাহাতে তাঁহার কোন অধিকার থাকিবে না; তাহা তৎক্ষণাৎ কোম্পানীর তহবিলে জমা করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ আইনে হেষ্টিংসের কোন প্রকার অন্তরায় ঘটিল না। তিনি গৃহীত উৎকোচের কোন হিসাব না দিয়া মধ্যে মধ্যে নজর প্রচার বলিয়া কিছু কিছু টাকা জমা দিতে লাগিলেন। তিনি শুধু কোম্পানীর হিতার্থে অর্থ গ্রহণ করিতেছিলেন, উহাতে তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ ছিল না, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত ১৭৭৪ খ্রী ৭ই নবেম্বর তারিখে দুই থলি টাকাসহ কাউনসিল গৃহে প্রবেশ করিয়া সভ্যগণকে বলিলেন :—

"আমি নজর বন্ধ না করিয়া কোম্পানীর হিতার্থে গ্রহণ করিতেছি। থলি দুইটির একটিতে ৪২৬ খানি মোহর এবং অপরটিতে ৩২৭ টাকা আছে। এই টাকা আমি ১লা অগষ্ট হইতে ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে পাইয়াছি। প্রত্যেক মাসে যাহা পাইব, মাসের শেষ তারিখে তাহা জমা করিয়া দিব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। নজর গ্রহণ করা সহসা বন্ধ না করিয়া এইরূপ ভাবে কার্য্য করাই ভাল।

বারওয়েল কোম্পানীর নাম করিবার প্রয়োজন কি? নজর-গ্রহণ বন্ধ করা উচিত নহে। কর্তৃপক্ষগণ আমাদিগকে এদেশের অধিবাসীদিগের রীতি-নীতির প্রতি সম্মান রাখিয়া চলিতে বলিয়াছেন। নজর গ্রহণ না করিলে বঙ্গবাসীরা দুঃখিত হয়। যাহাতে তাহারা দুঃখিত হয়, আমাদের এরূপ কার্য্য করা উচিত নহে।

ক্লেভারিং। আইন-প্রণেতারা গবর্ণর জেনারেলকে এবং কাউনসিলের সভ্যদিগকে দেশীয় রাজাদিগের অথবা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সেইজন্য আমি কাহারো নিকট হইতে কোন দিন নজর লই নাই, লইবার ইচ্ছা নাই।

মন্‌সন। আমি এযাবৎ নজর গ্রহণ করি নাই, করিবও না। আইনের অভিপ্রায় যেরূপ তাহাতে নজর গ্রহণ উচিত নহে।

পর দিবস নজর-গ্রহণ প্রসঙ্গ পুনর্ব্বার কাউনসিলে উত্থাপিত হইলে ক্লেভারিং, ফ্রান্সেস ও মনসন এই মর্ম্মে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন :—

"নজর গ্রহণ আইন-বিরুদ্ধ। আমরা গ্রহণ করি না। গবর্ণর জেনারেল নজর না লইলে বঙ্গবাসীরা দুঃখিত হয়। কিন্তু এদেশের লোক নির্ব্বোধ নহে। আমরা তাহাদের অর্থ না লইয়াও তাহাদের বন্ধু হইতে পারি, ইহা তাহারা বিলক্ষণ জানে।"

কিছুদিন পরে উৎকোচ-গ্রহণ-প্রসঙ্গে বঙ্গের নানা স্থান হইতে অভিযোগ আসিতে লাগিল। ৩ শে ডিসেম্বর বর্দ্ধমানের রাণী (রাজা ত্রিলোকচাঁদের পত্নী) ওয়ারেন হেষ্টিংসের আশ্রিত ব্যক্তিগণের নামে অভিযোগ করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। ১০ই মার্চ্চ (১৭৭৫) তারিখে কাউনসিলের বরাবর রাণীর দ্বিতীয় পত্র পৌছিল। ১৪ই মার্চ্চ রাণীর দেওয়ান ব্রজকিশোর বর্দ্ধমানের ষ্টেটের কাগজ পত্র দেখাইয়া প্রমাণ করিলেন যে হেষ্টিংসের বেনিয়ান্ কান্ত বাবু উক্ত ষ্টেট হইতে ৫০০০ টাকা এবং তাঁহার গোমস্তা কৃষ্ণজীবন চট্টোপাধ্যায় ৫০০ টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত কাগজপত্র হেষ্টিংসের নামে ১৫০০০ টাকা খরচ লেখা

পারিলেন না, কিন্তু দয়ারাম ঠাকুর নামক ষ্টেটের জনৈক কর্ম্মচারী ঐ হিসাবটি প্রমাণ করিয়া বলিলেন, উহা সত্য; উহা তিনি ব্রজকিশোরের আদেশে লিখিয়াছিলেন। ৩০শে মার্চ্চ জয়লাবদ্দিন নামক জনৈক মুসলমান হুগলীর ফৌজদারের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন, যে উক্ত ফৌজদার তাঁহার বেতনের অংশ প্রতিমাসে হেষ্টিংসকে উৎকোচ-স্বরূপ দিয়া থাকেন। রাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র রামকৃষ্ণ ও অন্যান্য জমিদারেরা হেষ্টিংশের নামে উৎকোচ-গ্রহণের অভিযোগ করিলেন।

কিন্তু হেষ্টিংসের নামে উৎকোচ-গ্রহণের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ মহারাজা নন্দকুমারের। ১১ই মার্চ্চ তারিখে কাউনসিলে অধিবেশন-কালে সভ্যপ্রবর ফ্রান্সিস বলিলেন :—

"অদ্য প্রাতে রাজা নন্দকুমার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার হস্তে কাউনসিলের বরাবর একখানি পত্র দিয়াছেন। আমি কাউনসিলের সভ্য বলিয়া তিনি পত্রখানি আমার নিকট দিয়াছেন। আমিও সেইজন্য উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারি নাই। সে সময়ে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা রাজার কথা আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পত্রখানি এই :—

"মহামান্য সভাপতি এবং কাউনসিলের সভ্যবৃন্দ, (১)

যখন মীর কাশিম খাঁ বহুসংখ্যক ইংরাজকে হত্যা ও বন্দী করিয়া স্বীয় প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তখন মীর জাফর যুদ্ধের নিমিত্ত আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না; সেইজন্য তিনি ইংরাজদিগের অনুরোধ-সত্ত্বেও কাশিমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমি জমিদারগণকে একত্রিত করিয়া সৈন্য সংগ্রহের এবং যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিলে নবাব ইংরাজদিগের সহিত (কাশিমের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। সম্মিলিত সৈন্যগণের কার্য্য-তৎপরতায় মীর কাশিম বিতাড়িত এবং সুজাউদ্দৌলা ইংরাজদিগের করতল-গত হইলে, আমি নবাব মীর জাফরের পক্ষ হইতে সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারি সনন্দ গ্রহণ করিয়াছিলাম। মীর জাফরের জীবদ্দশায়, রাজ্যের ভার আমার উপরেই ন্যস্ত ছিল। সে সময়ে আমি সম্রাটকে অঙ্গীকৃত রাজস্ব, ও কোম্পানীর মহারাষ্ট্রদিগের প্রাপ্য টাকা নিয়মিত পরিশোধ করিয়া ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় স লান করিয়াছি; দেশীয় সৈন্যগণের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া নিজামতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছি, সে সময়ে চাউল দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় প্রজাগণের ক্লেশ নিবারণের নিমিত্ত তাহাদিগকে চাউল বিতরণ করিয়াছি। মীর জাফরের মৃত্যুর পর কএকজন স্বার্থপরায়ণ ইংরাজ কর্ম্মচারী আমার কর্য্যদক্ষতা উপেক্ষা করিয়া আমাকে পদচ্যুত করেন। তখন মহম্মদ রিজা খাঁ নায়েব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইলেন। রিজা খাঁ সাত বৎসর কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য-প্রণালী কিরূপ, তিনি কোম্পানীর প্রাপ্য রাজস্ব অনাদায় যোগ্য বলিয়া মিথ্যা হিসাব দিয়া কিরূপে বঞ্চনা করিয়াছেন, কিরূপে তিনি নগরের প্রতি নির্য্যাতন এবং প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিয়াছেন, তাঁহার চাউলের ব্যবসায়ে বঙ্গদেশ কিরূপে উচ্ছন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছে। নিরপক্ষভাবে তদন্ত করিলে প্রকৃত ঘটনা সমস্তই আপনারা জানিতে পারিবেন। আমি দশ বৎসর হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছি। মহম্মদ রিজা খাঁ আমার কৃত কার্য্যে ত্রুটি দেখাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণের শত্রু-মিত্র উভয়ই থাকে; কিন্তু মহম্মদ রিজা খাঁ অনেক চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিয়াও আমার বিরুদ্ধে একজন সাক্ষীও প্রাপ্ত হয়েন নাই।

হেষ্টিংস মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসিয়া আমার সহিত সদ্ভাবে কার্য্য করিবেন প্রথমতঃ এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমিও তাঁহাকে শাসন-কার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। আমার কথা আমি রক্ষা করিয়াছি কি না পরে নিবেদন করিব। ক্লেভারিং, ফ্রান্সিস ও মনসন কলিকাতায় আসিলে হেষ্টিংস তাঁহাদের সহিত অনেক লোকের পরিচয় করিয়া দিলেন।

(১) Vide Forrest's selections from state papers Vol I

তৎপরে এক সপ্তাহ গত হইলে তাঁহাদিগের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিবার নিমিত্ত আমি হেষ্টিংসকে অনুরোধ করিলাম। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "আপনি আমার শক্রর সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি আমার সেই শত্রু আপনার পক্ষ হইতে নূতন সভ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। আপনি তাঁহাদের সহিত আপনার এই বন্ধু দ্বারা পরিচিত হউন। আমার নিজের সুবিধার জন্য যাহা আবশ্যক মনে করিব আমি তাহাই করিব—ইহাতে আপনার অনিষ্ট হইবে এই কথাটি মনে রাখিবেন।" আমি বলিলাম, "আপনি গ্রেহামের কথা বিশ্বাস করিবেন না, গ্রেহাম আমার পরম শত্রু।" কিয়ৎকাল যাবৎ এই ভাবে চলিল।

তৎপরে ফ্রান্সিস, ক্লেভারিং ও মনসনের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিবার নিমিত্ত হেষ্টিংস ইলিয়টকে পাঠাইলেন। তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইলে আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সহিত এবং কখন কখন হেষ্টিংসের সহিত দেখা করিতে লাগিলাম। ২৯ শে পৌষ মঙ্গলবার আবার আমি হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখি, তিনি ও গ্রেহাম কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। গ্রেহাম চলিয়া গেলে হেষ্টিংস আমাকে বলিলেন :—

"আমি নিশ্চয় জানিয়াছি যে আপনি আমার শক্রর ন্যায় কার্য্য করিতেছেন। আমি এইক্ষণ হইতে আপনার শত্রু হইলাম। আমি ইউরোপে চলিয়া গেলেও আপনার সহিত আমার শত্রুতা থাকিবে। অদ্য হইতে আর আপনি আমার নিকট আসিবেন না। আপনি আমার যাহা করিতে পারেন, করিবেন।"

আমি বলিলাম,—"আপনি স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে কথাগুলি বলিলেন তাহা সঙ্গত কি না। যতক্ষণ আপনি সে বিবেচনা না করেন, ততক্ষণ আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব না।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমি তথা হইতে প্রস্থান করিলাম; ভাবিলাম সহসা ক্রোধের উদ্রেক হওয়ায় হেষ্টিংস আমাকে এই কথাগুলি বলিয়াছেন। সত্য সত্যই কি তিনি আমার সর্ব্বনাশ করিবেন? এখন দেখিতেছি, তাঁহার অভিসন্ধি ভাল নহে। যে জগৎচাঁদকে আমি শৈশব অবস্থা হইতে এ যাবৎ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি, যিনি এখনও আমার পুত্র রাজা গুরুদাসের অধীনে নাএবতি কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তিনিই আমার ও আমার পুত্রের অনিষ্ট-সাধনের নিমিত্ত উদ্যোগী হইয়াছেন। জগৎচাঁদ আমার পুত্রের অনভিপ্রায়ে এবং কাউনসিলের অনুমতি না লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। এখানে আসিয়া তিনি এযাবৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। মোহনপ্রসাদ আমার পরম শত্রু, তিনি কিরূপ চক্রান্তকারী তাহা ইংরাজ বাঙ্গালী কাহারও অবিদিত নাই। মোহনপ্রসাদকে একবার গবর্ণর জেনারেল নিজেই তাঁহার বাটি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। গবর্ণর মহোদয় এখন সেই জগৎচাঁদকে এবং সেই মোহনপ্রসাদকে নিজের বাটিতে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহিত গোপনে মন্ত্রণা করিতেছেন।

মোহনপ্রসাদ হেষ্টিংসের সহিত কলিকাতায় এবং তাঁহার বাগান-বাটিতে ষড়যন্ত্র করিতেছেন; হেষ্টিংস নিয়ত জগৎচাঁদের বাটীতে যাইতেছেন। এই দুই ব্যক্তি কি এতই উচ্চপদস্থ? ইহারা এমন কি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছে যে স্বয়ং গবর্ণর ইহাদের প্রতি এরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন? ইহারা আমার শত্রু এবং আমার উপর ইহাদের মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ—ইহা ভিন্ন ইহাদের প্রতি গবর্ণরের বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইবার আর কি কারণ হইতে পারে? আমার এখন কোন ক্ষমতা নাই—গবর্ণর মহোদয় ক্ষমতাবান। কিরূপ শত্রুর হস্তে পড়িয়াছি, তাহা ঈশ্বরই জানেন। তিনি ভিন্ন আমাকে কেহই উদ্ধার করিতে পারেন না। আমি জীবন অপেক্ষা আত্মসম্মান শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি। যে সকল কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিব, তাহাতে আত্ম-সম্মানের হানি হইতে পারে, বুঝিতে পারি; কিন্তু আমার উপায়ান্তর নাই।

হেষ্টিংস শাসন-কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, "মহম্মদ রিজা খাঁর এবং সিতাব রায়ের দুষ্ক্রিয়া কলাপ আমি সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। তাঁহাদিগকে কার্য্য হইতে অপসারিত করিবার সঙ্কল্প

করিয়াছি। তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কোম্পানীর প্রাপ্য টাকার আপনি হিসাব প্রস্তুত করিয়া দিউন। আমি আপনাকে সমগ্র বঙ্গের আমীনের পদে নিযুক্ত করিব।"

গবর্ণর মহোদয়ের অনুরোধ আমি বহু পরিশ্রমে উভয়ের নিকট হইতে কোম্পানীর প্রাপ্য টাকার হিসাব প্রস্তুত করিলাম। রিজা খাঁ ও সিতাব রায় যত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তাহা সেই হিসাবে দেখাইয়া দিলাম।

মহম্মদ রিজা খাঁ মণি, মুক্তা, জহরৎ, হস্তী, ঘোটক, মেষ এবং গুপ্ত তহবিল হইতে নগদ যত টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তদ্ভিন্ন তিনি নিজামৎ হইতে বাঙ্গালা ১১৭২ হইতে ১১৭৮ সাল পর্য্যন্ত এবং ঢাকা প্রদেশ হইতে ১১৭০ হইতে ১১৭৭ সাল পর্য্যন্ত ২০২, ২৮৯৫৮ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ১১৭২ হইতে ১১৭৮ সাল পর্য্যন্ত যে সকল জেলা তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিল তদ্বাবদ ১৩০০০০০ টাকা তাঁহার নিকট কোম্পানীর পাওনা থাকে। তিনি শঠতা পূর্ব্বক সেই টাকা অনাদায়-যোগ্য বলিয়া হিসাবে লিখিয়া নিজে আত্মসাৎ করেন। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহার নিকট কোম্পানীর ৩০৫২৬৯৫ টাকা পাওনা হয়। যে সমস্ত ব্যবসায়ীর নিকট তিনি অবৈধমতে তণ্ডুল খরিদ এবং যাহাদিগকে জিনিস অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন আমি তাহাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করাইবার নিমিত্ত হেষ্টিংসের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। তখন মহম্মদ রিজা খাঁ তদন্ত বন্ধ করিবার জন্য হেষ্টিংসকে দশ লক্ষ টাকা এবং আমাকে দুই লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করিলেন। বাধ্য হইয়া এ কথা হেষ্টিংসকে আমার জানাইতে হইল। তিনি বলিলেন, "এই সামান্য টাকার লোভে কোম্পানীর প্রায় চারিকোটি টাকার দাবী আমি ছাড়িয়া দিতে পারি না। কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা আদায় করিতেই হইবে। রিজা খাঁর নামে যে সমস্ত অভিযোগ হইয়াছে তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ করাও আবশ্যক।" এই কথাবার্ত্তার কএক দিবস পরে দেখিলাম রিজা খাঁ অকস্মাৎ প্রহরী-মুক্ত হইয়াছেন; তাঁহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে তদন্ত বন্ধ হইয়াছে। হেষ্টিংস সহসা তাঁহার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন কেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

রিজা উদ্দিন মহম্মদ এবং মহম্মদ আলি খাঁ ও নদীয়া-নিবাসী শীতল ও অমূল্য কোম্পানীর নিকটে কয়েক লক্ষ টাকা পরিমাণে ঋণী ছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের ত্যক্ত সম্পত্তি রিজা খাঁ কোম্পানীকে না দিয়া নিজে আত্মসাৎ করিয়াছেন। বাঃ ১১৭১ সালে মহম্মদ রিজা খাঁ তাঁহার মুচ্ছদ্দি আমানত সিংহকে কলিকাতায় আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার নিকট হইতে অনেক টাকা পীড়ন করিয়া লইয়াছেন। হেষ্টিংস পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে মহম্মদ রিজা খাঁ যে জায়গীর ভোগ করিতেছেন, উহা তাঁহার পদ-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে মাত্র। তিনি পদভ্রষ্ট হইলে উহা কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করিবেন। তিন বৎসর হইল রিজা খাঁ কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপি জায়গীর তাঁহার দখলে আছে। কি জন্য বাজেয়াপ্ত হয় নাই, হেষ্টিংস তাহার সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে বাধ্য।

বাঃ ১১৭৩ হইতে ১১৮১ সাল পর্য্যন্ত সিতাব রায় নব্বই লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এই কথা মুরসিদাবাদ নিবাসী মহারাজাধিরাজ দীক্ষিতনারায়ণ শুনিতে পাইয়া আমার নিকট তাঁহার উকীলকে পাঠাইয়াছিলেন। উকীল আমাকে বলিলেন, দীক্ষিতনারায়ণ সিতাব রায়ের পদাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু তিনি নব্বই লক্ষ টাকার মধ্যে ত্রিশ লক্ষ টাকা অনাদায়-যোগ্য বলিয়া রায় দিয়া দিলে, ষাটি লক্ষ টাকা নগদ দিতে পারেন। এ কথা আমি হেষ্টিংসকে জানাইয়াছিলাম। রাজা সিতাব রায় দীক্ষিতনারায়ণের প্রস্তাব শুনিয়া আমাকে লিখিয়া পাঠাইলের "আমি গবর্ণরকে চারি লক্ষ, আপনাকে এক লক্ষ এবং রিড্ সাহেবকে পঞ্চাশ সহস্র টাকা দিব, আপনি তদন্ত বন্ধ করিয়া দিউন।"

হেষ্টিংস এই কথা শুনিয়া বলিলেন "কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা সর্ব্বাগ্রে আদায় করা কর্ত্তব্য।" কিন্তু তিনি কোম্পানীর নিমিত্ত এত কপর্দ্দকও আদায় না করিয়া সিতাব রায়কে অব্যাহতি দিয়াছেন; অব্যাহতি দিবার পূর্ব্বে আমাকে একবারও জানান নাই

দীক্ষিতনারায়ণের প্রস্তাব-অনুসারে কার্য্য করিলে কোম্পানীর ৬০ লক্ষ টাকা লাভ হইত। কিজন্য হেষ্টিংস সে প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন নাই তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

হেষ্টিংস বেনারস-যাত্রাকালে আমাকে বলিয়াছিলেন "সুবা বেহারের যদি কোন ভূমি অন্যায়মতে বেনারসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে দেখাইয়া দিউন। আমি চৈতসিংহের নিকট পুনরুদ্ধার করিব।" পরগণা কেরামঙ্করুর পরগণা বিজয়গড় বেনারসাধিপতি বলবন্ত সিংহ সুবা বেহার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। দেওয়ানী-প্রাপ্তির সময় হইতে ঐ দুই পরগণা কোম্পানীর ২৪০০০০০ টাকা পাওনা হইয়াছিল। আমি হিসাব প্রস্তুত করিয়া গবর্ণর জেনারেলকে দেখাইলে তিনি বলিলেন, "এই হিসাবের একটি নকল রায় রাধাচরণের নিকট দিউন; যদি চৈত সিংহ দাবী অস্বীকার করেন, তাহা হইলে রাধাচরণ তাঁহাকে দেখাইবে।" হেষ্টিংস বেনারস গমন করিয়া চৈতসিংহকে তলব করিয়াছিলেন, অথচ পরগণা দুইটির পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন নাই কেন, তাহা তিনিই জানেন।

পরগণা বাহারবন্দ রাণী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। হেষ্টিংস উহা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া তাঁহার বেনিয়ান্ কান্তবাবুকে দিয়াছেন। রাণীর কোনই অপরাধ ছিল না। কি নিমিত্ত তাঁহার উপর এরূপ অত্যাচার হইয়াছে, হেষ্টিংস তাহার কারণ দেখাইতে বাধ্য।

সম্রাট সাহ আলম আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে একখানি ঝালরদার পাল্কি দিয়াছিলেন। সে সময়ে মীর জাফরের মৃত্যু হওয়ায় আমি অবসর প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলাম। মহম্মদ রিজা খাঁ নাএব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পাল্কিখানি পাটনায় পৌঁছিলে সিতাব রায় উহা আমার নিকট না পাঠাইয়া রিজা খাঁর নিমিত্ত রাখিয়া দেন। হেষ্টিংস এই সংবাদ পাইয়া পাল্কিখানি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য সিতাব রায়ের প্রতি আদেশ করিলেন। তদবধি উহা হেষ্টিংসের নিকট রহিয়াছে। কি নিমিত্ত তিনি এতাবৎ উহা আমাকে না দিয়া নিজে রাখিয়াছেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। যদি পাল্কিখানি আপনাদের বিচারে আমার প্রাপ্য হয় তাহা হইলে উহা আমাকে দিবার নিমিত্ত হেষ্টিংসকে অনুরোধ করিলে আমি বাধিত হইব।

হেষ্টিংস গবর্ণরস্বরূপ যে সমস্ত উপঢৌকন গ্রহণ করিয়াছেন তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রাজা গুরুদাসকে নাএবের পদে এবং মণিবেগমকে নবাবের অন্তঃপুরে কর্ত্রী নিযুক্ত করার নিমিত্ত আমার নিকট হইতে গ্রহণ করেন :—

মাঃ গবর্ণরের খানসামা জগন্নাথ, বালকৃষ্ণ, চৈতন নাথ, সুরসিং ও সদানন্দ

১ থলি সোনার মোহর	১৪৭১ থানি মোহর
১ ,, ,, ,,	১৪৭১ ,, ,,
১ ,, ,, ,,	৯০০ ,, ,,
১ ,, ,, ,,	৫৭০ ,, ,,
	৪৪১২ থানি মোহর

আকবরি টাকায় মূল্য
৭৫০০৪৲ টাকা

হেষ্টিংসের খানসামা জগন্নাথ ও বালকৃষ্ণ এবং আমার চাকর চৈতন নাথ ও সুর সিং ইহাদের মারফত দেওয়া হয় :—

১ থলি সোনার মোহর	১২৯১ থানি মোহর
১ ,, ,, ,,	১৭৯ ,, ,,
	১৪৭০ থানি মোহর

আকবরি টাকায় মূল্য
২৪৯৯৮।০ টাকা

ঐ টাকার বাটা

প্রতি মোহর ১৴০ হিসাবে	আকবরি টাকা
১৮২২ সোনার মোহর ...	৩১০২৲ টাকা
জগন্নাথ, বালকৃষ্ণ ও শিবরাম হেষ্টিংসের নিকট লইয়া যায় ...	১০০০৲ টাকা

মণি বেগমকে অন্তঃপুরের কর্ত্রী নিযুক্ত করায় তাঁহার নিকট হইতে হেষ্টিংস গ্রহণ করেন ১০০০০০৲ টাকা।

১১৭৯ সালের আষাঢ় মাসে হেষ্টিংস কলিকাতা হইতে মুরসিদাবাদে গিয়াছিলেন। তিনি প্রায় তিন মাস কাশিম বাজারে অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে নবাবের প্রাসাদে যাইতেন। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলে মণি বেগম রাজা গুরুদাসকে বলিলেন, "মহারাজ নন্দকুমারকে আপনি পত্র লিখিয়া বলুন যে আমি গবর্ণর হেষ্টিংসকে এক লক্ষ টাকা দিতে ইচ্ছা করি। নন্দকুমার যেন হেষ্টিংসের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, টাকাটি তাঁহার নিকট নগদ অথবা বিলের দ্বারা পাঠান হইবে।" আমি এই পত্র পাইয়া হেষ্টিংসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, "আমার ঐ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। আপনি কান্তবাবুর ভ্রাতা নুরসিংহের নিকট কাশিম-বাজারে পাঠাইবেন।"

কলিকাতা ৮ই মার্চ্চ ১৭৬৫ }   নন্দকুমার।"

হেষ্টিংস সে দিবস অভিযোগ-সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া শুদ্ধ ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"আপনি বলিয়াছেন, নন্দকুমারের পত্রে কি লেখা ছিল তাহা আপনি পূর্ব্বে জানিতেন না। আমার নামে নন্দ-কুমারের এরূপ অভিযোগ আনিবার সঙ্কল্প আপনি পূর্ব্বে অবগত ছিলেন কিনা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইতেছে।"

ফ্রান্সিস। আমি কোন ব্যক্তির কৌতূহল নিবৃত্তির নিমিত্ত কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহি। তবে গবর্ণর জেনারেল যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহা বলিতে বাধা নাই। আমি নন্দকুমারের পত্রে কি লেখা আছে তাহা জানিতাম না সত্য, কিন্তু আমি মনে করিয়াছিলাম উহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে। পত্রের লিখিত অভিযোগ আনিবার সঙ্কল্প আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।

১৩ই মার্চ্চ, সুপ্রীম কাউনসিলের সেক্রেটারি সভ্যগণকে জানাইলেন, "নন্দকুমার আমার হস্তে এই পত্রখানি রাখিয়া গিয়াছেন।"

সেক্রেটারী কর্ত্তৃক মহারাজ নন্দকুমারের দ্বিতীয় পত্র-পাঠ :—

"মহামান্য প্রেসিডেণ্ট এবং কাউনসিলের সভ্যগণ,

গত ১১ই তারিখে আমি আপনাদের নিকট মহামান্য গবর্ণরের কার্য্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি। উহার একবর্ণও মিথ্যা নহে। সেই পত্রে যাহা লিখিয়াছি, তাহার একবর্ণও আমি পরিবর্ত্তন করিব না। অভিযোগ প্রমাণের নিমিত্ত আমার নিকট দলিল আছে। আপনারা আমাকে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইবার অনুমতি দিলে আমি বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণের দ্বারা অভিযোগের সত্যতা প্রতিপন্ন করিব।

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি ভিন্ন আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। পূর্ব্বে যাঁহারা গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আমি তাঁহাদিগকেও বলিয়াছি "যদি আপনারা ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি অধিক মনোযোগ দেন, তাহা হইলে দেশেরও ক্ষতি, কোম্পানীরও ক্ষতি! দেশের মঙ্গল ও সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব-বৃদ্ধি এই দুটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত।

হেষ্টিংস আমার নিকট হইতে যতদিন পর্য্যন্ত দেশের অবস্থা জানিয়া লইতে পারেন নাই, ততদিন আমার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি হইয়া গেলে তিনি আর আমার সহিত সদ্ভাব রাখেন নাই। সেই সময় হইতে তিনি আমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি দেশের মঙ্গল যাহাতে হয় সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কোম্পানীর যাহাতে হিত হয় তাহা না ভাবিয়া শুদ্ধ নিজের স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। আমার পূর্ব্বের পত্র এবং এই পত্র পাঠ করিয়া যাহা করিলে ভাল হয় তাহাই করিবেন।

কলিকাতা ১৩ই মার্চ্চ ;   নন্দকুমার।"

সভ্যপ্রবর মনসন প্রস্তাব করিলেন :—

"আমি প্রস্তাব করি, রাজা নন্দকুমারকে গবর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করা হউক।"

এই প্রস্তাব শুনিয়া গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন :—

'প্রস্তাবটি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই আমি জানাইতেছি যে আমি রাজা নন্দকুমারকে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ

সমর্থনের নিমিত্ত কাউনসিল-গৃহে উপস্থিত হইতে দিব না। আমি গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত। আমার মর্য্যাদা কি, আমি তাহাই জানি। এই সভায় আমি কথনই অভিযুক্ত হইয়া দাঁড়াইব না। কাউন্সিলের সভ্যগণকে আমি বিচারপতি বলিয়া মানিনা। আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে ক্লেভারিং, মনসন ও ফ্রান্সিস,—ইঁহারাই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী। তাঁহারা এদেশে আসিলে সুপ্রীম কাউন্সিল গঠিত হয়, তাহার অব্যবহিত পরেই তাঁহারা আমার পূর্ব্বকৃত কার্য্যাবলী সমস্তই রহিত করিলেন। আমি তাঁহাদের আদেশে অসম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক ডিরেক্টর-গণের নিকট আপীল করিয়াছি। তাঁহারাও তাঁহাদের কৃত কর্ম্ম সমর্থনের নিমিত্ত ডিরেক্টরগণের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহারা এখন আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য তাঁহাদের হস্তে অনুরূপ যন্ত্রও আসিয়া জুটিয়াছে। জোছেফ ফক, মহারাজা নন্দকুমার, রূপনারায়ণ চৌধুরী এবং বর্দ্ধমানের রাণী ইঁহারা যন্ত্র ভিন্ন কিছুই নহে।

কাগজ-পত্র দৃষ্টি করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে রাণী আমার নামে যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা ফকের অফিসেই প্রস্তুত হইয়াছিল। অভিযোগটি সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছিল, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। দুই একখানি পারসি অনুবাদ উহার সঙ্গে থাকিতে পারে কিন্তু ভাবগুলি সমস্তই ইংরাজি! রাণীর মূল পারসি দরখাস্তখানি আমি দেখিবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু কাউন্সিল আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সেইজন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে পারসি দরখাস্তের অস্তিত্বই নাই। নন্দকুমারের অভিযোগটি ফ্রান্সিস স্বহস্তে আনিয়াছেন। তিনি বলেন, তিনি কাউন্সিলের সভ্য বলিয়া নন্দকুমার পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিয়াছেন এবং তিনিও উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, ডিরেক্টরগণ শুদ্ধ ডিরেক্টরগণ কেন, যাঁহারাই এই কথাটি শুনিবেন, তাঁহারাই কাউন্সিলের এই কার্য্যটির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিবেন —পত্র-গ্রহন-কার্য্য কাউন্সিলের সভ্যগণের নাই। পত্রখানি নন্দকুমার জনৈক হরকরার মারফত অথবা সেক্রেটারীর হস্তে দিতে পারিতেন।

অভিযোগটি নন্দকুমার স্বয়ংই আনিয়া থাকুন অথবা উহা কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অনুগ্রহ-সূত্রেই আসিয়া থাকুক, সে একই কথা। তবে আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে কাউনসিলের সভ্যগণ এই মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষ। অথচ তাঁহারাই বিচারপতি হইতে বসিয়াছেন। সুপ্রীম কাউনসিল গঠিত হইবার পর হইতে ইঁহারা আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট আমার অক্ষমতা প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আইন-প্রণেতাগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমি একজন ঘৃণিত মানবাধম-সমক্ষে আসামী হইয়া দাঁড়াইব? আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে নন্দকুমার নরাধম। তিনি কতকগুলি ইতর লোককে সাক্ষী দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া আনিবেন। তাহারা আমার সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা-হানি-কর উক্তি করিবে, তাহা আমি এইখানে বসিয়া শুনিব! তাহা কখনই হইবে না। আপনারা ইচ্ছা করিলে একটি স্বতন্ত্র কমিটি করিয়া এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিতে পারেন; কিন্তু আবার বলিতেছি, নন্দকুমারকে অভিযোগ-কারী হইয়া এস্থানে দাঁড়াইতে দিব না!"

বারওয়েল। নন্দকুমারের এখানে উপস্থিত হইবার আবশ্যক কি? তাঁহার অভিযোগে গবর্ণর জেনারেল আসামী হইলে তদপেক্ষা কুদৃশ্য আর কি হইতে পারে? একেই ত কাউনসিলে দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে যদি আমরা এরূপ প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে সভ্য-গণের মধ্যে একতা থাকিবে না।

নন্দকুমার যদি অভিযোগ প্রমাণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন,তাহা হইলে তিনি কি সুপ্রীম কোর্টে যাইতে পারেন না? সুপ্রীম কোর্টই এই সমস্ত মোকদ্দমা বিচার করিতে সক্ষম, কাউনসিলের কোন ক্ষমতা নাই।

মনসন। গবর্ণর জেনারেলের বিরুদ্ধে কিরূপে প্রমাণ আছে তাহা অগ্রে দেখা আবশ্যক। যদি প্রমাণ যথেষ্ট থাকে, তাহা হইলে অভিযোগটি সুপ্রীম কোর্টে পাঠানো যাইবে। নন্দকুমারকে কাউন্সিলে উপস্থিত হইবার অনুমতি

দিলে, গবর্ণর জেনারেলও দেখাইতে পারিবেন যে মোকদ্দমাটি মিথ্যা।

ক্লেভারিং। গবর্ণর জেনারেলের সম্ভ্রম ও কাউনসিলের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্তই রাজা নন্দকুমারকে অভিযোগ প্রমাণের নিমিত্ত আহ্বান করা উচিত। যিনি এই কাউনসিলের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী, তাঁহারই বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ হওয়ার সভার মর্য্যাদা হানি হইয়াছে। আমরা নন্দকুমারেকে যদি কাউনসিলে আসিতে নিষেধ করি, তাহা হইলে গবর্ণর জেনারেলই আমাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে পারিবেন, "আপনারা আমাকে নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার সুযোগ দেন নাই।"

কাউনসিলের আদেশ হইল যে গবর্ণর জেনারেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের জন্ম নন্দকুমারকে আহ্বান করা হউক।

সভাপতি হেষ্টিংস। আমি আদেশ করিতেছি সভা ভঙ্গ হউক। আমার অনুপস্থিত-কালে সভ্যগণের সভার কার্য্য করিবার অধিকার নাই।

ফ্রান্সিস। আমি গবর্ণর জেনারেলকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি সভাপতির আসন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন?

হেষ্টিংস। আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই। আমি কাউনসিল ত্যাগ করিয়া চলিলাম। (প্রস্থান)

বারওয়েল। গবর্ণর জেনারেল সভা-ভঙ্গের আদেশ দিয়াছেন। পাঁচটা বাজিয়াছে। গবর্ণর জেনারেল কাউনসিল ত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ কথা তিনি বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "আমি উঠিলাম।" সেইজন্য আমি মনে করি, সভাভঙ্গ হইয়াছে। গবর্ণর জেনারেল পদ ত্যাগ করেন নাই, তিনি এখনই গবর্ণর জেনারেলই আছেন। তিনি সভ্যদিগকে পুনর্ব্বার আহ্বান না করা পর্য্যন্ত আইন-অনুসারে সভার কার্য্য হইতে পারে না। তাঁহারা অনুপস্থিতিতে কোন প্রসঙ্গের আলোচনা হইলে আমি তাহাতে যোগদান করিতে পারি না। (প্রস্থান)

মনসন। গবর্ণর জেনারেলের সভা ভঙ্গ করিবার অধিকার নাই। আমি প্রস্তাব করি, হেষ্টিংসের অনুপস্থিতি-কালে ক্লেভারিং সভাপতির কার্য্য করুন।

ফ্রান্সিস। পার্লিয়ামেণ্ট এ সম্বন্ধে যে আইন প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে এরূপ বিধান আছে যে সভাপতির অনুপস্থিতিতে কোন বয়োজ্যেষ্ঠ সভ্য সভাপতির কার্য্য করিতে পারিবেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে গবর্ণর জেনারেলের অনুপস্থিতি-কালেও সভার কার্য্য চলিতে পারে।

ক্লেভারিং। অধিকাংশ সভ্যগণের সম্মতি বিনা সভাভঙ্গ হইতে পারে না। সভ্যগণের নিষেধ না শুনিয়া হেষ্টিংস চলিয়া গিয়াছেন। অভিযোগটি মিথ্যা প্রমাণ করিয়া তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা করা উচিত ছিল। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলাম।

(নন্দকুমার আহূত হইলেন।)

মনসন (নন্দকুমারের প্রতি)। আপনি গবর্ণর জেনারেলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা সমর্থনের নিমিত্ত আপনার কি প্রমাণ আছে?

নন্দকুমার। আমার পত্রেই সমস্ত বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে। তদ্ভিন্ন মণি বেগমের পত্র আছে, তাহা এই :—

মণি বেগমের পত্র :—

"শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা নন্দকুমার—

জগদীশ্বরের ইচ্ছায় এবং গবর্ণরের অনুগ্রহে আমি যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহাই হইয়াছে। নিজামতে আমার পদোন্নতি এবং মর্য্যাদা বৃদ্ধি হওয়ায় আমি ভাবিয়াছি, গবর্ণর মহোদয় আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিরূপে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইব তৎসম্বন্ধে অনেক চিন্তার পর আমি তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি আমার নিজের স্বার্থের জন্য আপনার কোন কার্য্য করি নাই। আমি যাহা যাহা করিয়াছি তাহা কেবল কোম্পানীর সন্তোষার্থে।" এই কথা না শুনিয়া আমি পীড়াপীড়ি করিলে তিনি বলিলেন, "আপনি যদি নিতান্তই আমাকে উপঢৌকন দিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মহারাজা আপনার পক্ষ হইতে আমাকে যাহা দিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন (অর্থাৎ দুই লক্ষ টাকা) আপনি তাহাই দিবেন। আর যদি তাহা না হয়, তবে আপনার যেরূপ ইচ্ছা, করিবেন।

আপনি আপনার কর্ত্রী।" এই কথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম, আমি আপনাকে যে ৩৷৷০ লক্ষ টাকার কথা লিখিয়াছিলাম, এই দুই লক্ষ টাকা বোধ করি তাহারই মধ্যে হইবে। তখন আমার মনে হইল, যদি ইহাতে কোন কথা বলি, তাহা হইলে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নিষ্ফল হইয়া যাইবে। সেইজন্য আমি গবর্ণর মহোদয়কে বলিলাম, "সে সময়ে আমার বিশ্বাস থাকে ও অকৃতজ্ঞ শত্রুরা নানারূপ গোল বাধাইয়াছিল, সেইজন্য আমি মহারাজাকে লিখিয়াছিলাম "আমার পদোন্নতি-কল্পে এবং শত্রুগণের অভিসন্ধি ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত যাহা আপনি আবশ্যক মনে করেন, তাহাই করিবেন।" তদুত্তরে মহারাজা আমাকে লিখিলেন, তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট টাকার কথা বলেন নাই। যখন জগৎচাঁদ মহারাজার পত্র লইয়া আসিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ হয় নাই। সুতরাং মহারাজ আপনাকে দুই লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা জানিতাম না।" আমি গবর্ণর মহোদয়কে আরও বলিলাম "এক লক্ষ টাকা এখান হইতে গ্রহণ করুণ, আর এক লক্ষ টাকা মহারাজা নন্দকুমার আপনাকে কলিকাতায় দিবেন।" আমার সৌভাগ্যক্রমে গবর্ণর এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। আপনার উন্নতিতেই আমার মঙ্গল, আমরা পরস্পরের সুখ-দুঃখ-ভাগী। আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনি আমার নামে এক লক্ষ টাকা ঋণ লিখিয়া উহা গবর্ণর কলিকাতায় গেলে তাঁহাকে দিবেন। আমি এখানে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিতেছি। ঋণ-কৃত টাকা আমি কিছুদিনের মধ্যে রাজা গুরুদাসের সাহায্যে আপনাকে পরিশোধ করিব। ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমি আমার কথা রাখিব। উক্ত টাকা ভিন্ন, আমার পদোন্নতি এবং স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য আপনি যদি কাউনসিলের সভ্যগণকে কোন টাকা দিয়া থাকেন অথবা দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া থাকেন, তাহাও আমি পরিশোধ করিব। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেংসমস্ত টাকার একটি হিসাব পাঠাইবেন।"

আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী অরিয়ন এবং পারস্য অনুবাদক পত্রখানির মোহর পরীক্ষা করিয়া বলিবেন, উহা মণি বেগমের। প্রমাণ গ্রহণান্তে কাউনসিল নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন :—

'মহারাজা নন্দকুমারের পত্রে গবর্ণর জেনারেলকে যে সমস্ত টাকা দেওয়ার উল্লেখ আছে, ঐ টাকায় কোম্পানীর স্বত্ব। উহা কোম্পানীর জমা দিবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনারেলকে অনুরোধ করা হয়।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

পথের নেশা

(গল্প)

সেদিন ছিল কি একটা ছুটির দিন। ভোর সাড়ে সাতটায় ঘুম ভাঙ্গার পর আমার নিত্য-নৈমিত্তিক চা-কৃত্যাদি সমাপন করে' গত রাত্রের প্রায়-শেষ করে' রাখা একখানা স্প্যানিশ উপন্যাসের বাকী অধ্যায় কটি সবে মাত্র পড়ে উঠেচি; শক্তিশালী লেখকের উধাও-বিস্তৃত কল্পনার পিছনে পাড়ি দিয়ে মনটাও এদিকে বেশ একটু হাল্কা ভাবে বিভোর হয়ে উঠেচে, হাতের বইখানা মুড়ে ফেলে তার মাঝের একটা পাতায় আঙুল রেখে বসে বসে ভাবচি— নায়িকাকে সেই তো ফিরে আসতে হলো তার মনের মানুষের কাছে, তার এত কালের পুঞ্জীভূত দম্ভ, রূপ-গর্ব্ব, মর্য্যাদা-বোধ সকল শূন্য করে' চোখের জলে অন্ধ, বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে, সেই তো শেষে—এমন সময়ে হঠাৎ আমার নজরে পড়ে গেল, মুষ্‌ড়ানো, ধূলি-মলিন বাংলা হরফে লেখা একটু ছেঁড়া কাগজ। বাতাসের তাড়া খেয়েই বোধ হয় সেখানা বাইরে থেকে আমার ঘরে ঢুকে পড়ে লুটোচ্চে একেবারে আমার পায়ের কাছটিতে। সবুজ কালীতে

পরিষ্কার বাংলা হাতের লেখা দেখে আমি ঠিক কি ভেবে যে সেই কাগজখানা কুড়িয়ে নিলুম, জানিনে, কিন্তু সেখানা হাতে করে' চোখের সামনে ধরতেই মনে আমার বেশ একটু কৌতূহল জেগে উঠলো। পড়ে বুঝলুম, সেটা কোন অপরিচিত জনের ডায়ারীর এক উনিশে ভাদ্দরে লেখা পাতার একটু ছিন্ন অংশ। লাইন-টানা খাতার বাঁ-ধারে লাল বর্ডার-দেওয়া কাগজে সবুজ কালীতে খুব যত্নের সঙ্গে তার অক্ষরগুলি সব সাজিয়ে দেওয়া হয়েচে। কিন্তু আমি ভাবছিলুম কি, একে এর দরদীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে' অনাদরের নিষ্ঠুর আঘাত হেনে এমন শ্রী-সৌষ্ঠবহীন অবস্থায় এখানে এনে ফেল্‌ল কে? যার বুকের ভাষা এর গায়ে সবুজ কালীর আখরে গাঁথা হয়ে রয়েচে, সে মানুষ আজ কোথায়? সে কি এখন এই মাটির জগতে জীবন্ত প্রাণের মেলায় জেগে নেই—আনন্দের বিষাদের নিশ্বাস সে কি ত্যাগ করচে না! কোন্ সে ভাদ্দর—অতীত মহাবৃক্ষের কোন্ নিভৃত শাখা ছুঁয়ে সে আছে! তার সন্ধান কি কেউ বলে দিতে পারে না! তারিখটা উনিশে—আঠারোর দিন-রাত্তিরের সমস্ত ইতিহাস সম্পূর্ণ জানা থাকলেও উনিশের সেই একটি দিনের গোপনতাকে বুঝে ওঠা যায় না—অনন্ত কালের কোন উনিশ দিয়েই নয়। সে দিনটা তার কাছে কার স্মৃতি, কি বেদনা, কোন্ বিচিত্র আশা-আনন্দের পসরা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, কিসের প্রেরণা সেই মুহূর্ত্তগুলিতে এই সরল অকপট আত্মপ্রকাশকে সম্ভব করে তুলেছিল, কিছুতেই কি তা সহজ-বোধ্য হবে না! সে কি চিরকালই প্রচ্ছন্ন থাকবে, এম্‌নি এক অনির্দ্দিষ্ট, দুর্ভেদ্য রহস্যের তিমির অবগুণ্ঠনে! এও তো বড় কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়—এই ছেঁড়া পাতাটা আমার এখানে এই বিজন ঘরের মধ্যে এল কোথা হতে? কারণ, আমি যে ভাল রকম জানি, যারা তাদের জীবনের প্রতি দিবসের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে' রাখে, তারা তাদের সেই লিপিসমষ্টি খুব সন্তর্পণে রেখে দেয় নিজেদের কাছে-কাছে, সেগুলিকে হাত ছাড়া হতে দেয় না কোন মতেই! তাই যদি হয়, তবে যে ব্যক্তি এই কাগজের ওপর তার জীবনের কোন বিশেষ কালের হাসি কান্নার, সুখ-দুঃখের ছবি অল্প কয়টা রেখায় ফুটিয়ে তুলেচে, হয় সে আজ বেঁচে নেই, নয় তার আলো-আঁধারের জগতে হৃদয়-লীলার প্রমাণ-পুঁথি যেমন করেই হোক, সে হারিয়ে ফেলেচে চিরদিনের জন্য!

অজানা, অচেনা মানুষটির এই বিষম ক্ষতির দুঃখে মনটা আমার ধীরে ধীরে এক গভীর সহানুভূতির সজল করুণ স্পর্শে ভিজে উঠলো! আমি ভাবতে সুরু করলুম—আহা, সে তার এতখানি দরদের জিনিসটি হারিয়ে বসলো, কিন্তু তার সেই হারানোর এই বেদনা-চিহ্ন আমার এখানে এসে পৌছুলো কোন্ উপায়ে? হয়তো ঠিক এই রকমটিই ঘটেছিল; হয়তো কেন, আমার মনে হয় নিশ্চয়ই,—এ ছাড়া আর কিই বা সম্ভব হতে পারে—কোন শিশি-বোতল-বিক্রেতা এক প্রভাত-বেলায় তার সহস্র বিচিত্র আবিষ্কারের সঙ্গে অজানা মানুষটির সেই ডায়রীখানিও তার বাড়ীর ছোকরা চাকরের সাহায্যে উদ্ধার করে' আপনার সুবিপুল ছালার মধ্যে ভরে' বিক্রির জন্যে তাকে নিয়ে গিয়েছিল এক বেনে-মশলার দোকানে। সেখানে বোধ হয়, বেচারা ডায়ারীর আশ্রয় জুটেছিল কাঠের আরশুলা-ভরা তাকের এক অন্ধকার কোণে! অতঃপর একদিন সেই বণিকের পুত্র খুব সম্ভব ধনের আশাতেই নির্ব্বিকার মহাকালের সতীর দেহ-বিচ্ছেদের মতোই সেই খাতার এক-একখানি পাতা ছিঁড়ে তার শতসহস্র খরিদ্দারকে বিতরণ করে দিলে। এম্‌নি করেই হয়তো তার এক ছিন্ন পৃষ্ঠা এসে পড়েচে আমাদের এই কুটীরে...

আমি আবার সেই প্রহেলিকাময় জীবন-গাথার আব্‌ছা সুর-ইঙ্গিতগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলাম। দেখে আমার মনে হলো, একটা হতাশা ভরা, যাতনা-ক্ষীণ বুকের সবুজ-ব্যথা সবুজ অক্ষরের রূপ ধরে যেন সেই কাগজখানার উপর ছড়িয়ে রয়েচে। কি যে লেখা হয়েচে, অর্থ তার সম্পূর্ণ বোধগম্য হয় না—কোণ-ছেঁড়া পাতার ভাবটা একটু অর্থ-জটিল প্রলাপের মতোই বোধ হচ্ছিল। ঠিক এই কয়টা কথারই আঁচড় তার উপর কে টেনে দিয়েছিল—

"১৯ ভাদ্র—

"আজ সারা দিনটাই কেটেচে একটা নির্জ্জীব,...
কতকগুলো অসংলগ্ন চিন্তার আবর্ত্তে পড়ে...

শরতের সোনার দিনে তরুণ বয়সে...
কি কারু সাজে? আনন্দ-সিন্ধুর...
আজ এমন করে' আমার চোখের সামনে...
বসে বসে ভাবচি! 'পেলুম না,'...
জীবনের সকল দিক দিয়ে...
মুকুল! মুকুল! তোমায় আমি...
দুর্নিবার ক্ষোভ মাথা কুটে মরচে"

উনিশে ভাদ্দর! হ্যাঁ, উনিশে ভাদ্দরে একটা নাম-হারা বারেই দেখচি এগুলো লেখা। তবু, কি বার ছিল সে দিন—বারের নামটাই বা সে এমন অনুল্লেখ রাখলে কেন? এই 'কেন'র কারণ নির্ণয় করতে আমার সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করলুম। ক্রমেই, ভাবার আতিশয্যে মগ্ন হয়ে গিয়ে আমার মনে হতে লাগলো যেন এই কথাগুলি কোন্ সুদূর অতীতে আমিই লিখেছিলুম কাকে উদ্দেশ করে—অযত্ন-অবহেলার ফাঁকে মলিন বিধ্বস্ত মূর্ত্তিতে হঠাৎ সে আজ আমার চোখের সামনে এসে পড়েচে! যাই হোক, এ সম্বন্ধে আমার অনুমান-ধারণার আর অন্ত ছিল না। কিছু সময় কেটে যেতে কেমন আমার মনে হলো, তাইতো, বারের নামটা লেখারই বা তার কি প্রয়োজন ছিল? এই কাগজের বাঁ ধারটিতে যখন সে উনিশে ভাদ্দর লেখবার জন্যে কর স্থাপন করলে, তখনি তো তার সারা বুকটাকে দুলিয়ে দিয়ে এই সহজ কঠিন চেতনটা ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইল—কাল আঠারোর পর আজ এই উনিশে! তার কাছে সে দিনটা যেন মাসের গ্রন্থিচ্যুত একটা স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন কাল-বিন্দু! তাই সে আর লেখেনি বারের নামটা! উনিশে ভাদ্দর লিখেই সে তারিখের বার, ঘণ্টা, মুহূর্ত্ত সব কিছুকেই সে জড়িয়ে নিলে, সেই একটি ইঙ্গিতের সাহায্যে!

তারপর ডায়ারীটি আরম্ভ হয়েচে এই কথাগুলি দিয়ে—"আজ সারা দিনটাই কেটেচে একটা নির্জ্জীব—।' নির্জ্জীব কেন? কেন আর! এ তো বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে,—প্রাণশক্তির মূলই যে তার আজ ছিন্ন হয়ে গেছে! একটা গভীর বিষণ্ণতায় জীবন তো ভরে' উঠবেই, এ আর এমন আশ্চর্য্য কথা কি! দিশেহারা সে—তার পক্ষে কতকগুলো অসংলগ্ন চিন্তার আবর্ত্তে পড়ে' লক্ষ্যহীন ভাবে ভাসা ছাড়া আর কোন পথ মুক্ত থাকতে পারে! 'শরতের সোনার দিনে তরুণ বয়সে' অশ্রুর শ্রাবণ-ধারায় ব্যথার দেবতার তর্পণ 'কি কারু সাজে'! সে কথা সত্যি, কারু সাজে না বটে,কিন্তু তার একলার জীবনে এই সহজ সত্যটাও এমন নির্দ্দয়ভাবে মিথ্যা হয়ে গেল তো! বিভাষের সুর ধরে পূরবীতেই তার বুকের গানকে শেষ করতে হলো না কি! হায়, তাও আবার এমনি অভাবিতের মতো! 'আনন্দ-সিন্ধুর'—উপকূলে দাঁড়িয়ে? না না, আমি ভুল করচি। এর অর্থ বোধ হয় তা নয়, একে বুঝে ওঠা যাবে না—এ দেখচি আরেকটি নূতন রহস্য-কাণ্ডকার সমাবেশ! যাক্, পরের ছত্রে কি লিখেচে সে—'এমন করে আজ আমার চোখের সামনে'—ফুটে উঠ্‌ল! সে আবার কি—নিশ্চয়ই তার সম্বন্ধে ভুল বোঝার একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ! কি অপরাধ করেছিল সে যার জন্য তাকে নিরর্থক এতখানি দোষী করে' তোলা—কপালের দুটো-পাশ দু-হাতে চেপে এই কথাটাই সে 'বসে বসে ভাবছিল' বারে-বারে! এতখানি অবিশ্বাস সে ধারণাই করতে পারেনি—এ যেন নিশীথ রাতের স্তব্ধ নিবিড় ঘুমের মাঝে ধরিত্রীর হৃৎ-কম্পনের চঞ্চলতার স্বপ্ন ভেঙ্গে হঠাৎ জেগে ওঠা! 'পেলুম না'—। হায়, পেল না সে! তার এই না পাওয়ার একটি সুর জীবনের অপর সুরগুলিকে এমনি অবসন্ন করে দিলে যে, সে ভাবলে, ব্যর্থ হয়ে গেলুম, জীবনের সকল দিক্ দিয়ে! উঃ, এই সুরটার দহন, তা'হলে না জানি কত তীব্র, কত মর্ম্মান্তিক! ওগো বেদনা-নিপীড়িত তরুণ, এগুলিও যে তোমায় নীরবে বহন করতে হয়েছিল সেই দিনের সমস্ত মুহূর্ত্ত, ঘণ্টা, প্রহরের অলস গতির মধ্য দিয়ে!

একটি নামের সে উল্লেখ করেচে, এখানে। তার সম্বন্ধে লিখেচে—'মুকুল, মুকুল তোমায় আমি'—। হায়, এখানেও সেই ইসারা, যুগ-যুগের সেই চিরন্তন সুরের রেশটি! সেই অনুরাগের আনন্দে অধীর হয়ে ওঠা অথবা বিরাগের বিষাদে নুয়ে পড়া—তাদেরই একটি। তবে কি যতদিন এই আকর্ষণ থাকবে, দুটি প্রাণীর পরস্পরকে ভুল-বোঝার ইতিহাসও কি গড়ে উঠবে এমনি অবিচ্ছিন্নভাবে?

মুকুল! মুকুল! বেশ মিঠে নামটি। 'তোমায় আমি—।' হ্যাঁ, অনেকটা বুঝতে পারচি, বন্ধু! তুমি যে অনন্যনিষ্ঠ ছিলে, তোমার বুকটা এতকাল একটা আগুন-ভরা ভরাট ছিল, তুমি যে—হ্যাঁ, সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিচ্ছি তোমার এই মর্ম্মভেদী বিলাপ-কাকলী। কেন সে ভুল বুঝলে তোমায়, অবহেলার আঘাত দিয়ে তোমার বুকের খুসীকে চুরমার করে দিলে, এই না তোমার দুঃখ! স্মৃতির কপাটের ফাঁক দিয়ে অনেক কথাই স্পষ্ট প্রকাশ হয়ে গিয়ে তোমার মনকে বিচলিত করে' তুলচে! প্রথম কবে মুকুল তোমার কাছটিতে বসে তার শুভ্র নিটোল বাহুদুটি তোমার হাতের পরে' রেখেছিল—সে কোন্ নিভৃত নির্জ্জন গন্ধ-অলস সন্ধ্যায়, কেমন করে' সে চেয়েছিল সূর্য্যমুখীর আকাঙ্ক্ষা-ব্যাকুল পলক-হারা নিবিড় দৃষ্টি দিয়ে তোমার মুখের পানে, কতবার হেসেছিল অকারণে, কি গোপন কথা বলেছিল তোমায়, কি বলতে গিয়েছিল অথচ বলে উঠতে পারেনি—সেগুলো খুব বেশী করে মনে পড়চে না! কিন্তু সে কোথায়, কবে, কখন? সেদিন কি তোমায় একা একা প্রতীক্ষায় থাকতে হয়েছিল বহুক্ষণ ধরে? তারপর বুঝি তুমি তার দেখা পেলে শালবনের ছায়া-পথে একটা মহুয়া গাছের ফাঁক দিয়ে—তোমার সামনের রাস্তাটা সেখানে একটা নগ্ন কঠিন বাহু মেলে দিয়ে পাশের ছোট নদীটুকু ডিঙিয়ে দূরের গুল্ম-বহুল পাহাড়টাকে ছুঁতে চলেচে, ঠিক সেই জায়গাটিতে! তুমি তখন বসেছিলে একটা কাল পাথরের ওপরে আতাগাছে হেলান দিয়ে। দেখছিলে তোমার সমগ্র দৃষ্টিশক্তিকে উন্মুখ করে' মুকুলের পথ-চলার চারু ভঙ্গীটি! মুকুল যতই এগিয়ে আস্‌ছিল, দৃষ্টি তোমার ততই ঝাপ্‌সা, বুকটা ততই দুরু দুরু করে' উঠছিল! তুমি ঠিক ঠাহর করতে পারছিলে না, মুকুল তোমার সামনে এগিয়ে আসচে, না, সে সরে যাচ্চে পিছনে! শুধু চোখে পড়ছিল মুকুলের মুকুলেরই মতো মুখখানি, তার ত্রস্ত ব্যাকুল চোখ দুটি'র পর! ব্যস্ত হয়ে সে চাইছিল চারপাশে—তোমায় সে দেখতে পাচ্ছিল না কি না! গোটা কতক শালের চারা কেবল তোমায় আড়াল করে দিচ্ছিল তার দৃষ্টির সাম্‌নে থেকে। খুব নিকটে আস্‌তেই সে, তুমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলে অন্তরাল থেকে, মুকুলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে। হঠাৎ তোমাকে এত কাছে পেয়ে সে চম্‌কে উঠ্‌লো। তুমি হাস্‌লে, মুকুলও হাস্‌লো। দুজনেই নত হয়ে অভিবাদন জানালে দুজনকে। সন্ধ্যার আকাশে তখন জ্যোৎস্নার রূপালী আভাষ ফুটে উঠলো। চোখের সামনের কালো পর্দ্দা একটু একটু করে' গাছের মাথা, বাংলোর ছাদ, টেলিগ্রাফের তারের উপর থেকে সরে যেতে লাগলো, তোমরা হয়তো ভাবলে অনুরাগের জ্যোৎস্নায় এম্নি করে' তোমাদের বুকের নিভৃত অংশগুলিও কি সুপরিচিত হয়ে উঠবে না দুজনের কাছে! তখন তুমি বলে উঠলে—চারিদিক আজ আলোয় হাসছে মুকুল! চল, আমরা গিয়ে বসি নদীর কিনারে, ওই পাথরটার উপরে। সে তার একরাশ চুলে বোঝাই মাথাটা অল্প একটু হেলিয়ে জানালে—আচ্ছা, চলুন। তখন তোমরা গিয়ে বসলে সেই জায়গাটায়! বসার কিছু পরেই হঠাৎ তোমাদের মনে হলো, যেন যৌবনের একটা রঙীন স্বপ্ন তোমাদের চারপাশে জেগে উঠেচে! এক বৃক্ষে দুটি ফুলের মতো তোমরা বুঝি এইমাত্র এখানে এম্নি পূর্ণভাবেই বিকশিত হয়ে উঠ্‌লে—সংসার সমাজ দেশ কাল এর পিছনে যেন মোটেই নেই! যে-জীবন সংসারের সবার কাছে শিকড় নামিয়ে বেঁচে আছে,—এ যেন সে জীবন নয়,—একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব!

সময় ছুটে পালিয়ে যেতে লাগলো ব্যস্ত-পায়ে! দুটিতে পাশাপাশি বসে আছো, অথচ কেউ কথা আরম্ভ করছ না। বুকের ভিতরটায় দুজনের সমান তোলপাড় করচে, অধীর হয়ে উঠেচ দুজনেই, একে অপরের মুখের বিচিত্র বিস্ময়ের বাণী শোনার জন্য—কিন্তু লাজুক ঠোঁটদুটি যে সে পথে এতখানি অন্তরায় হয়ে উঠবে তা কে জানতো! যাই হোক, তুমি আর মৌন থাকতে পারলে না। মুকুলের ডান হাতখানি তোমার করতলে রেখে সামান্য একটু চাপ দিয়ে ধরা গলায় বল্লে—মুকুল! মুকুল মুখ তুলে তোমার চোখের ওপর চোখ রেখে ধীরে বল্লে—কি? সৃষ্টির নব উষায় আদিম মানবও বুঝি তার বুকের অস্থি দিয়ে গড়া প্রণয়িনীর পাশে বসে এমনি ব্যাকুলতা নিয়ে প্রণয়-সম্ভাষণ

করেছিল আর তার এম্নি সুন্দর অর্থপূর্ণ প্রতিদানও বুঝি সে ফিরিয়ে পেয়েছিল! তুমি আবার বল্লে,—মুকুল, তুমি —কি বল্‌তে যাচ্ছিলে, শেষ করতে পারলে না, থেমে গেলে। মুকুল তোমার দিকে চেয়েই ছিল, তোমার হঠাৎ-থেমে-যাওয়া কথাটা শুনে চোখে মুখে একটা পরিপূর্ণ বিস্ময়কে সে ফুটিয়ে তুল্লে! নদীর কোলে পা ঝুলিয়ে সে বসেছিল। শীতল জলের ছোঁয়াচ হঠাৎ তার পায়ে লাগ্‌তেই বুক তার শিরশির করে উঠলো! বেণুপাতার মৃদু ঝিরঝিরানির মতো অল্প একটু হেসে সে বল্লে—আমি কি—বল্লেন না কেন? তুমি আগের কথাটা ভুলে গিয়ে বলে ফেল্লে—মুকুল, তোমার গান আমার বড় ভাল লাগে। তোমার সেই—'গানের সুরের আসনখানি' গানটা! যখনি তোমার গলার মিষ্টি সুর আমার কানে এসে বাজে—বুকের মানুষটা আমার উতলা নৃত্যপর হয়ে ওঠে! আমি আপনাকে ভুলে গিয়ে তোমার মুখের গান শুন্‌তে থাকি অবাক্ হয়ে!

তোমার কাছে এতখানি অযাচিত প্রশংসা অর্জ্জন করে মুকুলের নমিত চোখের দুই পাশ ব্রীড়ার আভাষে রাঙিয়ে উঠলো! সে তার টল্‌টলে ঠোঁটের কোণ দুটি ঈষৎ বিস্তৃত করে' তোমার চোখে চমক লাগিয়ে বল্লে—কেন, আপনার বাঁশী? পুলক-শিহরণে দেহ তোমার দুলে উঠ্‌লো, সোহাগ-কাঁপা গলায় তুমি বল্লে, —মুকুল, তোমায়—। মন্ত্রমুগ্ধের মতো মুকুলের উৎসুক আঁখি দুটি তোমার মুখের কাছে অল্প করে এল, গলার স্বরে পূর্ণ আবেগ জানিয়ে সে শুধোলে,—কি আমায়—? তুমি হয়তো বলতে যাচ্ছিলে—মুকুল, তোমায় এত কাছে পেয়ে নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেচি মুকুল! শুধু মনে হচ্ছে—তুমি আছ আমার বুকের কাছে, আমার পাশে বসে নিরালা মাঠের নদীর কোল ঘেঁসে! চোখ মেলতেই দেখতে পাচ্ছি—তোমার মহিমা-সুন্দর দিঠি, ললাটের সীমা-রেখায় চূর্ণ কুন্তলের আবাক-স্বচ্ছন্দ খেলা, ভ্রূ-যুগের মাঝে আব্‌ছা সিন্দুর-বিন্দুটি! কাণে শুনে যাচ্ছি —তোমার কথা-গানের সুর, জীবন-স্পন্দনের পরিমিত শব্দ! অনুভব করচি আমার শিরায়-উপশিরায় তোমার এলায়িত বাহুর মৃদু মধুর উত্তাপ! যাক্ সে কথাগুলো যখন লজ্জার পাথর চাপা পড়েই রইল, তুমি অন্য কিছু বলার না পেয়ে একটা অতি-সাধারণ কথার অবতারণা কল্লে, বল্লে—তোমায় 'ফুলের ফসল' পড়তে দিয়েছিলুম মুকুল! পড়ে কেমন লাগলো তোমার, সে বল্লে তোমার মুঠির মধ্যে তার হাতটা অল্প নড়িয়ে হাতের পরশকে তোমার একটু বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে'—ভালই লাগচে আমার পড়া শেষ হয়ে গেছে। আপনি সত্যেন্দ্রনাথের আর একখানা বই আমায় দেবেন, কেমন? নির্ব্বাক হয়ে তুমি তাকিয়ে রইলে মুকুলের মুখের দিকে! কাণে তোমার ক্রমাগত ধ্বনিত হচ্ছিল তার মধুর অনুরোধের শেষ কথাগুলি—কেমন! কেমন! দেবেন, কেমন? তখন মাথা নেড়ে স্মিত মুখে তুমি বল্লে—হ্যাঁ, দেব তোমায়!

বেড়ানোর সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ—আর বাইরে আকাশটা, বিশেষ এই বুনো দেশে,—সমীচীন নয় বুঝে মুকুল বল্লে—চলুন, এবার উঠি আমরা। অনেকখানি রাত হয়ে গেছে!

কথা শুনে আল্‌গাভাবে তার হাতটা ধরে তুমি উঠে দাঁড়ালে। তার পর মাঠটুকু পার হয়ে তোমরা বাংলোর পথে এসে পড়লে। পুর্ণিমার চাঁদ তখন আকাশের প্রায় মাঝামাঝি। তোমরা চলতে লাগলে পাশাপাশি শ্লথ বাহু-মিলনে। শাল গাছের ফাঁক দিয়ে মিষ্টি আলোর ধারা ঝরে পড়তে লাগলো তোমাদের গায়ে-মুখে। তাই দেখে হাসলে। উলু ঘাসের দোলনে তোমাদের পা ছুঁয়ে যেতেই শিউরে তোমরা হেসে উঠলে। আবার হাসলে, এই ভেবে—কেমন চলেচ দুটিতে নির্জ্জন বন-পথ ধরে পাশাপাশি! তোমরা যে দুটি অনুরাগ-বিহ্বল তরুণ-তরুণী, এই কথাটা যেম্নি ধরা পড়ে গেল তোমাদের মনের পটে, অম্নি হাসি এল তোমাদের মুখে! পথে চলতে চলতে ইউক্যালিপটস্ গাছের ফিকে ছায়ায় একটিবার থমকে দাঁড়িয়ে দুজনে চোখো-চোখি হতেই হঠাৎ অকারণ হেসে ফেল্লে। অবশেষে তোমরা এসে পৌঁছলে তোমাদের ঠিকানায়। পৌঁছে মৌন অভ্যর্থনা-উন্মুখ লতা-বেষ্টিত পুষ্প-সমৃদ্ধ ফটক দুটির সুমুখে থেমে গেলে দুজনে।

তোমার মুঠি শিথিল হয়ে এল অল্পে অল্পে, মুকুলের বাহুও এলিয়ে পড়লো তার দেহের 'পরে। তুমি মুখে জোর করে' হাসি টেনে বল্লে—মুকুল, তোমায় আমার বিদায়—নমস্কার! কালও বোধ হয় তোমার দেখা পাব আজকার মতো সময়েই—

স্মিত হাস্যে প্রতি নমস্কার জানিয়ে মুকুল শেষবারের মতো তোমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্লে,—হ্যাঁ পাবেন! তুমি হয়তো শুনতে পাওনি, মুকুল তার কথাটার পুনরাবৃত্তি করেছিলো অতি অস্ফুট স্বরে—হ্যাঁ পাবে, পাবে তুমি! তার পর তোমরা চলে গেলে মন্থর পদক্ষেপে নিজের নিজের বাংলোর ভিতরে। চোখের আড়াল হতেই কি জানি এত হাসির পরেও একটা গোপন ব্যথা একই সময়ে বুক গুলিকে তোমাদের দুলিয়ে দিয়ে গেল .....

কে? পিয়ন? কই দেখি, হ্যাঁ, এ চিঠি আমারই!...

এ কি! এ কার কথা আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ভেবে চলেছি, কার সবুজ কাহিনী...! কাকে সামনে রেখে এই স্বপ্নের জাল বুনে যাচ্ছি অবহেলে? থাক থাক, সে কথা। তবে তো দেখছি এই অজ্ঞাত জীবনের করুণ ইসারাগুলি প্রাণকে আমার খুব বেশী করেই স্পর্শ করেচে! হায়, যৌবনের রীতিই বুঝি এই, এইটুকুই তার বিশেষত্ব! কবি ইয়েট্‌সের কথা আমার স্মরণে বাজচে'Youth must sigh with youth'। তরুণই পারে তরুণ বুকের দরদী হতে। জীবনের খাতায় যৌবনের পাতা যাদের কালের উই কাটতে আরম্ভ করেচে, রক্ত যাদের জমাট হিম হয়ে গেচে, পারে না কেবল তারাই। তারা যে দেখবে একে শুধু একটা তুচ্ছ অলীক স্বপ্নস্থায়ী মায়ার নাম দিয়ে। কিন্তু তা'হলেও, এতে পদে পদে 'দুনিবার ক্ষোভে মাথা কুটে মরলেও' তরুণ হাল ছেড়ে দেবে না কোন মতেই—ইয়েট্‌সেরই কথায়—

"The young must sigh through many a dream and hope."

তাই আমি চাই মিলনকে—চোখের মনের ক্ষুধা মিটিয়ে এক পূর্ণ মিলন, যদিও কিছুই জানিনে বিশে ভাদ্দরে ঠিক কি ঘটেছিল! হয়তো এ-জীবনে আর একটিবারও চোখো-চোখি হয়নি তারা, হয়তো একজন চোখের জলে আর দীর্ঘশ্বাসে তার দীর্ঘ দিন-রাত্রিগুলিকে বেদনাময় করিয়া তুলেছিল! তা হোক, তবুও এখানে মিলনকে আমি স্বীকার করে নিচ্ছি পূর্ণ বিশ্বাসে! এর জন্য যদি মিথ্যাকে গ্রহণ করার অপরাধও আমার হয়, হোক, তাতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই। আমার সত্য-বিচ্যুতির উপযুক্ত শাস্তিকেও আমি বহন করতে প্রস্তুত রইলাম, সাগ্রহে, সানন্দে!

শ্রীবিনয় চক্রবর্ত্তী।

সঙ্কলন

কর্পূরের কথা

মানব-দেহের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের উপর কর্পূরের বিশেষ ক্রিয়া আছে। অল্প মাত্রায় কর্পূর সেবন করিলে পাকস্থলী সকল প্রসারিত হয়। ঐ সঙ্গে সঙ্গে পাক-রসও (gastric juice) অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইতে থাকে এবং পাকাশয়ের ক্রিমিগতি (Peristaltic motion) বৃদ্ধি পায়। এজন্য ডাক্তারেরা ইহাকে আগ্নেয় ও বায়ুনাশক বলিয়া মনে করেন। ইহা দ্বারা আমাদের হৃৎপিণ্ড যন্ত্রটীও অল্পাধিক উত্তেজিত হয়; শ্বাসনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে (mucous membrane) রক্তাধিক্য হইতে দেখা যায় এবং তথাকার স্রাব-ক্রিয়াও বর্দ্ধিত হয়।

কাহারো কাহারো ৩-৪ রতি কর্পূর সেবন করিলেই সমস্ত শরীর উত্তেজিত হয় এবং মনে স্ফূর্ত্তি আসে। আবার কেহ কেহ ঐ মাত্রাতেই দেহের সুস্থতা ও স্থৈর্য্য অনুভব করেন।

ইহার স্বেদজনক ক্রিয়াও অনেক সময় পরিলক্ষিত হয়। সেবনের পর বিলক্ষণ ঘর্ম্ম হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক তাপও কমিয়া যায়। সেবনের পর ইহা মূত্রগ্রন্থি দ্বারা "ক্যাম্ফোগ্লাইকিউরিক এসিড" রূপে বহির্গত হয়।

অধিক মাত্রায় কর্পূর সেবনের পর বমন না হইলে মস্তকে ভার বোধ, শিরোঘূর্ণন, প্রলাপ, মূর্চ্ছা ও আক্ষেপাদি (convulsions)—বিষ-লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। একবার একটী শিশু ২০ গ্রেণ অর্থাৎ

১০ রতি পরিমাণ কপূর্র সেবন করিয়া বিষাক্ত হইয়া মারা পড়িয়াছিল। কিছুদিন গত হইল "ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে" একটী রোগিনীর কথা লিখিত হইয়াছিল। এই রোগিনী কপূর্রবাসিত জল পান করিয়া চৈতন্যহারা হইয়া পড়েন; তাঁহার অবস্থা যেরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে জীবনের আশা ছিল না বলিলেই চলে।

রোগিনীর স্বামী কপূর্র-বাসিত জল পান করিতে বড় ভালবাসিতেন। সুতরাং পত্নীকে জলে কপূর্র দিবার জন্য আদেশ করেন। স্ত্রীও স্বামীর আজ্ঞামত জলপূর্ণ কলসীতে কিঞ্চিৎ কপূর্র দিয়া রাখেন; কিন্তু স্বামী মহাশয় জলপান কালে ঐ জলে কপূর্রের আশানুরূপ গন্ধ না পাওয়ায় পত্নীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন এবং জলে অধিক পরিমাণে কপূর্র দিবার জন্য আদেশ করিলেন। এই ঘটনার পরে ঐদিন বৈকালে রোগিনী বাজার হইতে কপূর্র আনাইয়া এক কলসী পানীয় জলে প্রায় অর্দ্ধ আউন্স কপূর্র দিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই সময় গ্রীষ্মকাল। রোগিনী পিপাসার্ত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঐ কপূর্র-বাসিত জল পান করিতে থাকেন। রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় তিনি অত্যন্ত গা বমি বমি ভাব অনুভব করেন; কিন্তু তখনও তাঁহার স্বামী ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। রাত্রি ১ টার সময় রোগিনী অত্যন্ত অস্থির হইয়া শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং বাহিরে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হঠাৎ তাঁহার স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। তিনি দেখিলেন, দরজা খোলা রহিয়াছে, তথাচ তাঁহার স্ত্রী বাহিরে যাইবার জন্য দ্বার খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রোগিনী পাগলের মত হাসিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, রোগিনীর পদদ্বয়ও ঐ সঙ্গে টলিতেছে। তখন বিপদাশঙ্কা করিয়া ডাক্তার ডাকা হইল।

পরদিনে রোগিনীর অবস্থা খুবই মন্দ হইয়া পড়িল। সর্ব্বক্ষণ ভ্রান্তি ও প্রলাপ দেখা গেল। রোগিনী কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। তৃতীয় দিনে প্রাতঃকালে অবস্থা কিছু ভাল বোধ হইল বটে, কিন্তু অপরাহ্ণ ৫ টার সময় আবার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। রোগিনীর চোয়াল আবদ্ধ হইয়া গেল; তিনি কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না, হাত-পা অবশ হইয়া পড়িল এবং শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল। চতুর্থ দিবসও ঐরূপ খারাপ অবস্থায় কাটিব। পঞ্চম দিনে অবস্থার কিছু উন্নতি বুঝা গেল এবং তাহার পর আরও তিন চারি দিনে রোগিনী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন।

এই রোগিনীর চিকিৎসক অনুমান করেন যে ইনি এক ড্রাম আন্দাজ কপূর্র জলের সহিত উদরস্থ করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ইনি যথাকালে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই কোন মতে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

আমাদের মধ্যে কপূর্রের বিষক্রিয়ার কথা অনেকেই অবগত নহেন; অথচ আমরা সর্ব্বদাই নানাভাবে কপূর্র সেবন করিয়া থাকি। ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য-সমচার, কার্ত্তিক, ১৩৩০

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

— —

কামাখ্যা দেবী

কামরূপং মহাপীঠং কামাখ্যা যত্র তিষ্ঠতি।

(গরুড়পুরাণ, ৮১।১৬)

অর্থাৎ "কামরূপ মহাপীঠ", সেখানে ৺কামাখ্যা দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। কামেশ্বর ও কামাখ্যা দেবী উচ্চ মঞ্চোপরি পশ্চিম মুখ করিয়া বিরাজমান। পীঠমালায় লিখিত আছে—"যোনি-পীঠং কামগিরৌ তত্র দেবতা," অর্থাৎ কামগিরিতে যোনি পতিত হওয়ায় সেইস্থানে ৺কামাখ্যা দেবী আছেন। এই কামাখ্যা দেবী এক্ষণে ধাতুময় বিগ্রহ। কামাখ্যা দেবী সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে :—

"ভগবানুবাচ—

কামার্থমাগতা যস্মাম্ময়াসার্দ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকুটে রহোগতা॥
কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে॥"

অর্থাৎ ভগবান বলিতেছেন—এই মহাদেবী অভিলাষ-পূরণের জন্য আমার সহিত নীলকুটে আগমন করায় কামাখ্যা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামাঙ্গদায়িনী ও কামাঙ্গনাশিনী হওয়ায় কামাখ্যা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

৺কামাখ্যা দেবীর মন্দির

কামাখ্যা পাহাড়ের উপরিভাগে কামাখ্যাদেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির। কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের পূর্ব্বদিকে কেদারেশ্বরের মন্দির বর্ত্তমান। ৺কামাখ্যা মন্দিরাভ্যন্তরস্থ দেয়ালের গায়ে সুরক্ষিত প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ আছে :—

"লোকানুগ্রহকারকঃ করুণয়া পার্থো ধনুর্ব্বিদ্যয়া
দানেনাপি দধীচিকর্ণসদৃশো মর্য্যাদয়াম্ভোনিধিঃ।
নানাশাস্ত্রবিচারচারুচরিতঃ কন্দর্পরূপোজ্জ্বলঃ
কামাখ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবো নৃপঃ।
প্রাসাদমদ্রিদুহিতুশ্চরণারবিন্দ
ভক্ত্যাকরোদনুজো বরনীলশৈলে।
শ্রীশুক্লদেব ইমমুল্লসিতোপলেন
শাকে তুরঙ্গগজবেদশশাঙ্কসংখ্যে॥"

—ইত্যাদি

অর্থাৎ—যিনি করুণা বিতরণে লোকবান্ধব সূর্য্যের সদৃশ,—ধনুর্ব্বিদ্যায় পার্থস্বরূপ, নানা শাস্ত্রালোচনায় যাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল, রূপে কন্দর্পসদৃশ সেই কামাখ্যাদেবীর চরণসেবক শ্রীমল্লদেব নামক নরপতি জয়যুক্ত হউন।

তাঁহার অনুজ শ্রীশুক্লদেব ১৪৮৭ শকাব্দে মনোরম নীলশৈলে উৎকৃষ্ট প্রস্তর দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন :—ইত্যাদি।

ইহার দ্বারা বুঝা যায় ১৪৮৭ শকে বা ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে শুক্লদেব (শুক্লধ্বজ) নীলশৈলে ৺কামাখ্যা দেবীর এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। প্রবাদ আছে—কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের প্রত্যেক ইট এক রতি স্বর্ণসহ গাঁথা হইয়াছিল। এই শুক্লদেব কোচরাজ মল্লধ্বজ বা নরনারায়ণের অনুজ। নরনারায়ণ কোচবংশের আদি রাজা বিশু বা বিশ্বসিংহর পুত্র। বিশ্বসিংহ হারিয়া মণ্ডল নামক জনৈক "মেছ" সর্দ্দারের দ্বিতীয়া কন্যা "হীরা"র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যোগিনী তন্ত্রে বিশ্বসিংহের নাম পাওয়া যায়। কোচরাজ নরনারায়ণ মোগলকুল-তিলক জেলালুদ্দিন মহম্মদ আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। শ্রীযুক্ত গেইট বাহাদুর আসামের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "কোচরাজ নরনারায়ণ ১৫৪০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু স্বর্গীয় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর ও মিঃ রবিন্‌সনের মতে তিনি ১৫২৮ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৫৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

আসাম-বুরঞ্জী পাঠে অবগত হওয়া যায়, "মহারাজ নরনারায়ণের কামরূপে অধিকার প্রতিষ্ঠাকালে কালাপাহাড় নামক জনৈক হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী মুসলমান সেনাপতি ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে ৺কামাখ্যা দেবীর মন্দির বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ কালাপাহাড়ের প্রভাবে ভীত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। শুনা যায়—এই কালাপাহাড় কামরূপ অঞ্চলে পারাস্থঠার, পোড়াকুঠার, কালাস্থঠান ও কালযবন নামে আখ্যাত। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে মহারাজ নরনারায়ণ কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত এই মন্দিরের পুনঃসংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। ১৫৫৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে উহার কার্য্য সমাপ্ত হয়। নরনারায়ণের এই পুণ্যময় কার্য্যের জন্য তাঁহার একটী স্মৃতিস্মারক প্রস্তরমূর্ত্তি অদ্যাবধি মন্দিরের মধ্যে সংস্থাপিত আছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, "সুলেমান কারাণি ১৫৬৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৭২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন। কালাপাহাড় তাঁহার সেনানায়ক ছিলেন।" মুসলমান ইতিহাস রিয়াস্ উস্-সালাতিন অনুসারে সুলেমান কারাণি ১৫৬৮ খ্রীঃ অব্দে কোচবিহার আক্রমণ করেন।" তাহা হইলে ১৫৬৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে কালাপাহাড় কিরূপে ঐ মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন।

দেবীর প্রকৃত মন্দির ব্যতীত উহার সংলগ্ন আরও দুইটী নাটমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটীর নাম পঞ্চরত্ন আর অপরটীকে নবরত্ন বলিত। নবরত্ন একটী প্রকাণ্ড দালানের মত ছিল।

বিগত ১৩০৬ সালে দ্বারবঙ্গেশ্বর কামাখ্যা দেবীর মন্দির সংস্কার করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু কুচবিহারের তৎকালীন মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই।

ভুবনেশ্বরীর মন্দির—ভুবনেশ্বরীর মন্দিরটী ঠিক কামাখ্যা পাহাড়ের চূড়ার উপর অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা এই চূড়াকে ভুবনেশ্বরের পাহাড় বলেন। শুনা যায়—ভুবনেশ্বরের পাহাড় হইতে পুরাণ প্রসিদ্ধ উষা-নগরী (বর্ত্তমান তেজপুর) পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। এখান হইতে ব্রহ্মপুত্রের শোভা অনির্ব্বচনীয়। কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে ভুবনেশ্বরীর মন্দির প্রায় পাঁচ মিনিটের পথ। এই মন্দিরের সন্নিকটে একটী ক্ষুদ্র ঝরণা আছে; তাহা হইতে সুস্বাদু জল পাওয়া যায়।

কালিকাপুরাণে ভুবনেশ্বরীর উল্লেখ আছে :—

মহাগৌরী তুরা দেবী যোগিনী সিদ্ধরূপিণী।
সা ব্রহ্মপর্ব্বতে চাস্তে শিলারূপেণ চোর্দ্ধতঃ।
অতীব রূপসম্পন্না নাম্না সা ভুবনেশ্বরী।
যত্র ব্রহ্মা তু সংসক্তো ময়ি পর্ব্বতরূপিণি॥ ২৭

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ মহাগৌরী নামে সিদ্ধরূপিণী যে যোগিনী আছেন, তিনি ব্রহ্মপর্ব্বতের উর্দ্ধে শিলারূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি অতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী এবং ভুবনেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। যেখানে পর্ব্বত-রূপী আমাতে ব্রহ্মা সংসক্ত হইয়াছেন সেই স্থানেই তিনি অবস্থিত।

ভুবনেশ্বরীর মন্দিরটী ভূমিকম্পে ভূতলশায়ী হওয়ায় দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর আপন ব্যয়ে ইহা নূতন করিয়া দিয়াছেন।

ছত্রাকার মন্দির—গৌহাটী হইতে অল্প দূরে নবগ্রহ পাহাড়ের সন্নিকটে "ছত্রাকার" নামে একটী শৈল আছে। তথায় ছত্রাকার এবং মঙ্গলচণ্ডিকা বিদ্যমান। ছত্রাকার শৈলটী বড়ই মনোরম। এই শৈলোপরি অহমরাজ কমলেশ্বরের মন্ত্রী "কলিয়া ভ্রমরা"র আদেশে দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কর্ম্মনাশা—উমানন্দ দেবের মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে কর্ম্মনাশা নামে একটী শৈলশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডাগণ বলিয়া থাকেন, "যদ্যপি কেহ ঐ শৈলশৃঙ্গ দেখিতে পান তাহা হইলে ঐ দর্শনকারীর এখানকার যাবতীয় তীর্থফল নিষ্ফল হয়।"

উমানন্দ—অশ্বক্রান্তগয়া হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পাহাড়ের উপরিভাগেই "উমানন্দ" তীর্থ। গৌহাটিস্থ শুক্রেশ্বর ঘাট হইতে নৌকাযোগে ৩০।৩৫

মিনিটে সেখানে যাওয়া যায়। এই উমানন্দ প্রাচীন কালে বৃষধ্বজ নামে অভিহিত হইত। কথিত আছে, উমানন্দ দেব ললাটস্থ ভস্মের দ্বারা এখানে এই পাহাড়টী নির্ম্মাণ করিয়া পার্ব্বতীকে গীতা শ্রবণ করাইয়াছিলেন বলিয়া পুরাণশাস্ত্রে "ধর্ম্মমার্গ" ও তন্ত্রশাস্ত্রে "বৃষধ্বজ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৃষধ্বজ ৺কামাখ্যার ভৈরব বলিয়া ইঁহাকে সর্ব্বপ্রথম দর্শন করিয়া ৺কামাখ্যা দর্শন বিধেয় বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে। পূর্ব্বে এই তীর্থে নরবলি হইত। ইংরাজের শাসনে উহা রহিত হইয়া গিয়াছে। উমানন্দ পাহাড়ে দুইটী মন্দির বিরাজিত। একটীতে উমানন্দ দেবের (শিবের) মন্দির স্থাপিত, অপরটীতে রুদ্রদেবের নাট্যমন্দির। আহোমরাজ শিবসিংহ এই উমানন্দদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। শিবরাত্রির সময় এখানে যেরূপ যাত্রীর সমাগম হয় তাহার সংখ্যা নির্ণয় অসম্ভব। উমানন্দ পাহাড়ে ঝরণা নাই। এই পাহাড়ের নিম্নভাগে ব্রহ্মপুত্রের তটদেশে একটী গুহা আছে। উহাতে তিন চারি জন লোক থাকিতে পারে। কথিত আছে—ঐ গুহায় কোন মুনি তপস্যা করিতেন। এক্ষণে কোন কোন সাধু-সন্ন্যাসীকে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়। এই তীর্থের পূজারীরা বলিয়া থাকেন "এই পাষাণময় দ্বীপটীর নাম "ভস্মাচল"। এই স্থানেই হরকোপানলে কামদেব ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। উমানন্দ-পাহাড়ে দোকান অথবা তেমন কোন প্রকার চাষ-আবাদ না থাকায় যে কয়েক ঘর পাণ্ডা বসবাস করেন, তাঁহাদিগকে গৌহাটী হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়।

উর্ব্বশীকুণ্ড - উমানন্দগিরি হইতে পূর্ব্বদিকে অল্প দূরে ব্রহ্মপুত্রবক্ষে "উর্ব্বশীকুণ্ড" অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা উহাকে উর্ব্বশী তীর্থ বলিয়া থাকে। পাণ্ডাগণ এই কুণ্ডটী একটী স্ত্রী-মূর্ত্তির দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। বর্ষায় এখানকার শৈলাগ্রভূমিও ডুবিয়া যায়। উহাতে ষ্টীমারের তলদেশ ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কায় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ঐ শৈলোপরি একটী প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

পর্ব্বতোপরি কতিপয় তীর্থ—বিগত বৈশাখ-সংখ্যায় কামরূপান্তর্গত পর্ব্বতোপরি যে সকল দেবস্থানের উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের পরবর্ত্তী কতকগুলির উল্লেখ করা গেল ঃ—

৫৬। গণেশ পর্ব্বতের উত্তরে ভরদ্বাজ পর্ব্বত; ৫৭। গন্ধমাদন পর্ব্বত; উহার অগ্নিকোণে ভুজঙ্গেশ্বর মূর্ত্তি আছে। গন্ধমাদনের পূর্ব্ব শৃঙ্গের পদদেশে নৃত্যশীলা, তাহার দক্ষিণে "অস্তরাণি কুণ্ড"। ৫৮। অস্তরাণি কুণ্ডের অগ্নিকোণে তিনটি শৃঙ্গযুক্ত "লাংকুশ" নামে একটি পর্ব্বত আছে। সাধারণতঃ লোকে উহাকে "শ্রাবণবই" পর্ব্বত বলে। ৫৯। বরাহ পর্ব্বত। ৬০। মৎস্য পর্ব্বত; ৬১। অনন্ত পর্ব্বত—ইহার সাতটি শৃঙ্গ; ৬২। রাক্ষস পর্ব্বত—যেখানে মহাদেবের মূর্ত্তি আছে। ৬৩। বাঘেশ্বরী পর্ব্বত—এই পর্ব্বতের তিনটি শৃঙ্গ, যথা—সিদ্ধেশ্বর, বাঘেশ্বর ও রত্নেশ্বর। বাঘেশ্বরী পর্ব্বত উত্তর গৌহাটিতে অবস্থিত। ৬৪। গোবিন্দ পর্ব্বত; ইহার দুইটী শৃঙ্গ—গোবর্দ্ধন ও জ্ঞান। ৬৫। দুর্গাপর্ব্বত; ৬৬। গজনাঙ্কির পর্ব্বত, ৬৭। মধ্যাহ্নক; ৬৯। চিরঞ্জীব পর্ব্বত; ৬৯। কপিলি এবং নামধেনু পর্ব্বত; ৭০। নমনঙ্ক পর্ব্বত।

চণ্ডিকাদেবীর মন্দির—এই মন্দির ছয়গাঁও পাণ্টন মৌজার "মঠপারা" গ্রামে অবস্থিতট শুনা যায় – চাঁদসদাগর এখানকার চণ্ডীদেবীর সংস্থাপক। দেবীর নিষ্কর ভূমিজাত দ্রব্যাদির দ্বারা অদ্যাবধি সেবা-পূজা চলিয়া আসিতেছে।

অশ্বক্রান্তগয়া—গৌহাটীস্থ শুক্রেশ্বর ঘাট হইতে ষ্টীমারে ও নৌকায় অশ্বক্রান্তগয়ায় যাওয়া যায়। কথিত আছে—যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মক-দুহিতা 'রুক্মিণীকে' হরণপূর্ব্বক গৃহে যাইবার কালে তাঁহার রথাশ্ব উত্তর গৌহাটীস্থ ব্রহ্মপুত্র নদের পরপারে সম্মুখস্থ শৈলে ক্লান্ত হইয়া পড়ায় ঐ স্থান "অশ্বক্রান্তগয়া" নামে অভিহিত হইয়াছে। অশ্বক্রান্ত-গয়ার একস্থানে ঐ অশ্বের ( ) ক্ষুরচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। আসাম বুরঞ্জী পাঠে অবগত হওয়া যায়, "আহোমরাজ সুতান ফা ১৭২১ খৃঃ অশ্বক্রান্তগয়ায় একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।" তন্মধ্যে কুর্ম্মরূপী জনার্দ্দন ও কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশয্যা মূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। অশ্বক্রান্তগয়ায় অনেকে পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

যোগিনীতন্ত্রে অশ্বক্রান্ততীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

অশ্বক্রান্তে পরো যোগঃ অশ্বক্রান্তে পরা গতিঃ।
অশ্বক্রান্তে পরো মোক্ষস্তীর্থং নৈবাস্তি তাদৃশম্॥ ৩৯
ন সা গতিঃ কুরুক্ষেত্রে গয়ায়ারে চ পুষ্করে।
যা গতির্ব্বিহিতা পুংসাং অশ্বক্রান্তনিবাসিনাং॥ ৪২
ন দানৈর্ন তপোভির্ন যজ্ঞৈর্নাপি চ বিদ্যয়া।
প্রাপ্যতে গতিরুৎকৃষ্টা অশ্বতীর্থে যা লভ্যতে॥ ৪৩

অর্থাৎ অশ্বক্রান্তে পরম গতি, পরম যোগ ও পরম মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। ইহার মত তীর্থ আর নাই। অশ্বক্রান্তবাসীর যে গতি, কুরুক্ষেত্র, গয়া ও পুষ্করবাসীদিগেরও তাহা হয় না: অর্থাৎ অশ্বতীর্থে (অশ্বক্রান্তগয়ায়) তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়।

এই তীর্থে ক্রিয়াকলাপের সুব্যবস্থায় জন্য শ্রীযুক্ত এলেন সাহেবের গেজেটিয়ারে ১১৪১ বিঘা নিষ্কর সম্পত্তির উল্লেখ আছে।

পাণ্ডুনাথ –যোগিনীতন্ত্রে কামাখ্যা তীর্থপ্রসঙ্গে পাণ্ডুনাথের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অনেকের মতে কামরূপে 'পাণ্ডু' নামক রেলওয়ে ষ্টেশনের অনতিদূরস্থ পাণ্ডুঘাটেই পাণ্ডুনাথ নামক বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত ছিল। এখানকার মন্দিরগাত্রস্থ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেব তদীয় অমাত্য "গদাধরের বাক্যে ১৫০৭ শকে

এই বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কোচরাজ রঘুদেব ১৫৮১খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৯৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। মন্দিরগাত্রস্থ শিলালিপির শকের সহিত তদীয় রাজত্ব-কালের সামঞ্জস্য নাই। এই মন্দির এক্ষণে অস্তিত্ববিহীন। ভূমিকম্পের ফলে ইহার অস্তিত্ব লোপ হওয়াই সম্ভব। ঠিক কোন্ স্থানে আদি মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। একটী টিনের ঘর বর্ত্তমানে উহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। শ্রীযুক্ত এডোয়ার্ড তাঁহার সঙ্কলিত আসামের ইতিহাসে এই লিপি সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। নিম্নে পাণ্ডুঘাটর সন্নিকটস্থ টিনের ঘরবিশিষ্ট পাণ্ডুনাথ নামক বিষ্ণুমন্দিরের গাত্রস্থ শিলালিপি উদ্ধৃত করা হইল:—

১। ৺শ্রীমন্মল্লনৃপাত্মজস্য কৃতিনঃ শুক্লধ্বজস্যাত্মজে।
২। বীরে শ্রীরঘুদেবভূপতিকুলোত্তংসে কলানাং নিধৌ॥
৩। দুর্গাদত্তবরেণ শাসিতগুণগ্রামাভিরামে মহীং।
৪। তস্যামাত্যগদাধরস্য বচসা স্নেহানুকূল্যাদপি॥
৫। শ্রীপাণ্ডুনাথস্য পুরে নির্ম্মাতি প্রসাদস্য নির্ম্মিতবান মনোজ্ঞং।
৬। পয়োনিধিবিষ্ণুপদৈকতানঃ শাকে দ্বীপব্যোময়সেন্দুসংখ্যে॥

স্বর্গীয় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর তাঁহার আসাম বুরঞ্জীর একস্থানে লিখিয়াছেন—"লৌহিত্যের দক্ষিণ তীরে নীলাচল পর্ব্বতর বায়ুকোণে পাণ্ডুনাথ নামে এক দেবালয় আছে তাত পাণ্ডব সকলে প্রতিষ্ঠা করা দেবমূর্ত্তি আছে বুলি কোনো কোনো পুরাণ আরু যোগিনী তন্ত্র কয়। আর সেইরূপ প্রবাদ আজিলৈকে চলি আহিছে।"

তত্ত্ববোধিনী, আশ্বিন ১৩২০ শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী

রাখী

তোমার হাতের রাখীখানি
বাঁধো আমার দখিন হাতে,
সূর্য্য যেমন ধরার করে
আলোক রাখী জড়ায় প্রাতে।
তোমার আশীষ আমার কাজে
সফল হবে বিশ্বমাঝে,
জ্বলবে তোমার দীপ্তশিখা
আমার সকল বেদনাতে।

কর্ম্ম করি যে হাত লয়ে
কর্ম্ম বাঁধন তারে বাঁধে।
ফলের আশা শিকল হয়ে
জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে।
তোমার রাখী বাঁধো আঁটি'
সকল বাঁধন যাবে কাটি
কর্ম্ম তখন বীণার মত
বাজবে মধুর মূর্চ্ছনাতে।

৭ঠা, আশ্বিন, ১৩২০. শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান

আষাঢ় কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া
মাঠের শেষে শ্যামল বেশে
ক্ষণেক দাঁড়া।
জয়ধ্বজা ওই যে তোমার গগন জুড়ে
পূব হতে কোন্ পশ্চিমেতে যায়রে উড়ে
গুরু গুরু ভেরী কারে দেয় যে সাড়া।
নাচের নেশা লাগল তালের পাতায় পাতায়
হাওয়ার দোলায় দোলায়
শালের বনকে মাতায়।
আকাশ হতে আকাশে কার ছুটোছুটি
বনে বনে মেঘের ছায়ায় লুটোপুটি
ভরা নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে কে দেয় নাড়া॥

শান্তিনিকেতন, আশ্বিন, ১৩২০ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যেদিন সকল মুকুল গেল ঝরে'
সেদিন ডাকলে কেন আমায়
এমন করে।
যেতে হবে যে পথ বেয়ে
শুকনো পাতা আছে ছেয়ে;
হাতে আমার শূন্য ডালা
কি ফুল দিয়ে নেব ভরে।

গান-হারা মোর হৃদয়তলে
তোমার ব্যাকুল বাঁশি কি যে বলে।
নেই আয়োজন সেই মম ধন,
নেই আভরণ নেই আবরণ;
রিক্ত বাহু এই ত আমার
বাঁধবে তোমায় বাহু-ডোরে॥

অয়ন, শ্রাবণ, ১৩২০. শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজি সাঁঝের যমুনায় গো
তরুণ চাঁদের কিরণ-তরী
কোথায় ভেসে যায় গো।
তারি সুদুর সারি গানে
বিদায়-স্মৃতি জাগায় প্রাণে,
সেই যে দুটি উতল আঁখি
উছল করুণায় গো।
আজ মনে মোর যে সুর বাজে
কেউ তা শোনে নাই কি!
একলা প্রাণের কথা নিয়ে
একলা এ দিন যায় কি!
যায় যাবে সে ফিরে ফিরে,
লুকিয়ে তুলে নেয়নি কিরে,
আমার পরম বেদনখানি
আপন বেদনায় গো।

বিজলী, কার্ত্তিক ১৩৩০ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে
গগনে গগনে ডাকে দেয়া।
কবে নব ঘন বরিষণে
গোপনে গোপনে এলি কেয়া।
পুরবে নীরব ইসারাতে
একদা নিদ্রাহীন রাতে
হাওয়াতে কি পথে দিলি খেয়া।
(আষাঢ়ের খেয়ালের কোন্ খেয়া)
যে মধু হৃদয়ে ছিল মাখা
কাঁটাতে কি ভয়ে দিলি ঢাকা।
বুঝি এলি যার অভিসারে
মনে মনে দেখা হল তারে
আড়ালে আড়ালে দেয়া-নেয়া।
(আপনায় লুকায়ে দেয়া-নেয়া)

শান্তিনিকেতন, কার্ত্তিক ১৩৩০ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি
হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী।
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ঐ আসে তোমার সুরেরই তরী।
ব্যথা আমার কূল মানে না বাধা মানে না,
পরাণ আমার ঘুম জানে না জাগা জানেনা।
মিল্‌বে যে আজ অকূল পানে,
তোমার গানে আমার গানে
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী।

শান্তিনিকেতন, কার্ত্তিক, ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বুকের পথ

ছোট্ট আমার বুকের পথে কত জনাই আস্‌লো-গ্যালো—
তোমার পায়ের নূপুর-ধ্বনি তার মাঝে সই লাগলো ভালো!
কত জনাই চক্ষু ঠেরে বুক দেখালে কতই ফেরে
তাদের বুকের কাঁপন লেগে আমার এ বুক কাঁপলো না লো!

চক্ষে তাদের উজল ছিল উষর মরুর তৃষ্ণা ঢালা—
তপ্ত তাদের বক্ষে সখি, গুপ্ত ছিল অনল-জ্বালা!
শুধুই ক্ষুধা, শুধুই ক্ষুধা বিন্দু-বিহীন-শান্তি-সুধা—
শুধুই চাওয়া, শুধুই পাওয়া, শুধুই দাবী-দাওয়ার পালা!

এই পথে আর কেউ এলো না আমার আপন-জনের মত—
তুমিই আমায় চম্‌কে দিলে দুঃখে শুভক্ষণের মত!
অন্ধকার এ বুকের পথে নামলে এসে আলোর রথে—
প্রথম পথে নূপুর-ধ্বনি বাজ্‌লো বুকে মনের মত।

এক লহমায় তোমায় আমায় সেই হলো সই জানাজানি
নীরব নিথর নির্জ্জনতায় নীরব কথা কাণাকাণি!
তোমার বুকের কাঁপন লেগে আমার বীণা উঠলো জেগে
গন্ধে-সুরে উঠল পুরে শূন্য আবার হৃদয়খানি—

তোমার সরস পরশ পেয়ে ফুল ফুটেছে বক্ষে রাণি,
এ পথ যে আজ বন্ধ হবে, জানি তাহা আগেই জানি—
করো এ পথ বন্ধ করো, ছন্দে গানে গন্ধে ভরো—
তোমার প্রেমে অন্ধ করো তোমার অবশ পরশ হাসি!

শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৯

সন্ধ্যার সময় সবিতার মাকে লইয়া তার দাদা মশায় নবমী-পূজা দেখিতে গিয়াছেন। শরীর দুর্ব্বল বলিয়া সবিতা তাঁদের সঙ্গে যাইতে পারে নাই, সে বাড়ীতেই ছিল।

জান্‌কীয়া তার কাছে বসিয়া প্রথমে কিছুক্ষণ নিজের স্বামী ও সন্তানদের অনেক গল্প করিল, তার পর বারান্দায় শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল।

সবিতা তার অসময়ের ঘুম দেখিয়া হাসিয়া বলিল,—ঘুম কি এদের একেবারে হুকুমের চাকর!

কিন্তু ঘুমন্ত জান্‌কীয়ার কানে তার এ কথা পৌঁছিল না। জানলার কাছে একটা মাদুর পাতিয়া সবিতা চিঠি লিখিতে বসিল।

প্রথমে কার্ডে শ্বশুরকে বিজয়ার প্রণাম জানাইল, আশাকেও তার চিঠির উত্তর লিখিল, তার পরে জ্যোতির সুদীর্ঘ পত্রখানি সুমুখে রাখিয়া তার প্রত্যেক কথার উত্তর লিখিতে বসিল। জ্যোতি তার স্বভাব-মত কত কথাই লিখিয়াছে, যার উত্তর দিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র, কিন্তু সময় কাটাইবার জন্য সবিতা তারও উত্তর লিখিতে লাগিল।

বাড়ীর সামনে গলি-রাস্তা দিয়া অনবরত যাত্রী-বোঝাই যান-বাহন চলিতেছে। পূজার ছুটিতে অনেক বিদেশী ভদ্রলোক তীর্থ-দর্শন-হিসাবে কাশীতে জমা হইয়াছেন, পথে লোক-চলাচলের আর বিরাম নাই, রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলেও গাড়ীর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ কাণে যায়,—এবং আরোহীদের চেঁচামেচিতে রাত্রিটাও স্তব্ধ না হইয়া সশব্দ থাকে!

সবিতা মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া দেখিতেছিল, কত গাড়ীই চলিয়াছে, কিন্তু একখানিও তো তাদের বাড়ী থামে না! ট্রাঙ্ক-বিছানা বোঝাই-করা ভাড়াটে গাড়ীগুলি যখন দৃষ্টির সীমা ছাড়াইয়া যায়, তখন সে চোখ নামাইয়া দু চার ছত্র লিখিয়া আবার গাড়ীর শব্দে চোখ তুলিয়া পথের দিকে চায়।

কিন্তু কে যে আসিবে তার ঠিক নাই! এমন করিয়া যে সে কার আশা-পথ চাহিয়া থাকে, নিগূঢ় মনের সে বার্ত্তা সে নিজেও ভাল বুঝিত না!

প্রণম্যদের বিজয়ার প্রণাম জানাইতে বসিয়া তার যে আরও একটা সকলের চেয়ে বড় প্রণাম বাকী রহিয়া গেল, যা প্রকাশের অতীত!

থানার ঘড়িতে সন্ধ্যা সাতটার ঘণ্টা ঠুকিল। সবিতা উঠিয়া গিয়া সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া পোষা ময়নাটাকে ঘরে তুলিল। তখনো তার মা বা দাদামশায় ফেরেন নাই;—বেশ অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে, আলো না জ্বালিলে আর ঘরের ভিতরের কিছুই দেখা যায় না—! সবিতার দাদা-মশায়ের ঘরে টেবিল বা চেয়ার কিছুই নাই, ট্রাঙ্কের উপর কাগজ বিছাইয়া লণ্ঠন রাখিয়া সে আবার চিঠি লিখিতে বসিল।

জান্‌কীয়ার ঘুম ভাঙ্গিবার কিছুমাত্র তাড়া নাই;—সবিতা মনে মনে বলিল, মা কি কাজের লোককেই আমার কাছে রেখে গিয়েছেন! আমাকে কেউ এসে কেটে রেখে গেলেও যে টের পাবে না!

চিঠি লেখা শেষ হইয়া গেল। দোয়াত-কলম সব তুলিয়া সে জ্যোতির লেখা চিঠিখানি নাড়া-চাড়া করিতেছিল; হঠাৎ মনে হইল, একখানি গাড়ী যেন তাদেরই বাড়ীর বাহিরে আসিয়া থামিল, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অস্পষ্ট কথাও তার কাণে গেল!

সে জান্‌লার ফাঁকে চোখ দিয়া গাড়ী দেখিতে পাইল না কিন্তু তাদের কাঠের কপাটে ঘা পড়িল।

সবিতা একবার ভাবিল, দাদামশায় বুঝি ফিরিলেন, কিন্তু তিনি তো এমন সজোরে কপাটে ঘা দেন না! যদি এ আর কোনো অচেনা লোক কেউ হয়!

কপাটে আবার ঘা পড়িল, কিন্তু কোনো কথা নাই!

সবিতা জান্‌কীয়াকে ঠেলিয়া তুলিল, বলিল,—ওঠ্, ওঠ্,—বাইরে কে এসেছে, ত্যাখ্।

জান্‌কীয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ ঘসিতে ঘসিতে বলিল,—কে?

—কে, তা আমি কি জানি ! তুই দুয়োর খুলে দ্যাখ্।

জানকীয়া উঠিয়া দুয়ার খুলিতে গেল। সবিতা কেমন আড়ষ্টভাবে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া মাদুরের উপর বসিয়া রহিল। কিসের একটা অজানা উচ্ছ্বাসে তার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

ঘরের লণ্ঠনটী হাতে করিয়াই জান্‌কীয়া দুয়ার খুলিতে গিয়াছিল। অন্ধকার ঘরে বসিয়া সবিতার তখন মুহূর্ত্তকে যুগ বলিয়া মনে হইতেছিল। কে আসিল ?

জানকীয়ার পিছনে পিছনে ভারি জুতার শব্দ শুনিয়া সবিতা অবাক হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তার চক্ষের একান্ত সুমুখে ঘুমন্ত পুলককে বুকে ফেলিয়া পথ-শ্রান্ত অরুণ আসিয়া দাঁড়াইল। সবিতার শিথিল পা দুখানা তখন থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল,—এ যেন সে স্বপ্ন দেখিতেছে !

একটু পরে সে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল।

জানকীয়া একমুখ হাসি হাসিয়া সবিতার বিছানা একটু ঝাড়িয়া দিয়া বলিল,—খোকাকে এইখানে শুইয়ে দিন বাবু—

অরুণ পুলককে সেইখানে শোয়াইয়া দিয়া নিজেও একটু বসিল। জানকীয়া সবিতার কানের কাছে মুখ আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—জামাইবাবু ?

সবিতা মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল।

লণ্ঠনটি যথাস্থানে রাখিয়া জানকীয়া সবিতার মা ও দাদামশায়ের সন্ধান লইতে বাহির হইয়া গেল।

অরুণ বলিল,—কি, চিন্‌তেও পারছো না বুঝি ?

সবিতা একটু হাসিল, বলিল,—এমন হঠাৎ যে !

অরুণ পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিল, তাতিয়া উঠিয়া বলিল, —কেন, তাতে কি হয়েছে ?

সবিতা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল,—জুতো-টুতো খুল্‌বে ?

অরুণ হাসিয়া বলিল,—আজ আমি তোমাদের অতিথি, পাদ্য-অর্ঘ্য তুমিই দেবে।

সবিতা অতিথির পাদ্য-অর্ঘ্যের যোগাড় করিতে গেল।

জ্যোতির চিঠি খুলিয়া পড়িতেছে। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া অরুণ বলিল,—এ চিঠি কার ?

—আমার একটী বন্ধুর।

—কটক থেকে লিখেছেন ? তুমি এঁদের বেশ চেনো ?

—শুধু জ্যোতিকেই চিনি, আর কাউকে নয় ! ও কি, তুমি জুতো ছেড়ে হাত-পা ধোবে না ?

অরুণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আগে ধুলো পায়েই একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাক্—তার পরে পা ধোব।

—থামো, থামো, আমার সঙ্গে আবার নিষ্পত্তি কি করবে ! দোহাই তোমার—তুমি বসো,—জিরোও—

—জিরুচ্ছি, দাঁড়াও, আগে শোনো আমার কথা। তোমরা আমাকে যত নীচ মনে কর, আমি তত নীচ নই। আমি অহঙ্কারী, কিন্তু অবিশ্বাসী নই—

অত্যন্ত নম্র কোমল কণ্ঠে সবিতা বলিল,—অত কথা তুমি কাকে বলছো ? কেনই বা বলছো ?

—তোমাকেই বলছি। কেন বলছি ? বল্‌ছি যে, আমার ধৈর্য্য সীমা পেরিয়ে গিয়েছে,—আমি এখন আমার অধিকার যে আছে কি নেই, তাই—

—সে কি নতুন করে ? আমি তো নতুন নই !

—হতে কি পারো না ? ভেবে দ্যাখো,—একটু ভাল করে ভাবো, কিছু কি তোমার দরকার নেই আর ?

—না, তুমি অমন করছো কেন ? বসো।

—না, আমি বসবো না,—তুমি সত্যি কথা বলছো ? না ?...আবার বল তো ! আমার মুখ-পানে চেয়ে বল !

অরুণের গভীর কণ্ঠ কাঁপিতেছিল। সে সবিতার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া তার মুখের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে চাহিয়া কথা বলিতেছিল। প্রিয় মধুর তপ্ত ঘন শ্বাসে মুহূর্ত্তকাল আচ্ছন্ন সবিতা চমকিয়া বুঝিল, মা ও দাদামশায় ঘরে ঢুকিতেছেন। তাঁদের দুজনেরই মুখে এমন অপূর্ব্ব আনন্দের দীপ্তি সবিতা আর কখনো দেখে নাই !

বিশেষ সবিতার মায়ের স্নেহ যেন সহস্র ধারায় উথলিয়া তাকে ভরাইয়া দিল। তিনি মনে করিলেন, তবে তো

এক-বাটী গরম দুধ হাতে করিয়া পুলককে খাওয়াইবার জন্য জাগাইতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ না খাইয়া ক্ষুধাতেই সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, মুখে একটু দুধ যাইতেই অবাক হইয়া তাকাইয়া বলিল,—বড় মামা, রেলগাড়ী থেমে গিয়েছে?

সবিতা তার মাথাটী বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—আমাকে চিন্‌তে পারছিস্ পুলক? চেয়ে দ্যাখ্—

পুলক তার মুখপানে চাহিয়া বলিল,—তুমি!

—হাঁ রে আমি। চিন্‌তে পারছিস্ নে নাকি?

নিজেকে সবিতার হাতের বাঁধন হইতে ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পুলক বারবার বলিতে লাগিল,—তুমি! তুমি!

অর্থাৎ সে একটু একটু চিনিতেছে, কিন্তু সেটুকু বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারিতেছে না।

—হাঁ, আমি,—বলতো আমি কে?

অন্য সময়ে ঘুমন্ত পুলককে জাগাইয়া দুধ খাওয়ানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইত, কিন্তু একজন আধ-চেনা, আধ-অচেনা লোকের হাতে পড়িয়া তার ঘুমের ঘোর টুটিয়া গেল। ঘরের মেঝেয় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল,—বড় মামা কই?

অরুণ তখন সে ঘরে ছিল না। পাশের ঘরে সবিতার দাদামশায়ের কাছে বসিয়া জলখাবার খাইতেছিল।

দুধের গ্লাস পুলকের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া সবিতা বলিল,—আগে বল্, আমি কে?

—তুমি বৌমা।

—ওরে, এই যে চিনে ফেলেছিস্ রে! বলিয়া পুলককে কোলের কাছে টানিয়া চুম্বন করিতেই, ঘাড় ফিরাইয়া সে বলিল,—এটা তোমার বাড়ী? এটা কটক?

—আমার বাড়ী বুঝি কটকে? এত খবর তোমাকে কে দিলে?

পুলক সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল,—এখানে মা আছে?

—মা? না, বাবা মা তো এখানে নেই।

—আছে।

—কে বল্‌লে তোমায়?

—কেন, তুমি মার কাছে যাও নি?

—না। মার কাছে যাওয়া যায় না!

—যায় না? বড় মামা বলেন, যায়।

—তিনি ভুলে বলেছেন।

—ও!

পুলক এক চুমুকে দুধটুকু খাইয়া ফেলিল। ভিজা গামছায় তার মুখ মুছাইয়া দিয়া সবিতা তার কাপড় ছাড়াইয়া দিল। সে বলিল,—আমি কোথায় শোব বৌমা?

—কেন, এই বিছানায়।

তক্তাপোষের উপর সবিতার বিছানার দিকে চাহিয়া অপ্রসন্ন মুখে পুলক বলিল,—এখানে আমার ছোট্ট একটা বালিশ নেই, কিচ্ছু না, আমি শোব কিসে?

সবিতা প্রথমতঃ একটু বিপদে পড়িল। তার নিজের জন্মের পর তো আর এ-বাড়ীতে কচি ছেলের পাট ছিল না, ছোট বালিশ আর কোথা হইতে আসিবে?

অনেক কষ্টে, হিতোপদেশের বাঘ-শিয়ালের গল্প বলিয়া সে পুলককে ভুলাইয়া ঘুম পাড়াইল। তারও দেহ-মন আচ্ছন্ন করিয়া যেন তন্দ্রার আবেশ আসিতেছিল।

এ কি পুনর্জন্ম! প্রাণের গোপন পুরে যে উদ্দাম বাদ্য একটানা নদীস্রোতের মত কল্লোল-মুখর ছিল, আজ এই শিথিলতার মাঝে তার সেই কঠোর ধ্বনি যেন নূপুর-নিক্বণের মত মৃদু মধুর হইয়া গিয়াছে!

শিথিল দেহে, শিথিল মনে সে সত্য সত্যই পুলকের পাশে শুইয়া পড়িয়া বহুদিন পরে নিশ্চিন্ত গভীর ঘুমে ঘুমাইয়া পড়িল।

৩০

পুলককে লইয়া যাইবার পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গেলেও যখন অরুণের কোন চিঠিপত্র আসিল না, অরুণ নিজেও আসিল না, তখন কর্ত্তা ও এ-বাড়ীর আর যারা পুরানো লোক ছিল, তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কার অন্ত রহিল না।

কর্ত্তা রাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন আমি জানি, সে ফাজিলটার এতটুকু কোনো বিবেচনা নেই! কিন্তু মনে মনে তাঁরও পিতার প্রাণকে অবিচলিত রাখিতে পারিলেন না! আপনা-আপনি চিন্তা আসিল, কি জানি, যদি সে সেই পরের বাড়ী গিয়া অসুখ-বিসুখেই পড়িয়া থাকে! বাড়ীর সরকারকে ডাকাইয়া বলিলেন,—বড়বাবুর বন্ধু-বান্ধব কেউ এখানে আছেন কি না, জানো?

সে বেচারা শঙ্কিত মনে জড়াইয়া জড়াইয়া জানাইল, সে জানে না। বাস্তবিক মনে করিলে, সে অরুণের তাস-খেলার সঙ্গী, এক-আধজন স্থানীয় বন্ধুকে পাইলেও পাইতে পারিত, কিন্তু তার চেয়ে এক কথায় সাফ মুক্তি পাওয়াই সে সুবিধা বিবেচনা করিল।

কর্ত্তার দূর সম্পর্কের এক ভ্রাতুষ্পুত্র অরুণের বন্ধু ছিল। সে পূজার ছুটীতে দেশে আসিয়াছিল। তার নাম যতীন। কর্ত্তা বলিলেন,—তবে যাও তো যতীনবাবুকেই জিজ্ঞাসা করে এসো যে অরুণের কোনো চিঠিপত্র তিনি পেয়েছেন কি না?

যতীন শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল। বড়বাবুর চিঠিপত্র? সে কি হে! এতদিনে কি তাহা হইলে বড়বাবু সত্য সত্যই বিবাগী হইয়া চলিয়া গেল না কি?

সরকার মাথা নীচু করিয়া হাসিল। যতীন আবার বলিল,—আরে কাশী বৃন্দাবন কোথাও খোঁজ নিলে তো হতো! শুনেছি বিবাগী হয়ে লোকে ঐ সব দেশেই যায়!

সরকার ফিরিয়া যাইতেছিল, অরুণের খবর ভাল করিয়া জানিবার জন্য যতীনও তার সঙ্গে চলিল।

কর্ত্তা তখনো চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। যতীন আসিয়া বলিল,—অরুণের নাকি কোনো চিঠিপত্র আসে নি?

—হ্যাঁ, পুলকটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল,—তাই ভাবচি, তার আবার অসুস্থ শরীর!

—প্রভাতের বাসাতে গিয়েছে?

—কি জানি, কোথায় গিয়েছে। হয়তো প্রভাতের বাসায় তার মা নেই, তাই আবার সেই বর্দ্ধমানে তাদের দেশেই গেল!

যতীন ভয়ে ভয়ে বলিল,—প্রভাতকে একটা টেলিগ্রাম করে দেখলে হয় না?

কর্ত্তা এক কথায় উত্তর দিলেন,—নাঃ, সে কাজ নেই,—থাক্!

কার্ত্তিক মাস পড়িয়া তবু সকাল বেলাতেই বৃষ্টি চাপিয়া আসিল দেখিয়া আশা মনে মনে বড় দমিয়া গিয়াছিল। এমন মেঘাচ্ছন্ন মলিন দিন সে একটুও পছন্দ করিত না। ঝিয়েরা ভাঁড়ার-ঘরের সামনের দালানে বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে গল্প করিতেছিল, হাসিতেছিল। আশার বড় ইচ্ছা করিতেছিল, সেও অমনি একটু আড্ডা জমাইয়া বসে! বাড়ীর প্রকাণ্ড হাতা,—দোতলার ঘরে বসিয়া সুদূর সদর রাস্তার কিছুই দেখা যায় না, কেবল নিজেদের বাগানটুকু ছাড়া।

বৃষ্টি মাথায় করিয়া এক-জোড়া কঙ্কাল-সার ঘোড়া, কম্বল-মুড়ি-দেওয়া চালকের হাতের দড়ি-বাঁধা চাবুকের অবিশ্রাম ঘা খাইতে খাইতে একখানা ভাড়াটে গাড়ী টানিয়া আনিয়া বাড়ীর দ্বারে থামাইল।

চাকরেরা সেদিন সুবিধা বুঝিয়া সে তল্লাটে কেহই ছিল না; কেবল মালীর ছেলে বিষুণ কর্ত্তার অফিস-ঘরে ফুল দিয়া ফিরিতেছিল। আধখানা মাথা বাহির করিয়া অরুণ হাঁকিল,—বিষুণ, একঠো ছাতা লে-আও তো!

বিষুণ চেঁচাইয়া বলিল,—হুজুর, বড়াবাবু তো আ-গিয়া—

—বড়বাবু আগিয়া—বড়বাবু?

মোটা বালাপোষ গায়ে জড়াইয়া কর্ত্তা তাঁর ইজি-চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেছিলেন, সবিতা আসিয়া তাঁকে প্রণাম করিল। তিনি প্রফুল্ল মুখে বলিলেন,—বড় বৌমা, তুমি এসেছ মা! বড্ড রোগা হয়ে গেছ যে! এ কি, কাপড় বুঝি ভিজে গেছে বৃষ্টিতে? যাও মা, ছেড়ে ফেল গে!

আশা সবিতাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—বড়-ঠাকুর বুঝি তোমায় আনতেই গিয়েছিলেন?

সবিতা একটু হাসিল।

অরুণ সকলের চোখ এড়াইয়া নিজের তেতলার ঘরে

ঢুকিয়াছিল ; সেখান হইতে পুলকের মারফত সবিতার ডাক আসিল। সবিতা দুয়ারের কাছে থামিতেই অরুণ বলিল,—এই যে! এসো, আজ তোমার কাছে আমার অনেক কিছু চাইবার আছে!

সবিতা মাথা নামাইল। তার মন বলিল,—হায় সর্ব্বহারী দেবতা, চাহিবার অনেক আগেই যে প্রাণের ভাণ্ডার তুমি নিঃস্ব করিয়া লইয়াছ,—এ তো নূতন নয়!

অবনতমুখী সবিতার দুই কাঁধের উপর হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে অরুণ বলিল,—আমার এই অগোছালো ঘরখানা একটু গুছিয়ে দেবে সবিতা?

শেষ

শ্রীনীহারবালা দেবী।

ভূমি

উষর নীরস চির-পিপাসিত ভূমি চাহে নভ-পানে,
সে চির-পিপাসা মিটাইবে কেবা আজো তাহা নাহি জানে।
সহসা গগনে ভাসিয়া চলিল অশেষ মেঘের সারি,
ভূমি চাহে সেই কাতর-নয়নে, ভয়ে সে যাচে না বারি!
দিঠির কামনা নেহারি কেহ বা হাসিল ধবল হাসি,
অনেক দিল যে কয় কণা বারি—কি জানি মনে কি বাসি!

অচেনা অজানা পাখী এল কোন্ পারাবার-পার হয়ে,
পাখায় বহিয়া বিবিধ বর্ণ, চঞ্চুতে ফল লয়ে।
করিল গ্রহণ ফলের শস্য বিদীর্ণ করি' হিয়া—
অবহেলা-ভরে বুক-ভরা বীজ ভূমিতে ছড়ায়ে দিয়া।
নাহি তরু সেথা, নাহি লতা পাতা,—পাখী ধিক্কার দানি'
সে দেশ হইতে আর কোন্ দেশে উড়ে' গেল, নাহি জানি।

চলিতে এ পথে কহিল মানব, 'এ কি এ বন্ধ্যা দেশ!
নীরস-কঠিন, কাজে লাগিবার নাহিক যত্ন লেশ।'
বিরূপ হইয়া শীকারী মানব বর্শায় বারে বারে
হানিয়া চলিল সুগভীর খোঁচা সে পথের দুই ধারে।

হেলা নিল ভূমি সবার নিকটে, মেঘ হতে নিল বারি,
পাখীর ত্যক্ত বীজ নিল ক'টি, খোঁচাও দিল না ছাড়ি।

আপন বক্ষে সেই ক্ষত জুড়ি' অঙ্কুর দিল তুলি।
তরুণ তরু ও বিকচ পাতায় পবনে উঠিল দুলি'
বিশাল তরুও শাখা-পল্লবে নিবিড় হইয়া এসে
ছেয়ে গেল তার সুনিবিড় ছায়া সুশীতল করি' দেশে।
বারে বারে তার ফুটিল মুকুল মধুর গন্ধ সাথে,
বারে বারে তার ধরিল রে ফল মধু লয়ে আপনাতে।

মেঘেরা আসিয়া বিটপীর শিরে ক্ষণেক দাঁড়াল থামি,
সুবাস লইয়া বিভোর হইল—ধরায় আসিল নামি।
পাখী সে আসিয়া ভুঞ্জিল ফল, নীড় বাঁধিল সে শাখে।
নীড়ে বসে সে যে আজ হতে গানে নীল আকাশেরে ডাকে।
ভূমি বলে নরে, তোমা তরে মোর বন্ধ্যা এ দশা ঘোচা।
আমারে দিতেছি। কিবা দিবে আর? তুমি যে দিয়েছ খোঁচা!

শ্রীরামকানাই সামন্ত।

সাহিত্যে অধিকার

নবাবী আমলে যখন দেশের অল্পসংখ্যক দ্বিজগণই টোলে এবং চতুষ্পাঠীতে দেবভাষা শেখবার সুবিধা পেতেন এবং মাতৃভাষা শেখানোর সুবাবস্থা পাঠশালার গুরুমহাশয়দেরই উপর ন্যস্ত ছিল, তখনকার চেয়ে এখন রাজধানীতে য়্যুনিভার্সিটিতে এবং জেলায় জেলায় কলেজ স্থাপিত হওয়ায় এবং দেব ও রাজভাষা শেখ্‌বার অধিকার সকলেরই আছে স্বীকৃত হওয়ায় আমরা যে এখন গ্রন্থ পড়ি অনেক বেশী, তার আর সন্দেহ নেই ;—কিন্তু লেখাপড়া-জানা, উপাধিধারী বহু কৃতবিদ্য বিষয়ী লোকের রুচি-প্রবৃত্তি দেখে সন্দেহ হয় যে সাহিত্যে তাঁদের অধিকার আছে কি ! উদ্ভিদের রস আস্বাদন করতে তাঁদের যে রকম সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সজাগ দেখা যায়, সাহিত্যের সত্য বস্তু—রস, ভাব এবং আনন্দ উপভোগ করবার জন্য তেমন কোন তপস্যাই ত তাঁদের করতে দেখা যায় না।

অথচ তাঁরা গ্রন্থ পড়েন মনে হয়, আদি হতে শান্ত রস, দাস্য হতে মধুর ভাব এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করবার জন্য নয়, মনোজগতের কতকগুলি ঘটনা এবং তাদের নৈসর্গিক নিয়ম জেনে রাখ্‌বার জন্য মাত্র।

এই শ্রেণীর পাঠক সংখ্যায় অধিক এবং অর্থ ও উপাধি দেবার শক্তি এঁদের আছে বলে বহু লেখকই সাহিত্যকে উনবিংশ শতাব্দীতে মনোজগতের সংবাদ-পত্রের একটী শাখা করে তুলেছেন এবং এখন ঐ চেষ্টা বেড়েই চলেছে,—পাঠকের দিক থেকে তাগিদ থাকার দরুণ অর্থ এবং যশোলোলুপ গ্রন্থকারগণও এমন গ্রন্থ রচনা করেন —যেখানে ভাব, রস, আনন্দই প্রধান বিষয় নয়, কি নিয়মে সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা মনে আসা-যাওয়া করে সেই নিয়মই সব। এই রকমে Science সাহিত্যের সত্য বস্তুকে সিংহাসনচ্যুত করেছে।

বিষয়ী লোকদের মাটীর উপর পাকা ঘর, আর সেই ঘর আলো করে লক্ষ্মী অচলা হয়ে থাকেন ; তাঁরা ভাগ্যবান নন্ কেমন করে বলা যায় যখন মাটির উপর স-লক্ষ্মী ঘর থাকাই, বিষয়ী লোক, সকলের চেয়ে সৌভাগ্য বিবেচনা করেন ?

কিন্তু কথা উঠেছে, সাহিত্যে তাঁদের অধিকার আছে কি ? সাহিত্যের নির্ভরস্থল ত মাটী নয়, শব্দ। এখন আর সেদিন নেই যে মাটীর মালিকও সাহিত্যের বিচারক হতে পারেন।...কেন ?

যতটুকু আমরা চোখে দেখ্‌তে, কাণে শুনতে, হাতে স্পর্শ করতে পাই, বিষয়ীরা ততটুকু পেয়েই খুসী হন ; এবং তাই পাবার জন্যই কামক্রোধাদি রিপুর অধীন হন। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যতই বাড়্‌তে থাকে, যে অবস্থায় মানুষ মনে শিশু থাকে সে অবস্থায় রিপুর পূর্ণ রূপ ব্যক্ত হয় না ; এ সকল রিপু জাগে মনের যৌবনে। তখন ক্ষেত্রের স্বামী হবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অহং-জ্ঞান আসে, স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়, তখন সে বিশ্বাস করে ভোগের বস্তু অন্যের চেয়ে অধিক অর্জ্জন করবার অধিকার তারও আছে ; এবং আর-সকলকে বঞ্চিত করে নিজে ভোগ করবার স্বাধীনতাও আছে ; দেশের আইন যতক্ষণ মেনে চলে, ততক্ষণ তাকে তার আত্মসুখ হতে বঞ্চিত করবার অধিকার কারুরই নেই ! এই রকমে উদ্ভিদের রসাস্বাদনে লোলুপচিত্ত যুবায়-যুবায় মনান্তর হয়ে যায়।

যৌবনে মাটীর লোলুপতা এলে মানুষ একদিকে যেমন হারায় তার বাল্যকালের সরলতা, অজ্ঞাতসারে ঐশী-ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে থাক্‌বার আনন্দ, তার সত্য শিশুত্ব, অন্যদিকে সে লাভ করে আত্মশক্তির উপর অপরিসীম বিশ্বাস ; এই জন্য দেখা যায় নিঃস্বও লক্ষপতি হন।

কিন্তু তিনি উদ্ভিদ-প্রিয় জীবের শ্রেণীতেই থেকে যান। হাতের মুঠায় যতটুকু মাটী ধরে, তাহাই সত্য জ্ঞান করেন। তবে কারুর মুঠা ছোট, কারুর বড়। মুঠার মাটীতে বুকের মা-টী চাপা পড়েন। উদ্ভিদে ভাণ্ডার-ভরা থাক্‌বার পরই এঁদের সাহিত্য-চর্চ্চা, ধর্ম্ম-আলোচনা, দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠা ভাল লাগে ; বিষয়-বৃদ্ধির জন্য যে সকল দুর্নীতি

অবলম্বন করতে হয়, আর মানুষের দেহ মন পেয়েও কেবলমাত্র উদ্ভিদ-প্রিয় হলে যে সকল পাপ অধিকাংশ স্থলেই এসে জোটে; অবসর কিংবা অনুতপ্ত মুহূর্ত্তে সাহিত্য-চর্চ্চা, ধর্ম্ম-আলোচনা, মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেহ কেহ করেন বটে। এঁদের মনের এ দিক্ পরিবর্ত্তন আন্তরিকও বটে কিন্তু লক্ষ্মীমন্ত হবার দুর্ভাগ্য এই যে এঁদের স্বর্গে তোল্‌বার স্তাবকও অনেক জোটে, বহুদিন কেবলমাত্র উদ্ভিদ-লোলুপ থাকবার অভ্যাসও সহজে যায় না, শব্দ-জগতের ভাব রস আনন্দের সন্ধান পেয়েও অনেকে তপস্যার অভাবে হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেবলমাত্র উদ্ভিদভোজী জীবের চেয়ে অনুতপ্ত লক্ষ্মীমন্তগণ ঊর্দ্ধে উঠে থাকেন। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও উন্নতি হয়েছে।

মানুষের উদ্ভিদ্‌প্রিয়তার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ আর এক শ্রেণীর মানুষের মন জেগে ওঠে, যাঁরা শিশুর আনন্দ উল্লাস, সহজ বিশ্বাস, ঐশী ইচ্ছার উপর একান্ত নির্ভরতা হারান, যাঁরা প্রকৃতির দুর্দ্ধর্ষ শক্তির নিত্য সংঘর্ষণের মধ্যে থেকেও মনের বলে বলীয়ান্, যাঁরা জীবনকে পিছু হঠিয়ে শিশুত্বের দিকে নিয়ে যাবার কল্পনা না করে, সাম্‌নে সকল মনসিজ-রস উপভোগ করবার দিকে নিয়ে যান।

একদিকে উদ্ভিদপ্রিয়গণ বাহিরের সম্পদ বাড়িয়ে যেতে থাকেন, আর একদিকে রসলোলুপ কবিগণ লোকাচার, দেশাচার, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের উপরও সকল রসের অসীমতা ঘোষণা করেন। এলিজাবেথের রাজত্বকালে সেক্স্‌পীয়র, বিক্রমাদিত্যের রাজ-সভায় কালিদাস, বিষয়ী এবং কবি পরস্পরের হাত ধরে একই যুগকে পূর্ণতা দিবার জন্য প্রকৃতির রহস্যপুর হতে আবির্ভূত হন; একই জগতের জল-মাটীতে দুইজনেরই দেহ পরিপুষ্ট হয় বটে কিন্তু একজনের হাতের মুঠায় থাকে ধুলা, আর একজনের মনে মথিত হতে থাকে রস-সমুদ্র। একই যুগের অন্তর্নিহিত অ.আর আকাঙ্ক্ষা এই রকমে দুই বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

এই যুগের সাহিত্য কিরূপ? নব যৌবনে মানুষের রস-লোলুপতা যখন সকল দিক হতেই জেগে ওঠে, তখন পদে পদে তার পদ-স্খলন যেমন অনিবার্য্য, আবার নিজের পায়ের উপরই ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টাও তেমনি স্বাভাবিক। রসলোলুপ কবিগণ কোনো দেশেই, কিম্বা কোনো কালেই বেড়া-দেওয়া সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অনুশাসন মেনে চলেন না; বরং সেই বেড়া পদে পদে লঙ্ঘন করে মনকে এবং তার আদি হতে শান্ত রসকে বিশ্বজনীন ভাবেই উপভোগ করে থাকেন। কিন্তু এজন্য কি বল্‌তে পারা যায়, তাঁদের জীবন সত্যধর্ম্ম হতে চ্যুত? সংরক্ষণশীল সম্প্রদায় সকল রস-লোলুপ কবিকে নিষ্ঠাহীন, ধর্ম্মহীন বলেন বটে! এমন কি তাঁরা ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ের প্রথম কবিকে তাঁদের সভায় স্থান দিতে চান না; কেন না তাঁরা যে মনের বিচিত্র পিপাসাকে প্রাণের জননী-ক্রোড় হতে জাগাতে ভয় করেন! তাঁরা জানেন যে মন একবার বিশ্বজনীনভাবে তার যৌবন-রঙে রঙীন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জেগে উঠ্‌লেই সাম্প্রদায়িকতার মাটির প্রাচীরে আর মনের গতি রুদ্ধ হয়ে থাকবে না, প্রতিভাশালী জাগ্রত মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা-সকলের স্রোতের মুখে তাদের বেড়া ভেঙে ভেসে যাবে, তাই তাঁরা শিউরে উঠে পিছনে হঠে প্রথার, গতানুগতিকতার হাতে আত্ম-সমর্পণ করেন।

কিন্তু বিশ্বাত্মার সৃজনীশক্তি কবির হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে যুগে যুগে নব নব সাহিত্য সৃষ্টি করে; কবি তাঁর আজীবন সাধনায় এমন একটী নিকেতন গড়ে তোলেন, তার হৃদয়ের আগার আলোয় উজ্জ্বল, এবং রসে সুমধুর করে বিশ্ববাসীর উপভোগের বস্তু করে তোলেন যে তার পানে সংস্কারমুক্ত, রসলোলুপ মানব ফুলের সৌরভে মধু-মক্ষিকার ন্যায় আকৃষ্ট না হয়ে থাক্‌বে কি করে? এর মধ্যে যে বিশ্বজনীন রস রয়েছে। এ যে রস-স্বরূপেরই আত্মদান,—সেইজন্য দানেও যেমন কার্পণ্য নেই, গ্রহণেও তেমনি অগৌরব নেই।

এই যুগের সাহিত্য পড়লে মনে হয়, মানব-প্রকৃতি যেন এক যৌবন-সুরায় উন্মত্তা, চঞ্চলচরণা বিলাসিনীর মত চির-যৌবনময়ী—প্রকৃতির অদৃশ্য নূপুরের তালে তালে নৃত্যময়ী! তখন তার কণ্ঠ হতে যে গান ধ্বনিত হয় তাতে শৈশবের কোমলতা থাকে না বটে কিন্তু তাতে থাকে যৌবনের পূর্ণ, গম্ভীর, বিচিত্র মূর্চ্ছনাময়ী রাগিণী—সেই রাগিণী মিশে যায়

আকাশের নীলিমার বিস্তৃতির সঙ্গে, তরঙ্গিণীর চিরযৌবন-লীলার সঙ্গে, কামনার বিদ্যুতালোক-দপ্ত যৌবনের আকাঙ্ক্ষা লালসা প্রকৃতির সকল রসানুভূতির সঙ্গে।

এই যে যৌবন, দেহ-মনের বিচিত্র শক্তির এমন আশ্চর্য্য উন্মেষ এবং অনুভূতি নিয়ে যে যৌবন, যখন কাম্যবস্তুর পানে —প্রহরের পর প্রহর চেয়ে থাক্‌লেও শ্রান্তি আসে না, কেবল মনে হয় এই জীবন ঐ কাম্যবস্তু যতই দেখা যায়, যতই প্রাণের প্রতি নিশ্বাসে কামনার প্রতি লহরে উপলব্ধি করা যায় ততই নূতন বোধ হয়, ততই আমাকে সহস্র বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে, এ কি আশ্চর্য্য সুন্দর অভাবনীয় জীবন-বন্যা, এই ত সেই অসীম অনন্ত ভরা জীবন এবং তার সকল রস।

উদ্ভিদপ্রিয় লক্ষ্মীমন্তদের সঙ্গে মনসিজ রসলোলুপ কবিদের একটা বিষয়ে ঐক্য আছে, উভয়েরই দৃষ্টিক্ষেত্রের উপর। নিত্যানিত্য বিচার করা দার্শনিকের কাজ, সাহিত্যিকের নয়; মন কি কি নিয়মে পিছনের জগৎ হতে ঠেলা খেতে খেতে অগ্রসর হয়, চারি পাশের জগতের চাপের মধ্যে পিষ্ট হয়, আর উপরের চাপে অবসন্ন হয়, এ সকলের নিয়ম আবিষ্কার করা বৈজ্ঞানিকের কাজ, সাহিত্যিকের নয়।

কিন্তু আত্মবিস্তারের রহস্যময় আকাঙ্ক্ষায় যুবা যে ক্ষেত্রকে শক্ত মুঠায় ধরবার চেষ্টা করে থাকে, আর তার সুধা এবং বিষ পান করে, ঐ আকাঙ্ক্ষা, ঐ সুধা, ঐ বিষ পান করবার স্বাদ বলে যাওয়াই সাহিত্য।

সেই ক্ষেত্রটী কি? ভূমি এবং ভামিনী। উদ্ভিদ-প্রিয় লক্ষ্মীমন্তদের ন্যায় সেই যুগের কবিরও মন ভরে থাকে ভূমি এবং ভামিনীর সৌন্দর্য্যে এবং ঐ দুটী বস্তু উপভোগ করবার তৃষ্ণায়। মানুষ যতদিন মনে শিশু থাকে, ততদিন ঐ দুটির সম্বন্ধে এক রকম উদাসীন আনন্দেই সে জীবন কাটিয়ে দেয়। তখন গাছের পাতার উপর আলোর নৃত্য দেখে সেও আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে; আর তার মাকে সন্ধ্যার সময় বসনে ভূষণে সজ্জিতা হয়ে স্বামীর প্রতীক্ষায় থাক্‌তে দেখ্‌লে সে আনন্দে বলে ওঠে, "মা, মা, তুমি কেমন সেজেছ!" শিশু জানে না, য জন্য মানুষে আজ পর্য্যন্ত কত যুদ্ধ হয়েছে; তরুণীর প্রেম এবং ঘৃণা বিদ্যুতের জ্যোতিকেও মলিন করে দেয়! শিশু তার মার কাছে নানা আবদারই করে থাকে; আর তার মা বুকের বসন খুলে শিশুর কোমল অধরে স্তনের বোঁটাটী ধরে তাকে সঞ্জীবনী-সুধা পান করায়। সে কি আনন্দের জীবন,—লালসা নেই; বিষও নেই; আছে এক অপূর্ব্ব স্নেহ-করুণার অলৌকিক উপলব্ধি!

মানুষ দেহের ন্যায় মনেও চিরদিন শিশু থাক্‌তে পারে না। কিন্তু যৌবনের সুধা এবং বিষের মধ্যে পড়্‌লেই কি সে মানব-প্রকৃতি হারায়? না, সে আরও পিছু হঠে পশু হয়? তাও হবার নয়। জীবনকে শৈশব হতে যৌবনে সত্য করে করে তোলা কি—শ্রেয়? আমাদের জীবন সত্য হোক্, মন জাগ্রত হোক, আত্মা তার বীর্য্য ক্ষেত্রে রেখে যাক্,—সকল রসের বন্যায় দুই তীর বৈচিত্র্যময় হোক্,—এটাই কি স্রষ্টার ইচ্ছা নয়? সৃষ্টির কোলে আর একটী নূতন সৃষ্টি,—শব্দ-জগৎ আত্মার স্বভাবের দ্বারাই গড়ে উঠুক, এরই জন্য যে বিশ্বাত্মা তাঁর সৃজনীশক্তি মানুষকে দিয়েছেন,—এ সৌভাগ্য একমাত্র মানুষেরই আছে, উদ্ভিদের কিম্বা কেবল মাত্র উদ্ভিদ-প্রিয় প্রাণীর নেই।

রসলোলুপ কবিরাও তাই বিশ্বাত্মার সৃজনী-শক্তিতে আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ। তাঁরা সৃষ্টি করেন একটী নূতন শব্দ-জগৎ। সেখানে আলো আছে, ছায়াও আছে। আমাদের চোখের সাম্‌নে যে রকম ভূমি এবং ভামিনী দেখা যায়, শব্দ জগতের ভূমি এবং ভামিনী প্রায় এই রকমই; সেই একই ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা এবং তার পর অবসাদ; সেই একই পুরুষের বাহুবল এবং রমণীর সহিষ্ণুতা; সেই রসাতল, মর্ত্ত্য-ভূমি, স্বর্গ; কিন্তু তা হলেও জগৎ। কেন না তার প্রতি অণুতে গতি আছে; এই যে এক নূতন শব্দ-জগৎ, এখানে কার অধিকার আছে? মনে যে শিশু, তার নেই, যে যুবক রসলোলুপ তারই এই সাহিত্যে অধিকার আছে। যে আত্মসুখকে এত বড় করে দেখ্‌তে পারে যে সে এবং তার সুখ ছাড়া আর কিছুই সত্য নেই; সে তার ক্ষেত্রকে—তা ভূমিই হউক কি ভামিনীই হউক,—শক্ত মুঠায় ধরবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়; সিংহাসন অধিকার

করবার তৃষ্ণার তাপে যার প্রভুভক্তি এবং সকল কোমল রস চুঁয়ে যায়, তারই এ সাহিত্য উপভোগ করবার অধিকার আছে; মুনি ঋষির আশ্রমের পবিত্রতাও যে বিস্মৃত হয় নবীনার সহিত মিলনের তৃষ্ণায়,—তারই এ সাহিত্যে অধিকার আছে। এ সাহিত্যের রস ভোগ করতে হলে জড় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু হতে শব্দে মনকে ব্যাহৃত করতে হবে। যে শব্দজগতেই ধ্যানস্থ হতে পারে, তারই এই সাহিত্যে অধিকার আছে।

লক্ষ্মীবানদের মধ্যে এ সৌভাগ্য একেবারেই নেই বলা যায় না; কিন্তু ইন্দ্রিয়জ সুখের মোহ অতিক্রম করাও সহজ নয়।

জড়জগতের উপর বিষয়ীরাও যেমন বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যায়, কোথায় থাকে ধনৈশ্বর্য্য, বাহুবলের প্রতাপ, শব্দ-জগতেও এই রসলোলুপ সাহিত্যও তেমনি মিলিয়ে যায়, কোথায় থাকে সিংহাসন লাভ করবার তৃষ্ণা! কোথায় থাকে আনাঘ্রাত পুষ্পের মত তরুণীর হৃদয়-মধু আহরণ করবার বাসনা!

বিষয়ীদের অহমিকায় একটা মহাযুদ্ধ ঐশ্বর্য্য উপভোগ করবার পর হয়েই থাকে; রসলোলুপ মন রক্ত-দন্তিকা নৃমুণ্ড-মালিনীর নৃত্য দেখে স্তম্ভিত হয়, তখন মানুষের চিরন্তন যৌবন প্রকৃতি একটু দূর থেকে মনকে শান্ত করে অতীতের ভূমি এবং ভামিনীর প্রতি তৃষ্ণার ইতিহাস স্মরণ করতে থাকে। মনের এই অবস্থাকে অবসাদ বলে প্রথমে ভ্রম হয়, কিন্তু তা কি করে হবে, যখন এই অবস্থার পরই সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে আত্মার সৃজনী-শক্তি ক্ষেত্ররূপ মানব-হৃদয়ে, শব্দ-জগতে, আর একটী নূতন ভাব-প্রধান সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকে!

মনের এই শান্ত অবস্থায় তার মনে পড়ে শৈশব জীবনের সরল আনন্দ; তখন না জেনে কেমন আনন্দে দিন কাটাত; এখন এত জানার পরও সে আবার সেই জীবনের আনন্দ পেতে চায়।

কিরূপে? ঈশ্বর এবং তাঁর সত্বার উপর একান্ত নির্ভর করে। মনের এ অবস্থায় আত্মশক্তির গর্ব্ব, আত্ম-সুখের তৃষ্ণা, জয়-পরাজয়ের গৌরব-হীনতা, লাভ-ক্ষতি আর মনে ঠাঁই পায় না; এখন ভাব-সাধক ফিরে আসেন বিশ্বপিতার আশীর্ব্বাদ ভরা দক্ষিণ হস্তের নিম্নে; এখন তিনি পরম পুরুষ এবং তাঁর শক্তির পানেই চেয়ে থাকেন; এখন আত্মরক্ষা করবার চেষ্টাও আর আসে না; কেন না, ভগবৎভক্তের দৃঢ় বিশ্বাস যে তাকে রক্ষা করবার জন্য তার চেয়েও তার স্রষ্টার আগ্রহ বেশী।

এ সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা আর মানব এবং মানবী নয়। মাটির মালিক কে ছিলেন, আর তাঁর প্রকৃতি কি রকম ছিল, তা আমরা Miltonএর Paradise Lost কিম্বা জয়দেবের গান হতে জানতে পারি না। এঁদের মনের সম্মুখে সর্ব্বদাই ছিলেন ঈশ এবং তাঁর প্রকৃতি; সৃষ্টিতে, স্থিতিতে লয়ে, রসাতলে, মর্ত্ত্যভূমিতে, এবং স্বর্গে নিত্যকাল বর্তমান রয়েছেন একমাত্র জগদীশ্বর, তাঁর সামীপ্য লাভ করে ভাবুক-দল কেবল গান করে—জয় জগদীশ হরে!

এ সময় ভক্তের মন থেকে সংসার এবং তার আলো-ছায়া সরে যায়; জরামৃত্যুর অধীন যে জীবন, ভূমি এবং ভামিনীর প্রতি তৃষ্ণা নিয়ে যে জীবন, সে জীবন সরে যায়, স্থিতি এবং লয়কে পরিপূর্ণ করে রয়েছেন যে জগদীশ এবং তার প্রকৃতি,—ভক্ত কেবলমাত্র সকল রসের ভিতর দিয়ে একটীমাত্র ভাব উপলব্ধি করেন যে তিনি তাঁর সন্তান!

জানা-শোনা নৈসর্গিক নিয়ম দিয়ে ভগবৎ-ভক্তদের দ্বারা গঠিত এই ভাবপ্রধান সাহিত্য বিচার করতে গেলে সবই অস্পষ্ট বোধ হয়। কিন্তু যে ভাব থেকে এই সাহিত্যের উৎপত্তি সেই ভাবটী মনের মধ্যে উপলব্ধি করলেই, কবির সঙ্গে পাঠকের মনের যোগ স্থাপিত হওয়া সম্ভব হয়।

এ সাহিত্যে কার অধিকার আছে? যে মনে শিশু, তার নয়; ভূমি এবং ভামিনীর সৌন্দর্য্যে যে মুগ্ধ, এবং তাদের উপভোগ করবার তৃষ্ণায় যে আত্মবিস্মৃত তার নয়; কেবলমাত্র রস উপভোগ করবার জন্য যে ছুটাছুটি করে তারও নয়; যে যৌবনকে রসাস্বাদ হতে শুকিয়ে রেখেছে তারও নয়; যিনি মৃত্যুর অধীন আলোছায়ার ভিতর দিয়ে মৃত্যুর অতীত ঈশ-এবং তাঁর নিত্যানন্দময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করবার ব্রত স্ব-ভাবের অধীন হয়েই শান্ত মনে নিয়েছেন, তাঁরই এই সাহিত্যে অধিকার আছে। মনের

মধ্যে কাম-কাঞ্চনে আসক্তি থাক্‌লেও যে বাহিরে সাধু সন্ন্যাসী সেজেছে তার ত এ সাহিত্যে অধিকার নেই, কিন্তু যার মন অহরহ তাকে বল্‌চে "তুমি যে ঈশ্বরের সন্তান" তারই এ সাহিত্যে অধিকার আছে। যার মন শান্ত হয়েছে! সেইজন্য শান্ত রসকে যেমন রস-সাগরের শেষ সীমা বলা যায়, তেমনই ভাব-সাধনের আরম্ভ ঐ অবস্থা থেকেই। অশান্ত মন নিয়ে কোনো ভাবেরই সাধন হতে পারে না। দাস্য ভাবও নয়, মধুর ভাব ত দূরের কথা। ভগবানের সামীপ্য লাভ করবার সাধনায় ব্রতী হয়েও ভূমি এবং ভামিনীর রূপ গুণ এবং সেই সকল উপভোগের কথাই যার মনে পড়ে, তার ভাব ছন্নছাড়া হয়ে যায়, সাধনায় সিদ্ধিলাভ তিনি কর্‌তে পারেন না। যার প্রকৃতি হতেই ভূমি এবং ভামিনী সুন্দরী, শুদ্ধসত্ত্বলোকের অধিবাসী কবিগণ কামনার মোড় ফিরিয়ে তাঁকেই পূজা আরাধনা করে থাকেন, যিনি ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য হতে মনকে মুক্ত করে শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে শান্ত কর্‌তে পারেন, তাঁরই এ সাহিত্যে অধিকার আছে। ভূমি এবং ভামিনীর পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা ত দূরের কথা, ঐ দুটীর স্মৃতিও মন থেকে যে অবস্থায় সরে না যায়, সে অবস্থায় ঐ সাহিত্যের অনুশীলন করা নিষ্ফল। কেন না এ উপভোগ সাধনা-সাপেক্ষ। বাহিরের জগতের রূপ, রস, সৌন্দর্য্য আমরা উপভোগ করি নানা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। বাহিরের বস্তুর সংস্পর্শে এলেই সুখান্বেষী মন নানা রসের স্বাদ আপনা আপনিই পেয়ে থাকে; তার জন্য মানুষকে কোনো চেষ্টা কোনো সাধনা কর্‌তে হয় না। রসলোলুপ জীবন ঐ রূপ প্রবৃত্তির স্রোতেই কখনো তীরের, কখনো তরঙ্গের আঘাতেই এগিয়ে যায়। এ পথেও ভগবানকে পাওয়া যেতে পারে বটে কিন্তু মূল্য অত্যন্ত অধিক দিতে হয়; যখন ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে তখন তাঁকে উপভোগ করবার শক্তি আর থাকে না।

কিন্তু এইখানেই ত মানবপ্রকৃতির যৌবন শেষ হয় না। ইন্দ্রিয়জ সুখদুঃখ নিয়েই সে থাক্‌তে পারে না, বহির্ম্মুখী মন অন্তর্ম্মুখী হয়; এতদিন যে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বার রুদ্ধ ছিল, অন্তর্ম্মুখী মন এখন সেই দ্বারে সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত কর্‌তে থাকে। দিনের পর দিনের চেষ্টায় সাধকের একনিষ্ঠায় সেই দ্বার খুলে যায়; তখনই তার উপলব্ধি হয় যে সে ঈশ্বরের সন্তান; এই বিশ্ব বিধাতারই সৃষ্টি; এর সকল রূপ, রস, বিশ্বাত্মারই রূপ, রস; কবি নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ধ্যান কর্‌তেই পারেন না; অরূপকে রূপের মধ্যে, অনির্ব্বচনীয়কে বাক্যের মধ্যে, সর্ব্বব্যাপীকে দেশে দেশে উপভোগ করেই ভক্ত কবি তৃপ্ত হন। এটা যে ত্রুটি কবি তা জানেন; এবং সেইজন্য ক্ষমাও চান।

রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং॥

এ প্রার্থনাটী আমাদের দেশের ভগবৎভক্তদের মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিক। আমাদের সাহিত্যের নানা দেব দেবীর, গুরুবাদ এবং অবতার-বাদের ভিতর দিয়ে এই সত্যই ঘোষিত হচ্ছে যে

তমেব ভানুমনুভাতি সর্ব্বং,তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

ইতিহাসে দেখা যায় যে সেই সব জাতিরই সাহিত্য এখনো নবীন রয়েছে যাদের মধ্যে কবিগণ একদিকে মানুষের রসগ্রাহিতা, অপরদিকে তার ভাব সাধনা, ধর্ম্মচেতনা প্রকাশ করেছেন; প্রকৃতির চিরন্তন যৌবনকে একদিকে উপভোগ করেছেন তার নানা রসের মধ্যে, আর একদিকে ভাবের মধ্যে। রসপ্রধান সাহিত্যে আত্মশক্তি, আত্মসুখ, স্বাতন্ত্র্যই বড়,অন্যদিকে ভাবপ্রধান সাহিত্যে ভক্তি, আত্মদান, নিজের ইচ্ছাকে ঐশী ইচ্ছার সঙ্গে একযোগে কাজ করে যেতে দেওয়াই আমরা দেখ্‌তে পাই প্রাধান্য লাভ করে। এ সাহিত্যের কবি কারা? যাঁদের অহঙ্কার সলিলে লবণের মত বিশ্বাত্মার প্রকৃতিতে মিলিয়ে গেছে, যাঁরা সত্যই ভক্ত, ইষ্ট দেবতার ইচ্ছা পালন করে যাঁরা আনন্দময়,যাঁরা নিজেদের জীবনের ক্ষুদ্র আধারটী অনন্ত ভাব, রস, আনন্দের উৎসমুখে ধরে পূর্ণ করে নিয়েছেন, যাঁরা অমৃতকে লাভ করে সাহিত্য অমৃতময়ী করে গেছেন, তাঁরাই এ সাহিত্যের অমর কবি। অমর কেন? না, আত্মার ন্যায় তার ভাব রসও যে মরণের ঊর্দ্ধে। একটী ভাবকে, তা যাহাই হউক, সর্ব্বই

হউক, মধুরই হউক, স্থির ধরে থেকেই সকল রসের তরঙ্গ এঁরা উপভোগ করেন; এবং সে উপভোগ, কেবলমাত্র রস-লোলুপ কবিদের চেয়ে প্রগাঢ়। তাই কালিদাসের চেয়েও জয়দেবে, চণ্ডীদাসে বিদ্যাপতিতে সকল রসের এত প্রগাঢ়তা।

কি রস-প্রধান, কি ভাব-প্রধান, উভয় শ্রেণীর সাহিত্যে অধিকারের সঙ্গেই পাঠকের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দেহ এবং মন যার পরাধীন, তার দ্বারা যেমন কোনো সাহিত্যেরই সৃষ্টি হতে পারে না; দেহ এবং মন যার পরাধীন এমন পাঠকও সাহিত্যের সত্য বস্তু উপভোগ করতে পারেন না। দেখা-শোনা জগৎকে ছন্নছাড়া করে কবি যে জগৎ সৃষ্টি করেন পাঠককেও দেখা-শোনার জগৎ হতে মনকে মুক্ত করে সেই শব্দ-জগতে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু যার দেহ এবং মন পরাধীন, তার এ মুক্তি কোথায়? যে মন হাতের মুঠার মাটিকেই, উদ্ভিদ-প্রিয়তাকেই, সকলের চেয়ে সত্য বলে জেনেছে, তার যেমন সাহিত্যে অধিকার নেই, সেই রকম অষ্ট বন্ধনে বদ্ধ সাহিত্যে অনুরাগ থাক্‌তেও সে হতভাগ্য সাহিত্যের সত্য বস্তুর উপভোগ হতে বঞ্চিত! "লাজ মান ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।"

কেন না জ্ঞানপন্থীর পক্ষে মায়া যেমন ওঁকার-রূপী চিরজ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলাভের অন্তরায়, উভয় শ্রেণীর কবিদের মধ্যে পরাধীনতা তেমনই ভগবানকে লাভ করবার অন্তরায়। কবিদের, ভক্তদের লক্ষ্য কি? রস-স্বরূপ ভগবানকেই না লাভ করা! তার অন্তরায় কি? পরাধীনতা, হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য, জড়তা!

আর যে বিষয়ী মনের চারিদিকে প্রাচীর তুলে, মাথার উপর ছাদ তুলে, অন্ধকারকে জমাট করে তুলেছে, আর হাতের মুঠায় যতটুকু মাটি ধরে তার চেয়েও বেশি পাবার তৃষ্ণার সারা পৃথিবী দাবিয়ে বেড়াচ্ছে, ভাব রস এবং আনন্দ-ময় ভগবানকে যে কিছুই দান করতে পারে না; যৌবন দান করা, কুলশীলমান ত্যাগ করা ত দূরের কথা! সে যদি গ্রন্থে আলমারি ভরিয়ে রাখে, তার সভা সাজাবার জন্য কবি, কথকদের মাহিনা দিয়ে তাদের কখনো মুখ বন্ধ করে দেয়, কখনো মনের মত গান গাহিয়ে নেয়;—এতে প্রমাণ হয় না যে তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক, কিম্বা সাহিত্যে তাঁর অধিকার আছে। তাঁর সাহিত্য-সেবা ত ঘটী-বাটী ধুয়ে মুছে দিন কাটানোরই মত। যার তৃষ্ণা পায় নি, তার মুখে কেউই জলের পাত্র ধরে না; ভগবানই বা কেন তার মনে উদয় হবেন, তাঁকে শব্দ-জগতে পাবার তৃষ্ণা যার জাগে নি! বিষয়ী যে, সে জানে, তার হাতের মুঠার ধুলাই সকলের চেয়ে সত্য।

আর যে পরাধীন, তার অন্তরে তৃষ্ণা নিত্য সহস্র লাঞ্ছনার তাপে শুকুতে শুকুতে শেষে বাতাসে মিশে যায়, তারপর হৃদয়ও হয়ে পড়ে মরা নদীর মত।

এ সত্ত্বেও দেখা যায় যে একটি নবযুগকে আবাহন করে আন্‌বার জন্য বিষয়ীদের এবং পরাধীনদের পিছনে রেখে রসে এবং ভাবে তন্ময় হয়ে রসিক এবং ভক্তগণ শব্দকে অবলম্বন করে সেইখানেই চলে যান, যেখান থেকে নানা তরঙ্গে রস উৎসারিত হয়ে আকাশে আকাশে এক একটি গ্রহ-তারকায় জ্যোতি-বিন্দুর রূপ ধরে ঝলমল করচে; মানুষের অন্তরে আবির্ভূত হয়ে সাহিত্যের মূর্ত্তি গ্রহণ করে, সকলে রসের সেই একই মূলে, সেই নির্বিকার, জ্যোতির্ম্ময় আনন্দে। তখন আর ভাষা থাকে না; একটি মাত্র শেষ শব্দও আনন্দের প্রগাঢ়তায় মিলিয়ে যায়। সেই আলোকেই তখন সাধকের রাত্রি প্রভাত হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

রামগতি

ঠুক্‌-ঠাক্‌ টুক্‌-টুক্‌। সারা দিন সারা রাত একখানি চালা-ঘরের ভিতর থেকে শব্দ হয় ঠুক্‌-ঠাক্‌—টুক্‌-টুক।

রামগতির বাড়ী কোথায় ছিল কেউ জানেনা। এ গ্রামে এসে অবধি রামগতি কখনও বাড়ীর নাম করেনি বাড়ী যায়নি। গ্রামের শেষ সীমানায় ছোট পথটির ধারে অশ্বথ গাছের নীচে এই চালা-ঘরখানিতে বসে সে রাত্রিদিন সোনা-রূপার গহনা তৈরী করে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। চাল্‌শে ধরবার আগেই তাকে চশ্‌মা নিতে হয়েছিল। নাকের ডগায় সুতা-বাঁধা চশ্‌মা জোড়া লাগিয়ে ছোট একটি হাতুড়ি নিয়ে আপন-মনে সে কাজ করে।

গ্রামের লোক গ্রামান্তরে যাবার পথে রামগতির ঘরে বসে তামাক খেয়ে জিরিয়ে যায়। তাকে না চেনে সে গ্রামে এমন কেউ নাই। সন্ধ্যার পর হাত-মুখ ধুয়ে নিজের ঘরের পিঁড়ের উপর ছোট একখানি চৌকিতে বসে গ্রামের পথের শেষ বাঁকের দিকে তাকিয়ে থাকে আর কি ভাবে। তখন কেউ এসে তার সঙ্গে গল্প করতে চাইলে সে যেন একটু বিরক্ত হয়। কেবল হুঁ-হাঁ দিয়ে কথা সারে।

সন্ধ্যার সময় যেদিন ভাল করে চাঁদ ওঠে—মাঠে, পথে, গাছে, জলে জ্যোৎস্নার ঝিলিক্‌ জাগে, সে সময় গ্রামের দু-দশটা ছোট ছেলেমেয়ে রামগতির ছোট্ট উঠানটিতে এসে জোটে। তারা বলে, জ্যাঠা, গল্প বল; মামা, ভূতের গল্প বল, রামগতি ভাই, রাজকন্যার কাহিনী বল। রামগতি হা-হা করে হেসে উঠে বলে—বল্‌ছি, বল্‌ছি।

একলা মানুষ। ঘরে স্ত্রীলোক নাই। তবু রামগতির ঘর-বার খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চালা-ঘরের জাফ্‌রি দেওয়া লম্বা জানালার নীচে বেল্‌ জুঁই ফুলের কুঁড়ি; ঘরের দরজার নীচে ক'খানি ইট সাজিয়ে সিঁড়ি হয়েছে—তারপরেই পায়ে-চলা সাদা মাটির পথটুকু ঝাঁট দিয়ে তক্‌তকে করে রাখা। ছোট উঠানটিতে একটি কুটো পড়ে থাকে না। পরের জিনিষ গচ্ছিত রাখা, পরের জিনিষ ভেঙ্গে গড়ে দেওয়া, [illegible] কাজ। তার চাল-চলন দেখে মনে হোত, তার নিজের জন্য করবার যেন কিছু নাই।

* * * *

গ্রামের লোক ভোর-বেলা উঠে মাঠে বাজারে যাবার অনেক আগেই সেদিন রামগতি ঘরের বাইরে বসে গাইছিল—

আজ মন লাগেনা কাজে।
চোখ্‌-চাওয়া এই ঘুমের ঘোরে আলস বেসুর বাজে।
আজ প্রাণেরই ভাঁজে ভাঁজে
অবসরের গান;
ছুটী-পাওয়ার দারুণ তৃষায়—
কেঁদে মরে প্রাণ:—
মরা-বাঁচার মাঝ্‌খানেতে হারিয়ে-যাওয়া-সাজে;
আজ মন লাগেনা কাজে।

নিমাইচরণ দশ বছরের মেয়ের হাত ধরে রামগতি পাশে এসে বল্‌ল—দাদা, এই খাড়ু জোড়া রেখে দশটা টাকা দাও।

রামগতি নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গাইতে লাগ্‌ল—

—আজ মন লাগেনা কাজে।

নিমাইচরণ একটু চুপ করে থেকে বল্‌ল—পাগ্‌লামি করবার সময় নেই আমার, খাড়ু জোড়াতে না হয়, এ দুগাছি বালাও রাখো।

মেয়ের হাত ধরে বল্‌ল—দাও তো মা বালাজোড়া খুলে—রামগতি-দা ভাল করে গড়িয়ে দেবে।

বালাজোড়া খুলে রামগতির হাতের কাছে মাটীর উপর রেখেই বল্‌ল—এইবার উঠে টাকাটা বের করে দাও ভাই। বড় তাড়া।

রামগতি সাড়া দিল না। গাইতে গাইতে হাস্‌তে হাস্‌তে নিমাইয়ের মেয়ের হাত ধরে তার কোলের কাছে টেনে নিল; দু'হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে বুকের কাছে চেপে ধরল আর দুলে দুলে গাইতে লাগ্‌ল—আজ মন লাগেনা কাজে।

প্রায় সিকি ঘণ্টা কেটে গেল। নিমাই অধীর হয়ে উঠ্‌ল; দাঁড়িয়ে উঠে রামগতির হাত ধরে টেনে তুলতে চেষ্টা করল। রামগতি আরও জোরে মেয়েটীকে জড়িয়ে

নিমাইচরণ হেঁকে উঠে বল্‌ল—দাওনা ভাই টাকা ক'টা, আমার সময় নাই। কাল রাত্রে যে কথা দিয়ে এসেছি আজ ভোরে টাকা পৌঁছে দেব। দেখ্‌চ ত রোদ্‌ উঠে গেল। উপায় কর ভাই, তা নইলে আর মান থাকে না। গরীব বলে কি ভদ্রলোকের মানটুকুও যাবে!

রামগতি এবার গান থামাল। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল—টাকা কি হবে?

নিমাইচরণ উৎসাহিত হয়ে বল্‌ল—জানো না? কাল রাতে যে মেজবাবু গাঁয়ে এসেছেন। জমিদারকে প্রণামী দিতে হবে না?

রামগতি অলস চোখে চেয়ে ভারী গলায় বল্‌ল—গহনা বাঁধা রেখে জমিদারকে প্রণামী না দিলে্ও চলে।

নিমাইচরণের কন্যাটি রামগতির হাত ছাড়িয়ে তার বাপের কোলের কাছে দাঁড়িয়ে রামগতির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নিমাইচরণ বুঝিয়ে বল্‌তে চেষ্টা করল—বাঁধা দিয়ে দি, যা' করে দি—জমিদার দেবতা। যে ভুঁয়ে বাস করি, তার মালিক সে! তাঁকে প্রণামী দিতেই হবে। আর তা' ছাড়া ওঁরা ত বড় একটা দর্শন দেন্‌ না আমাদের সৌভাগ্য যে মেজবাবু নিজে গাঁয়ে এসেছেন এবার।

রামগতি মাথা নেড়ে বল্‌ল—বেশ, দাও। কিন্তু এ খাড়ু আর বালা তোমার নয়। যাদের গড়িয়ে দিয়েছিলে তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেবার তোমার কোন অধিকার নাই। এগুলি বাঁধা দিয়ে তুমি টাকা পাবে না।

জমিদারের নায়েব কীর্ত্তিবাস ছুটতে ছুটতে এসে নিমাই-চরণকে লক্ষ্য করে বল্‌ল—খুব লোক ত যাহোক্‌। মেজবাবু যে যাত্রার যোগাড় করে বসে আছেন। তোমার দেখাই নেই—! কই, টাকা কটা দাও—।

নিমাইচরণ ব্যস্ত হয়ে কাকুতি করে বল্‌ল—দাও না ভাই রামগতি, এ ক'টা রেখে দশটা টাকা।

রামগতি উত্তর করল—টাকা নেই।

নিমাই অস্থির হয়ে প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্‌ল—এতক্ষণ বল্‌লে না—এখন যাই কোথায়? কি করি! মান গেল, ধর্ম্ম গেল। এখন কি করি বল ত? দেখ্‌চেন ত নায়েব মশাই, চেষ্টার কসুর করিনি। সেই ভোর থেকে এসে হত্যে দিয়ে আছি।

কীর্ত্তিবাস গম্ভীর স্বরে হুকুম করলে—টাকা কটা দাওহে রামগতি।

রামগতি উত্তর করল—দেবনা।

কীর্ত্তিবাস একেবারে আগুন হয়ে উঠ্‌ল! শাসিয়ে বল্‌ল—জমিদারকে প্রণামী দেবে, তার জন্য টাকা চাইছে—তুমি দেবে না?

রামগতি এতক্ষণ বসেই ছিল। নায়েবকে দেখে উঠে দাঁড়ায়নি, তাতেও নায়েবমশাই আগে থেকেই বিরক্ত হয়ে ছিল—। নায়েবের কথা শুনে রামগতি দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌ল—জমিদারকে প্রণামীর কেন? তাদেরত খাজনা দি। প্রণামী কেন দেব? আমার শক্তিতে কুলোয় না তবু মা মেয়ের গহনা বাঁধা রেখে প্রণামী দিতে হবে!

—দেবেনা তাহলে? এর মজা বুঝ্‌বে। গ্রামে এসে প্রজাদের ঠকিয়ে ক'টা পয়সা করে ভারী মেজাজ হয়েছে, দেখ্‌চি!

যে মানুষ এতক্ষণ নিশ্চিন্ত অলসভাবে বসে গান গাইছিল—আজ মন লাগেনা কাজে—সেই মানুষ একেবারে ক্ষেপে উঠল। তার নাক ফুলে উঠ্‌ল—ঠোঁট ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগল। সমস্ত শরীরের শিরাগুলি জেগে উঠ্‌ল। চোখের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে কপালের দিকে উঠে গেল। তীক্ষ্ণ-স্বরে সে বলে উঠ্‌ল—আমি প্রজা! ঠকাই সাম্‌লে কথা বল্‌বেন মশাই। জানেন আমার স্ত্রীপুত্র জমি-জমা কিছু নাই যে প্রাণের ভয় করব! নিমাই প্রণামীর টাকা দেবেনা। আর তার জন্য আপনাদের বিচারে যদি কিছু সাজা হয়—সে সাজা আমাকে দেবেন।

নায়েব নিমাইয়ের দিকে চাইল। নিমাই রামগতির দিকে চেয়ে বল্‌ল—জমিদার—!

রামগতি রুখে উঠে বল্‌ল—জমিদার! এরা জমিদার? এরা জানোয়ার। এরা সহরে থেকে বদমাইসি করবে আর তার টাকা যোগাতে হবে আমাদের! কক্‌-খনো-না।

কীর্ত্তিবাস পেছন ফিরে দেখ্‌ল, মেজবাবু সদলে গ্রামের পথে আস্‌চেন। নিমাইয়ের দিকে চেয়ে বল্‌ল,—দেখ্‌চ! ঐ বাবু ঘাটে যাচ্চেন। দাও, গহনা দাও আমাকে, আমি টাকা দেব।

নিমাই হাত বাড়িয়ে গহনা নিতে যেতেই রামগতি তার হাতখানি বজ্রমুষ্টিতে ধরে বলল—খবরদার, ছোঁবে না।

একজন পেয়াদা দৌড়ে এসে জানাল—নায়েবমশাই, আপনাকে মেজবাবু ডাক্‌ছেন।

কীর্ত্তিবাস রামগতির দিকে তাকিয়ে বলে গেল—রোস্, এবার তেজ ভাঙচি!

অনতিদূরে মেজবাবুর সঙ্গের দল কীর্ত্তিবাসকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনতে লাগ্‌ল। কীর্ত্তিবাস হাত পা নেড়ে বাবুকে বোঝাচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটুখানি মাঠ পেরিয়ে এসে সদলে মেজবাবু রামগতির দ্বারে উপস্থিত হলেন। রামগতির দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—এ সব সত্য কথা? এর গহনা ফিরিয়ে দাওনি, আর জমিদারকে বদমাইস বলেছ?

রামগতি স্থির হয়ে বল্‌ল—হাঁ।

মেজবাবু রাগে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলেন, রামগতির দিকে ছাতিটা উঁচিয়ে বলে উঠ্‌লেন,—জমিদার বদমায়েস?

রামগতি বলে উঠ্‌ল,—আলবৎ। তারা নয়ত দুনিয়ার কে বদমাইস্? সহরে থেকে যতদূর পারে বদ্‌মাইসি করে—তাতেও তাদের রাক্ষুসে ক্ষিদে মেটে না! গ্রামে আসে গরীব প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করতে! জানেন, আজ আমি এখানে কেন? আমার গাঁয়ের জমিদার সেদিন গ্রামে এসে আমার স্ত্রীকে, আমার বিবাহিতা কন্যাকে হরণ করে নিয়ে গেল, সেদিনও কিছু বলিনি। কিন্তু সেদিন আমার সে কন্যা গর্ভাবস্থায় আমার কুটীর দ্বারে ভিখারিণীর মত এসে কাঁদল—বাবা আমার সন্তানকে বাঁচাও—আমাকে না হয় তার পরে মেরে ফেলো; সে যারই হোক্—সে আমারই সন্তান। জান নিমাই, সেদিনও আমি জমিদারকে ক্ষমা করেছিলাম ঐ অনাহূত শিশুর আগমনের কথা শুনে। আমি মেয়েকে ঘরে নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তবু এ অভাগিনীর মুখের দিকে চেয়ে আমার স্ত্রীর কথা ভুলতে পারব। মেজবাবু, তাও আপনাদের জমীদারের জাতের প্রাণে সইল না। গ্রামের লোক দেখি, আমার কুঁড়েখানি পুড়ে গেছে। গ্রামের লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তারা কেউ জানে না, আমার মেয়ে কোথায়। এমন কি, কেউ বল্‌ল—আমার ঘরে যে আগুন লেগেছিল তাও তারা জানতে পারে নি। তখন বুঝ্‌লাম জমিদার কতখানি পারে, কতখানি করে! তবু তাকে ক্ষমা করে চলে এসেছিলাম তোমাদের গাঁয়ে—এখানেও—

কীর্ত্তিবাস দুজন লোককে হুকুম দিল—মারো। মেজবাবু তারও অপেক্ষা সইলেন না। পায়ের জুতা খুলে রামগতির গায়ে বসিয়ে দিলেন। এতদিনের ক্ষুব্ধ পাগল আজ মর্ম্মান্তিক অপমানে ক্ষেপে উঠল। একলাফে ঘরের ভিতর থেকে কয়লা রাখার লোহার চোঙ্গাটা এনে জমীদারের মাথায় বসিয়ে দিল! মাথা কেটে রক্তের ঝরণা ছুট্‌ল। জমিদার অচৈতন্য হয়ে মাটীতে গড়িয়ে পড়লেন।

নিমাইয়ের শিশু কন্যা ভয়ে কেঁদে উঠল। কীর্ত্তিবাস রামগতিকে ধরতে গিয়ে তার চেহারা দেখে পেছিয়ে এল। নিমাইয়ের কন্যাকে একহাতে টেনে নিয়ে, নিমাইকে আগ্‌লে দাঁড়িয়ে রামগতি হুঙ্কার করে উঠ্‌ল—কেউ আমাকে ছুঁয়েছ কি তাকে খুন করব। আজ এ গাঁয়ের সব শেয়াল কুকুর শেষ করব।

সকলে ধরাধরি করে জমীদারকে নিয়ে কাছারীর দিকে চলে গেল।

রামগতি পিঁড়ের উপর বসে পড়ে হাঁপাতে লাগ্‌ল। দু চোখ বেয়ে জলের ধারা বইতে লাগল। আজ সকালে যে দিনের স্মৃতিখানি এমন আনমনা করে ফেলেছিল, সেই পুরাতন স্মৃতি আবার এসে তার প্রাণ জুড়ে বস্‌ল। রামগতি শিশুর মত কাঁদতে লাগল।

নিমাই রামগতির দিকে চেয়ে বল্‌ল—কি করলে ভাই, জমিদারকে মারলে? এবার—

রামগতি বাধা দিয়ে বল্‌ল—জমিদার! ওরা কিসের জমিদার? জমিদার হয়তো জমিদারীতে এসে বাস করুক! সহরে গিয়ে যারা নিজের ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে, প্রজার

চিরন্তন কাহিনী

হয়ত প্রলাপ, তবু পাগলের কল্পনা সেই
নব নব বেশ ধরিয়া,
কাহিনী রূপক রূপকথা-রূপে বিকশে নিত্য
তরুণ চিত্ত ভরিয়া।
শোনা কথা? তবে না-ই দিলে কান; বিমুখ শ্রবণে
আমি ত শুনাতে চাহিনি,
দেশে দেশে আর যুগে-যুগে-গীত অতি-পরিচিত
চিরপুরাতন কাহিনী!

* * *

সন্ধ্যার নীল ছায়ার স্পর্শে মূর্চ্ছিত কালো
সলিল-শয়নে নলিনী,
বক্ষে লুকায়ে রেখেছে রবির শেষের রশ্মি-
রেখাটি, কাহারে বলেনি।
স্বপনে হয়ত পশিছে শ্রবণে তপন-সোহাগ,
স্বর্গ-সুরের লালা সে,
পর্ণ-পুটে কি লুকালো বিকল স্বর্ণদলের
দিনের বর্ণ বিলাসে?

* * * *

"পদ্ম, আজি ও ছদ্মবেশের লাজ-আবরণ
জলাঞ্জলি দে ধনি লো!"
আপন আবেগে আপনি আকুল পাগ্‌লা হাওয়ার—
কণ্ঠ তিমিরে ধ্বনিল।
গুঞ্জরে কত মিনতি ভ্রমর পাপড়ির 'পরে
ক্লান্ত পাখাটি মেলিয়া,
মৃদু হিল্লোলে কি গান শুনায় অলস সলিল
চরণের তলে হেলিয়া,—
"না গো ও তন্দ্রা-নিলীনা নলিনী, জাগো আনন্দে
আঁধারের কারা ভাঙিয়া,
ওঠো প্রেমিকের তপ্ত মধুর অধর-পরশে
কামনার রঙে রাঙিয়া!"

রুদ্ধ দুয়ারে আকাশের তারা কর হানি কহে,
"অন্তর তব খোলো গো!"
চন্দ্র কাঁদিছে মুঞ্জত-কণ্ঠে, "কুণ্ঠিত অব-
গুণ্ঠনখানি তোলো গো!"

* * * *

প্রহরের পর প্রহর এমনি আহ্বানে তার
ফিরিয়া এল না চেতনা।
জ্বলিল নিবিল কত না আলোক; যামিনীর বুকে
বাজিতে লাগিল বেদনা।
ক্লান্ত ঝিল্লী, স্তব্ধ ধরণী, অনন্ত কোন্
উদাস-ভাবনা-মগ্ন;
তরল তিমির, উন্মুখ দিক, দিগন্তে শুধু
একটি তারকা লগ্ন।
এমন সময় উঠিল সহসা-শিহরণে সারা
পৃথিবীর প্রাণ কাঁপিয়া,
এমন সময় রহস্যময় দীপকে আকুল
আকাশ উঠিল ছাপিয়া,
এমন সময় পূর্ব্ব-তোরণ আলো করি রূপে
এলো কে কুমার, এলো কে?
সোনার কাঠির স্পর্শে শিহরি আঁখি মেলে কোন্
রাজার দুলালী এ-লোকে!

* * * *

তত্ত্ব-কথা তো কিছু নাই, ঊষা বারে বারে শুধু
এই বার্ত্তাটি দিয়ে যায়—
যার আলো যার ভালো লাগে, শুধু তারি আলো তারে
জাগরণ-লোকে নিয়ে যায়।
চাওয়া ও চাওয়াতে কত না প্রভেদ! সকলের ডাকে
সকলের মন ওঠে কি?
জলের ফুলটি ফোটে না যেখানে, মিনতিতে সেথা
মনের পুষ্প ফোটে কি?

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

ডাক-টিকিটের ইতিহাস

৬০।৭০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে যে কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে আর এখনও হচ্ছে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষিত সমাজ কতই না চেষ্টা করছেন, তাঁদের দৈনন্দিন কাজগুলিকে সুচারুরূপে অল্প ব্যয়ে চালাবার জন্য; এই চেষ্টার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন,—পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট বা ডাক-বিভাগ। যেখানে ডাক-ঘর নেই, যে-দেশে ডাক-টিকিটের জয়-পতাকা বুকে ক'রে চিঠিগুলি নির্বিঘ্নে যাতায়াত করছে না, এমন জায়গা পৃথিবীতে খুবই কম আছে। এই ডাক-বিভাগ আর ডাক-টিকিটের প্রথম প্রচলনের ইতিহাস বেশ চিত্তাকর্ষক।

ইংরাজী ১৮০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি ইংলণ্ডে প্রথম ডাক বিভাগ খোলা হয়। জায়গায় জায়গায় ডাকঘর স্থাপিত হল বটে, কিন্তু টিকিট তখনও প্রচলিত হয় নি। এই বিভাগের নিয়ম ছিল, পত্র-প্রেরক চিঠিতে টিকিট দিতেন না, যাঁর নামে চিঠি যেত, বিলি করবার সময় তাঁর কাছ থেকে পয়সা আদায় করা হত। এই নিয়মে অসুবিধা ছিল বিস্তর,—হিসাব রাখবার জন্য অসম্ভব সংখ্যায় কেরাণী রাখতে হত, কাজেই চিঠি পাঠাতে ব্যয়ও হত খুব বেশী। এই অভাব-অভিযোগগুলিকে দূর করবার জন্য পার্লামেণ্টের সদস্য সার্ রোলণ্ড হিল 'না-ছোড়-বান্দা' হয়ে পড়লেন। তাঁরই অসীম চেষ্টার ফলে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে Uniform penny-posting Act পাশ হয়, আর সেই বৎসরই এক পেনীর ডাক-টিকিট প্রচলিত হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ২ পেনীর টিকিটও লণ্ডনে চলতে সুরু হয়। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডাক-বিভাগেরও বিশেষ উন্নতি হতে থাকে। ফলে বিশ্ব জুড়ে নানাপ্রকার টিকিটের আবির্ভাব হতে লাগল, তাতে এক দেশের লোক ঘরে বসে মনের সুখে অন্যদেশবাসীর সঙ্গে আলাপ করবার যথেষ্ট অবসর পেলে।

৬০।৭০ বৎসর আগেকার টিকিট সংগ্রহ করা এক

বিভিন্ন দেশের প্রথম প্রচলিত ডাক-টিকিট কচিৎ দেখা যায়। হাজার হাজার টাকা দাম আজকাল সর্ব্ব-প্রথম প্রচলিত টিকিটের। টিকিট আবিষ্কার হবার ১০।১৫ বৎসর পরে অনেকে আগেকার টিকিট সংগ্রহের দিকে মন দেন; কাজেই টিকিট সংগ্রহ করা অবস্থাপন্ন লোকের একটা 'বাই' হয়ে দাঁড়াল, আর তাতে অনেক বেকারের অর্থ-সমস্যাও পূরণ হতে চল্‌লো। পুরানো টিকিট সংগ্রহ করাকে ইংরাজীতে Philately বা Timbrology বলে। এই শব্দ দুটির সৃষ্টিকর্ত্তা প্যারিস এক ভদ্রলোক,—নাম তাঁর হর্পাঁ।

আমেরিকার ব্রুকলীন এসোসিয়েশন পুরানো টিকিট সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য এক সভা স্থাপন করেন। টিকিট-সংগ্রাহকদের উৎসাহ দেবার জন্য লণ্ডনে ১৮৯৭ ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ডাক-টিকিটের একজিবিসন হয়েছিল। তাতে অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য ও বিচিত্র ডাক-টিকিট-পূর্ণ পাঁচশো বই আর অগণ্য টিকিট দেখানো হয়। বৃটিশ মিউজিয়মের কর্ত্তারা তা থেকে বিস্তর অপ্রাপ্য টিকিট কিনে মিউজিয়মে রেখেছিলেন। তার এক-একখানা টিকিটের দাম এখন ৫০০৲।৭০০০৲ টাকা।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে Stamp collectors Magazine আর Gimbsc Post * নামে টিকিট সম্বন্ধে দু'খানি কাগজ প্রকাশিত হয়। ডাক-টিকিট সংগ্রহ করবার জন্য লণ্ডনে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে The London Philatelic, আর ফ্রান্সে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে Lasociet F ancoisede Timbrologic নামে সভা স্থাপিত হয়েছিল। এই সময় থেকে টিকিট সংগ্রহ করা একটা art মধ্যে গণ্য হয়। ইউরোপের অনেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ডাক-টিকিটের আলোচনা হয়।

---

* Stamp-collectors Magazine তিনখানা আর Gimbse Post দু'খানা আমার কাছে আছে; অন্য কারো কাছে যদি থাকে,

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অনুসরণে ব্রেজীলে সর্ব্বপ্রথম টিকিট প্রচলিত হয়। United States of America থেকে ওয়াসিংটন ও ফ্রাঙ্কলিনের ছবি বুকে করে প্রথম ডাক-টিকিট দেখা দিলে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে। কৃষিদেবী 'সিরিসোর' নামের জয় ঘোষণা করে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ফ্রান্সে প্রথম টিকিট বেরিয়েছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারীও টিকিট বার করেছিল। ইংলণ্ডে ডাক-টিকিট প্রচলিত হবার প্রায় দশ বৎসর পরে কুড়ি জায়গায় এর প্রচলন হয়; আর গত ৬০ বৎসরের মধ্যে ছুনিয়াময় টিকিটের আবির্ভাব হয়েছে। বিভিন্ন দেশে নানা রকম চল্‌তি টিকিটের সংখ্যা বিশ হাজার রকমেরও বেশী। তা ছাড়া প্রথম প্রথম যে সব টিকিট বেরিয়েছিল, সে সব আর পাওয়া যায় না, বন্ধ হয়ে গেছে।

মরীসশ দ্বীপের ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচলিত টিকিটের একখানার দাম আজকাল ১৪৫০ পাউণ্ড। বৃটিশ গায়নার এক পেনী দামের প্রথম ষ্ট্যাম্পের দাম এখন ২০০০ পাউণ্ড; তাও পাওয়া যায় না। ক্যানেডার ১২ পেন্সের টিকিট মেলে না। অসম্ভব রকম দাম (ত্রিশ হাজার পাউণ্ড) দিয়েও এই টিকিটখানি কোন সংগ্রাহক সংগ্রহ করতে পারেন নি। সেডাং দেশের (Sedang) প্রথম টিকিটের আলোচনা এখন গল্প-কথায় দাঁড়িয়েছে। অনেকে বলেন Sedang-এর রাজা প্রথমে মোরীর সময় ডাক-টিকিট প্রচলিত হয়েছিল, তার নাম ছিল,—"S. M. be Roides Sedangs." বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট জর্জ্জ একজন শ্রেষ্ঠ ষ্ট্যাম্প বৈজ্ঞানিক ও টিকিট-সংগ্রাহক। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইনি যুবরাজ ছিলেন, তখন ক্যানাডার নূতন ষ্ট্যাম্পের ডিজাইন নিজে তৈরী করেন। ঐ বৎসরেই England Stamp Exhibition থেকে তাঁকে মেডেল দেওয়া হয়।

আমেরিকার Argentine Confederation এর প্রথম টিকিটের পরিকল্পনা করেছিল, সেখানকার এক রুটী-বিক্রেতার ছেলে; সে টিকিটে সেই ছেলেটির নামও লেখা আছে।

ক্যানাডার পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল কনেলকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নূতন টিকিট বার করবার ভার দেওয়া হয়; তিনি টিকিট ছাপবার জন্য আমেরিকা গেলেন। আমেরিকা থেকে টিকিট ছেপে এলে দেখা গেল, পাঁচ সেণ্টের টিকিটে রাজার বদলে কনেলের মূর্ত্তি ছাপা হয়ে গেছে। এই টিকিটের পরিবর্ত্তে রাজার চিত্রসহ নূতন পাঁচ সেণ্টের টিকিট ছাপিয়ে দেবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কনেলকে আদেশ করেন, তিনি তাতে স্বীকার হলেন না। নিজের কাজে ইস্তফা দিয়ে New Brunswick ছেড়ে চলে গেলেন।

১৯১০ সনের ২৯শে নভেম্বর Captain Scott জনকয়েক সহযাত্রী নিয়ে টেরানেভা জাহাজে নিউজিলণ্ড পোর্ট থেকে ধ্রুব আবিষ্কার করতে বেরিয়ে ছিলেন। নিউজিলণ্ড গভর্ণমেণ্ট এর জন্য নূতন রকমের টিকিট ছাপিয়ে দেন আর কেপ ইভান্সে একটা পোষ্ট অফিস খোলা হয়; এই ডাক-ঘরের কর্ত্তা ছিলেন Captain Shackleton :—কেপ ইভান্স থেকে জায়গায় জায়গায় যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল, তার উপরকার ছাপ মারা টিকিটের দাম আজকাল অনেক ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারী ক্যাপ্টেন স্কটের মৃত্যু আর টেরানেভার দুর্ঘটনার সংবাদ লণ্ডনে পৌছায়। সেই থেকে ধ্রুব-আবিষ্কারের টিকিটের দামও খুব বেড়ে গেছে।

গত মহা যুদ্ধের সময় যখন ভারতবাসী যুদ্ধে যেতে আরম্ভ করলে, তখন তাদের জন্য ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এক রকম পোষ্ট কার্ড ছাপিয়ে দেন, এতে কোন রকম টিকিট ছাপা হোত না। আমাদের দেশী রাজ্যগুলির টিকিটে বিশেষত্ব আছে; সে সব টিকিট নিজের নিজের রাজার একটা বিশেষ চিহ্ন বুকে করে ঘুরে বেড়ায়।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

উদ্‌ভ্রান্ত

যে অমৃত লুকান তোমায়,
সে কোথায় !

দিনের শেষে রক্ত-রাঙা আহত বীরের মতো, সূর্য্য পশ্চিমের কোলে ঢ'লে পড়েছে। ঠিক তারি মতো সারা-দিনের শ্রম-শ্রান্ত এক তরুণ যুবক এক ভাঙা মেস-বাড়ীর ছোট ঘরের কোণে, তার মলিন বিছানার উপর বসে পড়ল। ধীরে ধীরে তার গায়ের ময়লা জামা খুলে, কোঁচার খুঁটে মুখের ঘাম মুছে, সে তার ঘর্ম্মক্লান্ত শিথিল শরীরটাকে বিছানার উপর এলিয়ে দিয়ে চোখ মুদে শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ এমনি ভাবে শুয়ে থাকার পর যখন তার তন্দ্রা ছুটে গেল, তখন তার পাশের ঘরে কে কবিতা পড়ছিল, চরণ তার কাণে এসে বাজল—

—To drink life to the less...

কথাগুলো তার মনের মধ্যে একটা উত্তেজনার কোলা-হল জাগিয়ে তুললে! এই জীবন, কতটুকু বা এ, কিন্তু একে উপভোগ করা হয়নি! এতদিন যেভাবে সে জীবন যাপন করে এসেছে, আর তা ভাল লাগেনা একঘেয়ে। মন মন তার বিরক্তিতে ভরে উঠেছে একে নিয়ে। এতদিন সে গড্ডা-রুটীনের পথ দিয়ে চলে এসেছে, মাঝে মাঝে হয়ত চল্‌তি পথের বাহিরেও গিয়ে পড়েছে, কিন্তু তারি পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে সবুজ ঘাসের বুকের উপর দিয়ে, বকুল তলার ঝরা ফুলের আঁচল ঘিরে, নিবিড় বনানীর অন্ধকার ভেদ করে, আলোছায়ায় ঢাকা অস্থির জীবনের যে বিচিত্র পথ অজানায় গিয়ে মিশেছে, তার সঙ্গে ত তার পরিচয় কখনো হয়নি! আজ এত দিনের পর সবার-জানা পথের পথিক তার মন হঠাৎ কেমনে সবার না—জানা-পথের সন্ধান পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল, কে জানে! ব্যাকুল মন তার সম্মুখের রহস্যাবৃত ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যে ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মর্ম্ম ভেদ করতে চায়। মন তার উন্মাদ অশান্ত উদ্দাম গতিতে ছুটতে চায় [illegible] এতদিনের এত বৎসরের নিজের হাতে

কেমন পথের মাঝ দিয়ে অতীতকে অতিক্রম করে সে বর্ত্তমানে এসে পড়েছে। আগে যারা চলে গিয়েছে এই পথে, তারা চিহ্ন রেখে গিয়েছে তাদের জন্য যারা এই পথে আসবে, তাদের জন্য; সেই পদচিহ্ন ধরে চলে যাওয়া ঢের সোজা; কিন্তু এই গতানুগতিকতার পথ ছাড়তে হবে, অজানা পথে পাড়ি জমাতে হবে! তাতে যে আনন্দ, যে সুখ তা অনুভব করবার জন্য উন্মুখ তার মন, কোনো বাধা-বিঘ্নই মানতে চায় না! তার মন তখন বিদ্রোহীর সুরে গর্জ্জন করে উঠেছে—

"আমি ধূমকেতু, আমি দাবাগ্নি,
অভিশাপ আমি পৃথ্বীর,
আমি টর্পেডো আমি ভীম,
ভাসমান মাইন,
আমি মানি নাকো কোনো আইন।"

তার মন তখন চায় শুধু এই বর্ত্তমান—এই নিরাশায় ঘেরা শুষ্ক গতানুগতিকতার উপর গড়ে তোলা এই বর্ত্তমানকে ধাক্কা দিয়ে ভূমিসাৎ করতে। অতীতের ভিতের উপর গড়া বর্ত্তমান তার—এই ভাঙা মেশ-বাড়ী, অন্ধকার ঘরের কোণ, খোঁটা, ঠেকা দিয়ে রাখা তক্তাপোষ, মলিন ঘর্ম্মাক্ত দুর্গন্ধ বিছানা—সব কদর্য্যতায় ভরা! সম্পত্তি তার রঙীন টিনের তোরঙ্গ, সহায় তার শরীরের সামর্থ্য আর ত্রিশ টাকা মাহিনা...

পাশের ঘরের লোকটী তখন ইংরাজি ছেড়ে বাংলা পড়ছে—তার সুর যেন ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—

"তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি আমি উন্মাদ
আমি উন্মাদ
মোর টুটিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!"

উত্তেজনায় তার হৃৎপিণ্ড সচল এঞ্জিনের "পিষ্টনের" মতো বুকের মধ্যে দাপাদাপি সুরু করে দিয়েছে। যেন কত বৎসরের সঞ্চিত গ্লানি, গাছের পাতার নাড়া-পাওয়া শিশিরের মতো ঝরে পড়ল। তার শরীর অমিত তেজে পূর্ণ হয়ে উঠল।...

এক

(ডায়েরি থেকে)

···অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার আনন্দে মেতে উঠেছি কিন্তু তবুও যাবার আগে আমার এই সব অকিঞ্চিৎকর জিনিষগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। আমি চলে গেলে মেশের ম্যানেজার ফাঁকি পড়বে। তা পড়ুক। আমি নিজেও ত কম ফাঁকি পড়িনি, তবে আমিই বা কেন অপরকে ফাঁকি দেব না? Tooth for tooth—রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত চাই। অত্যাচার! অত্যাচারী নয় কে? পৃথিবীতে দুটো দল আছে;—এক স্বার্থান্ধ লোভী অত্যাচারীদের দল, আর এক দুর্ব্বল অসহায় নিপীড়িতদের দল।

যে দিন আমায় আশ্রয়-হারা করে আমার আত্মীয় শত্রুর দল আমায় দূর করে দিলে, তখন আমার চোখের সামনে পৃথিবীটা সব ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল। সব অচেনা—রঙ তার বদলে গেল।

সেদিন—কি ভীষণ রাতই না কেটেছে। ঝড় ওঠবার আগে প্রকৃতি শুব্ধ গম্ভীর মুখে চোখ রাঙিয়ে ছিল। কিন্তু মনে তখন আমার ঝড় উঠেছে। প্রকৃতির চোখ-রাঙানিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, কিছু না ভেবে অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, যেমন আজও সেই পথের সন্ধানে ছুটেছি। সে রাতে ঝড়-বৃষ্টির কি মাতামাতিই না চলেছিল। তারি মাঝ দিয়ে জ্ঞানহারা হয়ে ছুটেছিলাম—যখন জ্ঞান হল তখন দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—আগের রাতে প্রকৃতির মুখে ঝড়ের যে ভীষণ ভ্রূকুটী দেখেছিলাম, আজ দেখি সেখানে তার মুখে প্রভাত সূর্য্যের সোণার আলোর ঝলক ঠিক্‌রে হাসি ফুটেছে! বিস্ময়ের প্রথম চমক কাটিয়ে দেখি—নিষ্করুণ এই জগতের পথে করুণতার মূর্ত্তি ধরে কে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, এই স্নিগ্ধ সুরম্য কক্ষের কুন্দ-শুভ্র শয্যায়। আমার মুখের ওপর রাখা তার অপলক চাউনির স্নিগ্ধতা আমি যেন আমার বুকের মধ্যে অনুভব করছিলাম!

ছোট্ট একটি মেয়ে বয়স হয়ত সাত-আট বৎসর। এক বৃদ্ধ, সৌম্য কান্তি তাঁরই কাছে বসে আমার দিকে চেয়ে—অপলক দৃষ্টিতে। মেয়েটির কচি মুখে সে কী স্বর্গীয় সুষমা! তার দৃষ্টিতে কী সে স্নিগ্ধ জ্যোতি! আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমার জীবনের দানবিকতার অত্যাচারের টন্‌টনে ব্যথা তার পরশে সব উপশম হয়ে গেল। এই ছোট মেয়েটীর স্নেহ-বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেলাম। তার সাথীরূপে তার শিক্ষকরূপে কতদিন তার কাছে কাটিয়ে দিলাম। তার পর একদিন সকল বাঁধন ছিঁড়ে সবার চোখের জলের মধ্য দিয়ে বিদায় উৎসবের বাঁশরী সুরে "চিন ঘরের মেয়ে অচিন্ ঘরে বধূ" হয়ে গেল। আমিও চলে গেলাম সেখান হতে। শূন্য সে স্থান আর ভাল লাগল না। আলাপ জমে উঠতে না উঠ্‌তে রাগিণী-মুখর বীণার তার সব কটা ছিঁড়ে বেসুরো হয়ে গেল।

তার পর সুরু হল সবার সঙ্গে পথের সাথী হয়ে সাধারণ জীবনের রাজপথে চলা,—তার বীভৎস বৈচিত্র্য হীনতার মধ্য দিয়ে কলুর বলদের মতো। হয়ত এমনি ভাবেই ঘুরে জীবনের শেষ হয়ে যেত, কিন্তু একদিন হঠাৎ আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুক্তি পেলাম। যার কাজ করে জীবনকে জানবার সুযোগ পেতাম না, একদিন সেইই আমায় কর্ম্মচ্যুত করে সে সুযোগ এনে দিলে। কিন্তু প্রথমে, সারা শরীর ও মন আমার অবসাদে ভরে উঠল। ভাবলাম—কিন্তু জীবন, এর এইখানেই শেষ! কিন্তু তার পর হঠাৎ শুনতে পেলাম—

To drink life to the less.

জীবনকে শুষে ফেলতে হবে, তার অমৃত, তার বিষ আকণ্ঠ পান করতে হবে! "ষ্টার্ট" পাওয়া মোটর এঞ্জিনের মতো বুকের মধ্যে আমার শক্তি নেচে উঠল—তারি বেগে অন্ধকারের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম।—

দুই

স্বচ্ছন্দ অব্যাহত গতি আমার ব্যাহত হয়ে পড়েছে। কার দোষ? আমার কি?—না। এ যদি দোষ হয় তো আমার কর্ত্তব্য কি। বেশ ভেবে দেখেছি, কোনো ত্রুটী নেই, এ স্থলে আমি যা করেছি তা না করে কি করতে পারতাম,—কি করা উচিত ছিল আমার—

সেই ত রাতে বার হলাম, আমার উত্তেজিত মনকে সাথী করে। কত রাত তখন, জানিনা। দেখি বড়, বড়

বাড়ীর গাড়ী-বারান্দার তলায় ফুটপাথে, রকে সারি সারি কলকাতার গৃহ-হারা শ্রবজীবীর দল শুয়ে পড়েছে। এই সব কর্ম্ম-ক্লান্ত শ্রমিকদের নিষিক্ত সুষুপ্তির মাঝে ঘুমহারা চোখে উত্তেজিত আমি পথে চলেছি। কত অসংলগ্ন চিন্তার জালে মন আমার বদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু আমার সেই চিন্তার জাল ভেদ করে মনের দুয়ারে ঘা দিলে এক ফুঁপিয়ে কান্নার রেশ। একটা অন্ধকার কোণ হতে কান্নার স্রোত ঝরে আসছিল। একটু চম্‌কে উঠলাম। দেখি—একটী বছর বারোর ছেলে—হয়ত কাদের চাকর,—কাঁদছে! কান্নার কারণ আমি জানতাম না। কিন্তু অত্যাচারিত আমি, আমার বোধ হল—প্রভুর অত্যাচারে বালকের—এই নিপীড়িতের ব্যথা অশ্রুর আকারে ঝরে পড়েছে। কল্পনায়—তার চোখের জলের সচল ফোঁটা প্রভাতের আলো-লাগা শিশিরের মতো জলে উঠল, দেখে শিউরে উঠলাম। তাড়াতাড়ি তার হাতটা শক্তভাবে ধরে নাড়া দিয়ে প্রশ্ন করলাম—কি হয়েছে রে তোর!

চম্‌কে উঠে, তার কান্না গিলে ফেলে, একবার তার চোখের দৃষ্টি আমার মুখের উপর ফেলে ভয়ে ভয়ে সে প্রশ্ন করলে—তুমি কে?

বিরক্ত হয়ে তার হাতটাকে আর একটু শক্ত ভাবে টিপে অস্থিরভাবে বললাম—তোর হয়েছে কি বল্? বাবু মেরেছে? সে শুধু ঘাড় নাড়লে।

চল্, দেখি তোর বাবুকে—বলে তার হাতে ধরে টান্‌তে টানতে তাকে নিয়ে চললাম। সেও মূকের মতো, আমাকে তার বাবুর কাছে নিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকেই রূঢ় ভাবে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম—একে মেরেছ কেন?

বাবু তখন ইজি চেয়ারে বসে কি পড়ছিলেন। আমার কথা শুনে বইখানা সরিয়ে একটা তীব্র দৃষ্টি হেনে, প্রথমটা একটু দমে গিয়ে তাঁর দরোয়ানকে হাঁক দিলেন। উন্মাদের মতো গিয়ে তাঁকে আক্রমণ করলাম। ফলে আমার আসতে হল—জেলে, এক বৎসরের কড়ারে।

এই বন্দীত্ব, এতে আমার স্বাধীন গতি ব্যাহত হয়ে পড়েছে বটে, সেই রুটিনের ধরা-বাঁধা পথে চলেছি বটে, কিন্তু নূতনত্বও বড় কম পাইনি। আমার বন্দীত্বের এই সব সঙ্গী,—এদের মধ্যে নানা রকমের, নানা ধাঁচের মানুষ আছে কত রকমের মত-বাদ আছে এদের ভিতর; কত ধরণের আদর্শ এরা অনুসরণ করে, কত কি নিয়ম তারা পালন করে; একের সঙ্গে অপরের আপাতত কোথাও মিল নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে, একটু অবিহিত চিত্তে শুনলে বোঝা যায়—সবারই প্রাণের বীণার তারে ধ্বনিত হচ্ছে—কী এক অতৃপ্তির রাগিণী! কিন্তু বাস্তবতার চাপে সব সূক্ষ্মতা, সব কারুকার্য্যটুকু লোপ পেয়েছে। ফলে গান তাদের তাল হারিয়ে প্রাণহীন দেহের মতো বীভৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের মধ্যে কত শক্তি উপ্ত রয়েছে, তা লুপ্ত না হলেও সুপ্ত হয়ে পড়েছে। এদের জাগিয়ে দিতে হবে; এদের জানিয়ে দিতে হবে, কত শক্তি তাদের, কি না তারা করতে পারে। এদের মিলিত সংহত শক্তি কত ভীষণ, কত প্রবল......

এ কথা তাদের বোঝাতে হলে, এদের সাথের সাথী হতে হবে, প্রাণের বন্ধু হতে হবে, এদের কর্ম্মের সহকারী হতে হবে।

বন্দীত্বের মাঝে, দড়ি-পাকানোর অবসরে আমার এই সব বিচিত্র সাথী আর বন্ধুদের সঙ্গ আমার মনের সঙ্গে অনেক কিছুরই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল। ফলে জীবনের কঠোরতার মধ্যেও মন আমার বিচিত্র আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠত।

তিন

মুক্তি, আবার মুক্তি ফিরে পেয়েছি, আবার প্রাণে সতেজ উত্তেজনার জোয়ার বইছে। কত দীনের প্রতি প্রবলের অত্যাচারের কথা, কত অবিচারের কথা শুনি; প্রাণে আগুন জলে ওঠে। মনে শত সূর্য্যের তেজ নিয়ে শত ধূমকেতুর প্রাণে-শক্তি ধরে—সে-সব অত্যাচারের প্রতীকার করি। তারপর হঠাৎ বাস্তবতায় ফিরে আসি। নিজের শক্তিহীনতায় লজ্জায় নুইয়ে পড়ি। মন আমার ধিক্কারে ভরে যায়।

শক্তি, কোনো শক্তি নাই, অথচ তার অভিমান আছে ষোল আনা। এ দৌর্ব্বল্য নিয়ে, অত্যাচারের শোধ নিতে গিয়ে যুদ্ধে আহত হয়ে ফিরে এসেছি। এখন এ

আঘাত সহ্য করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। সঙ্ঘ, সঙ্ঘ – আমার প্রাণ দিয়ে গড়া, শত নিপীড়িতের দীর্ঘ নিশ্বাসের ভিতের উপর স্থাপিত, আশা-আকাঙ্ক্ষায় গড়ে তোলা সঙ্ঘতার স্বার্থ রাখ্‌তে গিয়ে, আমার হৃদয়ে কঠোরতার বাঁধ ভেঙ্গে, হঠাৎ লুকানো পুঞ্জীকৃত স্নেহ-মমতার বান ডেকে উঠেছে। প্রবল শত্রুর আঘাতে দুর্গের দুর্ব্বল প্রাচীরের মতো, আমার সংযমের আসন একেবারে ভেঙে গিয়েছে, আর তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা অসম্ভব।

আমার সঙ্ঘের শত্রু, অত্যাচারীর শাস্তি যখন নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল, তখন তাকে দমন কর্ব্বার ভার, নিজের স্কন্ধে তুলে নিলাম। তখন জানিনি, বুঝতে পারিনি, আমার ক্ষমতার সীমার অতিরিক্ত এ ভাব কি না। তারপর অত্যাচারীর শাস্তি দিয়ে, শত্রুকে চিরজীবনের মতো শান্ত করে নিয়েছি, তখন আমার সেই প্রথম জীবনের দুর্যোগ রাতের আশ্রয়, শান্তি, কতদিনের-না-দেখা-সাথী ছাত্রী রুচি এসে আমার সামনে দাঁড়াল। তার চক্ষে সে কী তীব্র দৃষ্টি। আমার বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। কিন্তু সে একটী চীৎকার কর্ব্বার পূর্ব্বেই, আমার কম্পিত হস্তের রিভলবারের এক গুলিতে সব শেষ করে, তাকে ভূমিতে রক্ত-শয্যায় লুটিয়ে, টল্‌তে টল্‌তে অন্ধের মতো ফিরে এলাম, আমার অন্ধকার কক্ষটীতে।

কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি এখনও আমার চোখের সামনে জ্বল্‌ছে। অন্তর আমার বিকল হয়ে উঠেছে। হৃদয়ের সকল বৃত্তি লোপ পেয়েছে। আমার শিরায় শিরায় যেন আগুন জ্বলে উঠছে। হয়ত তারি তাপে আমি ভস্ম হয়ে যাব। জীবন—এই তো জীবন—তার সুধা ভাণ্ড খুঁজে পেলাম না, বিষ আকণ্ঠ-পান করেছি। মৃত্যু— এখনও মৃত্যুকে আমার বরণ করে নিতে হবে। হে দানব, তোমার কঠোর হস্তে আমায় নিপীড়িত কর। আমার কতদিনের সাথী—আমার বিপদের বন্ধু লৌহময় আগ্নেয়-অস্ত্র, আজ প্রকৃত বন্ধুর মতো তোমার অগ্নি চুম্বনে আমায় অধর অভিসিঞ্চিত কর।...

শ্রীভূপতি চৌধুরী।

গাড়োয়ান

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

রাম পাঁড়ে নাম পশ্চিমে ধাম, নাহি সঙ্গতি তার,
দিবসের শেষে ঘরে ফিরে এসে দুটী ভাত পাওয়া ভার—
কোনদিনও তার দু' বেলা আহার ভাগ্যে থাকে না লেখা,
নাহি পরিজন বিদেশে বিজন, থাকে সংসারে একা!
তাড়ি-মদ তার দিনের আহার, যা কিছু অর্থ পায়—
রোগ-শোক চাহি' কিছু রাখে নাকো, মদে সব চলে যায়!
মূর্খ, মাতাল, কাটে তার কাল, কে তারে কহিবে ভালো?
অজ্ঞানতার ঘোর সে আঁধার, কে সেথা জ্বালিবে আলো?

বিধির আদেশে নেমে এল দেশে যখন বন্যা হায়,
দুরন্ত জল করি কলকল সারা দেশ ছেয়ে যায়,
ডুবিল ধনীর বিলাস-কুঞ্জ উদ্যান শত শত
বন্যার জলে ভাঙে দলে দলে দরিদ্র-গেহ যত!
পাকা ধানগুলি কে আনিবে তুলি? ক্ষেত্রে রহিল পড়ে—
সময় ত নাই, ব্যস্ত সবাই আপন-জীবন-তরে!
যত দূর হায়, চোখে দেখা যায়,—জল, সে কেবলি জল
বয়ে চলে জল কল-কল-কল নিষ্ঠুর চঞ্চল!

মৃত্যু তপন মাগিল যখন কালো সলিলের তলে,
আশার স্বপন ডুবিল তখন মৃত্যু-শীতল জলে!
রজনী আঁধার, নাহি তারা-হার শশীর মুকুট-মণি—
অম্বরমাঝে রহি' রহি' বাজে ডম্বরু-গরজনি!
মানুষ তখন হতাশা-মগন কাতরে কাঁদিয়া কহে,
"দয়া না করিলে অতল সলিলে সৃষ্টি ত নাহি রহে!"

নদী জল-ধার বহিবারে আর দু'তীরে বাঁধিতে নারে,
দুকুল ছাপায়ে ধরণী কাঁপায়ে বহে জল তীর-ধারে!

হিংসা-কুটীল ধূম্র সলিল গরজি নাচিয়া ছুটে,
আবর্ত্তে ছুটি কুল পরে লুটি' বেলার বাঁধন টুটে!
মৃত্যু-ভীষণ তটিনী-শ্বসন তীর-স্রোতে নদী ধায়,
বাজে তার প্রাণে মৃত্যুর গানে রোষ-গর্জ্জন, হায়!

শ্লথ তরী হতে মৃত্যুর স্রোতে সহসা কে গেল পড়ে?
ছুটিয়া এল কে উর্ম্মি ঝলকে মৃত্যু-মুরতি ধরে?
ফণা বিস্তারি বিষ উদ্গারি ঝলকে ঝলকে নদী
মেলিয়া মরণ ত্বরিৎ চরণ গরজিল নিরবধি!
নিঠুর সলিল-সমাধি হইতে তাহারে বাঁচাবে কেবা?
আজি এ জীবন-মরণের ক্ষণে করিবে মানুষ সেবা?
ছবির মতন হাজার মানুষ তীরে দাঁড়াইয়া রহে—
যে যাবে বাঁচাতে, আপনি মরিবে,—আপনা-আপনি কহে।
অভাগা যখন হতাশা-মগন বাহু দুটী তুলি হায়,
নীরব নিঠুর সহাস সুনীল গগনে ধরিতে চায়,
কণ্ঠে তাহার শুধু একবার ফুটিল হতাশা-বাণী
"কে বাঁচাবে হায়, কে বাঁচাবে মোরে ভাগ্যে মৃত্যু জানি!"
তবু যারা তীরে ছিল দাঁড়াইয়া, গলিল না হিয়া কার—
বলিল না কারো পাষাণ পরাণ বেদন রোদন সার!

তখন মূর্খ মাতাল দুঃখী গাড়োয়ান রাম পাঁড়ে
কর্ম্মের শেষে ঘরে ফিরে এসে ক্ষুধার অন্ন বাড়ে!
শুনিল যখন সলিলে মগন মরিছে মানুষ হায়,—
ক্ষুধার অন্ন ফেলি দিয়া ত্বরা নদী-তীরে ছুটে যায়!

দেখিল যখন উঠিছে ডুবিছে মানুষ, তাহার ভাই—
মাতাল বলে কি অন্তরে তার বিন্দু করুণা নাই?
বারেক কেবল চাহিল মৃত্যু-ভীষণ নদীর পানে,
গর্জ্জন তার মহা হাহাকার বারেক শুনিল কানে,
তার পর তার আঁখি হতে তীর নদী সবি গেল মুছি'
বিপন্ন ভায়ে দেখিল কেবল, অন্তর তার শুচি!
নদী-গর্জ্জন গানের মতন বাজিল তাহার কানে
বিপদ-আপদ সব ভুলি ঝাঁপ দিল নির্ভীক প্রাণে!

গরজি গরজি ফুলিয়া ফুলিয়া ভাদ্রের ভরা নদী
তরঙ্গ-ফণা মেলিয়া গগনে ছুটে চলে নিরবধি!
বিপুল পাথার সাঁতারি যখন রাম পাঁড়ে গাড়োয়ান
সলিল-মগন জনারে ধরিল, তাহার বিজয়-গান
উঠিল গগনে সে শুভ লগনে, সবে কহে, "জয়-জয়!"
মৃত্যুর মাঝে নিঃসংশয় গাড়োয়ান নির্ভয়!
ওগো প্রাণবান বীর গাড়োয়ান, ধন্য তোমার হিয়া—
গড়েছে তোমায় দয়াময় বিধি সুধা-নদী মন্থিয়া!
যে কহে তোমায় 'মাতাল, মূর্খ' সে-জন অন্ধ, হায়,
পরের লাগিয়া ক'জন কাঁদিয়া প্রাণ বলি দিতে চায়!
পরের লাগিয়া মরণ মাগিয়া চেয়েছিলে দিতে প্রাণ,
হাজার কণ্ঠে গগন মন্থে' গাহে আজ জয়-গান!

হুমায়ুন জহিরুদ্দিন আমির-ই-কবীর।

মা

লিভার হয়ে মেয়েটী মারা যাবার পর খোকারও যখন ঐ লিভার খারাপ বোধ হল, তখন মনটা আমার ভাবনায় ভরে উঠল। ডাক্তারের কাছে দস্তুরমত উপদেশ নিয়ে গোড়া থেকেই রীতিমত সাবধানে আমরা তা মেনে চলতে লাগলাম।

ডাক্তার নিয়ম-মত আসছিলেন। মুখে তিনি বিশেষ কিছু বলতেন না, কিন্তু চোখ-মুখের এমন একটা ভাব করতেন যে মুখ ফুটে না বললেও বুঝতে আমাদের কিছুই বাকি থাকত না! ওষুধ-পথ্য প্রভৃতির একটু-আধটু এদিক ওদিক করে ফিরে যাবার সময় ডাক্তার রোজই বলতেন, খুব

সাবধান! একদিন জবাবে আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম যে কোনই অনিয়ম হয়নি। যেতে যেতে আমার কথা শুনে ডাক্তার হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—সেজন্য বাহাদুরী নেবারও সময় হয়নি। কথা কটি এই,—কিন্তু এমনি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কথাগুলি তিনি বললেন যে শুনে মুহূর্ত্তের মধ্যে মনটা তাঁর উপর নারাজ হয়ে উঠল। একবার মনে হল, অন্য ডাক্তার ডাকি। কিন্তু আবার ভাবলাম, খোকা যদি বাঁচে, আমি না হয় একটু সহ্য করলামই!

ভাবতে ভাবতে তাই ঘরের মধ্যে ফিরে এলাম। ছেলেকে কোলে নিয়ে রাণী চুপ করে বসে ছিলেন। এমনি একটা উদাস ছায়া তাঁর মুখের ওপর পড়েছিল যে পরামর্শ করব বলে ঘরে ঢুকে সেই মুখের দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলাম।

কাছে গিয়ে দেখলাম, খোকা ঘুমুচ্ছে। রাণীকে বললাম, —ওকে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে একবার এসো এ ঘরে—একটা কথা আছে।—

—বল, এখানেই শুনছি।

—ওকে শুইয়ে দাও না—এখন ত ঘুমুচ্ছে।

—ঘুম নয়, ও আচ্ছন্নি—শোয়াতে গেলেই কাঁদবে।

—তুমিই ত অভ্যাস খারাপ করে দিয়েচ—চব্বিশ ঘণ্টা কোলে রেখে রেখে এমনি করে তুলেচ যে—

—তুলেচি ত তুলেচি। তোমায় ত ডাকচি নে কোলে করতে!

—ডাকচ না বটে, কিন্তু যা করচ তাতে একদিন কাঁধে করাবে তোমাকে। আচ্ছা, দেখ দেখি একবার আরশিখানা কি হয়ে গিয়েচে তোমার চেহারাটা—

—থাক্! বিয়ের কনেটী কিনা আমি যে চেহারা নিয়ে বসে থাকব! যাও তুমি এখান থেকে। আমায় বকিয়ো না বলচি—

আমি চলে এলাম। কারণ কথায় কথা বাড়ত এবং ফল হতো উল্‌টো—দশ বছর ধরে দেখে আসচি তো।

বাইরের ঘরে এসে একখানা বই নিয়ে বসলাম কিন্তু পড়তে ভাল লাগল না। বই বন্ধ করে শেষে তাকিয়া নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কত কথা মনে পড়তে লাগল। কত দিনের কত পুরোনো কথা—কত খুঁটিনাটি—চারদিক থেকে যেন ছুটোছুটি করে সব আসতে লাগল। আমি দেখতে লাগলাম, আমারই চোখের সামনে আমার জীবন হেসে খেলে চলে যাচ্ছে।—তন্দ্রাতের মধ্যে এই যে সব উজান চলেচে, আর আমিও দেখচি চোখ বুজে। কিন্তু যা দেখছিলাম যদিও তার ঘটনা সবই জানা, সবই চেনা, তবুও বুঝছিলাম যে দেখতে বেশ ভাল লাগচে!

দেখলাম, রাণীকে সঙ্গে করে চিড়িয়াখানা দেখতে গেছি। —বানর, বনমানুষ, সাপ, বাঘ, কত রকমের কত রঙের কত পাখী, নাম-না-জানা আরো কত রকমের কত কি সব জানোয়ার দেখে রাণীর মুখে-চোখে আনন্দ ধরচে না—পায়ে শ্রান্তি আসচে না—এদিকে আমার পা ব্যথা হয়ে গিয়েচে। জলের ধারে একটা বকুল গাছের তলায় একখানা বেঞ্চে আমরা বসলাম। একটু দূরে সামনে একটা মাচার ওপর একটী ভদ্রলোক পরম সহিষ্ণুভাবে ছিপ নিয়ে বসেছিলেন। আমি মাছ ধরা দেখছিলাম কিন্তু রাণীর চোখ ছিল অন্যদিকে, —যেখানে সবুজ ঘাসের ওপর ছোট একখানা ঠেলা গাড়ীর মধ্যে আরো ছোট একটী ঘুমন্ত শিশুর জাগরণের অপেক্ষায় একজন আয়া বসেছিল। অনেকক্ষণ পরে রাণী আমায় ডেকে সেই দিকে দেখিয়ে বলল—দেখ, ছেলেটী হাসচে! ঘুমুতে ঘুমুতে বোধ হয় স্বপ্ন দেখচে—

ফেরবার পথে অন্যমনস্ক রাণীকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি ভাবচ? জবাবে সে কিছুই বলল না; শুধু একটা বিশেষ ভঙ্গীতে আমায় জানিয়ে দিল যে বিশেষ কিছুই সে ভাবচে না।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন দেখলে চিড়িয়াখানা?

কথাটার কোন রকম জবাবই সে দিল না—কথাটা হয়ত তার কানেই পৌঁছয় নি! তার পর আবার যখন আমি আমার কথাটা বললাম, তখন নিতান্ত করুণভাবে রাণী আমার মুখে দিকে শুধু একবার চাইল, যেন এই বলতে যে, কেন মিছামিছি আমি তাকে বিরক্ত করচি!

সারা পথ আর কোন কথা আমি জিজ্ঞাসা করিনি।

শুধু মাঝে মাঝে রাণীর মুখের দিকে চেয়ে দেখেছি,—গোপন গভীর আবেগ সে মুখে উথলে উঠেচে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে তাই আমি আবার বললাম—তোমার রকম কি, রাণী, ছেলেটা ত ঘুমিয়ে দেখছিল, তুমি যে জেগে স্বপ্ন দেখচ—

এ কথারও কোন জবাব আমি পাইনি। হয়ত আমার কথা একেবারে সে শুনতেও পায়নি বুঝে তাই আমি আর কোন প্রশ্ন করে তাকে বিরক্ত করিনি, শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে বারবার ভেবেচি, কি কথা সে আজ এমন তন্ময় হয়ে ভাবচে!

—নাবার জল দিছি বাবু—

শুনে চমকে উঠলাম! চেয়ে দেখি, হরে তেল-গামছা নিয়ে এসে আমায় ডাকচে।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ।

নারীর কথা

রাজনীতি-ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আজ আমরা বলছি "স্বাধীনতাই মানবের জন্মগত অধিকার," কিন্তু সমাজে ফিরে এসেই করছি সে নীতির ব্যভিচার। সত্য যা, তা সর্ব্বত্র সত্য; তা নিজের বেলাই হোক্ বা পরের বেলাই হোক্। সত্যকে সমান সম্মান করাই সত্যনিষ্ঠের কাজ। সাধারণ মানুষ কিন্তু জন্মগত অধিকারের নীতিটাকে নিজের কথা স্মরণ করেই আওড়ায়। নিজের সুখ-সুবিধা ষোল আনার স্থলে পনেরো আনার সম্ভাবনা দেখতে পেলেই সে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে নীতিটাকে পেছন থেকে টেনে রাখতে চায়। সুতরাং আমরা দেখছি যে মানুষের মাঝে বর্ত্তমান রয়েছে দুটা পরস্পর-বিরোধী ভাব,—স্বাধীনতা আর কর্ত্তৃত্ব। অর্থাৎ স্বাধীনতা হচ্ছে আত্মস্বাধীনতা এবং কর্ত্তৃত্ব পর-কর্ত্তৃত্ব। তাই রাষ্ট্রনেতা সেজে নিজের জন্য যা বলছি সমাজে এসে পরের জন্য তা বলছিনে। যে পাষাণের দুর্ব্বহ চাপে শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে মুক্তির জন্য চীৎকার করে উঠছি সে পাষাণের বোঝা-ই অন্যের বুকে চেপে রাখতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করছিনে, প্রাণে এতটুকু ব্যথা বাজছেনা। এই অসামঞ্জস্য-পূর্ণ স্বার্থান্ধ বুদ্ধি দিয়েই সমাজে মানুষ মানুষকে ঠেকিয়ে রাখে, দাবিয়ে রাখে, ছোট-বড়র গণ্ডী আঁকে, অধিকারীত্ব অনধিকারীত্বের সৃষ্টি করে—মিথ্যা ভোগায় বুজরুকিতে শাসনের সহস্র কল গড়ে, লক্ষ জাল ছড়িয়ে দেয়। আজ কর্ত্তৃত্বের অনাচার, স্বার্থান্ধতার উৎপীড়ন, যথেচ্ছাচারের উৎকট লীলা যে আমাদের সমাজকে কত দিক দিয়ে কতভাবে পচিয়ে তুলছে তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে পুঁথি অফুরান হয়ে ওঠে। নিত্যকার ক্ষুদ্র ঘরখানা থেকে সুরু করে বিরাট সমাজে পর্য্যন্ত দেখতে পাই এই কর্ত্তৃত্বেরই খেলা। একই আলো বাতাসের সমভাগী করে একই অবয়বে একই আকাশতল চলতে দিয়ে বিধাতা মানুয়ের অধিকারের অবৈষম্য প্রচার করলেও মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ, ছাতা মাথায় দেওয়ার অপরাধে পেরিয়ার মাথাটা চূর্ণ করে দিয়ে তার অনধিকার প্রমাণ করতে ত্রুটী করে না। এমনি, যার ভয়ে তার জাত-ভাই মানুষকে শঙ্কিত প্রাণে প্রতি মুহূর্ত্তে চলতে হয়, তারই মুখে "স্বাধীনতাই মানবের জন্মগত অধিকার এই বুলির মত হাস্যকর কি আছে জানি না!

আমাদের এই কর্ত্তৃত্বের অনাচার সব-চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে নারীর বেলা। আমরা যুক্তি দিতে গিয়ে বলছি, এ ব্যভিচার তো ব্যভিচার নয়, এ তো বিধাতারই আইন মেনে নেওয়া। নারী যে নারী, পুরুষ যে পুরুষ এই ভেদকে বিধাতার বিধান বলে ব্যাখ্যা করে অশীতিপর লোলচর্ম্ম, কুব্জ বৃদ্ধ,মৃত পত্নীক লক্ষ্মণ সার্ব্বভৌম এক দিকে নিজের তৃপ্তি চরিতার্থতার জন্য রূপসী ষোড়শী কুমারীর জীবনকে যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন করছেন, তেমনি আর একদিক দিয়েও আবার অবিচার করছেন তার গৃহের অষ্টম বর্ষীয়া শিশু বিধবা কন্যাটীর পুনর্বিবাহের পথে শাস্ত্র-বদ্ধ বিধাতার ইচ্ছাকে ডেকে এনে।

এই অবিচারেই পতির মৃত্যুতে নারীকে হতে হয় পতির সহগামিনী, আর পত্নীর মৃত্যুতে পুরুষের জন্য শাস্ত্র হচ্ছে সদ্য-শ্মশানের অর্দ্ধ-দগ্ধ শবের কাছে দাঁড়িয়ে বিবাহের প্রস্তাব করা। এই অবিচারেই পশুবলে নারীর সর্ব্বনাশ সাধন করে পুরুষের আসন থাকে সমাজে তেমনি অটল আর সেই অত্যাচারিত নিরীহ নারীকেই হতে হয় গৃহত্যক্ত, সমাজচ্যুত; দুর্ভাগ্যের জীবন নিয়ে পথে বাহির।

কর্তৃত্ব জিনিষটা এমনি ভয়ঙ্কর যে সহজেই মানুষ তার অভিমানে সব যুক্তি-তর্ক ভাসিয়ে দিয়ে, আপনার বুদ্ধিকে বড় করে দেখে মনের ছাঁচে জিনিষকে গড়ে তোলে। তাই পুরুষ ভগবানের ইচ্ছাকে জানার বড়াই করে নারীর উপর যথেচ্ছ শাসন চালিয়েছে। নারীর উপর পুরুষের এই বুদ্ধির অহঙ্কার কর্তৃত্বেরই সুযোগ গ্রহণ মাত্র। সুগভীর বিবেচনা বলে পুরুষ একে যতই ব্যাখ্যা দিক্‌না কেন, এই কর্তৃত্বের ভিতর যে একটা স্বার্থ বা তৃপ্তি মাথা গজিয়ে উঠেছে তাকে কিছুতেই ধামা-চাপা দেওয়া চলেনি। নারীর উপর পুরুষের এই চালটাকে লক্ষ্য করে John Stuart Mill বলেছেন, It gratified the pride, the love of power and the personal interest of the whole male sex. বাস্তবিক বিধাতার রাজ্যে সম্মিলিত সম্মতি ছাড়া একের অন্যের জন্য আইন গড়বার অধিকার নেই। মানুষ মানুষের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বা আইন গঠনের সুযোগ পেলেই সেখানে মনিব-ভৃত্যের সম্বন্ধ এসে পড়ে, পরিণামে তা অত্যাচারের ফল হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষ নারীর বেলাতেও হয়েছে তাই, বিশেষ করে আমাদের দেশে তা জঘন্য রূপ ধারণ করেছে। ভাবতে গেলে আজ বিস্ময় লাগে এই যে, এক শ্রেণীর বুদ্ধিশালী পুরোদস্তুর মানুষকে আর এক শ্রেণীরই মানুষ "নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" বলে খাঁচায় পুরে একটা স্বতন্ত্র নগণ্য জীব করে রেখে দিয়েছে! এতে করে ফুটে উঠেছে, নারীজাতির উপর পুরুষের একটা অবিশ্বাস, সন্দেহ, ঘৃণা, ও স্বার্থ। কিন্তু নারীর উপর এই সন্দেহেরই ফলে পুরুষেরও যে মন হয়ে উঠেছে অধিক হতে অধিকতর কলুষিত, এই ঘৃণা পোষণ করে করেই তারও যে চরিত্র হয়ে উঠেছে ঘৃণিত,—শুধু তাই নয়, উভয়েরই মনে যে কু প্রবৃত্তিকে বড় করে তুলেছে এই অন্তরাল সৃষ্টি—এই সব পরোক্ষ ব্যাপারকে পুরুষ অনুভব করেনি। পুরুষের এই সন্দেহ-নজর উপলক্ষে নারীর তরফ থেকে যদি প্রশ্ন হয়, আমাদের যে সন্দেহ করছো, ভাল হওয়ার পক্ষে তোমারই বা কি দলিল আছে? ভুল যদি আমরাও করি তো তোমরাও কি করতে পারো না? ভয় যদি, সন্দেহ যদি আমাদের জন্য তোমাদের হয়, তবে তোমাদের জন্যও কি আমাদের তা হতে পারে না? সুখ-শান্তির চিন্তা তোমরা যেমন করছো, তেমনি সুখ শান্তির আশা কি আমরাও করি না? আজ আমাদের জন্য তোমাদের যেমন ব্যস্ত দেখছি, তেমনি তোমরা নিজেদের সামলাবার ব্যবস্থা কি করছো? সমাজের স্বাস্থ্য বা পবিত্রতা রক্ষা কি কেবল আমাদের দ্বারাই করবে? তখন পুরুষ এর উত্তর কি দেবে?

দেশের সমাজের দিকে লক্ষ্য করে আমরা দেখতে পাই, পুরুষ তার ষোল আনা খেয়াল নারীর উপর চালিয়ে তার মনুষ্যত্বকে তার সত্বাকে লুপ্ত করে দিয়েছে। সমাজের অর্দ্ধেক অঙ্গ আজ চেতনার সুযোগ না পেয়ে ঘরের কোণে জ্ঞান-প্রাণ-হীন অসাড় মাংস-পিণ্ড হয়ে পড়ে আছে। এতে ক্ষতি যে কেবল নারীরই হচ্ছে তা নয়, পুরুষেরও হচ্ছে। যদি শিক্ষায়, দীক্ষায়, চিন্তায়, কর্ম্মে নারী পুরুষের সহযোগিনী হতো, তবে সমাজ আরও সজীব, সুন্দর, মধুময় হয়ে উঠ্‌ত, ব্যক্তি-জীবনের দৈন্য অনেক ঘুচে যেত, বোঝা অনেক কমে আসত। নারীকে পরগাছা করে ও বঞ্চিত রেখে পুরুষ যে কেবল মানুষ-হিসাবে নারীকে অবমানিত করছে এমন নয়, নিজেও অবমানিত হচ্ছে। সংসার-সমুদ্রে নারী পুরুষের গলায় কলসী হয়ে পুরুষকে নিয়ে ডুবে পড়ছে, পুরুষ প্রতি মুহূর্ত্তে একটা তীব্র অস্বস্তি অনুভব করছে। এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে অজ্ঞ নারী তার সঙ্কীর্ণতা ও অন্ধতার শিকলে পুরুষকে আটকিয়ে পিছনে টান্‌ছে। যা পাবে কেবল তার সম্ভাবনাই যে পুরুষের কাজে আস্‌ছে এমন নয়, যা সে পেয়েছে বা পাচ্ছে, তাকেও নারী তিল তিল করে তার অজ্ঞতার সংস্পর্শে কমিয়ে দিচ্ছে।

অন্যদিকে নারীও তার মনুষ্যত্বের অবমাননা বোঝ্‌বার মত মনের দৃষ্টি হারিয়ে বসেছে। কারণ এমনি জীবন

চালিয়ে সে তাকে এই নিয়মের দাস বলেই জেনেছে, সেজে-গুজে প্রতি মুহূর্ত্তে কেবল পুরুষের মনস্তুষ্টি-সাধনাই জীবনের ব্রত বলে জানে, এ ছাড়া বিপুল মনুষ্য-সমাজে মানুষ-জাতি-হিসাবে সে তার ঠাঁই করে নেবার প্রয়োজন বোঝে না। সে জেনে নিয়েছে নিজেকে পুরুষেরই সম্পত্তি বা ভোগের বস্তু —সে ভোগ কখন সেবায়, কখন বিলাসে। নারী যদি জান্‌ত জীবনের মুল্য-হিসাবে প্রধানতঃ সে মানুষ, তা হলে সাজগোজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাক্‌ত না, পুরুষও তাকে দেখেই এমন একটা কৌতূহলে চম্‌কে উঠত না, আজকের মত শ্রদ্ধা হারিয়ে শথেচ্ছ দৃষ্টিতে তাকে দেখতে সাহসী হত না—নারী-পুরুষের ভেদ এত বড় হয়ে উঠত না। পক্ষান্তরে দেহ ও মনের কসরৎ করে করে সজীব মানুষ হয়ে শিক্ষায় দীক্ষায় কর্ম্মে সকল মানুষের সঙ্গে এক হয়ে পড়ে নারী-জীবনের একটা বড় লাভ এই হতো যে আজকের সংবাদ-পত্রের দৈনন্দিন ঘটনা নারী-নিগ্রহ ব্যাপার থেকে রক্ষা পেত বা রক্ষায় সমর্থ হতো। জগতের নিয়মই এই যে, একের ভীরুতা, নির্জীবতা ও হীনতার উপলব্ধি অন্যের স্বেচ্ছাচার-প্রবৃত্তিকে উস্কিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে উপযুক্ততা সজীবতা এবং আত্ম-শক্তিতে নির্ভরতা দেখতে পেলে যমও সরে দাঁড়ায়। আজকে নারী-নিগ্রহ ব্যাপারে পুরুষের অশিক্ষাই যতই গোড়াকার কারণ হোক্, তবু এ কথাও সত্য যে নারীর আত্মোপলব্ধি হীনতার, দুর্ব্বলতার, মন ও দেহের অক্ষমতার সুযোগ ধরেই অশিক্ষিততার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথকে সহজ করে পাচ্ছে। সুতরাং সকল বিষয়ে পুরুষের সাথে সমান হয়ে, তারই মতো যোগ্য হয়ে, সর্ব্ব ক্ষেত্রে একই অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে একই সম্মান নিয়ে দাঁড়ানোতেই একমাত্র এই নারী-নিগ্রহের শান্তি। * আজ লুঠ-তরাজ ডাকাতি পুলিসের থানাতল্লাস প্রভৃতি সব কিছুতেই নারী-নিগ্রহ ব্যাপারটা আনুসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অমৃতসরের ঘটনা থেকে আরম্ভ করে ছোট বড় এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে-সব অমানুষিক ঘটনায় পুরুষ নারীকে রক্ষা করতে পারেনি। নারী তার রক্ষার ভার পুরুষের উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত রেখে গলগ্রহ হয়ে উদাসীন থেকে আত্মরক্ষার ভাবনা ছেড়ে দিয়ে এই অত্যাচারের মুখে কিছুই করে উঠতে পার্‌ছে না। প্রত্যেকের রক্ষা তার নিজেরই হাতে। একে অন্যের রক্ষায় শুধু সাহায্যই কর্‌তে পারে। ষোল আনা রক্ষার ভিতর উৎপীড়িতের আত্মশক্তির ক্রিয়া চাই। পর-নির্ভরতার আর এক বিপদ এই, পর যখন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, তখন নির্ভরকারীকে অসহায় হয়ে পড়্‌তে হয়।

আমাদের সমাজের নারী-সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমরা দেখতে পাই,তারা নিজেদের অবলা বলেই জেনেছে, নিজেকে পুরোপুরি অকর্ম্মণ্য জেনে অক্ষমতার বোঝা নিয়ে একেবারে অলস দেহ ঢেলে পুরুষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। পুরুষ "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" বলে নারীকে পুত্রোৎপাদনের যন্ত্ররূপেই গ্রহণ কর্‌ছে, আর অবশিষ্ট দৃষ্টি—যা দিয়ে তাকে দেখ্‌ছে সে হচ্ছে একটা আরামের সামগ্রী, খেলা বা বিলাসের বস্তু-হিসাবে—সেবা-দাসী বা বক্ষোবিলাসিনী-রূপে। নারীকে এভাবে গ্রহণ করেছে বলেই নারী আজ হয়ে উঠেছে পুরুষের হৃদয়ে ঘৃণ্য, তাই পুরুষ বল্‌ছে, "নারী নরকস্য দ্বারং।" কেবল আমাদের দেশেই নয়, প্রায় সর্ব্বত্র পুরুষ কাব্যে নাটকে চিত্রে নারীর যদৃচ্ছ ছবি এঁকে তার তরল বিলাস-বাসনা চরিতার্থ কর্‌ছে, আর নারীর মানুষ-ভাবকে অমর্য্যাদা কর্‌ছে, তার জীবনকে মূল্যহীন করে তুল্‌ছে; এবং তারই ফলে পুরুষকে পদে পদে নারীর জন্য সাবধান সচকিত থাক্‌তে হচ্ছে। জীবনের কোনো এক সুপ্রভাতে পুরুষ-সম্প্রদায় যদি হঠাৎ জেগে দেখতে পায় যে নারী মানুষেরই জাত, তবে তার এত কালের আচরণ সেই মুহূর্ত্তে একটা ভীষণ অবিচারের আকার ধারণ করে লজ্জায় তার মস্তক অবনত করে

* Bishop Potterএর নিকট Elizabeth Cadyর লিখিত চিঠির এক অংশ আছে—

When our good men in state and church try to suppress the terrible outrages on woman, while they deal with the evil on the surface, they should begin the lasting work of securing to her equal honour, dignity and respect by sharing with her all the liberties they themselves enjoy.

The lesson of inferiority is taught everywhere, and in these terrible tragedies of life we have the result of

বিধাতা সমভাবে পুরো মানুষের ভাবকে নারী-পুরুষের মাঝে নিহিত রেখে জীবনে তার বিকাশকে অনুশীলনের অধীন করে দিয়েছেন। নারী যে আজ স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করেছে, জীবনের দিক দিয়ে যে সে স্বতন্ত্র সৃষ্টি হয়ে পড়েছে, এবং গোড়ায় রয়েছে নারী-পুরুষ উভয়ের চিরবদ্ধ সংস্কার ও পারিপার্শ্বিকতারই প্রভাব। নারী একটা বিশেষ অবস্থায় থেকে থেকেই নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখছে, আর পুরুষও তাকে এ অবস্থায় রেখে রেখেই স্বতন্ত্র জেনে আসছে। এটা হয়েছে তাই Second nature, কিন্তু first nature বা মূল প্রকৃতি নয়। অবস্থার প্রভাবে মানুষের রূপ বদলে যায়—মন বিভিন্ন রং ধরে ওঠে। কাজেই একটা অবস্থার গঠনকে স্বভাব বলে খাড়া করে তোলাতে সুবিচার হয় না। শুধু নারী পুরুষের বেলাই নয়, পুরুষে পুরুষেও অবস্থা-ভেদে এমনি পার্থক্য আমরা দেখেছি। উলঙ্গ বন্য কুকীর মনের ভাব তার ভিতরের মানুষ, আমাদের মনোভাব বা মানুষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এমন কি মানুষের জাতি বলেই তাদের মনে হয় না। এরা যেন মানুষ-বেশী হাত পা অবয়বযুক্ত পশুরই একটা সংস্করণ বিশেষ। কিন্তু এটাই কুকীর স্বভাব (নিজভাব) বা মানুষ হিসাবে First nature বলে জানি তো ভুল করা হয়। এ একটা অবস্থার প্রভাব মাত্র। আলেকজাণ্ডার সেলকার শত্রু কর্তৃক নির্জ্জন দ্বীপে নির্ব্বাসিত হয়ে যে পশুর মত ঘেউ ঘেউ করে ডাকতেন সেটাও তার তেমনি স্বভাব নয়, অবস্থা-বিশেষের প্রভাবেরই ফল। John Stuart Mill তাই নারী-প্রসঙ্গে বলেছেন, I consider it presumption in anyone to pretend to decide what women are or are not, can or cannot be, by natural constitution. They have always hitherto been kept, as far as regards spontaneous development, in so unnatural a state that their nature can not but have been greatly distorted and disguised, and no one can safely pronounce that if women's nature were left to choose its direction as freely as men's, and if no artificial tint were attempted to be given to it except that required by the conditions of human society, and given to both sexes alike there would not be any material difference or perhaps any difference at all in the character and capacities which would unfold themselves. শেষ কথার প্রমাণ বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধে নারীরা বিশেষ ভাবে দিয়েছে। পুলিশের কাজ থেকে কল-কারখানা পর্য্যন্ত সমস্ত কাজের ভা নিয়ে তারা পুরুষেরই মত শক্তির যোগ্যতা দেখাতে ত্রুটি করেনি। দৈহিক শক্তিতে পুরুষ অপেক্ষা হীন বলে নারী বাইরের কাজের অযোগ্য এই সংস্কার প্রতিষ্ঠার বাধা স্বরূপেও এটা একটা দৃষ্টান্ত। এ সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। এই কুমিল্লা সহরেই কয়েক বছর ধরে সাধারণের কাছে ইরাণী-নামে পরিচিত নারী-প্রধান যে এক যাযাবর শ্রেণীর লোক বাস করছে, এই সম্প্রদায়ের নারীদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাও সেই সত্যটাকে মিথ্যা করে দেয়। এখানে দেখতে পাই আমরা নারীর কর্তৃত্ব আর তার বাইরের কাজে তৎপরতা। ভোর বেলা থেকে এরা পাহাড়ে পাহাড়ে বাঁশ বেত সংগ্রহ করে ধামা, ডালা, পেটরা তৈরী করছে, হাট-বাজারে সে সব বিক্রী করে চাল, ডাল ক্রয় করছে বাড়ী ফিরে আবার ঘরকন্না করছে। এমন কি বাইরের সমস্ত কাজ করে করে মেয়েরা সুস্থ সবল পেশল আর তাদের পুরুষরা ঘরে বসে বসে শীর্ণ দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য হয়ে রয়েছে। পুরুষগুলো জরদগব হয়ে ঘরে পড়ে মেয়েদেরই তৈরী অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছে। একেবারে এটা আমাদেরই জগতের একটা উল্টো দিক। অনুশীলনের অভাবে নারী পুরুষের যে কেহই অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে থাকতে পারে, এ হচ্ছে তারই একটা প্রমাণ। এমনি সন্ধানী হতে যেয়ে দেখা যায় নারী পুরুষের যোগ্যতার তারতম্য কোন দিক দিয়েই নেই; বরঞ্চ পুরুষ যা করছে অভ্যাসে, এমন অনেক কিছু নারী সম্পন্ন করছে বিনা-অভ্যাসেই। পুরুষ সহজে অসহিষ্ণু কিন্তু নারী স্বভাবতঃ সহিষ্ণু একাগ্র। পুরুষ কোন কাজ অধৈর্য্য হয়ে ছেড়ে

দিতে পারে কিন্তু নারী তা শেষ পর্য্যন্ত আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। যে শিক্ষা দীক্ষা সাধনার ভিতর দিয়ে পুরুষ আত্মোন্নতি করে চলেছে তাকেও তা লাভের স্থযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে যদি হীন দেখতে পাওয়া যায় তো তবেই তার সম্বন্ধে বিপরীত সিদ্ধান্ত করা চলে। কিন্তু যখনই যেদিকে সুযোগ পেয়েছে সেখানেই তো মানব-জীবনের শক্তি নারীর মাঝে পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করেছে। তাই বিশ্ব নারীর আলোচনায় কৃতিত্ব ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই জোয়ান অব-আর্ক, এলিজাবেথ, ডেবোরা, চাঁদবিবি, রিজিয়া, কর্ম্মদেবী, ঝান্সীর রাণী, দুর্গাবতী, তারাবাঈ, আউসকোয়ার, লীলাবতী প্রভৃতি আরও এমন কত রমণীকে। যদি এলিজাবেথ বা বা আউস্‌কোয়ার রাজ্য-শাসনে এবং ঝান্সির রাণী ও চাঁদবিবি যুদ্ধ পরিচালনে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন, তবে আমরা এই বুঝব যে, সে নারীর জাতি এ-সব বিষয়ের অধিকারে বিধি কর্তৃক বঞ্চিত নন এবং সে ক্ষমতা তাঁর জাত-বোনদের ভিতরেও সুপ্ত রয়েছে। যে ক্ষমতা কোনো জাতির দু দশ জনের ভিতরে আছে, তার অঙ্কুর যে সমুদয় সম্প্রদায়ে আছে তা অস্বীকার করবার জো নেই। যোগ্যতা-লাভের মূলে যে শক্তির সাধনা দরকার, সেখানে শুধু তারই অভাব মাত্র। সর্ব্বক্ষেত্রে নারীকে ক্রমেই যোগ্য দেখে কে বলবে এমন জলজ্যান্ত মানুষকে শাসনে ঠেকিয়ে রাখতে? নারী-সম্বন্ধে সমগ্র জগতের ধারণা আজ বদ্‌লে চলেছে। এমন কি তুর্কী রমণী পর্য্যন্ত ইস্‌লাম ধর্ম্মের যুগ-যুগান্তের সনাতন পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করতে পেরেছে।

সুতরাং অনুগ্রহ হিসাবে নয়, মানুষের অধিকার হিসাবে—সর্ব্বোপরি সমাজের কল্যাণ-কামনায় নারীকে সকল দিকে জীবন-বিকাশের সুযোগ, চিন্তা ও বুদ্ধি-চালনার সুবিধা দেওয়া পুরুষের উচিত। নারীও মানুষ, তারও সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্ব-বিকাশের প্রয়োজন আছে, বিধাতার বিশ্বের অনন্ত রহস্য ও বৈচিত্র্য তারও উপভোগের বস্তু। সংস্কারের আলোকে নয়, জ্ঞানের আলোকে জীবনের সুখকে সেও যেন ধরে নিতে পারে।

আজকের মতো এমন সঙ্কীর্ণতা আমাদের সভ্যতার গোড়ায় ছিল না। আমাদের পুরুষ নারী একত্র হয়ে লড়েছে অসি এবং মসী উভয়ই নিয়ে—প্রকাশ্য ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, প্রকাশ্য দরবারে বসে। নারী জ্ঞান-চর্চ্চা করেছে, চিন্তা করেছে, সাধনা করেছে, কর্ম্ম করেছে পুরুষের পাশাপাশি থেকে—পুরুষের সহযোগিনী-রূপে। আজকের মতো এমন নিষ্ঠুর বাঁধাবাঁধিতে এমন বঞ্চিত হয়ে নারীকে থাকতে হয়নি। বিশ্ববারার মন্ত্র-রচনা ও পৌরোহিত্য, গার্গী ও মৈত্রেয়ীর যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত দর্শন-বিচার, সহস্র-জয়িনী মুদ্‌গলানীর রথের সারথ্য, যুদ্ধ-প্রত্যাগতা ছিন্ন-চরণা অপালার কাষ্ঠ-পদ সংযোগে পুনরভিযান, রাজা নমুচি কর্তৃক যুদ্ধে প্রেরিত তৎপত্নীর শক্র-পরাভব, সরমার অসংখ্য দস্যু হস্ত থেকে গোধন উদ্ধার প্রভৃতি তারই দৃষ্টান্ত।

বেদে পুরাণে যা-ই থাক্, আসল কথা, চাই নারীর মানুষ-বোধকে সচেতন করে তোলা, তার বৃহত্তর সত্তা বা রূপকে বুঝে নেওয়া ও তাকে বুঝিয়ে দেওয়া। সহস্র মানুষের যে বিশাল বন্ধন সমাজকে ধরে রাখবে তার অন্তর্নিহিত মহান আত্মার পূর্ণ বিকাশের জন্য চাই নারী পুরুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও কর্ম্মের মিলন। নারী-পুরুষ একে অন্যের মনুষ্যত্ব ও সহযোগিতাকে স্বীকার করে পরস্পর জ্ঞান-বুদ্ধির বিনিময়ে ধীর-সংযত অনুচ্ছৃঙ্খল এবং দেহ-মনের সম্পর্ক থেকে অবিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনকে সত্য করে তুলবে, সংসার-রথকে টেনে নিয়ে চলবে। বিশ্ব-মানবের বিশ্বাসের কাছে চিরন্তন সত্য যে নারী-পুরুষের প্রেম, তাকে সার্থক করে তুলতে হলে উভয়ের ভেদের গণ্ডী মুছে ফেলে ধ্যান জ্ঞান চিন্তার ঐক্য দ্বারা এক অভিন্ন হৃদয় ফুটিয়ে তুলতে হবে। অনৈক্যের মাঝে প্রেমের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। যে প্রেমে ভিক্তর হিউগোর কথায় A man and a woman mingled into an angel তার প্রতিষ্ঠার জন্য, সে স্বর্গ-রচনার জন্য চাই নারী-পুরুষের ভাবের সর্ব্বক্ষেত্রে একাত্ম মিলন।

বিবেচক বুদ্ধিমান হতে যেয়ে নারী পুরুষের সম্পর্ক-নিহিত সত্যের খোঁজ পাওয়া যাবে না। একমাত্র সংস্কারমুক্ত নিঃস্বার্থ মনকে খুলে দিয়েই এর সন্ধান পাওয়া সম্ভব হবে।

মনুষ্যত্বের খাতিরে মানুষ মাত্রকেই একটা কথা মনে গেঁথে রাখতে হবে—Man is bound to make himself and others better and happier according to his ability. His ability for this work is a sacred trust from God, the greatest of all trusts. He must answer for the waste or abuse of it. (W. E. Channing.)*

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

আশীর্ব্বাদ

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলুম.....

এক বৃদ্ধ অন্ধ ভিখারী রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তার শীর্ণ হাত দুটি বাড়িয়ে কাতর অনুনয়ে ভিক্ষা চাইচে। একটি ভদ্রলোক দয়া-পরবশ হয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালেন, পকেট থেকে একটা পয়সা বার কোরে ভিখারীর হাতের অঞ্জলিতে ফেলে দিলেন। মুহূর্ত্তে ভদ্রলোকটির মুখ-চোখের অবস্থা একদম্ বদ্‌লে গেল। তিনি পয়সা বলে ভিখারীকে যা দান করেচেন, তা পয়সা নয়, চক্‌চকে আধুলী! কি মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে!...তৎক্ষণাৎ তিনি খপ করে অন্ধের হাত থেকে দেওয়া আধুলীটা কেড়ে নিয়ে ফের পকেটে পুর্‌লেন। ভিখারীটা কাতর কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—দেখলেন, দেখলেন বাবু, কোন্ শালা চোর হাত থেকে চিলের মতো ছোঁ মেরে পয়সাটা নিয়ে গেল—ধরুন বেটাকে!

ভদ্রলোক পকেট থেকে এবার একটি তামার পয়সা বার করে অন্ধের হাতে দিয়ে বল্লেন—নিক্‌গে ও একটা পয়সা, আমি তোমাকে আর একটা দিচ্ছি!

বৃদ্ধ ভিখারী ওপর দিকে হাত দুটো একটু তুলে আশীর্ব্বাদ করলে—ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ কর বাবা, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!...

ভদ্রলোকটি চলে গেলেন। আমি পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, শুন্‌চি, অন্ধ শাপ দিচ্ছে—ব্যাটা চোর নিয়ে গেল একটা পয়সা! উচ্ছন্ন যাবে, সর্ব্বস্বান্ত হবে, ভিখারীর পয়সা চুরি করেছে! দিব্যি দুটো পয়সা হোত...মর্‌বে, মর্‌রে,সব মর্‌বে। ব্যাটার...

আমি তাকে একটা পয়সা দিলুম।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

প্রিয়ার রঙিন ঠোঁটে

প্রিয়ার রঙিন ঠোঁটে,
খোস্ বাগানের গুল্‌ভাতি ও
ফুল সকুরা ফোটে।
নট্‌কনা রং অধর ফাঁকে,
রঙিন ফানুস স্বপন আঁকে,
চিক্‌মিকিয়ে আবীর কণায়
সাঁঝ-সোণালি ওঠে।

প্রিয়ার রঙিন ঠোঁটে,
ভোর-উষসীর রক্ত-লালিম
তরল মদির ছোটে।
চুম্‌কুড়ুনির নেশার ঝাঁঝে,
তরুণ ব্যথীর পরশ-লাজে,
ভোর-ভামিনীর হৈম ছোঁয়ায়
হেম্‌ঝারি কোন লোটে!

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস।

* ত্রিপুরা সাহিত্য-পরিষৎ ও মহিলা-সমিতিতে পঠিত।

আলোচনা

সমাজ-বিজ্ঞানের এক পৃষ্ঠা

[১]

সমাজ-গঠন

সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সমাজ-বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু বর্ত্তমানের বিচ্ছিন্ন দুই-একটি ঘটনা দেখিয়া মীমাংসা করিতে গেলে থিওরীর উপর থিওরী চাপানোই হইবে, প্রকৃত সমস্যার মীমাংসা হইবে না। সমাজ-বিজ্ঞান আমাদিগকে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত একটা ধারাবাহিক ঘটনা-পরম্পারর পরিচয় দেয়; তাহাদের উৎপত্তি বৃদ্ধি ধ্বংস প্রভৃতির ব্যাখ্যা দেয়. তাই সেই বিজ্ঞানালোকে আমরা পথ বাছিয়া লইতে পারি।

একজন পণ্ডিত একবার বলিয়াছিলেন যে মাঠের মাঝে রাত্রে পথ হারাইলে পিছন ফিরিয়া চলিতে হয়। পিছন ফিরিবার সময় কোনও পরিচিত গাছ বা অন্য কিছু পথে পড়িতে পারে এবং তদ্বারা প্রকৃত পথ চিনিয়া লওয়া যায়। সেইজন্যই পুরাতন-পন্থীরা পিছন ফিরিয়া চলিয়াছেন ও পুরাতন যাহা পাইতেছেন তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরিতেছেন। কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস যে সমাজ এখন ভ্রান্ত পথে চলিতেছে, সুতরাং পিছন ফিরিয়া যাহা পাওয়া যায় (—ছাই-পাঁশ যা' হউক না কেন!) তাহাই ধরিয়া থাকা উচিত, তাহাতেই নাকি সমাজের রসাতল-গমন স্থগিত থাকিবে!

পণ্ডিতমহাশয়ের কথা কতটুকু সত্য, তাহার আলোচনা না করিয়াও আমরা একটা কথা গ্রহণ করিতে পারি যে সমাজ-সমস্যার মীমাংসার জন্য অতীত ইতিহাসের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। তবে ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন ঘটনা (isolated facts)আমাদের অনেক কাজে লাগে বটে, কিন্তু সমস্যা সমাধান করিতে হইলে ঘটনাগুলির ভিতর দিয়া যে মূল নীতির (principle)সন্ধান পাওয়া যায় তাহার সাহায্য লইতে হইবে। অর্থাৎ সমাজ-বিজ্ঞানের সাহায্যে সমাজ-সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে।

সমাজ-বিজ্ঞানের উপাদান প্রাচীন ইতিহাস, আচার ও আইন প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়েও পৃথিবীতে এমন সব জাতি আছে যাহারা সমাজ-গঠনের অতি নিম্ন স্তরে অবস্থিত। সর্ব্বনিম্ন ধাপ হইতে ক্রমশঃ বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজ-গঠনের ভিতর দিয়া বর্ত্তমানের সভ্য সমাজে আমরা আসিয়া পৌছিতে পারি। অভিব্যক্তিবাদীরা যেমন সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর প্রাণী হইতে মানুষ পর্য্যন্ত একটা ক্রমাভিব্যক্তির ধারা ধরিয়াছেন, আমরাও সমাজ-বিজ্ঞানের দিক হইতে এরূপ একটা শৃঙ্খলা পাইতে পারি—যদিও তাহা অসম্পূর্ণ। কারণ এই শৃঙ্খলার মধ্যস্থিত অনেক শ্রেণীই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি হইতে আমরা ক্রম-পরিবর্ত্তনের যে ধারা পাই, বর্ত্তমানের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের সমাজ-গঠন তাহারই পোষকতা করে। প্রাচীন কালে সমাজে যে ভাবে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, মোটামুটীভাবে অনুন্নত সমাজগুলিতে তাহারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। সুতরাং সমাজ-বিজ্ঞানের তথ্যগুলির সত্যতা পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিবার সুবিধা হয় ও সেই হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানকে পরীক্ষা-মূলক বিজ্ঞানের আসন দেওয়া যায়।

কোন্ জায়গা হইতে সমাজ-বিজ্ঞানের অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে বা কি উপায়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহা লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। এই মতভেদের প্রধান কারণ Unit of the old society অর্থাৎ প্রাচীন সমাজে সমাজ-গঠনের মূল ভিত্তি কি ছিল। কাহারও মতে তাহা ব্যষ্টি, কাহারও মতে পরিবার। এ বিষয়ে লম্বা তর্ক-বিতর্ক না তুলিয়া যতদুর সম্ভব সংক্ষেপে দু একটী কথা বলিব।

স্পেন্সার, রুসো, লক, হব্‌স্ প্রভৃতি পণ্ডিতদের মত এই যে, ব্যক্তিই সমাজের Unit ছিল। তাঁহাদের মতের প্রতিবাদ করিয়া মেইন সাহেব বলেন যে পরিবারই সমাজের Unit। প্রথমে আমরা Maine সাহেবের যুক্তির একটু আলোচনা করিব।

মেইন সাহেবের যুক্তির প্রধান ভিত্তি প্রাচীন আইন ও আচার। তাহার সাহায্যে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে পরিবারই প্রাচীন সমাজে Unit ছিল, এবং তাহা হইতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিহাসের দিক দিয়া তিনি অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং প্রাচীন আচার-ব্যবহারের দ্বারা তাঁহার মত সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধান ঐতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে; এর পর আর যায় নাই। সমাজ-গঠনের সময়ও ঐতিহাসিক যুগ যদি এক হয়, তবে মেইন সাহেবের কথা অকাট্য সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক যুগই সমস্ত নয়—প্রাগৈতিহাসিক যুগও আছে এবং অনুসন্ধান প্রাগৈতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত হওয়া দরকার।

অনুসন্ধানের দুইটী পদ্ধতি আছে। একটা নিম্নগামী, অন্যটা উর্দ্ধগামী। বর্ত্তমান সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পিছন ফিরিয়া নীচের দিকে অনুসন্ধান করিয়া আদিম যুগে যাইতে পারি। অথবা সেই আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ স্তরে স্তরে বর্ত্তমান যুগে আসিয়া পৌছিতে পারি। কিন্তু আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিলে কেবলমাত্র

theoryর উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে—যদিও theoryকে বাস্তবতা দ্বারা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু যদি বর্ত্তমান অবস্থা হইতে পশ্চাদগমন (retrospection) দ্বারা আদিম অবস্থায় উপস্থিত হই তাহা হইলে কোন theoryর সাহায্য লইতে হইবে না। আমরা এই শেষোক্ত উপায়ই গ্রহণ করিব।

মেইন সাহেব পরিবারকে Unit ধরিয়া গিয়াছেন, কারণ ইতিহাসের প্রমাণ তিনি এই পর্য্যন্ত পাইয়াছেন,—তাও আবার পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস নয়,—প্রধানতঃ রোমের প্রাচীন ইতিহাসের উপর তিনি নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে প্রাগৈতিহাসিক যুগেও সমাজ ছিল।

আমাদের পদ্ধতি অনুসারে আমরা এমন স্থানে উপস্থিত হই যেখানে পরিবারই সমাজের Unit. রাষ্ট্র হইতে সমাজ, সমাজ হইতে পরিবার—এ পর্য্যন্ত বেশ পাওয়া গেল, কিন্তু পরিবারের গঠন কিরূপে হইল তাহার উত্তর নাই।

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (Spencer)। তাঁহার মতে আদিতে সমাজ ছিল না—মানুষ প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত হইত—They were in a state of Nature Spencer এর অনুসন্ধান State of Nature প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। Locke, Hobbes প্রভৃতিও ঐ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছেন—যদিও তাঁহাদের ব্যাখ্যা একটু বিভিন্ন প্রকারের।

আমরাও ক্রমশঃ ঐ স্তরে গিয়া উপস্থিত হই। রাষ্ট্র—সমাজ—পরিবার পর্য্যন্ত পাওয়া গেল—কিন্তু মানুষ পরিবার-গত হইয়াই সৃষ্ট হয় নাই ; সুতরাং উহার অপেক্ষাও বিভক্ত অবস্থায় মানুষ ছিল, সে অবস্থা State of Nature বা প্রাকৃতিক অবস্থা অর্থাৎ তখন প্রকৃত পক্ষে কোন সমাজ-বন্ধন ছিল না, প্রত্যেক মানুষকেই তাহার আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হইত। কেহ কেহ তাহাকে যুদ্ধবিগ্রহের অবস্থা (State of War) বলিয়াছেন অর্থাৎ মানুষ ও পশুতে সামান্যই প্রভেদ ছিল। অভিব্যক্তিবাদীদের মতে সেই সামান্য প্রভেদটুকুও থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত দুই দলের মধ্যে আর একটি বিষয়ে মতভেদ হওয়া অনিবার্য্য—তাহা পরিবারের শাসনকর্ত্তাকে লইয়া। মেইনের মতের স্বাভাবিক ফল এই দাঁড়ায় যে পিতাই পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন—সমাজের আদিতে পিতৃতন্ত্র পরিবার ছিল,—তাহাও ঐতিহাসিক যুগের কথা। কিন্তু ব্যক্তি যদি সমাজের Unit হয়—logically (ন্যায়-শাস্ত্রের মতে) তাই দাঁড়ায়—তবে পিতৃতন্ত্র-পরিবারের পূর্ব্বেও আরও একটা অবস্থা ছিল—তাহা মাতৃতান্ত্রিক পরিবার (Matriarchal) এবং উহাই সমাজের আদিম অবস্থা।

মাতৃতান্ত্রিক পরিবারকে আদিম অবস্থা বলিবার একটা কারণ আছে। মানুষের কথা ছাড়িয়া দিলেও পশু জগতে দেখা যায় যে পশুরাও নিজেদের সন্তানকে কোন স্থলে মা বাপ দুইজনেই সন্তান পালনের ভার লইয়া থাকে। এর চেয়ে আদিম অবস্থা বাস্তব জগতে নাই এবং কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং সমাজকে বিশ্লেষণ করিয়া আমরা ব্যক্তিতে পৌঁছাই এবং সেই ব্যক্তি আবার স্বাভাবিক প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া পরিবারের অধীন হয়—অবশ্য মাতৃতান্ত্রিক। মাতৃতান্ত্রিক পরিবার হওয়ার আরও একটা কারণ এই যে আদিম অবস্থায় পিতৃ নিরূপণ সহজ ছিল না—কারণ কোনরূপ সামাজিক বন্ধন ছিল না।* প্রাকৃতিক কারণ বশতঃই ছেলেমেয়েরা মাকে ঘিরিয়া থাকিত। সুতরাং মাতাই পরিবারের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। এখনও কোন কোন অসভ্য-সমাজে মায়ের নামে পারিবারিক পরিচয় দেওয়া হয়।

এই আদিম অবস্থা হইতে আমরা ক্রমশঃ স্তরে স্তরে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিতে পারি। মাতৃতন্ত্র হইতে পিতৃতন্ত্রের আবির্ভাব হইল এবং এই স্থানেই মানব-জাতির উন্নতির মূল নিহিত আছে ; মানুষ যদি সেই আদিম যুগের মাতৃতান্ত্রিক প্রকৃতির কোলেই থাকিত, তাহা হইলে বন্যপশু ও মানুষে বিশেষ পার্থক্য থাকিত না। এই একটা পরিবর্তনে মানুষের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, ক্রমে ক্রমে সে সমাজ গঠন করিল।

মানুষের এই ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের মূলে আছে প্রেম। নর ও নারী শুধু শারীরিক প্রয়োজনের বশবর্ত্তী না হইয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে লাগিল, শারীরিক আকর্ষণের সঙ্গে মানসিক আকর্ষণ যুক্ত হইল, নর ও নারী মিলিত হইয়া পরিবার গঠন করিল। এই প্রেমের ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য, পরিবারের বনিয়াদকে দৃঢ় করিবার জন্য বিবাহ-প্রথার সৃষ্টি হইল। "স্বাধীন মকরকেতু, স্বাধীন প্রণয়" অথবা "বন্ধন দেখিলে প্রেম তখনি পলায়" কি না জানিনা, কিন্তু ববিাহবন্ধন ও তদানুসাঙ্গিক সংস্কারকে বিদায় দিলে সমাজ আবার তাহার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া যাইবে। আজকাল কেহ কেহ এই প্রাকৃতিক অবস্থায় (State of Natureএ) ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। অননুষ্ঠানিক বিবাহের কি ফল হইবার সম্ভাবনা তাহা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই পরিবার হইতে ক্রমশঃ সমাজ ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি। সমাজ গঠন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের মত তাঁহাদের মত হইতে একটু বিভিন্ন।

---

* মহাভারতে শ্বেতকেতুর উপাখ্যান সমাজের এর চেয়ে একটু উচ্চ অবস্থার পরিচায়ক। মহাভারত আদিপর্ব্ব, ১২২ অধ্যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়,চতুর্থ ব্রাহ্মণ পাঠেও ঐরূপ ভাবের আভাষ পাওয়া যায়। তখন আনুষ্ঠানিক বিবাহ থাকিলেও বিশ্বজনীন ভাবেও খুব উচ্চ অঙ্গের ছিল বলিয়া মনে হয় না। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত সমর্থন করেন।

মেইন সাহেবের মতের আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি—সমাজ-গঠন সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে পরিবার হইতে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, এক-নামধারী, বা এক অবস্থার অধীন, সত্যকার অথবা কাল্পনিক সগোত্রতা দ্বারা বিভিন্ন পরিবার একত্র মিলিত হইল, এবং ক্রমশঃ এই সম্প্রদায় গঠন বৃহত্তর হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট কোন দেশে অবস্থান, এক প্রকারের পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি দ্বারা একজাতীয়তা বোধ জন্মিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একটা synthesis এর দ্বারা সমাজ-গঠনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

Hobbes, Locke প্রভৃতি পণ্ডিতদের মত ভিন্ন। তাঁহাদের মত (তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যেও মতানৈক্য আছে) এই যে বিভিন্নভাবে অবস্থিত ব্যক্তি চুক্তিদ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। যখন মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে থাকার চেয়ে একত্র মিলিয়া মিশিয়া থাকা ভাল বলিয়া মনে করিল তখন পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হইয়া তাহাদের স্বাভাবিক অধিকার কিয়দংশ পরিত্যাগ করিল; ও তার পরিবর্ত্তে সমাজের বা রাষ্ট্রের সংহত শক্তির অধীনে নিরাপদে বাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

Maine এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁর প্রধান যুক্তি এই যে চুক্তি মানব সভ্যতার পরিণত অবস্থার ফল, আদিম অবস্থায় তাহা অসম্ভব। মেইনের এই যুক্তির সারবত্তা আছে বটে, কিন্তু তিনি উহার উপর যতটুকু জোর দিয়াছেন ততটুকু জোর দেওয়া ঠিক নয় কেবল চুক্তির দ্বারা মানুষ সমাজ গঠন করে নাই সত্য—যদি সে চুক্তি (contract) বর্ত্তমানে ব্যবহৃত অর্থে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু রেজিষ্টারী করা চুক্তিপত্র ছাড়াও পরস্পরের সুবিধার জন্য—কতকটা অজ্ঞাতসারে—এমন কাজ করা যায়, যাহা বর্ত্তমানে উন্নতপ্রণালীর চুক্তির দ্বারা আমরা করিতেছি, এবং তাহা দ্বারা উপকার হইলে ঐ প্রণালীর সাহায্যও আবার গ্রহণ করে। এইরূপে কতকটা অজ্ঞাতসারে—যদিও তাহা কতকটা চুক্তিমূলকই সমাজের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়—অন্ততঃ এই উপায় সমাজ গঠনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং সমাজ গঠনের মূলে চুক্তি একেবারেই ছিল না মেইন সাহেবের এই মত খুব যুক্তিযুক্ত নয়।

আবার তাঁহার ব্যাখ্যাত প্রণালীও যে সমাজ গঠনে সাহায্য করিয়াছে তাহাও সত্য। কিন্তু তাহার ব্যাখ্যাত প্রণালীর মধ্যেও একটা implied contract না থাকিলে সমাজ-গঠন রহস্যের মীমাংসা হয় না। যদি অন্ততঃ implied contractও না থাকে তাহা হইলে সম্প্রদায় হইতে রাষ্ট্র গঠন হয় কিরূপে? উভয়পক্ষ একদেশদর্শিতার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই জন্যই ব্যাখ্যা-প্রণালীর মধ্যে গলদ থাকিয়া গিয়াছে।

আমরা এ বিষয়ে আমাদের মত বলিয়াছি। শুধু contract, বা সগোত্রতা দ্বারা সমাজ-গঠন হয় নাই—সমাজ-গঠনে দুইটারই অংশ আছে। তা' ছাড়া মানুষের বুদ্ধি বৃত্তির আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশেই আত্মরক্ষা প্রভৃতি কার্য্যের সুবিধার জন্য পরস্পর মিলিত হইয়া মানুষ সমাজ গঠন করিয়াছিল।

কিন্তু সমাজ গঠনের প্রাথমিক স্তর পরিবার। পরিবার গঠনের মূলে প্রেম ও আনুষ্ঠানিক (তাহা যে প্রকারের অনুষ্ঠানই হউক না কেন) বিবাহ। এই বিবাহের ফল—বিশেষভাবে নারী-সমাজের উপর বিবাহ-প্রথার কথা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত।

স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

শ্রাবণের ভারতবর্ষে "স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা "সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পুরাতনের পক্ষ হইতে ইহাতে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে নূতন কিছু না থাকিলেও এবং ইহার সকল কথারই যথেষ্ট উত্তর দেওয়া হইলেও নারী-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমাদের দেশে সকলেরই এত কম ধারণা আছে দেখিতে পাওয়া যায় যে তবু ঠিক ইহার উত্তরেও কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইল।

লেখিকা কাহাকে "উন্মাদ স্ত্রী-স্বাধীনতা" বলেন, তাহা জানা নাই। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারা যায় না। তবে মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতার বিষয়ে যাঁহারা যথার্থই চিন্তা ও চেষ্টা করেন, তাঁহারা কেহই "উদ্দাম স্বাধীনতা" বলিতে যদি উচ্ছৃঙ্খলতা বোঝায় তাহা চাহেন না; বরং বর্ত্তমানে মনুষ্য-জাতির অর্দ্ধাংশ নারীর স্বাধীনতাও অপরাংশের ভাগেই পড়ায় তাহার অপরার্দ্ধ পুরুষের মধ্যে তাহার যে অপব্যবহার হইতেছে দুই অংশে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা নিবারণ করিতেই চাহেন। "প্রাচীন ও নবীন" এবং "সেকেলে একেলে বিভেদ" তিনি "আশা কি নিরাশার," ঠিক করিতে পারেন নাই। কিন্তু "নবীন" অর্থাৎ অগ্রগতি ও পরিবর্ত্তনের আশঙ্কা মানুষের মনে যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানুষের আজ দশা কি হইত ভাবিয়া দেখিলে হয়। তাহার পর "প্রাচীনের" যে "সমূলে ধ্বংস" হয় নাই বলিয়াছেন, সে প্রাচীন কে? কাল যাহারা নবীন ছিল, আজ তাহারাই প্রাচীন হইতেছে না কি? নবীনই বরং চিরদিনই নব নব বেশে আসিয়া পৃথিবী অধিকার করিতেছে এবং প্রাচীন ক্রমেই সরিয়া অতীত ও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লইতেছে। জীবন্ত মানব-সমাজের লক্ষণও এই। আর যাহার নবীনের মধ্যেও নবীন প্রাণের সাড়া নাই, তাহা প্রাচীনেরই ছাপ মাত্র,—সে সমাজের অবস্থা চিন্তনীয়। তিনি যাহা প্রাচীন মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও কি সত্যই প্রাচীন? আর কোন্ সময়কেই বা সেই "প্রাচীন" বলিয়া ধরা হইবে?—ইহা নিশ্চয়ই শ্রুতি-স্মৃতির কথা নয়।—আর ঐগুলিও সব এক সময়ের বা তাহাতে

একটি মতও প্রকাশিত হয় নাই। অত্যন্ত প্রাচীন সময়েও আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে বর্ণশিক্ষার প্রচলন প্রায় ছিল না। মাসিক-পত্রের অস্তিত্ব বা তাহাতে প্রবন্ধ লেখাও অবশ্য তাঁহাদের স্বপ্নাতীতই ছিল। "কাটা কাপড়, মোজা গেঞ্জি, জুতার ফিতা, মাথার ফিতা"র ধার তাঁহারা ধারিতেন না,—তাহার কলের সৃষ্টিও হয় নাই, তাহার নামও জানিতেন না।—এ সকল নবীনদের কল্যাণেই হইয়াছে। এমন কি ওগুলি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বিবেচনা করেন এবং তাঁহার মতও একান্তই আধুনিক বলিয়া অশুচি জ্ঞান করিবেন, এমন লোক এখনও যথেষ্ট আছেন। আর "যাহা প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলের নিদান, তাহার অপক্ষয় হয় না। যাহা অমঙ্গলের হেতু তাহাকেও কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না," ইহাই যদি তিনি বিশ্বাস করেন, তবে নবীনের আবির্ভাবেই বা বিচলিত হইবার কারণ কি? নবীনের মধ্যেও সকলেই যে "নবীন," তাহা নাও হইতে পারে। এবং প্রাচীন পক্ষেও সকলেই কিছু এমন প্রাচীনও নন।

"শারীর-বলে নারী" যে "ঠিক পুরুষের সমান" নয়, ইহা তিনি বলিবার আগেও সকলেরই জানা ছিল। বুদ্ধিবলে যে নয়, ইহা প্রতিপন্ন করিতেও অনেকের বিষম উৎসাহ দেখা যায়। কিন্তু ইহার কোনটীতেই তাঁহাদের রাষ্ট্রসামাজিক সমানাধিকার পাইবার কোনই বাধা হইতে পারে না। কোন মনুষ্যই সকল বিষয়ে সমান নয়, তবু কতকগুলি অধিকার মানুষমাত্রেরই প্রাপ্য। এ বিষয়ে মানুষের ন্যায়বুদ্ধি যতই বিকাশ পাইতেছে, ততই তাহা বিস্তৃততর ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। সেইজন্য আগে যেখানে উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর একই অপরাধে ভিন্ন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল,--সুখ, সুবিধার উপকরণ ছত্র পাদুকা—উৎকৃষ্ট যানারোহণাদি হইতে উচ্চ পদ, উচ্চ কার্য্য সমস্তই কেবল উচ্চ শ্রেণীর একচেটিয়া ছিল,—অপর কেহ সহস্র যোগ্যতা সত্ত্বেও তাহার অধিকার লাভ করিত না,—অধিকন্তু করিতে গেলে দণ্ডিত হইত এবং যোগ্যতা লাভ করিবার কোন সুবিধাও পাইত না; এখন তাহা হইতে পৃথিবীর কাম্য বস্তুগুলি ক্রমেই সর্ব্ব-মানবের অধিগম্য হইতেছে। পূর্ব্বেকার রাষ্ট্রসামাজিক নীতি ভেদ ও অধীনতার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।—কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার প্রতিষ্ঠা সাম্য, স্বাধীনতার উপর। এইজন্যই পৃথিবীর নিম্ন শ্রেণীসকল ক্রমেই সমানাধিকার লাভ করিতেছে এবং সর্ব্বনিম্নশ্রেণী নারীর সম্বন্ধেও তাহার দাবী উপস্থিত হইয়াছে। নারী যে সমান সুখ, দুঃখ, আশা আশঙ্কার অনুভূতিবিশিষ্ট মানুষ, এবং অন্য কোন স্বতন্ত্র শ্রেণীর জীব নয়,—মানবজাতিরই অপরার্দ্ধ মাত্র, এই জ্ঞান হইতেই সর্ব্বমানবের অধিকারগুলি তাঁহারও প্রাপ্য হইয়াছে। তাহার পর অপর দশজনের তম তাঁহাকেও অবশ্য কার্য্যক্ষেত্রে যোগ্যতা দেখাইয়াই বিশেষ বিশেষ অধিকার লাভ করিতে হইবে।

পারিলে কিছু আর তাঁহাকে বেতন দিয়া কেহ সৈনিক-শ্রেণীতে রাখিবে না বা প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিলে পরীক্ষাতেও পাশ করাইবে না।

তার পর যে সকল মেয়েরা "কলেজে বেটাছেলের শিক্ষালাভ ও দু'একটা চাকরীও করিতেছেন" তাঁহাদের নিকট হইতেও "এক-ঘেয়ে প্রেমের গল্প, বা এক-আধটা স্বদেশী গান ভিন্ন পাওয়া" যায় নাই বলিয়া অনুযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি ত "রাজনীতিক্ষেত্র, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞানে" মেয়েদের আসা চাহেনই না, তবে আবার তাহাতে "উপরে স্থানলাভ" না করার জন্য তাঁহাদের তিরস্কার কেন? বরং তাঁহারা "বেটাছেলের শিক্ষালাভ" করিয়াও "পুরুষ" না হইয়াও ঘর-সংসারে মাতা, জায়া, কন্যার কর্ত্তব্যই সুশৃঙ্খলে করিতেছেন বলিয়া তাহার কাছে প্রশংসাই পাওয়া উচিত; এবং তাঁহাদের দেখিলেই ত ঐ শিক্ষাও যে মেয়েরা "পুরুষ" বনিয়া যান না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণই পাওয়া যাইতে পারে।

মেয়েদের যে "উন্নতি চাই" তাহা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পারিবারিক "শান্তি, শৃঙ্খলা নষ্ট" হইবার ভয়ে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখিতে পান নাই। কিন্তু উন্নতি যদি "উন্নতি"ই হয়, তবে পারিবারিক ব্যবস্থাও সেই অনুসারে গড়িয়া লইতে হইবে। উন্নতি যে কাহাকে বলে তাহা বোঝে সকলেই, কিন্তু ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝাইতে গেলে তাহা বেশী পরিষ্কারের সম্ভাবনা কমই। তবু বলিতে পারা যায়, উন্নতি আত্মপ্রসারের বিস্তৃততর সম্ভাবনা, এবং তাহা সকল সময় "সুখময়" নাও হইতে পারে, তবু মানুষ সঙ্কীর্ণতর সুখ অপেক্ষা তাহার দুঃখকেও বরণ করিয়া লইতে চায়।

নর-নারী কাহারও মধ্যেই সকলের শিক্ষা ও কার্য্যক্ষেত্র এক হইতে পারে না। কাহারও কোন বিষয়ে বাধা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। যদি এই বাধা দূর ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে কতকগুলি নারী যে কাজে তাঁহাদের তেমন প্রয়োজন নাই, তাহাতে যান, তাহাতে ভয় পাইবার দরকার নাই। কারণ উহা দূর হইলে স্বভাবতঃ যাহাতে ক্ষতি হইতে পারে এমন বেশী সংখ্যায় তাঁহারা কখনও সে সকল কাজে যাইবেন না। (আর যে ২।৪ জন যাইবেন, তাঁহাদের তাহার জন্য সত্যই প্রেরণা থাকায় জন যাওয়া উচিতই হইবে।) প্রকৃতিকে অতটা ভয় পাইবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। নারীকে অধীনতাবদ্ধ না রাখিলেই কি আর তাঁহারা তাঁহাদের কোন কর্ত্তব্য করিবেন না? পুরুষ স্বভাবতঃ প্রবল এবং নারীর সকল অধিকার ও স্বাধীনতা তাঁহার হস্তগত থাকা সত্ত্বেও যদি এতদিন ধরিয়া আপনার কর্ত্তব্যপালন করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে নারী আপনার স্বাধীনতাটুকুই পাওয়া মাত্র "উন্মাদ" হইয়া উঠিবেন, মনে করিবার কারণ কি? তাহা হইতে নারীর সম্বন্ধে কিরূপ মনোভাবই

অন্যায় অসম্পূর্ণতা থাকে, তাহা হইলে সেগুলি যথাযোগ্যভাবে বিভক্ত ও সুশৃঙ্খল করিয়া অবশ্যই লইতে হইবে। সেইজন্য স্বামী-স্ত্রী এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এক কার্য্যক্ষেত্রে ঘুরিবেন কি না বা তাঁহাদের "কন্যাপুত্রের অবস্থা"ই বা তাহা হইলে কি হইবে তাহা তাঁহাদেরই ভাবিতে দিলে হয়! আর যখন চাকরীই করিতে পারিবেন, তখন তাহাতে লাভ কি লোকসান হইবে তাহাও বোধ করি তাঁহারাই স্থির করিতে পারিবেন। সন্তানদের তাঁহারা অযত্ন করিবেন না, সকলে কেবল ইহাই দাবী করিতে পারেন। এখন তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য করেন কি না রাষ্ট্রই ত তাহা দেখিবার ভার লইতেছেন। (তাহার সহিত তাঁহাদের সাহায্য করিতেও অবশ্য প্রস্তুত হইতেছেন।) সুতরাং সে বিষয়ে শাসন আরও কঠিনই করিতেছেন; সেখানে সে চিন্তা তাঁহাদেরও যথেষ্টই আছে। তাঁহাদের ঘরকন্নার কাজ ও ছেলে মানুষও আর কেহ গিয়া করিয়া দিয়া আসিতেছেন না। রোগ, ব্যাধি, শিশুমৃত্যু সেখানে আমাদের অপেক্ষা বহুগুণে কমই। ইহাও জানা উচিত যে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে নূতন শিক্ষা বিস্তার এবং নানারূপ গোলমালের জন্য তাঁহারা সম্প্রতি দাস-দাসীর সুবিধা হইতে বঞ্চিত আছেন। "দাস" তাঁহাদের ছিলই না! দাসীমাত্র ভরসা ছিল, এখন তাহাও বড় পাইতেছেন না। তিনি যে লেডী ডাক্তারের কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মেয়েদের বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনের দৃষ্টান্ত। এ অবস্থায় শিশুরক্ষার নানারূপ পরিকল্পনা ও চেষ্টা তাঁহাদের আছে। এ সকল কোন বিষয়ে খবর না রাখিয়া নবচেষ্টাব্রতীদের ধমকাইতে আসা অবশ্য "বিজ্ঞতার" পরিচয় নয়। আর সংসারে প্রত্যেক স্বামীস্ত্রীই যে আপনাপন সন্তানদের অবিশ্বাসী দাসীর হস্তে ফেলিয়া আজই সকলে একসঙ্গে চাকরী করিতে ছুটিবেন, এমন সম্ভাবনাও আছে বলিয়া বোধ হয় না। পিতামাতার কর্ত্তব্যভেদে অর্থোপার্জ্জন পিতারই কর্ত্তব্য; পুরুষের তাহাতে অধিকতর নিযুক্ত থাকা উচিত। তবে শক্তি, প্রকৃতি, সুবিধা ও প্রয়োজনানুসারে মেয়েদেরও তাহাতে বাধা না থাকাও চাই। স্নেহ, প্রেমও যখন কাহারও একচেটিয়া নয় তখন সে সম্বন্ধে উপদেশও অনাবশ্যক। প্রত্যেকে চাকরী করিতে লাগিয়া যাওয়া অপেক্ষা রাষ্ট্রসামাজিক পূর্ণাধিকার লাভই মেয়েদের লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়। ইহার আবশ্যকতা বিষয়ে এত বলিবার আছে ও বলা হইয়াছে যে এখানে তাহার পুনরুক্তি একসঙ্গেই অসম্ভব ও অনাবশ্যক। তাহাতে ঘর-সংসারে প্রলয় ঘটিবার পরিবর্ত্তে ঘর-বাহিরের অনেক বিষম অভাব, অন্যায় দূর হইবার আশা আছে। আর সকলেই চাকরী না করিলেও মেয়েদের রাষ্ট্রসমাজের ও বিদ্যানুশীলনের ক্ষেত্রেও কাজ নাই। পাশ্চাত্য দেশে মেয়েদের অর্থোপার্জ্জনে বেশী নিযুক্ত হওয়ার প্রধান কারণ সেখানে নারীর সংখ্যাধিক্য। তাহার পর প্রথম সকল বিষয়ে বাধা দূরের চেষ্টা। স্বামীর অর্থে স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উত্তরাধিকারে নরনারীর সাম্যের সহিত অসহায়-মাতৃত্বের স্থলে রাষ্ট্র-সাহায্যের ব্যবস্থা হইলেও ইহা আপনিই কমিয়া আসিবে। সম্প্রতি বরং আমাদের দেশেই অনেকে এ বিষয়গুলির জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত না হইয়া নারীকে কেবল "স্বাবলম্বিনী" হইতে উপদেশ দেন। আর "রাংয়ের শরীর"ও যাহাতে "রাংয়ের"ই না থাকে, সে দিকেও নবপ্রচেষ্টার যথেষ্টই লক্ষ্য আছে।

উত্তরাধিকারে অনধিকারই যে বরপণের কারণ তাহা তিনিও বলিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার সেটা নারীর সুগ্রহ ও "নরনিগ্রহ" বলিয়াই বোধ হইয়াছে। (মোসাহেবী কথাটা প্রভুর তোষামোদেই ব্যবহৃত হয়। আপনাদের বা অধীনস্থদের পক্ষে বলিলে তাহাকে "মোসাহেবী" বলে না।) প্রকৃতির উপর একস্থানে অন্যায়ের শোধ অন্যভাবে দিতেই হয়। কিন্তু তাহা হইলেও সেটা অন্যায়ই থাকে। তাহার পর ঐ পণের টাকাগুলি কে পাইয়া থাকেন? তাহাও ত মেয়ের নামে ব্যাঙ্কে জমা দিবার প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই! আর সেজন্য তাঁহার জন্ম হইতে সমস্ত ব্যাপারটাই বা কিরূপ ভাবে লওয়া হয়?

তাহার পর মেয়েরা চাকরী ব্যবসায়ে প্রবেশনিষেধ দূর করিতে চাহিতেছেন বলিয়াই "কুটীর-শিল্পে" হাত দিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়াও ত শোনা যায় নাই। "ব্যারিষ্টারী," "ওকালতি" ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটী" করিবার যোগ্যতা কিছু সকলেরই হইবে না। আর সেই রকম মেয়ের সংখ্যাও যখন বেশী এবং তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজনও আছে, তখন তাহা অনেকেরই করিতে হইবে। কিন্তু একটী কাজ করিলেই অপরটী বন্ধ রাখার বা নিন্দিত হওয়ার কারণও অবশ্য কিছু নাই। "লেডী ডাক্তার," "বালিকা-বিদ্যালয়ের লেডী প্রিন্সিপাল ও টিচারে"র প্রয়োজন তিনি দেখিয়াছেন,—আর একটু দেখিলে "উকীল ব্যারিষ্টারে"র প্রয়োজনও দেখিতে পাইতেন। ২।৪টী মেয়ে "সুচারুভাবে জমিদারী চালাইতেছেন" দেখিয়া তিনি গর্ব্বোৎফুল্ল হইয়াছেন। কিন্তু অবরোধ, অশিক্ষা ইত্যাদির জন্য কতজন যে কর্ম্মচারী ও আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হন, তাহার খবর কি তিনি লইয়াছেন? যুক্তপ্রদেশের মত পর্দ্দাবহুল স্থানেও সেইজন্য মেয়েদের ওকালতির অধিকার একমতে দেওয়া হইয়াছে। পর্দ্দা না থাকিলেও মেয়েরা নানারকম প্রয়োজনে পুরুষ অপেক্ষা আইনজ্ঞ নারীর পরামর্শ লইতে ও তাঁহাকে সব বিষয় খুলিয়া বলিতে সুবিধা বোধ করিতে পারেন বলিয়াই ত মনে হয়। রাষ্ট্রসমাজপৌর-ব্যবস্থার মধ্যে মেয়েদের হাত থাকিলেও "স্বাস্থ্যহীন ধ্বংসোন্মুখ জাতির ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতি" "ধর্ম্মোন্নতি" ও শিক্ষার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা বাড়িতেই পারে। আর স্বাধীনতার অভাব "মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভাব" বলিয়াই মানুষ আত্মচৈতন্য লাভ করিবা মাত্র তাহার জন্যই সর্ব্বাগ্রে ব্যগ্র হইয়া থাকে।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে "নারী"র যে সকল অধিকার পাওয়ার কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহা কি আমাদের সমাজস্থ নারীরা পাইয়াছিলেন, যে তিনি "লেডী ডাক্তার" ও "বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য' যোগ্য "টিচার" গ্রামে গ্রামে পাইবার আশা করেন? "চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বিনী" হইয়া "যেরূপ ইচ্ছা চলিতেই" বা তিনি উহার মধ্যে কয়জনকে দেখিয়াছেন? তাহা হইলে "বরপণ" ও "কন্যাদায়" হইতে পারিত কি? তবে কালের শিক্ষায় এখনকার নারীরা অবশ্যই অধিকতর অগ্রসর হইয়াছেন। তাই তাঁহারা ঐ সকল অধিকারেও এমনভাবে আরও ক্ষমতা লাভ করিয়া গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন, যাহাতে "তাহার মর্য্যাদা পূর্ণমাত্রায়" রাখা সত্যই সম্ভব হয় এবং আরও নানা সমস্যার সমাধান হইতে পারে। তাঁহার এই আগে যোগ্য হইয়া আরও অধিকার দাবীর কথায় কেবল আমাদের জাতীয় প্রচেষ্টায় শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের উক্তিই মনে পাড়াইয়া দেয়। জাতীয় ক্ষেত্রে কিন্তু ঘোর "মডারেটরা" এ কথা বলিতে পারেন না।

তাহার পর তিনি যে "বাহিরের স্বাধীনতা লোপ" করিলেও অন্তরের স্বাধীন বৃত্তির অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন, "বাহিরের স্বাধীনতা" পাইলেই কি তাহা লোপ পায়? (এখানে কাহাকে অধিক "ভাবে ভোর" দেখা যাইতেছে?) না, তাহা পাইলেই "পিতা, পতি পুত্র সৎ" ও অনুকূল হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিয়া যাইবেন? প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অনন্যসাধারণ ২।৪ জন "অন্তরের স্বাধীনবৃত্তি" রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই কি বাহিরের স্বাধীনতাটা ফেলিয়া দিবার বস্তু? যাঁহারা "শৌর্য্যবীর্য্যশালিনী" হইয়াছিলেন তাঁহাদেরও "বাহিরের স্বাধীনতা" লাভ করিয়াই তাহা করিতে হইয়াছিল।

যে সকল "মেয়ে পুরুষোচিত শিক্ষা না পাইয়াও শুধু মেয়েলী শিক্ষার মধ্যে থাকিয়াও সুচারুভাবে জমিদারী" চালাইতেছেন, তাঁহারা কি উক্তবিধ শিক্ষা পাইলেই তাহা কম "সুচারুভাবে" চালাইতেন? আর বর্ত্তমানে তাঁহাদের সংখ্যাই বেশী, না অবরোধ, শিক্ষাভাবাদি নানা অসামর্থ্য বশতঃ যাঁহাদের কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে তাঁহাদেরই আত্মীয়-স্বজন, কর্ম্মচারী ইত্যাদি দ্বারা সহস্ররকমে প্রতারিত লাঞ্ছিত হওয়ার দৃষ্টান্তই বেশী? এই অসামর্থ্যই আবার মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার না দেওয়ার কারণ বলিয়া সর্ব্বদাই বলা হয় কি না? আর মেয়েদের "যত কিছু উচ্চশিক্ষার পুরুষোচিত ব্যবস্থাই" যদি করিতে হয়, তবে "মেয়েলী ও পুরুষালী" শিক্ষায় তফাৎ কি? কেবল স্কুল-কলেজের শিক্ষার নামই কি "পুরুষালী" শিক্ষা? তাহা পাইয়াও যে মেয়েরা "পুরুষ" বনিয়া যান নাই তাহার দৃষ্টান্তও ত পাওয়া বোধ হয় কঠিন নয়। আর ঐ শিক্ষা যখন তাঁহার অল্পতরই বোধ হয়, তাহা হইলে ছেলেরাই কি অল্প শিক্ষা পাইবে? তাহা "ধর্ম্মশিক্ষা," "বিনয়শিক্ষা"র বিরুদ্ধ হইলেও অবশ্য ছেলেদেরও তাহার মধ্যে রাখিয়া অধার্ম্মিক অবিনয়ী করিয়া তোলা যাইতে পারে না। "উচ্চশিক্ষার পুরুষোচিত স্বাধীনতার ব্যবস্থা" করিতে হইলেই বা তাহা স্বতন্ত্ররকমে "নারীভাবাপন্ন" হইবে কি করিয়া? কারণ তাহা লাভ করিতে হইলে নরনারী সকলেরই এক পথ দিয়া যাইতে ও একইরকম সাধনার আবশ্যক হইবে। আর কলেজী শিক্ষা যদি "পাশ করার শিক্ষা" হয়, তাহা হইলে তথাকথিত "নারীভাবাপন্ন" বা "মেয়েলী" শিক্ষাও ত সাধারণত শিক্ষা নামেরই অযোগ্য থাকিতে দেখা যায়। "নারীভাবাপন্ন" স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালীর কথা বলিতে এই সকল কথাও মনে রাখা উচিত। তাহার পর কলেজী শিক্ষা যতই অসম্পূর্ণ হউক, তাহার মধ্যে দেশের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান, বুদ্ধি, কার্য্যপ্রচেষ্টা ও অর্থবল আছে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র কিছু করিতে গেলে তাহাতে তাহা থাকিবার সম্ভাবনা আছে কি? আর যাহাতে সকলকেই সমান বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন পরমধার্ম্মিক করিয়া তোলা যাইতে পারে, এমন কোন শিক্ষাপ্রণালীর আবিষ্কার হইতে ত এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই।

তাহার পর যাহারা মেয়েদের প্রতি অত্যাচার অন্যায়ের কথা প্রকাশ ও পুরুষদের তাহার জন্য দোষ দেন, তাঁহাদের তাড়নার বিষয় বলিতে হয়। কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে চৈতন্য জাগিলে যাহারা সেই অন্যায়ের জন্য দায়ী তাহাদের সকলেই দোষ দিয়াই থাকে। মেয়েরা যে সকলেই "ভয়ানক অত্যাচারে জর্জ্জরিত নয়, তাহা "সংসারাভিজ্ঞেরা না বলিয়া দিলেও সকলেই জানে। কোন বিধি, ব্যবস্থা অন্যায় হইলে তাহার মধ্যে সকলেই "ভয়ানক অত্যাচারে জর্জ্জরিতা না হইলেও তাহাকে অন্যায়ই বলিতে হয়। দাসত্বপ্রথার মধ্যেও প্রভু ভাললোক হইলে অনেকেই সুখস্বচ্ছন্দে থাকিত। কিন্তু তাই বলিয়াই, সে প্রথাটিকে কিন্তু ভাল বলা যায় না। বিশেষতঃ নর-নারীর মধ্যে যে প্রেমের সম্পর্ক আছে, তাহাতে সমস্ত রাষ্ট্রসামাজিক বৈষম্য সত্ত্বেও স্বাভাবিক সাম্য আনিয়া থাকে। ইহাতেও ঐ সকল বৈষম্য যে কতটা অস্বাভাবিক বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই প্রেমের মধ্যে একীকরণ থাকিলেও জাতিহিসাবে পুরুষেরা যে নারীকে "নিজের সেবাদাসী করিয়া রাখিয়া আপনারই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ও ইচ্ছানুযায়ীভাবে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তাহাতে এখন আর বড় কল্পনা-কুশলতার পরিচয় নাই। যাহা ভিতরে ভিতরে লোকে অস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছিল, তাহাই এখন প্রকাশিত ও প্রমাণিত হইয়াছে মাত্র। ইহা বিশেষ কোন চক্রান্ত করিয়া গঠিত না হইতে পারে, সম্ভবতঃ বলের প্রাধান্য ও যৌন-সংস্কারবশেই ইহা করিয়া থাকিবে। কিন্তু ফল একই হইয়াছে। পরে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই কাহারও মনে উদয় হয় নাই। এবং মানুষের ইহা এতই অভ্যস্ত, সংস্কারগত, এবং ধর্ম্ম, সাহিত্য-শিল্প-কলাদির সাহায্যে সদ্ভাবের সহিতও মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে তাহা সহসা কাহারও চোখে পড়ে না। কিন্তু একবার ইহার জ্ঞানমাত্রেই

আর অস্বীকার করা অসম্ভব। এবং ব্যক্তিগত হিসবে যত গুণই থাক, জাতিহিসাবে পুরুষেরা নিকট অপরাধী বলিয়াই জাতিহিসাবে নিন্দিত হন। পূর্ব্বব্যবস্থাদির পরিবর্ত্তন আবশ্যক বলিয়াও তাহার দোষ দেখাইতে হয়। কিন্তু "অনেকে" যে ইহা "সহ্য পর্য্যন্ত করিতে পারে না'" তাহার কারণ এ পর্য্যন্ত নারীরই দোষ, অদোষ, ক্ষুদ্র দোষে সকলেই নিন্দা, তিরস্কার, তাড়না করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নারীর তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনারই অধিকার ছিল না। এবং নারীর তাঁহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের উপদেশ যেখানে মনকরায় পওয়া যায়, সেখানে তাঁহাদের নারীর সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের বা দোষত্রুটির বিষয়ে উপদেশই বা তাঁহারা কতখানি পাইয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিলেও এই উষ্মার কারণ পাওয়া যাইতে পারে। আর মেয়েরাও যে মেয়েদের ও নবচেষ্টাব্রতীদের গালি দেন, তাহার কারণ তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশই এখনও ঐ সংস্কারে বদ্ধ আছেন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গণ্ডী ছাড়াইয়া চিন্তা করিবার অভ্যাস ও এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কমই হইয়াছে। তাই তাঁহারা আপনারা সুখ-সৌভাগ্যের মধ্যে থাকিলে অল্পলোকেই আর কিছু দেখিতে পান। আপনাদের মধ্যে মিল, একতা, শ্রদ্ধা, বিশ্বস্ততাও দাসের গুণের মধ্যে নয়। এজন্যও এখনও তাঁহারা উহাতে পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহাদেরও ইহা করিতে দেখিলে এমন কি আমাদের দেশের অন্যথা বিধবাদেরও শ্লেষ এবং "মেয়েদের আত্মহত্যা" সম্বন্ধেও মন্তব্য প্রকাশ তাহার মধ্যে থাকিলে "মেয়েদেরই লজ্জায়" ত "পড়িতে"ই হয়, আপনাদের অবস্থার কথা ভাবিয়া হতাশও যে না হইতে হয় এমন নয়। মেয়েদের শাশুড়ী, ননদের হাতে নিগ্রহ ভোগ করার কারণের মধ্যেও ইহা আছে। তাহার পর তাঁহারা স্বামী অর্থাৎ পুরুষের পক্ষীয় বলিয়াই বলী। বধূ অর্থাৎ স্ত্রীর অবস্থাক্রমেই তিনি তাঁহাদের দ্বারা নিগৃহীত হন। স্বামী স্ত্রীর বৈষম্যই ত ইহার মধ্যে কাজ করিতেছে।

কাহারও "সকলই দুঃখ এবং "সবই সুখ" অবশ্য হইতে পারে না। কিন্তু সুখ-দুঃখের প্রকৃতিভেদ আছে। কেহ অন্যের অন্যায়ে নিরুপায়-ভাবে দুঃখ ভোগ করে। তাহা যদি সংস্কার-বশে ধর্ম্মজ্ঞানেও করে তাহাতেও তাহার পরিবর্ত্তন হয় না।) আর কেহ আপনার স্বাধীন-বৃত্তির পরিচালনে আপনার শক্তি, প্রতিভার সাধনায় বা আপনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করে তাহার চেষ্টায় দুঃখ বরণ করে। ইহা ছাড়াও নানারকম কারণ ও অবস্থা-গতিকে নানারকম দুঃখ, শক্তি, প্রকৃতিভেদে সকল মানুষেরই আছে ও থাকিবে। মেয়েরা স্বভাবতঃ শরীর বলে দুর্ব্বলতর ও মাতৃত্ববদ্ধ বলিয়া মানুষের মন ও স্বভাবের আরও অনেক পরিমাণে উন্নতি, অভিব্যক্তি না হইলে দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা তাঁহাদের পক্ষে বরাবরই বেশী থাকিবে। কিন্তু এইজন্যই বরং যাহাতে তাঁহাদের দুঃখ যত কম পাইতে হয়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই রাষ্ট্রসমাজ-ব্যবস্থা প্রণয়ন কর্ত্তব্য। কারণ শারীরিক অপেক্ষাকৃত দৌর্ব্বল্য ও মাতৃত্ব কিছু প্রবলের হাতে নিগৃহীত হইবার পক্ষে উপযুক্ত অপরাধ নয়। আর এইজন্যই কোন সমাজে নারীর অবস্থা কেমন, তাহা দেখিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভুলরূপে তাহার দর দেওয়া যাইতে পারে

"বাইজী লইয়া বাগানে" যাওয়ার কথায় আর একটী স্বতন্ত্র আলোচনা আসিয়া পড়ে। তাহার স্থান ও সময়—দুইয়ের অভাব। কারণ "স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতা" এখন আর এক প্রবন্ধেই খতম হইবার মত বিষয় নাই। তবে কোন নূতন জিনিষ সম্বন্ধে একটী সুবিধা এই যে তাহার বিষয়ে কিছুই জানিবার বুঝিবার বালাই না রাখিয়াও ধমক ও বিজ্ঞতা প্রকাশ চলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রসামাজিক, নৈতিক শিক্ষাবিষয়ক সকল বিষয়ই হার অন্তর্গত। এবং নারী-প্রচেষ্টা আমাদের দেশে "নবীন", হইলেও পৃথিবীতে তাহা এখন আর নিতান্ত নবীন "অজ্ঞ" বা "অন্ধকারও নাই। আপাততঃ এ বিষয়ে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে নর-নারীর নৈতিক বৈষম্যের তিনি যে যুক্তিটী দিয়াছেন, তাহা অনেকদিনই জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নৈতিক বৈষম্য এবং মেয়েদের সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের শিক্ষা, সুবিধার অভাবেই যে ঐ বাইজীটীরও উদ্ভব তাহাও এখন আর অবিদিত নাই। মন্দকে ভাল করিবার চেষ্টাই অবশ্য নূতন আন্দোলনেরও উদ্দেশ্য। তাই সকল রকম অত্যাচার অনাচারেরই বিরুদ্ধে আপত্তি ও করিতে হয়, তাহা দূর করিতে হইলে যে ক্ষমতা আবশ্যক তাহার জন্য চেষ্টাও পাইতে হয়। ইহা মনে করিয়াও সকলে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন যে পুরুষেরা এখনও এমন অসহায় হইয়া পড়েন নাই যে মেয়েরাও তাঁহাদের রক্ষা করিতে না দাঁড়াইলে তাঁহারা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিবেন। রাষ্ট্রসমাজের বল হইতে দৈহিক, আর্থিক বিদ্যার বল, সকল বলই তাঁহাদের হাতে। ইহার উপর এতদিনের সংস্কার ইতিহাসের দ্বারা আভিজাত্যের বলও আছে। আর মেয়েরা ইহার কণা পরিমাণও কেবল অকাট্য যুক্তি ও সত্যের বলেই লাভ করিতেছেন ও করিতে পারেন। মেয়েদের মধ্যে যাঁহারা এ সকলের কিছুই চাহেন না, তাঁহাদেরও যেমন আছেন তেমনিই থাকিবার কোন বাধা হইবার কারণ নাই। তাঁহারা যাহা না করিবেন কেহই কিছুই জোর করিয়া তাঁহাদের দিয়া তাহা করাইবে না। সুতরাং যাঁহারা ঐ সকলের প্রয়োজন বোধ করেন, তাঁহাদেরও বাধা না দিলেই হয়।

নর-নারীর সম্বন্ধের মধ্যেও প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে মূলতঃ কোন ভেদ থাকিতে পারে না। সেখানে বিবাহ-প্রথাও উঠিয়া যায় নাই। শীঘ্র যাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যায় না। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে চৈতন্য-বোধ যে পাশ্চাত্য দেশ হইতে আসিয়াছে তাহার কারণ ঐ দেশেই এখন প্রাণের বল অধিক এবং উহা আগে হইতে এ বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী ছিল। আমাদের জাতীয়ত্ব-বোধও সেখান হইতেই আসিয়াছে। কিন্তু তবু

বর্ত্তমান আন্দোলন, যাঁহারা বেশী পাশ্চাত্যভাবাপন্ন তাঁহাদেরই কৃত নয়। বরং দেশে একদিকে পুরুষের মধ্যে পাশ্চাত্য খেলো জিনিষগুলির আতিশয্য অন্যদিকে মেয়েদের একাল পর্য্যন্ত সেকালেই আটকাইয়া রাখার প্রয়াসের অস্বাভাবিকত্ব হইতেই তাহার জন্ম। এবং তাহাতেই নরনারীর মধ্যে সামঞ্জস্যের সহিত পাশ্চাত্য বাজে ও দূষিত জিনিষগুলি দূর হইয়া জাতীয় ভাব বেশীই থাকিতে পারে। তবে নূতন কোন প্রচেষ্টা অবশ্য একদিনে, একসঙ্গেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া দেখা দিতে পারে না। তাহার ক্ষেত্রে অধিকারই যে কি ব্যাপার তাহা আমাদের দেশে উহার জন্মের সূচনা মাত্রেই যাহা হইতেছে তাহা দেখিলেই বোধগম্য হইতে পারে। তাহার পর উহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলেও নরনারী সকলেরই তাহাতে শিক্ষিত অভ্যস্ত হইতে অত্যন্ত সময়ের আবশ্যক। আর তাহা হইবার প্রধান বাধা যে প্রাচীন গুল্ম, তাহা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। তাহার উপর আবার নারী-প্রচেষ্টার সহিত কোন সম্পর্ক না থাকিলেও পাশ্চাত্য কতকগুলি মতামত ধরণ-ধারণের সহিত তাঁহাদেরও যুদ্ধ করা আবশ্যক। সুতরাং পরানুকরণের জন্যও তাঁহারা অতিমাত্রায় ব্যস্ত নন্। কিন্তু প্রাচীন গুল্ম যতই তাঁহাদের জড়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে, সেই সুযোগে বাজে লোকগুলির ঐ গুলিই নূতন মত বলিয়া চালানো ততই সহজ হইবে মাত্র।

শেষে বিনয়ের উপদেশটী সম্বন্ধে বলিতে হয়, উপদেশ দৃষ্টান্ত দ্বারাই বেশী কার্য্যকর হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। এবং নূতন কিছু না হইলেও যে ২।১ টী কাজের কথা প্রবন্ধটীতে আছে কেবল সে সম্বন্ধে কথা হইলে নবীন পন্থীদেরও আপত্তির কারণ থাকিত না। বঙ্গনারী।

দেবর

তনয়ের স্নেহ বন্ধুর প্রীতি
সোদরের ভালবাসা
এক হয়ে মিশে উছলিয়া ধীরে
কার বুকে নেছে বাসা!
মায়ের সমান হইয়াও কারে
রহস্য-জালে ঘিরি,
কৌতুক-হাসি বিদ্রূপ-বাণে
সতত বিঁধিয়া ফিরি!
শ্বশুরের গৃহে আসিলে প্রথম
কোন্ সে কিশোর আসি,
মৌন বধূর সিক্ত-নয়নে
প্রথমে ফুটায় হাসি!
চঞ্চল কার ব্যগ্র সে দুটী
কোমল নয়ন-তারা
সারাদিন রহে বধূরে ঘিরিয়া—
স্নেহে পলক হারা!
প্রথমেই মিঠা লাগে সব-চেয়ে
কার "বউদিদি" ডাক?
শতবার সে যে ডাকে গো কেবলি,
কাজ থাক্ বা না থাক্!
বল্ বধূ, বল্, অচেনা অজানা
শ্বশুরের গৃহে তোর,
পায়নি কি প্রাণ অকপট সেই
সহজ প্রীতির ডোর?

জনম অবধি যে ভাইয়ের সাথে
রহিয়াছি চিরকাল,
তাহারি বিরহ-ব্যথা কে ভুলায়
রচিয়া স্নেহের জাল!
অকপট প্রীতি স্নেহ কার বল
এড়াইয়া চলা দায়,
আব্দার-সনে অভিমান কেবা
চিরদিনই করে যায়!
বয়সে তরুণ বড় সে হলেও
স্বভাব সমান রহে,
স্নেহ-প্রীতি-মায়া-সম্ভ্রম-ভরা
ভকতি-অর্ঘ্য বহে!
সকল অভাবে সব পরামর্শ
আমার নিকটে যাচে,
মনের গোপন কথাটি জানায়
নিভৃতে আমারি কাছে!
ভগিনীর স্নেহ, জননীর পূজা—
পেয়েছি পরের মেয়ে,
প্রিয়-সখী-সম অন্তর-কথা
জানি কার সব চেয়ে!
কখনো বন্ধু, কভু সহোদর,
কভু বা তনয়-সম,
সে যে প্রিয়- এক-শোণিতে গঠিত

পরশমণি (Alchemy)

কবিবর হেমচন্দ্র গাহিয়াছিলেন :—

"কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?
অই যে অবনীতলে 'পরশ-মাণিক' জ্বলে
বিধাতা-নির্ম্মিত চারু মানব-নয়ন।"

প্রেমিক দেবেন্দ্রনাথ গাহিলেন :—

"না গো না এ চক্ষু নয় সে অতুল মণি
প্রেমই 'পরশমণি'—যাদুকর-স্পর্শে যার
হয়েছে অমরাবতী মাটীর ধরণী।"

সাধক তাহাতেও তুষ্ট হইলেন না। সর্ব্বারাধ্য সারাৎসার শ্রীভগবানই তাঁহার "পরশমণি !"

'আমার হৃদয় প্রাণ মন,
শুধু ধূলি, শুধু ছাই, মূল্য যার কিছু নাই,
মূল্য তারে কর সমর্পণ,
স্পর্শে তব পরশরতন !"

ইহা লাভের জন্য তিনি প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত।

আমাদের আলোচ্য 'পরশমণি' নিতান্তই ভৌতিক পদার্থ। তাহা হইলেও ইহার স্পর্শে ধূলি ও ছাই সুবর্ণে পরিণত হইবে এই সম্ভাবনা ছিল। তাই অনুসন্ধিৎসুর দল যে উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে উহা প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সাধকের সাধনা অপেক্ষা অণুমাত্র ন্যূন নহে। বুঝি বা তাঁহারা Cardinal Wolseyর ন্যায় যথার্থই বলিতে পারিতেন, "Had I but served my God with half the zeal" —ইত্যাদি ; অর্থাৎ এই মণির জন্য তাঁহারা যে সাধনা করিয়াছিলেন, সকল মণির মণি ভগবানের জন্য যদি ইহার অর্দ্ধেক সাধনাও করিতেন, তবে বুঝি তাঁহাদের এত দুর্গতি হইত না !

বস্তুতঃ দুর্গতি যথেষ্ট হইয়াছিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ যাইতে লাগিল, শরীরের সমস্ত সামর্থ্য, প্রাণের সমস্ত বল নিয়োগ করিতে লাগিলেন—একাগ্রতা, অধ্যবসায়ের চরম স্তরে উপনীত হইলেন—তবু আরম্ভ করিলেন—মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইতে প্রয়াস পাইলেন। * অনিচ্ছায় বা অজ্ঞতাবশতঃ নহে, যখন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে আমরা প্রলুব্ধ মানবকে—তাহা অপেক্ষাও গুরুতর—আমাদের প্রলুব্ধ হৃদয়কে প্রবঞ্চিত করিতে প্রয়াস পাই, তখনই আমরা দুর্গতির চরম সোপানে উপনীত হই। ইহাদেরও তাহাই হইয়াছিল। †

এই উদ্যমেরই আংশিক ইতিহাস আজ আপনাদিগকে দিবার চেষ্টা করিতেছি।

স্পর্শমণি অনুসন্ধানের ইতিহাসের সঙ্গে প্রাচীন মানব সমাজের সভ্যতার ইতিহাস বিশেষভাবে জড়িত। কথিত আছে, মানবজাতি সংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে স্থানাভাব হওয়ায়, তাঁহারা প্রাচীন আবাস-ভূমি পরিত্যাগ করেন ও উপনিবেশ স্থাপন করিতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যাইতে আরম্ভ করেন। যে দেশের জল-বায়ু তাঁহাদের

---

* To these considerations of a practical nature which strengthened the conviction as to the transmutation of the metals, but which inferred a gross self-deception on the part of the observer himself —to say nothing of their being turned to good accounts by crafty knaves."

History of Chemistry, Meyer p. 23.

When a man became a student of alchemy, merely for the purpose of making gold and failed to make it, —as he always did—it was easy for him to pretend he had succeeded, in order that he might really make gold by cheating other people. Such man rapidly degenerated into a charlatan"

Story of Alchemy ; P. Muir p. 106.

† "আপন হৃদয় যার ভুলায়
কুহকে আপনারে, বড় ভয়ঙ্কর সে সময়—
শাস্ত্র হয় ইচ্ছা আপনার, ধর্ম্ম হয় আপন কল্পনা।"

স্বাস্থ্যোপযোগী ও ভূমির উর্ব্বরতা-বোধে আহার্য্য সামগ্রী উৎপাদনে ও ধনাগমে সহায়ক, সেই সেই দেশে তাঁহারা স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। এইরূপে চীনদেশে—হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকাভূমি—ভারতে—সিন্ধু ও গঙ্গার উপত্যকা-ভূমি, সিরিয়ায় টাইগ্রিস ও ও ইউফ্রেতিজের উপত্যকা-ভূমি প্রাচীন মানব জাতির আবাস-ভূমিতে পরিণত হয়।

যে স্বাস্থ্য ও ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রধানতঃ তাঁহাদিগকে বিভিন্ন দেশে পরিচালিত করিয়াছিল, মানব হৃদয়ের অন্তর্নিহিত এই দুই প্রবল প্রবৃত্তিই মানব জাতিকে 'স্পর্শ-মণির' অনুসন্ধানেও প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। * কাজে কাজেই ইহা খুব স্বাভাবিক যে উল্লিখিত প্রত্যেক দেশেই স্বাধীন ভাবে স্পর্শমণির খোঁজ হইয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ গবেষণার ফলে ঐ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিল। †

তবে ইহার সাধনা প্রধানতঃ মিশর, সিরিয়া, ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশ-সমূহে আবদ্ধ ছিল বলিয়া আমাদের অন্ধকার আলোচনা তৎ-তৎ-প্রদেশেই নিবদ্ধ রাখিব।

মিশর ও সিরিয়া প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ছিল। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত বিখ্যাত "Rosette stone" ও ১৮৪২ অব্দে সিরিয়াতে আবিষ্কৃত বহুতর প্রস্তর-ফলক এবং অধুনা Thebes-এ আবিষ্কৃত টুটেনখামানের সমাধি-ভূমি ঐ দেশ-সমূহের সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এমন কি অধুনা Egyptiology ও Assyriology নামক দুই বিজ্ঞান প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র হইয়াছে। এই সব পাঠে অবগত হওয়া যায় যে সুন্দরী Cleopatraর লীলা-নিকেতন মিশর-ভূমি ও আরব্য রজনীর স্বপ্নময় গল্পাবলীর সৃজন-ভূমি সিরিয়া ও বেবিলন খৃষ্ট পূর্ব্ব চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও সভ্যতার কত উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল এবং কত প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল দেশ অধ্যুষিত ও শাসিত হইত।

পুরাকালে মিশর ও সিরিয়ার রাজগণের মধ্যের বহু যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছিল। কখনও বা ফেরোয়গণ (মিশরের রাজা) Syria অধিকার করিয়া তথায় নিজেদের সভ্যতা প্রচার করিয়াছেন; আবার কখনও Hittিগণ (সিরিয়ার রাজা) মিশর জয় করতঃ তথায় রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। ইহার ফলে এই দুই দেশের সভ্যতা ক্রমে একীভূত হইয়া যাইতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, ঘুয়েজ

---

* The alchemists sought the stone of wisdom for by gaining it they gained the control of *wealth*; they sought the universal panacea, for that would give them the power of enjoying wealth and life."

(Story of Alchemy, P. Muir P. 105)

—"Alchemy appealed to some of the strongest of human motives—the wish for health, the fear of death and the love of *wealth*."　　P. 36.

† We have cited ancient Egyptians as practising the chemical arts, but there in no proof that it originated with them. China, India, Chaldea have each. in turn been regarded as the birth-place of the various technical processes, from which chemistry may be said to have taken its "rise".

"History of Chemistry," Thorpe, Vol 1. P. 2.

The fact that all these authors were closely connected with the Schools of Alexandria...adds to the probability, that our science was first extensively practised in Egypt, although there are indications of early Babylonian and Chaldean traditions—and alchemical ideas also appear to Lave arisen and to have been developed independently in India.

Roscoe, "Treatise of Chemistry," Vol. 1. P.5.

ভারতে ইহার স্বাধীন প্রচার সম্বন্ধে "History of Hindu Chemistry" by Sir P. C. Ray সর্ব্বপ্রধান সাক্ষ্য। Vide. Vol. I. Chapter VI (Indebtedness of the Arabians to India) & Vol. II. Chapter V. (Indigenous origin of Hindu Alchemy.)

The Chinese also busied themselves with alchemy at that time, the transmutation of tin into silver and of the latter into gold being held to have actually accomplished."

Meyer, History of Chemistry P. 28 (foot-note)

তখনও যোজকই ছিল—প্রণালী হইয়া জাতিদ্বয়কে বিভক্ত করিবার সুযোগ পায় নাই। কিন্তু যে সকল দেশ ভূমধ্যসাগর ও অন্য জলরাশি দ্বারা মিশর-ভূমি হইতে বিভক্ত ছিল, তখনও তাহাদের সহিত মিশরের যোগাযোগের তেমন সুযোগ হয় নাই। তাহার উপর ফেরোয়া রাজগণ সাধারণতঃ অনেকটা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় (exclusive)ছিলেন। *

কাজেই ভূমধ্যসাগরোপকূলের মিশরস্থ বন্দররাজি তখনও সর্ব্বসাধারণের বাণিজ্যভূমিতে পরিণত হয় নাই। ফিনিশিয়গণ খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকায় বাণিজ্য বিস্তার করে—তাহার ফলে কার্থেজ-বন্দর উৎপত্তি হয়। এই বন্দর সভ্যতার ইতিহাসে কি উপাদান দিয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রই অবগত আছেন। ক্রমে ৬৭০ খৃঃ, পৃঃ,তে মিশরের বন্দরগুলি সর্ব্বসাধারণের বাণিজ্যভূমিতে পরিণত হয়। তখন হইতেই ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জাতির সঙ্গে মিশর অধিবাসিগণের সংশ্রব ঘটে। গ্রীস তখন উন্নতির কেন্দ্রস্থানে পৌছিয়াছে। এই সময়েই Thales of Meletus (640 খৃঃ, পূঃ,), Pythagorus (566 খৃঃ পূঃ) প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রীক পণ্ডিত ও দার্শনিক মিশরে বাস করেন এবং মিশরের জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কাজেই পূর্ব্বে সিরিয়া ও মিশরের ন্যায়, এই সময়ে গ্রীস ও মিশরের সভ্যতার সংমিশ্রণের বিশেষ সুযোগ ঘটে। তাহার পর খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৩৪ অব্দে বিশ্ববিশ্রুত Alexander the Great সিরিয়া ও মিশর জয় করিলে এই সংমেলন গাঢ়তর হয়। তিনি স্বনামে সাগরোপকূলে Alexandria নামে এক বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা তৎকালে শিল্পবিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি হইয়াছিল এবং উহা হইতে বিকীর্ণ জ্ঞানরশ্মি চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশ-সমূহকে আলোকিত করিয়াছিল। Alexander-এর মৃত্যুর পর তদীয় সেনাপতিগণের মধ্যে তদধিকৃত রাজ্য বিভক্ত হয়, বিখ্যাত টলেমিগণ মিশরের শাসনকর্ত্তা হয়েন। এই ভাবে গ্রীস ও মিশরের ভিতর ভাবের আদান-প্রদানের সম্ভাবনা হয়। গ্রীক্ পণ্ডিতগণের কল্পনা (speculation) ও মিশরীয় পুরোহিতগণের কার্য্যকরীবিদ্যার (techniqne) সংমিশ্রণ ধাতুকে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা সর্ব্বপ্রথম সূচিত করে।

মিশর দেশ কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল—তাই উহাকে লোকে Chemi (Black Country) কহিত। Chemia বিদ্যা—যাহা আরবীয় article "Al" সহযোগে ৭ম শতাব্দীতে Alchemy ও ক্রমে সপ্তদশ শতাব্দীতে Chemistryতে পরিণত হইয়াছে—তাহা এই Chemi

---

* Psamatik (B. C 672—667)

His employment of Greek and Carian mercenaries naturally led him on into intimacy with foreigners and into a regard and consideration for them quite unknown to previous Pharaohs and in contradiction to ordinary Egyptian prejudices. Egpyt was the China of the Old world and had for ages kept herself as much as possible aloof from foreigners and looked upon them with aversion. Foreign vessels were—until the time of Psamatik forbidden to enter any of the Nile mouths or to touch at an Egyptian port. The mercenaries, if they were to be content with the position, must be allowed to communicate freely with the cities and countries from which they came and intercourse between Greece and Egypt must be encouraged rather than forbidden. Accordingly the Greeks were invited to make settlements on the Delta. ....A considerable trade grew up between Egypt and Greece."

"The life and stir which foreign commerce introduced among them, the familiarity which strange customs and manner, engendered by daily inetrcourse with the Greeks, the acquisition (on the part of some) of the Greek language.................the insight into reek habits of thought produced no inconsiderable effect upon the national character of the Egyptians, shaking them out of their accustomed groove and awakening curiosity and energy."

"Ancient Egypt" by Rawlinson

কারণও বিদ্যমান আছে। প্রাচীন মিশরের রাজধানী থিবস্‌এর সমাধিমন্দিরে এক লিপি-ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে—উহা Papyrus নামে প্রসিদ্ধ (অধুনা Seydenএর Museumএ রক্ষিত)। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ইহা লিখিত বলিয়া বিশ্বাস। আমাদের দেশে প্রচলিত হস্তলিখিত পুঁথির ন্যায় ঘাসের পাতায় এই 'papyrus' প্রস্তুত। (৬)

এই লিপি-ফলক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে প্রাচীন মিশরের অধিবাসিগণ. অধুনা যে সকল বিষয় রসায়ন-শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, এমন অনেক বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দস্তা, পারদ, লৌহ প্রভৃতির অস্তিত্বের কথা তাঁহারা জানিতেন। খনি হইতে স্বর্ণ উদ্ধারের প্রস্তরলিপি খ্রীষ্টের জন্মের ২৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মিশরের সমাধি-স্তম্ভে পাওয়া যায়। রৌপ্য, শুভ্র স্বর্ণ, (white gold) নামে কথিত হইত এবং উহা মুদ্রা নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত। তাম্র মুদ্রা-নির্ম্মাণ ও বাসনাদি প্রস্তুতের কাজে লাগিত। লৌহকে ইস্পাতে পরিণত করা তাঁহারা অবগত ছিলেন ও ছুরী, কাঁচি, তরবারি ইত্যাদি লৌহ দ্বারা প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা কাঁচ নির্ম্মাণ, রঞ্জন-বিদ্যা ইত্যাদি জানিতেন। Mordant-এর সাহায্যে এক রং দ্বারা বিভিন্ন রংএ বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিতে পারিতেন। Glass blowing সম্বন্ধে বহুতর চিত্রলিপি মিশরের রাজধানী Thebes সমাধি-মন্দিরের প্রস্তরে লিপিবদ্ধ আছে। কাঁচে বিভিন্ন রং দিবার প্রণালীও তাঁহারা অবগত ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্বে ১৪৭৫ অব্দে মিশরের জনৈক রাণীর গলদেশে কাঁচ-গুটিকার (Bead) হার ছিল এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ১৭০০ অব্দে Emareld নির্ম্মিত মাদুলীর প্রচলন ছিল। বস্তুতঃ ইউরোপে এই সকল বিদ্যা প্রচলনের জন্য মিশর ও ফিনিশিয়ার অধিবাসীগণই অনেকাংশে সহায়তা করিয়াছে।

এদিকে মিশরে যখন কার্য্যকরী হিসাবে এই বিদ্যা চলিতেছিল ও একান্ত সংগোপনে বিভিন্ন দেব-মন্দিরের পুরোহিতগণ এই বিদ্যার পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন, তখন গ্রীক্‌গণ দার্শনিক আলোচনা লইয়া বিব্রত (৭)। কার্য্যকরী হিসাবে "হাতে-কলমে" বিদ্যালোচনা শুধু ইতর লোক করিবে, গ্রীক্ দার্শনিকদিগের মধ্যে এই ভাব খুব প্রবল ছিল (৮)। কোন্ মূল উপাদান হইতে পৃথিবী উদ্ভূত—তাঁহারা ইহা লইয়া বহু গবেষণা করিতেছিলেন। কোনো মূল উপাদানই যে এই জগতের উৎপত্তির কারণ,এই ধারণা তখন দার্শনিকদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। আজও যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ এই ধারণার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন তাহা নহে। Thales খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে 'জল'কে মূল ধাতু আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। কেহ "বায়ু"কে নামে, কেহ 'অগ্নি'কে, কেহ বা 'ক্ষিতি'কে এই মূল উপাদান বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদের "ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুৎ" পর্য্যন্ত তাঁহারা পৌছিয়াছিলেন। ক্রমে দেখা গেল, ইহাদের কোনটাই বস্তুতঃ জগতের মূল উপাদান হইতে পারে না—তখন Aristotle (৩৮০ খৃঃ, পূঃ,) এই চার উপাদান-সম্ভূত বলিয়া জগৎকে কল্পনা করিলেন। উপাদানগুলিকে বস্তু বিশেষ বলিয়া মনে করিলে মহাভ্রম হইবে। ইহাদিগের প্রত্যেকটীকে কতকগুলি সত্ত্বের সমষ্টিমাত্র কল্পনা করা হইত। যথা 'অপ' শৈত্য ও আর্দ্রতা, 'মরুৎ' উষ্ণতা ও আর্দ্রতা, "তেজঃ" উষ্ণতা ও শুষ্কতা এবং 'ক্ষিতি' শৈত্য ও শুষ্কতার সমষ্টি বলিয়া কল্পিত হইত। গুণের ইতর-বিশেষ দ্বারা উপাদানরাশি পরিবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব ছিল না - যথা—'অগ্নির' 'শুষ্কতা' যখন 'অপের' আর্দ্রতা দ্বারা বিনষ্ট হইত তখন 'মরুৎ'-এর উৎপত্তি হইত। 'মরুৎ'-এর উষ্ণতাকে 'ক্ষিতির' শৈত্য দ্বারা নাশ করিলে'অপ্' সৃষ্টি হইত। Pliny তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে অনেক উদাহরণ দ্বারা এই পরিবর্ত্তন প্রমাণীকৃত করিয়াছিলেন। আকাশে মরুৎ'-এর আকারে

(৬) এই "papyrus" কথা হইতে paper কথারই উৎপত্তি।

(৭) "In sharp contrast with the disinclination of the ancients towards experiment.........stood their great love for speculation." Meyer, P. 6.

(৮) Industrial work tends to lower the standard of thought M. P. 11 Aristotle.

প্রবহমান মেঘরাশি যখন 'ক্ষিতির' শৈত্যের সংস্পর্শে আসিয়া জলধারা সৃজন করিত, তখন 'মরুৎ' 'অপ'-এ পরিণত হইল, ভাবা কি অন্যায় ? আবার 'তেজের' সংযোগে উত্তপ্ত হইয়া বসুন্ধরার "অপ"রাশি যখন অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন তাহা মরুৎ-এ পরিণত হইল ভাবা কি খুব অস্বাভাবিক ছিল ?

যেহেতু উপাদান-মূলে জগত সৃষ্ট, এবং উপাদানরাশি পরিবর্তন-সাপেক্ষ, অতএব জগতের পদার্থ নিচয়ও পরস্পর পরিবর্তনশীল হইবে, ইহা খুব স্বাভাবিক অনুমান বলিয়া বোধ হইবে।

গ্রীসিয় ও মিশরীয় সভ্যতার যখন এই অবস্থা, তখন Alexander মিশর জয় করিলেন। Aristotle-এর চতুরুপাদান-মূলক শিক্ষা মিশরবাসীদিগের হৃদয়ে ধাতুর পরস্পর রূপান্তরের মোহ জন্মাইয়া দিল। নিম্নশ্রেণীর Base (ধাতুকে উচ্চশ্রেণীর) (noble) ধাতুতে পরিবর্তন সম্ভব, Aristotle এর শিক্ষা হইতেই যেন মিশরবাসীগণ পাইল। যে-উপাদানের সহায়তায় ধাতুকে রূপান্তরিত করা সম্ভব তাহাকে 'স্পর্শমণি' আখ্যা দেওয়া হইল। এই মণি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে—যথা philosopher's stone, Elixir vita, Elixir of life, Magisterium ইত্যাদি।

যদিও এই দুই জাতির ভাবধারার সংঘাতই পরশমাণিকের ধারণার সৃষ্টিকর্ত্তা, তবু উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু কৌতুকাবহ গল্প প্রচলিত আছে।

দেবতাগণই নাকি ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা! "আদম" উহা দেবতাগণের নিকট প্রাপ্ত হন। জ্ঞানী 'সলোমানকেও' নাকি উহা দেবতাগণ দিয়াছিলেন; কিন্তু এই মাণিক পাওয়া সত্ত্বেও তিনি যে কেন স্বর্ণের জন্য 'অফির' (ophir) এর সুবর্ণ-খনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, তাহার অর্থোদ্ধার করিতে পণ্ডিতদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, দেবতাগণ নারীর মোহে বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে গোপনে এই বিদ্যা শিক্ষা দেন; এই অপরাধে তাঁহারা নাকি স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। Sybillia Phoebusকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিদান-স্বরূপ নাকি তিনি দীর্ঘ জীবন ও স্পর্শমণি প্রার্থনা করেন—এইরূপ গল্পও প্রচলিত আছে। কিন্তু Hermese নামক মিশরীয় দেবতার সহিতই এই বিজ্ঞানের বিশেষ সংস্রব দেখা যায়। এইজন্য এই বিদ্যা Hermetic Art বলিয়া কথিত হয়। কোন কাঁচের নলের উভয় মুখ বন্ধ করিলে, তাহাকে hermetically sealed বলে —অর্থাৎ ইহার অভ্যন্তরস্থ জিনিষকে Hermes নামক দেবতার seal দ্বারা বন্ধ করা হইল;—এই ধারণা আমাদের পত্রের উপর ৭৪৷৷ লেখায় কতকটা বিদ্যমান আছে। Papyrus-এ বিভিন্ন ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করার বহু অনুপাণ দেওয়া আছে। কাজেই ইহা রচিত হওয়ার পূর্ব্বে এই বিদ্যা প্রচলিত ছিল, এমন অনুমান করা যায়।

রাসায়নিক অনুষ্ঠান প্রাচীন মিশরে প্রচলিত ছিল তাহা দেখানো হইয়াছে। কিন্তু থাকিলেও উহার সাধকগণ পুরাকালে যখন যেমন ইচ্ছা, এটা সেটা নিয়া খেলা-ধূলা করিতেন—এই বিদ্যা সাধনাই জীবনের একমাত্র সাধন সমগ্রী—এই ভাব ইঁহাদের কখনই ছিল না। উঁহারা অধিকাংশই ছিলেন, ধর্ম্ম-মন্দিরের পুরোহিত। মন্দির সংক্রান্ত কার্য্যের অবসর সময় তাঁহারা এই সকল লইয়া খেলা-ধূলা করিতেন মাত্র। তাঁহাদের সাধনার ফলাফল সর্ব্ব সাধারণের অগোচরে রাখিতেন। ইহা ভগবান Hermes এর প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞান—কাজেই ভগবানের মন্দিরেই তাহার সাধনা ছিল। ও ভগবানের অনুগৃহীত মন্দিরের উপাসকবৃন্দ তাহা অলোচনার অধিকারী (৯), এই ধারণাই তখন

(৯) "The chemical art proper, revered as "holy" was jealously guarded by the Priesthood, as a treasure, at once precious and profitable. Only the elect might penetrate into the mysteries. The Laboratories in which operations were carried out actually formed adjuncts to the temples."

Meyer P. 10.

"The Knowledge of it was a sacred mystery to be known only to the priesthood and jealously guarded by them.

Thorpe P. 4

মিশর-বাসীদের মনে বদ্ধমূলে প্রশস্ত কখনো তাহাদের অনুষ্ঠিত গবেষণাবলী লিপিবদ্ধ করা দরকার বোধ করিলে, তাহা এমন ভাষায় লিখিত হইত যাহার অর্থোদ্ধার করা অসম্ভব ছিল। যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য, গবেষণার ফলাফল পরস্পর হইতে গোপন রাখার অস্বাভাবিক চেষ্টাতে পর্য্যবসিত হয়, তখন তাহার উন্নতি অসম্ভব। অধীগত বিদ্যার আদান-প্রদানই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সোপান (১০)। জ্ঞান অনন্ত—ব্যক্তি-বিশেষের তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা কদাপি সম্ভবে না।

উন্নতির ইহা অপেক্ষাও গুরুতর আর এক অন্তরায় হইল —বৈজ্ঞানিক চিন্তার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা তখনও স্থির হয় নাই। চিন্তার একটা সাধারণ লক্ষ্য স্থির না হইলে সেই চিন্তা সবিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তা-প্রসূত কার্য্যাবলী অনেকটা পাগলের কার্য্যাবলীর ন্যায়। খৃষ্টীয় চতুর্থ এমন কি পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্তও এই বিজ্ঞানের এইরূপই একটা অবস্থা ছিল।

চিন্তার ধারাকে কোন একটা উপলক্ষ্যের বিষয়ীভূত করিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা চাই—তবেই সেই চিন্তাপ্রসূত কার্য্যাবলী অর্থযুক্ত হইতে পারে। 'পরশ-মাণিক' এইবার সেই লক্ষ্য পাইল। আমরা দেখিতে পাইব (৪র্থ ?) পঞ্চম শতাব্দীর পর হইতে ১৬শ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকদিগের সমস্ত প্রচেষ্টা এই মাণিকের খোঁজে ব্যাপৃত হইয়াছিল। প্রার্থিত 'মাণিক' মিলিল না সত্য—কিন্তু ইহার আরাধনার ফলে এমন সব তথ্য আবিষ্কৃত হইল, যাহা অধুনা বিপুল রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তি। এই জন্য পরশ-মানিকের খোঁজকে লর্ড বেকন সেই বৃদ্ধের উপাখ্যানের সহিত তুলনা করিয়াছেন—যিনি মৃত্যু-শয্যায় তদীয় পুত্রদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি প্রভূত স্বর্ণ আঙুর ক্ষেত্রের নিম্নে প্রোথিত রাখিয়া গেলেন। স্বর্ণ-লাভের প্রত্যাশায় পুত্রগণ প্রাণপণে সমস্ত আঙুর ক্ষেত্র কর্ষিত করিল—কিন্তু কোথায় স্বর্ণ? তবে কি তাহাদের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইল? তাহা নহে; স্বর্ণের পরিবর্ত্তে কর্ষিত ভূমি হইতে অপর্য্যাপ্ত আঙুর উৎপন্ন হইল—যাহা স্বর্ণ আগমনের পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দিল। 'পরশমাণিক' বলিয়াই নহে, বিজ্ঞান জগতে এমন ভূরি ভূরি ব্যর্থ অভিযানের দৃষ্টান্ত আছে, যাহা সাক্ষাৎভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে বিশেষ কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ হইয়াছে।

যাহা হউক, অতঃপর বৈজ্ঞানিকগণের সমস্ত চিন্তা ও কার্য্যাবলী 'পরশমাণিক'এর চতুষ্পার্শ্বে কেন্দ্রীভূত হইল। 'হাতে কলমে' ইহার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। ইহার খোঁজই প্রাচীন রসায়নের কার্য্য, আর ইহার সাধনাই প্রাচীন রসায়নের সাধনা। ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশর, সিরিয়া, ও গ্রীসই ইহার সাধনক্ষেত্র ছিল এবং এলেক্‌জেন্দ্রিয়া এই সাধনার কেন্দ্রস্থানীয় ছিল। কিন্তু অধুনা এই বিজ্ঞান ঐ সকল স্থানে আর অধীত হয় না—এমন কি সিরিয়াও মিশরের নাম এক রকম বিস্মৃতির গর্ভেই বিলোপ পাইতেছিল—কেবল এই বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের ফলে Mespot Syriaর নাম পুনরায় আবালবৃদ্ধবনিতার গোচরে আসিয়াছে। কিরূপে অতীত সাধন-ভূমি হইতে এই বিজ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া ক্রমে ইউরোপ খণ্ডে পৌঁছিল ও ক্রমে উহা ইউরোপীয় বিজ্ঞানে পর্য্যবসিত হইল সেই সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মিশর গ্রীস্ কর্তৃক অধিকৃত হইলে তথায় গ্রীসিয় সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে রোমকগণ গ্রীস্ জয় করিয়া তাহাকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করে। গ্রীসের স্বাধীনতা-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বাধীন চিন্তার ধারাও লোপ পায়। কত উন্নতিশীল জাতির স্বাধীন চিন্তার স্রোত এই ভাবে অবরুদ্ধ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যে জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের গর্ব্বে জগতের শীর্ষ স্থানে বিরাজ করিতেছিল, অধীনতা পাশ সেই গর্ব্বকে খর্ব্ব ও ক্ষুণ্ণ করিয়া ক্রমে তাহা ধূলিসাৎ করিল—গর্ব্ব শুধু একটা বিরাট বেদনা ও দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হইল। সমস্ত মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার মূলে কুঠারঘাত পড়িল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে শুধু একটা চর্ব্বিত-

(১০) For Science depends essentially upon free inter-communication of facts and the spread of knowiedge of natural phenomena."

Thorpe P. 13.

চর্ব্বণের যুগ আসিল। (১১) নূতন তথ্য, নূতন উপাদান সৃষ্ট হওয়া বন্ধ হইল, সর্ব্বত্র শুধু দীনতা, শুধু হীনতা। জ্ঞানের দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ, বুঝিবা জ্ঞান-বিজ্ঞান একেবারে অতলে নিমজ্জিত হয়।

এমন সময় কোথা হইতে অকস্মাৎ এক বিপুল তেজস্বী জাতির সৃষ্টি হইল– প্রস্তরে প্রক্ষিপ্ত বীজকে কোথা হইতে এক সর্ব্ব-বিজয়ী ধারা বহন করিয়া উর্ব্বর ভূমিতে নিক্ষেপ করিল—তাহার ইতিহাস বড়ই আশ্চর্য্য জনক। আরব মরুভূমির সন্নিকটে বেদুইন নামে অতি ক্ষুদ্র এক জাতি বিদ্যমান ছিল। মেষ-পালনই তাহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানই ছিল না। কিন্তু ইহারাই মহাত্মা মহম্মদের অধীনে গ্রীক্ ও পারসিক্‌দিগের যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসরে ক্রমে ক্রমে বল সঞ্চয় করিতেছিল। মহাত্মার তিরোধানের সমসময়ে তাহারা এক বিরাট ক্ষমতাশালী জাতিতে পরিণত হইল। তাহাদের বিরাট বিজয়-বাহিনীকে কোন বাধা অবরুদ্ধ করিতে পারিল না—তাহাদের অব্যাহত গতির সম্মুখে পর্ব্বত মস্তক নত করিল—সমুদ্র গর্ব্বিত তরঙ্গমালা স্তব্ধ করিল। তাহারা প্রথমে সিরিয়া অধিকার করিল। তৎপরে—পূর্ব্বে পারস্য, আফগানিস্থান ও ভারতের অংশ-বিশেষ এবং পশ্চিমে মিশর, সমস্ত উত্তর আফ্রিকা, এমন কি স্পেন পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিল। তৎপর "পিরেনিজ" (Pyrennis) পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ফরাশী দেশে প্রবেশ করিল। এই স্থানে তাহাদের বেগ সর্ব্বপ্রথম প্রতিহত হইল। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে টুইর্স্ (Tuirs) নামক স্থানে সমবেত ইউরোপীয় সামন্তাবলী চার্লস মার্টিলের (Charles Martel) অধীনে ইহাদিগকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় যুদ্ধ। ইহার ফলাফলের উপর সমস্ত ইউরোপের—তথা পারস্য ও ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছিল। যদি এই উদ্ধত বিজয়-বাহিনীর স্পর্দ্ধা ফরাসীগণ বিধ্বস্ত করিতে না পারিত তবে সমস্ত ইউরোপে হয়ত ইসলামীয় সভ্যতা বিস্তার লাভ করিত। (১২)

দেশ-বিজয়ের চেষ্টা এইরূপে প্রহত হইলে আরবীয়গণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহাদের অধিকৃত সর্ব্বত্র শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চ্চা চলিতে লাগিল। এসিয়া মাইনরে বাগ্‌দাদ্, মিশরে কাইরো ও স্পেনে করডোভা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে বিভিন্ন দেশ হইতে আগত জ্ঞানপিপাসুগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় রত হইলেন। ইংলণ্ড হইতে Roger Bacon, ফ্রান্স হইতে Arnold Villanovenus, জার্ম্মাণি হইতে Aibertus Maguns প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এই করডোভা (Cordova) বিশ্ববিদ্যাল হইতে Alexandrian বিজ্ঞানের শিক্ষা আহরণ করিলেন এবং ইউরোপ খণ্ডে স্পর্শমণির সাধনা সূচিত করিলেন। *

(১১) মানব ইতিহাসের এই যুগ বড়ই দুঃখের, বড়ই দৈন্যের যুগ (ইহা অন্ধ যুগ—"Dark Age" বলিয়া ইতিহাসে কথিত)

(১২) "But for it, perhaps the interpretation of the 'Koran" would now be taught in the schools of Oxford and her pulpits would demonstrate to a circumcised people, the sanctity and truth of the revelation of Mohamet." (Gibbon)

* গৌহাটি শাখা-পরিষদে পঠিত।

শ্রীআনন্দকিশোর দাশ গুপ্ত।

বায়োস্কোপে হাস্যকৌতুক

বায়োস্কোপে বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীর করুণ রসের অভিনয় যেমন জমিয়াছে, সে অভিনয়ে যতখানি কৃতিত্ব ফুটিয়াছে, তার তুলনায় কৌতুকাভিনয় বা হাস্যরস ঢের কম ফুটিয়াছে। একদল লোক বলেন, হাসিটা মনের পর্য্যাপ্ত খোরাক নয়; হাসিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। এবং সেজন্য আলঙ্কারিকের দল হাস্যরসকে করুণ রসের বহুৎ নীচের ক্লাশে নামাইয়া রাখিয়াছেন। আবার একদল বলেন, হাসিই জীবন—হাসি বন্ধ হইলে মানুষ পাগল হইয়া যাইবে! কবির কথাও তারা প্রমাণ-স্বরূপ খাড়া করে—যে না হাসিয়াছে, হয় সে শয়তান, নয় পশু! পশু হাসে না, কাঁদিতে পারে। আর মানুষ? মানুষ হাসেও, কাঁদেও—এইখানেই পশুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ।



'কিড্' চিত্রনাট্যে চার্লি ও জ্যাকি কুগান

তর্কের কথা যাক। হাস্য—শুভ্র অনাবিল হাসি—চিরদিন আদরের সামগ্রী, উপভোগের বস্তু। হাসিবার ও হাসাইবার ক্ষমতা অতি-অল্প লোকেরই থাকে। মানুষের প্রাণটা এমনি কোমল ধাতুতে গড়া যে সাহিত্যে সাধারণ লেখকও একটু করুণ ব্যাপার ন্যাকামি ছাড়িয়া লিখিতে পারিলে, পাঠকের বুক সে লেখা পড়িয়া ব্যথায় টন্‌টনিয়া ওঠে এবং তার চক্ষুও আর্দ্র হয়। কিন্তু হাসি,—যার নাম—শুভ্র সংযত হাস্য, কয়জন লোক সে হাসি হাসিতে পারে! এই বাঙলা সাহিত্যের কথা ধরিলেই বলা যায়, যা-তা একটা করুণ ব্যাপার লইয়া লেখা তো অনেকেই লিখিয়াছেন, লিখিতেছেনও। পড়িয়া সাধারণ পাঠক তার তারিফও করিতেছে—কিন্তু হাসাইবার প্রহসন—? বোধ হয় আঙুলে গণিয়া তার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যায়!

বাঙলা বায়োস্কোপে করুণ ছবির দেখা আমরা যা পাইয়াছি, তা খুব প্রথম শ্রেণীর বলিয়া না মানিলেও তা চলনসই হইয়াছে বটে! কিন্তু হাস্য-কৌতুকের বিকাশ সেখানে আজ পর্য্যন্ত দেখিলাম না। 'খোকাবাবু' চিত্র কিছুই নয়, 'বরের বাজারে' হাসির ফিনিক দু-এক টুকরা ফুটিয়াছে—কিন্তু তা ধরিয়া হাসির মাপ কষা চলে না!

বিলাতী চিত্র-নাট্যে যে কয়জন হাসাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চ্যাপ্‌লিনের কথাই আগে মনে পড়ে। তারপর লুক বা হ্যারল্ড লয়েড, পোলার্ড, ম্যাক্স লিণ্ডার। ইহাঁদের কৌতুক-অভিনয়ের বিচিত্র ছবি যেখানে-সেখানে বায়োস্কোপের পটে নিত্য প্রতিফলিত দেখিতে পাই। ম্যাক্স লিণ্ডার কাতুকুতু দিয়া হাসাইবার মত হাসান্—তাঁর সে অভিনয়ে আর্টের খেলা তেমন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পোলার্ড – নিষ্পাদপ অরণ্যে এরণ্ড দ্রুম! নেই মামার দেশে কাণা মামার সামিল! হ্যারল্ড লয়েডের কৌতুকাভিনয়ে প্রাণ আছে, তাঁর হাসানোর কতকগুলা



চ্যাপলিন ও কুগান

কায়দায় দর্শকের মনে সত্যই সাড়া ওঠে এবং ঠোঁটের কোণে শুভ্র হাসির ঝর্ণা ঝরিয়া যায়। এ রসের অভিনয়ে চ্যাপলিন কিন্তু সর্ব্বজনপ্রিয়, সবার সেরা।

তবু চার্লির অভিনয়ও ইদানীং কেমন একঘেয়ে লাগিত! সেই একই ভঙ্গীতে চলাফেরা অথচ ভিতরে একটা প্রতিভা জলজল করিতেছে—তার বিকাশ না দেখিয়া মন কেমন

ঝিমাইয়া পড়িত। সম্প্রতি চ্যাপলিনের Kid-এর অভিনয় দেখিয়া দর্শক তাঁর অভিনয়-ভঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। নাটক-হিসাবে Kid প্রথম শ্রেণীর রচনা। ইহার সূক্ষ্ম মনস্তত্ব চার্লির সংএর রং ফুঁড়িয়াও বুকে এমন তীব্র আঘাত করে—চার্লির নানা ভঙ্গীর মধ্য দিয়া অধরে হাসির সহিত চোখেও এতখানি অশ্রু পুঞ্জিত হইয়া ওঠে যে তার দাম নির্দ্দেশ করা যায় না। Kid-এর গল্পাংশটুকু সংক্ষেপে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।



চার্লির মুখের নানা ভঙ্গী

এক প্রতারিতা দুর্ভাগিনী হাসপাতালে সন্তান প্রসব করিয়া আরাম হইয়া সেই সন্তানকে বুকে লইয়া হাসপাতালের বাহিরে আসিয়া যখন দাঁড়াইল, তখন বাহিরের জগৎ তার সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। নামহীন সন্তানের জননী—না আছে গৃহ, না আছে এমন একটি লোক যে তার দুঃখে দরদ জানাইয়া ছোট্ট একটু আহা বলিয়াও তাকে সম্ভাষণ করে! বাহিরে লোকের হাসি লোকের কোলাহল ফোয়ারার মত শতধারে ঝরিয়া পড়িয়াছে, জগতের কর্ম্মচক্র সমানে ঘুরিয়া চলিয়াছে। এই নির্ম্মম পাষাণ পৃথিবীর বুকে দুর্ভাগিনী একা, অসহায়! শুধু তাই নয়, কোলে ঐ পাপের



বিভিন্ন ভূমিকায় চার্লি

ছাপ-মারা সন্তান! নারী বড় দুর্ভাবনায় পড়িল—উপায় নাই! তখন প্রত্যুষ। নারী ছেলেকে আনিয়া একটা গলির মুখে এক নিরালা জায়গায় রাখিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশাইয়া গেল। সে চলিয়া গেলে ছন্নছাড়ার ভূমিকায় চার্লি চ্যাপলিন আসিয়া হাজির। শিশু কাঁদিতেছিল—শিশুকে দেখিয়া সে ভাবিতে লাগিল, তাইতো, এ কার ছেলে, এখানে কি করিয়া আসিল! কাছেই এক বাড়ীর দাসী একটা ঠেলা গাড়ীতে একটি শিশুকে লইয়া আসিয়া শিশু-সমেত সেই গাড়ী রাখিয়া একটা বাড়ীতে ঢুকিয়া গল্প করিতে। চ্যাপ্‌লিন ভাবিল, এ ছেলেটি বুঝি ঐ গাড়ী হইতেই পড়িয়া গিয়াছে। ছেলেটিকে সে তুলিয়া ঐ ঠেলা গাড়ীতে-বসা শিশুর পাশে শোয়াইয়া দিল। দাসীও অমনি আসিয়া হাজির—সে ধমক দিয়া চ্যাপ্‌লিনের ঘাড়ে ঐ পরিত্যক্ত শিশুকে চাপাইয়া দিল। তারপর চ্যাপ্‌লিন শিশুটিকে আরো দুই-তিন বার অন্য লোকের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে গিয়া হার মানিল এবং শিশু যখন তার ঘাড়েই পড়িল তখন সে তাকে লইয়া ঘরে আসিল। তাকে মানুষ করিতে লাগিল। তার জামা-কাপড় যোগাড়, তাকে দুধ খাওয়ানো, সব ভার সে লইল। এমনিভাবে শিশু মানুষ হইয়া উঠিল। তারপর চ্যাপলিনের সঙ্গে নানা দুষ্টামিতে সে এমন পোক্ত হইল যে তাকে আঁটিয়া উঠা দুষ্কর, তবে চ্যাপলিনের কাছে সে একেবারে শিশু গোপাল! তার মা



তিন রকম



তিনটী ভঙ্গী

তাকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় শিশুর অঙ্গে এক টুকরা চিঠি রাখিয়া গিয়াছিল; চ্যাপ্‌লিন সে নিদর্শনটুকু বরাবর রক্ষা করিতেছিল। এই ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছে জ্যাকি কুগান। জ্যাকির বয়স সাত-আট বৎসর মাত্র; কিন্তু অভিনয় এমন করিয়াছে যে তেমন অভিনয় করিতে এদেশের কথা ছাড়িয়া দি, য়ুরোপ-আমেরিকারও অনেক দিগ্‌গজ অভিনেতা তেমন পারেন কি না সন্দেহ! চ্যাপ্‌-লিনের শিক্ষায় জ্যাকি কুগান অভিনয়ে এমন কৃতিত্ব দেখাইয়াছে যে গুরুকে সে ছাড়াইয়া যাইবে অচিরে, এ কথাও অনেকে বলিতেছেন! কিন্তু সে কথা আমাদের আলোচ্য নয়।

ছেলে বা এই 'Kid' এদিকে চ্যাপলিনের কাছে বড় হইতে লাগিল, ওদিকে তার মা ষ্টেজে গিয়া একজন নামজাদা অভিনেত্রী হইয়া অগাধ ঐশ্বর্য্যের ও যশের মালিক হইলেন। ছেলের জন্য তখন প্রাণ তাঁর কাতর—তিনি অবসর-কালটুকু দেশের যত গরিব-দুঃখীর

ছেলেদের দেখিয়া তাদের উপহার দিয়া বেড়ান। নিজের ছেলেকেও একদিন এমনি আসিয়া উপহার দিয়া গেলেন। অথচ এমনি ভাগ্যের খেলা, কেহই কাহাকে চেনে না! তারপর কিডের ভারী অসুখ হইল। তার মাই তার তদ্বিরের জন্য ডাক্তার আনাইলেন। ডাক্তার আসিয়া ছেলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। চ্যাপ্‌লিন পরিচয়ের বিনিময়ে সেই চিঠিটুকু দেখায়। ডাক্তার তখন বালককে জোর করিয়া হাসপাতালে পাঠাইবে, বলে। হাসপাতাল হইতে গাড়ীও আসে। চ্যাপ্‌লিন বালককে কিছুতে ছাড়িবে না, তারাও



Charles Chaplin in "The Pilgrim"

পিলগ্রিম্‌ চিত্র-নাট্যে পাদ্রীর ভূমিকায় চ্যাপ্‌লিন

তাকে না লইয়া নড়িবে না। দুইপক্ষে মারামারি হইল—তারা মোটরে করিয়া বালককে হাসপাতালে লইয়া গেল, চ্যাপ্‌লিনও ফন্দী করিয়া হাসপাতালে ঢুকিল। ওদিকে বালকের মা নানা খপরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিলেন। ছেলের সঙ্গে সেই চিঠি লাগানো ছিল, এ কথাও বিজ্ঞাপনে লেখা হইল এবং ছেলে পাইলে প্রচুর পুরস্কার দিবেন, ঘোষণা করিলেন। সেই ডাক্তার তখন ছেলের হদিশ দিল—এবং হাসপাতালের কর্ম্মচারীর সহযোগে ছেলেকে চুরি করিয়া তার মার কাছে পাঠাইল। ঘুম ভাঙ্গিয়া চ্যাপ্‌লিন দেখে, কিড নাই। দারুণ উদ্বেগ লইয়া চ্যাপ্‌লিন পথে পথে ঘুরিয়া তার খোঁজ করিল; শেষে কিডের মা মহা-আদরে চ্যাপ্‌লিনকে তাঁর কাছে লইয়া গেলেন।

এই চিত্র-নাট্যখানিতে চ্যাপ্‌লিনের কৌতুকের ভঙ্গী আর অভিনয় এত মর্ম্মস্পর্শী যে ছবিখানি দেখিলে মন



চার্লি চ্যাপলিন

একেবারে মুগ্ধ তন্ময় হইয়া পড়ে। তারপর ছেলের অসুস্থতায় তার ব্যাকুলতা, আর ছেলে মার কাছে চলিয়া গেলে তার আর্ত্ত দুই চোখের চাহনি একেবারে প্রাণের মধ্যে গাঁথিয়া যায়! সে চাহনি যিনি ছবির পটে দেখিয়াছেন, তিনি তা জীবনে ভুলিবেন বলিয়া মনে হয় না!

চ্যাপলিনের উল্লেখযোগ্য সুন্দর অভিনয় দেখিয়াছি, আর-একখানি চিত্রনাট্যে—A Dog's Life-এ। সেখানেও ঐ ছন্নছাড়ার ভূমিকায় চার্লি অবতীর্ণ হইয়াছেন—একমাত্র সঙ্গী ও বন্ধু তাঁর একটি পথের কুকুর। এই কুকুরটাকে অন্য কুকুর পথে আক্রমণ করে; চ্যাপ্‌লিন তাকে উদ্ধার করিয়া বুকে তুলিয়া লন। এদিকে অত্যন্ত একটা বদ চরিত্রের লোক

অথচ বুকে একেবারে মমতার সিন্ধু—এ ভূমিকার অভিনয়ে চ্যাপ্‌লিন একেবারে সকলের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি চ্যাপ্‌লিন আর একখানি নূতন ছবি তুলিয়াছেন, The Pilgrim. এই চিত্রনাট্যে চ্যাপ্‌লিন সাজিয়াছেন, এক জেল-ফেরার আসামী। পলায়নের পথে আসামী দেখে, এক পাদ্রী তাঁর পোষাক রাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছে। কয়েদীর পোষাক ছাড়িয়া সেই পাদ্রীর পোষাক গায়ে আঁটিয়া তিনি তো দৌড় দিলেন। তারপর ঐ পাদ্রীর পোষাকে পাদ্রী বলিয়া গির্জ্জায় বক্তৃতাও দিতে হইল। এবং ঐ ভূমিকায় গাম্ভীর্য্যের খোলস আঁটিয়া থাকিলেও তাঁর কয়েদী চরিত্রের স্বাভাবিক হাল্‌কা ভাবগুলিকে কিছুতেই সামলাইয়া রাখিতে না পারিয়া এমনি হাস্যকর ঘটনার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন যে তাহাতে হাসি তো ফুটিবেই, তাছাড়া তাঁর অভিনয়-ভঙ্গী একেবারে এত উঁচু দরের যে দেখিয়া তাক্ লাগিয়া যায়।

তাঁর আর এক অভিনয় দেখিয়াছি, ঘড়িওয়ালার দোকানে এক এ্যাসিষ্টান্টের ভূমিকায়। এক লোক আসিল দোকানে তার ঘড়ি বেচিতে। মালিক চ্যাপ্‌লিনকে ঘড়িটা পরীক্ষা করিতে বলিলেন। চ্যাপ্‌লিনের মুখের ভঙ্গীতে তখন এমন 'হোমরা-চোম্‌রা'র ভাব ফুটিল যে কৌতুহলে আমাদের চিত্ত ভরিয়া উঠিল,—এবার কি হয়! চ্যাপ্‌লিন গম্ভীরভাবে ঘড়িটা লইয়া ঠিক ডাক্তারের রোগী-পরীক্ষার মত তার পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত হইলেন। তিনি সেটাকে হাত দিয়া ঠুকিলেন, তার পর কাণের কাছে তুলিয়া তার শব্দ পরীক্ষা করিলেন, তার বুকে ষ্টেথেস্‌কোপ লাগাইলেন। সে সময়কার তাঁর সে মুখের ভঙ্গী যেমন সহজ, তেমনি জীবন্ত,—হাস্যের উদ্রেক করে। তারপর গম্ভীরভাবে ঘড়িটাকে টেবিলের উপর শোয়াইয়া দিয়া জামার আস্তিন গুটাইয়া একটা টিনের ছুরি লইলেন—ঠিক যেন ডাক্তার রোগীর অঙ্গে অস্ত্র করিতে চলিয়াছেন! এবং মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া ঘড়িটার অঙ্গে টিনের ছুরি বসাইয়া তার ডালা খুলিয়া ফেলিলেন, ভিতরের কল-কব্জা বেশ করিয়া দেখিলেন, ঘ্রাণ লইলেন; তারপর হতাশভাবে মালিকের পানে সেটা আগাইয়া দিয়া এমন মুখ বাঁকাইয়া রহিলেন, যার শুধু একটিমাত্র অর্থ হয়—ডাক্তারী ভাষায় তার নাম, hopeless case. এ দৃশ্যে তাঁর অভিনয় যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সংযত—আর ডাক্তারী পরীক্ষার উপর তেমনি ব্যঙ্গাত্মক! চ্যাপ্‌লিনের অভিনয়ের বিশেষত্ব এই যে তিনি কৌতুক-নাট্যে অভিনয় করেন না; একেবারে তার প্রাণ-বস্তুর মত বাতাসে ফোটা ফুলের মতই সহজভাবে অবলীলায় ফুটিয়া ওঠেন। তাঁর মুখে-চোখে এরকম বিচিত্র ভাব ক্ষণে ক্ষণে লীলায়িত হইয়া ওঠে যে সে এক পরম উপভোগের বস্তু!

কৌতুকাভিনয়ে প্রথম কথা এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে অভিনেতা সত্যকে নকল করিতেছেন—হাসাইবার জন্য আয়োজন গড়িয়া তুলিতেছেন না। অভিনেতার চক্ষু বাহিরের মাঝে এমন অভিনিবেশের সহিত দেখিবে যে তার বিচিত্র তরঙ্গ তাঁর বুকে দর্পণের মত প্রতিফলিত থাকিবে! 'আমি হাসাইতে আসিয়াছি গো,—তোমরা দর্শক, তোমরা হাসো' এমনি ভাবের অভিনয় নিতান্ত কৃত্রিম। সহজে যে ভাব ফোটে, তাহাই অভিনয়ে ফলাইয়া তোলো; বিকট চেষ্টায় যদি ভাব ফুটাইতে চাও, তাহা হইলে তোমার স্থান ষ্টেজে বা চিত্র-নাট্যের ক্ষেত্রে নয়—অন্যত্র। কথা-নাট্যে কথার ভঙ্গীতে কথার রহস্যে লোক হাসে; বাক্‌হীন নাট্যে কথা কেহ জোগাইবে না, অঙ্গ-ভঙ্গীতে আর ঘটনা-সংস্থানের মধ্যে হাসি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। দর্শককে কি দিবে, গোড়া হইতে তার আভাষ দিলে রস মাটী হইয়া যাইবে। দর্শককে একেবারে অভিনব ব্যাপারে চমক্ লাগাইয়া দিতে হইবে, এই কয়টি কথা বিশেষভাবে মনে রাখিয়া ষ্টেজে নামা প্রয়োজন। আর সেই সঙ্গে এটুকুও মনে রাখা দরকার—অভিনেতার নিজস্ব ভঙ্গী থাকা চাই, পরের নকল করিয়া নাম কেনা যায় না। তাহাতে দর্শকের বিরক্তিই উৎপাদন করা হয়। এই প্রবন্ধে চ্যাপলিনের কয়েকটি অভিনয়-ভঙ্গীর ছবি দেওয়া হইল। এগুলি হইতে বুঝা যায়, একই লোক, কি বিচিত্র ভঙ্গীর সৃষ্টি করিতে পারেন, মুখে-চোখে প্রতিভার জোরে; অথচ তাহাতে ন্যাকামি নাই, ভাঁড়ামি নাই। হাস্যরসের অভিনয় করিতে গেলে আগে প্রয়োজন প্রাণ-বস্তুর। প্রাণহীন নকল অভিনয় অভিনয়ই নয়, ভাঁড়ামির নীচের পৈঁঠাই তার যোগ্য স্থান।

মেডিকেল কলেজের কথা

সে প্রায় একশত বৎসর হইতে চলিল যখন বেন্টিঙ্ক সাহেব কোম্পানীর গভর্ণর। তখন ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এক কমিটী গঠিত হয়—কি প্রকারে ডাক্তারী শিক্ষা ভারতে প্রবর্ত্তন করা যায়, তাহাই বিবেচনা করিবার জন্য। কমিটীর মতামত লইয়া বেন্টিঙ্ক সাহেব হুকুম জারি করিলেন, সংস্কৃত কলেজের ডাক্তারী বিভাগ (Sanskrit College Medical class) এবং মাদ্রাসার ডাক্তারী বিভাগ ও নেটীভ মেডিকেল ইনষ্টিটীউসন উঠাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার স্থানে একটী নূতন কলেজ স্থাপিত হইবে,নেটিভ যুবকদের চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য। এই কলেজ এডুকেশন কমিটীর হাতে থাকিবে; ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে; যাহারা প্রথম হইতে ভর্ত্তি হইবে, তাহাদের foundation student বলা হইবে। তাহাদের সংখ্যা থাকিবে ৫০ পঞ্চাশ জন এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাহারা Stipend পাইবে। এই বৃত্তি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিবে। প্রথম শ্রেণী ৭৲, দ্বিতীয় শ্রেণী ৯৲ তৃতীয় শ্রেণী ১২৲ টাকা। তাহাদের পড়িতে হইবে চার হইতে ছয় বৎসর। এই প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বেও বাংলায় ইংরাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত অনেক মেডিকেল প্রতিষ্ঠান ছিল। যথা, জেনারেল হাসপাতাল নেটীভ হাসপাতাল, কোম্পানীর ডিস্‌পেনসারী The Dispensary of the poor এবং Eye Infirmary। মেডিকেল কলেজ সহরের মধ্যস্থলে স্থাপিত হয়। অনেক গুলি কক্ষ প্রস্তুত হইল। একটী কক্ষে প্রায় পাঁচশত লোক বসিবার উপযুক্ত স্থান রহিল। Practical Anatomy শিখিবার জন্য ও তাহার যন্ত্রাদি রাখিবার জন্য একটী কক্ষ ছিল; ল্যাবরেটরী, মিউজিয়ম, একটী লাইব্রেরী ও একটী হাসপাতাল প্রস্তুত হইল; আরও অনেক জায়গা পড়িয়া থাকিল, তাহাতে সময়ে অন্যান্য বাড়ী তৈয়ার করিবার আশায় প্রথমে পাঁচজন প্রফেসর নিযুক্ত হইলেন। য়্যানাটমীর ও কেমিষ্ট্রীর, মেটিরীয়া মেডিকার, সার্জ্জারির, বোটানীর ও clinical মেডিসিনের এবং একজন ডিমনষ্ট্রেটর।

প্রফেসর এ্যানাটমি ও মেডিসিন—

H. H. Goodeve. M. D.

" কেমিষ্ট্রী ও মেটিরিয়া মেডিকা—

W. B. O' Shanghnessy.

" সার্জ্জারী—

C. C. Egerton. Esq.

" বোটানী—

N. Wallich. M. D.

এ্যানাটমীর ডিমনষ্ট্রেটর—

R. O' Shanghnessy. Esq.

কিউরেটর—

G. Evans. Esq.

হেয়ার সাহেব সেক্রেটারি হন্। তাঁর সম্বন্ধে রিপোর্টে লেখা আছে—Mr. Hare an old and inestimable promoter of native education was appointed secretary to the college. A wiser measure than the last appointment could scarcely have been devised. এ ছাড়া আরও অনেক লেখা আছে। বাহুল্য-ভয়ে ত্যাগ করিলাম। পঞ্চাশ জন ছেলে ৭৲, ৯৲, ১২৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। ইঁহারা সকলেই হিন্দু। ইঁহারা ভিন্ন অপর যাহারা পড়িত তাহাদিগকে ক্যাণ্ডিডেট পিউপিল বলা হইত; তাহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালী ফিরিঙ্গি প্রভৃতি থাকিত এবং সিংহল গভর্ণমেণ্টও ছাত্র পাঠাইতেন।

ছাত্রদিগের কর্ম্মানুসারে শ্রেণী-বিভাগ :—

ব্রাহ্মণ	...	...	৫
লেখক (কায়স্থ)	...	...	১৫
ডাক্তার জাতি (বৈদ্য)	...	...	৩
কর্ম্মকার	...	...	২
Druggist	...	...	১
Bankers	...	...	৮
তাঁতি	...	...	৬
অন্যান্য	...	...	১০
			৫০

এই প্রতিষ্ঠান খুলিবার পর গভর্ণমেণ্ট তিন বৎসর পরে প্রাদেশিকে ডিসপেনসারী খুলিতে ইচ্ছা করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসকের নিমিত্ত সেক্রেটারী হেয়ার সাহেবের নিকট লেখেন। উত্তরে হেয়ার লিখিলেন, তাহাদিগের পড়া বা সার্জ্জরী শিক্ষা এখন শেষ হয় নাই, এমন অবস্থায় তাহাদিগকে চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করিলে লোকের বিশেষ উপকার হইবে না। পরন্তু প্রতিষ্ঠানের সুনামও থাকিবে না। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া অক্টোবর মাসে একটী পরীক্ষা গ্রহণ করা হইল। যাঁহারা তাহাতে উর্ত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগকে গভর্ণমেণ্ট সরকারী চাকুরীতে বাহাল করিবেন। পত্র লেখা হইল এপ্রিলে; পরে নভেম্বর মাসে পরীক্ষা লওয়া হয়। সব ছেলের মধ্য হইতে এগারটী ছেলে পরীক্ষা দেন! পাঁচজন কায়স্থ; তিন জন বৈদ্য, দুইজন ব্রাহ্মণ ও একজন খৃষ্টান।

নাম :—	জাতি :—	ধাম :—
১। উমাচরণ শেঠ	কায়স্থ	কলিকাতা
২। দ্বারকানাথ গুপ্ত	বৈদ্য	„
৩। রাজকৃষ্ণ দেব	কায়স্থ	„
৪। গোবিন্দসুন্দর গুপ্ত	বৈদ্য	„
৪। কালাচাঁদ দে	কায়স্থ	„
৬। গোপালকৃষ্ণ গুপ্ত	বৈদ্য	„
৭। চিমন লাল	কায়স্থ	„
৮। নবীনচন্দ্র মিত্র	„	„
৯। নবীনচন্দ্র মুখার্জ্জি	ব্রাহ্মণ	„
১০। বদনচন্দ্র চৌধুরী	ব্রাহ্মণ	„
১১। জেমস পোল	খৃষ্টান	„

প্রথম দিন এনাটমীর ও ফিজিওলজির পরীক্ষা হয়।

পরীক্ষার্থীর নাম :—

কি প্রকার উত্তর তাঁহারা দিয়াছিলেন :—

১। উমাচরণ শেঠ

Clear, steady, and satisfactory.

২। দ্বারকানাথ গুপ্ত

Same as above but not so clear.

৩। রাজকৃষ্ণ দেব

„ „ „ „

৪। গোবিন্দসুন্দর গুপ্ত

Pretty good but apt to be hasty and unreflecting in his answeis.

৫। কালাচাঁদ দে

Some of his answers very good others given without due reflection ; a good anatomist.

৬। গোপালকৃষ্ণ গুপ্ত

Apparently of a slow tuin his average answers good but apt to get confused.

৭। চিমনলাল।

Cool, collected and very corrected answers, a good anatomist.

৮। নবীনচন্দ্র মিত্র

Evidently a young man of superior acquirements ; all his answers excellent though he has naturally a diffident manner.

৯। নবীনচন্দ্র মুখার্জ্জি

His answers generally satisfactory.

১০। বদনচন্দ্র চৌধুরী

„ „ „ „

১১। জেমস পোল

Pretty much the same but slowish.

তাহার পর কেমিষ্ট্রী ও ফার্ম্মেসির পরীক্ষা হয়।

১। উমাচরণ শেঠ

Most admirable, steady satisfactory and reflecting.

২। দ্বারকানাথ গুপ্ত

Admiiable steady satisfactory and reflecting.

৩। রাজকৃষ্ণ দেব

Admirable steady satisfactoy cool and collected.

৪। গোবিন্দসুন্দর গুপ্ত

Some of his answers good, others careless and unreflecting failed in definution of subjects remanded to his studies for six months.

গোবিন্দ গুপ্ত ফেল করিয়া আবার ছয়মাস পড়িতে যান এবং সেই সঙ্গে বদন চৌধুরী ও জেমস্ পোল পরীক্ষা না দিয়া স্বেচ্ছায় আরও ছয়মাস পড়িতে যান।

৫। কালাচাঁদ দে

Answerd very satisfactorily but apt to be hurried.

৬। গোপাল গুপ্ত

Some of his answers good but wanting in cleaness generally apt to be confused আরও ছয় মাস পড়িতে পাঠান হয় remanded to his studies for six months.

৭। চিমনলাল

Steady collected and excellent replies and showed himself a better chemist than was supposed.

৮। নবীনচন্দ্র মিত্র

Excellent, Knows his subject thoroughly.

৯। নবীনচন্দ্র মুখার্জি

Answered extremely well throughout.

পরীক্ষার্থী ১১ জন ছেলের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন খৃষ্টান পড়িবার জন্য স্বেচ্ছায় পরীক্ষা দেন নাই এবং দুইজন বৈদ্য ফেল করাতে তাঁহাদিগকে আরও ছয় মাস পড়িতে পাঠানো হয়; কিন্তু কালাচাঁদ দে, চিমন লাল ও

হইয়াছিল ও তাঁহারা পাশ করিয়াছিলেন কিন্তু অপারেশন সুবিধাজনক ও স্বচ্ছন্দ মত না করিতে পারায় তাঁহাদিগকে অপারেশন শিখাইবার জন্য পুনঃপ্রেরণ করা হইল। কেবল নবীনচন্দ্র মিত্র বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে আরও পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়।

শেষে পরীক্ষা হয় মেটিরিয়া মেডিকার এবং ফিজিকের (Practice of physic).

১। উমাচরণ শেঠ

Most satisfactory in every respect evincing thorough knowledge of his subject.

২ রাজকৃষ্ণ দেব। } " " "
৩। দ্বারকানাথ গুপ্ত }

৪। নবীনচন্দ্র মিত্র

He was cxamined for two hours very searchingly and exhibited excellent knowledge of his subject, but somewhat obscured by a diflidence of manner already alluded to. He has been employed for some time as apothecary to the little hospital attached to the college and has given great satistaction.

Practice of surgery and operationএর পরীক্ষায়

উমাচরণ শেঠ
রাজকৃষ্ণ দেব
দ্বারকানাথ গুপ্ত
নবীনচন্দ্র মিত্র } Very satisfactory.

পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষকেরা লিখিলেন—To Uma Charan Set, Dawarka Nath Gupta, Raj Kissne Day and Nabin Chandra Mitter—We have unanimously come to the decision of granting letters testimonials that we consider them competent to the practice of medicine

according to liberal consideration of the Government as the first Hindus rising superior to the trammels of prejudice and obstacles of no ordinary character have distinguished themselves by attaining to complete medical education upon enlightened principles. It also affords us great gratification to report from the testimony of the officers of the Medical College that the conduct of these young men during the course of study has been uniformly steady and satisfactory. এই সমস্ত ছাত্রদের যাহাতে প্রথম হইতে মাহিনা ১০০৲ টাকা করিয়া হয়, তাহার জন্যও গবর্ণমেণ্টকে পরীক্ষকেরা অনুরোধ করিলেন।

পরীক্ষকদের নাম :—

S. Nicolson. Surgeon, General Hospital.
J. Grant. Surgeon, Apothecary to the Hon'ble East India Co.
J. R. Matten. Presidency Supgeon and —Surgn Native Hospital.
D. Stewart. Asst Surgeon Supdt General of Vaccination.

পরীক্ষকদের পরীক্ষায় গবর্ণমেণ্ট সন্তোষ লাভ করেন এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের সার্টিফিকেট দিবার জন্য মেডিকেল কলেজের থিয়েটার হলে এক প্রকাণ্ড সভা হয়। Sir Edward Regan চ.ফ জষ্টিস তখন জেনারেল কমিটী অফ পাব্লিক ইনষ্ট্রাকসনের প্রেসিডেণ্ট; তিনি সভাপতি হন। অন্যান্য অনেক দেশীয় ও ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। চীৎপুরের নবাব, রাজা রাজনারায়ণ রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ও পাব্লিক ইনষ্ট্রাকসন কমিটির মেম্বরেরা উপস্থিত ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর কলেজ খুলিবার সময়েই যাঁহারা পরীক্ষায় পাশ করিবেন, তাঁহাদের পুরস্কার প্রভৃতি দিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সার্টিফিকেটের প্রতিরূপ :—

MEDICAL COLLEGE OF BENGAL.
INSTITUTED.

On the year of the Christian Era, 1835.
Corresponding to the Bengal Era. 1242.
We the undersigned have fully and carefully examined——of——on the——of——do hereby certify that he posseses an intimate knowledge of Anatomy. Physiology, Chemistry and Materia Medica aud Surgery to qualify him for holding public medical employment or for commencing independent practice. We have further received satisfactory proof of his diligence and good conduct during his education at the Medical College of Bengal.

Signed by.
--Surgeon General Hospital--
Professor of Botany.
- Apothecary General————
Professor of Surgery
--Surgeon Native Hospital
Profe sor of Anatomy & Medicine
– General Surgeon. Fort. William.———
Professer Chemisty & Materia Medica
—Su pdt Vaccination———
Demonstrator of Anatomy,
Secy. Medical College Bengal সার্টিফিকেট দেবার পর ডাক্তার জন্ গ্রাণ্ট উত্তীর্ণ ছাত্রদের উপদেশ উৎসাহ ও কর্ত্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। তার পর দ্বারকানাথ ঠাকুর দত্ত পুরস্কার দেওয়া হয়। সভাপতি ঠাকুর মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তর সভা ভঙ্গ করেন।

ইঁহারাই মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্র। পাঁচজন ছাত্রের মধ্যে দুইজন অপারেশন ভাল ভাবে না করিতে পারায় পাশ করিয়াও আবার পড়িতে যান। তিনজন বৈদ্যের মধ্যে দুইজন ফেল ও একজন পাশ করেন। দুইজন ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন স্বেচ্ছায় আরও ছয় মাস পড়িতে যান, আর একজন ভাল ভাবে পাশ করিলেও অপারেশন ভাল ভাবে না করিতে পারায় আরও ছয় মাস পড়িতে যান; একজন খৃষ্টান স্বেচ্ছায় আরও ছয়মাস পড়িতে যান।

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস।

চয়ন

খোদার উপর খোদ্‌কারি

কুৎসিত-কুশ্রী, কুরূপ-কুরূপার দলের আর চিন্তার কারণ নাই! বিধাতা একচোখোমি করিয়া যদি কাহারও মুখ বিশ্রী গড়িয়া থাকেন, তবে তাঁর হাতের কাজের উপর নিজের হাত চালাইয়া মুখের দোষ-ত্রুটি সারিয়া লওয়া এখন সম্ভব হইয়াছে। শুধু তাই নয়,—চ্যাপ্‌টা নাক সরাইয়া সেখানে তিলফুল-জিনি নাসা গড়িয়া তোলা যাইবে, কোটর-চক্ষু ঢাকিয়া সেখানে পদ্মপলাশ নেত্রের গড়ন ফলইয়া তোলাও সহজ এবং অনায়াসলব্ধ হইয়াছে—শুধু প্রয়োজন একটু অস্ত্রোপচার। এ অস্ত্র করাইতে ব্যয়ও খুব কম। এই অস্ত্র-বিজ্ঞানের নাম, plastic surgery.

এই বিদ্যা আজ কবি-কল্পনার বস্তু নয়। অনেকেই আজ এ বিদ্যায় বেশ পাকা হইয়া উঠিয়াছেন। অবশ্য তাঁদের ফীয়ের হার এখন কিছু বেশী—তা খোদার উপর খোদ্‌কারি যাঁরা করিতে চান, সে ফীয়ের টাকা ফলের হিসাবে তাঁদের গায়ে লাগা উচিত নয়।

এই যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গেল, এই যুদ্ধে এই plastic surryge বিদ্যাটা হাতে-কলমে অনেকে নিখুঁৎ করিয়াই শিখিয়াছেন। ত্যাব্‌ড়া গাল, থ্যাঁদা নাক, কোটর চোখ, উঁচু কপাল—এ সবগুলা এই বিদ্যার জোরে এমন বেমালুম ঘুচানো গিয়াছে যে দেখিয়া অনেকের সত্যই তাক্ লাগিয়াছে। যুদ্ধে আহত যে-সব সেনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উড়িয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, তাহাদের কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর নূতন মশলা-সংযোগে আবার হারা অঙ্গ আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সেকালে এই বিদ্যাটা হাতুড়েগিরি বলিয়াই মানুষ উড়াইয়া দিত। ডাক্তাররা এ কাজে হাত চালাইতে চাহিতেন না। তার কারণ, এটাকে তাঁরা অপমানজনক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে এ বিদ্যার উপর অনুরাগ এমন বাড়িয়াছে যে ইহা লাভ করিতে বিলাতে সম্প্রতি অত্যন্ত চাড় দেখা যাইতেছে।

সম্প্রতি বিলাতের বহু তরুণী ও মধ্যবয়সী মহিলা প্রত্যহই এমনি অস্ত্রোপচারে চেহারা ফিরাইয়া নিখুঁৎ সুন্দরী বনিতে কসরৎ সুরু করিয়াছেন। মুখ বিশ্রী—তাঁরা ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার ছুরি চালাইলেন। ঠিক চুলের নীচে হইতে মাথার একপর্দ্দা চামড়া কাটিয়া তুলিয়া মুখের চামড়া টানিয়া দুই মুখ আঁটিয়া সেলাই করিয়া দিলেন, ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে তোব্‌ড়া গাল, পুরু ঠোঁট, বোঁচা নাক—সব কোঁচ সারিয়া টাইট নিরেট নিটোল হইয়া দেখা দিল। মুখের দোষ সারাইয়া তরুণী এমন মুখ লইয়া বাহির হইলেন যে লোকে চাহিয়া দেখিল, কহিল, হাঁ, একজন সুন্দরী বটে!

সেদিন এক নামজাদা অভিনেত্রী আসিয়া ডাক্তারকে বলিলেন—তিনি ফিল্‌মে নামিতে চান—কিন্তু তাঁর কুৎকুতে চোখ ফিল্‌মের উপযোগী নয়; তাই তিনি চান ডাগর দুই চোখ। ডাক্তার ছুরি লইয়া দুই চোখের কোণ ফুঁড়িলেন এবং পাশের চামড়া টানিয়া সেলাই করিয়া অভিনেত্রীর কুৎকুতে চোখ ডাগর-আঁখিতে রূপান্তরিত করিলেন। অনেকের চোখের নীচে ও পাতার উপরে কোঁচ থাকে প্রচুর—সেজন্য কাহারো চোখ হয় ড্যাবডেবে, কাহারো চোখ গিয়া কোটরে ঢোকে। অস্ত্র আর সেলাইয়ের দ্বারা সে সব চামড়ার কোঁচ সারিয়া ভালো চোখ গড়িয়া তোলা—এ একেবারে অতি সহজ ব্যাপার। অথচ কোথাও ক্ষতের চিহ্ন থাকে না। প্রকাণ্ড বিকট "হাঁ" সারানো একটু কঠিন ব্যাপার; তবে এটিও দুরারোগ্য নয়।

সব চেয়ে সহজ ফরমাশী নাক গড়া। ইহাতে মেহনৎ কম, ব্যয়ও কম। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ও গ্রীসে—২০০০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা—নাক-মেরামতি আর ফরমাশ-মত নাক গড়া নাকি নিত্যকার ব্যাপার ছিল, এমন কথাও শুনা যাইতেছে।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

যৌবন-সাধনা

মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নানা কথা ওঠে, কি করিলে মানুষের যৌবন চিরস্থায়ী হয় অর্থাৎ মানব-দেহে চির-বসন্ত জাগ্রত থাকে! এবং তার মীমাংসা করিতে গিয়া 'বানর-গলগণ্ড' প্রভৃতি লইয়া এমন বিতণ্ডা ও গবেষণা ওঠে যে যৌবনও চলিয়া যায় এবং মানুষও কোন হদিশ্ পায় না।

সম্প্রতি ডাক্তার জীন্ ফ্রামুশা এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন—Rejnvenation। এ গ্রন্থে তিনি যৌবনের পূজার যে মন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য এই চারিটি—

সব জিনিষ কাজে লাগাও,—কোনটায় 'অতি' দোষ ঘটাইয়ো না।

রসনা-তৃপ্তির জন্য যত পারো খাও, ক্ষতি নাই; কিন্তু এই বেশী খাওটাকে বরদাস্ত করিতে পরের বেলার খাওয়াটা আর খাইয়ো না।

জল, যত পারো, পান করিয়ো। শরীরের ক্লেদ বাহির করিয়া দিতে জলের মত সহায়ক আর কিছু নাই।

জিহ্বাই পরিপাকের ব্যারোমিটার। সেটি যেন পরিষ্কার আর সরল থাকে, এদিকে নজর রাখিয়ো।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে বয়স ৭০ কিম্বা ৮০ বৎসর হইয়াছে বলিয়াই আমরা বুড়া হইয়া পাকাইয়া যাই না। বার্দ্ধক্যের কারণ, আমাদের শিরা দীর্ঘকালের ব্যবহারে শক্ত হইয়া ওঠে; রক্তের চলাচলে তাই বাধা পড়ে এবং মনটাও বয়স বাড়ার সঙ্গে ঐ যে এক দুর্ভাবনা জাগাইয়া তোলে যে বয়স বাড়িতেছে, পারে যাইবার সময় আসিল—এই আতঙ্কই আরো শিরা ও পেশীগুলাকে কুঞ্চিত এবং কঠিন করিয়া তোলে। তিনি বলেন, বাড়ুক বয়স—সেদিকে নজর না রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলার দিকে সজাগ থাকিয়া যদি মৃত্যুর চিন্তা ছাড়িয়া দাও, তবে ভয় নাই। তাহা হইলে বার্দ্ধক্য এমন চট্ করিয়া মানুষকে ধরিয়া কাবু করিতে পারে না! আমরা অসার ও মিথ্যা দুর্ভাবনায় যে শক্তির অপচয় করি, তা না করিয়া যদি সেটাকে সুস্থ মনের আড়ালে রক্ষা করি অর্থাৎ দুর্ভাবনার ছোঁয়াচ্ না লাগাই, তবে বার্দ্ধক্যের সাধ্যও নাই, যে ঘেঁষ দেয়।

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

গুলি-রোধ জামা

একজন আমেরিকান এক প্রকার bullet-proof vest বার করেছেন, গুলি যাকে ভেদ করতে পারে না। বন্দুকের গুলি সত্যই এ জামা ভেদ করতে পারে কি না, তার পরখ হয়ে গেছে। একজন লোককে এই vest পরিয়ে দিয়ে তার বুকে গুলি মেরে দেখা গেছে যে গুলি সে জামা ভেদ করতে পারে নি। যে লোকটির বুকে গুলি করা হয়েছিল তার সাহস খুবই—কারণ কে জানে যদি গুলি ভেদ করত তা হলে কি সে অক্ষত দেহে ফিরে আসত! তার মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল! এবার ওয়াশিংটন পুলিশ কর্ম্মচারীরা এই জামা ব্যবহার করছেন। পুলিশকে প্রায়ই পিস্তল-ধারী বদ্‌মায়েসের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। এ জামা আত্মরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বীজের নিশ্বাস-প্রশ্বাস

আমরা জানতাম যে গাছ লতা পাতা সব উদ্ভিদ পাতার সাহায্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। কিন্তু ডাক্তার ট্রী মহোদয় Daily Science News Bulletin-এ বল্‌চেন যে বীজ যতই শুকনো, যতই ছোট বা যতই পুরানো হোক না কেন তাদের মধ্যে কতকটা গৃহীত অম্লজান বাষ্প থাকে। যে সব বীজ পোঁতা হয় এবং অঙ্কুর হবার জন্য প্রস্তুত হয় তারা তখন অধিক অম্লজান বাষ্প নেয় ও দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসও গ্রহণ করে। তাই বীজকে অঙ্কুরিত করতে হলে এবং বসন্তে ফুটিয়ে তুল্‌তে হলে মাটী খুঁড়ে তাকে বসাতে হয়। মধ্যে মধ্যে মাটী উল্‌টে-পাল্‌টে দিতে হয়। মাটীর ছোট ছোট ঢেলাগুলির মধ্যে যে ফাঁক থাকে তার মধ্য দিয়ে সে অম্লজান বাষ্প নেয়। এই সময়ে তার এই বাষ্পের বিশেষ প্রয়োজন থাকে। কিন্তু বাষ্প-বিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার তাকাশি কয়েক বৎসর আগে আবিষ্কার করেছিলেন যে এমন এক প্রকার বীজ আছে যার অন্তরোধ হয়ে গেলে বায়ুর প্রয়োজন হয় না। তাকাশি দেখেছেন যে এমন কি যে বোতলের মধ্যে মোটেই বায়ু নেই, তার মধ্যেও ধানের বীজ

অঙ্কুরিত হতে পারে যদি পর্য্যাপ্তরূপে বীজগুলি সিক্ত ও উত্তপ্ত থাকে। অধুনা Dr W. R. Camon এবং Dr Takahashi দেখেছেন যে ধানের বীজের ন্যায় আরও এক প্রকার বীজ আছে—কালিফর্ণিয়ার শস্য-ক্ষেত্রে আগাছার মত বন্য ঘাস জন্মায় তারই ঐ প্রকারে বীজ। এই দুই প্রকারের বীজের এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা আছে বলে জানা গেছে। জলের মধ্যে যে অম্লজান বাষ্প আছে, তারা তাই গ্রহণ করে।

শ্রীশশিভূষণ বারিক।

বৃহত্তম ক্যামেরা

পৃথিবীর মধ্যে সব-চেয়ে বড় ক্যামেরা আছে আমেরিকার ওয়াসিংটন নগরে। ক্যামেরাটা ওজনে ৭০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৮৫৷৷০ মণ। দুটো ঘর জুড়ে তাকে রাখা হয়েছে। প্রথম ঘরটাতে আছে লেন্স্ ও ফোকাস করবার যন্ত্রাদি এবং দ্বিতীয় ঘরটায় আছে প্লেট রাখবার বাক্স। আলাদা আঁধার ঘরের (Dark room) আর দরকার হয় না। দ্বিতীয় ঘরটাই ঐ কাজে ব্যবহার করা হয়। এই ক্যামেরায় তোলা ছবি লম্বে ও প্রস্থে এক গজ।

শ্রীভূপতি চৌধুরী।

পারলৌকিক

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৯শে কার্ত্তিক নায়ক-সম্পাদক প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁর মত চিন্তাশীল পণ্ডিত সাহিত্যসেবীকে হারাইয়া বাঙলা সাহিত্য আজ প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এ দেশের পুরাণ-শাস্ত্র ও প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও তাঁর আলোচনার প্রকাশ-ভঙ্গী দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

একদিকে তাঁর একটু দুর্নাম ছিল,—নায়ক-সম্পাদনে অনেক সময় তিনি ব্যক্তিগত কুৎসা করিতেন। সে ত্রুটি আজ তাঁকে হারাইয়া এত তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতেছে যে সে কথা মনে আনাও অন্যায় মনে করি। এজন্য তাঁর কাছে অনুযোগ করিলে তিনি বলিতেন, - কি করবো! পেটের দায়ে! কারণ বড় লেখা দাম দিয়ে কেউ নিতে চায় না। গালাগালির দাম আছে। সেটা চড়া দরে বিক্রয় হয়—সেই পয়সায় পেট চালাতে হবে তো! না হলে পয়সা কেউ দেয় না!

এই কথাটার মধ্যে বাঙালীর কুশিক্ষা, বাঙালীর নীচতাই সব-চেয়ে বেশী করিয়া প্রকাশ পায়! সাহিত্য আজো বাঙালীর প্রাণের বস্তু হইয়া ওঠে নাই! সবাই চায় কাজের ফাঁকে, দুইটা হাল্কা টিপ্পনী, দুইটা কুৎসা! এই পরচর্চ্চা আর কুৎসা করার ব্যাধিতে বাঙালী আজ জর্জ্জরিত, এ কথা নিষ্ঠুর হইলেও যে ভারি সত্য,—তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। "নায়ক,—বাবু, নায়ক—পাঁচকড়ি বাবু ভারি গাল দিয়েছেন—" কলিকাতার পথে ট্রামের ধারে কাগজওয়ালারা হাঁকিতেছে, আর ট্রামের যত লোক হাসিয়া চলিয়া অমনি কাগজ কিনিয়া গালি পড়িয়া আনন্দে ফুটি-ফাটা হইতেছে, এ দৃশ্য আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি! সাধারণ বাঙালী এ কথা জানিল না যে পাঁচকড়ি বাবু বাঙলার পুরাণ ইতিহাসের ধুলি-জঞ্জাল ঘাঁটিয়া কি নূতন তথ্য মহাসত্য আবিষ্কার করিতেছেন—তাঁর চিন্তাশীলতা পাণ্ডিত্য কত-উঁচু দরের! দুর্ভাগা বাঙালী! পাঁচকড়ি বাবুর মনের দাম, তাঁর পাণ্ডিত্যের দাম, তাঁর অপূর্ব্ব ভাষার দাম, তাঁর সহজ রচনা-শক্তির দাম, প্রকাশ-ভঙ্গীর দাম যে কতখানি, সাধারণ বাঙালীর মধ্যে কয়জন তার খপর রাখে! তিনি যে দিন পয়সার জন্য সাপ্তাহিকের ও দৈনিক কাগজের সম্পাদকী করিতে ঢোকেন, সেদিন বাঙলা সাহিত্যের দুর্দ্দিন! সেদিন কত বড় প্রতিভাকে যে আমরা কোথায় গুঁজিয়া দিলাম, ইহা ভাবিতে অঙ্গ আজো শিহরিয়া ওঠে!

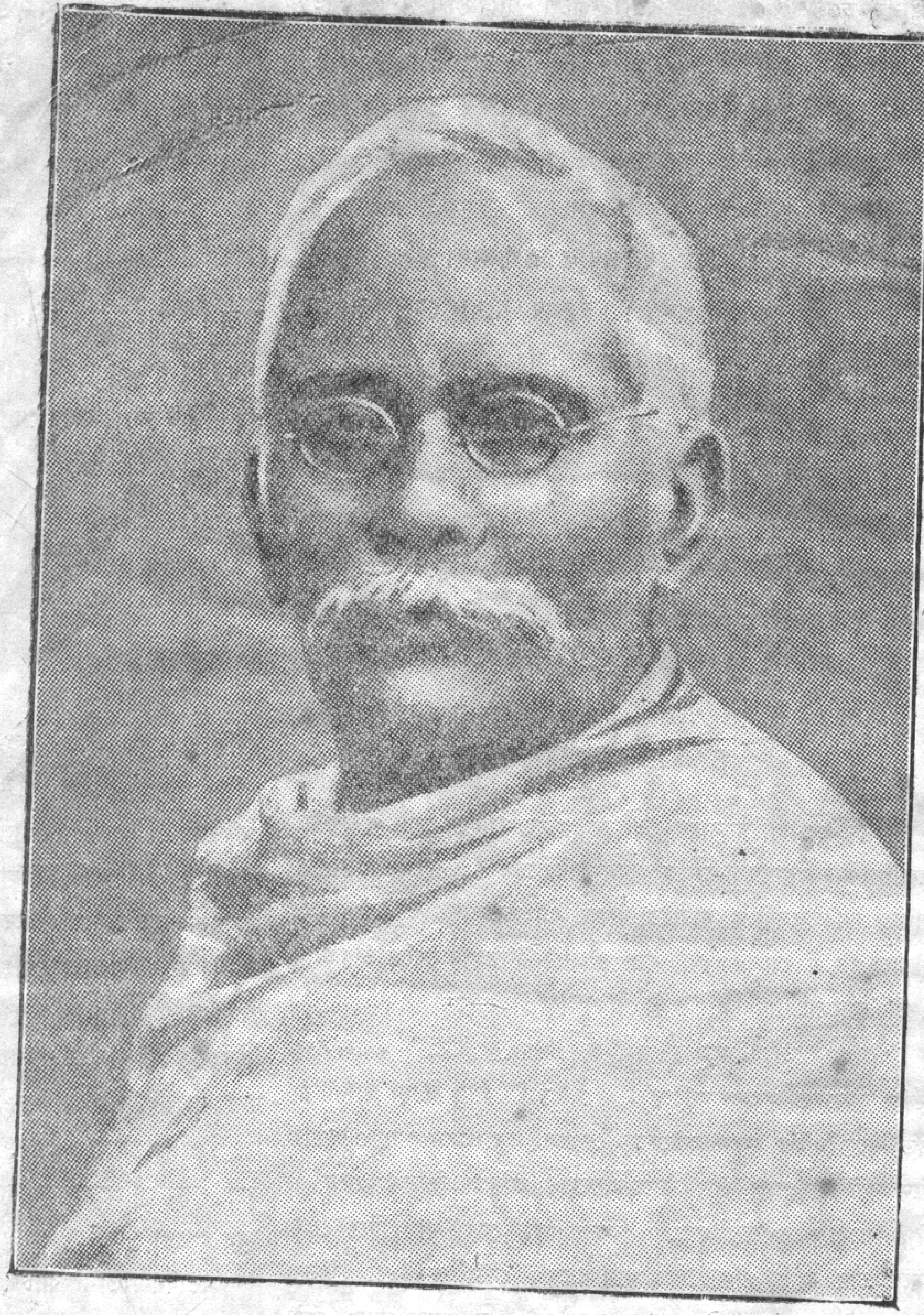
যতদিন তিনি বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন তাঁর দাম বুঝি নাই। আজ তিনি নাই, আজ সভা ডাকিয়া বক্তৃতা দিয়া কথার মালায় তাঁকে চরিতার্থ করিয়া তুলিতে উদ্যত হইয়াছি—বাঙালীর এ কলঙ্ক কি রাখিবার ঠাঁই আছে!

তিনি বাঙলা-সাহিত্যে কি দিয়া গিয়াছেন, তার দাম বাঙালী যে দিন কষিয়া দেখিবে, সেদিন বাঙালী বুঝিবে, পাঁচকড়িবাবু বাঙলার কে ছিলেন, কি ছিলেন! আজ তাঁর সাহিত্য-সাধনা, তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর চিন্তাশীলতার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া শুধু এই প্রার্থনা করি, তাঁর গবেষণা, তাঁর পাণ্ডিত্য বাঙালীর আদর্শ হোক!

৺অশ্বিনীকুমার দত্ত

বাঙ্‌লার কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত ৬৯ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি ওকালতিতে প্রবৃত্ত হন। ওকালতিতে তাঁর পসারও ছিল প্রচুর। তবু একদিন দেশের আহ্বানে তিনি ওকালতি ছাড়িয়া দেশ-সেবায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। বরিশালের ব্রজ মোহন স্কুল ও কলেজ তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি এই শিক্ষালয়ে তিনি পড়ানোর সঙ্গে ছাত্রদের চরিত্র-গঠনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। যতদিন প্রত্যক্ষভাবে তিনি এই শিক্ষালয়ের সেবা করিয়াছিলেন, ততদিন এই বিদ্যালয় বঙ্গে এক আদর্শ শিক্ষালয় বলিয়া পরিগণিত ছিল।

কংগ্রেসের তিনি একজন খাঁটী সেবক ছিলেন। ১৯০৬ সালের বিখ্যাত বরিশাল কন্‌ফারেন্সে তাঁর নির্ভীকতা ও দেশপ্রাণতা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়াছিলেন। তাঁর এই তেজ, এই নির্ভীকতায় ত্রুটি কোনদিন দেখা যায় নাই। বক্তৃতাবাগীশ দেশনেতা সাজিবার কল্পনা তাঁর মনেও কোনদিন উদয় হয় নাই--দেশের পয়সার উদরপূর্ত্তি করিয়া বক্তৃতায় দেশের যত লোকের তার লাগাইবার হাস্যকর চেষ্টাও তাঁর মনে জাগে নাই। এ ব্যাপারটাকে চিরদিন তিনি ঘৃণাই করিয়াছেন! ধর্ম্মে তাঁর অনুরাগ আর ভক্তিও ছিল প্রচুর—তাঁর নৈষ্ঠিক ধর্ম্মানুরাগ একালে দুর্ল্লভ! এই ত্যাগী সাহসী চিন্তাশীল দেশ-সেবককে এ দুর্দ্দিনে হারাইয়া বাঙলা দেশ কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না! তাঁর আদর্শ কোটি কোটি বাঙালীর বুকে উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলুক, তাঁর আদর্শে বাঙালী মনে-প্রাণে খাঁটি হইয়া দেশের সেবায় আত্মশক্তি নিয়োজিত করুক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।



৺অশ্বিনীকুমার দত্ত
(আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



দুর্দ্দিনের বন্ধু
শ্রীযুক্ত রামেশ্বরপ্রসাদ বর্ম্মা অঙ্কিত

ভারতী

৪৭শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৩০ { নবম সংখ্যা

পূর্ণিমা-ব্রত

সেকালের কোজাগর পূর্ণিমার উৎসবই খানিকটা রূপ বদলে হল পূর্ণিমা সম্মিলনী! রাত জাগলেম—শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে, তাস পাশা খেলে, গালভরা পান খেয়ে সেকালে, একালেও জাগলেম—হারমোনিয়াম বাজিয়ে, তর্ক করে, বক্তৃতা শুনে দশে-বিশে, মিলে এ-বাড়ি সে-বাড়ি, এর আঙ্গিনায় তার আঙ্গিনায়! পূর্ণিমার পরিপূর্ণতার স্বাদ এমনি করেই কি পাওয়া যায়? ঘরের দেওয়ালের মাঝেই বদ্ধ রইলো উৎসব, বাইরের আলো বাইরে পড়ে কাঁদতে থাকলো, প্রবেশ-পথ পেলে না কোন দিকে এই কি হল পূর্ণিমা-মিলন! সুধার পিয়াসী চকোর মিলন চাইতে চাইতে চলে গেল মাথার উপর দিয়ে, পূর্ণচন্দ্রের দিকে—ডাক দিতে দিতে, শুনলেম না তো—হাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে দাপিয়ে গাপিয়ে বকে বাওয়া গেল ঘণ্টার পর ঘণ্টা দশে-পাঁচে, নয়তো রঙ্গালয়ে গিয়ে কতকগুলো বিকট ও উদ্ভট শব্দ শুনে শুনে রাত কাটানো গেল, পূর্ণিমার গভীর ইঙ্গিৎ-ভরা মিলন-রাত্রি কারু সঙ্গে কাউকে, কিছুর সঙ্গে কিছুকে মেলাবার অবসরই পেলে না! দিনের কাজ সে রাতের পরিপূর্ণ বিরতিকে পেলে কই! মন সব কথা শেষ করে তো চেয়ে দেখলেনা, এপারের এই অপরিপূর্ণ চাঁদের আলোর ওপারে যে পরিপূর্ণতা, তার দিকে! পূর্ণিমার অভিসার-সাজ ধরলে কোথায় মন, নিজের সমস্ত অপরিপূর্ণতার বাসক, সজ্জার মাঝে কোথায় জাগলো সে

চাঁদ যখন ওঠে নদীর উপর দিয়ে আলোর সেতু এসে আপনি লাগে এপারের অন্ধকার ঘাটে—তরল আলোর হাল্কা সেতু জলে ভাসে, হাওয়ায় কাঁপে—সেই পথ ধরে সাধক যাঁরা কোজাগরে সত্যিই জাগেন, তাঁদের মন চলে যায় দেখি পরিপূর্ণতার দিকে। তারার ওপারে ঐ নিমেষ-হারা নয়ন-তারার কালো আলোয় হারিয়ে ফেলেন যাঁরা আপনাকে, তাঁদেরই প্রাণ-পাখী জানে যথার্থ পূর্ণিমার খবর। পঞ্জিকার পূর্ণিমা পাঁজির লেখা ধরে ঘণ্টা পল মিলিয়ে আসে এবং যায়ও ঠিক ওই ভাবেই, কিন্তু পূর্ণিমার যে পূর্ণিমা সে কারো দিকে নিজে আসে না—আলোর কাছে বাতাসের কাছে—তার কথা শুধিয়ে চলতে হয়। ঐ যে আলো-ছায়ার তরল সেতু তারি উপর দিয়ে আসা-বাওয়া! পায়ের ভর সয় না এমন সেতু গভীর জলের স্রোতের মাঝে টলমল করছে তারি উপর দিয়ে অভিসার—কবিরা একে বলেছেন শুক্লাভিসার—

"ধবল বিভুষণ অম্বর ধরই
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই!"

জল-স্থল-আকাশ ধবল সাজ পরলে, তার মধ্যে দিয়ে চল্লো মিলন-পিয়াসী—সাদা ফুলের মালা পরে—কর্পূর-চন্দনের শুভ্র পরিমলে সুরভিত হয়ে শুভ্রতার অবগুণ্ঠন টেনে চাঁদনীর স্রোতে গা ভাসিয়ে আলো-করা নদী বয়ে—

রূপ সে পরিপূর্ণ হল অরূপকে পেয়ে, খণ্ডতা পরলে অখণ্ড সুন্দর সাজ—আকারের আবরণ নিরাকারের ছন্দ পেলে!

আপনার খণ্ডতা চায় পুরিয়ে নিতে মানুষের মন তাই তার অভিসার! জনে জনে যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষ জানলে আর একককে না পেলে সে অপরিপূর্ণ, তার চারিদিকের কিছুই সম্পূর্ণতাকে ধরে দিতে পারলে না, উপবাসী চকোরের মতো মন তার তৃষিতই রইলো চেয়েই চল্লো অখণ্ড-মিলন-এই যে পূর্ণমিলন একে চেয়ে মানুষের মন উড়তে চায় কিন্তু ডানা-পায়না—দুঃখ, করে কেঁদে মরে! চিরদিনের বিরহিনী সে, গুমরে কাঁদে, মিনতি জানাতে চায়—কিন্তু যাকে চায়, তার কাছে পাঠায় এমন কাউকে সে দেখে না—সবাই, চন্দ্র সূর্য্য আকাশ বাতাস পূর্ণতার স্বপ্নই দেখেছ—পৌঁছবার সাধ্য নেই কারু সেখানে! পূর্ণ সুন্দর সে কেমন তা জানতে মন আকুল হয়, পায় না এমন কাউকে যাকে শুধায় খবর! পূর্ণ সুন্দরকে দেখেছে যে জেনেছে যে মিলন-আশা পরিপূর্ণ যার, দেখা সম্পূর্ণ হল যার সে তো অপূর্ণতাতে ফিরলেনা, সে চেয়েই রইলো নির্ব্বাক নিক্রীর সমুদ্রের প্লাবনের মধ্যে নদী সে ডুবে রইলো নিস্তরঙ্গ স্থির! স্বামীর ঘর পেয়ে গেল যে সে তো আর বাপের বাড়ীতে 'পেয়েছি' বলে খবর দিতে এলো না—একের সঙ্গে আর এক মিলিয়ে গেল, এই অবস্থার কথা কবীর বর্ণন করলেন—

> নৈহরবা হমকো নঁহি ভাবে ॥
> সাঁঈ কী নগরী পরম অতি সুন্দর
> জঁহ কোই জায় ন আবে
> চাঁদ সুরজ জঁহ পবন ন পানী
> কো সন্দেশ পহুঁচাবে!

পরিপূর্ণতার দিকে যেতেই চাচ্ছে চন্দ্র সূর্য্য পবন পানী! মানুষের মন দেখেছ পরিপূর্ণতার স্বপ্নই, না ধারত্রীতে না আকাশে না জলে কোন কিছুতে সেই অখণ্ড পূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ করছে সে, অথচ পরিপূর্ণতাকে পাওয়ার জন্যে সাধনার কামনার অন্ত নেই তার। বাপের ঘরের ভালবাসা আদর যত্ন স্বামীর আদরে গিয়ে পরিসমাপ্ত কামনা করছে, খবর নিয়ে যায় কে স্বামীর কাছে!

ধর্ম্মের দিক দিয়ে, আর্টের দিক দিয়ে, সকল কর্ম্মের দিক দিয়ে পূর্ণিমার ব্রত পালন এইভাবে করে চলেছে সাধক মানুষ, অপরিপূর্ণতার আসনে বসে পরিপূর্ণের পূজা! পূর্ণিমার ব্রত পালন সুখের নয় ব্রতধারীর পক্ষে, পরিপূর্ণ সুখ যা তাকে পেতে অসুখ বিস্তর! হলোনা হলোনা—ছবি দিয়ে যা জানাতেও চাইলেম জানানো হলনা, লেখা দিয়ে সুর দিয়ে যা বলতে চাইলেম তা বলা গেল না, পরিপূর্ণ হলোনা নিখুঁত হইনা ব্রতের উপচার—এই ভাব তো কোন আনন্দ দেয় না—দুঃখই জাগায় মনে পদে পদে পথে বিপথে সব ব্রতধারীর। পূর্ণতাকে এ জগৎ আলিঙ্গন করতে চাচ্ছে, পারছে না—পূর্ণিমার লীলা এই নিয়ে! পূর্ণচন্দ্র কিরণ-জাল বিস্তার করে ধরতে চল্লো পেলেনা পূর্ণিমাকে, বাদলের আকাশ বিদ্যুৎ-শিখা জ্বলিয়ে ধারা-গৃহে তার অপেক্ষায় রইলো, নদী কূলে কূলে ভর্ত্তি হয়ে, সাগর ফুলে ফুলে বেলা অতিক্রম করে চলতে চাইলে তার খোঁজে, ধরতে গেল পরিপূর্ণতাকে কিন্তু পারলে না—মানুষ সবাই জাল পাতলে—রংএর জাল, রেখার জাল, কথার জাল সুরের জাল—পূর্ণিমার পাখী ধরা দিলেনা, সবাই এরা কাঁদলে—"ধরার বাহিরে, লুকয়ে রহিল সে।"

যখন পরিপূর্ণতার জন্যে হাহাকার তখন যতই কেন ভাল হোক না চোখে লাগে না মনে ধরে না আর-কিছুই। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য যারা সন্ধান করে তাদের মত অসুখী কে? কিন্তু তবু চায় তাকে মন! সাধক মানুষের সব নিবেদনেই এই পূর্ণিমার জন্যে বেদনা মন্ত্রের মতো বাজছে—মালার সূত্রের মতো ধরে রেখেছে—তার একটির পর একটি কাজকে। এক পরিপূর্ণকে ঘিরে অপূর্ণের এই রাসলীলা পূর্ণচন্দ্রের বুকে কলঙ্কের, আলোর পাশে ছায়ায় ঝুলন! পরিপূর্ণের পাশে অপরিপূর্ণের এই লীলা এতেই দোলা দিচ্ছে—ঘুরিয়ে চলেছে বিশ্বকে, বিশ্বের যা-কিছু সমস্তকে! পরিপূর্ণতাতে যেমনি মিল্লো একেবারে তেমনি থেমে গেল এ লীলা! পূর্ণ এবং অপূর্ণ দুয়ের মাঝে মনোরম ভেদটুকু রইলো তবেই লীলা চল্লো, তরঙ্গ উঠলো, ফাঁকে ফাঁকে মিলন-পথের বাঁকে বাঁকে। যে মালার সব ফুল একের সঙ্গে আরেকের ব্যবধান ঘুচিয়ে নিরেট হয়ে গেল—সে মালা দুল্লোনা কোন

দিন! একের সঙ্গে অনেকে পুরোপুরি গিয়ে মিল্লো, সব সুর এক সুর হয়ে গেল যেমনি—রাসলীলা, রাগ-রাগিণীর খেলা বন্ধ হলো সেই মুহূর্ত্তে! বিচিত্রকে নিয়ে রাস, দুইকে নিয়ে ঝুলন, সাতকে নিয়ে সুর-সার—খণ্ডকে নিয়ে অখণ্ডের লীলা! মন মিলতেই চল্লো কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে সে নিজেই আবার বল্লে—না থাক্, তোমায় আমায় ঐ একটুখানি অমিল, লীলা চলুন—খণ্ড অখণ্ড দুই নিয়ে, এই হল পূর্ণিমার ব্রতধারির কথা—

"বহুবিধ চিত্র বনায়কে
হরি রচিন ক্রীড়ারাস!
ঝুলত ঝুলত বহু কল্পবীতে
মনহি নহিঁ ছাড়ৈ আশ।
কবহুঁক উঁচে কবহুঁক নীচে
সুকৃথ দুকৃথ লে জায়।
কহৈঁ কবীর সরসী বিনতী
শরণ হরি তুব আয়।
ঝুলত গণ গংধর্ব মুনিবর
ঝুলত সুরজ চংদ,
আপ নিগুর্ণ সগুর্ণ হোকে
ঝুলিয়া আপ গোবিন্দ!
শশী সুর রৈনী শারদী
তঁহা তত্ব পরলৈ নাহি,
সাধু সংগতি খোজি দেখহু—
তহঁ সংত বিরলে জাহি।

দোলার এবং লীলার বিরাম হলো না, পরমা বিরতি পরম সুন্দরের সৃষ্টিতে রইলো না, পূর্ণ হলনা, আশা নিরাশা খেলা ধূলা, স্থির হয়ে গেলনা কিছু, ঠাঁই পেয়ে বসলোনা কেউ, এই সৃষ্টির নিয়ম—

"ঝুলহি জীব জহান জঁহ লগ
কতহুঁ ন দেখো থিত থীর।"

যতদূর পর্য্যন্ত ঝুলনায় ঝুলিতেছে জীব এবং জগৎ ততদূর পর্য্যন্ত কোথায়ও দেখিতেছিনা স্থিতি ও ঠাঁই।

নিখুঁত জিনিষ নেই বলেই নিখুঁতের জন্যে প্রত্যাশা, হয়ে উঠতে চাচ্ছে কিন্তু নিখুঁত রূপ ধরে আসতে পারছেনা কেউ—একটুখানি অবনত হচ্ছে সবাই নিখুঁত সৌন্দর্য্যে চরম পরিপূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছে। ফোয়ারার ধারা পিচকারী দিয়ে মেঘ ছুঁতে চায়, বাদলের বৃষ্টি চায় মাটীর গভীর অন্তরের অন্তঃস্থলে চলে যায়, পারে না—মাথা হেঁট করে কেঁদে বয়ে চলে উৎস-ধারা—বৃষ্টি-ধারা! আলোক-ধারা আপন ছায়াকে মুছে নিখুঁত হয়, পারে না! পরিপূর্ণ আলোকের কাছে গ্রহ-চন্দ্র-তারকা হার মানে, পরিপূর্ণতার স্বপ্ন ধরেই থাকে, বিশ্বজগৎ আপনার মাঝে তাকে অনুভব করে কিন্তু প্রত্যক্ষ্য করতে পারে না।

সাঁই কেয়া, বহুতগুণ ঔগুণ কোই নাহি,
জো দিল খোঁজোঁ আপনা সব ঔগুণ মুঝমাহিঁ"॥

সব আর্ট সব রচনা সব কায মানুষেরও এই ভাবে হার স্বীকার করে আপনার আপনার পূর্ণ আদর্শের কাছে। এই হার স্বীকার মানেই আদর্শকে স্বীকার, যেখানে এই হার স্বীকার নেই সেখানে দম্ভ আছে কিন্তু পরিপূর্ণতা কোন দিক দিয়ে আছে কিনা সন্দেহ।

এই পূর্ণচন্দ্র সে নিজের আলো ধরে দেখিয়ে চলে আমি নিখুঁত নই, কিন্তু গোল আয়না সে পালিসে চোখ ধাঁধিয়ে প্রমাণ করতে চায় আমি নিষ্কলঙ্ক চাঁদ! এই সত্য এবং এই মিথ্যা দুই পথ হল সব মানুষের সামনে ধরা, নিজের অপরিপূর্ণতার সত্যকে জানা এবং সেটাকে না-জানা এই নিয়ে ভেদ হল রসিকে এবং বেরসিকে, পণ্ডিতে-অপণ্ডিতে, আর্টে এবং না-আর্টে, সত্যে এবং সত্যের ভাণে,—পূর্ণ সুন্দর অখণ্ড সুন্দর অতুলনীয় অনুপম অপরিমেয়, তার পরিপূর্ণ স্বাদ লাভ করলে যখন যে জীবন তখনই সে আপনার অপূর্ণতা খণ্ডতা তুচ্ছতা অনুভব করলে! এই অনুভূতি পদে পদে শঙ্কা জাগায় কিন্তু পরিপূর্ণতার দিকে চলার পথে আগল হয়ে থাকে না—দীপশিখা এই শঙ্কা অনুভব করেই সারারাত কাঁপতে থাকে, জ্বলে পুড়ে মরে পরিপূর্ণ আলোর বিরহে এবং সকালে সে মিলিয়ে দেয় বৃহত্তর আলোয় আপনাকে। যখন অন্ধকারের মাঝ দিয়ে অভিসার আলোর দিকে, অফুটন্তের অভিসার ফুটন্তের দিকে, তখন

মতো কাঁপতে কাঁপতে তার অভিসার—ভয়ে ভয়ে শিউরে ওঠে সে, রয়ে রয়ে সকল গায়ে তার কাঁটা দেয়, সে সোজা চলে না,একটু একটু হেলে চলে লীলাভরে, চলে কিন্তু অভিসারে—আপনার এক লহমার শ্রী সৌন্দর্য্য শোভা সৌরভ সমস্তই ফুটিয়ে ধরতে চলে সে,তার মনে যে অনুপম রয়েছে তারদিকে—

"গগন সঘন মহী পঙ্কা—
বিঘিনি বিথারিথ উপজয়ে শঙ্কা
দশ দিশ ঘন আন্ধিয়ারা—
চলইতে খলই লথই না হ পারা" !

পরিপূর্ণতাকে পেতে চলতে যে শঙ্কা যে সঙ্কোচ অপরিপূর্ণের সেইটেই মনোহরণ গুণ পৌছায় সুন্দর কাযে সব সুন্দর আর্টের সুন্দর রচনায়। এই সঙ্কোচকে এক ধরণের সমালোচক তারা বলে রচয়িতার অক্ষমতা ও রচনার দোষ—বড় ভুল করে তারা ! নিরাবরণ নিরাভরণ পরিপূর্ণতা সে বড় দুঃসহ, সূর্য্যের তেজ অনেকখানি এই ভাবের তেজ কিন্তু দুর্ণিরীক্ষ্য সে তেজ, পূর্ণচন্দ্রের আলো স্নিগ্ধ মনোহর—তেজ হিসেবে সে পূর্ণ নয় বলেই। ঘরের দীপ-শিখা সেও সুন্দর কিন্তু ঐ যে বিজলীবাতির প্রভা, ওকে ভাল লাগছে শুধু ও কায দিচ্ছে বলে, মনের সঙ্গে এসে মিলতে তো পারছে না ও কোন দিক দিয়ে ! দীপশিখার গান কবিরা রচনা করেছেন আকাশের একটুখানি বিজলীরও গান আছে কিন্তু বিজলী-বাতির কবি হয়তো কিছুদিন বাদে জন্মাতেও পারে ততদিন ওটাকে পরিপূর্ণতার নির্লজ্জ ভাণ বলেই গ্রহণ করা চল্লো—। perfection কথাটা শুনতে ভালো কিন্তু কাযে আসে না ওটা—মানুষের কাযের মধ্যে ও আদর্শ হয়েই থাকতে চায় ! গাড়ির চাকার মতো পরিপূর্ণ গোল পূর্ণচন্দ্র, যার আলো দ্বাদশ সূর্য্যকেও হার মানায়, সে কি বস্তু তা অনুমান করতেও ভয় হয়। অথণ্ড পরিপূর্ণতা সে যে প্রকাণ্ড শূন্যতা—এ কথা কবিরা বোঝেন—তাই তাঁরা গাইলেন—

সুন্ন মহল কাঁহা সোইয়ে
জঁহা নিশ আঁধিয়ারি
কহৈঁ কবীর বহুঁ সোইয়ে—
রবি শশি উজিয়ারি।

এ যে নিভাঁজ অন্ধকার এ যে অনন্ত শূন্য,—এখানে ফুলশয্যা কোথায় পাতবো ? যে বিরহিণী সেইখানে শয়ন বিছাও, যেখানে তোমার আপন মন্দিরে রবি-শশী দীপ্যমান।

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়ে আছয়ে যেজন
কেহ না দেখয়ে পারে—
প্রেমের কি রিতি যেজন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে—

এই যে প্রেমিকের চোখে চেয়ে দেখা কলঙ্ক-মাখা পূর্ণচন্দ্রের দিকে, মেঘের পর্দ্দায় ঢাকা পূর্ণিমা রাত্রির দিকে, এই হল কবিদের দেখা রসিকের দেখা ! দুরবীণ ধরে দেখা পিদীম ধরে দেখা হচ্ছে চাঁদের মুখের কলঙ্কটাই বড় করে দেখা,—সে আর এক রকমের দেখা ভয় তাতে আছে বিস্ময় আছে, সবই আছে আনন্দও এক রকমের আছে ! এই দুই পথ ধরে দেখতে চলেছে যারা তারা কিন্তু দু'রকমের মানুষ একদল নিখুঁৎ চায় ও খুঁৎ খুঁৎ করেই চলে, আর একদল খুঁৎ স্বীকার করে বলে—খুঁতের মধ্যেই পাচ্ছি নিখুঁৎ, এর বেশি আর চাইনে। পরিপূর্ণের সঙ্গে সাধক কিভাবে মিলতে চলেন, কবিরা কি চোখে তাকে দেখেন, তার কথা 'সুফিদের কথা থেকে ধরা—পড়ে।

"Oh my God ! I invoke Thee in public as Lords are invoked, but in private as loved ones are invoked. Publicly I say, Oh my God but privately I say 'Oh my beloved !" বিজলী বাতি যে ধরণের পরিপূর্ণতার স্বাদ দেয়, সেটা এই জগৎ-সংসারকে যে আপনার পরিপূর্ণতার দিকে আকর্ষণ করছে সেই পূর্ণচন্দ্রের মতো মধুর স্বাদ নয়। বিজলী বাতির আলোর পরিপূর্ণতার দিকে চেয়ে পতঙ্গ উড়ে চলে মিলতে কিন্তু ঠকে এবং ঠেকে ফেরে এবং দীপ-শিখা যার সঙ্গে সে মিলতে পারে তারি দিকে যায় ও সে বোঝে, বিজলী-বাতির আলোর পূর্ণিমা, তার সেই এতটুকু দীপশিখার পূর্ণিমা নয়, তার আপনারও জিনিষ নয় !

আমার অনুপম, আমার অতুলন—সে আর কারো নয়,

দের প্রাণের কথা, জপ মন্ত্র—এবং এরি সাধনা পূর্ণিমার ব্রত-সাধনা। কবির সাধনা আর্টিষ্টের সাধনা, একটুখানি হোক এতখানি হোক কিন্তু আমার সে হোক এইধ্বনি উঠছে কবি আর্টিষ্ট সবারই মনে—আমার সঙ্গে আমার যা তার পূর্ণমিলন! অন্যের ঘরে গেলে সে আর তো আমার থাকে না, সবার হয়ে যায়, সে অনন্যসাধারণ থাকে না, সাধারণ হয়ে পড়ে—রূপজীবা যে সবার, সেই জন্যেই সে কারোই নয়! এই আমার-কে চায় মানুষ সব দিক দিয়ে, আমার সঙ্গে আমার যে তার পরিপূর্ণ মিলন-আশাই চালায় অভিসারে, স্বাদ দেয় মিলনে, এ না হলেই মনে বিরক্তি আসে।

কেমনে ধরিব হিয়া—
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়—
আমার আঙ্গিনা দিয়া;

এ আমার নিজের পরের নয়—এই মানসে এ পর্য্যন্ত কাব্যে সাহিত্যে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সবই নতুন নতুন পথ ধরছে সেই জন্যেই, বারবার একই পূর্ণ চাঁদের দিকে অভিসার শত দিকে শতজনার শত শত পথে! এ অভিসার শেষ হয়ে যেতো,যদি সবার যা তাকে, পরিপূর্ণ যা তাকে পেয়ে যেতো কোন দিন সবাই। যে নিমেষে প্রলয় সেই নিমেষেই সৃষ্টি কেঁদে জানিয়ে দেয়, এ কি করলে, কেন এ রূপে এলে পরিপূর্ণ করে সব, আমার সেই খণ্ড পরিপূর্ণতা,—কলঙ্কী চাঁদ কোথায় হারিয়ে গেলো! অপরিণত শিশুকে দোলা দিচ্ছে মা—এক রকমের পরিপূর্ণ সুন্দর তা—পরিপূর্ণ দিনের আলোয় গাছের কলি ফুটছে, এ আর এক-রকম সৌন্দর্য্যের চরম, আবার সন্ধ্যার আঁধারে ফলেফুলে পরিপূর্ণ, ডালে পাতায় পরিপূর্ণ গাছ—এতটুকু চাঁদের আলোকে দুলিয়ে গাইছে; ও আমার চাঁদের আলো,এই ফাগুনের সন্ধ্যাকালে ধরা দিয়েছো রে, আমার পাতায় পাতায় ডালে ডালে—" এ এক রকম পরিপূর্ণ রসের স্বাদ! আবার "কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা ? পদ-নখে পড়ে তার আছে কতগুলা—এ এক রকমের perfect beauty, যা এক শ্রেণীর লোকে পছন্দ করতো, করেও এখনো, নিখুঁতি সন্দেশের ঝুড়ি ভরা beauty, গা-ভরা গহনার beauty কতকটা এই ধরণের সামগ্রী, টাকা-মোহরের এবং গাড়ির চাকার beauty এই ধরণের beauty, যা ওজন করা চলে, বুঝে নেওয়া চলে, যাচাই করে নেওয়া যায়, যার মাল-মসলা! লাটসাহেবের বাড়ির উৎসবে গেছি সে একেবারে program—ধরা উৎসব—এতটা নিখুঁৎ যে মনেই হয় না উৎসবে এলেম! কিছুর photographএর সামনে দাঁড়িয়ে যে ফটো তুলেছে তাকে পাইনে, যাকে তুলেছে তাকেও পাইনে, অথচ Perfect-photo সেটি এটা অস্বীকার করা যায় না। Perfection এর মধ্যে কি একটা আছে সেটা মন হরণ করতে পারে না, imperfectionএর মধ্যে এমন কি একটা আছে যেটা সহজেই মনকে টেনে নিতে পারে, ছেলের মুখের আধো আধো বুলির মতো—! আর্টিষ্টরা প্রায়ই দেখি গরু-গাড়ির বেটপ চাকাটা আফিস-গাড়ির ঠিক গোল চাকার চেয়ে বেশি পছন্দ করে আঁকতে!

আর্টিষ্টের কবির সাধকের মনের অভিসারে বড় রহস্যময় অভিসার খুঁতে নিখুঁত মিলিয়ে অভিসার, পরিপূর্ণতার স্বাদ সে যে পেতে চলে তা ধরা যায় না সহজে; মনে করি, এ কি, এ কোন্ পথে চল্লো, কোন্ রসাতলে নিক্ষেপ করতে চল্লো নিজের এবং আমাদেরও মনের উৎসব—! তোমার আমার কাছে যেটা ঠেকছে কালো সেটা ওদের কাছে আলোর উৎসব হয়ে দেখা দিচ্ছে এবং তোমার আমার কাছে যা আলো তা ঠেকছে ওদেরা চোখে কালো—এতো প্রায়ই ঘটে চলেছে! কাযেই perfection beauty ইত্যাদির তর্ক চলতে চলতে এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ায় সেখানে beautiful সে নিজেই বলে—"সকল জগত-মে সতকী নগরী, চিত্তভুলাতে বাঁকী ডগরি"—সত্য সুন্দরের পরম সুন্দরের এই যে বসতি, এর বাঁকা পথগুলিই সুন্দর ও মন-ভোলানো! এই বাঁকা সুন্দরের রহস্য যে জানে সে সহজেই পায় পরম সুন্দরের দেখা। সবাই তো নিজের নিজের পূর্ণিমার অভিসারে চলেছি—মিলছি যখন আপনার যে তার সঙ্গে তখন অন্যের তুলনায় এই আপনার মিলনে কতখানি ঘাটতি রইলো বা বাড়তি হল এর পরিমাপ করতে তো বৃথা সময় নষ্ট করি না! ওটা করে বাইরের লোক, যারা মিলন পেলে না!তারা থেকে থেকে বলে, এ তো আমাদের মনের মতো

মিলন হল না. ওতো সুন্দর নয়, ও যে কালো—ও যে বাঁকা, ওকে মনে হয় যেন কুব্‌জার বন্ধু! কিন্তু যে মিলন পেলে সে হেসে বল্লে, না না, ওই ঠিক—

"তাহার গলার ফুলের মালা—
আমার গলায় দিল—
তার মত মোরে করি—
সে মোর মত হৈল!

কাঁটা-ভরা মৃণালে আর ফুলে মিলন দেখে বুকে যার কাঁটা ফোটে তার মত বেরসিকই কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রের দোল পূর্ণিমার রাত্রের কলঙ্কী চাঁদের দিকে চেয়ে কোটরগত লক্ষ্মী-পেঁচার মতো চোখ মটকে ডেকে বলে, আরে ছ্যা ছ্যা! চকোর চলে যায় উধাও হয়ে ডাক দিতে দিতে—

পূর্ণ চাঁদের মাথায় আজি—
ভাবনা আমার পথ ভুলে।
যেন সিন্ধু-পারের পাখী তারা
যায় যায় যায় চলে!
আলোর ছায়ার সুরে—
অনেক কালের সে কোন্ দুরে
ডাকে আয়-আয় বলে।
যেথায় চলে গেছে আমার
হারা ফাগুন-রাতি—
সেথায় তারা ফিরে ফিরে
খোঁজে আপন-সাথী—
আলোর ছায়ায় যেথা—
অনেকদিনের সে কোন্ ব্যথা—
কাঁদে হায় হায় বলে!

চকোর জানেনা কিন্তু আমরা জানি—চাঁদ পরিপূর্ণ নয় সুধাকর নয়, চন্দ্রপুলিটা ওর চেয়ে ঢের perfect জিনিষ—তা দিয়ে পেট পরিপূর্ণ করা যায়, নিখুঁতি সন্দেশ সেও একেবারে perfect নিখুঁত পরিপূর্ণ সুমিষ্ট দ্রব্য অথচ এই imperfect এবং সুন্দর চন্দ্রমণ্ডলের চারিদিকে কেন যে চকোর উড়ে উড়ে ঘুরে ফেরে তা কে বলবে। শালুক

কেন তা কে জানে; কালো ছেলেকে মা যশোদা কালো সোনা বলে ভুল করেন কেন বলরাম পাশেই থাকতে এ রহস্য কে বোঝাবে? পরিপূর্ণতা সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে পেতে চলছে যখন মন তখন তার আদর্শ পাঁচজনের মত নিয়ে কেনই বা সে বেছে নেয় না আপনার মতেই বা চলে কেন কেনই বা কালোকেই আলো বলে ঠাওরায় কে তা বলে দেয়। চন্দ্রমণ্ডলের গোলটা জ্যামিতির অঙ্ক দিয়ে যাচাই করে নিয়ে চল্লেই হয়তো চকোর বুদ্ধিমানের মতো কায করতো! কিন্তু হয়তো বা সে পাগল তাই সে সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা কতখানি অসহনীয় তা জানে, পতঙ্গের মতো কালি পড়া দ্বীপ শিখাকে হয়তো সে পাগল বলেই ভালবাসে এবং ওরি দিকে ঝাঁপিয়ে পড়াকে ঠাউরে নেয় সত্যিকার তার পূর্ণিমা মিলন আর—তাই বুঝি এরা চুপ করে থাকে লক্ষ্মী পেঁচাগুলো যখন ডেকে বলে—আমি শ্রীর বাহন আমার দিক চেয়ে দেখ, ও কি করছ—আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ! এই যারা চুপ করে আছে তারা মনে মনে কি বলে না— যাচাই করে মিলন, ওজন করা সৌন্দর্য্য কে চায় রে! আশার পরিপূর্ণতা কে পায় রে, পেলে তো আর তাকে নিয়ে খেলার আশা থাকে না রে?

যে ভাবেই মিলন পাই যে দিক দিয়েই মিলনের স্বাদ পাই যখন তা পেলেম চুপ রইলেম কিম্বা বলতেই যদি হয় তো বল্লেম বলবার মতো করে।

বঁধু কি আর বলিব আমি—

চন্দ্রমণ্ডল সে নিজে অপরিপূর্ণ কিন্তু ঠিক পরিপূর্ণতাকে পেয়ে গেছে তাই সে কথা কয় না আপনার মাঝে যতটা অপরিপূর্ণতা তাই নির্ভয়ে প্রকাশ করে স্থির হয়ে চেয়ে থাকে —বাক্য হারা! স্তব্ধ রাত সেই কলঙ্কীর চোখের ইঙ্গীত পেয়ে হয়ে ওঠে অপূর্ব্ব সুন্দর মনোহর, কলঙ্কীর সেই নিষ্কলঙ্ক আলো কবি মনের ঝুলনায় দোলা দেয় পূর্ণিমার রাস চলে, তারায় চাঁদে দোল লাগে, গোলাপি আবিরের নেশায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে দিক-বধূর নীল দুটি চোখ, এই সময় কালো এক একটা পাখি তারা ঝাঁক বেঁধে বাসা ছাড়ে, তারা কি বলে তা যারা পাখির ডাক বোঝে

কুহেলিকা রাত্রির মোহ এমন কি দিনেরও আলো ছায়ার মায়া জাল ছিঁড়ে পড়ে যেন, এদের সাড়া পেয়ে উষালোকের অস্পষ্টতা পালায় হরিণের মতো চকিত হয়ে গহন বনে।

এ যেন উৎসবের আর একটা দিক, ছবির অপর পিট সেখানে পূর্ণসুন্দরকে মেপে নেবার জন্যে একটা তুলা দণ্ড একখানা চন্দ্রপুলীর উপরে ঝুলানো রয়েছে এবং মাল ও বাটখারায় সেখানে ঝুলন লাগিয়েছে,—অতি চমৎকার দেখতে হয়েছে সেটা—। এমন এক এক সময়ে ঘটে—চাঁদের আলোর হাল্কা সেতু বেয়ে চলতে চলতে হাবড়ার পুলের মুখে এসে ঘুম ভাঙ্গে পূর্ণিমার স্বপ্ন থমকে দাঁড়িয়ে চায়, ঠিক যে ভাবে চায় সমালোচকের মুখের দিকে আর্টিষ্টের রচনা। তখন মন বলে এ কোথায় অভিসারে এলেম একার দিকে? তখন সহরের আর মটরের বিজলী বাতির সামনে চাঁদ দেখায় মিট মিটে বাঁশীর সুর অনেকক্ষণ কান পেতেও আর শোনা যায় না, সামনে এসে সমালোচক, পিছনে আশে পাশে থেকে সমালোচক বলে, ও কোন্ অপরিস্ফুটতার অপরিপূর্ণতার দিকে চলেছো অভিসারে? কলে ছাঁটা perfection-টাই মনে হয় তখন সব চেয়ে বড় সব চেয়ে সুন্দর ও সম্পূর্ণ কিছু, ভুলে যেতে হয় তখন যে চোখের তারাটি নিখুঁৎ গোল বলেই তার উপরে পর্দা টেনে দিয়েছেন যিনি হলেন সেরা কারিগর তিনি। সম্পূর্ণ গোল চন্দ্রসভা অসম্পূর্ণ গোল পূর্ণচন্দ্রকে বুকে ধরে তবেই শোভা পায় না হলে সেটা বোধ হতো একটা অন্ধকারের কূপ কে যেন আকাশে খুঁড়ে গেছে, গোল মুক্তা রাখা হল লুকিয়ে বাদামি ঝিনুকের কৌটাতে রচয়িতার এই অভ্রান্ত নিয়ম ভুলিয়ে দিয়ে যায় সমালোচকের কূট তর্ক পূর্ণসুন্দরকে নিয়ে। যে ভালবাসে সেই যে ভাল দেখে, যে ভালবেসে লেখে সেই ভাল লেখে, এই সহজ কথাটার আর তখন কোন অর্থ পাওয়া যায় না, সুন্দরতার চরম পেতে বিতর্ক ওঠে মনে। কবি হাফেজ এই অবস্থায় পড়ে বল্লেন—

"This crowd that laugheth of those drinking the wine dregs, I fear ?

They will, in the end, ruin their faith !

যে অমৃত পেয়ালা উপচে পড়তে চায় তার স্বাদ ঐ তলানি এক ফোঁটা থেকে পেয়ে চলেন সুফিরা একটু-খানির একটু অবশেষে, উৎসবের ভরা পেয়ালার তুচ্ছ তলানিটা অতি মনোরম এই সব সুফি কবিদের কাছে—তাঁদের বড় শঙ্কা এই তুচ্ছ তলানিটুকু পাছে না পান তাঁরা কেন না তাঁরা জানেন ভরা পেয়ালার স্বপ্ন সে কোনদিন সত্যি হয়ে ওঠে না কারু কাছে তাই তাঁরা বলেন এই একটি ফোঁটার কথাই—

At time's Banquet enjoy one or two cups and go verily desire not perpetual union.

আবার—"The Anka is the prey of none up pluck thy snare for, here ever, in the hand of the snare is wind ।"

পূর্ণিমার পাখী সে কার জালে পড়েছে, সে জাল সম্পূর্ণ করে রচনা করতে পেরেছে কে! এই ছোট জাল এতেই যা পড়ে, এই ছোট পেয়ালা এর তলায় যতটুকু ধরে তারি আশা,—

"In the cup we have beheld the reflection of the beloved—O thou void of knowledge of the joy of the perpetual wine-drinking of ours."

পাত্র কেমন পানীয় কেমন তার কথা উঠলো না, প্রিয়ার মুখখানি পূর্ণচাঁদের ছায়ার মতো ভাসলো এইটুকু বলাতেই সব বলার আশা মিটলো এর বেশি বলতে চাইলে না কবির মন এবং এইটুকু দেখার উৎসবই হল অনেকগুলো পূর্ণিমার রাত ধরে দেশে বিদেশে কবিজনের মধ্যে। কালিদাস কবি তিনিও এই কথাই বল্লেন—

"সুবাসিতং হর্ম্যতলং মনোহরং
প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাস বিকম্পিতং মধু।"

ভাঙ্গা ভাঙ্গা আলো ভাঙ্গা ভাঙ্গা রূপের রেখা রংএর লেখা মধুর ছন্দে ছন্দ পেয়ে দুলছে একটি পেয়ালায়, চাঁদের আলোয় ফুটন্ত অফুটন্ত অগণ্য তারার ফুলে ফুল-ময় নীলকান্ত মণি-রচিত পান ভূমিতে দুদিকে দুই পিয়াসী দুই প্রণয়ী, এই হল পূর্ণিমার স্বপ্ন-ভরা উৎসব। কবিরা এর আয়োজন করলেন তখন যে সময়ে আর সবার চোখ ঘুমিয়ে আছে! আমাদের ভার সত্যিকার পূর্ণিমা সম্মিলন এর সঙ্গে মেলে না—আরো পরিপূর্ণ ও বিপুল ব্যাপার তা, কেন না চন্দ্রের বদলে চন্দ্রপুলি থাকে যথেষ্ট সেখানে। এটা এক হিসেবে মন্দই বা কি, নিন্দা

তো এতে নেই, ভালই বলবে পাঁচ জনে? ওটাতে বরং মাতাল বদনামও দিতে পারে কেউ কেউ, তার চেয়ে বেশিও বলতে পারে—ওর কথা থাক্। পূর্ণিমার ব্রত যে আলোতেই হয়, অন্ধকার হয়না,এমন তো কথা নেই! চকা-চকী আলোর পাখী যখন রাত এল তখন চকী ডেকে বল্লে চকাকে—"সাঁঝ পড়ে দিন বীতয়ে চকরী দীন্‌হ্যারোয়, চল চকবা বা দেশকো, যঁহা রৈন ন হোয়"—যেখানে রাত্রি নেই সেখানে চলো ও চক্রবাক্! বিহঙ্গ চাইলে আলোর উৎসব অফুরন্ত থাক্, রাত যেন আর না আসে, পতঙ্গ মলো গিয়ে পুড়ে দেয়ালীর উৎসব পরিপূর্ণ করে তুলতে চেয়ে। চকা-চকী যা চাইলে সেই ভাবের পরিপূর্ণতা দিনের মধ্যে নেই, পতঙ্গ যেভাবে আত্মসমর্পণ করে তার ভালবাসার পাত্র পরিপূর্ণ করে যায় তাকে তো ঠিক উৎসব বলতে আমরা রাজি হবো না "উৎসর্গ" বলে যতক্ষণ অভিধান ওটাকে লিখছে! বর্ষার উৎসব জলে ডুবে মরে অনেক জীব জন্তু গাছ পালা করছে, সেটাকে উৎসব বলিনে কেউ—কিন্তু ভাবতে গেলে ঐ তো—পূর্ণ মিলন,আপনাকে সম্পূর্ণ হারিয়ে দিয়ে লোপ করে দিয়ে! সত্যি কথা হচ্ছে সূর্য্যের আলো যেমন অসহ্য লাগে চোখে পর্দ্দার মধ্যে দিয়ে না আসলে, তেমনি অসহ্য পরিপূর্ণতা বলে বস্তুটি সে পুড়িয়ে ফেলে রূপকে যখন এনে রূপে লাগে জ্বালিয়ে দেয় সব রং সবদিকের!

পরিপূর্ণতার আলিঙ্গন রূঢ় দুঃসহ, বহুদূর থেকে একটুখানি তার রূপের আঁচ পেয়ে সুন্দর হল এই সৃষ্টি সত্য কথা কিন্তু সেই পরিপূর্ণ এসে পড়ুক একটু দেখি কাছে অমনি তার প্রলয় নিশ্বাসে কাঁপতে থাকবে নিজের প্রাণের সঙ্গে বিশ্বচ্ছবি। পরিপূর্ণতার নেশায় ভোঁ হয়ে রইলো যে তার কাছে থেকেও থাকলো না, Perfect beauty perfect drunkenness! মাতলামির perfection হল যখন পেয়ালায় কি বোতলে কি আছে দেখাও গেল না জানাও গেল না—সেই মুহূর্ত্ত কিন্তু সুন্দর মুহূর্ত্ত নয় বাঞ্ছনীয়ও নয়। ঐ যে হাফেজ বলেছেন "In the cup we have beheld the reflection of the beloved" এই ভাবে পূর্ণ সুন্দরকে পাওয়া হলে সুন্দর করে পাওয়া, পান উৎসব চলে এ হলে, একেই বল্লেন হাফেজ "The joy of perpetual wine drinking" নিত্য-রসকে অনিত্য পাত্রে ধরে পান উৎসব। চাঁদনী রাতে বাড়ির ছাতে কবি কালিদাস থেকে রসিক মাত্রেরই বাঞ্ছনীয় হল পূর্ণিমার এই রকম পূর্ণ উৎসবের আয়োজন কিন্তু এখন আমাদের ধাতে এটা তো সইবে না, সুতরাং আবার খাবোর ছাঁচে ছাপ-মারা perfect সন্দেশ চাঁদের জায়গা অধিকার করতে চল্লো—আপনার গোলের পরিপূর্ণতার ফাঁদে সে সব বিষয়ে পরিপূর্ণতার লোভীদের টেনে নিয়ে চল্লো আপনার দিকে, এটাতে ভুল নেই! বিজলী বাতির পরিষ্কার আলোতে দেয়ালী পিদুমকে দূর ছাই করে তাড়িয়েছে, পূর্ণচন্দ্রের আলোকেরও কলঙ্ক ঘোষণা করতে সুরু করেছে, উৎসবের মাত্রা আমাদের পরিপূর্ণ হবার আর দেরী নেই! কবিওয়ালা ছবিওয়ালা সব পাগল গুলো কিন্তু যায় কোথা, কি-বা করে এরা? এরা তো এভাবে পূর্ণ শোভাকে চায় না, কাযেই যেখানে সব কবি সব ছবি মিলে তিমিরাভিসারে বেরিয়েছে সেইখানেই যায় তারা অমাবস্যার পূর্ণিমার উৎসব লাগায় গিয়ে! আমাদের থেকে দূরে উল্টো আসরে গিয়ে বসে বলে তারা—

তিমির সাঁঝকা গহিরা আবৈ
ছাবৈ প্রেম মন তনমে"
পশ্চিম দিসকী খিড়কী খোলে
ডুবহু প্রেম গগন মে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল, প্রেমের গভীর অন্ধকার তনু-মনকে ছেয়ে ফেল্লে সেই পশ্চিমের খিড়কী খুলে চাও—যেদিকে আলো ডুবলো, সেই অন্ধকার আকাশের তলায় প্রেম-সাগরে ডুব দাও যেখানে সিন্ধুজলে পদ্ম ফুটেছে—

চেত-কমলে দল রস পিয়োরে
লহর লেহু যা তনমেঁ

অন্ধকার সমুদ্রে যে চিত্ত-কমল ফুটলো তারি রস পান কর, সারা দেহে অন্ধকারের ঢেউ স্পর্শ করিয়ে শীতল হও নির্ম্মল হও, তিমিরাভিসারে বেরিয়ে চল সিন্ধু-পারে সেখানে আরতি আর উৎসব চলেছে—

শংখ ঘণ্ট সহনাই বাজৈ
শোভা সিন্ধ মহল মেঁ।

শঙ্খ বাজছে ঘণ্টা পড়ছে শোভার অন্ত নেই সেই অন্ধকারের আসরে সিন্ধুপুরে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৃত-প্রিয়া

কাল রাতে সে স্বপ্নে আবার দাঁড়িয়েছিল এসে,
তেমনি করে'—তেমনি মলিন হেসে!
মুখখানি তার ছোট-বেলার মত,
নতুন-বিয়ের বধূর মতন নত,
শিশির-ধোয়া ফলটি যেমন—অশ্রুজলে মাজা
গাল দুখানি তেমনি নিটোল তাজা!
দাঁড়াল সে জানালাটিতে এসে,
স্বভাব-সরল বালা-বধূর বেশে!

দুই হাতে তার মুখটি তুলে' ধরে'
দিলাম শুধু দৃষ্টি-চুমায় ভরে'।
চোখের কোনায় ঘুমের কাজল টানা,
ঘরের ভিতর আসতে যেন মানা,
ইচ্ছাটি তার—বাঁধি বাহুর ডোরে,
আমি কেবল মুখটি দিলাম দৃষ্টি-চুমায় ভরে'।

যাবার বেলায় শেষ-বিদায়ের রূপটি সে ত' নয়!—
সে যে আরো অনেক বয়স—অধিক পরিচয়!
এ যেন সেই আদর-চাওয়া নিত্য-অভিমানী
প্রথম-প্রেমের ফুল-ফাগুনের সোহাগ-সুখের রাণী!
এ যেন সেই কিশোর-কালের বৃন্দাবনের সাথী,
—ভরা-দুপুর ছিল যখন পূর্ণিমারি রাতি!
ছিল যখন বুকের মাণিক বাহুর হারে গাঁথা,
গাল দুখানি ধরলে হাতে বুজ্‌ত চোখের পাতা!
মুখখানিতে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে-ওঠা একটু অনাদরে,—
ফুট্‌ত হাসি তেমনি আবার একটি চুমার পরে!
এ যেন সেই দীঘির জলে সকালবেলার ফুল,
বোঁটায় যেন ভার সহে না—পাপ্‌ড়িতে আকুল!

চাঁদ ছিল না, বোধ হয় যেন শুধুই তারা জ্বলে—
স্বপন-সাঁঝের আলো-ছায়ার তলে
চেয়ে মুখের পানে—

এত কাছে—এত আপন!—প্রাণের পরিচয়!
তবু যেন আমার সে নয় নয়!
তারে যেন হারিয়ে গেছি, আর পাব না ফিরে'—
সে যেন কোন্ পরদেশিনী—আর এক সাগর-তীরে,
কোন্ সে মহারহস্য-মন্দিরে
বাস করে সে একাকিনী—বল্‌তে আছে মানা,
আমার সে যে নিতান্ত অজানা!

কইলে শুধু একটি কথা—কণ্ঠ যেমন মধুর,
তেমনি করুণ বুক-ফাটা সুর অভিমানী বধূর!—
আদর করে' হাত দুখানি হাতের মুঠায় ভরে'
জিজ্ঞাসিলাম, "হাঁগো, তুমি এলে কেমন করে'?"—
চোখ নামিয়ে মাটির পানে চেয়ে,
বল্‌লে যেন কতই ব্যথা পেয়ে—
"এসেছি যা' করে'!"
—কান্নাতে তার কণ্ঠ এল ভরে'!
আমি যেন কতই নিঠুর, কতই উদাসীন—
একটি বারও দেখতে তারে চাইনি এতদিন,
তারি যেন একার জ্বালা—তারি যেন মরণ!
টান্‌তে গেলাম বুকের কাছে—হয় না যে আর স্মরণ!

* * * *

হঠাৎ গেল ঘুমটি ভেঙে, রাত্রি তখন অনেক—
বাইরে এসে আকাশ পানে রইনু চেয়ে ক্ষণেক;
মনে হ'ল এই ছিল সে দাঁড়িয়ে আমার পাশে,
এখনো তার কথার আভাস কাণে আমার আসে!
কৃষ্ণা রাত্রি—মাথার উপর মস্ত শামিয়ানা—
সোনার-কুচি-ছিটিয়ে-বোনা কালো কাপড়খানা!
তারি তলায় বিজন অন্ধকারে,
দুটি কথা চুপি-চুপি বলিই যদি তারে—
শুন্‌তে দেবে নাকি?
মৃত্যুপুরীর প্রহরীদের ঢুল্‌তেছে না আঁখি
এমন গভীর নীরব নিশুত রাতে?

চায় যদি সে একটি পলক
সরিয়ে দিয়ে আঁধার-অলক,
সেবারের সেই ছাল্‌না-তলায় শুভ-দৃষ্টির মত !—
বাণীটি তার বাজ্‌বে নাকি গহন-রাতির বীণায় অনাহত ?
হ'লই বা সে অনেক দূরের
একটুখানি বাঁশির সুরের —
ঝর্ণা-ঝরার—শব্দ যেন সুদূর-পরাহত !
তারায় তারায় পৌঁছে দেবে চোখের চিঠিখানি—
অকূল হতে আকুল-করা কাতর দিঠিখানি !

ওগো, তোমায় পথ খুঁজে আর আস্‌তে হবে নাক,'
যেথায় থাকো, ঘুমিয়ে তুমি থাকো !
স্মরণ-শিখায় প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে,
বছর পরে বছর ঠেলে-ঠেলে,
পৌঁছব যে তোমার ঘরে আমি—
সেদিনের সেই চার-চোখেতে প্রথম-চাওয়ার স্বামী !
জানি, তুমি আর ভুলেছ সবি—
দেহ-মনের সকল কালের ছবি,
অভিনয়ের সজ্জা যত—সব ফেলেছ খুলে,
বাঁধা-বেণী এলিয়ে এলোচুলে,
মৃত্যু-সিনান শেষে এখন পর্‌লে নিয়ে টানি'—
প্রেমের যেটি আসল বয়স তারি বসনখানি !

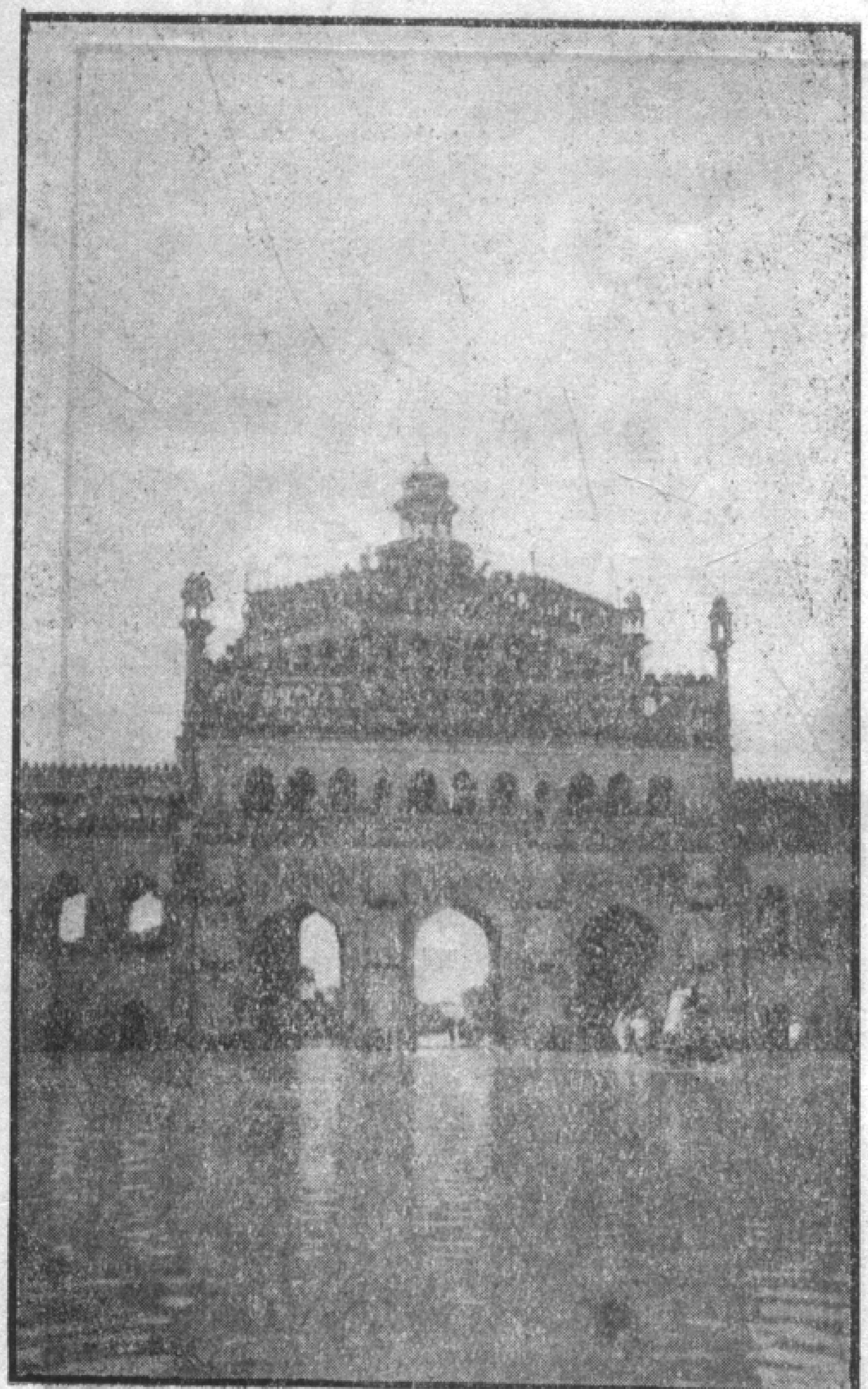
নও গৃহিণী, নও ঘরণী—সেইটি যে গো সকল ভুলের ভুল !
সংসার ত তারেই বলে—নিত্য-ঝরা পল্‌কা বোঁটার ফুল !
একটু আছে গন্ধ-মধু তাতেই করে অমর—
পরশ-মণির পরশ সে যে—বধূবরের অধর !
সেই ভরসার তরীখানি আঁধার-অভিসারে,
এপার হতে বাইব আমি তোমারি ঐ-পারে।
তোমায় আবার আন্‌তে যাব চতুর্দ্দোলায় চড়ি,'
ফুল-শয্যা যাবে আবার চাঁদের আলোয় ভরি,'
ঘোমটা-খোলা মুখখানি সে দেখেও বারম্বার
মনে হবে নূতন-দেখা, চির-চমৎকার !
যে-কথাটি বল্‌তে বাধে, লজ্জা করে কত—
বল্‌তে তবু কতই না সাধ—সেইটি অবিরত
লজ্জা-রাঙা মুখটি তোমার দুইটি হাতে তুলে,'
জিজ্ঞাসিব অধীর হয়ে, ভালোবাসার ভুলে !
সত্যিকারের সেই ক'টা দিন—চিরদিনের অতীত—
তারাই রবে সাথে সাথে—মরণ-মোহন অতিথ !
জগতটারে রাখব আমি দুয়ার হতে দূরে,
অজর হব স্মরণ-সুধায় পাত্রখানি পূরে !
নির্ভাবনায় ঘুমাও তুমি, আমার স্বপন পাঠিয়ে দেব তোমায়,
আমায় তুমি হারাওনি ত !—সিঁদুর নিয়ে গেছ
সিঁথির সীমায় !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

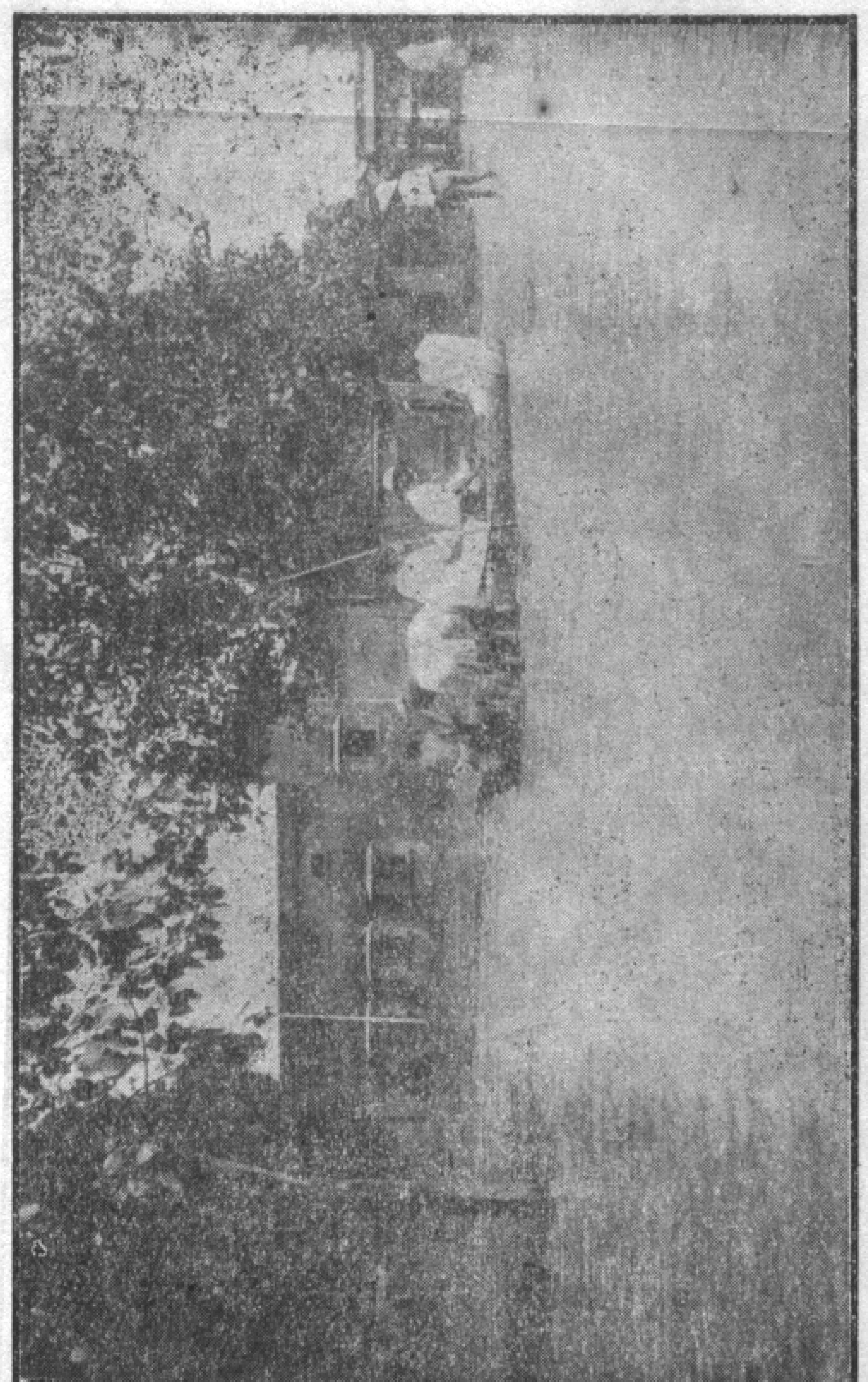
লক্ষ্ণৌ জলতলে

কিছুকাল পূর্ব্বে গোমতী নদীতে বন্যা আসে এবং তার ফলে সারা লক্ষ্ণৌ সহর জলটুঙ্গিতে পরিণত হয়। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম-স্থলে জল বাড়িয়া পূর্ব্বে একাধিক বার বন্যা আসিয়াছিল। গোমতীতেও ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে একবার ভয়ানক বন্যা হয়—সে বন্যায় নগরের প্রচুর ক্ষতি হয়। এবারের বন্যায় জল বাড়িয়াছিল সেবারের চেয়ে ঢের বেশী। সারা সহর বহুদিন জলের তলায় ছিল—ক্ষতিও হইয়াছে প্রচুর। বন্যার কয়েকখানি ছবি অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।



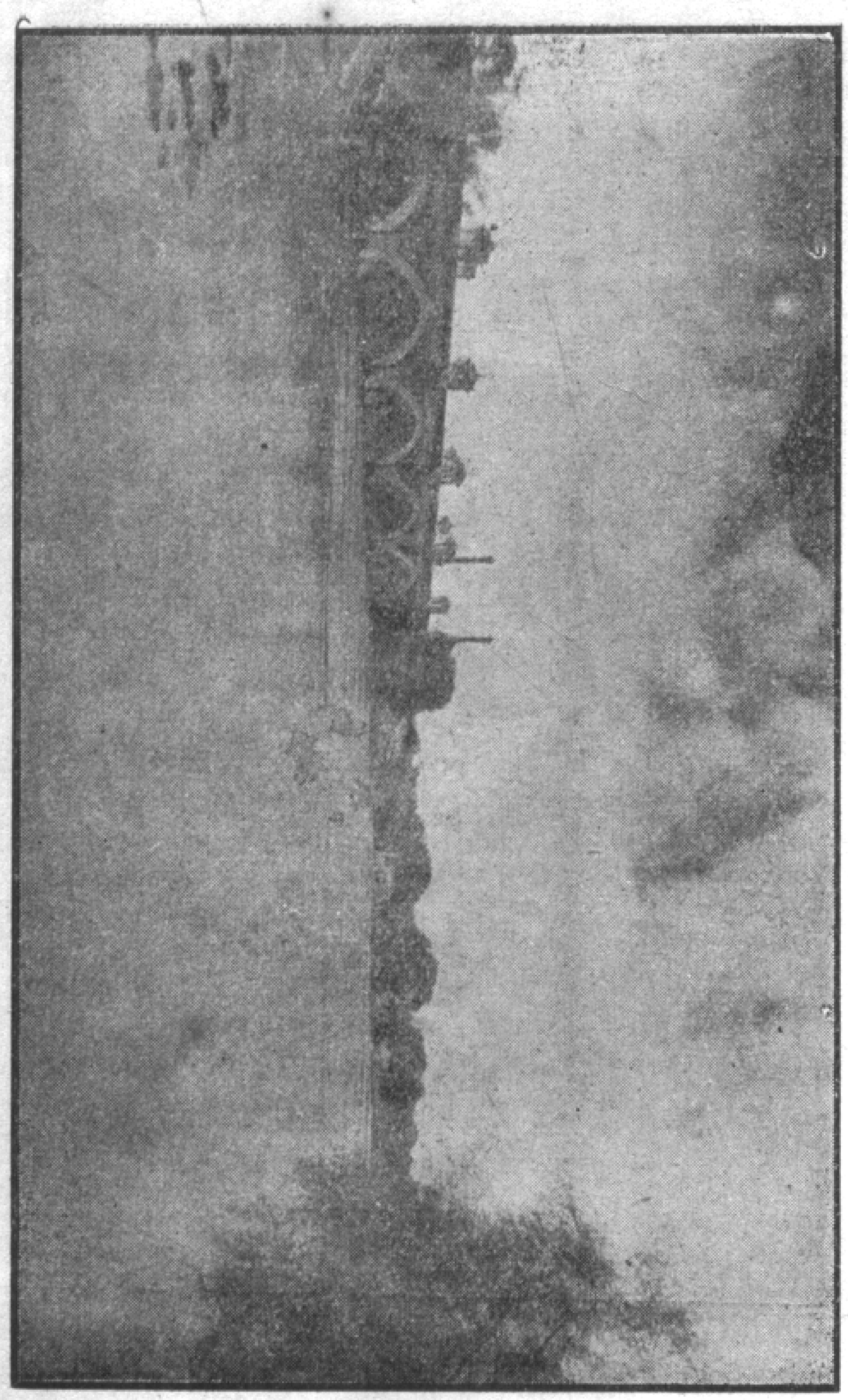
রুমী ফটক



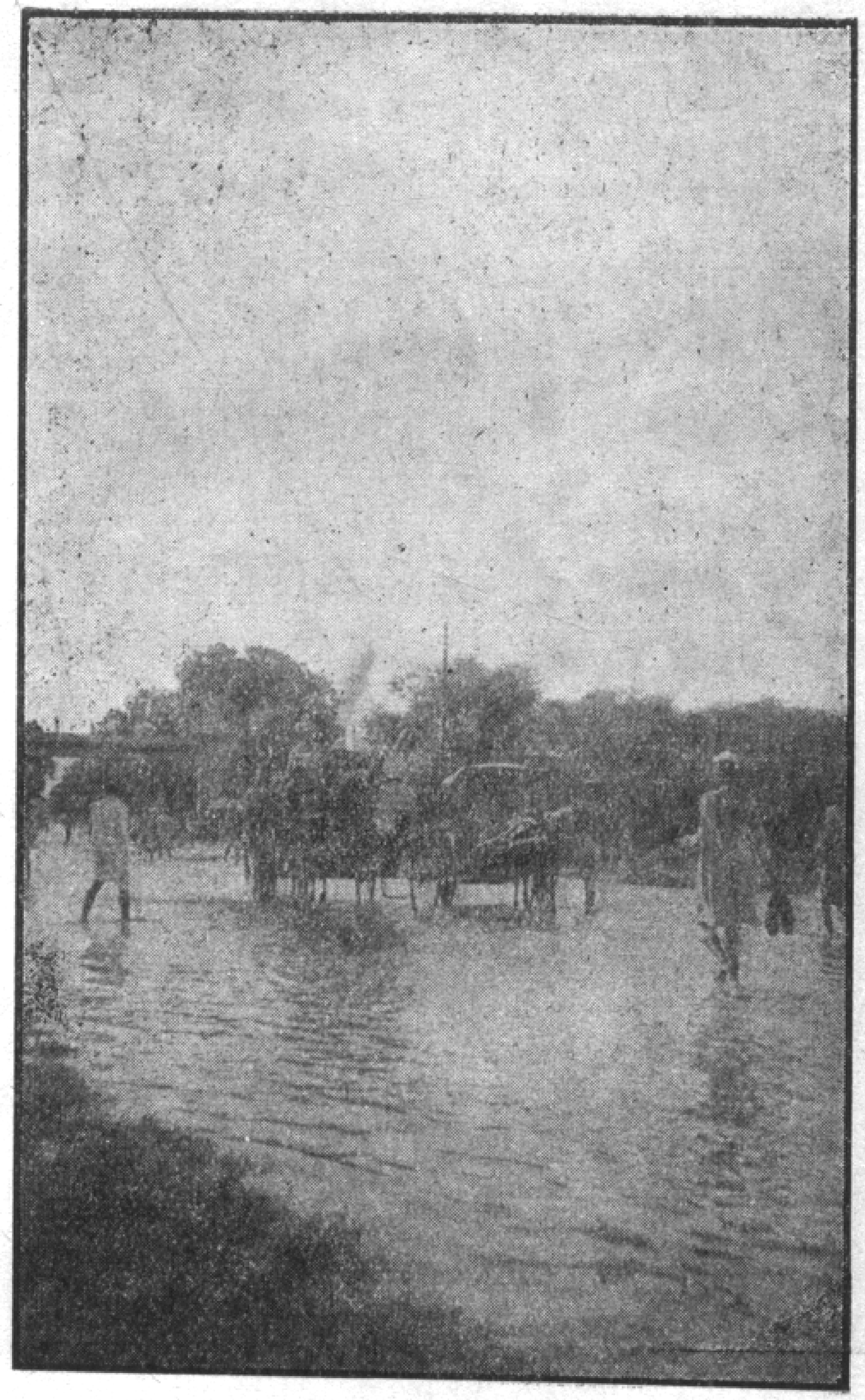
হোষ্টেল-প্রাঙ্গণ



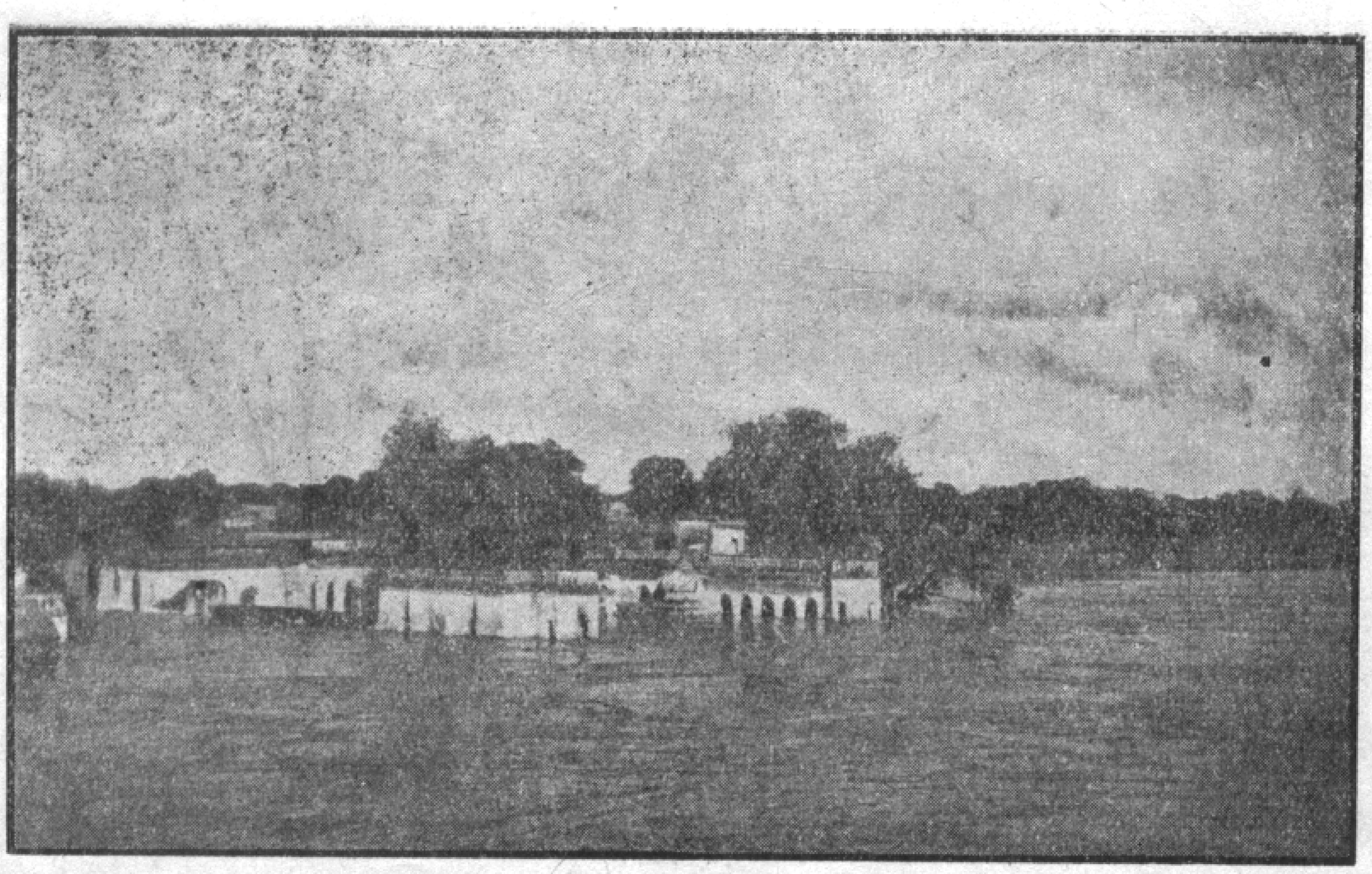
হোষ্টেল



মেডিকেল কলেজের পুল



মচ্ছীভবন রোড্



লৌহ-সেতু—পার্শ্বে মন্দির

অনুক্রম

(উপন্যাস)

মৃদু-মধুর হাসিয়া সে বলিল, "বেশ তো, আমি না হয় যাবই না।" তখন সকলে বলিয়া উঠিল, "সে কি হয়, সে না গেলে সেদিন যাওয়াই বৃথা।" মণিকা তখন মনে মনে একটু রাগিয়াছিল; সে বলিল যে, সে কিছুতেই যাইবে না। হারাণ বিপদ বুঝিয়া বলিয়া বসিল, "তবে না হয় আজকে বায়োস্কোপে গিয়ে কাজ নেই, আজ এইখানেই গল্প করা যাক।" বেবি বেচারা সারাটা দিন বায়োস্কোপে যাইবার ভরসায় বসিয়া ছিল; যাওয়া হইবে না শুনিয়া তাহার মুখখানা কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল। অনুপম এক কোণে বসিয়াছিল, সে এইবার বলিল, "আপনারা যাবেন না কেন? সবাই যান্, আমি যাব না।" এমন সময়ে মাসি-মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে, তোরা এখনো যাস্ নে? আবার কুয়াশা আসছে, এখুনি বৃষ্টি আরম্ভ হবে।" বেবি ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "মাসি-মা, দিদি নেড়া-দাদার সঙ্গে ঝগড়া করেছে, এখন কেউ যাবে না, বলছে।" বেবির অবস্থা দেখিয়া মাসি-মা বলিলেন, "যাবি নে কি রে? টিকিট কিনেছিস, সব সেজে-গুজে বসে আছিস, এখন যাবি নে কি! হল কি রে নেড়া?" অনুপম আর লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিল না, তাহা দেখিয়া মাসি-মা বলিলেন, "সব বাঁদ্‌রামো তোদের! শীগ্‌গির ওঠ, এখুনি বৃষ্টি আসবে, ওঠ্ নেড়া, ওঠ্।" অনুপম উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিল, বেবি নাচিতে লাগিল। সকলকে বাড়ীর বাহির করিয়া মাসি-মা যখন দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন উচ্চহাস্যে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

থিয়েটারে গিয়া অনুপম একটি কোণে বসিল, হারু বা ধীরেন তাহাকে সরাইতে পারিল না। সমস্ত ক্ষণ সে এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বায়োস্কোপ শেষ হইয়া গেলে হারু ধীরেনকে বলিল, "ধীরু-দা, নেড়াটা ক্রমশ

ধীরেন্দ্র শান্ত মানুষ, সে জানিত যে, এখন অনুপমের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেই সে আগুনের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, সুতরাং সে চুপ করিয়া গেল। তখন মণিমালিনী অনুপমকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৃষ্টি আস্‌ছে কি?" কথাটা সে যেন শুনিতেই পায় নাই, এমনি ভাব দেখাইয়া অনুপম বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন বেশ জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, থিয়েটারের লোক বাহিরে যাইতে পারিতেছে না। একটু পরে মণিমালিনী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "অনুপম বাবু, বৃষ্টি কি জোরে পড়ছে?" অনুপম তখন বাধ্য হইয়া বলিল, "ওঃ, তাই তো, আপনি দেখতে পান নি বুঝি? বৃষ্টি পড়ছে বৈ কি!" মণি তখন মুখখানা ছোট করিয়া সুমতিকে বলিল, "কি কোরে বাড়ী যাব ভাই?" এ বৃষ্টি তো আমাদের ছাতায় আটকাবে না। গায়ে না হয় বর্ষাতি আছে, কিন্তু মাথাগুলো?" বলিয়াই মণি হাসিয়া ফেলিল; আর সঙ্গে সঙ্গে সে হাসিটা সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইল। হারাণ তখন তাড়াতাড়ি নিজের ছাতাটা খুলিয়া মণির হাতে দিয়া বলিল, "এই যে এই ছাতাটা বড় আছে।" মণি ছাতাটা সুমতিকে দিয়া বলিল, "হারু-দা, আমরা যে তিনজন, বড় ছাতা তো মোটে একটা!" অনুপম তখন ফুল্লনলিনীর কাছে গিয়া বলিল, "আমার ছাতাটা আপনি নেবেন কি?" তাহা শুনিয়া মণি ধীরেনের হাত হইতে ছাতাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "ধীরু-দা, আমি তবে আপনার ছাতাটাই নিলুম।" ধীরেন হাসিয়াই আকুল হইল।

বর্ষাতির ভিতর বেবিকে লইয়া মণি ছাতা মাথায় দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল, সুমতি আর ফুল্ল তাহার পিছন-পিছন চলিল। মেয়েদের তিনটি ছোট ছাতা মাথায় দিয়া ধীরেন, অনুপম আর হারাণ সকলের পিছনে চলিল একটুখানি চলিয়াই মণি হাঁফাইয়া পড়িল, তাহা দেখিয়া

মেয়েদের পাশ কাটাইয়া মণির হাত হইতে ছাতাটা কাড়িয়া লইয়া তাহার মাথার উপরে ধরিল। মণি এতই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে আর কোন আপত্তি না করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ পরে বেবি বলিয়া উঠিল, "নেড়া-দা, তুমি কি নিষ্ঠুর!" অনুপম আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রে?"

"মণি-দিদির হাত যে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে! আমি এখন বড় হয়েছি কি না, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না?"

অনুপম তাড়াতাড়ি বেবিকে কোলে লইল, তখন মণিমালিনীর হাতখানা অবশ হইয়া আসিয়াছিল, বেবিকে সরাইয়া লইতেই হাতখানা পড়িয়া গেল। অনুপম বিশেষ লজ্জিত হইল।

বেবি বড় দুষ্ট, সে অনুপমের কোলে উঠিয়াই চেঁচাইয়া উঠিল, "উহুহু, ভিজে গেলুম যে নেড়া-দা!"

বেচারা অনুপম স্কুলের ছোট্ট ছাতাটি দিয়া যথাসম্ভব বেবিকেই বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছিল, সুতরাং দুই-এক ফোঁটা জল ছাড়া তাহার অঙ্গে আর কিছু পড়ে নাই। হারাণ আসিয়া অনুপমকে বলিল, "নিজের মাথায় ছাতা দিয়ে মেয়েটাকে ভেজাচ্ছিস!"

হারাণের মিথ্যা অভিযোগ শুনিয়া অনুপম কথা কহিতে পারিল না, ধীরেন আর হারাণ তাহাদের হাতের ছোট ছাতা দুটিও বেবির মাথার উপরে ধরিল। এমনি করিয়া দলটি বাড়ী ফিরিল, তখন বৃষ্টি ছাড়িয়াছে, একখণ্ড শাদা মেঘের অন্তরালে চন্দ্রকলা দেখা দিয়াছে।

বৃষ্টিতে ভিজিয়া আসার জন্য মেয়েদের একদফা বকিয়া মাসি-মা যখন অনুপমের দিকে চাহিলেন, তখন তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। বেবি তখন আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে শুনাইতেছিল যে, কেমন করিয়া সে একা তিন-তিনটা ছাতা মাথায় দিয়া আসিয়াছে আর সেই সঙ্গে নেড়া-দা, হারু-দা আর ধীরেন-দাকে বোকা বানাইয়াছে।

মাসি-মা অনুপমের ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া তাহাকে এক পেয়ালা চা খাওয়াইতে ব্যস্ত হইলেন। এই সময়ে মণি আসিয়া বলিল, "মাসি-মা, দেখুন না এই হাতটায় তখন

মাসি-মা কারণ জিজ্ঞাসা করায় মণিমালিনী তাঁহাকে জানাইল যে, বেবিকে কোলে করিয়া অনেকক্ষণ থাকার জন্য হাত ধরিয়া গিয়াছে।

"ও কিছু না, একটু পরে সেরে যাবে।"

কাপড় ছাড়িয়া মাথা মুছিয়া চা খাইয়া তিন বন্ধু যখন বাহির হইল, তখন বৃষ্টি ছাড়িয়া গিয়াছে। দুয়ারের বাহিরে আসিয়া অনুপম শুনিতে পাইল, মণিমালিনী বলিতেছে, "মাসি-মা, হাতটা যে এখনো ছাড়লো না?"

ফিরিবার সময় সেই চিন্তাটাই অনুপমের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। বাসায় ফিরিয়া অনুপম বসিল না, নিজের ঘর হইতে একটা ঔষধ লইয়া সে তখনই বাহির হইয়া গেল, মেসের লোক কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। পথে যাইতে যাইতে আবার বৃষ্টি আসিল, সঙ্গে সঙ্গে বাতাস উঠিল। জলের ঝাপটায় অনুপমের কাপড় ভিজিয়া গেল। সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া সে উঠিতে আরম্ভ করিল। অনুতাপে আর আত্মগ্লানিতে তাহার মন ভরিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, কেন সে মণিমালিনীর কোলে বেবিকে উঠিতে দিয়াছিল। এই সময়ে হঠাৎ পাহাড়ের গায়ের বৈদ্যুতিক আলোগুলা নিভিয়া গেল, অনুপম আরো বিপদে পড়িল। সে অনেক কষ্টে অন্ধকারে পথ চিনিয়া বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেখিল, সমস্ত দুয়ার বন্ধ, বাড়ীর সব আলো নিভিয়া গিয়াছে। সে একবার ভাবিল, মাসি-মাকে ডাকিয়া উঠাইবে। তাহার পরেই মনে ভাবিল, মাসি-মা কি মনে করিবেন?

অনেকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া অনুপম বাড়ী ফিরিয়া আসাই উচিত মনে করিল এবং অন্ধকার পথে ভিজিতে ভিজিতে রাত্রি একটার সময়ে মেসে ফিরিয়া আসিল।

২

"কি হে নেড়াবাবু, একটা কথা নিবেদন করব কি? বুড়ো হয়েছি, এখন কি আর কথা কানে উঠবে?"

অনুপম ভয়ে জড়সড় হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে, কি বলছেন কাকা?

এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানোটা কি উচিত বাপু? তবে একটা রাত্তির পর্য্যন্ত বাড়ী ফের না কেন, বাপু?"

"কাল বায়োস্কোপ দেখতে গিয়েছিলুম, কাকা।"

"সে তো সন্ধ্যাবেলায়, তারপরে কোথায় ছিলে, বাপু?"

"তারপর—তারপর—একটা নেমন্তন্ন ছিল কাকা।"

"রাত্তির একটা পর্য্যন্ত কোথায় নেমন্তন্ন ছিল, বাপু?"

অনুপম মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল। বিশ্বনাথ খুড়া বলিলেন, "মাথা চুলকুলেই কি নাম খুঁজে পাবে বাপু?"

অনুপম উত্তর দিল না, সুতরাং রায় মহাশয় বলিয়াই চলিলেন, "দেখ বাপু, তোমরা কি মনে কর যে, বাপ-খুড়োগুলো একেবারে বুড়ো হয়ে জন্মেছিল? আমাদেরও কাল ছিল, বুঝলে বাপু! এমন একদিন ছিল, যখন তোমার এই বুড়ো বিশ্বনাথ খুড়োকে দেখলে লোকের মাথা ঘুরে যেতো। একবার শান্তিপুরে, বুঝলে কি না—"

ধীরেন কোন্ সময়ে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা অনুপম বা বিশ্বনাথ কেহই দেখিতে পায় নাই। সে এই সময় বলিয়া উঠিল, "বলুন তো কাকা সেই শান্তিপুরের রাসের মেলায় কি হয়েছিল?"

বিশ্বনাথ রায় ধীরেনের উপর বড়ই সন্তুষ্ট; তিনি বলিলেন, "এসেছো ইঁচড়ে-পাকা ছেলেটি? রাসের কথাটির উপর তোমার এত টান কেন বাপু?"

"কথাটা কত বড় কথা কাকা, শুনলে আমাদের বুকের ছাতি কত বড় হয়! আপনি আমাদের কাকা, আপনার জন্য শান্তিপুরের রাসের মেলার মত প্রকাণ্ড মেলায় কি কাণ্ডটা হয়েছিল বলুন দেখি?"

তখনই ভক্তের পূজায় প্রীত হইয়া ভক্তবৎসল বিশ্বনাথ বলিয়া উঠিলেন, "বটেই তো বাপ ধীরু, হবারই তো কথা বটে। কি জানিস, তখন তো চুল ছোট করে কাটা ফ্যাসান হয় নি। তখন তোর এই বিশু কাকার মাথার চুলগুলো পিঠ অবধি ছেয়ে পড়তো! আর শরীরটি ছিল কেমন, যেন ঠিক কার্ত্তিকের মত। সেটা বাঙ্গালা ১২৬২ সাল, তখনো রেল হয় নি। আমার বয়েস তখন এই ষোল সতের, অমন বাব্‌রি-কাটা চুল, কাঁচা হলুদের মত রং, কার্ত্তিকের মত গড়ন দেখে দু'ধারি লোক ঝুঁকে পড়লো; লোকে মেলা দেখবে কি নিশু রায়ের ব্যাটা বিশু রায়কে দেখবে—ঠিক করতে পারে না। বিশেষ ভিড় মেয়ে-মানুষের, কোনও রকম করে ভিড় ঠেলে আমার বাপ-খুড়ো আমায় বাসায় নিয়ে গেলেন। সে বৎসর আর আমার রাসই দেখা হল না। কি দিন কি রাত্তির একপাল মাগী আমায় দেখবার জন্য বাসাটি ঘিরে বসে থাকতো। সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, একপাল তীর্থকাকের জন্যে বাসার বার হবার জো'টি নেই!"

ধীরেন মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা বটেই তো, তা বটেই তো!"

বিশুকাকা বলিলেন, "ছেলে যদি হতে হয় তাহলে ধীরু-বাবার মত যেন হয়।"

অনুপম বিশ্বনাথ কাকার বক্তৃতার গোড়াতেই সরিয়া পড়িয়াছিল! শান্তিপুর-লীলা বর্ণনা শেষ হইলেই বিশু খুড়ার মনে পড়িয়া গেল যে, অনুপমকে একটি কথা বলা হয় নাই! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা ধীরু, নেড়া বাবাজী বুঝি সরে পড়েছেন?" এদিক-ওদিক দেখিয়া আসিয়া ধীরেন বলিল, "নেড়া বোধ হয় বেরিয়েই গেল, কাকা। কিন্তু সে আর একদিন কি হয়েছিল, যেদিন বাঘের সঙ্গে—" বিশ্বনাথ রায় উঠিয়া বলিলেন, "ধীরু, তুমি ছেলেটি বড় শান্ত, নেড়াটা ভীষণ পাজি আর বাদশা-বখা। তার বাপ একখানা চিঠি লিখেছে, সেইখানা তাকে পড়ে শোনাব, না, বাবাজী অন্তর্দ্ধান! বিষম এঁচড়ে পাকা হয়ে উঠেছে ছেলেটা। দেখ তো কতদূর গেল?"

ধীরেন গম্ভীরভাবে বলিল, "তা চিঠিখানা আমার কাছেই দিন না! সে হয়তো ওয়েষ্টপয়েণ্ট অবধি চলে গেল, আমি মোটা মানুষ তার সঙ্গে কি ছুটে উঠতে পারবো?"

বিশু কাকা চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "হাঁরে ধীরু, তোরা বলিস কি! এই বিশু কাকার যখন বয়স ছিল, তখন তিনবার বিনে কারণে জলাপাহাড় উঠেছি আর নেমেছি! আর তুই দুধের ছেলে, বলিস্ কি না, ওয়েষ্ট-পয়েণ্ট অবধি চলতে পারবি নে।"

ধীরেন বেচারা বিপদে পড়িয়া বলিল, "তাই কি বলছি, কাকা? এই মিত্র-বাড়ীর ছোট কাকী কাল কি ব্রত করেছিলেন, সেইজন্তে সকাল বেলার জলপান করবার জন্ত ডেকেছিলেন, তা নইলে নেড়া কি আমার সঙ্গে ছুটে উঠতে পারে! এই রসগোল্লাটা—"

"সে কথাটা আমায় এতক্ষণ বলতে হয়, বাপু! বুড়ো হয়েছি বটে কিন্তু এখনো দশ ক্রোশ রাস্তা মারতে পারি। অকাল-কুষ্মাণ্ড কোথাকার দুটো রসগোল্লা খেয়েছিস, তাতে হয়েছে কি? যখন তোর বিশু খুড়োর কাল ছিল, তখন একটি পেট ফলারের পরে এক কুড়ি বোম্বাই আম আর আড়াই সেরা এক পাতিলে বেলডাঙ্গার ক্ষীর, আর তার পর বেলডাঙ্গা থেকে সটান গোরা-বাজার অবধি পাড়ি!"

ধীরেন বলিল, "তা বটেই তো, তা বটেই তো।" তখনটা তিনি নেড়ার অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া বসিয়া পড়িলেন। ধীরেন সময় বুঝিয়া বলিল, "তবে চিঠিখানা দিন্ কাকা, বেলা হয়ে গেল, আমায় আবার একবার বাজারে যেতে হবে।"

হঠাৎ বিশু কাকার মনে পড়িয়া গেল যে, অনুপম কেন ওয়েষ্টপয়েণ্টে গেল, সে কথা ধীরেন জানে, তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "একটু বসো বাবা, একটু বসো। আচ্ছা ধীরেন, নেড়া ওয়েষ্টপয়েণ্টে কোথায় গেল?"

ধীরেন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "কপি কিনতে গেছে, কাকা। কাল হাট কি না!"

"হাটে কি কপি বেচবে?"

"না, না, তা কেন? তার এক বন্ধুকে কপি পাঠাবে।"

"বাপু হে, এমন এঁচড়ে পাকা ছেলে তো আর দেখা যায় না। বন্ধুকে কপি পাঠাবে, তা বাজারে না কিনে এই বৃষ্টি মাথায় করে তিন ক্রোশ রাস্তা হেঁটে যাবার দরকার কি?"

"জানেন তো কাকা, তার স্বভাব কি রকম, কি করে বন্ধুর দু'পয়সা খরচ কম হবে, সেই চেষ্টায় এই বৃষ্টি মাথায় করে তিন ক্রোশ পথ হেঁটে গেছে।"

"চুলোয় যাক। এই চিঠিখান তবে তুমিই নিয়ে যাও।"

বাড়ীর বাহির হইয়া ধীরেন দেখিল যে, অনুপম পাশের বাড়ীতে বসিয়া আছে। দুই বন্ধুতে উপরে উঠিয়া এক বাঙ্গালীর দোকানে বসিয়া গেল। চিঠি পড়িয়া অনুপমের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। ধীরেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে?"

অনুপম উত্তর না দিয়া চিঠিখানা তাহার হাতে দিল। ধীরেন পড়িল—

নবদ্বীপ
২৯শে শ্রাবণ, ১৩২৫

চিরজীবেষু

ভায়াহে, অত্রপত্রে আশার্ব্বাদ জানিবে। অনেকদিন দেখিয়া শুনিয়া শ্রীমান্ অনুপমের জন্য একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান করিয়াছি। মেয়েটি ছোট, বয়স আট-নয়, কিন্তু শ্রীমানের সঙ্গে বড় সুন্দর মানাইবে। তাহার বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে মত জানিয়া আমাকে লিখিবে ও তাহাকে এই পত্র দেখাইবে। তাহার মনের ভাব না জানিতে পারিলে কন্যা আশীর্ব্বাদ করিতে পারিব না, জানিবে। যশ বাহাদুর এই মাসে ২৮৵৫ সুদ দিবে। আদায় করিতে যেন ভুল না হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

স্রোতের জলে তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে মণি-মালিনী দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়াছিল। এই তাহার প্রথম আশ্রয়। এই আশ্রয়-হীনা রমণী তাহার স্বভাবের গুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সারা শহরটা জয় করিয়া ফেলিয়াছিল। এমন লোক শহরে ছিল না যে তাহাকে চিনিত না, এমন দুঃখী-দরিদ্র ছিল না যে দুই হাত তুলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিত না। মণিমালিনী মেয়ে-স্কুলে শিক্ষয়িত্রী হইয়া আসিয়াছিল এবং স্থানাভাবে বৃদ্ধা মিসেস মজুমদারের গৃহে দুইদিনের জন্য আশ্রয় লইয়াছিল। মিসেস মজুমদার সর্ব্বপ্রথমে তাহাকে চিনিয়াছিলেন, আর ছাড়েন নাই। মণিমালিনীকে পাইয়া বৃদ্ধার স্নিগ্ধ শান্ত তপোবনের মত গৃহটি যেন জনপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সংসারে তাঁহার দুইটি কন্যা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। তাহার মধ্যে বড় মেয়ে বিবাহ করিয়া শ্বশুর-ঘর করিতে

গিয়াছিল, অবশিষ্ট ছিল শিশু বেবি। মণিমালিনী সকালে-বিকালে চিকিৎসা করিত, দিনের বেলায় শিক্ষা দিত আর দরকার হইলে রাত্রে রোগীর সেবা করিত। সংসারে বোধ হয় তাহার কেহ ছিল না, কারণ দুই-একজন সহপাঠী ভিন্ন কেহ তাহাকে পত্র লিখিত না। সে যাহা বেতন পাইত, তাহা ঔষধ কিনিয়া খরচ করিয়া ফেলিত এবং তাহার জন্য অনেক সময়ে তাহার নিজের খরচের সঙ্কুলান হইত না।

বংশ-পরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বড় বড় চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিত, সুতরাং কেহই দ্বিতীয়বার সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে যায় নাই। মিসেস মজুমদার সকলকে বলিতেন যে, সে যখন ইচ্ছা করিয়া নিজের পরিচয় কাহাকেও জানায় নাই, তখন সে কথা জিজ্ঞাসা লাভ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া অন্য কেহ কখনও তাহার বংশ-পরিচয়ের কথা তুলিত না।

যেদিন বিশ্বনাথ খুড়া অনুপমের পিতার চিঠি দিয়া ধীরেনকে অনুপমের খোঁজ করিতে পাঠাইয়াছিলেন, সেদিন সকাল বেলায় মণি জজ-বাজার দিয়া যাইতেছিল, পথে দলে দলে নেপালী আর ভুটিয়া তাহার সহিত কথা কহিতেছিল বা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, এই সময় একটি ছোট ছেলে হঠাৎ তাহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মেম-ডাক্তার?"

মণি হাসিয়া বলিল, "আমি মেমও নই, ডাক্তারও নই, তবে পাহাড়ীরা আমাকে ঐ বলে ডাকে। তোমার কি দরকার বাবা?" ছেলেটি ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "বাবার বড় অসুখ, মা আমাকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছেন, কিন্তু সব ডাক্তার বেরিয়ে গেছে। নেপালী-ঝি বল্লে যে, মেম-ডাক্তার নিয়ে যাও।" মণি ছেলেটিকে পথের এক পার্শ্বে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবার কি হয়েছে বাবা?" ছেলেটি বলিল, "বাবার বড্ড অসুখ, মা কেবল কাঁদে, আপনি শীগ্‌গির আসুন।" আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া মণি ছেলেটির সঙ্গে চলিল। বাজার ছাড়াইয়া তাহার সহিত অনুপম ও ধীরেনের সাক্ষাৎ হইল। মণিকে দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ধীরু-দা খবর কি?" ধীরেন বলিল, "আর কি, এইবার বিয়ে!" মণি একগাল হাসিয়া বলিল, "বেশ তো নেড়া-দা, এইবার বৌদি আসবেন, তাতে এত লজ্জা কেন?" অনুপম মুখখানা ভার করিয়া বলিল, "আমি বিয়ে করবো না।" মণি হাসিয়া বলিল, "আগে সময়টা আসুক, তখন দেখা যাবে! মুখে অমন বীরত্ব সবাই দেখিয়ে থাকে।"

"দেখে নেবেন।"

"আচ্ছা, দেখেই নেবো। এখন আপনারা দু'জনে আসুন দেখি, এই ছেলেটর বাপ পীড়িত, কোথাও ডাক্তার পায় নি।"

অনুপম আর ধীরেনকে সঙ্গে করিয়া মণি কার্ট রোড ছাড়িয়া নামিয়া গেল; ষ্টেশনের নীচে একটি ছোট বাড়ীর সম্মুখে গিয়া ছেলেটি দাঁড়াইল। দুয়ারে ঘা দিতে একটি ছোট মেয়ে আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

বাড়ীর ভিতর গিয়া মণি আশ্চর্য্য হইয়া গেল বাহিরের ঘরে একখানা ভাঙ্গা টেবিলের উপরে একখানা ভাঙ্গা চেয়ার পড়িয়াছিল, ঘরের ছাদের আলোটাও ভাঙ্গা, দেখিলে বোধ হয় ঘরের ভিতর দিয়া ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ছেলেটি বাড়ীর ভিতরে গিয়া তাহার মাকে ডাকিয়া আনিল এবং মণিকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এই মেম-ডাক্তার, মা।"

তাহার মা ধীরেন আর অনুপমকে দেখিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন। মণিমালিনী তাঁহাকে অন্তরালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার অসুখ করেছে?" তিনি ভিতরে গিয়া একটি ঘর দেখাইয়া দিলেন। অনুপম আর ধীরেন সেই ঘরে গিয়া দেখিল যে, খাটের নীচে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে, মুখ লাল চোখ যেন বাহির হইয়া পড়িতেছে, মুখে অসংখ্য মাছি বসিয়াছে। রোগী দেখিয়া মণি বলিল, "ধীরু-দা, এঁকে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যান, কারণ বমি না করালে জ্ঞান হবে না।" ধীরেন তখনই ডাণ্ডি আনিতে চলিয়া গেল, অনুপম বসিয়া রহিল।

বৌটিকে একপার্শ্বে ডাকিয়া মণি রোগীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল এবং কখন হইতে এই রকম অবস্থা হইয়াছে তাহা জানিয়া লইল। ধীরেন ...

মণি সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারকে চিঠি লিখিয়া দিয়া অনুপম আর ধীরেনকে রোগীর সঙ্গে পাঠাইয়া দিল। তাহারা চলিয়া গেলে মণিমালিনী অনেকক্ষণ বসিয়া বৌটিকে শান্ত করিয়া চলিয়া গেল।

সেদিন আপিস যাইতে ধীরেন ও অনুপম—দুই জনেরই বিলম্ব হইয়া গেল এবং তাহার জন্য তাহাদিগকে একটু অপমানও সহ্য করিতে হইল। আপিস হইতে ফিরিবার পথে দুইজনেই হাসপাতালে গেল এবং দেখিল যে রোগীর পার্শ্বে মণি বসিয়া আছে। রোগীর অবস্থা তখন ভাল এবং জ্ঞান হইয়াছে। অনুপম মণিমালিনীর চোখে জল দেখিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল, অল্পক্ষণ পরে সে দেখিল যে, রোগীর চোখেও জল।

কোন মতে বিশু কাকার প্রশ্নজাল এড়াইয়া তাহারা যখন মিসেস মজুমদারের ঘরে মণিমালিনীকে খুঁজিতে গেল তখনও সে স্কুল হইতে ফিরে নাই। সেদিন বিকালে তাহার রোগীর দল তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া গেল, তখন হারাণ বলিল, "নেড়া, এ তো ভাল কথা নয়। কোথায় গেল মণি ?" ধীরেন বলিল, "তাহলে খুঁজে দেখা যাক।

সারাটা শহর খুঁজিয়া তাহারা যখন মণিমালিনীকে পাইল না তখন ধীরেন বলিল, "সকাল বেলার সেই বাড়ীটা দেখলে হয় না—যে বাড়ী থেকে রোগী হাসপাতালে গিয়েছিল ?"

তিনবন্ধু সে বাড়ীতে গিয়া দেখলে যে, ছোট ছেলেটিকে কোলে করিয়া মণি বাহিরের ঘরেই বসিয়া আছে। অনুপম আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

হারু যখন জিজ্ঞাসা করিল, "এর মানে কি ?" তখন মণি সটান সোজা বলিয়া বসিল,"কিসের মানে কি,হারু-দা ?" হারাণ বসিয়া পড়িল। তখন ধীরেন বলিল, "তুমি যে স্কুল থেকে এখানে চলে এসেছো, মণি, কাউকে তো বলে আসো নি। সেই জন্য তিন জনে সন্ধ্যে বেলা থেকে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

মণি হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই কথা ? আমি তো বেবিকে বলে এসেছি যে, আমি আজ এখানে শোব। সে বুঝি তা বলে নি ?" হারু বলিয়া উঠিল, "বেবি ছাড়া কি আর লোক ছিল না বলবার ? সে সে-কথাটি ভুলে গিয়ে খেলতে বেরিয়ে গেছলো আর মাসি-মা ভেবে আকুল হচ্ছেন।"

"মণি বলিল, "তুমি তবে মাসি-মাকে খবর দাও গে, হারুদা, আমি এদের খাইয়ে শোয়াইগে।" মণি উঠিল, কাজে কাজেই ধীরেন, হারাণ আর অনুপম বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, দুয়ার দিয়া মণি চলিয়া গেল; তখন অনুপম বলিল, "তুই যা, আমি বাসায় থাকি।"

৪

এই কয় বৎসরে এত লোক আসিয়াছে গিয়াছে কিন্তু কুমারী মণিমালিনী মুখোপাধ্যায় কখনও কাহারও সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করে নাই। কিন্তু হাসপাতালের রোগীটির উপর তাহার টান দেখিয়া শহর-সুদ্ধ লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অনেকেই অনুমান করিয়া লইল যে, এত দিনে ডাক্তার-মেমের আপন লোক পাওয়া গিয়াছে। যাহারা মণিমালিনীর কাছে উপকার পাইয়াছিল কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পায় নাই, তাহারা এইবার একটা উপায় দেখিতে পাইল। ষ্টেশনের নীচের ছোট বাড়ীটিতে লোকের অভাব হইত না, বাজারের মাছ, তরকারি লইয়া দোকানদার বাড়ীর দুয়ারে পৌছাইয়া দিত, দুই-তিন জন ভুটিয়া গোয়ালা মারামারি করিয়া দুধ যোগাইবার সম্মান-লাভ করিত,একজন লোক ডাকিলে দশজন উপস্থিত হইত। অসভ্য পাহাড়ী আর ভুটিয়াদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিয়ম অন্য রকম।

রোগীকে লইয়া যেদিন ধীরেন আর হারাণ হাসপাতাল হইতে বাড়ীতে আসিল, সেদিন ছোট বাড়ীটার সম্মুখে লোকের ভিড় আরো বাড়িয়াছিল। কারণ একদল লোক দুই-তিন জন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া বাড়ীটা দেখাইয়া দিতে আসিয়াছিল। সেদিন রবিবার, আপিস স্কুল বন্ধ, মণিমালিনী বৌটির কাছে বসিয়াছিল, অনুপম বাহিরে বসিয়াছিল, আর ধীরেন আর হারাণকে রোগী আনিতে হাসপাতালে পাঠাইয়াছিল। আগন্তুক তিনজন বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া অনুপমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ মশাই, কৃষ্ণনগরের হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাবুর কি এই বাসা ?"

অনুপম তখন আনমনে চিন্তা করিতেছিল, সুতরাং সকল কথা তাহার কানে গেল না। সে একটু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে অনুপম বলিল, "আমি ঠিক বলতে পারি নে, তবে যিনি এ বাড়ীতে থাকেন, তাঁদের বাড়ী শুনেছি কৃষ্ণনগরে।"

এই সময়ে মণি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "আসুন, আসুন, এই হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাবুর বাসা।"

অনুপম অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ছেলেটি আর মেয়েটি আসিয়া নবাগতদের জড়াইয়া ধরিল; এই সময় হারাণ আর ধীরেন রোগীকে লইয়া আসিল। রোগী তাহার আত্মীয়দের মধ্যে পৌঁছিলে মণি বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল এবং ইসারা করিয়া তিন বন্ধুকে ডাকিয়া উপরে চলিয়া গেল। আনন্দ-মিলনের সময়ে বাড়ীর লোকে তাহাদের যাওয়াটা বুঝিতে পারিল না।

কার্ট রোডে আসিয়া মণি বলিল, "নেড়া-দা, চলুন একটু দূর বেড়িয়ে আসি।" চারিজনে তাহারা ঘুমের দিকে চলিল; চলিতে চলিতে মণি মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিল, ধীরেন মোটা মানুষ তাহাতে একটু কৃতজ্ঞ হইল, কারণ অনুপম বা হারাণের সঙ্গে চলিয়া বেড়ানো তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। হঠাৎ একবার হারাণ দেখিয়া ফেলিল যে,দূরে হিমানী-মণ্ডিত সীমান্তের দিকে চাহিয়া মণি চোখ মুছিতেছে। সেবারটা মণি যখন আবার চলিতে আরম্ভ করিল, তখন হারাণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে মণি?"

মণির গলাটা ভার; সে একটু কাশিয়া বলিল, "কৈ, কিছু না।" হঠাৎ পথের ধারের পাথরের দেওয়ালের উপর বসিয়া পড়িয়া হারাণ বলিল, "আমি একটু হাঁপিয়ে পড়েছি, মণি-দিদি, একটু বসো!" ধীরেন ততক্ষণ কৃতজ্ঞতা-বিগলিত হৃদয়ে বসিয়া পড়িয়া নস্যের কৌটা বাহির করিয়াছিল. অনুপম কেবল দূরে দাঁড়াইয়াছিল। মণি ছাতাটা দেওয়ালের উপর রাখিয়া বলিল, "বেশ দিনটি।" হারাণ বলিল, "মণি-দিদি, আমার তিনটি কথার উত্তর দিতে হবে। ও কে? তোমার চোখে জল কেন? আর ওদের লোক আসতে তুমি চলে এলে কেন?" মণি প্রশ্ন শুনিয়া দেওয়ালের উপর বসিয়া পড়িল। অনুপম তখনও দূরে দাঁড়াইয়া রহিল, মণি উত্তর না দিয়া পাহাড়ের দিকে চাহিয়া রহিল। হারাণ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কই, উত্তর দিলে না মণি? সব কথার উত্তর না পেলে আমিও উঠব না, তোমাদেরও উঠতে দেব না।"

মণিমালিনী একটা বড় নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "সে-সব সত্য যুগের কথা শুনে কি হবে হারু-দা?

হারাণ ভয়ানক জেদী লোক, সে বলিল, "সত্য ত্রেতা দ্বাপর—যে যুগেরই কথা হোক, আমি শুনবোই।" মণি আবার খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। থাকিয়া থাকিয়া ধীরেন বলিল, "বলতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে, মণি?" তখন মণিমালিনীর দুই চোখ বহিয়া জলের ধারা ছুটিল, হারাণ অপ্রস্তুত হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে মণিমালিনী চোখ মুছিয়া বলিল, "হারু-দা, ঐ হরেন্দ্র আমার মামাতো ভাই। চোখে জল আসছে মা'র মুখখানি মনে পড়ে। চলে এলুম আর ওদের কাছে থাকবার দরকার নেই বলে। তোমার সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছি কিন্তু আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করো না।"

মণি কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই চলিতে আরম্ভ করিল, কাজে কাজেই তাহার সঙ্গী তিনজনও চলিতে আরম্ভ করিল। বাতাসিয়ার কাছে মেঘ করিয়া আসিল, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বর্ষাতি মুড়ি দিয়া ছাতা মাথায় চলিতে চলিতে চারিজনই ভিজিয়া গেল। ঘুম ষ্টেশনে পৌঁছিতে পৌঁছিতে চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। যখন তাহারা চারিজন আশ্রয়ে পৌঁছিল তখন সকলেই ভিজিয়া গিয়াছে। অনুপম প্রস্তাব করিল যে, তখনই একখানা মালগাড়ী আসিবে, সেইখানায় চড়িয়া দার্জ্জিলিঙ্গে ফিরিয়া যাইতে হইবে। গাড়ী আসিলে সকলে একখানা বন্ধ মালগাড়ীতে উঠিল। বসিবার জায়গা নাই, সে গাড়ীখানায় কয়লা আসিয়াছিল সুতরাং মেঝে আর দেওয়াল কালী মাখা। অনুপম তাড়াতাড়ি নিজের বর্ষাতিটা মণির জন্য পাতিয়া দিল। মণি হাসিয়া বলিল, "তাহলে আমার বর্ষাতিটা কি দোষ করলে নেড়া-দা?"

অনুপম জবাব দিবার আগেই গাড়ী চলিল, ধাক্কায় মণি

পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল, অনুপম তাহাকে ধরিয়া না ফেলিলে সে পড়িয়া যাইত। সে মণিকে উঠাইয়া তাহার বর্ষাতির উপর বসাইয়া দিল।

তখনও বর্ষা থামে নাই, গাড়ীখানা ভয়ানক দুলিতেছিল, হারাণ তাহার বর্ষাতিটা পাতিয়া আর সকলকে বসিতে বলিল, সেই অবসরে ধীরেন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে নেড়া,গেলেই তো বিশু কাকা ধরে বসবেন। কি জবাব দেব, বল?"

অনুপম মুখখানা বাঁকাইয়া বলিল, "জবাব আর কি দেবে! বলো যে সে এখন বিয়ে করবে না।" মণি অনুপমকে পাইয়া বসিল; সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বিয়ে করবে না নেড়া-দা?"

অনুপম বলিল, "যখন সময় হবে তখন নিজেই করবো।"

"এখন তার সময় হয় নি?"

"না, নিশ্চয়ই না।"

"কি করে বুঝলে?"

"আমার মনের ভাবেই বুঝতে পাচ্ছি।

"যখন কাকা বিয়ে করেছিলেন, তখন কি নিজের মনের ভাব পরীক্ষা করেছিলেন?"

"সে কাল আর একালে অনেক তফাৎ।"

"তাহলে তুমি তোমার নিজের পছন্দ অনুসারেই বিয়ে করবে?"

অনুপমের চোখ দুইটা আনন্দে নাচিয়া উঠিল, সে বলিল, "যদি কখনো বিয়ে করি, তাহলে নিজের পছন্দ-মতই করবো।" হারাণ তখন অনুপমের পিতার পত্র হইতে পড়িল, "মেয়েটি ছোট, বয়স আট-নয়, শ্রীমানের সঙ্গে বড় সুন্দর মানাইবে।" সকলে হাসিয়া উঠিল, সেই সময় গাড়ীখানা থামিল, মণি নামিয়া পড়িল। অনুপম দেখিল যে, তাহারা দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতীক্ষায়

সবুজ তৃণে শ্যামল বনে
নাম্‌লো ঘনছায়,
আস্‌চো তুমি, বন্ধু আমার!
বল্‌লে বাদল বায়।
বার্ত্তা তাহার আগে হতেই
পেয়েছিলাম মনে,
গন্ধ যখন গভীর হয়ে
ভর্‌লো কেয়া বনে;
ঝর্‌লো যখন কামিনী-ফুল
বৃন্ত-বাঁধন টুটি,
বকুল-বধূ ব্যাকুল হিয়া
পড়্‌লো পথে লুটি'।
নদীর বুকে অধীর্-আবেগ
ছাপিয়ে উঠে কূলে
দিক্‌বালাদের কালো চুলে
তড়িৎ মালা দুলে।
সজল মেঘের কাজল বুকে
উড়্‌লো বকের পাঁতি
মন্দ্র মেঘের গরজনে
উঠ্‌লো ময়ূর মাতি।
বেণু বনের বুকের ব্যথা
বাজ্‌লো করুণ সুরে,
আকুল হয়ে চাতক যখন
উধাও অনেক দূরে।
পুলক যখন নিবিড় হয়ে
ফুটলো নীপের বনে
(ওহে) পরাণ-প্রিয় আসবে তুমি
জেনেই ছিলাম মনে॥

শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র।

কবিবর ইয়েট্‌স্

বিশ্ব-সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে নোবেল যে পুরস্কারের সৃষ্টি করে গেছেন, তা'তে নোবেলের নাম অমর হয়ে থাকবে। শুধু তাই নয়; যাঁরা সেই পুরস্কার লাভ কচ্ছেন ও কর্বেন, তাঁদের নামও ভোলবার নয়! গত বছর স্প্যানিশ কবির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছিল; এবার হলো আইরিশ কবি উইলিয়ম্ বাট্‌লার্ ইয়েট্‌সের। ইয়েট্‌সের নাম আমাদের মনেও আসেনি, কিন্তু ইনিই এককালে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ভূমিকা লেখেন। অনেকেই এবার ভেবেছিলেন, বাঙ্গালীর ভাগ্যেই নোবেল প্রাইজটা আছে। কিন্তু দুঃখ করবার কারণ কিছু নেই, যিনি পেয়েছেন তিনি বাণীর বর-পুত্র ও তা পাবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত; বরং আশ্চর্য্য এই তিনি এর আগে কেন নোবেল প্রাইজ পান্‌নি!

আয়র্লণ্ডে 'Celtic Renaissance'-এর সময় যে সব কবি বা গ্রন্থকারের আবির্ভাব হয়, ইয়েটস্ তাঁদের অন্যতম। আইরিশ সাহিত্যে তিনি নূতন চিন্তার ধারা বইয়ে দিয়েছেন। তাঁর মত লোকের জীবনের গতিবিধি জান্‌বার বিষয়! ঘটনাবৈচিত্র্যে তাঁর জীবন গড়ে উঠেছে। ১৮৬৫ খৃঃ অঃ ডব্‌লিনে স্যাণ্ডি মাউণ্টে তাঁর জন্ম হয়। সাধারণ ছেলের মত তিনি ছিলেন না, তাঁর সবই অদ্ভুত। খেলাধূলা তাঁর প্রিয়ও ছিল না, বিশেষ অপ্রিয়ও ছিল না। ন'বছর বয়সে লণ্ডনে গিয়ে হ্যামারস্মিথের Godolphin স্কুলে তিনি ভর্ত্তি হন। ইয়েট্‌সের বাবা ছিলেন চিত্রকর। শুধু তাই নয়, তিনি Royal Hibernian Academyর একজন সভ্য ছিলেন। লণ্ডনে এসে স্কুলে তাঁকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর একমাত্র অপরাধ, তিনি আইরিশ। কাজেই সেখানে খুব অল্প বন্ধুই তাঁর লাভ হয়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, "হ্যামারস্মিথ স্কুলের কোন সহপাঠীরই নাম মনে পড়ে না, কেবল দু'জনের কথা স্মৃতির নিভৃততম দেশে মাঝে মাঝে উঁকি মারে।" 'আইরিশ' বলে তাঁকে বিদ্রূপ কল্লে তাঁর মর্ম্মে তা বিঁধত। লণ্ডন তাঁর মোটেই ভাল লাগতো না এই সব কারণে। শৈশবের লীলাভূমি স্লিগোর জন্য মাঝে মাঝে বড় কাতর হয়ে পড়তেন। তাঁর বাবা জন্ বাট্‌লার, তাঁকে প্রথমে Scottএর Ivanhoe ও Lay of the Last Minstrel পড়ান। এই সব নিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্য-জীবনের শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। শৈশবে যে তিনি আদৌ সুখী ছিলেন না, তা' তাঁর Reveries over childhood and youth পড়লে বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এ দুঃখের জন্য আত্মীয়-বন্ধু কাউকে তিনি দায়ী করেন নি। তিনি বলেন, 'শৈশবে দুঃখের ভাগটাই কেবল মনে পড়ছে। বছরের পর বছর এগিয়ে এসেছি, দুঃখের ভার ততই লঘু হয়ে গেছে, তার কারণ দুঃখটা ছিল আমার নিজের মন-গড়া।' ১৯১৪ সালের প্রকাশিত 'Reveries' থেকে তাঁর শৈশব ও যৌবনের অনেক কথা জান্‌তে পারা যায়; তাঁর মন কি করে একটু একটু বেড়ে উঠছিল, তা' বুঝতে পারি। টেনিশনের যুগে জন্মেও তিনি টেনিসনের ভাবে অনুপ্রাণিত হননি, এই তাঁর বিশেষত্ব। তাঁর বাবা ছিলেন টেনিসনের ঘোর বিরোধী। তাঁর শৈশবের ইতিহাসে দেখতে পাই, তাঁর বাবা তাঁকে স্বাধীনভাবে চিন্তা কত্তে শিখিয়েছেন। স্কুলের পড়ায় তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল না, বাড়ীর সকলে তাঁকে বোকা বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। যে-জিনিষটা তাঁর ভাল লাগতো সেটা তিনি প্রাণপণ-শক্তিতে আগ্রহের সঙ্গে করতেন। সাহিত্যে বিশেষ মন ছিল না বলে ক্লাসের নীচেই থাকতেন, কিন্তু জ্যামিতি তাঁর বড় প্রিয় ছিল বলে, জ্যামিতির ঘণ্টায় সকলের ওপরে উঠ্‌তেন।

পনেরো বছর বয়সে তিনি ডব্‌লিনে ফিরে এলেন। এসে ঈরাস্‌মস্ স্মিথ স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। সাধারণতঃ বাপ-ছেলের যে সম্বন্ধ থাকে, তাঁর সে সম্বন্ধটা তার চেয়ে বেশী নিকটতর ছিল। তাঁর পিতা ছেলের সঙ্গে অনেক রকম

বিষয়ের আলোচনা কত্তেন। নিজে Pre-Raphaeliteর মতের ছিলেন বলে ছেলের মনে তাদের চিন্তার ধারা প্রবেশ করিয়ে দেন। ছোটবেলা থেকেই ইয়েট্‌স্ শেলীকে ভালবাস্‌তে আরম্ভ করেন। Alstairএর বিষাদের গান তাঁর বড় মর্ম্মস্পর্শী বোধ হতো। তাঁর বাবার ইচ্ছাতেই তিনি অল্প বয়স থেকে স্পেন্সার ও শেলীর মত কবিতা লিখতে সুরু করেন। ঈরাশমশ স্কুলের তাঁর কয়েকজন সহপাঠী আইরিশ সাহিত্যে সুপরিচিত। এঁদের নাম, চার্ল্‌স উইক্‌স্, জন এগ্লিন্‌টন্, চার্ল্‌স্ জনষ্টন্ ও জর্জ্জ রাসেল। কিছুদিন তিনি Royal Dublin Societyতে চিত্রবিদ্যা শিখতে যান। চিত্রকরের ছেলে যে চিত্রবিদ্যা শিখ্‌তে যাবেন তা' বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নয়। তাঁর লেখার ওপর, বিশেষ নাটকগুলোতে চিত্রকরের প্রভাব দেখা যায়। ইয়েটস্ নিজে বলেছেন, 'যখন কোন চরিত্র আঁক্‌তে হয়, তখনি back-ground খুঁজ্‌তে যাই।' যেদিন থেকে তিনি mysticism-এ মন দিলেন, সেইদিন থেকে বাপ-ছেলের চিন্তার ধারা অনেকটা তফাৎ হয়ে গেল।

ইয়েট্‌স্ প্রথম লিখতে আরম্ভ করেন ডব্‌লিন্ ইউ-নিভার্সিটী রিভিউতে। তাঁর রচনা আরো কতকগুলো আইরিশ পত্রিকায় বেরিয়েছিল। ১৮৮৮ সালে তাঁর লেখার মাত্রা খুব বেড়ে গেল। অস্কার ওয়াইল্‌ড্ তাঁকে খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁর কথায় তিনি লণ্ডনে গিয়ে তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'The Wanderings of Oisin' বার কল্লেন। সমালোচকেরা বুঝতে পাল্লেন, আয়র্লণ্ডে এক নূতন চিন্তার ধারা বইতে সুরু করেছে। এই বইখানি লেখা থেকেই আইরিশ সাহিত্যের নবযুগের সূচনা হয়। পরের বছর কতকগুলো লৌকিক কাহিনীর সমাবেশ করে 'Fairy and Folk-Tales' ও 'Tales from Carlton' লিখলেন। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৯ পর্য্যন্ত তিনি লণ্ডনেই থাকতেন। সে সময়কার সমস্ত লেখা বহু ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯১ সালে 'John Sherman' ও 'Dhoya' দু'টো আইরিশ গল্প নিজের নাম না দিয়ে লিখলেন। ১৮৯২ সালে তাঁর বিখ্যাত নাটক 'Countess Cathleen' প্রকাশিত হলো।

আয়র্লণ্ডের সাহিত্যে নাটকের বড় অভাব ছিল। ইয়েটস্ ২০ বছর বয়সেই একখানি নাটক লিখেছিলেন; তখন কিন্তু এই অভাব মোচনের জন্যে লেখেন নি, খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়েই লিখেছিলেন। ক্রমে তিনি এই অভাব বুঝতে পেরে, নাটক-রচনায় মন দেন। তার প্রথম সূত্রপাত হোলো 'Countess Cathleen'এ। আয়র্লণ্ডে সাধারণ লোকদের মধ্যে চলিত একটা গল্পের ছায়া নিয়ে এটি লেখা হয়। নামে নাটক হলেও কাব্য-হিসাবেই এর দাম বেশী; এতে তাঁর নাট্য-প্রতিভা তেমন ফোটেনি। লণ্ডনে থাকার সময় symbolist ও 'মিষ্টিক'-দের ভাবে খুব বেশী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; এই নাটকখানিতে ফরাসী 'মিষ্টিক' মেটারলিঙ্কের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। মেটারলিঙ্কের 'Sightless' ও 'Death of Tintagailes'-এর সঙ্গে এর বেশ সাদৃশ্য আছে। এই নাটকের জন্য 'ধর্ম্মদ্বেষী' 'নাস্তিক' ইত্যাদি অপবাদের বোঝা তাঁকে মাথায় করতে হয়েছিল। প্রথম অভিনয়ের দিন থিয়েটারে পুলিশ খাড়া রাখতে হয়েছিল, পাছে মারামারি বাধে! নাটকের গল্প এই :—'আয়র্লণ্ডে একবার খুব দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষের সময় চারিদিকে যখন অন্নের জন্য হাহাকার উঠেছে, দু'জন শয়তানের অনুচর মানুষের পোষাকে তখন দেশে দেখা দিল। তারা খাবার দিয়ে লোকের আত্মা কিনতে লাগলো। পেটের দায়ে লোকেদের এমন দুর্ম্মতি দেখে, দেশের রাণীর চোখে জল এল। নিজের ধন দৌলত দিয়ে দেশকে তিনি বাঁচাতে গেলেন। কিন্তু শয়তানের লোক দু'জন এর আগেই ক্যাথলিনের সব ধনদৌলত আত্মসাৎ করে নিয়েছে। ক্যাথলিন শেষে নিজের আত্মাকেই বেচবেন, মনস্থ কল্লেন। কিন্তু নিজের আত্মার সর্ব্বনাশ হবে ভাবতে ভাবতে ক্যাথলিন্ পরলোক চলে গেলেন, বেঁচে থাকতে পাল্লেন না।' এই আত্মদানের মর্ম্ম লোকে বুঝতে না পেরে তার এত নিগ্রহ কল্লে। তার পর তিনি লিখলেন গল্পের সমষ্টি; সেগুলোর নাম দিলেন 'Celtic Twilight', এতে

সালে 'The Wind among the Reeds' প্রকাশিত হয়। এখানি বোধ হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ। কলা-সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে দেখলে বইখানি সাহিত্যের বাজারে অমূল্য। 'The Everlasting Voices' কবিতাটীতে সৌন্দর্য্যের অস্তিত্বের কথা বেশ ফুটে উঠেছে; এর পরেই নাটকের পালা আরম্ভ হলো, কবিতা লেখা একরকম বন্ধ হয়ে গেল। 'Countess Cathleen'-এর পরের নাটক 'The Land of Heart's Desire; এও একটা আয়র্লণ্ডের চলিত কাহিনীর অবলম্বনে লেখা। নাটকখানি রূপকের মধ্যে দিয়ে ফুটেছে। পরীর কথা লেখায় তাঁকে খুবই দুর্নামের ভাগী হতে হলো। গল্পের নায়িকার পরীর রাজ্যে যাবার ইচ্ছাটা আর কিছু নয়, 'সুদূরের পিয়াসা!' নায়িকার মন যে গৃহস্থালী কাজের দিকে যায় নি, তা'আর আশ্চর্য্য কি! তার অন্তর-আত্মা বলে উঠছিল 'আমি উন্মনা হে, আমি সুদূরের পিয়াসী!" ১৯০২ সালে গদ্যে লেখা একখানি নাটক তিনি লিখলেন। নাম দিলেন 'Cathleen in Houlihan'; এটি বেরুল প্রথম তাঁর নিজের পত্রিকায়। এই সময়ে লেখা Where there is nothing নাটকে তাঁর সমাজ-বিদ্রোহের আভাস রয়েছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই সে ভাবটা বেশ পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর সমাজ-আক্রমণ অনেকটা বার্ণার্ডশ ও অস্কার ওয়াইল্ডের ধরণের। Pot of Broth-ও এই সময়ে লেখা। ১৯০৩ সালে Hour Glass-এর প্রথম সংস্করণ হয়; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১৪ সালে—এখানি morality নাটকের অনুকরণে লেখা।

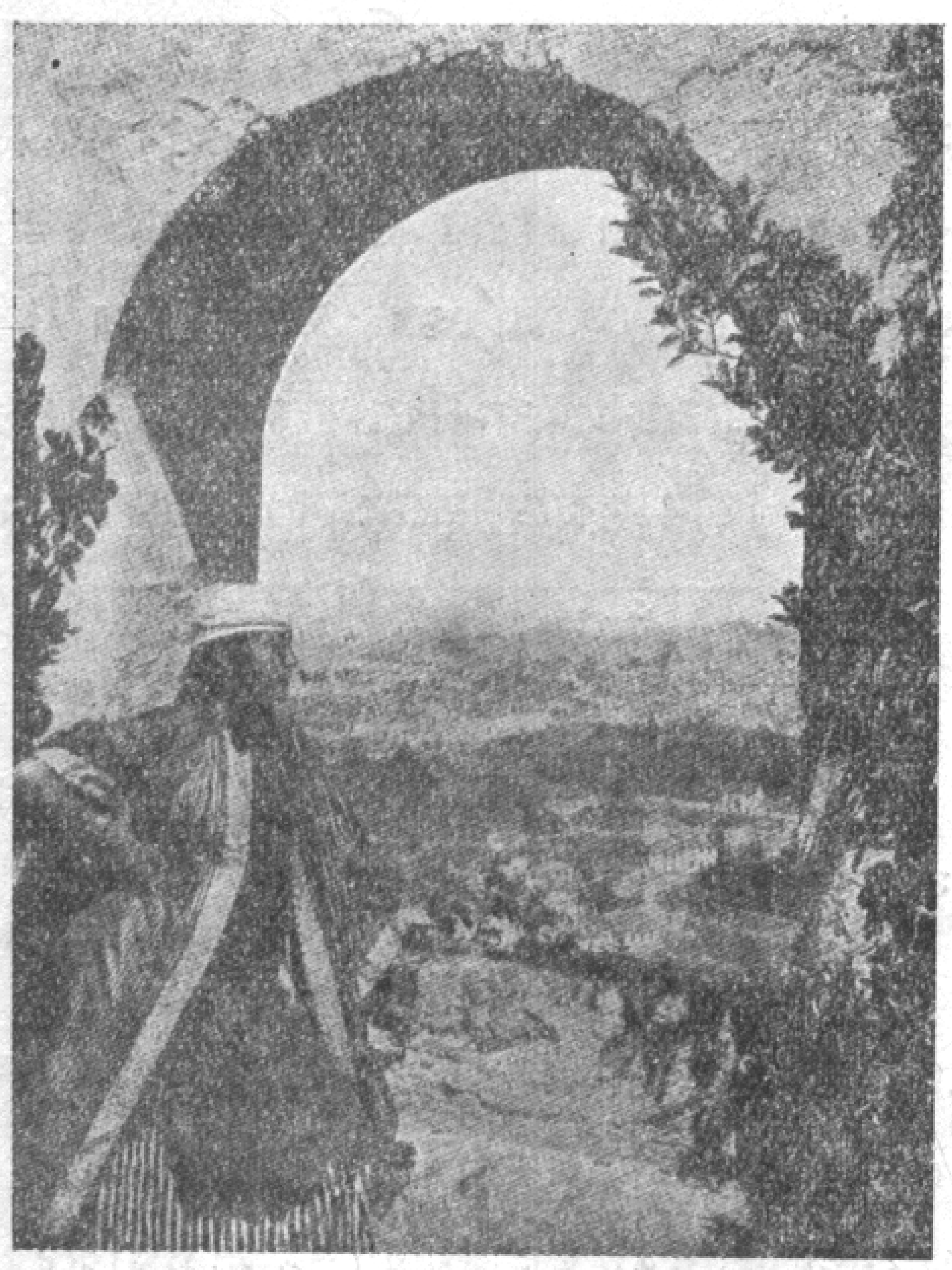
ইয়েটস্ উত্তর স্কটল্যাণ্ডের পৌরাণিক কাহিনী বা উপকথা নিয়ে পাঁচখানি নাটক লেখেন। প্রথমখানি The Shadowy Waters: এখানি North American Review-তে প্রথম বেরোয়। এ নাটকখানিও রূপকে লেখা। তার পর ক্রমান্বয়ে লিখলেন, On Baill's Strand, The King's Threshold ও Green Helmet; শেষের বইখানা প্রথমে Golden Helmet নাম নিয়ে বেরিয়েছিল; ডব্‌লিনের এ্যাবি থিয়েটারে Golden Helmet-এর প্রথম অভিনয় হয়। বইখানির একটা নূতনত্ব এই যে ব্যালাড ছন্দে লেখা। তার পর নাম করা যেতে পারে, At the Hawk's Well-এর। তার পর ইয়েটস্ যা লিখেছেন সেগুলো বেশীর-ভাগ নাটক গোছের।

ইয়েটসের লেখায় একটা জিনিষ বেশ পরিস্ফুট, সেটা তাঁর mysticism; মেটারলিঙ্কের সঙ্গে তাঁর বেশ মিল আছে, বিশেষ নাটকগু'লর রচনায়। লেখার প্রথম মাপ-কাঠি হচ্ছে লেখার আর্ট অর্থাৎ লেখক সাহিত্যে কতটুকু জিনিষ গড়েছেন। সাহিত্যিকের এই দানই সত্যিকার দান। ইয়েট্‌স্ সত্যই সাহিত্যে এ-রকম দান করেছেন, নয়ত তিনি আজ বিশ্বের সাহিত্য-মন্দিরে এ সুনাম নিতে পরতেন না। ভাবুকতা বা গম্ভীরতা তাঁর লেখার প্রত্যেক ছত্রে। সাহিত্যিক জীবনে তিনি কম কাজ করেন নি। নোবেল পুরস্কার পেয়ে তিনি আজ আয়র্লণ্ডের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আইরিশ থিয়েটার তাঁর ঋণ কখনো শোধ কত্তে পার্ব্বে না। তিনি শুধু এর সৃষ্টি-কর্ত্তা নন্, পালনকর্ত্তাও বটে। আয়র্লণ্ডের উপর তাঁর অনুরাগ নাটকে ফুটে উঠেছে। আইরিশ জাতির স্বভাবগত mysticism তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। অনেকে বলেন, নাটক লিখতে গিয়ে তাঁর যশের হানি হয়েছে, কাব্য লিখলে তিনি আরও খ্যাতি লাভ কত্তে পারতেন। সে কথা হয়ত সত্য, তবে এইটুকু জেনে রাখলেই চল্‌বে যে, দেশের জন্য তিনি যা করেছেন, তা তাঁর আগে আর কেউ করেন নি। The Wind among the Reeds-এর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, নাটক লেখায় প্রাণময় স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ আছে, কাব্য লেখায় তা পাই না, পাই শুধু নিরাশার ক্ষীণ সুর। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী ও ইটালীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যে তিনি আজ একজন অগ্রণী।

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ।

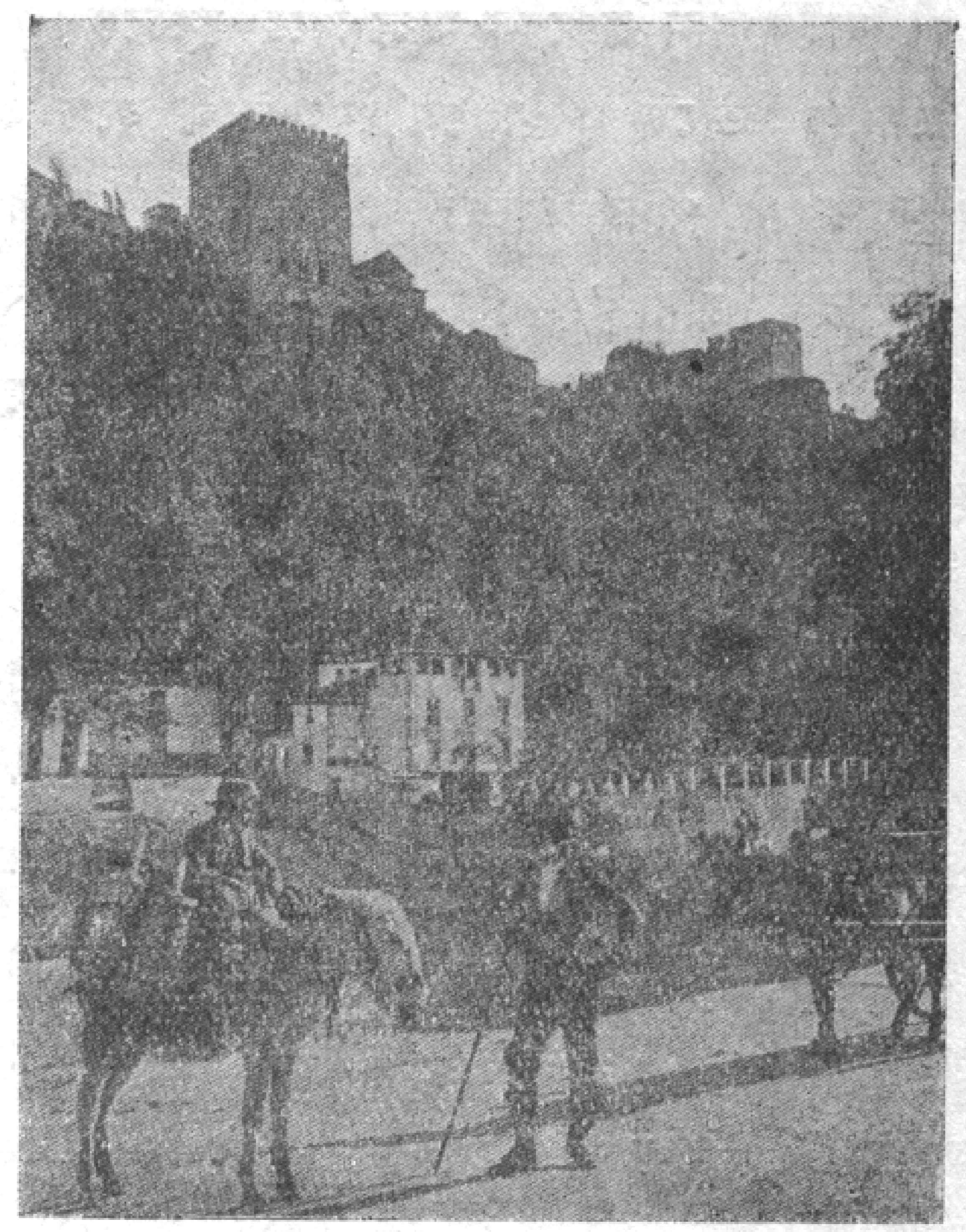
স্পেনের কথা

য়ুরোপের কোন প্রদেশের সঙ্গে এশিয়ার যদি কোন মিল থাকে তো সে মিল দেখা যায় শুধু স্পেনে। ঘর-বাড়ী, নদী-গিরি, বন-জঙ্গল, এ সবে মিল খুবই চোখে পড়ে; তাছাড়া রীতি-নীতিতেও অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায়। বর্ত্তমান বিজ্ঞান-যুগের প্রভাব স্পেনের কোথাও যদি পড়িয়া থাকে তো তার চিহ্ন দেখা যায় বড় বড় নগরে। পল্লী-প্রান্তরে এখনো বিজ্ঞানের ছোপ লাগে নাই! এমন কি ছোট ছোট গ্রাম-নগরের অধিবাসীরা পাশ্চাত্য ঢং বা কায়দা হইতে মনকে এখনো মুক্ত রাখিয়াছে—তাহাদের জীবন-ধারা এখনো সেই আগেকার যুগের মতই সহজ ও সরল রহিয়া গিয়াছে।



গ্রানাডা—মূর-আমলের প্রান্তর

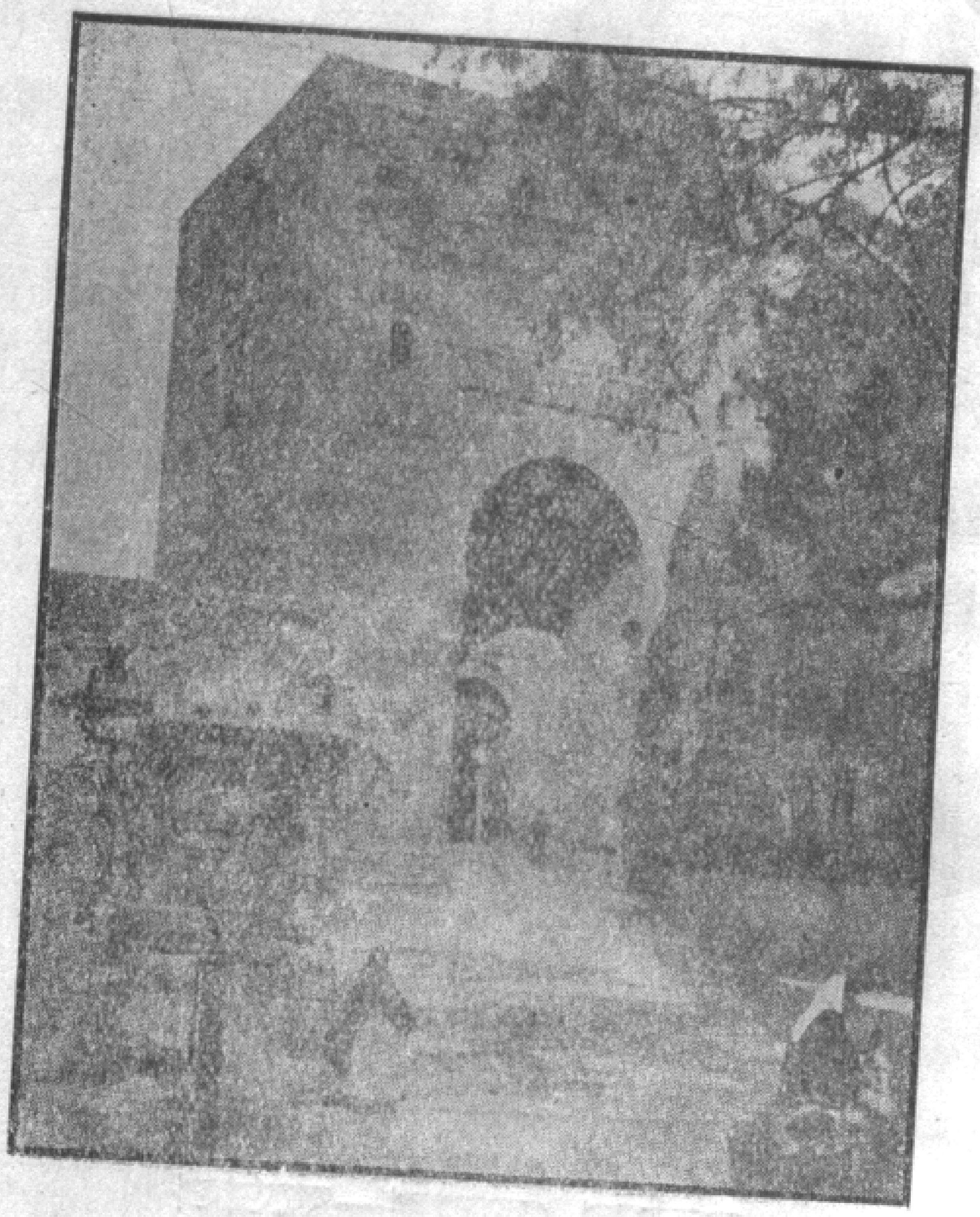
স্পেন, আফ্রিকা ও য়ুরোপের সন্ধিক্ষেত্র—আফ্রিকার খুব নিকটেই অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন স্পেনিশ জাতির উদ্ভব হয় য়ুরোপীয় পিতার ঔরসে, হাবশী মাতার গর্ভে। এ কথার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতখানি আছে জানিনা, তবে স্পেনিশের শারীরিক গঠনে ও প্রকৃতিতে সেকালের আফ্রিকা-বাসীর প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়! এই কারণে অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির চেয়ে প্রাচ্য জাতির সঙ্গেই স্পেনিশের দেহের মনের এতখানি সৌসাদৃশ্য। স্পেনের পোষাকে এদেশের মত বর্ণছটার সমাবেশ—



অলহম্‌ব্রার প্রাচীর ও বুর্জ

খাঁটী য়ুরোপীয় জাতির সখের বা রুচির অনুরূপ নয়। আর স্পেনিশের গায়ের রঙেও এদেশী আমেজ বেশই লক্ষ্য হয়। রূপে তেমন হল্‌কা নাই—এদেশী গোরা-রঙের মতই তাহা স্নিগ্ধ, শান্ত! স্পেনের এই আদিম জাতির নাম মূর।

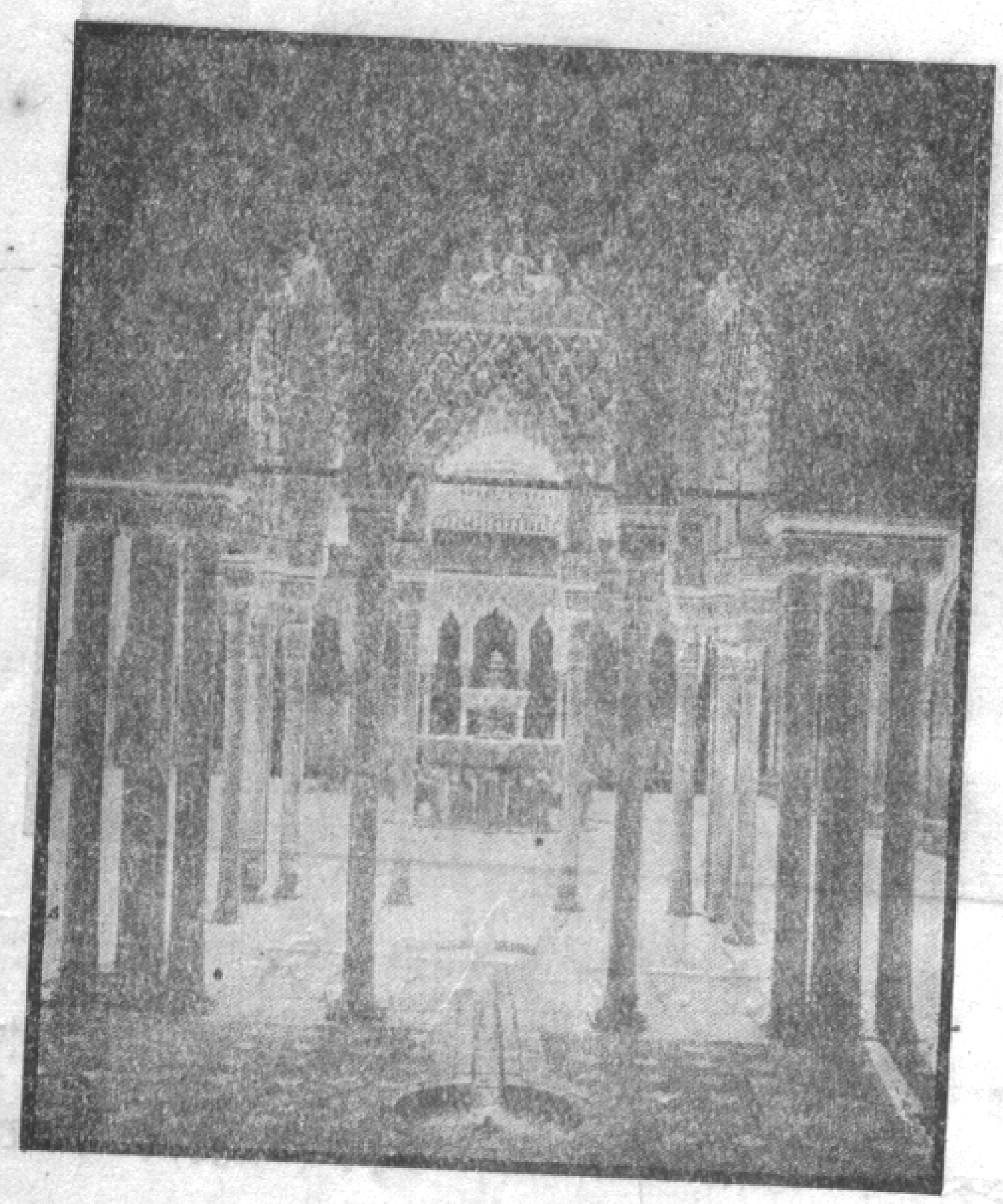
এশিয়ার প্রভাব স্পেনের উপর পড়ে মুসলমান-প্রাধান্যের যুগে। মুসলমানের অধীনে স্পেন ছিল প্রায় আট-শো বৎসর। এই দীর্ঘ কালে মুসলমান সভ্যতাই স্পেনকে বসনে ভূষণে আচারে ব্যবহারে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল। আদিম স্পেনিশ ভাষায় আজো সন্ধান করিলে বহু প্রাচ্য কথার রেশ পাওয়া যায়।



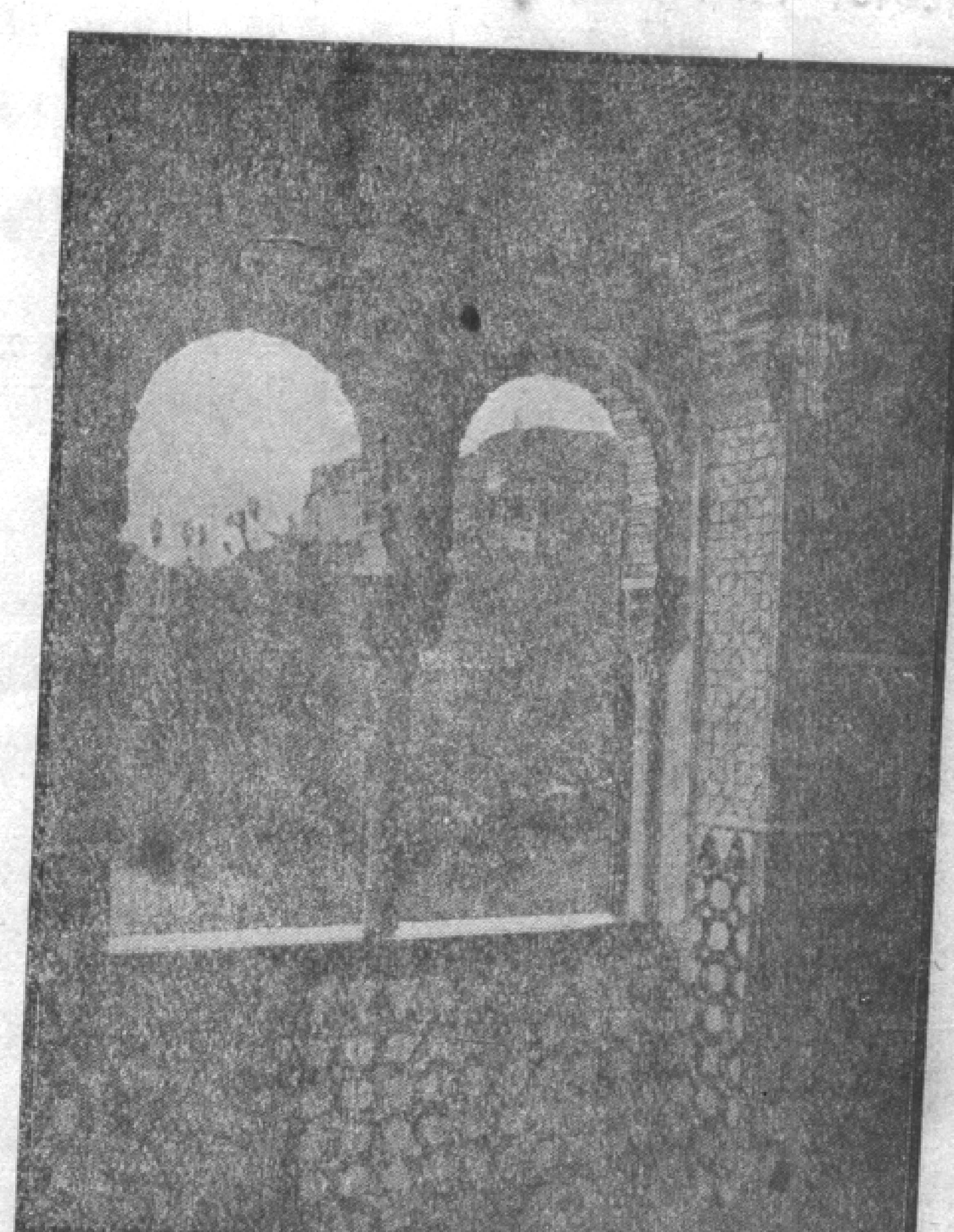
আলহাম্‌ব্রা—রাজমহলের ফটক



প্রাচীন মূর ফটক—কর্ডোভা



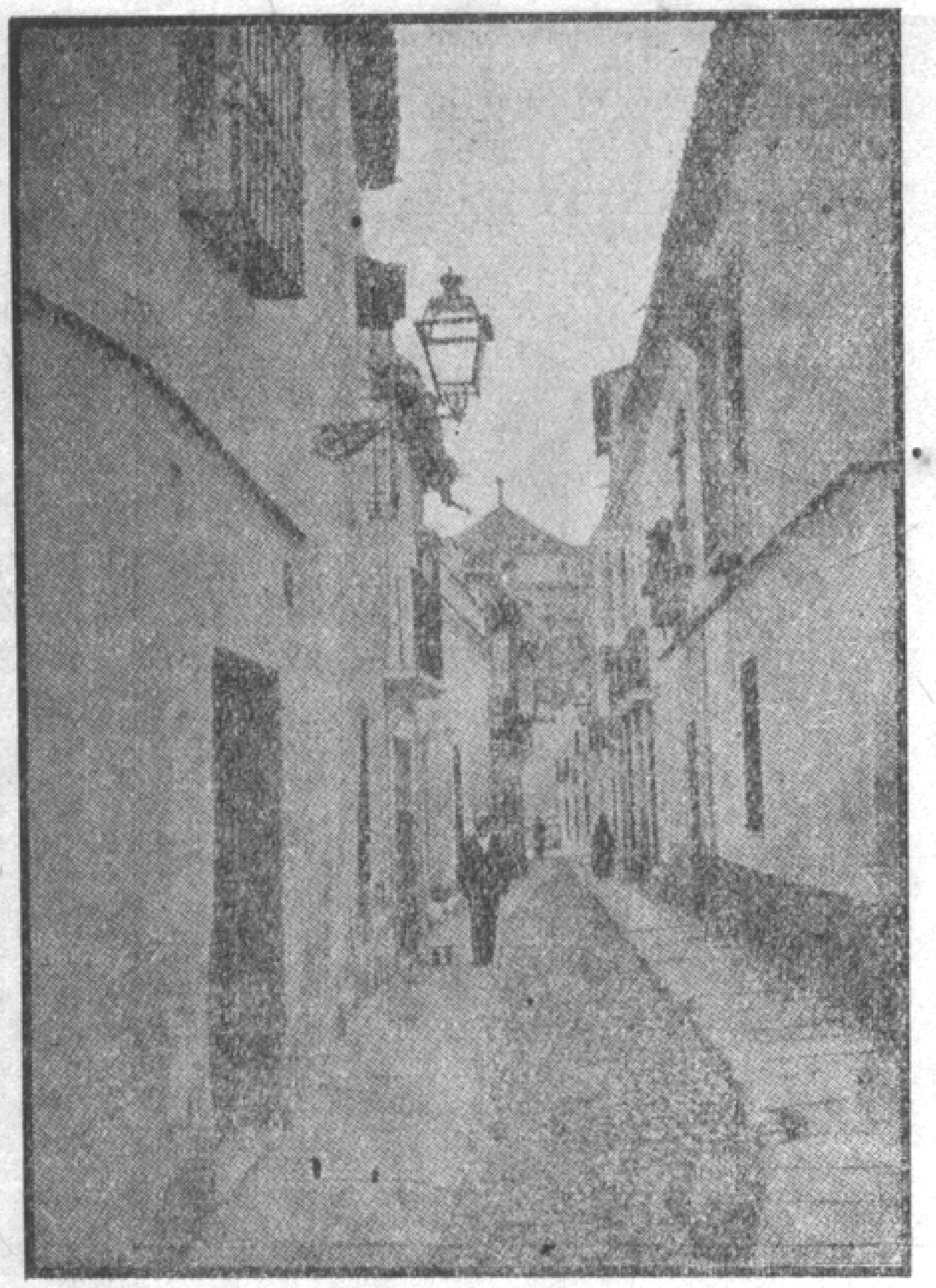
আলহাম্‌ব্রা—দরবার ভবন



আলহাম্‌ব্রা—বেগম-মহল ও বাগান

মুরদিগকে হারাইয়া মুসলমান স্পেনে আধিপত্য বিস্তার করিয়া নূতন ধর্ম্মে দেশবাসীকে দীক্ষিত করিল। দেশের ভোলও ফিরিয়া গেল। কলা, বিজ্ঞান, উদ্যম, আবিষ্কার—সকল দিকেই মুসলমান সভ্যতা এমন বিকাশ লাভ করিল যে স্পেনে মুসলমান রাজত্বের সময় স্বর্ণযুগের উদয় হইল।

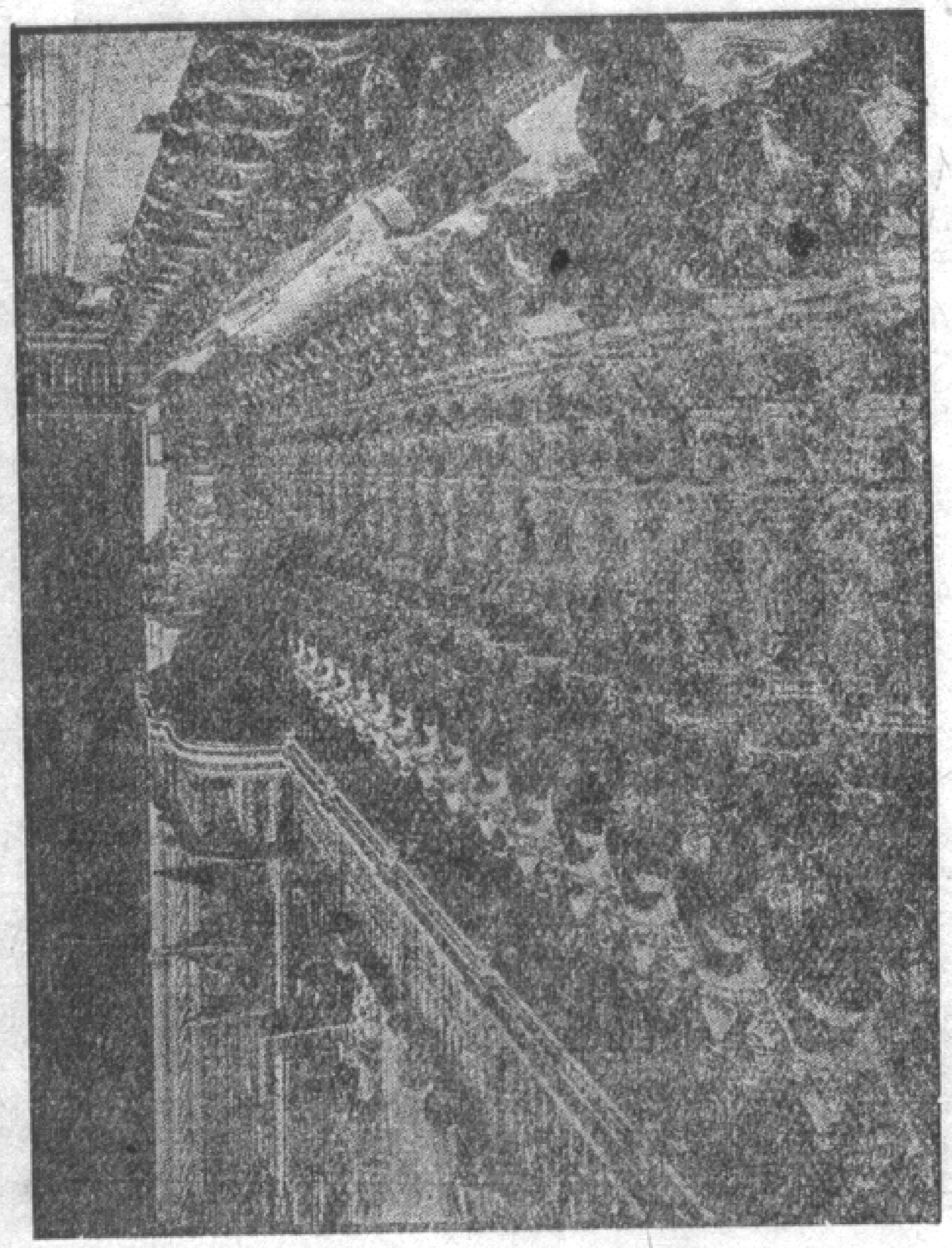
আজ চারিশত বৎসর মাত্র স্পেন মুসলমান-শাসন ত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছে; তবু স্পেনের প্রাচীন অট্টালিকা ও প্রাসাদ-সমূহে, উদ্যান-কুঞ্জে ও জলাশয়াদিতে



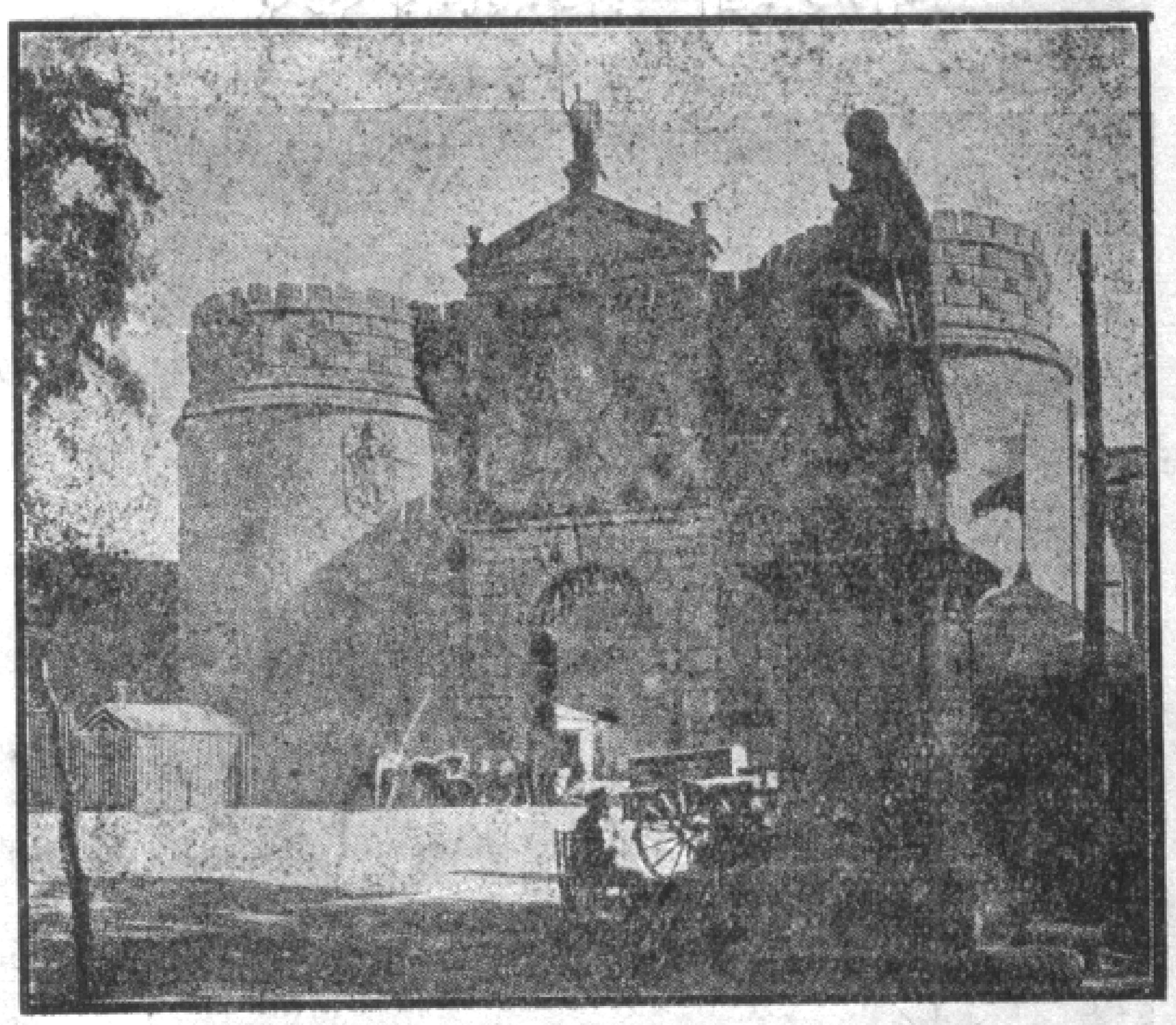
মেজছোটা মসজিদের সাম্‌নে গলি—কর্ডোভা



অলমিদা ফোয়ারা—কর্ডোভা



মস্‌জিদে নক্সার কাজ—কর্ডোভা



টোলেডো—আরবী ফটক

মুসলমানের হাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট জাগিয়া আছে। সে-সব ভবনগুলির অংশ-বিশেষ ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হইলেও মুসলমান গৌরবের চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। গ্রানাডার আল্‌হামব্রা ভবন, আলমিদা-উপবন, চেনাতল-অরৌফ বাগ প্রভৃতি শিল্প-কলার কতদূর উৎকৃষ্ট নিদর্শন, তাহা সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়—এগুলি সবই মুসলমান শিল্পীর হাতে গড়া।

আলহাম্‌ব্রার নির্ম্মাণ-কৌশল এমন যে বহু বারের তীব্র ভূমিকম্প ও জল-ঝড়ে তার কোন জায়গা একটু টস্‌কায় নাই! আগাগোড়া লাল পাথরে এই ভবন নির্ম্মিত।

আলহাম্ব্রা ছিল সেকালের রাজ-ভবন। তার নানা মহল শিল্পী কলা-বৈচিত্র্যে ভরিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই লাল পাথরে এমন রক্ত আভা যে আজো সূর্য্যালোকে তাহা তেমনি ঝলমল করিতেছে! দর্শক এখানে আসিয়া সে রক্ত আভা দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া যায়—মনে হয়, বুঝি কোন মণি-রত্ন খচিত আছে, এ তাহারি দীপ্তি!



ফেরিয়া-উৎসবে স্পেনিশ্ নৃত্য

গ্রানাডা ও কর্ডোভা—এই দুই নগর ছিল মুসলমান সভ্যতার কেন্দ্রভূমি! এই কর্ডোভা ছিল কালিফের রাজধানী। কিন্তু কালের প্রভাবে নগর আজ শ্মশানে পরিণত। তবে মেজ-ছোটা মসজিদটির চিহ্ন এখনো বর্ত্তমান আছে! এই মসজিদের শিল্প-নৈপুণ্য এককালে আলহামব্রার অনুরূপ ছিল। ইহার প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ও আশপাশের ভবনগুলির পাশে দিল্লীর প্রাচীন ভবনগুলিও খুবই তুচ্ছ মনে হয়। এই মসজিদের অলমিদা ফোয়ারা আজো সৌখীন নর-নারীর মিলন-তীর্থ।

স্পেনের টলেডো নগর এখনো আকারে সৌষ্ঠবে হুবহু মুসমানী কেতা রক্ষা করিয়াছে। এ নগরটিকে আরবী সহর বলিয়া দর্শক ভ্রমও যে না করিবে, এমন নয়। হার অধিকাংশ গৃহই আরবী প্রথায় রচিত। তাছাড়া প্রাচীন মসজিদগুলিকে অবলম্বন করিয়াই একালের বহু গির্জ্জা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। একটি মসজিদ শুধু আজো মসজিদ রহিয়াছে; সেটিকে গির্জ্জায় রূপান্তরিত করা হয় নাই।

সেভিল এখনো প্রাচীন সারল্যে ঘেরা, নদীর ধারে ছবির মত নগর। নদীর তীরে রাখাল-ছেলের দল মেষ চরাইয়া ফেরে, তাদের বাঁশী সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশকে যখন মুখরিত করিয়া তোলে, তখন মনে হয়, আরব্য রজনীর একটি মুগ্ধ মধুর রাত্রি বুঝি এখনই এখানে খসিয়া পড়িয়াছে! নগরের বাসিন্দারা সহজ আনন্দে জীবনের দিন কাটাইয়া যায়—বাহিরের ব্যস্ত কর্ম্ম-জগতের দিকে ছুটিবার তাদের কোন আগ্রহ নাই! কল্পনার মায়া-জালে আচ্ছন্ন দেশটিও তাই ভাবুক দর্শককে আবেশে মুগ্ধ করিয়া তোলে। সেভিলের প্রত্যেক গৃহ—তা কি ধনীর ঘর, কি গরিবের কুটীর; সবগুলিতে ছায়া-স্নিগ্ধ প্রাঙ্গণ আছে—এই প্রাঙ্গণে গৃহস্থ সপরিবারে বসিয়া গল্প-সল্প ও কাজ করে। এইখানেই পারিবারিক বৈঠক বসে, বন্ধু-মজলিসও এইখানে বসানো হয়। সদর ও খিড়কী দুইটি করিয়া প্রবেশ-দ্বার আছে। এ নগরটী কবির মানস-কুঞ্জের মতই মনোরম।



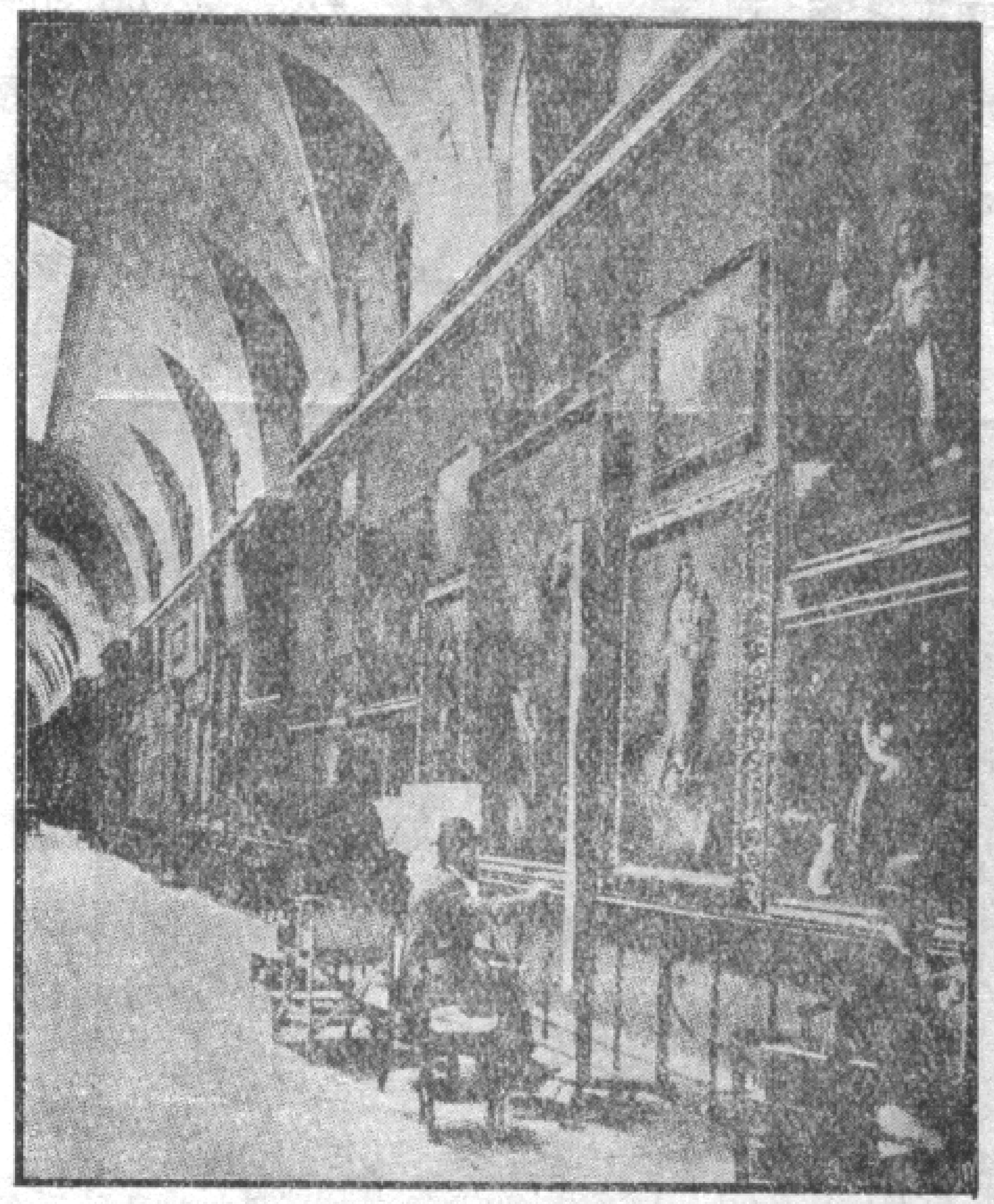
সেভিল—গৃহস্থ-বাড়ীর প্রাঙ্গণ

স্পেনের বর্ত্তমান রাজধানী মাদ্রিদ আধুনিক কালে রচিত। এই মাদ্রিদ যেন স্পেনের বুকে বিদেশীর মত বসিয়া আছে—তার আচার আকার রীতি-নীতি সবই ভিন্ন

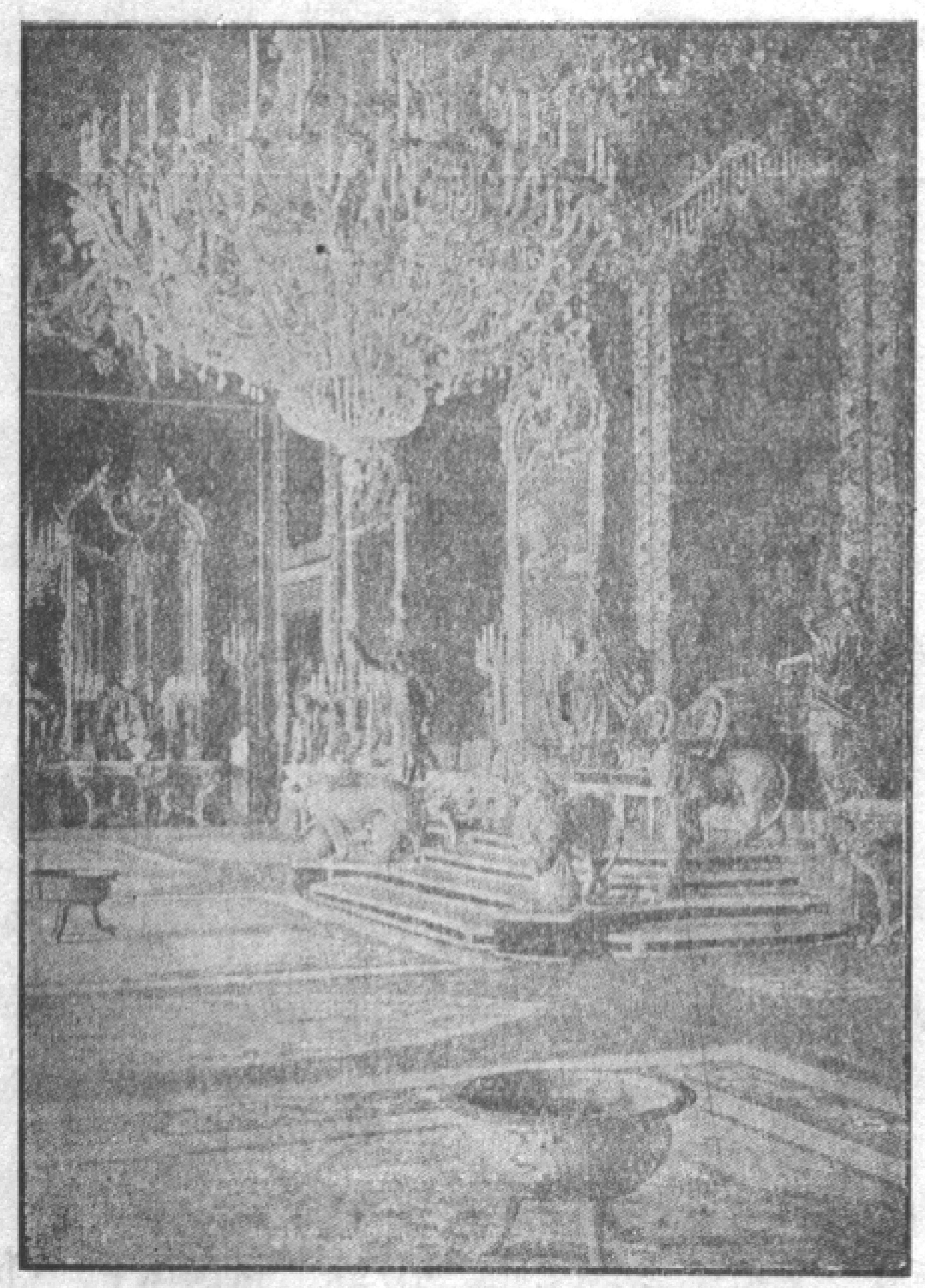
রকমের। স্পেনের আর কোন নগর বা গ্রামের সহিত তার বড় একটা মিল নাই। বড় বড় বাড়ী আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে, ধোঁয়া-ছড়ানো প্রকাণ্ড সব কল-কারখানা, গাড়ি ঘোড়া ঐশ্বর্য্য, জমক, পথে পথিকের ব্যস্ত পায়ে ছুটাছুটি—



স্পেনের রাজভবন—মাদ্রিদ্



রাজ-চিত্রশালা—মাদ্রিদ্



রাজসিংহাসন—মাদ্রিদ্



মাদ্রিদের বাজার

এ একেবারে খাঁটি য়ুরোপের প্রতিচ্ছবি! চওড়া পথ-ঘাট, পরিষ্কার সাফ্ অলি-গলি, কাঁচের সার্শি লাগানো দোকান-ঘর—এমন কি বাগান ঝিল পুকুর ফোয়ারা সমস্তই য়ুরোপের হাল্ ফ্যাশনে তৈয়ারী। ফ্যাশন অবশ্য ফ্রান্স হইতেই আমদানি।

নাট্যকলায় স্পেনের অনুরাগ চিরদিন,—প্রকৃতির বুকে লীলা কুঞ্জ স্পেন—সেখানে বাণীর করুণা চিরদিনই আছে। উপন্যাসে নাটকে স্পেন আজ জগতে অদ্বিতীয়। ইবানেজ, বেনাভেন্ত্ স্পেনের গৌরব, সারা জগতের গৌরব। নাট্যকলার দিকে স্পেনিশের অনুরাগ যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। নৃত্য-গীতে স্পেন জগতের আর সকল জাতিকে হার মানাইয়াছে। স্পেনিশ নাচের খ্যাতির আর সীমা নাই।

স্পেনের চিত্রশালা স্পেনের আর এক কীর্তি। সেকালের রোমান কাথলিক বাদশাহদিগের চিত্রানুরাগ একটা মস্ত তারিফের সামগ্রী।

ঈষ্টারের সময় স্পেনের জাতীয় উৎসব হয়। ইহার নাম ফেরিয়া উৎসব। সে উৎসবের সমারোহ সব-চেয়ে বেশী সেভিলে। আনন্দের একেবারে ধুম বাধিয়া যায়—নৃত্য গীত, মিছিল,—কয়দিন বহির্জগৎ ভুলিয়া সেভিলবাসী উৎসবে মত্ত থাকে।

স্পেনের অতিথি-পরায়ণতা বিশ্ব-বিখ্যাত। এই ফেরিয়া উৎসবে তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। অতিথি-সেবা সে উৎসবের একটী প্রধান অঙ্গ; যার যেমন অবস্থা হোক, উৎসবের দিনে সে অতিথি-সেবা করিবেই।

এখানকার গার্হস্থ্য জীবন সুখময়। অর্থাৎ স্পেনের অধিবাসীরা এখনো আমাদের মত ঢিলা-ঢালা স্বভাবের লোক। সময়কে মাপিয়া কষিয়া টাইট হইয়া তারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে না; কাজের ফাঁকে আমাদের মত এধারে-ওধারে চাহিয়া দেখে; দুই দণ্ড দাঁড়ায়ও এবং য়ুরোপের অপর প্রদেশের অধিবাসীদের মত ঘড়ির কাঁটা দেখিয়া ছুটাছুটি বা প্রেমালাপ সারিয়া লয় না! এজন্য জীবনে তাদের এখনো স্বাচ্ছন্দ্য আছে।

তবে স্পেনের ঐ Bull fight একটি মস্ত কলঙ্ক। আজো এই নির্ম্মম ক্রীড়া দেখিতে পঙ্গপালের মত লোক ছোটে—এই নৃশংস ব্যাপার দেখিয়া যে তারা আনন্দ পায় কি করিয়া, অপর সভ্য জাতিদের কাছে ইহা এক বিস্ময়ের ব্যাপার, সন্দেহ নাই।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

অঘটন

মগ্ন যে ছিল পঙ্কে,
কৃপায় তাহারে তুলে নিলে তব অভয় শীতল অঙ্কে।
যার ঠাঁই পথ পার্শ্বে,
ওগো সম্রাট! এ কি বিপরীত! আধ রাজাসন তা'র সে!
যে ছিল জন্ম-দুঃখী,
তাহারে সাজালে রাজার দুলাল, অঙ্গে অঙ্গে লক্ষ্মী।
নয়নে না ছিল দৃষ্টি,
তা'র দু'টি আঁখি-পল্লব ভরি' করিলে অমৃত বৃষ্টি।
বাণী যা'র চির বন্ধ,
তাহারি কণ্ঠে কুহরি তুলিলে নৃত্য-মুখর ছন্দ।
চির-বধিরের কর্ণে,
শত পাপিয়ার স্বর সুর-ধার ভেসে আসে নানাবর্ণে।
বসি' ছিল যেই খঞ্জ—
তা'রে ফিরাইলে নগরে তীর্থে দেখালে চরণকুঞ্জ।
পক্ষাঘাতীর অঙ্গ,—
শিরায় শিরায় চেতনা তাহার মুখরি করিছে রঙ্গ।
ধূ ধূ মরুভূমি মধ্য,
সাহারা বিদারি' ফুটায়ে তুলিলে, অমল কোমল পদ্ম।
যে গো আজনম শুষ্ক,
হেমবল্লরী বেড়ি' সেই তরু মুঞ্জরি ফুটে পুষ্প।
প্রভু! এ তোমার লাস্য,
চির-অঘটন-ঘটন-পটুয়া, হেলায় করিছ হাস্য।
ধন্য হে তুমি ধন্য।
নিজ আনন্দ-লীলায় খেলিছ আমি নাহি জানি অন্য।

শ্রীমৃণালসুন্দরী দেবী।

শিখিবার কলা-কৌশল

৫

যদি একটা কিছু শিখিয়া তাহা মনে ধারণ করিয়া না রাখা যায়, তাহা হইলে হইল কি? প্রায় কিছুই হইল না। তথাপি একেবারেই কিছু হইল না বলা যায় না, কেননা শিখিবার সময় মনের উপর একটা জিম্‌ন্যাষ্টিকের ক্রিয়া চলে। শিক্ষায় বিরত না হইয়া যদি আরো অন্যান্য জিনিষ (পরে ভুলিয়া গেলেও) শেখা যায়, তাহা হইলে অভ্যাসজনিত মনের একটা নমনীয়তাবরাবর থাকিয়া যায়।

কিন্তু ইহা কি শোচনীয় বলিয়া মনে হয় না, যখন ভাবি কতকগুলি ছেলে ১০।১২ বৎসর ধরিয়া স্কুলের বেঞ্চির উপর বসিয়া, একটা অপ্রিয় পাঠ-প্রণালী অনুসরণ করিয়াছে? লোকের কাছে দেখানো হইতেছে যে তাহাদিগকে ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীক, ইতিহাস, ভুগোল, গণিতের ভৌতিক বিস্তার, পদার্থ বিদ্যার কতকগুলি সরল গোড়ার তত্ত্ব—শেখানো হইতেছে, কিন্তু স্কুল হইতে বাহির হইবার দুইবৎসর পরেই দেখা যায় তাহাদের মনে উহার অবশিষ্ট আর কিছুই নাই—কেবল তাহাদের মনে পড়ে, কতকগুলা জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাদের মনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অর্জ্জিত জ্ঞানের যে অবশিষ্ট অংশ তাহাদের মনে থাকিয়া যায়, তাহা কোনো সচরাচর পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠার ভিতর সহজে ধরানো যাইতে পারে। এবং এই অবশিষ্ট অংশের মধ্যে আবার কি বিশৃঙ্খলা!...

ইহা কি শোচনীয় বলিয়া মনে হয় না, যখন ভাবি যে,—এতগুলা পুস্তক, এতগুলা প্রবন্ধ—স্কুল হইতে বাহির হইবার পর—যাহা আমরা পাঠ করিয়াছি; এতগুলা বক্তৃতা, এতগুলা আলোচনা-সভার আলোচনা, এমন কি এতগুলা সারবান কথোপকথন যাহা আমরা শুনিয়াছি, এতগুলা দৃশ্য, স্থান ও ঘটনা যাহা আমরা দেখিয়াছি,—তাহার মধ্যে উহাদের স্পষ্ট ধারণা কতটুকুই বা আমাদের মস্তিষ্কে থাকিয়া যায়?

প্রকৃতপক্ষে শোনাই নহে, দেখাই নহে, বিশেষতঃ এইরকম করিয়া শেখা শেখাই নহে। জ্ঞানলাভ করিবার জন্যই শেখা দরকার; যখন কিছু জানা হইল, তখন যাহা জানা হইল তাহা একটু চেষ্টা করিয়া, এমন করিয়া মনে ধরিয়া রাখা আবশ্যক যে, প্রয়োজন হইলে, উপস্থিত মত তাহার সদ্‌ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শেখা জিনিষগুলা স্মৃতির সাহায্যে মনের ভিতর ধরিয়া রাখা দরকার।

আমাদের যতগুলা মনোবৃত্তি তাহার মধ্যে স্মরণশক্তির মত রহস্যময় মনোবৃত্তি খুব কমই আছে। আমরা জানিনা কোথায় উহার অধিষ্ঠান; আমরা যখন মনে করি কতকগুলা জিনিষ একেবারে হারাইয়া গিয়াছে, তখন সেইসব লুপ্ত জিনিষ উহা হঠাৎ আমাদের সম্মুখে আনিয়া হাজির করে। আমাদের ইচ্ছাশক্তির সম্মুখে উহার একপ্রকার স্বাধীনতা আছে। সে তার নিজের কোণটিতে বসিয়া আপনার কাজ করিতে থাকে। আমরা জানি না, কি উপায়ে আমরা তাহাকে দিয়া তাহার গুপ্ত ভাণ্ডারটি খুলাইয়া লই,—কিন্তু তথাপি দেখিতে পাই আমাদের চেষ্টা সফল হয়। দৃষ্টান্ত যথা—একটা নাম ভুলিয়া গেলে, স্মৃতির কক্ষ আমরা অনুসন্ধান করি। কি করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে না জানিয়া, অন্ধভাবে একটা বেগ প্রয়োগ করিয়া সেই বিস্মৃত নামটা মনে আনিবার চেষ্টা করি; এই চেষ্টার ফল প্রায়ই রাত্রিতে প্রকাশ পায়;—বিস্মৃত নামটা আবার আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়!

এই রহস্যময় মনোবৃত্তির মূল্য যে কত তাহা এক মুখে বলা যায় না। স্মৃতি যাহা পাকড়াইয়া ধরে কেবল তাহাই আমরা পরিপাক করি—সাত্মীকৃত করি। আমাদের স্মৃতি আমাদের জন্য যাহা সঞ্চিত রাখে তাহা ছাড়া, প্রকৃতপক্ষে আমরা কিছুই জানিতে পারি না:—

অঙ্গচালনা, ঘটনা, আন্তরিক অনুভূতি, যুক্তিসমূহ,

এখন দেখা যায়—গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া যে শিখাইবার কাজ চলিয়াছে তাহাতে অনভিজ্ঞ শিক্ষকেরা শিক্ষাপ্রণালীর ভিতর, এই স্মৃতির মর্য্যাদা লাঘব করিবার চেষ্টা করিয়াছে। "মুখস্থ করা"—এই বাক্যটার একটা অযথা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিছুই মুখস্থ করা উচিত নহে। ঘটনা, যুক্তি, শৃঙ্খল-বন্ধনে-সংযুক্ত মানসিক প্রতিবিম্ব সমূহ,—এই সমস্তকে নিজ বলেই মনের ভিতর প্রবিষ্ট করাইতে হইবে; এক প্রকার বলপূর্ব্বক স্মৃতিকে চাপিয়া রাখিতে হইবে। স্মৃতি তাহাদের সম্মুখে আসিতে পারিবে না, তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে ধরিতে পারিবে না।

এ অতি অসঙ্গত কথা; কেননা, নিষ্ক্রিয়ভাবে হইলেও শেষটা স্মৃতিকেই মধ্যবর্ত্তিতার কাজ করিতে হয়। এই অসঙ্গতিটা অর্থাৎ স্মৃতিকে সক্রিয়ভাবে কাজ করিতে নিষেধ করা—ইহা শিক্ষকমণ্ডলীর না বুঝিবার ফল।

এইরূপ মনে করা হয় যে,—কণ্ঠস্থ করিয়া যাহা শেখা হয়, তাহা অগত্যা যেন না বুঝিয়াই শেখা হয় এবং সেই সঙ্গে এই পণ্ডিতী বাক্যটা আওড়ান হয় যে—"উহা তোতা পাখীর শিক্ষা" কিন্তু এ কথাটা নিতান্ত খামখেয়ালী ধরণের ও মিথ্যা। যাহা কণ্ঠস্থ করিয়া শেখা যায় তাহা বুঝা যাইবে না কেন? যাহা বুঝা যায় তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া শেখা যাইবে না কেন? বাহুত লোকে যাহাকে বুদ্ধির ব্যাপার বলিয়া জানে, তাহার মধ্য হইতে একটা দৃষ্টান্ত বাছিয়া লওয়া যাক্। মনে কর—একটা জ্যামিতির উপপাদ্য (Theorem)। কেবল যে নিরেট মূর্খ—সেই একবিন্দুও না বুঝিয়া কেবল অক্ষরে অক্ষরে উহা কণ্ঠস্থ করিবে, এবং ভগবান জানেন, উহাতে কতটা পরিশ্রম! কিন্তু যে ছাত্র খুব বুদ্ধিমান, সে উপপাদ্যটা বুঝিতে পারিলেই উহা আয়ত্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট মনে করিবে না। সে 'কালো-তক্তি'র উপর ও নিজের খাতায় উহা পুনরাবৃত্তি করিবে; এবং অল্পে অল্পে সম্পাদ্য প্রতিজ্ঞাগুলি এমন করিয়া আপনার মনে বসাইয়া দিবে যে, ইহার পর উহা বাহির করিতে ক্লেশ পাইতে হইবে না—উহা স্বতই বাহির হইয়া পড়িবে। সেই ছাত্র কি কিছু কম বুঝিয়াছে?—না, বরং ইহার বিপরীত।

এখন দেখ,—প্রত্যেক বিজ্ঞানের মধ্যে, প্রত্যেক শিল্পকলার মধ্যে, এক কথায়—যে কোন বিষয় শেখা যায় তার মধ্যেই, জ্যামিতির ন্যায়, আইডিয়া সমূহের (অথবা প্রক্রিয়া সমূহের) যোজক-বন্ধনের একটা সরঞ্জাম অর্থাৎ দুই মুখ-যোড়া দিবার একটা সরঞ্জাম আছে; সেই সরঞ্জামের জিনিসগুলা কণ্ঠস্থ করা আবশ্যক—অবশ্য সেই সঙ্গে ঐ সব আইডিয়ার ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কলকৌশলের তাৎপর্য্যও বুঝিতে হইবে। এমন কতকগুলা জিনিস আছে যাহা নিশ্চিতরূপে আয়ত্ত করা আবশ্যক—অন্ততঃ একবার সেই-গুলা এমন করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে যে, সেই জিনিষ-গুলা মনে আনিবার জন্য আবার নূতন করিয়া প্রয়াস পাইতে না হয়। দৃষ্টান্ত:—ইতিহাসে—ঐতিহাসিক ঘটনা ও ঘটনার কাল; বিজ্ঞানে—সংজ্ঞা, ও উপপত্তি সমূহের (Theorem) পরস্পর যোগাযোগ; ভাষায়—শব্দকোষ ও ক্রিয়াবিভক্তি; শিল্পকলায়,—যাহা কিছু বিশেষ নিয়ম ব্যবস্থা, অথবা কারিগরের হস্তচালনার বিশেষ কোন প্রণালী। কোন সময়েই, বুদ্ধির তত্ত্বাবধানের সাহায্য ব্যতীত স্মরণ শক্তিকে খাটানো উচিত নহে। কিন্তু বরাবর স্মৃতির সাহায্য না লইলেও আমাদের বুদ্ধি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, অচল হইয়া পড়িবে, বিধ্বস্ত হইবে!

অতএব এসো আমরা বিধিমতে স্মৃতির আরাধনা করি! স্মৃতিকে প্রত্যাখ্যান করিলে, সকল শিক্ষার্থীই শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। শিক্ষাকার্য্য হইতে, জ্ঞানানুশীলন হইতে স্মৃতিকে উঠাইয়া দেওয়া দূরের কথা, আমার ইচ্ছা, উহা প্রত্যেক বিদ্যালয়ে, প্রত্যেক অধ্যয়নশীল শিক্ষার্থীর নিজগৃহের পাঠাগারে এক একটা যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিয়া, উহা স্মৃতিদেবীর নামে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়...

*
* *

কোন কোন ব্যক্তির অতি প্রচুর স্মরণশক্তি—অসাধারণ স্মরণশক্তি। কখন কখন উহারা খুব বুদ্ধিমান হইয়া থাকে; সব সময়ে নহে। খুব দ্রুতভাবে জ্ঞাতব্য বিষয় মনে রাখিতে পারে বলিয়া, সেই দ্রুতগতির বেগে উহারা অনেক সময় না বুঝিয়াই উহা মনে ধারণ করিয়া রাখে। তাহাদের স্মৃতিকে সংযত করা উচিত। কিন্তু ইহা একটা ব্যতিরেক স্থল

ইহা অপেক্ষা বেশী লোক, ক্ষীণতা ও শক্তিহীনতার জন্য স্বীয় স্মৃতির উপর দোষারোপ করে। উহারা বলে :—"আমার স্মরণশক্তি নাই"; অথবা "আমার স্মরণশক্তি বড় খারাপ"; অথবা "আমার অমুক বিষয়ের স্মরণশক্তি আছে, কিন্তু অমুক বিষয়ের স্মরণশক্তি নাই।"

আমার কথা যদি বিশ্বাস কর, ও সমস্ত একটা বাগাড়ম্বর মাত্র, ও সমস্ত যুক্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না।

হীনাঙ্গ অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া সাধারণতঃ সকলেই যেরূপ নিজের পা, নিজের চোখ, নিজের কণ্ঠস্বর কার্য্যতঃ ব্যবহার করিতে পারে, সেইরূপ সাধারণতঃ সকলেরই এতটা স্মরণ শক্তি থাকে যে, তাহা যে-কোন বিষয়ের শিক্ষার পক্ষে ও মনে ধারণ করিয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট।

যে সকল লোক, তাহাদের স্মরণ-শক্তি খারাপ বলিয়া আক্ষেপ করে, প্রায় তাহারা হয় আলসে নয় আনাড়ি। প্রমাণ :—

যাহা-কিছু মনে ধারণা করিয়া রাখা নিতান্ত দরকার, তাহা সকলেই ধারণা করিয়া রাখে। যথা :—রাস্তার নাম, ব্যক্তির নাম, টেলিফোনের নম্বর, নিজের ব্যবসায়ে যে সকল জিনিষ অত্যাবশ্যক। কতকগুলি অভিনেতার—এমন কি খ্যাতনামা অভিনেতার, স্মরণশক্তি সম্বন্ধে একটা খুবই স্বাভাবিক হীনতা সত্ত্বেও তবু তাহারা শিখিতেও পারিত—মনে ধারণ করিয়া রাখিতেও পারিত—কেন?—না, তাহা না করিলে চলে না...তবেই দেখা যাইতেছে, যে-স্মৃতি এটাও ধারণ করিতে পারে সে-স্মৃতি ওটাও ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। সকল লোকেরই হাতিয়ার আছে; অনেকে উহার চালনায় শৈথিল্য করে, কিংবা উহা কি করিয়া বাগাইয়া ধরিতে হয় তাহা জানে না।

ফলতঃ স্মৃতির সাধনা করিতে হইলে একটা প্রবল চেষ্টা আবশ্যক—একটা বিশেষ প্রণালী অনুসরণ করা আবশ্যক। কণ্ঠস্থ করার কাজটা ইচ্ছা-শক্তিসাপেক্ষ, উদ্যম শক্তি সাপেক্ষ। হাতে মাথা রাখিয়া টেবিলের উপর কনুয়ের ভর দিয়া, কাণ বুজিয়া, এই স্মৃতিরূপ রহস্যময় যন্ত্রটাকে আয়ত্ত ও সুনম্য করিবার জন্য, শিখিবার বিষয়টাকে হইবে। ২০ বৎসরের কাছাকাছি বয়সে, প্রবল ও নমনীয় স্মৃতি শক্তি অর্জ্জনের জন্য, শব্দ কণ্ঠস্থ করিতে হইবে, তারিখ কণ্ঠস্থ করিতে হইবে, যুক্তিধারা কণ্ঠস্থ করিতে হইবে। যদি এই স্মৃতির উপর বরাবর বুদ্ধির তত্ত্বাবধান থাকে এবং যদি স্মৃতিকে বুদ্ধির বিশ্বস্ত সখা ও ভাণ্ডার রূপে গ্রহণ করা যায় তা হইলে উভয়ের সমবেত কার্য্যযোগে, শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইবে যে উভয়ের কার্য্যগত পার্থক্য আর উপলব্ধি হইবে না।

স্মৃতির উপর যে কাজের ভার দেওয়া আবশ্যক, তাহা বুদ্ধি আপনা হইতেই বাছিয়া লইবে এবং স্বয়ং স্মৃতিও বুদ্ধিকর্ষিত ক্ষেত্রে নিজের ফসল উৎপাদন করিয়া লইবে।

*
* *

মনে রাখিবার আর কি-কি উপায় আছে? প্রথমতঃ সাঙ্কেতিক নামের পদ্ধতি। ইহার উপর আমার নিজের বড়-একটা বিশ্বাস নাই। আমি এখানে সে সমস্ত প্রণালীর উল্লেখ করিব না। উহারা প্রায় সমস্তই আসল জিনিসের (তারিখ, ঘটনা, নাম ইত্যাদি) স্থান অধিকার করে, মনে রাখিবার জন্য কতকগুলা কল্পিত বুলির সাহায্য লইয়া থাকে। তাহার প্রাসঙ্গ দৃষ্টান্ত—ত্রি-অবয়বী ন্যায় রাজ্যের বিভিন্ন অবয়ব মনে রাখিবার জন্য, কতকগুলা কর্কশ শব্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে—যথা "বার্বারা" "সেলারা" —ইত্যাদি; এই প্রণালী অনুসারেই তারিখ মনে রাখিবার জন্য, তারিখের পরিবর্ত্তে সংখ্যাঙ্কের অনুরূপ কতকগুলা শব্দ প্রয়োগ করা হয়। তারিখের সংখ্যা অপেক্ষা এই কর্কশ শব্দগুলা সহজে মনে থাকিবার কি কোনও হেতু আছে? ইহা একটা রহস্য। এই সমস্ত কৃত্রিম উপায়ের দোষ এই যে, উহা বুদ্ধি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্মৃতির উপর প্রযুক্ত হয়। আমার বিশ্বাসে, ইহার বিপরীতে স্মৃতি ও বুদ্ধিকে পরস্পর হইতে পৃথক করা উচিত নহে। আমি তোতাপাখীর স্মৃতিকে স্মৃতি-ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত করি। সৌভাগ্যক্রমে স্মৃতির তোয়াজের জন্য কতকগুলি বুদ্ধিমূলক

সর্ব্বপ্রথম উপায়টি এই :—

কখনই এমন কিছু কণ্ঠস্থ করিবে না, যাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝা না গিয়াছে এবং যাহার পূর্ব্বাপর যোগাযোগ জানা না গিয়াছে।

—**কিন্তু নাম ও তারিখ?** উহার ভিতর বুঝিবার কি আছে? পূর্ব্বাপর যোগাযোগ করিবার কি আছে?

দেখ, নামের সহিত প্রায়ই একটা বাস্তব তথ্য আবদ্ধ থাকে, তারিখের সহিত কোন একটা ঘটনায় যোগ থাকে। গ্রন্থপৃষ্ঠায় ভৌগোলিক নামের যে একটা ফর্দ্দ থাকে সেই শুষ্ক ফর্দ্দ-ভুক্ত নাম কখনই শিখিবে না। প্রথমেই মানচিত্র দেখিয়া শিখিতে হইবে। এমন কোন তারিখ শিখিবে না, যাহা কোন জানিত যুগকালের মধ্যে অবস্থিত নহে। ইতিহাস পড়িতে হইবে ব্যাপক শতাব্দী কালের হিসাবে এবং আস্তে আস্তে খুজ্‌রা আংশিক বিবরণে ক্রমশঃ নামিয়া আসিতে হইবে।

যদি একটু ভাবিয়া কোন ছাত্র আমাকে এই উত্তর দেয় :—"১৮ শতাব্দীর প্রথম-বৎসরগুলার মধ্যে চতুর্থ-হেন্‌রির মৃত্যু হয়"—আমার কাছে এই কথাই যথেষ্ট হইবে—যদি সেই পরিমাণে ঐ যুগের বড় বড় ঘটনাগুলাও তাহার শেখা হইয়া থাকে। এক বিদ্যাভিমানী তোতাপাখী উত্তর দিবে : —"১৫১১এ—১৬১০এ"। আসল কথা, সে যা শিখিয়াছে, সে তাহার সমস্তটা যোগাযোগ করিয়া দেখে নাই।

শৃঙ্খলা হইতেছে বুদ্ধিবৃত্তির একটা অভিব্যক্তি।

স্মৃতিকে তৈয়ার করিবার দ্বিতীয় বুদ্ধি মূলক উপায় :—

যে-স্মৃতি নিছক্ বুদ্ধিমূলক, সেই স্মৃতিকে সাহায্য করিতে হইবে সেই স্মৃতির দ্বারা যে স্মৃতি আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধ-মূলক। এই দুয়ের একযোগে কাজ হইলে,কাজটা সম্পূর্ণ হয়।

চোখের একটা বিশেষ স্মৃতি আছে। কাণেরও আছে। আঙুলেরও আছে, ঘ্রাণেরও আছে। এমন একটি ইন্দ্রিয়-বোধও আমাদের নাই যাহা বুদ্ধিমূলক স্মৃতিকে সাহায্য করিতে না পারে। এইরূপ সাহায্য করিবার পক্ষে যে দুই ইন্দ্রিয় সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী তাহা হইতেছে—দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়।

আসল বস্তুর প্রতিরূপ বা ছবির দ্বারা স্মৃতির যে সাহায্য করা হয়, সে বিষয় সম্বন্ধে সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

অনেক সময় শিক্ষা-গ্রন্থে ছবির বাড়াবাড়ি ও ছড়াছড়ি করিয়া শেষে এই সাঙ্কেতিক-স্মৃতি-উদ্দীপনার কার্য্যফলটাই নষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক শিক্ষার্থী নিজে, যেন তাঁহার অধ্যয়নে, চাক্ষুষস্মৃতির সাহায্য লইতে অবহেলা না করেন। তিনি যাহা পাঠ করিয়াছেন, যতটা সম্ভব দৃষ্টির দ্বারা তাহা আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য। যাদুঘরের ইহাই একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা; এমন অনেক লোকই যাদুঘরে যায় যাহারা কিছুই পাঠ করে নাই, যাহারা চোখে-পড়া জিনিসগুলা তখনই তখনই ভুলিয়া যায়। চাক্ষুষ-স্মৃতির সুফল যদি পরীক্ষা করিতে চাও, গ্রীক আর্ট-সংক্রান্ত একটা পুস্তক পাঠ কর; তাহার পর প্যারিসের কোন যাদুঘরে গিয়া, যতটা সম্ভব গ্রন্থোল্লিখিত সেই সব রচনার প্রতিকৃতি খুঁজিয়া বাহির কর। গ্রীশ হইতে প্রত্যাগত পর্য্যটক অপেক্ষা তুমি শীঘ্রই গ্রীক্-আর্ট সম্বন্ধে বেশী পণ্ডিত হইয়া উঠিবে।

শ্রুতিমূলক স্মৃতিও কম কাজের নহে। এখনি ইহার পরীক্ষা এইরূপ হইতে পারে। প্রথমে নীরবে রাশিনের (Racine) দশটা কবিতা কণ্ঠস্থ কর; তাহার পর আর দশটা উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি কর। দ্বিতীয় প্রকরণের দ্বারা, হদ্দ এক তৃতীয়াংশ সময় লাগিবে, অথচ ভাল করিয়া শেখা হইবে...শ্রৌত-স্মৃতির আর একটা কার্য্যফল :—ছান্দিক জিনিসগুলা খুব সহজে শেখা যায়।.ছোট ছেলেদের গান করাইয়া শেখানো হইয়া থাকে। বাল্যাবস্থা পার হইবার পরেও গীত কথাগুলি আমরা খুব শীঘ্র ও দীর্ঘকাল মনে রাখিতে পারি। জ্ঞাতব্য কথাগুলা মনে রাখিবার পক্ষে, পদ্যই সুন্দর ও বিশ্বস্ত আধার-পাত্র। সেই দেশের লোকই সৌভাগ্যবান, হোমরের ভিতরে যাহাদের ঐতিহাসিক জ্ঞান নিহিত। আমি একথা স্বীকার করি যে, গ্রীক্ ধাতু মনে রাখিবার জন্য Lancelot যে পদ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে কবিত্বের রশ্মিচ্ছটা বিকীর্ণ হয় না। তথাপি, উহার ভিতর যে ছন্দ ও

স্মৃতিজনিত শ্রমের অনেকটা লাঘব হয়। একথাও আমি স্বীকার করি যে, পদ্যে ফ্রান্সের ইতিহাস সাধারণত অতি শোচনীয়। আক্ষেপের বিষয়, আমার বড় সহযোগী Lavissi পদ্য-রচয়িতা হন নাই!...আবার ইহাও স্বীকার করি, এই রাশিচক্রের চিহ্নগুলা মনে রাখিবার জন্য যে দুইটি ল্যাটিন পদ রচিত হইয়াছে তাহা যেমন সুললিত, তেমনি রাশিচক্রের চিহ্নগুলা শীঘ্র কণ্ঠস্থ করিবার পক্ষে, মনে ধারণ করিয়া রাখিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী :--

Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libraque, Scorpius, Arciteneus, Caper, Amphora, Pisces.

- ...অনেক পদ্য পড়িবে। অনেক পদ্য কণ্ঠস্থ করিবে:— ফরাসী পদ্য, ল্যাটিন পদ্য গ্রীক পদ্য, যে বিদেশী ভাষা অধ্যয়ন করা হইতেছে, সেই ভাষায় পদ্য। ইহা স্মৃতি-শক্তি বাড়াইবার পক্ষে একটা চমৎকার অভ্যাস ও সাধনা; এবং ইহার দ্বারা বুদ্ধিও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে।

স্মৃতির তোয়াজের জন্য সবচেয়ে ফলোপকারী যে বুদ্ধি-মূলক উপায় সেইটি সবশেষে দিবার জন্য রাখিয়াছি; সেটি হইতেছে:—

—লেখা।

আমার অন্য গ্রন্থে, লেখাকে আমি বলিয়াছি —"দ্বিতীয় স্মৃতি"। যে জিনিস লেখা হইয়াছে তাহা প্রথমে কোনক্রমে সেই জিনিসের স্থান অধিকার করে যে জিনিস মনে আনা দরকার। যাহা লেখা হইয়াছে তাহা যদি আবার স্মরণ করিতে পারা যায় তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল।

কিন্তু লেখার আর একটা প্রয়োজন আছে; যাহা মনঃসংযোগ করিয়া লেখা যায় তাহা কতকটা মানস-পটে মুদ্রিত হইয়া যায়। কাপি করা, পুনর্ব্বার কাপি করা, আবার একবার কাপি করা—এই প্রকরণটা বিরক্তিজনক হইলেও অতিবিদ্রোহী স্মৃতির স্থলে, এই উপায়টি অগত্যা অবলম্বন করিতে হয়। আলস্য বশতই এই উপায় অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করা হইয়া থাকে। আসলে ইহাতে সময়ের প্রায়ই ব্যয় সঙ্কোচ হয়। এইরূপে আমরা আর এক পথ দিয়া সেই "হাতে কলমের" শিক্ষা-সাধনায় ফিরিয়া আসি যাহা সমস্ত শিক্ষার পক্ষে, সমস্ত অধ্যয়নের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

তা ছাড়া দিনের মধ্যে যে সকল উল্লেখযোগ্য মানসিক ঘটনা সংঘটিত হয়, পাঠককে তাহা টুকিয়া রাখিবার জন্য— যদি পূর্ব্বেই না পড়িয়া থাকেন—আমি আহ্বান করিতেছি; এই কাজে প্রতিদিন ১০ মিনিট কাল আত্মনিয়োগ করিতে হইবে:—"অমুক চিত্রখানি দেখিয়াছি, অমুক ভাল কথোপকথন শুনিয়াছি, অমুক গ্রন্থ পড়িয়াছি।" এক মাসের শেষে তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন,—বিনা আয়াসে তাঁহার স্মৃতির ভাণ্ডারে কত জিনিস সঞ্চিত হইয়াছে।

যে সকল পাঠক খুব অলস তাহারা পঠিত গ্রন্থের যে সকল কথা তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, অন্ততঃ তাহারা গ্রন্থ পৃষ্ঠার কিনারায় সেই সকল কথার নীচে রেখা টানিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিতে চাহে। পরীক্ষা করিয়া দেখ:- একবৎসর পরে, ঐ গ্রন্থখানি খুলিয়া রেখাচিহ্নিত বাক্যাংশগুলি আবার একবার পাঠ কর—দেখিবে সে সমস্তই তোমার স্মৃতি হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে।

*

* *

শেষ করিবার আগে আর একটা খুব দরকারী কথা এইখানে বলি। আমরা বলিয়াছি, নিতান্ত অক্ষম অশক্ত ছাড়া, উত্তম শিক্ষাসাধনার যে সকল উপাদান সামগ্রী তাহা মনে রাখিবার জন্য সকলেরই যথেষ্ট স্মরণশক্তি আছে। কিন্তু একথা যেন না ভুলি—Inandiর মত অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি ছাড়া—সকলেরই স্মরণশক্তি সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। খুব মনোযোগের সহিত ও প্রণালীপূর্ব্বক অনুশীলন করিলেও, মানবীয় স্মৃতি, বিভিন্ন প্রকারের অনেক সামগ্রী একাধারে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। অতএব, যে সকল জিনিস স্মৃতিকে নিরর্থক বোঝাই করিয়া রাখে, সেই সকল জিনিস যতটা সম্ভব, স্মৃতি হইতে বহিষ্কৃত করা আবশ্যক। এবং আবশ্যকীয় দ্রব্য সঞ্চয়েরও একটা সীমা নির্দ্দেশ করা উচিত। যদি কেহ কতকগুলি উৎকৃষ্ট দ্রব্য স্মৃতির গুদামে উঠাইয়া রাখিতে

ইচ্ছা করেন—তাহা হইলে উহা অগত্যা নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যেই পরিণত হইবে। এই সত্যটী শিক্ষাদাতা মাত্রেরই নিয়মের সামিল হওয়া উচিত। তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে হয় না। কিন্তু দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে:—একপক্ষে তাঁহাদের বহু বিস্তারিত প্রোগ্রাম, যে সকল গ্রন্থ তাঁহারা রচনা করেন ও যে সকল গ্রন্থ তাঁহারা পাঠ্য-ভুক্ত করেন সেই সকল গ্রন্থ—এবং অন্যপক্ষে পাঠকের কিংবা শিক্ষার্থীর স্মরণশক্তি—এই দুই পক্ষের মধ্যে অনুপাত-বৈষম্য যে কতটা তাহা গুরু মহাশয় ও পাঠ্যগ্রন্থের লেখকদের নজরে পড়ে না।

কাহার কতটা স্মরণশক্তি তাহা যাচাই করিয়াই কি কার্য্যারম্ভ করা উচিত নহে? কতটা পাত্রে ধরিবে তাহা না দেখিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া যদি কোন ব্যক্তি পাত্রে সুরা ঢালে, তাহাকে কি উত্তম "সাকী" বলা যাইতে পারে? প্রথমভাগে বলিয়াছি শেখা যায় কি না, দ্বিতীয়ভাগে বলিয়াছি কেমন করিয়া শেখা যায়, এইবার, তৃতীয় ভাগে বলিব, কী শেখা যায়? (দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাব্‌লা

১২

পরের দিন সকাল হইতেই বিভার মনে এমনি চাঞ্চল্য দেখা দিল যে সে প্রতি কর্ম্মে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িতেছিল। প্রমোদ তো আসিবে সেই বিকালের দিকে, তবু এখন হইতেই তার পা এমন মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া দুই চোখের দৃষ্টি ঐ পথের বুকে ঘুরিয়া ফিরিতেছে, তার আশায়! এ কি অসম্ভব অধীরতায় মন কাঁপিয়া উঠিতেছে! এ তো ভালো কথা নয়। বাবা কি মনে করিবেন?

বীরেন্দ্র বাবু চা পান করিয়া বিভাকে কাছে ডাকিলেন, বলিলেন,—আজ প্রমোদ আমাদের বিশেষ অতিথি—তাকে তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়ানোর ভার তোমার উপর। তুমি ফর্দ্দ করে দাও, তাকে কি খাওয়াতে চাও—! তোমার পিসিমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকো না। সে যা ভালবাসে, তা যেন তৈরী করানো হয়।

বিভা বলিল,—আমি কি বুঝি বাবা! যা হবে, আপনি বলে দিন্।

তখন পিতা-পুত্রী মিলিয়া অতিথি-সেবার আয়োজন কি হইবে তার ফর্দ্দ করিতে বসিলেন। তার পর বীরেন্দ্র বাবু বিভাকে বলিলেন,—ঠিক সন্ধ্যার পরই খাওয়া-দাওয়া হবে। প্রমোদ হয় তো বাড়ীতেই ফিরবে। তার ওদিকে অনর্থক বেশী রাত না হয়, দেখো।

বিভা বলিল,—তাই হবে।

তারপর যথা-সময়ে বীরেন্দ্র বাবু কোর্টে বাহির হইয়া গেলে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বিভা নিজের ঘরে আসিয়া বসিল। সে মহা-ভাবনায় পড়িয়াছিল, কি বেশে সে আজ প্রমোদের সাম্‌নে বাহির হইবে! প্রমোদ বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছে, সে এক সৌন্দর্য্য-সুষমার লীলাভূমি! সেখানকার সভ্য নর-নারীর সুবেশ, সুভব্য ভাব-ভঙ্গী তার প্রাণে কি মোহন সুরেরই না সৃষ্টি করিয়াছে! সে দেশের স্মৃতি তার মনে এমনি অনবদ্য শ্রীতে ভরপুর রহিয়াছে—আজ যে ঠিক কোন্ সাজটি পরিয়া তার সামনে দাড়াইলে বিশ্রী বেমানান্ হইবে না, তাহাই সে ভাবিতে বসিল। আজ সে এমন সাজে সাজিয়া প্রমোদের সাম্‌নে দাঁড়াইতে চায়, যে-সাজ দেখিয়া প্রমোদ মুগ্ধ না হোক, অন্ততঃ এ কথা না ভাবে, বিলাতের সে সজ্জিত শ্রীর কাছে এখানকার তার এ শ্রী নেহাৎ খাটো, নেহাৎ ম্লান! বিভাকে কোন দিক দিয়াই না প্রমোদ সেখানকার চেয়ে ছোট করিয়া দেখে।

এই চিন্তাটা মনের মধ্যে খুব যখন প্রবল হইয়া উঠিল, তখন সে গিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল! নিজের যে ছবি আয়নার বুকে সে বিম্বিত দেখিল, তাহা দেখিয়া তার মুখে নৈরাশ্যের ছায়া পড়িল। এ কি মুখ...! কেশের রাশি বারবার খুলিয়া নানা ছাদে বাঁধিয়া সে নানা ভাবেই তাকেই বিন্যস্ত করিতে লাগিল, কোনটাই পছন্দ হয় না! সে তখন বিরক্ত হইয়া শ্রান্ত আচ্ছন্নের মত একটা কৌচের উপর গিয়া বসিয়া পড়িল।

বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে একটা চিন্তা কাঁটার মত বুকে এমন বিঁধিল—যে তার জ্বালায় সে অস্থির হইল। কি জানি, সেখানে সেই সুন্দরের মেলায় কোনো সুন্দরী তরুণী তার স্নিগ্ধ লাবণ্যে যদি প্রমোদের চিত্তকে ভরিয়া রাখিয়া থাকে! মন হা-হা করিয়া উঠিল! না, না!

পরক্ষণেই তার ভারী লজ্জা হইল—সৌন্দর্য্যে সুষমার এমন করিয়া নিজেকে ফুটাইয়া তুলিবার এই যে প্রয়াস—এ প্রয়াস কেনই বা তাকে এমন পাগল করিয়া তুলিল! সে কি আজ রূপের জলুস দিয়া প্রমোদের চিত্ত জয় করিতে চলিয়াছে! ছি! এ দুরন্ত দুর্ব্বার সাধই বা তার মনে জাগিল কি বলিয়া—এই জয়ের ইচ্ছা...এ যে তাকে এক-নিমেষে একেবারে কাঙাল করিয়া ছাড়িতে চায়।

প্রমোদ তাদের ঘরের লোক, আপন-জন, সে যে বড় ভাইয়ের স্নেহে চিরদিন তাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে—তার মাঝে এ রূপ বা তারুণ্যের কথাই বা আসে কোথা হইতে! ছি!

লজ্জায় বিভার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। যদি প্রবাসের কোন নিভৃত কোণে স্বপ্নের উচ্ছ্বাস দেখিয়া কোন সাধ প্রমোদের মনে জাগিয়াই থাকে তো জাগুক তা! সে কেন তাদের এই অনাবিল স্নেহের মাঝে অনর্থক ঐ পথ দিয়া এ ক্ষোভকে ডাকিয়া আনে! এই বিচিত্র কল্পনা সে কি পাগল হইয়াছে! প্রমোদ কি ভাবিবে! স্নেহের বোন্ চিত্তে অসম্ভব ক্ষুধা জাগাইয়া, এ কি বিলাসিনী সাজিয়া ভাইয়ের চিত্তে আজ মোহের সৃষ্টি করিতে চায়! বোনের স্নেহ, বন্ধুর প্রীতি, সব ভুলাইয়া, রূপের চমক দিয়া মায়াবিনীর মতই তাকে আজ ছলিতে চায়, আয়ত্ত করিতে চায়! বিভার মন ক্ষোভে ধিক্কারে ভরিয়া উঠিল! সে ভাবিল, কতকগুলা বাজে লোকের মন-গড়া উপন্যাস পড়িয়া এ কি বিপথে সে নিজের মনকে এতদিন নিজের অজ্ঞাতে এমনি করিয়া টানিয়া আনিয়াছে! সেই অসতর্ক মুহূর্ত্তগুলায় ফাঁক পাইয়া তার মনও এমন আকাঙ্ক্ষাকে বেশ নির্লজ্জভাবেই ছোঁয়াচ লাগাইতে দিয়াছে তো! আশ্চর্য্য!

বিভা ধড়্‌মড়িয়া উঠিয়া পড়িল। মনকে পায়ে চাপিয়া ধরিয়া একটু কঠিন ভাবেই যেন তাকে জানাইয়া দিল, খবরদার! তার পর আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মাথার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেশের রাশিকে হাতে জড়াইয়া বেণীর আকারে বাঁধিয়া ফেলিল—এবং পরক্ষণেই তাড়াতাড়ি রান্না-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সেখানে পিসিমার তত্ত্বাবধানে লোকজন সান্ধ্য-ভোজের বিচিত্র আয়োজনে ব্যস্ত ছিল; সে গিয়া ধপ্‌ করিয়া ছানার পায়সের জন্য কিস্‌মিস্ পেস্তাগুলা ধুইয়া বাছিতে বসিল।

হাতের ছোট-খাট কাজগুলা সারা হইলে সে উপরে আসিল, আসিয়া জানলার ধারে দাঁড়াইল। দুই চোখের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া এখন সে পথে পাঠাইল। পথে, কত লোক চলিয়াছে—নিজেদের কাজে কি সে তন্ময় হইয়া! মাঝে মাঝে গাড়ীও ছুটিয়া চলিয়াছে! চারিদিকে কর্ম্ম-প্রবাহের কি চপল উচ্ছ্বাস! দুইদণ্ড দাঁড়াইয়া বা বসিয়া গল্প করিবে, এমন অবসর কাহারো নাই! এ যেন দম দিয়া কতকগুলা কলের পুতুলকে কে পথে ছাড়িয়া দিয়াছে! এদের কাছে...তার মনে হইল, সে যেন একটা খাঁচার পাখী। এই খাঁচার মধ্যেই তার যা কিছু,—সাধ, আশা, আনন্দ, নৈরাশ্য, দুঃখ—এই খাঁচার মধ্যেই তাদের চকিত খেলায় তার মন উঠিবে পড়িবে! একবার সাধ হইল, সে ঐ পথে তীব্র গতি লইয়া ছুটিয়া বাহির হয়! ঘরের এই খাঁচার মধ্যে প্রাণ যেন তার হাঁপাইয়া উঠিয়াছে! ঐ পথ...সরল রেখার গণ্ডী ধরিয়া কোথায় কতদূরে চলিয়া গিয়াছে, দিকে-দিকে নানা শাখায় আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছে...হঠাৎ মনে হইল, এই পথেরই একটা শাখা ধরিয়া গেলে যাওয়া যায়...যেখানে প্রমোদ আছে! সে এখন কি করিতেছে? হাইকোর্টে যাইবার

কথা দুপুরবেলায়…এতক্ষণে নিশ্চয় হাইকোর্টে—কিম্বা কে জানে, হয়তো এই পথেই নামিয়াছে, আর-ঐ পথেরই একটা শাখা ধরিয়া সে আসিতেছে, তাহাদেরি এই বাড়ীর পানে! আঃ, এখনি যদি আসে!…তার এই অলস কর্ম্মহীন মুহূর্ত্ত তাহা হইলে নিমেষে এখনি একটা প্রাণের পরশে পুলকে মুখরিত হইয়া দুলিয়া ওঠে! কিন্তু…

না, সে একলা কি করিয়া এখন তার সামনে গিয়া হাজির হইবে! তার মনের নানা অসম্ভব কল্পনা তাকে এমন পাগল করিয়া তুলিয়াছে…সে ভাবটাকে তো কিছুতেই চাপিতে পারিতেছে না! নিজেকে ঠিক সেই পুরানো জায়গাটিতে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে—নহিলে সে বড় বিপদে পড়িবে!

বিভা অস্থির মন লইয়া শেষে বড় অর্গিনটার পাশে গিয়া বসিল। একেবারে তার নীরব বুকে ঘা দিয়া কি-একটা সুর বাজাইয়া তুলিল—তার পর সেই সুরেই সুর আর নিজের চিত্তকে মিশাইয়া গাহিতে সুরু করিল,—

হেলাফেলা সারা বেলা এ কি খেলা আপন মনে
এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে!

সুরের ফোয়ারা নিমেষে শতধারে উৎসারিত হইয়া উঠিল। আর তারি বিচিত্র তরঙ্গে বিভার মন কখনো ডুবিয়া কখনো ভাসিয়া নৃত্য-লীলার দোদুল ছন্দে আপনাকে একেবারে মুক্ত করিয়া দিল!

সুরের পর সুর ভাসিয়া চলিয়াছে, আর তারি কুহকে-ভোলা বিভার মন কূল ছাড়িয়া সব ছাড়িয়া ভাসিয়া ছুটিয়াছে সে কোন্ কুল-হারা অকূলের পানে!

বিভা অর্গিনের সুরে গাহিতেছিল,—

সখি, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে!
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে!

সহসা তার সুরের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া পাশে কে ডাকিল,—বিভা—

বিভা চমকিয়া অর্গিন ছাড়িয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল! তার সাম্‌নে…এ কি! বিভার মাথা ঘুরিয়া গেল, দুই চোখের সামনে স্নিগ্ধ আলোটুকুও নিবিয়া আসিল। সে টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল—কোনমতে আপনাকে সামলাইয়া লইবার জন্য সে একবার চক্ষু মুদিল। মুহূর্ত্তের জন্য! তার পর নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল,—আপনি! এর মধ্যে এলেন যে! এই কয়টা কথা বলিতেই বিভার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কণ্ঠের স্বর জড়াইয়া গেল।

প্রমোদ হাসিয়া বলিল,—আমি বোধ হয় ভুল করিনি,—শ্রীমতী বিভা দেবীর সঙ্গেই কথা কবার সৌভাগ্য বোধ হয় হয়েছে আমার?

প্রমোদ দুই চোখের পিপাসিত দৃষ্টি লইয়া বিভার পানে চাহিয়া রহিল। বিভা মুখ তুলিতেই দুইজনের চোখোচোখি হইল। অমনি রাজ্যের লজ্জা আসিয়া তাহাকে একেবারে বেপথু করিয়া তুলিল। সে কোন কথা না বলিয়া চোখ নামাইল।

প্রমোদ বলিল,—সেই ছোট্ট বিভাকে দেখে গেছলুম, আব্দারে-অভিমানে-মাখা ছোট্ট বিভা! সেই তার চোখ দুটি ছলছলিয়ে এলো আমার বিদায়ের মুহূর্ত্তে!…সেই দুই ছল-ছল চোখ আজ তিন বৎসর আমায় ঘিরে রেখেছিল—কোন্ দূরে, সেই সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে! আজো সে চোখ তেমনি ছল-ছল—এর মানে কি, বিভা?

বিভার বুক ঠেলিয়া একেবারে অশ্রুর পাথার উথলিয়া উঠিল। চোখের পিছনে তার অধীর তরঙ্গ এমনি ছলাৎ করিয়া আসিল যে বিভার তাকে রুধিবার প্রাণপণ চেষ্টা একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতায় পরিণত হইল। দুই চোখে জল দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অতীত, বিশেষ করিয়া এই তিনটা বৎসরের প্রতি অধীর মুহূর্ত্ত—একেবারে তার চোখের সামনে প্রচণ্ড দীপ্তিতে জাগিয়া উঠিল। বিভা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

প্রমোদ বলিল,—এখনো মন কেমন করছে না কি?

মৃদু হাসিয়া বিভা ঘাড় নাড়িল, জানাইল, না।

প্রমোদ বলিল,—গান শুনছিলুম তোমার! দু-তিনটে গান ওই ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলুম। ভাগ্যে শুনলুম, নাহলে মনে করতুম, বিভার কথা কইবার শক্তিই বুঝি লোপ পেয়েছে! তা যাক্…গান শুনে কি মনে হচ্ছিল, জানো বিভা?

বিভা সরমে-ভরা দুই কম্পিত চোখ তুলিয়া প্রমোদের পানে চাহিল। চাহিবামাত্র চোখ আবার নামিয়া পড়িল।

প্রমোদ বলিল,—মনে হচ্ছিল, চমৎকার এক বন-কুঞ্জে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর ফুলে-ভরা এক গাছের পাতার আড়ালে বসে পাখী তার সুরের ঝর্ণা খুলে দিয়েছে! সুরে সুরে সারা দুনিয়া একেবারে সুরময় হয়ে উঠেছে!

বিভা হাসিয়া বলিল,—যান্, আপনি ভারী এ!

প্রমোদ বিভার পানে ক্ষণেক স্থির অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; পরে বলিল,—কোন্ ভাগ্যবান্ অতিথির বন্দনা-গান গাইছিলে, বিভা—ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি!—কি সুন্দরই যে লাগছিল!

বিভা বলিল,—কার বন্দনা গাইব আবার! হাতে কাজ ছিল না, তাই এমনি একলাটি গান গাইছিলুম! গান বুঝি আবার মানুষ অত মানে করে নিয়ে গায়?

প্রমোদ বলিল,—এমনি কাজের মধ্যেই তুমি চিরদিন নিবিষ্ট থাকো, বিভা!…আর তোমার এমনি গান শুনেই আমরা ধরণীর বেচারা জীবগুলো ধন্য কৃতার্থ হয়ে যাই!

বিভার সমস্ত বুকের উপর লজ্জা ও সঙ্কোচ মিলিয়া এমন নিবিড় ছায়া বিস্তার করিয়া ধরিয়াছিল যে তার চেতনা ক্ষণে ক্ষণে তাদের তলায় চাপা পড়িয়া যাইতেছিল। জোর করিয়া সে সঙ্কোচ ঠেলিয়া আবার সে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—আপনি বসুন, আমি এখনি আসচি। বলিয়াই বিভা একরকম ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রমোদ তার পানে চাহিয়া রহিল।

সে দৃষ্টির অন্তরালে গেলে প্রমোদ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, তার পর উঠিয়া জানলার ধারে গেল। কিছুক্ষণ জানলার ধারে দাঁড়াইয়া পথের লোক-চলাচল দেখিল; ভাল লাগিল না। তখন আবার ফিরিয়া ঘরের মধ্যে এটা-ওটা নাড়িয়া দেখিতে লাগিল। ঘরের কোণে ছোট একটি টি-পয়! তার উপরে চন্দন কাঠের জাফরি-করা ফ্রেমে-আট্কানো তারি একখানি ফটো! বি-এ পাশ করিয়া কনভোকেশনে যাইবার পোষাক-পরা বিচিত্র মূর্ত্তি! ছবিখানির গায়ে প্রকাণ্ড একটি গোলাপ ফুল সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। সদ্যতোলা রাঙা গোলাপ! প্রমোদ ফুলটা হাতে তুলিয়া তার ঘ্রাণ লইল; পরে সেটি বুকে চাপিয়া চারিধারে চাহিল—তার পর ফুলটাকে জামায় গুঁজিল এবং ছবিখানি যথাস্থানে রাখিয়া একটা চেয়ারে আসিয়া বসিল।

বিভা তখনি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ইহারি মধ্যে সে নিজের বেশভূষা একটু সারিয়া লইয়াছে—রেশমি একখানি শাড়ী পরিয়া কাঁধের উপর দিয়া ঘুরাইয়া তাতে একটা ব্রুচ আঁটিয়াছে, এবং বিস্রস্ত চুলগুলাকে একটা ঢিলা খোঁপার আবরণে সাজাইয়া তুলিয়াছে! তার মুখে চোখে অধরে এমন লালিমা ফুটিয়া যে প্রমোদ তার পানে চাহিয়া চট্ করিয়া চোখের সে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না।

বিভা আসিয়া বেশ সহজভাবেই বলিল,—এখন বলুন তো দিকি বিলেতের গল্প! শোনবার জন্যে আমি একেবারে অধীর হয়ে আছি! সেখানকার পথ-ঘাট, বাগ-বাগিচা, সেখানকার বন্ধু-বান্ধব—তাদের কথা সব বলুন। এগুলো আমার জানা নেই কি না…

প্রমোদ চাহিয়া দেখে, এ যে সেই তার পুরানো বিভাই তার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। স্বরে আব্দারের সেই ভঙ্গী—লজ্জা তার কোনোখানটা ঢাকিয়া আড়াল তুলিয়া রাখে নাই…এ সেই সহজ সরল ছোট্ট বিভাই!

প্রমোদ তখন প্রবাসের গল্প পাড়িয়া বসিল। দূরত্বের ব্যবধান ঠেলিয়া স্মৃতির রঙে রঙাইয়া সে যেন ছবি রচিয়া চলিল, আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার মনও মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই অজানা স্বপ্নলোকে অপূর্ব্ব পুলকের মধ্যে তন্ময় হইয়া প্রবেশ করিল।

১৩

সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণেই বীরেন্দ্রবাবু বাড়ী ফিরিলেন। প্রমোদকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—এই যে এসেছ তুমি… ওদিক্কার কাজ চুকলো?

প্রমোদ হাসিয়া বলিল,—হ্যাঁ, আজই sworn in হয়েছি! দু'একজন সিনিয়ার সাহায্য করবেন, বলেছেন। তাছাড়া এটর্ণি পাড়াও ঘুরে এসেছি—আর একটা কেশও পেয়েছি—আস্চে সোমবারের জন্য!

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—বটে!

প্রমোদ বলিল,—তবে সেটা ক্রিমিনাল কেশ, আপনার কোর্টে!

বীরেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিলেন,—আমার কোর্টে! কি রকম?

প্রমোদ বলিল,—হ্যাঁ। এরা এত খপরও রাখে। এক এটর্ণির সঙ্গে দেখা করতে যেতেই তিনি বল্লেন, আপনি sworn হয়েছেন তো? বেশ হয়েছে। তা এই কেশ নিন,—প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট বীরেন্দ্র বাবুর কোর্টে। কেশ্‌টা একটা cheating case; আসামী মাড়োয়ারি। আমি বললুম, তাঁর ঘরে দাঁড়ানো ঠিক হবে কি? তা ওঁরা বললেন,—কেন হবে না? দোষ কি! আপনি তো তাঁকে influence করবেন না! তা আমি বলেছি, আপনার অনুমতি না পেলে এ case নিতে পারব না।··· প্রমোদ একটু থামিল···তার পরেই আবার বলিল,—এরা খবরও রাখে তো, যে আপনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে,—আপনি আমায় স্নেহ করেন।

বীরেন্দ্রবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন,—তা রাখে বৈ কি!...একটা গল্প বলি, শোনো। তখন আমি ডায়মণ্ড হারবারে। আমার এক ভায়রা-ভাই নতুন উকিল হয়ে আলিপুরে বেরুচ্ছে। তা একটা কেশে আসামীকে আমি জামিন দিই-নি—তার পক্ষে বড় কৌশুলি থাকা সত্ত্বেও। তার পর একদিন দেখি, আসামীর লোক পরেশকে নিয়ে গিয়ে হাজির। আমার সে ভায়রা-ভাইয়ের নাম পরেশ। কারণ? জামিন চাই। ভাবো একবার, পরেশ তো জুনিয়ার—তবু খুঁজে পেতে তাকে নিয়ে গেছে আমার কোর্টে! এরা ঘটককেও হার মানায়! তা তুমি ও কেশ নিতে পারো। আর কিছু না হোক্, আমার সামনে কতকটা সহজভাবে মুখ খুলতে পারবে। অন্য কোর্টে প্রথম মুখ খুলতে একটু বাধো-বাধো ঠেকতে পারে! জুনিয়ার এই সঙ্কোচ কাটানো সম্ভব হয়, যদি কোর্ট একটু দরদ করে, তাকে latitude দেয়! সেই জন্যে হাকিমদের উচিতও জুনিয়রদের একটু ধৈর্য্য ধরে সহ্য করা। তাছাড়া যদি এ কথা কেউ বুঝতে চায় যে হাকিমের জানা কৌঁশুলি কি উকিল দিলে মামলার সুবিধা হবে তো সে আহাম্মক! কেন না, হাকিম তাঁর বিবেককে আগে রক্ষা করবেন,—তারপর জানা-শোনা বন্ধু-বান্ধবের খাতির!···আমি ভাবছি, আমার কোর্টে case নিয়ে তুমি যদি না দাঁড়াও, তোমার পক্ষে সেটা লোকসান তো! তাই বা কেন ভোগ করবে তুমি? যখন এটা জানো,যে তুমিও তোমার conscience-এর বিরুদ্ধে কোন আবদার করবে না, আর আমিও আমার বিবেককে আগে রক্ষা করবো? তবে সুবিধা শুধু এই যে তুমি আমার কাছে নিঃসঙ্কোচে জেরা-টেরাগুলো করতে পারবে—ঠিক পথে না গিয়ে ভুল করলে আমি সেটা বলে শুধ্‌রে দিতেও পারবো।

প্রমোদ বলিল,—বেশ, তাহলে case টা নি—এইটেই হোক আমার ফার্ষ্ট কেশ্, আর আপনিই আমার প্রথম কোর্ট!

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—তারপর তোমার বাড়ী কথা—হ্যাঁ,আমার পেস্কার একখানি বাড়ীর খপর দেছে—আমহার্ষ্ট রোর কাছে—ভালো বাড়ী, নতুন হয়েছে। কাল সকালে সে এসে আমায় বাড়ী দেখাবে। যদি পছন্দ হয় তাহলে কালই ঠিক করে ফেলবো।···তোমার মা আসতে রাজী হয়েছেন তো?

প্রমোদ বলিল,—হয়েছেন।

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—কিন্তু, এধারে থাকলে কাজের পক্ষে অসুবিধা হবে। সিনিয়রদের কাছে হামেশা যাতায়াত করা, সেখানে দুবেলা হাজরে দেওয়া···

প্রমোদ বলিল,—তা খুব হবে। আর তাছাড়া ব্যবসা করতে বসেছি বলে কি দিবা-রাত্রই ঐ ব্রিফের মধ্যে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকবো! সমাজ, লৌকিকতা, এগুলোকেও রক্ষা করা চাই তো!...আর এই পাড়ার কথা বলছেন? দেখুন, ও-পাড়ায় গিয়ে থাকলে আমার সমাজকেও চিরকালের জন্য হয়তো ছেড়ে যেতে হবে। ইংরেজ-পাড়ায় গিয়ে তাদের আপনার জন তো হবই না—মাঝে থেকে নিজের সমাজকে ঐ ইংরেজ-পাড়ার পাঁচিলের আড়ালে চিরকালের জন্য বর্জ্জন করে যেতে হবে!

বীরেন্দ্র বাবু কথাটা লইয়া ভাবিতে বসিলেন, ভাবিয়া বলিলেন,—এ কথা বলেছ ঠিক! এই পাড়ার পাঁচিলই ক্রমে মনের পাঁচিল হয়ে দাঁড়ায়!

তারপর কয়জনে বসিয়া নানা গল্প-গুজবে খানিকটা সময়

কাটাইয়া দিবার পর বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—তুমি এসেছ, তোমার সঙ্গে এবার একটা বড় বিষয়ে পরামর্শ করতে চাই, বিভার বিয়ের সম্বন্ধে। ও তো আই-এ পাশ করেছে—আর পাশ করতে চায় না। তবে ঘরে পড়ছে। লিটারেচারটা বেশ পড়েছে। ঘরে নানারকম কাজও ও শিখচে। তাছাড়া ও বলে,গেরস্থালী শিখবে; সে না হলে ওর জন্মটাই বৃথা হয়ে যাবে! এ কথাটা ও ঠিক বলে, ভারী খাঁটী কথা। যেটুকু শিক্ষা বাইরে পেয়েচে, তারি উপর চর্চ্চা রেখে আরো তাকে বাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব! ওদিকে গেরস্থালী না শিখলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, আর সে কোন কাজেও লাগবে না! কেন না, যত লেখাপড়াই শিখুক, মেয়েদের মন এই ঘরের উপর রাখা চাইই—নাহলে চারিদিকে বিভ্রাট বাধবে, সংসারে শৃঙ্খলা কি শান্তি থাকবে না। আর ও'ও চায় না, যে, বই নিয়েই কাটিয়ে দেয়। আমিও তাতে বাধা দিই না।…ওর হাতের কাজ দেখনি? নিজের হাতে সুতো কেটে চরকায় সেই সুতোয় কাপড় তৈরী করিয়েছে যা, সে একেবারে খাসা!

প্রমোদ বলিল,—বটে, এ কথা তো বলনি বিভা!

লজ্জার রক্তিম আভায় বিভার মুখে চোখে সন্ধ্যার আকাশের মত ফুটিয়া তাকে এক অপরূপ শ্রীতে ভরিয়া তুলিল। প্রমোদ তাহা লক্ষ্য করিল।

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—তাছাড়া শিল্প-কাজ বিভা বেশ জানে! অর্থাৎ ও এমনভাবে নিজেকে গড়ে তুলছে যে যে-ঘরেই যাক্ সেই ঘরই শোভায় শান্তিতে ভরিয়ে দিতে পারে·· বীরেন্দ্র বাবুর চোখ ছলছলিয়া উঠিল। তাঁর মনে পড়িল, বিভার মার কথা! বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন—তাঁরও সাধ ছিল বিভার শিক্ষা সব দিক দিয়ে যেন সম্পূর্ণ হয়—ও যেন নিজের নারীত্বকে সবার আগে নিখুঁৎ করে গড়ে তুলতে পারে!

তারপর আরো নানা আলোচনার পর বীরেন্দ্র বাবু বিভাকে বলিলেন,—তোমার গান শুনিয়ে দাও প্রমোদকে।

বিভা পিতার আদেশে অর্গিনের সামনে গিয়া বসিল—এবং তার কোমল আঙুলের পরশে নির্জ্জীব যন্ত্রটার বুক দুলাইয়া তাকে সজীব করিয়া সেখানে এমন সুরের সৃষ্টি করিল যে সে সুরের স্রোতে সমস্ত বাহিরের বিশ্ব কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল!

রাত্রি প্রায় আটটা—আহারের ডাক পড়িল। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া প্রমোদ বিদায় চাহিলে বীরেন্দ্র বাবু তার হাত দুটি নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—My boy, my boy—I wish your father had been here this evening! How I felt it just now!

প্রমোদের চোখ ঠেলিয়া জল আসিল। অতীত শোকের স্মৃতি তার বুকটাকে নিমেষে প্রচণ্ড বেদনায় অভিভূত করিয়া ফেলিল।

আর-একটা কথা বীরেন্দ্র বাবুর বুক ঠেলিয়া ঠোঁটের পিছনে আসিয়া বাধিয়া গিয়াছিল। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি প্রমোদের পানে চাহিয়া রহিলেন। সে কথা আর বলা হইল না। প্রমোদ উদ্গত অশ্রুকে কোনমতে রুদ্ধ করিয়া বীরেন্দ্র বাবুকে প্রণাম করিল; পরে বিভার পানে চাহিয়া বলিল,—আজ আসি, বিভা!

বিভার চোখের সামনে সমস্ত আলো নিবিয়া গেল! যখন চোখে আবার আলো ফুটিল, প্রমোদ তখন চলিয়া গিয়াছে! সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় দেহ-ভার লুটাইয়া দিল। হায়রে, এত বড় বিশ্বটা এখনি বিপুল পুলকে কেমন ভরিয়া উঠিয়াছিল,…আবার সে যেমন শূন্য, তেমনি শূন্যই রহিয়া গেল!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মধ্যপথ

সম্পদ ও সুখের সহিত অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া ত বোধ হয় না। সুখে আমরা কিরূপ জীবন যাপন করি,—তাহাতেই আমাদের প্রকৃত স্বভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। অনেকের ত দুঃখেই প্রকৃতির নিকৃষ্টাংশ বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং দুঃখও যে আমাদের ভাল করিবেই, এমন কোন কথা নাই। উচ্ছৃঙ্খলতা ও নিগ্রহ এ দু'য়ের মাঝামাঝি কি কিছু নাই? গীতাতেও এ বিষয়ে বলা হইয়াছে। John Oliver Hobbsএর একটি কথা মনে পড়িল "শরীরকে, শুষ্ক, দুর্ব্বল করিয়া স্বাভাবিক মানুষ-ধর্ম্মকে নির্য্যাতন করাই কি আত্মার বিকাশের পক্ষে এতই আবশ্যক? আত্মা কি এত দুর্ব্বল যে পীড়িত দেহ ভিন্ন সে আর তাহাতে ভদ্রভাবে বাস করিতে পারে না? নিছক বস্তুতন্ত্রতার উপরে আর কিছু চাহিতে গেলেই কি কৃত্রিম উপায়ে দুঃখকে টানিয়া আনিতেই হইবে?"

বাস্তবিক সম্পদে এত ভয় কেন? চাপল্য পাপপ্রবৃত্তি, দম্ভ, ক্রোধ, প্রভুত্বের আস্ফালন ভিন্ন সম্পদকে কি আর কোন কাজেই লাগানো যায় না? স্বাধীনতাও এইজন্যই এত বেশী ভয়ের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সম্পদ, শক্তি, স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারে মানুষ যাহা করিতে পারে, দারিদ্র্য, অধীনতা, অক্ষমতার মধ্যে কি তাহা সম্ভব? কিন্তু ঐগুলিতে আতঙ্ক যে-পরিমাণ আছে, যথাযথ ব্যবহারের দিকে সে-পরিমাণে কোনই দৃষ্টি বা শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। তাই প্রৌঢ়ত্ব, বৃদ্ধত্বও অনেকেই হজম করিয়া উঠিতে পারেন না। বৃদ্ধত্বে তবু ঐ অবস্থা কতকটা গা-সহা হইয়া আসে, কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের বেগই দুঃসহতর। ক্ষমতার দম্ভ ও তাহা খাটাইবার ইচ্ছা এই সময় মানুষকে পাইয়া বসে।

তারপর স্বামীর নিজ-পক্ষীয় বহু-স্বজন-পরিবৃত না হইয়া শুধু স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া ঘরকন্নাও অনেকস্থলে "পশুর মত" বলিতে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রকন্যা লইয়া থাকিলেই তাহা "পশুর মত" করিয়া তোলার কারণ কিছু নাই। পশুদের স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া ঘরকন্না করিতে বেশী দেখা যায় না। যাহাকে আমরা যে-ভাবে দেখি, তাহা সেইরূপই হইয়া উঠার সম্ভাবনা। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"ও প্রসিদ্ধিই আছে। তাই গুরুজন ও অন্য আত্মীয়-মণ্ডলীর মধ্যে থাকিবার সময় অনেককে যে ভদ্রতা, শোভনতাটুকু রক্ষা করিয়া চলিতে দেখা যায়, কেবল আপনার পরিবারের মধ্যে তাহার একান্তই অভাব আসিয়া পড়ে। বাহিরের লোক, এমন কি অন্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও যেরূপ ব্যবহার করা যায় তাহাই পাওয়া যায়, সুতরাং তাঁহাদের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করিতেই হয়। কিন্তু আপনার পরিবারের মধ্যে তাহার কোন বালাই নাই। নিজে যেমনই ব্যবহার করি না কেন, তাহাতেও তাহাদের নিকট দেবত্বলাভে কোনই বাধা নাই, এবং আপনার অন্যায়ের জন্য নয়,—কিন্তু তাহাদেরই তাহা দিতে যে-পরিমাণে ত্রুটি হইবে তাহার জন্য তাহারা আপনার কাছে ত তৎক্ষণাৎ শাস্তি পাইবেই, অধিকন্তু সমাজ, ধর্ম্মের দণ্ড ও নিন্দা আছে। এমন অবস্থায় ইহার মধ্যে সকল রকম অপকৃষ্টতা সহজে প্রবেশ করিবার পথ খোলাই থাকে। তাহাকে অতিক্রম করাই বরং কঠিন হয়। কিন্তু তাহা কি স্ত্রীপুত্র-কন্যা লইয়া থাকার দোষ, না, তাহা থাকিতে না জানার দোষ? তবে পৃথিবীর প্রতি, অন্য আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ইত্যাদি আমাদের আরও অনেক কর্ত্তব্য আছে, সন্দেহ নাই। আজকাল ইয়োরোপে একনিষ্ঠ বিবাহের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতার কথা অনেকস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও ইহাই প্রকাশ করে। ঐ সঙ্কীর্ণতা একনিষ্ঠ বিবাহের দোষ নয়,—কিন্তু যেভাবে, নর-নারীর সম্বন্ধের যে আদর্শের মধ্যে উহা প্রচলিত তাহারই দোষ উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। সর্ব্বমানবের সাম্য, স্বাধীনতা, —মাতার ন্যায় পিতারও সন্তানের সম্বন্ধে শারীরিক, মানসিক দায়িত্ব এবং মাতা তাহার জন্মপালনের জন্য যাহা করেন, পিতারও যে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা তাহা করা একান্তই

স্বাভাবিক কর্ত্তব্যমাত্র,এইসকল বিষয়ের জ্ঞান পরিস্ফুট হইলে এবং তাহার সহিত পত্নী ও সন্তানের প্রতি তাঁর সম্পত্তির ভাব দূর হইয়া তাঁহাদের প্রতি যথার্থ কর্ত্তব্যের ধারণা বিকাশ পাইয়া পতিপত্নীর সম্বন্ধ সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার অনেক পরিবর্ত্তন আপনা হইতেই হইবে। ইহার সহিত প্রত্যেক গৃহকে যেন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ পক্ষের দুর্গ করিয়া রাখা দূর হইয়া পরিবারের সকলের সহিত বিশ্ব-মানবতার অবাধ গতি ও যোগ রাখিতে পারিলে একনিষ্ঠতার মধ্যেই যে উদারতা, উন্নত, উচ্চাদর্শের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, সুন্দর হইতে পারে,ইহা তর্ক করিয়া বলিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা বটে।

আর পৃথিবীর প্রতি, অন্যের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আছে, সন্দেহ নাই,—কিন্তু তাহা যাহার যেমন শক্তি, প্রবৃত্তি আছে, সেই অনুসারে করিয়া গেলেই হইল। তাহা কেহ ছবি আঁকিয়াও করিতে পারেন, কেহ পরসেবাব্রত লইয়াও পারেন। এমন কি হাতে-কলমে অপরের জন্য প্রত্যক্ষ কিছু না করিয়াও যিনি উচ্চ ও মহৎজীবন যাপন করিয়া যান, তাহাও 'পশুর মত" বলিতে কাহারও সাহস হইবে কি ? কে কত তপস্যার সহিত কি করিতে পারে ও তাহাতে কতটা দক্ষতা দেখাইতে পারে, তাহাতেই তাহার মূল্য ও বিচার। এমন কি যে কোন অন্যায় করে না বা কোন অন্যায়কে স্থায়ী করিতে সাহায্য করে না, তাহারও জীবনে অধিকার যথেষ্টই আছে। "যম্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ" ইহাও সাধুতার লক্ষণের মধ্যে গণ্য হইতে বাধা থাকিবার কথা নয়। প্রতি জীবনেরই মূল্য আছে এবং প্রত্যেকে আপনার জীবন যদি ভালভাবে কাটাইতে পারে তাহা হইলেই তাহার জীবনের মূল্য শোধ হইয়াছে বলিতে হইবে। জীবনের জন্য আপনার কাছে দায়িত্বই সকলের আগে; সে কর্ত্তব্য পালন করিয়াও যদি কেহ পরের জন্য, জগতের জন্য স্বতন্ত্রভাবেও কিছু করিয়া যাইতে পারে ত ভালই, নতুবা আপনিও জগতের অংশ বলিয়া আপনাকে যে ভালভাবে চালাইতে পারে, সেও জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্যে সাহায্যই করিতেছে। আপনাকে নষ্ট করিয়া কেহ পরেরও ভাল করিতে পারে না—তাহাতে কাহারও অধিকার নাই এবং তাহার কোন মূল্যও নাই এবং তাহা জগদুদ্দেশ্যের পরিপন্থী। পাশ্চাত্য সাহিত্যে কিছুদিন হইতে এ বিষয়ে অনেক বাজে কথাই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কাজ করা আবশ্যক বলিয়া তাহা করিলেই যেন মানুষের আর সব পাপ ও অন্যায়েই অধিকার আছে, এই ভাব তাহাতে অনেক স্থলেই দেখা যায়। আপনি সকলপ্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়াও জগতের কাজে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তাঁহারা ত আপনাদের নষ্ট করেন না, ঐ-সকল কাজে তাঁহাদের অন্তরের মহৎ সম্ভাবনাগুলি বিকাশ লাভই করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদেরও সে-সকল কাজে জীবন উৎসর্গের জন্য নিকটতম কাহারও প্রতি যাহাতে সত্যই অন্যায় না হয় তাহাও ভুলিয়া যাওয়া চলে না। এরূপ জীবন আরম্ভ করিবার আগে সেইজন্য আপনাকে ভালরূপে জানিয়া বুঝিয়া নিকটতম দায়িত্বের বন্ধনে বদ্ধ না হওয়াই উচিত।

যৌবনটাও কি বিষম জিনিষই হইয়া আছে! বিশেষতঃ আমাদের দেশে মেয়েদের সম্বন্ধে ইহাকে কি ভয়ানক ব্যাপার করিয়াই তোলা হইয়াছে ? সর্ব্বদাই সামাল, সামাল। একটু স্বাভাবিকভাবে রাখিতেও আতঙ্ক! একদিকে তাহারা নিজেরা বা কি যেন করিয়া বসে এই ভয়, অন্যদিকে আবার সমস্ত পুরুষ-জাতি যেন তাহাদের দেখিলেই গালে পুরিতে পারে ইহাও মানিয়া লইয়া তাহাদের সেইভাবে ঢাকা, চাপা দিয়া রাখিবার চেষ্টা হয়। একটী মহিলা বলিলেন, তাঁহাদের অল্পবয়সে গাড়ীতে কোথায়ও যাইতে হইলে ময়লা কাপড় পরাইয়া সর্ব্বাঙ্গ মুড়ি দিয়া পাঁচ-সাতজনকে একত্র ঠাসাঠাসি করিয়া রাখিয়াও "অভিভাবকেরা" নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। বিধবাদের সম্বন্ধে বর্ত্তমান নৃশংসতাগুলির প্রধান কারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি যাহাতে তাহাদের সমূলে ধ্বংস হইতে পারে ও তাহাদের দেখিয়া অপরপক্ষের লোভ না হয় সেই চেষ্টা। অস্বাভাবিক অবস্থা গায়ের জোরে চালাইতে গেলেই স্বাভাবিকতা মাত্রকেই ভয় ও চাপাচাপি করা আবশ্যক হয়। অন্যদিকে প্রশ্রয়ের বেলাও তেমনি অস্বাভাবিকতা। তাহাও সহজ, সুন্দর থাকিতে পায় না। কারণ তাহাতে সংযম, বিবেচনার, জ্ঞান ও শিক্ষামাত্র নাই। মেয়েদের

সমস্ত স্বাভাবিকতাকে ধ্বংস করিবার ও চাপা দিবার একদিকে এমন নিপুণ আয়োজন, অন্যদিকে আবার তাঁহাদের শরীর-মনের সম্বন্ধে কোন দৃষ্টি না দিয়াই যেন উন্মত্তের মত ব্যবহারও আছে। একদিকে মানুষ মারিয়া বৈধব্য,—অন্যদিকে বৎসর বৎসর সন্তান-প্রসব এবং আরও সহস্ররকম আতিশয্যের (সময়ে সময়ে তাহা পৈশাচিকতাতেও যে পরিণত না হয় এমন নয়) দ্বারা তাঁহাদের মৃত্যু ও জীবন্মৃত্যুও সর্ব্বদাই ঘনাইয়া আনা হয়। যৌবন ও Sexই বা ঠিকভাবে ব্যবহার করিতে ও তাহার মর্য্যাদা বুঝিয়া চলিতে মানুষ শিখিবে কবে?

আশ্বিনের "ভারতী"তে একটী প্রবন্ধে দেখা গেল লেখিকা ইয়োরোপে একাধিক বিবাহ প্রচলিত না থাকায় নেপোলিয়নের শেষ-বয়সে শান্তিলাভের বাধা হইয়াছিল বলিয়া তাহার সমর্থন করিয়াছেন! বঙ্কিমচন্দ্রও একস্থানে অষ্টম হেনরীর পত্নীবধের উল্লেখ করিয়া উহা যে কত আবশ্যক তাহা জোরের সহিতই বলিয়াছেন! এ যুক্তি ও দৃষ্টান্তগুলির সম্বন্ধে অবশ্য অনেক কথাই বলিতে পারা যায় এবং এ রকম "যুক্তি" হইলে এমন কোন কাজই নাই, যাহার সম্বন্ধে যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু ইঁহারাই আবার মেয়েদের স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারের নামমাত্রেই "পারলৌকিক সুখ" ও "আদর্শটাকে" উচ্চে রাখার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে অবশ্য একনিষ্ঠতা যে উচিত ইহাও পাশ্চাত্যভাব বলিয়া অবহেলিত হইয়াছে। বাস্তবিক আমাদের এই একটী বেশ সুবিধা আছে যে নূতন যাহা কিছু আমাদের ভাল লাগে না, অথচ তাহার যুক্তিও নাই, তাহাকে "পাশ্চাত্য" আখ্যা দিতে পারিলেই সব গোল চুকিয়া যায়। ইহার সহিত এটুকুও অবশ্যই বলিতে হয় যে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পূজনীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহুবিবাহ এবং বিপত্নীকের পুনর্বিবাহের দোষও প্রথম পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়াছেন। বিশেষতঃ শেষোক্তটীর সম্বন্ধে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বিশদ ও সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। এজন্য তিনি নারী, সুতরাং মানব-হিতৈষী এবং উচ্চ আদর্শবাদী মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র, সন্দেহ নাই। তবে তাঁহার নিজ পরিবারেও পিতার মৃত্যুর পরেই বিপত্নীক পুত্রের পুনর্বিবাহের কথা লেখিকার অগোচর থাকিবার কথা নয়।

কিন্তু কাহারও প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা থাকিলেই যে তিনি যে-কোন বিষয়ে যাহা-কিছু বলিবেন তাহাই মানিয়া লইবে ও কেবল তাহাই লইয়া থাকিবে, এমন নয়। শাস্ত্রকারদের সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। তাঁহাদের উক্তির মধ্যে যাহা শাশ্বত, কালোপযোগী এবং কালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও চিন্তার ধারার সহিত মিলিবে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও তাহার প্রভাব কিছুতেই যাইতে পারে না। কিন্তু গলদগুলি ঢাকা, চাপা দিয়া সমর্থনের চেষ্টা বৃথা।—তাহা টিঁকিবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও তাঁহার কাছে বঙ্গ-সাহিত্যের ঋণও কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু তথাপি সত্য সকলের চেয়ে গুরুতর, এবং অন্যায় বা অসত্য শ্রেষ্ঠ লোকদের মধ্যে দেখিতে পাইলেই বরং তাহা আরও বেশী করিয়া দেখানো আবশ্যক হয়। কারণ তাঁহাদের সমর্থনই সকলের কাছে সেগুলির স্বপক্ষে প্রধান অস্ত্র হইয়া উঠে। শাস্ত্রের বিষয়ে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলিয়াই তাহার সম্বন্ধে আপাততঃ বেশী কথা বলিতে বাধ্য হইতে হয়।

উক্ত লেখিকা আরও বলিয়াছেন, "পুরুষকে নারীর চেয়ে দুর্দ্দান্ত জীব মনে করিয়া" শাস্ত্রকারেরা "তাদের জন্য সংসার-সম্ভোগের পথ কথঞ্চিৎ সহজ রাখিয়াছেন।" কিন্তু "ধনীগৃহে বিলাস-ভোগের সঙ্গে ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব অনিবার্য্য-বোধে পুরুষের একাধিক বিবাহের" ও "পথ রাখিলে" তাহাকে "কথঞ্চিৎ" বলা যায় কি? তাহার ফলই বা কি দাঁড়াইয়াছিল? শত শত পত্নী-পরিবেষ্টিত থাকিলেও রাজা-রাজড়াদের শত শত দাসী ও রক্ষিতাও রাখা "আবশ্যক" হইত কি না? এবং ঐ দৃষ্টান্ত সমস্ত সমাজের মধ্যেই অল্পবিস্তর পরিব্যাপ্ত হয় নাই কি? কৌলীন্যের কথাটা মনে করিলেই হয়। বাঙ্গলার অব্যবহিত সীমান্তবর্ত্তী নিম্ন আসামে দাসী-রক্ষা ব্রাহ্মণ কায়স্থ ঘরেও এখনও রীতিমত প্রথা হইয়া রহিয়াছে। "নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি" ইত্যাদি

শ্লোকটী তাহা হইলে কোথায় প্রযুজ্য হয়? সদানিন্দিত পাশ্চাত্য শিক্ষাতেই বরং ইহা কমিতেছে না কি?

আর "দুর্দ্দান্ত জীব"দের "দুর্দ্দান্ত"তা করিতে ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত, না, তাহাদেরই দমন ও শাসন এবং দুর্ব্বলেরা যাহাতে তাহাদের হাতে অন্যায় ও অত্যাচার-গ্রস্ত না হয় তাহাই দেখা উচিত? পুরুষদের অন্যায়, অত্যাচারের কথা যাঁহারা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের ইনি গালি দিয়াছেন, কিন্তু ইহা কি তাঁহাদের সম্বন্ধে বড়ই শিষ্ট বাক্য? ইহা অপেক্ষা যাঁহারা বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন চান, তাঁহাদেরই বরং পুরুষ-চরিত্রে অধিকতর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে বলিয়াই ত বোধ হয়। কারণ তাঁহারা ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়াই আশা করেন। প্রথম হইতেই তাঁহাদের নিম্নাধিকারী করিয়া রাখিতে চান না।

তাহার পর "প্রথম বিবাহের পত্নীই সহধর্ম্মিণী তদ্ভিন্ন অপর সকলে কামজ পত্নী" হইলেই মেয়েদের প্রতি খুব সুবিচার হয় কি? যে "কামে"র জন্য বিবাহ হইল, তাহার কোন অধিকারই খর্ব্ব হইল না,—কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে নির্দ্দোষ নারীরাই হীন হইয়া রহিল!

"নির্দ্দোষী মাননীয়া স্ত্রী পতি-কর্ত্তৃক অপমানিতা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে" পতির "এই পাপের ফলে" তিনজন্ম স্ত্রীযোনি-প্রাপ্তি" এবং "সেই স্ত্রীর" তিনজন্ম পুরুষযোনি-লাভেও মেয়েদের সম্বন্ধ ধারণা ও তাঁহাদের অবস্থা ঐ দণ্ড-পুরস্কার-দানের দ্বারাই পুরস্কাররূপে প্রকাশ করে না কি? এইরূপ অনেক দেখানো যাইতে পারে। "শুধু কথার মালা গাঁথিলে যার জন্য গাঁথা হয় তারও কোন কাজে লাগে না" কথাটী যে খুবই সত্য এবং শ্লোকের "মালা" সম্বন্ধেও তাহা যে সমানই খাটে, এ সকল কেবল তাহাই মনে করাইয়া দেয় মাত্র।

কথা-প্রসঙ্গে অনেক অবান্তর কথা আসিয়া পড়িল। এ সকল উল্লেখ করিবার কারণ, সবদিকেই আমাদের এই দুই বিপরীত দিকে গতিরই প্রবণতা দেখা যায়। একদিকে আধ্যাত্মিকতা, পরার্থতা,"পারলৌকিক সুখের" দোহাই দিয়া মানুষের অতি স্বাভাবিক আশা, আকাঙ্ক্ষার স্থান রাখিব না অন্যদিকে সভ্য মানুষ মাত্রেরই কাছে যেটুকু দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার একান্তই ন্যায্য, তাহাও লঙ্ঘন করিতে সুযোগ ও প্রশ্রয় দিব! এই দুইদিকে আতিশয্যই ত নরনারীর সম্বন্ধের গলদের গোড়ার কথা। যাঁহারা তাঁহাদের সাম্য বাড়াবাড়ি বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, বৈষম্যেই সকল রকম বাড়াবাড়ির সৃষ্টি হয়। এবং পুরুষের ব্যভিচারের জন্য কঠোর দণ্ডপ্রদানের (যদিও তাহার "পূর্ব্বের ন্যায়" হওয়াই যথেষ্ট সম্ভব বা উচিতও না হইতে পারে। এবং তাহা যে কোন্ "পূর্ব্ব" তাহাও নির্ণয় করা সহজ হইবে না) ব্যবস্থাও করিতে হইলে ঐ সাম্যের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না।

বঙ্গনারী

শীতের হাওয়া

শীতের শীতল পিছল হাওয়া
কাঁপায় কানন মন্দ,
বাঁধন-হারা ঢেউয়ের গতির
নাচন তালের ছন্দ।
অস্তরবি আড়াল থেকে
যায় বুঝি তার করুণ ডেকে
শেষ বেলাতে যাবার পথে
ছড়ায় বিদায়-গন্ধ।

স্বপন গাঁথা আঁখির পাতায়
জাগে কিসের হর্ষ!
হিয়ার নীরে শুধুই ফিরে
কোমল কাহার স্পর্শ!
কা'র নূপুরের আভাস পেয়ে
শিউলি হেনা যায় গো ধেয়ে!
মিটিয়ে গোপন ব্যর্থ ভাবন
অতীত যুগের দ্বন্দ্ব!

সুবোধ রায়।

এক রাত্রি *

(গল্প)

আমাদের গ্রামখানির ধার দিয়ে নদীটি ধীর শান্ত ভাবে বয়ে চলেছে। নদীর নাম, বিলাসবতী। হয়তো তার ভৌগোলিক নাম কিছু আছে—কিন্তু সে নাম আমাদের জানা নেই।... ... ...

আমার জীবনের কত সন্ধ্যা এই নদীর নির্জ্জন তীরে বসে কেটে গেছে! কত সন্ধ্যায় সূর্য্যকে আমি নদীর ওপারে ডুবে যেতে দেখেছি! চাঁদ্‌নি রাতে নদীর বুকে জ্যোৎস্নার খেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘুমে চোখ ঢুলে এসেছে!... এখনও গ্রামে এলে এই নদীর নির্জ্জন তীরে গিয়ে বস্‌তে আমার বড় ভাল লাগে। সাগর দেখেছি, আবার এই নদীর তীরেও এতদিন কাটিয়ে দিছি। সাগরের উন্মত্ত লীলার চেয়ে নদীর এই ধীর শান্ত খেলাই আমার বেশী ভাল লাগে। সাগর সুন্দর, কিন্তু তার সৌন্দর্য্য মানুষের প্রাণে ঠিক নির্ম্মল আনন্দ এনে দেয় না। সে যে আনন্দ দেয়—সে আনন্দের সঙ্গে একটু যেন ভয়ের খিচ্‌ থাকে। আর নদী তার সৌন্দর্য্যে মানুষকে একেবারে বিভোর করে তোলে!

সেদিন প্রচণ্ড গরম! সেই ভীষণ গরমে বার হয় কার সাধ্য!... ... ... সমস্ত দিনটা ঘরে থেকে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালুম, তখনও পৃথিবীর বুক থেকে তপ্ত বাতাস আকাশে উঠ্‌ছিল!

সন্ধ্যা হলে চল্লুম—সেই আমার চির-পরিচিত নির্জ্জন নদীতীরে, যেখানে বস্‌লে মন থেকে সব বিশ্ব মুছে যায়। জেগে থাকে শুধু স্তব্ধ কাশবন, নদীর কলগান আর আকাশের চাঁদ।

সেদিন ত্রয়োদশী কি চতুর্দ্দশী হবে; চাঁদ সবে দেখা দিয়েছে। নদীর বুকের ওপর সাদা সাদা জ্যোৎস্না-কণা যেন ঢেউয়ের সঙ্গে নেচে নেচে ভেসে চলেছে!

বসে বসে প্রকৃতির্‌ এই বিচিত্র লীলা দেখ্‌ছি, এমন সময় দূর থেকে বাঁশীর সুর এসে কানে লাগ্‌লো।...আনন্দের সুর নয়! নিরালা নদীর তীরে বসে যে এ বাঁশী বাজাচ্ছে—এ-সুর তার অতীত বেদনা-ভরা স্মৃতির বুক চিরে যেন বেরিয়ে আস্‌ছে!

কে ও, এমন সময় পৃথিবীতে এই করুণ সুর ছড়াচ্ছে?

তাকে দেখ্‌বার সাধ হলো। উঠে চল্লুম সুর লক্ষ্য করে। কাছে গিয়ে দেখি—জীবন-মাঝি বাঁশী বাজাচ্ছে। ও এই নদীর বুকের উপরই প্রথম নৌকা বাইতে শেখে, আজও বাইছে;—কাছেই তার নৌকাখানি বাঁধা। সে আর ঐ নৌকা একই সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেছে—হয়তো এক সঙ্গেই সে-কাজ শেষ কর্ব্বে।

যদিও জীবন এখনও বার্দ্ধক্যের দ্বারে গিয়ে পৌঁছয়নি,—তবু তার প্রাণের সাধ-আহ্লাদ সব তার প্রিয়তমা হারাণীর সঙ্গেই শেষ হয়েছে।

একজনকে সুখে রাখ্‌বার জন্য সে ঐ নৌকাখানা নিয়ে ভূতের মত খাট্‌তো। নৌকার কাজ তখন তাকে নেশার মত পেয়ে বসেছিল। আজো সেই নৌকা, কাজে তার মন নেই। চিরদিনের অভ্যাস ছাড়তে পারে না, তাই করে।... ... ...

ওর কাছেই গিয়ে বস্‌লুম। সে আপন মনে বাঁশী বাজিয়েই চললো।

এই বাঁশী বাজাতে সে হয়তো কোনো ওস্তাদের কাছে শেখেনি—কিন্তু এ-থেকে যে-সুর ঝরে পড়্‌ছে, তা যেমন মর্ম্মস্পর্শী, তেমনি বেদনা-ভরা!

একটু বাদে বাঁশী থামিয়ে চুপ করে সে বসে রইল। সেখানকার সমস্ত বাতাস সেই সুর বুকে নিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো, নদী সেই সুরের প্রতিধ্বনি তুলে বয়ে চললো।

জীবন চুপ করে বসে আছে, কিন্তু অতীতের কত

---

* Guy De Maupassant [illegible]।

সুখ-দুঃখের স্মৃতি-ভরা দিন তার বুকের মাঝে হয়তো এখন তোলপাড় কচ্ছে !...

আমার মনে হল, এরাই মানুষ। সূর্য্যকে সবার আগে এরা উঠ্‌তে দেখে, আবার সবার-শেষে তাঁকে অস্ত যেতেও দেখে। নদী এদের কত দেশ-বিদেশের কথাই না শুনিয়ে যায় ! কত না অদ্ভূত জিনিষ এরা দেখে, কত না ঝড়ের রাত এরা এই নদীর ধারের ছোট্ট-কুঁড়েতে বসেই কাটিয়ে দেছে ! আবার এম্‌নি কত ভরা চাঁদনি রাত ওদের ঐ নদীর বুকের ওপর কেটে গেছে !

... ... এদের বুকে প্রিয়তমার চির-বিচ্ছেদ-জ্বালা, প্রিয়তম পুত্রের জন্য আকুল ক্রন্দন কতই না বাজে ! আর এদের বুক তারি সঙ্গে ওঠে নামে—যেন নদীর সঙ্গে তাল রাখ্‌তে চায় !

যখন নদীর বুক ঝড়ের রাতে আর্ত্ত-নিনাদে কেঁদে ওঠে, তখন এদেরও বুক হয়তো আঁধার ছোট্ট-কুঁড়ের ভিতর অতীত কালের স্মৃতি মনে করে কেঁদে উঠ্‌তে চায় !

* * *

জিজ্ঞাসা করলুম,—তুমি এতদিন মাঝিগিরি কর্চ্ছ—এ তোমার ভাল লাগে ?

একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে সে বল্লে,—যতদিন হারাণী ছিল, ততদিন ভাল লাগ্‌তো ; এখন আর লাগে না। কিন্তু ছাড়্‌তেও ইচ্ছে করে না, আর ছেড়েই বা কর্ব্ব কি ?... ... ... তার পর নৌকাখানার পানে চেয়ে থেকে খানিক বাদে আবার বল্লে—এতদিন ওর সঙ্গেই কাটিয়েছি—আর যতদিন না ভগবান আবার হারাণীর কাছে নিয়ে যান্‌, ততদিন ওর সঙ্গে এক সঙ্গেই কাটুক।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি তো এত দিন এই নদীর ওপর কাটিয়ে দিলে, কিন্তু আশ্চর্য্য এমন কিছু ব্যাপার ঘটেছে কখনো, যা তোমার আজও মনে আছে ?

নদীর দিকে চেয়ে যেন খানিক ভেবে নিয়ে সে বল্লে,—আশ্চর্য্য কি না বল্‌তে পারি না ! তবে সে-ঘটনা,—সে-রাতের সে-ঘটনা আজও আমার মনে আছে। শুনতে চান্‌ ? শুনুন্‌ !—

সে আজ প্রায় বছর দশ-এগারো হবে, তখন আমার হারাণী বেঁচে ছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কাজের শেষে আমার এই নৌকাখানি একলা বাইতে বাইতে ফিরে আস্‌ছিলুম। সেদিনও ঠিক এমনি গরম পড়েছিল, এম্‌নি চাঁদনী রাত ছিল, আর নদীও এমনিভাবে ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছিল। সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর সেদিন যেন একটু বেশী রকম ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। সরকারী বাঁধ-বরাবর এসে আর আমার নৌকা বাইতে আর ইচ্ছে কর্চ্ছিল না, সে ক্ষমতাও ছিল না। নদীর হাওয়ায় খানিক জিরিয়ে নেবো মনে করে সেইখানেই নঙ্গর ফেলে দিলুম।

চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও এতটুকু সাড়া নেই—শুধু নদী তার নিজের ভাষায় বক্‌তে বক্‌তে চলেছে। তামাক খেতে খেতে চারিদিকের এই নিঝুম থম্‌থমে ভাব সেদিন যেন একটু বেশী বলেই বোধ হলো। এত দিন আমার এই নদীর বুকে কেটে গেছে, কিন্তু এ রকম কখনো হয়নি। হুঁকো রেখে শুয়ে পড়্‌লুম।... ... ...

নীল আকাশের দিকে চেয়ে চুপ্‌ করে শুয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ মনে হলো—যেন নৌকাখানা চল্‌তে আরম্ভ করে দিয়েছে, নানারকম ভাবে চল্‌ছে—আর ঢেউয়ের তালে তালে নাচ্‌ছে !

কি জানি কি-একটা শব্দে হঠাৎ চম্‌কে উঠে সোজা হয়ে বসে চারিদিকে চাইলুম—কিন্তু কোথাও কিছু দেখ্‌তে পেলুম না।

আকাশে চাঁদ তেমনি হাস্‌চে, নদীও সেই হাসি বুকে নিয়ে তেমনি-ভাবে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেছে—চারিদিক ঠিক তেমনি নিস্তব্ধ ! ... ... একটু বেশী রকম শ্রান্ত হয়ে পড়েছি বলে মনে হলো। সেখানে থাক্‌তে আর তেমন ইচ্ছাও হচ্ছিল না। উঠে নঙ্গর তুল্‌তে গেলুম, নৌকা নড়ে একটু ভেসে গেল—কিন্তু নঙ্গর উঠ্‌লো না। আমার গায়ের সব জোর দিয়ে টান্‌লুম—তবুও উঠ্‌লো না। কি যেন একটা নঙ্গরকে টেনে রেখেছে।

সেখানকার ঐ স্তব্ধতা আর এই ব্যাপার মিলে আমার মনটাকে যে কেমন করে দিলে।... ... ...একবার মনে

হলো, হয়তো নৌকাখানাকে ফিরিয়ে রাখ্‌লে নঙ্গরটা উঠতে পারে। তাই কর্ল্লু'ম, কিন্তু উঠ্‌লো না। ভয় হলো—আমাদের মত লোক—যাদের মন একটুতেই ছম্‌ছম্‌ করে—এতে তাদের ভয় খুব হয়। শেকল কাটবার তো উপায় নেই, কাজেই চুপ করে বসে রইলুম।

মনে মনে ঠিক কর্ল্লু'ম, এই চাঁদনী-রাতে আরও মাঝি নিশ্চয়ই যাবে—তখন যা-হয় একটা-কিছু করা যাবে।……তামাক খেয়ে ভয় অনেকটা দূর হলো, আবার নিজের অবস্থা মনে করে একটু হাসিও পেল!

সমস্ত দিনের খাটুনির পর নদীর ওপরকার ঝির্‌-ঝিরে বাতাসে ঘুম এল!………তন্দ্রার মাঝে হঠাৎ একটা শব্দ কানে আস্‌তে তন্দ্রা ছুটে গেল।

মনে হলো, নৌকোর ধারে কে-যেন টুক্‌-টুক্‌ করে শব্দ কর্চ্ছে!

হ্যাঁ, শব্দই কচ্ছে—কে যেন কাকে ডাকছে!

ভয়ে আমার সমস্ত দেহ কেঁপে উঠলো! ঘামে নেয়ে উঠলুম!

হয়তো সেটা গাছের ডাল—কিম্বা আর-কিছু স্রোতে ভেসে এসে নৌকার ধারে লেগে ওমনি-ধারা শব্দ কচ্ছে, কিন্তু তবুও আমার ভয় দূর হলো না! আর একবার নঙ্গরটা তুলতে চেষ্টা কর্ল্লু'ম—নঙ্গর উঠ্‌লো না।

খানিক-বাদে কালো মেঘের মাঝে চাঁদ কোথায় লুকিয়ে পড়ল। একটা জমাট অন্ধকার এসে অমন চাঁদনী রাতটাকে গিলে ফেল্লে। সে ঘন-আঁধারে দৃষ্টি চলে না। পারের গাছগুলো অত আঁধারের মধ্যেও যেন দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। ঐ অন্ধকারের মধ্যে থেকে যা-তা ভাবনা এসে আমার মাথায় ঢুকতে সুরু করে দিলে।………

একটু পরেই—আমার বেশ বোধ হলো, এক রমণী-মূর্ত্তি আপাদ-মস্তক সাদা চাদরে আবৃত করে আমার নৌকার ওপর উঠ্‌লো!

ভয়ে আমি শিউরে উঠ্‌লুম! চোখ মেলে তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম।

অমনি সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো!

আমার মনে হলো, সমস্ত নদীটার ওপর কি যেন সব অদ্ভুত জীব ঘুরে বেড়াচ্ছে।………ভয়ে আমার বুক ঢিপ-ঢিপ কর্ত্তে লাগ্‌লো!

নদীতে ঝাঁপ দিতে গেলুম, পার্ল্লু'ম না। ঐ সমস্ত জীবের ভেতর গিয়ে পড়্‌তে সাহস হলো না।… তাছাড়া আমি কোথায় পড়্‌বো তা দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম না, আর সেখান থেকে পাড় কত দূরে, তা ঠিক করাও অসম্ভব! হয়তো লতা-পাতায় জড়িয়ে নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আন্‌বো—এ সবও মনে হলো।

মন থেকে ভয়টাকে দূর করে দেবার চেষ্টা করলুম—পারলুম না। তখন মনের অবস্থা এম্‌নি—যদি একটা ছোট মাছ লাফায়, তাহলেও বোধ হয় সেই শব্দে মূর্চ্ছা যাই। চেঁচাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না! অনেক কষ্টে চেঁচাতে যা শব্দ বার হলো, তা আমার কানেই যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসার মত বাজলো। চুপ করে বসে রইলুম—যেমন একটা ছোট ছেলে ভয় পেয়ে কাঁদতে ভুলে গিয়ে বসে থাকে! নড়া-চড়া কর্ত্তে আর আমার সাহস হচ্ছিল না—যেন নড়া-চড়া করার ওপরই আমার জীবন নির্ভর করছে!

এই ভাবে কতক্ষণ বসেছিলুম, বল্‌তে পারি না। একটু একটু ক'রে লুপ্ত সাহস ফিরে এলো। চোখ মেলে চাইলুম—যা দেখলুম, তাতে অবাক হয়ে গেলুম।

তেমন সুন্দর রাত জীবনে কখনো দেখিনি। ঠাকুরমার কাছে রূপকথায় যেমন শুনেছিলুম, ঠিক তেমনি ধারা!

চাঁদ নিবে যায়নি। এক-টুক্‌রো কালো মেঘ তাকে ক্ষণেকের জন্য ঢেকে ফেলেছিল। সে মেঘখানা সরে গেছে। নীচে নদীর বুক, মাঠ, গাছের মাথা সবই আবার নূতন করে জ্যোৎস্নায় নেয়ে উঠেছে। ওপরে নীল আকাশের গায়ে নক্ষত্র জ্বল্‌ছে—আর তার আলোর ওপর চাঁদের আলো পড়ে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে। জ্যোৎস্নার পুলক-পরশ পেয়ে জলের সমস্ত জীব যেন একসঙ্গে আনন্দ-ধ্বনি করে উঠলো! মাঝে মাঝে ঝিল্লীর সুরও ভেসে আস্‌ছিল!

জানিনা কতক্ষণ এই সৌন্দর্য্য জগতের ওপর ঝরে পড়েছিল! আমি এই আলোর মেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘুমিয়ে পড়লুম।………

যখন ঘুম ভাঙ্‌লো—তখন চাঁদ নিবে আস্‌ছে। নির্ম্মল নীল আকাশে সাদা-সাদা টুক্‌রো-টুক্‌রো মেঘ ভেসে যাচ্ছিল।

চাঁদ নিবে যাবার পরই অন্ধকার হয়ে এল, আবার এ অন্ধকারও একটু একটু করে চলে যেতে লাগ্‌লো।

আমার মনে হলো, যেন সেই রমণী-মূর্ত্তিটি আমার নৌকার ওপর এসে, আমার কাছে বসে কাঁদ্‌তে লাগলো! তার বুক-ফাটা দুঃখের কথা আমায় সে জানাতে লাগলো!

ভয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম।

কে-যেন দূর থেকে সাড়া দিলে। একটু বাদেই নৌকা বেয়ে নফরা-মাঝি এসে উপস্থিত।

তাকে সব কথা বল্লুম। তার পর দুজনে মিলে নঙ্গর টান্‌তে লাগলুম। অনেক কষ্টে সেটা ধীরে ধীরে উঠতে লাগলো। নঙ্গরটা টেনে নৌকায় তুলে দেখি, তার সঙ্গে আটকে রয়েছে একটা মেয়ে-মানুষের আস্ত কঙ্কাল, আর—আর—তার গলায় বাঁধা একটা কল্‌সী!

জীবন-মাঝি চুপ কর্ল্লে!

আমি তার কাছে বিদায় নিয়ে ভাবতে ভাবতে বাড়ীর পানে চল্‌লুম··· ··· ·· কে জানে, কতদিন আগে এই রমণী নদীর বুকে এমনি করে নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়েছে! না জানি কত ব্যথা, কত অভিমান, কত দুঃখই বুকে তার তখন জমা হয়ে উঠেছিল!

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাঠিয়াবাড়ে শিলালিপি আবিষ্কার

১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কাঠিয়াবাড় আক্রমণ করিবার ইচ্ছায় ছত্রপতি শিবাজী মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যসহ অভিযান করেন। তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া পরে অনেকেই বহুবার কাঠিয়াবাড় প্রদেশ আক্রমণ করেন; কিন্তু তাঁহাদের আধিপত্য ক্ষণস্থায়ী ছিল। "বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর।" উঁহাদেরও হইয়াছিল সেই অবস্থ। বিজয়-লক্ষ্মী ইঁহাদের অভ্যর্থনার কোনই ত্রুটি করিতেন না, তাঁহারা নিজেদের প্রতিনিধি সেইখানে রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আধিপত্যও কাঠিয়াবাড় হইতে তিরোহিত হইত; অর্থাৎ সেখানকার প্রজারা দাসত্বের শৃঙ্খল পরিতে ভাল বাসিত না; মুক্ত বায়ু সেবন করিবার ইচ্ছায় মাথা উঁচু করিয়া আততায়ীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইত। বহুদিন পর্য্যন্ত এক সঙ্গে ইঁহাদের রাজত্ব কাঠিয়াবাড়ে স্থায়ী না থাকায় দরুণ মহারাষ্ট্র আক্রমণের অথবা রাজত্বের তেমন চিহ্ন সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সেই কারণে সন্দেহ হইত, বুঝি মারাঠা জাতি কাঠিয়াবাড়ে কোনদিন আসেও নাই।

মহারাষ্ট্র জাতির ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমরা দেখিতে পাই—মহারাষ্ট্র সৈন্য যেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে মাত্র, সে দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে; সে দেশে স্থায়ী ভাবে রাজত্ব করিবার স্পৃহা পূর্ব্বে খুব সম্ভব তাঁহাদের থাকিত না! কাঠিয়াবাড়েও সেই পদ্ধতি অনুসারে লুণ্ঠন করিয়া একটি মাত্র প্রতিনিধির সাহায্যে তাঁহারা এক-চতুর্থ অংশ রাজকর আদায়ের চেষ্টা করিতেন। কাঠিয়াবাড়ের রাজারা কর বন্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেন—রাজ-প্রতিনিধিকেও বাড়ী ফিরিতে হইত।

একটিমাত্র স্থানে তাঁহাদের আধিপত্যের নিদর্শন কাঠিয়াবাড়ে দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা আজও বর্ত্তমান। দমাজী গায়কবাড় নামে এক মহারাষ্ট্রীর মনে এখানে স্থায়ীভাবে থাকিবার বাসনা প্রথমে জাগ্রত হয়। তিনি 'স্বামারাম' নামে একটি পল্লী আক্রমণ করেন ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে। নিকটস্থ এক রাজপুত কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া যৌতুক-স্বরূপ কয়েকটি গাঁও পাইলেন। সেই গাঁয়েই প্রথম মহারাষ্ট্র বসতি সুরু হইল।

দমাজী গায়কবাড় যতগুলি পল্লী পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে

"গোধায়ানা" একটি। এই গাঁটি তাঁহার অধীনে আসবামাত্র তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের একটী পল্লী বসান ও তাহাদের পূজার জন্য একটি "শিব-মন্দির" নির্ম্মাণ করান। এই মন্দিরে মহারাষ্ট্রীয় ভাষার একটি শিলালিপি আছে। সম্প্রতি মন্দিরটি আবিষ্কার করিয়া মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক এই শিলালিপির পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন।

মুসলমান-গৌরব-সূর্য্য যখন মধ্য গগনে বিচরণ করিতেছিল—সেই সময় তাহাদের কাঠিয়াবাড়েও আগমন হয়। এখানে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই তাহারা "গোধায়ানা" আক্রমণ করে। মোগলদিগের এক সুবাদার এস্থানে নিযুক্ত ছিল যে মন্দিরে একদিন সাঁঝে-সকালে ধূপ-ধুনার গন্ধ চতুর্দ্দিক আমোদিত করিত—যেখানে সাঁঝে সকালে কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনির সহিত ভক্তগণের দেব-বন্দনা শুনা যাইত, সেইখানে আজ মাত্র একটি মন্দির জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় নীরবে দাঁড়াইয়া!

পুরাণ-প্রসিদ্ধ কাঠিয়াবাড়ে আর্য্যজাতির বহু প্রাচীন শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্র জাতিরও এ প্রদেশে আগমন বহুদিন হইতেই হইয়াছে—কিন্তু এতদিন উহাদের রাজত্বের 'পাথুরে' প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায় নাই! সেই কারণে মন্দিরের এই মহারাষ্ট্রীয় ভাষার শিলালিপি ঐতিহাসিকের চক্ষে যে কত মূল্যবান, তা বলাই বাহুল্য. কবে এবং কে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাই শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে—

[১]॥ শ্রীশিবচর

(২) ণী তৎপর ॥ দামাজী গা

[৩] য়কবাড় নীরন্তর

[৪]॥ সম্বত ১৩৯৪ জেঠ

[৫]॥ শুদ বীজ

"শ্রী শিবচরণী তৎপর দামাজী গায়কবাড় নীরন্তর সম্বত ১৩৯৪ জ্যৈষ্ঠ শুদ বীজ।"

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অপরাধী

সেদিন শরীর ভাল ছিল না বলে বৈকালে ঘরেই ছিলাম এবং সময় কাটাবার জন্য মনের মধ্যে নানা আলোচনাও পেড়ে বসেছিলাম। কিন্তু সেই নানা আলোচনার মধ্যে যে বিষয়টা প্রধান হয়ে উঠেছিল, সেটা এই অভাগা বাংলা দেশের দুঃস্থ হিন্দু-সমাজের এক খুব সাধারণ ঘটনা।

আমাদের পাড়ার ঘোষেদের বড় জামাইটা মাস-ছয়েক হলো মারা গেছে। ঘোষেদের গিন্নি আমার মাকে সুপারিশ ধরেছিল যে যদি তার নাতি-দুটীকে কোনো স্কুলে ফ্রী করে দিই, তবেই তাদের পড়াশুনো চলে। জামাইয়ের অবস্থা অবশ্য ভাল ছিল না, এবং ঘোষ-গিন্নিরো এমন অবস্থা নয় যে নাতি-দুটী ও মেয়েকে সাহায্য করতে পারে।

বছর দশেক আগেকার কথা—ঘোষ মশায় তখন বেঁচেছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁর বড় মেয়ে মালতীর বিয়ে দেন। অবস্থা তাঁর ভাল ছিল না, কাজেই অল্প পণে ঘর-বর জুটো পাবার সুবিধা তাঁর হয় নি। অল্প-পণে পাওয়া পাত্রটি তখন চল্লিশ টাকা মাহিনায় এক অফিসে চাকরী করত, আর এই কলকাতাতেই একটা বাড়ীর দু-তিন খানি ঘর ভাড়া করে ছোট ভাই আর মাকে নিয়ে থাকত। পাত্রের ছোট ভাই টাকা ত্রিশ মাহিনায় কোথায় চাকরী করতো। এমন অবস্থায়,শুধু পাত্রটীর সৎচরিত্র দেখেই মেয়েটীকে তার হাতে দেওয়া হয়।

বিয়ে হয়ে গেল।

মালতীর স্বামী যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন না কি মালতীর বিশেষ কোন কষ্ট ছিল না। ঐ চল্লিশ টাকা ছাড়া গান-বাজনা শিখিয়ে জামাইটি মাসে আরও টাকা কুড়িক উপার্জ্জন করতো। এতে অবশ্য সংসার এক রকমে চালানো যেতে পারে, কিন্তু আজ স্বামীর অবর্ত্তমানে মালতীর অবস্থা কি রকম?

ষাট টাকায়, কলকাতার মতো স্থানে বাড়ী ভাড়া করে মা, স্ত্রী ও দুটো ছেলে নিয়ে একটা সংসার চালিয়ে কিছু সঞ্চয় করা যায় কি না সন্দেহ! আর যদিও কিছু সঞ্চয় হয়, তা এত সামান্য যে তার সুদে একটা লোকেরও চলে না। সে ভদ্রলোক এই দশ বৎসরে প্রায় পাঁচশো টাকা "সেভিংস্ ব্যাঙ্কে" রেখে গিয়েছিল, কিন্তু এতে তার বিধবা স্ত্রী ও ছেলেটীর ভরণ-পোষণ হওয়া অসম্ভব।

আমি ভেবে দেখলাম, সে ভদ্রলোকটির বিবাহ করাই অন্যায় হয়েছিল। অবশ্য মেয়ের বাপেরও দোষ কম হয়নি কিন্তু তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না। কারণ মেয়ে বয়স্থা হলে তাকে যে-কোন পাত্রে দান করতেই হবে। মেয়েকে অনূঢ়া রেখে এই অন্ধ অত্যাচারী সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তাঁর মতো অবস্থার লোকের সাহসে বা ক্ষমতায় কুলায় না। এ-অবস্থায় সাধারণ আর দশজনে যা করতো তিনিও তাই করে ছিলেন অর্থাৎ কোনো রকমে মেয়েকে পাত্রস্থ করে দায় উদ্ধার হয়েছিলেন।

ফলে স্বামীর অবর্ত্তমানে ঐ পঁচিশ টাকার সুদ ছাড়া, মালতীর আর কী সম্বল আছে! হিন্দু বাঙালীর ঘরের মেয়ে, বিশেষ লেখা-পড়াও জানে না, এবং গরীবের কন্যা, কাজেই সুতা বা পশম কিনে বোনার কাজ শেখার সুযোগও তার ছিল না, কাজেই এখন তার পক্ষে বাঁচবার ও ছেলেটীকে মানুষ কর্ব্বার উপায় কি! এক পরের বাড়ী রাঁধা-বাড়ার কাজ করা; আর পরিচিত পাঁচজনের হাত তোলার উপর নির্ভর করা,—এই দুটি উপায়। প্রথম উপায় অবলম্বনের বাধা প্রচলিত সংস্কার ও নীতির বাঁধন; দ্বিতীয় উপায় অবলম্বনের বাধা ভদ্রত্বের ব্যর্থ অভিমান। সুতরাং এমন অবস্থায় ভরণ-পোষণের একমাত্র উপায়, পরিচিতের সাহায্যে নির্ভর করা।

এমন অবস্থায় মালতী তার দেওরের ঝীকে তাড়িয়ে তার স্থানে নিজেকে বাহাল করে দেওরের ঘরে থেকে ঘর ভাড়া বাঁচালে বটে; কিন্তু তার দেওরের এমন অবস্থা ছিল না যে তাকে ভাত দিয়ে পালন করে! ত্রিশ টাকা তার মাহিনা! তার উপর নির্ভর করে স্ত্রী-পুত্রের খরচ চালিয়ে ও ভাই মারা যাওয়ায় মায়ের খরচ আর বাড়ী ভাড়া দিয়ে ভাইয়ের সপুত্র স্ত্রীকে প্রতিপালন করা অসম্ভব। তখন অনেক চেষ্টার পর এক আত্মীয়ের দেওয়া পাঁচ টাকা মাসহারা তার দেওরকে দিয়ে মালতী কোনো-রকমে তার দেওরের সংসারেই টিকে রইল। ছেলে-দুটীকে আমার দুই বন্ধুর বাড়ী রাখিয়ে তাদের পড়ার বন্দোবস্ত করে দিলাম!

২

মাঝে মাঝে মালতীর খবর নেবার ইচ্ছা হলেও, নানা কাজের ভিড়—যখন কাজ থাকে না, তখন আলস্যের দৌরাত্ম্য! কাজেই খবর নেওয়া আর ঘটে ওঠেনি। কিন্তু এমনভাবে দিন কাটালেও হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে মালতীর খবর পেলাম।

সেদিন রবিবার; কোনো কাজ ছিল না বলে বেলা সাতটায় বিছানা হতে উঠে স্নান করে, জল খেয়ে, বেড়াতে যাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় মালতীর দেওর এসে হাজির। একটু বিরক্ত মুখে প্রশ্ন করলাম ব্যাপার কি?

সে ভদ্রলোক তিক্ত অথচ মিনতি-ভরা করুণ স্বরে উত্তর দিলে,—বৌদি আপিঙ্ খেয়ে মারা গেছেন। কিন্তু কেন যে এ কাজ কর্লেন তিনি, কিছুই বুঝতে পারছি না অথচ পুলিশও ছাড়ে না আমায়। তাদের টানা-হ্যাঁচড়া থেকে রক্ষা করুন মশায়।

মার মুখে শুনেছিলাম, মালতীর দেওর লোকটী বড় সুবিধার নয়। মালতীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা দূরে থাক্, মার-ধর পর্য্যন্ত নাকি করত। চট্ করে এ কথাটা মনে হতেই রুক্ষ স্বরে বল্লাম—আপিঙ্ কেন খেলে, কিছু জানেন না আপনি? নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আপনি খুব মন্দ ব্যবহার করেছিলেন, সেজন্য তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

আমার কথার ঝাঁজ থামতে না থামতে, ভদ্রলোকটী প্রায় কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললেন—কি যে বলেন আপনি! আমি কখনো তাঁর সঙ্গে মন্দ ব্যাভার কর্‌তে পারি? বৌদি, গুরুজন তিনি আমার, তাঁর সঙ্গে—

তাঁর কথায়-বাধা দিয়ে বিরক্ত স্বরে বললাম—চলুন, দেখি কি কীর্ত্তি করেছেন।

৩

মালতী যে তার দেওরের অত্যাচারে আত্মহত্যা করেছিল তার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং খুব সম্ভব আমার কাছে আসার পূর্ব্বেই গোপনে টাকা দিয়ে বশ করায়, পুলিশও আর তেমন ভাবে তদন্ত করে নি। সেখানে সে-ভদ্রলোকের অবস্থার গুরুত্ব অনেকটা লঘু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পুলিশের এই ঔদাসীন্যই আমার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলল যে এ আত্মহত্যার মূল কারণ মালতীর প্রতি তার দেওরের অত্যাচার। একটা দুর্ভাগা মেয়ে, একজনের অত্যাচারে তার জীবন এমন ভাবে শেষ হয়ে যাবে এবং তা জেনেও আমি তার কোনো প্রতিবিধান কর্ত্তে পারবো না? মালতীর দেওরের বিরুদ্ধে একটা বিজাতীয় ঘৃণায় ও ক্রোধে মন আমার উত্তেজিত হয়ে উঠল। স্থির করলাম, এত-বড় একটা অত্যাচার—কঠোর হস্তে এর প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক। ফলে যাতে মালতীর দেওরের শাস্তি হয় সেজন্য সচেষ্ট হতে দ্বিধা করলাম না। পুলিশের উচ্চপদস্থ এক বন্ধুর সহায়তায় ও তার প্রতিবেশীর সাক্ষ্যে অপরাধীর শাস্তি হয়ে গেল।

বাড়ীতে এসে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বললাম—মা, মালতীর দেওরের জেল হয়ে গেল, ছ'মাস।

চম্‌কে উঠে শুষ্ক কণ্ঠে মা বললেন, আঁা, বলিস কি? ছ'মাস জেল! তাহ'লে এ ছ'মাস্ দুটো বাচ্ছা নিয়ে বৌ ছুঁড়ীর উপায়?

মার স্বর শুনে, ঝড়ের ঝাপ্‌টায় নিবে যাওয়া দীপটীর মতো মুহূর্ত্তে আমার আনন্দের দীপ্তি ম্লান হয়ে গেল। ভাবলাম, তাই ত, এই ছ'মাস মালতীর ভাজের জীবন-ধারণের উপায় কি?

আমার মনে হল, এক দুর্ভাগা মেয়ের মৃত্যুর সঙ্গে অপর একজনকে জড়িয়ে তার পরিবারের মধ্যে যে দুর্ভাগ্যের তীর হানলাম, তার জন্য দায়ী কে? আমি নয় কি?...

মা বলে চললেন—মালতী মারা গেল। তার সকল কষ্টের শেষ হলো। তার মরার জন্য দায়ী করে ওর দেওরকে শাস্তি দেওয়ার অত চেষ্টা না করলেই পারতিস্। ওদের হালচাল ত আর অজানা নেই। পয়সা উপায় ত বন্ধ হয়ে গেল। এখন ছ' ছ'টা মাস কাটাবে কেমন করে, বল্ দেখি?

মার কথাগুলো বন্দুকের গুলির মতো প্রাণ বিঁধে আমায় চঞ্চল করে তুলেছিল। আর মুখ তুলে মার দিকে চাইতে পারলাম না। মনে হলো, আজ যা পাপ করে এলাম, এত-বড় পাপ বোধ হয় জীবনে আর কখনো করিনি। চোখ ফেটে আমার কান্না আসছিল।

বোধ হয় আমায় এমনভাবে অনুতপ্ত দেখে,সান্ত্বনার সুরে মা বললেন—যা হয়ে গেছে, তার আর কি কর্ব্বি বল্। এখন দেখ্, যদি ওদের কোনো রকমে সাহায্য করতে পারিস!

কোন কথা না বলে মাথা হেঁট করে মার সাম্‌নে থেকে চলে এলাম।

৪

মার কথা শিরোধার্য্য করে সাহায্য করাই উচিত ভাবলাম। কিন্তু কেমন করে সাহায্যের কথা উল্লেখ করবো, সেইটাই দাঁড়াল এক মস্ত সমস্যা। আমিই উদ্যোগী হয়ে শাস্তি দিয়েছি, এ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে কেমন করে কোন্ মুখে, সেই আমিই এখন সাহায্যের কথা তুলব! অবশেষে মনের নানা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল। চিঠি লিখে তাঁকে সাহায্যের কথা জানাবো, ঠিক করলাম; কিন্তু নিজের ত্রুটির উল্লেখ করবার মতো সৎসাহস আমার ছিল না।

দিনকয়েক পরে চিঠির জবাব এল। আমার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, আমায় প্রশ্ন করেছেন, যে এমনভাবে তাঁকে অপমানিত করবার উদ্দেশ্য কি?

জবাব পড়ে প্রথমটা অবশ্য আমার মন ক্রোধে তেতে উঠেছিল। ভাবলাম, কি এমন অবস্থা তাঁর যে তিনি সাহায্য নিতে অস্বীকার করেন? চিঠিখানা মা'কে দিয়ে বললাম—দেখ দেখি, তোমার কথা শুনে খামকা আমায় অপমান হতে হল!

চিঠি পড়ে মা একটু হেসে বললেন—পাগলা ছেলে, তোরই ভুল হয়েছে যে!

মা আমায় বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় আমি ভুল

করেছি।…তখন ভেবে দেখলাম যে আমার চিঠির এমনতর উত্তর আশা না করাই আমার মূঢ়তা! কারণ এমন অবস্থায় আমার কাছ থেকে পাওয়া সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা একটুও অশোভন বা অসঙ্গত হয় নি। এ ক্ষেত্রে সাহায্য নিতে অস্বীকার করায় তাঁর ভিতরকার আসল মানুষটির প্রকৃত পরিচয়ই প্রকাশ পেয়েছে।

আমার নির্ব্বুদ্ধিতায় আমি মনে মনে মনে কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভিতরের আসল মানুষটার পরিচয় পেয়ে ধন্য হলাম। মন আমার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠ্‌ল।

শ্রীভূপতি চৌধুরী

চেঙ্গিস্ খাঁ

মোগল-সম্রাট বাবর, হুমায়ুন, আক্‌বর প্রভৃতির ইতিবৃত্ত সাধারণ পাঠক ভালোই জানেন, কিন্তু এই মোগল সম্রাটগণের পূর্ব্ব-পুরুষ, রণ-বীর চেঙ্গিস খাঁর সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের অভিজ্ঞতা খুব কম।

চীন-রাজ্যের উত্তরে সীমান্ত-রেখার শেষে, বৈকাল হ্রদের উত্তর-পূর্ব্বাংশে জোরয়া ও বারগু-অধিবাসী চুর্‌-চুর্ বা যুর্‌-যুর্ জাতি তাতারগণের নিকট পরিচিত ছিল। এই জোরয়া ও বারগুই মোগলগণের আদি-বাসস্থান।* আমুর, ইর্নিসি, ইয়টীস প্রভৃতি নদী-বেষ্টিত এই শস্য-শ্যামল প্রদেশে খুব শান্তভাবেই মোগলরা জীবন কাটাইতেছিল, তাহাদের স্বজাতির মধ্যে কোন রাজা ছিল না, তারা তাতার সর্দ্দার উন্‌খাঁর নিরীহ প্রজা ছিল। উন্‌খাঁ, কিন-বংশের নিউচি তাতার-সম্রাট অলটু খাঁর করদ রাজা ছিলেন।† কোন অভাব, কোন কষ্টই মোগলদের ছিল না। পরিপূর্ণ সুখ-স্বচ্ছন্দতার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে তাহারা সংখ্যায় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। উন্‌খাঁ চিন্তিত হইলেন, এই ক্রমশঃ-বর্দ্ধিত জাতি যে অদূর ভবিষ্যতে বিপুল বিক্রমে তাঁহারই বিপক্ষে দাঁড়াইবে না, এ কথা কে বলিতে পারে! উন্‌খাঁ কৌশলে মোগল ধ্বংস করিতে লাগিলেন। এই নরহত্যা কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, অল্পদিনের মধ্যেই মোগলগণ উন্‌খাঁর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আত্মরক্ষার পথে অগ্রসর হইল। দাসত্ব-শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া তাহারা বুঝিল, উনখাঁর অধীনে থাকিলে জাতীয় জীবন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমে তাহাদের অস্তিত্ব বিশ্বের বুক হইতে চিরতরে লুপ্ত করিয়া দিবে! তখন সমস্ত মোগল সমষ্টিতে পরিণত হইয়া ধীরে ধীরে মরুপ্রদেশের পরপারে সরিয়া যাইতে লাগিল; নিরাপদ স্থানে আসিয়া একজনকে তাহারা নেতৃত্বপদে বরণ করিল। ইনিই সেই রণ-নিপুণ দুর্দ্ধর্ষ মোগল বীর চেঙ্গিস খাঁ।‡

ঐতিহাসিকেরা বাদানুবাদের পর স্থির করিয়াছেন, ১১৫৫ খ্রীঃ অব্দে চেঙ্গিস খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অদ্বিতীয় যোদ্ধা ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। মোগলগণ তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত এবং তিনি যাহাকে যে আজ্ঞা করিতেন, সে নির্বিচারে তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিত। মোগলগণের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণের পর তিনি তৎ-কালীন সামরিক শিক্ষায় তাঁহাদের শিক্ষিত করিয়া, বিপুল অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমে দেশের পর দেশ জয় করিতে লাগিলেন। চেঙ্গিসের জয়-দুন্দুভি সারা বিশ্বে মোগল জাতির অভ্যুদয়ের শুভ বারতা ঘোষণা করিল। এইবার তিনি তাঁহাদের প্রতি উনখাঁর অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। সুযোগও মিলিল। উনখাঁর এক অপূর্ব্ব রূপসী কুমারী কন্যা ছিল। চেঙ্গিসের দৃষ্টি

* See Historical Maps by D. Anoilla.

† See Travels of Marcopolo, Page 116—20.

‡ একজন আরব ঐতিহাসিক বলেন, চেঙ্গিস উনখাঁর সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারা রণ-নৈপুণ্য ও স্বদেশ-প্রীতি দর্শনে ভীত উনখাঁ চেঙ্গিসকে মারিবার চেষ্টায় ছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া চেঙ্গিস অধীনস্থ মোগলগণকে লইয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া যান।

পড়িল তাহার উপর। সম্রাট-নন্দিনীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়া উনখাঁর নিকট চেঙ্গিস দুত প্রেরণ করিলেন।* চেঙ্গিস জানিতেন, তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্রাট জ্বলিয়া উঠিবেন। দূত পাঠাইয়াই তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। দূত-মুখে চেঙ্গিসের প্রস্তাব শুনিয়া সম্রাট ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। ঘৃণার সহিত দূতকে বলিলেন,—ভৃত্য হইয়া চেঙ্গিস আমার কন্যার পাণি গ্রহণের স্পর্দ্ধা করে। শীঘ্রই তাহার এ ঔদ্ধত্যের শাস্তি-বিধান করিব।† উনখাঁ তাঁহার বিপুল বাহিনী লইয়া চেঙ্গিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন; দূত ফিরিয়া গেল।

চেঙ্গিস যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। দূত-মুখে সমস্ত শুনিয়া, তিনি সসৈন্যে বৈকালহ্রদের দক্ষিণ প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক শত্রুর আগমন-প্রতীক্ষায় রহিলেন। এই সময় এক জ্যোতির্ব্বিদ অভিনব উপায়ে প্রমাণ করিয়া দেন যে, যুদ্ধে চেঙ্গিসই জয় লাভ করিবেন। এই মহাযুদ্ধে সত্যই বিজয়লক্ষ্মী চেঙ্গিসের কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন। যুদ্ধ-জয়ের পরই তিনি সম্রাটের কন্যাকে নিজ অঙ্কশায়িনী করেন। চীন সাম্রাজ্যের কিয়দংশ জয় করিয়া ১২০২ খ্রীঃঅব্দে (according to D E Guignes 1206) চেঙ্গিস সম্রাটরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর আরও আট বৎসর যুদ্ধে তিনি নানা দেশ জয় করিয়াছিলেন, শেষ যুদ্ধে সাংঘাতিক আহত হন এবং এই ক্ষত রোগেই ১২২৬ খ্রীঃঅব্দে মারা যান।

চেঙ্গিস খাঁ একজন যোদ্ধা ও অদ্বিতীয় বীর ছিলেন সত্য, কিন্তু বিবেক বা হৃদয় বলিয়া কোন বস্তু তাঁহার ছিল না। তাঁহার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। নিম্নে দুই এক-ছত্র উদ্ধৃত করিলাম, এইটুকু পাঠেই পাঠক চেঙ্গিস খাঁর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন।

"Who should be regarded as one of the scourges of mankind which like plague, pestilence, and famine, is sent from time to time to visit and desolate the world." M Polo.

চেঙ্গিসের চার পুত্রের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়; জুজী, জগতি, ওকৃতি, তুলি। জুজী পিতা-বর্ত্তমানে মৃত্যুমুখে পতিত হন, ইনিও পিতার ন্যায় বীর ছিলেন। জুজীর দুই পুত্র,—বটু ও স্যান খাঁ। পিতার উত্তরাধিকারী-রূপে বটু বল্‌গা ও ডন নদীর মধ্যবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং বাহুবলে রুস, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গারী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। বটুর নামে ইউরোপবাসী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত। অল্পকাল রাজত্ব করিয়া ১২৫৬ খ্রীঃঅব্দে ইনি মারা যান। চেঙ্গিসের দ্বিতীয় পুত্র জগতি আক্‌সাস্ ও তুরস্ক সংলগ্ন দেশসমূহ পাইয়াছিলেন; তিনি ১২৯৪ খ্রীঃঅব্দে বটুর জীবদ্দশায় মারা যান। তৃতীয় পুত্র ওকতি পিতার সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু ইনি অল্পদিন রাজ্যভোগ করিয়া ১২৪৯ খ্রীঃঅব্দে পরলোক গমন করিলে জগতির দৌহিত্র বরাক পাঁচ বৎসর রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইঁহার পর এক বৎসর রাজত্ব করিয়া ওকতির পুত্র কেউক ১২৪৮ অব্দে মারা যান। অতঃপর চেঙ্গিসের পৌত্র, তুলীর প্রথম পুত্র মংগু মহা-সমারোহে সিংহাসনে উপবেশন করেন। ১২৩২ অব্দে তুলীর মৃত্যু হয়! তাঁহার কতগুলি পুত্র ছিল, তাহা সঠিক জানা যায় না। ইতিহাসে চারিটি পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়,—মংগু, কব্‌লে, হলগু ও অরতিগবুগ। মংগু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে বিভিন্ন প্রদেশের সুবেদার করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। প্রায় সমগ্র চীন ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য প্রদেশ জয় করিয়া ১২৫৮ অব্দে মংগু প্রাণত্যাগ করেন। মংগু খাঁর মৃত্যুর পর কব্‌লে সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। ইঁহারই রাজ্যকালে সংটুতে তাওয়াখানা ও কারাকোরমের প্রাসাদ পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল।

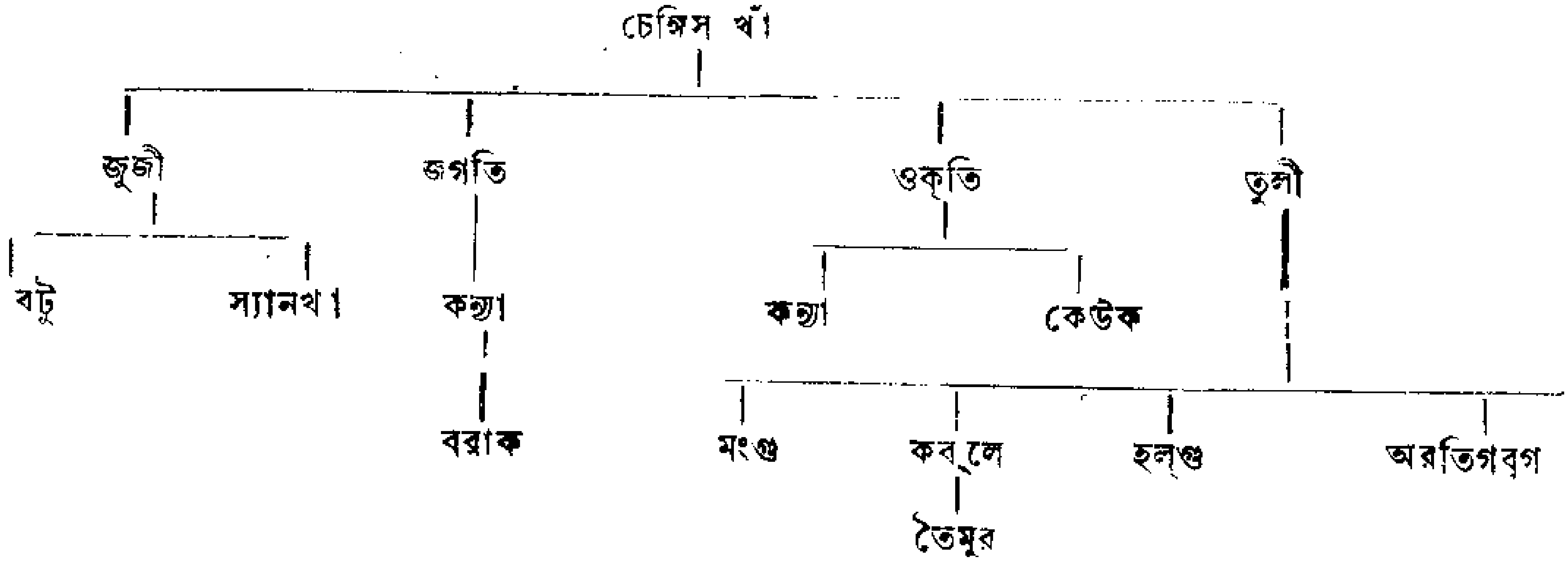
বিভিন্ন ইতিহাস হইতে চেঙ্গিস খাঁর বংশাবলীর যে

---

* কেহ কেহ বলেন, উনখাঁর কন্যাকে চেঙ্গিস পূর্ব্বেই বিবাহ করিয়াছিলেন, পরে বিদ্রোহীদলে যোগ দেওয়ায় শ্বশুর-কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন।

† "Who knowing himself to be my servant, dares o ask for the hand of my daughter? Depart instantly, he said."

বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া হইল :—



কবলে যখন রাজত্ব করিতেছিলেন চতুর্থ ক্লিমেণ্ট তখন রোমের পোপ। খৃষ্টধর্ম্মে কবলে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন; ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য এবং প্রজা-সম্প্রদায়ের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য, একশত ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইবার অনুরোধ করিয়া তিনি ক্লিমেণ্টের নিকট লোক পাঠান। প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ম্যাক্রোপোলোর পিতা নিক্রোপোলো ও ভ্রাতা ম্যাকিওপোলো তাঁহার পত্রবাহক-রূপে ক্লিমেণ্টের নিকট গিয়াছিলেন। ইনি ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১২৯৪ অব্দে পরলোক গমন করেন।

মংগু ও কব্লের সময় হইতেই ভারতবর্ষে মোগল প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হয়; তারপর কবলের পুত্র তৈমুর একটা দাব-দাহের মত ভারত-বক্ষে উদিত হইয়াছিলেন।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

আল্‌তার দাগ

জান্‌লায় বসে ছিলাম……

কলেজের গাড়ীটা খানিকদূরে গ্যাস্-পোষ্ট্‌টার কাছে থাম্‌ল। একটি তরুণী দু-হাতের অঞ্জলিতে অনেকগুলি বই নিয়ে নেমে এল। গলির মোড়ে একটা মুচি বসে জুতো সেলাই কর্‌ছিল। মেয়েটি হঠাৎ তার কাছে থেমে পড়ে' মোলায়েম গলায় বল্লে—এই, আমার জুতোটায় তালি দিয়ে দাও তো! বাবাঃ, এক-হপ্তায় চেষ্টায় দেখা পাওয়া গেল!…বলে মেয়েটি ফুটপাথের ওপর বইগুলি নামিয়ে নীচু-হীল-ওয়ালা জুতোটা খুলে ফেল্লে।…

আল্‌তার দাগ! মেয়েটির পদ্মকলির মতন ছোট ছোট দুটি পা ঘিরে আল্‌তার লালিম লেপন—একটা যেন রঙীন মায়া, জাগরণের বিচিত্র কোলাহলের মাঝে স্বপ্নের মধুর একটি রেশ, আষাঢ় সন্ধ্যার সুর-ভরা একটি রামধনু!

মেয়েটী চলে' গেল, মনে হলো, সরু গলিটা জুতোর ভরে কাঁপচে না, আল্‌তার ছোঁয়ায় শিউরে শিউরে উঠচে!

কথার যত ছন্দ-বাঁধুনীই থাক্, সুরটীকে সে হারায়নি।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত।

হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য

হিন্দী ভাষার কথা 'ভারতীতে' অনেকবার আলোচিত হয়েছে, এ ভাষার পুরানো ইতিহাস জানবার আগ্রহ অনেকের হতে পারে, তাই সংক্ষেপে এখানে কিছু বলছি।

এ ভাষার কবে প্রথম উদয় হলো, কত কালের পুরানো উদাহরণ পাওয়া গেছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার আবশ্যক আমি বোধ করিনে;—ঠিক-ঠিক খবর যা পাওয়া যায় এবং যার প্রমাণ এখনো রয়েছে, আমি শুধু তাই উল্লেখ করতে চাই। ভাষার উদাহরণ হাজার হাজার বছরের পুরানো পাওয়া গেছে, কিন্তু পণ্ডিতরা এখনো সবাই এক-বাক্যে তা মেনে নিতে নারাজ,—তাই উল্লিখিত কথাটা আগেই বলে নিলুম।

নাটক

হিন্দীতে প্রথম নাটক-রচয়িতা হচ্ছেন কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর এবং তা রচিত হয়েছিল পদ্যে। বিদ্যাপতির "রুক্মিণী-পরিণয়" ও "পারিজাত হরণ" নাটক দুটি তৎকালে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত হয়েছিল; কবি কেশোদাস "বিজ্ঞান গীতা" বলে একখানি নাট্যকাব্য প্রকাশ করেন। এ সব নাটক পুরাণো ধরণের এবং এই সব নাটকের রচনা-কাল ১৬৪৮ সম্বতের পূর্ব্বে এবং পরে। এই সময় অনেকেই নাটক লিখেছিলেন। আমি শুধু প্রধান লেখক ও প্রসিদ্ধ বইয়ের কথা এখানে উল্লেখ করছি। এর পরে নাটক লেখা মাঝে অনেকদিন বন্ধ ছিল। বর্ত্তমানে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেছেন। সেগুলি খুব ভালো হয়েছে। আজকাল আবার বাংলা নাটকের অনুবাদ করা হচ্ছে।

হিন্দী গানগুলি যে খুব ভাব পূর্ণ ও উচ্চ ধরণের, তা অনেক বাঙালীই জানেন। হিন্দী গান সুরের ফোয়ারা।

গদ্য রচনা

সব ভাষাতেই পুরানো লেখার উদাহরণ সংগ্রহ করা কষ্টকর। পুরাতন হিন্দী গদ্য রচনার প্রথম উদাহরণ পাওয়া গেছে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও রাওল অমর সিংহের সময় হতে। হিন্দী গদ্য রচনার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ লেখক হচ্ছেন মহাত্মা গোরক্ষনাথ। এর পরে আকবর বাদশাহের আমলে গঙ্গাভট্ট নামক এক লেখক অনেক বই লিখেছিলেন। তার অনেক কাল পরে জাটমল নামক এক লেখক "গোরা-বাদল" বইখানি রচনা করেন, অল্পদিন পরে বিঠ ঠলজী "শৃঙ্গার-রস-মণ্ডল" প্রকাশ করেন; তাঁর পুত্র গোকুলনাথজী অনেক বই এই সময়ে লিখে প্রকাশিত করেছিলেন। এ সময় কেশোদাস, দেবদাস, সুরজ মিশ্র ও অন্যান্য সাহিত্যিকগণ নব-নব গ্রন্থ প্রণয়ন করে হিন্দীভাষাকে শ্রীসম্পন্ন করে তোলেন। এর পরে অনেকদিন হিন্দীভাষায় কোনো ভালো বই আর প্রকাশিত হয়নি।

বহুদিন পরে যখন অযোধ্যা ইংরাজ সরকারের অধীনে এলো, নতুন নতুন পাঠশালা খোলা হলো, তখন নতুন বইয়ের দরকার হলো। এ সময়ে লল্লু লালজী ও রাজা শিবপ্রসাদ অনেক বই রচনা করেছিলেন। ভাষা-প্রবাহের গতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও বরাবর মার্জ্জিত ও সুন্দর হয়ে আসছিল—এ কথা বলা বাহুল্য। দয়ানন্দ সরস্বতী ও রাজা লক্ষ্মণপ্রসাদ এ সময়ে অনেক বই রচনা করেন।

বর্ত্তমান হিন্দী গদ্য রচনার প্রবর্ত্তক হচ্ছেন ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র। ইনি বই লিখে, পত্রিকা সম্পাদন করে—নানা রকম উপায়ে মাতৃভাষার উন্নতি করেন। এর লেখা যেমন গভীর ভাবপূর্ণ, তেমনি সরল। পড়বার সময় লেখার ছটা ও সলীল গতি মনকে মুগ্ধ করে।

কাব্য

হিন্দী ভাষার কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা অজস্র আছে। অনেক বড় বড় কবি বহু প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। নানা ছন্দের এত কবিতা বোধ হয় অন্য ভাষাতে কমই আছে। পূর্ব্বে কবিগণের সম্মান ও আদর যে কত বেশী ছিল এবং লোকে যে তাঁদের কি শ্রদ্ধার চোখে দেখত তা জানলে এদেশকে শত মুখে প্রশংসা করতে হয়। রইস্ ও রাজাদের সভায় বরাবরই একজন করে প্রসিদ্ধ কবি থাকতেন। এক একটি নতুন ছন্দের জন্যে একজন কবি ছত্রিশলাখ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার পেয়েছেন। রাজা ছত্রসাল কবির পাল্‌কীর দণ্ড নিজের স্কন্ধে ধারণ করেছিলেন। রাজসম্মান ছাড়াও দারিদ্র্যব্রতী, জ্ঞান-ভিক্ষু

কয়েকজন বিখ্যাত পুরানো কবির নাম দেওয়া গেল,—চন্দ কবি, জহ্লন, বিদ্যাপতি, ফকীর দাস ও মহাত্মা রামানন্দ। বল্লভাচার্য্য কবি অনেক 'ভজন' গান রচনা করেছিলেন। হিন্দীভাষা যাঁদের গৌরবে গৌরবান্বিত, তাঁরা হচ্ছেন, সুরদাস, তুলসীদাস, হিত হরিবংশ, দেবজী, মীরাবাই, গঙ্গ, নরোত্তম দাস, হরিদাস, সুন্দর। আরো অনেক কবির নাম, যাঁদের উল্লেখ আমার এই ছোট প্রবন্ধে কুলোবে না, নিঃসঙ্কোচে করা যেতে পারে। হিন্দী ভাষায় খুব বিখ্যাত কয়েকজন মুসলমান কবিও আছেন; যথা—রহীম, জায়েসী, তানসেন, রসখান ইত্যাদি। হিন্দীর এক প্রসিদ্ধ লেখক বলেছেন যে, সুরদাস, তুলসীদাস ও দেব কবির তুলনা সেকস্‌পিয়র, হোমার ও বারজিলের সহিত অনায়াসে করা যেতে পারে।

এ সব গেল পুরানো হিন্দী সাহিত্যের জীবন-কথা। বর্ত্তমান যুগে হিন্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র। এঁর লেখার সহিত অনেক বাঙালীর পরিচয় আছে। আজ-কাল যাঁরা হিন্দীর বড় কবি ও লেখক তাঁদের নাম হচ্ছে মৈথিলীশরণ গুপ্ত; মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী; পদমলাল বখ্‌সী, কৃষ্ণকান্ত মালবীয়, বদরীনাথ ভট্ট, গোপালশরণ সিংহ, ভগবান দাস, গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী প্রভৃতি। অনেক কবি এক-একটি ছদ্ম নামে (Nom-De-Plume) কবিতা লিখে থাকেন এবং এ প্রথা বহুদিন থেকে চলে আসছে। কবিবর মৈথিলীশরণ তাঁর কবিতাবলী "সনেহী" নামে প্রকাশিত করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক কাব্যের অনুবাদ হিন্দীতে করা হচ্ছে। হিন্দী ভাষার প্রধান গৌরব হচ্ছে এই যে, এ ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করলে ভারতের অন্য প্রদেশবাসীরাও অতি সহজে তা বুঝ্‌তে পারে।

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী।

আলোচনা

নানা কথা

যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করে এসেছে একা পুরুষ। সাহিত্যে, শিল্পে, পলিটিকে সর্ব্বত্র পুরুষই নিজেকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছে। সমাজ বল্‌তে, নীতি বল্‌তে, ধর্ম্ম বল্‌তে আমরা যা-কিছু বুঝি তাতে শুধু পুরুষেরই হাত সুস্পষ্ট দেখতে পাই। জাতীয় আদর্শ প্রভৃতি নিয়ে আমরা চীৎকার কর্‌ছি, পূর্ব্বপুরুষের অবদান নিয়ে ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন কর্‌তে যাচ্ছি,কিন্তু ভেবে দেখেছি কি সেগুলি কি পরিমাণে representative? সেগুলি যে পুরুষেরই আদর্শ, পুরুষ-মনের সৃষ্টি। ভারতের যা-কিছু আদর্শ তাতে অর্দ্ধ ভারতের অংশ নেই, ভারতের নারীকে বাদ দিয়ে আমরা প্রাচীন ভারত গড়েছিলাম, আর সেই প্রাচীন ভারতের ভিত্তির উপরে নূতন ভারতের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে যাচ্ছি। সব দেশেই এমনি। সব দেশেই সমাজ, পলিটি, সাহিত্য,আর্ট—জাতীয় আত্মার আত্মপ্রকাশ—সব একপেশে, সব পুরুষালি, সব নারীত্ব-বর্জ্জিত।

ভবিষ্যতে বড় একটা প্রতিঘাত ও সেই সঙ্গে সত্যের পরিচয় অবশ্যম্ভাবী। এ যাবৎ যা কিছু সৃষ্টি করেছে, সে একা পুরুষ। নারীকে সে নিজেরই মনের মতো করে দেখেছে—আসল নারীটি তার সমগ্র নারীত্ব নিয়ে পুরুষের চোখে ধরা দেয়নি। তাই সে এক-তরফা আইন-কানুন গড়েছে—এক তরফা বিচার করে এসেছে—নিজের idealগুলি যুগ-যুগ ধরে নর-নারী উভয়েরই বলে চালিয়ে এসেছে। কিন্তু একদিন পুরুষের খেয়ালে গড়া কাল্পনিক জগৎ নারী-হৃদয়ের সত্যের স্পর্শে ভেঙ্গে পড়তে পারে; একটা সত্য পরিচয় ও সেই সঙ্গে একটা সত্যিকার বোঝাপড়া আস্‌বেই। রহস্যময়ী নারীকে জান্‌বার জন্য পুরুষ-হৃদয়ের যে অদম্য আকুতি, নারীকে অর্দ্ধেক মানবী ও অর্দ্ধেক কল্পনা বলে, sphinx রূপে প্রতীক গড়ে, সে ব্যাকুলতায় পরিচয় সে যুগ যুগ ধরে দিয়ে আস্‌ছে। ভবিষ্যতে নারী সাহিত্যে, সমাজে, রাজনীতিতে, আর্টে আত্মপ্রকাশ না কর্‌লে তার নিরাকরণ হবে না। পরস্পরকে বুঝ্‌তে পারলেই স্থায়ী শান্তির সূত্রপাত হবে এই দুই চির-সংযুক্ত চির-বিযুক্ত, চির-বিপরীত, চির-পরিচিত জাতির মধ্যে।

কিছুদিন থেকে ভাবছি যে সংযমই সভ্যতা আর অসংযম অসভ্যতা; সভ্যতার মাপকাঠি সংযম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। সংযম—দেহের সংযম, মনের সংযম, আত্মার সংযম—শক্তির সংযম, কর্ম্মের সংযম ভক্তির সংযম—প্রেমের সংযম জ্ঞানের সংযম, মেধার সংযম—ভাষার, চিন্তার, বেশের, আহারের, পদক্ষেপের, কর-সঞ্চালনের,—যত-কিছু বিষয় আমরা ভাবতে পারি, করতে পারি,দেখ্‌তে পারি, শুন্‌তে পারি, হতে পারি—তার মধ্যে একটি শুদ্ধ, শান্ত, সংযত সৌন্দর্য্যবোধের করস্পর্শ দেখতে চাই। তাকেই আমি সভ্যতা বলব যা

ফেনিল উচ্ছ্বাসের তরঙ্গভঙ্গে নিজের প্রাণ নষ্ট করে না, মাদকতার মোহে শক্তির অপচয় করে না, বিদ্রোহের উন্মত্ত মাতামাতিতে সৃষ্টির ঐশ্বর্য্য হতে দূরে সরে যায়, জড়ের মতো শয়ান থেকে স্বপ্ন-বিলাসে, নিদ্রার অহঙ্কারে চক্ষু বুজে বিশ্বটাকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীর উন্নতির গতি রোধ করে না।

বহু বিবাহের issue যে-সব সন্তান তাদের বহু-বিবাহকারী পিতা বা বহু-বিবাহকারিণী মাতার ওপরে শ্রদ্ধা-ভক্তি না হওয়াই স্বাভাবিক কারণ বহু-বিবাহের বহু সঙ্গমের presiding deity কামদেব আর কাম-সন্তানদের প্রতি অনুকূল ভাব নয়। কামুক-কামুকীর দায়িত্ব-হীনতাপ্রসূত সন্তানগুলি সমাজে যথার্থ স্থান পেতে পারে না, পিতামাতা তাদের জন্ম সাধনা করে নি। তাদের জন্ম যেন একটা accident; শুদ্ধ সংযত জিতেন্দ্রিয় ভাবে তাদের পিতামাতা প্রজাপতিকে স্মরণ করে সংযুক্ত হন নি, হয়েছেন উচ্ছৃঙ্খল কামদেবের দায়িত্বহীন বিলাস-চাপের দুর্ব্বলাত্মভেদী সায়কের প্রভাবে।

প্রত্যেক নরনারী বিবাহের পূর্ব্বে এই কটি প্রশ্নের উত্তর দিন ; (১) আমি যে সন্তানের জন্ম দেব—তাকে জ্ঞানে গরীয়ান, দেহে বলীয়ান, বিক্রমে দুর্জ্জয়, আত্মায় উন্নতিশীল করে তোল্‌বার মতো দেহের তেজ, মনের শক্তি, আত্মায় সংযম আছে কি আমার? (২) আমি যে পরিবারের সৃষ্টি কর্‌ব তার প্রত্যেকের উচ্চতর তৃপ্তির জন্যে নিজের সমস্ত ক্ষুদ্রতা, সমস্ত স্বার্থ, সমস্ত জড়তা প্রেমের সঙ্গে ত্যাগ কর্‌তে পারব কি? তাদের চালনার জন্য কখনো ক্ষমাশীল, কখনো নিষ্ঠুর, সর্ব্বদা তেজোদৃপ্ত ও স্নেহনম্র থাকতে পারবো তো? (৩) আমি যাদের জন্ম দেব তাদের শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য হয়েছি তো?

ভালবাসার দ্বারা যাঁরা মিলিত হবেন, তাঁদেরও নিজেদের যাচাই করে নিতে হবে। তাঁরা যে সন্তানের trustee, দেহ,মন-আত্মা সর্ব্ববিষয়েই এটা যেন তাঁদের মনে থাকে। তাঁরা যদি নিজেদের কোনো বিষয়ে অক্ষম মনে করেন ভবিষ্যতে জাতির কথা ভেবে কঠোরতম সংযমের দ্বারা নিজেদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এই তাঁদের চূড়ান্ত আত্মত্যাগ।

অনেক সময় ভেবে দেখতে হয় প্রেমের মধ্যে কতখানি কাম, কতখানি লোভ এবং কতখানি অন্য কিছু বাইরের জিনিষ। দুনিয়ায় অনেক বাজে জিনিষ প্রেম নামে চলে এবং যখন তা দুদিনেই অদৃশ্য হয়ে যায় তখন প্রেমের গৌরবেরই হানি হলো বলে লোকে মনে করে। যখন দেখি প্রেমিক-প্রেমিকা দুদিনেই পরস্পরের প্রতি হতানুরাগ হয়ে divorce কর্‌তে যান্, তখন প্রেমের এই পরিণাম বলে আর কেউ মনে করতে পারে আমি কিন্তু বলব—এটা হয় রূপ-গুণ-মোহের, নয় দেহ-ভোগ-লোভের, নয় অর্থলিপ্সা প্রভৃতি হীনতর বস্তু-কামনার পরিণতি। প্রেমমাত্রেই বড় এবং এসব জিনিষ থেকে এত পৃথক যে তার পরিণাম এমন হৃদয়হীন নয়! তার পরিণাম হতেও পারে tragedy কিন্তু সে tragedy এমন comic নয়। তা বড় গভীর, বড় মর্ম্মন্তুদ বিশ্বের কোণে বিরাট্ নিয়মের অলঙ্ঘ্য বিধানের সঙ্গে বিদ্রোহ সম্বন্ধে যুক্ত। দুটি প্রাণ পরস্পরকে ভালবাসে অথচ মিলিত হতে পার্‌ছে না, এই হয়ত সব-চেয়ে বড় tragedy।—তার চেয়ে একটু খাটো সেই tragedy, যার উৎপত্তি একজনের প্রেমে ও অন্যের বিতৃষ্ণায়।

হিন্দু নারীর ভালবাসা কি? হিন্দু সতী তাঁর স্বামীকে ভালবাসেন না ; ভালবাসেন হিন্দুনারী সংস্কারকে। যে-ভালবাসা তিনি স্বামীকে দেন সে ভালবাসা তিনি অন্য লোককেও দিতেন যদি সে তাঁর স্বামী হতো। অর্থাৎ তিনি স্বামীকে ভালবাসেন, মানুষকে নয়। হরির স্ত্রী যদি রামের স্ত্রী হতেন রামকেই তিনি ভালবাস্‌তেন ; মধুর হলে মধুকেই তাঁর ভালবাসা অর্পণ করতেন। হরি বা রাম বা মধুর বিশেষ গুণের জন্য নয়, হরি বা রাম বা মধু স্বামী পদবী পেয়েছে বলেই। "নৌকাডুবি"র কমলা এইরূপ হিন্দু সতী। সে obstructionকেই ভালবাসে, স্বামীকেই ভালবাসে, কোনো-একটি মানুষকে নয়। হিন্দু সতীর type সে।

আমাদের বিবাহের আদর্শের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্বন্ধ খাপ খাচ্ছে না। বিবাহের প্রাচীন আদর্শের মূলে ছিল যৌন প্রেরণা। তাকে সমাজ সংযত করলে ভাবের আবরণ দিয়ে, নিয়মের বাঁধনে, লোক-মতের বেড়াজালে। তখন মানব-মন এত শিশু এবং মানবদেহ এত সবল (অন্ততঃ মনের তুলনায়) ছিল যে বিবাহের সময় মনের সঙ্গে সমাজকে পরামর্শ কর্‌তে হয়নি, হয়েছে শুধু দেহের সঙ্গে। দেহ পদার্থটা এমনি স্থূল যে যে-কোনো বিপরীত দেহে তার মিলন আট্‌কাত না। তাই যে-কোনো দুটি পাত্র-পাত্রীকে উপযুক্ত বয়সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ কর্‌লে তাদের শিশু-মন আপত্তি কর্‌ত না। দেহের মিলনটাই সব ছিল, মন ছিল subordinate—সুতরাং মনোবিবাদ বিশেষ হতো না। এখন কিন্তু মনের দাবী বেড়ে গেছে। মন এখন দেহের সমকক্ষ—দেহ যদি সংস্কার-বশে একটা কিছু কর্‌তে যায়, মন তাড়া দিয়ে ওঠে। যাচাই না করে, নিজের দাবী বাহাল না করে সে ছাড়ে না। মন চায় মানসী বধূ, মনোমত বর। তখন যদি নর-নারীকে টাকা বা কুল বা জাতি দেখে মিলিত করা যায় সমাজের অভিপ্রায় ভাল হলেও সে মিলন ব্যর্থ হতে পারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিলের অভাবে। দেহের নিয়ম আমাদের জানা আছে—দেহ স্থূল এবং ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে। মন কিন্তু স্বতন্ত্র জিনিষ, তার আইন-কানুন—অজানা। "চলেন তিনি গোপন চালে স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে ; কেই বা তাঁরে দিচ্ছে এবং কেই বা তাঁরে নিচ্ছে।" মন যে কখন কার ওপরে প্রতিকূল হয়ে ওঠে তা জানা

সমাজের সাধ্য নয়। তাই সমাজ জোর করে দেহের মিলনের ব্যবস্থা করলেই যে মনের মিলন হবে, এ ভুল। এবং না হলেই যে স্বামীকে অসৎ বা স্ত্রীকে অসতী বল্‌তে হবে, এও সমাজের খামখেয়ালী। সৌজাত্য-বিজ্ঞান ভাব্‌ছে, দেহ-মনের উৎকৃষ্ট এমন পাত্রপাত্রীর মিলন সমাজের পক্ষে হিতকর—তাদের সন্তান জাতীয় উন্নতি কর্‌বে। কিন্তু সে দুটি নরনারীর যদি মনের মিল না থাকে? বাইরের উৎকর্ষ স্থূল চোখে দেখা জিনিষটাই বুঝি সবখানি আর অন্তরের আকর্ষণটা কিছু নয়? একটি সুপুষ্ট যুবক যদি একটি invalid যুবতীকে ভালবাসে [যেমন Robert Browning, Elizabeth Barettকে ভালবাস্‌তেন] এবং তারা বিচ্ছেদ চায় না, তবে? একদিকে raceএর অবনতি, অন্যদিকে প্রেমের খর্ব্বতা। দুটিই বড় আদর্শ—দেহের উৎকর্ষ ও ভালবাসার নিষ্ঠা। এদুটিকে বাঁচিয়ে যদি কোনো বিশেষ দম্পতী মিলিত হতে পারেন তবে তাঁদের বিবাহ একটা accident মাত্র; অধিকাংশ স্থলে এ সম্ভব হবে না। দেহের উৎকর্ষ জিনিষটা সার্ব্বজনীন [common factor] হলে, ভালবাসাটাই হবে deciding factor আর তখনই বিবাহের এ conflict থাক্‌বে না। কিন্তু সে দিন এখন অনেক দূরে। মন ও দেহের এই যে দ্বন্দ্ব বিবাহে বিরাট সমস্যার সূত্রপাত করেছে, তার সমাধানের জন্য ভালবাসার ওপরে বিধি-বিধান চাপাতে গেলে মানবের দুঃখ বেড়ে যাবে মাত্র। মনকে দেহের নিয়মাধীন না করে দেহকে মনের দাবীর অনুরূপ গড়ে তুল্‌তে হবে—যাতে মনের বা দেহের কারো ক্ষতি না হয়। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

অন্নদাশঙ্কর রায়

সমাজ-বিজ্ঞানের এক পৃষ্ঠা

[২]

নারী-সমাজের উপর বিবাহের ফল

সমাজ-বন্ধনের মূলে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থত্যাগ আছে। সমাজ-গঠনের মূলে চুক্তিই থাকুক আর যাহাই থাকুক, ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিবর্ত্তে বৃহত্তর স্বার্থলাভই উদ্দেশ্য ছিল। তাহা না হইলে মানুষ, অন্ততঃ আদিম যুগের মানুষ যে কেন তাহার সামান্য মাত্র অধিকারও ত্যাগ করিবে, তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রত্যেকেরই বাঁচিবার অধিকার আছে—তাহা জগৎশুদ্ধ সমস্ত মানুষকে হত্যা করিয়াই হউক আর যে উপায়েই হউক। এইভাবে তার নিজেরও হত হইবার সম্ভাবনা। মানুষ এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সমাজ-গঠন করিল—নিজের কতক পরিমাণ অধিকার ছাড়িয়া দিল; তার পরিবর্ত্তে পাইল—সংহত সমাজ-শক্তির আশ্রয়। মানুষের পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণও সমাজ-গঠনে কম সাহায্য করে নাই।

এই অধিকার-ত্যাগ সমাজের পক্ষে যেমন খাটে, পরিবারের পক্ষেও তেমনি অনেকটা খাটে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরিবার গঠনের মূলে আছে নর-নারীর প্রেম। যদি এই প্রেম না থাকিত তাহা হইলে আদৌ পরিবার-গঠন—তথা সমাজ-গঠন সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ।

চুক্তিমূলক সমাজ-গঠনের theory মানিয়া লইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিবার-গঠনে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ তার ভিতরে প্রেম থাকাতে অবস্থা অনেকটা ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রেমের পরিণতি বিবাহ—যাহা মানব-সভ্যতার ভিত্তি-ভূমি।

বিবাহের ফল নারী-সমাজের উপর কিরূপ হইয়াছে তাহার আজ আলোচনা করিব। একাধিক ব্যক্তি একত্র মিলিতভাবে কাজ করিতে হইলেই প্রত্যেকেরই কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন—কি সমাজ, কি পরিবার সর্ব্বত্রই ইহা খাটে।

নর ও নারী পরস্পর মিলিত হইলেন। তাঁহাদের অব্যাহত স্বাভাবিক অধিকার সঙ্কুচিত হইল। তাঁহারা যখন মিলিতভাবে চলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন জীবনের বিভিন্ন কর্ত্তব্য তাঁহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। আর এরূপ অবস্থায় প্রকৃতি তাঁহাদিগকে চালিত করিয়াছিলেন বলিয়াই বিশ্বাস হয়।

সুতরাং প্রাকৃতিক কর্ম্মবিভাগে নারী যে 'ঘর' ও পুরুষ 'বাহির'কে গ্রহণ করিবেন, তাহা স্বাভাবিক। 'ঘর' অর্থ কুটীর বা রাজপ্রাসাদ নয়, এবং 'বাহির' অর্থে মাঠ বা গাছ বুঝায় না। এই ঘর ও বাহির কর্ম্মক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশ মাত্র তাহাদের মাঝখানে চীনের প্রাচীর নাই বা 'ঘর' বলিতে অন্ধকারময় পবিত্র অন্তঃপুরও বুঝায় না।

এই প্রাকৃতিকতাটা কি তাহা দেখা যাউক। পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটা বড় প্রাকৃতিক ব্যবধান এই যে নারীকে গর্ভ ধারণ করিতে হয়, সন্তান-জনন ও পালনের ভারও নারীর উপরই ন্যস্ত। আর এই দুইটা কাজের জন্যই নারী বাহিরের অনেক কাজের অনুপযোগী হইয়া পড়েন। * তারপর নর ও নারী যখন মিলিত জীবন যাপন করেন, তখন নারী যদি একা সন্তানের লালনপালনভার লন, তাহা হইলে পুরুষ—অন্ততঃ তার সন্তানের পালনকর্ত্রী বলিয়াও—নারীকে সাহায্য করিবেন তাহা খুবই ন্যায়-সঙ্গত। সুতরাং ঘরে যখন

* কেহ কেহ বলিবেন, পরিবার-গঠনের পূর্ব্বেও নারী সন্তানপালন করিয়াও সমস্ত কাজ করিতেন। হাঁ, "সন্তানপালন" করিতেন কিন্তু 'মানুষ' করিতেন না। বিশেষতঃ State of Natureএর সহিত সমাজের জটিল অবস্থার তুলনা হয় না। [লেখক

নারী সন্তান-পালনের ভার লইলেন কারণ নারীর বুকেই বিধাতার দান দুগ্ধ আছে) তখন তদনুসঙ্গিক গৃহস্থালীর ভার লওয়াই তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক—আর কার্য্যক্ষেত্রে হইয়াছেও তাই।

আর একটা কথা, বলিতে এখন ভয় হয়—সেটা নারী প্রকৃতি। নারী-প্রকৃতি কোমল, মৃদু কার্য্যের উপযোগী, নারীর হৃদয় পুরুষ-হৃদয় হইতে বহুগুণে কমনীয় ও স্নেহ-মমতার আধার (যাহা শিশু সন্তানের পক্ষে মাতৃদুগ্ধের পরেই প্রয়োজনীয়) ইহা বলিতে গেলে অনেকে তারস্বরে বলিয়া উঠিবেন—উহা পুরুষের অত্যাচারের ফল। অর্থাৎ পুরুষের অত্যাচার এমনি জিনিষ যে তাহা দ্বারা নারীহৃদয়ে মন্দাকিনী-ধারার সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু আমরা প্রকৃতির রাজ্যে দেখিতেছি (যেখানে নারীর উপর পুরুষের অত্যাচারের সম্ভাবনা নাই—এক গায়ের জোর ছাড়া) যে স্ত্রী পশু, পুংপশু হইতে কোমল প্রকৃতির হয়। আর ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইলে মাতৃ-হৃদয়ে সেই কোমলতার খুবই প্রয়োজন। সুতরাং পুরুষগুলি অত্যাচার দ্বারা কোমলতার সৃষ্টি করে নাই—ভগবান নিজেই (নারীদিগের প্রতি সম্ভবতঃ বিদ্বেষ-বশতঃ) তাঁহাদের হৃদয় ও শরীরকে কোমল করিয়া গড়িয়াছেন, সুতরাং আর কি করা যায়।

বৈজ্ঞানিকদের মতও সম্পূর্ণ ভিন্ন। Evolutionistদের মত এই যে অভিব্যক্তির উচ্চতর স্তরেই নারীর সৃষ্টি হয়। প্রজননবেত্তারাও বলেন যে গর্ভাবস্থায় উচ্চতরভাবে জীবন-যাপনে কন্যা-সম্ভাবনা। অবশ্য নারী-হৃদয়ও সেই সঙ্গে আসে। কিন্তু মেয়েরা তাঁহাদের নারী হৃদয়ের জন্য গৌরবের পরিবর্ত্তে অগৌরব বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন!

তাই দেখা যাইতেছে যে নারীর শরীর ও মন পুরুষের তুলনায় কঠোর কর্ম্মের অনুপযোগী, তাই জগতের সর্ব্বত্র সভ্যতার জন্ম-সময়েই নারী আপন-উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্র গৃহকে বরণ করিয়া লইয়াছেন [অবশ্য পুরুষ যদি লাঠির জোরে নারীকে ঘরে ঠেলিয়া দিয়া থাকেন তবে বরণ হইবে না, আর সেই জন্য পৃথিবীর সব নারী কোন কাজ করিলেও তাহা নারী-সমাজের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া ধরা যাইবে না।] পুরুষ তাহার কঠোর কর্ম্মের উপযোগী শরীর ও মন দিয়া বাহিরের ঝড় ঝঞ্ঝার সঙ্গে লড়াই করিতে অগ্রসর হইলেন। পুরুষ প্রেমের খাতিরে নারীকে রৌদ্র-ধূলি হইতে বাঁচাইবার জন্য ঘরে তার স্থান নির্দ্দেশ করিলেন—এ কথা বলিতে আর সাহসে কুলায় না! শুধু প্রাকৃতিকতার দিকটাই দেখানো গেল।

প্রাথমিক অবস্থায় অধীনতার কথা ওঠে না। কারণ নর ও নারী পরস্পরের সহায় মাত্র। তারপর ক্রমশঃ যতই সমাজ অগ্রসর হইতে লাগিল ততই নারী অধীনতার বাঁধনে পড়িতে লাগিলেন। এখানে সমস্যা একটু গুরুতর। কারণ দুইজন স্বাধীন নর-নারী একত্র মিলিতভাবে চলিতে চলিতে একজন কিরূপে অন্যজনের অধীন হইয়া পড়িলেন, তাহার উত্তর দেওয়া একটু শক্ত। অবশ্য ভগবানই নারীকে 'অস্বতন্ত্র' করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন বা নারী তাঁহার পায়ের নখ কি গায়ের মল হইতে উৎপন্ন ইত্যাদি শাস্ত্রীয় মীমাংসা পাওয়া কঠিন নয় কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানের পথ একটু স্বতন্ত্র।

নারীর এই অধীনতার কথা আলোচনা করিতে গেলেই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি পড়ে শারীরিক বলের উপর। নারী-সমাজ অস্বীকার করুন, কিন্তু এ কথা সত্য যে সর্ব্বদেশে,সকল সময়ে পুরুষ নারী অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী—আর যদি নারী হীনশক্তিই না হইবেন তবে পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিলেন কেন? তাই মনে হয় শারীরিক বলের প্রাধান্যের যুগে পুরুষ নারীকে দাবিয়া রাখিয়াছিলেন এবং এখনো পর্য্যন্ত তার জের চলিতেছে।

এই অধীনতার মূলে আর একটা কারণ দেখি। মাতৃত্বের খাতিরে নারীকে ঘরে থাকিতে হইত এবং তদুপযোগী গৃহস্থালী লইয়া তাঁকে ব্যস্ত থাকিতে হইত, সুতরাং বাহিরের খবর পাইবার সম্ভাবনা তাঁর অনেকটা কম ছিল এবং অভ্যাস-বশতঃ বাকী সমস্তের ভার পুরুষের উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। ক্রমশঃ সমস্ত কর্ত্তৃত্ব পুরুষের হাতে আসিয়া পড়িল। স্বার্থ বড় বিষম জিনিষ, সেখানে স্নেহ প্রেমের পক্ষে মাথা গলানো সহজ নয়,—যদিও এ কথাটা বিশ্বজননীভাবে সত্য নয়।

তাহা ছাড়া প্রাকৃতিক কারণের উল্লেখ করিয়াছি—এই সমস্ত মিলিত কারণে নারীর অধীনতা-শৃঙ্খল ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। অথবা ইহাও মনে করা অন্যায় নয় যে এই অধীনতাটা প্রাচীন নারীসমাজ গ্রাহ্য করিতেন না। প্রেমের বন্ধন, নিশ্চিন্ত জীবন লইয়াই তাঁহারা সুখী ছিলেন।

নারীর চরণে এই শৃঙ্খল প্রাচীন জগতের সকল সভ্য জাতিই পরাইয়া দিয়াছিল—এ শুধু ভারতের নিজস্ব জিনিষ নয়। প্রাচীন রোম ও ভারতের নারী-সমাজের তুলনা করিলে আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'সংস্কৃত ভাষায় লিখিত না হইয়া লাটিন ভাষায় হইলে কোন আপত্তি থাকিত না বরং প্রাচীন রোমে এই কথাটার সার্থকতা ছিল বেশী। প্রাচীন নারীসমাজের তুলনা-মূলক সমালোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু বিভিন্ন সমাজের ব্যবস্থা দেখিয়া একটা কথা মনে হয় যে নারীর পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্যও কতকটা বাধ্য হইয়া সমাজ নারীর প্রতি এরূপ আচরণ করিয়াছে। তখন সবে মাত্র সভ্যতার জন্ম হইয়াছে—প্রাকৃতিক অধিকারের স্মৃতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। সুতরাং সেই যুগে দুর্ব্বল নারীকে রক্ষা করিবার জন্যও কতকটা তাঁহাকে পুরুষের রক্ষণাধীন রাখিতে হইত।

আরও একটা কথা আছে। নর ও নারীর নিরঙ্কুশ-ভাবে একত্র চলা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। যতই আমরা, সভ্যতা ও পবিত্রতার বড়াই করিনা কেন, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নারী ও পুরুষের

মাঝে একটা পর্দ্দার আড়াল থাকা দরকার? যদি কেহ বলেন যে এই পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া নারী ভুগিবে কেন। পুরুষ পর্দ্দার ভিতরে গেলেই হয়—তার উত্তর এই যে তাহা হইলে নারীকে বাহির হইয়া আসিতে হয় এবং সব দিক গিয়া দেখিলে তাহা নারীর পক্ষে খুব আরামপ্রদ হইবে বলিয়া মনে হয় না। [পর্দ্দা বলিতে আমাদের দেশের অবরোধের কথা বলিতেছি না।]

নারীকে কেন ঘরে থাকিতে হইবে তাহার কারণ পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তার উপর যদি তাঁকে বাহিরের কাজও করিতে হয় তবে তাহা নারীর উপর শুধু অত্যাচার ব্যতীত আর কিছু নয় এবং সমাজেরও তাতে খুবই অমঙ্গল হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক সুখ-শান্তিও নষ্ট হয়। এই কারণে বাহিরের বিপজ্জনক কাজে নারীর নিয়োগ বাঞ্ছনীয় নহে। নারী-শ্রমিকের বেলায় এ কথা খুব খাটে, সমাজের নেতাদিগের এদিকে তীব্র মনোযোগ দেওয়া উচিত। অবশ্য যাঁহারা গৃহস্থালীর জন্য সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন বা চিরজীবন অবিবাহিতা থাকিবেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তবুও বিবাহিত জীবনে বাহিরে থাকিয়া পূর্ণভাবে পারিবারিক কর্ত্তব্য পালন খুব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

শ্রমবিভাগ (division of labour) এবং নারীর পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা হইতে কর্ম্ম-বিভাগ ও পর্দ্দার সৃষ্টি। সেই শারীর বল-প্রাধান্যের যুগে (নারীর সতীত্ব জ্ঞান জন্মিবার পর) নারীর পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য নারীকে গৃহের মধ্যে নানাবিধ বিধিনিষেধের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইত। অবশ্য এই পবিত্রতা বা সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা যদি "যৌন-সম্বন্ধমূলক পুরুষের ঈর্ষ্যা" হয়, তবে আমাদের বলিবার কিছু নাই। [কিন্তু তাহা যদি 'ঈর্ষ্যা' হয় তবে পুরুষের পবিত্রতার দাবীর মধ্যেও নারীর ঈর্ষ্যা আছে বলিতে হইবে।]

আমাদের ধারণা উপরোক্ত কারণে নারী গৃহভার পাইয়াছিলেন—কিন্তু (আমাদের দেশে অন্ততঃ) সেই গৃহ-কারাগারের প্রতিরূপ মাত্র। মেয়েদের অবস্থা দেখিয়া কোন দেশে কি-পরিমাণ সভ্য তাহা নির্ণয় করা হয়। তাহার কারণ এই যে আদিম সময়ে যে সমস্ত অবস্থার জন্য নারীদিগকে বাধ্য-বাধকতার মধ্যে রাখা হইত, সেই অসভ্য অবস্থার যে পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইবে, নারী-সমাজের অবস্থাও সেই পরিমাণে উন্নতি ও স্বাধীন হইবে। অবশ্য এই মাপকাঠি যে একেবারে অভ্রান্ত তাহা বলা যায় না। তবে উহা দ্বারা প্রকৃত অবস্থা অনেকটা নিরূপণ করা যায়।

এই মাপকাঠিদ্বারা আমাদের সমাজের অবস্থা বিচার করিলে বুঝা যায় যে উন্নত হইতে অনেক পরিমাণে আমরা অনুন্নত স্তরে আসিয়া পড়িয়াছি।

আদিম সময়ের স্বাধীন অবস্থার পর যখন আনুষ্ঠানিক বিবাহপ্রথা দ্বারা সমাজের ভিত্তি দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইল অথচ যখন সমাজের অবস্থা উন্নত হয় নাই তখন নারীকে একবার সম্পূর্ণরূপে গৃহে আবদ্ধ হইতে হইল। তারপর ক্রমশঃ সমাজের অবস্থা যতই উন্নত হইতে লাগিল ততই নানাবিধ বিধিনিষেধের দ্বারা নারী-সমাজের অবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই সমাজের গতি দুই দিকে ছুটিল। প্রাচীন রোমক-সমাজ নারী-সম্বন্ধে ভারত-সমাজের চেয়ে কিছু কম কঠোর ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা ক্রমশঃ নারীর নানা বিষয়ে অধিকার স্বীকার করিলেন; তাঁহাদের সভ্যতার উত্তরাধিকারীগণ আজ অনেক বিষয়েই পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার স্বীকার করেন। কিন্তু ভারতীয় সমাজ নারীর অধিকার স্বীকার করিতে গিয়া অর্দ্ধপথে থামিয়া গেলেন এবং সেখান হইতে পশ্চাদগমন (Retardation) দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন।

এই নারী-সমাজের গতি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোন দেশেই একটা নির্দ্দিষ্ট ধারায় হয় নাই। উত্থান পতন, অনেক হইয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে নারীর অস্বাতন্ত্র্যতা যেমন জোরের সহিত ঘোষিত হইতেছে পাশ্চাত্য দেশে এমন হয় নাই!

নারীর এই অস্বাতন্ত্র্যের মূলে আর একটী বিষয় আছে। সেটা প্রাচীন কালের বিবাহ-প্রণালী। আদিম অবস্থায় অনেক স্থলে মেয়েদিগকে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া বিবাহ করা হইত—সুতরাং তখন মেয়েদিগকে লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীর ন্যায় বিবেচনা করা কিছু অসম্ভব নয়। এই বিবাহেরই একটু উন্নত সংস্করণ—রাক্ষস বিবাহ। তার পর সম্প্রদান-প্রথায় মেয়ে যে পিতার সম্পত্তি তাহাই বুঝায়, বিবাহের পর স্বামীর সম্পত্তি। প্রাচীন রোমে বিবাহ সোজা-সুজি কন্যা-বিক্রয়মাত্র ছিল।* সুতরাং স্ত্রীকে সম্পত্তি জ্ঞান করা অস্বাভাবিক ছিল না। অবশ্য এ প্রথা প্রাচীন কালোপযোগী শক্তিশালী পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ফল।

উপরি-উক্ত সমস্ত কারণের সমবায়ে নারীর অধীনতার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীনকালে অন্য কোনও কারণ বর্ত্তমান ছিল কিনা তাহাও নিঃসংশয়ে বলা শক্ত। তবে এ পর্য্যন্ত বলা যায় যে—স্ত্রীকে (অবশ্য পরিবারের অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তিকেও) সম্পত্তি জ্ঞান করা অধীনতার সর্ব্বনিম্ন স্তর—এই অবস্থা হইতে নারীদের ক্রমশঃ উন্নতি হইয়াছে।

প্রাচীন সভ্য জাতিরা মোটামুটীভাবে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের পক্ষপাতী ছিলেন। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ক্রমশঃ পরিবার-নিষ্ঠতা

* রোমানদের Confarreatio বিবাহ আমাদের ব্রাহ্মবিবাহ। কিন্তু সাধারণ প্রচলিত বিবাহ Co-emptio বা আমাদের (একটু পরিবর্ত্তিত) আসুর বিবাহ। স্ত্রীকে দাসীর মত খরিদ করিবার ভাল করা হইত। It was a transaction per aes et liberam

ত্যাগ করিয়া ব্যক্তি নিষ্ঠতার (individuality) ভক্ত হইতে লাগিলেন, আর প্রাচ্য-ভারত সেই প্রাচীন পরিবার-নিষ্ঠ রহিয়া গেলেন। এক রকম সমাজ হইতে আসিয়া আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই সমাজের মধ্যে এত পার্থক্য জন্মিল কিরূপে—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে এই বিশিষ্টতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পাশ্চাত্য সমাজে ব্যক্তি-নিষ্ঠতার ফলে নারীরাও অনেকটা স্বাধীনতা পাইলেন প্রাচ্যে পরিবার-নিষ্ঠতার ফলে নারীর অবস্থা অনেকটা অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গেল। [প্রাচীন ভারতের নারী-সমাজ বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল, পিছন ফিরিয়া এই অবস্থায় আসিয়াছি] অবশ্য ভারতের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্যও কতকটা এরূপ হইয়াছে।

বিবাহের ফলে নারী তাঁহার অনেক প্রাকৃতিক অধিকার হারাইলেন বটে কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে পাইলেন সমাজশক্তি ও পুরুষের সবল বাহুর আশ্রয়। জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা হইতে রক্ষা পাইয়া নিশ্চিন্ত জীবন তাঁরা যাপন করিতে লাগিলেন। এইজন্য নারীও যে স্বেচ্ছায় তাঁহার অনেক অধিকার পুরুষের হাতে তুলিয়া দেন নাই তাহাও বলিতে পারা যায় না। এবং এই সুযোগে পুরুষও যে অনেক শক্তি আত্মসাৎ করেন নাই এমনও নয়।

প্রাচীন ভারত-নারীর উপর বিবাহের কিরূপ ফল হইয়াছিল—তাহার অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। বিবাহের মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় তাঁহাদের স্থান অতি উচ্চে ছিল। তাঁহারা গৃহের শ্রী, লক্ষ্মী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। নারীর সম্মানে উন্নতি, অপমানে ধ্বংস,—ইহা সমাজনীতির সূত্র ছিল। [সংহিতা-কারদের বিভিন্ন মত এখানে আলোচ্য নয়। উহা সমাজের বিভিন্ন সময়ের জ্ঞাপক] সমাজের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে অথবা ইহাও বলা যায় যে নারী-সমাজের পতনের সঙ্গে সমাজও পতনের দিকে চলিয়াছে।

জগতে পরিবর্ত্তনের স্রোতে অবিরাম চলিয়াছে। সেই স্রোতকে বাধা দিবার সাধ্য মানুষের নাই। মানুষ নিজ শক্তিবলে ও বুদ্ধিবলে এই প্রাকৃতিক শক্তিকে মানিয়া লইয়া আপনার কাজে লাগাইতেছে—তাতেই মানুষের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব নাই বলিয়া পশু-জগৎ হইতে কত শ্রেণীর প্রাণী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়ার কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু ভুয়া "সনাতনত্বের" দোহাই দিয়া প্রাচীনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিলে ধ্বংস অনিবার্য্য।

নারী-সমাজ সম্বন্ধে ভাবিবার সময় আসিয়াছে। জাতির জীবনী-শক্তি ঐখানে,—তাহাতে আঘাত করিয়া করিয়া আমরা মরিতে বসিয়াছি। বাঁচিব কি মরিব তাহার অনেকটা নির্ভর করে নারী-সমাজের অবস্থার উপর। বিবাহের উপরই সমাজের ভিত্তি স্থাপিত, এবং সেই বিবাহের জন্য নারীর (পুরুষেরও বটে) স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের সমাজে বর্ত্তমানে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। সমাজ-বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কিরূপে নারী-সমাজের (সুতরাং সমগ্র সমাজের) উন্নতি হয় তাহাই বর্ত্তমানের সব-চেয়ে বড় সামাজিক সমস্যা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত।

ঘরের কথা

আজ বাঙ্গালীর এত দুর্গতি হইল কেন? আজ বঙ্গবাসী নরনারী নানা রকম দেশী ও বিদেশী রোগে পীড়িত জরাজীর্ণ, পঁচিশ বৎসরে দৃষ্টি-শক্তিহীন, পঁয়ত্রিশ বৎসরে দন্তহীন, ৪০।৪৫ বৎসর অতিক্রম করিলেন তো বৃদ্ধ-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া পড়িলেন, ইহার কারণ কি?

কিছুদিন পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে ৮০।৮৫ বৎসরের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা এক-এক পল্লীতে ৮।১০ জন করিয়া বিরাজ করিতেন। তাঁহারা আজকাল্‌কার যুবক-যুবতী অপেক্ষা শক্ত ও কর্ম্মী ছিলেন। এরূপ গল্পও অনেক শুনা গিয়াছে যে, আশি বৎসরের বৃদ্ধা তিন শত লোকের আহারের জন্য অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া শেষ করিতেন। কিন্তু এখন কেহ পারেন না কেন? অথচ তখন এত বায়ু পরিবর্ত্তন ও কথায় কথায় ঔষধ ব্যবহার ছিল না। তখন প্রতি গ্রামে একজন করিয়াও কবিরাজ ছিলেন কি না সন্দেহ। আমার মায়ের এক পিশিমা ছিলেন; তিনি ৮৫ বৎসর বয়সে ২।০ শত লোকের রন্ধন-কার্য্য একাই রাঁধিয়া শেষ করিতেন। শুনিয়াছি ইনি ঔষধ-পত্র আদৌ ব্যবহার করিতেন না; একান্ত পক্ষে ঔষধ-পত্রের প্রয়োজন হইলে বৈদ্যের মুষ্টি-যোগের দ্বারাই কার্য্য সারিতেন। কিন্তু এখন মুষ্টিযোগও পরের কথা, কবিরাজী ঔষধে ফল হয় না ইহাই অনেকের বিশ্বাস। এ

বিশ্বাস পুরুষ অপেক্ষা আবার স্ত্রীলোকদের কিছু বেশী, কারণ কবিরাজী ঔষধ খাওয়ানোর ঝঞ্ঝাট বেশী।

আজ-কাল রোগ যত বেশী, ঔষধের ব্যবহার তার চেয়ে আরও বেশী, কারণে-অকারণে অধিক ঔষধ ব্যবহার করানোকে আজ-কালকার জনক-জননীরা পুত্রের প্রতি বেশী সাবধান থাকা বলিয়া মনে করেন।

তখন নর-নারী যেরূপ নিয়মে চলিতেন আমরা সে সব নিয়মগুলিকে অসভ্যতা বলিয়া মনে করি ও অগ্রাহ্য করি। সুখ ও অসুখে যে সব নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিলে শরীর ভাল থাকে, আমরা সেগুলি প্রতিপালন করি না বলিয়াই এত ভুগি। সামান্য জ্বরে বাড়ীতে দুইটা মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিলে যে স্থলে ফল পাওয়া যায় আমরা সেখানে রাশি রাশি অর্থ নাশ করিয়া তীব্র ঔষধাদি ব্যবহার করিতে থাকি। আমরা কবিরাজী চিকিৎসাকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনাদের অর্থ ও স্বাস্থ্য আপনারাই নষ্ট করিতেছি। অগ্রাহ্যের প্রধান কারণ প্রায় অধিক স্থলে নারীগণের আলস্য-পরায়ণতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যদিও কোন পুরুষ কখনও বলেন যে ছেলেরা সকলেই পুরাতন রোগে ভুগিতেছে, কবিরাজী চিকিৎসা করাইয়া দেখা যাক্, তো গৃহিণী এক তাড়াতেই কর্ত্তাকে চুপ করাইয়া দিলেন, কি, অত হেঙ্গাম কে পোহাইবে? পাঁচন সিদ্ধ করিতে আমি পারিব না, আধ সের জল দিয়া সিদ্ধ চড়াও আধপোয়া থাকিতে নামাও তাতে মধু দাও, এ বেলা একছটাক, ও বেলা একছটাক খাওয়াও এত ঝঞ্ঝাট আমি পারিব না। তার চেয়ে এলাহাবাদ চল ছেলেরা ভাল হবে। এদেশের জল-হাওয়া খারাপ হয়েচে, এই দেখনা কেন আমার অডিকলোনের বড় ছেলের পিলে জ্বর হয়েছিল, তিনি দেরী না করে তাঁর স্বামীকে শুদ্ধ নিয়ে এলাহাবাদেই গিয়েত সেরে উঠলেন।

কর্ত্তা গৃহিণীর অকাট্য যুক্তিতে মনে করিলেন, ঠিক কথা, গৃহিণী যাহা বলিতেছেন ইহাই ঠিক। জল-হাওয়াই খারাপ বটে, তবে এখন টাকা পাই কোথা? টাকা তো অনেকগুলি খরচ হইবে, আবার না যাইলেও স্ত্রী ও স্ত্রীর অডিকলোন কাপুরুষ মনে করিবেন।

কর্ত্তা ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা ধরাইয়া ফেলিলেন কিন্তু হুকুম অমান্য করিতে সাহস হইল না। যত দোষ জল-হাওয়ার, তাঁর বুদ্ধির দোষ নয়! হায়, আমরা ইচ্ছা-পূর্ব্বক লক্ষ্মীকে দূর করিয়া দারিদ্র্যকে সাদরে বরণ করিতেছি। অনেকে পুত্রের মাতা হইয়াছেন, মনে মনে অহঙ্কার—আমার ছেলে হইয়াছে, আমি সব শিখিয়াছি, আর আমার শিখিবার কিছু বাকী নাই। কিন্তু ঠিক্ মাতার কার্য্য তাঁহারা করেন কি? না, করিতে জানেন? তা যদি জানিতেন তবে বাঙ্গালীর নয়টা সন্তানের মধ্যে পাঁচটা মরিয়া যাইত কি? প্রথমত সন্তানের ক্ষুধা কেমন বা দাস্ত কেমন হয় ইহা যে মাতাকে বিশেষ খোঁজ রাখিতে হয় সকল প্রসূতি তাহা জানেন না! বিশেষতঃ যাঁহারা ঝি-চাকরকে ছেলে মানুষ করিতে দেন তাঁহারা ত আদৌ জানেন না, কতটা কর্ত্তব্য-জ্ঞান থাকিলে তবে মাতার কার্য্য করা হয়। যিনি যত ধনী লোকের কন্যা বা গৃহিণী হউন না কেন তাঁহার উচিত আহার্য্য প্রস্তুত ও সন্তান পালন এই দুইটী কার্য্য, নিজের হাতে লওয়া, তাহাতে আলস্য করা যে কত অন্যায় তাহা সহরের বাঙ্গালী বাবু বা গৃহিণীরা বোঝেন না। নারীরা তো বুঝিবেনই না, কারণ বুঝিলেই পরিশ্রম করিতে হইবে। আর পুরুষরা বোঝেন না কেন? স্ত্রীরা বোঝেন না বলিয়া। পুরুষদিগের এ সম্বন্ধে একটু লক্ষ্য রাখা উচিত। স্ত্রী যা বলেন তাহার মধ্যে একটু-আধটু বাদ দিয়া শুনিতে হয়। তাহাতে ধর্ম্মে পতিত হইবার বিশেষ আশঙ্কা নাই। কর্ত্তব্য যা কিছু তা প্রত্যেক নর-নারীর। আজ তবে স্ত্রীরা নিজেদের কর্ত্তব্যটা পুরুষের দ্বারায় করাইয়া লন কেন? আর পুরুষ বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের খাটুনি খাটেন কেন? তাঁহাদের নিজেদের একটু সাবধান হওয়া উচিত।

পাঠক বলিবেন "দোকর খাটুনি কিসে খাটিলাম?" অনেক বাড়ীতেই মাতা জীবিতা থাকিতে পিতাকে ছেলের অনেক কাজ করিতে হয়, সন্ধ্যায় অফিস্ হইতে আসিয়াই ছেলের বায়না থামাইতে হয়, শীতকাল হইলে পোষাক পরাইতে হয়, রাত্রে ঘুম পাড়াইতে হয়, কেহ কেহ দুধ পর্য্যন্ত গরম করিয়া খাওয়াইয়া দেন, প্রাতে উঠিয়া অফিসার

বাবু নিজ নিত্য কর্ম্ম সারিয়া সন্তান-সন্ততিকে পোষাক পরিচ্ছদ পরাইয়া দেন, ঔষধ খাওয়াইয়া দেন, খাবার দেন, স্ত্রী তখনও ঘুমাইতেছেন। অনেক বাড়ীতে আবার প্রত্যেক রবিবার ব্যতীত ছেলেদের স্নান করানো হয় না, কেননা স্নান করাইয়া দিবে কে? মাতা যতক্ষণ ছেলেকে স্নান করাইবেন ততক্ষণ তিনি নিজের বিলাস লইয়া ব্যস্ত! কেহ কেহ বা বালিকা সাজিয়া বলেন, আমি ছেলেদের স্নান করাইতে বা ঔষধ খাওয়াইতে জানিনা। ইহাতে যে নিজেকে মাতৃ-নামের আবর্জ্জনা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয় তাহা বোঝেন না।

পুরুষ প্রাণপণে অর্থ উপার্জ্জন করিবেন সেটা তাঁর কর্ত্তব্য, তিনি উপায় করিতে বাধ্য। তবে ভগিনীগণ, প্রাতে উঠিয়া ভাত রাঁধিয়া স্বামীকে দিতে স্বামীর ঊর্দ্ধ তিন পুরুষের মাথা কিনিয়া রাখো কেন? রন্ধনশালে বসিয়া বসিয়া বেগুন ভাজা ছুড়িয়া স্বামীর পাতে দিতে জুতার উপর দাও কেন? স্বামীর অপরাধ, তিনি রাঁধুনী রাখিতে পারেন না, কেমন? অর্থাৎ মাত্র স্বামীর পরিশ্রমে সংসার চলিবে তুমি খাটিতে আদৌ রাজী নও। স্বামীর পরিশ্রম-লব্ধ অর্থে দাসী থাকিবে রাঁধুনী থাকিবে, আর তুমি আহার্য্য প্রস্তুত ও সন্তান পালন এ দুইটির একটিও পারিবে না? স্ত্রীর যত ত্রুটি হোক স্বামী হাসিয়া উড়াইয়া দেন! আর স্বামীর ত্রুটি হইলে, পিতৃ-অপরাধে পুত্র-কন্যার পিঠে উত্তম মধ্যম প্রহার চলিবে!

আবার ইহাও প্রায় দেখা যায় যে পরের দ্বারা ছেলে মানুষ করা হয়। পরের দ্বারা ছেলে মানুষ করিলে সে ছেলে দেখিতে মানুষের মত হইলেও বুদ্ধি-বিবেচনায় মানুষের বাহিরে গিয়া পড়ে, পিতা-মাতা যে কি জিনিষ সেটা ঠিক বোঝেনা, যত্ন ভক্তিও করিতে শিখে না। আমি বাল্যকালে কোন বড়লোকের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তাঁহাদের একটা ঘটনার কথা কিছু মনে পড়ে। তাঁহার বাড়ীর একটী কচি ছেলের অসুখ হইয়াছিল। শিশু মাতাকে ছাড়িবে না মাতার কাছে থাকিবার জন্য কাঁদিতেছে, মাতা পাখী ও বানর দেখাইবার ছলে নিজের কাছ হইতে ছিনাইয়া জোর করিয়া ছেলেকে ঝির কোলে দিলেন। ঝি ছেলে লইয়া ...

ছেলেও মাতার নিকট আসিবার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে খাইতে বাধ্য হইল। ছেলে চলিয়া গেলে মাতা নিজের প্রধান কর্ত্তব্য যাহা, অর্থাৎ মাথা-বাঁধা, সাবান মাখা ইত্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদিন পরে আবার সেই বাড়ীর ঘটনা; মাতার বার্দ্ধক্যে কঠিন পীড়া হইলে আমরা কয়েক জনে দেখিতে গিয়া দেখি, বৃদ্ধা নীচেকার একটা ঘরে পড়িয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া কত কাঁদিলেন বলিলেন, "ছেলে আমাকে ডাকিয়া একবার জিজ্ঞাসা করে না, আমার কিছু মাত্র খোঁজ-খবর করে না! কলিকালের ছেলে বউকে লইয়াই উন্মত্ত!"

আমি বলিলাম, কলিকালের দোষ নয়, দোষ মাতা-পিতার। পিতা-মাতার ভালবাসা না পাইলে পুত্র ভাল বাসিবে কেন?

গৃহিণী বলিলেন, বউকে ত ভালবাসিতে জানে। আমি বলিলাম, সেটা ভালবাসা নয়; সেটা অধিকাংশ স্থলে মোহ। ভালবাসা গরীবের বাড়ীতে যতটা স্থান পায় প্রায়ই বড়লোকের বাড়ীতে সেটা তেমন থাকে না, মৌখিকতা অধিক দেখা যায়। ভাল বাসিয়া ভালবাসা শিখাইতে হয়; ইহা পয়সা দিলে মিলেনা। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও স্ত্রীর নিকট যেমন ভালবাসা পাইবে তেমনই ভাল বাসিবে।

আবার কোন কোন বাড়ীতে দুইটি ঝি আছে, একটীও চাকর নাই। গৃহিণী বলেন, চাকরের কোনই প্রয়োজন নাই। পুরুষের উপায়ে দাসী থাকিবে স্ত্রীর কষ্টের লাঘবের জন্য! আর যাঁহার উপায় তাঁহার সাধ্য কি যে একটা চাকর রাখেন! কারণ গৃহিণী অনুমতি দিতেছেন না,—কাজেই বাবু অফিস হইতে আসিয়া একটু বিশ্রাম করার পর বাড়ীর শাক্ শব্জী গাছ-পালায় জল দেওয়া, গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া ইত্যাদি কার্য্য করেন। কিন্তু বাবু অফিসে বাহির হওয়ার পর গৃহিণী যখন সঙ্গিনী পরিবেষ্টিতা হইয়া মহা জাঁক-জমকের সহিত তাস খেলিতে বসেন বেলা চারিটার পূর্ব্বে তার যে নেশা ছুটে না! পরে আবার সাবান মাখা মাথা বাঁধা ইত্যাদি আছে, অগত্যা গাছে জল দিতে সময় পান না।

যদি কোন দিন তাস খেলিতে বসিয়া হারিয়া যান তবে

রাত্রে পরিবেষণ-কালে পাঁচটা ব্যঞ্জনের মধ্যে একটা হয়ত দিতে ভুল হইয়া গেল, গৃহিণী আহারাদির পর "ঐ যাঃ" বলিয়া নিশ্চিন্ত হন। আর সে ভুলটা প্রায় কর্ত্তার বেলায়ই ঘটে।

নভেলি বালাদের কেবল, আহার বিলাস, আরাম ইহাতেই মাথার ঠিক থাকে না, বৎসরে ৫০ পঞ্চাশ বার বাক্সের চাবি হারাইয়া ফেলিতেছেন! আর সেই বধূদের বয়সী যুবকেরা কত মস্তিষ্ক চালনা করেন, বৎসর বৎসর পাশ দিতে হইতেছে, কত কঠিন অঙ্ক কষিতে হইতেছে তাহার মধ্যে দুই তিনটা করিয়া প্রাইভেট টিউশনিও আছেই! কারণ নিজের খরচ চালাইতে হইবে। আবার ভবিষ্যতের ভাবনা, কি করিয়া এর পর স্ত্রীকে গহনা দিব—ইহা সব চেয়ে কঠিন চিন্তা। আজকাল অনেক যুবা এই চিন্তায় বিবাহ করিতে চাহেন না। স্ত্রীর মনের মত জিনিষ না দিতে পারিলে পত্নী স্পষ্টই বলিবেন, যদি দিতে পারিবে না—তবে বিবাহ করিয়াছিলে কেন? কি সাংঘাতিক আত্ম-সুখাভিলাষ! এতেও বিলাস-রাণী সন্তুষ্ট নন, 'স্বাধীনতা চাই'! আমি ত দেখিতেছি পুরুষ অপেক্ষা তোমাদের স্বাধীনতা ঢের বেশী বোন! আর তোমরা স্বাধীনতা লইয়া করিবে কি? তোমরা ত চূড়ান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছ, তোমরা স্পষ্ট দেখিতেছ, তোমাদেরই অক্ষমতার দোষে বাঙ্লার স্বাস্থ্য একেবারে রসাতলে গিয়াছে! তোমরা শিশুর প্রতি লক্ষ্য কর না বলিয়াই আজীবন নর নারী রোগ ভোগ করে। নিজ হস্তে সন্তান পালন কর, বাজারের খাবার ত্যাগ করিয়া খাবার প্রস্তুত করিয়া স্বামী-পুত্রদের খাওয়াও। নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়া জল-হাওয়ার দোষ, আর ঝির দ্বারা ছেলে মানুষ করিয়া সে ছেলের ভক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া, কলি কালের দোষ দিলে কি হইবে? প্রথমতঃ শিশু প্রতিপালন করিতে বাঙ্গলার অধিকাংশ স্ত্রী জানেন না। প্রথম অবস্থাতেই যদি দেহটা অপটু হইয়া গড়িয়া উঠে, তবে পরে সে ছেলে কতখানি কার্য্যক্ষম থাকিবে? তার পর সামান্য কারণে বা অকারণে তীব্র ঔষধ সকল খাওয়ানো! যে কবিরাজী ঔষধ এতদিন ধরিয়া বাঙ্গালার প্রাণগুলিকে সতেজ রাখিয়াছিল, তা'কে অগ্রাহ্য করা, ধর্ম্মে—অর্থাৎ কর্ত্তব্যে অনাস্থা, স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞতাই বাঙ্গালীর দুর্গতির কারণ। নিজেদের বুদ্ধির দোষে নিজেরা ভুগিতেছ, অপরকে দোষ দিলে চলিবে কেন?

মেয়েদের বলি, আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে মনোনিবেশ কর, হিষ্টিরিয়া, প্যালপিটেসন, ডিস্পেপসিয়া প্রভৃতি রোগ দূর হইবে। শিশুর প্রতি লক্ষ্য কর, তাস খেলিয়া সময় নষ্ট করিও না, শিশুর অসুখে দেশীয় ঔষধ ব্যবহার কর, আবার বাঙ্গলার অনাবিল স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য সুষমাটুকু ফিরিয়া আসিবে।

শ্রীশরৎকুমারী দেবী।

ভোর-বেলাকার সাগর

সিন্ধুর ওড়্নায়
চাঁদ রবি ভিন্ কি?
দুই কোণে চম্কায়
কল্কার চিণ্ কি?
স'রে যায় অঞ্চল,
ডোবে চাঁদ চঞ্চল,—
ওঠে রবি ঝল্মল্!—
এল, এল দিন কি?

সোনা গেল মিশে' নীলে
চুনী পড়ে চ'ল্‌কে!
আড়াল থেকে গো দিলে
ফিরিয়ে এ ভোল্ কে?
মরি মরি অঙ্কন!
হাসে নভ-অঙ্গন,—
পূবে ওড়ে গন্‌গন্
আগুনের ফিন্‌কি!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

চয়ন

মেয়েরা পোষাক-পরিচ্ছদের ভক্ত কেন

মেয়েরা যে যথেষ্ট পরিমাণে পোষাক-পরিচ্ছদের ভক্ত, এ কথা আমরা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করে থাকি, এমন কি অনেক মেয়েরাও তা স্বীকার করে। এখন, এই মেয়েদের দলের যদি কেউ পোষাকের নিন্দে করে কথা বলতে আসে তাহলে আমরা যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ি! কথাটা আমাদের কানে এম্নি খাপছাড়া শোনায়! তখন তার সম্বন্ধে এ-রকম সিদ্ধান্ত করে নিতে আমাদের আর একটুও বাধে না যে, এই মেয়েটির নারী-প্রকৃতিতে কোথায় কি যেন একটা অসম্পূর্ণতার ছাপ আছে যার জন্য এ এমন বিচিত্র মনোভাব ব্যক্ত করছে! বাস্তবিক পোষাক জিনিসটে মেয়েদের এতখানি প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু যে যখনই তাদের কারুর পোষাক-নিস্পৃহতা আমাদের কাছে প্রমাণ হয়ে যায়, তখন আমরা এ-টা না ভেবে পারিনে যে, সে নিশ্চয়ই একটা অভাব নিয়ে জন্মেচে যা খুবই বিস্ময়োৎপাদক নয়তো অবস্থা-বিপর্য্যয়ের তাড়নায় তার মনের ওপর এই বসন-বিতৃষ্ণাটা এসে পড়েচে তার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

কিন্তু মেয়েদের দিক থেকে এটা প্রমাণ হয়ে যাওয়াটাও খুব কম সময়েই ঘটে। বেশীর ভাগ স্থলেই দেখা যায় যে, এটা একটা pose অথবা রূপ অভাবে অপরূপকে ফুটিয়ে তোলা। (If you can't be beautiful be odd)।

তবে পোষাকের ব্যাঁপার নিয়ে সত্য সত্যই মাথা ঘামায় না বরং তার চাইতেও ঢের উঁচু দরের কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেচে, এমন মেয়েও যে সংসারে নেই, তা নয়। থাকলেও কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম।

দেখা যায় প্রায় সকল মেয়ের জীবনেই এমন একটা সময় আসে যখন তাদের এই বসন-স্পৃহাটা অত্যুগ্র হয়ে ওঠে, ভাল কাপড় চোপড়ের নাম শুনলেই তারা এক রকম ক্ষেপেই যায়-কিন্তু এ-অবস্থাটা তাদের বেশীদিন স্থায়ী হয় না, আর তার উপর অধিকাংশের পক্ষেই অর্থ-সঙ্গতি এ সখকে খুব সহজেই দাবিয়ে রাখে। মেয়েদের এই সাজগোজের ধুমধাম সবার আগে বৃদ্ধদের চোখেই বড় বিরক্তিকর ঠেকে। তারা তখন শৃগালের দ্রাক্ষা-বৈরাগ্যের দর্শনটাকে বেশ যুক্তিপূর্ণ মনে করে নিজেদের সুদূর-পরাহত যৌবনের দুঃখকে ভোলবার চেষ্টা করেন। এ মন্দ কথা নয়, কিন্তু তাদের এটুকুও বোঝা উচিত যে, মেয়ের চরিত্রে এটা খুব দূষ্য নয় কারণ যৌবনের ধর্ম্মই হচ্চে নিজেকে সুসজ্জিত ও সুন্দর করে' দেখানো।

সত্য কথা বলতে কি, ছেলেদের অনেকেও আবার মেয়েদের এই পরিচ্ছদ-প্রিয়তা লক্ষ্য করে সময়ে সময়ে হাসে, কেউবা সহজভাবে কেউবা উপহাস করে—যার যেমন শিক্ষা ও রুচি! তাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা এক-সুট পোষাকে মেয়েদের তুলনায় ঢের বেশীদিন চালিয়ে দিতে পারে, আর তাদের চোখে এইটে সব চাইতে আশ্চর্য্য ঠেকে যে, মেয়েরা কতকগুলো তুচ্ছ কাপড়-চোপড়ের মানান বেমানান নিয়ে কি করে' ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্থক কাটিয়ে যেতে পারে!

প্রকৃতপক্ষে ছেলেদের তরফ থেকে এ-রকম আশ্চর্য্য হবার কোন সঙ্গত কারণ দেখতে পাওয়া যায় না। তারা যেমনটি চায় মেয়েরাও ঠিক সেই ভাবেই নিজেদের সজ্জিত করে তোলে। মেয়েদের বসন-বিলাসকে তারা অপছন্দ করে' কিন্তু বেশভূষা সম্বন্ধে উদাসীন অথবা কুসজ্জিতা মেয়ের প্রতি তাদের মনোভাবকে কি যথার্থ সন্তোষজনক বলা যেতে পারে? তা কি অনেকটা অবজ্ঞা অথবা তাচ্ছিল্যের পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে না?

শুধুই যে ছেলেরা তাদের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করবে এই আশাতেই মেয়েরা পোষাক সম্বন্ধে বিচক্ষণ তাও নয়; তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের ভিতরেও এ জিনিসটার আদর খুব বেশী। সুবেশা মেয়েরা নারী-সমাজে বিশেষ খাতির পেয়ে থাকে। মাত্র এটুকু বলেই আমরা নির্দ্দেশ করে দিতে পারিনে যে, মেয়েরা নিজেদের ধনসম্পত্তি ও সজ্জিত সৌন্দর্য্যকে

জাহির করে' প্রশংসা কুড়োবার জন্যেই পোষাকের এতটা ভক্ত। এ তে আছেই, এগুলি ছাড়া আরো কিছু আছে। চারু দর্শন অঙ্গাবরণে ভূষিতা হয়ে মেয়েরা একটা সূক্ষ্ম অথচ লঘু আনন্দের রেশ তাদের সর্ব্বদেহে অনুভব করে থাকে। রেশমের তৈরী পোষাকে এটুকু স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। একেই মেয়েদের মন স্বভাবতঃ কোমল ও ভাবপ্রবণ তার উপর পোষাকের ছাঁট-কাটের দিক দিয়ে যে কলাসম্ভূত আনন্দ artistic pleasure উপভোগ করার আছে তাও অতি সহজে তাদের মনকে আকর্ষণ করে ও তার ফলে তারা পরিশেষে বস্ত্রানুরাগী হয়ে ওঠে।

সেই জন্যেই বলা হয়েছিল যে, মেয়েদেরর মধ্যেও যদি কেউ পোষাককে অবহেলা দেখাবার চেষ্টা করে তাহলে তার পক্ষে সেটা খুব স্বাভাবিক তো হবেই না, বরং তার মধ্যে যা প্রকৃতি-সিদ্ধ হয়তো তাকেই গোপন করা হবে! এ অতি সত্য কথা যে, ছেলে ও মেয়ে উভয়েই সুচারুরূপে সজ্জিত হয়ে একটা বড় রকম দানের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের হর্ষসূচক তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।

পোষাকে মনোযোগী হওয়া কোনমতেই লজ্জার বিষয় নয়। সাজ-সজ্জার ভিতর দিয়ে আমরা মানুষের রুচির অনেকখানি পরিচয় পাই। তাছাড়া তকৃতকে পোষাকে মনের স্বাস্থ্যও বেশ ভাল থাকে। সুতরাং এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে, এ-জিনিষটা একেবারে হেলা ফেলার যোগ্য নয়। কোন সভ্য দেশই চায় না যে তাদের মেয়েরা কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও শুদ্ধ একটা ভারী চাল চালাবার জন্য লজ্জাহীনা হয়ে থাকবে। বোধ হয় একমাত্র বাংলা দেশেই এটি সম্ভব।

মেয়েদের পোষাকের প্রতি অনুরাগ মোটের ওপর অনিষ্টকর কিছু নয়। তবে যারা নিত্য নূতন পোষাকে অঙ্গ ঢাকবার জন্যে ব্যগ্র অথচ অর্থ সঙ্কুলান করে উঠতে পারে না, তাদেরই এই পোষাক-লোলুপতা সংসারে নানান রকম অশান্তি ডেকে আনে। এই শ্রেণীর মেয়েরা যে কাজ ভাল করেন না তা বলাই বাহুল্য। আর আমাদের বিশ্বাস যে, সংখ্যায় এরা খুব কম।

স্বাভাবিক এবং সুবিবেচনার সঙ্গে পরিচালিত হলে সকলেরই তা নয়ন-রঞ্জন ও আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

শ্রীনিনয় চক্রবর্ত্তী।

বাদুড়

কবির দল পাপিয়া, দোয়েল, শ্যামা, নাইটিংগেল, থ্রস প্রভৃতি পাখীর আদর করিয়াছেন এবং তাদেরই গান নানা ছন্দে গাহিয়াছেন চিরকাল! বেচারী বাদুড়,—এদেশের ছেলেমেয়েরা কবে কোন্ কবিকে ধরিয়া বুঝি দুই ছত্র লিখাইয়া লইয়াছিল বাদুড়ের উদ্দেশে—

বাদুড় বাদুড় চাল্‌তা-বাদুড়
কলা-বাদুড়ের বে—
বাদুড় ঝুম্‌কো নাড়া দে!

সাহিত্যের কুঞ্জবনে বাদুড়ের এই যা' গান শুনি। নহিলে নিশীথ-আঁধারের জীব এই কুশ্রী কুৎসিত পাখী (?) হীন যার সংসর্গ, ভীষণ যার ভঙ্গী,—তার খোঁজ কে রাখে! সম্প্রতি আমেরিকার কিন্তু বাদুড়ের আদর হইয়াছে। যে ম্যালেরিয়া তাড়াইবার জন্য এখানে কমিশনের পর কমিশন বসিতেছে, আমেরিকা সেই ম্যালেরিয়াকে বাদুড়ের পাখার ভরে উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছে এবং তার এ প্রয়াস কতক সার্থকও হইতেছে।

বাদুড় ম্যালেরিয়ার মশা খাইয়া মশক-বংশ ধ্বংস করিতে ভারী ওস্তাদ। আমেরিকায় তাই বাদুড় পোষা হইতেছে। এই রাত্রের পাখী বাড়ীর কানাচে আঁধারে বাসা করিয়া থাকে; দিনের আলোয় বাহির হইতে চায় না, বাহির হইতে পারে না। আমেরিকায় ইহাদের জন্য বাড়ীর কার্ণিশের ফাঁকে বাসা তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইতেছে—এবং রাত্রে বাসা হইতে ছাড়িয়া দিলে ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে ল্যাবরেটরিতে ধরা মশা-মাছি কীট-পতঙ্গ ধরিয়া মারিয়া খায়। তবে এভাবে বাদুড় পুষিয়া তাহাদের বেশী দিন বাঁচাইতে পারা যাইতেছে না, এই যা মুস্কিল। তারা উড়িয়া তবে শীকার ধরে,—ল্যাবরেটরির বাঁধা খোরাকে তাদের তেমন রুচি নাই। তাছাড়া সেখানকার মহিলারা এদের ওড়ার ভঙ্গী দেখিয়া

ইহাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ আছে। কতক পাখী গ্রীষ্মে বাঁচে, কতক বর্ষায় বাহির হয়, আবার কতক বা শীতের হিম-জর্জ্জর রাত্রিটাতেই আরাম পায়। পোষ-মানা বাদুড় সকল ঋতুতে সমান তেজে বাঁচিতে পারে না। তাছাড়া এরা তৈরী বাসায় বাস করিতেও অভ্যস্ত নয়। তারা পায়ের নখে একটা যা-কিছু আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিতে থাকে। বাসার ধরণ-ধারণ তারা জানেও না—এজন্য তৈরী বাসায় তারা বাস করিতে পারে না এবং অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মারাও পড়ে। তবুও আমেরিকার মিউনিসিপালিটি বাদুড়কে সর্ব্ব প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য দিয়া পোষ মানাইতে উদ্যত হইয়াছে—বাদুড়ের সাহায্যে তারা রোগ-বাহী মশা-মাছি ও কীট-পতঙ্গ মারিয়া দেশকে রোগমুক্ত করিবে, এ আশা আমেরিকা-বাসী দৃঢ়ভাবেই পোষণ করেন।

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

সাঁঝের তারা

সম্প্রতি বিলাতের গ্রীন-উইচ অবসারভেটরিতে বৈজ্ঞানিকের দল হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে আকাশে আনুমানিক ১৬০০০০০০০০ একশো-ষাট কোটী নক্ষত্র আছে। তার মধ্যে তিন-চারি হাজার মাত্র সাদা চোখে আমরা দেখিতে পাই। কিছুদিন পূর্ব্বে ফ্রাঙ্কলিন আডামস্ আকাশের ২০৬ খানি ফটোগ্রাফ লইয়া দেখিয়াছেন, সে ছবিতে ৫৫০০০০০০, সাড়ে পাঁচ কোটী নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব ফুটিয়াছে।

সুধীন্দ্র।

করাতের গুঁড়া

নানা পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গাভীকে যদি তার বরাদ্দ খোরাকের সহিত ছ'আনা ভাগ করাতের গুঁড়া অর্থাৎ করাতে-চেরা কাঠের সূক্ষ্ম গুঁড়া খাওয়ানো হয়, তবে তার দুধ গাঢ় হয় এবং পরিমাণেও বাড়ে। তবে এ গুঁড়া জলে ভিজাইয়া খাওয়াইতে হইবে। এ-সম্বন্ধে কৃষি-বিভাগ যে রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল,—

৭০ দিন ধরিয়া দুই দল গরুকে এই করাতের গুঁড়া খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে,—যে একভাগ খড়-বিচালির সঙ্গে দুই ভাগ করাতের গুঁড়া (পাইন কাঠের) তারা বেশ স্বচ্ছন্দভাবে আহার করিয়াছে এবং তার ফলও ফলিয়াছে ভালো। কিন্তু ইহার বেশী গুঁড়া দিলে তারা খাইতে চায় না। তবে এটুকুও দেখা যাইতেছে যে করাতের গুঁড়া ছ'আনা ভাগ দিলে তারা খুব তৃপ্তির সহিত খায়। গুঁড়া ইহার বেশী হইলে তারা যেন একটু অপছন্দ করে।

সুজাতা।

সোনার হ্রদ

দিদিমার রূপ-কথা নয়। সম্প্রতি কালিফর্ণিয়ায় একটি হ্রদ আবিষ্কার হইয়াছে,—বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন, এ হ্রদে সোনা মিলিবে। হ্রদটির নাম মনো-লেক। হ্রদটি চারিদিকে পাহাড় দিয়া ঘেরা—দক্ষিণে ও পূবে সুবিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর। দক্ষিণ দিকে কিছু দূরে আগ্নেয়-গিরির চিহ্নও দেখা যায়। হ্রদটি আকারে গোল। তার বুকে কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপও আছে,—তবে সে সব দ্বীপে লোকের বসতি নাই।

হ্রদের জলে আলকালিন্ সল্ট (ক্ষার) এত বেশী যে সে জল মুখে দেওয়া যায় না। এককালে ইহার আশে-পাশে খনি ছিল; এখন তার ধ্বংসাবশেষ মাত্র পড়িয়া আছে।

বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব দিয়াছেন যে এই হ্রদে ৫০০০০০০০ টন জল আছে। আর এই জলে স্বর্ণরেণু আছে প্রতি ১০০ টনে ৪০ ভাগ। অর্থাৎ এই হ্রদের জলে সবশুদ্ধ সোনা আছে ২০০০০০০০০০ পাউণ্ড দামের। পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া জল সেঁচিলে শতকরা দশ ভাগ জল কমিবে এবং ১০০ প্ল্যাণ্ট লইয়া কাজ চালাইলে বছরে ১০০০০০০ পাউণ্ড দামের সোনা মিলিতে পারে। বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়ীরা মিলিয়া এই সোনা তুলিবার উদ্যোগ করিতেছেন। সমুদ্র-মন্থনে একদিন লক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন, আজ আবার এই হ্রদ মন্থনে লক্ষ্মীর ঝাঁপি উঠিবে!

সৌম্যেন্দ্র।

রৌদ্রের শক্তি

বিলাতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া রায় দিয়াছেন যে মানুষের রোগ সারাইতে বাজে ঔষধ খাইবার আর প্রয়োজন নাই। রোগ যত দুরারোগ্যই হোক, তাকে সারানো যায় শুধু রৌদ্রের ঝলকে। প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র রোগীকে বাহিরে বসাইয়া রাখো। যতক্ষণ রৌদ্র-রশ্মি তীব্র হইয়া না ওঠে, ততক্ষণ তাকে রৌদ্রে থাকিতে হইবে। রৌদ্রের তেজ বাড়িলে সরাইয়া লইয়া যাও! রৌদ্রের তেজে রোগের জড় যায় না; রৌদ্রের স্নিগ্ধ আলোটুকুই রোগ সারাইবার ঔষধ! সেইজন্য মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নের পড়ন্ত রৌদ্র রোগীর পক্ষে উপকারী নয়। রোগ সারে ঐ নব-প্রভাতের প্রথম সূর্য্য-কিরণে, এই কথাটুকুই বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। সমুদ্রের ধারে খোলা হাওয়ায় প্রতি প্রভাতে দুই-তিন ঘণ্টা করিয়া রাখিয়া ছয় মাসে যক্ষ্মা রোগ সারানো গিয়াছে, এমন কথাও তাঁরা হলফ্ লইয়া বলিয়াছেন।

গৌরাঙ্গ।

সর্ব্বচারী যান

বিলাতের সরকারী বায়ুপোত-বিভাগে এক অদ্ভুত যান লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে; তাহা না উড়ো জাহাজ, না নৌকা, না গাড়ী,—অথচ একসঙ্গে এই তিনই। সেকালে এরকম ব্যাপার দেখিলে লোকে নিশ্চয়ই ভোজবাজী ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারিত না। একজন বৈজ্ঞানিক ইহাকে বলিয়াছেন, 'চাকা ও ডানা-ওয়ালা নৌকা।' কারণ ইহা চাকায় ভর দিয়া ডাঙায় দৌড়িতে পারে—আবার ডাঙা হইতে এক লাফে জলে ঝাঁপ দিয়া নৌকার মত জল কাটিয়া ভাসিয়া যাইতে পারে। আবার ডাঙায় বা জলে যখন খুসি ডানা মেলিয়া আকাশে উঠিতে পারে, কিংবা আকাশ হইতে পুনরায় ডাঙায় বা জলে নামিয়া আসিতেও পারে। জল হইতে সে যখন ডাঙায় উঠিয়া আসে, তখন তাহাকে দেখিলে কোন জীবন্ত জীব বলিয়া মনে হয়। এই অপূর্ব্ব জল-স্থল-ব্যোমচারী যান একরকম হাল্‌কা মিশ্র ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত এবং তাহা মেহগ্নী কাঠের প্রচ্ছাদনীর দ্বারা আবৃত।

খোলের উপরেই যন্ত্রের ডানা—আকাশে উড়িবার সময় তাহার কাজ চলে, অন্য সময়ে তাহা মুড়িয়া রাখা হয়। খোলের নীচেই চাকা—তাহার কাজ ডাঙ্গায়।

যানের ভিতর যাত্রীদের জন্য দুইটী কামরা আছে—একটী সামনে, আর একটী পিছন দিকে। সামনের কামরায় পরম আরামে বসিয়া জল-স্থল-ব্যোমের সমস্ত দৃশ্যই দর্শন ও উপভোগ করা যায়। পিছন দিকের কামরাটী আরও চমৎকার সজ্জিত এবং দরকার হইলেই তাহাকে শয়ন-কক্ষে পরিণত করা যায়। এই কামরার পিছনে যানের চালকদের জন্য শয়নের ব্যবস্থা আছে।

ভবিষ্যতে ইহাতে চড়িয়া যাত্রীরা অনেক দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল এবং সুদূর অজানা দেশেও নিরাপদে ও নির্ভয়ে পাড়ি দিতে পারিবেন। জলে কোন মুস্কিল উপস্থিত হইলে তাঁহারা ডাঙ্গায় গিয়া উঠিবেন এবং ডাঙ্গায় বিপদ দেখিলে বিপদকে কলা দেখাইয়া আবার শূন্যে উঠিয়া যাইবেন। যান ছাড়িয়া তাঁহাদিগকে একবারও নামিতে হইবে না; কারণ যানের ভিতরেই আহার ও শয়নের বন্দোবস্ত থাকিবে। যে-কোন দ্রুতগামী ট্রেণের চেয়েও এই অপূর্ব্ব যান অধিক দ্রুতগতিতে শূন্যপথ দিয়া উড়িয়া যাইতে পারিবে। আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে আরব্যোপন্যাসের উদ্ভট মায়া-আসনের কল্পনাকেও আজ হার মানিতে হইল!

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।



৺সূর্য্যকুমার অগস্তি

৺সূর্য্যকুমার অগস্তি

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার বেলা পাঁচটার সময় সূর্য্যাস্তের সহিত মেদিনীপুরের উজ্জ্বল রত্ন ও বঙ্গীয় কান্যকুব্জ সমাজের 'সূর্য্য', স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি মহাশয়ের জীবন-সূর্য্যও অস্তমিত হইয়াছে।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গড়বেতা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ-কুলে ১২৬৩ সালের মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া ঐ গ্রামে বসবাস করেন। এদেশে বহুকাল বাস করার জন্য তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গদেশীয় আচার ব্যবহার ও ভাষার চলন হইয়া পড়ে। তাঁহার পিতৃদেব ৺ঠাকুরলাল অগস্তি মহাশয় একজন কৃতী, উদ্যোগী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন।

ঠাকুরলালের প্রথম যৌবনে অর্থ-কষ্ট খুবই ছিল—এমন কি সমগ্র পরিবারের দুই বেলার আহারের সংস্থান-জন্য তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ঠাকুরলাল কেবল মাত্র নিজ-চেষ্টায় তৎকাল-প্রচলিত ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিয়া মোক্তারী পাশ করেন ও তাহাতে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়া বিষয়-সম্পত্তি অর্জ্জন করেন এবং ক্রমে সে স্থানের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন। অগস্তি মহাশয়ের মাতা শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীও অত্যন্ত ধৈর্য্যশীলা, পরম দয়াবতী ও ধর্ম্ম-প্রাণা রমণী ছিলেন। সূর্য্যকুমার তাঁহাদের কনিষ্ঠ পুত্র; তিনি পিতা-মাতার গুণসমূহের পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব মেধা ও প্রায়-শ্রুতিধরের-ন্যায় স্মরণ-শক্তি ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি নিজের বিগত পঞ্চাশ বৎসরের জীবনের প্রত্যেক দিনের ঘটনার তারিখ, মাস ও সময় সুস্পষ্টরূপে স্মরণ করিয়া বলিতে পারিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তার অনেক লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। যখন তিনি ছয় বৎসরের বালক, প্রথম ভাগ পড়েন, তখন তাঁহার এক বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণ করেন। সূর্য্যকুমার সমগ্র পুস্তকখানির প্রতি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর প্রদান করেন। বালকের এই অপূর্ব্ব মেধা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া উক্ত-জ্ঞাতি তাঁহাকে একটি টাকা সন্দেশ খাইতে পুরস্কার প্রদান করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি গড়বেতা স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন কিন্তু সেবার বৃত্তি পান নাই; ইহাতে তাঁহার পিতৃদেব বলেন, "সূর্য্য, তুমি তো বেশ মনোযোগ দিয়াই পড়া-শুনা কর, অথচ বৃত্তি পাইলে না,—ইহার কারণ কি?" ইহার পর তিনি ১১ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় বার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন ও ৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এইরূপে বাল্যকাল হইতে নিজ বৃত্তির অর্থ দ্বারাই তাঁহার আজীবন শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছিল।

১৮৭৩ সালে ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তিনি কুঁচিয়াকোল রাধাবল্লভ হাই স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ২০৲ টাকা বৃত্তি পান ও উক্ত পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্ব-প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার চারি-পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব হইতে উক্ত স্কুলে কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি ছাত্রগণের উন্নতির অভাব লক্ষিত হইতেছিল, তজ্জন্য ঐ স্কুলে গভর্ণমেণ্ট-সাহায্য বন্ধ হইবার কথা ছিল। সূর্য্যকুমার ঐরূপ প্রশংসার সহিত পাশ করাতে স্কুলের শিক্ষকগণ গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করায় স্কুলটী গভর্ণমেণ্ট-সাহায্য হইতে আর বঞ্চিত হইল না। ইহার পর হইতে ঐ স্কুল স্থায়ী হইয়া গেল।

পরিণত জীবনে ব্যায়াম-চর্চ্চা ও পরিশ্রমের অভ্যাস তাঁহাকে সাধারণ বাঙ্গালী হইতে বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছিল। যখন তাঁর বয়স ৫।৭ বৎসর, তখন বিদ্যালয় হইতে আসিয়া তিনি প্রত্যহ তাঁহাদের উঠানের দুইটি যোড় থাম্বার উপর ২০।২৫ বার নিয়মিতভাবে উঠিতেন ও নামিতেন। অথচ এইরূপ ব্যায়াম করিতে পিতা ভ্রাতা কি পরিবারস্থ কেহ কখনও তাঁহাকে উপদেশ দেন নাই কিম্বা অপর-কোন সহাধ্যায়ী বালকও যে এইরূপ ব্যায়াম করিত এমন কথা শুনা যায় নাই।

তাহার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় পরীক্ষাই সসম্মানে উত্তীর্ণ হন্ এবং সকল পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৮৮১ সনে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ পরীক্ষা পাশ করিয়া ১০০০০৲ হাজার টাকা পুরস্কার ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষায় তিনি এত বেশী নম্বর পান যে একাল পর্য্যন্ত কেহ অত নম্বর পাইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই।

এইরূপ অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া তিনি কিছুদিনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন ও জেনারল্ এসেম্ব্লি এবং ঢাকা কলেজে প্রোফেসারী করেন। অল্পদিনের জন্য তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটও হইয়া ছিলেন। ইত্যবসরে ভারতে ইণ্ডিয়ান ষ্টাটুটারী সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষার ব্যবস্থা হইলে তিনি তার জন্য প্রস্তুত হন এবং ১৮৮৪ সালে ঐ পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সিভিলিয়ানের পদে অধিষ্ঠিত হন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি এত অধিক নম্বর পাইয়া ছিলেন যে তৎকালীন লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর সার রিভার্স টমসন সাহেব আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে প্রশংসা-পত্র দেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার পরম অনুরাগ ছিল। গভর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতে করিতে তিনি হাই ষ্টেণ্ডার্ড সংস্কৃত পরীক্ষা দিয়া ২০০৲ হাজার টাকা বৃত্তি পান। তিনি অতি দক্ষতার সহিত ২৮ বৎসর রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিয়া ১৯১২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বালেশ্বর জেলা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

কার্য্যকালে তিনি বেহার উড়িষ্যা ও পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থলে ভ্রমণ করেন। সর্ব্বত্রই তিনি জন-প্রিয় হইয়াছিলেন। ১৯০৪ সনে যখন তিনি ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন ভয়ানক প্লেগের উপদ্রবে সে-স্থানের অধিবাসীরা অতিশয় বিব্রত-হন্। অগস্তি মহাশয় নিজপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া দেশের লোকের কল্যাণের নিমিত্ত এরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন যে সে-সময়ের ছোট লাট সার এনড্রু ফ্রেজার মহোদয় ভাগলপুরে গিয়া সর্ব্ব-সাধারণের নিকট তাঁহার গুণগান করেন ও স্বহস্তে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন। তিনি যখন যশোহরের জেলার সে-

স্থানের ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য স্রোত-হীন ভৈরব নদকে কাটাইবার উদ্দেশে গভর্ণমেণ্টে ঘোরতর আন্দোলন করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তার পরই তিনি সে জেলা হইতে স্থানান্তরিত হন। যদিও তৎকালে তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট পরে ইহার ফল উপলব্ধি করিয়াছিলেন! তাঁহার সে শুভ চেষ্টা যশোহর-বাসীদিগের এখনও মনে আছে।

পাবনা জেলায় অবস্থান-কালে এক সময় বাজারে আগুন লাগে। ম্যাজিষ্ট্রেট আগস্তি সাহেব তখন সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, একজন লোক অগ্নি-নিবারণের জন্য জল ঢালিতে ছাদে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু সিঁড়ির অভাবে উঠিতে পারিতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ লোককে বলেন যে তুমি আমার কাঁধে চড়িয়া ছাদে উঠ। সে ব্যক্তি ইতঃস্তত করিতেছিল কিন্তু তাঁহার বারম্বার অনুরোধে অবশেষে সেইভাবেই ছাদে উঠিয়া যায়। তাঁহার ঐরূপ ব্যবহার দর্শনে সে সময় সকলে চমৎকৃত হয়!

তাঁহার ন্যায় সরল ও নিরীহ ব্যক্তিও অল্পই দেখা যায়। যখন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে অবস্থান করিতেন তখনও অশ্বারোহণে কিম্বা অন্য কোন যানে ভ্রমণে গিয়া পথের পথিককে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান মুটেকে নিজ হইতে ডাকিয়া তাহার আর্থিক অবস্থার কথা, তাহার সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আপ্যায়িত করিতেন। এই রূপে রাজ-কার্য্য পরিচালন-সময়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে গিয়া সেখানকার কৃষক ও অপরাপর লোকদের সহিত নানারূপ ঘনিষ্ঠ আলাপে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় (যাহা সাধারণত তাঁহার ন্যায় উচ্চপদস্থ লোকের সহজে জানিবার কথা নয়) জানিতে পারিতে ও তাঁহাদের উপকারে অনেক সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাহার সার্থকতা সম্পাদন করিতেন।

রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া অগস্তি মহাশয় তাঁহার মেদিনীপুরস্থ 'মলয়াবাস' বাটীতে এ-যাবৎ অবস্থান করিতে-ছিলেন। চিকিৎসার্থে তিনি গত বৎসর কলিকাতায় আসেন।

তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং আজীবন

থাকিয়াও তিনি ফরাসী ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করেন ও অবসর কালে ফার্শী শিখেন। সূর্য্যকুমার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯২২ সনে মেদিনীপুরে যে সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল অগস্তি মহাশয় তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিরূপ উচ্চ আশা পোষণ করিতেন, তাহা সেই সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিলেই বুঝা যায়।

গীতা তাঁহার অতি প্রিয় পাঠ্য-গ্রন্থ ছিল। সমগ্র গীতাখানি তিনি অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন ও দিবসের অধিকাংশ সময়ই কোন না কোন শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার সংস্কৃত উচ্চারণ অতি সুস্পষ্ট ও মধুর ছিল। ফৈজীর ফার্শী অনুবাদ তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং প্রায়ই তাহা আবৃত্তি করিতেন।

দেশ-হিতকর সমুদয় কার্য্যে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল অসীম, এবং অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তিনি ঐ সব কার্য্যে যোগদান করিতেন। যখন ১৯২১ সনে মহাত্মা গান্ধী মেদিনীপুর যান, তখন তিনি এক সভার সভাপতি রূপে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

তাঁহার জন্মস্থান গড়বেতা গ্রামে তিনি নিজ চেষ্টায় এন্ট্রান্স স্কুল স্থাপিত করেন ও আজীবন ঐ স্কুলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী-শিক্ষায় তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল, তিনি নিজ কন্যাদিগকে ইংরাজি বাংলা সংস্কৃত ও সঙ্গীত-বাদ্যে সুশিক্ষিতা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার অন্যান্য সদ্‌গুণের সহিত অনন্যসাধারণ হৃদয়ের বিশালতা ও আত্মীয়-অনাত্মীয় পরিচিত-অপরিচিত জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের উপকারেচ্ছা তাঁহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল। বস্তুতঃ তিনি ধনী নির্ধন উচ্চ নীচ বিদ্বান মূর্খ শত্রু মিত্র, যে-কোন লোকের অযাচিত ভাবে উপকার করিতে পারিলে অসীম তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করিতেন।

তিনি যেমন পরম আস্তিক্য-বুদ্ধিশালী ছিলেন, সেইরূপ কখনও কোন বিষয়ে নিরাশ হইতেন না। ভগবান মঙ্গলময়, তিনি মঙ্গলই করিবেন! রোগ, বিপদ, দুর্ঘটনার সময় চিরদিন অটলভাবে এই মত পোষণ করিয়াছেন ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলকেও এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছেন।

তাঁহার সহিষ্ণুতার সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। পাবনায় থাকিবার সময় একদিন তিনি টম্‌টমে মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে যান। দৈব-দুর্ঘটনায় ঘোড়া হঠাৎ গাড়ীর সহিত ছুটিয়া গাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলে। অগস্তি মহাশয় পায়ে অত্যন্ত আঘাত পান। এই ক্ষত ৬ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি গভীর হইয়াছিল। তিনি চলৎশক্তি-রহিত হন। ডাক্তার আঘাত পরীক্ষা করিয়া বলেন যে ক্লোরোফর্ম দ্বারা অজ্ঞান করিয়া ঐ ক্ষত সেলাই করিতে হইবে। অগস্তি মহাশয় বলেন, অজ্ঞান করিবার প্রয়োজন নাই, আপনারা স্বচ্ছন্দে যাহা করণীয়, করিয়া যান। তিনি সিভিল সার্জ্জনের সহিত গল্প ও পুস্তক পাঠ করিতে থাকেন, ইত্যবসরে ডাক্তাররা ক্ষত কাটা, পরিষ্কার ও সেলাই ইত্যাদি কার্য্য সমাধা করেন; তাহাতে তাঁহার ভ্রূ-কুঞ্চনও হয় নাই। ঐ কার্য্য শেষ করিতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। সে সময় তাঁহার অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬৭ বৎসর হইয়াছিল।

মহারাজ নন্দকুমারের বিচার

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের চক্রান্তে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচার-বিভ্রাটে কৃত্রিম তমসুক প্রস্তুত করার অপরাধে অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্ব-প্রধান বাঙ্গালী, মহারাজা নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। বহুবাজার ষ্ট্রীটের পশ্চিম প্রান্তে বর্ত্তমান সময়ে যে স্থানে লালবাজারের গির্জা অবস্থিত, ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন-কালে সেই স্থানে মেয়র আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল। মেয়র আদালতে উইল-প্রোবেট ভিন্ন অন্য কোন প্রকার

মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইত না। তখনও সুপ্রীম কোর্টের গৃহাদি নির্ম্মাণ সমাপ্ত না হওয়ায়, নন্দকুমারের বিচারের নিমিত্ত মেয়র আদালতেই সুপ্রীম কোর্টের সেশন আরম্ভ হইয়াছিল। (১৭৭৫ খৃঃ, জুন)

৮ই জুন প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় সার ইলাইজা ইম্পে, হাইড, লামিষ্টার এবং চেম্বার্স এই বিচারপতি-চতুষ্টয়ের সমক্ষে মহারাজা নন্দকুমার আনীত হইলে, সর্ব্বপ্রথমেই জুরর-নির্ব্বাচন আরম্ভ হইল। তদানীন্তন প্রচলিত আইন অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিশ জন জুরর সম্বন্ধে আইন প্রদত্ত অধিকার পরিচালনা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও শ্বেতাঙ্গ জুররের অভাব হইল না। যে বারো জন জুরর মনোনীত হইলেন, তাঁহারা সকলেই ইংরেজ, তাহাতে অশিক্ষিত। বিচারপতিগণ কয়েক মাস পূর্ব্বে এদেশে আসিয়াছিলেন; তাঁহারা দেশীয় ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ইণ্টারপ্রিটারের সাহায্য ব্যতিরেকে সাক্ষীগণের উক্তি অথবা দলিলের মর্ম্ম কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না। সুতরাং ইণ্টারপ্রিটারের কার্য্য কে করিবেন, তৎসম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইল। ইলিয়ট নামক এক তরুণ-বয়স্ক ইংরাজ যুবক আদালতে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পে তাঁহাকে ইণ্টারপ্রিটারের কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। নন্দকুমারের উপদেশ-অনুসারে তৎপক্ষীয় ব্যারিষ্টার ফেরার আপত্তি করিয়া বলিলেন :—

"ইলিয়ট আসামীর শত্রুগণের সংসৃষ্ট ব্যক্তি, এ মোকদ্দমায় তাঁহার কার্য্য করা উচিত নহে।"

প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পে। আদালতের ইণ্টারপ্রিটার উপস্থিত নাই। অন্যান্য মোকদ্দমায় জুররগণ সহকারী ইণ্টারপ্রিটারের সাহায্যে বিচার-কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। (জুররগণের প্রতি) আপনারা কি মনে করেন, এ মোকদ্দমায় তাঁহার সাহায্যে কার্য্য করিতে পারিবেন ?

জুররগণ। তাহা সম্ভব হইবে না।

সার ইলাইজা ইম্পে। ইলিয়টের প্রতি অযথা দোষারোপ করা হইয়াছে।

ইলিয়ট। আমি এ মোকদ্দমায় ইণ্টারপ্রিটারের কাজ করিতে ইচ্ছুক নহি।

সার ইলাইজা ইম্পে। আমরা আদেশ করিতেছি, আপনি ইণ্টারপ্রেট করুন। দোষারোপে ভীত হইবেন না। আপনি সচ্চরিত্র, তাহাতে এদেশীয় ভাষায় আপনার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে। আপনি কার্য্য করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবে যে আপনার প্রতি অযথা দোষারোপ হইয়াছে।

ফেরার। ইলিয়ট যেন মনে না করেন, আমি আপনা হইতে আপত্তি করিয়াছি।

সার ইলাইজা ইম্পে। কে আপনাকে উপদেশ দিয়াছে ?

ফেরার। নাম প্রকাশ করিবার অধিকার নাই।

(জুররগণ ও ফেরার ইলিয়টকে ইণ্টারপ্রেট করিতে অনুরোধ করিলেন)

ফেরার। (বিচার-পতিগণকে সম্বোধন করিয়া) আমার দুইটি প্রার্থনা আছে। আসামীকে ডকে দাঁড় না করাইয়া আমার পশ্চাতে বসিতে দিবার অনুমতি দিতে আজ্ঞা হয়।

সার ইলাইজা ইম্পে। অগ্রাহ্য।

ফেরার। আসামীর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দাঁড়াইতে না হয়, এরূপ অনুমতি দিতে আজ্ঞা হয়।

সার ইলাইজা ইম্পে। অগ্রাহ্য।

মহারাজা নন্দকুমার আসামীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, অভিযোগের বিবরণ পঠিত হইল; ইলিয়ট অনুবাদ করিলেন।

সার ইলাইজা ইম্পে। (আসামীর প্রতি) আপনি দোষী কি নির্দ্দোষ, বলুন।

বিচারপতি লামিষ্টার। শীঘ্র শীঘ্র বলুন,—নতুবা আমরা মনে করিব, আপনি বোবা।

তখন ফেরার আসামীর পক্ষ হইতে আদালতের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আপত্তি দাখিল করিলেন :—

"আমি মহারাজা নন্দকুমার স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইয়া অভিযোগের বিবরণ শ্রবণে তদুত্তরে বলিতেছি আমি নির্দ্দোষী। কিন্তু আমি বর্ত্তমান অভিযোগের উত্তর দিতে বাধ্য নহি। বাঙ্গালী হিন্দুগণের নামে কোন ফৌজদারি অভিযোগ হইলে ইতিপূর্ব্বে এদেশীয় আইনের বিধান অনুসারে অধিবাসীগণের রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

তাহার বিচার হইয়াছে। সেরূপ অভিযোগ ইংলণ্ডের আইন অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের বিচার্য্য এই মর্ম্মে যতদিন ঘোষণা-পত্র প্রচারিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দুগণের উপর এ আদালতের ক্ষমতা থাকিবে না। পূর্ব্বে কোন ঘোষণা-পত্র প্রচারিত না করিয়াই সুপ্রীম কোর্ট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। এ দেশে ফৌজদারি আদালত ও জমিদারের কাছারি আছে। ঘোষণা-পত্র প্রচারিত না হওয়া পর্য্যন্ত এ সমস্ত মোকদ্দমা সেই আদালতের বিচার্য্য।

নন্দকুমার"

এলাকার আপত্তি উত্থাপিত হইলে ফরিয়াদির পক্ষীয় ব্যারিষ্টার ডার্হাম কোন প্রতিবাদ করিলেন না। হয়ত তিনি মনে করিলেন, নন্দকুমারের আপত্তি অসঙ্গত নহে; কিন্তু সার ইলাইজা ইম্পে বলিয়া উঠিলেন :—

"ফরিয়াদির উক্তি এইরূপ যে অপরাধটি কলিকাতায় হইয়াছে। পার্লামেণ্টের আইন-অনুসারে ইংলণ্ডের প্রচলিত আইন কলিকাতায় প্রযুজ্য। (ফেররের প্রতি) আপনি যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ-যোগ্য নহে। যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনাকে এলাকার আপত্তি উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারি। অথবা আপনি উহা সংশোধন করিয়া দিলেও পারেন।"

লামিষ্টার। আদালতের ক্ষমতা নাই—এই আপত্তি করিবার অগ্রে উহার পরিণাম-ফল কি আপনি ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন ?

ফেরার। অনেক চিন্তার পর আপত্তি দাখিল করিয়াছি। এলাকার আপত্তি অগ্রাহ্য হইলে, আসামী "নির্দ্দোষী" বলিয়া উত্তর দিতে পারিবেন কি না, আপনি আমাকে এই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বলিতেছেন ?

লামিষ্টার। (মাথা নাড়িয়া) হাঁ, হাঁ।

ফেরার। যে সমস্ত মোকদ্দমায় প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তাহাতে এলাকার আপত্তি অগ্রাহ্য হইলেও তিনি শেষে "নির্দ্দোষী" বলিয়া উত্তর দিতে পারেন।

লামিষ্টার—(মাথা নাড়িয়া) না না,।

ফেরার। যদি আপনারা একান্তই মনে করেন, এলাকার আপত্তি অগ্রাহ্য হইলে আসামীর "নির্দ্দোষ" বলিয়া উত্তর দিবার অধিকার থাকিবে না, তাহা হইলেও আদালত ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে সে অধিকার প্রদান করিতে পারেন।

সার ইলাইজা ইম্পে। আপনার যুক্তি আমরা শ্রবণযোগ্য মনে করি না।

বিচারপতি চেম্বার্স। দ্বিতীয় জর্জের ২ আইন অনুসারে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছে। সে অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড। সে আইন আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে প্রযুজ্য কি না, তৎসম্বন্ধে আমার গুরুতর সন্দেহ আছে। ইংলণ্ডে তত্রত্য অধিবাসীগণের রীতি নীতি বাণিজ্য-প্রথা, এবং তাহাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এই সমস্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ড বাণিজ্য-প্রধান দেশ; সেইজন্য সেখানে কৃত্রিম নোট প্রস্তুত করা একটি গুরুতর অপরাধ; সেইজন্য আইন-প্রণেতাগণ সে অপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঙ্গালায় সে সমস্ত কারণ বিদ্যমান নাই। ইংলণ্ডে এলিজ্যাবেথের ৫ আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময় সে দেশের যেরূপ অবস্থা ছিল, বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থাও সেইরূপ। সেই জন্য আমি বিবেচনা করি, আসামীর বিরুদ্ধে বর্ত্তমান আকারে মোকদ্দমা চলিতে পারে না। বর্ত্তমান চার্জ উঠাইয়া লওয়া উচিত। ইচ্ছা করিলে, ফরিয়াদি এলিজ্যাবেথের ৫ আইন অনুসারে পুনর্ব্বার অভিযোগ আনিতে পারেন।

সার ইলাইজা ইম্পে। আসামীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় জর্জের আইন প্রযুজ্য। ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ কলিকাতা বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এখানে বাণিজ্য, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-প্রদান প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেই কাগজ মুদ্রার প্রচলন আছে। ভারতবর্ষ "একটি অসভ্য দেশ" এরূপ কথা বলা যাইতে পারে না। আমরা ইতিহাস-পাঠে অবগত হইয়াছি, অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে; কিন্তু উপযুক্ত আইনের অভাবে দেশটি অধঃপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। দ্বিতীয় জর্জের ২ আইন এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য ফৌজদারি আইন এদেশে ইতিপূর্ব্বে প্রযুক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান মোকদ্দমায় এলিজ্যাবেথের ৫ আইন প্রযুজ্য কিনা সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে; সুতরাং বিচারপতি চেম্বার্সের মত আইন-সঙ্গত বলিয়া আমি মনে করি না।

হাইড। প্রধান বিচার-পতির যে মত, আমারও সেই মত।

লামিষ্টার। আমি প্রধান বিচারপতির মতের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইলাম।

বিচারপতি চেম্বার্সের মত গৃহীত হইল না দেখিয়া ফেরার মহারাজা নন্দকুমারের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত আবেদন-পত্রখানি দাখিল করিলেন:—

"আমার নামে যে অভিযোগ হইয়াছে, তাহাতে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। যে সময়ে আমি অপরাধ করিয়াছিলাম বলিয়া ফরিয়াদি প্রকাশ করিয়াছেন, তখন যে আইন প্রচলিত ছিল, তদনুসারে ভগবানের সাহায্যে আমায় স্বজাতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিচার প্রার্থনা করি।

নন্দকুমার।"

সার ইলাইজা ইম্পে। আপনার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। ইংলণ্ডেশ্বর-প্রদত্ত সনন্দ অনুসারে অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তি-গণের বিচার হইয়া থাকে। * সেই প্রণালী অবলম্বনে আপনার মোকদ্দমারও বিচার হইবে। অন্যান্য আসামীর সহিত আপনার প্রভেদ নাই। ইংলণ্ডেশ্বরের ইংরাজ প্রজাগণ আপনার মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

উপরি-উক্ত আপত্তি অগ্রাহ্য হইলে, ফেরার আসামীর পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত আবেদন-পত্রখানি দাখিল করিলেন:—

"এ মোকদ্দমা অত্র আদালতের বিচার্য্য নহে বলিয়া যে আপত্তি করিয়াছিলাম, তাহা আপনারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তৎপরে স্বজাতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিচার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাও অগ্রাহ্য হইয়াছে। সুতরাং আপনারা যে ক্ষমতা পরিচালন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অবস্থানুসারে তাহাতেই সম্মত প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম। নন্দকুমার।"

তখন আসামী "নির্দ্দোষ" বলিয়া জবাব দিলেন; তাহাই লিপিবদ্ধ হইল। সে দিবস রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত আইনের বাগবিতণ্ডার পর আদালতের আদেশ হইল, "কল্য বেলা ৮টার সময় মোকদ্দমা আরম্ভ হইবে।" দ্বিতীয় দিবস—৯ই জুন ১৭৭৫ খৃঃ ফেরার আদালতের কার্য্যারম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বিচার-পতিগণকে বলিলেন, "মহারাজ নন্দকুমার গত রাত্রে অসুস্থ হইয়াছেন, তিনি আদালতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে অক্ষম, অনুগ্রহপূর্ব্বক অদ্য বিচার-কার্য্য স্থগিত রাখিতে আজ্ঞা হয়।"

সার ইলাইজা ইম্পে ফেরারের প্রার্থনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উইলিয়ম ও এণ্ডার্সন নামক দুইজন ইংরাজ ডাক্তারকে নন্দকুমারের শারীরিক অবস্থা পরিদর্শনের নিমিত্ত কারাগারে প্রেরণ করিলেন। ডাক্তারদ্বয় কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগত হইয়া বলিলেন, "আসামীর জ্বরও হয় নাই, সর্দ্দিও লাগে নাই, তিনি আদালতে আসিতে অক্ষম নহেন।" এই কথা শুনিয়া সার ইলাইজা ইম্পে আসামীকে আদালতে আনিবার আদেশ করিলেন।

মহারাজা নন্দকুমার আনীত হইলেন। সাক্ষীগণের জবানবন্দী আরম্ভ হইল।

৮ই জুন হইতে ১৬ই জুন পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা চলিল। মোহনপ্রসাদ, কমলদ্দিন, হোসেন আলি, খোজা পেট্রুজ, মুন্সী সদরুদ্দিন, সাবুত পাঠক, রাজা নবকৃষ্ণ, এই কএক ব্যক্তি ফরিয়াদির পক্ষে এবং তাজুরায়, রূপনারায়ণ চৌধুরী, জয়দেব চোবে, চৈতন নাথ, লালা দোমান সিং, মীর আসাদ আলি মহারাজা নন্দকুমারের অনুকূলে সাক্ষী দিয়াছিলেন।* কৃষ্ণজীবন দাস উভয় পক্ষের মানিত সাক্ষী;

*এস্থলে বলা আবশ্যক, সার ইলাইজা যে সনন্দের ইম্পে (Charter) উল্লেখ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইংলণ্ডের ফৌজদারি আইন কলিকাতায় প্রযুজ্য; কিন্তু সে সনন্দে এইরূপ লিখিত আছে, "অভিযুক্ত ব্যক্তি ইংলণ্ডের আইন অনুসারে স্বজাতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিচারের প্রার্থনা করিতে পারিবে।"

* মোহনপ্রসাদ ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন। নন্দকুমার মার্চ্চ মাসে সুপ্রীম কাউন্সিলে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "হেষ্টিংস আমার সর্ব্বনাশের নিমিত্ত মোহনপ্রসাদের বাটীতে গিয়া গোপনে মন্ত্রণা করিতেছেন।"

তিনি পদ্মমোহনের কার্য্যকারক ছিলেন। যে তমস্থকখানি সম্বন্ধে মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জাল করার অভিযোগ হইয়াছিল, সে দলিলটি জাল সাব্যস্ত না হইলে পদ্মমোহনই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন; কিন্তু সত্যের অনুরোধে কৃষ্ণজীবন বলিয়াছিলেন যে দলিলটি জাল নহে, উহা প্রকৃতপক্ষে বলাকী দাসীই সম্পাদন করিয়াছিলেন। হুজুরিমল ও কাশীনাথ এই দুই ব্যক্তি কোন পক্ষের মানিত সাক্ষী ছিলেন না, কিন্তু আদালত তাঁহাদের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাক্ষীগণের জবানবন্দী সমাপ্ত হইলে, মহারাজা নন্দকুমারের কৌঁসুলি ফেরার তৎপক্ষে বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন; কিন্তু প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পে তাঁহাকে বলিলেন :—

"ইংলণ্ডের আইন-অনুসারে কোন ব্যক্তি এরূপ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইলে তৎপক্ষীয় কৌঁসুলি প্রমাণ আলোচনা করিয়া জুররগণের সমক্ষে বক্তৃতা করিতে পারেন না। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, প্রমাণ সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া আমার হস্তে দিতে পারেন। আপনি বক্তৃতা করিলেও যে ফল পাইতেন, বক্তৃতা না করিয়াও সেই ফল পাইবেন।"

আদালতের এইরূপ আদেশে ফেরারের মুখ বন্ধ হইল। তিনি মহারাজা নন্দকুমারের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত একটী কাগজে প্রমাণ ও আইন সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া সার ইলাইজা ইম্পের হস্তে প্রদান করিলেন। তৎপরে ইম্পে জুররগণকে মোকদ্দমার অবস্থা বুঝাইবার নিমিত্ত এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা (charge) করিলেন। তিনি ফরিয়াদীর সাক্ষীগণের উক্তি বিশ্বাস-যোগ্য কি না তৎসম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া আসামীর সাক্ষীগণ মিথ্যাবাদী এইরূপ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। * অনন্তর বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়া জুররগণের ফোরম্যান

এ কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই, কারণ এই কথা মোহন প্রসাদ তাঁহার নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার দুই মাস পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন। সাক্ষী কমলদিন হেষ্টিংসের বেনিয়ান কান্ত মুদির লবণের ইজারায় অংশীদার ছিলেন। খোজা পেট্রস্ হেষ্টিংসের অনুগৃহীত ব্যক্তি। ইনি হেষ্টিংসের প্রয়োজন-মত তাঁহাকে ঋণদান করিতেন। মুন্সী সদরুদ্দিন (যাঁহার নামে কলিকাতায় একটী ষ্ট্রীট আছে) প্রথমতঃ হেষ্টিংসের পরম বন্ধু গ্রেহামের মুন্সী ছিলেন; পরে গ্রেহাম ইংলণ্ডে গমন করিলে, হেষ্টিংসের অন্যতম বন্ধু বারওয়েলের মুন্সী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিভারিজ অনুমান করেন, এই সদরুদ্দিনই পরিশেষে হেষ্টিংসের নিয়োগ-ক্রমে বাঙ্গালার ফৌজদারের পদে অভিষিক্ত হইয়া সদরুল মুলুক খাঁ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস সর্ব্বপ্রথমে ১৭৫০ খৃঃ যখন এ দেশে পদার্পণ করেন, তখন রাজা নবকৃষ্ণই তাঁহার বেনিয়ান্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পদে নিযুক্ত থাকিয়াই তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়। হেষ্টিংসের সহিত রাজা নবকৃষ্ণের এরূপ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল যে তিনি বিনা তমস্থকে হেষ্টিংসকে তিন লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছিলেন। হেষ্টিংসও তৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে বর্দ্ধমান এষ্টেটের সুজওয়াল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হুজুরিমল হেষ্টিংসের সহিত সংসৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। হেষ্টিংস কলিকাতায় একটি ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত করিয়াছিলেন; হজুরিমল সেই ব্যাঙ্কের প্রধান অংশীদার ছিলেন। হজুরিমলের নামে কলিকাতায় এখনও একটী ষ্ট্রীট আছে। আসামীর সাক্ষীগণের মধ্যে রূপনারায়ণ চৌধুরী বর্দ্ধমানের মহারাণীর পেস্কার ছিলেন। তিনি ১৭৭৪ খৃঃ ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে সুপ্রীম কাউনসিল কর্ত্তৃক রাণীর নাবালক পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহারাজা নন্দকুমারের অন্যতম সাক্ষী মীর আসাদ আলি সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। বক্সারের যুদ্ধের পর রোটাস দুর্গ-ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিবার কথা হইলে দুর্গের শাসনকর্ত্তা সাহমাল বক্সর-বিজেতা মন্‌রোকে লিখিয়াছিলেন "আপনি লিখিয়াছেন, মীর আসাদ আলি কাগজপত্র লইয়া এখনও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি। হয়ত পথে তাঁহার কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে; অথবা তিনি হয়ত টিকারির রাস্তায় গিয়াছেন. সেইজন্য তাঁহার পৌছিতে বিলম্ব হইয়াছে। আসাদ আলি ফুলটন সাহেবের পরম বন্ধু। তিনি পৌছিলে তাঁহার নিকট সমস্ত কথা শুনিবেন। কিন্তু যদি তাঁহার পৌছিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রতীক্ষা না করিয়া আপনি একদল ইংরেজ সৈন্য পাঠাইবেন।" এই পত্রে যে সমস্ত কাগজ-পত্রের উল্লেখ আছে, তাহাতে সাহমাল যে যে সর্ত্তে ইংরাজদিগকে দুর্গ-সমর্পণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। এরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার যাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, তিনি যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু সার ইলাইজা ইম্পে আসাদ আলিকে জালিয়াৎ ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছিলেন।

* সার ইলাইজা ইম্পে জুররগণকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা জে ঘোষাল প্রণীত Celebrated Trials নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

রবিন্‌সনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা সকলেই এক-মত হইয়াছেন ?" রবিন্‌সন বলিলেন, "আজ্ঞা, হাঁ।" সার ইলাইজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের মত কি ?" রবিন্‌সন উত্তর করিলেন, "আসামী দোষী।"

বিভারিজ বলেন যে জুরী নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করিবামাত্র সার ইলাইজা ইম্পে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইতে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে ফেরার মহারাজা নন্দকুমারের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে ইংলণ্ডীয় আইনের বিধান অনুসারে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিতের নিমিত্ত নিম্নলিখিত হেতুবাদে আবেদন করিলেন :—

(১) যে দলিল জাল করার অপরাধে আসামী দোষে সাব্যস্ত হইয়াছেন, উহা ইংলণ্ডের প্রচলিত আইন-অনুসারে "তমস্থক" অথবা "প্রমিসরি নোট" নহে। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে এরূপ কোন দলিল জাল হইয়া থাকিলেও সে অপরাধে ইংলণ্ডীয় আইন প্রযুজ্য নহে।

(২) জুররগণ আসামীকে সাধারণভাবে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। আসামী দলিল বদল করিয়াছেন, অথবা কৃত্রিম জানিয়া প্রচার করিয়াছেন তাহা নির্ণয় না করায় দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখিবার যোগ্য।

উপরি-উক্ত আবেদন-প্রসঙ্গে ফেরারের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে বিচারপতিগণ প্রত্যেকে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিলেন।

সার ইলাইজা ইম্পে। দলিলটি তমস্থক অথবা প্রমিসরি নোট তাহা নির্ণয় করা অনাবশ্যক।

লাম্বিষ্টার। উহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। জুররগণ আসামীকে সাধারণভাবে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে ক্ষতি কি ? আসামী হয় দলিল জাল করিয়াছেন আর না হয় জাল-দলিল প্রচার করিয়াছেন।

হাইড। দলিলটি প্রমিসরি নোট অথবা তমস্থক তাহা নিরূপণ করিবার আবশ্যক নাই। জুররগণের মত সাধারণ ভাবে দেওয়াতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

চেম্বার্স। হাঁ, সে কারণে জুরীর মত আইন-অনুসারে অসিদ্ধ হয় না বটে, কিন্তু জুররগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন উহা আইন-সঙ্গত হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। হয়ত আইন-সঙ্গত হইয়া থাকিবে। আমি যদি একাকী বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিতাম, তাহা হইলেও আসামীর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ঘুচিত না।

সার ইলাইজা ইম্পে। আসামী দয়ার পাত্র নহে। প্রাণদণ্ডের আদেশই শেষ আজ্ঞা।

দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে ফেরার প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত মর্ম্মে আবেদন প্রস্তুত করিলেন :—

"আবেদনকারী একজন বাঙালী হিন্দু। তিনি ইংলণ্ডের ভাষা, রীতি নীতি, অথবা বিচার-পদ্ধতি কিছুই অবগত নহেন। তিনি দলিল জালের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়, ইংলণ্ডীয় আইনের বিধান-অনুসারে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ইংলণ্ডের আইনে কিরূপ অপরাধে কিরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা তাহা তিনি জানেন না ; সুতরাং একজন ইংরাজ তাঁহার অবস্থায় পড়িলে যেরূপভাবে অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেন, তিনি সেরূপ ভাবে প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তৎপ্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়ায় ন্যায়-বিগর্হিত কার্য্য হইয়াছে। প্রার্থনা, সুপ্রীম কোর্টের আদেশ রহিত করিতে আজ্ঞা হয়।"

প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিতে হইলে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন দাখিল করিতে হইত। কিন্তু আপীল হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সার ইলাইজা ইম্পে উহা অগ্রাহ্য করিলেন। অনন্যোপায় হইয়া ফেরার ভাবিলেন, যদি জুররগণ দণ্ডাজ্ঞা স্থগিতের নিমিত্ত বিচারপতিগণকে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে আসামীর জীবন রক্ষা পাইতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি একখানি আবেদন পত্র লিখিয়া উহাতে ইলারিংটন নামক জনৈক জুররের স্বাক্ষর করাইলেন। অনন্তর সেই আবেদনখানি লইয়া জুরীর ফোরম্যান রবিন্‌সনের বাটীতে গেলেন। রবিন্‌সনের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় ফেরার আবেদনখানি ও তৎসহ একখানি পত্র লিখিয়া রবিন্‌সনের বাটীতে রাখিয়া আসিলেন।

রবিনসন ওয়ারেন হেষ্টিংসের বন্ধু। তিনি ফেরারের পত্র ও আবেদনখানি ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রাইভেট সেক্রেটারি বেলির হস্তে প্রদান করিলেন। পর দিবস ফেরার সুপ্রীম কোর্টে উপস্থিত হইলে সার ইলাইজা ইম্পে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন :—"নন্দকুমারের বিচারকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। সেই সঙ্গে আপনার কর্ত্তব্যও শেষ হইয়াছে। আইন-ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ আদালতের ভিতরেই হউক অথবা আদালতের বাহিরেই হউক যে সমস্ত কার্য্য করেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা এবং জুররগণের নিকট অবৈধ আবেদন না হইতে পারে: তৎসম্বন্ধে উপায় উদ্ভাবন করা আদালতের কর্ত্তব্য। আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আদালতের মর্য্যাদা-হানিকর। ইংলণ্ডের কোন সম্ভ্রান্ত আইন-ব্যবসায়ী সেরূপ কার্য্য কখনই করেন না। আপনার হিতের নিমিত্ত এবং আদালতের মর্য্যাদা-সংরক্ষণ-কল্পে আমি আশা করি, এরূপ অপ্রিয় প্রসঙ্গে আর কোন দিন কোন কথা বলিতে না হয়। আপনি নন্দকুমারকে "হতভাগ্য আসামী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি কি আদালতের বিচার-কার্য্যের প্রতি দোষারোপ করিতে চাহেন ?"

ফেরার উত্তর করিলেন ;—"আমি রবিনসনের নিকট যে আবেদন-পত্র রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহার প্রতি অথবা আদালতের প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করি নাই। সে আবেদনের সেরূপ অর্থ কিরূপে করিলেন তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। বিচার-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমারও কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। পরে যে কার্য্য করিয়াছি তাহা কৌঁসুলি-স্বরূপ নহে। হতভাগ্য ব্যক্তির নিঃসহায় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার জীবন-রক্ষার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছি। নন্দকুমার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কারাগারে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই অত্যন্ত হাহাকার করিতেছে। তাহারা কেহই আমাদের আইন রীতিনীতি এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত জানে না। নন্দকুমারের জীবন-রক্ষার চেষ্টা করিতে পারে এরূপ সাধ্য কাহারও নাই। এরূপ বিপদের সময় যদি আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতাম, তাহা হইলে, আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম না।"

এইরূপে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিতের প্রার্থনা, আপীল, আবেদন সমস্তই অগ্রাহ্য হইল। কলিকাতা সুপ্রীম কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্যগণের নন্দকুমারের প্রতি সহানুভূতি থাকিলেও রেগুলেটিং আইনের বিধান-অনুসারে তাঁহাদের সুপ্রীম কোর্টের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহারা ইত্যগ্রে নন্দকুমারের কারাক্লেশ-নিবারণের নিমিত্ত বিচারপতিগণকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সার ইলাইজ ইম্পে তদুত্তরে কএকজন পণ্ডিতের * ব্যবস্থা-পত্র দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে নন্দকুমার হিন্দু হইলেও তাঁহাকে সাধারণ কারাগারে রাখায় তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। সুপ্রীম কাউন্সিল দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিতে অক্ষম হইলেও সভ্যগণ নবাব মোবারেকদ্দৌলার নিম্নলিখিত আবেদনখানি বিচার-পতিগণের নিকট প্রেরণ করিলেন :—

২৭ জুন, ১৭৭৫

ইংলণ্ডেশ্বর সংপ্রতি এদেশে যে আইন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, যদি তদনুসারে সুপ্রীম কোর্ট পূর্ব্বকৃত অপরাধ সমূহের বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে লোকের সর্ব্বনাশ হইবে। মহারাজা নন্দকুমারের নামে উক্ত আদালতের যে মোকদ্দমা চলিতেছে, উহার কঠোরতা চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। যে অপরাধে তিনি অভিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা প্রমাণ হইলেও দেশীয় আইন অনুসারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইতে পারে না। আপনাদের দেশেও পূর্ব্বে এরূপ অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত না। সেখানে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা কয়েক বৎসর মাত্র হইয়াছে। মহারাজা নন্দকুমার উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক হিতকর কার্য্য করিয়াছেন। যখন নবাব মীর কাশিম ইংরাজদিগকে এদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, নন্দকুমারই আমার

* যে চারিজন পণ্ডিত এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম :—
(১) কৃষ্ণজীবন শর্ম্মা (২) বাণেশ্বর শর্ম্মা (৩) কৃষ্ণগোপাল (৪) গৌরীকান্ত শর্ম্মা।

পিতার সহিত একত্রযোগে কোম্পানীর সৈন্যগণের ব্যয়-নির্ব্বাহের নিমিত্ত তণ্ডুল ও অর্থ প্রদানে ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সে সময়ে নন্দকুমার যে উপকার করিয়াছিলেন তাহা দিল্লীশ্বরের অবিদিত নহে। তৎতুল্য ব্যক্তি এরূপ ঘৃণিত অপরাধ করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অনেক শত্রু। যাঁহাদের চক্রান্তে মহারাজা বিপদাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার শত্রু। এই সমস্ত কারণে আমি প্রার্থনা করি, ইংলণ্ডেশ্বরের আদেশ না আসা পর্য্যন্ত মহারাজার প্রাণদণ্ড স্থগিত থাকে।"

সুপ্রীম কাউনসিল নবাবের আবেদনখানি বিচারপতিগণের নিকট প্রেরণ করিলে, সার ইলাইজ ইম্পে কোন উত্তর না দিয়া ৬ই জুলাই তারিখে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন :—

"আমি নবাবের দুইখানি পত্র ও সুপ্রীম কাউনসিলের বরাবর তাঁহার একখানি আবেদন-পত্র পাইয়াছি। আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রীম কাউন্সিলও আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। নবাব পূর্ব্বে কাউনসিলের সভাপতিকে ও আমাকে একই ভাবে পত্র লিখিতেন। কাউন্সিলের সহিত বিবাদ হইবার পর হইতে নবাব স্বীয় বর্দ্ধিত গৌরব সর্ব্বজন সমক্ষে প্রচার করিবার নিমিত্ত আমাকে নিকৃষ্ট আলকাবে (পত্র লিখিবার পাঠ) পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গবর্ণর জেনারেলকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেও সেইরূপ চতুরতা প্রদর্শন করিয়াছেন।"

নবাবের পত্র ও আবেদন পাঠ করিয়া সার ইলাইজা ইম্পে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। সুতরাং নবাব আর কি করিবেন? ফেরারের চেষ্টার ন্যায় তাঁহারও সর্ব্ব চেষ্টা বিফল হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বায়োস্কোপের নাটক

২

এই যে সুপ্রসিদ্ধ নাটক বা উপন্যাস অবলম্বন করিয়া চিত্র-নাট্য গড়িয়া তোলা হইতেছে, এগুলায় একটা ত্রুটি থাকিতেছে। কথা-নাট্যে বা উপন্যাসে লেখক একটা প্লট খাড়া করিয়া সেটিকে কথার সাহায্যে বা ঘটনার সাহায্যে রূপ দিয়া এক ধরণের ব্যঞ্জনায় তাকে ফুটাইয়া তোলেন। সে নাটক বা উপন্যাসের ফলনের যে পথ ধরা হইয়াছে, সেইটাই তার একমাত্র পথ। সে পথ হইতে এধার ওধার করিলেই মুস্কিল।

একটা খুব সাধারণ দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ যখন তাকে ষ্টেজের নাটকে রূপান্তরিত করিলেন, তখন বইখানার অর্দ্ধেক কাটিয়া এমনভাবে তার ঘটনা সাজাইলেন যে নাটক-হিসাবে সেটা মানাইল বেশ। উপন্যাসে লেখক যতটা স্বাধীনতা লইয়া লিখিয়া যান, নাটকে তেমনটি পারেন না। কারণ, তার মধ্যে লেখক প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিতে পারেন না, তার স্থানও নাই, সময়ও নাই। সেইজন্য একই উপাখ্যান উপন্যাসে একভাবে ফলানো হয়, নাটকে তার ফলন চলে আর এক স্বতন্ত্রভাবে। চিত্র-নাট্যে কথার পাঠ মোটেই নাই। সেখানে শুধুই action-এর উপর দিয়া বস্তুটিকে ফুটাইতে হইবে। এই যে সেক্স্‌পীয়রের নাটক বা ডিকেন্সের উপন্যাস চিত্র-নাট্যে দেখানো হইতেছে, সেগুলিতে নাটকের সে প্রাণবস্তুটী কি তেমন অটুট থাকিতে পারিতেছে! হ্যামলেটের To be or not to be—ছবির পটে তার কোন তেজ থাকে কি?



সেখ—অমরাৎ ও ডায়ানা

উপন্যাসকে চিত্র-নাট্যে রূপান্তরিত করিতে চান্, তাহা হইলে কথা-নাট্যের পথ ছাড়িয়া তাঁকে নূতন করিয়াই সবটা গড়িতে হইবে। এ বিষয়ে একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক ও ডিরেক্টর-নাট্যকার বলিয়াছেন,—The same subject can be conceived in terms of half a dozen different arts; only you have to forget all about the conception in one art before you can do anything respectable with it in another. Strictly speaking you cannot 'adapt' a novel or a play to the film—you will have to reconceive the whole thing.

তাই বলিয়া ফিল্ম্ যে কথা-সাহিত্যের সঙ্গে কোনদিন



সেথ—মেথ ও ডায়না

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে, তা নয়। ফিল্‌মের পথ আর কথা-সাহিত্যের পথ এক নয়। তবে ফিল্‌মের গল্পকে যদি কথা-উপন্যাসে ফলাইতে চাও, তাহা হইলে তার বিস্তর কাটকুট করিতে হইবে, অদল-বদল করিতে হইবে। তেমনি আবার কথা-উপন্যাসকেও ফিল্‌মে ফুটাইতে গেলে গোটা উপন্যাসের কোথাও কাটিতে হইবে, কোথাও বা বাড়াইতেও হইবে। সম্প্রতি আরো কয়টি উৎকৃষ্ট ফিল্‌ম্‌-নাট্যের গল্প আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব, ফিল্‌মের নাটক গড়িয়া তুলিতে হইলে কোন্ দিক দিয়া কোন্ পথে চলিব। এদেশে ফিল্‌মে দেশী জীবন-কথা ফুটাইবার প্রয়াস চলিয়াছে—তার মধ্যে খুঁত কি, সেটাও এ আলোচনায় ধরা পড়িবে এবং এদিকে যাঁর ঝোঁক আছে, শক্তি আছে,

প্রতিভা আছে, তিনি সে খুঁতগুলা সারিয়া এমন বাঙলা চিত্র-নাট্য গড়িয়া তুলিবেন, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া যাহা সমস্ত বিশ্বের লোকের মনে সাড়া জাগাইয়া সকলের আদর পাইবে!

সম্প্রতি যে-কয়খানি ভালো ফিল্ম্ এখানে আমরা দেখিয়াছি তার মধ্যে 'সেখে'র নাম উল্লেখ-যোগ্য। ইবানেজের Four Horsemen-এ যিনি নায়ক সাজিয়াছিলেন, তিনি এ নাটকেও নায়কের ভূমিকায় নামিয়াছেন। তাঁর নাম রুডল্ফ্ ভ্যালেণ্টিনো। সেখের গল্প মোটামুটি এই,—ডায়ানা মেয়ো তরুণী ইংরাজ-নন্দিনী—আফ্রিকার মরুপ্রান্তে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। সাহস তাঁর দুর্জ্জয়, প্রাণ তাঁর স্বাধীনতার হাওয়ায় ভরপুর! সেদিন সন্ধ্যায় বিস্ক্রায় আরব-সর্দ্দার সেখ আহম্মদ বেন হাসান নাচ-গান উৎসব লাগাইয়া ছিলেন – সেখানে কাফেরের প্রবেশাধিকার নাই। কৌতূহলী ডায়ানা দুর্জ্জয় সাহসে ভর করিয়া সেখানে ছদ্মবেশে প্রবেশ করে; কিন্তু সেখ আহম্মদের চোখে ধরা পড়িয়া যায়। সেখ তাকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলে, বন্দী করিতে চায়—ডায়ানা পলাইয়া আসে।

সেখ শেষে জানিতে পারে যে এই ইংরাজ-যুবতী পরদিন এক আরব গাইডের সহিত মরুভূমিতে ভ্রমণে বাহির হইবে। সে তখন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয় ও ডায়ানাকে পরদিন মরু-বক্ষ হইতে ধরিয়া নিজের শিবিরে আনে। তারপর দুইজনের সংঘর্ষ চলিল। সেখ চায় ডায়ানা তার বশীভূত হয়, আর ডায়ানা গর্ব্বিত বুকে বলে, না, না...! সেখ হঠিবে না, ডায়ানাও নীচু হইবে না! সেখ জোর-জবরদস্তি করিল না—তবে ডায়ানাকে মুসলমানী পোষাক পরিতে হইল। তারপর সেখ তার দিকে ঘেঁষ দেওয়া ছাড়িল দেখিয়া ডায়ানা নিতান্ত মুষড়াইয়াও রহিল না। তার ভাব কুছ্ পরোয়া নেহি গোছের। কিন্তু শেষে মুস্কিল হইল একদিন।

সেখ বাল্যকালে পারিতে লেখাপড়া করিত। তার পারির বন্ধু রাওল হিউবার্ট বিসক্রায় বেড়াইতে আসিবে, খবর পাঠাইল। রাওল মস্ত ঔপন্যাসিক—তার উপন্যাস ডায়ানাও সদ্য পড়িতেছিল। এ সংবাদ শুনিয়া সে চমকাইয়া উঠিল—তাহারই একজন দেশের লোক ফরাসী আসিয়া দেখিবে, এক ইংরাজ-মহিলা এমনি বাঁদীর বেশে বন্দিনী



পোলা নেগ্রি

হইয়া বাস করিতেছে, এই বর্ব্বর সেখের গৃহে! সেখও ওদিকে বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে গেল; ডায়ানাও পলাইল ঘোড়ায় চড়িয়া, ধূ-ধূ মরুর বুকের উপর দিয়া, এ লজ্জার হাত এড়াইবার জন্য। কিন্তু পথে দস্যু আমরাৎ দল লইয়া চলিয়াছিল—সে ডায়ানাকে দেখিয়া তাকে ধরিতে আসিল। ওদিকে সেখ ডায়ানাকে না দেখিয়া তার সন্ধানে সেখানে আসিয়া পড়িল; আমরাৎ পলাইল, এবং ডায়ানাও এ যাত্রা দস্যু-হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সেখের গৃহেই ফিরিল।

বন্ধু রাওল সেখকে বকিল, একজন ইংরাজ-মহিলাকে এমন হীনভাবে তার গৃহে ফেলিয়া রাখিবার জন্য। নারীকে এমনভাবে পাইবার চেষ্টা করা—এ যে মূর্খ হীন বর্ব্বরের কাজ! বেচারী কাঁদিয়া সারা হইতেছে আর···সেখ বুঝিল, ভাবিল, তাইতো, ইহাকে ভালবাসিয়াছি, বটে···কিন্তু এ কি ভালবাসা! চোখের জলে উহার দিন কাটিতেছে, আর আমি তাকে দেখার সুখে বিভোর হইয়া আছি! সে বন্ধুকে বলিল, তুমি ওঁকে ওঁর দলের লোকের কাছে লইয়া যাও বন্ধু! রক্ষা কর ওঁকে!

তারপর ওদিকে এই সময়েই এক বিপদ বাধিল। ডায়ানা সেখের সেক্রেটারিকে লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল,—আমরাৎ দস্যু ওৎ পাতিয়াছিল—সে পথের

মাঝে ডায়ানাকে পাইয়া সেক্রেটারিকে আহত করিল ; ও ডায়ানাকে চুরি করিয়া লইয়া নিজের গৃহে ছুট দিল।

সেখানে অত্যাচার আর নির্য্যাতন—এই নারীকে বশ করিয়া বুকে পাইবার জন্য ! ডায়ানা তখন বুঝিয়াছে, কি উঁচু মন সেখের ! তাকে সেখ কি ভালবাসাই না বাসিয়াছে—একটি দিনের জন্যও তার স্বাধীন ইচ্ছায় হাত দেয় নাই ! আর এ বর্ব্বর দস্যু ? তখন সেখের জন্য তার প্রাণ উন্মুখ অধীর হইল।

সেখ সংবাদ পাইয়া দল জড়ো করিল; এবং আমরাৎ দস্যুর দ্বারে হানা দিল ও ডায়ানাকে উদ্ধার করিতে আসিয়া সেখ নিজে প্রচুর আঘাত পাইয়া মূর্চ্ছিত হইল ; শেষে তার দলের লোক তার মূর্চ্ছিত দেহ ও ডায়ানাকে লইয়া সেখের শিবিরে ফেরে—এবং এই সেখের রোগের দারুণ মুহূর্ত্তের ফাঁকে ফাঁকে প্রেম আসিয়া ডায়ানার চিত্তকে একেবারে জয় করিয়া ফেলিল। তারপর সেখও সারিয়া উঠিল, এবং ডায়ানা পরিচয়ে জানিল যে সেখ ইংরাজ-পিতা-মাতার পুত্র। শৈশবে মরুর বুকে মা-বাপ হারাইয়া আরব সর্দ্দারের হাতে সে মানুষ হইয়াছিল। তখন মিলনেও কোন বাধা রহিল না।

এ ছবিখানির উপাখ্যান প্রায় নিখুঁত—একটু যা খুঁত, সে ঐ শেষের দিকে সেখের জন্ম-গত ব্যাপার লইয়া। তাকে ইংরাজ পিতার পুত্র না করিলে বহিখানি আরো আর্টিষ্টিক হইত ! স্বজাতি-প্রীতি রক্ষা করিতে গিয়া নাট্যকার রসভঙ্গ করিয়াছেন, এ কথা বলিতেই হইবে। চিত্রনাট্যের ফলন সম্বন্ধে বলিতে পারি, সেটিং প্রভৃতি চমৎকার। ধূ-ধূ মরু প্রান্তর, ঝড় উঠিয়াছে, তপ্ত বালির রাশি উড়িয়া চারিদিক আঁধার করিয়া দিয়াছে—এ-সব দৃশ্য ভারী সুন্দর। রুডলফ্ ভ্যালেণ্টিনোর অভিনয় ও ডায়ানার ভূমিকায় আগনেশ আয়ার্শের অভিনয় প্রথম শ্রেণীর। চরিত্রগুলির make-upও এত চমৎকার যে মুসলমান বেশ মুসলমান ভাব নিখুঁত ফুটিয়াছে, কোন গলদ নাই। আমরাতের make-up দেখিয়া কে বলিবে যে এ অভিনেতা য়ুরোপীয়ান ! সেখের ভূমিকায় অভিনেতার চলা-ফেরা বসা-দাঁড়ানো—এক কথায় সমস্ত কায়দাই একেবারে গোটা আরবীয় !

এই সঙ্গে আর একখানি ছবির কথা মনে পড়িতেছে ! সেখানিও এখানে সম্প্রতি দেখানো হইতেছে—One Arabian Night. এখানিও প্রাচ্য দেশের উপাখ্যান লইয়া রচিত। এই চিত্র-নাট্যে বিখ্যাত ফিল্ম্-অভিনেত্রী



ড্যাডি—জ্যাকির মোরব্বা-পরিবেষণ

পোলা-নেগ্রি নামিয়াছেন এক নর্ত্তকীর ভূমিকায়। ইহার ঘরদ্বার পথ-ঘাট-হারেম, সাজ-পোষাক, বাঁদী-বান্দা একেবারে মুসলমানী আবহাওয়ায় মুসলমানী কেতায় বিচিত্র সুন্দর ! অভিনয় বলিয়া মনেও হয় না ! দুঃখ হয় এই, যে এদেশে আমরা মুসলমানী নাটক বা গীতি-নাট্যের অভিনয়ে কোন

অভিনেতা-অভিনেত্রীকেই পোষাকে বা চেহারায় ঠিক মুসলমানী বানাইতে পারি না, বানাইতে জানিও না! অথচ আমরা তাঁদের সঙ্গে ঘর করিতেছি! আর এ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে মুসলমানী জীবন-লীলার অভিনয়ে কি প্রাণের পরশই না দেখি!

পোলা নেগ্রি জাতে ডেনিশ্ (দিনেমার)। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। ষোল বৎসর বয়সে তিনি



ড্যাডি—জ্যাকির খেলার সাথী

বার্লিনের এক দোকানে শপ্-গার্লের চাকুরি করিতে যান্। তিনি খুব ভালো নাচিতে ও বেহালা বাজাইতে জানিতেন। কিছুকাল পরে তিনি রুশিয়ার Imperial Ballet-এর দলে যোগ দেন। তারপর গত যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে সুবিখ্যাত ফিল্ম্-ডিরেক্টর Ernst Lubitsch তাঁকে বার্লিনে দেখেন, এক দোকানে শপ্-গার্লের চাকরি করিতে। তাঁর হাবভাব ও চেহারা দেখিয়া Lubitsch তাঁকে লইয়া বায়োস্কোপে নামান্! যাঁরা Passion চিত্র-নাট্য দেখিয়াছেন তাঁরা মাদাম ডুবারীর ভূমিকায় পোলা নেগ্রির অপরূপ অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন খুবই—কিন্তু এই One Arabian Night-এ নর্ত্তকীর ভূমিকায় পোলা নেগ্রির প্রতিভা আরো বেশী খুলিয়াছে! তাঁকে অভিনয়ের গোড়া হইতে এমনি তন্ময় দেখি—কোথাও একটা আড়ষ্টভাব তো নাই-ই—তাছাড়া ঠিক যেন বাতাসের মতই তিনি নাটকের অভিনয়ে ভাসিয়া উঠিয়াছেন—তাঁর আসা-যাওয়া, ভাব-ভঙ্গী,—সে একেবারে বাতাসের পরশের মত! কোনখানে একটা আয়োজন করার ভাব দেখি না। অভিনয়ের মধ্যে সহসা চাহিয়া দেখি, ঐ যে একটা জীবন-লীলা নদীর মৃদু তরঙ্গের মতই উছলিয়া উঠিয়াছে! অভিনয়ের এই সহজ ভাব আর কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এই চিত্র-নাট্যে বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীই নামিয়াছেন এবং সকলেই অভিনয়ে কিছু-না-কিছু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আমরা চ্যাপলিনের কথা বলিতে গিয়া অসাধারণ প্রতিভাশালী বালক অভিনেতা জ্যাকি কুগানের কথা বলিয়াছি। জ্যাকি অনেকগুলি চিত্রনাট্যে পর-পর অবতীর্ণ হইয়া অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। তার আর একখানি চিত্র নাট্য পাশ্চাত্য জগতে তার কীর্ত্তিকে দশগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এখানির নাম Daddy. ইহার উপাখ্যানটি ভাবের বিচিত্র লীলায়, মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণে, আর অভিনয়ের অপরূপ ভঙ্গীতে এমন নিখুঁত হইয়াছে যে Daddy সর্ব্বদিক দিয়া চিত্র-নাট্যের রাজ্যে যুগান্তর আনিয়াছে বলা যায়। এ চিত্র সর্ব্বকালের সর্ব্বলোকের মনোরঞ্জন করিবে। গল্পটুকু মোটামুটি এই—

জ্যাকির বাপ ওস্তাদ বেহালা-বাজিয়ে। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীর আর সংখ্যা নাই। তিনি তাঁর এক মহিলা-ছাত্রীকে বেহালা-বাজানোর কায়দা দেখাইতেছিলেন, জ্যাকির মা সেটাকে প্রণয়-সম্ভাষণ ভাবিয়া মনের দুঃখে জ্যাকিকে লইয়া সংসার, স্বামী, গৃহ, সব ত্যাগ করিয়া এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়া ওঠেন; সেখানে তাঁর অসুখ হয় ও তিনি মারা যান্। বাপ যখন ছেলের ও স্ত্রীর সন্ধান পাইলেন না,

তখন মনের দুঃখে ঘর-সংসার ছাড়িয়া দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইলেন ও সেরা বেহালা-বাজিয়ে বলিয়া প্রচুর খ্যাতি লাভ করিলেন। জ্যাকি ওদিকে মার আত্মীয়-গৃহে মানুষ হইতে লাগিল। তার নাম হইল জ্যাকি হোল্ডেন। ক্রমে তাঁদের অবস্থা খুব পড়িয়া গেল; তখন সে তাঁদের ঘাড়ে বোঝা হইয়া না থাকিয়া বিপুল বিশ্বে বাহির হইল, নিজের ভাগ্য গড়িবার উদ্দেশ্যে!

পথে দোসর নাই, সহায় নাই—কে দেখে! একদিন সে আশ্রয় পাইল গ্যালো নামে এক বুড়ার কাছে। গ্যালো বুড়া—তবে তার বেহালায় হাত আছে—কিন্তু গরিব সে বড়লোকের পাড়ায় তার ডাক পড়ে না! সে বেচারা পথে বসিয়া বেহালা বাজায়, কেহ শোনে, শুনিয়া দুটা পয়সা দেয়; কেহ-বা শোনেও না, পাশ দিয়া চলিয়া যায়। কুগান বাপের বিদ্যা কিছু পাইয়াছিল—সহসা তাকে বেহালার ছড়ি টানিতে দেখিয়া বুড়া গ্যালো তার বেহালা শুনিল ও তাকে কাছে রাখিল, বাজানো শিখাইতে লাগিল—এবং দুইজনে একসঙ্গে বেহালা বাজাইয়া যা উপার্জ্জন করিত, তাতেই দুইজনের দিন চলিত।



ড্যাডি—জ্যাকির গৃহস্থালী

ওদিকে কুগানের বাপ পল স্যাভেলি মস্ত নাম কিনিয়া দেশে আসিলেন বাজনার কেরামতি দেখাইতে! গ্যালোর সঙ্গে তাঁর জানা-শোনা ছিল, এবং এই গ্যালোর কাছেই জ্যাকির বাপের প্রথম এ বিদ্যায় হাতে-খড়ি হয়। স্যাভেলি বাজাইবে শুনিয়া গ্যালো থিয়েটারে ছুটিল—স্যাভেলিকে দেখা চাই! থিয়েটারের সামনে কি ভিড়! কাতারে-কাতারে লোক চলিয়াছে স্যাভেলির বেহালা শুনিতে!—গ্যালো ভাবিল, তার স্যাভেলি,—সে আজ, কত বড়... আর গ্যালো—বেচারী!

থিয়েটারের দ্বারে গ্যালো উন্মুখ দৃষ্টিতে চাহিয়া, স্যাভেলি পাশ দিয়া যাইবার সময় তাকে দেখিল,—কিন্তু চিনিতে পারিল না। গ্যালো আনন্দে মুখে হাসি ফুটাইয়া হাত বাড়াইল। স্যাভেলি ভাবিল, বুড়া ভিখারী বুঝি কিন্তু ভিক্ষা চায়! তার হাতে কিছু পয়সা দিয়া স্যাভেলি চলিয়া গেল; গ্যালোর প্রাণে খুবই বাজিল। কোনমতে জ্যাকি হোল্ডেন তাকে লইয়া গৃহে ফিরিল এবং সে-ই বুড়াকে খাওয়াইতে লাগিল। একদিন পথের ধারে জ্যাকি বেহালা বাজাইতেছে, পল স্যাভেলি সে-পথে আসিয়া সে সুর শুনিল; শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—কে তোমার ওস্তাদ, বালক? জ্যাকি বলিল,—গ্যালো।

গ্যালো! সে বাঁচিয়া আছে? বলিয়া স্যাভেলি তখনই পুরানো বন্ধু ও ওস্তাদকে দেখিতে ছুটিল। তারপর সে কি করুণ দৃশ্য—গ্যালোর দুই চোখ স্যাভেলিকে দেখিতে দেখিতেই চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইল! তখন হোল্ডেনকে লইয়া স্যাভেলি তার হোটেলে ফিরিল। হোটেলে মার একখানি ফাটো দেখিয়া হোল্ডেন বিস্মিত হইল,—এবং প্রশ্ন করিতেই পিতা-পুত্রে পরিচয় ও মিলন হইল।

এই নাট্যে জ্যাকির অভিনয় এত চমৎকার—দুষ্টামির সহিত কারুণ্যের স্নিগ্ধ সমাবেশ—সে এক অপূর্ব্ব ভাবাভিনয়! তাছাড়া গ্যালোর অভিনয় বুকটাকে

আগাগোড়া অশ্রুময় করিয়া তোলে, প্রাণ তার দুঃখে গলিয়া এমন হাহাকারেও ভরিয়া ওঠে! গ্যালোর মৃত্যুতে জ্যাকির কাতর কান্না—দর্শকের প্রাণে এমন দরদ জাগায় যে তার আর তুলনা নাই!

এই-সব চিত্রনাট্যগুলির উপাখ্যানে আমরা দেখি, এর আগা-গোড়া সামঞ্জস্য রাখিয়া অভিনয় ফুটাইবার কি প্রয়াস চলিয়াছে! দেশ, কাল, পাত্র সব বিষয়ই হুবহু ঠিক-ঠাক—কোথাও গোঁজা-মিল নাই!

আর—একখানি ছবি সম্প্রতি য়ুরোপে আমেরিকায় মস্ত নাম কিনিয়াছে—The Orphans of the Storm এখানি ফরাসী বিদ্রোহের আমলের একটি কাহিনীর উপর রচিত। বারান্তরে এ নাট্যের কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শিবসুন্দর।

সঙ্কলন

রামায়ণে রত্নের ব্যবহার

মণি-মরকত প্রভৃতি মূল্যবান পার্ব্বত্য প্রস্তর ও প্রবাল-মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য জলজ দ্রব্যাদিকেই সাধারণতঃ রত্ন বলা হইয়া থাকে। রামায়ণে রাজ-গৃহাদির, পোষাক-পরিচ্ছদের, তৈজস পত্রের ও অন্যান্য বর্ণনায় নানা প্রকারের রত্নাদির উল্লেখ আছে।

ভারতবর্ষে এই সকল জিনিষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই খুব সহজ-লভ্য ছিল, এই কারণে ভারতীয় শিল্পীরা বিলাস-প্রসাধনের বিশেষ উপকরণ-রূপে মণিমুক্তা এত অধিক ব্যবহারে আনয়ন করিতে পারিয়াছিল।

রামায়ণে নিম্নলিখিত রত্নগুলির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহা নীলমণি, ইন্দ্রনীল, বারিসম্ভব মণি, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, বিক্রম (প্রবাল) বৈদুর্য্য, মরকত, মুক্তা, স্ফটিক,বজ্রমণি, বা হীরক, শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ শিলা ইত্যাদি।

তখন ইন্দ্রনীল নামক মূল্যবান প্রস্তর খোদিয়া শিল্পীরা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিত। অযোধ্যার রাজ-পথের পার্শ্বে ইন্দ্রনীল প্রস্তরের মূর্ত্তি (Statue) স্থাপিত ছিল।

তত্রেন্দ্রনীলপ্রতিমা প্রতোলীবর শোভিতাঃ॥ ১৮।২।৮

রাবণের পুষ্পক রথে মূল্যবান ইন্দ্রনীল ও মহানীল নির্ম্মিত বেদিকা ছিল।

ইন্দ্রনীল মহানীলমণিপ্রবর-বেদিকাম্। ১৬।৫।৯

সীতা রামের যে চূড়ামণি সযত্নে অভিজ্ঞান স্বরূপে রাখিয়াছিলেন, সেই চূড়ামণিটী ছিল—'বারিসম্ভবঃ' অর্থাৎ সমুদ্র-রত্ন (সু ৪০-৮ শ্লোক)

বিক্রম বা প্রবালের উল্লেখ অযোধ্যায় রাম-ভবনের বর্ণনায় পাই। সে ভবনের দ্বারসমূহ ছিল—প্রবাল ও মণি-মুক্তা খচিত।

মণি-বিক্রম-তোরণম্···মুক্তামণিভিরাকীর্ণং। রাবণের রথখানাও ছিল—

হেমজাল-বিততং মণি-বিক্রম-ভূষিতম্। ৩৬।১১

রাবণের সিংহাসনগুলির কোন কোনটী ছিল বৈদুর্য্যমণি খচিত, কোনটী বা ছিল মরকতময়। ল ১১

রাবণের শয্যাগৃহের পর্য্যঙ্কটী বৈদুর্য্য মণির সহিত হস্তীদন্তের সমাবেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দান্ত কাঞ্চন চিত্রাঙ্গৈ বৈদুর্য্যাশ্চ বরাসনৈঃ। ২।৫।১০

আজকাল যেমন হীরক অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয় রামায়ণের যুগেও তাহা সেইরূপে ব্যবহৃত হইত। হীরক-খচিত অলঙ্কার (সু ১০) হীরক খচিত বর্ম্ম (ল ৭০) প্রভৃতির উল্লেখ রামায়ণে আছে। লঙ্কার রাজ-প্রাসাদগুলিও বজ্রমণিতে বা হীরক-খণ্ডে শোভিত ছিল।

বজ্র বৈদুর্য্য চিত্রৈশ্চ স্তম্ভৈদৃষ্টি মনোরমৈঃ। ৮।৪।৫৫

লঙ্কার চতুর্দ্দিকে যে স্বর্ণ প্রাচীর ছিল, সেই স্বর্ণ-প্রাচীর ও ছিল—

মণি বিক্রম বৈদুর্য্য মুক্তা বিরচিতান্তর। ৪।৬।৩

স্ফটিকের ব্যবহার লঙ্কায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। স্ফটিক কাঁচ নহে। প্রাচীনকালে কৈলাশ পর্ব্বতে, বিন্ধ্য পর্ব্বতে ও লঙ্কাদ্বীপে স্ফটিক উৎপন্ন হইত। কৈলাশ পর্ব্বতে শুভ্র স্ফটিক ছিল, দুই নামে পরিচিত। সূর্য্য-কান্ত মণি ও চন্দ্রকান্ত মণি। সূর্য্য-কিরণ সংঘাতে যে প্রস্তর মণি হইতে অগ্নি নির্গত হইত, তাহার নাম ছিল সূর্য্যকান্ত মণি; আর চন্দ্রকিরণ-সম্পাতে যাহা হইতে বারি নিঃসৃত হইত তাহার নাম ছিল—চন্দ্রকান্ত মণি। কৈলাশ পর্ব্বত এইরূপ মূল্যবান স্ফটিকের জন্মস্থান হেতু এখনও তাহা স্ফটিকাচল বলিয়া রচিত।

লঙ্কার প্রাসাদ চৈত্য, দেবায়তন—সমস্তই ছিল স্ফটিক প্রভাবে প্রভাবিত। লঙ্কার অনেক তৈজস-পত্রও স্ফটিক নির্ম্মিত ছিল। মণিময় স্ফটিক পান-পাত্রের উল্লেখ লঙ্কার বর্ণনায় আছে। (সু ১০) স্ফটিক খোদিয়াই বোধ হয় এই সকল পাত্র প্রস্তুত করা হইত এবং তাহাতে মণি-মুক্তা বসান হইত।

আমরা বর্ত্তমানে যে সকল পাত্রকে স্ফটিক পাত্র বলিয়া অভিহিত

করি, তাহা কাঁচ ঢালাই পাত্র ; স্ফটিকনিভ স্বচ্ছ ও শুভ্র হেতু স্ফটিক পাত্র বলিয়া পরিচিত। স্ফটিক এখন সাহিত্য ও প্রচলিত প্রবাদের আশ্রয়ে কোনরূপে নিজ নামের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে মাত্র।

সৌরভ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০।

গান

কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে
ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে।
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে
নিত্য নূতন সংঘাতে।
বাজে ফুলে, বাজে কাঁটায়,
আলো-ছায়ার জোয়ার-ভাঁটায়,
জীবন জুড়ে উঠ্‌ল বেজে
দুঃখে সুখে শঙ্কাতে,
নিত্য নূতন সংঘাতে।

তালে তালে সাঁঝ সকালে
রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
শাদা-কালোর দ্বন্দ্বে যে ঐ
ছন্দে নানান্ রং লাগে।
এই তালে তোর গান বেঁধে নে,
কান্না-হাসির তান সেধে নে,
ডাক দিল ঐ মরণ-বাঁচন
নাচন-সভার ডঙ্কাতে
নিত্য নূতন সংঘাতে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যমুনা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০।

নিশীথ রাতের প্রাণ
কোন্ সুধা যে চাঁদের আলোয়
আজ করেছে পান॥
মনের সুখে তাই
আজ গোপন কিছু নাই,
আঁধার ঢাকা ভেঙ্গে ফেলে
সব করেছে দান।
দখিণ হাওয়ায় তার
সব খুলেছে দ্বার।
তারি নিমন্ত্রণে
আজি ফিরি বনে বনে,
সঙ্গে করে এনেছি এই
রাত জাগা মোর গান॥

শান্তিনিকেতন, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই শ্রাবণ-বেলা বাদল-ঝরা
যূথী বনের গন্ধে-ভরা।
কোন্ ভোলা-দিনের বিরহিণী
যেন তারে চিনি চিনি,
ঘন বনের কোণে কোণে
ফেরে ছায়ার ঘোম্‌টা-পরা॥
কেন বিজন বাটের পানে
তাকিয়ে আছি কে তা জানে।
যেন হঠাৎ কখন অজানা সে
আসবে আমার দ্বারের পাশে,
বাদল সাঁঝের আঁধার মাঝে
গান গাবে প্রাণ-পাগল করা।

শান্তিনিকেতন, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত

মেয়েলী সঙ্গীত অসংখ্য। সেই সব সংখ্যাহীন গীতাবলী আবার বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—পূজার মালসী, ব্রতের গীত, প্রাতঃস্নানের গান, বিবাহের গীত, পুনর্ব্বিবাহের গীত, সহেলা অন্নপ্রাশন-চূড়াকরণ ও উপনয়নের গীত, স্নান-কামানের গীত, বর-বধূর যাত্রার গীত, পঞ্চামৃত-সীমন্তোন্নয়ন সাধভক্ষণের গীত, বরশয্যার গীত ইত্যাদি বহুবিধ গীত মেয়েলী সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, সীতা-সাবিত্রী শ্রীরাধিকার বারমাসী, রামের বনবাস, নিমাইয়ের সন্ন্যাস, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ।

নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এক প্রকার গায়িকা স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহারা উপযুক্ত মত বেতন লইয়া বিবাহাদি উৎসব-বাড়ীতে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বাৎসল্য রস-সংযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাই সেই কীর্ত্তনের বিষয়। ইহাকে "খেলা কীর্ত্তন" বা 'গোপিনী কীর্ত্তন" বলে। এই গোপিনী বা খেলা কীর্ত্তন মেয়েলী সঙ্গীত।

ভাটি অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা "ধামালি" বা "ধামাইল" বলিয়া এক প্রকার গীত গাইয়া থাকেন। সেগুলি অধিকাংশই প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব কবি-রচিত রূপানুরোগের পদ। শ্রীকৃষ্ণ আর গৌরাঙ্গই "ধামাইল" গীতের বিষয়।

দশ, পনের, কি বিশ-পঁচিশ জন স্ত্রীলোক মুক্ত প্রাঙ্গণে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া, তালে তালে করতাল দিয়া নাচিয়া নাচিয়া ধামালি গাহিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে "ধামালি" গাইতে দেখা যায় না।

মেয়েলী সঙ্গীতে গীতি-সাহিত্যের প্রায় অর্দ্ধাংশই সরস করিয়া রাখিয়াছে। এই সমস্ত গীতাবলী কাহার রচিত, তাহার কোন নামের ভণিতা নাই। তবে যে সকল পুরুষের গান মেয়েরা আপনার করিয়া লইয়াছেন, এবং বৈষ্ণব কবি রচিত যে সকল পদাবলী মেয়েলী সঙ্গীতে মিশিয়াছে, তাহার দুই-একটিতে রচকের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় খাঁটী মেয়েলী সঙ্গীতগুলি পল্লীর স্ত্রীকবি কর্ত্তৃকই রচিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলী এবং পুরুষের গান বাছিয়া পৃথক করিয়া লইলেও, খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীত সংখ্যায় অল্প হইবে না। হিন্দু ধর্ম্মের যাবতীয় শুভানুষ্ঠানেই মেয়েলী সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। কতকগুলি গীত বিধ্যুক্ত মন্ত্রের ন্যায় হইয়া গিয়াছে; সেগুলি না গাইলে নয়; শুভকার্য্য অঙ্গহীন হইয়া যায়।

যদিচ মেয়েলী সঙ্গীতের অনেক স্থলে বর্ণ-মৈত্রতার অভাব কি রচনা সৌন্দর্য্যশূন্য, তথাচ স্ত্রী-কণ্ঠে গীত হইয়া রাগিণীর মধুরতায় গীতগুলি মধুর হইতেও সুমধুর হইয়া উঠে, ভক্ত ভাবুকের নয়নাশ্রু আকর্ষণে সমর্থ হয়, হৃদয়ের পরতে পরতে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব-বৈচিত্র্যের প্লাবন খুলিয়া দেয়, মানুষকে টানিয়া আর এক রাজ্যে লইয়া যায়।

মেয়েলী সঙ্গীতের ভাষা ও রচনা বর্ত্তমান্ শিক্ষিত সমাজের ভাষা-রচনার মত উজ্জ্বল না হইলেও স্বাভাবিক কবিত্বের স্ফুরণ-শূন্য নহে। প্রাচীন পল্লীভাষায় রচিত, মেয়েলী সঙ্গীতসমূহ ভাষা-দোষে দুষ্ট না হইয়া বরঞ্চ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে সমধিক উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের একটি অঙ্গ বলিয়া এই গীত-রত্নগুলি বাণী ভাণ্ডারে স্থান পাইবার যোগ্য।

বিবাহের গীতের মধ্যে গালি দেওয়ার এক রকম গীত আছে। সেই গালির গীতে এবং গর্ভাধান বিবাহের কোন কোন গীতে অল্পাধিক পরিমাণে অশ্লীলতার ভাঁজ আছে। এই অশ্লীলতাটুকু এমন ভাবে গীতের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে গীতটি নীরস ও নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। বাস্তবিক ভাব-রসের সমাবেশ না থাকিলে কাব্যোদ্যানের কমনীয়তা রক্ষা পায় না। রস কাব্যের জীবনী-শক্তি; ভাব তাহার প্রাণ।

কন্যার মাকে পরিহাসপূর্ব্বক গীত দ্বারা গালি দিয়া মেয়েরা আমোদানন্দ উপভোগ করিতেছেন,—

"ঘর থাক্যা কন্যার মায় কমর দেখাইছে।
এরে দেখ্যা ঢুলী বেটায় গোট গড়াইছে।" ইত্যাদি।

কন্যার মা গীত শুনিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত বদনে মৃদু মধুর হাসিতেছেন, আর কার্য্যানুরোধে ঘরে বাহিরে আসা-যাওয়া করিতেছেন। উপর্য্যুক্ত দুইটি পদে এইরূপ একখানি আনন্দ-চিত্র আঁকিয়া দিতেছে।

বিবাহ-বাড়ীতে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষীয় আত্মীয় স্বজনের উপরই অল্পাধিক পরিমাণে গালি বর্ষিত হইয়া থাকে। আগন্তুক নাপিত ধোপা এমন কি, পুরোহিত ঠাকুরকে পর্য্যন্ত ভাগ লইতে হয়।

রসজ্ঞ সাহিত্যিক লইবেন—কবিতা-কুসুমের গোলাপগন্ধ; অশ্লীলতার পূতি গন্ধ তাঁহাদের আঘ্রাণের বিষয় নহে। চিনি মিশ্রিত থাকিলে, পিপীলিকা ধূলা ফেলিয়া চিনিই গ্রহণ করিয়া থাকে।

পূজার মালসী গীত হইবার সময় আজকাল মধ্যে মধ্যে অন্দর মহল হইতে কবি-ওয়ালাদের ডাকস্বর এবং স্বর্গীয় কবি রামপ্রসাদের গলা শুনিতে পাই।

জল ভরায় গীতে বৈষ্ণব কবিদের প্রাচীন রূপানুরাগের পদই অধিক। আধুনিক পল্লী-কবিদেরও রসাল রসাল অনেক পদ জল ভরায় স্থান পাইয়াছে।

খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীত সকল বহুকাল পূর্ব্ব হইতে পূজায় ব্রতে, সহেলায় ও বিবাহাদিতে মন্ত্রবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহার কোন পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন নাই। একসুরে একটানে চলিয়াছে।

কার্ত্তিক পূজার গীতের বয়স নির্ণয় করা অসাধ্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সুরে যে ভাবায় চলিয়া আসিতেছে, এখনও সেইরূপই আছে।

সন্ধ্যার সময় হইতে আরম্ভ হইয়া পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সারা রাত্রি ভরিয়া নানারকমের গীত কার্ত্তিক পূজায় গীত হয়। নমুনা-স্বরূপ একটা বাঘের গীত লিখিয়া দিতেছি—

"বাঘা কান্দেরে, বাঘুনীর লাগিয়া, বাঘা কান্দেরে।
বাঘা বুল বাঘুনী এই না পথে যাইও।
নবীনের গরু দেখ্যা ছেলাম জানাইও।"

এইরূপ হারুর গরুর দেখ্যা, রামনাথের গরু দেখ্যা ছেলাম জানাইও। অর্থাৎ ব্রতে যতজন মেয়ে লোক থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বাটীস্থ একজনের নামোল্লেখ করিতে হইবে। নতুবা বাঘ রাগ করিয়া গরু মারিয়া ফেলিবে।

এই সকল প্রাচীন মেয়েলী সঙ্গীতের ভিতর ঐতিহাসিক তত্ত্বের অস্পষ্ট রেখা-পাত আছে। প্রাচীন কালে ময়মনসিংহ যে জঙ্গলময় ছিল, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর উৎপাতও যে বেশী ছিল, প্রাগুক্ত বাঘের গীত তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। এখনও রাখালেরা বাড়ী বাড়ী মাগিয়া "বাঘের ব্রত" করে।

ময়মনসিংহের ছোট ছোট বালিকারাও পুতুল বিয়ার সঙ্গে সঙ্গে

বিবাহের অনেক গীত শিখিয়া ফেলে, এবং মধুর কণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় গাহিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলে। বধূ পুতুলটীকে পাল্কীতে উলুধ্বনি পূর্ব্বক বালিকারা গলাগলি দাঁড়াইয়া গাহিতেছে,—

"পুতুলা যাওগো জামাইর ঘরে—
তিনদিন ধইরা আইছুইন জামাই,
রইছুইন ফুলের তলে॥
ফুলের তলে ঝামুর ঝুমুর, কলার তলে বিয়া,
কইত্য আইছুইন, ছাওয়াল জামাই,
মড়ক মাথায় দিয়া॥
আদরে আদরে বাবা,—আগে দিছ বিয়া।
এখন কেনে কান্দ বাবা, গামছা মুখ দিয়া॥"

বসন্তকালে স্ত্রীলোকেরা বসন্ত রায়ের ব্রতের পূর্ব্ব সপ্তাহ কাল "উত্তম" পূজা করিয়া থাকেন। আমাদের নন্দদুলাল শ্রীকৃষ্ণই "উত্তম;" তাঁহারই আর এক নাম "বসন্তরায়।"

বসন্তকালের অপরাহ্ন বেলায় কুমারী কন্যাগণ দ্রোণ ধুস্তুর, পলাশ, মন্দার, ভাণ্ডারী প্রভৃতি নানাজাতীয় বাসন্তী কুসুমে ডালা সাজাইয়া লইয়া বিল্ব, কদম্ব, নিম্ব অভাবে অন্য কোন বৃক্ষ-মূলে সন্ধ্যাকালে উত্তমের পূজা করেন। ফুলের ডালায় ছোট ছোট মাটীর ঢেলা এবং ধান্য দূর্ব্বাও থাকে। কুমারীরা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক, ফুল, ঢেলা এবং ধান্যদূর্ব্বা উত্তমোদ্দেশ্যে বৃক্ষমূলে দিয়া প্রণাম করেন। উত্তম পূজার মন্ত্র। যথা,—

"উত্তম ঠাকুর ভালা। আমি কালা।
উত্তম ঠাকুর ভালা। ঠাকুর দাদা কালা॥
উত্তম ঠাকুর ভালা। আমার বাবা কালা।
উত্তম ঠাকুর ভালা। আমার মা কালা॥" ইত্যাদি।

বাটীস্থ ভাই ভগিনী, পিতা, মাতা সকলেই 'কালা' বলিতে হয়। কেবল উত্তম ঠাকুর কাল হইয়াও ভাল।

পূজা সমাপন করিয়া মেয়েরা সেই পূজিত বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া গীত ধরেন,—

১। "কে তুলরে ফুল রাজবাড়ীর মাঝে।
ঠাকুর বাড়ীর ঝী গো আমি ফুলের অধিকারী।
(কে তুলরে ফুল,)
আগা ধইরা তুল ফুল, মাঝে ভ্যাঙ্গা পড়ে।
(কে তুলরে ফুল,)
সাজি ভইরা তুলে ফুল, খোপা ভইরা পরে।
(কে তুলরে ফুল,)
সাত ভাইয়ের বইন গো আমি,
ফুলের অধিকারী। (কে তুলরে ফুল,)

২। "কুঞ্জের মাঝে কেরে, কুঞ্জের মাঝে কে?
নন্দের ছাইলা কালাচাঁদ কৃষ্ণ এসেছে॥
এক দেউরী, দুই দেউরী, তিন দেউরীর পরে।"
তিন দেউরীর পরে গিয়া, পাঠাইলাম ঠাকুরের লাগরে॥
(কুঞ্জের মাঝে কে?)
কুঞ্জে গিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ খাইলাইন একটুক্ পান।
রাধিকারে দেখইন ঠাউকুরে, পুন্‌মাসীর চান॥
(কুঞ্জের মাঝে কে?),
কুঞ্জে গিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ খাইল একটুক্ গুয়া।
রাধিকারে দেখইন ঠাউকুরে, পিঞ্জরের সুয়া॥
(কুঞ্জের মাঝে কে?)

বসন্ত রায়ের ব্রতের গীত আর অভিসার ব্রতের গীত প্রায় একই রকম। ঠাকুরের নিকট দৈন্যোক্তিই অধিক।

সৌরভ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০। শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

যক্ষ্মারোগ বা টিউবারকুলোসিস

নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিলে Tuberculosis এর হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়:—

১। জল, চা প্রভৃতি পানীয়ের জন্য সদা-সর্ব্বদা নিজের কাপ, গেলাস বা পাত্র প্রভৃতি ব্যবহার করিবেন। বাজারের চায়ের দোকানের ও হোটেলের পাত্র ও গেলাসগুলি এবং লিমনেডের দোকানের গেলাসগুলি প্রায়ই সংক্রামিত।

২। শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হইতে বিরত থাকা উচিত নহে।

৩। পুষ্টিকর ও বিশুদ্ধ বা খাঁটি খাদ্য দ্রব্য ব্যবহার করা একান্ত কর্তব্য।

৪। দিবারাত্র নির্ম্মল বায়ু সেবন করা দরকার। বদ্ধ হাওয়া-যুক্ত স্থানে থাকা আদৌ উচিত নহে।

৫। মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে।

৬। (Excess) সর্ব্বপ্রকার 'অতি' বর্জ্জন করা উচিত।

৭। (Over-work) নিজশক্তির বহির্ভূত কার্য্যাদি করিবেন না। আজকাল, ফুটবল, সন্তরণ প্রভৃতি খেলার প্রতিযোগিতায় জিতিয়া ভবিষ্যতে অনেকে যক্ষ্মা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন।

৮। জানালা বন্ধ করিয়া থাকা উচিত নহে।

৯। এক ঘরে অনেক লোক শয়ন করা বিধেয় নহে।

১০। নিদ্রার সময় মুখে ঢাকা দিয়া শয়ন করা ভাল নহে।

১১। ধূলা ও মাছিযুক্ত স্থান পরিত্যাগ করা বা তাহা নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

১২। মুখ দিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করার অভ্যাস অবশ্য পরিত্যাজ্য।

১৩। মেঝে, দেওয়ালে ও ঘরের কোণে বা যেখানে সেখানে থুতু ফেলা উচিত নহে।

১৪। সে ব্যক্তির থাইসিস হইয়াছে তাহার সহিত বসবাস করা উচিত নহে। নিতান্ত আপনার বন্ধু-বান্ধব হইলে অতি সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়।

১৫। ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত স্যাঁতসেঁতে, আলোক-শূন্য স্থানে বসবাস করা উচিত নহে।

১৬। যে কোনও রূপে শারীরিক দুর্ব্বলতা হইতে পারে, এরূপ কার্য্য করিবেন না।

১৭। নির্ম্মল শীতল বায়ু ও নির্ম্মুক্ত নৈশ বায়ু সেবন করিতে ভয় পাইবেন না। কারণ শরীর যথাযথ আবৃত থাকিলে নাক দিয়া শীতল বায়ু গ্রহণে কোন প্রকার অপকার হয় না। বিশেষতঃ কলিকাতার মত সহরে রাত্রের বায়ুতে অপেক্ষাকৃত ধূলা কম থাকে।

১৮। অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য আহার বা শরীরের প্রয়োজন অপেক্ষা অল্প বা অধিক আহার করিবেন না।

এই রোগের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা যায়,—

১। সন্ধ্যার প্রাকাল হইতে প্রত্যহ বা সময়ে সময়ে জ্বর-ভাব হয় এবং সেই জ্বর যদি ম্যালেরিয়া নয় বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত।

২। বিনা-কারণে অল্প অল্প করিয়া শরীরের ওজন কম হইতে থাকিলে কাল বিলম্ব না করিয়া তাহা নিবারণ করা উচিত।

৩। অল্প অল্প কাসি কিছুতেই সারিতেছে না, সেইরূপ অবস্থায় কাল বিলম্ব না করিয়া পারদর্শী চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত।

৪। অল্প অল্প রক্তের ছিট্ কফের সহিত দেখা যাইলে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

৫। অজীর্ণ (Dyspepsia) অগ্নিমান্দ্য অনেক সময়ে যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

উপরিউক্ত কারণে যদি মনে কোনরূপ সন্দেহ জন্মায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে বা কোন ডাক্তার-খানায় যাইয়া পরীক্ষা করাইতে হইবে। রোগ বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বেই যেন ধরা পড়ে। রোগ ধরা পড়িলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইলে আরোগ্য হইবার আশা থাকে। যদি বাটীতে কোন যক্ষ্মা রোগী থাকে তাহা হইলে ভীত না হইয়া নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলে তাহা হইতে সংক্রমণের ভয় থাকিবে না।

১। রোগীকে থুথু যেখানে সেখানে ফেলিতে বারণ করিতে হইবে। একটী পিকদানীতে থুথু ফেলিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং তাহা কার্য্যতঃ পরিণত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবে। ঐ পিকদানীতে চাপা দিবার বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। এজন্য আপনি বন্ধ হইয়া যায় এরূপ পিক্‌দান (self-closing spittoon) রাখিলে ভাল হয়। ঐ পিকদানী পরিষ্কার করিবার সময় থুথু ড্রেনের ভিতর ফেলিয়া ঐ পিকদানী বেশ করিয়া ১৫ মিনিট ধরিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া লইবে বা বেশ করিয়া পুড়াইয়া লইলে চলিবে বা ডাক্তারের পরামর্শ মত কোন (disinfectant) বিশোধক দ্রব্য দিয়া মতকাইবার পূর্ব্বে যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার হয় তাহা করিতে হইবে।

২। কাশিবার বা হাঁচিবার সময় রোগী মুখের নিকট একখানি রুমাল ঢাকা দিবে; তাহা হইলে থুথকুড়ি বায়ুর সহিত মিশিয়া, অপরে শ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিবে না। এবং ঐ রুমালখানি প্রত্যহ ১৫ মিনিট কাল জলে সিদ্ধ করিয়া লইবে।

৩। কোন দ্রব্য আহারের পূর্ব্বে ও পরে হাত ধৌত করিতে হইবে; কারণ অপরিষ্কৃত হস্ত দ্বারা অনেক ব্যাধি ছড়াইয়া পড়ে।

৪। রোগীর নিজের ব্যবহার্য্য থালা, গেলাস বাটী প্রভৃতি পাত্রাদি অপরে যাহাতে ব্যবহার না করে তাহা করিতে হইবে। এবং প্রত্যহ ঐ বাসনগুলি জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। রোগীর জন্য থালা বাটি প্রভৃতি বাসন একসেট আলাহিদা আনাইয়া রাখিয়া প্রত্যহ সিদ্ধ করিয়া লইবে ও একটী পাত্রে ফিকা পারমেঙ্গেনেটের দ্রব্য (weak permanganate lotion) করিয়া তাহাতে সব সময়ে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে।

৫। রোগীকে একলাই তাহার বিছানায় শয়ন করিতে দিবে। সে বিছানা যেন অপর কেহ ব্যবহার না করেন। কাপড় জামা সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে।

৬। রোগী যেন বালক বালিকা বা কাহাকেও চুম্বন না করে বা তাহাকেও যেন কেহ চুম্বন না করে তাহা বলিয়া দিতে হইবে।

অসাবধানী যক্ষ্মা রোগী হইতে বীজাণু সুস্থ ব্যক্তির শরীরে কিরূপে প্রবেশ করে তাহা জ্ঞাত হওয়া উচিত। যক্ষ্মা রোগী যেমন মেঝেতে থুতু ফেলে সেই থুতু শুকাইয়া ধূলার সহিত মিশিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ুর সহিত মিশিয়া সুস্থ শরীরে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মা উৎপাদন করে।

কিন্তু যদি ঐ থুথু কোন আঢাকা (uncovered) পিকদানীতে ফেলে এবং তাহাতে মাছি বসিয়া সেই মাছির পায়ে থুথুর কণিকা সংলগ্ন হইয়া যায় এবং ঐ মাছি যে যে খাদ্য দ্রব্যে বসে সেই খাদ্য দ্রব্য সুস্থ ব্যক্তি ভোজন করিলে ঐ খাদ্য দ্রব্যের দ্বারা ঐ সুস্থ ব্যক্তি সংক্রামিত হইয়া যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হইতে পারে।

মেঝেতে থুতু ফেলিলে আর এক বিপত্তি উপস্থিত হয়, তাহা

আমরা মনেও ভাবি না। ধুলার সহিত জীবাণু মিশ্রিত হইয়া থাকিলে মেঝে ঝাঁট দিবার সময় হাওয়ায় উড়িয়া স্থানে স্থানে গিয়া পড়ে। শিশু-সন্তান ও বালক-বালিকাদের গায়ে ঐ ধুলা লাগে ও ঘা থাকিলে তথায় লাগিয়া নানা-রূপ রোগ জন্মায়। নিশ্বাসের দ্বারা প্রবেশ করে এবং মুখের মধ্যেও প্রবেশ করিতে থাকে। বালক-বালিকাদের হাতের খাদ্য দ্রব্য, (lozenges, pencil) লজেঞ্জেস, পেন্সিল প্রভৃতি ঐ জমিতে পড়িয়া ঐ জীবাণুযুক্ত ধুলার ঐ সকল দ্রব্য সংযুক্ত হইয়া মুখে প্রবেশ লাভ করে। এই জন্য পেন্সিল, পয়সা প্রভৃতি দ্রব্য ছেলেরা যাহাতে বাল্যকাল হইতে মুখে না দেয়, সে বিষয় পিতামাতা শিক্ষক ও অভিভাবকদের শিক্ষা দেওয়া উচিত।

পূর্ব্বলিখিত মত যক্ষ্মা রোগীর ব্যবহৃত বিছানা বাসন প্রভৃতি নির্দ্দোষ (disinfect or boil) না করিয়া ব্যবহার করিলে ঐ রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা। ইহাও মনে রাখা উচিত যে এমন অনেক লোক আছে যাহাদের—যক্ষ্মা-রোগ যদিচ নাম মাত্র আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের শরীরে যক্ষ্মা জীবাণু বর্ত্তমান। ঐ সকল ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন ও একসঙ্গে থাকা উচিত নহে। ইহাদিগকে (Phithisis carrier) থাইসিস-বাহক বলে। ইহাদের শরীরে ঐ জীবাণু প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করে। মোট কথা কাহাকেও কাহারও উচ্ছিষ্ট খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

স্বাস্থ্য, অগ্রহায়ণ ১৩৩০। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

পুষী

(গল্প)

বেলা তখন সাতটা। প্রভাত-সূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণ গাছের পাতার ফাঁক দিয়া আসিয়া জানালার কাঁচের সার্শির উপর পড়িয়া জ্বল-জ্বল করিতেছিল।

ঘরের মধ্যে শয্যায় শুইয়া একটি বালক, আর একটি বালিকা। কাহারও শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে মা আসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে ও মণ্টু, ও পারুল, এত বেলা হলো, তবু তোদের ঘুম ভাঙ্গে না?"

ঘুম তাহাদের অনেকক্ষণই ভাঙ্গিয়াছিল—কিন্তু সকাল বেলায় কঠোর কর্ত্তব্য বই লইয়া পড়িতে বসার মধ্যে যে কতখানি বিভীষিকা লুক্কায়িত রহিয়াছে—ইহার খবর তো মা জানেন না! মার আহ্বানে দুই ভাই-বোনের চোখে চোখে একটি প্রকাণ্ড সঙ্কেত খেলিয়া গেল—কিন্তু তাহারা শয্যা আশ্রয় করিয়াও আর বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না।

কোন রকমে হাত-মুখ ধুইয়া কিছু খাইয়া লইয়া তাহারা বই খুলিয়া বসিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ কতকগুলি বিড়াল-ছানার 'মিউ'-'মিউ' শব্দ তাহাদিগকে সচকিত করিয়া তুলিল। দুইজনেই একসঙ্গে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে

করিয়া তারা বই হাতে লইয়া বসিয়াছিল—সে-মন ঐ 'মিউ'-'মিউ' শব্দের দিকে বাঁধন-হারা ছুটিয়া চলিল। পারুল মণ্টুর দিকে চাহিল—মণ্টু হাসিয়া মৃদু স্বরে কহিল—"আমাদের মেনির বাচ্ছা হয়েছে—না রে পারুল? চ' চুপি চুপি দেখে আসি।" দুই ভাই-বোন একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া বই ফেলিয়া সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া ছুটিল।

রান্নাঘরের পাশে ছাইগাদার উপর মেনিবিড়াল অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছে—আর তাহারই পাশে গোটা চার-পাঁচ সদ্য-প্রসূত বিড়াল-ছানা মিউমিউ করিতেছে। মণ্টু ও পারুল এ দৃশ্যে একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পারুল হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল—"কেমন সুন্দর ছানাগুলি দেখ দাদা।"

দাদা তাহাকে এক ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল—"চুপ! ও ঘরে মা রয়েছে!" বই ফেলিয়া তাহাদের বিড়াল-ছানা দেখিবার জন্য আগমন, ইহা যে মস্ত-বড় অপরাধ সেটা তাহাদের অজানাও ছিল না—কিন্তু এই পরম উপভোগ্য দৃশ্যটি ফেলিয়া রাখিয়া তাহাদের পড়িতে যাইবারো কোন

মন্টু এক-একটি করিয়া বিড়ালছানা গণিয়া দেখিল—পাঁচটি। এইবার তারা এই অমূল্য সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে বসিল। মন্টু এই পাঁচটির মধ্যে একটি মোটসোটা হলুদ ও সাদা রংয়ে মেলানো ছানা লইয়া বলিল—"এইটি আমার"; তারপর আর একটি ধূসর বর্ণের ছানা দেখাইয়া বলিল—"ঐটি তোর—বুঝলি পারুল ?"

পারুল ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"আমি ওটা নিতে গেলুম আর কি ! নিজে ভালটা নিয়ে..."

মন্টু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চোখ ঘুরাইয়া কহিল—"কি, বড় ভাইয়ের সঙ্গে চোপা ! অমন করলে একটাও পাবিনে, বলে দিচ্ছি।"

দুর্ব্বল পারুল তাহার বলিষ্ঠ অগ্রজের সহিত জোরে পারিবে না, জানে, কাজেই যাহা সে পাইতেছে তাহাই পরম লাভ মনে করিয়া ম্লানভাবে কহিল—"বেশ, আমি ঐটেই নেব।"

মন্টু ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল—"আমারটাও তোকে এক-একবার কোলে করতে দেব—বুঝলি...।"

দাদার এই আশ্বাস-বাক্যে পারুল পুনরায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

পাঁচটি ছানার মধ্যে দুইটির সত্ত্বাধিকার সাব্যস্ত হইল—আর তিনটি কাহার ভাগে পড়িবে—এই লইয়া তাহাদের জল্পনা চলিতে লাগিল। উদারভাবে তাহারা সবগুলাই নিজেরা আত্মসাৎ করিতে পারিত—কিন্তু বাড়ীর অন্য-সকলকে বঞ্চিত করিয়া সবটা নিজেরা দখল করিয়া বসিবে এমন প্রবৃত্তি তাহাদের হইল না। তাহারা ঠিক করিল একটি মায়ের, একটি বাবার—আর একটি বাড়ীর বামুন-ঠাকরুণের।

এদিকে তাহাদের হস্তপেষণে বিড়াল-ছানাগুলির অবস্থা নিদারুণ হইয়া উঠিতেছিল—আর তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া সদ্য-প্রসূতা মেনিরও ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল—সে গভীর কাতর ব্যাকুল স্বরে 'মাও' মাও' শব্দে চারিদিক ধ্বনিত করিয়া তুলিল।

মা আসিয়া বলিলেন—"ও কি হচ্ছে মন্টু, হ্যাঁরে ও পারুল..." মন্টু ও পারুলের মুখ ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। কোন রকমে পারুল কহিল—"মেনির ছানা হয়েছে মা।"

মা হাসিয়া বলিলেন—"তাতো দু'চোখ দিয়ে দেখতেই পাচ্ছি। আজ বুঝি আর পড়াশুনো হবে না ?" তিনি আর কিছু বলিলেন না—তাহাদের পড়িতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়িও করিলেন না। হয়ত বহুদিনগত শৈশব-কালের কথা তাঁহারও মনে জাগিয়াছিল—তখন তাঁহার মনের অবস্থাও তাঁহার ঐ শিশু পুত্র-কন্যার চেয়ে কোন খানেই তফাৎ ছিল না তো !

মা আর কিছু বলিলেন না দেখিয়া ছেলেদের সাহস বাড়িয়া গেল।

মন্টু বলিল—"চ' পারুল বাবাকে দেখিয়ে আসি।"

পারুল সম্মত হইল। পারুলের ফ্রকের সম্মুখটা তুলিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে এক একটি করিয়া বেড়ালছানা পুরিয়া দিয়া মন্টু কহিল—"বেশ শক্ত করে ধরে নিয়ে আয়—পড়েনা যেন।"

বাপ বাহিরের ঘরে বসিয়া কতকগুলি দরকারী কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন—হঠাৎ পারুল আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বেড়ালছানাগুলি ঢালিয়া দিয়া বলিল—"দেখ বাবা কি সুন্দর ছানাগুলি।"

বাপ এই আকস্মিক উৎপাতে একটু পিছাইয়া গিয়া কঠোর স্বরে কহিলেন—"সকালে উঠেই এ কি বাঁদরামি হচ্ছে ! এই নোংরা জিনিষগুলো একেবারে বিছানার ওপর ! শীগ্‌গির নিয়ে যা।" মন্টু ও পারুলের সমস্ত উৎসাহ নিবিয়া একেবারে জল হইয়া গেল। এই ছানাগুলিকে দেখিয়া তাহাদের শিশু-হৃদয়ে যে আনন্দ উপচিয়া উঠিতেছিল—তাহারই কিছু ভাগ দিবার জন্য তাহারা বাপের কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু হায় রে ! তাহারা তো জানে না, তাহাদের হৃদয় আর এই সব সাংসারিক জীবগুলির হৃদয়ের মধ্যে পার্থক্য কতখানি ! যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনা শিশুর চোখে অপূর্ব্ব সুষমায় রঞ্জিত হইয়া দেখা দেয়, তাহাই যে কঠোর-হৃদয় পরিণত-বয়স্ক ব্যক্তির কাছে বিভীষিকা বলিয়া

মনে হয়। তাহারা ক্ষুণ্ণ মনে বিড়াল-ছানাগুলিকে কুড়াইয়া লইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল।

এতক্ষণ মেনি ছানাগুলিকে না দেখিয়া অধীর ভাবে 'মাও' 'মাও' করিতেছিল—আবার তাহাদিগকে পাইয়া সে অনেকটা শান্ত হইল। মণ্টু একটু দূরে সরিয়া গিয়া বলিল—"এই পারুল, এদিকে সরে আয়। ওদের দুধ খেতে দে।"

তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া ছানাগুলির দুধ খাওয়া দেখিতে লাগিল।—কিন্তু বেশীক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবেও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। পারুল জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা দাদা, ওদের বাবা কে ?"

মণ্টু চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাইতো, এ কথা তো তাহার এ পর্য্যন্ত মনে পড়ে নাই! সকলেরই বাবা আছে, এই পুশীগুলিরই বা কেন না থাকিবে ? সে তখন বিস্ফারিত নেত্রে চারিদিক তাকাইয়া দেখিতে লাগিল—কিন্তু এই বিড়ালছানাগুলির পিতৃ-স্থান অধিকার করিতে পারে এমন কোনও কিছু সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

পারুল বলিল—"আচ্ছা, ঐ নারকেল গাছটা এদের বাবা।"

মণ্টু এক ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল—"ধ্যেৎ, গাছ বুঝি আবার বাবা হয় ?" ইহায় প্রতিবাদ করিবার মত সামর্থ্য পারুলের ছিল না—তাই সে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মণ্টু এইবার কি মনে করিয়া দৌড়াইয়া গিয়া সিঁড়ির নীচে হইতে লাল-রঙের এক পা-ভাঙ্গা কাঠের ঘোড়াটাকে লইয়া আসিয়া বলিল—"এইটে এদের বাবা—বুঝলি পারুল।"

যাহা হউক, কোন রকমে যে বিড়াল-ছানাগুলির একটি বাবা জুটিয়াছে, এই ভাবিয়া পারুল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে দাদার হাত হইতে কাঠের ঘোড়াটিকে লইয়া এই অচল নির্জ্জীব পদার্থকেই সম্বোধন করিয়া বলিল—"আজ থেকে তুই এদের বাবা হলি—বুঝলি রে ? তোকে এইবার পয়সা দিয়ে ছেলেমেয়েদের পুতুল কিনে দিতে হবে,—সার্কাস দেখাতে হবে—চুপটি করে পড়ে থাক্‌লে আর চলছে না।" তারপর এই কাঠের ঘোড়াটিকে বেড়ালছানাগুলির মধ্যে দাঁড় করাইয়া বলিল—"এই পুশী, পুশী, তোদের বাপ হচ্ছে এই কাঠের ঘোড়া!—খবরদার, এর কথার অবাধ্য হবিনে।" মেনি ইহাদের রকম-সকম দেখিয়া আর সেখানে অপেক্ষা করিতে পারিল না—সে একবার 'মিউ' করিয়া গা ঝাড়িয়া আহারের সন্ধানে রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

সূর্য্যের তাপ ক্রমশঃ প্রখর হইয়া উঠিতেছিল। মণ্টু ও পারুল বিড়ালছানাগুলিকে তাহাদের নির্ব্বাচিত পিতার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া এইবার বাহিরের ঘরে চলিয়া আসিল। দেখিল, মাতুল আসিয়া পিতার সহিত নানা গল্প জুড়িয়া দিয়াছে।—অদূরে মাতুলের ভীষণকায় কুকুর 'জিম্' লোলুপ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছিল।

মণ্টু ও পারুল মাতুলের নিকট গিয়া বলিল—"মামা মামা—আমাদের বেরালের পাঁচটা কি সুন্দর ছানা হয়েছে—দেখবে এসো।"

মাতুল কহিল—"বেরালছানা আবার দেখবো কি ?" তাহারা দুই জনে বিস্মিত হইয়া গেল—এমন দেখিবার মত জিনিষ বাড়ীতে জন্মিয়াছে—কোথায় সকলে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিবে—তা না, ইহাদের ভাবখানা, যেন কিছুই ঘটে নাই! আশ্চর্য্য!

তাহারা দুইজনে বাহিরের রোয়াকে বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিল। তাহাদের গল্পের ধারা আজ এই ক্ষুদ্র বিড়ালছানাগুলিকে আশ্রয় করিয়াই বহিয়া চলিল,—ছানাগুলি যখন বড় হইবে, তখন তাহারা কি করিবে, তাদের কি খাওয়াইবে, তাহাদের সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইবে, এক শয্যায় নিজেদের কাছে লইয়া শোয়াইবে ইত্যাদি। হঠাৎ পারুলের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল; সে কহিল—"আচ্ছা দাদা, ঐ জিম কুকুরটা কি ওদের বাবা হতে পারে না।"

কথাটা মণ্টুর মনে লাগিল—যদিও সে নিজে বুদ্ধি করিয়া কাঠের ঘোড়াটিকে 'বিড়ালছানাগুলির পিতৃপদে

অভিষেক করিয়াছিল—তবু ঐ নির্জীব পদার্থটিকে তাহার অতখানি সম্মান দিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। সে উৎফুল্ল হইয়া কহিল—"ঠিক, পারুল, ঠিক ! ঐ জিম্‌ই ওদের বাবা।" সে 'জিম্' 'জিম্' করিয়া চীৎকার সুরু করিয়া দিল।

অনতিবিলম্বে জিম্ তাহার লম্বা জিব চাটিতে চাটিতে সম্মুখে আসিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল।—হঠাৎ তাহাদের চোখে পড়িল—জিমের মুখের চারিপাশে রক্তের দাগ !

পারুল আতঙ্কে শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—"ওর মুখে রক্তর দাগ কেন দাদা ? বেড়ালছানাগুলোকে খেয়ে ফেলেনি তো ?"

মণ্টু কোনও প্রত্যুত্তর না করিয়া ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল—পারুলও তাহার পিছনে ছুটিল। যথাস্থানে পৌঁছিয়া তাহারা দেখে—একটিও বিড়ালছানা নাই, শুধু সে স্থানে রক্তের দাগ—আর মেনি অদূরে দাঁড়াইয়া আর্ত্তস্বরে ম্যাও ম্যাও করিতেছে।—মণ্টু ও পারুলের বুকে যেন কে পাথর ছুড়িয়া মারিল।—তাহাদের শিশু-হৃদয় মথিত করিয়া কান্নার বেগ ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া মাতুলকে করুণ কণ্ঠে জানাইল—"মামা, মামা, তোমার কুকুর আমাদের সব পুশীকে খেয়ে ফেলেছে।" তাহাদের আর্ত্ত স্বর শুনিয়া পিতা কিংবা মাতুল কাহারো মনে করুণার উদ্রেক হইল না।

পিতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন—আর মাতুল হাস্যোজ্জ্বল মুখে জিমের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "বাহাদুর জিম। সাবাস্ বেটা !"

মণ্টু ও পারুল একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জিমের দিকে চাহিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ীর ভিতর আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল।—মেনি বিড়ালের করুণ আর্ত্ত 'ম্যাও' 'ম্যাও' রব তখনও দিকে দিকে ধ্বনিত হইতেছিল।*

* (রুষ লেখক শেকভের রচিত গল্পের ভাবাবলম্বনে)

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়।

ঘর ও বাহির

জন-গণ-মন

গত ১লা ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় হিন্দু মহাসভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় নাগপুরের হিন্দু-মুসলমানের হাঙ্গামার জন্য দুঃখ প্রকাশ, সেখানকার হিন্দুদের প্রশংসা এবং মুসলমানদের নিন্দা করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে মুসলমানেরা যাহাতে হিন্দুরমণীর প্রতি অত্যাচার, হিন্দু-মন্দির অপবিত্র এবং হিন্দুদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে না পারে তাহার একটা পাকা রকমের ব্যবস্থা করিবার জন্য সভা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লজপত রায়, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও শ্রীযুত যমুনাদাস মেহতা প্রভৃতি বড় বড় নেতাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন।

হিন্দু-মুসলমানের মিলনের একমাত্র উপায় পণ্ডিত মদনমোহন যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা সমীচীন উপায় আর কিছুই নাই। হিন্দুদের গায়ে জোর করিতে হইবে, সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। শুধু জোর করিলে চলিবে না, অত্যাচারের বিরুদ্ধে এমন ভাবে দাঁড়াইতে হইবে যে, অত্যাচারী কোনো কালেই সে কার্য্য করিবার আর কল্পনাও করিতে পারিবে না। ইহা না করিতে পারিলে হিন্দুর মন্দির অপবিত্র হইতেই থাকিবে, হিন্দু রমণীর উপর মুসলমানেরা অত্যাচার করিবেই।

—হিন্দুস্থান

কিছুদিন হইল 'রঙ্গপুর দর্পণে' মুসলমান গুণ্ডা কর্ত্তৃক হিন্দু রমণীর উপর অত্যাচারের একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সহযোগী 'মোহাম্মদী' ঐ সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "হিন্দু হউক আর মুসলমান হউক গুণ্ডা গুণ্ডাই। তাহাদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা অবলা অসহায় মাতৃ-জাতির উপর পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিয়া চলে, তাহাদিগকে মানুষ নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না। আমরা আশা করি, কাটা-দুয়ার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মুসলমান-প্রধানরাই অগ্রণী হইয়া এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণে যত্নবান হইবেন। কারণ উপরোক্ত সংবাদে গুণ্ডারা মুসলমান বলিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে এবং ইহাও শুনা যাইতেছে যে সেখানকার মুসলমানেরা অত্যন্ত প্রবল ও হিন্দুরা নিঃস্ব।

এ অবস্থায় হিন্দুসমাজ কিছু করুন বা না করুন, মুসলমানের উচিত এ সম্বন্ধে সকল তথ্য অবগত হওয়া ও অপরাধীর দণ্ড বিধানের চেষ্টা করা। অন্যথা সমাজের উপর যে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহারাই দায়ী হইবেন।" আমরাও সহযোগীর কথা সমর্থন করিয়া বলিতেছি, গুণ্ডা হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক, যে গুণ্ডা সে সমাজের শত্রু, সমাজের কল্যাণের দিকে চাহিয়া প্রত্যেক সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য যাহাতে তেমন লোক সায়েস্তা হয়, এরূপ ব্যবস্থা করা।

—স্বরাজ

রাজনীতি

চট্টগ্রামের সহযোগী "জ্যোতিঃ"লিখিতেছেন :—"পরস্পর রাষ্ট্র শুনিতে পাইতেছি যে, স্থানীয় জনৈক জমিদার ও মার্চ্চেন্ট নাকি গভর্ণমেন্টের নিকট কর্ণফুলী নদীতে মাছ ধরিবার লাইসেন্স্ মঞ্জুর করিবার জন্য দরবার করিতেছেন। ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ঘটক নাকি ইহার অনুকূলে রিপোর্ট দিয়াছেন এবং রেভিনিউ বোর্ড হইতে সহসাই ইহা মঞ্জুর হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন।" সহযোগীর সংগৃহীত সংবাদটী সত্য হইলে ইহার পরিণাম ভাবিয়া আমরা আতঙ্কিত হইতেছি। চট্টগ্রামে যদি মাছের উপর এই তাবের ট্যাক্স্ বসানোর ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে ক্রমে তাহা সমগ্র বাঙ্গলায় প্রসার লাভ করিবে। তখন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা কি ভীষণ হইবে, চিন্তার বিষয়। বাঙ্গালীর বস্ত্র নাই, অন্ন নাই। অনেক স্থানে দরিদ্র ব্যক্তিরা অন্নাভাবে শুধু নদীর মাছের ঝোল খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। তাহার উপরে যদি লাইসেন্স্ বসানোর ব্যবস্থা চট্টগ্রামে এবং তারপর সমস্ত বাঙ্গলায় প্রচলিত হয় তাহা হইলে মাছ ও নুন মিশ্রিত জলটুকু আর দরিদ্রের উদরস্থ হইবে না। হয়ত তখন বাঙ্গালীর চক্ষু দিয়া আর দুঃখের অশ্রুও নির্গত হইবে না ; হয় ত তাহাকে নির্ব্বাক, অশ্রুহীন দৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিয়া মরণের কোলে শান্তিলাভ করিতে হইবে! পরনির্ভরতার কি মর্ম্মভেদী পরিণাম এ!

—মোহাম্মদী

মাদ্রাজে এগুরুজ ভোজ উপলক্ষে বক্তৃতা-কালে মাদ্রাজের লাট লর্ড উইলিংডন কয়েকটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন, কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, এ দেশে যে সব ইংরেজ আসেন, তাঁহারা যদি এদেশবাসীদের নিকট হইতে তফাৎ তফাৎ থাকিবার ভাব মন হইতে দূর করিতে পারেন, এবং নিজেরা ভারতবাসীর অপেক্ষা বড়, এমন মনোবৃত্তি পরিহার করিয়া এদেশবাসীর সহিত আন্তরিকতার সহিত মিলিতে মিশিতে পারেন, তাহা হইলে এদেশে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গের ভিতরকার সমস্যা দূর হইতে পারে। এদেশে যে সব ইংরেজ কর্ম্মচারী-স্বরূপে আগমন করেন, তাঁহারা যেন এই কথা স্মরণ রাখেন যে, কেবল জীবিকা অর্জ্জনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিও তাঁহাদের কিছু কর্ত্তব্য রহিয়াছে ; সেই কর্ত্তব্য-বোধে প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা যদি এদেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই এদেশবাসীদের সহিত তাঁহাদের সদ্ভাব এবং সৌহার্দ্দ্যের বন্ধন দৃঢ়তর হইতে পারে। পরস্পরের মধ্যে এইরূপ সদ্ভাব সৌহার্দ্দ্য এবং সাহায্যের প্রভাবে, কেবল ভারতবাসীরই যে উন্নতি এবং সমৃদ্ধি হইবে, তাহা নহে, উহাতে সাম্রাজ্যেরও কল্যাণ সাধিত হইবে।

বর্ণ-বৈষম্য বড় করিয়া তুলিলে সঙ্কীর্ণতারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহা সাম্রাজ্যের স্বার্থের পক্ষে অনিষ্টকর। আবার ইংরেজ এদেশের কিছুই করেন নাই, এ কথা বলিলেও ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়, সত্যকে লঙ্ঘন করা হয়, তেমন ধারণাও এ দেশের স্বার্থের পক্ষে অনিষ্টকর।

আজ ভারতে যে নূতন জাতীয়তা দেখা যাইতেছে, ইহার মূলে কি ইংরেজের সাধনা নাই, চেষ্টা নাই, এ দেশের অতীত ইতিহাসের পরিচয় যাঁহার কিছু জানা আছে তিনি তাহা অস্বীকার করিতে পারেন কি? ভারতের সে জাতীয়তা আজও শক্ত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেজন্য ইংরেজ এবং ভারতবাসীর উভয়ের সাহচর্য্যের আবশ্যকতা একান্তভাবেই আছে।

—স্বরাজ

ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীদের অল্প পারিশ্রমিক বাড়াইবার কথা উঠিলেই কর্ত্তারা কানে হাত দিয়া বলেন, "ওরে, সর্ব্বনাশ! গত দুই বৎসরে ডাক-বিভাগে আমাদের যে দেনা হইয়াছে!" ডাক বিভাগের কর্ম্মচারী সমিতির গত অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুত কামিনীকুমার চন্দ মহাশয় কিন্তু দেখাইয়াছেন যে, ১৯১০ হইতে ১৯২০, এই দশ বৎসরের ডাক-বিভাগের মোট লাভ হইয়াছিল—প্রায় ১ কোটী ৩ লক্ষ টাকা ; অর্থাৎ লোকসান বাদ দিলেও গবর্ণমেন্টের হাতে এখনও ২ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা লাভের কড়ি আছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট লাভের সময়ে ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীদের কথা মনে করিয়াছিলেন কি? তাঁহারা তো ইচ্ছা করিলে লাভের কিছু অংশ হইতে দরিদ্র কর্ম্মচারীদের মাহিনা বাড়াইয়া দিতে এখনও পারেন।

তারপর চন্দ মহাশয় আরও দেখাইয়াছেন, ডাক বিভাগের তরফ হইতে অনেক টাকা লইয়া গবর্ণমেন্ট সাধারণ রাজকোষে ভর্ত্তি করিয়াছেন। যথা, কাষ্টমস্ মাশুল, ডাকবিভাগ হইতে কুইনাইন বিক্রয়ের লাভ, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ও পোষ্টাল লাইফ ইনসিওরেন্সের লাভ, পোষ্ট আফিস ক্যাস্ সার্টিফিকেটের লাভ, ডাকবিভাগের সহিত সংযুক্ত টেলিগ্রাফ বিভাগের লাভ ইত্যাদি। ডাক-বিভাগ কার্য্যতঃ বিনা-পারিশ্রমিকে এই সব কাজ করিয়া দিয়াছে। গবর্ণমেন্ট এর জন্য ডাক-বিভাগের কর্ম্মচারীদের প্রতি কিছুই অনুগ্রহ দেখান নাই। অতএব লোকসানের অজুহাতে গরীব ডাকঘরের কর্ম্মচারীদের বেতন না বাড়াইবার অজুহাত নিতান্ত বিসদৃশ নয় কি?

সভাপতি চন্দ মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে জানা যায় যে, সমগ্র ভারতবর্ষে ৮৫২৭টী ডাকঘর আছে। অর্থাৎ হিসাব-মত প্রায় ৮৩ বর্গ মাইলে বা ১০ মাইল লম্বা ৮।০ মাইল চওড়া স্থানের জন্য একটী করিয়া ডাকঘর আছে। চন্দ মহাশয় বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের মত দেশের পক্ষে ইহা হাস্যকর ব্যাপার। সম্প্রতি ব্যয়-সংক্ষেপের জন্য অনেকগুলি গ্রাম্য ডাকঘর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই দিক্ দিয়াও যে ডাক বিভাগের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

স্বাস্থ্য

ক্ষয়রোগের নূতন ঔষধঃ—ডাঃ নোলান সম্প্রতি ক্ষয়রোগের এক নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি রোগীকে অঙ্গারজান ও কেল্‌সিয়াম মিশ্রিত বায়ু-সেবনে সাধারণতঃ আরাম করিয়া থাকেন। গ্যাস দ্বারা রোগ আরোগ্য করার প্রথা ইউরোপে ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

ছেলেদের তড়কায় কোষ্ঠবদ্ধ ও শ্লেষ্মা থাক্‌লে মুক্তাঝুরির পাতার রস ৪।৫ ফোঁটা খাওয়াবে। তাতে বমি বা দাস্ত হয়ে তড়কা কমে যাবে। ঐ পাতা বেটে আবার নাভির চারপাশে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

—হিন্দুরঞ্জিকা

শুধু খাবার জল নয়। কৃষি কাজ রয়েছে—গৃহদাহ প্রভৃতি অন্যান্য আপদ বিপদ রয়েছে, তা হতেই বা রক্ষা পাই কিসে? প্রশ্ন করে আর জবাব মিলবে না। জবাব দেবে কে? যারা আজ মরতে বসেছে তারই একটু গা নাড়া দিয়ে উপায় খুঁজে নিক্। গাঁয়ের শত ভেদ, সহস্র বিবাদ থাক্‌লেও যদি এই প্রাণ বাঁচানো ব্যাপারে সবাই এক-যোগে একজোট হয় তবে একটা কিছু প্রতিকার হতে পারে। আমরা জেলা বোর্ডের বা স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের মেহেরবাণির দোহাই দিচ্ছিনে—প্রজার দেয় অর্থ নিয়ে তারা যা খুশী করুক গিয়ে। তাদের না দিয়ে উপায় নেই বলেই দেয়। বারোয়ারী পূজা পার্ব্বণে এদেশে প্রায় অনেক ব্যয়ই হয়। তাতে খরচও যে খুব কম হয় তা নয়। পূজার আড়ম্বর কমিয়ে আর তার সঙ্গে প্রতি ঘরে মুষ্টি-ভিক্ষার হাঁড়ি দিয়ে তাতে যে আয় হবে তা দিয়ে প্রতি গাঁয়ে বছরে অন্ততঃ একটা করে কুয়ো বেশ প্রতিষ্ঠা করা চলে। আমরা জানি অনেক গাঁয়ে এমন মুঠির চা'ল বিক্রী করা টাকা মোড়লের কাছে জমা থাকে, পরে তার খোঁজ কেউ নেয় না; নিলেও দেখা যায় টাকার পাখা হয়েছিল।　—হিন্দুরঞ্জিকা

মনুষ্যত্ব

সুশীলা ভড় নাম্নী একটী উচ্চমনা মহিলা কাশিমবাজার মহারাজের পলিটেক্‌নিক ইন্‌ষ্টিটিউসন কলেজে ১৫ শত টাকা দান করিয়াছেন। তিনি আরও দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতি-কল্পে মহিলার এই দান ধনীদিগের মধ্যে দানের প্রবৃত্তি উন্মেষিত করুক, এই আমরা চাই।　—শিক্ষাসমাচার

যুক্ত প্রদেশস্থ ছাতারীর নবাব বাহাদুর "স্যার উইলিয়ম মরিস বাণিজ্য বৃত্তি" নামে একটী বৃত্তি প্রতিষ্ঠার্থ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে বাণিজ্য বিদ্যা শিক্ষার জন্য মুসলমান ছাত্রগণ বৃত্তি লাভ করিবে। শিল্প বাণিজ্য শিক্ষায় যাঁহারা সাহায্য করেন তাঁহারা ভারতের দৈন্য দূরীকরণের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ স্থান অধিকার করিবেন, সন্দেহ নাই।

—শিক্ষাসমাচার

কালীঘাট হিন্দুদের একটি পীঠস্থান বলিয়া এই স্থানে যাত্রীর কখনও অভাব হয় না। কালীঘাটে এত যাত্রীর ভিড়, কিন্তু কালীঘাটে অন্যান্য তীর্থস্থানের মত যাত্রীদের থাকিবার সুবিধা ততটা নাই। এই অভাব কালীঘাটে আছে বুঝিয়া মাড়োয়ারী ক্রোরপতি সার হরিরাম গোয়েন্‌কা স্বেচ্ছায় সরকারের হাতে ৫০ হাজার টাকা একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন। সার হরিরাম গোয়েনকার বদান্যতা প্রশংসার যোগ্য। তিনি কালীঘাটের যাত্রীদের যে মহৎ উপকার করিলেন, তাহার জন্য তাঁহার কাছে হিন্দুমাত্রেই কৃতজ্ঞ।

—বন্দেমাতরম

শিক্ষা

বিহারে যতগুলি সরকারী মেডিক্যাল স্কুল আছে, সেগুলির সঙ্গে যাহাতে কবিরাজি ও হকিমি পড়াইবার ব্যবস্থা হয় তাহার চেষ্টা চলিতেছে। কবিরাজী এদেশের হিন্দুর গৌরবের একটা বড় জিনিস, সরকারের উপেক্ষায় বহুদিন হইতে অনাদরে থাকিয়া লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছিল, সরকার যদি সেদিকে দৃষ্টি দেন, দেশের ও দশের উপকার অবশ্যম্ভাবী।

—শিশির

গত তিন বৎসর আমাদের দেশীয় একজন মন্ত্রীর হাতেই শিক্ষা-বিভাগের ভার ছিল। কিন্তু দেশে জন-শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি কি করিতেছেন? বাঙ্গলা সরকার হইতে যে শিক্ষা-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই লেখা আছে যে, এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে খুব কম চেষ্টাই হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ছাত্রের সংখ্যা শতকরা ১৭০৩ ভাগ হইতে ১৭ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে, যে চেষ্টা হইয়াছে তাহা

spasmodic, unsystematic and haphazard অর্থাৎ অনিয়মিত ও খেয়াল-মাফিক! শিক্ষা-মন্ত্রীর চমৎকার প্রশংসা বটে!

শিক্ষা-বিবরণীতে একটী ব্যাপার দেখা যাইতেছে। গত পাঁচ বৎসরে নিছক সাহিত্য ও আইন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমিয়াছে; কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। নানারূপ শিল্প ও কলাবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ইহাতে বোঝা যায়, শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ব্যবসা ও বৃত্তি শিক্ষার দিকে বাঙ্গালী ছাত্রের অরুচি নহে,—কেবল সুযোগের অভাব। এই অভাব পূরণ করা আজিকার শিক্ষা সমস্যা।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

বেলেঘাটা পাঠাগার।—মাণিকতলা মিউনিসিপালিটী বেলেঘাটা পাঠাগারে ৬০০ টাকা দান করিয়াছেন। পাঠাগার দ্বারা দেশে শিক্ষা-স্রোত বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং মিউনিসিপালিটীর এইরূপ দান শিক্ষা-বিস্তারের সহায়ক সন্দেহ নাই।

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে দান।—মাণিকতলা মিউনিসিপালিটী কলিকাতার জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে ১৯২৩-১৯২৪ সনের জন্য ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। এ দান প্রশংসনীয়।

—শিক্ষাসমাচার।

বঙ্গীয় ব্যয়সঙ্কোচ সমিতি তাঁহাদের রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রেসিডেন্সী কলেজে ব্যয় সঙ্কোচ করা সম্ভব। কাজের অনুপাতে অধ্যাপকের সংখ্যা উক্ত কলেজে অনেক বেশী। প্রেসিডেন্সী কলেজে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সার্ভিসের ১৪টি পদ রহিয়াছে; কিন্তু ব্যয়সঙ্কোচ সমিতির মতে মাত্র ৬জন ঐ পদে থাকিলেই চলিতে পারিবে; অবশিষ্ট কয়েকটি পদে প্রভিন্সিয়াল অথবা সাব-অরডিনেট এডুকেশন্যাল সার্ভিস্‌ওয়ালাদিগকে লওয়া যাইতে পারে। উক্ত সমিতির মতে ঐ কলেজের ছাত্রের বেতনও অত্যন্ত অল্প। ইহাও শতকরা ৫০৲ টাকা হিসাবে বেশী করা যাইতে পারে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

বিবিধ

বিজ্ঞান-বলে আজকাল যাদুমন্ত্রের চেয়েও আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভব হইয়া উঠিতেছে। লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডাঃ অগষ্টাস সম্প্রতি একটী অদ্ভুত যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহার দ্বারা কেহ মিথ্যা কথা বলিতেছে কি না তাহা অনায়াসেই ধরিতে পারা যায়। অপরাধীকে ধরিবার সময়ে এই যন্ত্রটীর বৈদ্যুতিক রেকর্ডের উপরে তাহার স্নায়ু-জালের স্পষ্ট ও চাক্ষুষ ছাপ পড়িয়া যায়। ডাঃ ওয়ালার আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মানুষের গাত্র-ত্বক বৈদ্যুতিক প্রভাবকে যে সাড়া দেয়, মানসিক ভাবের বিভিন্নতা অনুসারে তাহার তারতম্য ঘটে। সেই আবিষ্কারের ফলেই এই যন্ত্রটী উদ্ভাবিত হইয়াছে! মনে করুন, কোন চোর মিথ্যা বলিয়া তাহার দোষ গোপন করিতেছে। আপনার বাড়ীতে হয়তো চুরি হইয়া গিয়াছে, চোর ধরা পড়িয়াছে অথচ সে বলিতেছে যে আপনার বাড়ীতে জীবনে সে কখনও পদার্পণ করে নাই। তখন ডাঃ ওয়ালারের যন্ত্রের তার তাহার হাতে জড়াইয়া দেওয়া হইল, তারপর তাহাকে খানকতক বাজে ছবির সঙ্গে যে বাড়ীতে চুরি হইয়াছে সেইখানকার ছবি দেখানো হইল। তাহা দেখিয়া চোরের মনে কোনই বিশেষভাবের উদয় হইল না কিন্তু ঘটনাস্থলের ছবিখানা দেখিবামাত্র তাহার মনের ভিতরটা হঠাৎ ছাঁৎ করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের মধ্যে একটী আলোক জানাইয়া দিল যে স্থানে সে জীবনে যায় নাই বলিতেছে সে স্থানটা তাহার পরিচিত। মনের ভিতরের ভাব লুকানো কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর নহে।

—যুগবার্ত্তা

বোম্বায়ের আর্ট সোসাইটীর প্রদর্শনী গত ২৭শে নবেম্বর বোম্বায়ের টাউন-হলে খুলিয়াছে। এই উপলক্ষে বোম্বায়ের গবর্ণর স্যর জর্জ্জ লয়েড বলেন, "স্বরাজের জন্য যাহারা বড় উৎসাহী, এমন অনেক ধনী ব্যক্তিকে আমি বহুবার বলিয়াছি, আচ্ছা, আপনারা স্বদেশী শিল্পকে সাহায্য করেন না কেন? ইঁহাদের বাড়ীতে গিয়া আমি দেখিয়াছি, ইহারা স্বদেশী শিল্পকলা অপেক্ষা প্যারিস হইতে আমদানী করা বিদেশী মালেই নিজেদের বাড়ী-ঘর সাজাইতে ভালবাসেন। বাঙলার অনেক স্বদেশী ভক্তের কথাও ইহাই। বাড়ীতে ইঁহাদের বিলাতী কাপড় না হইলে চলে না, সভায় বক্তৃতা করিবার সময় উপরে একটু খদ্দরের আবরণ দিয়া আসেন।

—হিন্দুস্থান

ব্যয়-সঙ্কোচ, ব্যয়-সঙ্কোচ কেবল গবমের্ণ্টের সমালোচনা করিবার বেলাতেই ঐ সব বোলচাল আমরা চালাই; কিন্তু পরের পয়সা নিজেরা যদি হাতে পাই, তবে তাহা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে আমরা কসুর করি না। কলিকাতা কর্পোরেশনে ৪০ খানা চেয়ার এবং ৪০ খানা ডেস্কের জন্য ৯৮০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এক একখানা চেয়ার ও ছোট একটু ডেস্কের জন্য দুইশ টাকা করিয়া খরচ! চামড়ার গদি আঁটা এমন চেয়ার নহিলে কি কাজ চলে না? চলে বই কি। সকলেরই চলে। কর্পোরেশনের যাঁহারা মেম্বর তাঁহাদের কাহার বাড়ী অত দামের কয়খানা চেয়ার আছে! আমরা জানি না, তবে এ কথা ঠিক যে, অনেকের বাড়ীতেই নাই! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, কথায় আছে পরের ধনে পোদ্দারী!

—হিন্দুস্থান



... অঞ্চল উড়ে চঞ্চল !

ভারতী

৪৭শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৩০ { দশম সংখ্যা

প্রভুর দান

প্রভুর দান রে, প্রভুর দান !
আমার প্রভুর দান !
গরল তাই যে অমৃত রসে
তিতিল মনঃ প্রাণ !
মগন হইয়ে পেলেম তাহে
আনন্দের অতল,
বিষের জ্বালা জুড়িয়ে হল
সুধাস্নিগ্ধ শীতল !

প্রেমের পরশমণির ছোঁয়ায়
উলোট-পালট ধরা !
কাঁটার মাঝে ফুলের বিকাশ,
ফুলের সুবাস ভরা !
অন্ধ নয়নে আলোক এল,
দৃষ্টি গেল খুলে !
প্রভুর দানে জীবন আমার
ভরিল কূলে কূলে !

শ্রীসরলা দেবী ।

স্বরলিপি

পা
II না সা না। দা পা দপা। মা না মা। জরা সা — া II রমা
প্র ভু র দা ন রে প্র ভু র দা ‌ ন আ

মা মা। পা না দা। পমা পা — া। -া -া -া। মা মা মা। মা — া
মা র প্র ভু র দা ‌ ‌ ‌ ‌ ন গ র ল তা ই

মা। পা না না। র্সা র্সা র্সা II না না না। র্সা র্সা র্রা। নর্সা র্রর্সা না
যে অ মৃ ত ‌ র সে তি তি ল ম ন ‌ প্রা ‌ ‌

দা পমা পা। পা র্রা র্রা। র্রা র্রা র্রা। র্রা র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্রা র্সা — া।
‌ ‌ ণ ম গ ন হ ই যে পে লে ম ত হে ‌

না র্সা — া। নর্সা র্রা র্সা। দা — া পমা। পা -া -া II পা র্জ্ঞা র্রা। র্সা
আ ন ‌ ন্দে র অ ত ‌ ‌ ‌ ‌ ল বি যে র জ্বা

র্রা র্সা া। না র্সা না। দা পা মা II সা সা -া। রা মা মা। মা পা -া
‌ লা জু ড়ি য়ে ‌ হ ল সু ধা ‌ স্নি ‌ গ্ধ শী

-া -া -া II সা সা মা। পা দা র্সা। -া -া -া। -া -া -া II
‌ ‌ ‌ ত ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ল

ন্‌ ন্‌ ন। ন্‌ ন্‌া -া। স। সরা জা। রা জ্ঞরা সা II সা গা -া। সা গা -া।
প্রে মে র প র শ ম ণি ‌ ছোঁ য়া য় উ ল ট পা ল ট

গমা পমা গা। গমা -া -রা II রজ্ঞা জ্ঞা -া। রা জ্ঞা -া। রা মজ্ঞা া।
ধ ‌ ‌ রা ‌ কাঁ টা র মা ঝে ‌ ফু লে র

রা সা না II ন্‌া ন্‌া -া। সা রা জ্ঞা। রজ্ঞা মজ্ঞা রসরা। সা -া -া II
বি কা শ ফু লে র সু বা স ধ ‌ ‌ রা ‌ ‌

সা র্রা র্রা। র্রা র্রা র্রা। র্রা র্জ্ঞা র্রা। র্সা র্সা র্সা II না -া র্সা।
অ ‌ ন্ধ ন য় নে আ ‌ লো ক এ ল দৃ ‌ ষ্টি

না র্সর্রা র্সা। না দপা মা। পা -া -া II পা র্জ্ঞা র্রা। র্সা র্রা র্সা। না
গে ল খু লে ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ প্র ভু র দা ‌ নে জী

র্সা না। দপা মা মা। সা সা সা। রা মা -মা। মপা -া -া।
ব ন আ ‌ মার ভ রি ল কূ লে কূ লে ‌ ‌

-া -া -া। সা সা মা। পা দা র্সা। -া -া -া। -া -া -া II
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

বাব্‌লা

১৩

বেলা চারটার সময় স্কুলের ছুটী হইলে ছেলের দল হল্লা করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। শীতকাল—নানা রঙের পোষাকে-র‍্যাপারে রঙের ফুলঝুরি ফুটাইয়া হাসি আর কলরবে আশ-পাশের পথ মাতাইয়া তারা পথে চলিয়াছিল। দলে ছোট-বড় সব রকমের ছেলেই ছিল।

আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের উপর একটা পাণের দোকান। তার কাছাকাছি আসিয়া ছেলেরা দেখে, দোকানের সামনে ছোট্ট একটু ভিড়—আর সেখানে চড়া গলায় বেশ একটা বকাবকি চলিয়াছে। ছেলেরা কৌতূহলী হইয়া সেইদিকে ছুটিল।

বকাবকি চলিয়াছিল পাণওয়ালার সঙ্গে ষোল-সতেরো বৎসরের এক মুসলমান ছোকরার। মুসলমান ছোকরার পরণে ছিল ডোরা-কাটা একটা শিল্কের লুঙ্গি, গায়ে গরম গলফ্‌ কোট, পায়ে পাম্প-শু—তার সঙ্গে দলে আরো চার-পাঁচজন ছোকরা ছিল; তারা তারই সমবয়সী।

পাণওয়ালা গরম সুরে বলিল,—আমার প্রায় তেরো টাকা পাওনা হয়েছে—তা না দিলে আমি বিড়ি-সিগারেট তোমায় ধারে দেবো না আর! হও না তুমি হেদায়েতের ছেলে—আমি গরিব মানুষ, আমার বিশ হাজার পুঁজিও নেই, আর কোকেনও বেচি না!

দলের মধ্যে ছোকরাটির প্রতিপত্তি ছিল খুবই—তার নাম পণ্টু। বিখ্যাত কোকেনওয়ালা হেদায়েতের একমাত্র পুত্র সে। আতর মাখিয়া বাবু সাজিয়া সে পথে-ঘাটে দল লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। গায়ে জোর যেমন আছে, সে-জোর ফলাইতে তেমনি সে প্রস্তুতও থাকে সর্ব্বক্ষণ।

সেদিন পথে চলিবার সময় সিগারেটের দরকার হওয়ায় প্রথা-মত ইদু পাণওয়ালার দোকান হইতে পণ্টু চার-পাঁচ বাক্স সিগারেট তুলিয়া লইয়াছিল। ইদু পাণওয়ালা হাত হইতে সেগুলা ছিনাইয়া লয়। এভাবে সহসা অপমানিত হওয়ায় পণ্টু চোখ রাঙাইয়া গর্জ্জন করিয়া ওঠে,—বেয়াদব! ইদু পাণওয়ালাও উত্তরে দুই কথা বেশ শুনাইয়া দেয়। তারপর তাহা লইয়াই বকাবকি বাড়িয়া ওঠে—এবং পণ্টু পাণওয়ালাকে একটা বিশ্রী গালি দিয়া তার গালে চড় বসাইতেই ইদু পাণওয়ালা দোকানের তক্তার উপর হইতে পথে লাফাইয়া পড়িয়া পণ্টুর হাত চাপিয়া ধরিয়াছে!

সহরের পথে পথিকের দল প্রচণ্ড কৌতূহল লইয়া পথ চলে। তাদের দেখিয়া মনে হয় না, যে তারা কোন কাজে ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছে! চোখে অলস দৃষ্টি, গতিও কেমন লক্ষ্যহীন—যেন পথে কোথায় কি ঘটিবে, তাহারি সন্ধানে বাহির হইয়াছে! এই ব্যাপারটায় মজা পাইয়া দুই একজন করিয়া পথিক এমনি সেখানে আসিয়া জমিয়া গেল—এবং ইহাদের সম্মুখে মান রাখিতে পণ্টুও তখন খুব তেজে ফুলিয়া ঝগড়ায় মাতিল।

ছেলের দল যখন সেখানে আসিয়া পৌঁছিল, তখন কথা ছাড়িয়া উভয়পক্ষে হাতাহাতি সুরু হইয়াছে। পাণওয়ালা একা—আর পণ্টুরা দলে ভারী। আশ-পাশের দোকানদারেরা পাণওয়ালার পক্ষ লইতে সাহস করিল না—কারণ হেদায়েৎ লোকটার টাকা-পয়সার জোর আছে যেমন, গায়ের জোরও তেমনি—তাছাড়া সে আদালত বা পুলিশ কাহাকেও বড় গ্রাহ্য করে না! কাজেই মাঝে হইতে ইহাদের ঝগড়ায় মাথা গলাইয়া বিপদ ডাকিয়া আনিতে তাদের ভরসায় কুলাইল না। গরীব ছাপোষা লোক—এ সব দুর্দ্দান্ত লোককে ক্ষ্যাপাইয়া শেষে কি পস্তাইয়া মরিবে! তার চেয়ে দূর হইতে মজা দেখাই ভালো—ইহা ভাবিয়া তারা একটু দূরে সরিয়া গিয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। পাণওয়ালাকে লাথি মারিয়া মাটীতে ফেলিয়া যখন তাকে একেবারে নির্জ্জীব করিয়া তুলিয়াছে, তখন পণ্টু তার দোকানের ক্ষতি করিবার দিকে ঝোঁক দিল। পটাপট্ সোডা-লিমনেডের বোতলগুলা টানিয়া লইয়া সে যেন বল ছোড়া সুরু করিয়া দিল। পথের লোক ভয়ে যে যেদিকে পারে পলাইতে লাগিল। স্কুল-ফেরৎ ছেলেরা অতটা জানের মায়া রাখে না,

—তারা এমন কাণ্ড পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই, কাজেই সামনের ভিড় সরিয়া গেলে ফাঁক পাইয়া তারা নির্ভয়ে আগাইয়া আসিয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

এমনি সময়ে একটা লিমনেডের বোতল আসিয়া লালবেহারীর মাথায় লাগিল। তার মাথা কাটিয়া গেল। সে বাবা-গো বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া সেইখানে ঘুরিয়া পড়িল। অমনি ছেলের দলে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল—কতক দিক-বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া ছুট দিল—দুই-তিনজন মাত্র লালবেহারীর দিকে ঘেঁষিয়া আসিল। রক্ত দেখিয়া ভয়ে তাদের বুক কাঁপিয়া উঠিল।

এই দুই-তিনজনের মধ্যে ছিল বাবলা। বাবলার বয়স এখন ছয় বৎসর—সেও লালবেহারীর সঙ্গে প্রত্যহ স্কুলে যায়।

লালবেহারীকে অমনভাবে আঘাত পাইয়া পড়িতে দেখিয়া বাব্‌লা কাঁদিয়া ফেলিল। সে লালবেহারীর পাশে ঝুঁকিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে ডাকিল,—দাদা, দাদাগো···

দাদা সাড়া দিল না। পথে লোকজন চলিয়াছিল—কেহই এদিকে অগ্রসর হইল না। একটা ছেলে মাথা ফাটিয়া রক্ত-গঙ্গা হইয়া মরিতেছে—ইহাতে মজা থাকিলেও পাছে পুলিশ আসিয়া সাক্ষী দিবার জন্য আদালত-অবধি দৌড় করায়, এই ভয়ে লোকগুলা এদিকটায় একরূপ না চাহিয়াই চট্‌পট্‌ সরিয়া পড়িতে লাগিল। শেষে দরদ জাগিল একটা মুটের প্রাণে। সে ঝাঁকা লইয়া পথে চলিয়াছিল। এ কাণ্ড দেখিয়া ঝাঁকা নামাইয়া সে লালবেহারীর কাছে আসিল ও তাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া নিজের মাথা হইতে ময়লা পাগড়ী খুলিয়া রাস্তার কলের জলে বেশ করিয়া ভিজাইয়া সেই জল নিংড়াইয়া লালবেহারীর মুখে-চোখে দিতে লাগিল। পল্টুর দল রক্তগঙ্গা দেখিয়া ওদিকে নিমেষে ততক্ষণে সে স্থান হইতে চম্পট দিয়াছে।

তারা চলিয়া যাইবার পর পাণওয়ালা গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তার মুখ-চোখ কাটিয়া গিয়াছে। সারা গায়ে রক্ত ঝরিতেছে! তার যা মূর্ত্তি হইয়াছে, তাকে সহসা দেখিলে চমকিয়া উঠিতে হয়। সে উঠিয়া দাঁড়াইতে

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে নানা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া পাণওয়ালাকে পরামর্শ দিল,—থানায় যা এখনি—নালিশ কর্‌গে। মেরেও সুখ হলো না, আবার এত টাকার মাল নষ্ট করলে! বদমায়েস, গুণ্ডা, যেন মগের মুল্লুক পেয়েছে, বটে!

পাণওয়ালা বলিল,—তাই যাব। তোমাদের সাক্ষী দিতে হবে কিন্তু—সব তো চোখে দেখেচ!

পাশের ঘরের মুদি বলিল,—ঐটি মাপ করতে হবে। ঐ বদমায়েস গুণ্ডার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়া—সেটি পারবো না। শেষে আমায় দোকান লুঠ হয়ে যাক একদিন রাত্রে!

সকলের মুখে তখন ঐ একই কথা। পাণওয়ালা মরিয়া হইয়া বলিল,—বেশ, এই কাটা ছড়া দাগ, আর এই ভাঙ্গা বোতল পথে ছড়ানো—দেখি, সাজা হয় কি না!

পাণওয়ালা দোকান বন্ধ করিয়া থানায় যাইতে উদ্যত হইয়া দেখে, একটু দূরে মুটেটা লালবেহারীকে কোনমতে খাড়া করিয়া তুলিয়াছে। তার পাগড়ী ছিঁড়িয়া লালবেহারীর মাথায় তখন সে একটা পটি বাঁধিয়া দিয়াছে।

পাণওয়ালা তখন মুটের কাছে গিয়া বলিল,—এর মাথায় বোতল লেগেছে বুঝি?

বাব্‌লা কথা কহিল। সে বলিল,—হাঁ।

পাণওয়ালা বলিল,—এসো আমার সঙ্গে থানায়।

মুটে ও পাণওয়ালা উভয়ে মিলিয়া লালবেহারীকে এক রকম বহন করিয়াই তখন থানার দিকে চলিল। বাব্‌লাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পাণওয়ালা বলিল,—আমায় মেরেছে, দেখেচো তো?

বাবলা বলিল,—দেখেচি।

পাণওয়ালা বলিল,—বোতল ছুড়েচে—তাও দেখেচ?

বাবলা বলিল,—সেই বোতলই তো আমার দাদার মাথায় এসে লেগেছে। দাদার মাথা কেটে একেবারে রক্তময় রক্ত!

পাণওয়ালা বলিল,—বেশ, থানায় চলো ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুর কাছে। দেখাচ্ছি মজা!···দুটো পয়সা হয়েছে বলে গরম ত্যাখো না! এবার ভাঙ্গচি গরম!

তাদের লইয়া তদারকে বাহির হইল। ইন্‌স্‌পেক্টর আসিয়া পাশের দোকানের সম্মুখে ফুটপাথে একটা চেয়ারে বসিয়া গেলেন। ইহুর লালবেহারীর ও বাব্‌লার জবানবন্দী লিখিয়া লইয়া তিনি জমাদারকে আদেশ করিলেন, সাক্ষী ডাকো!

জমাদার তখন এর ঘর ঠ্যাঙাইয়া ওর দ্বার ঠ্যাঙাইয়া একদল লোক জড়ো করিয়া আনিল। তারা আসিতে ইহু পাশের দোকানের সেই মুদিকে দেখাইয়া বলিল,—এই, ইনি সব দেখেছেন।

সকলে যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে, এমনি ভাব দেখাইয়া দাঁড়াইল। মুদি বলিল, সে কিছুই দেখে নাই! বাহিরে একটা গোলমাল হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে তখন দোকানে খরিদদার লইয়া ব্যস্ত—সে গোলমালে মনোযোগ অর্পণ করিবার তার অবসরও ছিল না। শেষে ইহু আসিয়া যখন বলে সে বিষম মার খাইয়াছে, তখন বাহিরে আসিয়া দেখে, কতকগুলা বোতল ছড়ানো আছে এবং ঐ ছেলেটির মাথায় পটী বাঁধা। কে যে পথে বোতল ছড়াইল বা ইহুর গায়ে চোট্ লাগিল কোথা হইতে, মুদি তা জানেও না।

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, বোতল ছোড়া সে দেখিয়াছে কি না এবং না দেখিলেও ইহু তাকে সে বিষয়ে কোন কথা বলিয়াছিল কি না!

তাহার উত্তরে মুদি বলিল, ইহু শুধু বলিয়াছিল, সে থানায় যাইতেছে। তা ছাড়া বোতল ছোড়া সম্বন্ধে আর কোন কথা সে বলিয়া যায় নাই।

ইহু এই এত বড় মিথ্যা কথাটা মুদিকে বলিতে শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। পরক্ষণেই সে ঝাঁজিয়া উঠিয়া বলিল,—তুমি দেখনি নিজের চোখে সব! তুমি না হেথায় দাঁড়িয়ে দেখছিলে···

মুদির মুখ মুহূর্তের জন্য সাদা হইয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল,—না, আমার কাজের ভিড়,—আমায় কি ও-সব তামাসা দেখবার ফুরসুৎ আছে···! মুদি চলিয়া গেল। আশপাশের অন্য

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু ইহুর পানে চাহিলেন। ইহু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। সে বাব্‌লাকে দেখাইয়া বলিল,—এই ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করুন।···এরা কিচ্ছু বলবে না, দোকান লুট হবার ভয়ে!

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু হেদায়েতের ছেলেকে জড়াইতে পারিলে সুখীই হন,—তাই তিনি লোকজনদের আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—তোমরা দেখে থাকো যদি তো বল হে,—কোন ভয় নেই। তার এত বড় আস্পর্দ্ধা হবে না, যে, তোমাদের দোকান লুঠ করে এই পথের উপর! আমরা আছি কি করতে তবে?

লোকগুলা মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইল। দুই-একজন এ কথায় সাহস পাইয়া কিছু বলিবে বলিয়া উদ্যোগীও হইল—কিন্তু পিছন হইতে অস্ফুট কণ্ঠে নিষেধ জাগিল,—হাঁ, আমায় মেরে সব লুঠ করে যাক—তারপর ওঁরা এমনি তদারক করবেন! এই তো ইহু মার খেলে, তার দোকানও লুঠ হলো—পুলিশ এসে রক্ষা করলে, ঠ্যাকাতে পারলে!·· আমাদের মাথা ভাঙ্গলে পুলিশকে তার সাক্ষী দিতে পারলে তবে তার কিনারা হবে। তাও সাক্ষীরা তখন এমনি করে যদি···

ঠিক! যারা ইন্‌স্‌পেক্টরের কথায় সত্য কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাদের মুখের কথা আবার এই নিষেধে মুখের মধ্যেই আটকাইয়া রহিল।

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু নিরুপায় হইয়া বাব্‌লাকেই তখন প্রশ্ন করিলেন,—কে মেরেছে এই পাণওয়ালাকে, তুমি দেখেচ?

বাব্‌লা বলিল—চার-পাঁচজনে মিলে মেরেছে।

—বোতল নিয়ে কে ছুড়েচে দেখেচো?

—সকলেই বোতল ছুড়ছিল। তারি একটা বোতল এসে আমার দাদার মাথায় লাগে···

—তাদের দেখলে তুমি চিনতে পারবে?

—পারবো।

—বেশ, এসো আমার সঙ্গে।

ইহুকে দিয়া একটা ট্যাক্সি ভাড়া করাইয়া ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু ইহুকে বাব্‌লাকে ও লালবেহারীকে লইয়া তখনই

হেদায়েতের বাড়ী গ্যাড়াতলায়। গাড়ী আসিয়া সেখানে পৌঁছিলে হেদায়েতের তলব পড়িল। হেদায়েৎ আসিয়া ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল,—কাম্ ফরমাইয়ে মহারাজ...

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন,—তোমার ছেলে পণ্টু কোথায়?

হেদায়েৎ বলিল, সে খেলিতে গিয়াছে।

—কখন ফিরবে?

হেদায়েৎ বলিল, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই।

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু তখন বলিলেন,—একটা মারপিট করে এসেছ সে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে। এই ছেলেটির মাথা ফাটিয়েছে, আর এই পাণওয়ালার দোকান লুঠ করেছে। পাণওয়ালা তারি নালিশ করেছে—সে এলে তাকে থানায় যেতে বলবে।

হেদায়েৎ কট্‌মট্ করিয়া একবারে পাণওয়ালার পানে চাহিল; পরে ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুকে সেলাম করিয়া বলিল,—সাক্ষী-প্রমাণ পেয়েছেন?

—পেয়েছি।

হেদায়েৎ আবার সেলাম করিল।

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু ট্যাক্সিতে চড়িলেন। হেদায়েৎ একটা দোকান হইতে মিঠা পাণের কয়টা দোনা লইয়া ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুর হাতে গুঁজিয়া দিল। ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু পাণ মুখে পুরিয়া বলিলেন—সে এলেই থানায় পাঠিয়ো—ভুলো না। না, জমাদারকে এখানে রেখে যাব?

হেদায়েৎ বলিল, জমাদারকে রাখিয়া গিয়া তাকে বেইজ্জৎ করিবার প্রয়োজন নাই। ছেলে ফিরিলে ছেলেকে সে নিজেই থানায় হাজির করাইয়া দিবে।

লালবেহারীকে লইয়া তখন ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু হাসপাতালে গেলেন। সেখানে তার কাটা ঘা সেলাই হইল; ইদুকে ও তাকে ডাক্তার দেখিয়া সার্টিফিকেট দিলে সেই সার্টিফিকেট ও ফরিয়াদী সমেত থানায় ফিরিয়া ইন্‌স্‌পেক্টর সকলকে ছুটি দিলেন। ইদুকে তিনি বলিয়া দিলেন,—কাল সকালে এসো, কোর্টে যেতে হবে।

মুখে চলিল। তখন রাত্রি হইয়াছে। কলিকাতার পথ গ্যাসের আলোয় ভরপুর।

তারা গৃহে ফিরিয়া দেখিল, গৃহে কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে। কৈলাস আর ঘনশ্যাম ছেলেদের খোঁজে বাহির হইয়াছে। আর কম্পিত বুকে অসহ্য বেদনা ও পাহাড়-প্রমাণ আশঙ্কা লইয়া ভগবতী ও শৈল নিঝুম বসিয়া আছে। কাঁদিয়া দুই চোখে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। একটা কু-ই মনে জাগিতেছিল—এই গাড়ী-ঘোড়ার রাস্তা—বুঝি বা মোটরের তলায় পড়িয়াই ছেলে দুইটা প্রাণ দিয়াছে! তারা যুক্ত-করে কায়-মনে ভগবানকে ডাকিতেছিল।

এমনি আশঙ্কা ও দুর্ভাবনার মধ্যে ছেলেরা ফিরিলে ভগবতী ও শৈল একেবারে লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। কিন্তু এ কি—লালবেহারীর মাথায় এ পটী বাঁধা কিসের!

লালবেহারী নিজেই সব কথা খুলিয়া বলিল। থানা, পুলিশ, হাসপাতাল—কোন কথাই বাদ রাখিল না। শুনিয়া ভগবতী ও শৈল শিহরিয়া উঠিল।

শৈল বাবলাকে বলিল,—ভিড় দেখে কেন তোমরা সেখানে যাও? যদি প্রাণদুটোই যেত...?...আজ যে প্রাণ-দুটো রক্ষা পেয়েছে...তার প্রাণ আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল।

ভগবতী লালবেহারীর মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন,—বৌমা, পাঁচ পয়সার হরির লুট মেনেছিলুম, কাকেও দিয়ে বাতাসা আনিয়ে তুলসীতলায় বাবার লুট দাও মা...তারপর লালবেহারীকে বলিল,—আর থানা-পুলিশ করতে হবে না! শেষে নালিশ-ফারয়াদ করে আবার উল্টো বিপদ ঘরে ডেকে আনবে! ভালোয়-ভালোয় প্রাণ দুটো যে ফিরে পেয়েছি, এই ঢের! ভগবতী আবার কোন্ অলক্ষ্য দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

১৬

আরো দুই-চারিদিন থানা-ঘর করিয়া ইদু শুনিল, তার মামলার সাক্ষী-সাবুদ নাই—কাজেই মামলা নাকচ করিতে হইল। বাবলাও পণ্টুকে ঠিক সনাক্ত করিতে পারে নাই। পণ্টু বেশ বাঙালী বাবু সাজিয়া থানায় আসিয়া উদয় হইয়াছিল। সঙ্গে উকিল ছিল। তার জেরায় বেচারা

হেদায়েৎ থানার দ্বারে একরূপ হত্যা দিয়া পড়িয়াছিল, এবং ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুর সহিত হেদায়েতের চোখের ভাষায় দুই-চারিবার কিসের ইসারাও চলিয়াছিল—! ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু একটা মোটা খাতা টানিয়া তার দিকে চোখ রাখিয়া বলিলেন,—তুমি আদালতে গিয়ে হাকিমের কাছে দরখাস্ত দিয়ে নালিশ করতে পারো। পুলিশ তোমার মামলা চালাবে না!

ইদু গাড়ীভাড়া-বাবৎ কতকগুলা ব্যয় করিয়া শেষে যখন নিরুপায় হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন পাশের দোকানের মুদি আসিয়া হাসিয়া বলিল,—ওদের সঙ্গে পেরে উঠতে পারিস্ কখনো তুই!...কোকেন বেচে টাকা—হেদায়েতের তদ্বিরের জোর কত! ওরা দিনকে রাত করে তুলতে পারে। ও হলো পগেয়া পাজী! পুলিশের সঙ্গে ওর দহরম-মহরম কত!

ব্যাপার দেখিয়া ইদুর তাক লাগিয়া গিয়াছিল। এত বড় অত্যাচার কলিকাতার বড় রাস্তায়, দিনের বেলায়—আর তার প্রতিকার হয় না! তার পয়সা নাই বলিয়া এমনি ভাবেই পরের পদাঘাত তাকে সহ্য করিয়া চলিতে হইবে! এই পুলিশ-পাহারার মধ্যেও গরিবের অবস্থা এমন শোচনীয়! রাগে জ্বলিয়া দোকান-পাঠ বন্ধ করিয়া সে দেশে চলিয়া গেল। দেশে গিয়া চাষ করিয়া খাইবে সে-ও ভালো, তবু এই সুরক্ষিত সহরের বুকে বসিয়া দুই পয়সা কামাইবার প্রত্যাশায় ব্যবসা ফাঁদিয়া আর একদিনও থাকিবে না!

যথাসময়ে লালবেহারীর কাটা ঘা সারিয়া উঠিল—এবং এ ঘটনার কথা স্মৃতির এক কোণে জমা রাখিয়া সে বাব্‌লাকে সঙ্গে করিয়া যেমন স্কুলে যাইত, তেমনি স্কুলে যাইতে লাগিল।

এমনিভাবে কিছু কাল কাটিবার পর কৈলাস আসিয়া সংবাদ দিল, তাদের ছাপাখানা হইতে একটা নূতন কাগজ বাহির হইবে—তারা কয়েকটি চালাক ছোকরা চায়, সেই কাগজ বিক্রয় করিবার জন্য। মাহিনা মিলিবে, তাছাড়া যেমন যেমন কাগজ বিক্রয় করিবে, তার উপর একটা লাভও পাইবে।

বাছা—ওর আর পড়াশোনা করে কি হবে! আমি তবু দেখে যেতে পারব যে ও কাজের মানুষ হয়েছে। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে বারো-তের বছর বয়স হলো তো! লেখা-পড়া শিখে আর কি হবে! হাকিমও হবে না, উকিলও হবে না,—এ তবু নিজে খুঁটে খেতে শিখবে। আমি দেখে যেতে পারব'খন।

লালবেহারী তখন কাজে লাগিয়া গেল। পথে সে কাগজ বিক্রয় করে। চালাক চট্‌পটে ছোক্‌রা—তাছাড়া মুখেও তার এখন কমনীয়তা যে কোন পথিকের সামনে কাগজ মেলিয়া ধরিলে কেহ তাকে ফিরাইতে পারে না! কাজেই কাগজ সে বেশ বিক্রয় করিতে লাগিল।

প্রত্যহ সে গৃহে ফিরিয়া পথের নানা ঘটনার এমন গল্প ফাঁদিয়া বসিত যে বাব্‌লার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিত এই বাহিরের জন্য। বাহিরটা তাকে অনবরত ডাকিত। ঐ চলন্ত গাড়ী-ঘোড়ার চপল উচ্ছ্বাস,—ঐ লোকজনের কলরবের জীবন্ত চাঞ্চল্য! লালবেহারীকে ছাড়িয়া তার জীবন নিতান্ত নীরস একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছিল। সেই একলাটি যথা-সময়ে স্কুলে যাওয়া, তারপর নিরূপিত সময়ে বই লইয়া বাড়ী ফেরা, বাড়ী ফিরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া থাকা—তার কেমন হাঁফ ধরিত! দাদার গল্পে দাদার ঐ সজীব জীবনের লীলায়িত বৈচিত্র্য—তার স্পর্শে বালকের প্রাণ এমন রঙীন স্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠিত যে প্রাণ তার প্রবল উচ্ছ্বাসে বাহিরে ছুটিয়া যাইবার জন্য অধীর অশান্ত হইয়া উঠিত! মনে হইত, তার জীবনটা যেন একটা বদ্ধ প্রাচীরের মধ্যে আটকাইয়া রহিয়াছে—ইহাকে ঠেলিয়া চালাইতে তার অঙ্গে চাড় লাগে, বেদনা জাগে—অথচ তাকে চালাইয়া যাইতেই হইবে! আর দাদার সাম্‌নে কি প্রচণ্ড মুক্তি...!

এমনি অধীরতার মাঝে স্কুলের বাঁধা-ধরা নিয়মে পড়াশুনায় তার অনুরাগ শিথিল হইয়া আসিল। একদিন স্কুলের ছুটীর পর ঘুরিয়া ফিরিয়া বড় রাস্তার মোড়ে গিয়া সে দাঁড়াইল—দাদা এই মোড়ে কাগজ বিক্রয় করে। কত রঙের, কত রকমের ছবি আঁকা বিচিত্র কাগজের বোঝা...এই বেচা-কেনার

করিতে ছুটিল। খরিদ্দারকে কাগজ দিয়া যখন হাতে পয়সা পাইল, তখন আর তার আনন্দ ধরে না! সেও একজন মানুষ হইয়া উঠিয়াছে—দাম লইয়া কাগজ ফিরি করিতেছে! সে আর নগণ্য, স্কুলের একটা নীচের ক্লাশের ছেলেমাত্র নয়। সে-ও একজন পসারী—তার পানেও মানুষ ফিরিয়া তাকায়—তার হাতের কাগজ লইয়া যাচাই করে এবং তাকে পয়সা দিয়া তার কাগজও মানুষ কিনিয়া পড়ে!—আপনার এই ক্ষুদ্র জীবন সে আজ সার্থক মনে করিল।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গিলে লালবেহারী বলিল,—তুমি ইস্কুল থেকেই এখানে এসেচ! বাড়ী যাওনি বাব্‌লা?

বাব্‌লা অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—না।

—তোমার মা কত ভাবছেন!

বাব্‌লার তখন হুঁশ্ হইল—ঠিকই তো! ঘরে মা ভাবিয়া সারা হইতেছে!···তার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল—ভয়ও হইল, বাড়ীতে ফিরিয়া এখনি মার কাছে বকুনি খাইতে হইবে!

লালবেহারী বলিল,—খাবারও খাওনি?

বাব্‌লা বলিল,—না।

লালবেহারী তখন তাকে লইয়া একটা খাবারের দোকানে গেল এবং খাবার কিনিয়া বাব্‌লাকে খাওয়াইল। পরে বলিল,—এখন বাড়ী যাও।

বাবলা বলিল,—তুমি?

লালবেহারী বলিল,—আমার একটু দেরী আছে।

বাবলা তখন তার কাগজের বোঝা আবার লালবেহারীর হাতে তুলিয়া দিয়া বিষণ্ণ মনে ধীর পদে বাড়ী ফিরিল।

বাড়ী গিয়া বাহিরে সে মাকে দেখিতে পাইল না! ভগবতীও বাড়ী নাই। সে চোরের মত সতর্ক নিঃশব্দ পায়ে গিয়া ঘরে ঢুকিল। ঘরের মধ্যে অন্ধকার—সন্ধ্যা-দীপ জ্বালা হয় নাই। ঘরের জানলা বন্ধ।

বই রাখিয়া বাবলা চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। ও কি ও, বিছানার মধ্যে…

সে আগাইয়া আসিয়া দেখিল, মা বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া। সে ডাকিল,—মা—

কোন উত্তর নাই। সে আবার ডাকিল,—মা, মাগো, …ও মা—

তবুও উত্তর নাই। তার বুকটা দুলিয়া উঠিল। সে মার গায়ে হাত দিল। মার গা একেবারে আগুন! মার যে খুব জ্বর!

বাবলার বুক ভয়ে ভাবনায় কাঁপিয়া উঠিল। সে মার বুকের উপর পড়িয়া ডাকিল,—মা···

কাঁপিতে কাঁপিতে মা হাত বাড়াইয়া বাবলাকে বুকে চাপিয়া ধরিল, বলিল,—বড্ড জ্বর হয়েছে বাবা, আমার ···খাবার নিজে নিয়ে খাও আজ। তাকে তোলা আছে—খাও গে!

বাবলা খাইল না—মার বুকের উপর মুখ চাপিয়াই পড়িয়া রহিল। তার দুই চোখ ফাটিয়া হু-হু করিয়া জল আসিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সে

বাইরে থেকে দেখলে তারে নয় সে তেমন সুন্দরী
যেমনতর অন্য সকল মেয়ে,
পড়লো ধরা প্রথম চোখে মাধুরী তার, আ মরি,
হাসলে যখন আমার পানে চেয়ে!
দেখতে পেলুম চোখ দুটি তার উজল এবং কালো,
প্রেমের উৎস, আলোর ঝরণা, উপচে পড়ে আলো!

কিন্তু এখন নেই অনুরাগ—বিরাগ ভরা দুটি চোখে,
আমারে আর দেয়না সাড়া কভু;
আঁখিতে তার প্রেমের আলো তেমনিতর ঝক্‌মকে
আজও আমি দেখতে যে পাই তবু;
তাহার চোখের ভ্রূকুটিও অনেক গুণে শ্রেয়
অন্য মেয়ের রাঙা ঠোঁটে রাঙা হাসির চেয়েও।

(হার্টলি কোলরিজ)

সঙ্কলন

গান

মন চেয়ে রয়, মনে মনে
হেরে মাধুরী।
চোখ দুটো তাই কাঙাল হয়ে
মরে না ঘুরি॥
চেয়ে চেয়ে, বুকের মাঝে
গুঞ্জরিল একতারা যে,
মনোরথের পথে পথে
বাজ্‌ল বাঁশরি,
রূপের কোলে ঐ যে দোলে
অরূপ মাধুরী॥

কুলহারা কোন্ রসের সরোবরে
মূলহারা ফুল ভাসে জলের পরে।
হাতের ধরা ধরতে গেলে
ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে,
আপন মনে স্থির হয়ে রই
করিনে চুরি;
ধরা দেওয়ার ধন সে ত নয়
অরূপ মাধুরী॥

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে
আয়রে চলে।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে॥
হাওয়ার নেশায় উঠ্‌ল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে॥

মাঠের বাঁশী শুনে শুনে
আকাশ খুসি হ'ল।
ঘরেতে আজ কে রবে গো,
খোলো দুয়ার খোলো।
আলোর হাসি উঠ্‌ল জেগে
ধানের শীষে শিশির লেগে
ধরার খুসী ধরে না গো, ঐ যে উথলে

শান্তিনিকেতন, পৌষ ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যথোপযুক্ত অঙ্গ সংস্থাপন ও পরিচালন

প্রায়শঃই, বিকৃত-অঙ্গ মনুষ্য দেখা যায়; অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের অনেকেই শৈশব হইতেই তদবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কেবল অঙ্গ বিকৃতি নহে, এমন আরো অনেক রোগ আছে যাহার মূল কারণ, যথোপযুক্ত অঙ্গ সংস্থানের কতকগুলি মূলসূত্রের প্রতি অবহেলা।

শোয়া বসা ও দাঁড়াইবার ভঙ্গীর উপরই মানুষের উপরোক্ত অঙ্গ বিকৃতির কারণ নির্ভর করে; শুইবার দোষে অনেকেরই ঘাড়ে ব্যথা হয়; বালিস বিছানা রৌদ্রে দিলে, তাহার উপশম হয় মাত্র। বিশ্রামের সময়ও আমরা যেরূপ অবস্থিতে থাকি তাহা আশ্চর্য্য রকমের। হয়ত বিছানার মধ্যভাগ কটিদেশের ভারে বসিয়া যায়, হয়ত বা খুব উচ্চ শক্ত বালিসে মাথা রাখা হয়; ইহার ফলে, শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রাদিতে অযথা চাপ পড়ে ও তাহাদের কার্য্যকরী শক্তির ব্যাঘাত ঘটে। অনেকের দাঁড়াইবার ভঙ্গী এইরূপ অস্বচ্ছন্দ যে অযথা অঙ্গ স্থাপনের ফলে তাঁহাদের কতকগুলি হাড় ও মাংসপেশীর উপরে অযথা ভাবে বেশী ভার পড়ে। কিছুদিন ধরিয়া এইরূপ কুঅভ্যাসের ফলে, এই প্রকার শুইবার বসিবার বা দাঁড়াইবার ভঙ্গী তাহার মজ্জাগত হইয়া দাঁড়ায়। তখন ক্রমাগতঃ শরীরের একদিক ভারগ্রস্থ হওয়ায় অস্থি পঞ্জর বক্র হইয়া যায়;—এইরূপে অনেক রকম রোগ হয় তাহার মধ্যে Lordosis, Kyphosis ও Pelvic deformities উল্লেখযোগ্য।

অতএব, শোয়া বসা ও দাঁড়ানের ভঙ্গী শৈশব হইতেই এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত যে, শরীরের ভার সমভাবে সমস্ত অস্থির উপর পড়ে,—অযথা কোন বিশেষ অস্থি বা পেশী ভার গ্রস্ত না হয়। বিশেষ করিয়া যত্ন করা উচিত যাহাতে বুক ও পেটের যাবতীয় যন্ত্রাদি ঝুলিয়া না পড়ে; সেই বিষয়ে সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

প্রথম হইতেই, শিশুগণ যাহাতে অস্বাভাবিক অঙ্গ স্থাপনে ও পরিচালনে অভ্যস্ত না হয় সে বিষয়ে বিশিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা উচিত। শৈশবই কোমল অস্থির পরিপুষ্ট হইবার কাল; এ সময়ে উহা সুতরাং স্বচ্ছন্দে বৰ্দ্ধিত ও সুপুষ্ট হইবার অবসর প্রাপ্ত না হইলে অস্থিগুলি অপুষ্ট অবস্থাতেই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। তাহার ফলে, সেই সঙ্গে, ধমনী শিরা ও স্নায়ু সমুদায় বাঁকিয়া যায় এবং যন্ত্রাদি অস্বাভাবিক ভাবে ভারগ্রস্ত হইয়া আপন আপন স্থান ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে—তখন শারীরিক স্বাভাবিক ক্রিয়ারও ব্যাঘাত হয়।

যথোপযুক্ত অঙ্গ স্থাপন ও পরিচালনের অভাবে যাহারা কুব্জ হইয়া পড়ে, তাহাদের উদর প্রাচীরের মাংস লোল হইয়া পড়ে; এজন্য ফুসফুস ঠিকমত বায়ু পূর্ণ হইয়া প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইতে পারে না। ঐ

কারণে,যকৃৎ প্লীহাদি যন্ত্র সমুদায় স্থানচ্যুত হইয়া নামিয়া পড়ায় তলপেটের যন্ত্রগুলির উপর চাপ দেয় ; তাহাতে তাহাদের রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হয় ; এবং ইহা হইতেই অজীর্ণ রোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা ও মূত্র সম্বন্ধীয় পীড়াদি জন্মে।

কদভ্যাস জনিত এই ব্যারাম সকলের প্রতিকার বিশেষ কঠিন নহে। যাহাতে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ স্বাভাবিক ও স্বাধীন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সেই মত কুব্জদিগকে অঙ্গ পরিচালনার অভ্যাস করিতে হইবে। তাহাদিগকে দিবসের মধ্যে ২।৩ বার অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল কাঁধের তলায় একটি বালিশ রাখিয়া শক্ত বিছানার উপর শুইতে হইবে। এই প্রকার অভ্যাসের ফলে ফুসফুস আবার যথাযথ ভাবে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হইবে ; এবং উহাদের যন্ত্রগুলি আপন আপন স্থানে প্রবিষ্ট হইবার সুবিধা পাইবে। কিছুদিন এই অভ্যাসের ফলে রোগী সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন এবং শরীরের যন্ত্রগুলি স্বাভাবিক কার্য্য করিবে।

স্বাস্থ্য, পৌষ ১৩৩০। শ্রীঅমিয়চরণ মুখোপাধ্যায়।

ছাত্র-শাসন

যদি খেলা করাকেই আমরা বালকদিগের কার্য্য বলিয়া ধরি, তাহা হইলে বালকদিগকে সেই স্বার্থহীন, উদ্দেশ্যহীন কার্য্য বা occupation হইতে নিরস্ত করিয়া তাহাদিগের তৎকালীন জীবনের অন্যতম স্বার্থযুক্ত কার্য্য—পাঠে—পরিচালিত করাই শিক্ষকের উদ্দেশ্য। খেলা বালকদিগের স্বাস্থ্যের উপকার করে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তাহারা খেলা করে না—সে উদ্দেশ্য বালকদিগের অভিভাবক বা শিক্ষকের মনেই থাকে। বালকেরা আনন্দ পায় বলিয়া খেলা করে।

ইহার কারণ, বালকদিগের চিত্ত বা মন শিক্ষার সর্ব্বজনীন ও সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ধারণা করিতে পারে না, তাহাদের চিত্ত বা মন অসম্পূর্ণ এবং অপরিণত। শিশুরা যাহার ধারণা করিতে অক্ষম, তাহার প্রতি তাহাদের কৌতুহল বা ইচ্ছা উদ্রিক্ত হয় না।

জানিবার ইচ্ছা থাকিলেও অনেক সময় জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি শিশুদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞান হইলে কি উপকার বা লাভ হইবে, শিশুগণ তাহার ধারণা করিতে পারে না। শিক্ষকের প্রথম কার্য্য এই যে তিনি তাঁহার শিক্ষাধীন বালকদিগের চিত্ত সমাহিত করিতে চেষ্টা করিবেন। শিক্ষণীয় বিষয়ে যাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ মনোযোগ করে তিনি তাহা করিবেন। শিক্ষার কোনও বিষয় সম্মুখে রহিয়াছে, তাহাতে মন নাই, শিক্ষক কোনও বিষয় শিক্ষা দিতেছেন অথচ তাহাতে মনোযোগের অভাব – ছাত্রদিগের মধ্যে এই সব দোষ সচরাচর দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ অনেক। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত

(১) শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়া বাহ্যিক অপরাপর বিষয়ে ছাত্রদিগের মনোযোগ।

(২) শারীরিক, মানসিক ব্যাধি বা অসুস্থতাবশতঃ মনোযোগের অভাব।

(৩) শিক্ষণীয় বিষয়ে কৌতুহল বা অনুরাগের সঞ্চার হইতে চায় না – বিষয়টী নীরস।

(৪) শিক্ষকের প্রতি বিরোধী ভাব ও অনাস্থা।

(১) Attention—অভিনিবেশ। মনোবিজ্ঞান বলে, attention অর্থাৎ অভিনিবেশ ব্যতীত বাহ্যবস্তু মনের গোচরীভূত হয় না। বাহ্যবস্তু বস্তুই থাকে—যে পর্য্যন্ত না attention তাহাদিগকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া মনে প্রতিফলিত বা মনের গোচর করে। আর the intensity of attention varies with the area of attention অর্থাৎ চিত্ত যত অধিক বিষয়ে রত থাকিবে, ততই অল্প অভিনিবিষ্ট হইবে। এক ব্যক্তির চিত্ত একই সময়ে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে না এক বিষয়ে যখন অভিনিবিষ্ট হইবে, তখন অন্য বিষয়ে অনবহিত হইবে।

attention অবান্তর বিষয়ে প্রযুক্ত হওয়াতে বালকদিগের চিত্ত যখন শিক্ষকের শিক্ষণীয় বিষয় হইতে দূরে থাকে, তখন শিক্ষণীয় বিষয় ত তাহাদের মনের গোচরে আসিতে পারে না। ইহার প্রতিকার করিবার জন্য শিক্ষকের অনেকটা দক্ষতা থাকা আবশ্যক। তাঁহার শিক্ষার বিষয় এবং প্রণালী monotonous এক-ঘেয়ে না হয়, ইহা তাঁহাকে দেখিতে হইবে। ছাত্রদিগের মনোযোগ অপর কারণেও বিষয় হইতে অপসৃত হইয়া পড়ে ; কারণ, voluntary attentian স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত মনোযোগ এগার বার বৎসরের পূর্ব্বে জাগ্রত হয় না। এই voluntary attention পুষ্ট করিতে হইলে, বালকদিগের মধ্যে কয়েকটি অভ্যাসও পুষ্ট করিতে হইবে। শিক্ষক পাঠাগারে প্রবেশ করিলেই শিক্ষার্থীরা অন্য সকল বিষয় ছাড়িয়া তাঁহারই আদেশ মানিতে চেষ্টা করিবে তাহারা স্থির ও নিয়মিতভাবে বসিতে এবং শিক্ষকের দিকে চাহিয়া থাকিবার অভ্যাস করিবে।

শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, এই voluntary attention পুষ্ট করিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। শিক্ষক যেন এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন। শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়া অন্য কোনও অবান্তর বা বিসদৃশ বিষয় বালকদের চিত্তকে রত বা আসক্ত করিতে না পারে তাহাও দেখা দরকার। বয়স্ক ছাত্রেরাও কখন কখন ইন্দ্রিয়জ নানারূপ অনুভূতি হইতে মনকে অপসৃত করিবার নিমিত্ত কোন এক বিষয়ে বিশেষরূপে অভিনিবিষ্ট হয়।

তাহার পরে অবান্তর বিষয় হইতে শিক্ষণীয় বিষয়ে attention

বালকগণের কৌতূহল ও অনুরাগ উদ্রিক্ত করা। শিক্ষক যে কোনও নীরস বা অপ্রীতিকর বিষয় শিখাইবেন না, তাহা বলি না। তিনি এই নীরস—অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়, যেমন নামতা-শিক্ষা ইত্যাদির প্রতি ধীরে ধীরে ছাত্রদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবেন। নতুবা voluntary attention এর পুষ্টিসাধন হইবে না। বাহ্যবস্তু হইতে attention অপসৃত করিয়া শিক্ষণীয় বিষয়ে প্রয়োগ করা voluntary attentionএরই কার্য্য। অল্পবয়স্ক বালকদিগের মনে voluntary attentionএর উদ্রেক করিবার জন্য কখন কখন ধমকানি বা তিরস্কারের প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু অধিক বয়স্ক বালকদিগকে তিরস্কারের সহিত উপদেশ দিলে অধিক ফলোদয় হয়।

(২) শারীরিক বা মানসিক ব্যাধি ও অসুস্থতা।

বালকদিগের শারীরিক ব্যাধি—মাথাধরা, চক্ষুর দোষ এবং অন্যান্য ব্যাধি যেমন শিক্ষকের অধ্যাপনায় অভিনিবিষ্ট হইতে দেয় না, মানসিক ব্যাধি ও বিকার—ক্রোধ, শোক প্রভৃতিও সেইরূপ বালকদিগকে শিক্ষণীয় বা পাঠ্য বিষয়ে আকৃষ্ট হইতে দেয় না। এই অবস্থায় বালকদিগকে নানারূপে সান্ত্বনা দিয়া বা অন্য উপায়ে যতদূর সম্ভব প্রকৃতিস্থ করিয়া শিক্ষকের অধীন করা উচিত। শারীরিক ব্যাধি হইলে তাহাকে কিছুকালের জন্য পাঠে বিরত করিয়া চিকিৎসাধীন রাখা উচিত। শিক্ষক এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। পড়াইবার সময় কোন বালককে অমনোযোগী বা পড়ায় অধিকক্ষণ বিমুখ দেখিলেই তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিবেন। যদি তাহাকে কোনও রূপ অসুস্থ দেখেন তবে তখনই তাহার যথাযথরূপ প্রতিকার করিবেন। অসুস্থ বালককে শিক্ষাধীন রাখা ও নিষ্ঠুরতা। মস্তিষ্ক সতেজ থাকিলে চিত্ত সকল বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে, ক্লান্ত বা ক্লিষ্ট হইতে পারে না।

(৩) শিক্ষণীয় বিষয়সকল বালকদিগের প্রীতিকর ও কৌতূহলোদ্দীপক হইলে ভালই হয়। যদি সে সকল স্বতই বালকদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে না পারে এবং তজ্জন্য বালকগণ সে সকল শিক্ষা করিতে না চাহে, তাহা হইলে শিক্ষণ-কার্য্য একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। তখন অনেক প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য শিক্ষণীয় বিষয়ও বালকদিগের শিখান যায় না। একজন জার্ম্মান পণ্ডিত এ বিষয়ে বলিয়াছেন, "Make your instruction interesting" এই নীতি পূর্ব্বকার পণ্ডিতদিগের আদরণীয় ছিল; কিন্তু আমাদের নীতি হইবে; —"instruct in such a way that interest may awake and remain active for life." কেবলমাত্র সরস ও বালকদিগের কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ই শিক্ষা দিলেও চলিবে না, বিষয় যতই কঠিন হউক, শিক্ষকের শিক্ষাপ্রণালী যেন চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক হয়।

(৪) অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষক বালকদিগের অপ্রীতিকর হইয়া উঠেন, এবং বালকেরা তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চাহে। কখনও অন্তরালে কখনও বা সাক্ষাতেই তাহারা তাঁহার নিন্দা করে। এ অবস্থায় ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া চলে না; দিলেও কোন ফল হয় না। শিক্ষকের উপর আস্থা নাই বলিয়া শিক্ষকের সারবান কথায় ছাত্রেরা অনেক সময় কাণ দেয় না। অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় অনেকক্ষেত্রে শিক্ষকেরই দোষ। শিক্ষকের শিক্ষাদান-প্রণালী অনেক সময় বালকদিগের কৌতূহল উদ্দীপিত করিতে পারে না; তিনি বালকদিগের প্রতি অতীব কঠোরাচরণ করিয়াও তাহাদের চিত্ত তাঁহার প্রতি বিরূপ করিয়া তোলেন। নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে মানুষের, বিশেষত বালকদিগের কৌতূহল উদ্রিক্ত হওয়া স্বাভাবিক। উপযুক্ত প্রথা ও প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষকের কাজ। বালকেরা হয়ত তাঁহাকে বার বার প্রশ্ন করে; তাহাদের কেহ বা স্বভাব সুলভ চাঞ্চল্য দেখায়; কেহ বা অত্যধিক কথা কহে; বালকদিগের এরূপ আচরণ স্বাভাবিক। এ সকল আচরণে বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া প্রথমে ধৈর্য্য-সহকারে কার্য্য করিয়া ক্রমে ক্রমে বালকদিগকে স্বায়ত্ত করিবেন। সকল সময়েই দেখাইবেন, তিনি তাহাদের হিতকারক ও বন্ধু; ইচ্ছা করিলে ও মন দিয়া শুনিলে বালকগণ তাঁহার নিকটে সকল বিষয়ই শিখিতে পারে; দেখাইবেন যে, তিনি তাহাদের ভালবাসেন এবং তাহাদের অন্যায়াচরণ তাঁহার মনোমত নহে।

শিক্ষক, পৌষ ১৩৩০। শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ।

কাগজের ঠোঙায় খাবার বিক্রয়

মুদি, জিরিওয়ালা, চানাচুরওয়ালা এবং সরকারী বাজারে ফল বিক্রেতারা তাহাদিগের বিক্রয়ের জিনিসগুলি, হয় শালপাতার ঠোঙায় নতুবা কাগজের ঠোঙায় বিক্রয় করে। কচি ছেলেদের খেলনার বাঁশীগুলিরও মুখ কাগজ দিয়া ঢাকা থাকে। শালপাতাগুলি বনে জঙ্গলে পড়িয়া থাকে; সেখানে লোকের বা পশুপক্ষীর যাতায়াত তেমন নাই; কাজেই যদিও দু'চারখানি শালপাতায় পশুপক্ষীর বিষ্ঠা লাগিয়া থাকিতে পারে, অধিকাংশ শালপাতায় ধূলা ছাড়া অপর কিছুই না লাগিবার কথা। আর সে ধূলা—খোলা যায়গার ধূলা; তাহাতে মানুষ, পশু বা পক্ষীর বিষ্ঠা, থুথু, গয়ার পুঁয কিছুই থাকে না; কাজেই সে ধূলা তাদৃশ মারাত্মক নহে। কিন্তু শালপাতাকে রেল বা জল পথে আমদানি করিতে হয়; শালপাতা দোকান ঘরের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া থাকে, শালপাতা ফাটিয়া যায় প্রভৃতি নানা কারণে কতকটা অসুবিধার জিনিষ। অথচ আজকাল কাগজ অত্যন্ত সুলভ। কাগজের ঠোঙা তৈয়ারী করিয়া গরীব মুসলমানের অন্তঃপুরচারিণী মেয়েরা পয়সা রোজগার করিতে পারেন; কাগজের ঠোঙা অল্প

যায়গা জুড়িয়া থাকে। কাগজে মুড়িয়া বিষ্ঠা লইয়া যাওয়া যায়—কেননা সেটা বিলাতী সভ্যতার অনুবর্ত্তী; কিন্তু শালপাতায় মুড়িয়া সোণাও লইয়া যাওয়া "ছোটলোক" বা অসভ্য বা গরীব লোকের কাজ! এই সকল কারণে, শালপাতা একরকম উঠিয়াই যাইতেছে—তাহার স্থানে কাগজের ঠোঙার বাহুল্যই দেখা যাইতেছে।

এই ঠোঙার কাগজ কোথা হইতে আসে, কাহারা প্রস্তুত করে—প্রভৃতি জানিবার বিষয়। সওদাগরী বা সরকারী আপিসের ও আদালতের পুরাতন কাগজপত্র, স্কুল কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কাগজ পত্র; গৃহস্থের পড়া পুরাতন খবরের কাগজ, রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া কাগজ, এই সমস্তই সহরে দপ্তরী-পাড়ায় বা অপরাপর আড়ডায় জমা হয়। যে সব ঘরে কাগজগুলি জমা থাকে প্রায়ই সে সব ঘর কাঁচা ঘর, অন্ধকার ঘর এবং নোংরা ঘর। সেই কাগজ মাড়াইয়াও লোকে চলে, তাহার উপরে শয়নও করে, তাহার উপরে থুথু গয়ারও ফেলে। সুস্থ ও অসুস্থ সকল রকম লোকের হাতে ঘাঁটাঘাঁটি হইয়া, গায়ের ঘাম ও থুথু গয়ার লিপ্ত হইয়া, ইঁদুর, আরসুলা, মাকড়সা, টিকটিকি ও বিছা প্রভৃতির ময়লা লিপ্ত হইয়া, ড্রেণের পাঁক, কাণচুলকাণর ময়লা মুরগী, হাঁস, পায়রা প্রভৃতির মলদুষ্ট হইয়া, এই সকল কাগজ ঠোঙা প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আর সেই সব কাগজের ঠোঙা খুলিবার সময়ে দোকানীরা ফু দিয়া খোলে, তাহার সঙ্গে কত থুথু পড়ে! আর ব্যস্ত থাকিলে, উড়িয়ারা পায়ে করিয়া চাপিয়া ধরিয়া শালপাতা ছেঁড়ে।

তাহার পরে, যাহারা এই কাগজের ঠোঙা প্রস্তুত করেন, তাঁহারা অধিকাংশই অত্যন্ত গরীব গৃহস্থের মেয়ে। আর গরীবের ঘরেই প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড্ যক্ষ্মাকাশ প্রভৃতির ছড়াছড়ি। হয়ত বা যে গরীবের বৌ-ঝি ঠোঙা প্রস্তুত করে, জ্বরগায়ে, কাশিতে কাশিতে অথবা নাকের সিক্‌নি মুছিতে মুছিতে সে ঠোঙা তৈয়ারী করে। অনেক গরীবের বাড়ীতে, নাকের সিক্‌নি, কচিছেলেদের মলদ্বার প্রভৃতি কাগজেই মোছা হয়। আবার সেই সকল কাগজও পুরাতন কাগজের গাদায় জমা হয় এবং তাহা হইতে ঠোঙা তৈয়ারি হয়!!!

কাগজে নুতন ও পুরাতন জুতা মোড়া হয়; হাতের তেল-কালি পায়ের কাদা, এসবও মোছা হয়; প্লেগে মৃত ইন্দুরও কাগজে মুড়িয়া উঠাইয়া ফেলা হয়; আবার, বসন্ত রোগীর ঘায়ের মামড়ীও কাগজে জড় করা হয়; দাড়ি কামাইয়া লোকে কাগজে মোছে এবং ঘাযুক্ত মাথা কামাইয়া কাগজে চুল জড় করে; কাযেই, কাগজে লাগে না, এমন ময়লাই দেখি না। লোকে পুরাতন কাগজ বিক্রয় করিবার সময়ে টুক্‌রা, ময়লা কিছুই বাদ দেয় না—সমস্তই বিক্রয় করে। পুরাতন কাগজ বিক্রেতাওয়ালারাও দাগী, ময়লা—কোনও রকম কাগজ বাদ দেয় না। তাহার উপরে, রাস্তায় যে সব টুক্‌রা বা আস্ত কাগজ পড়িয়া থাকে, সে সবও সযত্নে সংগৃহীত হয়। আর সেই ময়লা কাগজ, ময়লা ঘরে বদ্ধ থাকিয়া, সাধারণতঃ বেশীর ভাগ ময়লা লোকেদের দ্বারা ঠোঙায় পরিবর্ত্তিত হয়। আর আমরা সেই সব ঠোঙায় অবিচারিত চিত্তে খাবার লইয়া আসি! আর সেই জাতীয় কাগজে রং করিয়া ছেলেদের খেলার বাঁশী প্রভৃতির গায়ে জড়ান হয়!

যে দেশে "অন্নের বিচার" সক্‌ড়ীতত্ত্ব-স্বপাক ভোজন বিধি এতই কড়াকড়ি ভাবে ছিল, আজ সেখানকার ব্যবহার শ্রীক্ষেত্রেরও অনেক উপরে উঠিয়াছে! আর আজ তাই ব্যারাম, জ্বরা ও অকালমৃত্যু ঘরে ঘরে!!!

অবান্তর হইলেও, এই প্রসঙ্গে আরো দু'একটি সমান মারাত্মক জিনিষের উল্লেখ করিয়া রাখি—যদি কাহারো চোখ ফুটে:—

(১)। বিড়ির দোকানের শালপাতাগুলি সরকারী ময়লা জলের "কলের" গর্ত্তে ভিজাইয়া রাখা হয়—আর সেই জলে কুষ্ঠরোগী ঘা ধোয়,, গরীবের ছেলেরা জলশৌচও করে।

(২)। চায়ের দোকানে এক বাল্‌তি ময়লা জলে, সারাদিন ধরিয়া চায়ের বাটি ডোবাইয়া "ধোয়া" হয়।

(৩)। বরফের জন্য "করাতের গুড়া" রাস্তায় শুকাইতে দেওয়া হয়, আর কত লোক সেই গুড়াগুলিকে মাড়ায়, কতলোকে তাহার উপরে থুথু গয়ার ফেলে।

(৪)। "হেয়ার কাটারের" বাড়ী যে "পাউডারের পাফ" চিরুণী, বুরুশ, তোয়ালে "লুফা" প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, তাহাতে কত সহস্র বৎসরের কত জাতীয় কতলোকের ঘাম ও ময়লা জমাট হইয়া থাকে, তাহা কেহ দেখিয়াছেন কি?

(৫)। ময়রার দোকানে খোস, দাদ প্রভৃতি চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে খাবার তৈয়ারি করা; ঘাম টস্ টস্ করিয়া পড়িতেছে এমন গায়ে খাবার তৈয়ারি করা; 'ডাষ্ট্‌বিন্'' ও রাস্তা ঝাঁট দেওয়া ধুলা খাবারের উপরে পড়া—এ সবও দেখিবার জিনিষ।

(৬)। চাকরেরা নিজেদের মুখের কসের পান বা থুথু মুছিয়া সেই হাতেই খাবার লইয়া, তাহাদের কুৎসিত রোগ ও ময়লা দুষ্ট কাপড়ে ঢাকিয়া খাবার আনে, আর আমরা তাহাই খাই!!

সংহতি, কার্ত্তিক ১৩৩০। শ্রীরমেশচন্দ্র রায়।

মনোমোহন ঘোষ

(মৃত্যু—১৮ই পৌষ ১৩৩০)

১

সেদিন বিশ্বের ছিল প্রথম যৌবন—
ললাটে পুলক-ভাতি, চোখে দীপ্ত আশা,
মলয় পরশে জাগা আধ শিহরণ,
অধরে কম্পন মৃদু, বুকে ভালবাসা—
হে কবি, উঠিলে ফুটি সেই স্থলগনে—
ক্ষণেকের তরে শুধু গন্ধ বিতরণ,
তারপরে দিনশেষে শীত সমীরণে
খ'সে পড়া ধূলিতলে—সব সমাপন !

আজিকে সকলি শেষ ? গন্ধটুকু তার
আকাশে, বাতাসে, শূন্যে জলে স্থলে মিশি'
বিশ্ব-মানসীর পায়ে প্রীতি-অর্ঘ্যভার
ঢালি দিয়া ভরিবেনা তার দিবানিশি ?
ব্যর্থ সে কি—জীবনের অফুরানো আশা—
মিটিবে না কভু তার অনন্ত পিপাসা ?

২

কোন্ নব জাগরণে, হে সুন্দর কবি,
জাগিয়া উঠিলে আজি অমর প্রভাতে,
হৃদে আঁকা ছিল যার স্মৃতি-ঘেরা ছবি—
তারে কি দেখিলে পুনঃ নবীন শোভাতে ?
তোমার হারাণো প্রিয়া—সে কি বসেছিল
কম্প্রবুকে, নিদ্রাহীন, শয়ন-শিয়রে
তব জাগরণ লাগি' ? সে কি এনেছিল
পুরাণো পরশ-স্মৃতি এ নব বাসরে ?

এ তো মিথ্যা নহে কবি ; এ মিলন-কথা—
ছন্দে গাঁথা ছিল সেই সৃজন-উষায়—
দুইটী বেপথু হিয়া—বাহিরিল যথা—
অনন্তের সঙ্গী ল'য়ে অন্ধ দেবতায়।
জীবনে বিচ্ছেদ আর মরণে মিলন—
কবি ভালে চিরন্তন নিয়তি-লিখন।

জয়মাল্য নাহি শিরে ; বৈজয়ন্তী মালা
শোভে নাই বক্ষে তব, হে বরেণ্য কবি,
তারি সাথে না বহিলে যশোদুখজ্বালা—
ভিখারী ছিলেনা তুমি, তুমি ছিলে কবি।
তোমার বাঁশীটি শুধু বেজেছিল সুরে
নিত্য নবতানে তার সৌন্দর্য্য বাখানি—
নিভৃত সে হৃদয়ের শুদ্ধ অন্তঃপুরে
পেতেছিলে তার তরে পুষ্পশয্যাখানি।

সে কি আজ বরি নিল মরণ-উষায়
অমর কবিরে তার ? প্রীতিপুষ্পভারে
উচ্চ শির আজি নত ? তারি স্নেহছায়
দুখের সমাধি তব জীবনের পারে !
তুমি বুঝেছিলে কবি—মানস-প্রিয়ার
আঁখির পরশ পাশে তুচ্ছ যশোভার।

৪

ভাল বেসেছিলে তুমি, হে বন্ধু আমার,
জগতে যা কিছু ভাল ; শান্ত সুপ্রভাতে
যে সুর উঠিত গানে—ভেদি অন্ধকার
যে আলো উঠিত ফুটি' শুদ্ধ সন্ধ্যারাতে—
সে তো ব্যর্থ নহে কভু ;—তাহাই স্মরিয়া,
কত সে গোপন ব্যথা, —নাহি ছিল মনে—
যা' কিছু সুন্দর তাই গানে ঢালি দিয়া,
নিজেরে রাখিলে ঢাকি সুরের পিছনে ;

তোমার পূজার মন্ত্রে সেই বাণী তাই
ধ্বনিতেছে অহরহ দিবস-শর্ব্বরী ;
তারি প্রতিধ্বনি সে কি শুনিবারে পাই
কল্পলোকে, সৃষ্টিরন্ধ্রে উঠিছে মর্ম্মরি'—
পূর্ণ করি নিখিলের হৃদয়-কন্দর—

পরিণাম

আজ তার আস্‌বার দিন। গাড়ী আস্‌বে সাতটায়, এখানে পৌছুতে আটটা বাজবে।...সাড়ে ছ' টা বাজলো—আর ত দেরী করা চলে না। চুল্ বেঁধেছিলাম আজ খুব ভালো করে,—হায়রে!

আর ভাববার সময় নেই।...উঃ, কি মেঘ করে এসেছে! দেরী হলে যদি সাহসে না কুলোয়! ভয় করলেই বা আজ চল্‌বে কেন? দেড় ঘণ্টা পরে দেখা ত হবেই। সংই ত সে তা জান্‌তে পারবে।...যদি না জান্‌তে পারে? তাও কখনো হয়?

এমনি দিনে দু' বৎসর আগে ঝড়ের মাঝে ঝগড়া করে সে চলে গেছলো। তার খুব শোধ নিয়েছি!...তবে এখন ভয় কিসের? ভয় নয়,—লজ্জা, ঘৃণা—তাও কি আমার আছে? এই যে শিশিটা ঠিক আছে। উঃ, এখানটা যেন কন্ কন্ করে উঠলো...

যেমন মেঘ, তেম্‌নি হাওয়া,—নদীর জল ছুটেছে কি জোরে! কেউ নেই! কেই বা থাক্‌বে এ দুর্য্যোগে? ওই না একটা আলো দেখা যাচ্ছে, কে আস্‌চে বুঝি! তাই বটে! এসে পড়্‌লো,—গায়ে জামা—সে কি জানি! যাই, শীগ্‌গির ওই ঝোপটার পাশ দিয়ে—আঃ!—কাঁটাগুলো কাপড়ে বিঁধচে,—গায়েও...এত মায়া!

দৌড়ে হাঁফিয়ে পড়েছি। এই যে ত শিশিটা—না, এখানে নয়—এখানটা তেমন নির্জ্জন নয়। কি মেঘের ডাক...! ওই বিদ্যুতের আলো—ওই ঝোপ—এখানে ত কেউ আর নেই যে আস্‌বে!—ও কি নড়ে উঠ্‌লো...! এখনো মায়া,—তবে এলাম কেন?

বাপ্‌রে,—বিদ্যুতের আলোয় ওই যে বিকট চেহারা ও কে না দাঁড়িয়ে রয়েছে?...না,—কি!

এসে পড়েছি, একেবারে ঠিক নীচে জল ছুটেছে কি তোড়ে—যেন ছিঁড়ে ফেলবে!

আর না,—বসে পড়ি এই ঝোপটার মাঝে। আবার ঐ আলোয় সেই ভীষণ মুখ,—ইস্,—চোখ বুজলেও যে দেখা যায়! কি করি! শিশিটা, শিশিটা,—উঃ!

কি ভীষণ ঝড় উঠলো,—আর না, এইবার!...আঁধার, রাশ রাশ আঁধার! বুকের মধ্যে মধ্যে এ কি কড়কড়...বাজ পড়লো...ঝড়ের আওয়াজ এ যে মিলিয়ে আসছে! এত ঝড়—তবু হাওয়া পাই না যে...কি এ যাতনা!...জীবনে কি ঝড় তুলেছিলুম...আজ এই ঝড়ের মাঝেই তার শেষ হোক্!...ঐ যে ঝোপের পাশে সেই দুই চোখ...যেন আগুনের গোলা...নিবে গেল! সব নিবে আসছে... ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্.........

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

ক্ষণিকের গান

এক পলকের দেওয়া নেওয়া—
জয় ক্ষণিকের জয়!
জীবন জুড়ে বোঝা বওয়া
নয় কিছুতেই নয়!
এক ফাগুনের দখিণ হাওয়া,
এক নিমেষের স্বপ্নে চাওয়া,
এক পলকের একটু পাওয়া
তাই চুকিলেই হয়!
আঁধার-রাতে খসে যাওয়া—

জীবন ফুরায় কান্নাহাসির—
শিশির অরুণ-হত!
প্রেম যে ফুরায় একটু ছোট
দীর্ঘশ্বাসের মত!
এক কোণেতেই টানাটানি,
একটী কথাই কানাকানি,
জীবন-জুড়ে জানাজানি—
নয় কিছুতেই নয়!
চাই পলকের চুমোখানি,—

যৌবন সে ফুরিয়ে যাবে
কিশোরকালের মত !
তোমার ও রূপ তাও পালাবে
ইন্দ্রজালের মত !
আজ্‌কে বেজায় কাছাকাছি
তুমিও আছ আমিও আছি,
চুমোর-মদে মদের-চুমোয়
যেন এ রাত বয় !
কাল্‌কে যেন পালিয়ে বাঁচি—
জয় ক্ষণিকের জয় !

ভেসে যাব দখিণ হাওয়া—
মন যে কেমন করে !
ফুলের মত সব বিলিয়ে
হঠাৎ যাব ঝরে !
সকল প্রেমই মনের তারে
রইবে গাঁথা অশ্রুহারে—
ক্ষণিক জীবন এ যে অসীম
চুমোর-ব্যথাময়—
ঝরবে সে-সব ঝরব যেদিন—
জয় ক্ষণিকের জয় !

শিবরাম চক্রবর্ত্তী।

কারসাজি

—যতীনবাবু, যতীনবাবু, টেলিগ্রাম এসেচে আপনার! নীচের বারান্দা থেকে আমার রুম্‌-মেট্‌ প্রমোদ হেঁকে উঠ্‌ল।...

আমার টেলি গ্রাম ! হঠাৎ ? বুকটা ধক্‌ করে উঠ্‌ল —কোত্থেকে ?

দেখি,বাবা টেলিগ্রাম করেচেন—মার সাঙ্ঘাতিক অসুখ, মরণাপন্ন, শীগ্‌গির এখনি যেতে হবে।...

বুকটা ভীষণ দমে' গেল। মার অসুখ ! এত কঠিন ? বাঁচবেন না ?—নীল আকাশে পাখা ছড়িয়ে একটা পাখী উড়ে যাচ্ছিল। হায় পাখী, যদি আমার ডানা থাক্‌ত !

গ্রামের দ্বারে ট্রেণ এসে থাম্‌লো। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে। নাম্‌লুম। সারা বুকের ভেতরটা গুম্‌রে উঠ্‌চে, মা আমার বাঁচ্‌বেন না ? যদি মাকে বাড়ী গিয়ে দেখতে না পাই ? হাত-পা সব হিম হয়ে আস্‌ছিল।

তাড়াতাড়ি পা ফেলে চল্‌ছিলুম—ও কি ! ঐ দূর মাদার গাছের ওপর দিয়ে শ্মশান থেকে কালোকালো ধোঁয়া উঠ্‌চে কিসের ? কাদের অস্ফুট হরিধ্বনি, করুণ বেদনা-মথিত দীর্ঘশ্বাসের মতো...

ঝড়ের মতো বুকটা হু-হু করে উঠ্‌ল। মা, মা, মা—চলে' গেলেন ? ঘাসের ওপর বসে পড়লাম। পৃথিবীটা যেন টল্‌চে, সব যেন এখুনি ভেঙে-চুরে খান্‌ খান্‌ হয়ে যাবে !

ভারী মন্থর পা ফেলে-ফেলে বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাড়ীটা থম্‌ থম্‌ করচে। কোন্‌ মুখে ঢুকব, কোন্‌ মুখে ? উঠানে এসেই একটা আহত কান্নায় আছ্‌ড়ে পড়ে চেঁচিয়ে ডাক্‌লাম—মা !

অশ্রুতে সব ঝাপসা হয়ে গেছে। আমার এই কাতর হাহা-রব শুনে ঘর থেকে কে একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক ছুটে এসে আমার লুণ্ঠিত দেহটা তুলে ধরে' বিস্ময়-বেদনা-মাখা কণ্ঠে শুধোলেন,—কে ? এ কি ! যতীন্‌ ? এ কি রে পাগল ? কোত্থেকে এলি ? হঠাৎ ? এঁ্যা !

আমি স্বপ্ন দেখচি না তো ! এ কি, মা ! মা ফিরে এসেচেন ? আমি মাকে কঠিন করে জড়িয়ে ধরে' বল্লাম—তুমি ভালো হয়ে গেছ, ভালো হয়ে গেছ ? মা !...

মা কিছুই বুঝতে পার্‌লে না, শুধু আমার আলিঙ্গনে নিথর হয়ে রইলেন।...লোকজন জমে' গেল। বল্লুম—কাকে পোড়াচ্ছে ওরা ?...

মা বল্লেন—নাপিত-বৌকে,—দুপুর-বেলায় মারা পড়েচে। মার বিস্ময়-দীপ্ত চোখের পানে অশ্রু-ঝাপ্‌সা চোখ দুটি তুলে তৃপ্তির সুরে ডাক্‌লাম—মা ! বুঝলাম, হারিয়ে পাওয়ার সুখ কী !

মেলে ফিরে এসে দেখি, আমাদের মেশের যতীন বিশি তার মায়ের শোকে দিন-রাত কেবলি কাঁদ্‌চে !

বুঝলুম—টেলিগ্রামের খামে 'বিশি'র জায়গায় বিদ্বান্‌ টেলিগ্রাফ-মাষ্টারটি বসু লিখেছিলেন !

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

ত্রিধারা

এক

অজানা পথে চলতে চলতে খুব একটা উঁচু জায়গায় এসে পড়লে লোকে যেমন একবার তাকিয়ে চারিদিক দেখে নেয়, সমরও তার অজানা জীবন-পথের এমন একটা স্থানে এসে পৌঁচেছিল, যেখান থেকে সে তার সারা-জীবনের সমালোচনা সুরু করে দিয়েছিল।

আজ সকালে উঠেই সমর তার জামার পকেটে হাত দিয়ে সে দেখলে, একটাও পয়সা নেই। কাল রাতে খাওয়া হয়নি, পেটে যথেষ্ট ক্ষুধা। শরীরে আলস্যের একটা দারুণ জড়িমা। একবার উঠেই কিছুক্ষণ চুপ করে তার সেই মলিন বিছানাটার উপর শুয়ে সে ভাবতে আরম্ভ করলে—কি করা যায়! খানিকক্ষণ শুয়ে থাকার পর কি একটা ভেবে ক্ষিপ্তের মতো বিছানা ছেড়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে দড়ির আন্‌লা থেকে একটা ছেঁড়া জামা টেনে নিয়ে তাকে সবলে পরে খালি পায়ে উত্তেজিতভাবে সে বেরিয়ে পড়ল।

অনেক কথা,—তার পূর্ব্বেকার কথা তার মনে পড়ছিল, কিন্তু সেই সব স্মৃতির উপর গঠিত হয়ে উঠেছিল বর্ত্তমান, যাকে সে তুলে রাখতে চায়। যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। এখন তাকে বাঁচতে হবে, দাঁড়াতে হবে। সবচেয়ে বড় সত্য তার মনে এসেছিল—দরিদ্র যে, এমনি ভাবেই তার জীবন-রথ হঠাৎ থেমে যায়। কিন্তু এমন ভাবে থামবে কেন? চিরকাল থেমে অসেছে বলে। কিন্তু এবার হতে চলতেই হবে তাকে; যে কোন প্রকারে হোক। নতুন নিয়ম সে প্রতিষ্ঠিত করে যাবে। কিন্তু কোন দিক থেকে, কেমন করে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলবে, তা ভাববার আগে তার জীবনের কয়েকটা পাতা সে পালটে নিতে চায়।

তার জীবন ছেলেবেলায় যতদিন বাপ-মা ছিল ততদিন যেমন আর পাঁচজনের কাটে, ঠিক তেমনি ভাবেই কেটেছে। স্কুলে সে গিয়েছিল, পড়েও ছিল বহুদূর পর্য্যন্ত, কিন্তু তার পড়াশুনো অজ্ঞাত গন্তব্য স্থানের কাছে গিয়ে পৌঁছবার কাছ থেকে তার সাহায্য আসত। বাধ্য হয়ে সব ছেড়ে তাকে নিজেকে বাঁচাবার উপায় খুঁজে নিতে হল। আজ এমনি ভাবে পথ খুঁজতে খুঁজতে সে এসে এখানে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ঠিক হিসাব-মতো একে দাঁড়ানো বলা চলে না। চারিদিক থেকে তাকে চেপে বসিয়ে ফেলবার জন্য দারিদ্র্যের যে ভীষণ পেষণ তাকে ঘিরে ফেলেছে, তা ভেদ করে গর্ব্বোন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে যে ক্ষমতার, যে সাহসের যে স্থৈর্য্যের প্রয়োজন আজ সে তার বুকের মধ্যে তাদের কিছুই খুঁজে পায়নি। অথচ একটা উপায় নির্দ্ধারণ করবার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কোন্ পথ ধরে চলবে সে! তার আশে-পাশে অন্য সব জাতিদের ইতিহাস একবার পড়বার চেষ্টা করলে। যদি তাদের সাহায্যে কোনো উপায় খুঁজে পায়। সে স্পষ্ট দেখতে পেলে সেই বহু পুরাতনের যুগ থেকে এই বাঁচবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু ক্ষমতার ধনের ঐশ্বর্য্যের চাপে পড়ে আর সবের চেষ্টা বিফল হয়ে গেছে। হঠাৎ তার চোখের উপর জ্বল জ্বল করে ফুটে উঠল রুশীয় বিপ্লবের ছবি। রক্তের বন্যা বহিয়ে, নিষ্ঠুরতার রথে চড়ে তাদের আক্রমণের নিদারুণ আঘাতে সব বাধা-বিঘ্ন ভূমিসাৎ করে, আজ তারা কোথায় তাদের জয়ধ্বজা স্থাপন কর্ব্বে, সেই চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। শান্তি, শান্তি, রক্তের স্রোতে শান্তির শ্বেত পতাকার শুভ্রতা রক্ত-রাঙা হয়ে উঠেছে। অশান্তি, অসন্তোষ বুক জুড়ে বসেছে। একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা, একটা অতৃপ্ত বুভুক্ষা সবার মধ্যে জেগে উঠেছে। একজন আর একজনের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে চায়। "আত্মানং বিদ্ধি", নিজেকে জানো। উপনিষদের এ বাণী আজ সময়ের প্রাণের দানবের কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হয়ে এল। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে হবে! অপরের ভালো হোক, মন্দ হোক, সেটা আমার দেখবার প্রয়োজন নেই। আমার যাবার পথের বাধা তার উচ্ছেদ-সাধনে কোনো দ্বিধার প্রয়োজন নেই।

জলের স্রোতের মতো থেমে গেল। এ সব কথার চিন্তায় অনভ্যস্ত তার হৃদয় যেন কেঁদে উঠল। এতদিনের, বাঙালীর ভারতীয়ের জন্মগত সংস্কার এই চিন্তার ভীষণ আক্রমণে, ঝড়ের মুখে কলাগাছের মতো একবার কেঁপে ভূমিসাৎ হয়ে গেল। মনে শুধু একবার ক্ষণিকের দ্বিধা জেগেছিল কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে দ্বিধা অতিক্রম করে মুক্ত-জল-স্রোতের মতো তার চিন্তাধারা ছুটল।

ক্ষমতাবান চিরকাল অন্যের উপর প্রভুত্ব করে। আবহমান কাল এই নীতি চলে আসছে। পশুজগৎ মনুষ্য-জগৎ কোথাও এ নিয়মের ব্যতয় ঘটে না। শক্তি, শক্তি, শক্তি চাই। নব জাগরণের আলোক দর্শনের আনন্দের মতো এই কথার চিন্তায় তার চোখদুটো এক অজ্ঞাত পুলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পাগলের মতো খানিক ছুটে হঠাৎ থেমে একবার নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে তারপর চারপাশে চোখ তুলে চেয়ে সে দেখলে। তার রুক্ষ দৃষ্টি হতে সে কী তীব্র ঘৃণার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে লাগল। তার মুখ এক দানবিক হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

দুই

ক্ষুধা, তখন আর তার ক্ষুধা ছিল না। মাথার মধ্যে তখন তার যে চিন্তার আগুন জ্বলছিল, তার তাপে তার আর কোনো চেতন ছিল না। সে আনমনে চলেছিল। পথ দিয়ে যারা চলছিল তারা মাঝে মাঝে সমরের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে তাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে মৃদু হেসে তাকে পাগল স্থির করে সরে যাচ্ছিল। ও সব দিকে কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল না। থাকলে হয়ত তাদের মুখের দিকে চেয়ে সে তাদের আক্রমণ করে বসত।

হঠাৎ তার চমক ভেঙে গেল একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে। একটু দাঁড়িয়ে একবার চারপাশ দেখতেই তার দৃষ্টি পড়ল, একটী লোক একঠোঙা খাবার নিয়ে চলেছে। হঠাৎ তার সুপ্ত ক্ষুধা জাগ্রত হয়ে গর্জন করে উঠল! সে ছুটে গিয়ে তার হাত হতে খাবারের ঠোঙা কেড়ে নিয়ে খেয়ে বাকিটা ছুড়ে ফেলে দিলে। লোকে পাগল ভেবে তাকে কিছু বল্লে না। সমর কিন্তু এ কথা ভাবলে না তার বিদ্রোহী আত্মা এই প্রথম বিজয়-গর্ব্বে একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অন্তরের মধ্যে একটা অর্দ্ধ তৃপ্ত হিংসার আনন্দ সতেজ হয়ে উঠল।

আবার সে চলতে আরম্ভ করলে।

কিছুদূর গিয়ে আবার তার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। এবারে চোখ চেয়ে দেখে, সম্মুখে এক বিরাট জনতা। একদল পুলিশ প্রহরী তাদের স্বাভাবিক কর্কশভাবে ছেলের দলকে বন্দী করছে। ছেলের দল নিশ্চেষ্টভাবে আপনাদের ধরা দিচ্ছে।

এ দৃশ্য দেখে তার চিন্তার ধারা ভিন্ন পথে ছুটল। প্রথম তার মনে হল, এতগুলো ছেলে আর এই কটা প্রহরী! এরা ত ইচ্ছা করলে এদের কজনকে টুঁটি টিপে ধ্বংস করতে পারে অথচ কোন উপায় অবলম্বন না করে এরা এমন নিশ্চেষ্ট ভাবে জড়ের মতো ধরা দিচ্ছে কেন? এর কারণ কি? এ রহস্য না, অভিনয়। তার চিন্তার জাল ভেদ করে তাকে চকিত ও চমকিত করে তুল্লে—একটা সমবেত কণ্ঠের উত্তেজিত উৎক্ষিপ্তস্বর—মহাত্মা গান্ধিজীকী জয়। প্রথম যাকে সে একটা নিশ্চেষ্ট জড়তা বলে স্থির করেছিল হঠাৎ তার মধ্যে-একটা বিরাট প্রাণের স্পন্দন, অটল গাম্ভীর্য্য ও গভীর মৌনতার সন্ধান পেয়ে সে বিস্মিত হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ মূঢ়ের মতো সে সেইদিকে স্থিরভাবে চেয়ে রইল। দলেদলে ছেলের দল তাদের কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হচ্ছে' আর অন্য এক বিরোধী দল তাদের বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা হাসি-মুখে শৃঙ্খলকে বরণ করে নিচ্ছে।

মনশ্চক্ষে তার ভেসে উঠল কারা প্রাঙ্গণের ছবি। শাস্তি, মিথ্যাদোষের শাস্তির গুরুভার বহন করে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বন্দীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে—স্থৈর্য্য, শৌর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ও শান্তির মূর্ত্তি ধরে। তাদের অতগুলো মূর্ত্তি ধীরে ধীরে একীভূত হয়ে একটী মূর্ত্তিতে পরিণত হয়ে এল। সে মূর্ত্তির মুখে কী গভীর শান্তি, চক্ষে বেদনার কী অসীম তৃপ্তি! সে মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে একটা পূর্ণতার ঔজ্জ্বল্য যেন ছড়িয়ে পড়ছে। নিজেকে সচকিত করে—মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে তুলনা করতে সে মূর্ত্তি কল্পনালোক হতে বিলীন হয়ে গেল।

তার চিন্তার ছবি এসে সাম্নে দাঁড়াল। একটা বিরাট আকারে প্রথমে যে স্বার্থের দেখা পেয়েছিল, সে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হয়ে এল। তার বিদ্রোহের সিঁদুর-মাখা পতাকার রঙ ক্রমশ ঝরে পড়ে শ্বেতাভ হয়ে এল। যেখানে সে রক্তের নদীর কল্পনা করেছিল, সেখানে স্নিগ্ধ নির্ম্মল নীল স্রোত বয়ে এল। ভস্মীভূত ধ্বংস-স্তূপের উপর নব হর্ম্ম্যরাজি মাথা তুলে দাঁড়াল।

আশ্চর্য্য হয়ে সে ভাবলে তার সেই বিদ্রোহী আত্মা কি নবগঠিত হর্ম্মরাজির তলে ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে সমাহিত হয়ে গেল। শান্তির দিনে এই নবগঠিত সৃষ্টির ভিতর কোথাও সে তার চিহ্ন খুঁজে পেলে না। শুধু দেখলে একটী শ্বেত মর্ম্মর স্তম্ভের উপর যুদ্ধে গতায়ু সৈনিকদের সঙ্গে তার নাম কলঙ্কের মতো ম্রিয়মাণ হয়ে আছে।

সে চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে মনে স্থির কর্লে—বেশ, তাই হোক। যে কোন প্রকারে সে তার সত্ত্বাকে জানিয়ে দেবে। একটা সন্ধানীর দৃষ্টি নিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে সে একবার চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে দেখলে।

তখনও পর্য্যন্ত প্রহরীর দল সমানে এই নির্ব্বিরোধ যুবকদের দলকে বন্দী করে চলেছে। তাদের দিক হয়ে, কোন প্রকার বাধা দান করা না হলেও প্রহরীর দল তা সত্ত্বেও তাদের প্রহার করতে দ্বিধা বোধ কর্চ্ছে না। সমর ছুটে গিয়ে প্রহারে-উদ্যত একটা প্রহরীর হাত থেকে তার বন্দীকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে ঠেলে ফেলে দিলে। মুহূর্ত্তে ব্যাপার গুরুতর হয়ে উঠল। চার পাশ হতে পুলিশ ছুটে এল তাকে ধরতে। প্রথম যে তাকে ধরতে এসেছিল তার হাত থেকে লাঠী কেড়ে নিয়ে তাকে সে এমন আঘাত করলে যে তার মাথা হতে ফিনিকি দিয়ে রক্ত ছুটে তাকে অর্দ্ধস্নাত করে দিলে। পালাবার উপায়ও ছিল না। বন্দী হয়ে তাকে থানায় যেতে হল। একটা ছোট ঘরে তাকে বন্ধ করে রাখা হল। তার দরজায় পাহারা দাঁড়িয়ে রইল। হাতের শৃঙ্খল কিন্তু মুক্ত হল না, হাতেই রয়ে গেল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সমর চুপ করে এক কোণে গিয়ে

তিন

কোর্টে বিচার চলেছে। সমর কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে দর্শকদের দিকে চেয়েছিল। কিন্তু যে তার বিচার কর্চ্ছিল তার দিকে একবারও সে চায় নি। একজন উকিল স্বেচ্ছায় তার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার জন্যে কি কর্চ্ছিলেন না কর্চ্ছিলেন তা দেখা সে প্রয়োজন বোধ করেনি। কত সাক্ষী তার পক্ষে কত বা তার বিপক্ষে বলে গেল, কিছুরই সে প্রতিবাদ করেনি।

তার দিকে অনেকেই চেয়েছিল, সে কিন্তু কারুরই দিকে বিশেষ ভাবে তাকায়নি। লোকে যেমন উদাসভাবে আকাশের নীলিমার দিকে চেয়ে থাকে সমরও অনেকটা সেই ভাবে জনতার দিকে চেয়েছিল।

খদ্দর-পরা, খদ্দর-না পরা অনেকেই, বিশেষতঃ যুবকের দলই অধিকাংশ ভাবে তার বিচার-নাট্যের দর্শক। তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে তর্ক উঠছিল। তারি দু' চারটে কথা তার কানে যেতে সে চমকে উঠল।

একজন বলছিল—এমনধারা কাণ্ড যে হবে তা জানা কথা। কারণ অহিংসা অসহযোগ বলে কিছু থাক্‌তে পারে না। ও ব্যাপারটা "সোনার পাথর বাটীর" মতো একটা অসম্ভব জিনিষ। এবং তা জেনেও মহাত্মা গান্ধী যখন ওই নীতিই অনুসরণ কচ্ছেন তখন তার প্রত্যেক অঘটন ঘটনার জন্য তিনি দায়ী। মূলতঃ এ ব্যাপারের জন্য তিনিই দোষী!

সমর আশ্চর্য্য হয়ে গেল যে তার নিজের ব্যক্তিগত দোষের জন্য সাধারণে দায়ী কর্লে মহাত্মা গান্ধীকে অথচ তার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর কোনো সম্পর্কই নেই! তার অস্থির চিত্তের কার্য্যের জন্য নিন্দা-ভাগী হলেন মহাত্মা! একটা গ্লানিতে তার মন ভরে উঠল। একবার সে ভাবলে চীৎকার করে বলে—যে তার সঙ্গে মহাত্মার কোনো সম্পর্ক নেই। সে তাঁর শিষ্যও নয়। কিন্তু তাহলে লোকে তাকে পাগল ভাববে স্থির করে সে চুপ করে গেল। তার মনের মধ্যে যে জ্বালা ধরেছিল, তাতে সে অস্থির হয়ে উঠল। সে ভাবতে লাগল—তার দোষে মহাত্মার যে

বিচার তখন শেষ হয়ে গেছে। বিচারপতি তার দু'বৎসর কারাবাসের আদেশ দিলেন। বিচারপতি তাঁর রায় পড়ে গেলেন। সমরের কাণে কিন্তু তাঁর সব কথা প্রবেশ করেনি। শুধু তার যে দু বৎসরের শাস্তি হয়েছে এইটুকু জেনেই সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

এই শাস্তিভোগের মধ্যে সে তার প্রায়শ্চিত্তের পথ খুঁজে পেয়েছিল।

কাঠগড়া থেকে নামবার সময় একবার শুধু সে বিচারপতির দিকে চেয়েছিল—প্রায়শ্চিত্তের আনন্দে তার চোখ দুটো একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার পর আবার পূর্ব্বের মতো স্থির নির্ব্বিকারভাবে প্রহরীদের সঙ্গে সোজা কয়েদীদের গাড়ীতে সে চড়ে বসল।

দর্শকবৃন্দ তার এই নির্ব্বিকল্প মূর্ত্তির দিকে বিস্মিত চোখে চেয়ে রইল।

সশব্দে কয়েদীদের গাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

শ্রীভূপতি চৌধুরী।

স্পর্শ-রসিক

আমারে করেছে অন্ধ গন্ধ-ধূমে দেহ-ধূপাধার!
　মাদক সৌরভে তার চেতনা হারায়—
বিষ-রস পান করি' স্বাদ পাই স্বরগ-সুধার!
　—চির-বন্দী আছি তাই স্বপন-কারায়!
অন্ধ আমি, দেহ তাই স্পর্শে হাহা করে,
　ধরার ধূলায় তাই ফুল-রেণু ঝরে!
আলো—সে যে উষ্ণ শুধু, জানি কত শীতল আঁধার!
　—সর্ব্ব-অঙ্গ স্নান করে চুম্বন-ধারায়!

অন্ধ আমি, দিশে দিশে গন্ধ তাই করে দিশাহারা,
　চিরদিন মধু করে মধুর বঞ্চনা!
করাঙ্গুলি ক্ষত হয়— হেরি না যে কাঁটার পাহারা!
　দৃষ্টিহীনে করে সবে বৃথাই গঞ্জনা!
সে-বেদনা কণ্ঠে মোর গীত হয়ে বাজে,
　ব্যথায় বৃহৎ হ'য়ে সে ফুল বিরাজে!
অশ্রুজলে আর্দ্র হয় জীবনের এ মরু-সাহারা!
　প্রাণের পীরিতি মোর হয় নিরঞ্জনা।

অন্ধ আমি জাগি তাই সারারাত পরশ-পিয়াসে,
　শয়ন-শিয়রে মোর জ্বলে না প্রদীপ,
হেরি নাই মুখ তার, বুক শুধু বাঁধি বাহুপাশে,
　অঙ্গে অঙ্গে শিহরিয়া ফোটে কক্ষ নীপ।
　মিলন-রজনী মোর আঁধার শ্রাবণ—
　দুই দেহ-তটে সে কি দুরন্ত প্লাবন!
অন্ধ হয় অন্ধকার!—অন্ধ-আঁখি বিদ্যুৎ বিকাশে!
　সে মুহূর্ত্তে আমি যে গো মরণ-অধিপ!

স্নায়ুশিরা শততন্ত্রী ঝঙ্কারিছে প্রাণের হরষে,
　দীপহীন চিত্তে মোর দীপক-উল্লাস!
মিটাতে চাহিনা তৃষা নিস্তরঙ্গ অমৃত-সরসে,
　চাই মৃত্যু, চাই নব-জনম-আশ্বাস!
　দৃষ্টিপথে সৃষ্টি আরো হয় যে সুদূর!
　—দেহ করে আলিঙ্গন তবে সে মধুর!
আঁখি তাই মুদে আসে, তৃপ্ত যবে প্রিয়ের পরশে,
　—মিলে যবে বাহুপাশে নিশ্বাসে নিশ্বাস!

দেহী আমি, মন্দিরে মন্দিরে তাই পরশ-ভিখারী,
　দেবতারে স্পর্শ করি' করি যে প্রণাম!
ধরণীর স্পর্শ-মণি—মর্ম্মে আছে পরশ তাহারি,
　সে পরশে জড়-চিতে ভুলেছে সংগ্রাম!
　পরশ-রসিক আমি, অন্ধ আঁখি-তারা,
　আমার আকাশ তাই শশী-সূর্য্য-হারা!
পদতলে পৃথ্বী আছে আলিঙ্গন চৌদিকে বিথারি';
　আলো নাই, আছে শুধু প্রাণের

চয়ন

আমিষাশী উদ্ভিদ

আমাদের মধ্যে এমন অনেক নিরামিষাশী ব্যক্তি আছেন যাঁরা মৎস্য-মাংসাশী ব্যক্তির সহিত পংক্তি-ভোজন করতে ঘৃণায় আঁৎকে ওঠেন। এই সব নিরামিষাশী ব্যক্তি উদ্ভিদজ খান। তাঁরা যদি শোনেন যে উদ্ভিদরাই আবার আমিষাশী তা হলে তাঁরা কি করবেন জানি না! ফিলাডেলফিয়া ফার্ম্মাসির অধ্যাপক হেবার ইয়ংকেন মহোদয়ের মতে একটি নয় দুটি নয় প্রায় পাঁচ শ' রকমের উদ্ভিদ আমিষাশী। তারা শীকার ধরে তাদের পাতা দিয়ে। যেই শীকার পাতায় বসে অমনি তারা পাতায় আটক পড়ে যায়; তার পরই হজম হয়ে উদ্ভিদের শরীরে লয় পায়। Sundews, Flytrups, Pilcher-plants, Bludderworts এবং Butter-worts এই প্রকার উদ্ভিদের দলভুক্ত।

দস্তানার ইতিহাস

জুতো তৈরীর মত আধুনিক দস্তানা-ব্যবসার দু'টো প্রধান দিক আছে। একটি হচ্ছে নমুনা-মাফিক দস্তানার নক্‌শা ও ছাঁটকাট করা; অপরটি হচ্ছে সেলাই করা। আধুনিক জুতো ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে দস্তানার ব্যবসা ক্রমেই বেড়ে উঠচে। ১৮৫০ খৃঃ অব্দের পর হতে ছাঁচের সাহায্যে ছাঁটকাট করা সুরু হয়েছে। প্রায় এই সময় থেকেই জুতো-তৈরীও গবেষণার বস্তু হয়ে ওঠে।

আদিম কালের লোক হাতের আবরণ তৈরী করতে জান্‌তো এবং অনেক মিউজিয়মে তারে নানারূপ নমুনাও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সে-গুলি অধিকাংশই ছোট ছোট লোম-ওয়ালা জন্তুর চামড়া দিয়ে তৈরী করা এবং mitten এর (এক রকম দস্তানা, যা আঙুল-শুদ্ধ হাত ঢেকে রাখে) ধাঁচে গড়া। কি করে দস্তানা তৈরী করতে

দস্তানা তৈরীর সূত্রপাত হয়, কিন্তু সে সময় দস্তানার আঙুল-গুলি ভারী বেয়াড়া রকমে কাটা হতো; তাই দস্তানাগুলি হাতে বিশ্রী দেখাতো। প্রায় ১৮২০ খৃঃ অব্দে Vallet d' Artois নামে প্যারী সহরের একজন দস্তানা-নির্ম্মাতা সর্ব্বপ্রথম দস্তানার ছাঁটকাটের ছাঁচ আবিষ্কার করেন কিন্তু এর প্রচলন বড় বেশী হয় নি। Gloversville-এর Niles Fairbnnks এবং ফ্রান্সের Grenoble সহরের Xavier Jonvin ভিন্ন প্রকারের ছাঁচ আবিষ্কার করেন। নমুনা-মাফিক দস্তানার ছাঁটকাট করার ভিত্তিই এই সব ছাঁচ। এই ছাঁচের সাহায্যে ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের দস্তানা তৈরী হতে আরম্ভ হয়। কিছুদিন ধরে দস্তানা হাতেই সেলাই হতো; কিন্তু ১৮৫০ খৃঃ অব্দের পর Howe নামে সেলাই-এর কল বাহির হওয়ায় দস্তানা এ-যাবৎ কলেই সেলাই হচ্ছে। বেশভূষায় পরিপাটী লক্ষাধিক লোক বলেন যে উৎসবাদির সময় দস্তানা হাতে থাক্‌লে নাকি লোকের মর্য্যাদা বেড়ে যায় এবং বেশ-ভূষায় যেটুকু অপূর্ণতা থাকে সেটুকু পূর্ণতা লাভ করে!

এ সব দেখে মনে হয় যে জুতো-ব্যবসার মত দস্তানার ব্যবসাও লাভজনক হয়ে উঠত যদি খবরের কাগজে জুতোর বিজ্ঞাপনের ন্যায় দস্তানার বিজ্ঞাপন জাহির করা হতো।

কাঠ-বাঁকানো কল

একখানা চেয়ারের দিকে তাকালে তাতে কত না কাঠের টুক্‌রো জোড়া লাগানো হয়েছে, দেখতে পাই। এ সবের অধিকাংশই শক্ত করে লাগানো এবং শিরিষের উপর নির্ভর করে। যদি কেউ কিছু আবিষ্কার করতে চায় তাহলে চেয়ারে যাতে জোড় মোটেই না থাকে সেজন্য কাঠ কি করে বাঁকানো যায়, তাই তিনি চিন্তা করবেন।

কোন কেঠো কারিগর যদি নতুন উপায়ে আসবাব-পত্র

কাজ চলে যায়। এরূপ চেয়ার তা হলে প্রায় আদর্শ হয়ে দাঁড়াবে, কখনো ভাঙবে না বল্‌লেই চলে। বেয়াড়া ব্যবহার কর্‌লেও বেশ ট্যাকশই হবে। ভেঙে কিম্বা কোনও অংশ ছেড়ে যেতে সুরু কর্‌লেই কয়েক মুহূর্ত্ত spanner দিয়ে boltগুলি শক্ত করে দিলেই চেয়ারখানা আগের মত ঠিক হয়ে উঠবে।

কোনো কেঠো কারিগর যদি তার কাঠ কল দিয়ে সোজা কর্‌তে পারে এবং তারপর বাঁকিয়ে ইচ্ছামত আকারে গড়তে পারে তাহলে তার প্রতিযোগীদের চেয়ে সুযোগ-সুবিধা তার বেশী দাঁড়ায়। সরল কাঠ যদি কল দিয়ে ইচ্ছামত তাড়াতাড়ি বাঁকাতে পারে তাহলে কাঠ কুঁদে আবশ্যক-মত বাঁকা আকারে নিয়ে যেতে তার যা খরচ পড়ত সে খরচের চেয়ে কম খরচ তো পড়বেই তার উপর তার বিশেষ লাভও হবে উপরন্তু অনেকটা সময় বেঁচে যাবে।

যুদ্ধের আগে অষ্ট্রিয়ানরা কাঠ বাঁকানোর জন্য প্রচুর অর্থ ও সময় নিয়োগ করেছিল এবং এতে যথেষ্ট সাফল্যও লাভ করেছিল। এতে তারা এতদুর কৃতকার্য্য হয়ে উঠেছিল যে তারা ইউরোপে চেয়ারের ব্যবসা একরকম একচেটে করে ফেলেছিল।

কাঠ বাঁকানোর তিনটি প্রণালী আছে। প্রথমটি হচ্ছে মামুলি প্রথানুযায়ী কাঠটাকে কুঁদে আবশ্যক মত বাঁকানো আকারে নিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয়টি—এমন যন্ত্র ব্যবহার কর্‌তে হবে যাতে নাকি বাঁকানোর দরুণ কাঠের উপর বাঁকানোর সময় ভেঙে যাওয়ায় যে চাপ পড়ে সেটা না পড়ে। তৃতীয়—কাঠটাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে যে কাঠ বেঁকবে কিন্তু মোটেই ভাঙ্‌বে না।

ব্লাকমান সাহেব আমেরিকার Hardwood Record নামক পত্রিকায় লিখেচেন যে তিনি কুড়ি মিনিট ধরে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কুড়ি পাউণ্ড বাষ্পের চাপ থেকে আরম্ভ করে ষাট পাউণ্ড পর্য্যন্ত চাপ দিয়ে দেখেচেন যে ৪৫ পাউণ্ডে সব চেয়ে ভাল ফল দাঁড়ায়। এতে কাঠ এমন নরম হয় যে তখন তাকে ইচ্ছামত বাঁকানো যায় এবং যদিও ওপরটা সামান্য শক্ত হয়ে ওঠে তবু তত শক্ত হয় না যাতে শক্ত হওয়ার দরুণ আর শিরিষ করা যেতে পারে না।

জুতোর রঙ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী

বোষ্টনের কোপ্লি প্লিজা হোটেলে ১৬ই অক্টোবর তারিখে Boston Boot & Shoe Club এর যে সভা হয়েছিল তাতে নিউ-ইয়র্কের Textile Color Cord Association-এর শ্রীমতী মার্গারেট্ হেডেন্ রুঙ্ক ১৯২৪ সালে জুতোর কি কি রঙ লোকের পছন্দ হবে সে সম্বন্ধে এক ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। তিনি রঙের যথাযোগ্য নামকরণ এবং আগামী বছরে কোন্ কোন্ রঙ লোকের পছন্দ হতে পারে সে সম্বন্ধে বরাবরই ভবিষ্যৎবাণী করে থাকেন। তিনি এই ভবিষ্যৎবাণী করলে তবে কারিগর ও বিক্রীওয়ালারা সে সব রঙ চালাবার জন্য একযোগে কাজ কর্‌তে থাকে।

তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেছেন যে আমরা সব সময়ই রঙ সম্বন্ধে চিন্তা করে থাকি ; তার কারণ ফ্যাসান ও মাল বিক্রী রঙের উপর নির্ভর করে। ষ্টাইল এবং রঙ এ দুটো হচ্ছে এ ব্যবসার আসল জিনিষ। আজকাল জুতো মহিলাদের পোষাক-পরিচ্ছদের এক প্রধান অঙ্গ। আধুনিক ফ্যাশানের যত সুন্দর লক্ষণ আছে, জুতো তাদের মধ্যে একটি। যতদিন আমরা রঙ লোকের পছন্দমাফিক করে তুলতে পারবো ততদিন জুতোর ব্যবসায় লাভ খুবই হতে থাক্‌বে। সবার আগে ত থাক্‌বেই ; তার উপর চিরদিনই বড় বড় ব্যবসার মধ্যে গণ্য হবে।

তিনি বলেন যে পৃথিবীর মধ্যে The Textile Color Cord Association এক অসাধারণ সভা। কারণ ব্যবসার যত প্রকার রঙ্ আছে সে সব এই সভাই আদর্শানুযায়ী করে তোলে। কেবল, যে ইউনাইটেড্ ষ্টেটসে এই রঙের ভাষা ব্যবহৃত হয়, তা নয়, আজকাল সাতাশটি বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ক্রমেই বেড়ে চলেছে। রঙের এইরূপ আদান-প্রদান ব্যবসার পক্ষে ভারী মূল্যবান্ অর্থাৎ বড় বড় Association থেকে রঙ বের হবার পর সে সব রঙ আগামী বছরের মত সবার কাছেই আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্যই আমেরিকান মহিলারা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত।

তিনি আরও বলেন যে তাঁর Association এ বিষয়ে যা করে তা সবাই মেনে নেয়। এ ব্যবসার প্রত্যেক

শাখার জন্য কি কি রঙ খাটে তার ব্যবস্থা তাঁরাই দিয়ে থাকেন। ১৯২৪ সালে কোন্ কোন রঙ লোকের পছন্দ হতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁরা গত বছর ধরে চিন্তা করচেন।

এখন জুতোর বাজারে কালো রঙ্ সব চেয়ে বেশী আধিপত্য করচে। রঙের আসরে সাদা রঙ আবার নাচ্‌বে। বাদামি রঙ সব চেয়ে বেশী চটকদার হয়ে উঠবে। নীল রঙ লোকের ভারী পছন্দ হবে। আমি দেখচি যে ফিকে ও মাঝারি বাদামি রঙ লোকের মনে লাগ্‌বে। কালো রঙ বাদ দিলে বাদামির বিক্রী সব চেয়ে বেশী, তা আমাদের জানা আছে। পাঁশুটে রঙও কিছু কিছু চল্‌বে। ফ্যাশানের উপর পাঁশুটে রঙের আধিপত্য আছে বলে পাঁশুটে রঙ্ সব সময়েই কিছু কিছু থাকবেই। ইউরোপের ফ্যাশান আমেরিকার ষ্টাইলের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

— —

কৃত্রিম উপায়ে জমি উর্ব্বর করা

রাসায়নিক পদার্থ এমন অনেক আছে যুদ্ধের সময় যাদের বিশেষ উপকারিতা দেখা গেছে, শান্তির সময়েও ব্যবসার পক্ষে তাদের উপকারিতা ঠিক তেমনিই।

তাহলে Synthetic Ammonia কিম্বা Ammonium Sulphate দেশের কি উপকারে আসে? Ammonium Sulphate এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ জমিতে সার রূপে ব্যবহার করলে ফসলের কিরূপ উন্নতি হয় তা দেখ্‌লেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। কৃত্রিম উপায়ে যে সব জিনিষ দিয়ে জমির উর্ব্বরতা বাড়ানো যায় তাদের পিছনে টাকা খরচ কর্‌লে সত্য সত্যই সে টাকা নষ্ট হয় না; উপরন্তু হিসাব করে দেখলে দেখি কমই খরচ হয়। এ সহজ সত্যটি আজকাল কৃষকগণ বুঝচে কিন্তু নিশ্চিতরূপে ধরতে পারছে না। Ammonium Sulphate এর আজকালকার চাহিদা দশ বছরের আগেকার চাইতে দশগুণ বেড়ে গেছে। অপর দিকে দেশে চাহিদা বেড়ে গেছে বলে রপ্তানি ব্যবসার যে ক্ষতি হচ্ছে না তা মোটা-

চেয়ে উদ্যোগী জার্ম্মানী। সেই জার্ম্মানী প্রতি একর জমিতে যত Sulphate সার-রূপে ব্যবহার করে তার প্রায় অর্দ্ধেক আমেরিকা ব্যবহার করে। বর্ত্তমানে জমির যেরূপ উর্ব্বরতা আছে তা অনন্তকাল ধরে অটুট থাক্‌বে না, এবং তা থাক্‌তেও পারে না। যে সব জমিতে এখনো লাঙল চলেনি, সে সব জমি প্রথম প্রথম খুব ফসল দেবে কিন্তু শীগ্‌গির সে সব জমিতে nitrogen ও অন্যান্য প্রকারের সার দিয়ে জমির উর্ব্বতা বাড়িয়ে তুল্‌তে হবে।

জমিতে পর্য্যাপ্তরূপে সার দিলে কি লাভ হয় তার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি বিবরণ উদ্ধৃত করা যাক। Nitrogen, potash এবং phosphate—জমির যা দরকারী সার—সে দিকে নজর দেওয়ার দরুণ জার্ম্মানীতে প্রতি একর জমিতে ত্রিশ বছরে উৎপন্ন রাই ১৫ বুশেল (প্রতি বুশেল প্রায় ৴৯॥০ সের) থেকে ২৯ বুশেল পর্য্যন্ত বেড়েছে। এদিকে আমেরিকায় প্রায় একরূপই আছে যথা:—১৪ বুশেল থেকে ১৬ বুশেল বেড়ে উঠেছে। জার্ম্মানীতে গড়-পড়তা ৩০ বছরে ১৯ বুশেলের জায়গায় ৩০ বুশেল গম উৎপন্ন হচ্ছে; অপর দিকে আমেরিকায় ১৩ বুশেল থেকে ১৫ বুশেল প্রতি একর জমিতে উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ প্রতি একরে মোটে ২ বুশেল গম বেশী পাওয়া গেছে। আলু দুটো দেশে যথাক্রমে উৎপন্ন হয়—১১৫ থেকে ২০০ এবং ৯৮ থেকে ১০০ বুশেল। অন্যান্য ফসল সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

পঁচিশ বছর আগে প্রতি একর জমিতে গড়-পড়তা ১৩ বুশেল গম হত। এখন প্রতি একর জমিতে এক হন্দর Ammonium Sulphate এবং ২ হন্দর Superphosphate সার দিলে ২৩ বুশেলের জায়গায় ৬০ বুশেল উৎপাদন করা সম্ভবপর এবং প্রায়ই এরূপ পাওয়া গেছে। ১৯টি কৃষিকেন্দ্র থেকে তিন বছরের যই চাষের যে বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে—৪১.২৫ বুশেল যই এবং ২৮.২৫ হন্দর খড় উৎপন্ন হয়েছে; superphosphate এর সার দেওয়ায় দাঁড়িয়েছে—৪৩.৫ বুশেল এবং ২৯.৫ হন্দর; superphosphate এবং kainite এর সার দিয়ে

পরিমাণ—superphosphate এবং kainite (২ হন্দর প্রতি একর জমিতে) ও উপরন্তু ৮৭ পাউণ্ড Ammonium sulphate দেওয়ায় যই ওখড় উৎপন্ন হয়েছে ৪৫.৫ বুশেল এবং ৩৮.৫ হন্দর।

পৃথিবীর তিনটি বৃহৎ লাইব্রেরী

পৃথিবীতে তিনটি বড় লাইব্রেরী আছে। এই তিনটীর মধ্যে বড় হচ্ছে—ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরী ; এতে বই আছে চল্লিশ লক্ষ। প্যারী সহরের The Bibliotheque Nationale হচ্ছে দ্বিতীয়। এর বইএর সংখ্যা হচ্ছে—ত্রিশ লক্ষ। ওয়াশিংটন সহরের The Library of Congress হচ্ছে তৃতীয়। তাতে বই আছে পঁচিশ লক্ষ।

বিকেল ৬ টার পর কালো জুতো

আমেরিকায় এক নয়া সংস্কার হয়েছে যে বিকেল ছ'টার পর কেবল কালো জুতো পরা সমীচীন। এই কারণে কালো জুতোর এত আদর। এই সংস্কারের প্রথম প্রচলন হয় কালিফর্ণিয়ার জুতো-পাইকারদের মজলিসে। জুতোওয়ালারা (shoe-men) এই ফ্যাসান প্রথম চালায়। এমন কি এই মজলিসের একটা বৈঠকেএরূপ ইঙ্গিত নাকি করা হয়েছিল যে কালিফর্ণিয়ার ব্যবসাদারদের সভায় যদি কোন সভ্য বিকেলে ৬টার পর কালো জুতো ছাড়া অন্য রঙের জুতো পরেন তা'হলে তাঁকে জরিমানা দিতে হবে পরে দেশে এই সংস্কার ছড়িয়ে পড়ে এবং তার ফলে জুতোর ব্যবসাদাররা সান্ধ্য ব্যবহারের জন্য নানা প্রকার পেটেন্ট (patent) ও বাছুরের কিম্বা ছাগলছানার চামড়ার ফ্যাকাশে কালো জুতো চালাচ্ছে।

১৫৩ বছর বয়সের জুতো

ওয়াশিংটনে শ্রীমত চার্লস্, এন, বেক্উয়িথের এক জোড়া জুতো আছে, তার বয়স ১৫৩ বৎসর। স্কটল্যাণ্ডের গ্রীনক সহরে এই জুতো-জোড়া কেনা হয়েছিল। তাঁর ছেলে এই সেদিন এই জুতো জোড়া পরেছিলেন। এই ছেলেটির আগের চার পুরুষ নাকি এই জুতো-জোড়া পরে গেছেন ! আলমারিতে তুলে রাখ্‌লে কোন্ না আরও পাঁচ ছ' পুরুষ একবার করে পরে জুতোর বয়স বাড়িয়ে তুল্‌বে।

পাতি লেবুর উপকারিতা

পাতি লেবু আমাদের দেশে সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। গাঁয়ে এমন গৃহস্থ নেই যার বাড়ীতে পাতি লেবুর একটা না একটা গাছ আছে। এর উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু না কিছু সবাই জানে। ভাতে পাতি লেবুর রস বেশ রুচি-কর। লেবুর রস চিনির সরবৎকে অম্ল-মধুর করে তোলে। আজকাল ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে বিভিন্ন প্রকারে অসুখের পক্ষে পাতি লেবু ছাড়া অন্য কোন ফল এত উপকারী নয়। দামও খুব কম। যাদের বাড়ীতে গাছ আছে তাদের তো মূল্যই লাগে না, উপরন্তু বিক্রী করে বেশ দু'পয়সা পেতেও পারে! লেবুর ব্যবসা আজকাল কম লাভজনক নয়। অন্যান্য ফলের গাছের মত এর তত যত্নও নিতে হয় না ; বর্ষাকালে চারা পুঁতে দিলে আর দেখতে হয় না। এ গাছ বাঁচেও অনেক দিন। লেবুর কলম করে বছরে বেশ দু'পয়সা রোজকার করা চলে কাগজি লেবুও বাজারে বেশ চড়া দামে বিক্রী হয়। এ তো গেল উপার্জ্জনের কথা।

ডাক্তারদের মতে ডিপ্‌থেরিয়া (Diphtheria) রোগে ও গেঁটে বাতে পাতি লেবু বিশেষ উপকারী ; বহুমূত্র রোগের প্রতিষেধক। বাতের দরুণ গাঁট ফুলে গেলে ডাক্তাররা প্রায়ই লেবুর রস খেতে উপদেশ দেন। অম্বলের অসুখে কিম্বা পেটের অসুখে ত আমরা প্রায়ই লেবু ব্যবহার করে থাকি এবং সুফল পাই।

কয়েক ফোঁটা করে লেবুর রস ঠাণ্ডা জলে দিয়ে খেলে চোখের জ্যোতি বাড়ে। শীতের দরুণ হাত-পা জ্বালা করলে কিম্বা ক্ষত হলে লেবুর রস ধন্বন্তরির কাজ করে। যদি প্রত্যেকে সকালে কিছু না খাওয়ার আগে এবং চা-খাওয়ার বদলে একটা করে লেবুর রস খায় তাহলে জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি শীগ্‌গির দেখতে পাওয়া যাবে।

আঠারো ও উনিশ শতাব্দীতে হাজার হাজার বৃটিশ

নাবিক কাউরের ঘায়ে একেবারে মরণাপন্ন হয়ে উঠেছিল। তারা ভেবেছিল চূণে এই ঘায়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে। কিন্তু তাতে তাদের কিছুই হয়নি। শেষ এই পাতি লেবু হাজার হাজার নাবিকের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলে।

স্নিগ্ধ হওয়ার ও ক্লান্তি দূর করার জন্য আমরা সরবৎ কি লেমোনেড বা যত রকম পানীয় ব্যবহার করি লেবুর রস তাতে যে কোন আকারে থাকবেই থাকবে। সাহেবদের হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডী, জিন্ এবং অন্যান্য প্রকার মদের সঙ্গে পাতি লেবুর রস বেশ মিশ খায়।

লেবুর কোন অংশ ফেলা যায় না। আমরা রসটা নিংড়ে নিয়ে খোসাটা ফেলে দিই। কিন্তু রসের ন্যায় খোসাও ভারী মূল্যবান। খোসা থেকে তে- কিম্বা আরক বার করা যায়। পাশ্চাত্য দেশে রন্ধন-কার্য্যে এর খুব চল্তি এবং আজকাল নাকি সব পাচকই লেবুর খোসা ব্যবহার করে। খোসাকে চিনিতে পাক করে কেক (cake) তৈরী করা হচ্ছে।

এই লেবু গাছের আবার একটা বিশেষত্ব আছে। বছরের সব সময়ই লেবু হয়। একই সময়ে ফুল ধরেছে, কচি কচি লেবু হচ্ছে এবং লেবু পাকছেও। আমাদের দেশে পাতি লেবুর খোসা সবই ফেলা যায়। কোন রাসায়নিক যদি এই খোসাকে পাশ্চাত্য দেশের মত কাজে লাগাবার পন্থা বলে দেন তো দেশের খুবই উপকার হবে এবং ব্যবসার পক্ষেও একটা নতুন পথ খুলে যাবে।

শ্রীশশিভূষণ বারিক।

অজানা নগরের কাহিনী

পৃথিবীতে এখনো এমন কয়েকটী নগর আছে আজ পর্য্যন্ত যেখানে কোন শ্বেতাঙ্গ বা বিদেশী ঢুকিতে পারে নাই এবং যাহাদের কাহিনী আজও প্রগাঢ় রহস্যে আবৃত। যেমন 'সিস্থুয়ান' (Sheshuan) নগর। ইহার অবস্থান উত্তর আফ্রিকায় মরক্কো প্রদেশে। মুরেরা ইহাকে পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া মনে করে। পাছে কোন কৌতুহলী শ্বেতাঙ্গ সহরের ভিতরে লুকাইয়া ঢুকিয়া পড়ে সেই ভয়ে মুরেরা চারিদিকের আট-ঘাটে কড়া পাহারা বসাইয়া রাখিয়াছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তি দেশীয় বাসিন্দার ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া সহরগুলির ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু তাহার সৌভাগ্যক্রমে আসল সহরের ভিতর প্রবেশ করিবার আগেই তাহাকে আবার ফিরাইয়া দেওয়া হয়। নচেলে সহরের ভিতর ঢুকিবার পর যদি কোন গতিকে তাহার আসল পরিচয় জাহির হইয়া পড়িত তবে নিশ্চয়ই তাহাকে আর জীবন লইয়া বাহিরে ফিরিয়া আসিতে হইত না।

ভারতের আসাম প্রদেশের সীমান্তে মিশমী জাতিদের নিবাস। তাহারা অত্যন্ত রণপ্রিয়। সেখানে গিরি পদম্ নামে একটি দুর্গম পার্ব্বত্য নগর আছে যাহার সিংহদ্বারে অদ্যাবধি কোন শ্বেতাঙ্গ মাথা গলাইতে সাহস করে নাই। মিশমীদের দেশে আরো আর দুইটী রহস্য-নগরী আছে, তাহাদের নাম 'রিমা' ও 'টোয়াং'। 'নীডহ্যাম্' নামে একজন মাত্র ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ফকিরের ছদ্মবেশে কোন ক্রমে 'রিমার' ভিতরে একবার ঢুকিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু 'টোয়াং' নগরে এখনো কোন শ্বেতাঙ্গের ছায়াও পড়ে নাই।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

চোখের মায়া

খুকীর চোখের চাওয়া না ত'
খুকীর চোখের মায়া ;
শরৎ-আকাশ—হর্ষ, আবার
অভিমানের ছায়া!

ফেরার পথে মাঝে মাঝে
বর্ষা ফিরে তাকায় পাছে,
হাসির হেমে অশ্রু-মোতি
লুটায় নির্দোষ কায়া!

প্রত্যর্পণ

তার নাম ছিল ষ্টেন্, বাচ্ছা ষ্টেন!

প্যারির ছেলে সে, রোগা, ময়লা। তার বয়স দশও হতে পারে, পনেরোও বলা চলে! এ-সব সহুরে ছেলের বয়স আন্দাজ করা কঠিন। তার মা ছিল না, বাপ জাহাজের খালাসীর কাজ ছেড়ে এখন সহরের একটা বাগানে দরওয়ানী করত। ছোট ছেলে-মেয়েরা, তাদের ঝারা, ঠেলা গাড়ী-চড়া বুড়ো স্ত্রীলোকেরা, সহরের রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে যারা ঘাসের ওপরে বেড়াতে খেলতে বা ফুলের শোভা দেখতে আসত, তারা সকলেই বুড়ো ষ্টেন্‌কে চিনত আর ভালও বাসত। তারা জানত যে ওই খোঁচা-খোঁচা গোঁফের পিছনে মধুর, স্নেহসিক্ত এমন মৃদু হাসি লুকানো আছে, যে হাসি সর্ব্বক্ষণ সকলকে অভিবাদন জানাতো।"

সে তার ছেলেকে এত ভালবাসত! তার আনন্দের আর সীমা থাকত না, যখন বৈকালে স্কুলের ছুটীর পর তার ছেলে তার কাছটিতে আসত, আর তারা দুজনে বাগানের ধারের রাস্তায় বেড়াত; আর প্রত্যেক বেঞ্চের সুমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বেঞ্চের অধিকারীদের সঙ্গে গল্প করত।

কিন্তু জর্ম্মানদের প্যারি-অবরোধের সঙ্গে সঙ্গেই সব বদলে গেল। ষ্টেনের বাগানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ হলো। বাগানটি কেরোসিনের টিনের গুদামে পরিণত হলো। বেচারাকে সারাদিন সেখানে পাহারা দিতে হত—সারাদিন সে না পারত একবার চুরুট খেতে, না তার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। এই সব কারণে জর্ম্মানদের নাম শুনলেই তার গোঁফ রাগে ফুলে উঠত। বাচ্ছা ষ্টেনের বরং এই নূতন জীবন ভালই লাগছিল। অবরোধ! ছোট ছেলেদের পক্ষে এর চেয়ে মজার ব্যাপার আর কি হতে পারে! স্কুল বন্ধ! পড়াশুনা নেই! সর্ব্বক্ষণই ছুটী আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো!

সে সারাদিন বাহিরে ঘুরে বাসায় ফিরত সন্ধ্যার পরে। সে সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত, বিশেষতঃ যাদের ব্যাণ্ড ছিল ভাল। এ বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল গভীর। সে এক নিশ্বাসে বলে যেতে পারত, কোন্ দলে কটা বাঁশী, কটা ড্রাম।

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতে একটা ঝুড়ি নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকত, কসাই আর রুটীওয়ালার দোকানের সামনে,—সেখানে শীতে কাঁপতে-কাঁপতে লোকে গল্প-গুজব করত, যুদ্ধের কথা আলোচনা করত কিন্তু কোন বিষয়ে কোন খবর জানবার দরকার হলে, তারা জিজ্ঞাসা করত বুড়ো ষ্টেনের ছেলেকে। কিন্তু এই সব গল্পের চেয়েও তার ভাল লাগত গ্যালোস্ খেলা দেখতে। সে সময়ে এই নূতন ধরণের জুয়া খেলার খুবই রেওয়াজ ছিল। সময় পেলেই বাচ্ছা ষ্টেন এই খেলার আড্ডায় গিয়ে হাজির হত। অবশ্য সে নিজে খেলত না—খেলায় পয়সা লাগে অনেক, সে পয়সা তার ছিল না। সে কেবল সকলকে খেলতে দেখত। তখন তার চোখ এমন জ্বলত! একটি নীল জামা-পরা ছোকরাকে তার খুব ভাল লাগছিল। সে পাঁচ ফ্রাঁর কম বাজী রাখত না, আর পকেটে সর্ব্বদাই টাকা তার ঝম্-ঝম্ করত। একদিন সে বাচ্ছা ষ্টেনকে চুপি চুপি বললে—"কিরে, আমার টাকা দেখে তোর জিভে জল পড়ছে দেখছি। যদি চাস্ তো আমি তোকে টাকা কোথায় পাওয়া যায় বলে দিতে পারি।"

সেদিন খেলা শেষ হবার পর সে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে যে যদি সে তার সঙ্গে জর্ম্মানদের কাছে খবরের কাগজ বেচতে যায়, তাহলে প্রত্যেক বারে ত্রিশ ফ্রাঁ সে পাবে। শুনেই সে ভারি চটে গেল, বললে যে, তার দ্বারা এ কাজ হবে না। তিন দিন সে জুয়ার আড্ডায় এল না। তিনটি ভীষণ দিন। সে ঘুমায়নি, খায়নি। রাত্রে সে চোখ বুজলেই দেখতে পেত, সেই জুয়ার আড্ডা আর চক্‌চকে ফ্রাঁর স্তুপ। লোভ সামলানো দুঃসাধ্য! তাই চতুর্থ দিনে সে আড্ডায় এসে তার প্রস্তাবে রাজী হল।

তার পরদিন খুব ভোরেই তারা যাত্রা করল, একটা প্রকাণ্ড চটের থলে পিঠে ফেলে আর খবরের কাগজ জামার

নীচে লুকিয়ে। তারা যখন সহরের ফটকের কাছে উপস্থিত হল, তখনো ভালো আলো ফোটেনি। ঢেঙ্গা ছেলেটি ষ্টেনের হাত ধরে, ফটকের শান্ত্রীর কাছে এগিয়ে গিয়ে ভিখারীর মত কাঁদ-কাঁদ ভাবে বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগল—"রাজা বাবা, আমাদের খেতে দিন বাবা। বাপ আমাদের নেই, মা অসুখে ভুগছে, আমি আমার ভাইকে নিয়ে মাঠে আলু তুলতে যাচ্ছি।" সে কাঁদতে লাগল। ষ্টেন লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইল। শান্ত্রীর মন ভিজল, সে একবার জনহীন রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললে—"যাও, শীগ্‌গির বেরিয়ে যাও।"

ফটক থেকে একটু দূরে গিয়ে বড় ছোকরা তখন কি হাসিই হাসতে লাগল।

সহরের বাহিরে সর্ব্বত্রই সৈন্যদের ছাউনি। কোথাও কামান সাজানো রয়েছে, কোথাও বন্দুকের গাদা, কোথাও একদল সৈন্য আগুনের চারিধারে বসে হাসি-তামাসা করছে। বড় ছোকরাটি পথ-ঘাট বেশ ভাল রকমই জানত, কিন্তু খুব সতর্ক হয়ে চললেও একদল শান্ত্রীর সুমুখে তারা পড়ে গেল। তারা একটা রেল-রাস্তার পাহারায় ছিল। এখানে কান্না-কাটি বিফল হল। তারা যেতে দিলে না। কিন্তু তাদের কান্না শুনে একজন বুড়ো সার্জ্জেণ্ট, অনেকটা ষ্টেনের বাপের মত দেখতে, রাস্তায় বেরিয়ে এসে বললে—"কি হে ছোকরা, এত কান্না কিসের? তোমাদের আলু কুড়োতে যেতে দেওয়া যাবে। এসো, ভিতরে আগুনে হাত-পা সেঁকে নাও। এ যে জমে যেতে বসেছ।" হায়, শীতে ষ্টেনের কাঁপুনি ধরেনি, সে কাঁপছিল লজ্জায়, ভয়ে। ঘরের ভিতরে অনেক সৈন্য বসে ছিল। তারা আগুনে হাত-পা সেঁকছিল আর বিস্কুট চিবুচ্ছিল। তারা ছেলেদের একটু জায়গা ছেড়ে দিলে আর তাদের বিস্কুটও খেতে দিলে।

এমন সময় একজন কর্ম্মচারী এসে চুপিচুপি সেই বুড়ো সার্জ্জেণ্টকে কি বললেন। সার্জ্জেণ্ট ঘরে এসে বললে—"ভাই সব, সুখবর। আজ রাত্রে কিছু দৌড়-ঝাঁপ করতে পারবে? আজ ওই বনের ডান ধার ঘেঁসে এগিয়ে শত্রুদের পশ্চিম থেকে হঠাৎ আক্রমণ করতে [illegible]

তারা টেরও পাবে না, হঠাৎ দেখবে আমরা তাদের চেপে ধরেছি।" আনন্দধ্বনিতে ঘর ভরে গেল। কেউ নাচ-গান সুরু করে দিল, কেউ তলোয়ার তুলে জয়ধ্বনি করতে লাগল। এই গোলযোগের সময় সুযোগ বুঝে ছেলে দুটী সরে পড়ল।

এবার তাদের সামনে এক মস্ত মাঠ। এই মাঠের ওপার থেকে শত্রুপক্ষের ছাউনি আরম্ভ। কোথাও তারা তার দিয়ে ঘিরেছে, কোথাও মাটিতে খাদ কেটে শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে। ষ্টেন বার-বার বলছিল—"ছেড়ে দাও ভাই, আমি ফিরে যাই। আর এগিয়ে কাজ নেই।" তার সঙ্গী বজ্র-মুষ্টিতে তাকে ধরে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই সে শিশ্‌ দিতে লাগল, কিছুদূর থেকে এই শিশের উত্তর শোনা গেল। কে একজন ভারি গলায় বললে—"এদিকে এস।" তখন তারা একটা খাদের ভেতর লাফিয়ে পড়ল। বড় ছেলেটি বললে—"এ আমার ভাই।" খাদের দুধারে মাটির পাহাড়, তার ওপর কোথাও শাবল কোদাল পড়ে রয়েছে, কোথাও গাছের গুঁড়ি। জর্ম্মান সৈন্যরা ছোকরা দুটিকে যেতে দেখে হাসতে লাগল।

খাদ বেয়ে তারা একটা বাগানের মধ্যে এসে উপস্থিত হল। এখানে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ঘরে ঘরে জর্ম্মানরা তাস খেলছে, কেউ বেহালা বাজাচ্ছে, কেউ বা তার তালে তালে নাচছে! রান্নাঘরে ভাল ভাল রান্না হচ্ছিল—এর সঙ্গে সেই ফরাসী শান্ত্রীর খাদ্যের দৈন্যের কত পার্থক্য! মনে হলো, যেন এরা যুদ্ধ করতে আসেনি, বনভোজন করতে এসেছে। ছেলেদের দেখে তারা স্ফূর্ত্তিতে চেঁচিয়ে উঠল। খবরের কাগজ বার করতেই তারা প্রত্যেকে দাম দিয়ে কিনতে লাগল। বড় ছোকরা তাদের সঙ্গে অকথ্য ভাষায় হাসি-তামাসা করতে লাগল। ছোট ষ্টেনেরও কথা কইবার ইচ্ছা হচ্ছিল খুব, সে যে নেহাৎ বোকা নয় তার পরিচয় দিতে মন অস্থির হয়ে উঠছিল, কিন্তু কি কারণে তার গলা থেকে স্বর ফুটল না। তার সুমুখেই বসেছিলেন একজন প্রৌঢ় জর্ম্মান। তিনি [illegible]

করছিল সস্নেহ তিরস্কার—যেন তাঁরও ঘরে ষ্টেনের মত একটি ছেলে আছে, আর তিনি যেন ভাবছিলেন—আমার ছেলে এমন জঘন্য কাজ করবার আগে যেন আমি মরি! সেই মুহূর্ত্ত থেকেই ষ্টেনের মনে হলো যে একটা হাত যেন তার গাল টিপে ধরেছে, নিশ্বাস ফেলতে দিচ্ছে না।

এই যাতনা ভোলবার জন্য সে মদ খেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে পৃথিবী তার চারিদিকে ঘুরতে লাগল। তার কাণে অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছিল, তার বন্ধু ফরাসী সৈন্যদের নিয়ে ব্যঙ্গ করছে, আর জর্ম্মানরা তাতে খুব উৎসাহ দিচ্ছে আর হাসছে। তারপর তার নেশা ছুটে গেল যখন সে শুনলে, যে তার বন্ধু জর্ম্মানদের সাবধান করে দিচ্ছে ফরাসীদের সেই আক্রমণের কথা বলে। সে লাফিয়ে উঠে বললে—"না, না, আমি এতে নেই!" সকলে হেসে উঠে তার কথা চাপা দিলে। এমন সময় কে একজন এসে বললে—ছোকরারা এখন সরে পড়।

বড় ছেলেটি নবাবের মত বুক ফুলিয়ে তার টাকা বাজাতে বাজাতে চলল, আর তার পিছনে ঘাড় হেঁট করে চলল ষ্টেন! সেই প্রৌঢ় জর্ম্মান পাশ দিয়ে যাবার সময় ষ্টেনের মনে হল যেন তিনি বললেন—"ছি ছি, এ কাজ ভাল নয়।" ষ্টেনের চোখে জল এল।

মাঠে পড়েই তারা দৌড়ুতে লাগল। তাদের পিঠে জর্ম্মানদের দেওয়া এক-বস্তা আঙুর ছিল। তারা সেই মাঠটা পার হল। ফরাসীরা রাত্রের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল; সৈন্যরা জমায়েৎ, তারা গোলাগুলি ঠিক করে নাচ্ছিল। সেই সার্জ্জেন্ট ছেলেদের চিনতে পেরে একটু হাসলেন; এই মৃদু হাসি ষ্টেনের বুকে যেন ছুরি চালিয়ে দিলে। একবার তার ইচ্ছা হল সে চেঁচিয়ে বলে—"তোমরা আজ আক্রমণ করো না, আমরা ওদের খবর দিয়েছি।" কিন্তু ভয়ে সে তা' পারল না!

সহরের মধ্যে যখন তার সঙ্গী তাকে ছেড়ে চলে গেল, তখন তার পকেট কত ভারি মনে হল, যে হাতটা তার গলা চেপে ছিল, তার মুঠো যেন আবার দৃঢ় হয়ে উঠল। প্যারির চেহারা যেন বদলে গেছে রাস্তার লোকগুলো যেন তার দিকে সন্দেহের চোখে চেয়ে রয়েছে! "চর"—এই শব্দটি গাড়ীর চাকার ঘড়ঘড়ানিতে সে শুনতে পেলে, সৈন্যদলের ব্যাণ্ডে যেন ওই কান্নাই বেজে-বেজে উঠছে! বাড়ী পৌঁছে সে খুব খুসী হল, তার বাপ তখনও আসে নি দেখে। সে তার ঘরে গিয়ে বালিশের নীচে টাকার তোড়াটা লুকিয়ে ফেললে।

যখন বুড়া ষ্টেন বাসায় ফিরলো, তখন তার স্ফূর্ত্তির সীমা নেই। চারিদিক থেকে যুদ্ধে সাফল্যের সংবাদ পাওয়া গেছে। খেতে খেতে বুড়া সৈনিক ঘরের কোণে ঝোলানো তার বন্দুকটি দেখে বলে উঠল,—"তুমি যদি আর একটু বড় হতে বাবা, কি বেগেই তুমি জর্ম্মানগুলোকে না আক্রমণ করতে!"

আটটার সময় তোপের শব্দ শোনা গেল।

"ওঃ, আজ রাত্রের সেই আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেছে।" বাচ্ছা ষ্টেনের মুখ শুকিয়ে গেল। ক্লান্ত হয়েছে এমনি ছল করে সে শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুম হলো না। তোপের শব্দ তখনও শোনা যাচ্ছিল। সে ভাবতে লাগল, এতক্ষণ বোধ হয় ফরাসীরা অন্ধকারে জর্ম্মানদের অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করতে এসে, নিজেরাই তাদের প্রস্তুত দেখে বিপদে পড়েছে। সেই বুড়ো সার্জ্জেন্ট হয়ত আরও অনেকের সঙ্গে মাটিতে মরে পড়ে আছে! এদের জীবনের মূল্য তার বালিশের নীচে রয়েছে, আর সে—ষ্টেনের ছেলে, বুড়ো সৈনিকের ছেলে—চোখের জলে তার গাল ভেসে গেল। পাশের ঘরে তার বাবা জানলা খুলে দেখছিল, রাস্তা দিয়ে নূতন এক সৈন্যদল চলেছে লড়তে, আক্রমণকারীদের সাহায্য করতে। ষ্টেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্নার শব্দ শুনে সে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার কি হয়েছে?"

সে আর থাকতে পারলে না। বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে সে তার বাবার পা জড়িয়ে ধরলে। তার লাফানোর বেগে, টাকাগুলো বালিশের নীচে থেকে মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল।

"এ সব কি? তুমি কি চুরি সুরু করেছ নাকি?"

তখন এক-নিশ্বাসে সে সমস্ত ব্যাপার খুলে বললে—কি করে সে জর্ম্মানদের কাছে গিয়েছিল, আক্রমণের কথা বলে দিয়েছিল।

এ কথা বলে তার বুকটা হালকা হল—দোষ নিজের মুখ দিয়ে বলতে তার যাতনা কমলো। বুড়ো শুনছিল একমনে, তার চোখের পলক্ পড়ছিল না। যখন বলা শেষ হল, তখন সে কেঁদে উঠল, হাতে মুখ ঢেকে ডাকলে, "বাবা, বাবা।"

বুড়ো কথা না বলে, ছেলেকে সরিয়ে দিয়ে টাকাগুলো কুড়িয়ে নিলে, জিজ্ঞাসা করলে, "এই সব ?

ষ্টেন মাথা নেড়ে জানালে, হ্যাঁ। বুড়ো তার বন্দুক আর টোটার বাক্‌স পেড়ে পকেটে সেই টাকা-গুলো রাখতে বললে—"বেশ, এগুলো তাদের আমি ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি।"

আর একটি কথাও না কয়ে, একবার পিছনে না ফিরে ষ্টেন এসে রাস্তায় সৈন্যদলে মিশে গেল। আর তাকে কেউ ফিরতে দেখেনি।*

শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বায়োস্কোপের নাটক



আট্‌লান্‌টাইড—সাঁৎ আবিকে আঁতিনে হত্যার আদেশ করিয়াছে

৩

Orphans of the Storm চিত্র-নাট্যের গল্প এই,—নাটকের প্রথম দৃশ্যে এক ধনী-মা তাঁর শিশুকে পথে ফেলিয়া গেলেন। এক গরীব কারিকর মেয়েটিকে কুড়াইয়া লইয়া নিজের মেয়ের মতই তাকে মানুষ করিতে লাগিল। কারিকরের নিজেরও একটি মেয়ে ছিল—দুটী মেয়েই এক-বয়সী। একটু ডাগর হইলে ধনীর কন্যাটি অন্ধ হইল, তখন কারিকরের মেয়েই অন্ধের সাথী হইল। তাকে খাওয়ানো-

* আলফন্স্ দোদে হইতে



মাদাম নিপার কোস্কি আঁভিনের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন

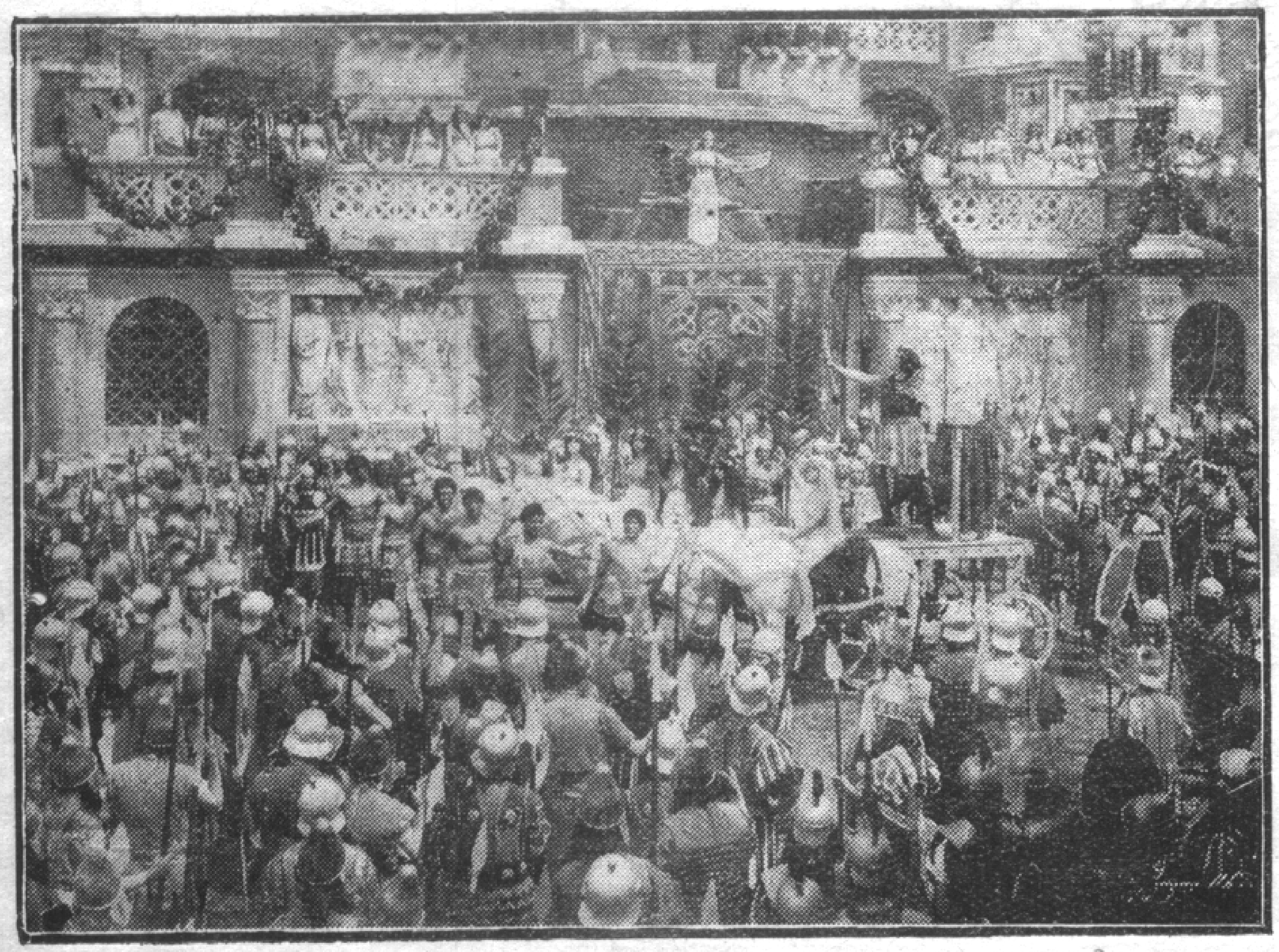
পরানো সব ভার সে গ্রহণ করিল। আরো একটু বয়স বাড়িলে কারিকরের কন্যা অন্ধ লুইসাকে লইয়া পারিতে চলিল—যদি সেখানে তার চোখ-দুটীকে আরাম করাইতে পারে, এই ভরসায়। কারিকরের মেয়েটির নান হেনরিতা। পারিতে সুন্দরী তরুণী হেনরিতাকে এক ধনী চুরি করিয়া লইয়া যায় এবং লুইসাও এক বদমায়েস নারীর হাতে গিয়া পড়ে। সে লুইসাকে দিয়া পথে-পথে ভিক্ষা করাইয়া পয়সা রোজগার করিতে লাগিল। পরে তরুণ ভদ্রি হেনরিতাকে সেই লম্পট ধনীর গ্রাস হইতে উদ্ধার করে এবং হেন্‌রিতার মুখে সংবাদ পাইয়া লুইসাকেও চতুর্দ্দিকে সন্ধান করে। বহুবার পথে তাকে সে দেখিতে পায়। লুইসা হেন্‌রিতার গৃহের বাহিরে গান গাহিতেছে, এমন ঘটনাও ঘটে এবং হেন্‌রিতা তার গানের স্বর শুনিয়া যখনই আসিয়া তাকে উদ্ধারের চেষ্টা পায়, তখনই দুর্ব্বৃর্ত্তেরা তাকে ছিনাইয়া লইয়া যায়। তারপর দাতন নামে এক যুবার সহিত হেন্‌রিতার সখ্য হয় এবং ঘটনাক্রমে হেনরিতা ও ভদ্রির মৃত্যু-দণ্ড হইলে দাতনই দুইজনকে গিয়া রক্ষা করে। তারপর নানা ঘটনার মধ্য দিয়া লুইসাকে আবার হেনরিতা খুঁজিয়া পায়; তার অন্ধতাও আরোগ্য হয় এবং হেনরিতার সহিত ভদ্রির বিবাহ হয়।

এই ছবিখানিতে অর্থ-ব্যয় হইয়াছে প্রচুর—এবং জনতার বিচিত্র দৃশ্য মনকে অভিভূত করিয়া দেয়। এই দুই অনাথ বালিকার অভিনয় এমন মর্ম্মস্পর্শী এমন করুণ যে দর্শকের চোখ বারবার তা দেখিয়া অশ্রুময় হইয়া ওঠে। তা ছাড়া উদ্ধারের দৃশ্য প্রভৃতিতে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। ছবিখানির মধ্যে continuity মাঝে মাঝে ঘা পাইয়াছে, এই যা খুঁৎ—তার উপর ফরাসী-বিদ্রোহের কতকগুলা দৃশ্য এই দুই অনাথ বালিকার চিত্ত-বৃত্তির লীলার মাঝখানে আসিয়া পড়ায় রসভঙ্গও যে মোটে হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। আর একটি খুঁৎ, বহু চরিত্র দু'একটা দৃশ্যে আসিয়া দেখা দিয়াছে, অনাবশ্যক—তাদের অভিনয়ে নাটকের গল্প অগ্রসর হয় নাই, বরং গল্পের সহজ গতিকে তাহা বাধা দিয়াছে। তবে setting খুব চমৎকার। লিলিয়ান গিশ্ ও ডরোথি গিশ্ দুই বালিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। দুইজনেই করুণ



রিটা জলিবেত্—থিয়োডোরার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন

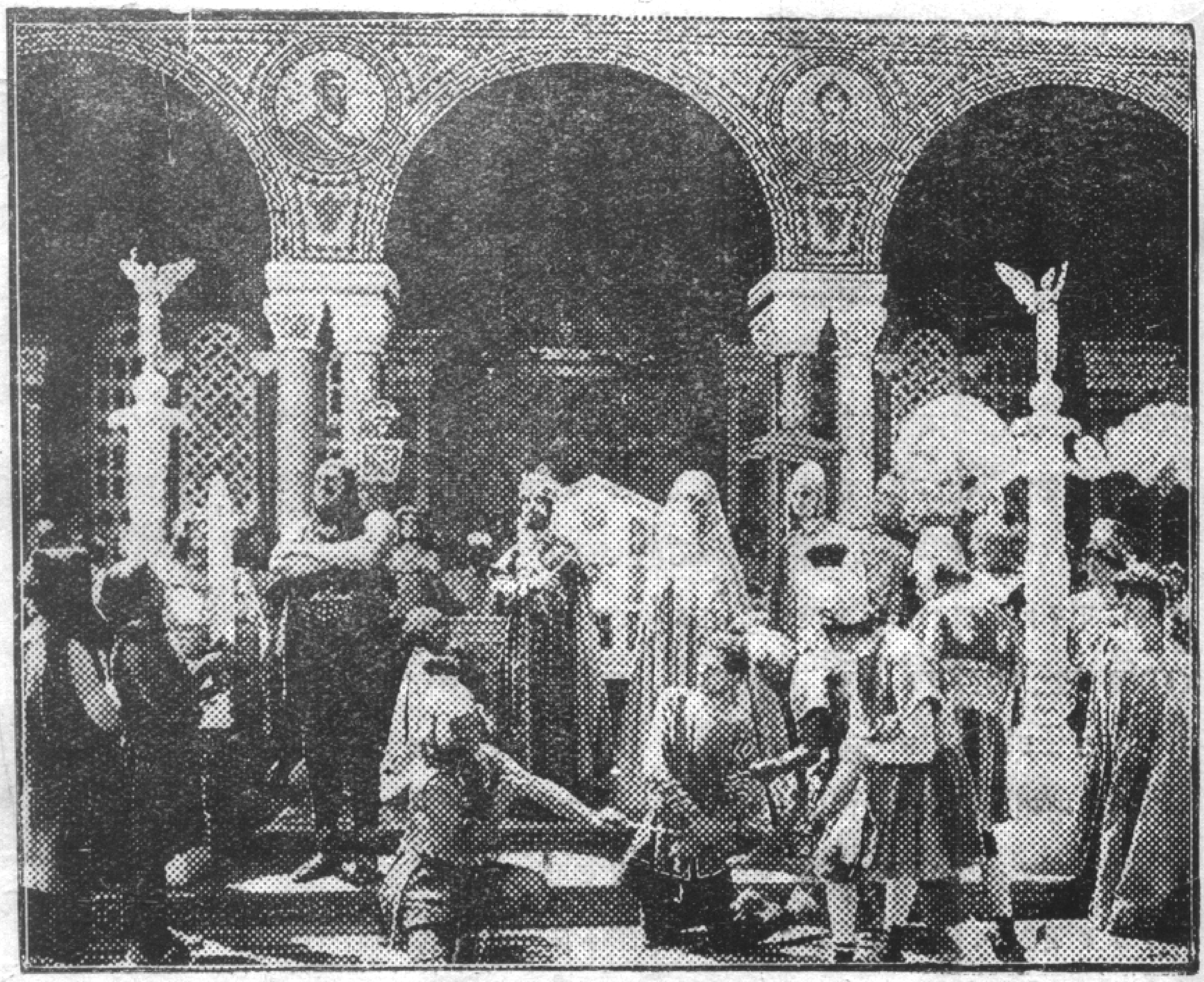
রসের ভূমিকা-অভিনয়ে অপরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মোটের উপর এ ছবিখানি সকল শ্রেণীর দর্শককেই মুগ্ধ



থিয়োডোরা—সংক্ষুব্ধ জনতার দৃশ্য

করিবে। ইহার ফটোগ্রাফি নিখুঁৎ—এবং ছবিখানিতে মানুষের চিত্তবৃত্তির এমন বিচিত্র লীলা ফুটিয়াছে যে তা দেখিয়া তাক্ লাগিয়া যায়। এ ছবিখানি কলিকাতায় শীঘ্রই দেখানো হইবে।

সম্প্রতি এখানে যে কয়খানি ছবি দেখানো হইয়াছে, তার মধ্যে আর্টের হিসাবে Atlantide বা Missing Husbands ছবিখানি আমাদের খুব ভালো লাগিয়াছে। প্রথম দৃশ্যেই দেখি, বিস্তার মরুভূমি, চারিধারে ধু-ধু বালির রাশি। এই মরুভূমির বুকে লেফটেনাণ্ট সাঁৎ আবি মরণ-পথের যাত্রী। তাকে কুড়াইয়া আনিয়া চিকিৎসা করানো হয়, বিকারের ঘোরে লেফ্টেনাণ্ট বলেন যে তিনি তাঁর সঙ্গী ও সহযাত্রী কাপ্তেন মরহাঁজকে হত্যা করিয়াছেন। তারপর আরোগ্য লাভ করিলে একটা জায়গার ভার আবির উপর অর্পণ করা হয়। এইখানে তাঁর এক সঙ্গীকে নিজ-জীবনের কাহিনী তিনি বিবৃত করেন। এই কাহিনীর উপর চিত্র-নাট্যখানি গঠিত। সে কাহিনী এই,—আবি ও মরহাঁজ মরুর বুকে বেড়াইতে গিয়া দেখেন, একজন তুর্কী মরিতে বসিয়াছে। তাঁরা তার জীবন রক্ষা করেন। তুর্কীটা একরকম ধুম পান করাইয়া আবি ও মরহাঁজকে



থিয়োডোরা—বিচার-সভা

নেশায় বিভোর করিয়া তোলে এবং পূর্ণ নেশায় উদ্‌ভ্রান্ত তাঁদের লইয়া এক সজ্জিত পুরীতে যায় —সেটি আতলান্তির এক ধ্বংস-পুরী। এই পুরীর রাণী আঁতিনে রূপে রূপময়ী। এমন রূপ দেখা যায় না! তার রূপের এমন কুহক—যে পুরুষ সে রূপে উন্মাদ জর্জ্জরিত হইয়া তার মান-ইজ্জৎ সম্ভ্রম, মনুষ্যত্ব, এমন কি প্রাণ অবধি বিসর্জ্জন দেয়! এই দুই বন্ধু আসিয়া সেই কুহকিনীর কাঁদে পা দিল। তখন এই দুই বন্ধুর সখ্যের মধ্যে আঁতিনে এমন নিবিড় ছায়া মেলিয়া ধরিল যে দুই বন্ধুর মধ্যে সে ছায়া প্রকাণ্ড আড়াল তুলিয়া দিল। মরহাঁজ অপেক্ষাকৃত তরুণ, এবং বেশী সুশ্রী। আঁতিনে তার রূপে মজিল, তাকে ভালবাসিল; কিন্তু মরহাঁজ কিছুতেই তার চিত্তকে এই কুহকিনীর হাতে ধরা দিতে দিল না; বন্ধুর চিন্তা তাকে কঠিন করিয়া রাখিল। আবি কিন্তু আঁতিনের রূপে মজিয়া একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। সে বন্ধু ভুলিল, সারা দুনিয়াই ভুলিয়া বসিল। আবি দেখিল, এই পুরীর মাঝে একটা ঘরে কত শত পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি চারিধারে দাঁড় করানো। উহারা এই কুহকিনীর কুহকে মজিয়া প্রাণ দিয়াছে, আর তাদেরই ধাতুমূর্ত্তি কুহকিনীর বিজয়-স্তম্ভের মত চারিদিকে খাড়া রহিয়াছে! ইহা দেখিয়াও তার রূপের নেশা কাটিল না। মরহাঁজকে বিরূপ দেখিয়া আঁতিনের প্রাণে প্রতিহিংসা জাগিল—সে কুহকে-উন্মাদ আবিকে আদেশ করিল, আমায় কেমন ভালবাস, দেখি, হানো ছুরি ঐ তোমার বন্ধু মরহাঁজের বুকে। তাকে মৃত্যু দিয়া প্রমাণ কর আমায় তুমি সত্যই সবার চেয়ে ভাল-



ষ্টিফেন্স পার্কিন্স ও রুথ

বাসো! আবি ভয়ার্ত্ত হইল, কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু উপেক্ষিতা নারীর প্রতিহিংসা বড়ই ভীষণ। আঁতিনে আবির হাতে ছুরি গুঁজিয়া দিয়া তার হাত ধরিয়া নিদ্রিত মরহাঁজের শয্যা-পার্শ্বে টানিয়া আনিল এবং বিভোর নেত্রে তার পানে চাহিয়া তাকে মশগুল করিয়া আদেশ করিল, হানো ছুরি। সে কম্পিত হস্তে বন্ধুর বুকে ছুরি বসাইল—বন্ধুর বুকে রক্ত ছুটিল। বন্ধুর প্রাণ লইয়া তখনই তার চেতনা হইল। সে আঁতিনকে মারিতে ছুটিল। আঁতিনে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল! তারপর নানা চেষ্টার পরে সে আঁতিনেকেও মারিয়া কম্পিত পায়ে মরুর বুকের উপর দিয়া পলাইয়া শিবিরে আসিবার চেষ্টা পায়! এবং এই চেষ্টা করিতে গিয়া মরুর বুকেই মূর্চ্ছিত মরণোন্মুখ হইয়া পড়ে।...আরোগ্য লাভ করিলে কি হইবে, এখনো রাত্রির বিজন স্তব্ধতার মধ্যে আঁতিনের রূপের স্মৃতি তার প্রাণে এমন কুহক জাগাইয়া তোলে, এমন তীব্র নেশা যে সে গভীর নিশীথে কতদিন ঐ মরু বুকে লক্ষ্যহীন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে উদ্‌ভ্রান্তের মত! সেই পাষাণপুরী তাকে কি ক্ষুধায় কি ব্যাকুল

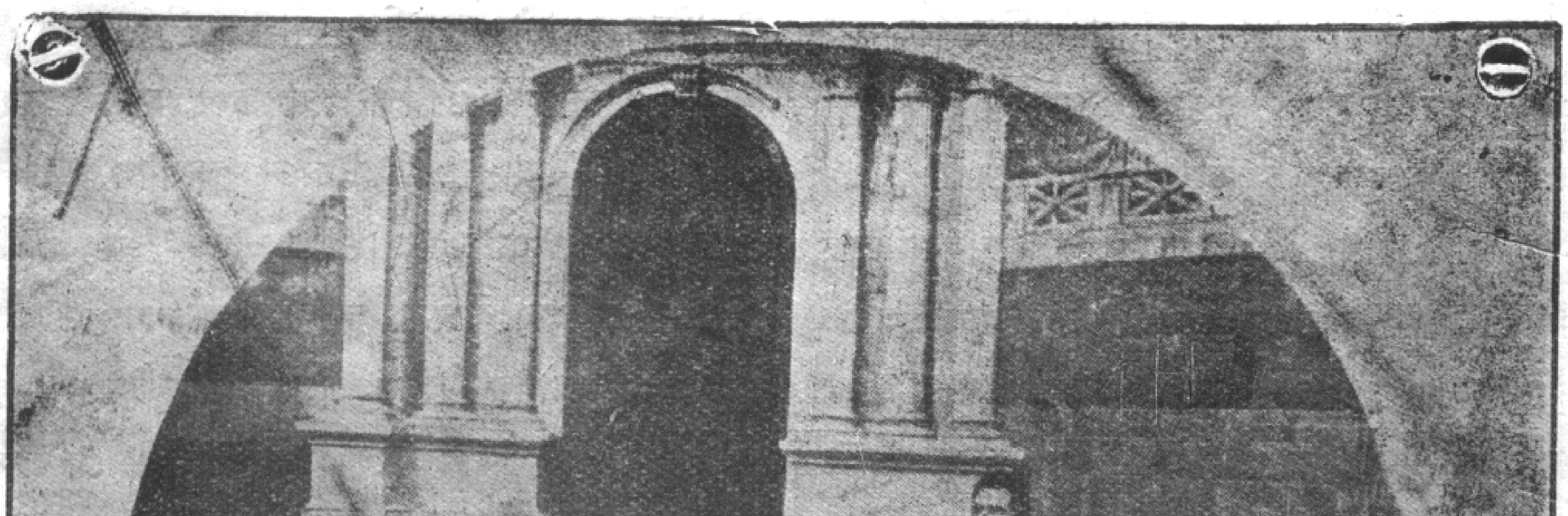
আকর্ষণেই যে টানিতে থাকে, সে বেগ রোধ করা অসম্ভব।

কাহিনী শেষ হইলে গভীর রাত্রে ঘোড়ায় চড়িয়া আবার আবি বেড়াইতে বাহির হইল, তখন এই শ্রোতা-সঙ্গীও তার পিছনে চলিল এবং ধূমাচ্ছন্ন আঁধার রাত্রে এই লক্ষ্যহীন যাত্রার মধ্যেই ছবির পরি-সমাপ্তি।

এই চিত্র-নাট্যখানির সমাপ্তির মধ্যে এই যে সুদূরের পিয়াসা বুকে লইয়া অধীর ছোটা, সেই মায়া-পুরীর ক্ষুধিত-পাষাণের নেশায় এই যে যাত্রা, ইহার মধ্যে কতখানি suggestiveness, কতখানি mysticism—যে ছবিখানি দেখা হইলেও মন হইতে তা মুছিবার নয়। আর্টের এমন খেলা আর কোন ছবিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না! প্রতি মুহূর্ত্তে মন এমনি উদ্দাম ছন্দে নাচিয়া চলে, এমন এক কল্পনার রাজ্যে উধাও হইয়া,—প্রতি মুহূর্ত্তে সংশয়, ভয়, আর উত্তেজনার দোলায় দুলিয়া যে তেমন অনুভূতি আর কোন ছবি দেখার সময় মনকে ভরিয়া তোলে না। আঁতিনের প্রেমের কুহক, রূপের বিভ্রম পারিপার্শ্বিকের রঙীন ছায়ার পাশে এমন মোহে এমন সজীব মূর্ত্তিতে ফুটিয়া ওঠে যে কোন্ অজানা অতৃপ্তিতে মন সারাক্ষণ হা-হা করিতে থাকে! গল্পের পারম্পর্য্য (continuity) আশ্চর্য্য বজায় রাখিয়া মুখে-বলা কাহিনী-টুকু নাটকীয় ভাবে আগাগোড়া জম-জমাট হইয়া উঠিয়াছে! Setting, অভিনয়, কোনখানে এতটুকু খুঁৎ নাই! রূপের কুহক, রূপের মোহ সারা নাট্যখানিতে এমনি আব-হাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে যে তার আর তুলনা নাই! রবীন্দ্রনাথের সেই গান—

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন রে...

সেই গানটি যেন বিচিত্র ছন্দে তার সমস্ত হতাশায় ভরিয়া ছবির পটে জাগিয়া উঠিয়াছে! তারি সুরে প্রাণটা ভরিয়া ওঠে! এই অতৃপ্তি আর নৈরাশ্যের সুর ছবিখানির মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে। নারীর রূপের জন্য পুরুষের



ক্যো ভাদিস্-এর একখানি দৃশ্য

চিত্তে যে উদ্দাম পিপাসা যুগ-যুগ ধরিয়া জাগিয়া আসিতেছে, যে ক্ষুধা, যে দুর্দ্দান্ত সংগ্রাম বাহিরের বিশ্বে ও চিত্তের মধ্যে বিপুল দ্বন্দ্ব চিরদিন ছুটাছুটি করিয়াছে, তাহা একেবারে মূর্ত্তি ধরিয়া চোখের সামনে জাগিয়া ওঠে! এ ছবি যাঁরা দেখেন নাই, তাঁরা বুঝিতেও পারিবেন না, ছবির পটে মনের খেলা, অন্তরের নিভৃত সাধ আশা তৃপ্তি-অতৃপ্তি কি উজ্জ্বল বর্ণেই না ফোটানো যায়!

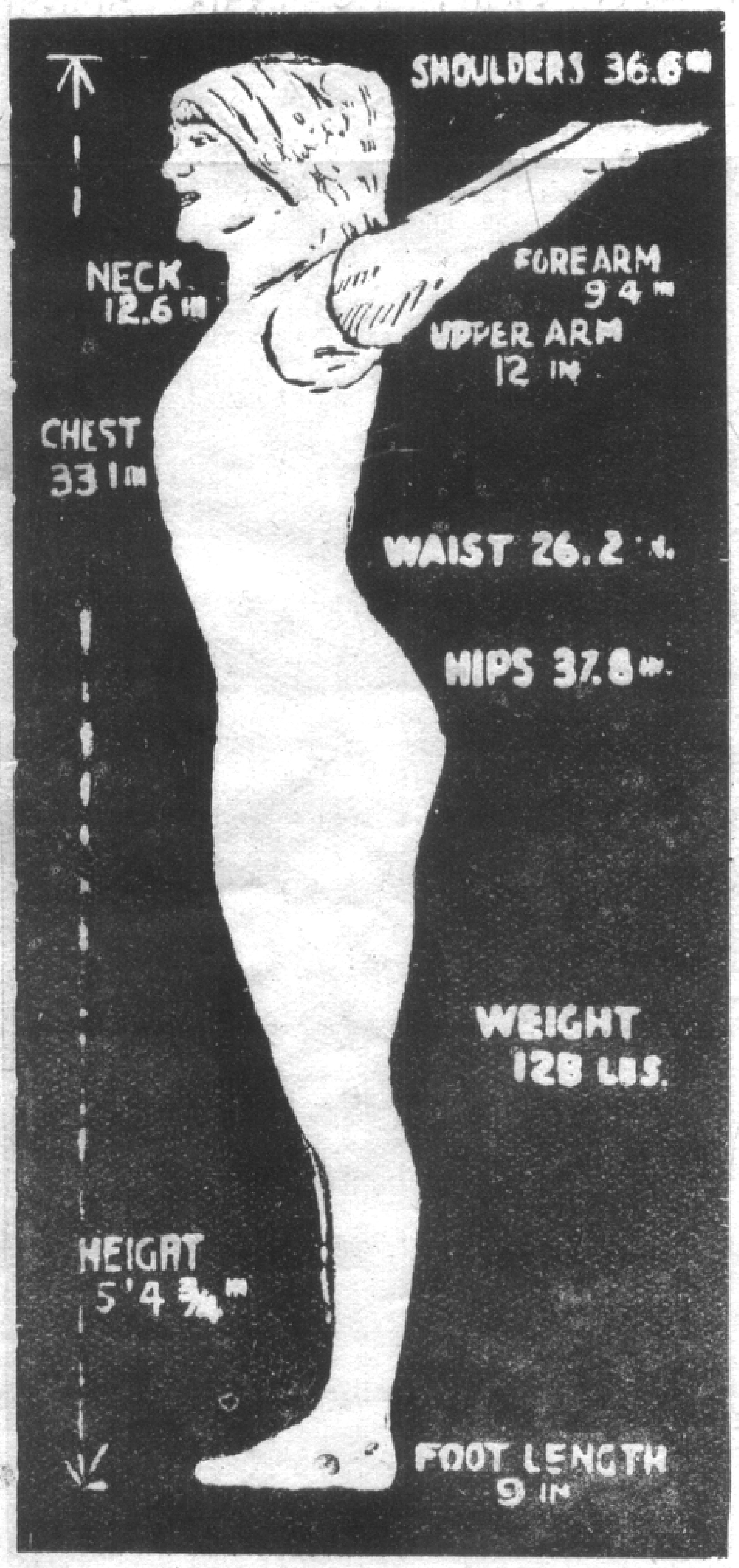
সেটিং ও ফটোগ্রাফিতে আর-একখানি চিত্রনাট্যও দর্শককে বিমুগ্ধ করিয়া ছিল। সে ছবি, 'থিয়োডোরা।' থিয়োডোরা রাজসভার নর্ত্তকী—সম্রাট জষ্টিনিয়ান তাকে বিবাহ করেন। প্রাসাদের বিলাস-ঐশ্বর্য্য থিয়োডোরার প্রাণে ভাল লাগিল না। সে ছদ্মবেশে নগর পর্য্যটন করিয়া বেড়াইত। এমনি পর্য্যটনের সময় একদিন এথেনিয়ান আন্দ্রিয়াসের সঙ্গে তার দেখা হয়। আন্দ্রিয়াস সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিল। তার প্রতি থিয়োডোরার অনুরাগ সঞ্চার হয়। থিয়োডোরা আন্দ্রিয়াসের মুখে ষড়যন্ত্রের সব তথ্য জানিয়া ফেলে এবং শিহরিয়া ওঠে। পরে সম্রাট ও আন্দ্রিয়াস দুইজনকেই সে রক্ষা করে। তার পর প্রজারা বিদ্রোহী হয় এবং আন্দ্রিয়াস যখন বুঝিল থিয়োডোরাই সম্রাটকে রক্ষা করিয়াছে, তখন থিয়োডোরার উপর ঘৃণায় তার মন বিষাইয়া ওঠে। ইহার পর আর একবার আন্দ্রিয়াস বিপদে পড়ে এবং থিয়োডোরা তাকে এবারও রক্ষা করে। সম্রাট ব্যাপার বুঝিয়া থিয়োডোরাকে সন্দেহ করেন ও তার উপর ক্রুদ্ধ হন; থিয়োডোরা আন্দ্রিয়াসের প্রাণ ভিক্ষা চায়। সম্রাট অসম্মত হইলে থিয়োডোরা তাকে বাঁচাইতে ছোটে, কিন্তু তবু আন্দ্রিয়াসকে রক্ষা করা গেল না। সম্রাটের আদেশে আন্দ্রিয়াসের প্রাণদণ্ড হয়। থিয়োডোরা তার মৃত দেহের উপর গিয়া লুটাইয়া পড়ে; সম্রাট তাহা দেখিয়া থিয়োডোরার ফাঁসির হুকুম দেন।

এই চিত্র-নাট্যের অভিনয়ে বহু লোক নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথচ প্রত্যেক চরিত্রের ভাবভঙ্গী ও কার্য্যকলাপ অনুসরণ করা দর্শকের পক্ষে একটুও কষ্টকর নয়। নাটকীয় ঘটনা ও তার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি প্রাণকে একেবারে অভিভূত করিয়া দেয়। থিয়োডোরার ভূমিকায় প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী রিটা জলিবেতের অভিনয় একেবারে প্রথম শ্রেণীর, দীপ্ত মহিমায় আগাগোড়া উজ্জ্বল।



ওয়্যার কেশ—হুবার্ট ওয়্যার ও মেরিয়ান
ওয়্যার কেশ. চিত্র-নাট্যে হুবার্টের ভূমিকায় মাথিশন ল্যাঙ

মধ্যে ছোট এক খানি চিত্রনাট্য দেখিয়া-ছিলাম, The Chicken in the Case—সেখানির

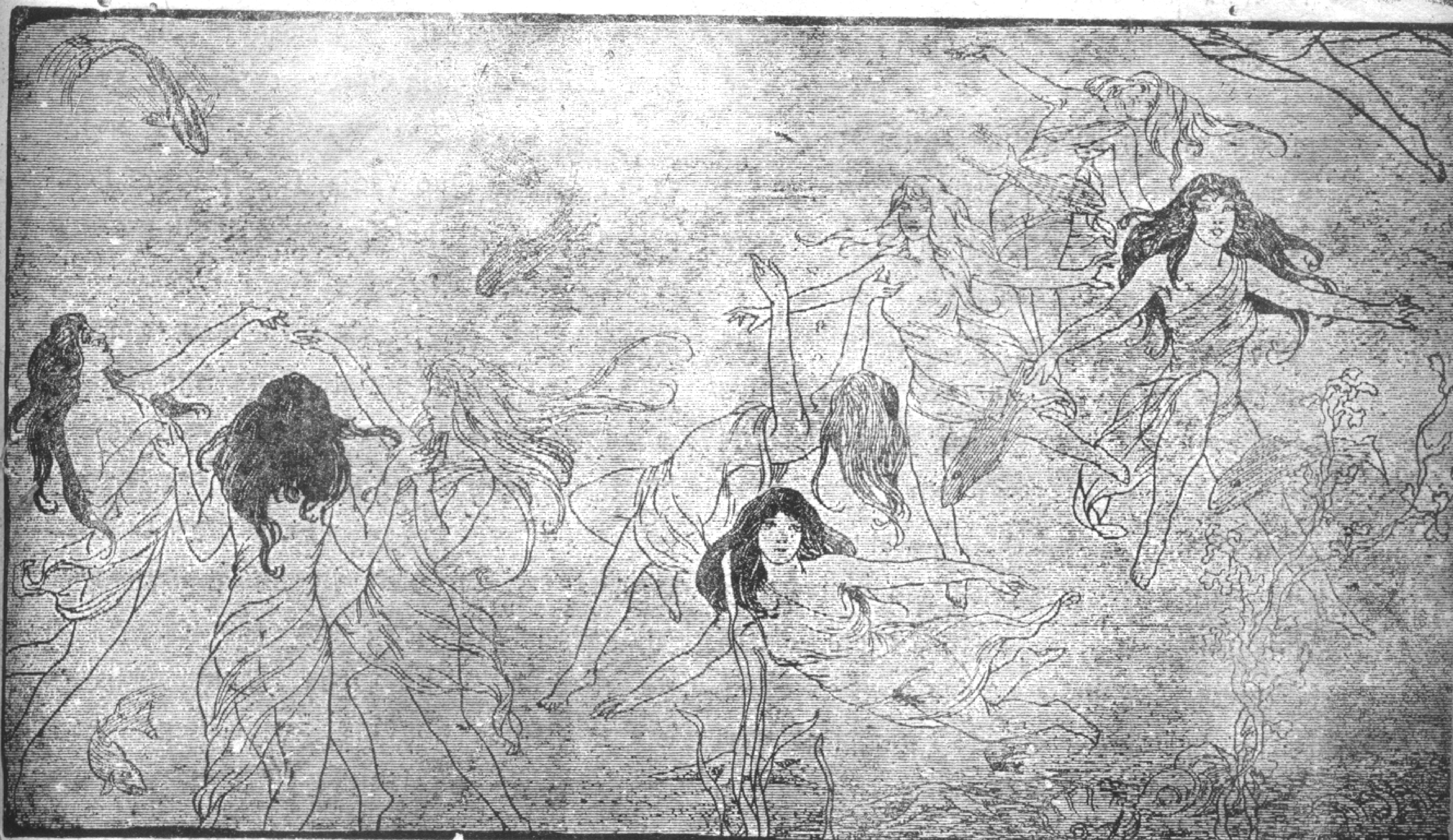


কুইন্ অফ দি সী-তে—নায়িকার দেহের গঠন

অভিনয়ও যেমন সুন্দর, গল্পটিও তেমনি হাসিতে ঝলমল করিতেছে। ষ্টীফেন্স পার্কিন্স তরুণ যুবা, বিবাহ করিতে নারাজ। তার খুড়ী বলিল, তুমি যদি বিবাহ কর তো তোমার হাত-খরচের টাকা বাড়াইয়া দিব। পার্কিন্স তখন তার সদ্য-বিবাহিত এক বন্ধুর কিশোরী পত্নী অ্যানিকে নিজের পত্নী বলিয়া খুড়ীর কাছে চালাইয়া দিল। তার কিছু পরেই প্রতিবেশীর কন্যা রুথের প্রতি তার অনুরাগ সঞ্চার হয়। এই মেয়েটি গৃহের বিস্তর পশু-পক্ষী লইয়া থাকিত—মুরগীগুলাকে কিছুতেই সে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। এই কাজে পার্কিন্স তাকে সাহায্য করে এবং তাহা হইতেই প্রেমের সূচনা হয়। ও'দিকে রুথের পিতার কাছে খুড়ী অ্যানিকে পার্কিন্সের নবোঢ়া বলিয়া পরিচয় করাইয়া দেয়। রুথের পিতা তখন রুথের সঙ্গে পার্কিন্সের ঘনিষ্ঠতায় বাধা দিল; খুড়ীও পার্কিন্স এবং অ্যানির মধ্যে আড়-আড় ছাড়-ছাড় ভাব দেখিয়া ভাবিল, এ কি দাম্পত্য-কলহ! খুড়ী তাদের বিবাদ মিটাইয়া মিলনের ডোরে বাঁধিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পায়—এবং নানারকম খুঁটিনাটী ও হাস্যকর ব্যাপারের মধ্যে আসল কথা ব্যক্ত হয় ও গোল মিটিলে পার্কিন্স রুথকে বিবাহ করে।



কুইন্ অফ দি সী—একটি দৃশ্য।



কুইন্ অফ সী—জলের মাঝে জলবালাদের নৃত্য-রঙ্গ

এই চিত্র-নাট্যখানিতে ঘটনার পারম্পর্য্যটুকু আগাগোড়া সুস্পষ্ট এবং তার প্রকাশে কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খল বা বেমানান কিছু নাই। ঘটনার কোথাও এতটুকু শ্লথ ভাব দেখা যায় না। খুব যেখানে মনের খেলা, সে-সব জায়গায় অভিনয় এত উঁচু দরের যে পটে অভিনয় দেখিতেছি, এ কথা ভুলিয়া যাইতে হয়!

ওয়্যার কেশ্ (Ware Case),—স্যর হুবার্ট ওয়্যার সৌখীন ধনী; ঘোড়দৌড়ের বাজারে তার খাতির খুব। পুরুষের দল তাকে ভালোবাসে তার খেলা-ধূলায় অনুরাগের জন্য; আর নারীরা ভালোবাসে উপহারে সে মুক্ত হস্ত বলিয়া। সুন্দরী মেরিয়ান স্কেল্স্ ওয়্যারের জন্য পাগল—ওয়্যার তাকে ভারে ভারে উপহার জোগায়। ক্রমে মেরিয়ান ওয়্যারকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসিল।

ওয়্যারের গৃহে পুত্রশোকে-উন্মাদ তার পত্নী ম্যাগ্ ডেলেন স্বামীর দুর্ব্বলতা দেখিয়াও দেখিত না। তাঁর বন্ধু ছিল মাইকেল আইড। যদি নিজের পছন্দ-মত ম্যাগ ডালেন বিবাহ করিত তো এই মাইকেলই তার স্বামী হইত!

ওয়্যার ওদিকে বাজে খরচের দায়ে একদিন সর্ব্বস্বান্ত হইল। তবে তার আশা ছিল, ধনী শ্বশুর মৃত্যুকালে তাকে প্রচুর সম্পত্তি দিয়া যাইবেন। কিন্তু তা হইল না—শ্বশুরের মৃত্যুর পর দেখা গেল, উইলে তিনি তাঁর যথাসর্ব্বস্ব মাগডালেনের ভ্রাতা য়ুষ্টেশ্ এড্‌কে দিয়া গিয়াছেন।

এই খপর বাহির হইবার একসপ্তাহ পরে য়ুষ্টেশ ওয়্যারের পল্লীগৃহ-সংলগ্ন হ্রদে সাঁতার দিতে আসিয়া জলে ডুবিয়া মারা গেল। বাহিরে এটা দৈব ঘটনা বলিয়া মনে হইলেও করোনার তদন্তে রায় দিলেন,—অজানা লোকে য়ুষ্টেশকে হত্যা করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছে।

মাগডেলেন তখন ভাইয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী

হইয়া স্বামীর ঋণ শোধ করিল; এবং স্বামীর পর-নারীর প্রতি অনুরাগেরও পরিচয় পাইল। সে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং য়ুষ্টেশ্‌কে হত্যা করার অপরাধে ওয়্যারকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মাগ্‌ডেলেনের অনুরোধে মাইকেল ওয়্যারের পক্ষে কৌঁসুলী দাঁড়াইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণ করাইলে ওয়্যার মুক্তি পাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে।

কিন্তু তার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—ফিরিয়া স্ত্রীর কাছে সে স্বীকার করিল যে সেই বিষয়ের লোভে য়ুষ্টেশকে হত্যা করিয়াছে। নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া ওয়্যার আত্মহত্যা করে। তার মৃত্যুতে কেহই অশ্রুপাত করিল না—একমাত্র মেরিয়ান ছাড়া।

এই সব চিত্রনাট্যগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখি—যিনি ফিল্‌মের জন্য নাটক লিখিতে চান, প্রথমেই তিনি দেখিবেন, চিত্র-নাট্যের জন্য তাঁর মাথায় প্লট যথার্থই আছে কি না। প্রথমতঃ তাঁর একটি সুসমঞ্জস প্লট থাকা চাই। তারপর চাই মানব-চরিত্রে এবং বাহিরের জগৎ ও মনোজগৎ সম্বন্ধে সুগভীর অভিনিবেশ, এবং কল্পনা-শক্তি। লেখার-ভাষায় যাঁরা গল্প বা উপন্যাস ভাল করিয়া রচিতে পারেন, কতকগুলা techniques-এর জ্ঞান থাকিলে তাঁদের হাতেই চিত্র-নাট্য ভালো খুলিবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে লেখার ভাষায় কথা-নাট্য বা উপন্যাস লিখিয়া যাঁরা মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে বিশেষ পারদর্শী, তাঁরা যদি actions-এর সৃষ্টি করিতে পারেন, তবেই তাঁদের হাতে চিত্রনাট্য খুলিবে; নহিলে নয়। কারণ মনের অনেক লীলা-খেলা লেখার ভাষায় চমৎকার খোলে আর তাতে action-এর অভাব থাকিলেও কোন দোষ হয় না। চিত্র-নাট্যে চিন্তার ঠাঁই তেমন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য Quo Vadis, Last Days of Pompeii, Queen of the Sea প্রভৃতি উপন্যাস চিত্র-নাট্যে অপরূপ ভঙ্গিমায় বিচিত্রভাবেই ফুটিয়াছে।

ইহা হইতেই বুঝা যায় কোন্ নাটক ফিল্‌মে রূপান্তরিত হইতে পারে। যে উপন্যাস বা নাটকের প্রাণ action-এ প্রতিষ্ঠিত তাহাই ফিল্‌মের উপযোগী;—আর যেগুলির চিন্তাই প্রাণ, সেগুলি ফিলমে রূপান্তরিত করা যায় না। এই action আবার যতই মানবের চিত্তবৃত্তির বিচিত্র বিকাশের ধারা ধরিয়া ফুটিয়া থাকে, ততই ফিল্‌মের পর্দ্দায় তার আকর্ষণী-শক্তি বাড়ে; নচেৎ কেবলি দৌড়-ঝাঁপ ও খুন-জালিয়াতীর ব্যাপার মুহূর্ত্তের উত্তেজনা জাগাইলেও তার মধ্যে আর্টের লীলা নাই, কাজেই এগুলা নিরেস শ্রেণীর চিত্র-নাট্য—শুধু চিন্তাশক্তি-বর্জ্জিত অত্যন্ত সাধারণ দর্শককেই তা আমোদ দিতে পারে—শিক্ষিত ভাবুক বা রসগ্রাহী দর্শকের প্রাণে কোন সাড়াই জাগাইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে "দেবী চৌধুরাণী" ফিল্‌মের পক্ষে সব-চেয়ে উপযোগী; তারপর "রাজসিংহ।"

বারান্তরে চিত্র-নাট্যের রচনা সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ কথা আলোচনা করিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল।

শিবসুন্দর।

সলাজ আঁখি

প্রিয়ার সলাজ আঁখি
ঘুম-ভাঙা কোন্ তরুণ মনের
রাঙা স্বপন নাকি?
স্বপন-পারের সাগর-কূলে
ডাক দেয় সে হাতটি তুলে
ফুল-ফোটা কোন্ আলতা-লালিম
ফাগের গুঁড়া মাখি!

প্রিয়ার সলাজ আঁখি,
পাতায় ঘেরা নীলিম দোলায়
নিকষ কাজল পাখী!
নয়ন-ভরা চাউনি রেখা,
নীরব ভালবাসার লেখা,
বেহেস্তেরি কোন্ স্বপনের
অস্ফুট ফুল-সাকী!

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস।

সমাপ্তি

মনে থাকবে তাহ'লে যা বললাম, সব ?

কি ?

'কি !'

এতক্ষণ যা বললাম।—শোনোনি এক বর্ণও ?

বোধ হয় না। কিছু তো মনে পড়চে না! আর একবার বল।

'আর একবার বল!' এ কি একটা-দুটো কথা? সেই তখন থেকে সমানে বলছি!...তুমিও ত বেশ মন দিয়ে শুনছিলে, মনে হলো। একবারও নড়নি, আমার মুখ থেকে তোমার চোখের দৃষ্টি অন্য কোথাও গিয়ে পড়েনি! ...তোমার কাণ ছিল কোথায়?

বেশী দূরে নয়; তোমার মুখের কাছ থেকে বড় জোর একহাত তফাতে ছিল তারা, কিন্তু ওদের দোষ কি, বল? কাণ তো আর শোনে না—শোনে মন। ওরা শুধু কথাগুলোকে ধরে এনে মনের কাছে জড়ো করে দেয়।—হয়তো ওরা ওদের কর্ত্তব্য ঠিকই করে গেছে। যদি কারো দোষ থাকে, সে হচ্ছে আমার মনটারই। না, তাই বা বলি কি করে? আমার চোখ দুটো যে খুব বেশী ভাল মানুষ, তাও ত বলতে পারিনা! স্বার্থপর ওরা একটু অতিরিক্ত। সমানে নিজেদের কাজ হাসিল করে নিয়ে গেছে! তাই বেচারী কাণ আর মন আমার—দেখ, শীগ্‌গির মোছ—

কি?

তোমার মুখ। ঘেমে উঠেছে! নইলে ধরে মুছিয়ে দেবো, ভয়ানক লোভ হচ্ছে কিন্তু—ওটুকুও সইল না প্রাণে? নিজেরই হাতে রুমাল দিয়ে মুছে নিলে! আমার আঁচলটা—তুমি যাবে বলছিলে না? তা যাও...তোমার আবার কাজের ক্ষতি হতে পারে। সত্যি কিছু শুনিনি তোমার কথা! তা হলেই বা? যা যা আমায় করতে হবে লিখে পাঠিও। বেশী দরকারী কথার নীচে লাল কালি দিয়ে দাগও টেনে দিতে পার। সেই ভাল, কি বল? তোমার হাতের লেখা পড়বার সময় আমার মন যদিও শত্রুতা করে চোখের সঙ্গে—আচ্ছা, কারো হাতের লেখা দেখে কখনও তোমার বুকের রক্ত সমুদ্রের ঢেউএর মত উতলা হয়ে উঠতে অনুভব করেছ?—কিছু আর মনে থাকে না! কোন অবলম্বন পাই না...ঐ কাগজের টুক্‌রোটুকু বুকে চেপে পড়ে থাকি, কথা বলতে পারি না। ভাগ্যে ওটা কোনদিন তোমার চোখের সাম্‌নে হয়নি—ও কি, এত কাছে এসে বসলে যে... আর তখন আমি তোমার কাছে গিয়ে বসতেই উঠে যাওয়া হয়েছিল... এখন যদি আমি উঠে যাই?— পারি না, ভাবছ?

পার।

না, পারি না, সত্যি পারি না! অনেকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই পারিনি। আমায় শিখিয়ে দাও না, কি করে পারতে হয়।

আর পারিনা।

'আর পারিনা!'...কি আশ্চর্য্য কথা! তুমি পার না? আমি বিশ্বাস করি না। না যাও তুমি, আমি দেখি—

যাব না।

ওঃ এ কি তুমি বললে! এ তোমার মুখের কথা?... ঐ যা! তোমার গায়ে যে আমার পা ঠেকে গেল...এ কোথায় নিয়ে এলে আমায়? আমি তোমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিলাম যে...এ যে তোমার বুক! আমার মাথা এসে পড়েছে তোমার কাঁধের ওপর! আমার চার পাশে ও কিসের বেড়া! ও, তোমার হাত? চোখে যে আর দেখতে পাচ্ছি না কিছুই! সব দুলছে...আমায় ছেড়ো না...

* * *

আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?

হাঁ।

কতক্ষণ?

তা জানিনা। তোমার মাথাটি একটু একটু করে আমার বুকের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ছিল। তোমার হাতও শিথিল হয়ে আমার গলা থেকে খুলে আসছিল,

তাই তখন আমি তোমায় শুইয়ে দিয়ে ছিলাম।—জাগ্‌লে কেন? ঘুমাও।

ওগো দেখ, আমার মনে হল তখন আমার পায়ে যেন—

যেন কি?—

বল্‌তে পার্‌ছি না যে···

না, বল—

যেন কে মুখ চেপে ধরেছিল!

না—না, ও কিছু নয়।

কিছু নয়?—কিন্তু ভিজে রয়েছে যে!—ঠোঁটের স্পর্শ এখনও যে ওখানে—

ও তুমি স্বপ্ন দেখেছ।

স্বপ্ন?—আচ্ছা, তাই হোক। আর তুমি? এই যে দু'হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে আছ, এও কি স্বপ্ন?—হোক স্বপ্ন...তুমি যেও না—ভেঙ্গো না এ স্বপ্ন আমার—

না, কোথায় যাব? আমার আর কোথাও ঠাঁই হবে না—সব আমার হারিয়ে গেছে···

কিছু নেই আর তোমার?—

শুধু তুমি আছ আমার সকল ভরে।

মাগো! ঝড় উঠল বুঝি!···

না, একটা গাড়ী চলে গেল, ও তারই শব্দ।—তুমি ঘুমাও।

ঘুম?—শিখিয়ে দাও না—কি করে ঘুমাতে হয় ভুলে গেছি! পারছি না আমি···আমার গালের ওপর হাত রেখে তোমার মুখ চেপে ধরলে আমার মুখের ওপর... দেহের প্রত্যেকটি রক্ত-কণা জমাট বেঁধে গেল! চেতনা হারিয়ে পড়ে রইলাম...ঘুমাই নি।—ওরই নাম সুখ? ওরই নাম দহনের শান্তি?...কৈ, নিভল না ত আগুন! তোমাকেও বুঝি হারালাম!···তুমিও পার্‌লে না আমায় বাঁচাতে!—ও আমার মরণ—মরণ—

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

শিখিবার কলা-কৌশল

তৃতীয় ভাগ

কী শেখা যায়?

১

সব শিখিতে পারা যায় না; কিন্তু আমরা অনুভব করিতে পারি, যে-মন প্রকৃতরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার সকল বিষয়েরই কিছু কিছু আলোক পাওয়া দরকার।

উজ্জ্বল নিছক আলোক—আলো-ছায়ার মিশ্রণ নহে। যাহা কিছু-জানা যায়, মানস-পটে তাহার একটা সুস্পষ্ট পরিস্ফুট প্রতিবিম্ব পড়া চাই। সকল বিষয়ের কিছু কিছু আলোক,—অর্থাৎ এই সব পরিস্ফুট প্রতিবিম্ব, সমস্ত মানব-জ্ঞানকে সংক্ষেপে মনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবে—এইরূপ হওয়া চাই।

বর্ত্তমান কালের কোন "ভদ্রলোকই"—আইকেল অট্ট-করিতে হয়,—ফরাসী-ছন্দ বিদ্যার মুখ্য নিয়মগুলি কি—ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের কোন্‌গুলি প্রধান যুগ-কাল—কেমন করিয়া মাংসপেশীর উন্নতি সাধন করিতে হয়···ইত্যাদি—এই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়কে অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

এইরূপে, আজকালের মানুষ দেখিতে পায় যে সে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতব্য বিষয়ের দ্বারা পরিবৃত রহিয়াছে। মন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত, সুসংযত, ও ধৈর্য্যশালী হইলেও, ভাল শিক্ষক ও ভাল পুস্তকের সাহায্য পাইলেও, তীব্র কৌতূহলের দ্বারা জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেও সে মন ভয় পায়...কি! যাহা-কিছু শেখা যাইতে পারে, সেই সমস্ত বিষয় হইতেই কিছু না কিছু স্পষ্ট জ্ঞানলাভ করা? ইহা কি কখনো সম্ভব? জীবন কি অতীব ক্ষণস্থায়ী নহে? বুদ্ধিভ্রংশ ও

কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা যাক্। যে সব বিষয় শিখিতে হইবে তাহার ভিতর যে-একটা গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা আছে—সেই গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলাকে কি করিয়া সুশৃঙ্খল ও প্রণালীবদ্ধ করা যায়, প্রথমে তাহারই চেষ্টা করা যাক্। একটা কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করিয়া নহে এবং পণ্ডিতদিগের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের প্রোগ্রাম অনুযায়ী নহে, পরন্ত সহজ বুদ্ধির সাহায্যে, এক একটা বড় বড় বিষয়কে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়া এই চেষ্টা করিতে হইবে।

* * *

কী শেখা যাইতে পারে? অঙ্গচালনা শেখা যাইতে পারে, তথ্য শেখা যাইতে পারে, যুক্তি-বিচার শেখা যাইতে পারে।

তাছাড়া প্রথমে একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হইলেও—"ইন্দ্রিয়-বোধের কথা" শেখা যাইতে পারে; অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে আমরা যে ভাবাবেগ প্রাপ্ত হই, সেই ভাবাবেগ সমূহ অনুভব করিবার শক্তিকে পরিপুষ্ট করা যাইতে পারে, সংযত করা যাইতে পারে, সমঞ্জসীভূত করা যাইতে পারে। আরও কিছু বেশী:—একটা রহস্যময় আভ্যন্তরিক অনুভবশীলতার (sensibility) শিক্ষা—মনে হয় যেন এই অনুভবশীলতা আমাদের অন্তরে গূঢ়ভাবে নিমজ্জিত রহিয়াছে—উহা চক্ষুর অতীত, কর্ণের অতীত, স্পর্শের অতীত। Andromach Hectorকে বিদায়-সম্ভাষণ করিতেছেন, তুমি তাহা ইলিয়াডে পড়িতেছ; তোমার নেত্র-পল্লব আর্দ্র হইয়া আসিতেছে; এবং সেই সঙ্গে এক অপূর্ব্ব আনন্দ তোমার চিত্তকে অধিকার করিতেছে। কয়েক মুহূর্ত্তকাল তোমার জীবন-ধারা যেন যার-পর নাই তীব্র হইয়া উঠে, অত্যুৎসাহগ্রস্ত হইয়া উঠে:—এই সময়ে না তোমার চোখ, না-তোমার কাণ, না-তোমার স্পর্শেন্দ্রিয় এই ভাবাবেগ উপভোগ করে। তবেই দেখ! এই আভ্যন্তরিক বোধশীলতাও একটা শিক্ষালাভ করে। গোড়ায় একটা নিয়ম-শাসন মানিয়া চলায় যে আনন্দ লাভ হয়,—অশিক্ষিত আত্মা সে আনন্দ লাভে বঞ্চিত।

অঙ্গচালনার শিক্ষানবীশি, তথ্যের শিক্ষানবীশি, যুক্তি-বিচারের শিক্ষানবীশি, ইন্দ্রিয়বোধমূলক অনুভূতির শিক্ষানবীশি,—ইহার ভিতরে সমস্তই সমাবিষ্ট। শুধু বাকী রহিল—উহাদিগকে পরম্পরাক্রমে পরীক্ষা করা, প্রত্যেক শিক্ষানবীশির প্রয়োজন-অনুসারে, শিখিবার মূল-নিয়মগুলি কিরূপে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা অবগত হওয়া:—ইচ্ছাশক্তি, শৃঙ্খলা, সময়ের ব্যবহার; স্বচেষ্টা, শিক্ষক, গ্রন্থ—ইহারা এই বিষয়ে কিরূপ সাহায্য প্রদান করিতে পারে, তাহা বুঝিয়া দেখা। এবং ইহা বেশ জানিবে যে, এই সুশৃঙ্খল পরীক্ষাকার্য্যে, মূল-নিয়মসমূহের প্রয়োগ ঠিক হইল কিনা যাচাই করিবার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে আর আমরা পশ্চাৎদিকে ফিরিব না। এই খুঁৎ খুঁৎ ধরণের প্রক্রিয়া অসহ্য হইয়া পড়িবে। কেবল, বিশেষ-বিশেষ অবস্থাগুলি টুকিতে হইবে। বাদ বাকী সমস্তই, যে শিক্ষার্থী পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছদগুলা মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছে,—সে অক্লেশে স্থির করিতে পারিবে। যেমন মনে কর,—যুক্তি-বিচার-ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার কিরূপ কাজ, ইন্দ্রিয়বোধের শিক্ষায় সময়কে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তথ্যের শিক্ষায় আবিষ্কারের কি কাজ এবং অঙ্গচালনার তালিমে পুস্তকের কি কাজ—এই সমস্ত সেই শিক্ষার্থী একলাই বাহির করিতে পারিবে। এবং টুলো পাণ্ডিত্যী পরিভাষায় ইহাকে "শিখিবার কলা-কৌশলের" এক প্রকার exercise (সাধনা বা প্রয়োগ অভ্যাস) বলা যাইতে পারে।

* * *

অঙ্গচালনার শিক্ষানবিশীর আলোচনা হইতে আরম্ভ করা যাক্। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি,—ইহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার; কেন এইরূপ আরম্ভ বাছিয়া লওয়া হইল তাহা সমর্থন করা আবশ্যক।

আমি বোধহয় আমার এই মত পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি—এখনও আমার বিশ্বাস যে,—যাহা কিছু শেখা গিয়াছে তার মধ্যে, অঙ্গচালনার জ্ঞানই আমাদের সবচেয়ে বেশী। অঙ্গচালনার শিক্ষানবীশিতে "বুদ্ধি-বিভ্রম" হওয়া প্রায় অসম্ভব। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাইবার পর, পার্শ্বদেশে

তলোয়ারের খোঁচা খাইবার পর, অশ্বচালনা ও তলোয়ার খেলার সম্বন্ধে তোমার একটা "দিব্য-দৃষ্ট" জন্মে। খুব নিকট হইতেই তুমি জানিতে পার, যে ঝোপের উপর দিয়া তুমি লম্ফ প্রদান করিতেছ তাহার উচ্চতা কতটা; —২০ সেকেণ্ডের মধ্যেই তুমি জানিতে পার তোমার চলার সাময়িক-গতি-বেগ কিরূপ। পক্ষান্তরে শিখিবার কলা-কৌশলে যেগুলি অপরিহার্য্য সাধনা—সেই ইচ্ছা-শক্তি,শৃঙ্খলা ও সময়—তাহা যেরূপ, অঙ্গচালনা ও ক্রীড়া-ব্যায়ামে পরিণতি লাভ করে এমন আর কিছুতে নয়। আরও একটা কথা—আজিকার দিনে ক্রীড়া ব্যায়ামের শিক্ষাই আর সকল শিক্ষার আদর্শস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রীড়া ব্যায়ামের অধ্যাপক ও প্রণালী অতি উত্তম; উহাতে আশ্চর্য্য ফললাভ হইয়া থাকে। অতএব আমাদের মনটাকে মধ্যে মধ্যে উহাদের স্কুলে পাঠাইতে যেন আমরা ইতস্তত না করি। সেখানে গিয়া এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বাবয়ব-পরিপূর্ণ মল্লের ভাবটিকে আমরা যেন সাদরে অভিবাদন করি।

—ভৌতিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করিতে হইলে—"ইহা শিষ্ট সজ্জনের অন্তর্নিহিত মর্ম্মভাব বই আর কিছুই নয়।

কিন্তু শুধু শিখিবার কলা-কৌশলের অভ্যাস-সাধনার জন্য এবং কতকগুলি পূর্ণাঙ্গ প্রণালীতে আপনাকে অভ্যস্ত করিবার জন্যই যে আধুনিক লোকেরা দৈহিক ব্যায়াম চর্চ্চার প্রবৃত্ত হইবে—অর্থাৎ অঙ্গচালনা হইতে বল,ঠিক্‌ঠাক্ নির্দ্ধারণ-শক্তি,ক্ষিপ্রতা, শোভন-অঙ্গভঙ্গী বাহির করিবার চেষ্টা করিবে —তাহা নহে। সর্ব্বাবয়ব-সম্পূর্ণ শিক্ষাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। চৌকোশ রকমের বিদ্বজ্জন না হইয়া (intellectual) না হইয়া শুধু বিদ্বজ্জন যে ব্যক্তি—সে অসম্পূর্ণ মানুষ। আজিকার দিনে নাট্যবিশারদ-ধাঁচার পণ্ডিত কিংবা দুর্ব্বল, অন্যমনস্ক ভীরু, বিহ্বলচিত্ত চস্‌মাধারী পণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য কোন বুদ্ধিপ্রতিভান্বিত ছেলেকে তাহার অভিভাবক স্বপ্নেও মনে করেন না। আমরা আজকাল "আল্পস্"-গিরিলঙ্ঘী Renanর কথা—বাচখেলার সর্দ্দার Berthelot-র কথা বেশী করিয়া মনে করি। "সাগর-প্রণালীর" অপর পারের লোকেরা বহুকাল হইতে এইসব অসমসাহসিক ব্যাপারে আর বিস্মিত হয় না। শিশুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জীবন দৈহিক শিক্ষাসাধনা চালাইবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজকাল আমাদের এতটা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে এই বিষয়ে বাক্যব্যয় করা বাহুল্য। এই বিংশতি শতাব্দীতে, একজন ভদ্রলোক বলিলে, একজন পাকা মল্লের ধারণা মনে না আসুক—অন্ততঃ মনে আসে সেই মধ্যশ্রেণী ইংরেজের ধারণা—যে নিজ শরীরকে ব্যায়ামে অভ্যস্ত করিয়াছে।

তবে ব্যায়ামের ক্রীতদাস না হইয়া কিরূপে ইহার উচিত ব্যবহার করিতে হয়,—ইহাই সময়ে সময়ে বুঝিয়া উঠা কঠিন। যথাযথভাবে ব্যবহার করিলে মাংসপেশী খুব একটা বড় জিনিস, যেহেতু দেহের ভারসাম্য নৈতিক-চরিত্রের উপর একটা হিতজনক প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু শীঘ্রই আবার মাংসপেশী দেহের ভারস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ইংলণ্ড বহুকাল ধরিয়া ব্যায়ামের অবহেলা করিয়াছিল—তাই বিদ্রূপ-চিত্রে মোটা "জন-বুল" যেরূপ চিত্রিত হইত, সে সময় ইংরেজ আসলেও সেইরূপ ছিল। কেবল উনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্যায়ামের আবার আদর হয়। আমরা বেশ দেখিতে পাইতেছি, ব্যায়াম ক্রীড়াদি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ইংলণ্ডের কতটা উপকার হইয়াছে। কিন্তু এ কথাও আমরা জানি, ব্যায়াম ক্রীড়াদির সেখানে একটা বাড়াবাড়িও হইয়াছে। এমন একটা দিন আসিল, যখন হইতে ইংরেজি স্কুলে "ফুট্-বলই" সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িল। ইঙ্গ-বোয়ার যুদ্ধের সময় ইহার পরিণাম-ফল সকলেরই চোখে পড়িয়াছিল। ব্রিটিশ-জাতি তখন বলিতে লাগিল,—নিরবচ্ছিন্ন মাংসপেশীর চর্চ্চার খাতিরে, বুদ্ধির চর্চ্চা বিসর্জ্জন করা অতীব বিপদজনক। যে সাম্রাজ্যিক কবি ইংরেজের-পরাক্রমের নিদর্শন স্বরূপ "তিন নিকৃষ্ট অশ্বারোহীর" বর্ণনা করিয়াছিলেন তিনিই টেনিস্ রেলিং-এর ভিতরেই যাদের জীবন-যাত্রা সীমাবদ্ধ—সেই ফ্ল্যানেল-পরা নির্ব্বোধদিগকেও বিদ্রূপ করিয়াছেন।

আমাদের মধ্যে, এই সেদিন মাত্র পেশী-চর্চ্চার পুনর্জন্ম আরম্ভ হইয়াছে; ইহার দরুণ বুদ্ধিবৃত্তি এখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। কিন্তু উহার মোহিনী-শক্তি খুবই বেশী; ইহাতে

বিপদ আছে। অতিমাত্র ব্যায়াম-চর্চ্চায় আশঙ্কা আছে—কসরতের বাড়াবাড়ি আরও বিপদজনক। আর একটা আশঙ্কা এই, ফোতো নবাবীর হিসাবে লোকে যদি মনে করে, উচ্চ সমাজের উচ্চশ্রেণীর সমকক্ষ হইতে হইলে, এইরূপ ব্যায়ামচর্চ্চা করা আবশ্যক। আরও একটা আশঙ্কা এই পাছে সাধারণ দৈহিক ব্যায়াম অবহেলা করিয়া কোন ক্রীড়াবিশেষকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই সমস্ত বাড়াবাড়ি, একটা দৈহিক আসামঞ্জস্যে, একটা বিশৃঙ্খলায় কিংবা একটা নৈতিক হীনতায় পর্য্যবসিত হয়।

আধুনিক জীবনযাত্রায়, ক্রীড়াকৌতুককে উচ্চ ও বৃহৎ যথাযোগ্য আসন প্রদান কর না কেন—কিন্তু তাহার পর থামিয়া যাও! উহারা স্বাস্থ্যের সাধন, আনন্দের সামগ্রী! পেশাদার ছাড়া, আর কাহারও নিকট, ইহা অপেক্ষা বেশী আর কিছুই নহে। নচেৎ—পূর্ণ মল্লের বৃদ্ধি যে পরিমাণে হইবে পূর্ণ মানুষ সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে। অমুক লর্ড যিনি গ্রীষ্মকালে, টেনিস খেলেন, গল্‌ফ খেলেন, ফুট-বল খেলেন, পোলো খেলেন; যিনি শরৎকালে হরিণ শীকার করেন এবং শীতকালে জমাট বরফের উপর দিয়া পিছলাইয়া চলেন,—ইহাঁর এই দৃষ্টান্ত আদর্শস্থল বলিয়া আমার মনে হয় না। এই মহামহিম "লাট্" পেশীকে অতিরিক্ত-রকম খাটাইয়া মস্তিষ্ককে অসাড় করিয়া ফেলেন। এই মনুষ্যটি অতীব অসম্পূর্ণ।

বিবেচক ব্যক্তি শুধু দেখিবেন, সচরাচর দৈনিক জীবনে কর্ম্মজাল হইতে আপনাকে কিরূপে একটু বিনির্ম্মুক্ত করিতে পারেন, একটা নর্দ্দামা টপ্‌কাইতে পারেন, একটা ক্ষুদ্র প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারেন, দীর্ঘপথ চলিতে পারেন, এমন-কি পাহাড় পর্ব্বতেও অনেকক্ষণ ধরিয়া হাঁটিতে পারেন, বাইসিক্ল চড়িতে পারেন, আবশ্যক হইলে অশ্বারোহণ করিতে পারেন, তলোয়ার ধরিতে পারেন, আত্মরক্ষণোপযোগী অস্ত্রচালনা করিতে পারেন! এই সমস্ত যাহা তিনি করেন তাহা সুবিধার হিসাবে—লোক দেখানো বাহবার হিসাবে নহে। যদি এই সব নিরভিমান ধরণের দক্ষতার সঙ্গে, তিনি আর একটা বিশেষ ধরণের তো সোনায় সোহাগা হইবে। তবে দেখা দরকার এই সব দক্ষতা খামখেয়ালিভাবে কিংবা শুধু যৌবন-কালেই প্রদর্শিত না হয়। মানসিক শিক্ষাসাধনার ন্যায় দৈহিক শিক্ষাসাধনাও বরাবর চালাইতে হইবে। অমুক লর্ডের মতো যার যথেষ্ট অবসর নাই—তার পক্ষে এইটাই ত মুস্কিলের কথা। অনেক পুরুষ এবং অনেক স্ত্রীলোকও গুরুতর সাংসারিক প্রয়োজন বশতই ব্যায়াম-ক্রীড়াদিতে দিনের মধ্যে একঘণ্টাও সময় দিতে পারে না। ইহাদের জন্য একটা বিশেষ গ্রন্থ রচনা করা উচিত—যাহাতে মানসিক জীবনধারার মধ্যে—এমন-কি বসিয়া-থাকা জীবনধারার মধ্যেও পেশার উন্নতিসাধন কি করিয়া করিতে হইবে তাহার উপদেশ থাকিবে। এই দেহ-চর্চ্চার মূলে অবস্থিত, সেই সব চমৎকার সুয়িস্ জাতীয় জিম্‌ন্যাষ্টিক—এক প্রকার ব্যায়াম-অভ্যাসের সংক্ষিপ্তসার। এই সব ব্যায়াম অভ্যাস এক্ষণে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করিবার কাহারও অধিকার নাই। উহার একমাত্র অসুবিধা:—কালক্রমে এইসব ব্যায়াম-অভ্যাস বিরক্তিজনক হইয়া উঠে। কিন্তু উহা অতীব ফলদায়ক, এবং উহার অভ্যাসে অতি অল্প সময়ের দরকার হয়।·· কার্য্যভারাক্রান্ত সরকারী দফ্‌তরের কর্ম্মচারীও দিনের মধ্যে উহার জন্য কিছু সময় দিতে পারেন। বৎসরের মধ্যে ক্রীড়াকৌতুকের জন্য যে একমাস ছুটি পাওয়া যায়, সেই একমাস যদি উহাতে আবার তিনি যোগ করিয়া দেন, তাহা হইলে; তাঁহার দৈহিক ক্ষয় পিছাইয়া যাইবে এবং তাঁহার পরমায়ু বৃদ্ধি হইবে।

*

* *

পরিমিত অথচ বরাবর সেবিত দৈহিক ব্যায়াম ব্যতীত কাহারও জীবন সম্পূর্ণ সুখের হইতে পারে না। সহরের কেরাণী, শনিবারের ফুট-বলের কথা ভাবিয়া হাসিমুখে তাহার দৈনিক রূঢ়-ধরণের খাটুনী খাটিতে পারে। প্যারিসের "নোটারি"-দিগের নিকট তাহাদের পুরাতন মক্কেলরা যখন তাহাদের কাজের কথা ঘ্যানোর-ঘ্যানোর করিয়া বিস্তারিতভাবে ক্রমাগত বলিতে থাকে তখন তাহারা

"নাড়া" জমির উপর দিয়া দ্রুত চলার কথা কল্পনা করে, একটা ক্ষুদ্র সাদা খর্গোস লাফাইয়া লাফাইয়া ঝোপ্-ঝাড়ের ভিতর প্রবেশ করিতেছে—কল্পনা করে···

যে সব লোক কোন প্রকার দৈহিক ব্যায়াম করে না তাহারা স্থূলকায়, কদাকার, ও বিষণ্ণ।

যে সব লোক অতিরিক্ত রকম ব্যায়ামচর্চ্চা করে, অথবা কোন প্রকার মানসিক শ্রম করে না,তাহারা লঘু-কায় হইতে পারে, সুশ্রী হইতে পারে এবং আমুদে হইতে পারে। এই সব ব্যায়াম-ক্রীড়া এই সব প্রলোভনের দিকে, আমাদিগকে লইয়া যাইতে পারে—ইহাই একটা আশঙ্কার বিষয়···কিন্তু তবুও, তুমি কখনই অমুক লর্ড হইতে ইচ্ছা করিবে না; এই মহামহিম লর্ডের অন্তরাত্মায়,—জগতের বিরাট ও বিচিত্র শোভাসৌন্দর্য্যের একটা অতি অসম্পূর্ণ ধারণাই আছে। প্রিয় পাঠক, বোধ হয় তোমার মনে আছে—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি;—মানব জাতিকে মানসিক ও পৈষিক এই দুই শ্রেণীতে যে বিভাগ করা হয়—ইহা একটা কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ। তাছাড়া এই বিভাগটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এইরূপ বিভাগ বর্ব্বরোচিত ও মধ্যযুগ-সুলভ। সোফোক্লিস্ ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ—মল্ল ও কবি মার্কস্ অরিলিয়স্‌ও তাহাই, মোন্তাইং-ও (Montaigne) তাহাই, গেত্তেও (Gothe) তাহাই। অনেক আর্টিষ্ট ও আধুনিক মহাপণ্ডিত—প্রায় সকলেই দৈহিক ব্যায়ামে অভ্যস্ত।

* * *

প্রকৃতপক্ষে যাহাকে ব্যায়াম বলা যায়-তাহা ছাড়া—হাঁটা আছে, তলোয়ার খেলা আছে, গোলা ছোঁড়া আছে, ইত্যাদি...অবশ্য এমন কতকগুলি অঙ্গচালনা শেখা যাইতে পারে যাহার ভিতর পৈষিক দক্ষতা স্বতই আসিয়া পড়ে কিন্তু আনুসঙ্গিকভাবেও সহকারীভাবে। এ বেশ উপলব্ধ করা যায় যে, গান, বাজনা, খোদাই কাজ—এ সমস্ত ব্যায়াম-ক্রীড়া নহে; ইহারা শিল্পকলা, এবং শিল্পকলার হিসাবেই ইহাদের অনুশীলন করিতে হয়। এই বিষয়ের আলোচনা পরে করা যাইবে।

শিল্পকলা ও ব্যায়াম-ক্রীড়ার মাঝে আসিয়া পড়ে—নৃত্য :—

নৃত্য ব্যায়াম-ক্রীড়ার মতোই শ্রদ্ধেয়,প্রীতিকর ও কেজো।

প্রাচীন ও আধুনিক নৃত্যের তুলনা করার এ স্থান নহে। আধুনিক নৃত্যগুলিকে "বিদেশী" বলা হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাকে "পুরাতন ফরাসী নৃত্য" বলা হয়—সেই "পোল্‌কা, "মাজুর্কা" "ওয়াল্‌স" "স্কটিশ—এই সব নৃত্য আমাদের দেশে উৎপন্ন হইয়াছে—এই সব নামে কি তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়? আধুনিক নৃত্যগুলাকে অসুবিধাজনক বলিয়া দোষদেওয়া হয়;—Valse এরও সেই বদ্‌নাম আছে।

Werther, Sharlott এর সঙ্গে নাচিয়া তাহার পর প্রতিজ্ঞা করিলেন—"তাঁহার স্ত্রী, তিনি ছাড়া আর কাহারও সহিত কখনো নৃত্য করিবেন না।" এই সব বাদবিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কি প্রাচীন কি আধুনিক—নৃত্যের অপব্যবহার হইতেও পারে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, নৃত্য জিনিষটা কেজো। যদি তোমার ছেলেকে হিসাব-লেখক করিয়া তুলিবার মৎলব থাকে, তাহাকে নাচিতে শেখাও; সহজ শোভনভাবে সংসারে প্রবেশ করা কোন মানুষের পক্ষেই নিতান্ত ছোট জিনিস নহে। শোভন-আচরণ ও শোভন অঙ্গভঙ্গীর বিশেষ তালিম দিবার প্রথা আর এ যুগে প্রচলিত নাই—এযুগে নৃত্যই সেই অভাব পূরণ করিতে পারে,—নৃত্যের দ্বারাই শোভন-আচরণ ও অঙ্গভঙ্গীর প্রকৃষ্ট শিক্ষা হয়। তা ছাড়া, নৃত্য সঙ্গীতের ভগিনী। সঙ্গীতের সহিত নৃত্যের মিলন হয় ছন্দ-তালের সহযোগেই। আমি বিশেষজ্ঞদিগের নিকট শুনিয়াছি নৃত্যের মধ্যবর্ত্তিতার দ্বারা, শিশুদিগকে সঙ্গীতের সহজতত্ত্বগুলি শিখাইয়া, আজকাল খুব দ্রুত ও উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। ব্যায়াম-ক্রীড়াদি যে সব সুবিধা, তাহার প্রায় সমস্তই নৃত্যের মধ্যে আছে—অধিকন্তু, নৃত্য একটা শিল্পকলা, সামাজিক ধরণের শিল্পকলা—ভাবুক ভাব-রসাত্মক (sentimental) শিল্পকলা বলিলেও হয়। আমার ব্যাখ্যা-অনুসারে আর্ট—নৃত্যের দ্বারা কলঙ্কিত বা লাঞ্ছিত হয় না।

(ক্রমশঃ)

দিবা-শেষে

আজি দিবাশেষে,
বিশ্বের রহস্যময় পরিপূর্ণ বেশে,
কি কথা কহিলে কাণে কাণে ;
বিশ্ব তার সবটুকু জানে কিগো জানে ?
ক্লান্তি পাশে মানি পরাভব,
জানে কি লভিতে তব অতুল বৈভব ?—
নবীনের জয়-যাত্রা আরম্ভিতে পরাজয় মাঝে,
গুমরি উঠেনি ধরা লাজে ?
রাতে সারা দিবসের ক্ষুধা ;—
কোথায় সঞ্চিত তব সঞ্জীবনী-সুধা,
সে খবর কাণে কাণে ব'লিবে কি তুমি চুপে চুপে ;—
বিশ্বের রহস্য-কথা ব্যক্ত আজি কোন্ মায়ারূপে ?... ...

দীর্ঘ সারা দিনমান খেটে
অপূর্ণ রহিল কাজ, বেলা যায় কেটে ;
বাড়ে শুধু নিরাশার দুর্ব্বিষহ গ্লানি ;—
ব্যর্থতার উপহাস ঘরে তুলি আনি।
লজ্জানত আঁখি
অতীত কলঙ্কভরা পিছনের পথে চেয়ে থাকি,
বারে বারে ভরি ওঠে তপ্ত আঁখি-জলে ;
কি বলে বোঝাই তারে ; সান্ত্বনায় কোন্ কথা বলে ?
অগৌরব গাঢ় চারিপাশে ;
তবু দিবা-অবসানে শান্ত মন কি পূর্ণ বিশ্বাসে !

ফিরে ফিরে চায় তার অপূর্ণ কাজের পানে চাহি,
ব্যর্থ কৃতকার্য্যতার লজ্জাপথ বাহি,
ফেরে জীর্ণ বাসে আপনার ;
অপূর্ণতা মাঝে পায় কি করে সে পূর্ণতা অপার ?... ...

দিবসের খুঁটিনাটী কাজ
সাঙ্গ করিল যেই, দিবাশেষে আজ
লভি পরিপূর্ণতার নিরমল শুভ আলিঙ্গন,
তৃপ্ত আজি বুভুক্ষিত ক্লান্ত দেহ-মন !—
সে ত নহে মিছে,
গৌরবের ইতিহাস ধ্বনিয়া উঠিছে তার পিছে
তাহার অতীত এক পরিপূর্ণ সফলতাময়।
পরিতৃপ্ত দেহে মনে,—সে ত মোটে অসম্ভব নয় !

কিন্তু আজি দিবা-অবসানে,
কেহই বঞ্চিত নহে তব শুভ দানে !
মিছে যার কেটে গেল দিন,
জীবন-ভাণ্ডার যার শূন্য পুঁজি-হীন ;
ব্যর্থ মিছে খাটুনির শেষে,
সেও তৃপ্ত তব দান লভিয়া নিঃশেষে !
ভাবি তাই মনে,—
বর্ত্তমান সমুজ্জ্বল নয় শুধু অতীতের ধনে !—
বর্ত্তমান যার ব্যর্থ অতীত সে লজ্জাভার গুরু,
সে ত তৃপ্ত ভবিষ্যতে সফলের জয়যাত্রা করিবারে সুরু !

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়।

জ্যোতির্বিদ্যার ক্রমোন্নতি

জ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র উপায় যে চিন্তা ও জিজ্ঞাসা, ইহা সকলের জানা থাকিলেও অতি অল্প লোকেই ইহার অনুসরণ করে। সাধারণ লোকের এই দুইটিরই অভাব অত্যন্ত অধিক। তাহাদের আশে-পাশে নিত্য কত ঘটনা ঘটিতেছে, কিন্তু সেগুলি কেন বা কেমন করিয়া হয় তাহারা তাহার কিছু জানেও না বা জানিবার চেষ্টাও করে না। 'মাটিতে জিনিস পড়ে কেন ?' 'নানা রকম শব্দ একসঙ্গে শোনা যায় কেন' ? 'আকাশ নীল দেখায় কেন ?' প্রভৃতি প্রশ্ন তাহাদের মনে কখনও উদয় হয় না।

সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিলেও যাঁদের আমরা

বিদ্বান বলে জানি তাঁদের মধ্যেও হয়ত অনেকের এ সমস্ত বিষয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। আমি নিজে কোন এক উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্রলোককে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে জলে বুদ্বুদ হয় কেন? তিনি উত্তরে বলিলেন যে একথা তাঁর কখনও মনে উদয়ই হয় না। এই বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মাঝেই যখন এই অবস্থা, তখন মানব-সভ্যতার প্রথম অবস্থায় সেই পুরাকালে মানুষের জ্ঞানের স্পৃহা যে কত অল্প ছিল তাহা সহজেই বোধগম্য। সাধারণ লোক আজও যেমন তেমনই চিরকাল নিজেদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা লইয়া ব্যস্ত আছে ও থাকিবে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা লইয়া সময় নষ্ট করিবার মত দুর্বুদ্ধি তাহাদের কখনও হয় নাই বা হইবেও না। কিন্তু প্রত্যেক যুগেই এমন কতকগুলি মহাত্মা জন্মান যাঁরা জগৎকে একটু ভিন্ন চক্ষে দেখেন। তাঁহারা সংসারটাকে কেবল একটা কেনা-বেচার বাজারের মতই দেখেন না। তাঁহারা ভগবানের রাজ্য যে কোন নিয়মে চলিতেছে তাহা জানিতে চান ও সেই জ্ঞানের ভাগ জগৎকে দেন। অবশ্য এজন্য প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় সময় সময় সাধারণের কাছে যথেষ্ট নির্য্যাতনও সহ্য করেন।

আমাদের দিনে সস্তার আবিষ্কারের বাজারে অনেকেই বিজ্ঞানের নামে সামান্য নূতন কিছু বলিয়াই এক একজন মস্ত আবিষ্কারক হইয়া উঠেন। ইহারা মানবজাতির জ্ঞান ভাণ্ডারে সামান্য কিছু দান করিলেও, জ্ঞানের নূতন রাজ্য বড় একটা দেখাইতে পারেন না। কিন্তু য়্যারিষ্টটল, আর্কি-মেডিস্, হিপার্কস্, কোপার্ণিকস্, নিউটন, আইন্‌ষ্টাইন প্রভৃতির কথা স্বতন্ত্র। এঁরা বিজ্ঞান-জগতে বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন।

অতি প্রাচীনকালের বৈজ্ঞানিকদের কথা আমরা এখন অতি অল্পই জানি। গ্রীকরা কোন কোন বিষয়ে বেশ একটু অগ্রসর হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের বিজ্ঞান ও দর্শন এতটা সংমিশ্রিত যে তাহার কতটুকু দর্শন আর কতটুকু বা বিজ্ঞান তাহা স্থির করা একরকম অসম্ভব। আর তাহার বেশীর ভাগ বিষয়ই অনুমানের উপর নির্ভর করে, প্রমাণের উপর নয়। কারণ তাঁহারা প্রকৃতিকে নিজের মনের মত করিয়া দেখিয়াছিলেন, প্রকৃতির বিশেষত্ব দিয়া দেখেন নাই। সেজন্য তাঁহাদের আবিষ্কার সত্য ও মিথ্যায় পূর্ণ; আর তাহা এখন পৃথক করাও কঠিন। ইহা ব্যতীত তাঁহাদের আবিষ্কারের বৃত্তান্ত এখন আর কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার কতক বা য়্যালেক্‌জ্যাণ্ড্রিয়ার অগ্নিকাণ্ডে, কতক বা বর্ব্বর জাতির আক্রমণে আর কতক বা অন্ধকার যুগে নষ্ট হইয়াছে। তাই সেগুলি আবার এ যুগে নতুন করিয়া আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। তবে পুরাকালের বৈজ্ঞানিকদের বিষয় যা কিছু জানা যায় তাহাতে বোধ হয় যে আর্কিমেডিসই শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকেই একরকম পদার্থ-বিদ্যার জনক বলা যাইতে পারে।

পুরাতন বিজ্ঞান নষ্ট হওয়ার পর ও আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে প্রায় এক হাজার বৎসর ইউরোপে কোন রকম বিজ্ঞান চর্চ্চাই ছিল না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে সে সময়ে এক আরবরাই জগতে বিজ্ঞানের সেবা করিত। তবে আরবদের বিদ্যার অধিকাংশই যে ভারতবাসীদের নিকট হইতে লওয়া তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করেন। কেননা তা হইলে তাঁহারা যে পরাধীন ভারতের কাছেও ঋণী ইহা স্বীকার করিতে হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রোজার বেকন-ই একরকম আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার করেন। তবে তিনি বড় বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহার কথা সে সময়ের লোকে বড় একটা বুঝিত না তাই তাঁহার অদ্ভুত চরিত্র ও অগাধ পাণ্ডিত্যের অপরাধে তাঁহাকে কারাগারে যাইতে হইয়াছিল। তাঁহার দুইশত বৎসর পরে লিওনার্ডো-ডি-ভিন্সির জন্ম হয়। তিনি একজন খুব প্রসিদ্ধ আর্টিষ্ট ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম Perspetcive এর নিয়ম-কানুন, আলো, ছায়া ও বস্তুর সাম্য প্রভৃতি বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত না হইলেও বেশ সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়াছেন। এই সময়ে মুদ্রাযন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়। সেজন্য ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই আধুনিক

সময়েই (১৫৪৩ সালে) কোপার্ণিকসের জীবনব্যাপী সাধনার ফল পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।

কোপার্ণিকসের আসল নাম নিকোলা কোপার্ণিক। আজকাল যেমন ইংরাজির অনুকরণে আমাদের মধ্যে অনেকেই মিত্রকে মিটার; দত্তকে ডেটা; বন্দ্যোপাধ্যায়কে বোনার্জ্জি প্রভৃতি বিকৃত পদবীতে রূপান্তরিত করিয়া সুখী হন সেই-রকম সে যুগে লোকে নিজেদের নামটা একটু ল্যাটিন স্বরে উচ্চারিত হইলে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। কোপার্ণিকও এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাই তিনিও কোপার্ণিকস্ লিখিতেন। তিনি জার্ম্মাণীর থার্ণ সহরে১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্র্যাকো হইতে ভৈষজ-বিদ্যা, সাহিত্য ও জ্যোতির্বিদ্যায় উপাধি লাভ করিয়া বোলগাঁতে অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করেন। তার কিছুদিন পরে তিনি রোমে গণিতের অধ্যাপকের কাজ করেন। শেষে মিশনারী-দলে চাকুরি লইয়া নিজের জন্মভূমির প্রধান গির্জ্জায় পাদ্রী হইয়া আসেন ও জীবনের শেষ পর্য্যন্ত শান্তির সহিত অধ্যয়নেই সময় কাটান। এখানে তাঁহার জ্ঞানের যশ শীঘ্রই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ও নানা দূর দেশ হইতে তাঁর অনেক শিষ্য আসিয়া জুটে। কোপার্ণিকসের পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে পৃথিবী স্থির; চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ তার চারিদিকে ঘুরিতেছে। কোপার্ণিকস্ একদিন এক দ্রুত যানে যাইতে যাইতে রাস্তার ধারের গাছপালাগুলি ছুটিতেছে বোধ হওয়ায় অনুমান করেন যে সূর্য্যের চারিদিকেই পৃথিবী ঘুরিতেছে। ইহার পর তিনি পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের সম্বন্ধে অনেক বৎসর ধরিয়া গবেষণা করেন ও গ্রহদের গতিবিধির বিবরণ সবিস্তারে De Revolutionibus Orbium Celstium এ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার জীবনের শেষ সময় যখন তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত, তখন ইহা মুদ্রিত হয় ও মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে ইহাকে পুস্তকাকারে তিনি দেখেন।

কোপার্ণিকস্ নির্জ্জনতাপ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, উৎসাহী ভগবদ্-ভক্ত ও ভাবুক ছিলেন। তিনি ভাবরাজ্যে এমন পরিবর্ত্তন আনিয়াছিলেন যে তাহার আর তুলনা হয় না। যখন

সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ ঘুরিতেছে, এমন কি বাইবেলেরও যখন সেই অনুশাসন তখন তিনি প্রচার করিলেন যে সূর্য্য স্থির আর পৃথিবী তার চারিদিকে ঘুরিতেছে! এখন অবশ্য আমরা এ মতটা চার বৎসর বয়স হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু সে সময় এটা ভাবাও দুষ্কর ছিল না কি? এখনই কি সকলে প্রথমে ধারণা করিতে পারেন যে পৃথিবী এই সমস্ত বাড়ী-ঘর পাহাড়-পর্ব্বত বন-জঙ্গল লইয়া সেকেণ্ডে ১৯ মাইল বেগে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে? আমরা যদি এমতে অভ্যস্ত না হইতাম তা হইলে এটা আমাদের কাছে একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হইত না কি? সেজন্য সেকালে সাধারণে এ কথায় যে একটুও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই তাহাতে একটুও বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কোপার্ণিকস্ নিজে একজন পাদ্রী হইয়া স্বয়ং ধর্ম্মগুরু পোপকে বইখানা উৎসর্গ করিয়াছিলেন আর সাধারণেও ব্যাপারটা প্রথমতঃ ভাল বোঝে নাই তাই তাঁহাকে সেই ধর্ম্মের গোঁড়ামির যুগেও তাঁহার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় নাই। কিন্তু পরে যখন গভর্ণমেণ্ট বুঝিলেন যে তাঁহার এই মত লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস কি রকমে নষ্ট করিয়া দিতেছে তখন গভর্ণমেণ্ট ইহার প্রচারকদের অমানুষিক অত্যাচার করিতে এমন কি ফাঁসী পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

সাময়িক ধর্ম্মমতেরও বিরুদ্ধতা ব্যতীত কোপার্ণিকসের মতের বিরুদ্ধে তখনকার অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরাও নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিতে লাগিলেন, তিনিও তাঁহাদের যুক্তি যথাসম্ভব খণ্ডন করিলেন।

পৃথিবী যদি ঘুরিতেই থাকে তবে আমরা তাহা অনুভব বা কল্পনা করিতে পারি না কেন?

অনুভব করিতে পারি না, কারণ ইহা সমান ভাবে সমান বেগে (uniform) ঘুরিতেছে। আর কল্পনা করিতে পারি না আমাদের কল্পনা-শক্তির অভাবে! জগতে আরও অনেক ঘটনা ঘটে যাহা আমাদের কল্পনাতীত, তাই বলিয়া কি সেগুলি মিথ্যা?

নক্ষত্রগুলির স্থানের কোন পরিবর্ত্তন হয় না কেন?

আঠারো কোটী দূরে থাকে ডিসেম্বর মাসে; অথচ দুই সময়েই একই তারা একই স্থানে দেখি কেন?

নক্ষত্রগুলি পৃথিবী এমন কি সৌরজগৎ হইতে অসংখ্য (infinite) মাইল দূরে। সেগুলিকে যে কেবল পৃথিবীর উপর হইতেই একই অবস্থায় দেখা যায় তাহা নয়, সৌর জগতের সমস্ত গ্রহদের উপর হইতেও একই অবস্থায় দেখা যায়।

বুধ ও শুক্র যখন পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের নিকটে, তখন চন্দ্রের মত তাদের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না কেন?

হ্রাসবৃদ্ধি নিশ্চয়ই হয় তবে আমাদের দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ তাই আমরা তাহা দেখিতে পাই না। যদি কখন এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার হয় যাহাতে আমাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, তাহা হইলে আমরা ইহা দেখিব।

পৃথিবী যদি সেকেণ্ডে ১৯ মাইল বেগে ঘুরিতেই থাকে তাহা হইলে কোনও উচ্চ স্থান হইতে কোন জিনিষ ফেলিলে তাহা পিছাইয়া যায় না কেন?

সম্ভবতঃ পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল জিনিসটীকে পৃথিবীর সহিত চলিতে সাহায্য করে।

বাস্তবিক পরে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ-যন্ত্র আবিষ্কার করার পর দেখিলেন যে বুধ ও শুক্রের চন্দ্রের মতই হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। আরও আমরা এখন জানি যে খুব উচ্চ মন্দিরের উপর হইতে যদি কোন দ্রব্য মাটিতে নিক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে সেটা পিছাইয়া না গিয়া বরং একটু আগাইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে পৃথিবীর দৈনিক গতির জন্য মন্দিরের চূড়া তাহার তলদেশ অপেক্ষা অধিক বেগে ঘুরিতে থাকে। এখন মন্দিরের চূড়া হইতে নিক্ষিপ্ত বস্তু মন্দিরের চূড়ার বেগেই চলিতে থাকে ও সেজন্য একটু সামনের দিকে আগাইয়া পড়ে। আরও আমরা দ্রুতগামী রেলগাড়ীতে হাত হইতে কোনও জিনিস পড়িলে সেটা আমাদের পায়ের কাছেই পড়িতে দেখি, সেটা পিছাইয়া যায় না। তবে কি প্রমাণ হয় যে গাড়ীটা চলিতেছে না?

এই যে সার্কাসে দ্রুতগামী ঘোড়া হইতে লোক উঠিতে নামিতে দেখিয়া কতই না আশ্চর্য্য হই, কিন্তু একটু লোকটা ঘোড়া থেকে ঘোড়ার গতি লইয়া লাফায় বলিয়া কেবল তাকে একবার উঠা-নামা ভিন্ন আর কিছুই করিতে হয় না।

যাহা হউক কোপার্নিকসের মত মানব-হৃদয়ে যে কি পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল তাহা জানিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব সময়ের লোকের পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের আকার ও গতিবিধি সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল, তাহা একটু জানা দরকার।

যতদূর জানা যায় অতি প্রাচীনকালে লোকে ভাবিত আর এটা স্বাভাবিকও—যে পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র ও তাহার চারিদিকে সীমাহীন সমুদ্র। সূর্য্য একটী দেবতা, তিনি প্রত্যহ একবার রথে করিয়া পৃথিবীর উপরিস্থিত আকাশে বায়ু সেবন করেন। পরে য়্যানাক্সোগোরাস্‌ই প্রথমে নিতান্ত দুঃসাসিকভাবেই বলেন সূর্য্য যে দেবতা ইহা মিথ্যা কথা, ইহা গ্রীসের মত আকারের একটা আগুনের গোলা মাত্র। এই অপরাধের জন্য লোকে তাঁহাকে প্রথমে মারিয়া ফেলিতে গিয়াছিল, কিন্তু কি জানি কেন, শেষে তাঁর প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া তাঁহাকে কেবলমাত্র দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। ইহার বিরুদ্ধে কথা ছিল এই যে সূর্য্য যদি জড় পদার্থই হইবে, তবে রোজ এক স্থানে উদয় হয় কি করিয়া? ইহার সমাধান হইল এই বলিয়া যে পৃথিবীর উত্তরাংশে খুব উচ্চ এক পর্ব্বতমালা আছে, আর সূর্য্য এই পর্ব্বতের পিছন দিয়া সমুদ্রের উপর দিয়া ঘুরিয়া আসে। তখন লোকের এও বিশ্বাস ছিল যে চন্দ্র মাসে একটী করিয়া প্রস্তুত হয় ও তাহারাই টুক্‌রা অংশে নক্ষত্র নির্ম্মিত হয়। পরে লোকের মনে হইল যে পৃথিবীর নীচের দিকেও যাওয়া দরকার, তাই বলা হইল সুইপ্টের (Swift) ল্যাপুটা (Laputa) দ্বীপের মত পৃথিবী কয়েকটী থামের উপর শূন্যে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের দেশে পৃথিবীকে মনে করা হইত যে একটী বিরাট কচ্ছপের উপর চারিদিকে চারিটি হাতী ও তাহার উপর অর্দ্ধগোলাকার পৃথিবী।

নিশ্চয়ই গোলাকার। আজকাল বিদ্যালয়ের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর ছেলেরা ইহার স্বপক্ষে যে জাহাজ চালানোর যুক্তি দেয়, তিনিও তখন সেই সব যুক্তি দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু পৃথিবীর বিপরীত অংশের অধিবাসীকে লইয়া একটু বিপদ হইল। তখন ইহা কেহ ধারণাও করিতে পারিত না যে কেমন করিয়া ঠিক তাদের পায়ের নীচে লোকে শূন্যে ঝুলিতেছে। এখনও ইহা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে বুদ্ধিমান ছেলেদের ইহা বুঝাইয়া দেওয়া মহা কঠিন ব্যাপার।

যাহা হউক কালে এ বাধা কাটিয়া গেল ও লোকে মানিয়া লইল যে পৃথিবী গোল এবং অন্যান্য সকল জগৎ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহাদের সাতটী যথা চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি প্রত্যেক দিনে এক এক ঘণ্টার জন্য পর্য্যায়ক্রমে পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিতেছে। এবং যে গ্রহটী দিনের প্রথম ঘণ্টাটির উপর আধিপত্য করিত তাহার নাম অনুসারে দিনের নাম রাখা হইত। যেমন সূর্য্য যদি রবিবারের প্রথম ঘণ্টার উপর আধিপত্য করে তাহা হইলে শুক্র দ্বিতীয়, বুধ তৃতীয়, এইরূপে সূর্য্য ৮ম, ১৫শ, ২২শ, শুক্র ২৩শ, বুধ ২৪শ ঘণ্টার উপর আধিপত্য করিবে, ও পরের দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি চন্দ্র ও সেই হেতু তার নাম সোমবার। তাই সপ্তাহের দিনগুলির নাম হইতেই জানা যায় গ্রহদের অবস্থিতি (order) সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদের কি ধারণা ছিল।

তার পর গ্রহদের গতিবিধির একটা নিয়মাধীন করা শেষে আর এক বিপদ হইয়া উঠিল। ইহা পুরাকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী (Hipperchus) কতকটা ঠিক করেন। টলেমির (Ptolemy) মত বলিয়া যে মত অধুনা প্রচলিত তাহা তাঁহারই আবিষ্কৃত। কিন্তু টলেমিই ইহা জগতে প্রচার করেন বলিয়া ইহা তাহারই নামে চলিতেছে যদিও এই মতে যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তি আছে তথাপি ইহা অনেকটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

টলেমির মত প্রচার হইবার প্রথম প্রথম (Eudoxus)

এক একটী কাঁচের (crystal) পাত্রের মধ্যে স্থাপিত ও সর্ব্বশেষে একটী বড় পাত্রে নক্ষত্রগুলি স্থাপিত। নক্ষত্রদের পাত্রটির নাম primum mobile ইহাই অন্যান্য গ্রহদের গতি দিত। এই সমস্ত গ্রহরা যখন পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিত তখন একটি স্বর্গীয় সুরের উৎপত্তি হইত। সেই সুর অতি ভাগ্যবান ও পুণ্যাত্মা লোক শুনিতে পাইতেন। পাইথাগোরাসের (Pythagoras) শিষ্যরা মনে করিতেন যে তাঁহাদের গুরু এই সুর শুনিয়াছিলেন। পরে হিপার্কস্ ও টলেমি বলেন যে গ্রহদের গতির জন্য Primum mobile এর কোন হাত নাই। তারা আপনিই গোলাকার, পাক খাইতে খাইতে (Epicyclic train) ঘুরিতেছে।

বাস্তবিক যদি প্রত্যহ কোন গ্রহের যথা মঙ্গল কিম্বা বৃহস্পতির গতি লক্ষ্য করিয়া কোন নক্ষত্রের অবস্থিতি অনুসারে একটা মানচিত্র আঁকা যায় তাহা হইলে বেশ বুঝা যায় যে গ্রহদের গতি কখনও নিয়মিত নয়। কোন সময়ে বোধ হয় ইহা আগাইয়া যাইতেছে, কোন সময়ে বোধ হয় ইহা স্থির হইয়া রহিয়াছে, আবার কোন সময়ে বোধ হয়, ইহা পিছাইয়া যাইতেছে।

গ্রহদের এই স্থিতি ও বক্রগতির কথা সেকালের পণ্ডিতেরা বিশেষ ভাবেই জানিতেন। আমাদের দেশেও ইহা বিলক্ষণ জানা ছিল। এখনও আমরা ঠিকুজি, কোষ্ঠীতে গ্রহদের অতিচারী মহাতিচারী বক্রী প্রভৃতি আখ্যায় দেখিতে পাই। এই নানাবিধ গতির কারণ পণ্ডিতেরা জ্যামিতি-সংক্রান্ত নানারকম জটিল প্রস্তাবের দ্বারা নিরূপণ করিতে চাহিতেন। অবশেষে কোপার্ণিকস বলিলেন যদি মনে করা যায়—সূর্য্য স্থির ও পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত গ্রহ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে; তাহা হইলে ইহার সহজ মীমাংসা হয়।

উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাক পৃথিবী ও বৃহস্পতি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। পৃথিবীর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে যে সময় লাগে—তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সময় লাগে বৃহস্পতির। এখন পৃথিবী ও বৃহস্পতিকে

রেখা সুদূর আকাশস্থিত একটী বড় বৃত্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিন্দুতে মিশিবে। এই সংযোজক বিন্দুগুলির অবস্থিত কখনও বা পর-পর শ্রেণীবদ্ধ, কখনও বা একই স্থানে স্থির আর কখনও বা পিছাইয়া আসিতে দেখা যাইবে। এইরূপে কোপার্ণিকস গ্রহদের গতি কতকটা সরল করিলেন বটে কিন্তু কেপ্‌লারই (Kepler) ইহার যথার্থ সমাধান করেন। তিনিই নানারকম প্রমাণ দিয়া বলেন যে গ্রহদের ভ্রমণ-পথ ডিম্বাকার (elliptic).

গ্রহদের গতির আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এখানে আর একটা কথা বলা উচিত। আমরা এখন সকলেই জানি যে বৎসরের দুইটা দিনে দিন রাত সমান। সেকালের পণ্ডিতেরাও দেখিয়াছিলেন যে ইহা বৎসরের ঠিক একই সময়ে হয় না বরং নির্দ্দিষ্ট সময়ের একটু আগে ঘটিয়া থাকে। হিপার্কস্‌ই প্রথমে ইহা লক্ষ্য করেন। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে দিনরাত সমান কেন হয়, আগে জানা দরকার।

এখন পৃথিবীর আকাশ-পথের (orbit) সমতলটিকে (Plane) যদি শূন্যে আরও বিস্তীর্ণ করা যায়, তাহা হইলে সূর্য্যের দৃশ্যতঃ গতির পথটি হয়। এই পথটির নাম ecliptic; কেন না চন্দ্র এ পথের উপর থাকিলেই গ্রহণ হয়। সূর্য্য এই রাস্তা সর্ব্বদা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে আর অন্যান্য গ্রহরা কখনও বা ইহার উপর দিয়া কখনও বা ইহার নীচ দিয়া ঘুরিতে থাকে। চন্দ্রের ত কথাই নাই। এখন গ্রহণ হইতে হইলেই চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী সকলকেই এক সরল রেখায় থাকিতে হয়। আর তাহা অসম্ভব যতক্ষণ না তাহাদের কোন না কোন অংশ এক সমতলে(ecliptie plane) থাকে। অন্যদিকে পৃথিবীর বিষুব রেখাও (equator) যদি আরও বিস্তীর্ণ করা যায় তাহা হইলে আর একটি বড় বৃত্ত (Eqninoctial) হয়। এই দুই বৃত্ত পরস্পরকে দুই স্থানে কাটে। এই দুই বিন্দুর নাম Equinoxes. Eqninox বলার কারণ এই যে সূর্য্য যখন ecliptic-এর এই বিন্দুতে থাকে, তখন Equator-এর উপরেও থাকে এবং সেই জন্য সূর্য্য পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে থাকে বলিয়া পৃথিবীতে দিন-রাত এক মাপের হয়।

হিপার্কস্ সূর্য্যের অবস্থিতি অনেকদিন ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া ঠিক করিলেন যে এই দুই বিন্দু স্থির নয়। ইহারা নক্ষত্রদের মধ্যে ধীরে ধীরে যেন সূর্য্যকে ধরিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। সে জন্য বৎসর পূর্ণ হবার ২০ মিনিট ২৩½ সেকেণ্ড আগে পূর্ণ একটী পাক খায়! এই ধীরে ধীরে আগাইয়া আসাকে precession of Equinox বলে।

কোপার্ণিকস্ এখন দেখিলেন যে পৃথিবী ঘুরিতেছে ইহা মানিয়া লইলে এই precession এর বেশ কারণ পাওয়া যায়। সাধারণে জানে যে পৃথিবীর অক্ষদণ্ড (axis) সকল সময়েই নিজের সঙ্গে সমান্তরাল থাকে। কিন্তু এই অক্ষদণ্ডকে স্থির মনে না করিয়া যদি ধরা যায় যে ২৬০০০ বৎসরের ইহা একটি cone এর আকারে ঘুরিতেছে তাহা হইলেই এই precession এর আর কোনও বাধা থাকে না।

পৃথিবীর অক্ষদণ্ডের দুই দিক যদি শূন্যে বিস্তীর্ণ করা যায়, তাহা হইলে এই আকাশস্থিত উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ধীরে ধীরে এক একটি বৃত্ত প্রস্তুত করিবে। ইহা ইহা এখন Lesser Bear এর প্রধান নক্ষত্রে অবস্থিত এবং এইজন্য ইহাকে আমরা ধ্রুব তারা বলি। কিন্তু ঐ তারাটিই চিরকাল ধ্রুবতারা ছিল না বা থাকিবে না। কোপার্ণিকসের অনুমিত পৃথিবীর অক্ষদণ্ডের এই conical গতির দ্বারা তখন অনেক রহস্যের সমাধান হইয়াছিল। তবে কোপার্ণিক ইহার হেতু নির্দ্দেশ করেন নাই। ইহার কারণ নিউটন (Newton) দিয়াছেন।

পরিশেষে আমরা দেখিতেছি যে কোপার্ণিক জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক না হইলেও তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় বড় কম পরিবর্ত্তন ঘটান নাই। তিনিই সূর্য্য ও পৃথিবীকে তাঁদের স্ব স্ব স্থানে বসাইয়াছেন, তিনিই গ্রহদের গতির জ্যামিতির জটিলতা কতকটা সরল করিয়াছেন ও precession of Equinox যে পৃথিবীর অক্ষদণ্ডের conical গতির ফল, তাহা তিনিই বলেন।

প্রতীক্ষা

১

আমার এই অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী কারো কাছেই প্রকাশ করবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আজ এই জীবন-মধ্যাহ্নে আমার বুকের ব্যথা কিছুতেই আর চেপে রাখতে পারছি না। তাই আজ কালির আঁচড়ে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছি। সেগুলো এই কালির দাগের চেয়েও কালো।

কে জান্তো যে, যৌবনের প্রথম মুকুলিত অবস্থাতেই আমার সকল মঞ্জরী অকালে চ্যুত হয়ে ঝরে পড়্‌বে, যৌবনাগমের প্রথম উজ্জ্বল আলো এক মুহূর্ত্তের জন্য উদ্ভাসিত হয়েই চির-অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবে! হৃদয়ের পুষ্প-উদ্যানের সকল বীথির সকল পুষ্প পুষ্পিত হতে না হতেই ঝড়ো দমকা হাওয়ায় ছিঁড়ে পড়ে মায়া-কাননের মত মুহূর্ত্তে মিলিয়ে যাবে! চোখের সাম্‌নে প্রথম প্রেমের রঙিন্ ফুলঝুরি জ্বলে উঠেই, পরমুহূর্ত্তে গভীর অন্ধকারের কালো যবনিকা চিরদিনের মত জীবনের সাম্‌নে ঝুলে পড়্‌বে! যখন আমার চারিদিকে পিকের কুহুতান, ভ্রমরের মৃদু গুঞ্জন এক অপূর্ব্ব মায়া-রাজ্যের সৃষ্টি করে তুল্‌ছিল, ঠিক সেই সময়েই আমার জীবন একটা গভীর অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল!

আমি বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। কাজেই খুব আদরের ছিলাম। তারপর আমি নাকি ভারী সুন্দরী ছিলাম—গড়নও ছিল নাকি ঠিক নামজাদা সুন্দরীর মত। আজ মনে হয়, আমি যদি সুন্দরী না হয়ে, বাপ-মায়ের অনাদৃত হয়েও, সুখে ঘর-করনা করতে পেতাম, তাহলেও জীবন সার্থক হতো। আজ সকল সুখের সার হারিয়ে, এই রূপ ও আদরের উপর ঘৃণা জন্মে গেছে। কারো কাছেই মুখ দেখাতে ইচ্ছা করে না, এমনি দুঃসহ লজ্জা! যাক্ সে সব কথা।

বাপ-মায়ের আদরে একটু বড় হয়ে উঠ্‌তেই বাবা মা তখনই আমার বিয়ে দেবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠ্‌লেন। যদিও আমার বিয়ের বয়স তখন মোটেই হয় নি—গাছ-কোমর বেঁধে পাড়ার সমবয়সী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা করে বেড়াতাম। আর বাড়ীতে পুতুল-খেলায় পুতুলের বিয়ে দিতাম। আসল বিয়ে যে কি, তা' বোঝবার মত বয়স তখন আমার মোটেই হয়নি, এতই ছোট ছিলাম। বোঝবার বয়স যখন হলো, তখন কিন্তু সব হারিয়ে বসে আছি। বিয়ের কথা হতেই ভাবলাম, এই পুতুলের বিয়ের মতই বুঝি একটা কিছু হবে। তারপর একদিন পাড়ার মালতীর বিয়ে দেখলাম—বর কত বাজনা করে বিয়ে করতে এলো। দেখে মনে বড় আনন্দ হলো। ভাবলাম, ভারী মজা, আমার বরও এইরকম বাজনা আলোর মধ্যে দিয়ে বিয়ে করতে আস্‌বে। বেশ মজা হবে, দু'জনে মিলে পুতুল খেলবো। কিন্তু মালতীর বরের মতন যদি সে বড় আর বুড়ো হয়, তা হলেতো সে আমার সঙ্গে পুতুল খেল্‌বে না! সে সব কথা ভুলে গিয়ে ভাবতে লাগলাম, মালতীর সেই বিয়ের দিনের অলঙ্কার-শোভিত হাস্যোজ্জ্বল দেহের দৃশ্য। আমার বিয়ে হলে আমিও অমনি কত গহনা পর্‌বো। কিন্তু হঠাৎ বিয়ের কিছুদিন পরে মালতী একদিন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরে এলো। তার পরণের সব গহনা কাপড় কে কেড়ে নিয়েছে। তার বদলে তাকে নিরাভরণা করে শুভ্র কাপড়ে সাজিয়ে দিয়েছে। তাকে ঘিরে সবাই খুব কাঁদ্‌তে লাগলো।

ব্যাপার কি বুঝতে পার্‌লাম না। মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম,—হ্যাঁমা, বিয়ের পর সবাই কি এমনি করে ফিরে আসে? তাহলে কিন্তু ভারী মজা হয়, চিরদিন তোমার কাছে থাকতে পাই। মা ধম্‌কে উঠলেন, বললেন,—ও সব অলুক্ষণে কথা বলতে নেই। বাবাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে তিনিও বকে উঠলেন। কিছুই বুঝতে পার্‌লাম না।

তারপর সত্য সত্যই এক বসন্তের সন্ধ্যায় চ্যুত আম্র-মুকুলের গন্ধ ও ভ্রমরের গুঞ্জন-গীতের মধ্যে দিয়ে আমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের দিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমায় সাজিয়ে একটা ঘরের ভিতর একলা বসিয়ে রাখলে। আমি

চুপ করে' বসে রইলাম, আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে, বিয়েতে এত হাঙ্গামা কেন! কই আমার পুতুলের বিয়েয় তো এ সব ঝঞ্ঝাট নেই। তারপর অসহ্য এই একলা চুপ করে বসে থাকা। নাঃ, এ রকম বিয়ে মোটেই ভাল নয়।

ঠিক এমনি সময় সবাই চীৎকার করে' উঠলো. বর আস্‌ছে। দূরে বাজনা বেজে উঠলো। বাড়ীতে চার-পাঁচটা শাঁখ একসঙ্গে গর্জ্জে উঠ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও নেচে উঠলো। আমি ছুটে বর দেখতে বারাণ্ডায় বেরিয়ে এলাম। মা দেখতে পেয়ে বকৃতে বকৃতে টেনে ঘরে নিয়ে এলেন, বর দেখতে দিলেন না। একজন কে বল্‌লে যে, বর একটু পরেই আপনি এসে দেখা দেবে। মনে বড় রাগ হলো, সবাই বর দেখবে, আর আমায় এই ঘরের কোণে একলা চুপ করে বসে থাকতে হবে! এরকম বিয়ের চেয়ে বিয়ে না হওয়া যে ছিল ভাল। আমি গুম্ হয়ে বসে রইলাম।

তারপর খানিক পরে কজনে মিলে আমায় পিঁড়ি-শুদ্ধ ধরে' বাইরে নিয়ে এসে বরের চারিপাশে ঘোরাতে লাগলো। ঘোরানো শেষ হলে বরের দিকে ভাল করে' চেয়ে দেখতে বললে। চেয়ে দেখলাম, বেশ সুন্দর। আর সব চেয়ে আনন্দ হলো যে, এ মালতীর বরের মতন বুড়ো আর গম্ভীর নয়। আমার খেলার সঙ্গী হয়ে এ আমার সঙ্গে পুতুল খেল্‌তে পার্‌বে। এ ঠিক আমার খেলার সঙ্গী রমেশের মতন বা তার চেয়ে একটু বড়। মনে যেটুকু নিরানন্দের ছোপ লেগেছিল সেটুকু মুছে গেল।

শ্বশুর-বাড়ী এসে দেখলাম যে, আমার মতন আরো তিনজন বৌ রয়েছে। শুন্‌লাম আমার আগে তাদের বিয়ে হয়েছে, তাদের দিদি বলে ডাকৃতে হয়। তাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। বেশী ভালবাস্‌তো বড়দিদি, তারপর মেজ-দিদি, ছোট আমার সমবয়সী ছিল বলে তার সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া-খুনসুটি হতো। সেখানে সব চেয়ে মুস্কিল হলো আমার ঘোম্‌টা নিয়ে। আমি কিছুতেই ঘোমটায় মুখ ঢেকে থাকতে পারতাম না, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো। বাড়ীতে সবাই

বরও আমার সঙ্গে ভারী খুন্‌সুটি আর ঝগড়া করতো; আবার ভালও বাস্‌তো। লুকিয়ে লুকিয়ে আমায় কত খেল্‌না আর খাবার এনে দিতো। আবার ঝগড়া হলেই খেল্‌নাগুলো কেড়ে নিতো, নয়তো আছড়ে ভেঙে দিতো। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,সে পুতুল খেলতে জানে না কি? সে বল্‌লে যে, সে পুতুল খেলা জানে না, তবে লুকোচুরি খেল্‌তে পারে। সেই দিন থেকে তার সঙ্গে লুকোচুরি খেল্‌তাম। আমিই রোজ চোর হতাম। তাকে কোনো দিনও চোর কর্‌তে পার্‌তাম না। আমার জীবন-যুদ্ধেও চিরকাল চোর হয়ে থাকবো বলেই বোধ হয় ছেলে-খেলাতেও চোরই হতাম। এমনি করেই দিন কাটতে লাগলো।

শাশুড়ীর একটু রাগ বেশী ছিল। কথায় কথায় বকৃতেন, তা' নইলে আর সবাই বেশ ভালবাস্‌তো। শ্বশুর-বাড়ীতে কিন্তু বেশীদিন থাকৃতে হয় নি। কিছুদিন থাকবার পরই বাবা বাড়ী নিয়ে এলেন, কারণ আমি ছোট বলে। এখন মনে হয়, সেই সময় না এসে, আরো কিছুদিন যদি ছেলে-খেলার ভিতর দিয়েও তাঁকে অনুভব কর্‌তে পেতাম, তা' হলেও জীবন হয়তো কতকটা সার্থক বলে মনে হতো। মনকে বোঝাবার তবু একটা সান্ত্বনা পেতাম।

বাড়ী এসে আবার পুতুল-খেলায় মন দিলাম। মনও খুসী হয়ে উঠলো যে, আর কারো বকুনি খেতে হবে না। কিন্তু আবার একটু মন-কেমনও কর্‌তে লাগ্‌লো,তাঁর জন্যে। দু'দিনেই কিন্তু তাঁর ছবি মনের ভিতর আবছায়া হয়ে গেল।

এখন মনে হয়, কেন অত ছোট বয়সে বাবা-মা আমায় বিয়ে দিয়েছিলেন। যদি একটু বড় বয়সে বিয়ে হয়ে, ভাল করে সব বোঝবার পর সব হারাতাম, তবুও মনে একটা সান্ত্বনা পেতাম! আর এ যে ছেলে-খেলার মত তাঁকে পেয়ে, হৃদয়ের বুভুক্ষার তীব্রতা বাড়বার মুখেই তাঁকে ছেলে খেলার ভিতর দিয়েই হারিয়ে ফেল্‌লাম। প্রাণের ভিতর অনুভব কর্‌বার পূর্ণ ক্ষমতাও পেলাম না। হিন্দু ধর্ম্ম কি এমনি করে আমাদের মত অবলাকে বধ কর্‌বার জন্যেই এখনও সজীব রয়েছে। কোন শাস্ত্রকারের বিধান-অনুসারে

দিয়ে সমস্ত জীবন ব্যর্থতার অভিশাপে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে হবে! কিন্তু এটুকুও আশ্চর্য্য যে, এই হিন্দুধর্ম্ম আবার কত মহাপ্রাণময়। যে ধর্ম্ম একটা সামান্য নুড়ী-পাথর হতে আরম্ভ করে বিরাট জ্যোতিষ্মান সূর্য্য পর্য্যন্ত বিশ্বদেবতার অস্তিত্ব অনুভব করে, সে ধর্ম্মকে হেয় জ্ঞান করতেও প্রাণ চায় না। এতদূর মহাপ্রাণতার মধ্যে হীন নীচতা যে কি করে লুকিয়ে আছে, এইটাই আশ্চর্য্য! কিন্তু হয়তো সেই সব নীচতার মূলে আমাদের নিজের-নিজের স্বার্থ জড়িত থেকে এই ধর্ম্মকে এত নীচ আর স্বার্থপর করে ফেলেছে। জানি না কবে এর সংশোধন হবে।

মধ্যে মধ্যে বাবা-মা আমায় জোর করে' শ্বশুর-বাড়ী পাঠিয়ে দিতেন। আমার কিন্তু সে সময় ভাল লাগ্‌তো না। সেখানে গিয়ে দুদিন থাকৃতে না থাকৃতেই কান্নাকাটি সুরু করে দিতাম। তারা বিরক্ত হয়ে রেখে যেতো। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে ছেলেখেলার গল্প হতো। বিরক্ত করলে আঁচড়ে কামড়ে তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুল্‌তাম। প্রাণের কথা তাঁর সঙ্গে একদিনও হয় নি। আর প্রাণের কথা জান্‌বার বা বল্‌বার বয়স তখন মোটেই হয়নি। এখন নিজেকে নিজে ধিক্কার দিই, গাল দিই। পোড়ারমুখী, তোর ছোট বয়সে বিয়েই যদি হয়েছিল, তবে তুই জোর করে কেন বড় বয়সের বুদ্ধি এনে তাঁকে প্রাণের ভিতর ধরে রাখ্‌লিনে!

২

তারপর বছর কতক পরের ঘটনা বল্‌ছি। এই বছর কতক আমি মোটেই শ্বশুর-বাড়ী যাইনি। আর তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়নি। এখন আমার প্রাণে, সকল দেহে, যৌবন-বসন্তে নব-জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। হৃদয়-বৃন্তের সকল কোরকগুলি মুকুলিত হবার জন্য আকুলিত হয়ে উঠেছে। প্রাণের ভিতর সদাই যেন একটা কিসের অভাব অনুভব করি। অথচ সে অভাব যে কি, ঠিক তা' ধর্‌তে পারি না। এক এক সময় হৃদয় ব্যথিয়ে উঠে, কান্নায় আকণ্ঠ ফুঁপিয়ে উঠে, তবু ধর্‌তে পারিনা সেটা কিসের অভাব। প্রাণ এক এক সময় যেন কাকে খোঁজে! সন্ধান পায় না, মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়ে। পাড়ার মেয়েরা যখন সবাই হাসি-মুখে শ্বশুর-বাড়ী যায়, তখন আমার প্রাণও যেন এই রকম একটা কিছু করতে চায়। তখনি বুঝতে পারি যে, প্রাণের ভিতর কিসের অভাব আজ জেগে উঠেছে। প্রাণ চায় পরিপূর্ণ সার্থকতা পেতে; কিন্তু পায় না। তাই সে আকুল কান্নায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। চোখের সাম্‌নে আলো রঙিন হয়ে ওঠে; কিন্তু তার মধ্যেও যেন অন্ধকারের আভাস পাই। প্রাণ দিয়ে যেন কাকে ভালবাসতে চাই, কিন্তু প্রাণের লোক খুঁজে পাই না। যদিও পাই, ভাল করে যেন অন্তরে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারি না। মন তখনই নুয়ে পড়ে, যেন বাগানের এক কোণের একটি অযত্নে বর্দ্ধিত পুষ্প আপনা-আপনি ফুটে উঠেই রোদের তাতে, লোকের চোখ থেকে আড়াল হয়ে আম্‌লে পড়েছে।

জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র-তপ্ত স্তব্ধ দুপুরে জানলায় একলা বসে বসে ভাব্‌ছিলাম। কোন্ ছায়া-ঘেরা দূর গাছের উপর থেকে দোয়েলের করুণ টানা-টানা শীষ ভেসে এসে; আমার প্রাণের গোপন কোণ হ'তে সকল ব্যথাকে এক করে অশ্রুরূপে ঝরিয়ে দিচ্ছিল। ভাব্‌তে ভাব্‌তে মন বড় অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। বাবাকে গিয়ে বল্‌লাম যে আমি শ্বশুর-বাড়ী যাবো। বাবার কাছে সকল আব্দার চল্‌তো বলেই বল্‌তে সাহস করলাম। বাবাও রাজী হলেন। যাবার সব জোগাড় হতে লাগ্‌লো, বাবা শ্বশুর-বাড়ীতে খবর দিলেন।

যাবার দিন সকাল হতেই আমার প্রাণের ভিতর আনন্দের মেলা বসে গেল। সে মেলা শুধু হাসি-খুসীর মেলা, ফুলের মেলা—পুষ্পকাননে বসন্তের নব-জাগরণের মেলা। আনন্দ এত বেশী হয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লো যে, নিজের হৃদয়ের মধ্যে যেন আর ধরে রাখ্‌তে পার্‌ছিনা। আজ যে আমার ঈপ্সিতের সঙ্গে আমার মিলন হবে। এত আনন্দ রাখি কোথায়! মানুষের প্রাণে যৌবনের সাড়া লাগার সঙ্গে সঙ্গেই তার অন্তর প্রিয়তমের সঙ্গে মেলবার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে। এইটাই হচ্ছে, বিশ্ব-নিয়মের শাশ্বত প্রথা। তাই আজ আমার প্রাণও, কিছু না বুঝেই, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এত ব্যকুল হয়ে উঠেছে!

গাড়ীতে পা দিয়ে উঠ্‌তে যাব ঠিক এমন সময় এক-খানা পত্র এলো। বাবা পড়ে বল্‌লেন, তাঁর ক্ষয় রোগ হয়েছে, জীবনের আশা বড় কম। আমায় যেতে বারণ করেছে। কারণ রোগ সংক্রামক। মা কেঁদে উঠলেন; বাবার হাত থেকে পত্র খসে পড়্‌লো। আমি কেমন অভি-ভূতের মত হয়ে বাবার কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়্‌লাম। যাওয়া আর হলো না।

যাবার জন্য প্রাণ বড় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। কোন রকমেই দেখতে যেতে দিলে না। এরা যে কেন এত নিষ্ঠুর হয়ে আমায় আটকে রাখলে, বুঝতে পার্‌লাম না। তাঁর প্রাণের কাছে কি আমার প্রাণের মূল্য এতই বেশী! হঠাৎ মালতীর কথা মনে পড়তেই আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। মাগো, তা হলে বাঁচবো কেমন করে! কিন্তু হতভাগী এখনো তো কালামুখ নিয়ে বেঁচে আছি, তিলে তিলে দগ্ধে মর্‌বার জন্য! আর সেই জন্যই বোধ হয় আমার তাঁর কাছে যেতে দেয়নি।

সে দিন বিজয়ার সকাল। পূজা-বাড়ীতে মহামায়ার বিদায়ের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরের কান্না নিয়ে সকাল হলো। আজ আমি যাবোই। বাবাকে বল্‌লাম, আজ আমি শ্বশুর-বাড়ী যাবোই, কিছুতেই বারণ শুন্‌বো না। বাবা একটু ভেবে মত দিলেন।

সন্ধ্যা-বেলা শ্বশুর-বাড়ী এলাম। শাশুড়ী আমায় তাঁর কাছে যেতে দিলেন না, কেন, তা তিনিই জানেন। আমি আস্তে আস্তে বড় আর মেজ যায়ের কাছে গিয়ে তাদের জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেল্‌লাম। তারপর বল্‌লাম, দিদি, আজকের দিনেও কি তাঁকে প্রণাম কর্‌তে পাবো না? কথাটা হয়তো খুব বেহায়ার মত হলো, কিন্তু কিছুতেই চেপে রাখ্‌তে পার্‌লাম না, তাদের কাছে বলে ফেল্‌লাম। বড়দিদি বল্‌লেন,—দাঁড়া, দেখি, সুবিধা কর্‌তে পারি কি না। বলে উঠে চলে গেলেন।

একটু পরে ফিরে এসে আমায় বল্‌লেন,—শীগ্‌গির আয়। মেজদিদিকে বাইরে দাঁড় করিয়ে আমায় তিনি তাঁর ঘরে দিয়ে এলেন। ঘরে গিয়ে তাঁর চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়ে ঢেকে ঢেকে দিয়েছে। বিছানার সঙ্গে তিনি মিশিয়ে রয়েছেন। চোখের জল সাম্‌লাতে পার্‌লাম না। তাঁর পায়ে আজ প্রথম প্রণাম কর্‌লাম, আর অঞ্জলি দিলাম হৃদয়ের ব্যথার উদ্যানের পুষ্প-অশ্রু। আজ মনে হলো যে, এতদিন পরে আমার আজ প্রকৃত বিয়ে হলো। আমার স্বামীকে, দয়িতকে আজ প্রাণ দিয়ে অনুভব কর্‌লাম। কথা কিছুই বল্‌তে পার্‌লাম না। তিনি শীর্ণ হাতে আমার হাত নিজের মুঠোর ভিতর চেপে ধর্‌লেন। সে স্পর্শে কি আকুলতা কি ব্যাকুলতা, আমার প্রাণের ভিতর কি একটা শিহরণ যে সঞ্চরিত হয়ে উঠ্‌লো! মনে হলো, আজ যেন আমার নারী-জন্ম সার্থক হলো! তিনি আস্তে আস্তে আমায় বল্‌লেন—সুধা, তোমায় আমি ভালবাসি। তুমি আমায় ভালবাস?

আমার মন আনন্দে খঞ্জন পাখীর মত নেচে উঠ্‌লো। মন গুম্‌রে উঠলো—ওগো, তোমায় যে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। আর সেই কথা বল্‌বার জন্যেই তো প্রাণ আমার আকুল হয়ে উঠেছে। এতদিন তোমাকেই তো সে খুঁজে বেড়িয়েছে। মুখ ফুটে বল্‌তে যাচ্ছি,তোমায় ভালবাসি, ঠিক এমনি সময় মেজদিদি এসে বল্‌লেন, শাশুড়ী আসছে, শীগ্‌গির চলে আয়। মুখের কথা বলা হলো না। তাঁর পায়ে নিজের সকল সত্তা লুটিয়ে দিয়ে প্রণাম করে, নিজেকে হারিয়ে, ঘর হতে বেরিয়ে এলাম। চোখের জলে দৃষ্টি তখন ঝাপসা হয়ে গেছে, তাঁর ও আমার ও।

তারপর তারা আমায় জোর করে বাপের বাড়ী রেখে গেল। উঃ, কি নিষ্ঠুর তারা! কাছে থাক্‌বার অধি-কারটুকুও দিলে না! তবু আমার মনে এইটুকু সান্ত্বনা রইলো যে আজ তাঁকে স্বামী বলে চিন্‌তে পার্‌লাম। আজই বিয়ের প্রকৃত শুভদৃষ্টি হলো। কিন্তু ভাল করে বাসর জাগা হলো না। ভোর হবার আগেই বাসরের সব আলো যেন কোন্ দৈত্যের বিষাক্ত নিশ্বাসে ম্লান হয়ে গেল।—তাঁকে আর ভাল করে দেখতে পেলাম না। তাঁর মূর্ত্তি ঠিক ছায়ার মত আবছায়া হয়ে গেল, মনের মধ্যে শত চেষ্টাতেও ফুটিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লাম না। এখন শুধু সেই স্মৃতির রেশটুকুই জীবনের সম্বল! আর সেইটুকুর

চলেছি। জানি না, হিসাব মেটাতে পারবো কি না। সেই দিন যে নিজের হৃদয় নিঃশেষে তাঁর পায়ে অঞ্জলি দিতে পেরেছিলাম, এতেই নিজেকে ধন্য মনে হয়!

বাড়ী এসে মন ভারী খারাপ হয়ে গেল। তাঁর সেই রোগ-ক্লিষ্ট মুখ মনের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো, আর অজানিত অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকের ভিতর আঁৎকে উঠতে লাগলো। ছোঁয়াচে অসুখের জন্য তারা আমায় তাঁর কাছে থাকতে পর্য্যন্ত দিলে না! হা রে, পোড়াকপালী আমি, আমার জন্যে তারা আবার ভাবতে গেল! মলেই যে আমার ছিল ভাল। প্রতিমা-ভাসানোর পর যেমন তার খড়-কুটোর কাটামোর আর কোনো কদর থাকে না, তেমনি তাঁকে হারিয়ে আমার জীবনের মূল্যই বা কি! আমি যদি তাঁর ছোঁয়াচের বালাই নিয়ে যেতে পারতাম তো নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করতাম। কিন্তু বোধ হয়, অনেক পাপ করেছি; তাই তার ফল ভোগ করবার জন্য তাঁকে হারিয়েও বেঁচে থাকতে হলো! সেই বিজয়ার দিনই মাত্র তাঁকে ঠিক আপনার বলে চিনতে পেরেছিলাম। সেই দিনই হলো শেষ দেখা! কোন্ রুষ্ট গ্রহের অভিশাপে যে আমার আজ এই অবস্থা, তা এক ঈশ্বরই বলতে পারেন। কোন্ যুগান্তের পাপ আজ এমনি করেই সফল হয়েছে!

দুপুর বেলা। ঘরে একলা বসে বসে কেবল তাঁর কথাই ভাবছিলাম। ঠিক এমনি সময় আমার ভাবনাকে সচকিত করে ঘরে ঢুকলো মালতী, একমুখ হাসি নিয়ে। আমার প্রাণ তাকে দেখেই কেমন অমঙ্গল-আশঙ্কায় দুলে উঠলো। নিজের অজ্ঞাতসারেই মালতীকে চীৎকার করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললাম। মালতী কেমন ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আমি তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। বুকের ভিতর কেমন ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে মনও ভারী খারাপ হয়ে গেল। নিজের অদৃষ্ট বিড়ম্বনা ঢাকতে গিয়ে অনর্থক মালতীর মনে কষ্ট দিলাম! বেচারী হয়তো আমায় আনন্দিত করবার কি না সে ভাবলে সেদিন! পরের অদৃষ্টের দোষ দেখলেই আমরা তাকে মিছি মিছি বিড়ম্বিত করি! কিন্তু নিজের অদৃষ্ট যে,হয়তো তার চেয়েও খারাপ, এ কথা একেবারে ভুলে যাই—বড় আশ্চর্য্য! মালতীকে সেদিন শুধু শুধু অপমানিত করলাম। তাতে আমার অদৃষ্টের কি কিছু পরিবর্ত্তন হলো!

দিনকয়েক পরে একদিন সকালে বাবা এসে বললেন যে, আমার শ্বশুর-বাড়ী থেকে পত্র এসেছে, আমায় যেতে হবে—তিনি দেখতে চেয়েছেন। আমি সেই মুহূর্ত্তেই যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। আজ আমার জীবনের শাশ্বত মুহূর্ত্ত! আজ আমার দয়িত আমায় নিজে স্মরণ করে দেখতে চেয়েছেন, এ কি কম সৌভাগ্য!

শ্বশুর-বাড়ীর দরজার কাছে গাড়ী থামতেই কান্নার ধ্বনি এসে আমার সকল ইন্দ্রিয় বিকল করে দিলে। তবে কি তিনি—ভাবতেও পারলাম না! মাথাটা আপনা-আপনি শিথিলভাবে ঝুলে পড়লো, চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল। টলতে টলতে বাড়ীর উঠানে এসে দেখলাম, তাঁকে বাইরে বের করে উঠানে শুইয়ে রেখেছে। প্রাণ তাঁর কোন্ অনন্ত পথের পথিক হয়েছে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না, তাঁর পায়ের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম। দেখতে চেয়েও দেখা করলেন না, এতই পাপের ভরা আমার হয়েছিল!

জ্ঞান হলে দেখলাম, আমি ঘরে শুয়ে আছি! তাঁকে নিয়ে গেলে। কিছুক্ষণ পরে আমায় গাড়ী করে তাঁর মুখাগ্নি করবার জন্যে নিয়ে গেল। মায়া কাটাবার একি নিষ্ঠুর নিয়ম! যে প্রিয় মুখ একদিন কত প্রিয় ছিল এবং যা শত চেষ্টা করলেও হৃদয় থেকে মুছে ফেলা যাবে না—তেমনি প্রিয়ই থাকবে, তাকেই নিজের হাতে বিকৃত করতে হবে। এর চেয়ে যে নিজের মরা ভাল ছিল। কেন আমার সে মূর্চ্ছা ভাঙলো! হাত-পা সব অবশ হয়ে এলো। তবু আমায় এই নিষ্ঠুর নিয়মগুলো সব খুঁটিয়ে পালন করতে হলো, এমনি শাস্ত্রের শাসন! এই করতে এবং দেখতেই কি তাঁর আমায় দরকার হয়েছিল

চিতায় আমার হৃৎপিণ্ড উৎসর্গ করে তার ছাই নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম।

তারপর একদিন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে নিজের লজ্জা ঢেকে বাপের বাড়ী চলে এলাম, ঠিক মালতীর মত অবস্থা নিয়ে। শ্বশুর-বাড়ী ঠাঁই হলো না অলুক্ষণে বলে। বাইরে আমার সব শুভ্র করে সাজিয়ে দিয়েছে; কিন্তু মনকে কি শুভ্র করতে পেরেছে! সে যে ঠিক অমাবস্যার অন্ধকারের মতই কালো হয়ে গেছে, পুড়ে গিয়ে। নিজের মনকে বোঝাবার মত সান্ত্বনা যে আমার কোথাও এতটুকুও নেই! তাই আজ এমনি করেই রিক্ত নিঃসম্বল হয়ে তাঁর নাম স্মরণ করে' তাঁকে পর-জীবনে ফিরে পাবার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে বসে আছি।

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পদ্মাকর ও তাঁহার অপ্রকাশিত কাব্য

কবির কল্পনা—"এ জাতি নিশ্চয়ই জাগিবে"—একদিন সত্যে পরিণত হইয়াছিল। চাঙ্গদেব ও নামদেব, জ্ঞানদেব ও সোপানদেবের দুন্দুভি-নিনাদে সুপ্ত মহারাষ্ট্রীয় জাতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের গৈরিক-রঞ্জিত পতাকা "দক্ষিণ হাওয়ায় দোদুল দোলায়ে" দুলিতে লাগিল—এমন কি আমাদের শ্যাম-শস্যে বিভূষিত বঙ্গও তাঁহাদের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই! তাই আজও বঙ্গ-রমণী ঘুম পাড়াইবার ছলে আপন সন্তানদিগকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের কীর্ত্তি শুনাইয়া থাকেন:—

"খাদু ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো,
'বর্গী' এলো দেশে।"

সে যুগটি ছিল মহারাট্টাদিগের 'স্বর্ণ যুগ!'

কুট-রাজনীতি-বিচক্ষণ শ্রেষ্ঠ শিক্ষক দাদোজী কোণ্ডদেবের শিষ্য, মহর্ষি রামদাসের মন্ত্রে দীক্ষিত, তুকারামের ঝঙ্কৃত উপদেশে পরিচালিত, ভারত-লক্ষ্মীর আদরের দুলাল, মহারাট্টা জাতি যাঁহার পূত পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করিয়া আজও নিজেদের ধন্য মনে করেন, সেই সাহসী, সংযমী, স্বদেশ-রক্ষক বীর শিবাজীর পর এক সিন্ধিয়াই মহারাষ্ট্রীয় সৌভাগ্য সূর্য্যের দীপ্তি ম্লান হইতে দেন নাই;—তাঁহাদের সময়ও মহারাট্টা ভাগ্যাকাশে রবি সকিরণ বিচরণ করিতেছিল। এক সময় প্রবল প্রতাপান্বিত বিশাল মোগলসাম্রাজ্যের লাগাম এই সিন্ধিয়া বংশের শ্রেষ্ঠ-তিলক ভারত-গগনে উদিত হইয়া সমস্ত হিন্দুস্থানে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম সর্ব্বত্র গুঞ্জরিত ছিল; তাঁহাদের পুরাতন কাহিনীগুলি সেদিন পর্য্যন্ত চারণদের মুখে রাজপুতনায় শোনা গিয়াছে। তাঁহাদের কীর্ত্তি-কাহিনী মহারাষ্ট্রীয় 'বখরে' চিরদিনই সজাগ থাকিবে,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি কাব্যেও ইহাঁদের গুণকীর্ত্তন দেখিয়া সত্যই মনে আনন্দের উদ্রেক হয়, মন পুলকে নাচিয়া উঠে! হিন্দি কবির রচনাগুণে (১) সেই সুদূর অতীতের বার্ত্তা সুরঞ্জিত ছবির মত চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে!

হিন্দী-সাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত কবি পদ্মাকর রচিত "আলিজাহ-প্রকাশ" নামে নব আবিষ্কৃত কাব্যে আমরা দৌলতরাও সিন্ধিয়ার একটি বড়ই মধুর চরিত্রাখ্যান দেখিতে পাই! (২)হিন্দি-কাব্য হিসাবে গ্রন্থটি বহুমূল্য; ঐতিহাসিকে চক্ষেও ইহার আদর কম নয়, কারণ দৌলত রাও সিন্ধিয়ার সামান্য পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়।

এই কাব্যের রচয়িতা কবি পদ্মাকর হিন্দি-সাহিত্য জগতে সুপরিচিত কিন্তু বাংলায় তাঁর পরিচয় অনেকেই

১। কবি পদ্মাকর রচিত "হিম্মত-বাহাদুর ও "পঞ্চতন্ত্র" কবি রঘুনাথের "মিতাক্ষরা" ফালকের "লক্ষণ-চন্দ্রিকা" ইত্যাদি নানা কাব্যে সিন্ধিয়ার ভুরি ভুরি প্রশংসা পাওয়া যায়।

২। "মিশ্রবন্ধু" এখনও গ্রন্থটি পান নাই, এজন্য তাঁহারা ইহার

জানেন না ; (৩) তাই তাঁর গ্রন্থের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সামান্য পরিচয় দেওয়া খুবই প্রয়োজন।

পদ্মাকর ভট্ট দাক্ষিণাত্য তেলঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে আগমন করেন ; সেই পর্য্যন্ত তাহারা এইখানেই বাসা বাঁধিয়াছিলেন। আলিজাহ-প্রকাশে মথুরার মোহনলাল ভট্টাত্মক পদ্মাকর ইত্যাদি উল্লেখের জন্য সহজে অনুমান কর যায়, মোহনলাল-পুত্র পদ্মাকর মথুরা-নিবাসী ছিলেন ;—বোধ হয়, সেই কারণেই তিনি ব্রজভাষাকে বিশেষভাবে নিজের গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন।

তাঁহার রচনা-মাধুর্য্য ও শব্দ-যোজনা-চাতুর্য্য দেখিয়া বোধ হয় তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। "মিশ্র বন্ধু" যদিও হিন্দি-কাব্য-কুঞ্জের নবরত্ন সভাসদের মধ্যে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট করেন নাই, তথাপি হিন্দি-কবি তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। তাঁহার মত সরস রচনায় তাঁহার সমসাময়িক অতি অল্প কবিই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিয়াছিলেন।

পদ্মাকরের জন্মভূমি ছিল বাঁদা। তাঁহার পিতা মোহন-লাল নিজে একজন কবি ছিলেন ; সেজন্য শিশু পদ্মাকরের চিত্তও বাল্যেই কাব্য-সুন্দরীর চরণ-মঞ্জীরের ছন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল। ছোট পানসীর মত হেলিয়া ছুলিয়া কাব্য-দরিয়ায় ভাসিয়া যাইত। জীবন-সায়াহ্নে উপস্থিত হইয়াও তিনি যে সব কবিতা রচনা করেন সেগুলি সাঁঝের অস্তগামী সূর্য্যকিরণের মতই স্নিগ্ধ অলজ্বলে ;—পূর্ব্বদিকের উঁকিমারা চন্দ্রের মত প্রেমের স্বপ্নের জাল বুনিত !

১৮৪৯ সম্বতে বাঁদা নবাবের সেনাপতি হিম্মত বাহাদুরের সাহচর্য্য লাভ করিয়া শিবিরে ও রণপ্রাঙ্গণে নিত্য সহচর রূপে ঘুরিয়া অবসর-কালে ওজস্বিনী ভাষায় বীরত্বজ্ঞাপক কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে তিনি প্রোৎসাহিত করিতেন। হিম্মত বাহাদুরের প্রশংসায় তিনি যে পুস্তকের রচনা করেন তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—"হিম্মত-বাহাদুর বীরদাবলী।"

১৮৫৬ সম্বতে সিতারা-নরেশ রঘুনাথ রাওয়ের আশ্রয়ে আসিয়া তিনি বাস করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় হইয়াও তিনি হিন্দি-কবি পদ্মাকরকে যথেষ্ট জায়গীর ও মুদ্রা পুরস্কার দেন। সেস্থানে আসিবার কিছুদিন পরে তিনি জয়পুর-রাণা প্রতাপসিংহের রাজসভায় আশ্রয় লাভ করেন। প্রতাপ স্বয়ং কবি ছিলেন,—তিনি কবির উপযুক্ত সম্মান করিয়া-ছিলেন। প্রতাপের প্রতাপ যখন জগতের অন্তরালে চির-দিনের জন্য অস্তমিত হইল, তাহার পুত্র জগৎ সিংহাসনারূঢ় হইয়া পদ্মাকরকে পূর্ব্ব সম্মানেই বজায় রাখিলেন।

সে সময় হিন্দি-সাহিত্যের উন্নতি সাধনে অনেক কবিই ব্যস্ত ছিলেন,—কিন্তু কেহই তাঁহার মত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। জগৎ-সিংহের চিত্ত-বিনোদের জন্য শৃঙ্গার রসে পূর্ণ "জগৎ-বিনোদ" কাব্য প্রণয়ন করেন ; সেটি হিন্দি-সাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ! ইহাতে "রসভেদ" ও "ভাবভেদের" সঙ্গে সঙ্গে "নায়িকাভেদের" বর্ণনা উদাহরণের সহিত দিয়াছেন !

জয়পুর-রাজসভা হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক উদয়-পুরের রাজা ভীমসিংহের দরবারের তিনি অন্যতম সভা-কবির পদ অলঙ্কৃত করেন। রাণা তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বহু পুরস্কার ও সম্মান দ্বারা পরিতুষ্ট করেন। উদয়পুর হইতে তিনি গোয়ালিয়র সিন্ধিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছায় উপস্থিত হন। প্রথম সাক্ষাতেই সম্ভাষণের জন্য যে বীররসের কবিতাটী প্রস্তুত ছিল তাহাই তিনি আবৃত্তি করিলেন ;—ইহাতে তিনি দৌলত রাওয়ের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা অতি চমৎকার ;—

মীনগঢ় বম্বই সুমন্দ মন্দরাজ বঙ্গ,
বন্দর কো বন্দ করি বন্দর বসাবে গো।
কহি পদমাকর কসকি কাসমীর হুকো
পিঞ্জর সো ঘেরীকে কলিঞ্জর ছুড়াবে গো ॥
বাঁকা নৃপ দৌলত অলীজা মহারাজ কাবু
সাজি দল পকরি ফিরঙ্গিন দবাবে গো।
দিল্লি দহপট্টি পটনা হুকো ঝপট্টি কর

৩। বন্ধুবর বিমলকান্তি বাবু "মানসী" পৌষ ৩০ সংখ্যায় তাঁহার "শিবাবাওনী" প্রবন্ধে পৃঃ ৪৫৬ এক জায়গায় ইহার নাম

কবি সিন্ধিয়ার উচ্চাকাঙ্খা দেখাইতেছেন। তিনি এত বড় বীরশ্রেষ্ঠ সে মুহূর্ত্ত বম্বই, মান্দ্রাজ সহজে জিনিতে পারেন। বাংলার হারবর ভাঙ্গিয়া নিজের ইচ্ছা-অনুযায়ী নূতন হারবার নির্ম্মাণ করাইতে পারেন। তাঁহার পক্ষে কাশ্মীর কিছুই নহে,—তাহাকে তিনি নিজের মুষ্টির ভিতর অনায়াসে লইতে পারেন। পিঞ্জরের মত কলিঞ্জর দুর্গ ঘিরিয়া নিজের অধীনস্থ করিতে পারেন। বীর-শ্রেষ্ঠ দৌলত রাও সিন্ধিয়া (৪)নিজের সৈন্যসহ অভিযান করেন যদি—তাইহলে ইংরাজকে পরাজিত করা অসম্ভব নয়,—পাটনা ও দিল্লি তাঁহার পদভরেই কাঁপিয়া উঠিবে;—ইচ্ছামত কলিকাতার দুর্দ্দশার একশেষ করিতে পারেন।

সে শব্দের ধ্বনিতে, উপমার সৌন্দর্য্যে, ছন্দের মাধুর্য্যে ও ভাষার তেজে দৌলত রাও সিন্ধিয়া মোহিত হইলেন, তিনি তাঁহাকে উপযুক্ত ভাবেই পুরস্কৃত করিলেন।

গোয়ালিয়র হইতে তিনি বুঁদি ঘুরিয়া অতঃপর বাঁদায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শুনিতে পাওয়া যায় সেইস্থানে তিনি কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। আরোগ্য লাভের আশায় তিনি হিন্দি-সাহিত্যিক মাত্রের আদরের বস্তু "ভক্তি-রস" প্রণয়ন করেন। সে গ্রন্থ পড়িলে বোধ হয় সংসার-সমুদ্রের দুঃখের ঢেউ সহ্য করিতে না পারিয়া কোনো হতভাগ্য কাতর স্বরে ঈশ্বরের পদে "ভক্তি-অঞ্জলি" দিতেছে! এমন মধুর, করুণ মর্ম্মস্পর্শী সে উচ্ছ্বাস! তাঁহার বিষাদের সুর কিরূপ প্রাণস্পর্শী, করুণ রসের উন্মেষে তিনি কিরূপ সিদ্ধহস্ত, তাহা এই পুস্তক পাঠ করিলে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

পুরাণে, তন্ত্রে ও দর্শনেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। জীবন-সায়াহ্নে উপস্থিত হইয়া গঙ্গার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া একটি কাব্য লেখেন। রোগমুক্ত হইবার পর "গঙ্গালহরীর" রচনা,—ভক্তির দ্বারা হৃদয়ের দুঃখ-প্রবণতা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছেন! তিনি দুর্ব্বল মানবের আত্মশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়াছেন!

সম্বৎ ১৮০০ কানপুরে গঙ্গার ধারে তিনি দেহত্যাগ করেন—সে সময় তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর। নিজের প্রতিভায় তিনি সকলেরই সম্মান-ভাজন হইয়াছিলেন,—এক ভূষণ ছাড়া কোন হিন্দি-কবি তাঁহার ন্যায় রাজা-মহারাজ দিগের নিকট সম্মান আদায় করিতে সক্ষম হন নাই।

ইহার কবিতার সর্ব্বপ্রধান গুণ অনুপ্রাসের প্রাচুর্য্য। তাঁহার ন্যায় শব্দকুশলী কবি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়:—

"মল্লিকান মঞ্জুল মলিন্দ মতবার মিলে
মন্দমন্দ মারুত মুহীম মনসাকী হৈ
কহে পদমাকর ত্যোঁ নাদত নদীন নিত
নাগরি নবেলিন কী নজরী নিসাকী হৈ॥
দৌরত দরের দেত দাদুর সু দুদৈ দীহ
দামিনী দমকনী দিসান মেদসাকী হৈ।
বঙ্গলনি বূদন বিলোকে বগুলান বাগ
বঙ্গলন বেলিন বহার বরথাকী হৈ॥(৫)

বর্ষা নূতন সাজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুন্দর গুল্মলতার কুঞ্জে মধু-প্রেমে ভ্রমর গুণ-গুণ রবে গান জুড়িয়া দিয়াছে; স্নিগ্ধ সমীর ধীরে ধীরে বহিতেছে। নদীতে বর্ষার সৌন্দর্য্য পূর্ণ যৌবনা নারীর ন্যায় উথলিয়া উঠিতেছে,—কত শত যুবতী প্রিয়-মিলনের ঔৎসুক্যে নিশির আগমন আশায় আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। ভেকও গান ধরিয়াছে (সেই বা বাদ যায় কেন?)। উথলিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ—আকাশে কালো মেঘের বুক চিরিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। মেঘ হইতে যেন পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে!—বাগানে পাতায় ফুলে নূতন কিরণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে!

দেখিতে গেলে কবিতার অর্থ অতি সামান্য;—বর্ষার একটি ছবি মাত্র! রসময়ী ভাষা লইয়াই তিনি ক্রীড়া করিয়াছেন!

স্বভাব-বর্ণনেও তিনি শক্তি-শালী, প্রকৃতির অন্তঃস্থলে সুন্দরীর বিরহ দেখাইয়াছেন:—

"এ ব্রজচন্দ চলৌ কিন বা ব্রজ লুকৈ বসন্তকী উকন লাগি।
ত্যোঁ পদমাকর পেখৌ পলাসন পাবন সীমনৌ মুকন লাগি॥
বৈ ব্রজবারী বিচারী বধূ বণি বাবরী লৌ হিয় হুকন লাগি।
কারী কুরূপ কসাইন ঐসী কুহু কুহু কৈলিয়া কূকন লাগি॥"

হে কৃষ্ণ, বসন্তের আগমন হইল, তবুও তুমি ব্রজ মণ্ডলে কেন পদার্পণ করিতেছ না? কিরণ-মাখা পাখা

তুলিয়া বসন্ত সহ-গরম হাওয়া উপস্থিত হইয়াছে ; পলাশের পুষ্প যেন অগ্নির মত হৃদয় জ্বালাইয়া দিতেছে। ব্রজের যুবতী বিরহে আত্মহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ;—কালো কোকিল কুহু-কুহু তানে কসাইয়ের মত বুকে আঘাত করিতেছে।

তাহার এই বাক্যচিত্রের রেখাগুলি কত সুললিত, সূক্ষ্ম ও নিপুণতার সহিত গ্রথিত !

স্বভাব-শোভার ক্ষুদ্র দৃশ্যপট হইতে, মানব-মনের নিগূঢ় সুষমা ও সৃষ্টির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সৌন্দর্য্য পর্য্যন্ত তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ও অনুরাগভরে নিরীক্ষণ করিতেন। স্থানে স্থানে তিনি সুন্দরী যুবতীর অতি সুন্দর ও নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছেন—সে সব পড়িলে অলঙ্কার-বিন্যাসে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় :—

"আরসো আরত সম্ভারণ ন শীশপট
গজব গুজারত গরীবণ কী ধারপর।
কহৈ পদ্মাকর জুরাসো সরসার তৈসে
বিথুরি বিরাজৈ বার হীরণ কে হারপর॥
ছাজত ছবিলে ছিতি ছহরি ছরাকে ছোর
ভোর উঁচি আঙ্গ কেলি-মন্দির দুয়ার পর।
এক পদ ভিতর ঔ এক দেহরীপে ধরৈ
এক কর-কঞ্জ এক কর হৈ কিবার পর॥

তরুণীর সদ্য নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে,—সেজন্য তাহার দেহ ও মন আলস্যে ভরা, তাই তিনি ব্যাকুল। মাথার কাপড় সরিয়া গিয়াছে—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই ;—তাহার আকর্ষণ-শক্তি মদের চেয়েও ঢের বেশী। মাথার কেশ গলার হীরার হারের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। পায়ের পায়জোরের এক কোণ দেখা যাইতেছে, উঠিয়াই দরজার উপর দাঁড়াইয়াছে—একটি পা ভিতরে, একটি চৌকাঠের বাহিরে,—একটি হাত দরজার উপর, অপর হাতে গোলাপ ফুল !

উষার প্রথম অরুণ কিরণ ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বে সুন্দরী জাগিয়া উঠিয়া শয়ন-মন্দিরের দরজার উপর দাঁড়াইয়া ! তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গিমাটুকুও কি সুন্দরভাবে তিনি চিত্রিত করিয়াছেন !

আজ্ঞায় "আলিজাহ প্রকাশ" রচনা করেন। মিশ্র-বন্ধু নিজের হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইনকে নাম পর পমোরজীনে "আলিজাহ প্রকাশ" নামক গ্রন্থ বনায়া হৈ, পরন্তু শুনা যাতা হৈ কি ঈসকে আদিমে দৌলতরাও-কী প্রশংসাকে কুছ ছন্দ রখ করে মুখ্য বিষয়মে কবিনে "জগদ-বিনোদ" ও-হীকো রখ দিয়া হৈ। ইহ গ্রন্থ অভিতক প্রকাশিত নহী হুয়া, তাউরণ হমনে ইসে দেখা হৈ। অতঃ ইসকে বিষয় মে নিশ্চয়াত্মক কুছ্ নহি কহ সকতে।"

"মিশ্র-বন্ধু" ঠিক অনুমান করিয়াছেন। ভূমিকাস্বরূপ তিনি প্রারম্ভেই দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সামান্য পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকের 'মুখ্য' বিষয় "জগদ-বিনোদের" পৃষ্ঠা হইতে আহরণ করিয়া "আলিজাহ-প্রকাশে" বসাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে "আলিজাহ-প্রকাশে" অনেকগুলি কবিতা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে।

যোধপুরী কাগজে ৯×৭ ইঞ্চি আকারে ১০৭ পৃষ্ঠা অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ২১৪ পৃষ্ঠায় কাব্যটি শেষ হইয়াছে। হস্তলিপিটি সেই সময়ের কালো কালি দিয়া লৌহ কলমের সাহায্যে লেখা। আজকালকার মত রেশমি সুতায় পুস্তকাকারে সেলাই করা ;—সুন্দর বড় বড় অক্ষরে লেখা ;—কিন্তু দুঃখের বিষয়, সব অক্ষরগুলি এক লাইনে লেখার দরুণ পড়িতে বেগ পাইতে হয়। কবি আরম্ভেই লিখিয়াছেন—পুস্তকটির জন্য দৌলতরাও সিন্ধিয়া একলক্ষ মুদ্রা কবিকে পারিতোষিক স্বরূপ দিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি লিখিয়াছেন :—

* * * *

"দৌলত-আলিজাহ-নৃপ, হুকুম কিয়ো নিধি নেহু।
"আলিজাহ-প্রকাশ" য়হ, সরস গ্রন্থ করি দেহু॥
দৌলত আলিজাহ কো, হুকুম পায় সবিলাস।
কবি পদ্মাকর করতহৈ, "আলিজাহ-প্রকাশ॥"

অর্থাৎ দৌলতরাও সিন্ধিয়ার আজ্ঞামত "আলিজাহ-প্রকাশ" রচনা করিলাম। ইহাও "জগদ-বিনোদের" মত শ্রদ্ধার রসে পূর্ণ।

সংযোগই দেখিতে পাই। প্রথমে বীর-রস;—কবিতার প্রকৃতি পদ্ধতি ব্রজভাষার অনুকরণ। লিপিটি পাঠ করিলে বোঝা যায় তিনি একজন সৌন্দর্য্যদর্শী, সুন্দরের প্রতি তাঁহার অনন্ত অনুরাগ :—

মুগ্ধা

* *

লাজহী বুলাবতসী সখীন রিঝাবতসী,
নাবতিসি প্রতি অতি পীতম কো মনমে।
আখিন অসীসতসী দীসতসী মন্দ মন্দ,
আবত চলিয়োঞ্চ তরুণাঙ্গ তীয় তনমে॥"

লজ্জাশীলা যুবতীর বর্ণনা করা হইয়াছে। সখী সকলে তাহাকে খেপাইয়া তুলিয়াছে,—তাহাদের প্রতি সে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে—অথচ মনে মনে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। লজ্জার হেতু, নিজের প্রিয়তমাকে কাছে পাইয়াও ভাল করিয়া তাহার প্রতি চাহিতে পারিতেছে না! দিনভোর সে নিজের প্রিয়তমের চিন্তায় মগ্ন থাকে,—আনন্দের শিহরণ তাহাকে কাঁপাইয়া তুলে। যৌবন ভরা গঙ্গার জোয়ারের মত আসিয়া হাজির হইয়াছে।

ইহার "নায়িকাভেদ" ইত্যাদি পাঠ করিলে সহজে জানা যায় কবি-পদ্মাকর নারী-মাহাত্ম্যে অনুপ্রাণিত।

তাঁহার মন আবার সময় সময় ভক্তির তরঙ্গেও উচ্ছ্বসিত দেখি,—কখনও ঈশ্বর-আরাধনায় লিপ্ত,—আবার কখনও "মহা-সিন্ধুর ওপার থেকে" কোন্ সঙ্গীতের সুর শুনিয়া মন উধাও!

"সব মে রহে ভাব সদা সবতে,
মন মায়া মলীন কো জীতত হৈ।
পদ্মাকর বেদন কো শুনিকে,
গুনি কে গীতি গগন কী গীতত হৈ॥
ধরণী হৈ জনতে নিজ গেহমে,
দেহমে আত্ম ন বুদ্ধি চিতত হৈ।
পরিপরণ ব্রহ্ম বিচারহি মে,
নিজ কো ছিনসে বীতত হৈ॥"

জগতে সকলেরই সহিত এক হইয়া রহিয়াছি—আবার একান্ত চেষ্টা করে, কিন্তু মনই মায়াকে জয় করে। বেদ ইত্যাদি শুনিয়া সার মর্ম্ম বুঝিবার পর জ্ঞানের চর্চ্চায় দিন কাটাই। ঈশ্বরের আরাধনায় লিপ্ত থাকি বলিয়া আমার দিন সহজে কাটিয়া যায়!

কবি আলিজাহ-প্রকাশের শেষে লিখিয়াছেন :—"ইতি সিদ্ধশ্রী মথুরাস্থ মোহনলাল ভট্টাত্মজ কবিপদ্মাকর বিরচিত "আলিজাহ-প্রকাশ" কাব্য সম্পূর্ণম। এবং আরও দুইটি চরণ লিখিয়া শেষ করিয়াছেন।

"নিদ্ধি দুগুণ করি জান, উনপর পঠহত্তরী অধিক।
বিক্রম গো পহিচানি, শ্রাবন সুদী ইন্দু অষ্টমী।"

অর্থাৎ শ্রাবণ সুদী অষ্টমী সোমবার ১৮৭৮ বিক্রমে ইহা শেষ হইয়াছে।

এইস্থানেই অবস্থান কালে তিনি সর্দ্দার উদাজী রাওয়ের কথায় সংস্কৃত-"হিতোপদেশের" হিন্দিতে ভাষানুবাদ করিয়াছিলেন। "মিশ্র-বন্ধু" ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"ইহ গ্রন্থভী অভি প্রকাশিত নহি হুয়া অউর ন হমারে দেখনেমে আয়া হৈ। অতঃ হম্ ইসকে বাবত নহী কহ সকতে কি ইসকী কবিতা কৈসী হৈ।"

এই লিপিটিও আবিষ্কৃত হইয়াছে;—ইহাও কবি পদ্মাকরের রচনা, কারণ তিনি ভূমিকাতেই লিখিয়াছেন :—

"উদাজী কী নেহ সো, 'পদ্মাকর' সুখ পায়।
রাজনীতি কী বচন কা, যোঁ ভাখত চিত লায়॥" ৬

এখন হিন্দি সাহিত্যিকের উচিত দুটি একত্রিত করিয়া একটি নূতন গ্রন্থ প্রচারিত করা। "জগদ-বিনোদে" যাহা নূতন ও "আলিজাহ-প্রকাশে" যাহা অধিক কবিতা আছে—সব একত্র করিলে একটি নূতন কাব্যের সৃষ্টি হয়।

তাঁহার কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায় তিনি চমৎকার সুন্দর শব্দ ব্যবহার করিবার ইচ্ছায় ভাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই;—সেই কারণে কবি স্কটের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। দুইজনেই চমৎকার শব্দের পক্ষপাতী

৬। এই গ্রন্থের উল্লেখ করিলাম; কারণ "মিশ্র-বন্ধু' এখনও ভ্রমে আছেন—পদমাকর দ্বারা ইস্ সময় নির্ম্মিত হোনা ঠিক হৈয়া নহি।—ইহা যে পদমাকর দ্বারাই রচিত, তাহা এই চরণ দুটি হইতে সহজেই জানিতে

ছিলেন। আবার বিধির কি বিড়ম্বনা! দুই কবি এক সময়েই মৃত্যুর দ্বারে অতিথি হন;—তফাতের মধ্যে কবি স্কটকে জগৎ চেনে—আর কবি পদ্মাকরকে ভারতেও কেহ জানে না। কবি তাই বলিয়াছেন :—

Full many a flower is born to
blush unseen,
And waste its sweetness on the
desert air!"

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেমের পূজা

সখা তুমি মোর দেহ চাও
বিনিময়ে তব দেহ দেবে—
কিন্তু দেখ ভেবে
মোর মাঝে আমারে না পাও
খুঁজি আর, বল দেখি এবে?
আমি কিগো গিয়েছি ফুরায়ে,
আমারে কি নিয়েছ কুড়ায়ে
তোমার মাঝারে?
হে বঁধু, আমারে
নিয়ে মালাগাঁথা তব হয়ে গেছে শেষ?
তুমি হয়েছ নিঃস্ব, কিছু রস-লেশ
তোমারো কি রহেনি দেবার
কিছু রূপ, কিছু প্রেম আর?

তাই বুঝি আজ মোরে চাও
খেলেনা করিতে,
বিনিময়ে দিতে
রঙীন খেলেনা তব, প্রাণহীন তাও!
ওগো প্রিয়তম প্রিয় হে রাজা আমার
তুমি যে ফুরাও নাই—
মোর কাছে হায়,
কোনকালে কোনদিন নহ ফুরাবার!

তোমার মাঝারে আছে এত মোর সুধা
এখনও জাগে নাই ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা!
তবে যদি হয় ইহা ছল
ছিঁড়িতে শিকল—
একদা যা গলায় পরেছ
আজ যদি করে তা বিকল
চলে যাও সহাস আননে
আমি কারে বাঁধিনা বাঁধনে!

যদিও হৃদয়-রক্ত ঝরিবে নয়নে,
তবু জানি মনে,
ছেড়ে দিতে হবে
যেজন না রবে,
হয়ত বা চিরদিন তরে
অশ্রুজলে দীর্ঘশ্বাসভরে!

তবে যদি মনে এই চাও
যাবার সময়
তুমি শুধু নয়
যা দিয়েছ নিয়ে যাবে তাও!
রূপ নেবে প্রীতি নেবে নেবে গীতিবাণী
তারি সাথে নিয়ে যাবে সুখস্মৃতিখানি!
যে দেহ ভরিয়া
আনন্দ-অমৃত-প্রেম পড়িছে ঝরিয়া
—নাহি জানি কার—
অধরে তোমার!
মদ্যপান-শেষে সেই শূন্য পাত্রখানি
ধূলিমাঝে আনি
চূর্ণ করি ফেলি যবে মলিনতা মাঝে
বিদায়ের সাঁঝে।

ক্ষমা কর মোরে
ওগো প্রিয় কহি তোমা হৃদয়েরই জোরে !
যা কিছু আমার
সকলি তোমার !
এই দেহ এই মন প্রাণ প্রেম আর
যা কিছু—সকলি দিতে পারি শেষ করে
তোমারেই, তোমার ভিতরে !
কিন্তু আমি নহি তব বিলাসের তরে !
তোমারেও হিয়া হতে টানি
সাধ্য নাই কামনার ধুলিমাঝে আনি !
জানি, প্রেম যাবে—
যেন নাহি যায় এই ভাবে !
ফুল ফোটে ফুল যায় ঝরে—
আবার মুকুল নব ফোটাবার তরে !
যাক্ প্রেম যদি তাহা যায়,
যেন নাহি যায় তাহা কামের তাড়ায় !

যে মন্দিরে একদা দেবতা
হাসিয়াছে গাহিয়াছে কহিয়াছে কথা—
যায় যদি দেবতা চলিয়া
পূজারীর মালারে দলিয়া—
তবে সে মন্দির রোক্ আপন আঁধারে
চির-পূত শূন্যতা-মাঝারে !
সেথা যেন নাহি জাগে কামের শাসন—
ভূত যেন নাহি পায় দেবের আসন !

জানি আমি ঐ দেহ মাগি
ঐ রূপ লাগি ;
চাই ওরে আঁখিতে আঁখিতে
বাহুপাশে হৃদয়ে রাখিতে
চিরদিন চিরনিশি জাগি
স্বর্গ যেথা আছে মোর মাঝে
সেথা গান বাজে
ঐইরূপ ওই দেহ লাগি—ওরে চাই !
কিন্তু যদি ওর মাঝে প্রেমজ্যোতি নাই—
কি হইবে শিখাহীন প্রদীপ-আলোতে
জীবনের অন্ধকার পথে !

মোর মাঝে যেই প্রেমময়
তুমি জাগায়েছ—তবু তোমারি সে নয় !
সে শুধু প্রেমের সবে নেবে তারে প্রেমে
কিনিতে নারিবে কেহ শুধু রূপ হেমে !
তোমার কামনা মিটাবারে
আমারে মারিতে পারি, পারিনা তাহারে !
তোমারো চাইতে
প্রেম বড় মোর চিতে !
সে আমার বড় সাধনার
সে আমার বেশী আপনার !
সে যে ঈশ্বরের সে যে বিশ্বজগতের,
বহু পথিকের সে যে অনন্ত-পথের !

শিবরাম চক্রবর্ত্তী।

মহারাজা নন্দকুমারের বিচার

পূর্ব্বানুবৃত্তি

বিচার-সমাপ্তির পর এইরূপে দেড় মাস অতিবাহিত হইল। এ যাবৎ নন্দকুমার সাধারণ কারাগারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই কারাগারটি কোন্ স্থানে ছিল এবং কোন্ স্থানেই বা নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল তাহা এক্ষণে অবধারিত হইয়াছে।

"নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের স্থানটি কুলী-বাজার ও হেষ্টিংস ষ্ট্রীজের নিকট"। কাপ্তেন প্রাইস নামক জনৈক ইংরাজ সেই সময়ে কলিকাতায় ছিলেন; তিনি বলিয়াছেন, "নন্দকুমার কাউণ্টি জেলে আবদ্ধ ছিলেন।" ইত্যগ্রে

কাউন্টি জেলও ঠিক সেইস্থানে বিদ্যমান ছিল। তাহার কিয়দ্দূর পশ্চিমে হেষ্টিংস ব্রীজের নিকট নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। প্রাণদণ্ডের আদেশ পালনের ভার তদানীন্তন সেরিফ আলেকজাণ্ডার ম্যাক্রাবির উপরে পড়িয়াছিল। ম্যাক্রাবি তৎসম্বন্ধে যে বিবরণটি প্রকাশ করিয়াছিলেন, পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

"কএক ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছিলাম, যে মহারাজা নন্দকুমার মৃত্যুকালে সমবেত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিবেন; সেই জন্য আমি পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে এবং তাঁহার দেহত্যাগের সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যেরূপ যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।

৪ঠা অগষ্ট, শুক্রবার সন্ধ্যাকাল।

আমি কারাগারে গিয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলে, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় অভিবাদন করিলেন। আমরা উভয়েই উপবিষ্ট হইলে তিনি নিশ্চিন্ত ভাবে আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলনে; তাহা দেখিয়া আমি মনে করিলাম, ইহার আশু যে পরিণাম ঘটিবে, সম্ভবতঃ তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই! সেইজন্য আমি ইন্টারপ্রিটারকে বলিলাম, "আপনি মহারাজাকে বুঝাইয়া বলুন, আমি তৎপ্রতি অন্তিম সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত আসিয়াছি। এরূপ দুঃখের সময়ে যে কার্য্য করিলে তাঁহার প্রীতিকর হইতে পারে আমি তাহাই করিব। কর্ত্তব্যের অনুরোধে আদালতের আদেশ পালন করিতে হইবে ভাবিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। কিন্তু আমি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিব। এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাঁহার নিজের পাল্কীতে তাঁহার নিজের ভৃত্যগণ তাঁহাকে লইয়া যাইবে।"

রাজা উত্তর করিলেন, "আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন তাহাতে এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন সে জন্য আপনার নিকট বাধিত হইলাম। এই অনুগ্রহটুকু আমার পরিবারবর্গের প্রতি দেখাইলে "ভাগ্যে যাহা ছিল, তাহা খণ্ডন হইবার নহে! ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্লেভারিং, ফ্রান্সিস ও মনসনকে আমার নমস্কার জানাইবেন। তাঁহাদিগকে বলিবেন, তাঁহারা যেন রাজা গুরুদাসকে প্রতিপালন করেন। আমার অবর্ত্তমানে গুরুদাসকেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া জানিবেন।" মহারাজা নন্দকুমারের সাম্য ভাব দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। তিনি একবারও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন না; তাঁহার কণ্ঠস্বরেও বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। অথচ জানিলাম, তিনি কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই স্বীয় জামাতা রায় রাধিকার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ছিলেন। তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা দেখিয়া আমি আপনাকে এতই দুর্ব্বল মনে করিতে লাগিলাম যে আমি আর সে স্থানে থাকিতে পারিলাম না। আমি নীচের তলায় গেলে কারারক্ষক আমাকে বলিলেন, "মহারাজা নন্দকুমার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া হিসাব-পত্র দেখিতেছেন। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

পরদিবস শনিবার ৫ই তারিখে আমি প্রাতে ৭৷৷০টার সময় জেলে গিয়া দেখিলাম মহারাজার ফাঁসির জন্য সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহার নিকট হইতে অন্তিম বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের হৃদয় বিদারক ক্রন্দনধ্বনি বর্ণনা করিবার আমার সাধ্য নাই। তিন ঘণ্টা পরে আমার চিত্ত কথঞ্চিৎ স্থির হইলে আমি এই বিবরণ লিখিতে বসিলাম। আমি জেলে আসিয়াছি, এই সংবাদ পাইবামাত্র মহারাজা জেল-প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিয়া আমার সহিত কারা-রক্ষকের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতিতে কোন প্রকার ইতস্ততঃ ভাব লক্ষিত হইল না। তিনি প্রফুল্ল চিত্তে কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বে একখানি চেয়ারে বসিলে তিনিও বসিলেন। এক ব্যক্তির হস্তে একটি ঘড়ি দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই ত, আমি প্রস্তুত হইয়াছি।" সেখানে তিনজন ব্রাহ্মণ

তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে কোনরূপ বিষাদের চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "নির্দ্দিষ্ট সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। ৮টা বাজিতে পনের মিনিট বিলম্ব আছে। কিন্তু ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আপনি যখন ইঙ্গিত করিয়া বলিবেন, তাহার পূর্ব্বে আমি এস্থান হইতে উঠিব না।" আমি আরও বলিলাম, "নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া যখন বুঝিবেন যে সংসারের মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তখনই ইঙ্গিত করিবেন।" মহারাজা বলিলেন, "হাঁ, তাহাই হইবে।" আমরা প্রায় একঘণ্টা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিলাম। সে সময়ের মধ্যে তিনি আমার সহিত কয়েকবার কথা বলিলেন। রাজা গুরুদাস, ক্লেভারিং, মনসন ও ফ্রান্সিস্ এই কএক ব্যক্তির নাম তাঁহার মুখে শুনিলাম। কিন্তু তাঁহার মুখে চিন্তার লক্ষণ দেখিলাম না। তৎপরে দেখিলাম, তিনি জপমালা হস্তে লইয়া ভগবানের নাম করিতেছেন। তাঁহার জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় মৃদুভাবে নড়িতেছে। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমার পানে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কারাগারের ভৃত্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যদি আমার কোন বিষয়ে ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাজা গুরুদাস তাহার সংশোধন করিবেন।" এই বলিয়া তিনি প্রফুল্ল চিত্তে দরজার নিকটে যাইয়া পাল্কীতে উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল না যে তাঁহার মনে কোনরূপ চিন্তা আছে! ডেপুটী সেরিফের ও আমার পাল্কী তাঁহার পাল্কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। *

নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখি তথায় বহুসংখ্যক লোক সমবেত হইয়াছে। † কিন্তু কোন হাঙ্গামার লক্ষণ দেখিলাম না। মহারাজা বেহারাদিগের স্কন্ধে পাল্কীতে বসিয়া অতি মনোযোগের সহিত জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সম্মুখে ফাঁসি-কাষ্ঠ ছিল, কিন্তু তদ্দৃষ্টে তাঁহার মুখে ভাবান্তর লক্ষিত হইল না! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণেরা কি আসিয়াছে?" যখন শুনিলেন, তাঁহারা এখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই, তখন একটু ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন, ব্রাহ্মণেরা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হয়ত তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে হইবে। আমি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, "এখনও বেলা হয় নাই, ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই; যতক্ষণ আপনি প্রস্তুত না হইতে পারেন, আমি ততক্ষণ বিলম্ব করিব।" ইহার কিছুক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনার যদি গোপন কোন কথা বলিবার থাকে, তাহা হইলে আমি জেলের কর্ম্মচারীগণকে স্থানান্তরে সরাইয়া দেই।" তিনি বলিলেন, "নিষ্প্রয়োজন। রাজা গুরুদাস এবং আমার অন্তঃপুরের মহিলাগণের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শুদ্ধ তাহাই স্মরণ করিয়া দেওয়া ভিন্ন আমার অন্য কোন কথা নাই। আর একটি কথা এই যে, যে ব্রাহ্মণেরা আমার শব লইয়া যাইবেন, তাঁহাদিগকে অন্য কেহ স্পর্শ না করিতে পারে, আপনি তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।" আয়োজন শেষ করিতে একটু বিলম্ব হইল। কিন্তু অধিক বিলম্ব হয়, তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কারণ, তিনি বারম্বার আমাকে বলিতে লাগিলেন "আমি প্রস্তুত হইয়াছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আর কোন আত্মীয়-স্বজনকে দেখিতে ইচ্ছা করেন?" রাজা উত্তর করিলেন "আত্মীয়-স্বজন ত আমার অনেকই ছিল; কিন্তু এরূপ স্থানে এবং এরূপ দৃশ্য দেখিতে তাহারা আসিবে, আমি আশা করি না।" আমি বলিলাম, "হয়ত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ আসিয়াছেন; কিন্তু জনতাবশতঃ নিকটে আসিতে পারিতেছেন না।" ইহা শুনিয়া তিনি এক ব্যক্তির নাম করিলেন। তখন সেই নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকা হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি পরক্ষণে

* Vide Busteed's Echoes from old Calcutta.

† Captain Cowe in his evidence before the Parliamentary Committee said "he saw the execution from the parapet of the new fort, not quite half a mile away and that there were eight or ten thousand people assembled, who, the moment the Raja was

নাই।" তৎপরে মহারাজা পুনর্ব্বার বলিলেন, "ক্লেভারিং, মনসন ও ফ্রান্সিসকে আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন।" তখনও তাঁহার অবয়বে ও দৃষ্টিতে কোন ভাবান্তরের-লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি কথা বলিতে বলিতে মধ্যে মধ্যে এক একবার কথা বন্ধ করিয়া ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কিরূপে ইঙ্গিত করিবেন? যেরূপ গোলমাল হইতেছে, তাহাতে আপনি কথা বলিলে আমি শুনিতে পাইব না।" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি হস্তের দ্বারা ইঙ্গিত করিব।" আমি বলিলাম, "দেহের স্পন্দন নিবারণের নিমিত্ত আপনার হস্ত বাঁধিয়া দিবার প্রয়োজন হইবে; আপনি পদ দ্বারা যেন ইঙ্গিত করেন।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।"

অনন্তর সেই বিষাদময় অন্তিম কার্য্যের সময় আসিল। আমি বেহারাদিগকে পাল্কীখানি ফাঁসি-কাষ্ঠের নিকটে আনিতে বলিলাম। তাহা শুনিবামাত্র মহারাজা পাল্কী হইতে নামিয়া পদব্রজে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া বন্ধনের নিমিত্ত হস্তদ্বয় একত্রিত করিয়া পশ্চাৎ দিকে প্রসারিত করিলেন। তখনও তাঁহার বিমর্ষ ভাব দৃষ্ট হইল না। মুখ বাঁধিবার কথা হইলে একটু বিভ্রাট হইল। তিনি বলিলেন, "সে কার্য্যটি আপনারা করিলে হইবে না।" আমি বলিলাম, "আমি একজন ব্রাহ্মণ সিপাহি দিতেছি, সে আপনার মুখ বাঁধিয়া দিবে।" মহারাজা তাহাতে সম্মত না হইয়া তাঁহার নিজের একজন ব্রাহ্মণ ভৃত্যকে বলিলেন, "আমি উপরে উঠিলে তুমি আমার মুখ বাঁধিয়া দিও।" সে ব্যক্তি তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া আত্ম-উদ্যমে সোপানে উঠিলেন। হস্ত দুখানি বাঁধা ছিল বলিয়া উঠিতে কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইল। তথাপি কাহারও সাহায্য লইলেন না। মঞ্চের উপরে উঠিয়া তিনি ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। যতক্ষণ তাঁহার মুখ রুমালে আবৃত না হইল, আমি একদৃষ্টে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু কোন উদ্বেগ বা ভয়ের লক্ষণ দেখিলাম না। আমার অন্তরাত্মা বিষাদ-মগ্ন হইল। আমি আর স্থির ভাবে দাঁড়াইতে না পারিয়া পাল্কীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু আমি বসিবার পূর্ব্বেই মহারাজা ইঙ্গিত করিলেন। মঞ্চ সরিয়া গেল। দেহটি ঝুলিতে লাগিল। আমি একপ্রকার সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে দেখিলাম, হস্ত দুইখানি যে ভাবে বাঁধা ছিল, ঠিক সেইরূপই রহিয়াছে। মুখের এক পার্শ্ব অনাবৃত ছিল, দেখিলাম, সে স্থানে বিকৃতি ঘটে নাই! মহারাজা নন্দকুমারের বিষাদান্ত নাট্যের আদ্যোপান্ত অভিনয় দেখিয়া আমার এইরূপ ধারণা জন্মিল যে এ যাবৎ যে-সকল ব্যক্তি মৃত্যুকালে দৃঢ়তা, নির্ভীকতা এবং অদম্য সঙ্কল্প দেখাইয়া ইতিহাসে অমরতা লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের সমকক্ষ। নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত শবদেহ ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিল, তৎপরে দাহন-কার্য্যের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের হস্তে প্রদত্ত হইল।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

শিবাজীর নৌবহর

ভারতে সামন্ত রাজন্য-বর্গের সৈন্য-সামন্ত আছে,—নৌ-বহর বা যুদ্ধ-জাহাজ কাহারও নাই। কিন্তু তিনশত বৎসর পূর্ব্বেও ছত্রপতি শিবাজীর নৌ-বহরের নামে বিদেশী বণিকগণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত। রাজ্য স্থাপন ও রক্ষণের জন্য শিবাজী যে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন,—নৌ-বহর তাহার অন্যতম প্রমাণ! রাজ্য-বিস্তারের জন্য শিবাজী ইতস্ততঃ করিতেন না। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের পর কল্যাণ হইতে রাজপুর পর্য্যন্ত সমগ্র কোকনদ সীমান্ত শিবাজী জয় করিয়াছিলেন, এ জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকারও করিতে হইয়াছিল। বিজাপুরের সুলতান ঐ প্রান্তের বিধাতা ছিলেন, তাছাড়া জহ্বারের কোলী, জঞ্জীরার সীদী, বাড়ীর সামন্ত, পর্টুগীজ, ডচ, ফ্রেঞ্চ ও ব্রিটিশগণও এই

শিবাজী ধীরে ধীরে সকলকেই পরাজয় করেন; সীদীর অধীনস্থ সমস্ত স্থান তিনি হস্তগত করিয়াছিলেন, মাত্র রাজপুরান্তর্গত প্রদেশ পরের অধীনে রহিয়া গেল, নৌসৈন্য ও দুর্দ্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী রণতরী ব্যতীত এই দুর্গ জয় করা অসম্ভব বুঝিয়া ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে—শিবাজী নৌ-সৈন্য সংগ্রহ ও রণতরী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন।

রাজপুর, বার্সিলোর, সুরাট, চিপলুন প্রভৃতি সহরগুলি তৎকালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এই সকল প্রদেশ জয় করিয়া, তৎলব্ধ সমস্ত অর্থ শিবাজী নৌ-বহরের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধের জন্য সর্ব্বত্র নৌবহর স্থাপন করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই শিবাজী প্রচুর শক্তিশালী নৌবহর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, কোলী ও ভণ্ডারী নামক শ্রেষ্ঠ নাবিক তাঁহার নৌবহরে ছিল। যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য বিভিন্ন স্থানে ছত্রপতি কারখানা স্থাপন করেন, বিজয়-দুর্গ, কোলাবা, মালবন, রত্নগিরি, অঞ্জন বেল প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট রণপোত প্রস্তুত হইত। জঞ্জীরা দুর্গ জয় করিবার জন্য গুরাব, তরাণ্ডী, গলবতে, দুবারে, শিবাণ্ডে, পগার ইত্যাদি নামের অসংখ্য নূতন রণতরী শিবাজী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এই অগণ্য নৌবহরের অধীশ্বর ছিলেন,—দরিয়া সারঙ্গ ও মায়নক ভণ্ডারী। প্রত্যেক জাহাজ উপযুক্ত নৌসৈন্য ও যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র-শস্ত্রে সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিত। মারাঠা রণতরী ব্যবসায়ী মহল ও অন্যান্য বিদেশী জাহাজ লুট করিয়া, লুটলব্ধ দ্রব্যাদি যথাসময়ে রাজসভায় পাঠাইয়া দিত; ক্রমে মারাঠা শক্তি সমুদ্রেও অজেয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থান-সমূহ জয় করিয়া স্থানে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া শিবাজী বিভিন্ন জাতির নিকট হইতে জল-কর আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নৌ-বহর স্থাপনের পর সমুদ্র-তীরবর্ত্তী সমস্ত বন্দর ছত্রপতি অধিকার করেন।

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে বাড়ীর সাবন্তের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাহাদের নৌসৈন্য শিবাজী নিজ সৈন্যভুক্ত করিয়া লন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে মালবনের সিন্ধু-দুর্গ জয় করিয়া এই দুর্গই নৌবহরের প্রধান কেন্দ্র করেন, কোলাবা নৌবহরের নূতন দুর্গ করিয়া ছত্রপতি উহার নাম রাখেন, "বিজয়-দুর্গ"। সমুদ্রে মারাঠা শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বণিকগণ চিন্তিত হইল। পর্টুগীজগণ তোপ এবং বহুমূল্য উপহার সহ শিবাজীর নিকট দূত পাঠাইয়া পশ্চিমপ্রান্তে বাণিজ্য করিবার আদেশ প্রার্থনা করে, বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট করের বিনিময়ে শিবাজী তাহাদের ব্যবসা করিবার অনুমতি দেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর নৌবহর পশ্চিমপ্রান্ত আক্রমণ করায় ইংরাজ বণিকগণ ১১২০ টাকা দণ্ড স্বরূপ দিতে বাধ্য হন, এই নৌ-অভিযানে শিবাজীর সহিত পঁচাশীখানি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং তিনখানি বৃহৎ রণতরী ছিল। গোয়া হইতে ১৩০ মাইল দূরবর্ত্তী বিখ্যাত বন্দর বার্সিলোর লুটিয়া শিবাজী বিস্তর মূল্যবান দ্রব্যাদি ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

১৬৭০ খৃষ্টাব্দে বাবাজীর নৌবহরে সর্ব্বসমেত ১৬০ খানি রণতরী ছিল। এই বৎসর পর্টুগীজগণের সহিত জলযুদ্ধে মারাঠাদের ১২ খানি জাহাজ পর্টুগীজদের হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু মারাঠা সর্দ্দারগণ প্রাণপণ চেষ্টায় পর্টুগীজদের বিধ্বস্ত করিয়া, তাহাদের একখানি রণতরী দাভোল বন্দরে ধরিয়া আনিয়াছিলেন। শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের সময় তাঁহার নৌ-বহর বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথম শিবাজীর নৌবহরে তিনখানি যুদ্ধ-জাহাজ ছিল, ক্রমে ইহা সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়া প্রায় চারিশত হয়। তাঁহার নৌসৈন্য-সর্দ্দারদের মধ্যে দরিয়া সারঙ্গ, ইব্রাহীম খাঁ, মায়নাক ভণ্ডারী ও দৌলত খাঁ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে মোরোপন্ত পিংলে, নেতাজী পালকর, রঘুনাথ বল্লাল প্রভৃতি মারাঠা সর্দ্দারগণও নৌসৈন্য পরিচালনের জন্য প্রেরিত হইতেন; ভিম্বজী গুজর ও কান্হোজী আংড়ে—এই দুই মারাঠা বীর নৌসৈন্যাধ্যক্ষরূপে অনেক যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন। ১৮ই জানুয়ারী, ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে শিবাজীকে লিখিত জিবাজী বিনায়কের একখানি পত্র হইতে শিবাজীর নৌবহর সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। পত্রখানি নীচে উদ্ধৃত হইল:—

রাজশ্রী জিবাজী বিনায়ক সুবেদার ব কারকুন সুবে

দৌলতখান ব দরিয়া সারঙ্গ ইয়াসী এবজ বগল্লা রাজশ্রী মেরোপন্ত পেসবে ইয়ানী বরাতা সুভে মজকুরাবরীদিল্যা। ত্যাম তুমী কাঁহি পাওবিলে নাহী মনোন কলো আলে। ত্যাবরূণ অজব বাটলে কী এসে নাদান থোড়ে অস্তীল! তুমাস সমজলে কী ইয়ালো এবজ খোঠে তরী এবজ খজানা রসদ পাঠ বিলিয়া মজয়া হোইল মহনত অগাল। তরী পদ্মদুর্গ বসবূন রাজপুরীচ্যা উরাবরী দুসরী রাজপুরী কেলী আহে। ত্যাচী মদতহবাবী, পানী ফাটী আদি করুন সামান পাবাবে, ইয়া কামসে আরমার বেগীনে পাবাবে, তে নাহী। পদ্মদুর্গ হবশী ফৌজা চৌফের জের করিত অসতীল, আনি তুমী এবজন পাবরুন, আরমার খোলমুন পাড়াল! এবডী হারামখোরী তুমী করাল; আনী রসদ পাঠবূন, মজরা করু মহনাল, ত্যাবরী সাহেব রিঝতীলকি কায়া হে গোষ্ঠ ঘটায়াচী তহী হোয় ন কেলে কী হবশিয়ানী কাঁহী দেউন আপলে চাকর তুমহাল কেলে অসতীল। ত্যা করিতা এসী বুদ্ধিভেলা অসেল। তরী এসা চাকবাস ঠীকে ঠীক ফেলে পাহিজেত। ব্রাহ্মণ মহনূন কোন মুলাহিজা করু পাহতো? মা উপরিয় তহ্বী ত্যালা এবজ গল্লা রাজশ্রী মোরোপন্তানী দেবিলা অসেল তো দেবিতীল। তো খজানা রসদ পাবলিয়াহুন অধিক জানূন তেনেপ্রমানে আদা করণে কী তে তুমচী ফিয়াদর্ন করিত ব ত্যাচে পোটাস পাবোন আরমার ঘেউন পদ্মদুর্গাচে যদতীস রহাতে তে করনে। ইয়াউপরী বোভাটা আলিয়া উপরি তুমচা মুলাহিজা করণার নাহী। গণীমাচে চাকর, গনীম জালেস, এসে জানূন বরা নতীজা তুমহাস পাবেল। তাকিদ অসে। রবানা ছ ২ জিল্কাদ।”

অর্থাৎ,—ছত্রপতি শিবাজীকে সুবেদার জিবাজী বিনায়কের দণ্ডবৎ প্রণামান্তে নিবেদন এই,—দৌলত খাঁ ও দরিয়া সারঙ্গের দ্বারা সুবা হইতে প্রাপ্ত অর্থ ও দ্রব্যাদি পেশবা মোরোপন্তের নিকট পাঠানো হয়, কিন্তু উহা আপনি পান নাই, এই সংবাদে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছি,—প্রেরিত দ্রব্যাদি অত্রস্থ রসদের জন্য পুনঃ প্রেরিত হইয়াছে, ইহাই আপনার ধারণা। রাজপুর হস্তগত হইয়াছে, কিন্তু পদ্মদুর্গের প্রেরণ করা হয় নাই, শীঘ্রই পদ্মদুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে, সে জন্য আরও নৌবহরের প্রয়োজন, এসম্বন্ধে যাহা ভাল বিবেচনা হয় শীঘ্র করিবেন। জ্ঞাতার্থে নিবেদন।

রবার্ট অর্মি তাঁহার গ্রন্থে সীদী, ইংরাজ ও পর্টুগীজগণের সহিত শিবাজীর জল যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণণা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—“১৬৬৭ সনে শিবাজীর নৌবহর বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ছোট বড় অসংখ্য রণতরী তাঁহার নৌবহরে ছিল। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে সীদীগণ মাজগাঁও বন্দরে উপনিবেশ স্থাপন করেন; ইহাতে শিবাজী ও ইংরেজগণের মধ্যে মনান্তরের সূত্রপাত হয়। সুরাটের মোগল সুবেদার বোম্বাইএর ইংরাজ প্রেসিডেণ্টের আদেশানুসারে সীদীদের মাজগাঁওএ থাকিতে দেন। এই স্থানে থাকিয়া সীদীগণ নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে থাকে এবং মাজগাঁও হইতে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। ইহাতে শিবাজী, দরিয়া সারঙ্গ ও দৌলতখাঁর নেতৃত্বে চারহাজার নৌসৈন্যসহ সীদীর বিরুদ্ধে নৌবহর প্রেরণ করেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পথে সুবিধা করিতে না পারিয়া, উত্তরদিক দিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে দৌলত খাঁ কল্যাণ-অভিমুখে অগ্রসর হন। পর্টুগীজ-গণের অধিকৃত পথের উপর দিয়া কল্যাণ হইয়া মাজগাঁও যাইতে হইবে, সহসা পথিমধ্যে ইংরাজ পর্টুগীজদের দ্বারা মারাঠাবাহিনী বাধা প্রাপ্ত হইল। এখানে উভয় পক্ষে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়। দৌলতখাঁ এখানে অনর্থক সময় নষ্ট না করিয়া সুরাট ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহ লুটিয়া রায়গড়ে চলিয়া যান। ইংরাজগণ সীদীদের বোম্বাইএ আশ্রয় দিলেন, ইহা শিবাজীর নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি জঞ্জীরা আক্রমণ করিবার জন্য পুনরায় নৌবহর পাঠান, কিন্তু কাসীম সীদী বোম্বাই ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। এই সময় শিবাজী নৌসৈন্য সাধ্যমত বাড়াইয়া ছিলেন। শিবাজীর নৌবহর সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত বিবরণ যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা Robert Orme's Historical Fragments নামক ইংরাজী পুস্তকের ৭০ হইতে ৯০ পৃষ্ঠা দেখুন।

শিবাজী শেষ সমুদ্রাভিযানে বিশেষ সাফল্য লাভ

পরাজিত হইয়াছিল। জঞ্জীরা ব্যতীত সমস্ত স্থান জয় করিয়া শিবাজী নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

সমুদ্রের পশ্চিমপ্রান্ত বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল, কিন্তু শিবাজীর নৌবহর ইউরোপীয় নৌ-বহরের মত শক্তিশালী ছিল। দূর সমুদ্রে ইউরোপীয় রণতরীর সহিত যুদ্ধে মারাঠা নৌবহর কয়েকবার পরাজিত হয়। এইরূপ বিভিন্ন কারণে ছত্রপতি নানাপ্রকারে নূতন রণতরী নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন, নৌসৈন্যগণকে নবীন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়া মরাঠা নৌবহর অজেয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া, নিজের হাতে গড়া বিশাল মারাঠা সাম্রাজ্য ফেলিয়া শিবাজী পরলোক প্রস্থান করিলেন। সীদী ও জঞ্জীরার নাম করিতে করিতে তাঁহার শ্বাস বায়ু বহির্গত হইয়াছিল।

শিবাজীর নৌবহর সম্বন্ধে একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন :—

The completion of his plans was entrusted to Moro Punt, his principal minister who found himself, however unable to cope with the Sidee, inured to a sea life, and possessed of large and stout vessels. Several of these engagements were fought within sight of Bombay. History of the Mahrattas by Edward Scott Waring. 1810. Page 85.

অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের ইংরাজী ইতিহাসের এক সম্পূর্ণ অধ্যায়ে শিবাজীর নৌবহর ও জলযুদ্ধের বিশদ বর্ণন আছে।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

অনুক্রম

৫

বাড়ী ফিরিয়া হরেন্দ্র বাবুর যখন মণির বা ধীরেনের কথা মনে হইল, তখন আর তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যাঁহারা সেদিন আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুইজন হরেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধী আর একজন তাঁহার বন্ধু। তাঁহারা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরেন, মেয়েটি কে ?" তখন হরেন্দ্রকৃষ্ণ জবাব দিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে সকলের খাওয়া-দাওয়া সারা হইলে হরেন্দ্র বাবুর স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, এই মেয়ে-ডাক্তারটি কে গা ? তুমি কি ওকে চেনো ?"

হরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "চিনি বই কি, বেশ চিনি। আমাদেরই আপনার লোক।"

—কে বল দেখি ?

—ওর মা আমাদেরই বাড়ীতে ছিলেন।

—নামটাও কি শুনিনি ?

—শুনেছ বই কি। মার কাছে তারিণী পিসীর নাম

—বটে

স্বামী-স্ত্রীতে আর কোন কথা হইল না।

তাহার পরে মণি আর একদিনও হরেন্দ্র বাবুর বাসায় আসিত না। তাহার যে সকল পাহাড়ী ভক্ত নিত্য জিনিস যোগাইত, তাহারাও ক্রমশ সরিয়া গেল। তখন হরেন্দ্র বাবু শুনিতে পাইলেন যে গোয়ালা দুধের পয়সা লয় নাই, তরকারী বা মাছের দাম অনেক বাকী পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এক দিন মণি-মালিনীর সন্ধানে বাহির হইলেন। ঠিক সেই সময়টা নীচে ভুটিয়া-বস্তীতে বড় ডেঙ্গু আরম্ভ হইয়াছিল ; সুতরাং মণিকে এক মিনিটও বাড়ীতে দেখা যাইত না। হরেন্দ্রবাবু অনেক কষ্টে পাহাড়ের উপরে উঠিয়া শুনিলেন যে, মণি বাহির হইয়া গিয়াছে, কখন ফিরিবে তাহার ঠিক নাই। অবসন্ন দেহে তিনি যখন নীচে নামিতে ছিলেন, তখন ধীরেন, হারাণ ও অনুপম এক রোগীকে ঔষধ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। হরেন্দ্র বাবু তাহাদের

"কি মশায়, বেশ চল্‌তে ফিরতে পারছেন তো! এখন আর মাথা ঘোরে না?"

হরেন্দ্র বাবুর তখন মনে পড়িল যে, এই লোকটিই তাঁহাকে হাসপাতাল হইতে লইয়া আসিয়াছিল। তিনি তখন কলিকাতার প্রথায় ঈষৎ হাসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এখন ভালই আছি। সেদিন বড়ই উপকার করেছিলেন!"

হরেন্দ্র বাবু শিষ্টাচার-সম্মত দুই-একটি কথা বলিয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টায় আছেন দেখিয়া ধীরেন তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, "দেখুন মশায়, আপনার সঙ্গে আমাদের দুটো কথা আছে। আপনি যদি মণি-দিদির আত্মীয় না হতেন তো বলতুম না। কথাগুলো একটু শক্ত হবে, বুঝলেন, অপরাধ নেবেন না।"

হরেন্দ্র বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "বলুন না,—অপরাধ আবার কিসের?"

হরেন্দ্রবাবুকে পথের ধারের দেওয়ালের উপর বসাইয়া ধীরেন বলিল, "দেখুন, আপনার ছেলের সঙ্গে মণি দিদির সেদিন হঠাৎ দেখা না হলে আপনার কি হতো মনে ভেবে দেখেছেন কি? এই দূরদেশে, এখানে একা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আছেন, অমন কাজ কি করতে আছে! সেটা যদি বোঝেন, তবে অমন করেন কেন?"

হরেন্দ্র বাবু উত্তর দিলেন না দেখিয়া ধীরেন বলিয়া গেল, "আপনার জীবনটা তো যেতেই বসেছিল, কেবল সময় থাকতে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল বলেই না এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেছেন। দেখুন, স্ত্রীর মুখ চেয়ে ছেলে-মেয়েগুলির মুখ চেয়ে এ কাজ আর করবেন না!"

হরেন্দ্র বাবু মাটীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না।"

তখন ধীরেন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল।

তিনি চলিয়া গেলেন। তখন অনুপম দেখিল, তাহার ওভার-কোটের পকেটে একটী বড় জিনিষ রহিয়াছে, সেটার আকার অনেকটা বড় বোতলের মত।

সেদিন হারাণ সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সকলে যখন তাহার বাড়ীতে গেল তখন রাত্রি হইয়াছে। ধীরেন ও অনুপমকে বাহিরে বসাইয়া

গেল; কিন্তু ফিরিতে বিলম্ব হইতেছিল। ধীরেন তখন ডাকিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু উত্তর পাইল না। অল্পক্ষণ পরেই তাহারা দুইজনে শুনিতে পাইল, চাপা গলায় বচসা হইতেছে; কিন্তু তাহার দুই-একটা কথা ক্রমশঃ চড়া আওয়াজে বাহির হইতেছে।

—আমি শুনেছি সে ডাইনী, তা নইলে এত মানুষ সহজে তার বশ হয় কেন! আমি কখ্‌খনো তোমাকে তার কাছে যেতে দেব না। যদি আর কোন দিন শুনি যে তুমি তার কাছে গেছ তাহলে বাড়ী ফিরে রক্তগঙ্গা দেখতে পাবে।

ধীরেন হাসিয়া অনুপমের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাইনীটা কে রে?"

অনুপম মুখখানা বাঁকাইয়া বলিল, "এ কি মণির কথা হচ্ছে?"

ধীরেন বলিল, "দূর পাগল! তাকে কি বৌমা কখনো ডাইনী বলতে পারেন? তাঁর সঙ্গে মণি-দিদির কত আলাপ!"

এই সময় বাড়ীর ভিতর হইতে আবার শোনা গেল, "দাদা বলে তো হয়েছে কি? ডাইনে সব বলে, ছেলে খাবার যম। আচ্ছা, দার্জ্জিলিং শহরে এত লোক থাকতে তোমার উপর ডাইনীর এত টান কেন, তোমায় দাদা বলবার দরকার কি?"

একটু থামিয়া শব্দটা আবার আরম্ভ হইল, "দেখ এত করে তোমায় বোঝাচ্ছি, তবু তুমি বুঝ্‌চোনা! মণি আমার বোনের মত, তার স্বভাব বড় সুন্দর, তুমি ভুল বুঝচো।"

"এতদিন চোখে ধুলো দিয়ে রেখেছিলে, তাই বুঝতে পারি নি। আজ থেকে কিন্তু তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, ও-ডাইনী মাগীর ছায়া যদি তুমি মাড়াবে তাহলে তোমার পায়ে আমি আত্মহত্যে হব। ও যে সুন্দর কোন্‌খানটায় তা সেইদিন বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এত লোক তো আছে, তোমাদের তিনটি বন্ধুর দিনে তিনবার জলাপাহাড়ে না উঠ্‌লে ভাত হজম হয় না কেন, বল দেখি?"

শব্দটা আবার নরম হইয়া গেল, তখন ধীরেন বলিল,

অনুপম কোন কথা কহিল না।

অনেকক্ষণ পরে হারাণ যখন ফিরিয়া আসিল, তখন দুইজনের একজনও তাহার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা করিল না। সেদিন আহারে বসিয়া কেহই বড় একটা কথা কহিল না, অথচ অন্য দিন তাহারা তিনজনে একত্র হইলে হারাণের ক্ষুদ্র গৃহখানি কাঁপিয়া উঠিত। কোন মতে নাকে-মুখে আহার গুঁজিয়া ধীরেন যখন উঠিয়া পড়িল তখন অনুপম বলিল, "ধীরুদা, চল, বাসায় যাই।"

হারাণ তাহাতে আপত্তি করিল, বলিল, "না, না, এখন যাবি কি! এই তো সবে সাড়ে আটটা।"

অনুপম বলিল, "তা হোক,আজ শরীরটা কেমন করছে।"

হারাণ বলিল, "শরীরটা যেমনই করুক না কেন, তোর এখন যাওয়া হবে না।"

—বাড়ীর ভেতর যেতে ভয় হচ্ছে?

—তবে তোরা শুনেছিস?

অনুপম বলিল, "যে চাপা গলায় স্বামী-স্ত্রীতে একটি ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে শিষ্টালাপ করছিলে…!"

হারাণ হাসিয়া ফেলিল।

এই সময় দুয়ারে মাথা গলাইয়া কে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, অনুপমচন্দ্র বাবুজী কি এখানে আছ?"

৬

ও-রকম অপ্রত্যাশিতভাবে বিশু কাকার আবির্ভাবে অনুপম ভয় পাইয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। ধীরেন বলিল, "এই যে কাকা, আমরা সকলেই এখানে আছি।"

ছত্র-যষ্ঠি-হরিকেন-সমন্বিত শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায় মহাশয় ক্রমশঃ কিস্তিবন্দী করিয়া ঘরের ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে হারাণ তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। রায় মহাশয় সুখাসনে সমাসীন হইয়া বলিলেন, "বাপু হে, বুড়ো হয়েছি, এখন কি আর তোমার পিছন-পিছন ঘোড়দৌড় করা পোষায়!"

ধীরেন বলিল, "সে কি কাকা, এই যে আপিস থেকে ফিরে আপনার সঙ্গে দেখা করে এলুম!"

বিষম বিরক্ত লইয়া রায় মহাশয় বলিলেন, "ইঁচড়ে-পাকা ছেলে, বিশু রায়ের যদি সময় থাকতো তাহ'লে আর— কান্নাকাটি ক'রে পত্র দিচ্ছেন, একটি জবাব না হয় দাও, তোমার জ্বালাতে আমার যে প্রাণটা যায়! হরি বিশ্বনাথ পার কর! বয়স হয়েছে—রোজগার করছ, এখন বিয়ে করতে আপত্তিটা কি, বাপু? বুড়ো বাপ দু'পয়সা প্রত্যাশা ক'রে বসে—"

অনুপম এতক্ষণ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিল, সে এতক্ষণে বলিয়া উঠিল, "আমায় বলছেন? দেখুন, আমি পণপ্রথার ভয়ানক বিরোধী, এই জন্যই বাংলা দেশে হিন্দু-সমাজের এই দারুণ অধঃপতন হচ্ছে—"

বিশ্বনাথ রায় বলিয়া উঠিলেন, "বাপু হে, এঁচড়ে যে পেকেছ তা তো অনেক দিনই জানি। আমার অজীর্ণ রোগ আছে, জেনে শুনে অত বড় লম্বা-চওড়া কথাগুলো কেন, বাপু!"

অনুপম হটিবার পাত্র নহে, সে বলিল, "দেখুন, আপনি বাবাকে বলবেন—না হয় লিখে দেবেন যে পণ নিয়ে একজনের সর্ব্বনাশ করে আমি বিয়ে করতে চাইনে—বুঝলেন?"

দুই হাতে দুই খানা বড় থালা লইয়া হারাণ প্রবেশ করায় বিশ্বনাথ খুড়ার আর জবাব দেওয়া হইল না। হারাণ বলিল, "কাকা, মেয়েরা বলছিল, কোনও দিন তো পায়ের ধূলো পড়ে না, আজ যদি আমার কুঁড়েয় পায়ের ধুলো পড়েছে তো একটু মিষ্টি মুখ করে যেতে হবে।"

আনন্দে রায় মহাশয়ের দশনাবলী বিকশিত হইয়া পড়িল; তিনি বলিলেন, "তা হবেই তো, কেমন ঘরের মেয়ে আনা হয়েছে!"

একখানা থালায় রাশীকৃত গরম লুচি আর একখানায় এক-রাশ রসগোল্লা সাজানো ছিল। তাহা দেখিয়া অনুপম বলিয়া ফেলিল, "হারু, কাকার ডায়াবিটিশ আছে। জেনে শুনেও এতগুলো মিষ্টি দেওয়া তোর ভাল হয় নি।"

নেড়ার কথাটা রায় মহাশয়ের মর্ম্মস্থল ভেদ করিল। তিনি বলিলেন, "বলি নেড়ারাম, পাকামিটি সকল রকমেই শিখছ। ডায়বিটিস আছে তাতে তোমার কি?"

অনুপম জবাব দিল, "ব্যায়রামে কষ্ট পান, সেই জন্যই

পাছে কেহ মিষ্টান্ন উঠাইয়া লয় সেই ভয়ে রায় মহাশয় তাড়াতাড়ি সেটা উচ্ছিষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং তর্ক ছাড়িয়া আহারে মন দিলেন।

আহার শেষ হইলে রায় মহাশয় মুখে মসলা দিয়া অনুপমকে ধরিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন যে, অনুপমের পিতা যখন ধরিয়া পড়িয়াছেন তখন সে আট বছরের মেয়েটিকে তাহার বিবাহ করিতেই হইবে। অনুপম বিপদে পড়িল, পড়িয়া সেই পণপ্রথার আশ্রয় লইল। সে বলিল যে আট বৎসরের কুৎসিত মেয়েটির উপর যখন তাহার পিতার ঝোঁক পড়িয়াছে, তখন তিনি নিশ্চয়ই বিলক্ষণ অর্থপ্রাপ্তির আশা পাইয়াছেন, এ রকম অবস্থায় সে কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজী হইতে পারে না। তর্ক-বিতর্কে রাত্রি হইয়া গেল। দশটা বাজিবার পরে বাহির হইতে কে একজন দরজায় ঘা দিল, হারাণ দুয়ার খুলিয়া দেখিল বর্ষাতি মুড়ি দিয়া মণিমালিনী দাঁড়াইয়া আছে।

সেদিন সে রকম অবস্থায় মণিমালিনীকে দেখিয়া হারাণের মুখে কথা ফুটিল না, সে যেন বেকুব হইয়া গেল। মণি তাহা দেখিয়া বলিল, "নেড়াদাকে খুঁজে এলুম, বাড়ী নেই। হারুদা' তুমি শীগ্‌গির এসো, ভারী বিপদ হয়েছে।"

মণির গলার আওয়াজ শুনিয়া ঘরের ভিতর হইতে অনুপম বলিয়া উঠিল, "এই যে আমরা সকলেই এখানে আছি।"

বাহিরে টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল। মণিমালিনী ছাতাটা মুড়িয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল। তাহাকে দেখিয়া রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা বাছা এত রাত্তিরে?"

মণি তাঁহার দিকে না চাহিয়াই বলিল, "আমি মণি-মালিনী। একটি রোগী মরমর, সেই জন্য নেড়াদা হারুদাকে ডাকতে এসেছি।"

"রোগী মরে, তার জন্যে তোমাকে কেন পাঠিয়েছেন বাছা? তোমাদের বাড়ীতে কি আর পুরুষ নেই?"

প্রশ্ন শুনিয়া মণি একটু হাসিল। সে বলিল, "আমাদের বাড়ীতে কেউ পুরুষ মানুষ নেই, বুঝলেন খুড়োমশাই! মানুষের মধ্যে মাসিমা, আমি, আর বেবি। রোগী আবার আমাদের বাড়ী নয়।"

"তবে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন মা! এই রাত্তির কাল, একা, সঙ্গে পুরুষ মানুষ নেই, কেন বেরিয়েছ বাছা?"

মণিমালিনী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং পরে বলিল, "মাথা ব্যথাটি আমার অনেক দিন থেকে, বুঝলেন কাকা। কেন যে আমার মাথা ব্যথা করে তা আমিই বুঝতে পারিনে! পুরুষ কেউ নেই বলেই তো দাদাদের সন্ধানে এসেছি। মেয়ে মানুষ দিয়ে সকল কাজ তো হয় না, সেই জন্যই নেড়াদাকে ধরতে হয়। ধীরুদা, দেরী করলে হবে না, ওঠো। সেই মুন্সেফ বাবুটির বাড়ীতে আজ রাত্রিবাস। হারুদা তুমিও এসো, একবার দেখে এসো। যদি অবস্থা ভাল বোধ হয় তাহলে না হয় চলে এসো। নেড়াদা আর ধীরুদা আমার সঙ্গে থাকবে। তুমি চট্ করে বৌদিকে বলে এসো।"

বৌদিকে বলিয়া আসার কথা শুনিয়া ধীরেন একটু হাসিল। অনুপম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তবে, আর দেরী করে কাজ নেই, চল ধীরুদা। হারু, তোর আর বাড়ী যেতে হবে না।"

অনুপম চলিয়া যায় দেখিয়া রায় মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "ওহে অনুপমচন্দ্র বাবাজীবন, আমার কথাটার জবাব দিয়ে গেলে না?"

রাস্তায় দাঁড়াইয়াই অনুপম বলিল, "আপনি বাবাকে লিখবেন, এখন আমি বিয়ে করব না।"

চারিজনে বাহির হইয়া পড়িল দেখিয়া অগত্যা বিশ্বনাথ রায় মহাশয়ও ছত্র যষ্ঠি ও হরিকেন লণ্ঠন সংগ্রহ করিয়া বাসায় ফিরিলেন।

পথে যাইতে যাইতে মণি জিজ্ঞাসা করিল, "ধীরুদা, নেড়াদা এখন বিয়ে করতে চায় না কেন?"

ধীরেন গুরুভোজনের পর উপরে উঠিতে হাঁপাইতেছিল। সে বলিল, "আসামী তো সঙ্গেই রয়েছে, জিজ্ঞাসা কর না দিদি!"

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া মণি অনুপমকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি নেড়াদা, বিয়ে করবে না কেন?"

অনুপম হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "আমায় ডাইনেয় [illegible]"

বলিয়াই সে হারাণের দিকে চাহিল, হারাণ মুখখানা ফিরাইয়া লইল। মণি বলিল, "ডাইনের আমি বড় সুন্দর ওষুধ জানি, খাবে নেড়াদা ?"

"না, আমার ওষুধ খাবার দরকার নেই, আমি বেশ আছি।"

ধীরেন হাসিয়া উঠিল। তখন তাহারা ষ্টেশনের নীচের রাস্তা ধরিয়া উপরে উঠিতেছিল, হঠাৎ পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুরঝি, ও ঠাকুরঝি..."

মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া একটি স্ত্রীলোক তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। তিনি নিকটে আসিলে সকলে তাঁহাকে চিনিল,—হরেন্দ্র বাবুর স্ত্রী। মণি জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বৌদি ?"

বৌদি বলিলেন, "শীগ্‌গির এসো ঠাকুরঝি, আবার সেই রকম হয়েছেন, সন্ধ্যে থেকে সেই বিষ খাচ্ছেন, এই রাত্রি ন'টা থেকে কেমন এলিয়ে পড়েছেন।"

৭

হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাবুর সে দফা সারিয়া উঠিতে কিছু বিলম্ব হইল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, অতিরিক্ত পান-দোষে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা জন্মিয়াছে, আর বেশী অত্যাচার করিলে রোগীর শরীরের সে অংশের ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অন্য রোগীর ভার অনুপম ও হারাণের উপর দিয়া মণিমালিনী সে কয়দিন হরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতেই রহিয়া গেল। হরেন্দ্র বাবু সুস্থ হইয়া উঠিলে অনুপম একদিন তাঁহাকে মণি-মালিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল। হরেন্দ্র বাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মণি আমাদেরই আত্মীয়া, তবে কি জানেন, আমরা হিন্দু, ও এখন ব্রাহ্মিকা, তাই বিশেষ পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি নে।"

অনুপম আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

সারিয়া উঠিয়াই হরেন্দ্র বাবু দার্জ্জিলিং ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার যাত্রার দিন মণিমালিনী, হারাণ, অনুপম, ধীরেন—সকলে আসিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেল। তিনি চলিয়া যাইবার দুই-চারি দিন পরেই একদিন আপিস যাইতে বিলম্ব করিয়াছিল; আপিসে প্রায়ই তাহার বিলম্ব হইত, সুতরাং সেদিন গঞ্জনার মাত্রাটা বাড়িয়া গিয়াছিল। বকুনি খাইয়া যখন নিজের টেবিলে গিয়া সে বসিল, তখন দেখে, তাহার সম্মুখে একখানা পত্র পড়িয়া আছে। পত্রের শিরোনামাটা নূতন হাতের লেখা। পত্র খুলিয়া অনুপম পড়িল—

লুইস জুবিলী স্যানিটেরিয়াম
দার্জ্জিলিং, ২১শে শ্রাবণ

প্রিয় অনুপম

তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি বটে কিন্তু তোমার বাবা আমার অনেক কালের বন্ধু। অনেকদিন পূর্ব্বে আমি যখন দার্জ্জিলিঙ্গে ছিলাম তখন তুমি নিতান্ত শিশু। আমি ছুটি নিয়ে এসেছি, মনে করছি কিছুদিন এখানে থাকব। তোমার বাবাকে পত্র লিখে জেনেছি যে, তুমি এখানেই আছ। তুমি পত্রপাঠ আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমার শরীর বড়ই দুর্ব্বল, বেড়াতে বাহির হতে পারিনে, সুতরাং তুমি যখনই আসবে তখনই আমার সঙ্গে দেখা হবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুধীরকুমার হালদার

পত্রখানা পড়িয়া অনুপম কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না, লোকটি কে। কখনও যে পিতার কাছে সুধীরকুমার হালদারের নাম শুনিয়াছে তাহা তাহার মনে হইল না। লোকটা নিশ্চয়ই চাকরী করে, তাহা না হইলে ছুটি লইবে কেন? পূর্ব্বেও যখন দার্জ্জিলিঙ্গে ছিল, তখন বোধ হয় বদলী হইয়াছে। তাহা হইলে সরকারী চাকর হওয়াই সম্ভব। অনুপম তাড়াতাড়ি "বেঙ্গল সিভিল লিষ্ট" খুলিয়া দেখিল যে, সুধীরকুমার হালদার একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্ত্তমানে মৈমনসিংহে থাকেন।

আপিসের ছুটী হইলে অনুপম স্যানিটেরিয়ামে গিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধান লইয়া জানিল যে সুধীর কুমার হালদার তিনটা ঘর দখল করিয়া আছেন এবং তিনি সপরিবারে আসিয়াছেন। ঘরের দুয়ারে গিয়া ঘা দিতে

অনুপম ভয়ে পিছু হটিয়া গেল। মনুষ্য-মূর্ত্তি আকার-সদৃশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই হে ছোক্‌রা ?"

অনুপম ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "সুধীর বাবু এখানে আছেন কি ?"

—বাবু কি হে! ভদ্রলোককে মিষ্টার বলতে পার না? কোত্থেকে আসছ তুমি? বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েট থেকে? আমারই নাম সুধীরকুমার হালদার।

অনুপম এক কোণে দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন, তাই এসেছি।—আমার নাম অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"ওঃ, তুমি গোবিন্দ বাবুর ছেলে? এস হে বাবা-জীবন এস এস। ওগো তুমি কোথায় গেলে, একবার এদিকে এস তো।"

একটি অতি ক্ষুদ্রকায় স্ত্রীলোক অন্য ঘর হইতে আসিলে হালদার মহাশয় বলিলেন, "এরই নামই অনুপম, গোবিন্দ বাবুর ছেলে, বুঝলে? বসো হে বাবাজী।"

হালদার মহাশয় নিজে বসিয়া পড়িয়া অনুপমকে বসিতে বলিলেন, ঘরে তখন মোটে আর একখানা চেয়ার ছিল, তাহা দেখিয়া অনুপম বসিতে পারিল না। হালদার মহাশয় তখন বলিলেন, "ওগো, চা আনতে বল তো। আর খুকীকে ডেকে নিয়ে এসো, চা করে দিক।"

ক্ষুদ্রকায় হালদার-গৃহিণী চলিয়া গেলে হালদার মহাশয় আবার বলিলেন, "বসো হে বাবাজী।"

অনুপম অগত্যা বসিল। ইহার মধ্যে আরও দুইখানা চেয়ার টেবিল ও চায়ের সরঞ্জাম আসিলে হালদার-গৃহিণী কন্যা লইয়া দেখা দিলেন। হালদার মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাহেবী কায়দায় কন্যার সহিত অনুপমের আলাপ করিয়া দিলেন, "আমার মেয়ে ললিতা, ওকে আমরা খুকী বলেই ডাকি—মিঃ অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়।"

অনুপম ছোট একটি নমস্কার করিয়া আবার বসিয়া পড়িল। মেয়েটি চা তৈয়ার করিয়া সকলকে দিল। চা খাইয়া অনুপম বিদায় লইবার উপক্রম করিলে হালদার মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "তাও কি হয়! তুমি খুকীকে দুর্ব্বল, আমি তো মোটেই হাঁটতে পারব না, সুতরাং তুমি সঙ্গে করে না বেরুলে খুকীর আর ওঁর বেড়ানোই হবে না।"

অনুরোধ এড়ানো অনুপমের কোন কালেই অভ্যাস ছিল না। সুতরাং সে বলিল, "যে আজ্ঞে।"

হালদার মহাশয়ের গৃহিণী ও কন্যাকে লইয়া পথে উঠিতেই অনুপমের সঙ্গে মণিমালিনীর দেখা হইল। তাহার সঙ্গে দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়া মণিমালিনী ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এঁরা কারা, নেড়া দা?"

অনুপম বড়ই লজ্জিত হইল, কিন্তু মণি ছাড়িবার পাত্রী নয়। সে বলিল, "আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন্ না!"

কাজে কাজেই অনুপম হালদার-গৃহিণী ও শ্রীমতী ললিতার সহিত মণিমালিনীর পরিচয় করাইয়া দিল।

চৌরাস্তার পথে উঠিতে প্রথমে হারাণ ও তাহার পর ধীরেন আসিয়া জুটিল। অনুপম যথারীতি হালদার গৃহিণী ও তাঁহার কন্যার সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিল। তাহার পরে পথে যত পরিচিত লোকের সঙ্গে তাহাদের দেখা হইল, সকলের সঙ্গেই হারাণ আগু বাড়িয়া মহিলা দুইটির পরিচয় করাইয়া দিল। পরিচয়টা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া তাহার পর প্রত্যেকের কানে কানে আরও দুই একটা কথা বলিল; তাহারা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

স্যানিটেরিয়ামে ফিরিয়া অনুপম যখন সুধীর বাবুর কাছে বিদায় লইতে গেল তখন তিনি বলিয়া দিলেন, "কাল থেকে আপিসের ফেরত এখানেই চা খাবে, বুঝলে, তা নইলে ললিতার বেড়ানো হবে না, বুঝলে?"

অনুপম জবাব না দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, হারাণ আর অনুপম হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। অনুপম জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, হলো কি?"

হারাণ বলিল, "নেড়া দা, কনে পছন্দ হয়েছে?"

অনুপম বলিল, "দূর!"

ধীরেন হাসির বেগ সামলাইয়া বলিল, "এবার কিন্তু

৮

শনিবারের দিন আপিসের মালির কাছে একটা বড় ফুলের তোড়া পাইয়া অনুপম একেবারে মণির স্কুলের দিকে ছুটিল। এ কয়দিন সে আর মণির দেখা পায় নাই। তাহার উপর হারাণ আর ধীরেন ললিতাসুন্দরীর নাম করিয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সেদিন আর স্যানিটেরিয়ামে যাইতে তাহার মন সরিল না। পথে চৌরাস্তায় সে বিষম বিপদে পড়িয়া গেল। সেদিন যে হালদার-সাহেব তাঁহার বপুখানি একটি ছোট রিকৃশতে ন্যস্ত করিয়া সেক্রেটেরিয়েটে গৌরাঙ্গ সম্ভাষনে যাইবেন এ কথা অনুপম একেবারেই ভাবে নাই। অন্যদিন বরং সে কার্ট রোড ধরিয়াই বাসায় ফিরিত। আজ চেনা লোক এড়াইবার জন্যই সে উপরের পথ ধরিয়াছিল। ফুলের তোড়া-সমেত অনুপম একেবারে হালদার সাহেবের সম্মুখে পড়িয়া অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। হালদার-সাহেব তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে অনুপম, সকাল সকাল ছুটি হয়েছে, তাই আমাদের ওখানে চলেছো! বেশ, বেশ! গিন্নি বলছিলেন যে, ললি সারাটা দিন তোমার জন্যে বসে থাকে, কেবল ভাবে, কখন বিকেল হবে, কখন তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে। বা, বেশ তোড়াটি তো অনুপম, তোমার পছন্দ আছে। ললির জন্যে বাঁধিয়েছো বুঝি? তা বেশ, বেশ! তোমার অনুরাগ দেখে বড়ই খুসী হলুম। চল একসঙ্গেই যাই।"

অনুপম অভ্যাস-দোষে বলিতে পারিল না যে, সে ললিতার জন্য তোড়া বাঁধায় নাই আর সে অন্যত্র যাইতেছিল। কোনও জবাব না দিয়া রিকৃশ'র পিছন পিছন সে চলিতে আরম্ভ করিল। পথে যাইতে যাইতে তাহার মণির সঙ্গে দেখা হইল। তখন সে আর কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না। সে বলিয়া উঠিল, "ক'দিন ভয়ানক বিপদে পড়েছি, কিছুতেই যেতে পারছিনে।"

মণি হাসিতে হাসিতে বলিল,"সে সমস্তই আমি শুনেছি। হারুদা রোজ তোমার অবস্থার কথা আমায় শুনিয়ে যান। বৌ-দির জন্য ফুলের তোড়া নিয়ে যাচ্ছ বুঝি? বিয়ের সময় নিমন্ত্রণ করতে ভুলে যেয়ো না!"

ছুটেছিলুম, পথে বিষম বিপদ! হালদার মশায়ের সঙ্গে চৌরাস্তায় দেখা, তিনি ধরে ফেলেই জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোড়াটা তাঁর মেয়ের জন্য নিয়ে যাচ্ছি বুঝি—"

—বেশ তো, তাতে তুমি এত লজ্জা পাচ্ছ কেন নেড়াদা? ওঃ, শ্বশুর বলে বুঝি! সেকালে শুনেছি শ্বশুর-শাশুড়ীকে দেখলে ভয়ানক লজ্জা করতে হত। তা, নেড়াদা, তুমি তো ততটা সেকেলে ফ্যাসানের নও! তুমি বল্লে না কেন যে হাঁ শ্রীমতী ললিতার জন্যই এমন সুন্দর করে তোড়াটি বেঁধেছি!

—কেমন করে এই জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা বলি? তোড়াটা বাঁধাবার সময়ে শ্রীমতী ললিতাসুন্দরীর কথা আমার একবারও মনে হয় নি?

—ছি, নেড়াদা, মিথ্যে কথাটি কেমন করে বল্লে?

—মাইরি বলছি, ঈশ্বরের দিব্যি বলছি আর যে দিব্যি করতে বলবে তাই করে বলছি, ও তোড়া আমি...আর-একজনের জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলুম।"

কথাটা শুনিয়া এক মুহূর্তের জন্য মণির মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। অনুপম মুখ নামাইয়া লইল।

হালদার মহাশয়ের রিকশ' একটু দূরে গিয়া থামিয়াছিল। ভাবী জামাতার বিলম্ব দেখিয়া তিনি একজন কুলীকে পাঠাইয়া দিলেন, সে আসিয়া অনুপমকে জানাইল, সা'ব বোলাতা।

অনুপম রাগিয়া বলিল, "আবি দের হোগা, সাবকো চলা যানে বোলো।"

মণিমালিনী তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "ছি ছি, নেড়াদা শ্বশুর বাপের সমান, অমন জবাব কি ভাল দেখায়? তুমি এখুনি চলে যাও। আমার সঙ্গে আর কথা কইতে হবে না, বরং কাল দিনের বেলায় বাড়ীতে এসো। হারুদা ধীরুদা আসবে! আমি এখন যাই।"

মণিমালিনী চলিয়া গেল, কাজে কাজেই অনুপমকে রিকৃশ'র কাছে ফিরিতে হইল। হালদার-সাহেব তাহার বিলম্ব দেখিয়া রাগে ফুলিতেছিলেন। সে আসিলেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, এত দেরী কেন? ও মেয়েটি

"উনি এখানকার মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, ওঁর নাম শ্রীমতী মণিমালিণী মুখোপাধ্যায়, অনেকদিন পরে দেখা হল কি না!"

—কতদিন পরে দেখা হল বাবাজী?

বাবাজী সম্বোধনটা অনুপমের চাবুকের মত লাগিল। সে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল, "এই তিন-চার দিন পরে।"

হালদার সাহেব বলিলেন, "ওঃ!"

ভাবী জামাতার সহিত হালদার সাহেব যখন স্যানিটেরিয়ামে পৌছিলেন তখন তাঁহার গৃহিণী ও কন্যা সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া ছিলেন। অপ্রসন্ন মুখে হালদার সাহেব চা খাইতে বসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া স্ত্রী-কন্যার মুখও শুকাইয়া গেল।

চা খাওয়া শেষ হইলে অনুপমকে ললিতার কাছে রাখিয়া হালদার সাহেব গিন্নীর সঙ্গে একটু অন্তরালে সরিয়া গেলেন। তখন ললিতা মুখ তুলিয়া বলিল, "বেশ সুন্দর তোড়াটি!"

প্রশংসাটা কিন্তু অনুপমের ভাল লাগিল না। সে বলিল, "ও আমাদের আপিসের মালি বাঁধে, রোজই আপিসের ফুল তুলে বাঁধে, ভালগুলো সাহেবদের দেয় আর খারাপগুলো এক একদিন এক একজন কেরাণীর ভাগ্যে পড়ে।"

কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। অনুপম সেদিন মালিকে বকশিসের লোভ দেখাইয়া ভাল তোড়া বাঁধাইয়া আনিয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া কিন্তু ললিতার মুখখানি ছোট হইয়া গেল। সে তবুও বলিল, "যে মালি রোজ এমন তোড়া বাঁধতে পারে সে আপিসের মালি হবার যোগ্য নয়। সে উঁচু পদ পেতে পারে।"

অনুপম ললিতার কথার জবাব না দিয়া বসিয়া রহিল।

পাশের ঘরে হালদার সাহেব তাঁহার গৃহিণীকে বলিতেছিলেন, "বেশী বিলম্ব হলে বিগড়ে দাঁড়াতে পারে। তখন আর কিছুতেই পোষ মানানো যাবে না। এইবেলা যা হয় করে ফেল।"

গৃহিণী বলিলেন, "এ কি ছেলেখেলা! তবু আমি লজ্জার মাথা খেয়ে ললিকে রোজ বলি। ছেলেমানুষ মেয়ে—কন্যাদায়ে পড়ে তুমি যতটা গায়ে পড়া হতে বল, ততটা কি মেয়েতে পারে?"

"তুমি বুঝতে পারছ না। আজ আবার সেই মণিমালিনীর সঙ্গে রাস্তায় ওর দেখা হয়েছিল। তাকে ছেড়ে কোন মতেই আসতে চায় না। লোক পাঠিয়ে ডেকে পাঠাই, তবে আসে।"

"সে মাগী দেখতে শুনতে তো তেমন নয়, আর ললির পায়ের নখের যুগ্যিও নয়, তবে ছেলেটি এমন করে কেন?"

"সে কথায় কাজ নেই। একবার কোনও রকমে বাছাধনকে গেঁথে ফেলতে পারলে হয়, তারপর দেখে নেব।"

—সে রাজী হয়ে তোমার টোপ গিললে তবে তো গাঁথবে।

—নিশ্চয় গিলবে, না গেলে তো জোর করে গিলাতে হবে।

—এ কি ছেলে-মেয়েকে দুধ খাওয়ানো যে, হাত-পা ধরে জোর করে গিলিয়ে দেবো।"

—তুমি ললিকে ভাল করে বল না।

—এর চাইতে বেশী বলা যায় না।

সেদিন বেড়াইতে গিয়া অনুপম বেশী কথা কহিল না। ললিতা যতদূর পারিল তাহাকে কথা কহাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কথা কহাইতে পারিল না। তখন লজ্জায় আর অভিমানে সে চুপ করিয়া গেল। সেদিনকার বেড়ানো যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করিয়া অনুপম মেসে ফিরিয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গভীর

সাগর বলে,—"গম্ভীর আমি;"
আকাশ বলে,—"আমার মত?"

কেউ জানো কি,—মর্ত্ত্য মানুষ
মোদের এ মন গভীর কত।

স্পেনের কথা

২

প্রাচীন স্পেনের অধিবাসীরা অত্যন্ত বিলাসী ছিল; নিজেদের লইয়া তারা এতখানি মত্ত থাকিত যে ভোগ-



গির্জ্জার মধ্যকার দৃশ্য



সরাই



ঘরের মধ্যে



স্পেনের নর্ত্তকী

বিলাসের মধ্যে গরিবের কথা তারা ধর্ত্তব্যের মধ্যেও আনিত না। অহঙ্কারী নির্ম্মম ধনী-সম্প্রদায় গরিব জনসাধারণকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখিত। কাজেই সাধারণ প্রজার আর্থিক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত খারাপ।

কিন্তু এই দোষ ছাড়া সেকালের স্পেনিশের বীরত্বের, ধর্ম্মানুরাগের ও অধ্যবসায়ের অভাব ছিল, এমন কথা কেহ

কোন দিনই বলিতে পারিবে না। আর স্পেনিশদের সখের খেলা চিরদিনই ঐ বুল্-ফাইট।

তারপর প্রাচীন স্পেনের বুরোক্রেসি ভাঙ্গিয়া জন-মত যেদিন গড়িয়া উঠিল, স্পেনের হৃদয়ের বাণী সেদিন টলেডোর



দড়ির কারখানা



ছেলেদের খেলা



উত্তর স্পেনের একখানি গ্রাম

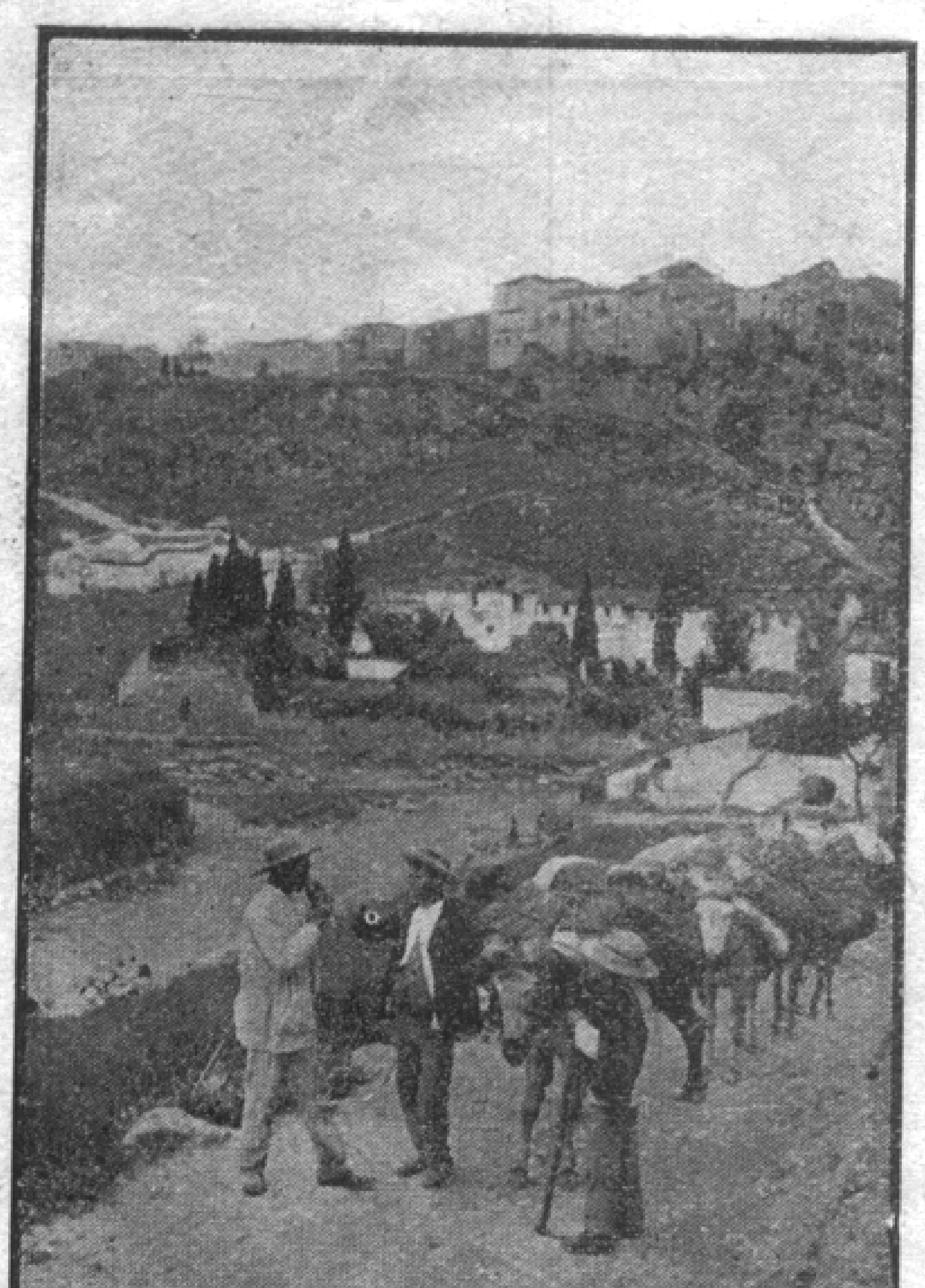


ক্ষেত্

শিলা-স্তম্ভে লেখা হইল, "এই টলেডোর শাসন-কর্ত্তৃত্ব যিনি চাহিবেন, তিনি ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির কথা ভুলিয়া যাইবেন! প্রেম, ভয় ও লোভ, এই তিনটি জিনিষ তিনি বর্জ্জন করিবেন। সাধারণের স্বার্থের নীচে ব্যক্তিগত



ফুলের বেসাতি



প্রাচীন গ্রাম

স্বার্থকে চিরদিন চাপিয়া রাখিবেন; আর ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইবেন না। এই স্তম্ভের মতই চিত্তকে খাড়া ও দৃঢ় রাখিতে হইবে।”

স্পেনের অধিবাসীরা চির দিনই ভাবুক। পরার্থে স্বার্থ ও আপনাকে উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত স্পেনে প্রচুর। এটি মুসলমানী সভ্যতার ফল। ভিক্ষাদান স্পেনের ধর্ম্ম—য়ুরোপের আর সব প্রদেশে ভিক্ষুককে পুলিশে ধরে; শুধু এই স্পেনের ভিক্ষুক ভারতের মত কৃপার পাত্র, ভিক্ষাও পায়, দ্বার হইতে তাহাকে কেহ হাঁকাইয়া দেয় না।

এক কালে স্পেনে শিক্ষার অভাব খুবই ছিল। এই জন্য কাল্‌চারে (culture) স্পেন অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতির অনেক পিছনে রহিয়া গিয়াছে! অবশ্য রাজধানীতে ও বড় বড় সহরে কয়েকজন মাত্র পণ্ডিত বা লেখককে লইয়া সমস্ত জাতির শিক্ষার মাপ কষা যায় না। স্পেনের প্রকৃত পরিচয় লইতে হইলে স্পেনের পল্লীতে যাইতে হয়। সহরে বিলাস-ঐশ্বর্য্যের জাঁকে চোখে ধাঁধা লাগিলেও পল্লীতে এখনো সারল্য বিরাজ করিতেছে। সেখানকার পল্লীতে অতিথির আজো আদর আছে,—এদেশের মত আজো ধর্ম্মশালার পর ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণে লোকের আগ্রহ অপরিসীম। গ্রামে সরাইয়ের প্রাচুর্য্যও দেখা যায়। সারা দিন কাজ-কর্ম্ম সারিয়া লোকেরা এই সরাইয়ে আসিয়া বৈঠক বসায়; গান গায়, নাচ দেখে, সুরা পান করে।



মাটীর বাসনের দোকান

বিদেশী, এই সরাই দেখিয়া সেখানে ঘেঁস দিতে চাহে না—কেন না, সেকেলে ধরণ-ধারণগুলিতে আজও সরাইয়ে ভরিয়া



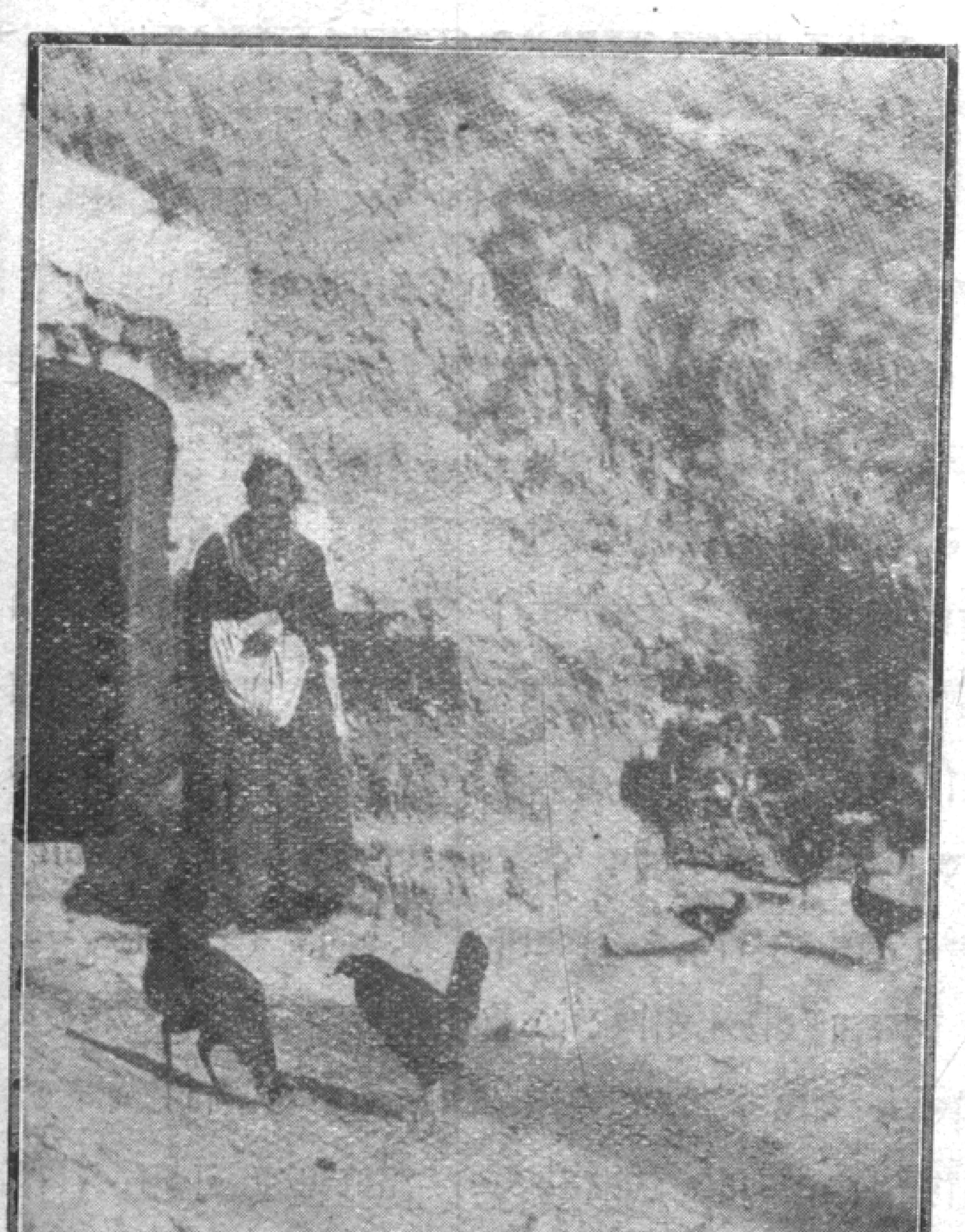
শ্রান্ত পথিক



রয়েল গাড়ী

আছে! আমোদের সময়—বিরাট হল্লা, গলা ধরাধরি করিয়া নাচ-গান সভ্য জগতের চক্ষে সেটা বর্ব্বরতার নামান্তর হইলেও এগুলার মধ্যে প্রাণ-খোলা সরল ভাব বর্ত্তমান আছে—এ কথা দরদীর দল স্বীকার করিবেনই।

স্পেনে ধর্ম্মশালাগুলির নির্ম্মাণভঙ্গী এক রকমের। বাহিরে ছোট-খাট সুরার বিপণী, ভিতরে প্রমোদকুঞ্জের মত গাছপালায়-ভরা বাগান ও তাহারই সাম্‌নে ঘর। বাহিরে সংাইখানার মুরগী গরু বাছুর খচ্চর ও গাধার আস্তানা। ধর্ম্মশালার পথিকেরা এইগুলি ব্যবহার করে এবং সেগুলি সর্ব্বদাই বেশ সাফ্‌ রাখা হয়।



জিপ্‌সীর ঘর

স্পেনের গৃহস্থালীতে গৃহিণীর অধিকার সকলের উপর অর্থাৎ তিনিই ঘরের মালিক। গৃহিণী সারাদিন কাজকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকেন—আলস্য কাহাকে বলে জানেনও না। অতিথি-সেবার ভার গৃহিণীর হাতে। স্পেনে গিয়া যাঁহারা কোন গৃহে বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করিবেন, যে, স্পেনে অতিথি-সেবা ধর্ম্ম বলিয়াই সকলে মনে করে, সেজন্য অতিথির আদর ও সেবায় কোন দিক দিয়াই কোন ক্রটি থাকে না।

এখানকার মত স্পেনের পল্লীগ্রামগুলিতে সপ্তাহে একদিন

করিয়া হাট বসে। গাছের ছায়া-ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাট হয়। ফলমূল, শাকসব্জী, বাসন-কোসন,—অর্থাৎ সংসারের প্রয়োজনীয় সর্ব্ব-প্রকার জিনিষ হাটে বিক্রয়ের জন্য আসে। বেচা-কেনা সন্ধ্যা অবধি চলে। এই হাটের এক প্রান্তে ছোট্ট একটু ঘেরা জায়গায় দেবী ভার্জ্জিন মেরীর একটি প্রতিমূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। মূর্ত্তির সামনে হাটের দিন একটি প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়। ব্যাপারীর দল ও ক্রেতার দল সকলেই হাট করিতে আসিয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া যায়।

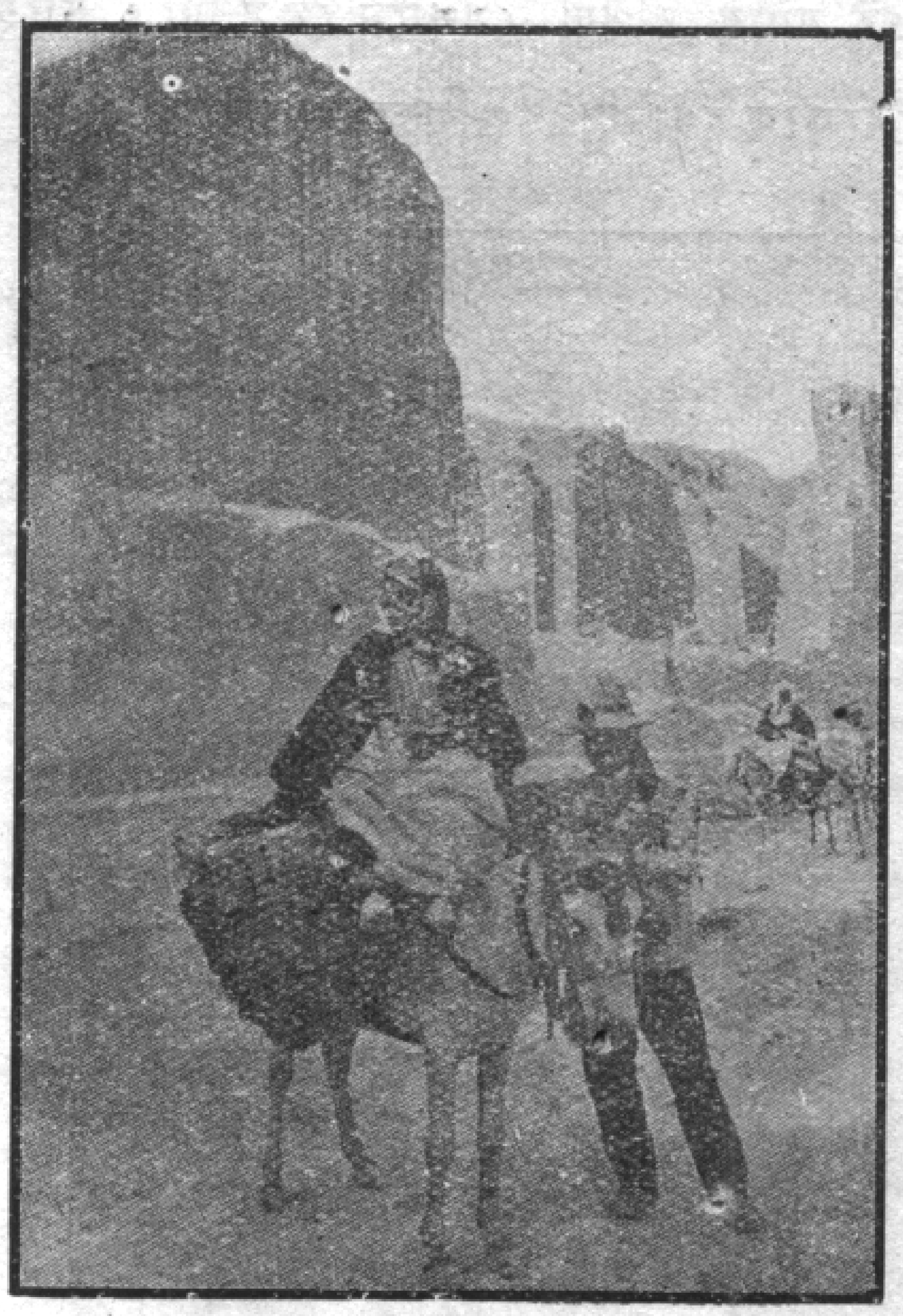
খাওয়া-দাওয়ার ছাড়া বয়েল, গরু, ঘোড়া, ছাগল এ-সবেরও স্বতন্ত্র হাট বসে!

স্পেনের উত্তরে ফরাসী মুল্লুকের সীমান্তে এক জাতি বাস করে—তারাই নাকি য়ুরোপের সব চেয়ে প্রাচীন জাতি। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বহু-প্রাচীন প্রথার প্রচলন আছে—তার মধ্যে একটি জ্যেষ্ঠ পুত্রের পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার। এ জাতির ভাষাও স্বতন্ত্র। চাষ-আবাদ করিয়াই ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

স্পেনে ভেড়া পোষার খুব রেওয়াজ আছে। এক একজন গৃহস্থের অমন সংখ্যায় পঞ্চাশ ষাট হইতে হাজার-করা অবধি



চড়িভাতির আমোদ



দক্ষিণ স্পেনের দৃশ্য

ভেড়া আছে। এই ভেড়ার লোম হইতে পশমের কারবার হয়। এই পশমের ব্যবসায়ে হাজার-হাজার লোক প্রতিপালিত হয়। বিচিত্র ধরণের ফুলদানীও স্পেনে তৈয়ার হয়।

স্পেনে জিপ্‌সীর প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে স্পেনে জীবিকার সংস্থান অনেকটা সহজ ও সুলভ বলিয়াই জিপ্‌সীর সংখ্যা এখানে এত অধিক।

স্পেনের পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহে রেলগাড়ীর প্রচলন এখনো তেমন হয় নাই! এ সব জায়গায় এক রকম ফিটন আছে—সেই ফিটনে চড়িয়াই দেশের লোক গতায়াত করে। এ সব গাড়ী আবার খচ্চরে টানে। এ গাড়ীর গাড়োয়ানেরা রঙ-বেরঙের পোষাক পরে, আর গাড়ী চালাইবার সময় নানা মুখভঙ্গী-সহকারে চীৎকার করিতে থাকে। গাড়ীগুলি খুব জোরেই হাঁকানো হয় এবং খচ্চর-গুলিও বেশ তেজী; ও পরিশ্রম করিতে খুব মজবুত।

শিক্ষায় হঠিয়া থাকিলেও স্পেনের সাহিত্য ও শিল্প-কলা, সঙ্গীত ও ললিত কলা প্রথম শ্রেণীর, সমস্ত সভ্য জগতের শ্রদ্ধার যোগ্য! স্পেনের এ পরিচয়টুকু নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

চিঠি

নিজেকে চিঠি লিখতে বসেচি।

রিক্ত বঞ্চিত ব্যর্থ জীবনটাকে আরো বঞ্চিত করবার জন্যে এই উপায়টি বার করেচি।...সে যেন আমাকে লিখ্‌চে।

...মনের মতো কোরে চিঠিখানা লিখলেম, অনেক ধরে ধরে তার পুরানো হাতের লেখা নকল করে। এ এক মধুর অনির্ব্বচনীয় ব্যর্থতা!...

চিঠি লেখা শেষ করে একবার চারিদিকের থম্‌থমে অন্ধকারের দিকে চাইলেম। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বেজে গেল।...

কাল ভোরে জাহাজ ছাড়বে, আজই পোষ্ট করা দরকার। গরম কোটটা গায়ে দিয়ে জাহাজ থেকে বেরিয়ে পড়লাম।...

... ... রেঙ্গুনে এসে চিঠি পেলাম।

ইচ্ছে হলো, তখনি খুলে পড়ি। কিন্তু এ ফাঁকা আনন্দটুকু এত শীগ্‌গীরই ফুরুতে দেওয়া হবে না। চিঠি-খানা বুকের কাছে পকেটে পুরে রাখলেম। সে যদি এই রকম একটা চিঠি লিখতো, আর তাহলে জীবনটা কত সুন্দর, কত রঙীন, কত মহীয়ান হয়ে উঠত। যাক সে সব কথা।...

বিকেলে বেড়াতে বের হলেম। মনে আনন্দ নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, দুঃখ নাই, বেদনা নাই, অভিযোগ নাই। ফাল্গুনের মুক্ত বাতাস আমায় উদাস করে তুলেচে। সন্ধ্যার আলো হ্রদের জলে কাঁপচে, বাতাসে গাছের পাতা দুলচে, আড়াল থেকে একটা পথ-হারা কোকিল গাইচে। আমার দু'চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠ্‌ল।...

একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে বসে পড়লেম, চিঠিখানা বের করে পড়তে সুরু করলেম। চোখের সাম্‌নে চিঠির সমস্ত অক্ষরগুলো নাচ্‌তে সুরু করলে। এ কি! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি?

সে লিখেচে! এ যে তার হাতের লেখা! এ কী আনন্দ, কী উল্লাস! আমি পাগল হয়ে গেলেম না তো!

আমার জীবনের শেষ কামনাটি পরিপূর্ণতার রূপ ধরে আমার কাছে এসেচে,—কী মধুর অনির্বচনীয় এ তৃপ্তি!

সে লিখেচে, সে লিখেচে! তার এ ক্ষুদ্র চিঠিখানা আমার প্রাণে যে সুরের জোয়ার লাগিয়ে দিলে!...

"বাবা রাজী হয়েচেন"—কী সুন্দর এ ছোট্ট কথাটি। আজ যে এ আনন্দ ধরে রাখ্‌তে পারচি না।...

বিশ্ব তার ঐশ্বর্য্য আমার সামনে খুলে ধরলে। আকাশ আমায় ইঙ্গিতে কত কথা জানালে; বাতাস আমার কাণে কাণে কত কথা বলে গেল, সেই কথার আভাস নিয়ে পায়ের নীচে শ্যামল ঘাস বাঁশী বাজিয়ে উঠ্‌ল। প্রকৃতি আজ একটী পরিপূর্ণ গানের সুরে বেজে উঠেচে, আমার বুকের স্পন্দনের তালে তালে। ওগো সুন্দরের খেয়ালী দেবতা, তোমায় আজ বারে বারে নমস্কার করচি।...

দুদিন বাদে নিজে লেখা চিঠি পেলেম, সেখানা আর খোলা হলো না।...

শ্রীসুবোধ দাশ গুপ্ত।

বিদায় বেলার চাওয়া

বিদায় বেলার চাওয়া,
শুক্‌নো-কাঁদন চোখের ফাঁকে—
মিলন ঘন পাওয়া!
রাত্রিশেষের শুক তারাটি—
উষার কাণে যেই কথাটি,—
মেঘ-নিঝরে যায় গো ক'য়ে—
লাগে তারির হাওয়া!

বিদায় বেলার চাওয়া
পদ্ম পাতায় দুটি ভ্রমর—
রজত আলোয় ছাওয়া!
কাজল দুটি মেঘের ফাঁকে,
নূতন আসার আভাষ আঁকে,—
দুই বিরহের চিকের পারে—
মিলন-রাতের গাওয়া!

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস।

বাজে খরচ কেন ?

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়—'খেয়াল' নামক একটি ব্যাধি অধিকাংশ স্ত্রীলোককে এমনভাবে আক্রমণ করিয়াছে যে তাহার ফলে তাহাদিগকে এমন কি কর্ত্তাদিগকে পর্য্যন্ত নানারূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ধনী গৃহস্থ অপেক্ষা মধ্যবিত্ত ও গরীবের পক্ষে ইহা অনিষ্টকর বেশী। পান, চা, দোক্তা ইত্যাদি বেশী খাওয়া বা থিয়েটার বায়োস্কোপ প্রভৃতি বেশী দেখা আজ-কাল যেন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একটা বাহাদুরীর বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঁচজন স্ত্রীলোক এক জায়গায় সমবেত হইলেই পান, দোক্তা ও চা খাওয়ার কথা ওঠে। যাঁর যত পান দোক্তা ও চায়ের খরচ, তিনি আপনাকে তত ভাগ্যবতী ও ঐশ্বর্য্যবতী বলিয়া মনে করেন। যাঁহার স্বামীর মাসিক আয় ২৫।৩০ টাকা, তিনিও মাসিক পাঁচ-ছয় টাকা, চা, দোক্তার খরচকে বাজে খরচ বলিয়া মনে করেন না। চা খাওয়ার ঝোঁক পুরুষদেরও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। দোক্তা, জর্দ্দা, সুর্ত্তি, প্রভৃতি কতকগুলি দোক্তা-ঘটিত পদার্থের ব্যবহার অধিকাংশ নারীদিগের মধ্যে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে দেখা দিয়াছে। ঐ সকল দ্রব্যের অতিরিক্ত ব্যবহারে রমণীগণ অকালে স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য দন্ত প্রভৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন, এ সম্বন্ধে আমাদের কথার সারবত্তা 'স্বাস্থ্য সমাচার' বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন। দোক্তা ও চায়ের খরচ উঠাইয়া দিয়া সেই পয়সায় যাহাতে কচি ছেলের একটু দুধের মাত্রা বাড়ে কি কর্ত্তার পাতে একটু ঘী কি নিজেরই পাতে একটু ঘী পড়ে, গৃহিণীর সে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে কি ?

গঙ্গাজলের ও বকুলফুলের কায়দা অনুকরণ করিলে চলিবে না; যেমন কর্ত্তার অবস্থা সেই-মত চলাই ঠিক।

আবার এমন কুঁড়ে স্ত্রীলোকও দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহারা পান খাইবেন, তা সুপারি কুচাইতে অক্ষম! কাজেই বাজারের কুচানো সুপারি ব্যবহার করেন, বাজারের অধিকাংশ কুচানো সুপারির মধ্যে পচা সুপারি ত আছেই, তা ছাড়া দূষিত জলে ভিজানো সুপারিও কুচাইয়া রাখা হয়। পূর্ব্বকালে পানের সহিত যমানী ব্যবহার করা হইত কিন্তু বিস্মৃতা হইয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যমানীর গুণ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

"যমানী কুষ্ঠ-শূলঘ্নী হৃদ্যা পিত্তাগ্নিকারিণী।
সমীরণ বলাসঘ্নী ক্রিমীণাঞ্চ বিনাশিনী॥"

যোয়ান;—কুষ্ঠ শূল, বায়ু, শ্বাসরোগ ক্রিমি নষ্ট করিয়া পিত্ত ও অগ্নি বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

এমন গুণ-সম্পন্ন যোয়ানকে বিদায় দিয়া আজ-কালকার সুরুচি সম্পন্না মহিলাগণ তৎপরিবর্ত্তে দোক্তা, জর্দ্দা, সুরতি প্রভৃতি উগ্র অনিষ্টকর দ্রব্যগুলিকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছেন।

যাঁহাদের বাড়ীতে অত্যন্ত দোক্তা জর্দ্দার চলন তাহাদের বাড়ীর উঠানে পৈঁঠার পাশে পানের পিক্ দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি পিক্‌দানী ব্যবহার করেন তিনি আবর্জ্জনা-পূর্ণ নরককুণ্ড 'পিক্‌দানীটি' ঘরের মধ্যেই রাখিয়া দেন। বহুবার এরূপ শুনা গিয়াছে যে মাতার অসাবধানতা-বশতঃ শিশু দোক্তার কৌটা হইতে দোক্তা বা 'পিকদানী'র পরম পদার্থ টুকু উদরসাৎ করিয়া অশেষ কষ্ট পাইয়াছে। এমন কি শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তারও বিলক্ষণ পকেট ভারী করিয়াছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে এক ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী দেখিয়াছি বাড়ীর কর্ত্তা অতিকষ্টে মাসে ৩০৲ টাকা উপায় করেন। ঐ ত্রিশটি টাকা তাঁহাকে উপার্জ্জন করিতে রীতিমত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয়; তাঁহারও বাড়ীতে চা, চিনি, পান, দোক্তায় মাসিক সাত-আট টাকা খরচ হয়। কিন্তু কর্ত্তা যখন বেলা ৯ টার সময় কার্য্যে বাহির হইবার পূর্ব্বে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করেন, "কিছু জলখাবার নাই গা?" গৃহিণী তখনই নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বলেন, "আমার কি তেমনি কপাল! জল-খাবারের মুখ কতকাল দেখিনি তা মনেও পড়ে না।" কর্ত্তা অগত্যা জল-খাবারের পরিবর্ত্তে মুখ ঝামটা খাইয়া ক্ষুধা শান্তি করিয়া কার্য্যে বাহির হইয়া যান; পরে একেবারে আড়াই প্রহরের সময় আসিয়া ভাতে বসেন। শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে উক্ত গৃহিণী

তিনি খেয়ালের বশবর্ত্তিনী হইয়া এমন কর্ত্তব্য-জ্ঞান হারাইয়াছেন যে, ঐ খেয়ালগুলি পরিত্যাগ করিয়া দৈনিক এক পয়সা হিসাবে মুড়ি-মুড়কি, অর্থাৎ মাসে সাড়ে সাত আনা কর্ত্তার জন্য ব্যয় করিতেও নারাজ। তবে কি পুরুষগুলি টাকা রোজগার করা কল? কোন রকমে তাহাদের জীবন রক্ষা করিয়া টাকা উপায় করাইয়া লওয়াই কি উদ্দেশ্য? হায় ভগিনীগণ, তোমরাই না "গৃহ-লক্ষ্মী? তোমরাই না শান্তিময়ী রমণী!

আবার থিয়েটার বায়স্কোপ দেখার খেয়ালটিও কম অনিষ্টকর নয়। এই খেয়ালের বশবর্ত্তিনী হইয়া অনেকে বহু অর্থ অপব্যয় করিয়া থাকেন। সহরের বাহিরে যাঁহাদের বাড়ী তাঁহাদের প্রতিবার থিয়েটার দেখিতে যথেষ্ট পরিমাণে খরচ হইয়া থাকে। ক্ষণিক আমোদ উপভোগের জন্য স্বাস্থ্য ও অর্থ নষ্ট করা সঙ্গত কি? যাঁহারা ছোট সন্তান-সন্ততির মাতা তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে ঐ খেয়ালগুলি পরিত্যাগ করা উচিত।

এই খেয়ালের বশবর্ত্তিনী হইয়া জনৈক রমণী যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীতা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ এস্থলে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

প্রায় ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে এক সুন্দরী যুবতী তাঁহার দুই বৎসরের শিশু পুত্রকে লইয়া আমাদের বাড়ী পলাইয়া আসেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, তাঁহার স্বামীর কতকটা মাথা গরম হইয়াছে ও তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি সে দিবস আমাদের বাড়ীতেই রহিলেন। পরদিন তাঁহার এক প্রতি-বাসিনী তাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়া উক্ত সুন্দরীর পলায়ন সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা পাঠক-পাঠিকা বিশ্বাস করিতে পারিবেন কি? তিনি বলিলেন, "সুন্দরীর স্বামী এক সওদা-গরী আপিসে চাকুরী করিয়া মাসিক দুইশত টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এবং ঐ মাহিনার টাকা সমস্তই স্ত্রীর হাতে অর্পণ করিতেন, স্ত্রী তাহার মধ্যে থিয়েটার দেখায় ও তাস খেলায় মাসিক একশত টাকা খরচ করিয়া ফেলিতেন। থিয়েটার দেখার খরচ ত আছেই; তা ছাড়া, তাস খেলার খরচ, প্রতিদিন যাঁহারা তাস খেলিতে আসিবেন তাঁহাদের রীতিমত জল খাওয়ানো (নেশা) ভঙ্গ হইলে মনের অবসাদ দূরী-করণার্থ এক পেয়ালা করিয়া চা, তাহার পর বাজী রাখিয়া হার জিত ইত্যাদি। প্রতি সপ্তাহে সঙ্গিনী-পরিবৃতা হইয়া থিয়েটার দেখিতে যাওয়া, ইহাতেও যথেষ্ট খরচ আছে। ইদানীং আবার থিয়েটার দেখার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠায় আড়াই শত টাকায় আপনার সমস্ত মূল্যবান গহনা স্বামীর অজ্ঞাতসারে বাঁধা দিয়া ফেলিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার স্বামী ক্রোধে ও দুশ্চিন্তায় উন্মাদবৎ হইয়া গিয়াছেন।"

প্রতিবাসিনীর কথা শুনিয়া সুন্দরী সক্রোধে বলিলেন, "তা বলিয়া তাস খেলিব না? থিয়েটার দেখিব না? কেবলি গাধার মত খাটিতে পারা যায়? না, তা ভাল লাগে?"

আরও শুনিলাম সুন্দরীর একজন পাচিকা ও একজন পরিচারিকা আছে। অন্বেষণ করিলে অনেক গৃহিণীকেই এইরূপ মিতব্যয়ী দেখিতে পাইব।

এইরূপ তাসখেলার নেশা অনেক স্ত্রীলোকেরই আছে। যে সময়টা তাঁহারা তাস খেলেন সেই সময়ে যদি সীবন-কার্য্যে একটু মন দেন, তবে সংসারের অনেক অভাব মোচন হয়। সেমিজ পরিধান করিতে ইচ্ছা অনেকেরই; কিন্তু সেলাই করিয়া লইতে খুব কম লোকেরই মন হয়। সেমিজ পেনি পাঞ্জাবী আস্তিন ইহা সামান্য চেষ্টা করিলেই করিতে পারেন, কিন্তু এবিষয়ে একেবারেই নিশ্চেষ্ট। আবার তাস খেলিবার কতকগুলি আনুসঙ্গিক ক্রিয়া আছে যথা;—হাস্য, চীৎকার, ব্যাপকতা, বাচালতা, রাগারাগি, গণ্ডগোল, দিব্য করিয়া তাস ফেলিয়া প্রস্থান, পরদিন যথাসময়ে তাসের আড্ডায় উপস্থিতি এসব গুলিতে সকলে বিলক্ষণ সচেষ্ট!

বাড়ীতে জামা সেলাই করিলে মন্দ লাভ হয় না। বারো আনায় দেড় গজ কাপড় পাওয়া যায়। সেই কাপড়ে দেড় বৎসরের দুইটা ছেলের গায়ের পেনিফ্রক হইতে পারে। সেই পেনি দুইটির মূল্য কমপক্ষে দুই টাকা হইবে। পেনি দুইটি সেলাই করিতে ১২।১৩ ঘণ্টা সময় লাগে। যে সময়টা তাস খেলায় অপব্যয় হয় সেই সময়ের উপর আর কিছু খাটিলেই বাড়ীর ছেলেদের পেনি, কর্ত্তার আস্তিন ও নিজের সেমিজ-সেলাই-খরচটা বাঁচিয়া যায়। যাঁহাদের অর্থকষ্ট

আছে, তাঁহাদের দৈনিক ছ' আনা, আট আনা উপার্জ্জন হইতে পারে।

'রুলী' গড়া কাজটি বেশ। চুচুঁড়া, হুগলী, চন্দননগর, এই সব স্থানের গরীব রমণীদের মধ্যে অনেকেই রুলী প্রস্তুত করেন। নিজ হাতে সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম করিয়াও প্রতি-মাসে ১০।১২ টাকার রুলী তৈয়ার একটি স্ত্রীলোকের দ্বারাই হইতে পারে। আবার কেহ কেহ ঐ উপার্জ্জন হইতে দুই-এক খানি অলঙ্কারও প্রস্তুত করাইয়া রাখেন।

পূর্ব্ববঙ্গে বহু গরীব রমণী কাপড়ে ঢাকাই তুলিয়া, কাঁথায় সীবন-চিত্র করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। এইরূপ শিল্পে কোন কোন স্ত্রীলোকের প্রচুর অর্থ সংগ্রহের কথাও শুনা যায়।

নবদ্বীপ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-বাসিনীরা পূর্ব্ববঙ্গের অনুকরণে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতেন। বালুচরের রমণীরাও চেলীর উপর সূচীকার্য্যদ্বারা নানারূপ চিত্র তুলিয়া নিতান্ত কম উপার্জ্জন করেন নাই।

এখনও উপার্জ্জনের অনেক পথ প্রশস্ত আছে। তবে একটু খাটিতে হয়। পুরুষেরা কত খাটেন, তবে পরের টাকা ঘরে আসে। ধনী লোকে যাহা করেন সকলি শোভা পায়। কিন্তু গরীবের তাহা কি অনুকরণীয়? আমি যাহা বলিতেছি তাহা ধনী গৃহস্থের জন্য নহে; গরীব ছাপোঁষা গৃহস্থের জন্যই।

সেমিজ সায়া স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার করা উচিত কিন্তু ইহা স্বহস্তে সেলাই করাই কর্ত্তব্য। পুরুষদের বহু পরিশ্রমের পয়সা; আলস্য-পরবশ হইয়া বা খেয়ালের বশবর্ত্তিনী হইয়া সে পয়সা বাজে খরচ করা উচিত নহে। আমি যে সকল খরচকে বাজে খরচ বলিতেছি, মাত্র ঐ খরচটা বন্ধ করিলেই বাৎসরিক প্রায় শতাবধি টাকা স্বামীকে সাহায্য করা হইবে। বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার দিনে ৩০।৩৫ টাকা বেতনভোগী গৃহকর্ত্তার পক্ষে উহা নিতান্ত কম সাহায্য হইবে বলিয়া মনে করি না।

শ্রীশরৎকুমারী দেবী

আলোচনা

উইলিয়াম বাট্‌লার ইয়েট্‌স্

এ-বৎসর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আয়র্লণ্ডের বিখ্যাত কবি ইয়েট্‌স্। আমরা এ-কথা ভুলিনি যে এই বিদেশী কবিই আমাদের রবীন্দ্রনাথকে বিলাতী সমাজে কবি বলে প্রথম পরিচিত করিয়ে দ্যান। আর যেদিন রবীন্দ্রনাথ জগতের সেরা পুরস্কার, সম্মান-মুকুট মাথায় পরে ফিরে এলেন, সেইদিন থেকেই এই বিদেশী কবির গানে বাংলার মন মজ্‌তে শুরু হল। সেই থেকেই এই কবির সঙ্গে আমাদের পরিচয়।...

আজ তাঁর কবিতার বিষয় বিশেষ কিছু আলোচনা না-করে তাঁকে মানুষ-হিসাবে যতটুকু জানা গেছে, সেই বিষয়েই কিছু বল্‌ব। তিনি বাহিরের জীবন থেকে এত বিচ্ছিন্ন, এত দূরে যে তাঁকে সহজের মধ্যে ছোঁয়াই যায় না। Galsworthy-ও মানুষের বীভৎসতা অবিচার ও নির্দ্দয়তায় আহত হয়ে-হয়ে এই সংসারের ওপর বীতস্পৃহ হয়ে আছেন; কিন্তু ইয়েট্‌সের বিচ্ছিন্নতা আরো অদ্ভুত ধরণের। আজকালকার Problem তাঁর ধারে ঘেঁসেও আসেনা। তিনি মানুষের খোঁজে থাকেন না, তাদের কাজ খুঁজে বেড়ান। তিনি একলা থাক্‌তে ভারী ভালো বাসেন। ইংরিজি কবিদের মধ্যে শুধু তিনিই বোধ করি খালি যুদ্ধের বিষয়ে কোনো কবিতা লেখেন-নি! তিনি দরজা জানলা বন্ধ করে চুপ বসে' থাক্‌তে চান; ওধারে সমস্ত রাজ্য জুড়ে কী হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপও নেই। রাস্তা ঘাট দোকান গাড়ী আলো হৈ-চৈ—তাঁর কাছে এ-সবের যেন কোনো অর্থ নেই। যদি Euston Road-এ তাঁর বাড়ীর কাছে জার্ম্মানেরা বোমা না ফেলে যেত, তা হলে হয়ত তিনি এই গত মহাযুদ্ধের কথা কিছুই জান্‌তেন না। এ রকম উদাসীন নির্ব্বিকার কবি ইংলণ্ডে আর জন্মেচেন কি না সন্দেহ।...

তাঁর হাতের লেখা অতি কদর্য্য, বিশ্রী, অপাঠ্য। কথা সবটাই

প্রায় লেখা হয়না. যা-কিছু লেখা হয় একদম্ হিজিবিজি! বার্ণার্ড-শ'র লেখা অতি চমৎকার, সুন্দর, পরিষ্কার, পরিস্ফুট, সুগঠিত, শিল্পীর আলপনার মতো; আর ইয়েটসের লেখা দেখলে মনে হয় যেন ভোঁতা একটা কলম দিয়ে কালীর আঁচড় কাটা হয়েচে। H G Wells-এর লেখা ছোট ছোট পরিষ্কার অক্ষরে, যদিও বিশেষ সুন্দর নয়, তবুও ইয়েটসের মতো এমন কদর্য্য লেখা কখনো নয়।

বার্ণার্ড-শ-র প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম থাকলেও ইয়েটস বলতেন যে তিনি শ-র লেখা কিচ্ছু বোঝেন না। তিনি ভূতের সঙ্গে কথা কইতে রাজী আছেন, কিন্তু শ-র সঙ্গে নয়. তিনি তাঁকে বলেন "that strange man of genius, Bernard Shaw"—ছাপবার আগে হাতের লেখা অবস্থায় ইয়েটস্ শ-র John Bull's Other Island বইখানা পড়েছিলেন; তিনি বলেচেন, তার মাথামুণ্ডু তিনি নাকি কিছুই বোঝেন-নি!

তিনি তাঁর এক বইয়ে লিখেচেন যে এই জীবনটা যা-কিছু অসম্ভব অঘটনীয়—তারি একটা আয়োজন, বিপুল সমারোহ! Galsworthy উপন্যাসে ও নাটকে যা, কবিতায় তিনিও তাই; তাঁরা দুজনেই জীবনের কাছে নিজেদের সমর্পণ, উৎসর্গ করেচেন। তাঁর কবিতার এই বিশেষত্ব যে, তা আমাদের চঞ্চল মত্ত করে দ্যায় না, ব্যথায় বিনম্র মুগ্ধ করে তোলে। তাঁর কবিতায় যেন বিভাস নেই, খালি পূরবী! এ যেন সূর্য্যোদয়ের গান না, খালি ধূসর গোধূলির বিদায়-বেদনা। তাঁর lyric-গুলিতে একটা শ্রান্তি অবসাদ আর দুঃখ বেজে-বেজে উঠ্‌চে, মধুর একটি হতাশা, করুণ একটি নিঃসঙ্গতা, পবিত্র একটি আকাঙ্ক্ষা! Innis free কবিতাটা আনন্দসুরে কথা কয়না, যেন পরিশ্রান্ত পরিম্লান, কবি যেন আর পারেন না এই কোলাহল-কলরব সইতে, তাই তিনি জুড়োতে চান।

রাত্রে কেউ তাঁর সঙ্গে দ্যাখা করতে গেলে ফিরে যাবার সময় তাঁকে বলে' দ্যান, সিঁড়িতে তিনি যেন আস্তে-আস্তে নামেন, যেন জুতোর শব্দ না হয়, প্যাছে দোতলার ঘুমন্ত মজুর মুটেরা জেগে ওঠে! গরীব যারা খেটে খায়, তাঁদের প্রতি তাঁর দরদ অপরিসীম! কবি এ-ই-র সঙ্গে যেমন তিনি কথা কন, তেম্‌নি সুরেই এই গরীবদের সঙ্গে তিনি কথা কইতে পারেন। তার মধ্যে কোনো দাক্ষিণ্য বা অহঙ্কারের লেশ নেই।

তিনি আকৃতিতে দীর্ঘ, পিঠের ওপর দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, এখন তা পাক্‌তে সুরু করেচে, এবং তাঁর চোখের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ, অদ্ভুত। যেন তাঁর চোখে কি একটা তীব্র বিরক্তি মাখানো রয়েচে। তাঁর বেশে কবিত্বের ছাপ আছে, শুধু নেক্-টাইটা ছাড়া আর কোথাও বেখাপ্পা রকমের কিছু নেই। তিনি সহজ ভাবে কথা কন্ না, সোজা তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে আলোচনাও তিনি পছন্দ করেন না। লোকের সঙ্গ তাঁর বিশেষ লোভনীয় নয়; কোনো একজনের সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা কইলে তাঁর মনে হয় যেন একটা বিরাট জনসঙ্ঘ উৎসুক হয়ে তাঁর কথা শুনচে। হয় তিনি খুব বড়-বড় কথা কন, অথবা কোন পরলোকগত বন্ধুর জীবন-স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন।

তাঁর বাড়ীর লোক তাঁকে "Willie" বলে' ডাকতে যেন একটু সঙ্কোচ করেন। তাঁকে "Mr Yeats" বলে' ডাকলেই যেন মানায় ভালো। "Hello old chap" বলে' কাউকে কোনোদিন তাঁর ঘাড় চাপড়াতে দ্যাখা যায় নি। যাকে তিনি অনেক বছর ধ'রে জানেন, তার সঙ্গে রাস্তায় দ্যাখা হয়ে গেলে এমনভাবে তার দিকে চাইবেন যেন তিনি কথা বলতে ভুলে গেছেন। তিনি কখনো কোনো বন্ধুকে হাত বাড়িয়ে দ্যান না, অস্পষ্ট একটি Good eventng বলে' সরে পড়েন; কিন্তু দাঁড়িয়ে বলেন-না, "তুমি কেমন আছ?" বা "তোমায় দেখে খুসী হলাম।" কোন অতিথি বা অভ্যাগতের কাছে তিনি এমন অমায়িক সদয় ও বিনম্র যে তাঁর বন্ধু-আত্মীয়ের প্রতি এমন বিমুখতা ও ঔদাসীন্য খুব আশ্চর্য্য ঠেকে ...

তিনি যখন কথা কন, চমৎকার বলেন, কিন্তু প্রায়ই বলতে বলতে আপন-মনে প্রলাপ বক্‌তে সুরু করেন। তিনি তাঁর আগের বন্ধুদের কথাই বলতে বেশী ভালোবাসেন—Oscar Wilde, Aubrey Beardsley, Arthur Symons প্রভৃতি। তিনি চুপ করে ভাবুকের মতো হাঁটেন। যখন আস্তে হাঁটেন, তখন তাঁর পায়ের গতি সুন্দর সংহত লীলায়িত হয়ে ওঠে; আর যখন তিনি বড়-বড় পা ফেলে তাড়াতাড়ি হাঁটতে সুরু করেন, তখন তাঁর সেই গতির বিলাস দূর হয়ে যায়, অতি অদ্ভুত কিম্ভূতকিমাকার হয়ে পড়েন। তিনি রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনা ও journalism-এর ধারেও ঘেঁষেন না, এবং নূতন লেখকদের খালি Balzac পড়তে অনুরোধ করেন।

তিনি বলেচেন—পঁচিশ বছরের পর কারুর সঙ্গে দৃঢ় বন্ধুত্ব করতে নেই, তাই তাঁর মন খালি পঁচিশ-বছরকার বন্ধুদের পানে অনবরত চোখ মেলে চায়। কিন্তু আমরা জানি Dr Johnson Sir Joshua Reynolds কে বলেছিলেন—'A man, Sir, should keep his friendship in constant repair"।—আজকালকার এই জীবন থেকে ইয়েট্‌সের এমন বিচ্ছিন্নতা দেখলে বাস্তবিকই ভারী বিস্ময় লাগে। তিনি H. G. Wells, Arnold Bennet, John Galsworthy ও Joseph Conrad-এর লেখা বেশী পড়েচেন কি না, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তিনি তাঁর বন্ধু St John G Ervine কে বলেছিলেন, ত্রিশ বছরের পর মানুষের কয়েকখানা বাছাই বই পড়া উচিত; তা শুধু একবার নয়, অনেকবার। পরে খানিকক্ষণ চিন্তা কোরে বলেছিলেন ত্রিশ বছরটা কিছু কম হল, চল্লিশ বছরের পর......; কিন্তু Ervine এর কাছে এ পরামর্শটা মোটেই গ্রাহ্য হলনা।

যাদের বলিষ্ঠ মন, তাদের সব সময়েই নূতন বইয়ের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। অনেকে আজকালকার বইকে রাবিশ বলে' উড়িয়ে দিয়ে, ও-সব কিছু পড়েন না বলে' গর্ব্ব করে থাকেন, তেমন কিছু বই বেরুলে তাঁরা পুরানো একটা বই খুলে পড়তে বসেন এবং পুরানোর তুলনায় নূতনটা যে কিছু নয়, তাই সাব্যস্ত করতে চান। তাঁরা হচ্ছেন কূপমণ্ডূক ক্ষীণদৃষ্টী অপরিসর সংকীর্ণ বদ্ধ কুটীরে তাঁদের নিশ্বাস সংসারের ধোঁয়ায় গুলিয়ে উঠেছে। কিন্তু ইয়েটসের বেলায় এই বেশী না পড়ার প্রবৃত্তিকে চিত্তের অপ্রসারতার ফল বলে ভাবলে মারাত্মক ভুল করা হবে। ইয়েটস্ চোখে ভালো দেখতে পাননা, এবং বই পড়তে তাঁর ভারী কষ্ট হয়। সমসাময়িক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নেই, এই দৃষ্টিক্ষীণতার একটা যথার্থ কারণ হতে পারে।...

শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষের দলে তিনি অজস্র কথা কইতে পারেন, কিন্তু রাস্তায় কারো সঙ্গে বেরুলেই—তাঁর মুখে আর কথা জোটে না। তাঁর সঙ্গে যার আলাপ আছে, সে যদি ইয়েটসের কথা ভাবতে বসে, তা হলে একই সময়ে এই কবির দুই বিশেষত্ব পাশাপাশি ফুটে উঠবে—এই তিনি আকৃষ্ট করলেন, এই আবার বিমুখ হয়ে রইলেন ; এই মাতিয়ে তুললেন, এই আবার মীইয়ে দিলেন। তাঁর কবিতার মধ্যে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য আছে বটে, কিন্তু মানুষিকতার স্বাভাবিক লালিত্য নেই। তাঁর কবিতায় সুর আছে প্রচুর কিন্তু বিশ্বজনীনতা নেই। এই কারণেই তাঁর ছোট্ট নাটক Kathleen in Houlihon আয়র্লণ্ডে খুব আদর ও অভ্যর্থনা পেলেও ইংলণ্ডে তার কোনো তারিফ হলোনা।

তাঁর কবিতা পড়ে' পাঠকরা প্রায়ই একটু হতাশ হয়ে পড়েন। পাঠকরা সবুজ মাঠে যেতে চাইলে তিনি তাদের এক সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে নিয়ে হাজির করান। Blake-এর কবিতার সঙ্গে ইয়েটসের কবিতার একজায়গায় ভারী তফাৎ আছে। Blake যা অনুভব করতেন, তাই লিখতেন ; আর ইয়েটস্ যা ভাবেন, তাই লেখেন। অনুভূতি অমর, কিন্তু চিন্তা সতত পরিবর্ত্তনশীল ; তাই ইয়েটসের মানুষ থেকে এই যে বিচ্ছিন্নতা, এর কারণ, তিনি ভাবেন খুব বেশী, অনুভব করেন অতি অল্প। তিনি বার্ণার্ড-শর চাইতে দশ বছরের ছোট, কিন্তু মনে হয়, তিনি যেন তাঁর দশ বছরের বড়। তাঁর কবিতায় কথায় ও স্বভাবে যৌবনের বিলাস-চাঞ্চল্য ও উচ্ছ্বাস নেই, তা স্থির, উদার, মহিমাময়, গম্ভীর। তিনি '৮৬৫ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেছেন, ১৮৯০ খৃঃ অব্দের পর থেকে তাঁর যেন আর বন্ধু জোটেনি। যখন কথা বলবেন, যাঁরা অনেক আগে মরে' গেছেন, তাঁদের কথাই বলবেন।

বন্ধু কাছে বসে থাকলে বন্ধুর চেয়ে তিনি নিজের কথার ওপরই বেশী নজর দ্যান। কোনো খারাপ বন্ধুত্ব না-করার চাইতে কোনো একটা খারাপ কথা উচ্চারণ না-করাতেই তিনি বেশী সতর্ক ; তিনি সব অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু কোনো অশ্লীল উচ্চারণকে ক্ষমা করতে পারেন-না। তাঁকে কোনোদিন স্বাভাবিক গ্রাম্য কথা উচ্চারণ করতে শোনা যায়নি। উইলিয়ম মরিশের কবিতার প্রতি তাঁর খুব টান ছিল। সম্প্রতি তাতে ভাঁটা পড়ে গেছে। তিনি একদিন এই Morris এর বিষয় রাগ কোরে কথা বলেছিলেন বলে তাঁর বন্ধুর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, তাঁর কথা অশ্লীল ছিল না ; কিন্তু তা "inelegant" হয়েছিল বলে। তিনি রাগ কোরে কথনো Damn বা Blast! বলেন না। অনেক লোক জড় না হলে তিনি কথা বলতে পারেন-না বলেই এ-পৃথিবীতে তিনি ভারী একলা।

কোনো কবির, এমন-কি কীটস্ ও শেলির মধ্যেও এমন গভীর খাঁটি অফুরন্ত কবিত্ব নেই ইয়েটসের মতো ; আর কোনো কবির এমন-কি Kipling-এরও এমন মানব-জাতির ওপর বিরাগ বা ঔদাসীন্য দ্যাখা যায় না !

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্ত।

সত্যের সন্ধান

প্রৌঢ়ত্বের সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছি ; বাল্য ও যৌবনের আমোদ-উল্লাস আর ভাল লাগে না। অর্থ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে কতই না কষ্ট ভোগ করিয়াছি ! কিন্তু ইহাতে তৃপ্তি পাইলাম কোথায় ? স্নেহ মমতা বন্ধুত্ব ভালবাসা সবই ক্ষণ-ভঙ্গুর, প্রায়ই স্বার্থজড়িত। সাংসারিকতায় যে এত অশান্তি তাহা কি পূর্ব্বে জানিতাম! আত্মীয়-স্বজনের অকাল-মৃত্যুতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এই তো ক্ষণস্থায়ী জীবন! অনেক সময় মনে হয় এই দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহিয়া লাভ কি ? এ অবস্থায় স্বভাবতই মন সৎ বস্তু পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

নানা জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র কিছু কিছু আলোচনা করিলাম,—বেদ চতুষ্টয় ঐশীবাণী, কোরাণ খোদাকা কলম, Bible is the work of God এ সব ত অন্ধভক্তির কথা, একই ঈশ্বর বিভিন্ন জাতির জন্য পরস্পর-বিরোধী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিব ? সত্য-লাভের আশায় দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগিলাম, সেখানেও অত্যন্ত বিরোধ ও মত-বৈপরীত্য দেখিতেছি—"না সৌ মুনিঃ যস্য মতং ন ভিন্নং." কেহ বলিতেছেন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা আর কেহ বা বলিতেছেন জগৎই সত্য ব্রহ্মই মিথ্যা। সাংখ্য-দর্শন বহুজীববাদী, বেদান্ত এক-জীববাদী, একমেবাদ্বিতীয়ম্। সাংখ্য মতে জগতের সৃষ্টি অচেতন প্রকৃতি হইতে আর বেদান্ত মতে জগতের সৃষ্টি আত্মা হইতে,—

আমিই মায়া প্রভাবে এই বাহ্যজগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ই মায়া (কল্প)—প্রকৃত একমাত্র আত্মাই (Self, Consciousness) সত্য নিত্য বস্তু হইতে অতীত ; "আমা হইতে ভিন্ন স্রষ্টা মনে করা মায়ার কার্য্য" (গীতায় ঈশ্বরবাদ বৌদ্ধদর্শন মতে আত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই। "There is no real I unit ও সমস্তই ক্ষণিক জ্ঞান (sensations)। Schopenhaur বলেন বাসনাই দুঃখের মূল, Nietzche বলেন ঠিক ইহার বিপরীত-will to Power" Nietzche made Schopenhaur's devil will to Power into his God. Nietzcheর মতে দয়ামায়া fit only for slaveso Superman তাঁহার লক্ষ্য ; তিনি জার্ম্মান জাতিকে "will to Power মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া যুদ্ধে মাতাইয়া ছিলেন ; তাহার ফলে বর্ত্তমানে জার্ম্মান জাতির এই দুর্দ্দশা, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে। Kantকে সমালোচনা করিতে গিয়া Fichte বলিতেছেন—This thing-in itself was itself after all, only a creature of the mind, the relic of that dogmatism of which Kant wanted to get rid আবার Fichte ই বলিতেছেন, Divisible Ego posits a divisible Non-Ego to realise itself in the Absolute Ego. Kant-এর "dogmatism-এ Fichte যে দোষারোপ করিয়াছেন বিচার করিয়া দেখিলে Fichteর প্রতিও সেই দোষ আরোপিত হয়। Kantএর Thiny in itself যদি মনঃকল্পিত ও অন্ধবিশ্বাস-প্রসূত হয় তবে Fichteর universal Ego-ই বা কেন ঐরূপ মনঃকল্পিত হইবে না? Ftchteর Ego-ই পরিণামে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাইয়া ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি সমস্ত জার্ম্মাণ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার Self-conseious Egoর দোহাই দিয়াছিলেন। দার্শনিক পণ্ডিতদের মধ্যেও মতের পরস্পর এত অনৈক্য দেখিয়া দুই গুলিখোরের গল্প মনে পড়ে—এক গুলিখোর আর এক গুলিখোরকে দেখিয়া বলিতেছে ভাই, এক স্থানে দেখিলাম জলের ভিতর আগুন লাগিয়াছে ও মাছগুলি গাছে উঠিতেছে। আর এক গুলিখোর ইহার উত্তরে বলিল—দূর গাধা, মাছ কি গরু নাকি যে গাছে উঠবে? Universal Ego কথার মার-প্যাঁচ মাত্র intellectual gymnasium. কেহ বলেন ঈশ্বর সক্রিয় ও সগুণ কাহারও মতে তিনি নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ, দেশকালের অতীত, অতীন্দ্রিয় পারমার্থিক সত্তা, এ সব transcendental nonsense. আমার ধারণার অতীত দেশকাল ও নিমিত্তের (time space and causality বাহিরে কেহ চিন্তা করিতে পারে কি? কেহ কেহ আছেন যাহা মত দুর্ব্বোধ্য ও জটিল তাহাতে তত শ্রদ্ধাবান্। কোন পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে আছেন তাহা ত যুক্তি দ্বারা বুঝিতে পারিতেছিনা। দার্শনিকদের মধ্যে কেহ materialist, কেহ idealist, কেহ বা sensationalist ; কোন্ মতটী সত্য—সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক সত্য?

দর্শনশাস্ত্রেও সত্যের দর্শনলাভ হইল না, প্রাণের পিপাসা মিটিল না তখন সহজাত সংস্কারের উপর নির্ভর করিলাম, নিজের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম সহজাত সংস্কার বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না ; যদি আমি সমাজের বাহিরে প্রতিপালিত হইতাম তাহা হইলে হয়ত বুঝিতে পারিতাম প্রকৃত intuition কোনটী, কিন্তু শিশুর জন্ম-গ্রহণের পরেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহার উপর এরূপভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে যে তাহার সহজ সংস্কার অনেক পরিমাণে বিকৃত হইয়া পড়ে। বাল্যকালে যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতাম তাহা এখন স্বপ্ন বলিয়া বুঝিতেছি, দুই বৎসর পূর্ব্বে যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতাম, এখন দেখিতেছি তাহা অন্ধ বিশ্বাস মাত্র। পরিবর্ত্তনশীলতাই প্রকৃতির নিয়ম, আমিও প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছি—"No man can bathe twice in the same river" বৌদ্ধদিগের ন্যায় Heraclitus এবং Bergson এই মতাবলম্বী। Ptolemic thory-তে বলিত পৃথিবী স্থির কিন্তু এখন বিশ্বাস অন্যরূপ। Intuitionists ও সকলে একই সত্যে উপনীত হন নাই। সহজাত সংস্কার বা প্রজ্ঞা (reason) দ্বারাও সত্য পাওয়া গেল না। মনে করিলাম সাধুসঙ্গ দ্বারা শান্তি পাইব, নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া বহু সাধু-সন্ন্যাসীর দর্শন-লাভ করিলাম কিন্তু সেখানেও যথার্থ বস্তুর সন্ধান মিলিল না। দেখিলাম সেখানেও বুজরুকি ও অর্থলোলুপতা, অনেকে মোহান্ত সাজিয়া অহঙ্কারের বোঝা লইয়া বকধার্ম্মিক হইয়া বসিয়া আছে, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথে সুখ অন্বেষণ করিতেছে। প্রাণে দারুণ নৈরাশ্য লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। তারপর পৃথিবীর বড় বড় কর্ম্মবীরগণের জীবনী পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। মনে করিলাম কর্ম্মদ্বারাই জীবনে শান্তি আনিব কিন্তু সেখানেও দেখিলাম জাতিগত স্বার্থই বীরত্বের ও কর্ম্মের প্ররোচক। উহাদের দ্বারা নিখিল মানব সমাজের কি প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। জাতিগত স্বার্থই তাঁহাদের নিকট বড় ; দুর্ব্বল জাতিকে পদদলিত করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠাই কি বীরত্ব? Hegel বলিতেন, "Asia" was doomed to be dominated by Europe" কিন্তু আবার মনে হইল "A cosmoplitan loves all counitries but his own" কিছুতেই শান্তি পাইলাম না "Knowbdge is the fruit of that forbidden tree" অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম ; উহাতে যথার্থ ত্যাগ ও সেবার আদর্শ দেখিতে পাইয়া প্রাণে শান্তি আসিল, তিনি বলিতেছেন—"আমি যেন লক্ষবার জন্ম গ্রহণ করি আর লক্ষবার যেন দরিদ্ররূপী, দুষ্টরূপী, দুঃখীরূপী নরনারায়ণের সেবা করিতে পারি ; ইহাই আমার সাধনার ভিত্তি, আমি ভক্তি মুক্তির অপেক্ষা রাখি না। "আমি লাখ নরকে যাব,

বসন্তের ন্যায় লোকের হিত আচরণ করিব।" মনে তৃপ্তি পাইলাম বটে কিন্তু ভাবিলাম কিরূপে আমি এই আদর্শ নিজের জীবনে উপলব্ধি করিব, এই বিশাল বিশ্বে আমি ক্ষুদ্র পরমাণু, আমার দ্বারা পৃথিবীর কি উপকার হইতে পারে? আর সেই উপকার কি স্থায়ী হইবে? সংসারে মানবের দুঃখের কি সীমা আছে? প্রকৃত মঙ্গল যে কিসে হইবে তাহাও ত বুঝিতে পারি না, মঙ্গল ও অমঙ্গল পরস্পর ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। আমি হাজার চেষ্টা করিয়াও কি অপরের দুঃখ দূর করিতে সক্ষম হইব? মানবের দুঃখ দূর হউক বা না হউক আত্মতৃপ্তি ত হইবে, ঈশ্বর-নিরপেক্ষ হইয়াও বুদ্ধদেব বিশ্বমানবের হিতের জন্ম যে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন জগতে তাহার তুলনা আছে কি? "Service of man is the service cf God" এই আদর্শ মনে রাখিয়া কার্য্য করিলে যাহা কিছু শান্তি পাওয়া যায়, ইহাই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম স্থির করিলাম।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চাঁদের কলঙ্ক

(ন্যাথানিয়েল্ হথর্ণের অনুকরণে)

১

ফুলশয্যার রাত্রে অবিনাশ একরূপ জোর করিয়া সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রী সরযুর ঘোমটা খুলিয়া দিল। সরযু ফিক করিয়া হাসিয়া, চোখ দুইটি হাতের পাতার তলে লুকাইতে না লুকাইতে স্বামী তার চিবুক ধরিয়া মুখখানি টানিয়া তুলিল। তারপর, বিবাহিত জীবনের প্রথম প্রলোভনের আবেগে মুখের কাছে মুখ আসিতেই অবিনাশের দৃষ্টি পড়িল—স্ত্রীর বাম গালের ছোট্ট কালো তিলটীর প্রতি।

দেওয়ালের গায়ের জুয়েল্-ল্যাম্প হইতে কিরণ-রেখা বিচ্ছুরিত হইয়া স্বামী-স্ত্রীর মুখের উপর পড়িয়াছিল। তুষার-শুভ্র পুষ্প-বিতরনের মাঝে আধ-ফুটন্ত চম্পক-কলির ন্যায় সরযুর মুখখানি সোহাগে-সরমে ঢল-ঢল, আর অনুরাগ-রঞ্জিত লোহিতাভ অভ্রের উপর কৃষ্ণবর্ণ একটী ছিটা—যেন সে দেব-মন্দিরের স্বর্ণথালে তিল চন্দন!

সুধার সমুদ্র ভুলিয়া অবিনাশ মুখ নোয়াইয়া সোহাগের প্রথম চুমুক দিল—পত্নীর তুলতুলে গালের সেই তিলটীরই উপর। স্বামীর পানে চোখের কোণের পুলক-দৃষ্টি দিয়াই সরযু অবিনাশের হাঁটুর উপর নুইয়া পড়িল।

২

এম্ এ-পরীক্ষায় রসায়নে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া অবিনাশের চাকুরী হইল লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে। কলেজের ন্যায় বাসাতেও যেটুকু সময় পায়, তাহা সে ঘরের ল্যাবোরেটরীতে রসায়ন-চর্চ্চা করিয়াই কাটাইয়া দেয়। গৃহ-কর্ম্মের তদারক করিয়া অবসর পাইলেই সরযুও অবিনাশের কাছে ছুটিয়া আসে, টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর হাতের অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করে।

একটা পাতা-বাহারের রঙীন ডোরায় আরকের ফোঁটা ঢালিয়া অবিনাশ ল্যাবোরেটরীতে কি পরীক্ষা করিতেছিল; সরযূ ঘরে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিল—'গাছের পাতায়ও কি আত্মারামের ভেল্‌কী চালাতে চাও নাকি?'

মৃদু হাসিয়া স্ত্রীর দিকে একবার চাহিয়া অবিনাশ নিজের কার্য্যই করিয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ তার চোখের সম্মুখে পাতাটী তুলিয়া ধরিয়া সোৎসাহে বলিল,—'ছাখো।'

সরযূ দেখিল, ডোরা-কাটা পাতা-বাহারটীর গায়ে ডোরার লেশমাত্র নাই,—পাতাটী আগাগোড়া গাঢ় অতসী বর্ণের হইয়া গিয়াছে।

বিস্মিত হইয়া সে বলিয়া উঠিল—'বা রে! সত্যি সত্যিই এ যে ভেল্‌কী!…ভগবানের ছিষ্টির ওপরও, দেখ্‌চি তোমার হাত চলে!'

৩

দুপুরে কলেজের পোষাক পরিতে পরিতে অবিনাশ স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল—'আচ্ছা, আরকের গুণে গাছের

পাতার রং বদ্‌লায়, এ তো চোখেই দেখেচ,—মানুষের ওপরও এ গুণ খাটে, বিশ্বাস কর?'

কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া সরযূ বলিল—'কি রকম?'

'এই ধর,—যেমন তোমার গালের তিলটী ঠিক গালেরই রঙের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া।'

'যাঃও!—তা-ও আবার হয় নাকি?'

'আচ্ছা, যদি হয়-ই। দেখ্‌বে, পরখ করে? শুধু চার ফোঁটা আরকেই—'

'ওমাঃ! গাছের পাতায় ঢেলেছ ব'লে আমার গালেও ও আরক মাখাতে চাও নাকি?...বাঃ রেন্‌ আমি দিতেই গেলুম!—ও হলো আমার এয়োতির চিহ্ন।'

অবিনাশ হাসিয়া উঠিল—'এয়োতির চিহ্ন গালে থাকে নাকি?—না কালো হয়?'

সরযূ বলিল—'তোমার ডাইনের দিষ্টি,—যাতে লাগে তা কালো হবে, বিচিত্তির কি!...ভালো,—কেন—এ তিলটীর ওপরও তোমার ডাইনের দিষ্টি পড়চে কেন, বল দিকিন্‌?'

অবিনাশ বলিল—'চাঁদ-খখানির ঐটুকুনই যে কলঙ্ক!'

সরযূ বলিল—'ও কি!—এ পোড়ারমুখে কি রংমশালের আলো জ্বলচে যে, একদৃষ্টে তাকানো হচ্ছে?'

অবিনাশ বলিল—'বড় মিছে বলনি!—ঐ রংমশালের আলো থেকে যদি কালির দাগটি ঘোচাতে পারি, তবে হাজারো বাতির ঝাড়-লণ্ঠন লাগে কোথায়!'

সরযূ বলিল—'ঐ এক কথাই তো রোজ হচ্ছে।...কেন?—একটা ছোট্ট তিলে তোমার কি ক্ষতি করছে, বল?'

'ক্ষতি নয়?—ঐ একটা খুঁতে কাঁচের মূল্যে কাঞ্চন বিকুচ্ছে,.. ও যে ভারী বিশ্রী,—মোটেই আমার ভালো লাগে না।'

'তা লাগ্‌বে কেন!—একটা ছুঁতো চাই তো! আজ এ তিলটী বিশ্রী, কাল চোখের কোণটা বিশ্রী, পরশু হবে মুখখানা বিশ্রী, তারপর আমার সবই বিশ্রী! কেমন!—এই তো তোমার মনের ভাব?'

'পাগল আর কি!—আচ্ছা, নিজেই ভাবো, মুখখানি কেমন নিটোল টুল্‌টুলে হবে যদি—টুক্‌ ক'রে ঐ গালের ওপরের তিলটী তুলে নেওয়া যায়!'

'যাও যাও, অত কথায় আর কাজ নেই! আসল কথা বল, নিজের খেয়াল চেপেছে, তাই। ভালো, যদি এ তিলটা থাক্‌লে তোমার ঘুম না হয়, তবে নয় পরখ ক'রেই দেখ।—কিন্তু পরখের সময় যদি আমি মরেই যাই!"

'ধ্যেৎ! তবে আর ম্যাদ্দিন বই প'ড়ে কি বিদ্যে শিখ্‌লুম আর দিনরাত খেটেই বা হাতে-কলমে কি কর্‌চি!'

'না, না,—ও তো একটা কথার কথা বল্‌লুম।—তবে দিন ঠিক কর, কবে পরখ কর্‌বে?'

উৎসাহে অবিনাশ মাতিয়া উঠিল; বলিল—'কা্‌ল রবিবার, কলেজের ছুটী আছে,—ভাল, কালই তোমায় হাতে হাতে বুঝিয়ে দেবো—মানুষের সৃষ্টি বড়, না, ভগবানের সৃষ্টি বড়!'

'বটে!...আর একদিন এ কলঙ্কই মাথার মণি—' বলিতে বলিতে নীচের ঠোঁটে দাঁত চাপিয়া সরযূ হঠাৎ থামিয়া গেল।

অবিনাশের মনে পড়িল, সেই ফুলশয্যার রাত্রের কথা। সে-ও ঠোঁটের কোণে হাসি চাপিয়া, স্ত্রীর পানে অপাঙ্গেয় দৃষ্টি দিয়া, উত্তর করিল—'তখন ছিলাম নেহাৎ আনাড়ি,—হাফেজের মত মন হতো—

গালের 'পরে তিলটী,
ফুল-বিতানের ঝিল্‌টী!—

সে ভুল ভেঙেছে;—এখন বুঝেছি—

এই তো সুধা, এই তো সুধা!
এইখানে মোর মিট্‌বে ক্ষুধা!'

বলিয়াই অবিনাশ হাত বাড়াইয়া সরযূর ঠোঁট দুখানি ধরিতে গেল।

—'তুমি যে কি!'—বলিয়া সরযূ ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইল।

৪

ল্যাবোরেটরীতে কয়েকদিন অবিশ্রাম খাটুনীর পর, শনিবার একটু সকাল সকাল বিছানায় শুইয়া অবিনাশ বই পড়িতেছিল। সরযূ খাটের নিকট আসিতেই সে উঠিয়া

বসিল। তার পর, তাহাকে টানিয়া আনিয়া সম্মুখে বসাইয়া উভয় চক্ষুতে একাগ্র দৃষ্টি ভরিয়া তাকাইয়া র'হল তার বাম গালের সেই কালো তিলটীর দিকে।

৫

ভোরে জাগিয়াই সরযূ অবিনাশকে প্রশ্ন করিল—'শেষ রাত্তিরে অমন কচ্ছিলে কেন?—অনেকক্ষণ ধরে বিড় বিড় ক'রে বক্‌ছিলে আবার মাঝে মাঝে আমার নাম নিয়েও কি বল্‌ছিলে!—কোন স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছিলে বুঝি?

'স্বপ্ন!···কই, কিছুই তো মনে পড়ে না।'

'মনে পড়ে না'—বলিতেই ছাঁৎ করিয়া আবছায়ার মত স্বপ্নের একটা দৃশ্য অবিনাশের মনে পড়িয়া গেল। সত্যই তো শেষ রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিয়াছে—পদ্মের মৃণালের মত সরযুর গালের তিলটী লতাইয়া লতাইয়া দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার মর্ম্মস্থল জড়াইয়া ধরিয়াছে; আর সেই মৃণালের আগায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—সরযুর হৃদয়-পদ্ম। অবিনাশ মৃণালের মূল ধরিয়া টান দিতেই সরযুর হৃদ্‌পিণ্ড সমেত পদ্মটী ছিঁড়িয়া আসিল।

পাশ ফিরিয়া শুইয়া অবিনাশ আপন-মনে স্বপ্নের কথাই ভাবিতে লাগিল।

সরযূ বলিল—'কই, উঠবে না? চুপ ক'রে শুয়ে রইলে যে!···আজ না কোন্ কলঙ্ক, না, তোমার চোখের কাঁটা, কি নিকেশ করার কথা!'

'হুঁ' বলিয়া অবিনাশ সরযুর দিকে ফিরিল। ফিরিয়া-ঘুরিয়া রাতের স্বপ্ন তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতেছিল। সে ভাবিল—সত্যই যদি ঐ তিলটী সরযুর জীবনের তন্তু হয়!·না, না, তাও কি সম্ভব?···স্বপ্ন কি আর সত্য! অলীক ভাবনা ঝাড়িয়া মুছিয়া সে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল। বলিয়া গেল—'তুমি নেয়ে-টেয়ে ল্যাবোরেটরীতে এস, আমি সেখানেই যাচ্ছি।'

৬

স্নান সারিয়া চওড়া লাল পেড়ে সাড়িখানি পরিয়া সরযূ যখন ল্যাবোরেটরীতে প্রবেশ করিল, তখন অবিনাশ টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুইটা সাদা গুঁড়া একত্র মিশাইতেছিল।

ঘরের কোণে সোঁ সোঁ করিয়া গ্যাসের ষ্টোভটা জ্বলিতেছে। উনানের পাশে তে-পায়ার উপর চৌ-কোণা চীনা বাসনে বেগুনে রঙের কি একটা আরক। ঘরের দরজা-জানালা সবুজ পর্দ্দার ঢাকা। আর মেঝের মাঝখানে একখানি জাফরিকাটা ছোট গোল টেবিলে ফুলদানী—জাজা যুঁইফুলে ভরপুর।

অবিনাশ মুখ ফিরাইয়া সরযুকে বলিল—'সোফার ওপর শোও গে।

সোফায় শুইয়া সরযুর মনে পড়িল, ফুলশয্যার সেই রাতের কথা।—বিছানাময় সেই রকমই ফুলের রাশ, ঘরের ভিতর নিরালায় সেই রকমই তারা দুইজনে—স্বামী আর স্ত্রী! কিন্তু সেদিন যাহা সোহাগের ছিল, আজ তাহাই কলঙ্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে!—এ কি চোখের ভুল, না, মনের ভুল?

এক হাতে বেগুনে রঙের বাসন, আর এক হাতে সাদা গুঁড়ার মোড়ক লইয়া অবিনাশ স্ত্রীর সোফার নিকট আগাইয়া আসিল। বলিল—'ছোট্ট একটা তিল তুলে দেওয়া, এ তো সামান্য কথা,—বিজ্ঞানের বল কত বেশী, এই দেখ।"

জানালার গোড়ায় এক-তাল মাটী ছিল; অবিনাশ তাহাতে একটা বীজের মত কি পুঁতিয়া কয়েক ফোঁটা বেগুনে আরক ঢালিয়া দিল; তারপর দুই চামচে সাদা গুঁড়া ছড়াইয়া দিতেই, যাদুকরের ভেলকীর ন্যায় মাটীর উপর একটি সবুজ অঙ্কুর দেখা দিল; অঙ্কুরটী বাড়িয়া বাড়িয়া দশ মিনিটের মধ্যেই হইল এক গোলাপ-গাছ, আর সেই গাছের আগডালে ফুটিয়া উঠিল—টাটকা রক্তের বরণ দল্‌দলে একটী গোলাপ ফুল।

হাস্য-পুলকে অবিনাশ মাটীর ডেলাশুদ্ধ গাছটী আনিয়া সরযুর চোখের সাম্‌নে ধরিল। বলিল—'নাও, গন্ধ শোঁকো, হাতে ধরেও ছাখো,—খাঁটী বসোরার গোলাপ।'

'বাঃ রে! বড় সুন্দর তো!'—বলিয়া সরযূ হাত বাড়াইয়া ফুলটী ছুঁইতেই লাল পাপড়িগুলি কুঁচকাইয়া কাল্‌চে হইয়া গেল।

বিস্মিত হইয়া অবিনাশ একবার শুষ্ক গোলাপটীর দিকে, আর একবার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

তাহার মনে পড়িল, দেহের শক্তি আর মনের শক্তি এক না হইলে এই রকমই তো হয়। সরযুর মনে হয়তো ভয়ের উত্তেজনা হইয়াছে, তাহারই সাড়ায় ফুলটা এমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

স্ত্রীর ডান হাতখানি নিজের হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল—'সত্যি বল তো সরযু, তোমার কি ভয় কচ্ছে?' তার পর নিজেই আবার সান্ত্বনার স্বরে বলিতে লাগিল, 'ভয় কি!...ভগবানও সৃষ্টি করেন, বিজ্ঞানও সৃষ্টি করচে। বিজ্ঞানের সৃষ্টি বরং ভগবানেরও ওপর;—বিশ্বাস হারিয়ো না, ফল দেখে মেনে নাও—মনের ধাঁধা ঘুচে যাবে।'

মুখে স্ত্রীকে সাহস দিলেও অবিনাশের নিজের মনে একটু খটকা লাগিয়াছিল। সরযুর মন ভুলাইবার জন্ম এবার সে ফটোগ্রাফের ক্যামেরাখানি সোফার নিকট টানিয়া আনিল। বলিল—'ঠিক হয়ে শোও,—কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে, মাথাটা একটু তুলে...না, না, ওদিকে না,—বাঁ দিকে আর একটু হেলে।...ব্যস্, এবার ঠিক হয়েছে।'

ক্যামেরা হইতে প্লেট খুলিয়া অবিনাশ দেখে, এ কি ফোটো! সব জায়গাতেই কালো বড় বড় দাগ! বিরক্তি-ভরে সে কাচখানি দুই হাতে ঘরের কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

সরযু বলিল—'ও কি করলে?'

অস্বাভাবিক জোর-গলায় অবিনাশ চ্যাচাইয়া উঠিল—'কিছু না।...তুমি এখন চুপ করে শুয়ে থাকো দেখি।'

টং টং করিয়া ল্যাবোরেটরীর ঘড়িতে নয়টা বাজিল। অবিনাশ দেওয়ালের গায়ের একটা চাবি খুলিয়া দিতেই ছাদের ঝাঁঝরি হইতে ফুলের রেণুর মত জলের কণা ঝির্ ঝির্ করিয়া সরযুর গায়ে পড়িতে লাগিল। শেফালির সুবাসের ন্যায় মৃদু গন্ধ ঢেউ খেলিয়া সমস্ত ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুরভির নেশায় সরযুর চোখ ঠেলিয়া অবসাদ জাগিয়া উঠিতেছিল,—চোখ মুদিয়া চুপ করিয়া সে সোফার উপর পড়িয়া রহিল।

৭

গালের উপর কিসের একটা ঝাঁজ লাগিতেই সরযু চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে, স্বামী তার মুখের উপর ঝুঁইয়া রহিয়াছে; তাঁর বাঁ হাতে ছোট একটী শিশি; শিশির মধ্যে হল্‌দে আরক। ঐ আরক ডান হাতের তুলিতে মাখাইয়া অবিনাশ সরযুর গালে বুলাইয়া দিতেছিল।

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সরযু বলিল,—'এবার বুঝি আসল পরীক্ষা আরম্ভ হলো!

'পরীক্ষা!' অবিনাশ বলিল—'পরীক্ষা কি? দু মিনিট সবুর কর, পরীক্ষার ফল চাক্ষুষ দেখ্‌তে পাবে।...এই যে ছোট্ট শিশিটী দেখ্‌চ,—কি এতে, বল তো?—অমৃত-গরল্। অমৃতের ফল এখন পাবে, কিন্তু ওজন ঠিক না রাখ্‌তে পারলে এই অমৃতই হয়ে ওঠে কালকূট বিষ।'

বিষ!—কথাটা যেন কানের ভিতর ঢাক পিটাইয়া সরযুকে বিচলিত করিয়া তুলিল। সে ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিল—'ঐ বিষ দেবে আমার গালে?—কেন গো,—কি করেচি, আমি?'

সান্ত্বনার স্বরে অবিনাশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—'সে কি! মিছে ভয় করচ কেন?—বিষ নয়, এ অমৃত,—তোমার পক্ষে অমৃত-সঞ্জীবনীরই কাজ করবে।'

মলিন মুখে মৃদু হাসিয়া সরযু আপন মনেই যেন অস্ফুট গুঞ্জন করিল—'দাও, তবে দাও।—তোমার দেওয়া সবই আমার অমৃত!'

৮

অবিনাশ আরক-মাখা তুলিটী তিন-চারিবার বুলাইতেই বাস্তবিক অমৃত-সঞ্জীবনীর ফল ফলিল। ইন্দ্রধনুর রঙের রেখা যেমন আস্তে আস্তে আকাশের গায়ে লয় পায়, সরযুর গালের কালো তিলটীও তেমনি ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছিল।

জয়ের উল্লাসে অবিনাশ দেওয়ালের গায়ের বড় আয়না-খানি টানিয়া আনিয়া স্ত্রীর মুখের সাম্‌নে ধরিয়া বলিল—'ভাখো, ভাখো, একবার চেয়ে ভাখো।'

আয়নার দিকে দৃষ্টি পড়িতে সরযু দেখিল, সত্যই তিলের কালো দাগটী প্রায় মিলাইয়া আসিয়াছে। যেটুকু

আছে তাহাও রাত্রি-অবসানে আসন্ন প্রভাতের ন্যায় ফিকে হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর বিজয়-গর্ব্বে সরযু অবিনাশের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া মৃদু হাসিল। অবিনাশ হাঁটু গাড়িয়া পত্নীর হাসির কোলে টোল-খাওয়া তিলটীর উপর অধর স্পর্শ করিয়া বলিল—'এবার চাঁদ নিষ্কলঙ্ক!'

কিসের অবসাদে স্বামীর সোহাগ সরযুর প্রাণে তেমন উৎসাহ জাগাইতে পারিল না। অবিনাশের হাতে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া সে শুইয়াই রহিল।

স্ত্রীর মুখের পানে অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া অবিনাশ পরীক্ষার শেষ ফলের অপেক্ষা করিতেছিল। চাঁদের কলা যেমন বাড়িয়া বাড়িয়া পূর্ণিমার রাত্রে পূর্ণ-চাঁদে পরিণত হয়, সরযুর গালের গোলাপী রং কালো তিলটীকে গ্রাস করিয়া তেমনি সমস্ত মুখে ভরিয়া উঠিতেছিল।...কলঙ্কের ঐ শেষ চিহ্নও মুছিয়া যায়!—আনন্দে, উৎসাহে অবিনাশ চ্যাচাইয়া উঠিল—'ওঠ, সরযু, ওঠ,—পরীক্ষায় জয় হয়েচে।'

চোখের পাতা টানিয়া মেলিয়া ঘুমের নেশার জড়িত স্বরে সরযু বলিল—'জয় হয়েচে?...কলঙ্কের চিহ্নটী আমার মুছে গেছে?...বেশ।...তোমার জয়েই আমার জয়!—তোমার এ জয়ের টীকা প'রে আমার পরাজয়ের ভয় কিসে?'...

...কিন্তু, এ যে পরাজয়েরই লক্ষণ!—অবিনাশ চমকাইয়া উঠিল—সরযুর এ কি স্বর!...চোখই বা কেন সে মুদিয়া আছে! আর, হাত পা কেন অমনভাবে এলাইয়া পড়িল!

কম্পিত কণ্ঠে সে ডাকিল—'সরযু, সরযু!'

ক্ষীণ গলায় সাড়া আসিল—'হুঁ!'

'সরযু, অমন করছো কেন? চোখ মেলে দ্যাখো,—কথা কও,—আমার পানে চাও'—

কোন্ সুদূর হইতে হাওয়ায় ভাসা চাপা স্বরের অস্ফুট ধ্বনি আসিল—'কই তুমি?...ঘুম—ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে যে গো—'

ঘুম! এ কিসের ঘুম?...কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবিনাশ পাথরের মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

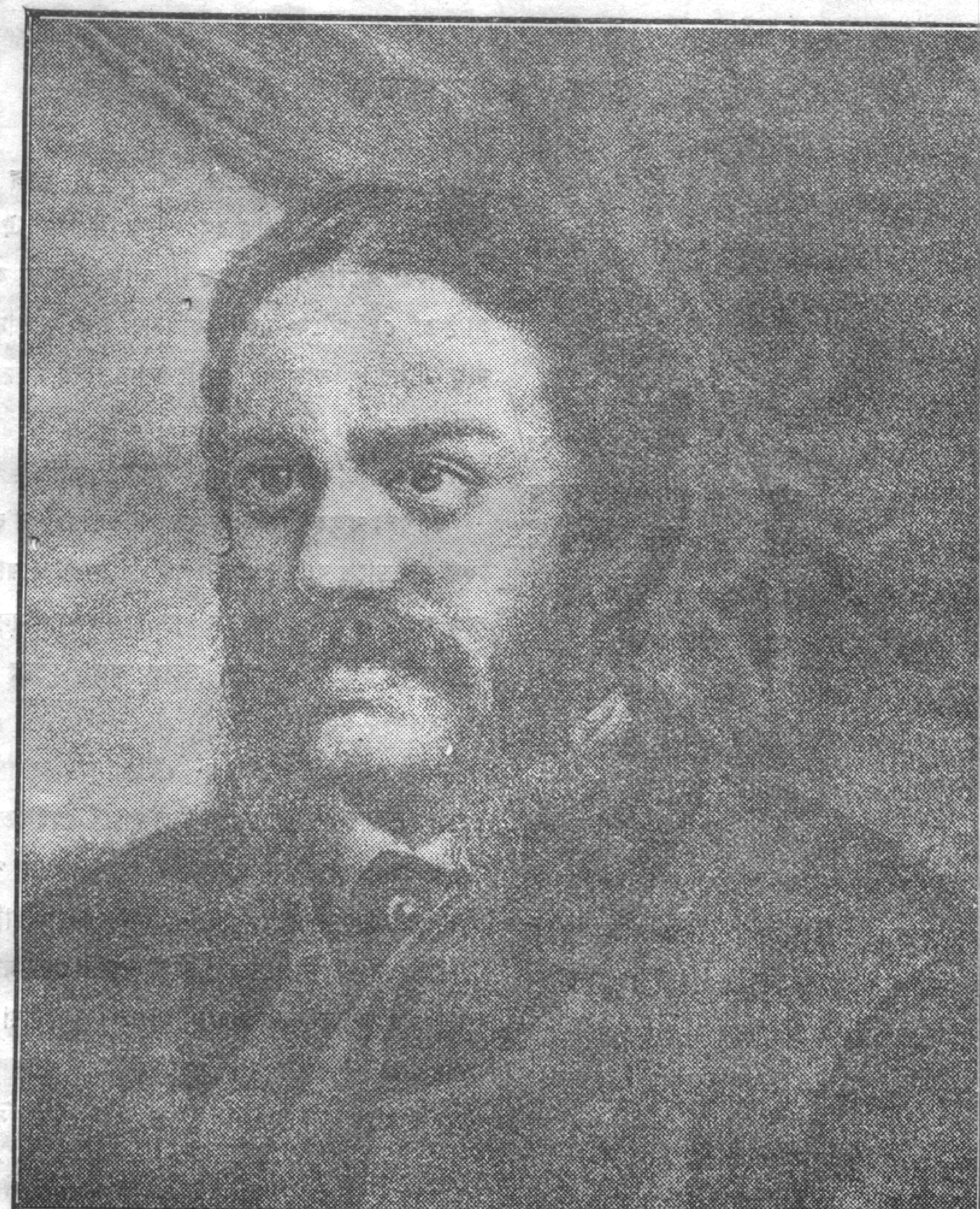
ঘুমের ঘোরে সরযুর মৃদু নিঃশ্বাস মৃদুতর হইয়া আসিল। তারপর,—সন্ধ্যার সূর্য্য ডুবিতেই যেমন পশ্চিমের রোদটুকুও হঠাৎ নিভিয়া যায়, তেমনি গালের তিলটি নিশ্চিহ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরযুর শেষ নিশ্বাসও বাতাসে মিশিয়া গেল।

স্ত্রীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অবিনাশ তখনো ভাবিতে লাগিল, এ কি হইল!...ক্ষুদ্র তিলটি তুলিতে গিয়া স্ত্রীর হৃৎপিণ্ড কি সত্যই তবে ছিঁড়িয়া ফেলিলাম!...

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

গত ১২ই মাঘ মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের শত বার্ষিকী জন্মদিন গিয়াছে। আমাদের দেশে কবি বা সাহিত্যিকের এরূপ শতবার্ষিক জন্মতিথির উপলক্ষ্য এই প্রথম বলিতে হইবে। মাইকেলের মত কবি—বা সাহিত্য-প্রতিভা, নব্যবঙ্গের ইতিহাসে অধিক নাই—তাঁহাকে নব্যসাহিত্যের প্রবর্ত্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ হেন কবির শতবার্ষিক জন্মোৎসবের কথা মনে হইলে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিবার কথা। শুধু বড় কাব্যকার বলিয়া নহে এই কবির জীবন কথা—তাঁহার অপূর্ব্ব হৃদয়, ও শোচনীয় ভাগ্যকাহিনী মনে হইলে, প্রাণের যেমন শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়,—বাঙ্গালী চরিত্র ও প্রতিভার একদিক স্মরণ করিয়া যেমন গর্ব্বানুভব হয়, তেমনি প্রাণমন ব্যথায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ হেন কবির শত বার্ষিক স্মৃতি উৎসব যেমন করিয়া সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল, এবং চেষ্টা করিলে হইতে পারিত, কলিকাতার কোনও নাগরিক-সভা তাহা করিতে পারেন নাই, এমন কি সাহিত্য-পরিষদ্ সভাও যে ভাবে তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন তাহাতে জাতির মুখ রক্ষা হয় নাই—ইহা আরও দুঃখের কথা এইজন্য, যে এইরূপ উৎসবের উপলক্ষ্য শতবর্ষে একবার উপস্থিত হয়। কি হওয়া উচিত ছিল, কেমন করিয়া এই অনুষ্ঠান যথার্থ হৃদয়ের উৎসব হইতে পারিত, কেমন করিয়া মৃত কবির স্মৃতি জনগণের মনে গভীর ভাবে



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

জন্ম—১২৩০।১২ই মাঘ শতবার্ষিক উৎসব—১৩৩০।১২ই মাঘ

[আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে]

মুদ্রিত করা যাইত, এবং এই শ্রদ্ধা নিবেদন একটি জাতির গৌরবানন্দের পরিচয় স্বরূপ হইতে পারিত তাহা সুধী ব্যক্তিগণ চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। অনেক পূর্ব্ব হইতে অর্থ সংগ্রহ, এবং উপযুক্ত কর্ম্মী সভা গঠন করিয়া বিভিন্ন ব্যাপারের ভার অর্পণ,—বর্ত্তমান কালের প্রবাণ ও নবীন কবি সাহিত্যিকের সম্মিলন—গান, কবিতা, প্রবন্ধ, যাত্রা ও কবির রচিত নাটকের অভিনয় প্রভৃতি এবং একটি মেলা ইত্যাদির দ্বারা এই উৎসবকে কতখানি মহিমান্বিত করা যাইত তাহা ভাবিলে এখন দুঃখ হয়। সর্ব্বশেষ, এখনো-বর্ত্তমান সেই যুগের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথকে এই উৎসবের অধিনায়ক রূপে দাঁড় করাইলে কত সুন্দর কত শোভা হইত! আমাদের জাতীয়তা বোধ যে কতটুকু মাত্র জাগ্রত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ সাধনা যে সাহিত্য, তাহার সম্পর্কে এই উৎসাহের অভাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ঘর ও বাহির

স্বাস্থ্য

বাঙ্গালীর এক শত্রু ছিল ম্যালেরিয়া, এখন আবার কালাজ্বর নামক আর এক শত্রু বাঙ্গলা দেশে হানা দিয়াছে। কো-অপারেটিভ অ্যান্টীম্যালেরিয়া সোসাইটী, বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-সমিতি প্রভৃতির হিসাব মতে বাঙ্গলা দেশে কালাজ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। তাঁহারা এমনও বলেন যে, কালাজ্বর দমনের কোন চেষ্টা না করিলে, অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতা সহরেই শতকরা ৬০ হইতে ৮০ জন পর্য্যন্ত লোক কালাজ্বরে আক্রান্ত হইবে। বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের ইস্তাহারে এতটা স্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের হিসাব অনুসারেও বাঙ্গলা দেশে দুই লক্ষ হইতে তিন লক্ষ লোক কালাজ্বরে ভুগিতেছে।

'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর'। আজ ৬০।৭০ বৎসর ধরিয়া ম্যালেরিয়া বাঙ্গলা দেশ ধ্বংস করিতেছে, প্রতি বৎসর প্রায় আট দশ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মরে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। স্কীম, গবেষণা অনেক হইয়াছে; ইস্তক গভর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া নাগাদ দেশী মন্ত্রী পর্য্যন্ত সকলেই বীরত্বব্যঞ্জক বক্তৃতা করিয়াছেন। কিন্তু কাজে কিছুই হয় নাই; কেননা কাজে কিছু করিতে হইলে যে পদার্থটীর প্রয়োজন গভর্ণমেণ্ট সেইটাই যথেষ্ট পরিমাণে যোগাইতে পারেন না!

—আনন্দবাজার পত্রিকা

জন-গণ-মন

যেখানেই অত্যাচার হউক, সেখানে যদি বাধা দিতে কেহ দাঁড়ায়, তবে অত্যাচারের গতি নিশ্চিতই কতকটা রুদ্ধ হয়। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ স্থলেই দুর্ব্বৃত্তদের আগমনে নারী ও তাহার অসহায় স্বামী হা হুতাশ করিয়াছে, বুকফাটা কান্না কাঁদিয়াছে, কিন্তু মরিয়া হইয়া অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নাই। অবশ্য ১৫।১৬ জন দুর্ব্বৃত্তের সঙ্গে দুইজন নারী, পুরুষ কিছুতেই হয়ত পারিয়া উঠিবে না, বাধা দিয়া কৃতকার্য্য হইবে না; কিন্তু ইহাও ঠিক, এই রকম মরিয়া হইয়া বাধা দেওয়ার ফলেই দুর্ব্বৃত্তদের মনে বিভীষিকা জাগে, অত্যাচারের প্রবাহে বাধা পড়ে। আজ পুরুষের উপর, সমাজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে নারী "আপনার মান" রাখিতে পারিবে না। নিজেদের মর্য্যাদা রক্ষার ভার নিজেদেরই বহন করিতে হইবে। যে দেশের সমাজের পুরুষ, নিজের পল্লীগ্রামের নারীদের অত্যাচার করে, অত্যাচার করিয়া অনেক স্থানে রেহাই পায়, সেই দেশে, "আপনার মান রাখিতে জননী, আপনি কৃপাণ ধরগো।" শিখ নারীরা ছোট কৃপাণ ধারণ করেন ধর্ম্মের আদেশে। আজ বাঙ্গলার নারীদের, নিজেদের মর্য্যাদা ও সতীত্ব রক্ষার জন্য নিজেদের ঐ কৃপাণের মতই কিছু গ্রহণ করা প্রয়োজন হইয়াছে। আজ কামুক জয়দ্রথের হস্ত হইতে লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীকে রক্ষা করিবার জন্য বৃকোদর বাঙ্গলায় নাই। নাই বলিয়াই, বাঙ্গলার নারীকে নিজেদের মর্য্যদা রক্ষায় জাগ্রত হইতে অনুরোধ করি।

—স্বরাজ

দাম্পত্য কলহ চিরকালই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া, সবাই জানি; কিন্তু হাওড়াতে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া অভিমানে গাত্র-বস্ত্রে কেরোসিন লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, সুতরাং দাম্পত্য কলহ অজা যুদ্ধের মত লঘু হয় নাই। দস্তুরমত গুরু হইয়াছে।

নারীদের এই গাত্রবস্ত্রে কেরোসিন লাগাইয়া পুড়িয়া মরিবার খেয়াল এ দেশে আগে তেমন ছিল না। স্নেহলতার মরার পর, দেশের সর্ব্বত্র যখন স্নেহলতার প্রশংসা চলিল, তাহার পর হইতেই মেয়েদের মধ্যে কারণে-অকারণে বা অল্প কারণে কেরোসিনে পুড়িয়া মরিবার খেয়াল দেখা দিয়াছে। কোন কোন স্থলে নারী অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অসহ্য হইলেই হয়ত আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা যন্ত্রণা শেষ করিবার এই নিন্দনীয় পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তাহা সমাজের পক্ষে কলঙ্কের সন্দেহ নাই; কিন্তু এই কেরোসিনে আগুন লাগাইয়া মরার মধ্যে অনেক মৃত্যু যে খুবই সামান্য কারণে ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যখন দেশ শুদ্ধ লোক স্নেহলতার মৃত্যুতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল তখন কবি গোবিন্দ দাস ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই বুঝি উল্টা সুরে গান ধরিয়াছিল, "করলি কিলো সর্ব্বনাশী, মেয়ের মড়ক আনলি দেশে!" এযে তাই দেখিতেছি! কেরোসিনে আত্মহত্যা করিবার এমন সাঙ্ঘাতিক ঝোঁক যদি কারো মাথায় চাপে, উপায় কি?

—স্বরাজ

ফেরীঘাটে ষ্টীমার প্রায়ই দেরী করে আসে, আর তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয়। ফলে তল্পীতল্পা নিয়ে যাত্রী বেচারাদের দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটি করে প্রাণান্ত হতে হয়, এতেও আবার অনেক সময় তারা ষ্টীমারে উঠতে পারে না, বা হয়ত জলে পড়ে নাকানি-চোবানি খায়। ভাড়ার পয়সা দিয়ে এমন ঝকমারি কেবল এদেশের লোকের ভাগ্যেই বুঝি ঘটে। সেদিন নাকি এক ভদ্রলোক এসব কথা পোর্ট কমিশনারদের কাছে বলেও ছিলেন। ট্রাফিক ম্যানেজার তার জবাব দিয়েছিলেন

যে, যাত্রীদের ওঠানামার পক্ষে ৩০ সেকেণ্ড বা আধ মিনিটই যথেষ্ট, লণ্ডনেও এর বেশী সময় দেওয়া হয় না। ট্রাফিক ম্যানেজার বোধ হয় নূতন লণ্ডন থেকে কলকাতায় এসেছেন, নইলে নিশ্চয়ই তাঁর মনে হতো যে, লণ্ডন আর কলকাতা এক নয়।

যা'হোক এ সব কথা কাটাকাটি করে আমরা কোন লাভ দেখি না। পোর্ট কমিশনারেরাই করুন বা কলিকাতা কর্পোরেশানই করুন,—শীঘ্রই ফেরীঘাটের ভাল বন্দোবস্ত হওয়া দরকার। কলিকাতার জনসাধারণও নিশ্চেষ্ট না থেকে এ বিষয়ে একটু উদ্যোগী হোন। নিজেদের সুবিধা-অসুবিধা নিজেরা না দেখলে অন্যের উপর বরাত দিয়ে চলে না। —আনন্দবাজার পত্রিকা

রাজনীতি

"সব ভাল যার, শেষ ভাল।" ঘরপোড়া গরুর কিন্তু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় হয়। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া রুশ-ভীতি ও সীমান্ত-নীতির ফলে গরীব ভারতবর্ষকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। সামরিক শ্বেতহস্তী পুষিবার জন্য, পাহাড় কাটিয়া রেল বসাইবার জন্য, দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার জন্য বহু কোটী টাকা খরচ করিতে হইয়াছে। আমরা ভাবিয়াছিলাম, আফগানীস্থান স্বাধীন হইলে সীমান্ত নীতিরও পরিবর্ত্তন হইবে; কিন্তু আবার যদি সীমান্ত সমস্যা লইয়া ইঙ্গ-আফগান বিরোধ বাধিয়া উঠে, তবে গরীব ভারতবাসীরাই সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। —আনন্দবাজার পত্রিকা

সুশিক্ষা, সৎসাহস এবং শক্তিই জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ; যে জাতি এ সকল গুণ অর্জ্জনে অসমর্থ, দুঃখ-দুর্বিপাকাদি তাহার নিত্যসহচর। বাঙ্গালী যদি জগতের সুসভ্য জাতিসমূহের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এ সকল গুণে যে তাঁহারা হীন নহেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হইবে। বঙ্গসন্তানের আজ সেই সুযোগ উপস্থিত। মেসোপোটেমিয়ার রণক্ষেত্রে আহত ও পীড়িত সেনাদলের সেবায় অগ্রসর হইয়া বঙ্গসন্তান প্রথমে যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গালী পল্টন গঠন করেন; তৎপর বেঙ্গল লাইট হর্স্ সৈন্যদলের সৃষ্টি যে বাঙ্গালী পল্টনেরই বীরত্ব ও কৃতিত্বের ফল, তৎপক্ষেও সন্দেহ নাই। শিক্ষা সম্পদে বাঙ্গালী কোন জাতি অপেক্ষা হীন না হইলেও, শৌর্য্যবীর্য্য-বিহীন জাতি বলিয়া তাঁহাদের যে কলঙ্ক ছিল তাহা এখন অপসারিত হইয়াছে, এবং এ নিমিত্তই কর্ত্তৃপক্ষ ভারতরক্ষার জন্য বাঙ্গালী সৈন্য দ্বারা এক জাতীয় সেনাদল গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন এই সদনুষ্ঠানের নিমিত্ত শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইবেন। সংকল্পিত জাতীয় সেনাদল যাহাতে সত্বর সুগঠিত হয়, আশা করি, বঙ্গের সাহস ও শক্তিসম্পন্ন যুবকগণ তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। —ঢাকা প্রকাশ

ময়মনসিংহ জেলার কতকগুলি ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে বলিয়া সর্ব্বত্রই একটা হৈ চৈ পড়িয়াছে। আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, যে সকল ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিসের আয় অপেক্ষা খরচ বেশী তাহাদিগকে রাখিতে হইলে বিনা সর্ত্তে এক বৎসরের ক্ষতিপূরণের টাকা জমা দিবার জন্য গরীব গ্রামবাসীগণের উপর ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন এবং তাহাতে ইহাও বলা হইয়াছে যে সরকারী হুকুম প্রাপ্তির ৭ দিবস মধ্যে উক্ত টাকা জমা না দিলে আফিসগুলি উঠিয়া যাইবে। কোন্ কোন্ আফিসের উপর এ রকম ইস্তাহার জারী করা হইয়াছে। তাহার তালিকা আজও আমরা প্রাপ্ত হই নাই। তবে জানিতে পারিলাম উহার মধ্যে অনেক আফিসই নাকি ৩০।৩২ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে। এ অসম্ভব প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের মনে হয়, এই জিলার সকল পোষ্টাফিসের আয় ও ব্যয়ের হিসাব করিলে মোটের উপর লাভের অঙ্কই অধিক দাঁড়াইবে। এমতাবস্থায় লাভের টাকা গবর্ণমেণ্ট নিবেন এবং ক্ষতিপূরণের টাকা দুঃস্থ প্রজাবৃন্দ দিবে ইহা কিরূপ বিচার? গ্রামে গ্রামে পোষ্টাফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের সুবিধা করিয়া দিবেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ডাকমাশুলের হার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইতেছেন—ইহাতে গবর্ণমেণ্টের উপর জনসাধারণের ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিতে পারে কি? —চারুমিহির

কালা আদমীর প্রাণের মূল্য শ্বেতাঙ্গের সমান হয় ত নয়; অবশ্য শ্বেতাঙ্গেরা সকলেই যে কৃষ্ণাঙ্গদিগকে এইরূপ চক্ষে দেখেন, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু এমন ঘটনা মাঝে মাঝে কেনই বা হয়? বিশেষতঃ যাহাদের হাতে দেশের শান্তি রক্ষার ভার রহিয়াছে, দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখিতে হইলে যে শ্বেতাঙ্গ সেনাদের আবশ্যকতা, প্রয়োজনীয়তা, কার্য্য-কারিতার কথা এত বেশী আমরা শুনিতে পাই, তাহাদের দ্বারাই এরূপ ঘটনা অধিকাংশই ঘটে। Law and Order—এ কথা ত আমরা কর্ত্তাদের মুখে সদা সর্ব্বদাই শুনিতেছি; শুনিতে শুনিতে কাণ ঝালা-পালা হইয়া গেল।

এই Law and order বজায় রাখা এদেশে নাকি বড়ই শক্ত কাজ। কিন্তু Law and order আইন ও শৃঙ্খলা ইহার বাহন যাহারা তাহারাই বা এমন বিগড়ায় কেন? যাহারা Law and order

(আইন ও শান্তি) বজায় রাখিবে, তাহারাই Law and order আইন ও শান্তি ভঙ্গ করিবে;—আর কর্ত্তারা আমাদের উপর চোখ রাঙ্গাইবেন,—তোমরা বড়ই বেয়াড়া, আইন ও শান্তির মর্য্যাদা বুঝ না। এদেশের কোন দুষ্ট লোকের হাতে যদি কোন শ্বেতাঙ্গ খুন হয়, তবে সেজন্য কেমন স্বর্গ-মর্ত্ত তোলপাড় পড়িয়া যায়, সে কথা যাহারা এদেশে অশান্তি অরাজকতার জুজুর ভয় দেখেন, তাঁহারাই ভাবিয়া দেখুন। শ্বেতাঙ্গ হত্যার দায়ে বোধ হয়, এদেশের কোন অপরাধীই ফাঁসি হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গকে খুন করার অপরাধে কয়জন গোরার ফাঁসি হইয়াছে? কৃষ্ণাঙ্গের হাতে শ্বেতাঙ্গ নিহত হইলে শ্বেতাঙ্গের প্রাণে যেমন লাগে, এদেশের লোক শ্বেতাঙ্গের হাতে খুন হইলেও এদেশের কৃষ্ণাঙ্গের প্রাণে তেমনই আঘাত লাগিয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত এমন ব্যাপার এদেশে সম্ভব হইবে, শান্তি-রক্ষার ভার যাহাদের উপর তাহারাই উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাইবে, বিষম বে-আইনী করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত শাসন-সংস্কার অথবা স্বায়ত্তশাসন—কোন অধিকারই ভারতবাসী ও ইংরেজ, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ এই উভয়ের আন্তরিক মৈত্রী ঘটাইতে পারিবে না—ভেদ-বৈষম্য বাড়াইয়া তুলিবে এই সব ব্যাপারই। —— —হিন্দুস্থান

ভিতরের গলদ দূর করাই হইল, আমাদের আজ সব চেয়ে বড় কথা—আমাদের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ রহিয়াছে, আমাদের ভিতরে। আমরা যদি সেগুলি দূর করিতে পারি, তবেই শুধু আমাদের সমাজে নহে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আমরা শক্তিশালী হইতে পারিব। আমাদের ঐ সব ভিতরকার গলদের জন্য বিদেশীদের দৃষ্টিতে আমরা কতটা খাটো হইয়া পড়িতেছি, আমাদের অধিকারের দাবী কতটা হাল্কা হইয়া পড়িতেছে, সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার 'কেপ্‌টাইমস' পত্র দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের উপর যে কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে। 'কেপ্‌টাইমস' লিখিয়াছেন, ভারতীয় রাজনীতিকেরা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতবাসীদের প্রতি অত্যাচার হয়, অবিচার হয় বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। অত্যাচার, অবিচার কোথায় হয়, ইহা যদি তাহারা জানিতে চাহেন, তবে তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেই সে খোঁজ আগে করুন। ভারতের লক্ষ লক্ষ লোককে এখনও 'অস্পৃশ্য' পর্য্যায়-ভুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। ভারতের ঐ শ্রেণীর রাজনীতিকেরা যদি সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা পাতি পাতি করিয়া খুঁজেন, তাহা হইলেও ভারতের সামাজিক রীতি নীতিতে যতটা অত্যাচার অবিচার হয়, এখানে ততটা দেখিবেন না। বিদেশীর নিকট হইতে এমন খোঁটা আজ যে আমাদিগকে শুনিতে হয়, বাস্তবিকই কি তাহার মূলে সত্য কিছুই নাই? বিভেদ, বিদ্বেষই আমাদের শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে; শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে বক্তৃতায় নহে, আমরা যদি জাতীয়তার ভিত্তি দৃঢ় করিতে চাই, তবে সমাজ সংস্কারের ভিতর দিয়াও আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে, এবং সে কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী।

—— —স্বরাজ

নারী-প্রসঙ্গ

প্রায় একমাস কাল হইল কলিকাতার পতিতা রমণীরা "মুক্তি সমাজ" নাম দিয়া একটি সমিতি গঠন করিয়াছে। তাহাদের ছেলেমেয়েরা যাহাতে সৎ শিক্ষা পাইয়া সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে শিখে, সেই উদ্দেশ্যেই এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতির বিস্তৃত বিবরণ আমরা জানি না; তবে, শুনিতেছি, উক্ত উদ্দেশ্যে স্কুল, কলেজ, বোর্ডিং. এবং দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পতিতা রমণীরা নিজেদের ভিতর হইতে চাঁদা তুলিতেছে। এ চেষ্টা প্রশংসনীয়। পাপ-ব্যবসা-আইন সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই একথা বলিয়াছি যে ঐ আইনকে সফল করিতে হইলে যাহারা পাপ ব্যবসা পরিহার করিতে চায়, কিংবা পাপ ব্যবসায়ীদের কবল হইতে যাহাদিগকে মুক্ত করা সম্ভব হয়, তাহারা যাহাতে সদ্ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, তজ্জন্য এরূপ প্রতিষ্ঠানাদিও এদেশে গঠিত হওয়া আবশ্যক। পেটের দায়ে জীবিকা অর্জ্জনের অন্য পথ সম্মুখে না পাইয়াও এদেশের পতিতাদের মধ্যে অনেককে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ঐ পাপ ব্যবসায়েই ডুবিয়া থাকিতে হয়, সদ্ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের সৎশিক্ষা পাইবার সুবিধা ইহাদের পক্ষে থাকিলে পাপ ব্যবসায়ের প্রসারও যে অনেকটা কম হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। পতিতা রমণী সম্প্রদায়ের এই নূতন চেষ্টা সাফল্য লাভ করিলে, সে পথ অনেকটা প্রশস্ত হইবে, এবং পাপ ব্যবসায়ের প্রভাবও কমিবে যাঁহারা সহরের দুর্নীতি দমন করিতে চাহেন, তাঁহাদের এ প্রচেষ্টার সমর্থন করা উচিত। —স্বরাজ

——

শ্রীমতী রাধাবাই সুধারায়ণ মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বোম্বাই প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী সদস্যের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে কিন্তু বাঙ্গলা দেশের একটি রমণীও আজ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইলেন না, ইহার কারণ কি? বাঙ্গলায় কি শিক্ষিতা মহিলার অভাব আছে? না, স্ত্রী-পরাধীনতার দেশ বলিয়াই এটা ক্রমাগত মুলতুবী রাখা হইতেছে। —শিশির

—

গত পাঁচ বৎসরে পূর্ব্বেকার অপেক্ষা বাঙ্গলা দেশে মেয়েদের শিক্ষার স্কুল শতকরা ২৮৭৯ হারে বাড়িয়াছে। স্কুলের ছাত্রীদের সংখ্যাও ১৬১৯ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ হিসাব। মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল বটে, কিন্তু ইহাকেই সন্তোষজনক বলা চলে না। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার আবশ্যকতা যে এদেশে আজিও অনুভূত হয় নাই, তাহার

প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া যায় যে, ছাত্রীদের শতকরা ৯৮ জন প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যন্তই লাভ করে। এমন অবস্থায় নারী-শিক্ষা এদেশে সন্তোষজনক এ কথা বলা চলে কি? এদিকে প্রধান অন্তরায় হইতেছে আমাদের দেশাচার, আমাদের সামাজিক কতকগুলি রীতি-নীতি। এদেশের যাঁহারা শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদেরও অনেকে এখনও এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, মেয়েদিগকে বাল্য বিবাহই দেওয়া উচিত, তাহাদের উচ্চশিক্ষার কোন আবশ্যকতা নাই, শুধু চিঠিপত্র লেখা এবং বাজারের হিসাব রাখার মত লেখাপড়াটুকু তাহাদের জানা থাকিলেই হইল। আমরা এমন যুক্তির সমর্থন করিতে পারি না। উচ্চশিক্ষা যদি ছেলেদের পক্ষে কল্যাণকর হয়, তবে মেয়েদের পক্ষেও উহা সমান কল্যাণকর হইবে। বিদ্যাচর্চ্চার ফল কাহারও পক্ষেই খারাপ হইতে পারে না—শিক্ষার প্রসার হইলে সমাজের তাহাতে উন্নতি হইবেই, সে শিক্ষা শুধু পুরুষদের মধ্যে প্রচার হইলেই চলিবে না—কারণ সমাজের অর্দ্ধাংশই নারী, ইঁহাদিগকে অশিক্ষিতা রাখিয়া আমরা কিছুতেই জাতি হিসাবে জাগিয়া উঠিতে পারিব না—উচ্চশিক্ষার পথের অন্তরায় পুরুষদের পক্ষেও থাকা যেমন উচিত নহে, জাতীয় উন্নতির দিকে চাহিয়া মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পথের বাধাগুলিও তেমনই দূর করা কর্ত্তব্য।

—স্বরাজ

শিক্ষা

অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলা দেশ শিক্ষায় কিরূপ পশ্চাৎপদ তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। আমেরিকায়, ইংলণ্ডে, সুইডেনে ও সুইটজারল্যাণ্ডে শতকরা ৯৯ জন শিক্ষিত, অষ্ট্রিয়ায় ৯১, হল্যাণ্ডে ৯০, বেলজিয়ামে ৮০, আয়লর্ণ্ডে ৭১, ইটালীতে ৫৬, রুশিয়ায় ২৫ জন শিক্ষিত। বাংলা দেশে মাত্র শতকরা ১০ জন শিক্ষিত। অর্থাৎ ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ১০ জন বাঙ্গালী কম-বেশী লেখাপড়া জানে। বাংলায় শত-করা ১৬ জন হিন্দু শিক্ষিত কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৬ জন। হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ২৭ জন পুরুষ এবং ৩।০ জন নারী শিক্ষিত; কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ১০ জন পুরুষ ও অর্দ্ধজন নারী লেখাপড়া জানে। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৬ জন, মুসলমানের সংখ্যা শতকরা কিঞ্চিদধিক এক জন।

—আনন্দ বাজার পত্রিকা।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। আগে বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে কতকগুলি পুস্তক ঠিক করা থাকিত। সেই পুস্তক হইতেই প্রশ্ন করা হইত। আজকাল ইংরেজী, বাঙলার কোনো নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক নাই। সম্প্রতি সিনেট সভা স্থির করিয়াছেন যে, কিছু পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট পুস্তক পড়াইতে হইবে এবং সেই পুস্তক হইতে কতকগুলি প্রশ্ন করা হইবে। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, ম্যাট্রিকুলেশনের মধ্যে ছাত্রেরা যাহাতে শুদ্ধ করিয়া সহজ ইংরেজী লিখিতে পারে এবং সহজ ইংরেজী ভাষায় যাহাতে সকল বিষয়ই বুঝিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

— হিন্দুস্থান

মনুষ্যত্ব

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীটের বাবু গোপীকৃষ্ণ বসু জাতীয় শিক্ষা-পরিষদকে ৯৬০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের প্রাথমিক বিভাগের একজন দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে উহার সুদ হইতে একটী মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

— ঢাকা প্রকাশ

বিজ্ঞান

ইংলণ্ডে ব্রিটীশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনী উপলক্ষে একটী বিরামহীন রেলগাড়ী স্থাপিত হইবে। এই গাড়ীখানা কোথায়ও থামিবে না; কেবল যেখানে যাত্রীরা নামিতে ইচ্ছা করে, সেখানে গাড়ীর গতি কমাইয়া দেওয়া হইবে। এই গাড়ী দ্বারা প্রত্যহ প্রতি ঘণ্টায় ২০ হাজার লোক সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে যাতায়াত করিতে পারিবে।

—আনন্দ বাজার পত্রিকা

সুইটজারল্যাণ্ডের জনৈক বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি এক প্রকার টাইপ রাইটার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। উহাতে হাত লাগাইবার কোন আবশ্যক হইবে না। একজন কথা বলিয়া গেলেই ঐ যন্ত্রে কথাগুলি টাইপ হইয়া যাইবে। যন্ত্রটি পেটেণ্ট করিবার জন্য উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক আবেদন করিয়াছেন।

—ট্রিবিউন

বিবিধ

জনৈক হিন্দু ক্রোড়পতি, ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিক মিঃ আসানদীন জেনেভায় মণ্ট স্যালিভিতে একটী মানমন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৮৭৫০০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই মান মন্দিরটী পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় মন্দির হইবে। ইহা ফরাসী জাতীকে প্রদত্ত হইবে। ঐ টাকাকড়ি যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে ব্যয় হইবে। স্যালিভি শিখরটী ৪৪৩০ ফিট উচ্চ চারিদিকে খোলা পরিষ্কার দৃষ্টি চলে, বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময়ই আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে। উড়ো জাহাজ প্রত্যহ এখানে চলাচল করিবে। বেতার বার্ত্তা গৃহও নির্ম্মিত হইবে। সেখানে পৃথিবীর সর্ব্বস্থান হইতে আবহাওয়ার সংবাদ আদান প্রদান করা চলিবে। বিশেষ যন্ত্রটী হইবে ১০৫ ইঞ্চি ব্যাসের একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র—মার্কিনের মাউণ্ট উইলসনস্থ দূরবীক্ষণাপেক্ষা ৫ ইঞ্চ মোটা। আরও ২০—৬০ ইঞ্চির ব্যাসের দূরবীক্ষণ থাকিবে।

—বন্দেমাতরম

ভারত হইতে কত রকমে যে বিদেশীরা টাকা লুটিয়া লইয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একমাত্র বিদেশী বীমাকোম্পানীগুলি কত টাকা এদেশ হইতে লইয়া যায় তাহার হিসাব দেখুন—১৯২০ খৃঃ অব্দে নর্থ ব্রিটিশ মার্কেণ্টাইল্ কোম্পানী ফিনিক্স কোম্পানী এবং রয়েল একচেঞ্জ কোম্পানী এই তিনটী কোম্পানী ভারতে মোট ২৭৪৩৭৭০৲ টাকা লাভ করিয়াছিল এবং এই বৎসরে এই তিনটী কোম্পানীতে ভারতবাসী মোট ৫৮৯৮৭৬৫০৲ টাকা বীমা করিয়াছে। ১৯২১-২২ খৃঃ অব্দের হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতে মোট ৫০টী বিদেশী কোম্পানী কারবার চালাইতেছে। তিনটী কোম্পানী ১৯২০ খৃঃ অব্দের দুর্ম্মূল্যের দিনে এত টাকা লাভ করিলে ১৯২১-২২ খৃঃ অব্দে ৫০টী কোম্পানী কত টাকা লাভ করিতে পারে?

—আনন্দ বাজার পত্রিকা

কলিকাতার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে সম্প্রতি এক অদ্ভুত নর-রাক্ষস আসিয়াছে। লোকটী দন্ত ও অঙ্গুলির সাহায্যে ছাগল ও মোরগ হত্যা করিয়া তাহার রক্ত-শোষণ করিতে ও কাঁচা মাংস খাইতে পারে। সে একদিন একটা ছাগলের চারি সের ওজনের রাণ দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া কেবল অস্থিখণ্ড বাদে সমস্তটাই অপক্কাবস্থায় ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছিল। উহার পর একটা জীবন্ত মোরগের কণ্ঠনালী দন্তাঘাতে ছিঁড়িয়া রক্ত শোষণ পূর্ব্বক অস্থিসমেত সমস্ত মোরগটি উদরসাৎ করিয়াছিল। লোকটি জাতিতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ; বয়স ২২।২৩ বৎসর। তাহার দেহ আদৌ শক্তিশালী বা মোটা নহে। সে পূর্ব্বে আগরতলা মহারাজের নিকট অবস্থান করিত। সে কলিকাতায় আসিয়া একদিন গভর্ণর লর্ড লিটনের সম্মুখে একটা জীবন্ত ছাগলের কণ্ঠনালী ছিন্ন ও রক্তপান করিয়া সমস্ত ছাগটি খাইয়া ফেলিয়াছিল।

—সোলতান

চিঠি পত্র

অশ্বিনীকুমার দত্ত স্মৃতি ভাণ্ডার

আবেদন

মহাপ্রাণ জননায়ক স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতি স্থায়ীভাবে রক্ষাকল্পে কতিপয় উপযুক্ত লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণার্থ জন্য সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশিমবাজারের মহারাজা, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, যতীশ রঞ্জন দাশ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সার কৈলাশচন্দ্র বসু, সার নীলরতন সরকার, ময়মনসিংহের মহারাজা, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়, অখিলচন্দ্র দত্ত, কামিনীকুমার চন্দ, কিশোরীমোহন চৌধুরী, রাজা রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, মাননীয় মৌলভী এ, কে, ফজলল হক প্রমুখ জাতি ধর্ম্ম সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে বঙ্গীয় নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী ও প্রধানগণকে লইয়া একটি স্মৃতি সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, আবশ্যক ও উপযুক্ত পরিমাণে অর্থসংগৃহীত হইলে (১) কালীঘাটে তাঁহার চিতাস্থানের উপরে একটী বিশ্রামাগার (২) তাঁহার জন্মভূমি ও কর্ম্মকেন্দ্র বরিশালে একটি টাউনহল (৩) বঙ্গের দুঃস্থ ও যোগ্য ছাত্রগণের সাহায্যার্থ একটি ছাত্রভাণ্ডার এবং (৪) একটি অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

এই মহদুদ্দেশ্য সাধনার্থ আমরা সাগ্রহে দেশবাসী ভ্রাতা ভগিনী-গণের নিকটে তাঁহাদের সাধ্যানুযায়ী অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। বলা বাহুল্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যিনি যাহা দিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত ও যথাকালে বিজ্ঞাপিত হইবে। পত্রাদি সম্পাদকের নামে (শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী, ৪১ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।) প্রেরিতব্য।

(স্বাক্ষর) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতি, অশ্বিনীকুমার স্মৃতি সমিতি।

(৯২, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা)

" মদনমোহন মালব্য
" লাজপত রায়
" মতিলাল নেহেরু
" সরোজিনী নাইডু
" ডি, জে, প্যাটেল
" এন, সি, কেলকার
" আজমল খাঁ

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



ভিখারী

ভারতী

৪৭শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৩০ { একাদশ সংখ্যা

মহাত্মা গান্ধি



কবি সত্যেন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, —

ক্লপণের বেশে কে ও কৃশ তনু—কৃশানু পুণ্য ছবি,—
জগতের যাগে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি !
কৌঁসুলি-কুলি করে কোলাকুলি কার সে পতাকা ঘেরি,—
কার মৃদু বাণী ছাপাইয়া ওঠে গর্ব্বী গোরার ভেরী !

* * *

আত্মার বলে কে পশু-বলের মগজে ডাকায় ঝিঁ ঝি,
কে রে ও খর্ব্ব সর্ব্বপূজ্য—'গান্ধিজী,' 'গান্ধিজী' !

ছয় বৎসরের কারাবাস-দণ্ড মাথায় লইয়া দেশগুরু মহাত্মা গান্ধজী জারবেদা জেলে বাস করিতেছিলেন, এখনও দণ্ড-কালের দুই বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

জেলে তিনি আনন্দেই বাস করিতেছিলেন,—দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনা সুখেষুবিগতস্পৃহ ! এই কারাদণ্ড তিনি মাথায় পাতিয়া লইয়াছিলেন ; এবং দেশের লোকে যখন তাঁর মুক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছিল, তখনও তিনি সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া জেলের মধ্যে দেশের ধ্যানে তন্ময় ছিলেন।

সম্প্রতি জেলে তাঁর কঠিন পীড়া হয়। এই পীড়ার যাতনা মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার চিত্তকে ম্লান বা কাতর করিতে পারে নাই—শরীরের অস্বাচ্ছন্দ্য ও অসুস্থতার মাঝেও মন তেমনি দৃঢ়তার অটল বর্ম্মে আবৃত ছিল। গবর্ণমেণ্ট

তাঁর পীড়ার জন্য তাঁর কারাভোগের বাকী সময় মাপ করিয়া সম্প্রতি তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে মৌলানা আলি মহোদয়কে মহাত্মা লিখিয়াছেন,—"এ মুক্তিলাভের জন্য আমি দুঃখিত! যেহেতু আমি মনে করি, বন্দীর পীড়া তাহার মুক্তির কারণ হইতে পারে না।" এ মুক্তি সম্পূর্ণ বিনাসর্ত্তেই দেওয়া হইয়াছে।

দীর্ঘকাল কারাগৃহের দুঃসহ নিঃসঙ্গতার মধ্যে বসিয়া তিনি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,… "জাতিতে জাতিতে মিলন-ঐক্য, চরকার প্রতি নিষ্ঠা ও অনুরাগ, অস্পৃশ্য জাতিকে বুকে লওয়া এবং স্বরাজ-লাভের উপায় ও স্বরূপ চিন্তা, কথায়-কাজে অহিংসা, এগুলির উপর আমার বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছে।"…এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলিয়াছেন,…"ইংরাজকে আমরা বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে চাই—তাঁহাদের সহিত বিরুদ্ধতা করিয়া তাঁহাদিগকে ভুল বুঝিতে চাহি না। আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যে বিরোধে ব্যাপৃত আছি, তাহা শাসন-প্রথা ও শাসন-প্রণালী লইয়াই; ব্যক্তিগত ভাবে ইংরাজ জাতির সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই। এই কথাটি সব সময় আমরা মনে রাখিতে পারি নাই বলিয়া বাঞ্ছিত-লাভেও আমাদের অন্তরায় ঘটিতেছে এবং অক্ষমতায় পীড়িত হইয়াছি।"

জাতি-গঠনের মূলে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ব্যাপারটিকেই মহাত্মা প্রথম স্থান দিয়াছেন। ঘরের মধ্যে দারুণ অবজ্ঞা ও ঘৃণা লইয়া ঘরের লোককে খেদাইয়া দূর করিয়া নেশন গড়িব, এত বড় উদ্ভট হাস্যকর ব্যাপার আর নাই। দেশের লোক তাঁহাকে যত সম্মানই করুক, এই মন্ত্রটি যথার্থই সকলে ইষ্টমন্ত্রের মত গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন কি? অথচ ইহার সঙ্গেই তাঁর রাজনীতি জড়িত, অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত। এই একটি ব্যাপারে সমাজ একেবারে সব আবর্জ্জনা দূর করিয়া এক বিরাট সত্তায় জাগিয়া উঠিবে—এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই মন্ত্রে অন্তর ভরাইয়া দেশের লোক মহাত্মাকে আজ এ শুভদিনে প্রাণের অভিনন্দন জ্ঞাপন করুন, তবেই এ মুক্তি তাঁর প্রাণে আনন্দ জাগাইবে—নচেৎ দিনে পথে কীর্ত্তন গাহিয়া ও রাত্রে বাড়ীতে আলোর মালা সাজাইয়াও ফল নাই! তাঁর কার্য্য-ব্যবস্থায় আছে, মদ্যপান ছাড়িয়া দাও, আহারে-বিহারে সংযম-সাধনা কর, বিলাস বর্জ্জন কর, কাপাসের চাষ কর, চরকা ও তাঁত চালাও, সঙ্ঘবদ্ধ হও! এ ব্যবস্থার উপযোগিতা আজও যদি গলাবাজি ও কলমবাজি করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা চলে, তাহা হইলে মহাত্মার এ দুঃসহ তপশ্চর্য্যা বৃথাই হইবে!

যাহার পরশে খুলে গেছে যত নিদ-মহলের খিল,
পূরা হয়ে গেছে যার আগমনে তিরিশকোটির দিল—

আজ আবার তিনি কারার বাহিরে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—বহু সময় কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া আমরা যে বিমূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিতাম, ঠিক পথ বাছিয়া লইতে না পারিয়া বিপথেই হয়তো আগাইয়া পড়িতাম, সে ভয় আজ ঘুচিয়াছে! দেশের এ সন্ধিক্ষণে তাঁহার সান্নিধ্য আমাদিগের দেহে-মনে প্রতিক্ষণে যে শক্তি সঞ্চার করিবে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সে শক্তির সার্থক সাধনা যেন আমরা করিতে পারি! তাঁর বিরাট হৃদয়-তলে দাঁড়াইয়া তাঁর নির্দ্দেশমত দেশের কাজে সব শক্তি আমরা যেন নিয়োজিত করি,—আর দ্বিধা নয়, ভয় নয়, বিরোধ নয়,—ভারতের প্রাঙ্গণে বিরাট ভারতীয় জাতির প্রতিষ্ঠা কিছুতেই অসম্ভব হইবে না! তাঁর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া সাধনা করিলে স্বরাজ যে আমরা লাভ করিবই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই আজ সব ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা মাগিয়া এ সন্ধিক্ষণে তাঁকে অভিনন্দন করি,

এস দুর্জ্জয় শক্তি-সম্পদ মুক্তবন্ধসমাজ হে
এস জ্ঞানী এস কর্ম্মী নাশ ভারত-লাজ হে,—
এস মঙ্গল, এস গৌরব, এস অক্ষয় পুণ্য-সৌরভ,
এস তেজঃ-সূর্য্য উজ্জ্বল কান্তি অম্বর মাঝ হে!
বীর ধর্ম্মে পুণ্য কর্ম্মে বিশ্ব-হৃদয়রাজ হে—
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
জয় জয় নরোত্তম পুরুষ-সত্তম জয় তপস্বী-রাজ হে।



মহাত্মা গান্ধি

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

কালাপাহাড়

শুনিছ না—ওই দিকে দিকে কাঁদে রক্ত-পিশাচ প্রেতের দল!
শবভুক্ যত নিশাচর করে জগৎ জুড়িয়া কী কোলাহল!
দূর-মশালের তপ্ত-নিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগন-শিলা!
ধরণীর বুক থরথরি' কাঁপে—একি তাণ্ডব নৃত্য-লীলা!
এতদিন পরে উদিল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার?—
মানুষের পাপ করিবে মোচন, দেবতারে হানি' ভীম প্রহার,
—কালাপাহাড়!

কতকাল পরে আজ নর-দেহে শোণিতে ধ্বনিছে আগুন-গান!
এতদিন শুধু লাল হ'ল বেদী—আজ তার শিখা ধূমায়মান!
আদি হ'তে যত বেদনা জমেছে—বঞ্চনাহত ব্যর্থশ্বাস—
ওই উঠে তারি প্রলয়-ঝটিকা, ঘোর-গর্জ্জন মহোচ্ছ্বাস!
ভয় পায় ভয়!—ভগবান ভাগে!—প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড়!
ওই আসে!—তার বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা, কাড়া-নাকাড়!
—কালাপাহাড়!

বংশ যাহার বলি যোগাইল যূপে, যুগে-যুগে, ভয়-বিহ্বল—
জাগিয়াছে তারি বীর-সন্তান হুঙ্কারে ভরি' জলস্থল!
পথে পথে ওই গিরি নুয়ে যায়, কটাক্ষে রবি অস্তমান!
খড়্গ তাহার থির-বিদ্যুৎ!—ধূলি-ধ্বজা তার মেঘ-সমান!
সেই আসে ওই!—বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা, কাড়া নাকাড়!
এতদিন পরে উদিল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার!
—কালাপাহাড়!

কোটী-আঁখি-ঝরা অশ্রু-নির্ঝর ঝরিল চরণ-পাষাণ-মূলে,
ক্ষয় হ'ল শুধু শিলা-চত্বর—অন্ধের আঁখি গেল না খুলে!
জীবের চেতনা জড়ে বিলাইয়া আঁধারিল কত শুক্ল নিশা!
রক্ত-লোলুপ লোল-রসনায় দানিল নিজেরি অমৃত-তৃষা!
আজ তারি শেষ!—মোহ অবসান!—দেবতা-দমন যুগাবতার
আসে ওই! তার বাজে দুন্দুভি,—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়
—কালাপাহাড়!

পাষাণ-পুরীর খিল খুলে' যায়, দূর হ'তে শুন' হুহুঙ্কার!
পূজাবেদী-মূলে হেম-তৈজস ঝঙ্কার করে আশঙ্কার!
বেগে বাহিরায় লৌহ-কীলক বিরাট দেউল-কপাট-পাটে!
আঁধার-গহ্বরে জাগে হাহাকার, বিগ্রহ-শিলা আপনি ফাটে!
পূজারী-পাণ্ডা ঝাণ্ডা নামায়ে প্রাঙ্গণ-তলে খায় আছাড়!
ওই আসে—ওই! বাজায়ে দামামা, ভীম-নির্ঘোষ কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড়!

বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা—বাজে কি ভীষণ কাড়া-নাকাড়!
অগ্নি-পতাকা উড়িছে ঈশানে, দুলিছে তাহাতে উল্কা-হার!
অসির ফলকে অশনি ঝলকে!—গলে' যায় যত ত্রিশূল-চূড়া!
ভৈরব রবে মূর্চ্ছিত ধরা, আকাশের ছাদ হয় বা গুঁড়া!
পূজারী অথির, দেবতা বধির—ঘণ্টার রোলে জাগেনা আর!
অরাতির দাপে আরতি ফুরায়!—নাম শুনে হয় বুক অসাড়!
—কালাপাহাড়!

অকাল-জলদ-উদয় যেন সে উদিয়াছে কাল!—কালাপাহাড়!
ডাকিনীরা ওই দলে দলে চলে, গলে দোলে নর-কপাল-হাড়!
রক্ত-শোষণ পাপ-বিভীষিকা, প্রাণ-শিহরণ মন্ত্র-গান—
আঁখি মুদি' ভয়ে জপ অনিবার, অন্ধ-আরতি প্রদীপ-দান—
ঘুচাইতে আসে মহাভয়হারী দেবারি-মানব যুগাবতার—
ঘুচাবে কান্নার ছায়া-শৃঙ্খল, চূর্ণ করিবে পাষাণ-ভার!
—কালাপাহাড়!

নিজ হাতে প'রি' শিকলি দু'পায়, দুর্ব্বল করে যাহারে নতি,
হাত জোড় করি' যাচনা যাহারে, আজ হের তার কি দুর্গতি!
কোথায় পিনাক? ডমরু কোথায়? কোথায় চক্র-সুদর্শন!
মানুষের কাছে বরাভয় মাগে মন্দির-বাসী অমরগণ!
ছাড়ি' লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার!
ভয়ঙ্করের ভুল ভেঙ্গে যায়! বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড়!

কল্প-কালের কল্পনা যত, শিশু-মানবের নরক-ভয়—
নিবারণ করি' উদিল আজিকে দৈত্য-দানব-পুরঞ্জয়!
দেহের দেউলে দেবতা নিবসে—তার অপমান দুর্ব্বিষহ!
অন্তরে হ'ল বাহিরের দাস মানুষের পিতা প্রপিতামহ!
স্তম্ভিত হৃদ্‌পিণ্ডের 'পরে তুলেছে অচল পাষাণ-ভার—
সহিবে কি সেই নিদারুণ গ্লানি মানব-সিংহ যুগাবতার
—কালাপাহাড়!

ব্রাহ্মণ-যুবা যবনে মিলেছে—পবন মিলেছে বহ্নি সাথে!
এ কোন্ বিধাতা বজ্র ধরেছে নবসৃষ্টির প্রলয়-রাতে!
মরুর মর্ম্ম বিদারি' বহিছে সুধার উৎস পিপাসাহরা!—
কল্লোলে তার বন্যার রোল! কূল ভেঙে বুঝি ভাসায় ধরা!
ওরে ভয় নাই, মুকুটে তাহার নবারুণ-ছটা, ময়ূ্‌খ-হার!
কাল-নিশীথিনী লুকায় বসনে!—সবে দিল তাই নাম তাহার
—কালাপাহাড়!

ভেঙে ফেল মঠ-মন্দির-চূড়া, দারু-শিলা কর নিমজ্জন!
বলি-উপচার ধূপ-দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জ্জন!
নাই ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ যবন, নাই ভগবান—ভক্ত নাই!
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে! মানুষের বুকে রক্ত চাই!
ছাড়ি' লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার!
ভয়ঙ্করের ভয় ভেঙে যায়!—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড়!

শুনিছ না ওই!—দিকে দিকে কাঁদে রক্ত-পিশাচ প্রেতের পাল!
দূর-মশালের তপ্ত-নিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগন-ভাল!
কার পথে-পথে গিরি নুয়ে যায়! কটাক্ষে রবি অস্তমান!
খড়্গ কাহার থির-বিদ্যুৎ!—ধূলি-ধ্বজা কার মেঘ-সমান!
ভয় পায় ভয়! ভগবান ভাগে! প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড়!
ওই আসে! ওই বাজে দুন্দুভি!—বাজায় দামামা,কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড়!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

বাব্‌লা

১৭

জ্বর শিয়রে বাব্‌লা গুম্ হইয়া বসিয়া ছিল। আর-একটু রাত্রি হইলে ভগবতী আসিয়া ডাকিলেন,—বৌমা...

লেপের মধ্য হইতে শৈল সাড়া দিল, উঁ!

ভগবতী তার মাথায় কপালে গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন,—জ্বরটা বড্ড হয়েছে যে বৌমা। কৈলেসকে বলি, ডাক্তার ডেকে আনুক!

শৈল বলিল,—ডাক্তারের দরকার নেই। আমার এ বাতিকের জ্বর, মা। তারপর শৈল চোখ চাহিয়া দেখে, শিয়রে বাব্‌লা ম্লান মুখে বসিয়া আছে। শৈল বলিল,—বসে কেন বাবা?

বাবলা কাঁদিয়া ফেলিল। ভগবতী তাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—ছি, কাঁদছো কেন? শুধু-শুধু

বাবলা কাঁদিয়া বলিল,—মার অসুখ করেছে।

হাসিয়া শৈল বলিল,—দূর পাগল ছেলে, অসুখ হয়েছে, সেরে যাবে, তার জন্যে কাঁদে কি!...তুমি যাও বাবা, ইস্কুলের পড়া আছে, পড়ে নাও গে।

বাবলা বলিল,—আমি পড়বো না মা, তোমার অসুখ না সারলে ইস্কুলেও আমি যাব না।

ভগবতী তাকে বুকের মধ্যে টানিয়া বলিলেন,—যেয়ো না ইস্কুলে। এখন খাবে এসো দিকি।

বাবলা সে রাত্রে কিছুই খাইল না। ভগবতী তাকে আদর করিয়া খাওয়াইয়া দিতে গেলেন, বাবলা দুই-এক গাল মুখে পুরিয়া সেটা তুলিয়া ফেলিল। তারপর এক ঢোক জল খাইয়া সে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—

ভগবতী তার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন,—এ না খাও,—বেশ, থাক্—দুধটুকু খাও দাদা...

বাবলা মুখ অত্যন্ত কাতর করিয়া বলিল,—খেতে পারবো না কিছু, ঠাকুমা।

বাবলা ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। ভগবতী বলিলেন,—আচ্ছা, আঁচাবে চল।...একটু পরে ঠাণ্ডা হয়ে দুধ খেয়ো'খন।

কোনমতে মুখ-হাত ধুইয়া বাব্লা গিয়া নিঃশব্দে বিছানায় ঢুকিল; ঢুকিয়া মার কাছে বসিল, বসিয়া মার মুখে হাত বুলাইতে লাগিল। শৈল বলিল,—বসে কেন রে! শুয়ে ঘুমো বাবলা...

—না মা, ঘুমুবো'না। ঘুম পায়নি আমার। বলিয়া বাবলা মার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

ভগবতী আসিয়া বলিলেন,—ও তো মুখে কিছু দিলে না বৌমা! কিছু দেওয়াতে পারলুম না। একটু দুধ অবধি না...

শৈল বলিল,—খেলে না কেন বাবা?

বাবলা কাতর মুখে বলিল,—খিদে নেই মা আমার,—সত্যি বলছি।

শৈল হাসিয়া বলিল,—বদ্ধ পাগল! আমার একটু অসুখ হয়েছে বলে তোর খিদে চলে গেল!

মার স্বরে এই বিদ্রূপের আভাষ পাইয়া বাবলার ছোট্ট প্রাণটুকু একেবারে আর্ত্ত আকুল হইয়া উঠিল। এ কি বিদ্রূপের ব্যাপার! তার একমাত্র আশ্রয়, তার এক, তার সর্ব্বস্ব মা রোগে এমনি কাতর যে উঠিবার শক্তি নাই, এ দেখিয়া তার প্রাণটা যে কি বেদনায় মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িয়াছে, মা তার কিছুই বুঝিতেছে না! এখন কি তার নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আহার করিবার কথা! না, আহার সে করিতে পারে! মার কাছে কাছে থাকিয়া কি করিয়া মার এ অসুখ সে সারাইতে পারিবে, এই চিন্তাই যে তার সমস্ত শরীর-মন ছাইয়া ফেলিয়াছে! মার হাসি, মার কথা,—তাহাতে সে যে কি শক্তি

এটুকুর মধ্যে পড়ায় তার অনুরাগ যে শতগুণ বাড়িয়া ওঠে! নূতন নূতন পড়ার মধ্য দিয়া সে কেমন জ্ঞান-ভাণ্ডারের দিকে নূতন নূতন পথ গড়িয়া সে-পথে অনায়াসে চলিয়া যায়, গতি তার কোথাও নিমেষের জন্য বাধে না, কারণ মা যে অতি আগ্রহে তার পড়া শুনিতেছে!—এ কি সম্ভব হইত, মা যদি তার পাশটিতে থাকিয়া তার সঙ্গে সঙ্গে এমনি করিয়া সে-পথে না চলিত! মা পাশে না থাকিলে তার খেলা-ধূলাও যেমন প্রাণ হারাইয়া থমকিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, পড়ার বেলাও যে ঠিক তেমনিই হয়!

মার পা টিপিতে টিপিতে বাবলার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল, একটা দীর্ঘ প্রান্তর...সে প্রান্তরে কোথাও একটা গাছ নাই যে ছায়া দেয়! ধু-ধু অসীম প্রান্তর! আর সে প্রান্তরে মস্ত এক বোঝা কাঁধে তুলিয়া সে চলিয়াছে, একা! পা দুইটা শ্রান্তিতে ভরিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে, মাথার উপর প্রচণ্ড রৌদ্র...এ দীর্ঘ প্রান্তরে তার ক্লান্ত হাতটি ধরিয়া তাহাকে সঙ্গ বা সাহায্য দান করিতে মা তার পাশে নাই, কেহ নাই...একা সে এ বোঝা বহিয়া এ প্রান্তর কি পার হইতে পারে! পদে পদে হুঁচট খাইয়া পা তার ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতেছে, শরীরও বহে না...এ কি ক্লান্তি, এ কি বেদনা! বুঝি, সে এখনি মাটীতে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইবে!

বাবলার প্রাণ হাঁপাইয়া বুকটা হু-হু করিয়া উঠিল। সে মার পা দুইটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া সেই পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। এই তার আশ্রয়, একমাত্র আশ্রয়... এই পায়ের পরশ তার দিনের ক্লান্তি এক-নিমেষে মুছিয়া তাকে সবল সুস্থ করিয়া তোলে! এ পরশটুকু যদি তার ঘুচিয়া যায়? কম্পিত বুকে বাবলা মার পা দুইটা আরো জোরে আঁকড়াইয়া ধরিল। এক অজানা ভয়ে শিহরিয়া তার মন থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল।

শৈল পা নাড়িয়া পাশ ফিরিতেই পায়ের তলায় বাবলাকে অনুভব করিল। কষ্টে উঠিয়া বাবলার মুখে চুমা খাইয়া বলিয়া উঠিল,—ষাট, ষাট! ও কি হচ্ছে রে পাগল! ছি,

মার এ আদরের কথায় বাবলার প্রাণের রুদ্ধ আবেগ নাড়া পাইল এবং তার দুই চোখে ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। সে উঠিয়া মার মুখের উপর মুখ দিয়া পড়িল।

শৈল দুই হাতে বাবলার গলা জড়াইয়া তার মুখে চুমু দিয়া বলিল,—পাগলা, আমার পাগলা ছেলে, আমার বাবলা মাণিক...

ভগবতী সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—কৈলেস এখনো ফেরেনি, তাই তো, নালুও এলো না···এরা কেউ এলে একবার নয় ডাক্তারের বাড়ী যেত!

শৈল বলিল,—কেন ব্যস্ত হচ্ছ মা! কাল যদি অসুখ থাকে তো ডাক্তার আনিয়ো! তারপর একটু থামিয়া বলিল,—যমের অরুচি মা, কোন ভয় নেই! দেখো, কাল সকালে দিব্যি সেরে উঠবো!

ভগবতী শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—বালাই, ও কথা বলতে আছে! তোমায় এখন এই গুঁড়োটুকুকে বড় করে তুলতে হবে যে মা। ও-সব কথা মনের কোণেও আনতে নেই। ছি! তোমার ওপর কত বড় ভার যে চাপিয়ে গেছে! ভগবতীর চোখ পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া ছল-ছলিয়া উঠিল।

শৈল বলিল,—গুঁড়োর জন্যে ভাবনা করিনে মা, সত্যি বলছি। আর ও যে-আশ্রয় পেয়েছে···ভগবান এর বাড়া আশ্রয় মানুষকে আর কি দেবেন!

ভগবতী বলিলেন,—বটে, আমি যক্ষি-বুড়ী হয়ে চিরদিন ওদের আগলে বসে থাকবো, আর তোমরা হাসতে হাসতে সরে পড়বে! বয়ে গেছে আমার আগলাতে। এমন না হলে আর আত্তি গো...বয়ে গেছে আমার সব দেখতে। যা দেখেচি তা খুব হয়েছে, হাড়ে হাড়ে গাঁথা আছে আমার। আমায় আর কেন টানিস তোরা, বাছা! এখন তোর হাতে সব গছিয়ে দিছি···নালু, বাবলা, এ দুটীই তোমার, তুমিই এদের দেখবে। আমায় আর এ-সবের মধ্যে জড়াস্ নে মা—তোদের খাতা থেকে আমার নামটা কেটে দে।

শৈল কিছু বলিল না—কথা বলিতে তার কষ্ট হইতেছিল। বাবলাকে বুকে চাপিয়া সে চোখ বুজিল। মনে মনে বলিল, এখনো কি আমার সময় হয়নি? এখনো কেন ডাকছো না? একলা তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে যে গো! আমায় পাবে বলে বড় আশায় এখানে ঘর সাজিয়ে বসেছিলে... দেরী হলো বলে এমন সাজা দিয়ে চলে গেলে যে তার ক্ষমা চাইবারও অবসর দিলে না!···আর কেন, ক্ষমা কর, আমায় ডেকে নাও···তুমি বেশ থাকতে পারো তো আমায় ছেড়ে, কিন্তু আমি যে পারি না আর!···আমার কষ্ট কোনদিন তুমি সইতে পারতে না তো···আজ তবে কি করে সইছ!···তোমার বাবলা? তার জন্যে কিছু ভাবি না···সে যে-আশ্রয় পেয়েছে, এ আমার ধারণার অতীত! তবে? তবে কেন আজো এখানে ফেলে রেখেছ?...তুমি ছাড়া এখানে যে আমার কিছুই ভালো লাগে না!

এমনি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে শৈলর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল,—গাল বহিয়া সে জল গড়াইয়া পড়িল, বাঁধন-হারা মুক্ত নির্ঝরের মত! ঘুমে ঢুলিয়া বাবলার মাথা ওদিকে শৈলর হাতের কাছে গড়াইয়া পড়িল। শৈলর চমক ভাঙ্গিল। সে বাবলাকে টানিয়া বুকের উপর তুলিয়া তার মুখখানির পানে চাহিল; সে মুখের ম্লানিমা তখনো কাটে নাই, চোখের কোলে জলের রেখায় কালো কালো দাগ কে আঁকিয়া রাখিয়াছে! থাকিয়া থাকিয়া বাবলার বুক তখনো কাঁপিয়া উঠিতেছিল! শৈল তার মুখে চুমার পর চুমা বর্ষণ করিয়া বাবলাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—না, না, কোথায় যাব! আমি যাবো না, যেতে পারবো না···এমনি করে কেঁদে কোথায় বাছা আমার এসে আশ্রয় নেবে...কেঁদে যে ও পাগল হয়ে যাবে! আমি যাব না, যাব না, আমার যাওয়া হবে না!

১৮

পরদিন সকালে শৈলর জ্বর কমিল না, গায়ে অসহ্য বেদনা দেখা দিল। নড়িতে পাশ ফিরিতে বেদনা লাগে।

দুর্ভাবনায় ভগবতীর রক্ত হিম হইয়া গেল। পাড়ায়

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—অসুখ বেশী। বসন্ত হতে পারে।

ভগবতীর চোখের সামনে আতঙ্কের কতকগুলা কালো ছায়া এক মুহূর্ত্তে নাচিয়া ঘুরিয়া তাঁর দৃষ্টিকে ঝাপসা করিয়া দিল। তিনি বলিলেন,—ওকে বাঁচাও—আহা, ঐ বাচ্ছা ছেলেটাকে নিয়ে ও মুখ গুঁজে পড়ে আছে সংসারে। ছেলেটারও আর কেউ নেই।

ডাক্তার বলিলেন,—আমার যথাসাধ্য আমি করবো। তবে ছেলেপিলেদের এঁর কাছে আসতে দেবেন না।

বাবলা মার বিছানায় এক প্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, মার মুখের পানে চাহিয়া। তার মুখে-চোখে এমনি বেদনা মাখা ছিল যে তার পানে চাহিতে ভগবতীর প্রাণটা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। এই ছেলেকে মার পাশ হইতে টানিয়া হিঁচড়াইয়া তাকে আলাদা রাখিতে হইবে, তাকে মার কাছে আসিতেও দেওয়া হইবে না! প্রাণ তার মার জন্য ছিঁড়িয়া গেলেও না!...এত বড় কঠিন কথা বাবলাকে বলিবে কে? তাঁর প্রাণটা বেদনায় গলিয়া গেল।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ভগবতী বাবলাকে বুকের কাছে টানিয়া বলিলেন,—তুমি এসো দাদা, পড়াশুনো করে নাও, ইস্কুলে যেতে হবে যে...

বাবলা বলিল,—আমি ইস্কুলে যাব না।

ভগবতী বলিলেন,—ইস্কুলে যাবে না কি! সব ছেলেরা পড়ায় কত এগিয়ে যাবে, আর তুমি তাদের পেছনে পড়বে! সবাই নিন্দে করবে না?

বাবলা বলিল,—করুক নিন্দে! আমি ইস্কুলে আর কখখনো যাব না।

ভগবতী বিস্ফারিত নেত্রে বাবলার পানে চাহিয়া বলিলেন,—ইস্কুলের ওপর রাগ হলো না কি?

বাবলা বলিল,—আমি মাকে ছেড়ে ইস্কুলে যেতে পারবো না ঠাকুমা...

বাবলার দুই চোখে আবার বাণ ডাকিল। ভগবতী বলিলেন,—দিন-রাত মার কাছে থাকলে মার অসুখ সারবে কেন, গোপাল? ডাক্তার-বাবু বলে গেলেন, এ ঘরে কেউ সারবে—নাহলে অন্য লোকের নিশ্বেস লাগলে মার অসুখ সারতে দেরী হবে...

বাবলা বলিল,—বলুক গে ডাক্তার...

ভগবতী বলিলেন,—ছি, অবুঝ হয়ো না। তুমি নালু দু'দিন আমার কাছে থাকবে...নাহলে তোমার নিশ্বেস লাগলে মার অসুখ সারতে দেরী হবে যে সোনা...আমি কত গল্প করবো'খন।

সে কথা বাবলার কানেও গেল না। সে বলিল,—ও ছাইয়ের ডাক্তার! আমি এতটুকু ছেলে—আমার নিশ্বেস লাগলে মার অসুখ বাড়তে পারে কখনো! ও ডাক্তার কিছু জানে না...

ভগবতী বলিলেন,—তুমি যে লক্ষ্মী ছেলে ধন, কথা শোনো ত...

বাবলা বলিল,—না, আমি কথা শুনবো না।...তার পরেই একটু ঝাঁকিয়া উঠিয়া বলিল,—আমি মার কাছে থাকবো না, এই মেঝেয় মাদুর পেতে পড়ে থাকবো—তাহলে তো আর মার গায়ে আমার নিশ্বেস লাগবে না...

ভগবতী নিরুপায় হইয়া শৈলর কাছে ডাক্তারের কথা খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য শৈলর নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া গেল। বাবলাকে না দেখিয়া সেই বা থাকিবে কি করিয়া! কিন্তু না, বসন্তই যদি হয় তার, তাহা হইলে বাবলার কল্যাণের জন্যই যে তাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে হইবে!

শৈল বলিল,—আচ্ছা, আমি ওকে বুঝিয়ে বলছি...

কিন্তু বাবলা পণ করিয়াছিল, সে কিছুতেই কিছু বুঝিবে না! মার অসুখ হইয়াছে সত্য, কিন্তু ডাক্তার এমনি বোকা, অসুখের সময় কোথায় সকলে যার অসুখ তাকেই সারাক্ষণ ঘিরিয়া থাকিয়া তার সেবা করিবে, তা না এ ডাক্তার বলিয়া গেল, মার কাছেও কেহ যাইবে না! এই তো নালুদার সেদিন অসুখ হইয়াছিল—ঠাকুমা, মা তাকে সারাক্ষণ ঘিরিয়াই বসিয়া থাকিত,—সেও যে কত সময় তার কাছটিতে গিয়া বসিয়া কত গল্প করিত, খেলিত। তবে? তার নিজের যখন

কেহ তো তাকে ছাড়িয়া যাইত না, কাহারো নিশ্বাসে তার অসুখ বাড়েও নাই, বরং অসুখ সারিয়া গিয়াছিল! আর এ কোথাকার ডাক্তার আসিয়া আজ কি এ নূতন কথা বলিয়া গেল! বাবলা রাগিয়া উঠিয়া বলিল,—ও আবার ডাক্তার! ও কিছু জানে না! তুমি অন্য ডাক্তার আনো ঠাকুমা।

শৈল বুঝাইল, এ অসুখ অন্য রকমের। ইহাতে লোকের কাছ হইতে আলাদা থাকিতে হয় যে।

বাবলা বলিল,—অসুখ অসুখ—তার আবার এ রকম ও রকম কি! সব অসুখেই ওষুধ লাগে, যার অসুখ সে ওষুধ খায়, শুইয়া থাকে, ভাত খায় না, কাজ-কর্ম্ম করে না, এই তো! সে বরাবর সবার বেলায় তাই দেখিয়া আসিয়াছে।

শৈল বলিল,—আমার কাছে থাকলে তোমার যদি অসুখ করে তাহলে আমার কতখানি ভাবনা হবে বল দিকি! তখন এই অসুখ শুদ্ধ আমাকেই আবার তোমায় দেখা-শুনো করতে হবে তো—তাতে আমার অসুখ সারতেও পারবে না…হয়তো আমি মরেই যাব!

বাবলার বুকে এ কথা একেবারে তীক্ষ্ণ ছুরি চালাইয়া দিল। তার প্রাণটা সে আঘাতে কাটিয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। বাবলা স্থির দৃষ্টিতে মার পানে চাহিয়া রহিল। মা তার সে করুণ কাতর দৃষ্টিতে গলিয়া তাকে বুকে টানিয়া বলিলেন,—ছি বাবা, কথা শোনো, লক্ষ্মীটি! বেশ, ইস্কুলে যেতে ইচ্ছে না হয়, যেয়ো না, কিন্তু ঠাকুমার কাছে থাকোগে, ঠাকুমা কত ভালবাসেন তোমায়—নাহলে ঠাকুমার মনে যে দুঃখ হবে যাদু! আর ঐ দোরের বাইরে থেকে আমায় কেবল দেখে দেখে যাবে! কেমন?

সকলের এই একঘেয়ে নিষেধ আর উপদেশ বাবলার প্রাণটাকে তিক্ত করিয়া তুলিল। তার অন্তর এমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল যে তার মনে হইল, এ নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া সে এমন শোধ দিবে যে সে-মজা দেখিয়া সকলের তাক্ লাগিয়া যাইবে! যেমন নিশ্বাসের ভয়ে সকলে আকুল হইয়া উঠিতেছে, তেমনি সে এই নিশ্বাস লইয়া মার ছাড়িয়া এমন দূরে, এত দূরে পলাইয়া যাইবে যে তাকে আর কেহ খুঁজিয়াও পাইবে না!…

দারুণ অভিমান বুকে ধরিয়া মার পাশ ছাড়িয়া এক-পা এক-পা করিয়া সে বাহিরে দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল; দাওয়ায় একটা খুঁটী ধরিয়া বহুক্ষণ সে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—বহু উর্দ্ধে আকাশের পানে তাকাইল। আকাশে খুব উঁচুতে দুই-একটা পাখী উড়িতেছিল, ঠিক যেন তুলির লেখা! ঐ অসীম সুদূর আকাশ,—না জানি, কোথায় উহার শেষ! মনকে সে তখনি অজানা বহু দূরের কোন্ পথে পাঠাইয়া দিল…সে এক কেমন পথে বিচিত্র নূতন গৃহ-শ্রেণীর মাঝে-মাঝে মুক্ত সরল পথ, পথে নূতন লোকজন, স্বপ্নের মতই সব সে পথে চলাফেরা করিতেছে! গল্পে-শোনা কত রঙ-বেরঙের পোষাক-পরা রাজপুত্র কোমরে তরবারি দুলাইয়া ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া সে পথে চলিয়াছে,—দূরে ঐ মস্ত পাহাড়,—গা তার স্ফটিকে মোড়া, সূর্য্য-কিরণ তার উপর পড়ায় পাহাড়টা চক্-চক্ করিতেছে! আর সেই পাহাড়ের উপরে শ্বেত পাথরের ছোট্ট বাড়ী, তাহারই আলিশা-ঘেরা ছাদের উপর দাঁড়াইয়া চম্পা রাজকন্যা, মাথার চুলের রাশি এলাইয়া দিয়া পথের পানে চাহিয়া আছে! রাজপুত্রের ঘোড়ার পিছনে পিছনে বাবলাও চলিয়াছে, একা…

ভগবতী কাছে আসিয়া ডাকিলেন,—বাব্লু, দাদা…

বাবলার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে ফিরিয়া চাহিল। চাহিয়া দেখে, এ তাদের চিরদিনের চির-পুরানো সেই ঘর…কোথায় এখানে সে নূতন পথ, পাহাড়, ঘোড়ায়-চড়া রাজপুত্র বা মর্ম্মর গৃহের ছাদে দাঁড়াইয়া চম্পা রাজকন্যা!

ভগবতী বলিলেন,—কিছুই খাওনি যে দাদা…এসো, খাবার খাবে। নালু মুখ-হাত ধুয়ে বসে আছে তোমার জন্যে…

হায়রে, কোথায় সে স্বপ্নে-রচা মায়া-রাজ্যের ছায়াপথ! নিমেষে কোথায় যে সব মিলাইয়া গেল! এ আবার সেই চির-দিনকার বাঁধা-ধরা বন্দোবস্তর মাঝে আবার সেই একঘেয়ে ডাক, একঘেয়ে কাজ…সেই বসিয়া খাবার

তারপর বই লইয়া স্কুলে ছোটা! কোনো বৈচিত্র্য নাই!··· বাবলার মনে হইল, তার আষ্টে-পৃষ্ঠে কেবলি এক দড়ির বাঁধন! এ বাঁধনের চাপে তার প্রাণ যে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে!

কিন্তু কোথায়ই বা যায় সে! ঘরে মার এই অসুখ... দুর্ভাবনার সীমা নাই! মাকে ফেলিয়া কোথাও যাইবার উপায়ও নাই! বাবলা নিরুপায় চিত্তে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভগবতীর সঙ্গে গিয়া খাবার খাইতে বসিল।

১৯

তৃতীয় দিনে শৈলের গায়ে গুটি দেখা দিল, জ্বর সমানই রহিল। যাতনার ঘোরে শৈল থাকিয়া থাকিয়া দমিয়া পড়িতেছিল—একা, বড় একা! বাবলাও কাছে নাই—তাকে কাছে পাইবার উপায়ও নাই! তাকে কাছে টানিয়া শেষে কি বিপদ ডাকিয়া আনিবে!

বাবলা অভিমানে বুক বাঁধিয়া সবার নিষেধ শিরোধার্য্য করিয়া লইল। তাকে খেলার মধ্যে পুরিয়া রাখিয়া, নালুর সঙ্গে বাহিরে পাঠাইয়া অন্যমনস্ক রাখিবার শত চেষ্টা হইল; তবু সে থাকিয়া থাকিয়া ব্যাকুল অধীর মন লইয়া বাড়ীতে ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়ে—শৈলর ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আর্ত্ত কণ্ঠে ডাকে, মা! শৈল সাড়া দিয়া বলে, —কেন বাবা?

পথে বাবলার কত কথা মনে জাগে, গিয়া মাকে বলিয়া আসিবে···কিন্তু এই ব্যবধানের কঠিন আঘাতে মনের কথা তার চূর্ণ হইয়া কোথায় যে ছড়াইয়া পড়ে, কিছুই সে বলিতে পারে না! মা যখন জিজ্ঞাসা করে, বলে,—কি বলছিস্ বাবলা? তার জবাবে বাবলা শুধু বলে, এখন কেমন আছ মা? মা জবাব দেয়, ভালো আছি।

বাবলার কথাও ফুরাইয়া যায়! প্রশ্নের পুঁজিটাকে ধরিয়া নাড়া দিলেও সে আর দ্বিতীয় কথা খুঁজিয়া পায় না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে আবার পাগলের মত বাড়ী ছাড়িয়া পথে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। সারা পথ ছুটিয়া সে নালুর কাছে আসে, তার কাগজের বোঝা ঘাড়ে তুলিয়া একেবারে

টেস্‌মান্, ডেলি নিউজ,অমর্ত্ত-বাজার···বাহিরের এই কলরব-কোলাহলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া সে তার বুকের জ্বলন্ত আবেগ-উচ্ছ্বাসটাকে চাপা দিবার চেষ্টা করে।

তাও বেশীক্ষণ ভালো লাগে না। হঠাৎ চোখের সামনে মার রোগ-কাতর শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানি তার সমস্ত কারুণ্য লইয়া ফুটিয়া ওঠে, মার রোগার্ত্ত স্বর কাণের কাছে ধ্বনিয়া ওঠে, সে কেমন মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া শুব্ধ হইয়া দাঁড়ায়। পরে নালুর হাতে কাগজ ও পয়সা-কড়ি চুকাইয়া একদৌড়ে আবার বাড়ী ফিরিয়া আসে—আসিয়া মার ঘরের দ্বারে দাঁড়ায়। মা ঐ বিছানায় পড়িয়া, নিঝুম, স্তব্ধ! বাবলার প্রাণ হা-হা করিয়া ওঠে। মনে হয়, ছুটিয়া গিয়া মার বুকে মুখ গুঁজিয়া প্রাণের এই দীপ্ত আবেগ একেবারে অশ্রুর সাগরে ঝরাইয়া ফেলিয়া প্রচণ্ড ভারী বুকখানাকে হাল্‌কা করিয়া লয়! কিন্তু ইচ্ছা হইলেও তা সে করে না—মা মানা করিয়াছে, ছি বাবা, আমার কাছে এ ক'দিন এসো না। শেষে তোমারও অসুখ হবে কি! আর তোমার যদি অসুখ হয় এখন, তাহলে এমন ভাবনা হবে আমার যে সেরে তো উঠবোই না, হয়তো ভেবেই মরে যাব!

এই শেষের কথাটা মনে উদয় হইলে তার প্রাণের মধ্যে এমন যাতনা গুমরিয়া ওঠে যে তার চাপে বাবলার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে। চোখের সামনে হইতে সমস্ত আলো দপ্‌ করিয়া একমুহূর্ত্তে নিবিয়া চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়া তোলে! সে অন্ধকারে সব তার কোথায় যে হারাইয়া যায়!

সেদিনও কাগজ ছাড়িয়া বাবলা আসিয়া ঘরের দ্বারে অধীর মন লইয়া দাঁড়াইয়াছিল মার পানে ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া। মা বিছানায় শুইয়া,—মুখে কথা নাই, চোখ মুদিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। মা বাঁচিয়া আছে তো..? বাবলার সারা গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল! উচ্ছ্বসিত স্বরে সে ডাকিল,—মা···

সে ডাক শৈলর কাণেও গেল না। বাবলা কম্পিত স্বরে আর-একটু জোর গলায় ডাকিল,—ওমা, মাগো···

বাবলা কোন কথা বলিল না, তার কণ্ঠে স্বর আর ফুটিল না। চোখে-মুখে পুলকের একটা হাসি অতি-মৃদু বিদ্যুতের শিখার মত খেলিয়া গেল।

শৈল হাসিয়া বলিল,—ভারী মজা হয়েছে, না রে? স্কুলে যাওয়া নেই, পড়াশোনা নেই…খুব ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিস…

বাবলার মনের উপর একরাশ কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিল। অমন কথা তুমি বলিয়ো না মা, অমন পরিহাস করিয়ো না গো...তোমার ঐ রোগ-কাতর মুখ দেখিয়া পড়ায় যে কিছুতেই মন লাগে না, খেলা? তাও তো ভালো লাগে না...কিছুতেই আর বাবলার কোন আকর্ষণ নাই আজ! বাহিরে পথে কাগজের বোঝা লইয়া ছুটাছুটি, তাও তো সে করিতে পারে না! তোমায় না পাইয়া তার প্রাণ কি কাতরতায় যে ভরিয়া ওঠে মা…

বাবলার চোখে জল আসিল। সে কোন কথা বলিতে পারিল না।

তার বাক্‌হীন বিশুষ্ক মুখ দেখিয়া শৈলর প্রাণ বেদনায় ভরিয়া উঠিল। ছেলেকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য মন অধীর হইল, হাত দুইখানাও ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে উন্মুখ হইয়া উঠিল… কিন্তু উপায় নাই, উপায় নাই! আহা, বেচারী, বাছা আমার!

শৈলর মনে পড়িল, ছেলেবেলায় দেশে তাদের পাড়ার একটা নিরাশ্রয় কুকুর সবার দ্বারে তাড়া খাইয়া আসিয়া তাদের বাড়ীর উঠানে সেই একদিন আশ্রয় লইয়াছিল! সে একটা বাঁখারি হাতে করিয়া তাকে তাড়াইতে গেলে কুকুরটা তার দুই চোখে কি ব্যাকুল দৃষ্টি ভরিয়াই না তার পানে চাহিয়াছিল! ভাষাহীন পশুর মর্ম্মব্যথার কি জ্বলন্ত ছবিই না তার সেই অশ্রুহীন দুই চোখে মর্ম্মান্তিক ভাবে সেদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল! সে-চোখের দৃষ্টি তার প্রাণে এখনো তেমনি দীপ্ত বর্ণে আঁকা আছে! বাবলার ঐ চোখের দৃষ্টি আজ আবার সেই বহুদিনকার ভোলা পশুর কাতর চাহনিটাকে শৈলর মনে জাগাইয়া তুলিল। শৈলর চোখের কোলে দু' ফোঁটা জল গড়াইয়া

শৈল বলিল,—আর পাঁচটা দিন্ যাক, বাবা—তার পরেই আমি সেরে উঠবো,—আবার তোমায় কোলে নিয়ে আদর করবো, চুমু দেব। এই পাঁচটা দিন আর কষ্ট কর, ধন।·· তোমায় যে বুকে নিতে পাচ্ছি না, এতে আমার বুক কি যে করছে···

শৈলর স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। বাবলা পাথরে-গড়া নিশ্চল মূর্ত্তির মত দ্বারের প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভগবতী আসিয়া বলিলেন,—এই যে বাবলু। কোথায় গেছলে, দাদা? ভাতে তো মুখ দিয়েছিলে মাত্র, খিদেও পায় না?···বুঝলে বৌমা, তোমার ছেলেকে কিছুতেই খাওয়ানো যায় না—বাপু, সব সময় বলে, ক্ষিদে নেই! ছি দাদা, অমন করে কি।···তারপর একটু থামিয়া বাবলার পানে ফিরিয়া আবার বলিলেন,—দুটো ভাত মুখে দিয়েই, ব্যস্, দে ছুট্! এখন ফিরেছ তো, দুধটুকু আনি, খেয়ে ফ্যালো, ধন।

শৈল হাসিয়া বলিল,—হাঁরে পাগলা, খাস্ না কেন! এই বুঝি মাকে ভালোবাসা! মা তাহলে নিশ্চিন্তি হয়ে অসুখ সারাবে কি করে? তুমি না খেলে আমার যে ভাবনা বাড়বে! আমি তাহলে সারবো কি করে?···আর ভাবলে কি হবে, জানো তো...সারা তো হবেই না, শেষে···

শেষে কি,—কথাটা শৈলর মুখে উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই বাবলা কাঁদিয়া একেবারে পাগলের মত ঝাঁকিয়া উঠিল। মার কথা শেষ হইবার আগেই বাধা দিয়া জোর করিয়া সে বলিয়া উঠিল,—যাও, তুমি যদি ফের ও-সব কথা বলবে, তাহলে আমি খাব না, কিচ্ছু খাব না, কোনদিনও খাব না,—খালি খালি উপোস করবো···তুমি বলো না সে কথা··· বল্‌লে দুধও খাবো না, কিছুই খাবো না...

বাবলা কাঁদিয়া অনর্থ বাধাইয়া তুলিল।

শৈল হাসিয়া বলিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, বলবো না আর। তুমি লক্ষ্মী হয়ে দুধ খাওগে ঠাকুমার কাছে। না খেলেই কিন্তু বলবো।

ভগবতী বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার শৈলর পানে চাহিলেন,

চলিয়া গেলেন। একটু পরে দুধ আনিয়া বাবলার হাতে বাটী দিলে বাবলা এক-নিশ্বাসে দুধটুকু পান করিল। ভগবতী খালি বাটিটা হাতে করিয়া চলিয়া গেলেন, বাবলাও থপ্ করিয়া দ্বারের চৌকাঠে বসিয়া পড়িল। শৈল হাসিয়া বলিল,—আমার পাগলা ছেলেটা…লক্ষ্মী হয়ে আর পাঁচটা দিন থাকো,…তারপরই আমি সেরে উঠবো—তোমায় বুকে নেব।…কিন্তু অমন করে রোদে রোদে ঘুরো না বাবা, বাড়ীতেই থেকো! তোমার কথা কানে শুনতে না পেলে আমার যে বড় মন কেমন করে, মাণিক! মনে হয়,কোথায় আছে আমার পাগলাটা, কি করছে…!

বাবলা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল,—আমি আর কোথাও যাব না মা,—তুমি সেরে ওঠো।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

রাজোয়ারা

রাজপুতানায় এককালে বীর্য্য-শৌর্য্যের যে দীপ্তি ফুটিয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার বিচিত্র কাহিনী স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত আছে! মনুষ্যত্বের দীপ্ত বর্ণনায় রাজস্থানের প্রতি পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল। কিন্তু সেই সব বীর ও ত্যাগী মহাপুরুষ ছাড়া রাজপুতানায় দুর্গম গিরির আড়ালে এমন বহু বীরের নাম চাপা পড়িয়া আছে,যাঁহাদের কথা ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! এমনি কয়জন মহাপুরুষের কথা আজ আমরা বলিতে আসিয়াছি। নানা দিক দিয়া ইঁহারাও চরিত্র-মহিমায় বর্ণরাগ ফুটাইয়া সেকালের রাজপুত-ভাগ্য-গগন উজ্জ্বল আলোকিত করিয়াছিলেন,—তাঁদের কীর্ত্তিও অবিনশ্বর।

এমনি মহাপুরুষগণের মধ্যে প্রথমেই মনে আসে দেব-রাজের কথা। দেবরাজের পিতা ননৌট-অধীন বিজয়রাজ শত্রু-তাড়িত হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময় ৮৬০ বিক্রম-সম্বতে দেবরাজের জন্ম হয়। যৌবনে তাঁর বিবাহের স্থির হয় ভাটিগুার এক বর্হীর ঘরে। শত্রুরা খপর পাইয়া সেখানে গিয়া হাজির হয় ও বিজয়রাজকে হত্যা করে। দেবরাজ পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। তাঁর খোঁজ করিতে গিয়া শত্রুর দল ভাটিগুার ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দেয়—অত্যাচারের চূড়ান্ত করে। দেবরাজ বর্হী-রাজ্যে এক বৎসর গোপনে বাস করেন। তার পর এক যোগীর শিষ্যত্ব তিনি গ্রহণ করেন ও ৫২ গুম্বজী এক কেল্লা তিনি রচনা করিয়া ফেলেন। যোগী গুরুর চেষ্টায় সেই কেল্লায় তাঁর রাজ্যাভিষেকও সম্পন্ন হয়। এখানে থাকিয়া কৃষাণ ও শ্রমজীবীদের লইয়া দেবরাজ এক



দেবরাজ

সৈন্যদল গঠন করেন—এবং শিবাজী-গুরু রামদাস স্বামীর ন্যায় দেবরাজের এই যোগীগুরু সেই সৈন্যদলকে রণশাস্ত্রে

পারদর্শী করিয়া তোলেন। এই সৈন্য লইয়া দেবরাজ পিতার রাজ্য পুনরধিকার করেন; ও ক্রমে মাড়বার রাজ্যের একাংশ অধিকার করিয়া তার একচ্ছত্র অধীশ্বর হন। এই সময় দেবরাজের সৈন্যবল ছিল প্রচুর—৫৬ হাজার অশ্বারোহী ও প্রায় একলক্ষ উষ্ট্রারোহী সেনা তাঁর অধীনে কাজ করিত।

দেবরাজের দান ও শক্তির কথা লইয়া বহু গাথা রচিত



রাণী পদ্মিনী

হয়। সে-সব গানের অংশ-বিশেষ আজো যশল্মীরের গরিব চাষার ঘরে শোনা যায়। এই দেবরাজই পরে যশল্মীর-রাজ্যের পত্তন করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১০১১ সম্বতে।

ভীমসিংহের মহিষী পদ্মিনীর কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে—কিন্তু সেই প্রাচীন যুগে রাজস্থানে আর এক পদ্মিনীর জন্ম হইয়াছিল। ১২০৫ সম্বতে পুঁগলরাজ্যে পদ্মিনীর জন্ম হয়—এ-পদ্মিনী রণথম্ভোর-রাজ হঠী হামিরের মহিষী ছিলেন। পুঁগল তখন সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। পদ্মিনীর রূপলাবণ্য যেমন অসীম ছিল, বীরত্বও ছিল তেমনি।

মহম্মদ খিলিজি পুঁগলরাজ্য আক্রমণ করিলে এই রাণী পদ্মিনীই সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন, তাঁর রণ-চাতুর্য্য দেখিয়া মহম্মদ খিলিজী বিস্মিত হইয়া যায়। এবং তাঁর রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধ মহম্মদ তাঁকে হরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু সে প্রয়াস তার ব্যর্থ হয়, পদ্মিনীর রণবিক্রমে।

রণথম্ভোরে এখনো 'পদ্মিলা' নামে এক অট্টালিকার ধ্বংস-স্তূপ দেখা যায়—এই 'পদ্মিলা'ই ছিল রাণী পদ্মিনীর বাস-ভবন। পুঁগলরাজ্য এখন বিকানীরের অন্তর্ভুক্ত।

ইতিহাসে রাজাদের পিছনে আড়ালে থাকিলেও বীর চণ্ড একান্ত পরিচয়-হীন নহেন। ভীষ্মের মত ত্যাগী এই নিষ্কাম বীরের কথা লইয়া বহু কাব্য, বহু নাট্য রচিত হইয়াছে।



চণ্ডজী

চণ্ড লাক্ষা রাণার পুত্র। রণমল্ল তাঁর কন্যার সহিত চণ্ডের বিবাহ প্রস্তাব করিয়া লাক্ষা রাণার সভায় ভাট পাঠান্। চণ্ড তখন সভায় আসিবার জন্য পোষাক পরিতেছিলেন,—লাক্ষা রাণা পরিহাস করিয়া বলেন, "আমি বুড়া হইয়াছি বলিয়া কি ভাটের নারিকেল লইতে পারি না।" এ কথা শুনিয়া চণ্ড বিবাহে অসম্মত হইলেন—পিতা অনুরোধ করিলেও

না। চণ্ড বলিলেন, যে কন্যার সম্বন্ধে পিতা এমন পরিহাস করিয়াছেন, তিনি আমার মাতৃ-স্বরূপিনী! সভার লোক অবাক! লাক্ষা রাণা বহু অনুরোধ করিলেন, শাসাইলেন, চণ্ড তবুও অবিচল। তখন লাক্ষা রাণা বলিলেন, বেশ, আমিই এ কন্যা বিবাহ করিব, কিন্তু এই রমণীর গর্ভে



রায়শীল

যে পুত্র জন্মাইবে সে-ই পরে রাজ্য পাইবে। তুমি পাইবে না। চণ্ড বলিলেন, তথাস্তু! লাক্ষারাণা বলিলেন, প্রতিজ্ঞা কর, এ সত্য পালন করিবে। চণ্ড পিতার সামনে ভীষ্মের ন্যায় তখন সেই প্রতিজ্ঞা করিলেন।

বৃদ্ধ লাক্ষা রাণা সে কন্যাকে বিবাহ করিলেন; সেই মহিষীর গর্ভে মকুলজীর জন্ম হয়। পরে লাক্ষারাণার মৃত্যু হইলে মকুলজী রাজা হইলেন,চণ্ডজী তাঁকে ও তাঁর রাজ্যকে বুক দিয়া আজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন,—কখনো মনের গোপন চিন্তাতেও সত্যভ্রষ্ট হন্ নাই।

আর এক বীর ছিলেন রায়শীল। ১৪০৬ সম্বতে ইঁহার জন্ম হয়। রাজপুতানায় ভোজপুর গ্রামে রায়শীলের জন্ম হয়। রায়শীলের জন্মকালে ভোজপুর অশান্তির নীড় ছিল—লোক-জনের মধ্যে কেবলি মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ, বিগ্রহ—কেবলি অশান্তি জাগিয়া থাকিত। রায়শীল স্বীয় বিক্রমে এই অশান্তি বিশৃঙ্খলা ঘুচাইয়া ভোজপুরে সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এবং সব অশান্তি দূর করিয়া সমস্ত জাতিটাকে আপনার অধীনে আনিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করেন। পরে তিনি বহু জলাশয় খনন করাইয়া, পথ তৈয়ার করিয়া ভোজপুরকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলেন।

এ তো গেল রাজা-রাজড়ার কথা। বড় ঘর ছাড়িয়া এক ব্যবসায়ীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, লক্ষ্মী বনজারা। এই ব্যবসায়ীর দেশ-প্রাণতা ছিল অপূর্ব্ব। ১৫৩৫ সম্বতে লক্ষ্মীর জন্ম হয়। রাজপুতানায় বিভিন্ন প্রদেশে বড় বড় জলাশয়



লক্ষ্মী বন্‌জারা

প্রতিষ্ঠা, পথ ঘাট তৈয়ার করায় লক্ষ্মী বহু মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিল। এমন নিঃস্বার্থ দান বড় দেখা যায় না!

রাজা মানসিংহের ন্যায় রণ-নিপুণ কৌশলী ও সাহসী আর এক রাজপুত বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যাঁর নাম ইতিহাসের



মনোহরদাস

পৃষ্ঠায় না উঠিলেও শক্তি তাঁর অসাধারণ ছিল। ইহার নাম মনোহরদাস। ইনি ছিলেন রাণা প্রতাপসিংহের অনুচর।

হলদীঘাটে চৈতক প্রাণ হারাইলে রাণার জীবন যখন দারুণ সঙ্কটে, তখন এই মনোহরদাসই তাঁকে বুক দিয়া রক্ষা করেন। মনোহরদাস একসময় কাবুলে মোগল-শক্তিকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। রাণা প্রতাপের সঙ্গে যোগ দিবার পূর্ব্বে মনোহরদাস কাবুল-অঞ্চলে বীর-বিক্রমে হিন্দু শক্তির প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। কিন্তু একা সেখানে কোন সাহায্য না পাইয়া তিনি পরে রাণা প্রতাপের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হন, হিন্দুশক্তির রক্ষাকল্পে। প্রতাপসিংহের কাছে আসিবার পূর্ব্বে মনোহরদাস কাবুলের শাসনকর্ত্তাকে যুদ্ধে হারানোর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ তাহার রাজছত্র ও দণ্ড সঙ্গে আনিয়াছিলেন। প্রতাপের মৃত্যুর পর রাজপুত জাতি আবার ছন্নছাড়া হইয়া পড়ে, তখন মনোহরদাস তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হন। পুরীর মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার মনোহরদাসই স্বব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তাঁর শেষজীবনে সম্রাট আকবর তাঁকে আনাইয়া তাঁর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনা করেন—এবং এই মৈত্রীর নিদর্শন-স্বরূপ তাঁকে প্রচুর জায়গীর দেন। মনোহরদাস তীর্থভ্রমণেই জীবনের বাকী দিন অতিবাহিত করেন।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

প্রিয়া-স্মৃতি

অফুরন্ত সুগভীর সীমাহীন প্রেম-পারাবার
আজি মোর চিত্তমাঝে এপার ওপার
অবিরাম ফুলে' ফুলে' দুলে' দুলে'
উঠে পড়ে সহাস্য গর্জ্জনে,
উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের আনন্দ-নর্ত্তনে;
কমলার মূর্ত্তিখানি গর্ভ হতে তুলিয়া আদরে
আদিম সমুদ্র যথা মুগ্ধ তৃপ্তিভরে
ফুলে' ফুলে' ঢেউএ ঢেউএ ছুটে এল
পাদযুগ করিতে লেহন,—

তেমনি এ চিত্তমাঝে যেই অগণন
একান্ত আপন মোর প্রেমভোলা প্রেমভরা প্রিয়া
প্রভাত-অরুণ সম উদেছিল জ্যোতি বিচ্ছুরিয়া—
তাদেরি চরণ-মূল চুমিতে বেড়িতে, বিথারিয়া
উদ্বেল প্রণয়-সিন্ধু উল্লাসে মেতেছে আজি হিয়া।
পথে পথে নিশি দিন করি' আহরণ
নয়ন-হইতে-ঝরা হৃদয় হইতে গলা
সকরুণ প্রেম-নিবেদন
জমায়ে জমায়ে চিত্তে যা রেখেছি তুলি'—
আজি তারা রচিয়াছে পূর্ণ সিন্ধু—সেই বিন্দুগুলি।

কবে কারে বেসেছিনু ভালো—
গবাক্ষের ক্ষুদ্র পথে আশা-দেওয়া নয়নের
মৌন-প্রেম-আলো
অন্তরের অন্তস্তলে আঁধারের খুলিল কপাট।
কোন্ জনতার হাট
অতিক্রমি' চলে গেছি—তারি মাঝে
একখানি মুখ—
সরমে-হাসিতে-আঁকা মূর্ত্তিধরা সুখ—
কোমল করুণ আঁখি সাথে
জীবনের ইতিহাসে লিখন রাখিল রেখাপাতে।
নয়নে নয়নে নাহি কথা—
কবে কোন্ নিরালয় লজ্জায়-আনতা
মুখখানি হেরে' হেরে' সাধ গেছে
হেরি হেরি আরো,
কল্পনারে কহিয়াছি—আঁকো যত পারো
এ মুখের অভিনব-মোহন লিখন,
এঁকে বুকে রেখেছিনু করিয়ে যতন।
কারে বা বেসেছি ভালো, কাছে গেছি
বার বার, সাধ গেছে শত
শুধু শুধু একবার, শুধু নিমেষের তরে চিরদিন মত
বক্ষে তারে চেপে ধরি—ওষ্ঠে ওষ্ঠে ঢেলে দিই প্রাণ—
একটি চুম্বনে শুধু হয়ে যাক্ আদান-প্রদান ;
ব্যগ্র হিয়া তাও লভিয়াছে।
আবার কোথায় কোন্ উৎসবের কোলাহল মাঝে
আমারেই বারবার হেরিয়া সে তরুণ-পিয়াসী
ব্যস্ত ত্রস্ত অঞ্চলেতে প্রেম-জিহ্বা চকিতে উচ্ছ্বাসি'
পরশ দিয়েছে মোরে—
পড়েছিল বাঁধা প্রাণ সেই স্পর্শ-সুখ-প্রেম-ডোরে।
আবার সে একদিন কোন্ এক সখী
অতিনম্রা অতিধীরা—আড়ে আড়ে আমারে নিরখি'
নয়ন করেছে নীচু—মেকেনি নয়ন,
ফিরিয়া চলিয়া গেছি—রহিয়া গোপন
হেরিয়াছি খোঁজে সেই মোরে বারবার—
কাছে গেছি—আঁখি দুটি নত হল তার,—

আঁখিতে ফেলেনি আঁখি-লেখা—
তবু মোরে চেয়েছিল—তারপর গেছি একা একা।
আবার সে কার সাথে ঘন ঘন মৌন পরিচয়—
বহুদিন ধরে' ধরে' নয়নে হৃদয় বিনিময়
হয়েছিল সুনিবিড়—
দেখা শুধু দেখা দেখা-কামনা-অধীর,
না দেখে পেয়েছি ব্যথা দোঁহে,
না-দেখা হয়েছে শোধ দীর্ঘ-দেখা-তৃপতির অচপল মোহে ;
গেল চলে' একদিন—গণ্ডে তার হেরিয়াছি নয়নের জল,
সে জল হৃদয় মাঝে তুলেছিল নদীস্রোত আবেগ-উচ্ছল।
আবার পেয়েছি কারে সুচতুরা সুচপলা সুকৌতুকময়ী
আশা দেছে হাসি দেছে—সবার গোপনে রহি' রহি'
চুমা দেছে, নেছে সেধে সেধে,
অভিমানে আলাপনে রেগে হেসে কেঁদে
আমারে বেসেছে ভালো—প্রসারিয়া বাহু দুইখানি—
প্রেমের দুইটি ডোর—বুকেতে নিয়েছে মোরে টানি',
কখনো বা কোনো নিরালাতে
পিছু হতে চুপে চুপে এসে মোর
আঁখি দুটি টিপে দুই হাতে
বামগণ্ডে সুনিবিড় চুমা দেছে আঁকি'—
পলায়েছে, সেদিন দেয়নি ধরা,—আজো
সেই আধা ধরা, আজ সে যে ফাঁকি।

আজি স্মৃতিভরা বক্ষে সেই যত পুঁজি
আকুলি' বিকুলি' ঘোরে মোরে খুঁজি' খুঁজি'
সেই মোরে—প্রেমাতুর ভালোবাসা-সুবিলাসী
প্রণয়-প্রবণ।
আমি হাসি বসে' দূরে, হাসে মোর মন।
হাসিছে গোপনে বসি' অভিলাষী চপল হৃদয়।
সেই অযাচিত-পাওয়া সেই অযাচিত-দেওয়া প্রেম-অভিনয়
চিত্তে মোর ঘুরে ঘুরে ভাসে ভাসে হাসে,
পরতে পরতে পরশিয়া তরুণ উল্লাসে।
প্রাণ-পথে আলো-দেওয়া হৃদয়ের বন্ধমুক্তকারী,
স্নিগ্ধজ্যোতি সুমধুর অতিমনোহারী,

ক্ষণিকের তবু যারা চিরদিনকার,
আনন্দের হরষের সোনার জীবনে জাগা দিল বারম্বার,
অভিষেক-বারি-দানে জাগাইল
হৃদয়ের প্রণয়-সম্রাট্,—
নিমেষের দানে, তবু সে দান বিরাট্,—
আজি সেই অগণনা লাজনম্রা স্মিত-স্নিগ্ধ-আঁখি
প্রেয়সীর প্রেমাশীষ শিরে মোর রাখি'
চলে' যাই চলে' যাই—যেতে হবে দূর,
হে মোর তরুণী তন্বী প্রাণপ্রিয়া প্রিয়াগণ!
জেগে রহ অনিবার সেই প্রেমাতুর!
তোমাদের স্নিগ্ধ আলো এই পথে পাথেয় আমার;
সৌন্দর্য্যের কণাগুলি! পরিপূর্ণ সে সৌন্দর্য্য
বল কোথা অতুল অপার?

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

আলোচনা

স্বতন্ত্র থাকা

অনেকে যাঁহারা আপনাদের অত্যন্ত উন্নতিশীল ও নারীর প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ মনে করেন, তাঁহারা স্বামীর দুর্ব্বৃত্ততা স্থলে স্ত্রীর উদ্ধারের কোন পথই না রাখিয়া তাঁহাকে কেবল স্বতন্ত্র থাকিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাতে প্রথমতঃ বলিতে হয় প্রচলিত আদর্শে স্বামী যতই কদাচারী হউক, তবু তাহার পদতলে পড়িয়া থাকাই স্ত্রীর পক্ষে গৌরবের পরাকাঠা বলিয়াই এ পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইয়া এবং তাঁহাকে সেই অনুসারে শিক্ষাও দেওয়া হইয়া আসিতেছে কিনা? সুতরাং ওরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাকে স্বতন্ত্র থাকিতে হইলেও আগে সেই অনুযায়ী শিক্ষা ও আদর্শপ্রচার আবশ্যক। তাহার পর বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার সেই স্থানই বা কোথায়? এক পিতৃগৃহ মাত্র ত এস্থলে আমাদের মেয়েদের অবলম্বন,তাহাতেও সকল সময়ে তাঁহাদের স্থান ও সুবিধা থাকে কি? আর পিতৃগৃহের সকলেও অধিকাংশ স্থলেই ওরূপ ক্ষেত্রে মেয়েকে ঐ-রকম স্বামীর কাছেই ঠেলিয়া পাঠাইয়া এবং সেই রকম উপদেশ, পরামর্শ, শিক্ষাই দিয়া থাকেন না কি? স্বতন্ত্র থাকিলে স্বামীর স্ত্রীকে অর্থ সাহায্যের কোন পরিমাণও ঠিক নাই। এমন কি তাহার কোন নিশ্চয়তাও নাই। সন্তানদেরও তিনি আটকাইয়া রাখিতে পারেন, কারণ মার তাহাদের উপর কোন অধিকার নাই। শারীরিক আঘাতে আধমরা হওয়া না দেখাইতে পারিলে স্বামী যেমনই হউক, বা আর যাহাই করুক রাজদ্বারে নালিশ করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াও তাঁহার সেই স্বতন্ত্র-থাকা-রূপ সাধু সঙ্কল্পের সমুচিত প্রতিকারও করিতে পারে। সম্প্রতিমাত্র ইহার সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে।

তাহার পর কেবল স্বতন্ত্র থাকার উপদেশ দিয়াই যে তাঁহারা খালাস, সে ব্যাপারটী প্রকৃত পক্ষে যে কি জিনিষ, মনুষ্যস্বভাব এবং তাহার আশঙ্কা ও প্রয়োজনের বিষয় চিন্তা করিয়া তাহা ভাবিয়া দেখিলেই হয়। দুর্বৃত্ত স্বামীর পদতলে পড়িয়া থাকিলে তাঁহাদের যে "সতী" বলিয়া এত ধন্য-ধন্য পড়িয়া যায়, "স্বতন্ত্র থাকা" ব্যাপারটীই যে সে খ্যাতি-লাভের চেয়ে আরও বিষম রকমই কঠিন। বহুদিন একত্র জীবন যাপনের পর কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে বা সন্তানাদি থাকিলে অবশ্য গৃহ, পরিবার রক্ষার জন্যও অনেক সহিতে বাধ্য হইতে হয়। কিন্তু তাহা ছাড়াও ঐরকম ভাবে অপমান অত্যাচার সহিয়া পড়িয়া থাকার মধ্যে দুঃখ থাকিলেও ভাল কাজ করিতেছি এই আত্মপ্রসাদের সহিত এরকম উত্তেজনা ও নর-নারীর পরস্পর সঙ্গের বিশেষ আবশ্যকতাটীর কথঞ্চিৎ তৃপ্তি ইত্যাদি আছে। এ রকম হীন গৌন ভাব যাহার আর এক মূর্ত্তি বিপরীতভাবে পুরুষের ক্ষেত্রে স্ত্রীর নির্য্যাতনে প্রকাশ পায়, তাহাও ইহার মধ্যে থাকে। কিন্তু আমাদের মেয়েদের অবস্থা ও তাহার ফলে মানুষের স্বভাবের প্রকৃতির সহিত ইহাই খাপ খায়। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আত্মমর্য্যাদা এবং ন্যায়, সত্য,উচ্চাদর্শ মাত্র অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইলে যে শিক্ষা ও মানসিক বলের আবশ্যক, তাহা সাধারণ মানুষের পক্ষেই সহজসাধ্য বা সুলভ নয়। আমাদের মেয়েরা তাহার উপযুক্ত শিক্ষা ও চরিত্র-বল লাভ করিবার সুবিধাই বা কি পাইয়া থাকেন? বিধবাদের কথা এস্থলে উঠিতে পারে, যে, তাঁহারাও ত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। কিন্তু তাঁহারা একান্ত উপায়ান্তরভাবে বিষম সামাজিক চাপ ও সংস্কারবশে আচার নিয়মের আর একটী সহজ আনুষ্ঠানিক গণ্ডীর মধ্যে আপনাদের বাঁধিয়া রাখিয়া কোনমতে দিন কাটাইয়া যান। এতটুকু উপায় থাকিতেও কেহ সহজে সেরূপ জীবন বরণ করিয়া লইতে পারেন। একটী ঘটনা শোনা গেল,—কোন অবস্থাপন্ন ঘরের সম্ভ্রান্ত, "শিক্ষিত" স্বয়ং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবাহের পরই বধূকে যথেষ্ট সুন্দরী নয় বলিয়া অপছন্দ হয়।—যদিও তিনি নিজে কদাকার, এবং মেয়েটীও দেখিতে

মন্দ ছিল না। যাহা হউক, তাঁহার এটুকু অনুগ্রহই বলিতে হইবে যে তিনি ফুলশয্যাও ঘটিতে দেন নাই। পিতা উহাতে যথেষ্ট তিরস্কার করিলে তাহা না শুনিয়া তিনি আবার বিবাহ করিবেন বলেন। মেয়েটীর পিতৃগৃহের অবস্থাও ভাল ছিল। তাঁহারা এই ব্যাপার শুনিয়া কন্যাকে আর শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবেন না স্থির করেন। আর পুত্রটী বাপকে কিছুতেই সম্মত করাইতে না পারিয়া আপনি উদ্যোগ করিয়া পুনরায় "বিবাহ" করিয়া সেই বধূকে আপনার কর্ম্মস্থানে লইয়া গিয়া "সুখে, স্বচ্ছন্দে সংসার" করিতে থাকেন। এদিকে অপছন্দ বধূটীর বাপের বাড়ীর "আদরের" আশাহীন, ভবিষ্যৎহীন শুষ্ক জীবন অনির্দ্দিষ্টভাবে কাটানো অসহ্য হইয়া উঠিল। অনেকে বলিতে পারেন, মেয়েটী কুমারী থাকিলেও ত এমনিই থাকিত, সুতরাং তাহার চাঞ্চল্যের কারণ নাই। কিন্তু তাহা কি ঠিক? বিবাহের অভিনয়টীর দ্বারাই যে তাহার পূর্ব্বজীবনের গতি থামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যখন সে নিশ্চিন্ত ভাবে কলহাস্যে, খেলাধূলার মধ্যে দিয়া বহিয়া চলিতেছিল, তখন হঠাৎ এই প্রকাণ্ড আপদ বাধাইয়া তাহাকে অন্য একটী জীবনের আশায় সচেতন ও প্রস্তুত করিয়াই তেমনি হঠাৎ তাহা চাপা দিয়া দেওয়া হইল. তাহার আবছায়া সে যে একেবারেই দেখিতে পায় নাই এমন নয়। একদিকে তাহার দশায় শোক, সহানুভূতি ও বাড়ীতে না চলিয়া যাইতে পারে না। এমন অবস্থায় সব দিক দিয়াই তাহার জীবনটা যে একেবারে মাটি ও তাহাতে আশা, ভরসা আর কিছুই নাই, সহস্র "আদরের" মধ্যেও ইহা তাহার বুঝিতে বাকী থাকিবার কথা নয়। সুতরাং তখন তাহার জীবনকে পূর্ব্ব খাতে ফিরাইয়া লইতে বলা একান্তই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ! কাজেই সে তাহাতে হাঁপাইয়া উঠিয়া শ্বশুরবাড়ী আসিবার জন্য জেদ ধরিল। পিতা বাধ্য হইয়া মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া আসিলেন। শ্বশুরও তাহাকে পরমাদরে গ্রহণ করিয়া কন্যার মত রাখিয়া দিলেন। এই পরিবর্ত্তনে কিছু নূতনত্ব ও উত্তেজনা ঘটিয়া কিছুদিন মেয়েটী শ্বশুরের সেবা ও সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়া অনেকটা তৃপ্ত হইয়াই রহিল। কিন্তু কিছুদিন পরে তাহার "স্বামীর" পরিবারে কাহারও অসুস্থতার কথা শুনিয়া সেখানে গিয়া সেবা করিবার জন্য আবার সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। শ্বশুর অনেক বুঝাইলেন। সে পাষণ্ডের গৃহে যাওয়া যে অনুচিত এবং তাহাতে তাহার লাঞ্ছনা ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে তাহাও বলিলেন। কিন্তু মেয়েটী শুনিল না; সে "স্বামীর" গৃহে গিয়া সপত্নী, তাহার পুত্রকন্যা ও স্বামীর পরিচর্য্যা ও দাসীবৃত্তি করিয়াই দিন কাটাইতে লাগিল। "স্বামীকে" এখানেও কিন্তু প্রশংসা করিতে হয় যে সে তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না। কিন্তু মেয়েটী তবু আড়াল-আবডাল হইতে তাহার সেবা, পরিচর্য্যা করিয়া তৃপ্ত থাকিত। এমন ঘটনা "হিন্দু রমণী"র অলৌকিক মাহাত্ম্যবশেই ঘটিয়া থাকে তাহা নয়। ঘটিয়া থাকে;—সমাজ-ব্যবস্থাগুণে কোন লেখিকার সংজ্ঞাটীর উপযুক্ত স্থলে ব্যবহার করিতে হইলে হিন্দু পুরুষেরই "উদ্দাম স্বাধীনতা" (অবশ্য কেবল "হিন্দুরমণী"র বেলাতেই ইহার প্রকাশ) এবং 'হিন্দু রমণী"র গত্যন্তরাভাবের জন্য। এই মেয়েটীর মত পিতৃগৃহ, শ্বশুর-গৃহের সেই ভাগ্যও সকলের হয় না ইহাও মনে রাখা উচিত। প্রায়ই শ্বশুর বা শাশুড়ীকেই তো বরং 'অপছন্দ স্বতন্ত্র থাকা"বা "ছেলের অনুপযুক্ত" বধূর পরিবর্ত্তে আবার "পছন্দ" বা "উপযুক্ত" বধূ আমদানী করিতে শোনা যায়। "পরিবর্ত্তেও" বলা যায় না। কারণ আগেরটীকে ফেলিয়া দিলেও ফেলা যায় না, সেও থাকিয়াই যায়। কেবল তাহার সম্বন্ধে কাহারও আর কোন কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের বলাই থাকে না এইমাত্র। অনেক সময় আবার শেষেরটী বিরাগভাজন হইলে সেও "পছন্দসই" হইয়া উঠিয়া থাকে বটে কিম্বা উভয়েরই প্রাণপণ প্রতিদ্বন্দ্বী-চেষ্টার ফলে সুবিধা-বোধ হইলে দুজনেই একসঙ্গে "পছন্দ" ও অনুগ্রহভাজন হইতেও পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে হিন্দু-পুরুষেরা পিতৃমাতৃ-আজ্ঞা পালন করিবার জন্য যেমন এরকম ডবল ট্রিপল বিবাহ করিয়া হিন্দুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন, তাহার বিরুদ্ধতা করিয়া উহা করিলেও তাঁহাদের হিন্দুত্বে কোন বাধা হয় না। কিন্তু 'হিন্দুরমণী'র ক্ষেত্রে 'পিতৃমাতৃ-আজ্ঞাই হউক বা স্ব-আজ্ঞাই হউক অদৃষ্ট একই থাকে। বিবাহ যদি কেবল ঐ শব্দটাই হয়, তাহা হইলেও তাহার ব্যত্যয় হয় না।

এমন যতদিন থাকিবে, ততদিন তাঁহাদের "স্বতন্ত্র থাকা"র উপদেশ দেওয়া পরিহাস মাত্র। অবশ্য শিক্ষা ও উন্নততর আদর্শের প্রচারের দ্বারা আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানের সহিত তাহার শক্তি অনেকটা লাভ করা সম্ভব। নিখিল জ্ঞান কর্ম্মজগতে সেই শক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রও তাহার সঙ্গে থাকা চাই। কিন্তু স্বাভাবিক জীবনে তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদা রক্ষার স্থান এবং উপায়ও সমাজে থাকা আবশ্যক। স্বতন্ত্র থাকার আবশ্যকতার কারণ যথাসম্ভব দূর করিয়া স্ত্রীর তাহা থাকিবার সত্যই পথ রাখিলেই মাত্র তাহা হইতে পারে। এইজন্য সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হিন্দু-পুরুষের "উদ্দাম স্বাধীনতা" খর্ব্ব করিয়া একসঙ্গে একাধিক বিবাহরোধ, উভয়পক্ষে বিবাহচ্ছেদের সমান সর্ত্তে ব্যবস্থা, বিবাহে উভয়পক্ষেই নির্ব্বাচন-প্রথার প্রবর্ত্তন একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পিতা-মাতার সন্তানে তুল্যাধিকার এবং স্বামীর দোষে স্বতন্ত্র থাকিতে হইলে স্বামীর স্ত্রীতে যথোপযুক্ত সাহায্যের এবং পিতামাতার মধ্যে যিনি নির্দ্দোষ, সৎ সুতরাং যোগ্যতর, তাঁহার কাছেই সন্তানদের থাকার ব্যবস্থাও হওয়া দরকার। এই সকল করিতে হইলে যে মেয়েদের বিবাহে অবশ্যবাধ্যতা বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিবাহ দূর করিতে হইবে, তাহা অবশ্য বলাই বাহুল্য। উত্তরাধিকারে নরনারীর সাম্য, মেয়েদের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযুক্ত শিক্ষার বহুল প্রচলনও ইহার সহিত আবশ্যক। এবং এই সকল হইলেই তখন "স্বতন্ত্র থাকা" কিম্বা ভাল করিবার চেষ্টায় সচ্

করার কথাও হইতে পারে। কারণ ঐগুলি প্রবর্ত্তিত হইলেও স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই পুনর্ব্বিবাহ না করিয়াও সংশোধনের চেষ্টায় সহ্য করা বা "স্বতন্ত্র থাকার" স্থানও বরাবরই থাকিবে ও তাহা থাকা উচিত। কিন্তু তাহার সহিত ন্যায় ও মানবাত্মার মর্য্যাদা-রক্ষা এবং মানুষের স্বাভাবিক আশা, আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির দিকেও দেখিতে হয়।

কোন লেখিকা বিধবা বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদের কথায় বলিয়াছেন যে "সংসারে বিবাহচ্ছেদ ও বিবাহ"ই "জীবনের চরম লক্ষ্য" নয়। সকল সংস্কারব্রতীও ত এই কথাই বলিয়া থাকেন। এবং "এভিন্ন অনেক কর্ত্তব্য অনেক কাজ" যে "মনুষ্যজীবনে বর্ত্তমান আছে" তাহাও তাঁহারা সর্ব্বদাই বলিয়া আসিতেছেন। এই জন্যই আমাদের দেশে মেয়েদের বিবাহই যে "জীবনের" "লক্ষ্য" করিয়া তোলা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধেও তাঁহারা সংগ্রাম ঘোষণা করেন কিন্তু তাহাতেও ত মেয়েদের বিবাহের বয়সবৃদ্ধির নামমাত্রেই বাল্যবিবাহের মহিমা কীর্ত্তন করিতেই দেখা যাইতেছে "হতভাগিনী হিন্দুবিধবাদের ২৫ বৎসর বয়সের মধ্যে বিধবা" হইলেই বিবাহ করিয়া মরিতেও অবশ্য তাঁহারা বলেন না। তবে তাঁহাদের যাহাতে কেবল "মরিতে" ও "হতভাগিনী" হইয়া থাকিতেই না হয়,—মানুষমাত্রেরই শক্তি ও প্রকৃতি ভেদে স্বাভাবিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা যথার্থ "শ্রেয়ে"র পথেরও সত্যই "সুযোগ" থাকে, তাহাই তাঁহাদের লক্ষ্য। "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যানুসারে চলায় তাঁহার যদি আপত্তিই না থাকে, তবে "রক্ষণশীল সমাজকে" তাঁহাদের "সংস্রব পরিবর্জ্জন করার "কর্ত্তব্যতার" উপদেশই বা দেওয়া হইয়াছে কেন? সে উপদেশ তিনি দিবার আগে হইতেই "রক্ষণশীল সমাজ" করিয়াও আসিতেছেন না কি? "বিপত্নীক সম্বন্ধেও ঠিক একই কথাই" যদি হয়, তবে তাঁহাদের সম্বন্ধেই বা অনুরূপ "কর্ত্তব্যের" উপদেশ নাই কেন? এই কেটিগণিত দেশে ৪৫০টী বিধবা-বিবাহের মধ্যে বাঙ্গালী কয়টী তাহাও কি তিনি দেখিতে পান নাই? অথচ বাঙ্গালীর মত বিধবার দশাও আর কোথায়ও নাই।

"বংশ-রক্ষার" কথা আগেই ("বিজলী"—"সামঞ্জস্য" নামক প্রবন্ধ) বলা হইয়াছে। "অপুত্রক"তার স্থলেই "বিপত্নীকের বিবাহ সমর্থন করিতে হইলে ঐরূপ পত্নীকের বেলাও ত সে দাবী আসিতে পারে এবং তাহা যে ছিল না বা একেবারেই নাই এমনও নয়। কিন্তু "দত্তক" লইয়াই কাজ চলিলে সেজন্য আবার বিবাহের আবশ্যকতাও টিকে না। তবে ধনী হইলে পত্নীক, "বিপত্নীক", সপুত্রক, "অপুত্রক" কাহারও একাধিক বিবাহে তাঁহার আপত্তি দেখা যায় না বটে! আর বিপত্নীকেরা পুত্রক, "অপুত্রক" কেহই যে তাঁহার "সমর্থন", অসমর্থনের জন্য বসিয়া আছেন বা থাকিবেন এমনও ত বোধ হইতেছে না। এদিকে সন্তান লাভ-আকাঙ্ক্ষাও "বংশ-রক্ষার"জন্য না হইলেও মানুষমাত্রেরই থাকিতে পারে। সুতরাং ন্যায়বিচারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার বিষয়ও ভাবিতে হয়।

যাঁহারা স্ত্রী মৃত বা জীবিত যাহাই হউক, "বিবাহচ্ছেদের কোন বালাই না রাখিয়া ইচ্ছা-মত "ত্যাগ" বা অত্যাগ করিয়াও "দ্বিতয়ে তৃতীয়, চতুর্থ পক্ষে বিবাহ" (বেশীর কথা না হয় নাই বলা গেল) বরাবরই করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের "সংস্রব পরিবর্জ্জনের"জন্য কোন রূপ ব্যস্ততাও ত "রক্ষণশীল সমাজের" এ-পর্য্যন্ত কখনও দেখা যায় নাই। বরং কৌলীন্যাদির সৃষ্টি করিয়া তাহাকে মহাসম্মানই দেওয়া হইয়াছে। লেখিকা বলিয়াছেন "এদেশে কৌলীন্য অর্থকরী নহে"—তবে পত্নীকরী বটে। আর তাহার সহিত ভালরকমেই "অর্থকরীও" যে ছিল তাহাও তাঁহার না জানিবার কথা নয়।

বিলাতে বিবাহচ্ছেদে সম-অধিকার পাইয়াও স্ত্রীরা যে কত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতার সহিত চলিতেছেন এবং বিবাহিত জীবনের অসুখ ও মর্য্যাদা নষ্ট যে কাহার জন্যই সাধারণতঃ হইয়া থাকে, তাহা তাঁদের দেশের পুরুষেরাও স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু তবু আমাদের কোন কাগজের অন্য আর একস্থলে দেখা গেল সেখানকার "তিন-চার-বার" বিবাহচ্ছেদে "পাশ্চাত্য দেশের মহিলাগণেরই দোষ অধিক ; পুরুষগণের ততটা নয় ; এবং স্ত্রীর বিলাস-বাসনা ও পুরুষের তৎপূরণের অক্ষমতাই তাহার কারণ।" তাঁহাদের যদি দোষই থাকিত, তাহা হইলেও কি স্বাধীনতা বা ন্যায্য অধিকার হইতে মানুষকে বঞ্চিত করা যাইতে পারে? পুরুষেরা কি সকলে দোষলেশবিবর্জ্জিত বলিয়াই চিরকাল "উদ্দাম স্বাধীনতা" পাইয়া আসিতেছেন? স্বাধীনতা কাহারই যাহাতে "উদ্দাম" না হয়, নবচেষ্টা-ব্রতীরা যে তাহারই প্রয়াসী, ইহাও আগেই বলা হইয়াছে।

আর "বিধবা সধবা ও কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতৃগণের ও কুৎসিতা কন্যাদলের প্রতি যাঁহারা মমতা-পূর্ণ" তাঁহাদের "মাস এডুকেশন" বা অসংখ্য নারী-প্রতিষ্ঠান গঠনাদি ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়ার দুরভিসন্ধি। লক্ষিত হইতেছে বলিয়া ত বোধ হয় না। কারণ তাঁহারা সেগুলির জন্যও প্রাণপণই করিতেছেন। কিন্তু ওগুলি না হইলে তাহাতেও কিছুই হইবে না বলিয়াই উহার চেষ্টাও তাঁহারা রাখেন। একদিক করিলেই যে অপর দিকটী ঠেলিয়া ফেলিতে হইবে, ইহারও কোন-হেতু তাঁহারা দেখিতে পান না। বরং যে কোন দিকই ঠেলিয়া ফেলিলে বিপদ আছে মনে করেন।

চারিদিকের অবস্থা-গতিক দেখিয়া অনেক অবান্তর কথাই বলিতে হইল। অনেক নবীন, "অত্যুন্নতশীল" ছেলেদেরই বলিতে শোনা যাইতেছে, "গুরুজনেরা আমার মতের অপেক্ষা না করিয়া যে বিবাহ দিয়াছেন তাহা ত বিবাহই নয়। তাহার জন্য আমি দায়ী নই।"—তাই "অশিক্ষিতা বালিকা" বধূর সম্বন্ধে সকল দায় হইতে মুক্ত হইয়া "বয়স্থা শিক্ষিতার" প্রণয়ান্বেষণেই তাঁহারা আপনাদের নব্যতার চরম শিখরে অধিষ্ঠিত মনে করেন। ইঁহাদের মনে রাখা উচিত যে পুরাতন পন্থায় এত বিরাগ,তাহার প্রসাদেই মাত্র তাঁহাদের ঐ-সকল নব্যতা-প্রকাশ

চলে। নতুবা অত সহজে "দায়" হইতে মুক্তি লাভ ঘটিত না। আর যে গুরুজনের সেকেলে কুকর্ম্মের প্রতিশোধ তাঁহারা দিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদেরও কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু যাহাদের তাঁহাদের অপেক্ষাও অজ্ঞানে, অনভিমতে বয়স ও শিক্ষার কোন সুবিধা না দিয়াই বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, সকল "দায়" কেবল তাহাদের উপরেই পড়ে মাত্র। সুতরাং নব্যতা, উন্নতিশীলতা দূরে থাক, মনুষ্যত্বের কণা পরিমাণও থাকিলে এমন চিন্তা মনেও স্থান দিবার আগে তাঁহাদের মাথা হেঁট হওয়াই উচিত। আর সত্যই নব্যতা, উন্নতিশীলতা যদি তাঁহাদের প্রাণে এতটুকুও জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে কোনপক্ষেই বিবাহ যাহাতে "অজ্ঞানে, অনভিমতে" না হয়, বধূরা "বালিকা ও "অশিক্ষিতা" না থাকে, এবং "দায়"ও উভয়পক্ষেই সমান হয়, সেই দিকেই তাঁহাদের দৃষ্টি ও চিন্তার গতি হওয়া চাই।

বঙ্গনারী।

দুঃখবাদ

মানুষের মন সর্ব্বদাই নব নব সুখের জন্য লালায়িত কিন্তু কাহারও সুখের ষোল কলা পূর্ণ হয় না। মানুষ সুখের উপাদানগুলিকে,—স্বাস্থ্য, যৌবন, ধন-সম্পদ ইত্যাদি—লাভ করিলেও তাহার মন কিছুতেই সুখ বোধ করে না, মন কতকগুলি কল্পিত অভাব সৃষ্টি করিয়া বসে; সেই কল্পিত অভাবগুলিকে পূর্ণ করিতে গিয়া সে সুখের উপাদান-গুলিকেও হারাইয়া ফেলে অথচ কল্পিত অভাবগুলিকে সে পূর্ণ করিতে পারে না—Negative-কে পাইবার জন্য সে Positive-কেও হারাইয়া ফেলে। সাংখ্যকার বলেন, মানুষ যাহাকে বাস্তবিক সুখ মনে করে তাহা বাস্তবিক অভাবাত্মক, আহার করিলে আমাদের বাস্তবিক সুখ হয় না, ক্ষুধা-রূপ যন্ত্রণার ক্ষণিক নিবৃত্তি হয় মাত্র, ঔষধ সেবনে করিলে বাস্তবিক কোনো সুখ হয় না, ব্যাধিরূপ যন্ত্রণার ক্ষণিক নিবৃত্তি হয় মাত্র। বৌদ্ধদর্শন-মতেও দুঃখই প্রকৃত—Sorrow, and sorrow alone, is all that the Buddhist recognises in this world of illusion; of nothing else does he think but the removal of this sorrow."—Buddhist Essays P. 68 (By Paul Dahlke). Schopenhaure এই মতাবলম্বী ছিলেন। মানুষের মন কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত সুখ অনুভব করিতে পারে না। যযাতির উপাখ্যানে এই তত্ত্বটী সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে,—তিনি যখন পুত্রদের নিকট যৌবন ভিক্ষা চাহিলেন, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু, তাঁহাকে আপন যৌবন ফিরাইয়া দিয়া বৃদ্ধ পিতার বার্দ্ধক্য গ্রহণ করিলেন। তখন যযাতি সহস্র বৎসর পুত্রের যৌবন লইয়া বিষয় ভোগ করিলেন কিন্তু তাঁহার বাসনার তৃপ্তি হইল না, বরং উহা উত্তরোত্তর বলবতী হইতে লাগিল।

একটা বাসনার তৃপ্তি হইতে না হইতেই সহস্র বাসনা মানুষের মনকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলে, ইহা বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধিমান যযাতি তপস্যার জন্য বনে চলিয়া গেলেন। সুখ মায়া মরীচিকা। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই মতকে pessimism বা দুঃখবাদ আখ্যা দিয়াছেন। যাঁহারা Optimist বা সুখবাদী, তাঁহারাও দুঃখ জিনিষটার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। Leibnitz এবং Hegel Optimist-গণের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা উভয়েই দুঃখের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। Leibntz বলিয়াছেন, "The world is the best of all possible worlds". Hegel বলিয়াছেন যে Evil is a necessary phase in the self evolution of the Absolute" এ সব কথা কতকগুলি শব্দের সমষ্টি মাত্র, দার্শনিকের হেঁয়ালি—metaphysical jargon, ইহাতে প্রকৃত জিনিষের কোনো ব্যাখ্যাই হয় না। যিনি Absolute তাঁহার আত্ম-বিকাশের জন্য Evil প্রয়োজন হইবে কেন? Lotze, "Problem of Evil" এর সমস্যা লইয়া বিষম গোলযোগে পড়িয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের মত আলোচনা করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, Pessimism as a theory is equally tenable as optimism." বস্তুতঃ মানব-জীবন এতই দুঃখ-পূর্ণ যে উহাকে অস্বীকার করিলে জীবন সমস্যারই সমাধান চলে না। দুঃখকে কিছুতেই অস্বীকার করিবার যো নাই। চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সমস্ত বন্ধ করিয়া, বাস্তবকে বাদ দিয়া যে দর্শনের সৃষ্টি, তাহাতে পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে কিন্তু তাহা অসার ভিত্তিহীন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রেম

"তাকেই বলে প্রেম,
যখন থাকে নাক futureএর চিন্তা
থাকে নাকো shame"

কবি যদিও ব্যঙ্গ করে কথাটা বলেছেন, ঠিক ভাবে কথাটা ভেবে দেখলে'এই ব্যঙ্গের ভাবের ভিতর হতেও নিখুঁৎ সত্য কথাটা ধরা পড়ে। কবি প্রেমকে বর্ণনা কর্ত্তে গিয়ে প্রেমের একটি অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন মাত্র। কিন্তু এই অবস্থার সঙ্গে প্রেমের এতই ঘনিষ্ঠ নিকট সম্বন্ধ যে এটাকে ছেড়ে প্রেম দাঁড়াবারই ঠাঁই পায় না। সুতরাং এই বিশিষ্ট-ভাবটার উল্লেখ করেই কবি প্রেমের যা স্বরূপ দেখিয়েছেন, তাতেই জিনিষটার সম্বন্ধে অনেকখানি ধারণা করা যায়।

কবি অবশ্য কাম অর্থেই প্রেমের প্রয়োগ করছেন, কিন্তু প্রেমের প্রকৃত অর্থ তা' নয়। কামনা-রহিত ভালবাসায় নামই প্রেম। ভালবাসা,

সোজা কথা ; বোঝবার জিনিষ, বলবার নয় ; সুতরাং এর কোন ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

ভালবাসা মানুষের জন্মগত একটা বৃত্তি। এটা শিখতে হয় না, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এর বিকাশ আপনি হয়। দুগ্ধ-পোষ্য শিশু যাদের মুখে এখনও কথা ফোটেনি, ভাষায় প্রকাশ কর্ত্তে না পারলেও তারাও ভালবাসতে জানে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাক্‌তে পারে না। তার সুমুখে লাল কিছু ধরলেই সে হাত বাড়াবে, না পেলে কাঁদবে। যখন কাঁদবে অপরিচিত কেউ কোলে নিতে গেলেও শান্ত হবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মা এসে বুকে তুলে নেন্। এ সব ছোট-খাটো বিষয় হতে সহজেই অনুমান হয়, শিশুদের বুকেও ভালবাসার অনুভূতি আছে।

শিশু একটু বড় হল, মুখে আধ আধ বুলি ফুটলো, এক-পা দু-পা চলতে শিখলো—তখন তার বুকে ভালবাসার অনুভূতি আর একটু বেশী দেখা গেল। খেলার সাথী ও ভাই-বোনদের সঙ্গে তার ভাব হল। ভালবাসার অর্থ তখনও বোঝে না, তবু ভিতরে বেশ অনুভব করে। এদের কাউকে না দেখলে কেঁদে আকুল হয়। নবীন বাবু রৈবতকে কুমারী ব্রতের কথা-প্রসঙ্গে ছোট্ট একটি মেয়ের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—আর আর যারা যখন মনের মত পতির বর চেয়ে নিচ্ছিল, তখন সে বলছে "ভুতি পচি আমাতে দাও।" পতির অর্থ জানে না, তবু সবাই যখন চাইছে, তখন তারও একটা কিছু চাওয়া চাই, তার একমাত্র প্রিয়পাত্রী ভুতি দাসীকেই সে পতিরূপে চেয়েছে। এটা শুধু কবির কল্পনা নয়, কবি-কল্পনার ভিতর হতে শিশুর বাস্তব অনুভূতির কথাই এতে ফুটে উঠেছে।

তারপর এল সুখের কৈশোর। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সবই উজ্জ্বল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার অনুভূতিও আর একটু প্রগাঢ় হয়ে হৃদয়কে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে। তখন ভালবাসার ক্ষেত্র প্রসারতা লাভ করেছে। মাতা পিতা, ভাই বোন, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে তখন অনাত্মীয়ের মধ্যে আত্মীয়তার আস্বাদ পেতে হৃদয় আকুল হয়ে উঠেছে। তাই একজন কবি বলে গেছেন, "জীবনে কৈশোরের বন্ধুত্বই সব চেয়ে মধুর। সরল, উদার, অমায়িক বন্ধুত্ব—প্রাণের অফুরন্ত প্রীতি প্রস্রবণ, এর তুলনা কোথায় ?"

কৈশোর গেল, যৌবন এল। কথায় বলে, এ বড় বিষময় কাল, কিন্তু ভাবতে গেলে দেখা যায় এ ধারণা কত বড় ভুল। জীবনের যা' কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য—তার বিকাশের এই সময়। সংসার সুন্দর, মাতা পিতা সুন্দর, ভাই বোন সুন্দর, সংসারের যা' কিছু সকলই সুন্দর। জীবনের বসন্ত, রূপের মধ্যাহ্ন, দেহ-মনের সম্মিলিত পূর্ণ বিকাশের সময়, তার সঙ্গে সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিটুকুও হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে সাড়া দিয়ে ওঠে। তার ফলে ভালবাসার ক্ষেত্রে একটা নূতন শ্যামল কুঞ্জবনের সৃষ্টি হয়। সেই ক্ষেত্রে নূতনভাবে নূতনরূপে একজন সাক্ষী এসে দাঁড়ায় এবং তাকে ঘিরেই ভালবাসার লতা জড়িয়ে পড়ে। শাস্ত্রকার বলে গেছেন, দাম্পত্য বন্ধন না হ'ল নাকি জীবনই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রকৃতি পুরুষের যে মিলন, কত মধুর ও শান্তিপ্রদ তা তাঁরাই জানেন, যাঁরা এর আস্বাদ্ পেয়েছেন।

তারপরই দুটি-একটি ছোট শিশু স্বর্গের নন্দনের সুরভি নিয়ে ঘরে এল। তখন তাদের উপর ভালবাসার আর একটি শিকড় গজিয়ে উঠলো ; ভালবাসা তখন অপত্য-স্নেহের রূপ ধরে আপনার আর একটা স্বরূপ দেখিয়ে দিল।

এই তো গেল, মোটামুটি সাধারণ জীবনে ভালবাসার কথা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কি প্রেম ? পিতামাতার প্রতি আকর্ষণ, ভাই-বোনের প্রতি প্রীতি, দাম্পত্য প্রণয়, সন্তানের প্রতি স্নেহ সব কটিরই মূলে একটা কামনা আছে দেখতে পাওয়া যায়। শিশু পিতামাতাকে ভালবাসে কারণ তারাও তাঁকে ভালবাসেন, সেটা সে বুঝতে পারে, তাঁদের না হলে তার চলে না ; ভাই বোনকে ভালবাসে, কারণ তাদের না হলে খেলা হয় না, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে ; স্বামী বা পত্নীকে ভালবাসে কেননা তার সঙ্গেও স্বার্থের সম্বন্ধ আছে ; সন্তানকে ভালবাসে, কেননা সে যে নিজেরই রক্ত-মাংস, অনেক আশা-ভরসার স্থল। সুতরাং প্রেম যদি কামনা-রহিত ভালবাসা হয়, তাহলে কখনই এ সব স্থলে তার প্রয়োগ হতে পারে না।

এ হতে এই প্রমাণ হয়, প্রেম বলে হয়ত কিছু নেই এ সংসারে, কারণ প্রত্যেক কাজের মূলে একটা না একটা কামনা আছেই আছে। তাই কথাটা একটু ভেবে দেখবার বিষয়।

অনেক পুরানো যুগে আমাদের দেশ এত অবনত ছিল না। যেদিন লোক ইহলোকের চাইতে পরলোকটাকেই বড় করে দেখতো সেদিনের কথা বলছি। কাজেই সংসারের তুচ্ছ ছোটখাটো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যটুকু তার সেই ঊর্দ্ধদৃষ্টির নীচে চাপা পড়ে গেছল। পরলোক, হয়ত তার মূলে বাস্তব কিছুই নেই, তবু সেদিকে চেয়েই লোকে স্বার্থ-পঙ্কিল কলুষতাকে দূরে রেখে চলতো। এই যে অনিশ্চয়ের জন্য ঈপ্সা বা কামনা, তার সঙ্গে যে আজকালকার সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনার আকাশ-পাতাল তফাৎ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই জন্মান্তর-বাদের সংস্কার হতে আসে জীবের প্রতি প্রেম—এর মূলে কামনা নেই ; 'সর্ব্বজীবে দয়া, ভক্তি ভগবানে' এর সঙ্গে স্বার্থের সম্বন্ধ অনেক দূর ফারাক। সুতরাং প্রেম যদি প্রয়োগ কর্ত্তে হয়, তবে সকলে আমরা পরের তরে' এর সঙ্গেই তার প্রয়োগ সমীচীন। বুদ্ধদেব এম্নি প্রেমিক ছিলেন—নিজের তাঁর কিছুরই অভাব ছিল না, তবু সব ছেড়েছিলেন পরের জন্য। এমনি প্রেমিক খৃষ্ট পরের জন্য মৃত্যু বরণ করেছিলেন। এই গানেই নিমাই একদিন বাংলা দেশ মাতিয়ে তুলেছিলেন।

তাঁরাও মানুষ ছিলেন কিন্তু এইটুকু বিশেষত্বের জন্যই মানুষের অনেক উপরে স্থান পেয়েছেন।

এগুলি হ'ল অতি-মানুষের কথা। এবার আসছে সাধারণ লোকের কথা। রবীন্দ্রনাথ একস্থলে বলে গেছেন, "বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।" সাংসারিক জীবনে এ কথা খুবই খাটে। সংসারে সবই বিরাগী হয়ে যাবার জন্য আসে নি, এসেছে কাজ করতে, ভগবানের দেওয়া অন্তরের বৃত্তি-নিচয়ের মর্য্যাদা রাখতে। প্রেম, ভালবাসা, হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি—যাতে কলুষ-পঙ্কিল মলিনতায় তার উপর কোন কালিমার ছাপ না পড়ে তাই করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কিসে তা' সম্ভব?

কিসে সম্ভব? চাই তার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা, স্থির লক্ষ্য, অবিচলিত ধৈর্য্য। যা' আসুক ক্ষতি নেই—বিলিয়ে দিতে হবে আপনাকে—স্বার্থ বলে যা কিছু, তা ছেড়ে আপনাকে মিশিয়ে দিতে হবে তাঁর সঙ্গে—আর সেই সঙ্গে পেতে হবে তাঁকে। ভুলে যেতে হবে নিজের পৃথক সত্তা, ভাবতে হবে আমি সেই। রাধাকৃষ্ণের প্রেমে ভাগবতকারও এই তথ্যই প্রচার করেছেন। তাইত কুল-মান, সংসারের সব কিছু ছেড়ে শ্রীরাধা কালো রূপের মাঝে আপনাকে এমন ডুবিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাই একদিন রাধা খেদ করে বলেছিলেন, "মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন, তোমারে করিব রাধা।" এর মূলে কি দেখতে পাওয়া যায়? আপনাকে মিশিয়ে দেবার বিরাট আকাঙ্ক্ষা! সব ভুলে যে ভালবাসা—প্রেম—তার এই পূর্ণ পরিণতি। নবীন বাবু কুরুক্ষেত্রে শৈলজা-চিত্রেও এই কথাটুকুই বলেছেন শৈলজার মুখে—

> "কভু আমি পার্থ, পার্থ শৈলজা আমার,
> অভিন্ন হৃদয় নদ। নদী পারাবার।"

এর মূলে লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই, অতীত নেই, বর্ত্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই;—আছে শুধু আত্মবিস্মৃতি—প্রেমের গহন সাগরে আপনাকে ডুবিয়ে দেবার বিপুল প্রয়াস।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "যদি গাহন করিতে চাও, এস তবে নাম জলে,
> দূরে ফেলে সব লাজ এস তবে এস আজ,
> ঝাঁপ দাও এই জলে।"

এই কথাটাই নবীন বাবু কুরুক্ষেত্রে আর এক স্থানে বলেছেন:—

> "এই প্রেম মানবের স্বর্গের সোপান,
> এই প্রেমে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ ভগবান।
> আসক্তির করালতা ছায়া কামনার
> নাহি চাহে, সেইজন উপাস্য আমার।

এর ফল কি? প্রেমের মূলে ফলাফল-বিচার নেই—সুতরাং এর বিচার নিষ্প্রয়োজন।

পারুলকুমার।

ম্যালথস প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাবরী চুল বা হাই-হীল জুতোর মত ম্যালথসের থিওরী অফ পপুলেশন নানা ভদ্র সমাজের ফ্যাশন হলেও তাঁর মত ও সিদ্ধান্ত যে অবিসংবাদী এ কথা মনে করলে ভুল হবে; তাঁর বিরুদ্ধমতাবলম্বী অনেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা পেয়েছেন যে তাঁর তত্ত্বের গোড়াতেই যথেষ্ট গলদ আছে। তাঁরা বলেন যে ম্যালথসের গণনামত জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না এবং জন-বৃদ্ধির অনুপাতে কর্ম্মশক্তি ও ফসল স্বতঃই বৃদ্ধি পায়।

বিখ্যাত Socialist Bebel ম্যালথসের একজন শক্তিশালী বিরুদ্ধবাদী। তিনি লিখছেন,—দেশে দেশে জনসংখ্যা প্রচুর বলে মনে হচ্ছে, তার একমাত্র কারণ পৃথিবীর মাত্র খানিকটা জায়গায় মানুষ বসতি করেছে, বেশীর ভাগ জায়গাই খালি পড়ে আছে; দেশে-বিদেশে অন্নসংস্থানের বন্দোবস্ত সুচারু ও প্রচুরতম যে হওয়া সম্ভব তা প্রমাণিত হলেও তা কাজে না খাটাবার দোষেই আজ এই অন্ন-সমস্যা। উচ্চতর সভ্যতার বৃদ্ধি-সাধনার জন্য মানুষ যা চেষ্টা করছে তা সার্থক করবার মত লোক-সংখ্যা আজই যে অল্প তা নয়, এ সংখ্যা-ন্যূনতা বহুদিন থাকবে বলে সন্দেহ করা যেতে পারে; অথচ প্রতিদিন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নব নব উদ্ভাবন ও আবিষ্কারে মানুষের জীবন-রক্ষার উপযোগী নানা বস্তুর সংস্থানের প্রয়াস চলছে। জগতের নানা দেশ অকর্ষিত হয়ে পড়ে আছে অথচ এমন স্থানের অভাব নেই শুধু যেখানে আবাদ করলে সহজেই সারা বিশ্বের অন্নসংস্থান হওয়া বিচিত্র নয়। মানব-সমাজের কাছে সভ্যতার একমাত্র দাবী জন সংখ্যা হ্রাসের নয়, বৃদ্ধির।

বিখ্যাত এনার্কিষ্ট বা সংঘবাদী প্রিন্স ক্রপটকিন-প্রমুখ বিদ্বজ্জনের মত যে নরের কর্ম্মশক্তি ও ভূমির উপযুক্ত সার সংগৃহীত হলে ভূমির ফসল কোন কালেই শেষ হবে না এবং চেষ্টার অনুপাতে ফল বাড়বে বই কমবে না, এ কথা ত স্বতঃ-সিদ্ধ। বর্ত্তমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জার্ম্মান মনীষী Nicolai এই কথাটায় সায় দিয়াছেন; তিনি বলেন, মানুষ আজ পর্য্যন্ত অপরিমেয় সৌরশক্তির কণামাত্র ব্যবহার করে বর্ত্তমান সভ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু এতদিনে সে শুধু কাঠামো মাত্র তৈরী করেছে এবং সভ্যতার সত্য সুন্দর মঙ্গল প্রতিমা গড়ে তুলতে তাকে সমস্ত সুপ্তশক্তিকে জাগাতে হবে। জনসংখ্যার হ্রাসে নয় বৃদ্ধিতে সে কার্য্য সফল হওয়া সম্ভব।

ম্যালথসপন্থীরা নানা কথায় এ চাপানের উত্তর দেবার চেষ্টা করলে বা এড়িয়ে গেলেও ম্যালথস এ সম্বন্ধে নিরুত্তর। কারণ তিনি মৃত এবং দ্বিতীয়ত কৃষিবিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর উন্নতি তাঁর জ্ঞানগোচর হয় নি। Agricultural chemistry ও intensive culture প্রভৃতি আধুনিক উন্নত প্রণালীর কৃষির সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় ছিল না;

Law of diminishing return প্রভৃতি তৎকাল-প্রচলিত অর্থনীতির ছেঁদো বুলির মোহ কাটিয়ে ওঠবার উপায়ও ছিল না, থাকলে অন্ন-সংস্থানের নাম করে এ তথ্য আবিষ্কার ও এ তত্ত্ব আলোচনা করতেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সমাজের মুখ চেয়ে আর একদল শিক্ষিত প্রতিপত্তিশালী লোক ম্যালথসের তত্ত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা পেয়েছেন। মার্কিন প্রজাতন্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক রুজভেল্ট ও বিশ্ববিখ্যাত হাওয়ার্ড কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ইলিয়ট প্রভৃতি এই দলে। তাঁরা প্রচার করেন যে কেউ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিলাসের আশায় পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করে, সমাজের কাছে সে দোষী এবং দেহ ও মনে যে কোন সুস্থ জাতির চোখে তারা হেয়—এ বিরতি বা বিকৃত সংযম সমাজের সমূহ অকল্যাণের মূল।

ম্যালথস-তত্ত্ব মূলতঃ স্বীকার করলেও জন্ম-সংরোধের উপায় সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ম্যালথস নিজে রতিবিরতি ছাড়া অন্য উপায় নির্দ্দেশ করেন নি; অথচ তাঁর শিষ্যেরা তাঁর সে ত্রুটী পূরণ মানসে যে সব উপায় নির্দ্দেশ করেছেন বহু মনীষী ও চিকিৎসকের কাছে তা দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথেষ্ট প্রতিকূল বলে অগ্রাহ্য হয়েছে। স্থায়ী বা অস্থায়ী সংযম মানব সমাজ ও সভ্যতার উন্নতির পক্ষে একটী বিশেষ শক্তি, এ কথা বহুজনগ্রাহ্য মত। যৌন-সঙ্গম বিশ্বের একটী পবিত্রতম কার্য্য; অথচ সামাজিক প্রয়োজনীয়তার মুখাপেক্ষা না করে কেবলমাত্র স্বীয় অধঃপতিত অভিপ্রায়-সিদ্ধির মানসে যারা লালসার দাসত্ব করে তারা হেয়। নৈতিক সংযম ভিন্ন অন্য কোন প্রকার সংরোধ-প্রণালী সামাজিক অধঃপতনেরই লক্ষণ।

এই নৈতিক সংযমকে কার্য্যকরী করবার চেষ্টায় অনেকে নানা বিচিত্র উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন। স্ত্রীলোকের রজঃ-আবির্ভাবের কিছুদিন (১৬ পরে ও পুনরাবির্ভাবের কিছুদিন (৩।৪) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অথবা বৎসরে বিশেষ কোন ঋতুতে সঙ্গমকালে স্ত্রীর নিশ্চেষ্টতা বা চীন প্রথা কং ফু Kong fou, অর্থাৎ অন্য বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ অথবা অসভ্য সমাজ-অনুমোদিত শিশু-পালনের দৈর্ঘ্য (artificial protraction of lactation) ও জনন ও গর্ভ-ধারণে শক্তি কমাবার ইচ্ছায় আহার সংযম প্রভৃতি অথচ এর কোনটাই যে কার্য্যকালে সুফল প্রসব করে না মানুষ এতদিনের অভিজ্ঞতায় তা বিশেষ করেই জেনেছে। এই সূত্রে কেউ কেউ বিবাহের বয়স-বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছেন; তার ফলে বিনা চেষ্টায় ও বাধায় অসুখকর রতি-বিরতি-সমস্যার একটা সহজ সমাধান হবে এই তাঁদের বিশ্বাস; তবে বয়স বৃদ্ধি যে জনন-শক্তির প্রতিকূল তা আয়ুর্ব্বেদ-গ্রাহ্য।

আর একজনের মতামত লিপিবদ্ধ করে এ প্রবন্ধ শেষ করব। তিনি হচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত রুশ-সাহিত্যরথী টলষ্টয়। The Kreutzer Sonata নামক বিখ্যাত উপন্যাসে তিনি ম্যালথস-প্রশংসিত উপায়কে স্বীকার করেছেন। অশন বিলাস, স্বল্পাহার ও গুরু পরিশ্রম মনের এ কুপ্রবৃত্তি দমন বা শাসনে সক্ষম হতে পারে। তিনি বলেন যে-যৌন-সঙ্গমের ফলে পুরুষ তার ফল থেকে আত্মরক্ষা করে কিম্বা সমস্ত দায়িত্ব-ভার মেয়ের ঘাড়ে চাপায়, তা নিশ্চয় হেয় ও ঘৃণ্য। জন্ম-সংরোধ-মানসে কোন কিছুর সাহায্য গ্রহণের তিনি ঘোরতর বিরোধী; কারণ তাতে স্ত্রী-পুরুষ কামের শাস্তি সন্তান-দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পায় এবং ভ্রূণ-হত্যারও তাতে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। টলষ্টয়ের চোখে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার চেয়ে ভাই-বোনের স্নেহ-সম্বন্ধ উচ্চতর এবং নর-নারী মাত্রেরই তা কাম্য। তেরটি সন্তানের পিতা উক্ত মহাপুরুষের জীবন-কথার সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁরা এ উক্তিকে বাতুলের প্রলাপ বলে অভিহিত করেন।

তথ্য হিসাবে আংশিক ভুল প্রতিপন্ন হলেও জন্ম-সংরোধ-প্রণালী কার্য্যক্ষেত্রে বিফল হলেও ম্যালথস দেশবিদেশে একদিন প্রচলিত সংস্কারের মূলকে আন্দোলিত করেছিল, জ্ঞানী-গুণীর উদ্ধৃত নানা মতবাদই তার প্রমাণ। ক্রপটকিন-প্রমুখ বৈজ্ঞানিক ও বিশ্বপ্রেমিকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ম্যালথস-বচনের মধ্যে সত্যের বীজ আছে এবং যতদিন না মানব সাধারণ খাদ্য সংগ্রহের উন্নত বৈজ্ঞানিক পন্থার সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ করছে, ততদিন জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে দৈহিক গঠনের নিকৃষ্টতা, মৃত্যু-সংখ্যার বৃদ্ধি, স্থানাভাব ও অসুবিধাজনক জন-বিস্তৃতি এমন কি দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অনিবার্য্য। তা নিবারণ করতে লোক-সংখ্যা নিয়মিত করা, জন্ম-সংরোধক নানা প্রণালী জন সমাজে প্রচলন করার প্রয়োজন, আশা করি, দেশ-হিতৈষী মাত্রের চোখেই প্রতিভাত হয়েছে। প্রতি সভ্য দেশেই এ বিষয়ে আলোচনা ও নানা প্রণালীর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ চলছে; আমাদের নিশ্চেষ্টতা আমাদের অজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যকর্ম্মে আলস্যই প্রমাণ করছে।

আনন্দসুন্দর ঠাকুর।

ফাগুন বাতাস

ফাগুন বাতাস, ফাগুন বাতাস
আমের মুকুল অশোক-বকুল—রংমশালের রঙিন আভাষ।
বন্-বিহারীর রূপের ভাতি,
রসের জোগান দিবস রাতি,
চিকন পেশল পেলব কুসুম—পাপ্ড়ি-ঝরা ফুলের সুবাস!

ফাগুন বাতাস, ফাগুন বাতাস,
মন-কাঁদানো পাখীর পালক—আলোক-মাখা পুলক আকাশ
ফুলেল হাওয়ার গোলক ধাঁধায়,
উদাস ব্যথীর পরাণ কাঁদায়,
কেউবা হাসে—কুঁড়ির সোহাগ, কেউবা কাঁদে কেবল হতাশ!

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

কাশ্মীর ও জাম্মু

(সমালোচনা)

যে-লোক কূপমণ্ডুকের মত ঘরের কোণে বসিয়া থাকে, সে অতি দুর্ভাগা, তার মনে না থাকে স্ফূর্ত্তি, না থাকে আনন্দ। আর কাল্‌চারের অভাব তার থাকিবেই—তা ঘরে বসিয়া সে কাঁড়ি কাঁড়ি বই পড়িলেও। মনের এই অন্ধকার দূর করিবার জন্য চাই বহিঃ-প্রকৃতির সঙ্গে মিলন—ঘরের ইট-কাঠের চাপ ঠেলিয়া মুক্ত গগন-তলে বাহির হইয়া আসা। বদ্ধ ঘরে বসিয়া থাকিলে মন আমাদের ঝিমাইয়া আসে, শরীরেও আমরা অস্বস্থতা বোধ করি। মনের এই নিঝুম ভাব, শরীরের এই অস্বাচ্ছন্দ্য দূর হয় যদি আমরা ঘরের কোণ ছাড়িয়া একটু বাহিরের মুক্ত আলো-হাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াই। এ ব্যাপার আমরা অনেকেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। এইভাবে প্রকৃতির এই মুক্ত ক্ষেত্রের গণ্ডী যদি আমরা বাড়াইয়া দি—অর্থাৎ কলিকাতায় ঘরের কোণ ছাড়িয়া গড়ের মাঠ বা গঙ্গার তীরটুকু না ঘুরিয়া আশ-পাশের গ্রামে বেড়াইতে যাই, এবং পরে এই গণ্ডী ছাড়াইয়া দেশ-দেশান্তরে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা, বিপুল জন-তরঙ্গের বিচিত্র ভঙ্গী চোখে দেখি, তাহা হইলে মনে স্ফূর্ত্তিরও সীমা থাকে না. জ্ঞান তো প্রচুর ভাবেই লাভ করি। নিজে প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতির সঙ্গে এই যে মেলামেশা করি, করিয়া যে আনন্দ পাই, তার আর তুলনা নাই!

কিন্তু এ ভাবে দেশ-দেশান্তরে বেড়াইতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন—সকলের তার তেমন সংস্থান নাই। দেশ-দেশান্তর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা এবং পরের চোখে দেশ-বিদেশ দেখা আর-এক উপায়ে ঘটিতে পারে, অপরের লেখা ভ্রমণ-কাহিনী-পাঠে। ভ্রমণ-কাহিনী তাই অনেক উপন্যাসের চেয়েও মিঠা লাগে। কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনীও আবার দুই ধরণের দেখিতে পাই—এক দেশ-বিদেশের নানা তত্ত্বে, নানা তথ্যে ফটোগ্রাফের মতই উপভোগ্য; আর একশ্রেণীর ভ্রমণ-কাহিনী আছে, যাহাতে দেশ-বিদেশের কথা বিশদভাবে বিবৃত থাকে না, থাকে শুধু লেখকের আত্ম-সর্ব্বস্ব কথার জাল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বাংলা সাহিত্যে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ভ্রমণ-কাহিনীরই প্রাচুর্য্য দেখি। সেগুলাকে ভ্রমণ-কাহিনী বলিতে লজ্জা বোধ হয়।

ভ্রমণ-কাহিনী লিখিতে হইলে লেখকের চাই শক্তি,—দেশ দেখিবার ও নিজে দেখিয়া পরকে তাহা দেখাইবার শক্তি। অর্থাৎ যে লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রাণে প্রচুর দরদ নাই, তাঁর হাতে ভ্রমণ-কাহিনী কখনই বাহির হইবে না। তার উপর লেখার ক্ষমতা তো থাকা চাইই।

আমাদের সৌভাগ্য যে, এই বইখানি—"কাশ্মীর ও জাম্মু"—ভ্রমণ-কাহিনীই হইয়াছে। গোড়ার দিকে নিজের কথা বেশী থাকিলেও খানিক পাড়ি দিবার পর লেখক আপনাকে ভুলিয়া পথের কথাই বলিয়াছেন। লেখকের দেশ দেখিবার ও দেখিয়া তার ছবি আঁকিয়া অপরকে দেখাইবার শক্তিও আছে। এ বইখানি এমনি সুশৃঙ্খলভাবে লিখিত হইয়াছে যে এ বই পড়িয়া যে কোন লোক কাশ্মীর যাত্রা করিতে পারেন। কোথায় কি সুবিধা অসুবিধা আছে, পথে কোথায় কি দেখিবার মত বস্তু আছে—তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লেখক এমন নিপুণভাবে দিয়া দিয়াছেন যে এ বইখানি কাশ্মীর-যাত্রীর পক্ষে গাইডের কাজ করিবে!

কিন্তু তাই বলিয়া বইখানি গাইড-বুকের মতই নীরস নয়। প্রকৃতির যে বৈচিত্র্য বাহিরে মুক্ত প্রান্তরে লীলায়িত রহিয়াছে, তাহার মাধুর্য্য লেখকের তুলির লেখায় বেশ মিঠা ও সরস হইয়া দীপ্ত বর্ণে ফুটিয়াছে, প্রকাণ্ড একখানি রঙীন ছবির মত!

যাত্রা-পথের খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়া ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের ছবি আঁকিয়া লেখক সেখানকার লোক জনের আচার-ব্যবহার, ও তাদের সুখ-দুঃখের কথাও বলিয়াছেন। লেখক এ-দফায় পাঠককে একেবারে অমরনাথের পথ অবধি লইয়া গিয়াছেন। সেখানকার পথ দুর্গম, বিপদ-সঙ্কুলও বটে। সে পথে এমন 'চড়াই' যে প্রতি মুহূর্ত্তেই বুক কাঁপিয়া উঠে, পা শিহরিয়া উঠে—আর মনে হয়, এই বুঝি ঘোড়ার পদস্খলন হয়! কোন কোন স্থলে চড়াই এমন যে বিশ-পঁচিশ হাতের বেশী উঠিতে পারা যায় না—তাহাতেই "কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসে, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে এবং পা অবশ হইয়া যায়।" অথচ ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই! সেখানে খুব শীত। "পাহাড়ের গায়ে গলিত বরফ ভিজা লবণ বলিয়া মনে হয়—একটু শক্ত বলিয়া আঙুলের চাপ দিলে উহা চতুর্দ্দিকে ছিটকাইয়া পড়ে; চুষিতে স্পঞ্জের মত—একটু একটু করিয়া মুখে জল ঢুকিতে থাকে।"

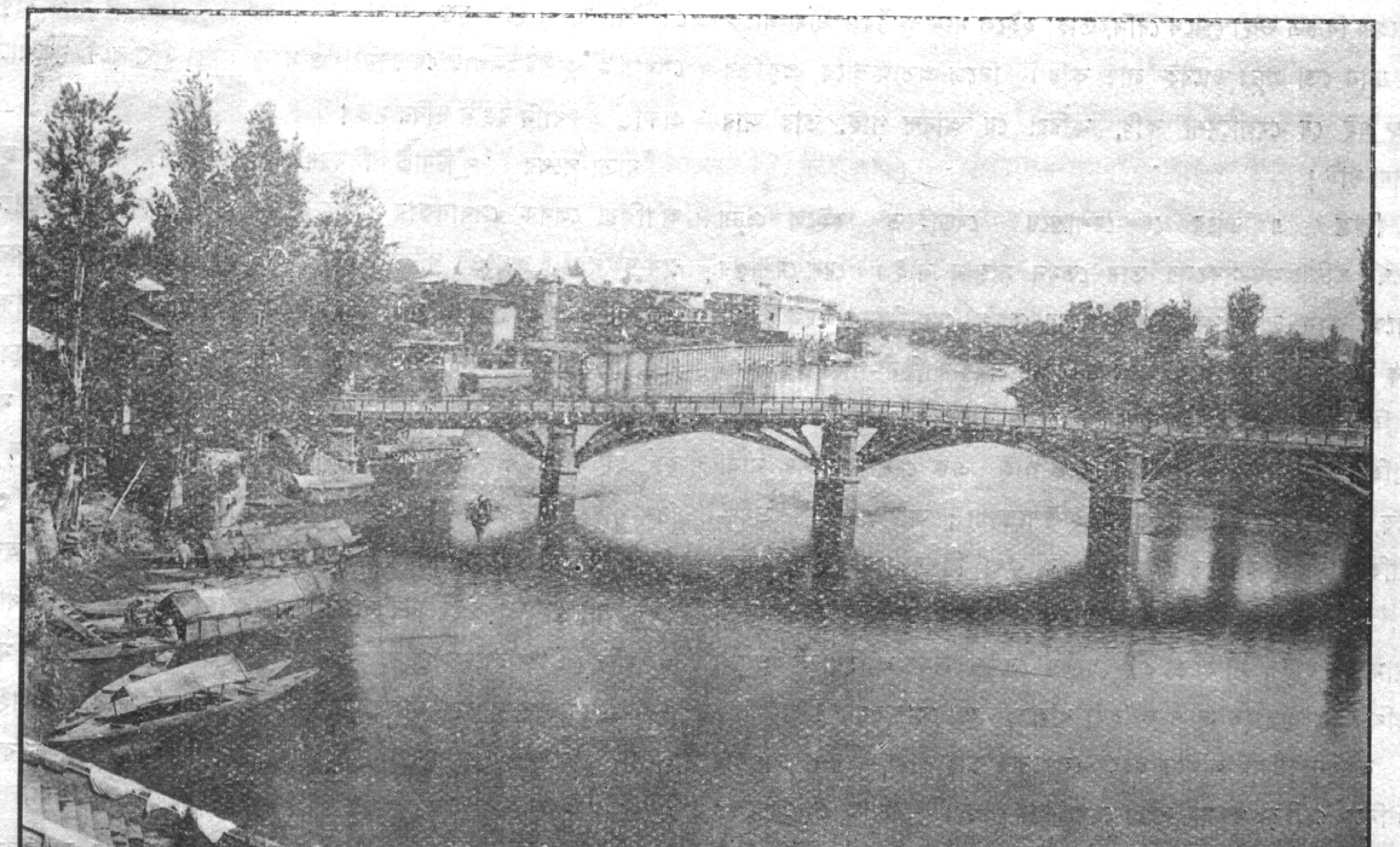
পথে সুগুল নামক একপ্রকার গাছ আছে, দেখিতে অর্কেরিয়ার মত। এই সকল গাছ সারি বাঁধিয়া এমন সুন্দরভাবে খাড়া আছে যে মনে হয় যেন মানুষের হাতে গড়া অর্কেরিয়ার বাগান। এই পথে বহু দূরে গেলে 'শীষারাম-নাগ' পর্ব্বতে পৌছানো যায়। এটি

* কাশ্মীর ও জাম্মু। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীকালীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কানিহারী ময়মনসিংহ। কলিকাতা, আর্ট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

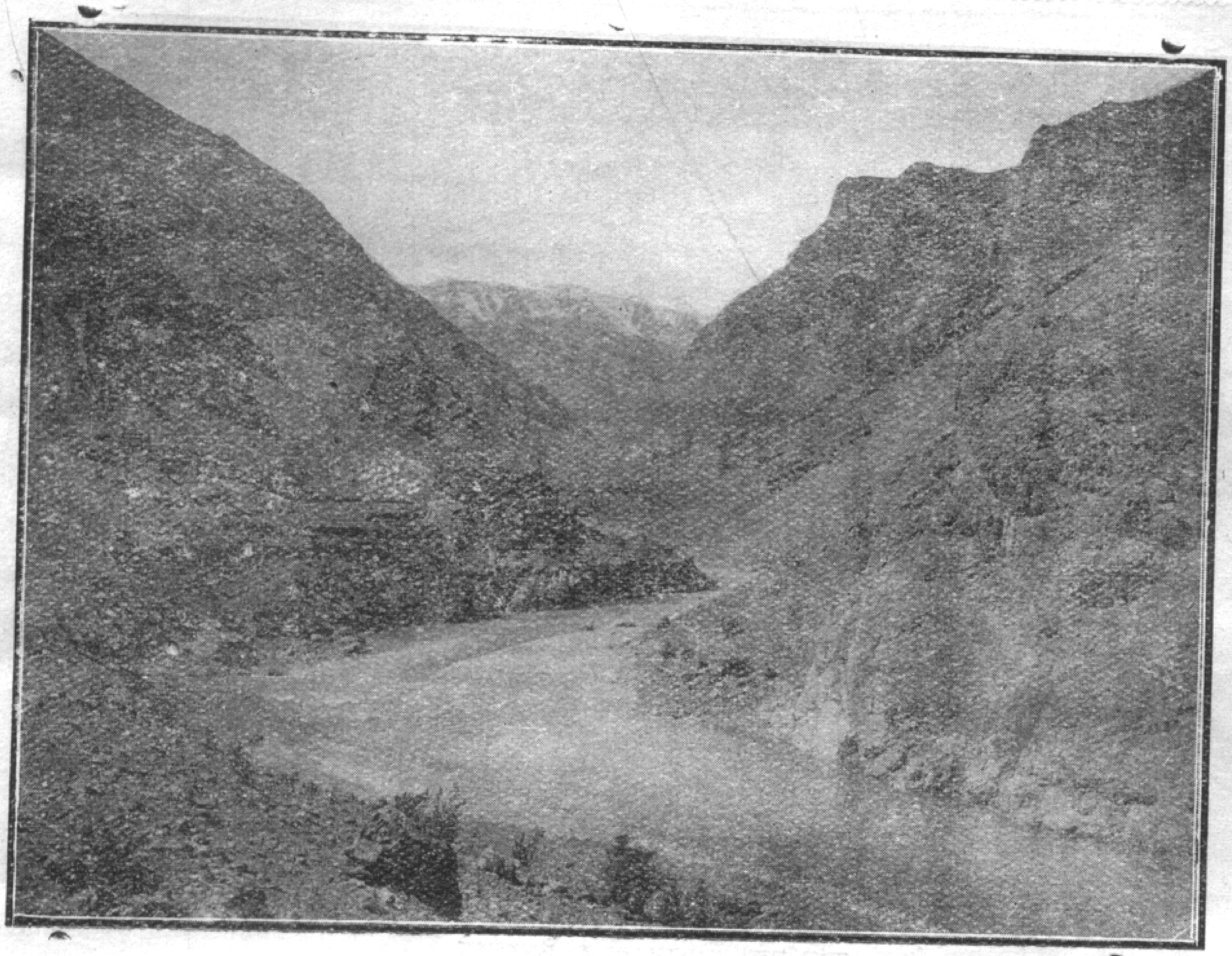
হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। এখানে একটি হ্রদ আছে, তাহারো নাম শীষারাম-নাগ। অমরনাথের যাত্রীরা এই হ্রদে স্নান করেন, শ্রাদ্ধাদি করেন। চারিদিক শুভ্র তুষার-মণ্ডিত। এখানে মহারাজার নির্ম্মিত একটি আবাস-গৃহ আছে। সে ঘরের দরজা জানালা সমস্তই বরফে ঢাকা। শীষারাম-নাগ পর্ব্বত হইতে ক্রমেই চড়াই আরম্ভ হইয়া এবলট পর্ব্বত পর্য্যন্ত গিয়াছে—এখান হইতে মহাগুনাস পর্ব্বতের চুটী চড়াই আরো ভয়ঙ্কর। তার পর নাগারর্থ৷ পর্ব্বত—এই পর্ব্বতের পর পঞ্চ-তরণী...পাঁচটি নদীর সঙ্গম। এই পঞ্চ-তরণী হইতে অমরনাথ মাত্র ৪ মাইল দূরে। চড়াই এখানে আরো খাড়া; পথ অত্যন্ত ভীষণ। চড়াই পথের পাশে প্রকাণ্ড গহ্বর—এ পথে অনেকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। পঞ্চ-তরণী ও অমরনাথের মাঝে বৈরনাথ ও হাতিয়ার তলা—ভয়ঙ্কর খাড়া পথ। এ পথ পার হইলেই অমরনাথ। অমরনাথ পর্ব্বতের উপরে প্রায় একশো হাত পরিধি-বিশিষ্ট এক গুহামুখ—এই গুহা ক্রমেই সরু হইয়া একশো হাত পর্য্যন্ত গিয়াছে। গুহার মধ্য তিনশো লোক বসিতে পারে। উপর হইতে সর্ব্বদা জল চোঁয়াইয়া পড়িতেছে—এই গুহার ভিতরে অসংখ্য পারাবতের বাস। তাহারা কি খায়, কে জানে! বৎসরে একবারমাত্র রাখীপূর্ণিমার সময় এই গুহায় লোক-সমাগম হয়—এই সময়েই শ্রীশ্রী৺অমরনাথ জীউর পূজা হয়। এই গুহার মধ্যে বরফ জমিয়া শিব-লিঙ্গের আকার ধারণ করে। রাখীপূর্ণিমার দিন বরফের এই লিঙ্গ-মূর্ত্তি পূর্ণতা পায়। উক্ত পূর্ণিমার দিন গুহার এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহের বরফ রাশি গলিয়া গেলেও এই মূর্ত্তিটি পূর্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। আরো আশ্চর্য্য এই যে, অন্য স্থানের বরফরাশি যে সময় হইতে গলিতে থাকে, সেই সময় হইতে এই মূর্ত্তিটীর গঠনকার্য্য আরম্ভ হয়! এই মূর্ত্তিই শ্রীশ্রী৺অমরনাথ জ.উ।

এমনি কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনায় বইখানি ভরপুর। বইখানি কোন গ্রন্থের অনুবাদ নয়। লেখক স্বচক্ষে দেখিয়া সেখানকার বিচিত্র ছবি আঁকিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে লেখকের হাতে তোলা বহু ফটোগ্রাফের প্রতিলিপিও সংগৃহীত হইয়াছে; তাহাতে গ্রন্থের মূল্য আরো বাড়িয়াছে। যাঁরা কাশ্মীর সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে চাহেন, তাঁরা এ-গ্রন্থ পাঠ করুন, পাঠে আনন্দ পাইবেন প্রচুর। গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগে পথে কোথায় কি পাওয়া যায়, এক জায়গা হইতে অপর জায়গায় কি ভাবে যাওয়া যায় ও কত ভাড়া লাগে,...এই সব বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী আছে। সে বিবরণীটুকু মনে প্রচুর কৌতূহল জাগাইয়া তোলে।

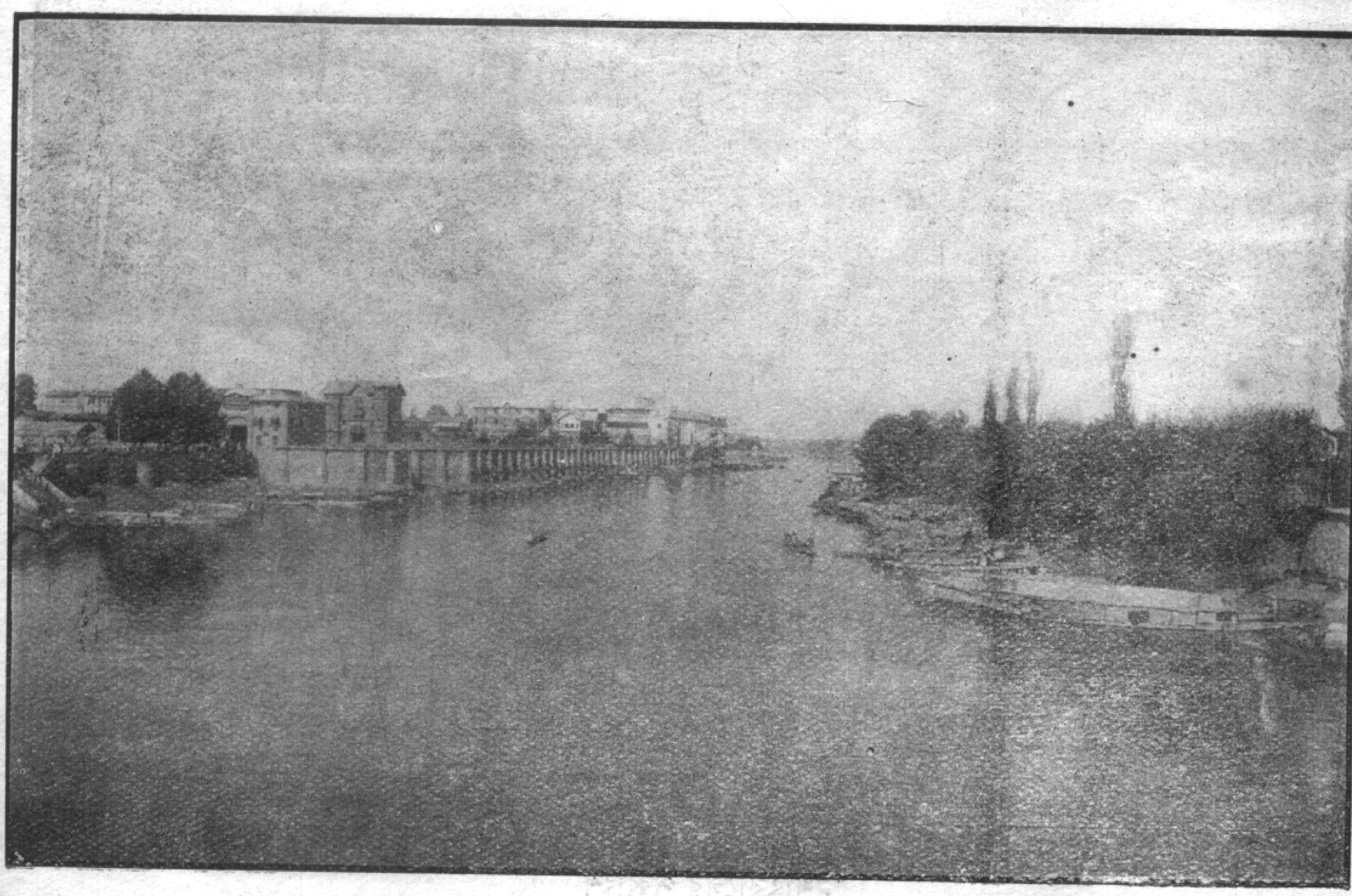
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।



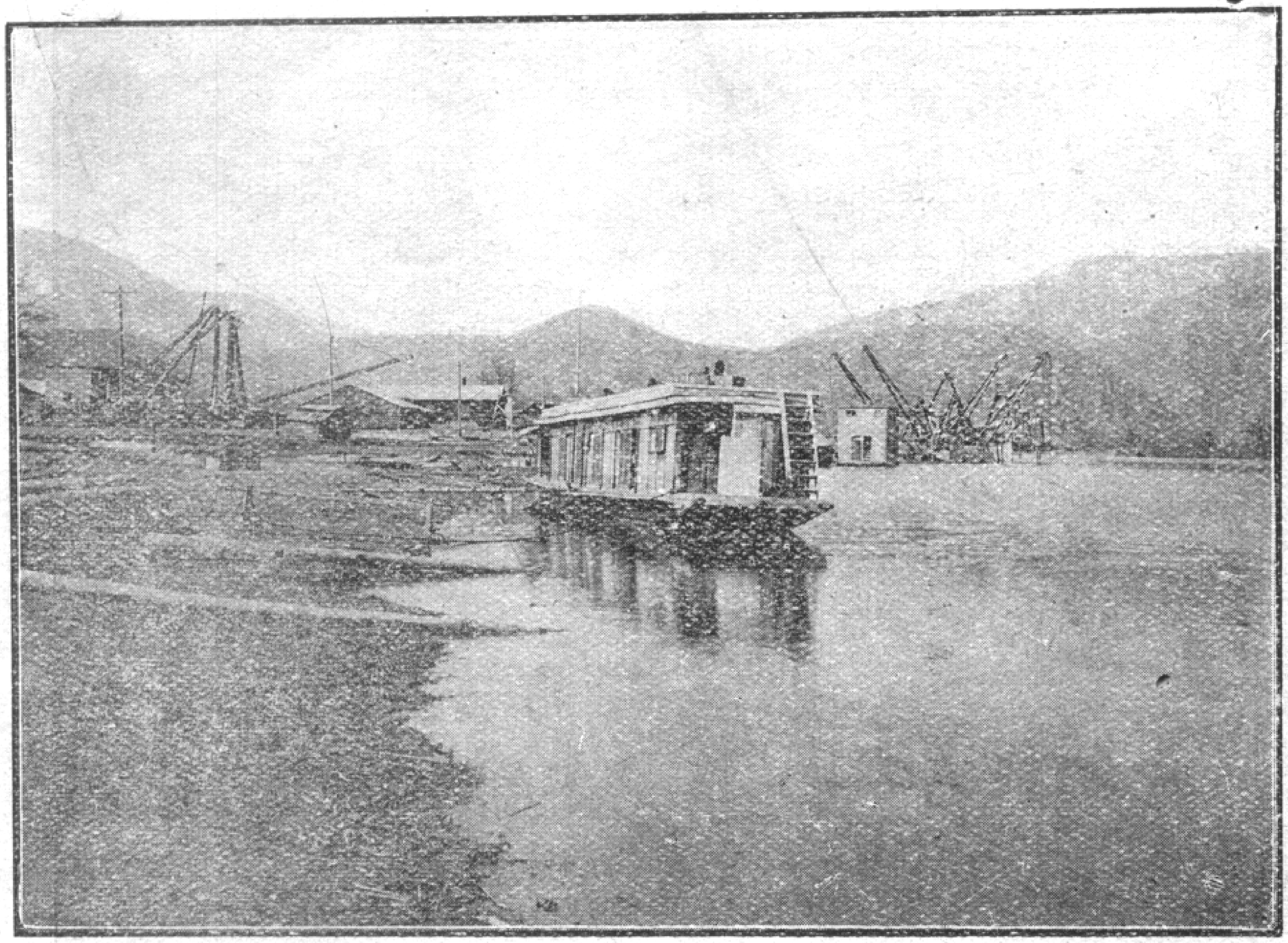
শ্রীনগরের প্রথম পুল



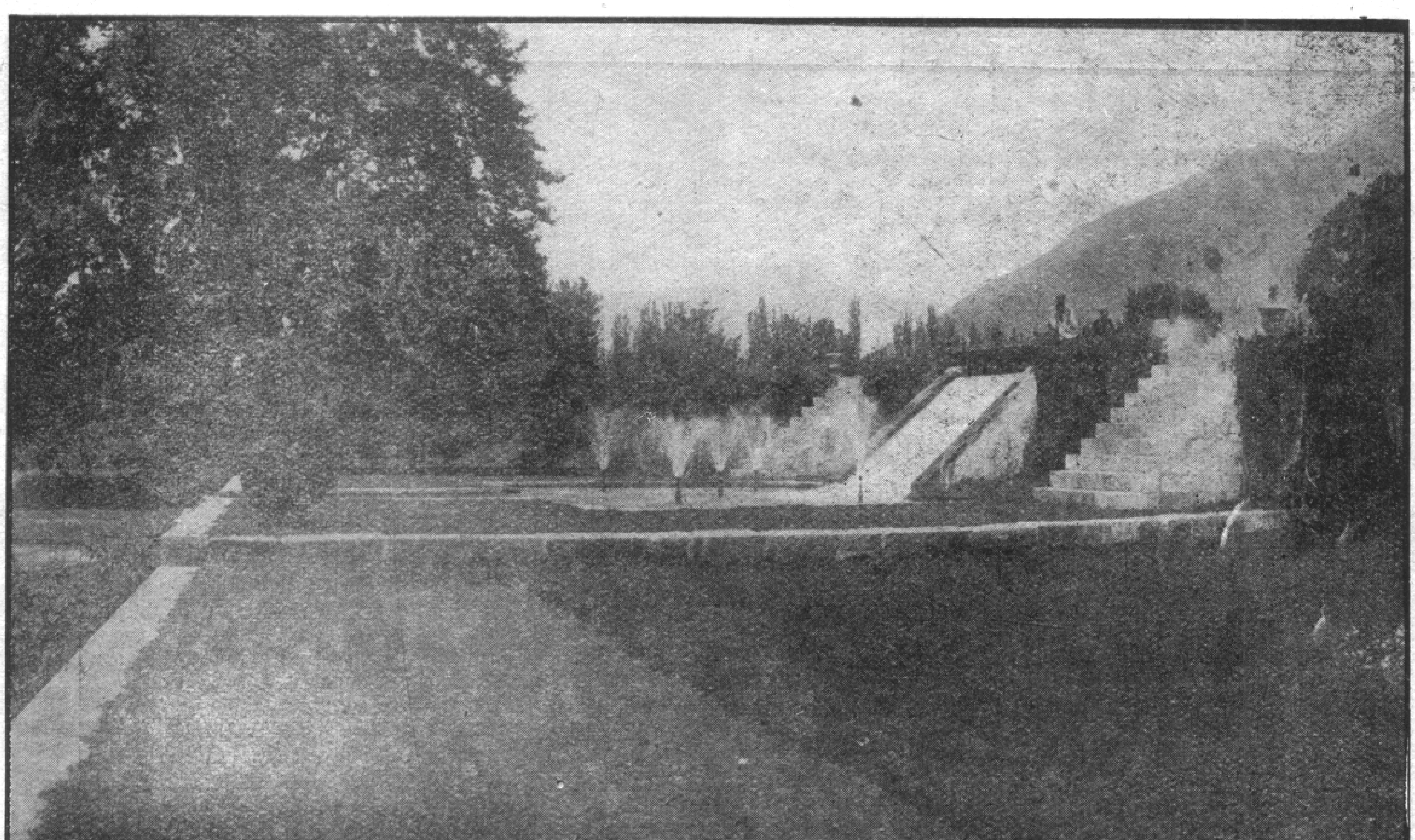
ঝিলাম নদী



ঝিলাম-বক্ষ—অদূরে রাজপ্রাসাদ



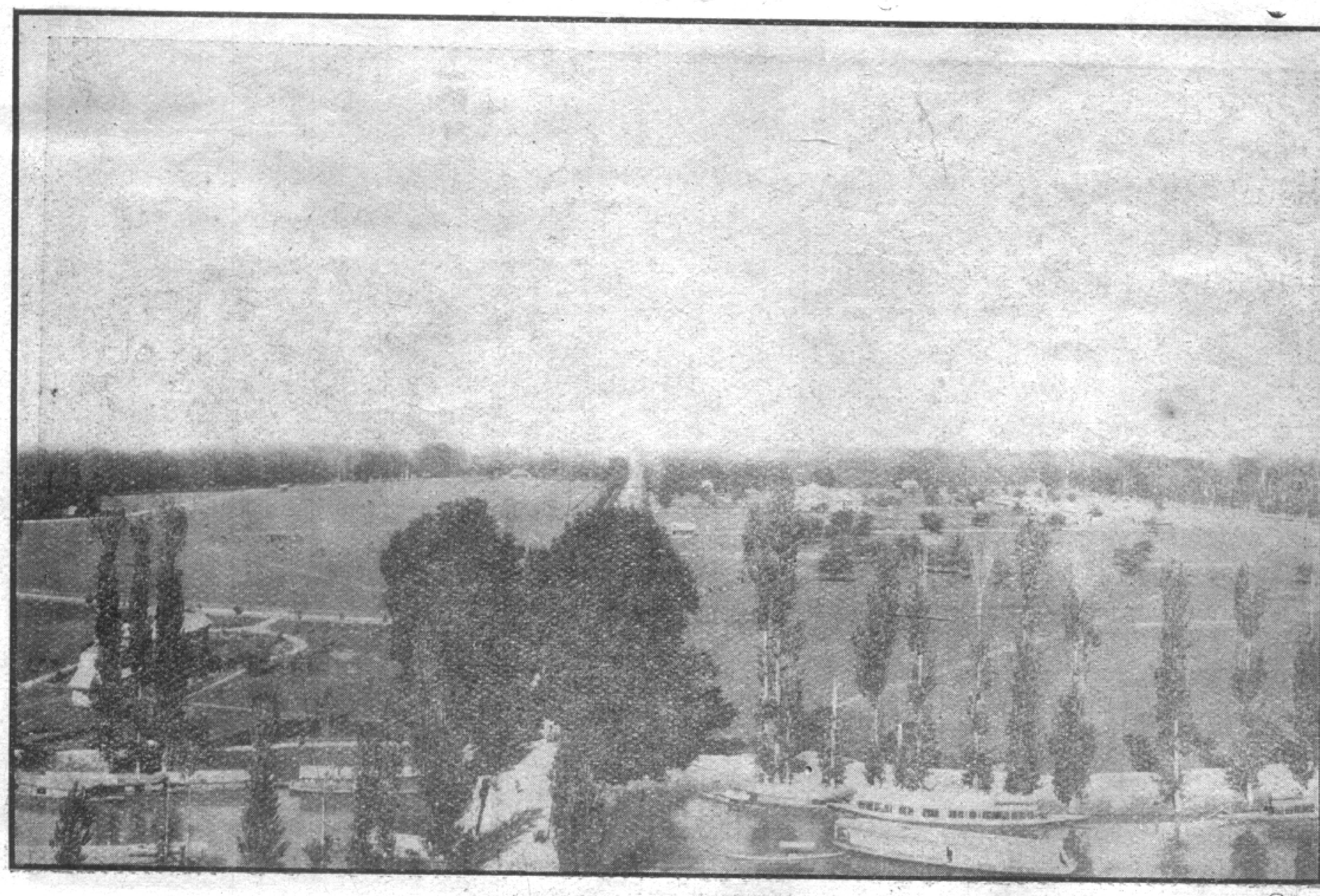
বারামুল্লা নদীবক্ষে হাউসবোট্



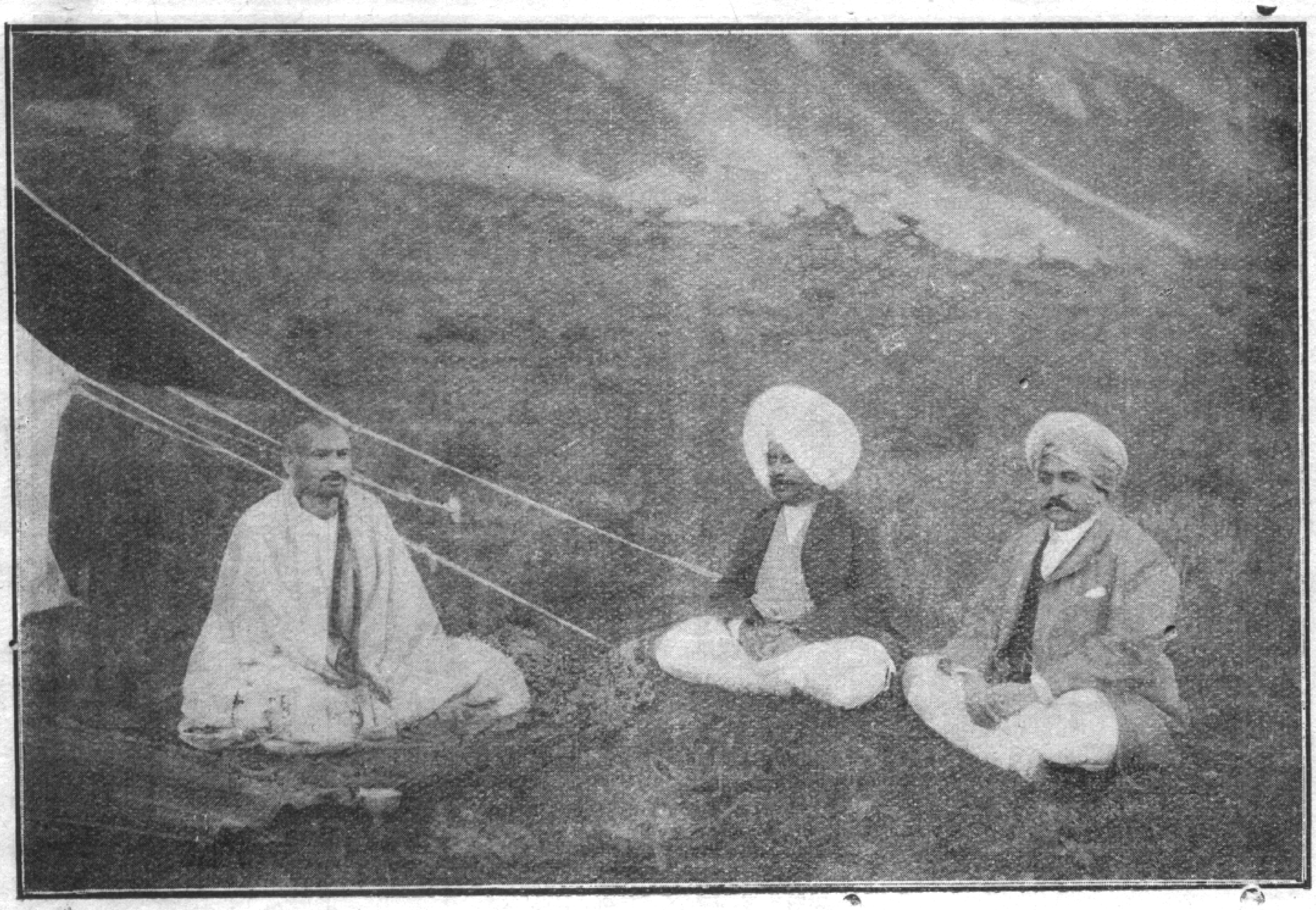
নিশাৎবাগের পূর্ব্বাংশ



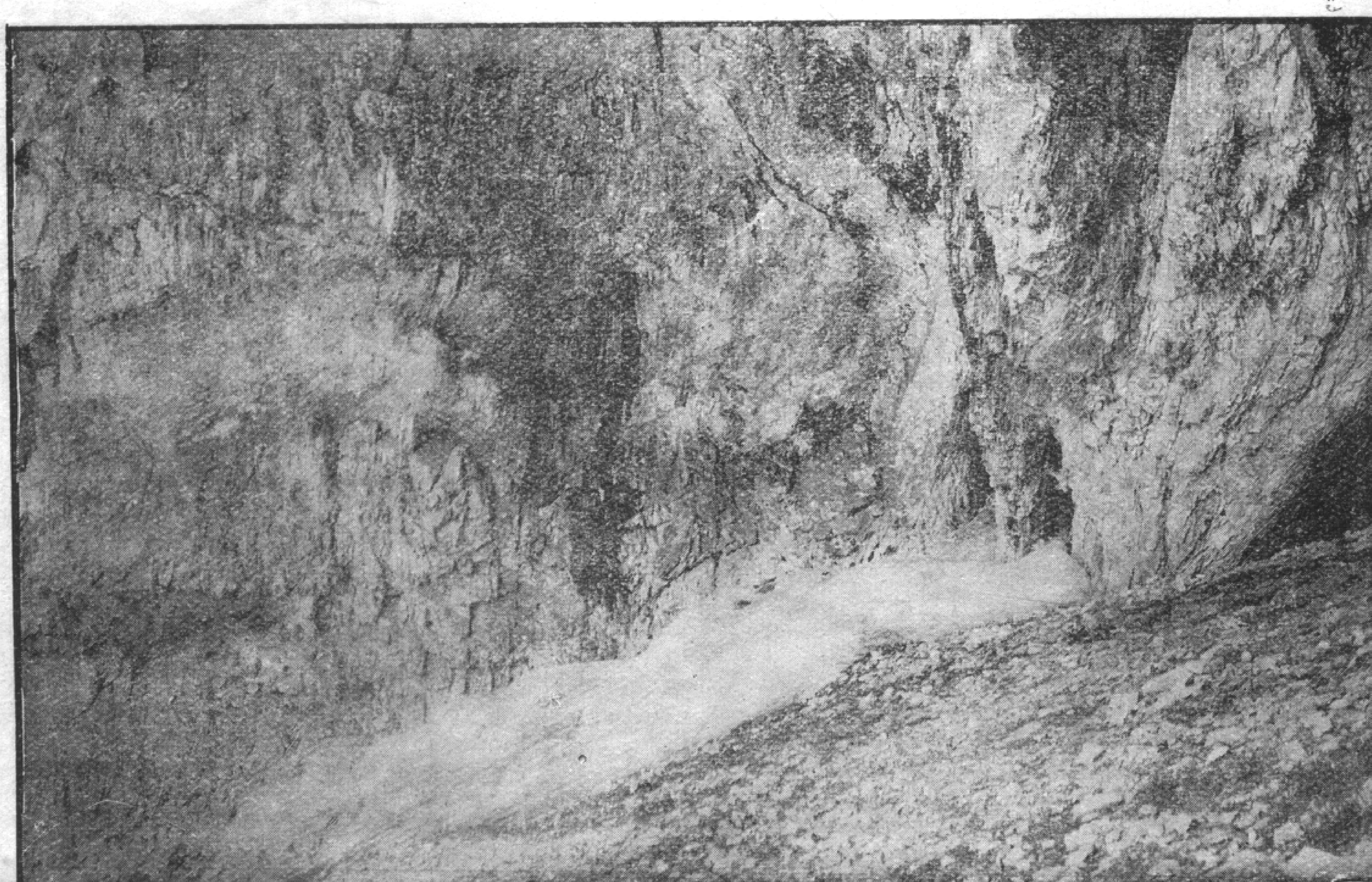
উলর হ্রদের একাংশ



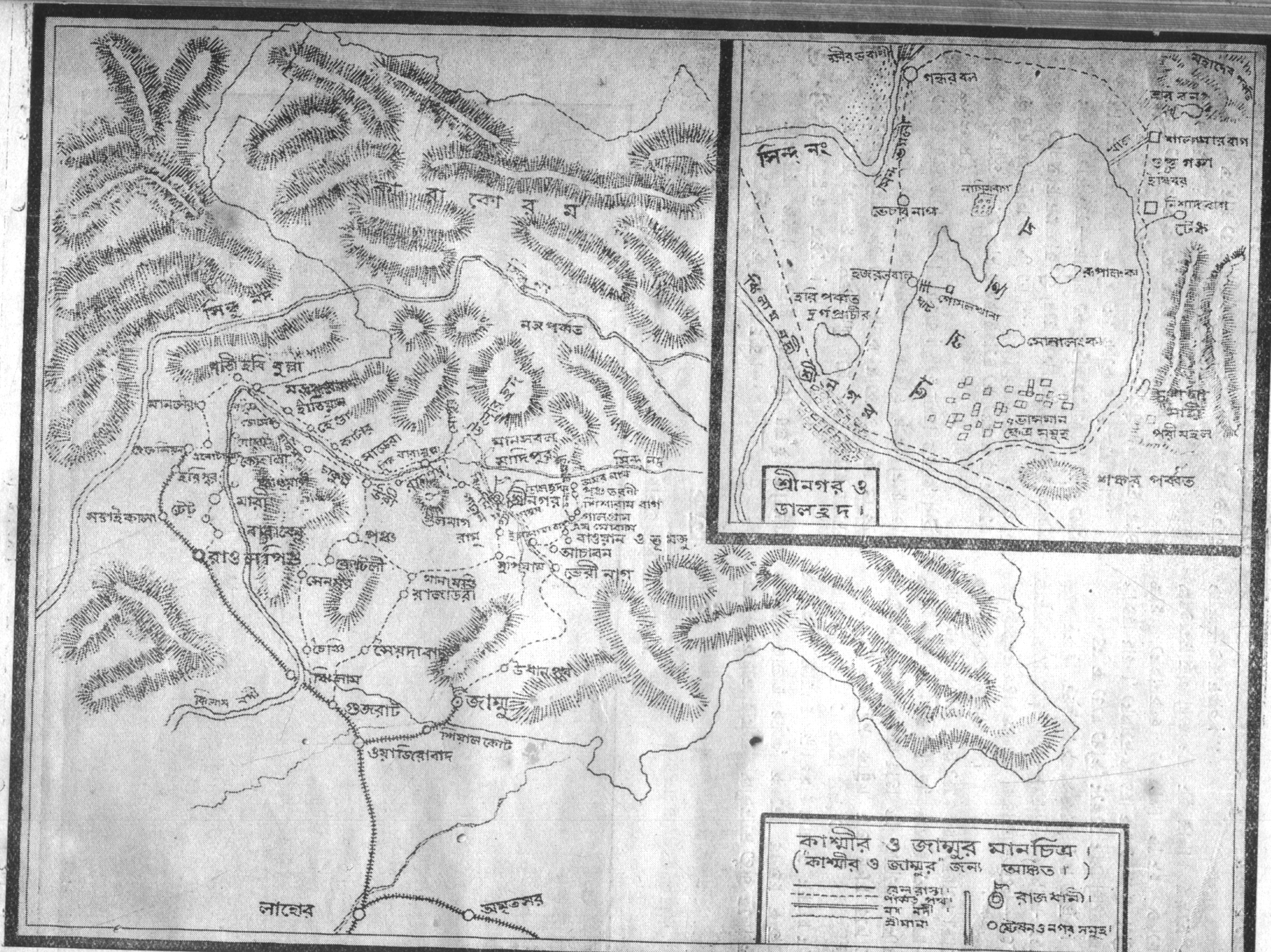
মুন্সিবাগ ও ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড



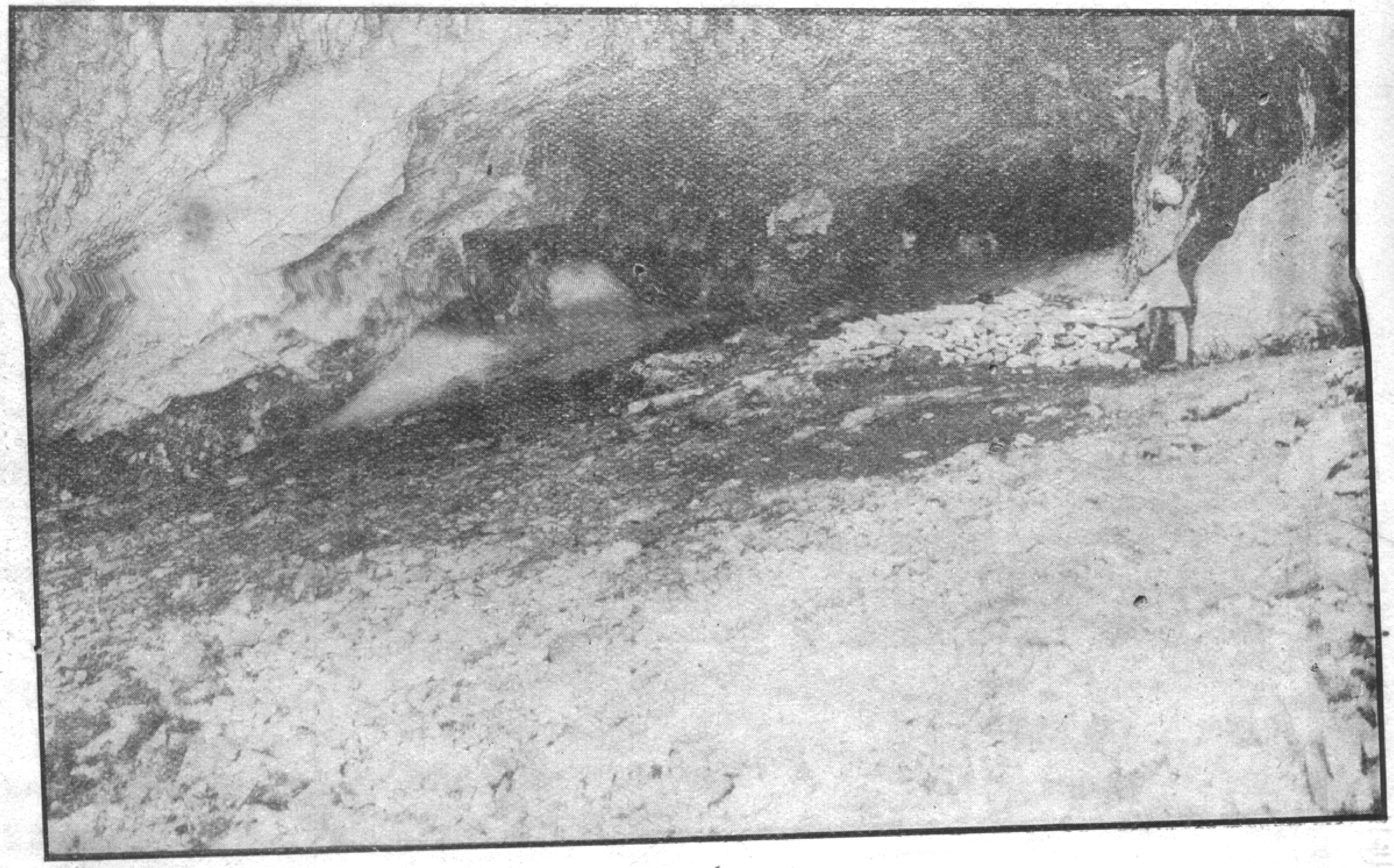
গুরুসমীপে মহারাজ প্রতাপ-সিং



বরফে ঢাকা অমরনাথ গুহামুখ



কাশ্মীর ও জাম্মুর মানচিত্র



তুষারাবৃত পর্ব্বতের একাংশ

কড়া নাড়া

দুপুরের রোদ্দুর ঝাঁ-ঝাঁ করচে।...

সাম্‌নের পড়ো জমিটায় কয়েকটা চড়ুই অবিশ্রাম কিচির-মিচির রব করচে!...

ধানের ক্ষেতের কোলে চুপটি করে' গা এলিয়ে গ্রামের পথ যেন ঘুমিয়ে পড়েচে; মাঝে মাঝে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে কোথাকার পায়ে-হাঁটা পথিক এক-হাঁটু ধূলো নিয়ে হাট থেকে মন্থর পদে বাড়ী ফির্‌চে!...রৌদ্রময়ী প্রকৃতি, নিঝুম স্পন্দহীন!...

আস্তে-আস্তে আমার বন্ধ দুয়ারে কে যেন কড়া নাড়্‌লে। উঠে দরজা খুলে দেখি, সে!...

সে তার নগ্ন বাহুদুটি দিয়ে চুলের খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে মুচকে হেসে বল্লে—বাড়ীর কেউ ঘুমিয়ে পড়েচে, কেউ গেছে পাড়ায় বেড়াতে! আমি সেই ফাঁকে চলে' এসেচি।...

ঘরে এসে ঢুকলুম। সে বল্‌লে—দোরটা বন্ধ করে' দাও, কেউ দেখলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না...

দরজা বন্ধ করে দিলুম।...

সে আমার চেয়ারটায় খানিক বস্‌লে, বইগুলো ওলোট-পালোট কর্‌তে লাগল, ড্রয়ার ধরে' টান মার্‌লে, ট্রাঙ্কটা খুলে ফেল্‌লে, কখনো হাস্‌লে, অভিমানে ঠোঁট ফুলোলে, কখনো গলাটা জড়িয়ে ধর্‌লে, কখনো হাতের কব্জিতে চিম্‌টি কাট্‌লে! তারপর সন্ধ্যা হবার আগেই সন্ধ্যার মতো করুণ একটি দৃষ্টি হেনে সে বাড়ী চলে' গেল!

তারপর কত দিন কাট্‌ল, কত দুপুর চলে গেল, কত বসন্ত ধরণীতে আল্‌তা-রাঙা পা ফেল্‌লে,...আমার কড়া আর নড়ে না! জানি না, কতদূর সে মুঙ্গের—সেখানে গেলে এমনি করে'ই ভুলে যেতে হয়, যেখানে লোকে চিঠির কাগজও কিন্‌তে পায় না!...

একদিন হঠাৎ আবার কড়া নড়ে উঠল—টুঙ্‌ টুঙ্‌ টুঙ! জান্‌লা দিয়ে চেয়ে দেখি—পিয়ন! আথালি-পাথালি করে উঠল বুক! দর্‌জাটা ঝনাৎ করে' খুলে ফেল্লুম!...

...চম্‌কে চেয়ে দেখি, মুঙ্গেরে সাদা চিঠির কাগজ আর পাওয়া যায়না, সেখানে পাওয়া যায় গোলাপী চিঠির কাগজ, আর সেখানকার গোলাপী খামের ওপরে ডগডগে আগুনের তুলি দিয়ে বড় বড় ছাপার অক্ষরে স্পষ্ট লেখা থাকে—শুভবিবাহ!...

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

বর্ত্তমানের দাবী ও বিশ্ব-ভারতী

১

একশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশই যখন ইংরাজের হাতে আত্মসমর্পণ করে আরাম বোধ করছিল, তখন রামমোহন তারও চেয়ে বিশ্বাত্মার পালনী-শক্তির উপর একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করবার আনন্দে গান করেছিলেন—

ভাব সেই একে।

রামমোহনের মর্ম্মবাণী তখন আমাদের মনকে ক্ষণিকের জন্য চঞ্চল করলেও, তখনও এবং সত্য কথা স্বীকার করতে লজ্জিত হওয়া উচিত নয়, এখনও আমরা আমাদের গ্রামের দেবতাদেরই অহরহ ভেবে থাকি; মনে হয় গ্রামের সেই ত হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। সেখানে বিদ্রোহী হবার সাহস আমাদের মধ্যে ক'জনের আছে! আর এও ত চোখে দেখা সত্য যে গ্রামের দেবতা তার বিদ্রোহীকে নাস্তানাবুদ করে,—এই ভয় থাকার দরুণই আমরা 'এক'-কে ভাবতেও পারি না, তাঁর হাতে আত্মসমর্পণও করতে পারি না।

আর আজ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশই যখন আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার চেষ্টায় নানা উপায় অবলম্বন করছিল, উপবাস ও হরতালকে অস্ত্র এবং কংগ্রেস, খিলাফৎ কমিটিকে যন্ত্র করে তুলেছিল, তখনই বাংলার কবির কণ্ঠ হতে সমগ্র জগতে ঘোষিত হয়েছিল। —"বিশ্ব-ভারতী"—

ন্যাশনাল স্বার্থের বাহিরে কি আমরা এখন যেতে প্রস্তুত! এবং যদি প্রস্তুত নই, তার কারণ অন্বেষণ করে দেখ্‌বার সময় কি এখনো আসে নি! আজ্‌কের এই নেশন-'দেবতায় আর একশো বৎসর আগেকার গ্রাম-দেবতায় জাতিগত পার্থক্য কিছু আছে কি! তখন ভাবতুম গ্রামে এক দেবতা জাগ্রত থাকেন বলেই মানুষ খেতে পরতে পায়, আর আজ ভাবচি নেশন-দেবতা জাগ্রত থাক্‌লেই আমরা খেতে পরতে পাব; এবং বংশবৃদ্ধি করাও চল্‌বে।

কিন্তু জীবন সম্বন্ধে এইটেই কি সত্য কথা? আমাদের উৎপত্তি-স্থান কি সত্যই মাটি? জড়শক্তি? পঞ্চভূত? সেইজন্য সেইখানে মিলিয়ে যাবার ভয়ই মানুষের সবার চাইতে বেশী?

২

মানুষ আজ সকলের চেয়ে যে চেষ্টা বেশী করচে তা হচ্চে নব নব শক্তির—জড়ের এবং প্রাণ-মনের আবিষ্কার এবং তা থেকেই অস্ত্রের ও যন্ত্রের উন্নতি।

কেন?

তার সকল সময়েই ভয় যে তাকে সংহার করতে কেহ না কেহ সঙ্গে সঙ্গে ফিরচে, সুযোগ পাবা মাত্রই হিংস্র জীবটা তার হৃদয় বিদীর্ণ করে শোণিত পান করবে।

এই ভয়ই মানুষকে নব নব শক্তির আবিষ্কারে, অস্ত্র এবং যন্ত্রের উন্নতি-সাধনে ব্রতী করচে। পুরাকালের অস্ত্র, যন্ত্র এখনকার শত্রু নিপাত করবার পক্ষে যথেষ্ট বলে কোন সেনাপতিই মনে করে না।

এই ভয়টাই বা এসেচে কোথা হতে? দেহের মৃত্যুতেই প্রাণ, মন আত্মার মৃত্যু, এই বিশ্বাস হতেই না! দেহকেই দেহী ভ্রম করা হতেই না? ঐ দুই-এর জাতিগত পার্থক্য উপলব্ধি করতে হলে যে অনুকূল শিক্ষা এবং অবস্থা মানুষের থাকা প্রয়োজন তার অভাব হতেই না! আজ রাজা থেকে ফকির পর্য্যন্ত সকলেই ঐ আমায় গ্রাস করলে এই ভয়েই দেহ দেহীর ভেদজ্ঞান খুইয়ে দ্রুত ছুটেছে; আজ সকলেরই মন যে শত্রুর ভয়ে ভীত; অশান্তিতে জ্বালাময়। প্রজ্ঞা দেহাত্মবোধের কুজ্ঝটিকায় আবৃত; মন বিমূঢ়; ভক্তিতে আনন্দময় নয়। একটা রব উঠেছে 'চাই শক্তি, চাই অস্ত্র, চাই যন্ত্র। ঐ দেখ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আমার কত শত্রু। এখন ভক্তির কথা আনন্দের কথা শোন্‌বার সময় কোথায়? আগে সকল শত্রুর নিপাত করি, তারপর ধর্ম্মের কথা শুন্‌ব।"

৩

দেহকেই দেহী ভ্রম করা হতে দেহ সম্বন্ধে এখনকার দিনের মানুষ অনেক সত্য জান্‌তে পারে, সন্দেহ নেই। ঐ ভয় তাকে আত্মরক্ষার নব নব চেষ্টায় প্রবৃত্ত করচে, এ চেষ্টাও স্বাভাবিক। মানুষ কেন সকল জীবই মৃত্যুকেই সকলের চেয়ে সত্য ভয় করে। তাই সে এখানকার আলো

বাতাস, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে থাক্‌বার সুখ ভোগ করবার জন্য এত লালায়িত; তার বিশ্বাস বৈতরণীর ওপারে ত সবই ভোঁ-ভোঁ!

এই সুখের লোভে পড়েই না মানুষ শক্তি অর্জ্জন করবার জন্য এত ব্যস্ত যে অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করে অকাল-মৃত্যুকেই স্বর্গে যাবার সিধা পথ জেনে হাত গুটিয়ে, চোখ কাণ বুজে বসে আছে,—তারও চেয়ে মৃত্যুর ভয়ে এই জীবনেরই সুখে লোলুপ হয়েই শক্তিসাধন করা শ্রেষ্ঠ এ কথা মানতেই হবে।

কিন্তু কাল-প্রবাহের মধ্যেও যিনি নিত্য বর্ত্তমান, তিনি যুগে যুগে শ্রেষ্ঠতমকেই চেয়ে থাকেন, এখনও চাইছেন; কেন না একমাত্র তারই মধ্য দিয়ে যে তিনি আত্মবিকাশ করতে পারেন।

এই ভয় পাওয়ায় দরুণ মানুষের যে জ্ঞান বৃদ্ধিই হয়েছে তা নয়, এখনকার বালক বালিকা, তরুণ তরুণী পুরাকালের বল এবং বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত সত্য মানুষদের চেয়েও বলবান, বুদ্ধিমান, স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত; জলে ডুবতে, আকাশে উড়্‌তে, পৃথিবীর উপর পায়ের দাগ রেখে যেতে দড়; ভাবে, এ যদি না করলুম তাহলে আর মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলুম কেন? এ থেকেই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আজ মানুষের শক্তি ছড়িয়ে পড়েছে; তার প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং ইহাও সত্য যে নিখিল বিশ্বের প্রাণীগণের চিত্তও আজ ত্রাস-যুক্ত। আকাশের পাখী এবং জলের মাছও আজ মানুষকে পুরাকালের চেয়ে অনেক বেশী ভয় করে।

কিন্তু এ অবস্থা কি স্বাভাবিক? সেইজন্য দেহাত্ম-বাদীর উপহাস লাঞ্ছনা নিশ্চিত জেনেও তাদেরই সমাজের আনাচে-কানাচে এমন কেহ কেহ জন্মান, যাঁর মনে সন্দেহ হয় বাহিরে সকল সময়েই শত্রু দেখা, আর অন্তরে একটা ভয় জাগিয়ে রাখা, অস্তিত্বকে সকল সময়েই অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যস্ত রাখা, কর্ম্মেন্দ্রিয়কে ঐ ভয়ের বেড়া দেওয়া গণ্ডীর মধ্যে অনুশীলন করাই মানবজীবনের সার্থকতা লাভ করবার সোজা পথ নয়। মানুষের শক্তি বেড়েছে সন্দেহ নেই; এখন মণ্ডলে বসেই ভারত শাসন করা যায়; বার্লিনের রাজপ্রাসাদ হতে একটা আদেশই জলে স্থলে আকাশে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া কাইজারের পক্ষে খুবই সহজ হয়েছিল; নিউ-ইয়র্কের কোন এক তিনতলা হোটেলের বারান্দায় বসে ধূমপান করতে করতে দুনিয়ার বাজারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া আরও কিছুদিন পরে সম্ভব হবে, এখনই যে অসম্ভব তাও নয়। জ্ঞানের, দক্ষতার, অস্ত্রের যন্ত্রের উন্নতি যতই হউক্, দলছাড়া ভাব! রস আনন্দের সাধক কবিরা দেখেন যে ঐ এক ভয় থাকার দরুণই মানুষের জীবন একটা অবিরাম যুদ্ধই হয়ে উঠেছে, এমন কি জগৎ-বিখ্যাত শক্তিশালী জাতিদের নারীগণও স্বভাবের কমনীয়তা হারিয়েছেন; পুরুষদের অবিশ্বাসের ভয়ের চোখে সর্ব্বদাই দেখার দরুণ তাঁরাও নির্ভয়ে থাক্‌বার আনন্দ হারিয়ে প্রতিযোগিতার রুদ্রতা-মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন। বনের হরিণীও যেমন আজ মানুষের হাত থেকে তৃণ তুলে নিতে ভয় পায়, তরুণীও এখন দিনে দিনে তরুণকে অবিশ্বাসের ভয়ের চোখে দেখে সত্য বিশ্বাস করতে পারেন না।

এ অবস্থায় হৃদয়ের তৃপ্তি কোথায়? ঐ গণ্ডীর মধ্যে নর-নারীর মনে অভয়দাতা আনন্দের প্রকাশ না হয়ে সেখানে জলে উঠেছে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধারশ্মির লেলিহান্ শিখা। অর্থের জন্য, অন্নের জন্য, ব্যক্তির, জাতির প্রতাপ প্রেস্‌টিজ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য যেখানে নর-নারী পরস্পরকে ষোল আনা বিশ্বাস না করেও, দল বাঁধে, সেখানে অভয়দাতা আনন্দের প্রকাশ কিরূপে সম্ভব? সেখানেও তাই দেখা যায় একের সহিত অন্যের সংঘর্ষণ। কিম্বা থাবার ভিতর নখ গুটিয়ে রেখে মুখে মিষ্টি হাসি!

কিন্তু আনন্দের সাধকেরা যে অভয়দাতার হৃদয়ের উত্তাপের মধ্যেই চিরকাল বেঁচে থাক্‌তে চান! সে আনন্দ কি দেহাত্মবাদীর বিজ্ঞানে পাওয়া যায়?

৪

সেইজন্য দেহাত্মবাদীদিগকে তন্ন তন্ন করে বিশ্ব প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে, বিচিত্র দৃশ্যের মধ্যে এক স্বাভাবিকতা নিরূপণ করতে, বৈদ্যুতিক শক্তিরও পিছনে আর এক শক্তিকে আবিষ্কার করবার চেষ্টায় নিরস্ত হতে না দেখে আনন্দের সাধক, খাপখোলা তরবারির

ফলকে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিপাতের মত একবার চকিতের জন্য তার পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, হে বিজ্ঞ! তুমি যে শক্তিশালী, তাতে আর সন্দেহ নেই; কিন্তু এত শক্তি আবিষ্কার করেও তুমি ত ভয়ের অতীত হলে না! এ বিজ্ঞান ত তোমায় এমন কোন সত্য বস্তু দেয়নি, যা ধরে তুমি আনন্দ পেতে পার। এর কারণ কি ভেবে দেখেছ? আর তুমি যখন নিজেই তোমার বিজ্ঞানে অভয়দাতাকে পেলে না, তখন তুমি তোমার নেশনকে কি রকমে ভয়ের অতীত অবস্থায় নিয়ে যাবে? এই জন্যই কি দেখচো না তোমার বিদ্যুতালোকদীপ্ত কল-কারখানাতে যে নর-নারী যন্ত্র ঘুরোচ্চে উদরান্নের জন্য, সেই যন্ত্রেই পেশাই হয়ে শ্রমজীবি-সম্প্রদায় যে দিনে দিনে দিনে মহাকালের মূর্ত্তি ধারণ করেচে, এদের নিষ্ঠুর হিংসা হতে তুমি তোমার সম্প্রদায়কেই রক্ষা করবে কি করে?"

অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সুখের, আরামের আয়োজন শতগুণ বেড়েছে সত্য, কিন্তু জীবন হতে অকৃত্রিম ভাব, রস, আনন্দও তারও চেয়ে বেশী দ্রুত গতিতে পিছনে হঠে গেছে। মানুষ ঘুম থেকে জেগেই উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে এক কুহকিনী পিপাসায় বাহিরের দিকে ছুটেছে; অন্যের লোলুপতা হতে কল্পিত স্বার্থ, স্বত্ব রক্ষা করবার জন্য দিবারাত্র অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়েই রয়েছে; অশান্তিতে, অসন্তোষে, বিদ্রোহে সুন্দর এই জীবন, রমণীয় প্রকৃতির আলো এবং ছায়া তৃষ্ণার্ত্তের ক্রন্দনে পরিপূর্ণ করে তুলেছে; অভয়দাতার ক্রোড়ে মানুষ হয়েও তৃষ্ণা ভিন্ন জীবনের আর কোনো অর্থই খুঁজে পাচ্ছে না; তাই এই জগতের সঙ্গে নিত্য ভয়ের সম্বন্ধ। তাই প্রকৃতিকে দাসী করবার এত চেষ্টা। আর প্রকৃতিও মোহিনী, তৃষ্ণার্ত্তের চিত্তকে নিয়ে খেলা করচে। হতভাগ্য জানো এ খেলা তার পক্ষে কি মর্ম্মান্তিক! তৃষ্ণার উপরে আনন্দের শুভ্র আলোর জেগে ওঠবার শক্তি যে তার দিন দিনই নষ্ট হচ্চে। এ ছাড়া ত আর কিছুই হতে পারে না। যখন তাদেরই স্বজাতীয় বৈজ্ঞানিকগণ ঘোষণা করে যে অভয়দাতা আনন্দ এখানে থাকৃতেই পারে না; এ জগৎ যুদ্ধক্ষেত্র; অন্যকে উদরসাৎ না করলে এখানে একদণ্ড বেঁচে থাক্‌বার উপায় নেই! এখানে তাই দেখতে পারচ না যার যেমন জোর, তার তেম্‌নি শ্রীবৃদ্ধি। ছেড়ে দাও অভয়দাতা আনন্দকে চাওয়া, আলোচনা কর জাগতিক ঘটনার বিজ্ঞান। তুমি দুর্ব্বল, পুরোহিতের দ্বারা প্রতারিত, তাই গিরি-নদীকে প্রণাম করতে শিখেছ, তাই তোমার মাথা সর্ব্বদা নীচুই হয়ে আছে;—একবার ছায়া থেকে বেরিয়ে এসো সত্য জগতে দেখ আমরা মাটিতেই জন্মে কেমন পৃথিবীর রাজা হয়েছি! এত শক্তি আর কোনো জীবের আছে! এ শক্তি তোমার লাভ করবার ইচ্ছা যদি না হয় তাহলে তুমি যে পরের পদানতই থাক্‌বে, অকালে মারা যাবে। প্রতাপ-শালীর রথের চাকার তলায় পড়ে অকালে মরা ত জীবনের আদর্শ হতে পারে না, তাই বলি, পুরোহিতের দ্বারা আর প্রতারিত হয়ো না,—স্বয়ং শক্তিবান হয়ে রথের চালক হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ কর। একবার সব নিয়ম আবিষ্কার করতে দাও, দেখবে, মানুষ কত সুখী হয়েছে।

আনন্দের সাধক তার উত্তরে বলেন, "যে পুরোহিত আনন্দ মৃত্যুর পরই পাওয়া যেতে পারে, এখানে কেবল বিধিমতে প্রণামই করে যাও, তার ছলনায় মানুষের উঁচু মাথা নীচুই হয়েছে বটে কিন্তু তুমিও ত বল্‌তে পারচ না যে অভয়দাতাকে এখনই, এই মুহূর্ত্তে পাবার উপায় আছে। সকল নৈসর্গিক নিয়ম আবিষ্কৃত হবে কবে? কত হাজার বৎসর পরে? আর ততদিন কি ভয়েই না আড়ষ্ট হয়ে জীবন কাটাব! যা আমি স্বয়ংই এই দেহে মনে উপভোগ করে যেতে পারলুম না; তা ত কখনই নিত্য হতে পারে না! তুমি দেহটাকে দেখেছ এ জন্য তোমার দেখবার শক্তি আছে, স্বীকার করচি, কিন্তু দেহকেই দেহী যে জ্ঞান অথবা ভ্রম করেছ এ ত আমি তোমাকে মনে না করিয়ে দিয়ে থাক্‌তে পারচি না। তোমার বিজ্ঞানে দেহ সম্বন্ধে অনেক সত্য জানা যায় সন্দেহ নেই, কিন্তু অভয়দাতার সঙ্গে আমার যে একটা যোগ নিত্যই রয়েছে, এ সংবাদ তোমার শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। জগৎ মানুষকে চিরদিনই বিস্মিত করেছে; তুমি এর মোহিনী মূর্ত্তি দেখে ভাব্‌চ একে দাসী করে জলে ডোবা, আকাশে ওড়া, সত্তর মাইল দূর থেকে শত্রুর সহরের গির্জ্জায় গোলা ফেলা খুবইসহজ।

কিন্তু এর যে আরও অনেক মূর্ত্তি আছে এবং সেগুলি একেবারেই প্রিয়দর্শন নয়। তুমি জান্‌তে চাও ফুল কেন ফোটে। আমি জান্‌তে চাই বটে এবং তা ছাড়া আর একটা কাজ করতে চাই! ঐ ফুলটির গন্ধ নিজে ঘ্রাণ না করে যে বিশ্বশক্তির ক্রোড়ে সেটি ফুটেছে সেই শক্তি যাঁর তাঁরই চরণে ঐ ফুল দিয়ে পূজা করতে চাই। পুরোহিতের দ্বারা অভিভূত না হয়েও আমি গান করতে চাই—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-তলে।

জিজ্ঞাসা করি যে মানব সমাজের মধ্যে বাস করে তুমি তার আবির্ভাব, স্থিতিকাল, এবং বিলয় নিরূপণ করচ। কোন্ শক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে এই বৃহৎ মানব সমাজের দুই চারিজন প্রেমোন্মাদ অজ্ঞানতা হতে জেগে উঠে স্তরের পর স্তরে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেই মাটির উপর কল্পিত স্বত্ব ত্যাগ করেছে, সেই সমাজের সঙ্গে কি কেবল অর্থহীন, হৃদয়হীন, অন্ধ শক্তির সম্বন্ধ? তুমি বল্‌চ নিয়মই ফুল ফোটাচ্ছে, কোনো নিয়ামককে ত নিয়মের পিছনে দেখা যায় না যে তাকে শ্রদ্ধা করব, অলৌকিক কিছুই নেই; সকলই স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে থাকে।

বেশ ভালো কথা। কিন্তু তুমি তোমার জীবনে কি কখনো দেখেছ নিয়ম আছে, অথচ হৃদয়বান নিয়ামক নেই। এই মানব সমাজই ত তোমার কণ্ঠে বাণী দিয়েছে; তুমি যখন নিয়মের চোরা বালিতে পথ-হারা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়, ভাবো, প্রকৃতি যে দেখচি অর্দ্ধেক নাগিনী, অর্দ্ধেক রমণী, তাই রূপে আকৃষ্ট করে, বিষে জর্জ্জর করে, শেষটা না জান্‌তে পারার বেদনায় মনে হয় যা জানা গেছে তার কোনো মূল্যই নেই,—তখন নিয়ামকে বিশ্বাসহীন তোমারও হতাশ হৃদয়ে আশার আলো ফুটিয়ে তুলে তোমাকে আবার নবীন করে তোলে মানব সমাজ, বিশ্ব জগৎ; এই মানুষই তোমার রুগ্নাবস্থায় সেবা করে, আনন্দের সময় চারিদিক হতে অনাহূত, আহূত, রবাহূত এসে আনন্দ-উজ্জ্বল পরিপূর্ণ করে, এ-সকল কি হৃদয়হীন জড়শক্তির দ্বারা, কেবল নিয়মের দ্বারাই হয়ে থাকে? তা ত হবার নয়। যে বিশ্ব-জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তুমি কার্য্য-কারণের দ্বারা সমস্ত দৃশ্য বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করচ, সকলই স্বাভাবিক নৈসর্গিক শক্তির ক্রিয়া মাত্র ধরে নিয়ে কিছুদিনের জন্যও একটা theory দাঁড় করাচ্ছ, আবার নূতন নূতন ঘটনা ঘটতে দেখে সেই theory কেই ভাঙ্‌চ, আজ পর্য্যন্ত তোমার কত theory মিথ্যা প্রমাণ হয়েচে।

কিন্তু গর্ভধারিণী মাতা যে-স্নেহে সন্তানকে লালন পালন করেন, সেই স্নেহ ত তেম্‌নি নিত্য রয়েছে, এর উপর কালের কালো ছাপ ত এখনো পড়েনি। এই বিশ্ব প্রকৃতিতে যদি কার্য্য-কারণ সম্বন্ধই একমাত্র সম্বন্ধ হয়, তাহলে মানুষের ভ্রম আসে কোথা হতে? আনন্দই বা কোন্ নিয়মের ফল? কোন্ কারণ থাকার দরুণ প্রেমোন্মাদ মহাপুরুষগণ নিজ স্কন্ধে ক্রুশ বহন করে তাদেরই কাছে যান, যারা নিয়মের এক চুল এদিক ওদিক দেখলেই আত্মত্যাগী মহাত্মাদের নর-ঘাতকের পাশেই ক্রুশে চড়ায়, কারাগারে বন্দী করে?

এ কেন হয় যদি জড়শক্তি, দেহাত্মবাদই একমাত্র সত্য হয়? তাহলে ফুল কেন ফোটে? চাঁদ কেন হাসে? নদীর বুকে কেন লহরী নৃত্য করে? জীবের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়? মানুষকে ভালবাসে! শব্দের মধ্যে প্রাণ-মন-আত্মার শক্তি কম্পিত হলেই কেন কাব্য অমর হয়? চারিদিকে একটা অলৌকিক আগুন সৃষ্টি করে মিথ্যা দেহাত্মাকে পুড়িয়ে ফেলে মানুষকে নিয়মের বাহিরে আনন্দে নিয়ে যায়, নব সভ্যতার সৃষ্টি হয়? নব নব সভ্যতা তো যুগে যুগে আনন্দ হতেই সৃষ্টি হয়েছে। এ সকলই ঐতিহাসিক সত্য। কেন এ রকম হয় যদি জগতের আদি কারণ ভাবময় আনন্দময় না হবে?

আনন্দ ছাড়া মানুষের অভয় কোথায়? আনন্দ যে মৃত্যুর এলাকার অনেক উর্দ্ধে।

৫

মানুষ কেন, জীবমাত্রই ভয়ের বশীভূত; মানুষ আবার সকলের চেয়ে বেশী। তাই উদরে ক্ষুধা এবং কণ্ঠে তৃষ্ণা না থাক্‌লেও সে হিংস্র জীব দেখলেই তার হিংস্রতা করবার পূর্ব্বেই তাকে হত্যা করে। এই প্রবৃত্তির মূলে আত্মরক্ষার,

সন্তান-সন্ততি, সম্প্রদায়, কুল, নেশন রক্ষা করবার চেষ্টা আছে বলে এটাকে সভ্য মানুষেরই লক্ষণ বলা হয়।

এমন কি যার স্বভাব সম্বন্ধে মানুষ কিছুই জানে না, তার পানেও সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এই ভয় পাবার এবং দেখবার শক্তি থাকার দরুণই দুর্ব্বলেরা সবলের শত যোজন দূরে সরে যায়; এই রকমেই সভ্যতা এক একটী বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর কুলের, নেশনের এই সভ্যতা হয়ে পড়ে। মাঝে থাকে ভয়ের দূরত্ব, অবিশ্বাসের vacuum,—যার ভিতর দিয়ে কোনো মর্ম্মবাণীই বহে গিয়ে সকল মানুষকে একই সুখে সুখী, একই দুঃখে দুঃখী করতে পারে না।

কিন্তু এ অবস্থায় সেই স্বাধীনতা কোথায় যার ফলে মানুষ আনন্দের অধিকারী হতে পারে?

ভয় যেমন তার দেহকেই দেহী করা হতে আসে, ভক্তিও তেম্‌নি আসে কোন্ এক মহাপুরুষের হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগে। ইনি বংশের আদি জনক, কুলপতি, নেশনের রাজা, ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, কিম্বা বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা, লয়-কর্ত্তাও হতে পারেন। ভক্তি স্বভাব হতেই আসে, স্বর্গের শোভা দেখিয়ে কিম্বা কাঁধের উপর শাণিত তরবারি ধরে কাকেও ভক্ত করা যায় না। বহু ধর্ম্ম-গ্রন্থ মুখস্থ করে, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে, সাধু-সন্ন্যাসীর পদ সেবা করে ভক্তির ছায়া মানুষ পেলেও পেতে পারে; কিন্তু আসল বস্তুটী পেতে হবে তার সাত্ত্বিক প্রকৃতির, সাত্ত্বিক আহারে পরিপুষ্ট জীবন দেহেরই মধ্যে। দেহের পরিপুষ্টির সার্থকতা ঐখানেই, যাতে সে ভক্তি আনন্দ হতে সৃষ্টি করতে পারে,—কি নব নব প্রাণী, কি নব নব সভ্যতা। অতিকায় দেহের কোনো মর্য্যাদা নেই যদি অতিকায় হওয়ার দরুণই নব প্রাণীকে সৃষ্টি করবার সামর্থ্য না থাকে। নব প্রাণীর, নব সভ্যতার সৃষ্টি দেহকে অবলম্বন করেই দেহী করে সত্য, কিন্তু দেহকেই দেহী জ্ঞান অথবা ভ্রম করার ন্যায় মারাত্মক অপরাধ আর আছে কি?

একশত বৎসর আগে আনন্দ হতেই গীত হয়েছিল "ভাব সেই একে।" তার কিছুকাল পরে আনন্দ হতেই "শান্তি-নিকেতন" স্থাপিত হয়েছিল, এবং এখন আনন্দ হতেই "বিশ্ব-ভারতী" জগতে ঘোষিত হয়েছে। কেন? দেহকে সাত্ত্বিক আহারে পরিপুষ্ট করে সংসার-বৃক্ষটীতে "ঊর্দ্ধমুখং অধঃগমং" রূপে দেখবার অনুকূল অবস্থা এবং শিক্ষা দেবার জন্যই না? এই কি আশার কথা নয় যে এখনো আমাদের সাধকদের মধ্যে সাধনার ঐতিহাসিক ধারা একেরই দিকে বহে চলেছে, এ দেহাত্মবাদের যুগেও। তাঁরা কখনো দেহাত্মবাদীর বিজ্ঞান চূড়ান্ত জ্ঞান করে আমাদের মনে দেহের মৃত্যু-ভয়কেই জাগিয়ে রাখেন নি,—আনন্দকেই ধরে আছেন,—যেমন আনন্দই বিশ্বকে ধরে আছে এবং নিত্য লীন করচে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সমালোচক

১

নবীন সাহিত্যিক বিনয়কুমার দত্ত তাঁর বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, এবং তাঁর স্ত্রী অলকা দেবী অদূরে বসিয়া লেস্ বুনিতেছিলেন। শীত-কালের পরাহ্ণ। বিনয় বাবু উচ্চৈঃস্বরে কাগজের নানা খবরের শিরোনামাগুলা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন।

"জাভায় সংক্রামক ব্যাধি। বিলাতের উরুষ্টারসায়ারে ধর্ম্মঘট। লুধিয়ানায় ট্রেণ ধ্বংস। ফ্রান্সে মাডাম্ আনা পাভ্‌লোভা। কলিকাতায় গুণ্ডার অত্যাচার।"

কাগজখানা নিক্ষেপ করিয়া বিনয় বাবু স্ত্রীকে বলিলেন, "নাঃ, এ ভাল লাগে না! কেবলি ধ্বংস, মারামারি আর অত্যাচার—যত রাজনৈতিক ব্যাপার! আমায় বৈজয়ন্তখানা এনে দাও ত গা।"

অলকা হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ! ও কাগজ

আবার মানুষে পড়ে! ওতে না আছে গল্প, না আছে কবিতা, না আছে থিয়েটারের কথা!"

এই বলিয়া অলকা ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের ভিতর হইতে সাপ্তাহিক "বৈজয়ন্ত" পত্রিকাখানা আনিয়া স্বামীর হাতে দিলেন। বিনয় বাবু তার দুই-একখানা পাতা উল্টাইয়া বলিলেন, "সান্ থিয়েটারে আমাদের অশেষ বাবুর একখানা নতুন বইয়ের খুব জোর অভিনয় চল্‌চে, দেখছি!"

"কি বই গো?"

"কর্পূর-অঞ্জন।······যাক, অশেষ বাবুর বইখানা যে চলে গেছে, এতে আমার ভারি আনন্দ। শুনেছ অলকা, অশেষ বাবুর আর একখানা বিয়োগান্ত নাটক সান্ থিয়েটারে রিহার্সাল দেবার কথা আছে।"

"আবার কি নতুন বই?"

"মোসলেম-বঙ্গ।"

"কবে থেকে রিহার্সাল হবে?"

"আজ সন্ধ্যায়। আমার যাবার কথা আছে।"

বেহারা আসিয়া খবর দিল, সুরেশ বাবু আসিয়াছেন। সুরেশ বাবু একজন লেখক। অলকা দ্রুত ঘরের ভিতর প্রস্থান করিলেন। একটু পরে সুরেশ বাবু বেহারার সহিত প্রবেশ করিয়া বিনয় বাবুকে নমস্কার করিলেন। বেহারা চলিয়া গেল।

"আসুন, আসুন, সুরেশ বাবু,······বসুন—তারপর? সব খবর ভাল ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, উপস্থিত ভালই!......আমি এসে আপনার কোন ক্ষতি করলুম না ত?"

"Oh, no no! বৈজয়ন্তখানায় অশেষ বাবুর কর্পূর-অঞ্জনের সমালোচনা পড়ছিলুম। তার পর অশেষবাবুর নতুন বই 'মোসলেম বঙ্গের' প্রথম অভিনয়-রজনীতে আসছেন ত?"

"হ্যাঁ। টিকিট পেলে যাবার ইচ্ছা আছে।" একটু থামিয়া সুরেশ বাবু আবার বলিলেন, "আপনার কাছে একটু কাজে এসেছি, বিনয় বাবু।"

"বলুন—"

"দেখুন বিনয় বাবু, সাহিত্যিক এবং সমালোচক বলে আপনার যথেষ্ট সুনাম আর প্রতিপত্তি আছে!"

"কিছু না, কিছু না! এখন আসল কথা বলুন—"

"কলকাতার থিয়েটারগুলোর ওপরও আপনার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।"

"না, তা না, তবে হ্যাঁ,—সকলেই আমায় ভালবাসেন। তার পর ব্যাপার কি?"

"আমার দু'খানা বই আপনার কাছে দিয়ে যাচ্ছি, আপনাকে যেমন করে হোক, এর একখানা সান্ থিয়েটারে চালিয়ে দিতে হবে। আমি জোর করে বল্‌তে পারি, এ-রকম বই কখনো থিয়েটারে বেরোয় নি। একদম্ নতুন ষ্টাইলে লেখা।"

"মাটী কর্‌লেন, মাটী করলেন সুরেশ বাবু! আবার সমালোচনা! এঃ! আপনারা আমায় একটুও বিশ্রাম কর্‌তে দেবেন না দেখছি!"

"বই নিজে লেখার চেয়ে, সমালোচনা করে ত' আপনি বেশী আনন্দ পান বিনয় বাবু।"

"সে কথা ঠিক। সমালোচনা করা বড় কষ্টকর ব্যাপার, কিন্তু আমোদের কাজ, তাতে কোন ভুল নেই! জানেন সুরেশ বাবু, এমন এক-একটা দিন আসে, যখন প্রাতঃকালে বসে সবে মাত্র চায়ের বাটিটা হাতে করে তুলেছি, আর এক ডজন লোক এসে উপস্থিত—যাদের মুখ পর্য্যন্ত জীবনে কখনো দেখি নি! এক পেয়ালা চায়ের বদলে বারো পেয়ালা চা খরচ হয়ে গেল, দু স্লাইস্ টোষ্টের জায়গায় ছখানা গ্রেট-ইষ্টার্নের রুটিতেও কুলিয়ে উঠতে পারিনে! তা যাক, কিন্তু এতে আমোদ আছে। এতে যে পয়সা খরচ হয়, সমালোচনা করে তার সুদ-শুদ্ধ পুষিয়ে নি! ভারি আনন্দ সমালোচনায়, ভারি আনন্দ,সুরেশ বাবু!"

"সেই সাহসেই ত' বিরক্ত করতে আসি!"

"কিছু না, কিছু না! এমন একটা হপ্তা আমার যায় না, যখন অন্তত পঞ্চাশখানা চিঠি আমি না পাই! কেবল সমালোচনার জন্য অনুরোধ, থিয়েটারে বই দেবার জন্য অনুরোধ! আমার নিজের কাজের জন্য এক লাইনও কেউ লেখে না!"

সুরেশ হাসিয়া বলিলেন, "ভারি মজার কথা, বটে !"

বিনয় বাবু বলিলেন, "কি বই আপনার, দেখি—"

সুরেশ বাবু বিনয় বাবুর হাতে একখানা খাতা দিলেন; বিনয় বাবু দু-চারখানা পাতা উল্টাইয়া বলিলেন, "ক্রন্দন ও প্রস্থান ! এটা কি বিয়োগান্ত নাটক ?"

"না। ওটা একটা চমৎকার মিলনান্ত ব্যাপার। ভাবে পরিপূর্ণ, আগাগোড়া কেবল চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস !"

"I see ! বটে !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ ! এটা তর্জ্জমা নয়, একখানা ফরাসী নাটকের ভাব নিয়ে লেখা,—সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ !"

"কিন্তু লক্ষ্য করেছেন, আজকাল দর্শকদের মধ্যে কি রকম একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে ?"

"বিশেষ পরিবর্ত্তন ! সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই !"

"কি নাম দিয়েছেন বইটার ?"

"নব-যুগের মনোচোর !"

"চমৎকার নাম, নতুন ধরণের বটে !"

"ব্যাপারটা হচ্ছে আধুনিক ফৌজদারি আইনটাকে ফুটিয়ে তোলা, উদ্দেশ্য দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন, অর্থাৎ শিক্ষার ব্যাপার।"

"যথার্থ শিক্ষাপ্রদ বটে !"

বেহারা আসিয়া বলিল, কৃষ্ণধন কাব্যরত্ন আসিয়াছেন। বিনয় বাবু কৃষ্ণবাবুকে উপরে আনিতে বলিয়া সুরেশ বাবুকে বলিলেন—"জানলেন সুরেশ বাবু, এই লোকটা নিজের লেখা ছাড়া অপরের লেখাগুলোকে বলে রাবিশ্ ! আসলে নিজের লেখবার কোন ক্ষমতা নেই ! যদিও এ কথা আমার বলা উচিত নয়, কারণ সেও বন্ধু !"

"আপনি তাঁর নতুন নাট্য-কাব্যখানা পড়েছেন বিনয় বাবু ?"

"হ্যাঁ, কেবল বাজে কথার রাশি !" সিঁড়িতে কৃষ্ণ ধন বাবুর পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া বিনয়বাবু উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কৃষ্ণবাবুর লেখার মধ্যে যথেষ্ট রস আছে !" ও চোখ টিপিয়া সুরেশকে বাহিরের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। একতাড়া কাগজ হস্তে কৃষ্ণবাবু প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়া বিনয়বাবু শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "আসতে আজ্ঞা হয়, আসুন কৃষ্ণবাবু ! এইমাত্র আপনার নতুন নাট্য-কাব্যের কথাই হচ্ছিল ! ভারি চমৎকার বই হয়েছে ! আপনার সঙ্গে সুরেশ বাবুর পরিচয় আছে বোধ হয় ? বেয়ারা আর একখানা চেয়ার দিয়ে যা।"

বেহারা চেয়ার দিয়া গেলে, কৃষ্ণবাবু তাহাতে বসিয়া বলিলেন, "সুরেশ বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে বৈ কি। তার পর বিনয়বাবু, বাড়ীর সব মঙ্গল ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, উপস্থিত সব মঙ্গল।......আপনার বই কোন থিয়েটারের ম্যানেজারকে পাঠিয়েছেন না কি ? বলেন ত' সে বিষয়ে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি।"

"আজ সকালে প্রসরপিন্ থিয়েটারে বইটা পাঠিয়েছি ! দেখি, ওরা কি বলে !"

সুরেশবাবু বলিলেন, "ও থিয়েটারটায় কিন্তু অভিনেতা ভাল নেই। তার চেয়ে যদি সান্ থিয়েটারে পাঠাতেন—"

"আপনি জানেন না সুরেশবাবু, সেখানে অন্য লেখকের বই যাবামাত্র সেটা গাপ হয়ে যায়, পরে সেই বইই ওখানকার ম্যানেজারের নামে অল্প একটু অদল-বদল করে অভিনয় হয়।"

"কি সর্ব্বনাশ ! কথাটা কি সত্য বিনয়বাবু ?"

"হতে পারে ! কিছু বিচিত্র নয় !"

কৃষ্ণবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তার পর বিনয় বাবু, আমার বইটা তাহলে আপনি পড়েছেন ?"

"পড়েছি বই কি ! আমি মুক্ত কণ্ঠে বলছি, বই চমৎকার হয়েছে।"

"আপনি হলেন সমালোচক,—আমার বইখানার দোষ-গুণ সবই আপনার বলা উচিত। তা যদি না বলেন, তা হলে আমার ভুল সংশোধনের কোন উপায়ই থাকবে না।"

বিনয় বাবু বলিলেন, "তাহলে আপনি যদি আমায় অনুমতি দেন ত' সাহস করে একটা সামান্য ভুলের আমি উল্লেখ করি !"

"ভুল ধরে দেবার জন্যই ত' বইখানা আপনার হাতে দেওয়া ! বলুন—বলুন···কোথায় কি দোষ আছে !"

"দেখুন কৃষ্ণ বাবু—বইখানির লেখা চমৎকার, ভাষা অতি উত্তম, কাগজ বাঁধাই যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট! কিন্তু ঘটনা বলতে গেলে এর মধ্যে কিছুই পেলুম না।"

কৃষ্ণবাবু বলিলেন, "সুরেশ বাবু, আপনি কি বলেন?"

"রাগ করবেন না কৃষ্ণবাবু—বইখানার প্লটে মাথা-মুণ্ড খুঁজে পাওয়া শক্ত! কিছু মনে করবেন না, আপনি আমায় বন্ধু ভাবেন বলেই কথাটা বল্লুম!"

"আপনার কথা আমি অস্বীকার করতে পারি না সুরেশ বাবু। কিন্তু ঘটনা আর প্লটই ত' আসল জিনিষ নয়, আসল জিনিষ হচ্ছে ভাষা। কি বলেন বিনয়বাবু আপনি বিজ্ঞ সমালোচক, আপনিই বলুন—"

"তার কোন ভুল নেই। সুরেশ বাবুর ও-কথাটা ভুল। তবে অভিনয়ের পক্ষে বইটা একটু বড় হয়ে পড়েছে, এই যা দোষ।"

"আপনি কি অভিনয়ের স্থায়িত্ব-কালের কথা বলছেন? তা যদি হয়, ত আপনার সমালোচনা মানব না বিনয়বাবু। কারণ এ-ক্ষেত্রে ঘড়িই হল প্রকৃত সমালোচক। আসলে কিন্তু গল্পটা খুবই ছোট!"

"তা হবে। তাহলে বোধ হয় আমার স্ত্রী খুব ধীরে ধীরে পড়ছিলেন বলেই আমার এত বড় বলে মনে হচ্ছিল। কারণ প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের সময় আমার তন্দ্রা এসেছিল, চমক ভেঙে দেখি একেবারে বেলা ছ'টা। বারোটা থেকে ছ'টা পর্য্যন্ত যদি পড়তেই লাগে, অভিনয়ে নিশ্চয়ই আরো বেশী সময় লাগবে বলে মনে হয়।"

"কিন্তু চতুর্থ দৃশ্যের সময় থেকে যে আপনি তন্দ্রামগ্ন হয়েছিলেন বিনয় বাবু! কাজেই—"

"তা বটে! কিন্তু তন্দ্রাভঙ্গে দেখলুম, আমার স্ত্রী তখনো পড়ছেন।"

বেহারা আসিয়া বলিল, সান্ থিয়েটারের ম্যানেজার একদল হিন্দুস্থানি গাইয়ে বাজিয়ে পাঠাইয়াছেন।

"কি সর্ব্বনাশ! গান-বাজনার অক্ষরো আমার বোঝবার ক্ষমতা নেই!"

সুরেশ বাবু বলিলেন, "যখন লোকগুলো এসেছে, তখন দু-একটা গান শোনা উচিত!"

বেহারাকে, গায়ক ও বাদকদের পাঠাইতে বলিয়া বিনয় বাবু বন্ধুদ্বয়কে বলিতে লাগিলেন, "সমালোচক হওয়ার ঠেলা বুঝতে পারছেন, আপনারা! এখন এই দেড় ডজন ওস্তাদকে খাতির করতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে।"

সারিঙ্গি, সেতার, সুরবাহার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র হস্তে বড় বড় পাগড়ী মস্তকে, মুসলমান, খোট্টা ওস্তাদগণ প্রবেশ করিল। বিনয় বাবু উঠিয়া শশব্যস্তে বলিলেন, "আসতে আজ্ঞা হয়! আসুন আপনারা সব। এই বেয়ারা, কার্পেটখানা পেতে দে।"

সকলের প্রধান ওস্তাদ দাড়ি ও পাগড়ি নাড়িয়া বলিল, "সালাম ফোরদোস্ত! মগর আপই মালিকান হুঁ?"

"কি বলছেন?"

"ময় নে পুছতেহুঁ আপঁই মালিক-উল্‌মুলুক্?"

"ও সুরেশ বাবু, এরা বলে কি? বেয়ারা, বেয়ারা, জলদি কার্পেট লে আও!"

"বহুত বহুত সালাম সাব্! আপঁই-কা মিজাজ আচ্ছা হুঁ?"

"বৈঠো, বৈঠো, ওস্তাদজিরা—"

"বেসক্! লেকিন্ ময় নে এক-দো বাত পুছতে হুঁ!"

"বেয়ারা, বেয়ারা কার্পেট—জলদি কার্পেট—"

বেহারা কার্পেট আনিয়া পাতিয়া দিল। ওস্তাদগণ তাহার উপর যন্ত্র-পাতি রাখিয়া বসিয়া পরস্পর উর্দ্দুতে কথা কহিতে লাগিল, কেহ আপন উত্তরীয় নাড়িয়া বাতাস করিতে লাগিল। বিনয় বাবু বলিলেন, "কেষ্ট বাবু, এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাই কি উপায়ে?

"কেন আপনি কি ওদের কথা বুঝতে পারছেন না?"

"এক-বর্ণও না!"

এমন সময় প্রধান ওস্তাদ সুর-বাহারটায় সুর বাঁধিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ফরমাইয়ে জনাব—"

বিনয়বাবু বলিলেন, "হাঁ—হাঁ, গাও, বাজাও, নাচো নাচো!"

"আপ্‌নে কোন্ রাগেঁকো তারিফ্ করতে হৈঁ জনাব?"

"হাঁ, হাঁ অনেক তারিফ করতা! বাজাও, বাজাও।"

"হিন্দোল? পুরিয়া? মালি গৌরা?"

"ও সুরেশ বাবু আপনারা দু-একটা কথা বলুন না, আমার একার ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না যে!"

ওস্তাদ পূর্ব্ববৎ বিজ্ঞের মত বলিয়া যাইতে লাগিল, "ভঁয়েৎ? মুলতান? ধানসী? কই চিজ ফরমাইয়ে হুজুর!"

সুরেশ বাবু বলিলেন, "একঠো বাজাও খাঁ-সাহেব!"

খাঁ-সাহেব তখন ধানশ্রীর আলাপ সুরু করিলেন। আলাপ শেষ হইলে গীত চলিল; তাহার সহিত তবলার সঙ্গত আরম্ভ হইল। বিনয় বাবু অনবরত বে-তালে হাততালি দিতে লাগিলেন। বাজনা শেষ হইতে, আর-এক ওস্তাদ সেলাম ঠুকিয়া গান ধরিল। গানটি তেলে-না বা তারা-না জাতীয়। এই জাতীয় গানের কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন, কেবল "না দেরে তানা দিম্ তিয়া ইয়া" ইত্যাদি। সুরেশ বাবু, কৃষ্ণ বাবু, অতি-কষ্টে হাস্য সংবরণ করিতে লাগিলেন; বিনয়বাবু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া অনবরত বলিতে লাগিলেন, "বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা!" বেহারা আসিয়া খবর দিল, অশেষ বাবু আসিয়াছেন। অশেষ বাবুকে উপরে আনিতে বলিয়া ওস্তাদকে বাধা দিয়া বিনয় বাবু বলিলেন—"হাম বহুত খুসি হুয়া। নিচেকা ঘরে কুছ্ খানা-পিনাকা ব্যবস্থা হ্যায়, আউর মিছে কাহে কষ্ট করেগা! কুছ্ খাবার উবার ত' খাও যাকে। বেয়ারা, বেয়ারা, ওস্তাদদের নীচে নিয়ে গিয়ে খাওয়া।"

বেহারার সহিত ওস্তাদগণের প্রস্থান ও অশেষ বাবুর প্রবেশ।

"আসুন, আসুন, অশেষ বাবু! বসতে আজ্ঞা হয়!"

"কি ব্যাপার, আপনার এখানে এত গাইয়ে-বাজিয়ের আগমন?"

"সমালোচনা, অশেষবাবু, কেবল সমালোচনা!"

"সর্ব্বনাশ!"

"যাই হোক, উদ্ধার পেয়েছি, এই যথেষ্ট! কারণ যে রকম টিবেটিয়েন ভাষা ছেড়েছিল, আর খানিকটা হলেই আমি অচৈতন্য হতেম, নিঃসন্দেহ! আপনার সঙ্গে কেষ্টবাবুর সুরেশবাবুর বোধ হয় পরিচয় আছে?"

"হ্যাঁ, মুখ চেনা আছে। সুরেশবাবুও ত' একজন বিশিষ্ট সমালোচক!"

"না, না, ও কথা বলবেন না অশেষ বাবু। আমি বিশিষ্ট সমালোচক নই। সে গর্ব্ব একমাত্র বিনয় বাবুকেই খাটে!"

"হ্যাঁ। গুণ জিনিষটা সামনে বল্লেই খোসামোদের মত শোনায় বটে! তারপর বিনয় বাবু, যাচ্ছেন কখন?"

"আপনার রিহার্সাল্ ত' আরম্ভ হবে সাতটায়! এখনো আধ ঘন্টা দেরী আছে!"

সুরেশ বাবু বলিলেন, "আপনার রিহার্সালে যাবার অনুমতি পেলে বড় খুসি হবে অশেষ বাবু।"

"এ আর বেশী কথা কি, সুরেশবাবু! দয়া করে যাবেন, সে ত' আমার পরম সৌভাগ্য! তাহলে আমি এগিয়ে পড়ি বিনয় বাবু, পথে দু-একটা কাজ সেরে আমি ঠিক পৌনে সাতটায় থিয়েটারে হাজির হব। সুরেশ বাবু আসতে ভুলবেন না! কৃষ্ণবাবুও যাবেন ত? আপনিও দয়া করে আসবেন।"

বিনয় বাবু বলিলেন, "বেশ, তা হলে থিয়েটারেই আবার দেখা হবে।"

২

সান থিয়েটারের ষ্টেজের সম্মুখে বসিয়া অশেষবাবু, সুরেশ বাবু ও বিনয় বাবু গল্প করিতেছিলেন। অশেষ বাবু বলিলেন, "আমাদের ভারতীয় ইতিহাস, নাটক লেখবার উপকরণে পরিপূর্ণ। লেখকের কেবল মাত্র বিষয়টি বেছে নিলেই হল, বাদ-বাকি ঘটনা সবই ইতিহাসে আছে। যাই হোক, আমার এ নাটকখানার নাম হচ্ছে মোসলেম-বঙ্গ। ঘটনা-স্থান কলিকাতা, দৃশ্য, গঙ্গার উপকূলে মাণিকগড় গিরিদুর্গ!"

সুরেশ বাবু। "চমৎকার!"

বিনয় বাবু। "আমি ত' আপনাকে আগেই বলেছিলেম সুরেশ বাবু, যে বইখানা চমৎকার। যাই হোক, কলিকাতায়, গঙ্গার উপকূলে, গিরি এবং তার উপর দুর্গ ছিল বলে ত কোন বইয়ে পড়িনি অশেষ বাবু! নতুন আবিষ্কার বটে! প্রত্নতত্ত্ব হিসাবেও এর দাম অনেক!"

অশেষ বাবু। "গিরি দুর্গ যে ছিল, তা আমার বলবার উদ্দেশ্য নয়। আমি এ কথা বলছিনা, যে, কলিকাতায়

গঙ্গার উপকূলে গিরি-দুর্গ নিশ্চয়ই ছিল! তবে থাকতে পারত! নাটকের উদ্দেশ্য কি? যা প্রত্যহ ঘটছে, তা দেখানো নাটকের উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য, যা অদ্ভুত, যা কখনো ঘটেনি, কিন্তু কোন দিন ঘটতে পারে, তাই দেখানো।"

সুরেশ বাবু বলিলেন, 'ঠিক কথা! যা মানুষের মস্তিষ্কে আসতে পারে, তা ঘটা অসম্ভব নয়! কে বলতে পারে দশ মুণ্ড রাবণের আবির্ভাব ভবিষ্যতে অসম্ভব!"

বিনয় বাবু বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়! তা অশেষ বাবু, আপনার বইটা সম্ভবত ঐতিহাসিক বীরত্ব-কাহিনী, এর মধ্যে প্রেম জিনিষটা কি করে আনতে পারেন?"

অশেষ। "সেইখানেই ত' মজা! ইতিহাস যেখানে প্রচণ্ড বীর-রসের অবতারণা করে গেছে, সেখানে, নাটক-লেখককে এটুকু বুঝতেই হবে যে, এর পিছনে রমণীর প্রেম আছেই আছে! লেখকের কর্ত্তব্য, সেটিকে ফুটিয়ে তোলা। কাজেই, এক-হিসাবে, ঐতিহাসিক নাটকগুলো ইতিহাসের অভিধান ভিন্ন আর কিছুই নয়! অবশ্য যদি ঠিক সেই ভাবে লেখা হয়!"

বিনয়। "অবশ্য, অবশ্য!"

অশেষ। "যাই হোক, সাদাউদ মৈন্ মির্জ্জা খাঁ অর্থাৎ আমার নাটকের নায়ক, বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বঙ্গ বিজয় করতে যখন অগ্রসর হলেন, তখন 'বিজয়া' অর্থাৎ মাণিকগড় দুর্গ-রক্ষকের কন্যা এবং আমার নাটকের নায়িকা, সাদাউদ্ মৈন্ মির্জ্জাখাঁর বীরত্ব-কাহিনী শুনেই হোক, অথবা তাঁর ছবি দেখেই হোক, তাঁর উপর মনে মনে অনুরাগিণী হ'ন। যাই হোক যদিও বিজয়া সামান্য দুর্গরক্ষকের কন্যা, তবু তার প্রেম, অনেক রাজকন্যার চেয়েও শত গুণ বেশী!"

বিনয়। আহা, বিজয়ার অবস্থাটা আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি! একদিকে ভালবাসা, অন্যদিকে কর্ত্তব্য; এক দিকে দেশের উপর প্রীতি, আর এক দিকে দেশের শত্রু সাদাউদ্ মৈন্ মির্জ্জা খাঁর উপর প্রেম! যে সে প্রেম নয়, অগাধ প্রেম!

অশেষ। বলবেন না, বলবেন না! আমি নিজেই লেখক হয়ে চোখের জল সামলাতে পারছি না! আহা, বেচারার হৃদয় কি ভীষণ সংশয়ের দোলায় দুলতে আরম্ভ করেছে! ভাবলেও মন করুণাপ্লুত হয়ে ওঠে!

কথা হইতেছে. এমন সময় থিয়েটারের ম্যানেজার যবনিকার সম্মুখে বাহির হইয়া বলিলেন, "সিন্ সাজানো হয়ে গেছে, আপনারা অনুমতি দিলেই রিহার্সাল আরম্ভ হয়।"

অশেষ। মিছে সময় নষ্ট করে লাভ কি! আপনারা স্বচ্ছন্দে আরম্ভ করতে পারেন!

ম্যানেজার। কিন্তু অশেষ বাবু—বইটা বড় ছোট হয়ে গেছে। কারণ অভিনেতারা আপনার ঢালাও হুকুমের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছে!

অশেষ। অর্থাৎ?

ম্যানেজার। আপনি তাদের হুকুম দিয়েছিলেন যে, যে-সব জায়গা তাদের অনাবশ্যক বলে মনে হবে, তারা যেন নিজেরাই সে জায়গাগুলো বাদ দেয়। সেই হুকুম-অনুযায়ী তারা কেটে-কুটে বইটা ছোট করে ফেলেছে!

অশেষ। বটে, বটে, কেটে বাদ দিয়ে ফেলেছে?... এক-হিসাবে, অভিনেতারা খুব ভাল সমালোচক বটে! তা ছাড়া আমার বইটা ভাবে এবং ভাষায় পরিপূর্ণ কিনা, কাজেই একটু বড় হয়ে পড়েছে! তা যাক, আর দেরি করে আবশ্যক কি! রিহার্সাল আরম্ভ করে দিন!

ম্যানেজার। বেশ। ওহে কন্‌সার্ট বাজাও।

কন্‌সার্ট্ ওরফে, কণ্ঠশ্বাস আরম্ভ হইল, তাহার পর ঘণ্টা-ধ্বনি! অশেষ বাবু বলিলেন, "যাক্। এইবার দেখা যাক, আমাদের চিত্রকর-মশায় দৃশ্যপটখানা কি রকম এঁকেছেন!"

যবনিকা উঠিল। দেখা গেল, এক উজ্জ্বল রংদার পট, তাহাতে এক পর্ব্বত ও তাহার উপর এক দুর্গের চিত্র! ভূমিতে দুইজন কাটা সৈন্য নিদ্রিত।

বিনয়বাবু। বাঃ চমৎকার! কলিকাতার গঙ্গার উপকূলে মাণিকগড় গিরি-দুর্গ! চমৎকার, চমৎকার!

অশেষ। এখন বলুন দেখি, কি ঘটনা দিয়ে দৃশ্যটা আমি আরম্ভ করেছি?

বিনয়। যথার্থ কথা বলতে গেলে, দৃশ্য দেখে আমি

এত দূর মুগ্ধ হয়েছি যে, অন্য কথা আর ভাবতেও পারছি না!

অশেষ। দৃশ্যটা ঘড়ি দিয়ে! শুনুন—

ঘড়ি বাজিল। অশেষ বাবু বলিলেন, "এটার উদ্দেশ্য কি তা জানেন বিনয় বাবু?"

বিনয়। আজ্ঞে না!

অশেষ। এটার উদ্দেশ্য, দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করা, আর, দেখানো যে ঘটনার সময় প্রাতঃকাল চার ঘটিকা। এতে করে, প্রাতঃকালের সৌন্দর্য্য বর্ণনা, সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক পূর্ব্বদিগন্ত সুবর্ণ-বর্ণে রঞ্জিত করা ইত্যাদি বর্ণনাগুলো বেঁচে গেল! আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, কারণ আপনার সমালোচনার সুবিধা হবে!

বিনয়। চমৎকার!

সুরেশ। কিন্তু সৈন্যগুলো কি ঘুমোতেই থাকবে?

অশেষ। গাঢ় নিদ্রা! যেন ওদের চির নিদ্রা এসেছে।

সুরেশ। এটা একটু অনাবশ্যক, অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে না?

অশেষ। ও কথা বলবেন না সুরেশ বাবু! এই তুচ্ছ ব্যাপার থেকে একটা খুব বড় ঘটনার সুচনা হবে! নাটকের নিয়মই হল এই! এখানে রাজ্যের দুজন কর্ণধার গোপনে কথা বলতে আসছেন; সৈন্যদুটো যদি জেগে থাকে, তা হলে কি করে তাঁরা কথা বলতে পারেন? কাজেই, হয় সৈন্যদুটোকে বাদ দিতে হয়, না হয়, ঘুমে তাদের বিভোর রাখতে হয়!

সুরেশ। বুঝলেম! কথা কইতে আসছেন কাঁরা?

অশেষ। উদয়দত্ত আর বিক্রমবাহু! দুজনেই রাজ্যের কর্ণধার! একজন হলেন অর্থ-সচিব আর একজন পররাষ্ট্র-সচিব! এখন শুনুন এঁরা বলছেন কি…

উদয়দত্ত ও বিক্রমবাহুর প্রবেশ।

উদয়দত্ত :—যথার্থ বিক্রম বাহু!

কিন্তু, হে বীরশ্রেষ্ঠ, সাম্রাজ্য-গৌরব,
একটি প্রশ্ন আছে শুধাবার!
যে প্রশ্ন পূর্ব্বে কভু আসি নাই জিজ্ঞাসিতে হেথা!

বিনয়। এরা কি আগে থাকতেই কথা বলছিল?

অশেষ। সারা পথটাই কথা বলতে বলতে আসছে! (অভিনেতাগণের প্রতি) বলুন, বলুন, থামবার প্রয়োজন নাই!

উদয়দত্ত :—যথার্থ বিক্রমবাহু!

কিন্তু, হে বীরশ্রেষ্ঠ, সাম্রাজ্য-গৌরব,
একটি প্রশ্ন আছে শুধাবার,
সে প্রশ্ন পূর্ব্বে কভু,
আসি নাই জিজ্ঞাসিতে হেথা।
সেই প্রশ্ন আজি মনে হয়েছে উদয়,
ঘুচাও সংশয়, হয়ো না নিদয়,
চরণ-প্রান্তে আজি যাচি অভয়!

বিক্রমবাহু :—কহ বীর, কিবা প্রশ্ন তব?

সঙ্কুচিত কেন আজি বৃথা অকারণ!*

উদয়দত্ত :—দিকে দিকে কেন শুনি রণ-দামামা,

কেন দেখি বঙ্গ-ভূমে যবন-শিবির,
যবন-সৈন্য কেন হেথায় পশিল,
অর্থ কিবা তার, বুঝিতে অপার,
বল বীর, ঘুচাও সংশয়!

সুরেশ। ইনি হলেন অর্থ-সচিব অথচ রাজ্যের সংবাদ রাখেন না, এ বড় অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে!

অশেষ। অভিনয় আরম্ভ হবার আগেই কি করে উনি রাজ্যের সংবাদ রাখতে পারেন, বলুন!

বিনয়। ঠিক কথা, ঠিক কথা! আপনি দয়া করে এই ভাবে আমায় বুঝিয়ে যান, তা হলেই আমার সমালোচনার সুবিধা হবে!

অশেষ। যাক্! শুনুন, বিক্রমবাহু কি বলছেন— (অভিনেতাগণের প্রতি) তার পর? তার পর?

উদয়। বিক্রমবাহুর এখন নয়। আমার আরো খানিকটা বলবার আছে—

অশেষ। তা বেশ, বলে-যান—

উদয় :— দেখি সৈন্যরাজি, দেখি করী সহস্র শতেক,

---

* পাঠক মহাশয়, হাসিবেন না; ইহা নবাবিষ্কৃত ছন্দ!

শুনি দূরে কামানের প্রচণ্ড গর্জ্জন—
মনে হয়,
দুর্দ্দিন এলো বুঝি জাহ্নবী প্লাবিয়া,
অমঙ্গল-সূর্য্য বুঝি উদিল গগনে!

বিক্রম :—যথার্থ ধারণা তব!
আসিছে বিপদরাশি পূর্ণ অমঙ্গল!
মড়কের সৃষ্টি হবে,
হাহাকার উঠিবে গগনে!
বঙ্গের পুণ্য নদী জাহ্নবী-জননী
পূর্ণ হবে মৃত দেহে! শোণিতে
রাঙ্গিয়া যাবে স্নিগ্ধ বারি তার!

উদয় :— কোথা? কবে? কোন্‌ক্ষণে
বাধিবে বিপদ? কারণ ঘটিল কিবা?

বিক্রম :—শুন বন্ধু, বিপদের ইতিবৃত্ত কহিব তোমারে!
দুই সূর্য্য তিন চন্দ্র গেল অস্তাচলে—
আসিল যবন-দূত অতি মূঢ়মতি
পত্র এক সাথে লয়ে রাজার সকাশে!

উদয় :—জানি তাহা।

বিক্রম :—যবনের রাজা বীর মক্কেত হাসানি
বিজয় করিতে চান কলিকাতা-ধাম,
বিনা যুদ্ধে, কিংবা যুদ্ধে, যে কোন প্রকারে,
হরণের অভিলাষে বদ্ধ-পরিকর!

উদয় :—জানি তাহা!

বিক্রম :—বন্দী হইল দূত এই দুর্গমাঝে!
সুশ্রী সে দূতবর, নাম তার,
সাদাউদ মৈন্ মির্জ্জা!
কিন্তু সখা, দূত নহে সে,
ছদ্মবেশী রাজার তনয়,
এসেছিল দূতরূপে!

উদয় :—জানি তাহা!

বিক্রম :—শ্রবণ করিল যবে বীর হাসানি,
পুত্র তার বন্দী হল বঙ্গ দুর্গ-মাঝে,
সেই ক্ষণে, সসৈন্যে, আসিল এখানে—
এই দুর্গ জিনিবারে বাসনা তাহার!

উদয় :—তাহাও যে জানি।

সুরেশ। আচ্ছা অশেষ বাবু, দেখছি আপনার অর্থ-সচিব ত' সবটাই জানে, তা হলে, ও ভদ্রলোকের মিছি মিছি বকে গিয়ে লাভ কি?

অশেষ। এটা আর বুঝতে পারলেন না সুরেশ বাবু? অর্থ-সচিব জানতে পারেন, কিন্তু দর্শকরা ত' জানেন না!

বিনয়। ঠিক, ঠিক! দর্শকদের জানানো চাই বই কি!

অশেষ। (অভিনেতাগণের প্রতি) তার পর? তার পর?

বিক্রম :—সেই হেতু রণসজ্জা কামান-গর্জ্জন,
সেই হেতু উড়িয়াছে আরক্ত নিশান!

উদয় :—মৌন রহ বীর! আসিতেছে সেনাপতি
ভীমবাহু, দুর্ব্বল-পীড়ন, মন্ত্রণার অভিলাষে!

(দুর্গরক্ষক ও সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি :—হে বীর বিক্রমবাহু,
কি হেতু বৃথায় কাল করিছ হরণ?
দেশের দুর্দ্দিন আজি, এসেছে অরাতি,
উচিত নহে গো বীর আমা তোমা সবা,
জল্পনায় বৃথা কাল করিতে ক্ষেপণ!

বিক্রম :—হে বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি, বীররসাপ্লুত,
কহ সবে, কি উপায়ে করিব নিধন
দেশের অরাতি এই প্রচণ্ড যবনে?

সেনাপতি :—হয়ে সবে এক-মন-প্রাণ,
দেবী-পদে লইয়া শরণ,
ভীম বেগে চল যাই অরাতি-শিবিরে,
মারি অরি পারি যে কৌশলে।

উদয় :—বিন্দুমাত্র সংশয় নাহি আর ইথে,
মহাত্মা কবির শ্রেষ্ঠ গিয়াছেন বলে—
'মারি অরি পারি যে-কৌশলে!'

সেনাপতি :—কহ বীর, এক মত, কিংবা অন্যমত?

সকলে :—এক মত তোমা সনে! নাহি জানি
অন্য মত মোরা!

সেনাপতি :—বিজয় করিব শত্রু, কিংবা প্রাণ দিব।

সকলে ঃ—বিজয় করিব শত্রু, কিংবা প্রাণ দিব।

সেনাপতি ঃ—এক মনে এক প্রাণে কর সবে পণ
যেমনে তেমনে শত্রু করিব নিধন!

সকলে ঃ—এক মনে এক প্রাণে করিলাম পণ,
যেমনে তেমনে শত্রু করিব নিধন!

বিনয়। লা গ্রাণ্ড—লা গ্রাণ্ড! চমৎকার!

অশেষ। ওইটুকুই ত' মজা! যখন ষ্টেজে এ্যাক্টিং করবে, তখন ওদের একতা অসাধারণ!

উদয় ঃ—বিলম্বে আর কিবা আছে প্রয়োজন?
এসো সবে দেবী-পদে লই গে শরণ!

দুর্গরক্ষক ঃ—হে মাতা করুণাময়ী কালী কপালিনি,
খড়্গ-মুণ্ড সুশোভিতা শৃগাল-সঙ্গিনী,
তন্বী শ্যামা শিখরী-দশনা, জননী আমার,
দাও শক্তি আদ্যাশক্তি হর-মনোরমা!

সকলে ঃ—হে মাতা করুণাময়ী কালী কপালিনি,
খড়্গ-মুণ্ড সুশোভিতা শৃগাল-সঙ্গিনী
তন্বী শ্যামা শিখরী দশনা জননী আমার
দাও শক্তি আদ্যাশক্তি হর-মনোরমা।

বিনয়। চমৎকার, চমৎকার!

অশেষ। বলুন দেখি সুরেশ বাবু, এমন অতি-ভক্তি আর কোথাও দেখেছেন কি?

সুরেশ। আজ্ঞে না!

উদয়। কিন্তু কি ভাবে আমাদের প্রস্থান হবে, তা আমরা ঠিক করতে পারি নি।

অশেষ। ও রকম হাঁটু গেড়ে নিশ্চয়ই প্রস্থান করা সম্ভব নয়!

বিক্রম। তা ত বটেই মশায়!

অশেষ। কিন্তু যদি ওই ভাবে প্রস্থান করা সম্ভব হয়, তা হলে ভারি চমৎকার দৃশ্য হবে! তা হলে প্রচলিত প্রথাটারো বদল করা হয়!

সুরেশ। যে-ভাবেই প্রস্থান হোক, দর্শক সে দিকে মন দেবে বলে বোধ হয় না!

অশেষ। তা হলে, শেষের লাইনটা বলে উঠে দাঁড়িয়েই প্রস্থান করা হোক!

সকলে ঃ—দাও শক্তি আদ্যাশক্তি হর-মনোরমা!

[অভিনেতাগণের প্রস্থান]

বিনয়। ব্রাভো! চমৎকার প্রস্থান!

[ষ্টেজে কাটা সৈন্য দুইজন উঠিল।]

১ম সৈন্য ঃ—সমাচার দিতে হবে নবাব-শিবিরে!

২য় সৈন্য ঃ—চল ত্বরা! বিলম্বে নাহি কোন লাভ!

[সৈন্যদ্বয়ের প্রস্থান]

বিনয়। এটা কি রকম হলো! আমার ধারণা ছিল ওরা দুজনে ঘুমোচ্ছে!

অশেষ। ঘুমের ভাণ করে পড়েছিল। ওরা দুজন হচ্ছে নবাবের গুপ্তচর! এইটুকুই ত' হল আর্ট!

সুরেশ। এ বড় অসম্ভব, অশেষ বাবু! ওরা গুপ্তচর, অথচ সেনাপতি পর্য্যন্ত কেউ ও-দুটোকে দেখেও দেখলে না!

অশেষ। যারা গুপ্তচর তাদের সহজে কেউ দেখতে পায় না, সুরেশ বাবু! আর তাছাড়া এটা হচ্ছে নাটক!

সুরেশ। কি জানি মশায়, বুঝতে পারলুম না!

অশেষ। ও আপনি বুঝতে পারবেন না! এইবার শুনুন বিনয় বাবু, কামানের গর্জ্জন আরম্ভ হবে!

বিনয়। অর্থাৎ?

অশেষ। ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত নাটকের নিয়মই হচ্ছে কামানের গর্জ্জন!

বিনয়। কামানের effect ষ্টেজে খুবই ভাল হয়!

(নেপথ্যে দুইবার বোমা ফাটিল)

অশেষ। কি রকম? তিনবার কামান-ধ্বনি হবে, তার জায়গায় দুবার কেন? (চীৎকার করিয়া) ও মশায়, আপনাদের কি আর কামান নেই? (নেপথ্য হইতে উত্তর আসিল—"আজ্ঞে না!") এই জন্যই ত' থিয়েটার গুলোর উপর অভক্তি জন্মায়! জানলেন সুরেশ বাবু, ওদের হাতে একটা খুব ভাল বই দিন, দেখবেন, সমস্ত পণ্ড করে বসেছে! (চীৎকার করিয়া) এইবার খুব মৃদু সঙ্গীত আরম্ভ হোক!

সুরেশ। কামানের পরেই সঙ্গীতের অর্থ?

অশেষ। এখানে মৃদু সঙ্গীতের অর্থ, যে, আমার নাটকের নায়িকা প্রবেশ করছেন! বীরাঙ্গনার প্রবেশ-কালে, সঙ্গীত বড় চমৎকার লাগে!

(বিজয়া ও তাহার সঙ্গিনীর প্রবেশ)

বিনয়। আপনার নায়িকার সঙ্গে উনি কে?

অশেষ। সঙ্গিনী!

বিনয়। I see!

অশেষ। চমৎকার মানিয়েছে! (ক্ল্যারিওনেট্‌ ওরফে বিলাতি 'রামসিঙে' ও হরেমোনিয়মে মৃদু সঙ্গীত? আরম্ভ হইয়াই তখনই তাহা থামিয়া গেল,)

বিনয়। চমৎকার, চমৎকার!

অশেষ। বিজয়ার এ্যাক্টিং সুরু হোক—

বিজয়া :—সখি প্রভাতের মৃদু মৃদু সমীর গুঞ্জনে,
জাগিল বুঝি গো আজি প্রকৃতি-সুন্দরী!
বিচিত্র দীপ্তি-পূর্ণ সবিতা মহান,
ত্যজিয়া নৈশবাস, কৃষ্ণ আবরণ,
মুছিয়া স্বপন-ক্লান্ত অলস নয়ন
ধীরে ধীরে প্রকাশিছে সুনীল গগনে।
আঁধার গিয়াছে দূরে! খুলিয় জড়িত আঁখি
কমল্‌ সুন্দরী, সলজ্জ আনন তার
সরমে আনত, দ্যাখো সখি,
কেমনে সে চুমিতেছে, তপনের জ্যোতি;
যে জ্যোতি তাহারে আজ জাগাইল ধীরে!
কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিল যে কুসুমের দল—.
মালতী মাধবী বেলা, যূথিকা বকুল,
টগর, কেতকী, চাঁপা, করবী মল্লিকা,
চপলা গোলাপ-বালা, আর রাঙা জবা
কত আর ক'ব সখি, সকলের নাম
মোর নাহিক স্মরণে! বিহঙ্গ ধরেছে গান
দিকে চৌদিকে! গাহে পিক, নাচে শ্যামা
গাহে ফিঙ্গে, ভীমরাজ, নাচিল ময়ূর,
সুকণ্ঠে ধরিল গান ছাতার-সুন্দরী,
নাচিল তিতির আর কুক্কুটের দল!
টেঁয়া টেঁয়া রবে ওই উড়ে শঙ্খচিল!
চাতক কহিছে দূরে "দাও বারি কণা!"
শুক আর কাকাতুয়া বলে, "গোপী ভজ!"
কিন্তু সখি, প্রকৃতির এই জাগরণ
আমার নয়নে যেন শূন্যময় সব!
নাহি জ্যোতি, নাহি ফুল, নই পিক-গান!
আমার হৃদয় মাঝে সকলি আঁধার,
হাহাকার, দীর্ঘশ্বাস, নয়নের জল
সম্বল আমার!

অশেষ। এইখানটায় বিজয়া সাদা রুমাল দিয়ে চোখ মুছবে।

বিজয়া। আমায় কিন্তু মশায় ভুলুবাবু বলে দিয়েছিল, যে যেখানটায় "হৃদয় ভাঙ্গিয়া আজ হোল চুরমার" আছে সেইখানটায় সাদা রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে হবে।

অশেষ। ঠিক, ঠিক, আমার ভুল হয়েছিল! "আমার হৃদয়-মাঝে" থেকে আবার আরম্ভ হোক—

বিজয়া :—আমার হৃদয়মাঝে সকলি আঁধার
হাহাকার দীর্ঘশ্বাস নয়নের জল
সম্বল আমার!

[ক্রন্দন]

অশেষ। চমৎকার, চমকার!

বিনয়। ব্রে বিঁয়া! ব্রে বিঁয়া! ক্যাপিটাল!

বিজয়া :—একদিন সযতনে গোপনে পরাণে
গেঁথেছিনু যে মালাটি চাঁদের কিরণে,
ছিন্ন হলো আজি তার সব ফুলগুলি!
হৃদয় ভাঙ্গিয়া আজ হলো চুরমার!

[সাদা রুমাল দিয়া চক্ষু মর্দ্দন]

বিনয়। এ বড় হৃদয়-বিদারক!

সুরেশ। একটু অতিরিক্ত!

সঙ্গিনী :—স্থির হও সখি!
কেমনে জানিলে তুমি নাহি সুখ আর?
কে বলিতে পারে ললাট-লিখন?
শুনেছি পুরাণে আছে, সুখ-দুঃখ—

শাস্ত্রের বচন কভু নাহি মিথ্যা হয়
জানিহ নিশ্চয়!

বিজয়া :—হায় সখি, এখনো বালিকা তুমি !
প্রেমের কুটিল দৃষ্টি পড়ে নাই হৃদয়ে তোমার,
কেমনে বুঝিবে কত জ্বালা আছে তার মাঝে !
যে হৃদয় একবার ভেঙ্গে হয় চুর
জগতে কিছুই নাই তারে শান্তি দিতে !
ছার তব শাস্ত্রের বচন !

বিনয়। তার কোন ভুল নেই !

সঙ্গিনী :—আসিছেন পিতা তব !
শান্ত হও বিজয়াসুন্দরী !
দেখিলে নয়নে তব বারি-বিন্দুধারা,
কহিবেন কিবা তিনি ?
উচিত নহে গো সখি পিতার সকাশে
দেখাইতে হৃদয়ের গোপন বেদনা !

অশেষ। এ কি রকম হল ? অনেকটা কাটা গেল যে ! সাদাউদ্ মৈন্ মির্জ্জার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, তার মধুর কটাক্ষ, তার মৃদু-হাস্যের ইতিহাস, সে সব ব্যাপার-গুলো গেল কোথায় ?

বিজয়া। সে সব পরে আছে, দেখতে পাবেন !

অশেষ। ভাল। আছে ত' সেগুলো ?

বিজয়া। আজ্ঞে হাঁ। মশায় !

অশেষ। তার পর চলুক।

বিজয়া। শেষের কথাটা ধরিয়ে দাও ত ! লকা বাবু—

(নেপথ্য হইতে প্রম্পটার:—"হৃদয়ের গোপন বেদনা)

বিজয়া :—সত্য কথা সখি ! কিন্তু, মনেরে
বুঝাতে সখি নাহিক শকতি !
দুঃখের কালো রেখা, কেমনে ঢাকিব
সখি, মিথ্যা সুখ-জালে ?

[দুর্গরক্ষকের প্রবেশ]

রক্ষক :—এ কি হেরি ! চোখে অশ্রু-ভার ?
ধিক তোরে ওরে বিজয়া ! দেশের
দুর্দিন আজি, আসিছে শত্রু-সৈন্য-রাশি,
বীরাঙ্গনা তুই,—তোর চোখে জল ?

বিজয়া :—অদৃষ্টের এই পরিহাস !
পিতা, পিতা, ওই বুঝি আসে সৈন্যরাশি !
ওই দেখি—

অশেষ। দেখুন বিনয় বাবু, একটা কথা এইখানে আপনাদের বলে রাখি। কথাটা হচ্ছে এই যে, বিয়োগান্ত নাটকে, নায়ক বা নায়িকারা, অনেক এমন কথা বলে যায়, যা তারা চাক্ষুস দৃশ্য বা সিনের মধ্যে দেখতে পায় না, কিন্তু মানসিক দৃষ্টিতে সেগুলো উপলব্ধি করতে পারে, দর্শকদের সেগুলো বাজে কথা বলে ধরা উচিত নয় !

সুরেশ। আপনি কবি-দৃষ্টির কথা বলছেন ?

অশেষ। আজ্ঞে হাঁ ! অর্থাৎ, আভ্যন্তরিক কাব্য-দৃষ্টি ! তার পর চলুক—

বিজয়া :—ওই দেখি অরাতির আরক্ত নিশান !
কোথা ভীম, কোথা কর্ণ, কোথায় গাণ্ডীবী ?
দেশের দুর্দিন আজি ! এখনো কি
বীরবর বাঁধা রবে পুস্তক-মাঝারে ?
ওই শুনি কামানের প্রচণ্ড গর্জ্জন—
হে অর্জ্জুন ক'র আসি লক্ষ্যভেদ !
ছাড় শয্যা, কর সজ্জা ওগো কর্ণবীর,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে অরাতি ভীষণ।
কোথা ভীম ? কোথা গদা তব ?
কর চূর্ণ শত্রু উরু দুর্যোধন সম !
ওই শুনি বিজয়-নিনাদ, ওই শুনি
অশ্বের চীৎকার, ওই দেখি বারুদের
কৃষ্ণবর্ণ ধূম ! ওই শুনি নিয়তির প্রচণ্ড
সঙ্গীত ! দিকে দিকে ছিন্ন ভিন্ন শত মেখলা,
শত ছিন্ন দেহ ওই ভাসে রক্ত-স্রোতে !

দুর্গরক্ষক :—চুপ, চুপ, ওরে কন্যা চুপ শতবার !
(স্বগত) প্রেমের নয়নে দেখি শত্রুর তনয়ে
উন্মাদিনী, পাগলিনী, হ'ল বুঝি শেষে !
(প্রকাশ্যে) কোথায় শত্রুরাজি দেখিলি বিজয়া ?
এখনো ত' উপনীত হয় নাই হেথা !
যদিও এখনো নহে দৃষ্টির গোচর,

বিনয়। বাপটা দেখছি বেজায় অরসিক! কন্যার কাব্য-দৃষ্টির মাধুর্য্য অনুভব করতে পারলে না! শেষ বল্লে কি না, 'উন্মাদিনী!'

অশেষ। দুর্গরক্ষকের চরিত্রটা হচ্ছে সাদাসিধা গোছের, অত হেঁয়ালির মধ্যে যেতে প্রস্তুত নয়! চলুক এ্যাক্‌টিং—

বিজয়া :—প্রত্যাখ্যান তারে তুমি করিবে
কি পিতা?

রক্ষক :—অবশ্য! নিশ্চয়—! করিব!
করিতে পারি—করাই উচিত।

বিজয়া :—কত মূল্য দিতে চায়, জান কি হে পিতা?

রক্ষক :—বৃথা বাক্যালাপে নাহি প্রয়োজন!

বিজয়া :—চাহে স্বাধীনতা! দাও তারে পিতা—

বিনয়। কে স্বাধীনতা চাচ্ছে অশেষ বাবু? এরা কার কথা বলছে?

অশেষ। বুঝ্‌তে পারলুম না মশায়! এখানে যথেষ্ট কাটাকুটি হয়েছে। আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, কোথা থেকে কি হোল, কি গেল!

বিজয়া :—পরে সে সব কথা আছে দেখতে পাবেন মশাই।
স্বাধীনতা দাও তারে
মূল্য সে দিবে অগ্রিম!

অশেষ। হায়, হায়! এই ভাবে বইখানাকে এরা যদি যা-তা করে কেটে বাদ না দিত, তাহলে দেখতে পেতেন বিনয় বাবু, স্বাধীনতার জন্য সাদাউদ মৈন্ মির্জ্জা কি রকম ব্যাকুল হয়ে লাফালাফি করছে! হায় হায় সব নষ্ট করে ফেলেছে!

বিজয়া :—সৈন্য সে লয়ে যাবে ফিরায়ে!

রক্ষক :—এখানে হইবে বিদ্রোহ।

বিজয়া :—আদরিণী কন্যা তব যাচে চরণে।

রক্ষক :—অটল প্রতিজ্ঞা তব পিতার!

বিজয়া :—সে যে মোর পতি!

রক্ষক :—এ যে মোর দেশ!

বিজয়া :—আদরিণী বিজয়া তোমার—

রক্ষক :—পুণ্যভূমি বঙ্গ আমার!

বিজয়া :—মিলিবে উপাধি বহু—

রক্ষক :—রাখিব দেশের মান!

বিজয়া :—পাইবে জায়গীর!

রক্ষক :—কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবল আমার!

বিজয়া :—কোটি স্বর্ণমুদ্রা পাবে, পূর্ণ
হইবে তব ভাণ্ডার প্রচুর!

রক্ষক :—রক্ষা কর, রক্ষা কর, মোরে বিজয়া,
করিস্ না দুর্ব্বল মোর সবল চিত্তেরে!

অশেষ। দেখলেন, দেখলেন বিনয় বাবু, বিজয়া কিছুতেই রক্ষকের মন টলাতে পারলে না! স্নেহ স্বদেশীতায় উড়ে গেল, উপাধি তাও দেশের জন্য ভালবাসায় উড়ে গেল, জায়গীরের লোভ কর্ত্তব্যজ্ঞান এসে ভাসিয়ে দিলে! কোটি স্বর্ণমুদ্রায় প্রায় টলিয়েছিল আর কি, তাও দেশ-প্রীতির প্রবল উচ্ছ্বাসে ভেসে গেল!

বিনয়। চমৎকার, চমৎকার!

বিজয়া :—পিতা, কর আমারেও ত্যাগ—
সে-বিনা জীবন মোর নীরস অসার!

রক্ষক :—বৃথা! বৃথা ভিক্ষা তব
পিতৃস্নেহে পারিতাম হইবারে রাজি,—
কিন্তু, দুর্গের রক্ষক আমি,
এ ক্ষেত্রে কেমনে বল্ হইব সম্মত?
ক্ষমা কর্, ক্ষমা কর্ কন্যা আমার!
(প্রস্থান)

বিজয়া :—উত্তম!
ফুরাইল সব আশা সুখেরি কল্পনা,
নিভিল প্রাণের মাঝে উজ্জ্বল প্রদীপ।
প্রিয়, প্রিয়, কোথা তুমি?

সাদাউদ মৈন মির্জ্জা :—(নেপথ্যে) স্বপ্নময়ী প্রেয়সী আমার—

বিজয়া :—(চমকিত হইয়া) ও হো!
[সাদাউদ মৈন মির্জ্জার প্রবেশ]

মির্জ্জা :—লাবণ্যময়ী প্রতিমা আমার!

অশেষ। বিজয়ার চমকানোটা আরো বেশী রকম হওয়া উচিত ছিল!

বিজয়া। ও মশাই 'প্লে-নাইটে' ঠিক হয়ে যাবে।

বিনয়। নেপথ্যে কথা বলা ষ্টেজে ভারি চমৎকার শোনায়!

অশেষ। ঠিক বলেছেন! তার পর—তারপর?

বিজয়া :—দেখ, দেখ প্রিয়, গগনে উদিল চাঁদ,
শত ধার জ্যোৎস্না তাহার
ধরাতল করে নিমগন!

অশেষ। কি ব্যাপার? এ যে দেখছি, বইখানাকে জবাই করা হয়েছে! এর আগে অনেক কথা ছিল!

বিজয়া। মশাই আমাদের ফিলিং নষ্ট করবেন না!

অশেষ। বাবা, আমার ফিলিং, যে গয়া-প্রাপ্তি হচ্ছে!

সুরেশ। ওদের, যা-খুসি বলতে দিন অশেষ বাবু, বাধা দিয়ে লাভ নেই!

সাদাউদ :—সখি, বিদায়—বিদায় চিরতরে!

বিজয়া :—লহ সখা প্রণয়ের শেষ আলিঙ্গন!

সাদাউদ :—বিদায়—

বিজয়া :—বিদায়—

(উভয়ের প্রস্থান)

অশেষ। এঃ, কেটে-কুটে যাচ্ছে-তাই করেছে!

বিজয়ার সখী। মশাই আমার প্রস্থানটা কি রকম ভাবে হবে?

অশেষ। ডিঙ্গি মেরে!

(সখীর প্রস্থান)

বিনয়। চমৎকার!

থিয়েটারের ম্যানেজার প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মশায়, ষ্টেজ ম্যানেজার বল্লেন যে, এর পরের দৃশ্যটা দেখানো বড় মুস্কিল, অনবরত curtain ফেলতে হয়, কাজেই সেটা বাদ দেওয়া গেছে!

অশেষ। বলেন কি? আমার কুঞ্জভবন বাদ গেছে? হায় হায় মশায়, আপনারা যে কি জাতীয় জীব, তা বুঝতে পারলুম না! ভাল, দিন মশাই অভিনয়ে বাদ, আমি কিন্তু বইটা ছাপাবার সময় এর একটি লাইনও বাদ দেব না! আজ আর বোধ হয় রিহার্সেলের সময় নেই?

ম্যানেজার। আজ্ঞে না! আবার কাল রিহার্সাল হবে!

অশেষ। তবে আর দেরী করে লাভ কি? আসুন বিনয় বাবু যাওয়া যাক! হায়, হায় সব কেটে কুটে বাদ দিলে গো! আমি কিন্তু ছাপাবার সময় একটুও বাদ দেব না! এরা বেজায় নৃশংস কি ভয়ানক! বইটা সব কেটে বাদ দিলে! আমার সাধের কুঞ্জভবনের দৃশ্য,—তাও! হায় হায়! আমি অনেক আশা করে থিয়েটারে বই দিয়েছিলেম, তা, গিরিশবাবুর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল!

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বিবাহ

১

আনুষ্ঠানিক ও অননুষ্ঠানিক

প্রথমেই আমরা অননুষ্ঠানিক বিবাহের আলোচনা করব। পাশ্চাত্য দেশে এটার তরঙ্গ উঠেছে এবং তার আঘাত ভারতের উপকূলে এসেও আঘাত করছে। আমাদের দেশের দু'একজন লেখকও অননুষ্ঠানিক বিবাহের পক্ষে ওকালতি করতে আরম্ভ করেছেন বলে মনে হয়।

এখানে "বিবাহ" শব্দটা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা গেল। নর-নারীর সব রকমের মিলনকেই বিবাহ মধ্যে গণ্য করা হলো,—তাই বিবাহের প্রধান দুটী বিভাগ দাঁড়ালো, আনুষ্ঠানিক ও অননুষ্ঠানিক।

সমাজ-বিজ্ঞানের দিক থেকে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে প্রকৃত সমাজ-গঠনের পূর্ব্বে মানুষের মধ্যে অননুষ্ঠানিক বিবাহ প্রচলিত ছিল—অর্থাৎ পশু ও মানুষে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। প্রকৃতির আকর্ষণে বা পরিচালনে নর ও নারী পরস্পর মিলিত হতেন—মুহূর্ত্তের জন্য বা দীর্ঘকালের জন্য। অবশ্য এই মুহূর্ত্ত-বিবাহের চেয়ে

অনমুষ্ঠানিক দীর্ঘকাল-ব্যাপী নর-নারীর একত্র অবস্থান একটু উচ্চ অবস্থার পরিচায়ক, কারণ শেষোক্ত স্থলে মানস-বৃত্তির যোগ আছে।

কিন্তু যে প্রকারই হউক এর মধ্যে কোনরূপ বন্ধন ছিল না। আজকাল যাঁরা স্বাধীনতার নামে বিবাহের বন্ধনকে দূর করে দিতে চান তাঁদের মনে রাখা প্রয়োজন যে তা'হলে সমাজ-বন্ধনই চূর্ণ হয়ে যাবে এবং সমাজ আবার আদিম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছবে। কারণ সমাজের ভিত্তি-ভূমিই হলো আনুষ্ঠানিক বিবাহ। যে পর্য্যন্ত না মানুষ এই আনুষ্ঠানিক বিবাহ-পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিল সে পর্য্যন্ত সে সাধারণ 'বুদ্ধিমান' জন্তু ব্যতীত আর কিছুই ছিল না—অন্যান্য জন্তুদের সহিত তার কোন প্রভেদ ছিল না।

বর্ত্তমানে সমাজে অনমুষ্ঠানিক বিবাহের সর্ব্বত্র প্রচলন হলে কি ফল হওয়া সম্ভব, তা দেখা যাক্। সর্ব্বপ্রথম সামাজিক ও পারিবারিক শৃঙ্খলা নষ্ট হবে—তার ফলে বর্ত্তমান সভ্য সমাজ যতটুকু উন্নতির দিকে এগিয়েছে, সেখান থেকে আবার তাকে পূর্ব্বকার অসভ্য অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। পিতৃনিরূপণ সহজ হবে না অথবা অসম্ভব হবে সুতরাং পিতার স্বাভাবিক স্নেহ-ধারার অভাব-বশতঃ সন্তানরা কেবল মায়ের যত্নে বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু 'মানুষ' হবে না—আবার সেই (Matriarchal) মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজে ফিরে যেতে হবে।

দীর্ঘকাল বা আজীবন-ব্যাপী অনমুষ্ঠানিক বন্ধনহীন বিবাহ মুহূর্ত্ত-বিবাহ অপেক্ষা ভাল বটে, কিন্তু তা'তে সমাজের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। কারণ পশু বা পক্ষী যেরূপ প্রকৃতির ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়, পশু-পক্ষী যেরূপ জন্মগত সংস্কারের অধীন, মানুষের সাহায্যের জন্য সেরূপ কিছু না থাকাতে মানুষ উচ্ছৃঙ্খলই হবে মাত্র।

মানুষের পক্ষে অনমুষ্ঠানিক বিবাহ সুফল-প্রসূ হতে পারে—মানুষের আদর্শ জ্ঞান ও প্রেমের অবস্থায়। সার্ব্ব-জনীনভাবে সমাজ-বিজ্ঞান, জীবন-বিজ্ঞান, এবং সুপ্রজনন বিদ্যার নিয়মানুসারে চলা যদি সম্ভবপর হয়,—কোন বন্ধন না থাকলেও কেবল মাত্র কর্ত্তব্য-বোধের জন্য কাজ করার অবস্থা যদি সম্ভবপর হয় এবং সমাজ-রক্ষার উপযোগী বিশুদ্ধ প্রেমের পরিচালন যদি সম্ভবপর হয়, তবেই মানুষের পক্ষে অনমুষ্ঠানিক বিবাহ মঙ্গলকর হতে পারে—কিন্তু মানুষের বর্ত্তমান অবস্থা দেখে তা যে কখনও সম্ভবপর হবে এমন মনে হয় না ; আর সেই অবস্থায় না আসা পর্য্যন্ত বা তার সম্ভাবনা না দেখে অনমুষ্ঠানিক বিবাহের পক্ষে ওকালতি করতে যাওয়া মানব-শত্রুতার পরিচায়ক মাত্র। *

কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানের দিক থেকে উহা আলোচনার অযোগ্য ত নয়ই বরং সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণের তার বিশেষ আলোচনা করা উচিত।† পাশ্চাত্য দেশে—বিশেষতঃ ফ্রান্সে unmarried mothers' problem সমাজ-বিজ্ঞানের একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; যার এ সমস্যা যে কোন জাতির জীবনে উপস্থিত হতে পারে।

এই অনমুষ্ঠানিক বিবাহের পরের স্তরেই আনুষ্ঠানিক বিবাহ। এই বিবাহকে আবার নানা শাখায় বিভক্ত করা যায়। ক্রমোন্নতির দিক থেকে communial marriage (সম্প্রদায়গত বিবাহই) আনুষ্ঠানিক বিবাহের সর্ব্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত। এই communial marriage আনুষ্ঠানিক ও অনমুষ্ঠানিক বিবাহ-প্রণালীর সন্ধিস্থলে অবস্থিত—প্রকৃত পক্ষে উহাকে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর মধ্যে ফেলা যায় না।

---

* Promiscuous mixing leads to early death of men and women both—Spencer's Sociology p 295.

পরন্ত, By regular sexual relation offspring grow stronger—the race the same. *III*

† শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার "মাধবী"তে এই প্রশ্নের আলোচনা করেছেন—কিন্তু সেটা ঠিক সমাজ-বিজ্ঞানের দিক থেকে নয়। সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষা করে, সমাজের অগ্রগতি প্রতিহত না করে যদি নর-নারীকে—on terms of perfect freedom—পূর্ণ স্বাধীনতার সর্ত্তে মিলিত হতে হয়, তবে সমাজকেও perfect humanityর আদর্শে সকলভাবে গড়ে তোলা চাই। 'মাধবী'তে সে সামাজিক অবস্থার অভাব। মাধবী সব চেয়ে বড় ভুল করলে গোপনে বিবাহ করে, তাতে নিজেও সুখী হতে পারলে না—তার আদর্শও প্রচার হলো না। সমাজকে লুকিয়ে বিবাহ করার অর্থই প্রকারান্তরে বর্ত্তমান সমাজ-প্রথার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা ; সুতরাং বুদ্ধির দোষে মাধবী তার চিন্তায় ও কাজে মিল দেখাতে পারে নি ; কাজেই সমাজ-সমস্যারও মীমাংসা হয় নি।

তবুও তার উপর বিবাহ-বন্ধনের ছোপ আছে। এই স্তরে সমাজ-গঠনের সূত্রপাত হয়েছে।

কোন দল বা পরিবারের সমস্ত নর ও নারীর মধ্যে পরস্পর স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ স্বীকার করলে তাকে সম্প্রদায়গত বিবাহ বা communial marriage বলে। সাধারণতঃ এ রকম বিবাহ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূদের মধ্যেই হয়ে থাকে। বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে এই প্রকার বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে।

অনমুষ্ঠানিক বিবাহ অপেক্ষা এটি সমাজের একটু উন্নত অবস্থার পরিচায়ক; কারণ তাতে প্রকৃত সমাজ-গঠনের চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। পিতৃ-নিরূপণ সহজ না হলেও সন্তানকে কেবলমাত্র মায়ের যত্নের উপর নির্ভর করতে হয় না—সে পরিবারের সাহায্য পায়,—এবং 'মানুষ' হবার পথেও অগ্রসর হতে থাকে।

মনোবৃত্তির একটু উন্নতি হলেই যে এরূপ বিবাহ-প্রথা লোপ পাওয়া অবশ্যম্ভাবী, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আর বর্ত্তমানের বিভিন্ন স্তরের অসভ্য জাতিদের আচার-ব্যবহার দেখলে তার প্রমাণও আমরা পাই।

এ অবস্থার পরের স্তরেই আমরা প্রকৃত আনুষ্ঠানিক বিবাহ দেখতে পাই। এই উচ্চশ্রেণীর বিবাহের মধ্যেও নানা শাখা-প্রশাখা আছে। এই বিবাহ-প্রথার সর্ব্ব-নিম্ন স্তর polyandry অথবা এক স্ত্রীর বহু-স্বামী গ্রহণ। এরূপ বিবাহ-প্রথার কারণ নির্ণয় করা দুষ্কর। সামাজিক কোন্ অবস্থার জন্য কোন্ কারণাধীনে যে polyandry সমাজে প্রচলিত হয়েছিল তা আজ নির্ণয় করা সহজ নয়। এ প্রথার বিশেষ দোষ এই যে সন্তানের পিতৃ-নিরূপণ সহজ নয় এবং জাতির জন্ম-সংখ্যার আশানুরূপ বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। Polyandry যে খুব ব্যাপকভাবে কোন সমাজে বর্ত্তমান আছে বা ছিল, তা মনে হয় না। নারী-সংখ্যার ন্যূনতা বা বন্দিনী স্ত্রীলোকের উপর বিজেতাদের স্বামীত্ববোধ প্রভৃতি কারণে polyandryর উদ্ভব হয়েছিল, মনে হয়।

এই polyandry বা স্ত্রীলোকের বহু-বিবাহের অন্তদিক polygamy বা পুরুষের বহুবিবাহ। উহা দোষমুক্ত হলেও polyandryঅপেক্ষা উন্নত; যেহেতু উহাতে polyandryর ঐ দোষ দুটী নাই। এতে সন্তানের পিতৃ-নিরূপণে বাধা হয় না বা জাতির জন্ম-সংখ্যারও হ্রাস হবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু উচ্চ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের দিক দিয়ে যে তা অন্যায় এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

সমাজ-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে যেমন, পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিক দিয়েও তেমনি বহুবিবাহ অনিষ্টকর। বিশেষভাবে নারীর দিক থেকে এর আদৌ সমর্থন করা চলে না। নর ও নারী সমাজ-গঠনে সাহায্য করেন এবং তার ফলও উভয়ে ভোগ করেন। সুতরাং নারীকে এই অশান্তির মধ্যে ফেলা শুধু নীচ স্বার্থপরতা মাত্র।

অবশ্য সমাজে এমন অবস্থা উপস্থিত হয়, যখন সমাজে পুরুষের সংখ্যা অত্যন্ত কমে যায়, তখন সমাজ ও জাতির দিক থেকে বিচার করে পুরুষের বহু-বিবাহের সমর্থন করা চলতে পারে—সেটা আপদ্ধর্ম। কারণ জাতি বাঁচলে পরে কুপ্রথার পরিবর্ত্তন সহজেই হয়। কিন্তু এরূপ স্থলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর সহজ স্বাধীন মত গ্রহণ করতে হবে।

গত যুদ্ধের পর ফ্রান্স যদৃচ্ছা জনসংখ্যা-বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছিলেন—নারীদের আপত্তিতে তা অগ্রাহ্য হয়েছে। অবশ্য উহা অননুষ্ঠানিক বিবাহেরই নামান্তর মাত্র।

বহু-বিবাহের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা যায় যে পুরুষের সংখ্যার ন্যূনতা, অথবা শারীরিক বলের প্রাধান্যের যুগে নারীকে সম্পত্তিরূপে গ্রহণ প্রভৃতি কারণ হতে বহু-বিবাহ-প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। হয়ত সামাজিক কোন কারণ-বশতঃ অথবা সামাজিক উন্নতির নিম্ন স্তরে এ প্রথার উৎপত্তি হয়েছিল, পরে পুরুষ তার সুবিধার জন্য সে ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছেন; এবং এখনও এ ব্যবস্থার গুণ-কীর্ত্তন ও তার পুনঃ-প্রচলনের চেষ্টা করছেন।

শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক মিলনই বিবাহের আদর্শ। যদি তাই হয় তবে এক পুরুষ একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে একসময়ে মিলিত হবেন কিরূপে?

সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রী বা পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত হওয়া সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। প্রায়

প্রত্যেক সমাজেই স্বাভাবিক অবস্থায় নর ও নারীর সংখ্যা সমান থাকে। এমন স্থলে একজন পুরুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের স্বাভাবিক ফল অন্য পুরুষকে বিবাহ হতে বঞ্চিত করা। জোর করে এই অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করলে সমাজে নানা প্রকার দুর্নীতির উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক —কারণ মানুষ মানুষই বটে—দেবতা নয়। সুতরাং কোনও sex-এর বহু-বিবাহের ফলে অপর সেক্সেরও (sex) নৈতিক অবনতি মোটেই অসম্ভব নয়। তার প্রমাণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়।

বহুবিবাহ যেরূপ ঘৃণিত অবস্থায় বাংলার সমাজে প্রচলিত ছিল (এখনও কিছু কিছু আছে বোধ হয়) তার ফলও যে তদনুরূপ হয়েছিল, তা সকলেই জানেন। অন্যান্য প্রকারের বিবাহের ফলাফলও অতীতের অভিজ্ঞতা হতে সংগ্রহ করা যায়।

সর্ব্বপ্রকার বিবাহের সর্ব্বোচ্চ স্তরে এক-বিবাহ বা monogamy। মানুষ ক্রমশঃ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মিলনের স্তরে উপস্থিত হয়েছে। বিবাহের ফলে যে কেবল সমাজ-গঠন সম্ভবপর হয়েছে তা নয়; তার সর্ব্বোচ্চ স্তরে মানুষ যে অপরিমেয় মিলনানন্দ লাভ করে অন্য কোন উপায়েই তা সম্ভবপর নয়। নর ও নারীর প্রেমের পরিণতি বিবাহ—বিবাহের চরম পরিণতি পূর্ণ প্রেমানন্দ।

তাই যদি হয় আর স্ত্রী বা অর্দ্ধাঙ্গিনী (তা বামাঙ্গিনী বা Better-half-ই হউন) হন, তা'হলে এক পুরুষের একাধিক পত্নী কিরূপে সম্ভবপর হয়, তা বোঝা যায় না।

সমাজের উন্নত অবস্থায় বহুবিবাহ অন্যায়। স্বামী যেমন স্ত্রীকে পূর্ণভাবে পেতে চান, স্ত্রীরও স্বামীকে সেরূপ পূর্ণভাবে পাবার অধিকার আছে—তাঁর সে অধিকারে বাধা দেওয়া যেতে পারে গায়ের জোরে—অন্য কোন উপায়ে নয়। যেখানে স্ত্রী স্বেচ্ছায় নিজ-অধিকার পরিত্যাগ করেন, সেখানে কারও কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু এরূপ ঘটনা ক'টা ঘটে, তা অনুসন্ধানের বিষয়। আর নারীর এই আত্মত্যাগের কি পুরস্কার পুরুষ দেন, তাও দ্রষ্টব্য।

যে সমস্ত সভ্য সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে— সেখানেও উহা খুব শ্লাঘার বিষয় বলে বিবেচিত হয় না। প্রাচীন মনুসংহিতা এরূপ বিবাহকে "কাম"-বিবাহ বলেছেন। অবশ্য কুলীনদের বহুবিবাহ বিবাহ-পদবাচ্য কি না, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর যে সমাজে এরূপ প্রথার সমর্থন করা হয়, সে সমাজের নৈতিক জ্ঞান সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করলে খুব অন্যায় হবে না।

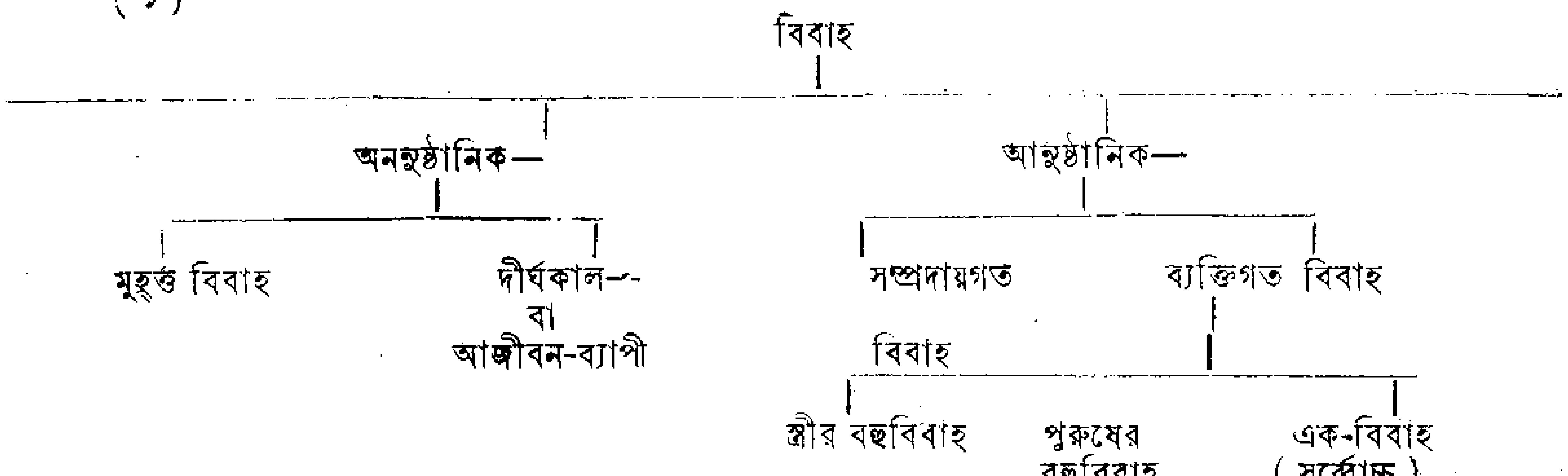
আমাদের আলোচনার ফল মোটামুটি নিম্নলিখিত তালিকায় প্রকাশ করা যায়: (১)

২

প্রেমের পৌরোহিত্য

বিবাহ যে কেবল সমাজ-গঠনের ভিত্তিভূমি তা নয়, বিবাহ মানুষকে পূর্ণ করবার উপায়ও বটে। সেজন্য হিন্দু সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণ বিবাহকে 'সংস্কার' বলেছেন। সংস্কার অর্থে শোধন, পরিষ্কার করা,—বিবাহের দ্বারা মানুষের নানাবিধ অপূর্ণতা দূরীভূত হয়, নানাদিকে কর্ম্মশক্তি জেগে

(১)



ওঠে (হিন্দু মতে কর্ম্মে অধিকার জন্মে), তাই বিবাহ 'সংস্কার'। যেখানে একজন কেবলমাত্র নিজের সুখ-দুঃখের বোঝা নিয়ে চলেছিল, সেখানে অপর-একজনের (নিজ + অপর = বিশ্ব) জন্য স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়, অনাগতদের জন্য স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত থাকতে হয়,—অর্থাৎ ত্যাগের সূত্রপাত হয়, charity begins at home—ইহাই মোটা-মুটী একদিকে বিবাহ-সংস্কারের হিন্দু ব্যাখ্যা। অন্যদিকে স্ত্রী সহধর্ম্মিণী—'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ'; সস্ত্রীক না হলে ধর্ম্মে কর্ম্মে অধিকার জন্মে না। একক মানুষ অর্দ্ধেকমাত্র, বিবাহে নর ও নারী মিলে পূর্ণ এক হয়; তাই যজ্ঞের সময় রামচন্দ্রকে নাকি "স্বর্ণ-সীতার" আশ্রয় নিতে হয়েছিল! এই হলো হিন্দু ব্যাখ্যার অন্য অংশ।

মোটের উপর হিন্দু-সমাজ-তাত্ত্বিকগণ বিবাহকে উচ্চস্থান দিতে কসুর করেন নি। সব দেশেই বিবাহিতদের প্রতি সমাজের একটু পক্ষপাত আছে। অবিবাহিত থাকলে যত বয়সই হোক না কেন, লোকে তাকে একটু "চেংড়া" ভাবে। বিবাহিত হলেই তাঁরা আবার পর-মুহূর্ত্তে বিজ্ঞতার দাবী করতে পারেন।

এটুকু ভণিতা দেওয়ার উদ্দেশ্য, এই দেখানো যে—বিবাহটাকে সকল দেশেই একটু গুরু-গম্ভীর ব্যাপার বলে মনে করা হয়। এরূপ মনে করা যে সম্পূর্ণ সঙ্গত, তা আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধগুলিতে দেখাবার একটু চেষ্টা করেছি। মানব-সমাজের উন্নতির মূলে বিবাহ; কিন্তু বিবাহের মূলে আছে নর-নারীর প্রেম। সুতরাং সমাজোন্নতির চরম-ভিত্তি, নর-নারীর প্রেম।

"বেঁধে ধরে পিরীত হয় না"—এ কথাটা প্রেমের আলোচনার সময় মনে রাখা দরকার। সুতরাং বিবাহের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান উপকরণ হবে—নর ও নারীর স্বাধীন প্রেম। যে প্রেমে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা থাকবে না, কোনরূপ দোকানদারী থাকবে না, শুধু পরস্পরের প্রতি প্রেম—তাই হলো বিবাহ-যজ্ঞের পুরোহিত।

প্রেমের পূর্ণ পরিণতি বিবাহ—পূর্ণ মিলন। প্রেমের ধর্ম্মই হলো, সে মিলন চায়। আর সেই মিলন সম্পূর্ণ হয় নর-নারীর বিবাহে, যেখানে দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক মিলন চরম মূর্ত্তি লাভ করে। অন্যত্র এই মিলন এত গভীর শক্তিশালী হয় না, কারণ বিবাহে যেরূপ প্রাকৃতিক আকর্ষণ ও মিলনের সম্পূর্ণতা আছে, অন্যত্র তা নাই।

এই সত্যকে আমাদের দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায় যেমন কাজে লাগিয়েছেন, অন্য কেউ সেরূপ পারেন নি। (খৃষ্টানদের মধ্যেও নাকি এক সম্প্রদায় মধুর রসের সাধনা করেন) তাঁরা তাঁদের সাধনায় সেজন্য মধুর রসকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। প্রেমাস্পদকে যে শুধু পেতে চাই তা নয়, তার সঙ্গে আমার আত্যন্তিক মিলন চাই—কোথাও একটু ফাঁক থাকবে না।

এই পূর্ণ মিলনের চিত্র হিন্দু-বিবাহের একটি মন্ত্রে উজ্জ্বলরূপে ফুটে উঠেছে।

> ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম
> যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব
> প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি—
> মাংসৈর্ম্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্ ॥

এ মিলন শুধু শরীরের নয়, মাংসে মাংস, ত্বকে ত্বক মিলিত হবে বটে,—কিন্তু উহাই শেষ নয়—প্রাণে প্রাণ, হৃদয়ে হৃদয়ও মিলিত হবে। এ যদি না হয় তবে আর যা হউক না কেন, সত্যকার বিবাহ হয় না।

এই মিলন-যজ্ঞের পুরোহিত বিশুদ্ধ প্রেম। প্রেম ব্যতীত অন্য কেউ দুই হৃদয়কে মিলিত করতে পারে না। মন্ত্র পড়ে, বা প্রতিজ্ঞা করে নর-নারী পরস্পরকে গ্রহণ করতে পারে বটে, কিন্তু প্রেম ব্যতীত মিলন অসম্ভব। সামাজিক প্রবন্ধ লেখবার সময় আমাদের নিজেদের সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়, তাই মন্ত্র-বিবাহ সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা আবশ্যক।

কেউ কেউ হয়তো শিউরে উঠবেন—কি! মন্ত্র-শক্তি দ্বারা বিবাহ সিদ্ধ হয় না?—আমরা স্থিরভাবেই উত্তর দিচ্ছি, না—শুদ্ধ মন্ত্র দ্বারা বিবাহ সিদ্ধ হয় না, মিলন ঘটে না,—অতীতেও মন্ত্রশক্তির প্রভাবে (বা গীর্জ্জার অলৌকিক শক্তিতে) নর-নারীর হৃদয়ে মিলন ঘটে নাই—বর্ত্তমানেও ঘটে না। যদি তা সম্ভবপর হোত, তা হ'লে প্রাচীন গ্রন্থে "ব্যভিচার" শব্দের স্থান থাকতো না।

আর সব তর্কের সেরা তর্ক—বাস্তব তা। চোখের সামনে দেখছি শুদ্ধ মন্ত্রের জোরে (বা টাকার জোরে) মিলন হয় না—এর বাড়া আর যুক্তি নাই!

কিন্তু প্রশ্ন হবে, তবে কি মন্ত্র-বিবাহে সত্যকার প্রেমের স্থান একেবারেই নাই? প্রেম থাকতে পারে—কিন্তু সেটা দৈবাধীন ঘটনা (accident) মাত্র। আমরা চোখের সামনে যে প্রেমের ছড়াছড়ি (আমাদের দেশের বিবাহিতদের মধ্যে; অন্য দেশের সম্বন্ধেও কতকটা খাটে) দেখছি—তার মধ্যে প্রেম কতটুকু, তা বিশ্লেষণ করতে বড় রাসায়নিকের দরকার হয় না। অধিকাংশ স্থলেই সংসার চালানোর জন্য নর-নারীর একত্র মিলন প্রয়োজন, সুতরাং একত্র থাকা হয়—ব্যস্, এই পর্য্যন্ত। 'মালতীমালা' না হয়ে 'ক্ষেন্তমণি' হলেও কোন আপত্তি নাই, আর 'নফরচন্দ্র' না হয়ে 'ফকির-চন্দ্র' হলেও ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নাই। মা বাপ, এবং সমাজ দুজনকে একত্র করে দিয়েছেন, সুতরাং তারা স্বামী স্ত্রী!

অথচ আমরা প্রত্যেকেই প্রেমের কত বড়াই করি। জীবনে যাদের সহিত কখনও পরিচয় হয় নি—কেউ কারও অস্তিত্বেরও খবর জানি না, এমন দুজন নর ও নারীকে বিবাহের নাম করে একত্র করে দিল সমাজ—আর সেই বিবাহের ঠিক দু'শত আশীদিন পরে তারা সন্তানের পিতা-মাতা হয়ে দাঁড়ালো! অথচ তারাই আদর্শ প্রেমিক দম্পতী। উহারই আগে-পিছনে 'ধর্ম্ম বিবাহ', 'আধ্যাত্মিক কার্য্য' ইত্যাদি কত বড় বড় শব্দই না জুড়ে দেওয়া হয়!

এ প্রেম নয়, প্রেমের ব্যভিচার মাত্র—একটা শারীরিক আকর্ষণ। It is not love, but lust.

সকলের পক্ষেই অবশ্য এ কথা খাটে না। এরূপ অপরিচিতদের বিবাহেও অনেক স্থলে প্রেম জন্মাতে পারে এবং জন্মায়ও; কিন্তু সেটা শুদ্ধ ভাগ্যের উপর অন্ধ নির্ভরতা মাত্র। কিন্তু যেখানে শারীরিক আকর্ষণটাই প্রাথমিক কারণ, সেখানে প্রেমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ স্বাভাবিক। এই দিকে দেখতে গেলে বরং আমাদের সমাজের বাল্য-বিবাহ ভাল, কারণ শারীরিক আকর্ষণের পূর্ব্বেই মানসিক ঘটে। কিন্তু সেখানেও ঐ দৈব-নির্ভরতা, বিশেষতঃ বাল্য-বিবাহের আনুসঙ্গিক কুফল ত আছেই।

বিবাহের পূর্ব্বে নর-নারীর মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেম-সঞ্চারের যথেষ্ট প্রয়োজন থাকলেও প্রেম জিনিষটা যে বাংলা দেশের ম্যালেরিয়া বীজাণুর মত সহজ-প্রাপ্য জিনিষ নয় তা জানি, এবং পাশ্চাত্য দেশেও প্রেমের নামে যে ভণ্ডামী চলে তাও অবিদিত নয়। কিন্তু কোন জিনিষ সহজ-প্রাপ্য নয় বলে তা পাবার পথে কাঁটা দিয়ে বসে থাকতে হবে এমন কোন শাস্ত্রও নাই! মানুষ পূর্ণ নয় এবং তার উদ্ভাবিত জিনিষগুলিও পূর্ণ নয়; কিন্তু তাই বলে যে আমরা নিশ্চিন্ত মনে অপূর্ণের উপাসনা করব, এমন কি কথা আছে?

যে-সব স্থলে বিবাহের পূর্ব্বে নর-নারীর মিলনের সুবিধা আছে, সে-সব স্থলেও অনেক সময় সত্যকার প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায় না। স্বার্থপরতা, অজ্ঞতা, অন্ধতা প্রভৃতি আমাদের প্রধান শত্রু; কিন্তু সে-সকলের বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নয়।

আমার মোটামুটী বক্তব্য—বিবাহের পূর্ব্বেই নর-নারীর মধ্যে প্রেম-সঞ্চারের প্রয়োজন। অবশ্য পিতামাতা বা অভিজ্ঞ অভিভাবকগণ তাঁদের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তরুণ-তরুণীকে সাহায্য করতে পারেন, এই পর্য্যন্ত।

আমাদের দেশে বিবাহ ধর্ম্মকার্য্যের মধ্যে গণ্য এবং ধর্ম্মের জন্যই বিবাহের প্রয়োজনীয়তা। এই দিক দিয়েই প্রেমের সার্থকতা আছে কি না, দেখা যাক।

বিবাহ দ্বারা নর ও নারী এক পূর্ণ মানুষ হয়—ইহাই হিন্দু ব্যাখ্যা। কিন্তু মানুষের শরীরই কি সব? অজানা অচেনা একজনের সঙ্গে মিলিত হতে পারি—সে শরীরের আকর্ষণে for a physical necessity, এই মাত্র। মন ও আত্মার মিলন কোথায় রইল?

ধর্ম্মকার্য্য করবে উভয়ে একাত্মা হয়ে,—বেশ কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সমাজের হুকুমে যে দুটী প্রাণীকে এক দড়িতে বেঁধে দেওয়া হলো—তারা যে "প্রাণৈর্প্রাণান্" মিলিত হবে—Cats and dogs bound together হবে না, তার প্রমাণ কি? কোন অধিকারে সমাজ এবং কোন

বিবাহের পরিণতি যদি কেবল প্রেমের খেলা হতো তা হলেও কথা ছিল—কিন্তু প্রথমেই বলেছি সমাজের ভিত্তি ঐ বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিবাহ-প্রণালী যত উন্নত হবে সমাজের উন্নতিও সেই পরিমাণে হবে। নর ও নারীর প্রেমই বিবাহের প্রধান উত্তেজক ও বন্ধন; সুতরাং সমাজ-বিজ্ঞানের দিক থেকে প্রেমকে অবজ্ঞা করা চলে না।

সুপ্রজনন বিদ্যা ও জীবন-বিজ্ঞানের দিক থেকেই সব চেয়ে বড় সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। জগতে মানুষের মত বেঁচে থাকতে হলে এই দুই বিজ্ঞানকে অবহেলা করে চলবার উপায় নাই। পশু জগতে Eugenics-এর যে সব নীতির (principles) প্রয়োগ করা হয়, মানব সমাজে তার চেয়ে আরও একটী বেশী আছে—সেটা মানুষের মন। কি করে উৎকৃষ্ট সন্তান জন্মাবে, সে সম্বন্ধে পশু-জগতে বাঁধা-ধরা নিয়মে চলা হয়তো সম্ভবপর—কিন্তু মানুষের পক্ষে সেই বাঁধা-ধরা নিয়ম চলবে না। কারণ শরীরের চেয়ে মানুষের মন বড়, সেই মনের খাতিরে অনেক নিয়মের পরিবর্ত্তন করতে হয়।

পশু ও মানুষে মন এই পার্থক্যের সৃষ্টি করে—প্রেমের দিক থেকে। সুসন্তান জন্মাবার পক্ষে মানুষের শারীরিক উপযুক্ততাই যথেষ্ট নয়—মানসিক উপযুক্ততাও চাই। সেই উপযুক্ততার প্রধান জিনিষ হবে, প্রেম। নর ও নারীর মানসিক মিলন না হলে সে মিলনের ফলে শরীর-বৃত্তির হয়ত তৃপ্তি হতে পারে—কিন্তু সুপুত্র বংশোজ্জলকারী জাতির গৌরব সুপুত্র জন্মাবে না। বাঁধা-ধরা শাস্ত্রের গৎ বা বিজ্ঞানের বুলি বিশেষ কার্য্যকর হবে না।

পিতা ও মাতার মানসিক একত্বের ফলে তাঁদের মিলনানন্দের পরিণতিতে, সন্তানের মানসিক শক্তি লাভ হয়—যেমন তাঁদের শারীরিক শক্তি সন্তানে সংক্রমণ করে থাকে।

এ-পর্য্যন্ত ব্যক্তি ও পরিবারের কথা বলা হয় নি। যাঁরা জীবনের জন্য একত্র মিলিত হবেন, তাঁদের মধ্যে যদি মানসিক মিল না থাকে, তাহলে গতানুগতিক সংস্কার ও শারীরিক আকর্ষণ কত কাল তাঁদের একত্র রাখবে আর আনন্দই বা কি দেবে? অবশ্য কেউ যদি বলেন বিবাহের সঙ্গে আনন্দের কোন সম্পর্ক নাই, দড়ি-বাঁধা ছাগলের মত চরে-ফিরে খাওয়া আর জাতির সংখ্যাবৃদ্ধি করাই কর্ত্তব্য, তা হলে বলবার কিছু থাকে না—কিন্তু আনন্দটাকে ফেলে দেওয়া যায় না—বরং সেটাই জগতের চালক শক্তি বলেই আমাদের ধারণা।

ব্যক্তির পক্ষে যা খাটে, পরিবারের পক্ষেও তাই। প্রেমহীন বিবাহিত জীবন শুধু দুজনকে নষ্ট করে না—চারিদিকে সব পোড়ায়। শক্ত রকমের শাস্ত্র-বচন না আওড়ে যদি আমরা চোখ মেলে দেখি তবেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এখানে পাশ্চাত্য বিবাহের কথা টেনে আনার কোন অর্থ নাই। কি হওয়া উচিত আমি তাই বলছি, পাশ্চাত্য বিবাহের ওকালতি করছি না। সেখানে যে বিবাহ, প্রথা বিশুদ্ধ-প্রেম-নিয়ন্ত্রিত, এ কথা সব সময় (অথবা অনেক স্থলেই) হলফ করে বলা যায় না। তবে তাঁরা প্রেমকে বরণ করবার চেষ্টা করেন, আমরা ও-পথে খুব সতর্কভাবে কাঁটা দিয়ে রেখেছি—এই তফাৎ।

প্রশ্ন হতে পারে, মানসিক প্রেমই যদি বড় হয়, তবে মানুষ শুধু মানস-মিলন নিয়েই থাকে না কেন?

—না, মানুষ তা পারে না। কারণ, মানুষ কেবলমাত্র মন নয়, তার মন ও শরীর দুই আছে, সুতরাং মানসিক ও শারীরিক মিলন দুইই সে চায়।

এটা কেবলমাত্র তর্কের জোরেই প্রতিপন্ন হচ্ছে না—এই মিলন-আকাঙ্ক্ষার পিছনে রয়েছে অনন্ত-শক্তিশালিনী প্রকৃতির প্রেরণা। সেজন্য মানুষ শরীরকে বাদ দিতে পারে না।

সুতরাং মিলনের জন্য মানসিক যোগ্যতা যেমন থাকা দরকার, শারীরিক যোগ্যতারও তেমনি প্রয়োজন। এই দুই মিলে এক হয়।

অবশ্য এই সব যোগ্যতা বেছে নিয়ে প্রেমিক হওয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রায়ই সম্ভবপর হয় না। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে কোন কাজই সহজ নয়,—বিশেষতঃ অশিক্ষিত ও অগঠিত মনের পক্ষে। এ সবের জন্যও শিক্ষা-যত্নের প্রয়োজন।

তবে ভগবানের একটা বিশেষ রূপ এই যে—একটু স্বার্থপরতা ও অন্ধতা পরিত্যাগ করলে মনই সত্যকার প্রেমের সন্ধান দেয়।

ব্যক্তি পরিবার ও সমাজের দিক থেকে আমরা দেখবার চেষ্টা করলাম যে প্রেমই বিবাহের প্রধান নিয়ামক হওয়া উচিত; বিবাহের পরিণতি প্রেম (ঘোড়ার আগে গাড়ী!) না হয়ে প্রেমের পরিণতি হবে বিবাহ; অর্থাৎ বিবাহ-যজ্ঞের ঋত্বিক হবে প্রেম।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত।

পার্ব্বতী।

পার্ব্বতী মন্দির-তলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল, দেবতার গৃহ প্রাচীরের গাত্র-লগ্ন বনলতার শ্যামল পত্রের উপর সূর্য্যাস্তের কিরণ লেখা হরিৎ-বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। মন্দিরের সোপানশ্রেণী বাহিয়া মানব-মানবিকার যাতায়াতের একটা শৃঙ্খলিত গতিস্রোত দীর্ঘ ও বিচিত্র বর্ণ লইয়া নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছে। সে তাহার অঞ্চলের অন্তরালে আচ্ছরিত কুসুমগুচ্ছের থালাখানি যুক্ত অঞ্জলির উপর ধারণ করিয়া উচ্চারণ করিল, দেবতা তুমি কি সত্যই সুখী?

পার্ব্বতী সারাদিন ধরিয়া একটি একটি করিয়া ফুল বাছিয়া রঙের পর রঙ্ মিলাইয়া, কিশলয়ের আস্তরনের উপর ফুল সাজাইয়া একখানি ফুলের থালা প্রস্তুত করিয়াছে। বহুদিন হইতে তাহার মনে হইত, মানুষের দুঃখ দেবতা বুক পাতিয়া লন, কিন্তু দেবতা তাঁহার দুঃখের বোঝা কোথায় রাখেন? তাহার নিজের যাহা দুঃ ছিল তাহা সে ভুলিয়া যাইত, দেবতার দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার সমস্ত বেদনা হাত বাড়াইয়া দেবতার দুঃখের ভাগ বুকে টানিয়া লইতে চাহিত। এমনি করিয়া সে অনেক দুঃখকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল, অন্তহীন সুখের প্রলোভন হইতে আপনাকে দেবতার দুঃখে দুঃখ মিলাইবার পরম শান্তিতে ডুবিতে পারিয়াছিল।

আজ তাই তাহার মনে হইয়াছিল, এই অর্ঘ্যবিহীন শূন্য ফুলের থালাখানি দেবতার মন্দিরে স্থাপন করিয়া আসিবে। আরতির পর শূন্য মন্দিরে বসিয়া দেবতা যখন মানুষের নিবেদিত অর্ঘ্য-স্তূপের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, তখন এই কুসুম-থালিকার উপরও তাঁহার দৃষ্টি পড়িবে। সেই অবসন্ন-অবসরে বুঝি একক নিঃসঙ্গ দেবতার সমস্ত বেদনা তিনি ঐ থালাখানির উপর রাখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিবেন!

পার্ব্বতী তাহার নিজের মনের মত করিয়াই এ সকল কথা ভাবিল। আর ভাবিল, একটু দেরী করিয়াই সে মন্দিরে যাইবে। তাই মন্দিরের সোপান-তলে আসিয়াও সেই শূন্য-অবসরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার সম্মুখ দিয়া শত শত মানুষ কি কামনা বুকে ভরিয়া যে মন্দিরের দিকে চলিয়াছে তাহা সে ভাবিতে চেষ্টা করিল। সেই মুহূর্ত্তেই যাহারা মন্দির হইতে ফিরিতেছে, তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল, না জানি উহারা কি লইয়া ফিরিল!

চিন্তা করিতে করিতে পার্ব্বতীর চোখের দৃষ্টি হইতে জনস্রোতের সমস্ত ছবি মুছিয়া গেল। অন্ধকারে ঢাকা দুরান্তরের বিটপিশ্রেণীর গাত্রস্পর্শ করিয়া আকাশের গায়ে যে একটা ম্লান আলোর ধারা কাঁপিয়া কাঁপিয়া রাত্রির মৌনতার চারিদিকে ঘিরিয়া উঠিতেছিল, তাহারি দিকে দৃষ্টি তুলিয়া পার্ব্বতী ভাবিতেছিল, দেবতা কি একলা থাকেন না? কখনও না? মানুষ যখন দেবমন্দির ছাড়িয়া আপন আলয়ে ফিরিয়া যায়, পূজারী ব্রাহ্মণ যখন দিনান্তে সুখ-দুঃখের বোঝা নিদ্রার কোলে স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত-অন্তরে সুপ্ত সন্তানের পার্শ্বে শয্যা গ্রহণ করে, দেবতা কি তখনও একলা থাকেন না? তখনও কি তিনি দেখিতে

পান না, লোক-চক্ষুর অন্তরালে বাহিরের পরিপূর্ণতার মাঝ-খানে আমারই মত কত মানুষ তাহার একলা-মনের বেদনা-আকাঙ্ক্ষা সাজাইয়া পূর্ণতার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে!

এমনি ভাবিতে ভাবিতে পার্ব্বতী শোক-সাগরের তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় তাহার সঙ্গে যে-বালকটি আসিয়াছিল, সে পার্ব্বতীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, হ্যাঁ মা, এ বুড়ীটা কি করতে মন্দিরে যাচ্ছে?

বালকের কথায় পার্ব্বতীর ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল, একটি বুড়ী পৃথিবীর যত জঞ্জাল ঘাড়ে করিয়া লাঠির উপর তাহার জরাজীর্ণ দেহের ভার রাখিয়া সোপান আরোহণ করিতেছে। আর তাহার ক্লেশাতুর কণ্ঠস্বর থাকিয়া থাকিয়া অস্পষ্ট ভাষায় কি কথা উচ্চারণ করিতেছে।

বালক পার্ব্বতীকে নাড়া দিয়া বলিল, একটা পয়সা দাওনা মা ওকে। পার্ব্বতীর মুখে কোন উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই বালক ডাকিল, ও বুড়ী, পয়সা নিয়ে যা।

বুড়ী ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার লাঠিটাকে ভাল করিয়া ধরিয়া বালকের দিকে চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, ঐ পূবের দিক থেকে যে-রাস্তাটা পশ্চিমের দিকে গেছে, তারই পরে যে মস্ত বড় একটা মাঠ, তার পরেই যে স্বপ্নপুরী, তার পরে যে বনটা, তার ধারে যে ভাঙ্গা বাড়ীটা, ঐখানে যারা থাকে তাদের কাছে কেমন করে খবর পাঠাই আমি! তাও সেই যে এ-সব মালপত্র যাবার সময় আমার কাছে রেখে গেল, আজ পর্য্যন্ত নিয়ে যাবার নাম নেই! কত-কাল আমি আর এ-সব ঘাড়ে করে আগ্‌লাই! তোরাও মরেছিস্, বালাই গেছে, এখন যে ক'টা বেঁচে আছে তাদের দেখে কে?...এই বলিয়া বুড়ী আবার সোপান বাহিয়া উঠিতে লাগিল।

বালক পয়সা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বুড়ী পয়সা নিল না, চলিয়া গেল; বালকের তাহাতে বড় দুঃখ হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে একটু বিষাদের হাসি হাসিল। পার্ব্বতী বালককে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, পথে আর কারুকে পেলে পয়সা দিও। কেমন?

বালক একটু বিষণ্ণ দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বাড়ী যাবে না মা?

পার্ব্বতী রুদ্ধশ্বাস ফেলিয়া বলিল, চল, মন্দির থেকে ঘুরে আসি।

২

মন্দিরে যাইয়া সেই অন্ধকারে পার্ব্বতী ফুলের থালা-খানি রাখিল। তাহার পর জোড় করে বলিল, জানি না কোন দুঃখ আছে কিনা, যদি থাকে সব আমাকে দিও, আমার শূন্য থালা ভরে থাকবে।

পার্ব্বতীর শীত-গ্রীষ্মের সর্ব্বসহা অন্তর ফাটিয়া যেন এই কথা কয়টি ভুঁইচাপার মত ফুটিয়া উঠিল। সে বালককে লইয়া মন্দির হইতে ফিরিল।

মন্দির হইতে আসিবার সময় পার্ব্বতী দেখিল, একটি রমণী বসনাঞ্চলে কি যেন ঢাকিয়া লইয়া ধীরপদে মন্দিরের অভিমুখে চলিয়াছে।

পার্ব্বতীকে দেখিয়া রমণী শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তুমি কি মন্দির থেকে ফিরছ?

পার্ব্বতী বলিল, হাঁ।

রমণীর প্রায় শ্বাসরোধ হইয়া আসিয়াছিল। সে ক্ষীণ স্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল, মন্দিরে বুঝি কেউ নাই?

পার্ব্বতী উত্তর করিল, আছে, একটা বুড়ী চাতালের পাশে শুয়ে আছে, আর কেউ নাই।

রমণী আবার চলিতে লাগিল। পার্ব্বতী কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর বালককে লইয়া নামিতে লাগিল।

রাত্রে গৃহে ফিরিয়া দিদিমার কাছে শুইয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ দিদিমা, ঠাকুর-দেবতারা রাত্রে ঘুমোয় না?

পার্ব্বতী তখন সেজ্ জ্বালিয়া চৌকির গায়ে ঠেস্ দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল।

বালকের প্রশ্নে সে একটু নড়িয়া বসিল, কিন্তু তেমনি অলস-ভাবে দীপ-শিখার দিকে চাহিয়া রহিল।

বালক তাহার তন্দ্রাচ্ছন্ন দিদিমাকে নাড়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, বলনা দিদিমা, ঠাকুর ঘুমোয় কি না?

একটা টিক্‌টিকি দেওয়ালের গায়ে শব্দ করিয়া উঠিল, টিক্ টিক্ টিক্।

দিদিমা জড়িত স্বরে উত্তর করিলেন, খায় দায় আর ঘুমোয় না? নে, তুই এখন ঘুমো দিকি। তাহার পরেই তিনি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

বালক বিরক্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া পার্ব্বতীর মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, মা, আমরা ফেরবার সময়, অত রাত্রে ঐ মেয়েটি মন্দিরে যাচ্ছিল কেন মা?

পার্ব্বতীর মনে পড়িল সেই রমণীর কথা। ধীরে ধীরে সেই পরিশ্রান্ত রমণীর মুখের সব রেখাগুলি তাহার মনে ফুটিয়া উঠিল। তাহার অঙ্গ-ভঙ্গী, চলিবার কথা কহিবার ধারা,—সব কিছু যেন তাহার ধারণার ভিতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। মনে হইল, সে যেন তাহাকে বহুবার দেখিয়াছে। মনে হইল, তাহারই নিজের বহুবারের অসংযত কামনার কঙ্কালকে যেন ঐ রমণীর পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া আজ মায়াপথ অতিক্রম করিতে দেখিয়া আসিয়াছে। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মুখে একটা অকারণ আনন্দ শিহরিয়া উঠিল। সে বালকের হাতের উপর মাথাটি পাতিয়া দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কিছু হয়ত ঠাকুরের কাছে দিতে গেল! সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে হইল, সকলেই কত কি ঠাকুরকে দিয়া আসে, এতদিন ভাবিয়াও সে কিছুই দিতে পারে নাই। আজ বহুদিন পরে তাহার সমস্ত কামনা সাজাইয়া, সমস্ত দুঃখ বাছিয়া বাছিয়া, সমস্ত আনন্দের রঙের পর রং মিলাইয়া একখানি শূন্য থালা দেবতার বিশ্রাম-দ্বারে পাতিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। জানে না, তাহা কিসে পূর্ণ হইয়া উঠিবে, অথবা প্রভাতে পুষ্প-পত্রের প্রত্যাখ্যাত স্তূপের মধ্যে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িয়া থাকিবে!

পার্ব্বতীর সমস্ত শরীরে যেন নবীন চেতনা সঞ্চারিত হইয়া গেল। তাহার অবসন্ন দেহ-ভার সে চৈতন্যে উৎসারিত হস্তের মত কিসের আশায় উন্মুখ হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া বসিল, বালককে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া কানে কানে বলিল, কাল খুব ভোরে আমরা মন্দিরে যাব, কেমন?

বালক বলিল, কাল না বাবা আসবে, মা?

পার্ব্বতী হাসিয়া বলিল, খুব ভোরে উঠে চলে যাব, আবার খুব সকাল সকাল ফিরে আসব।

বালক মায়ের গলায় হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, হ্যাঁ, তাই হবে। আমাকে তাহলে ভোর বেলা তুলে দিও।

পার্ব্বতী বালকের ললাটে মুখ রাখিয়া অনেকক্ষণ সেই-ভাবে পড়িয়া রহিল। বালক ঘুমাইয়া পড়িল। পার্ব্বতী ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া লইল। তাহার পর নিজের বক্ষের উপর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল; হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া প্রদীপ নিভাইয়া দিল। নিজের মনে বলিতে লাগিল, ঘুমোতে কি পারে সে কখনও? আমার মত যারা জেগে বসে থাকে তাদের কাছে তাহলে কে এসে দাঁড়ায়!

আবার অস্ফুট স্বরে নিজের মনেই সে বলিতে লাগিল,—যেন কে আসিয়াছে, কাহার সঙ্গে সে কথা কহিতেছে। না, ঘুমুই নি ত!..কেন এলে তুমি! কি মনে হয়ে এলে!... থালা! হ্যাঁ, সে আমিই রেখে এসেছি? কেন? দেবতা সত্যি বল্‌তে পার, তোমার কোনও দুঃখ নেই, কোনও আশা নেই, কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই? তোমার নিজের বলে কিছু নেই? মিছে কথা। আমি বলচি, মিছে কথা।... আচ্ছা, তুমি বসো। আমি আর কিছু বলব না। তুমি যা চাও, আমিও তাই চাইব। এতদিন বুঝিনি, তুমি এত পূজার আড়ালে এমন করে হতাশয় বসে ছিলে?...না, তুমি আমার মাথার কাছে বসো, তোমার হাতটা রাখ আমার কপালের উপর। আঃ...আচ্ছা তুমি না দেবতা, এতদিন বুঝতে পারনি কিছু? তোমারও অভিমান আছে?...যেতে হবে! কোথায়? যারা জেগে আছে, সবার কাছে! সারা রাত তাহলে ঘুমোও না তুমি?...দিনেও না? আচ্ছা যেও, আমি ঘুমিয়ে পড়লে যেও, এমন করে যাবে, আমি যেন জেগে না উঠি!

জানালা দিয়া মধ্য রাত্রের বাতাস পার্ব্বতীর এলায়িত কেশরাশি কাঁপাইয়া দিয়া তার ললাট স্পর্শ করিল। পার্ব্বতী মেজের উপর ঘুমাইয়া পড়িল।

৩

প্রত্যূষে আনন্দে জাগিয়া উঠিয়া সে বালককে সঙ্গে করিয়া মন্দির-অভিমুখে ছুটিল। তখনও উষার কুহেলি কাটিয়া রক্তপদ্ম ফুটিয়া উঠে নাই। আশ-পাশের সমস্ত অস্তিত্ব যেন পার্ব্বতীর সাম্‌নে মুছিয়া গেল। আজ প্রভাতের বিশ্বব্যাপী জাগরণ যেন তাহার এই আনন্দের অধীরতাকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিতে পারিয়াছে।

মন্দিরের সম্মুখে উঠিয়া সে ছুটিয়া দরজার কাছে যাইয়া হঠাৎ পিছাইয়া আসিল। সেই শব্দে বুড়ী জাগিয়া উঠিয়া চাতালের কোণ হইতে বিড় বিড় করিতে লাগিল, ঘুমোও না একটু বাছা। সারা-রাত যে কি কাণ্ড করিস্! দিনের বেলা ত মানুষের কাছে দেখাস্ ভাল-মানুষটি! তোকে নিয়ে আর পারি না আমি। আমি আর কতদিন তোকে আগ্‌লে বেড়াব বলতো!

বুড়ী আবার চুপ করিয়া গেল। মন্দিরের ভিতরে যে থাকে সে যেন বুড়ীরই দৃষ্টির বেষ্টনে অকল্যাণের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে!

পার্ব্বতীর ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া বুড়ীকে বুকে জড়াইয়া ধরে। তাহার দেবতাকে সে এত ভালবাসে, রাত্রির অন্ধকারেও তাহার মঙ্গল-চিন্তা তাহার দেবতাকে ঘিরিয়া থাকে, তাহাকে প্রাণের কৃতজ্ঞতা ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা করিল। এ সকল যেন তাহারই করিবার কথা, না বুঝিয়া সে এতদিন দেবতাকে ছাড়িয়া ছিল, বুড়ী তাহার দেবতাকে সঙ্গ দিয়াছে!

তাহার পর কি ভাবিয়া সেই অল্প আলো ও অন্ধকারের ভিতর অতি সন্তর্পণে মুক্ত মন্দির-দ্বার অতিক্রম করিয়া পুষ্প-পত্রের স্তূপের ভিতর যে দুইখানি ক্ষুদ্র হস্ত উর্দ্ধে উঠিয়া খেলিতেছিল, তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে চুম্বন করিল। ফুল-পাতা সরাইয়া শিশুকে বুকে তুলিয়া লইতে গিয়া দেখিল, তাহারই নিবেদিত ফুলের থালাখানি ভরিয়া শিশুটি শুইয়া আছে।

পার্ব্বতী মন্দির ছাড়িয়া পথে নামিল! তাহার মনে হইল, আজ প্রভাত-সমীর যেন বাধা-বন্ধ-হারা! তৃণে তৃণে যেন কে আজ ভাষা অর্পণ করিয়াছে! তরুণ আলোর ধারায় ধারায় যেন বিহগের গীতধ্বনি গোপন ভুবনের আশার কথা বহিয়া আনিয়া কম্পিত পুষ্প-লতার অন্তর-প্রান্তরে জীবন-কাহিনীর প্রতিধ্বনি ধ্বনিয়া চলিয়াছে।

পার্ব্বতী শিশুকে বুকে ঢাকিয়া যখন গৃহে ফিরিল, তখন তাহার মা গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া স্নান সারিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া যুক্ত করে সূর্য্য প্রণাম করিতেছিলেন। পার্ব্বতী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইল। প্রণামান্তে তাহার মা মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই—পার্ব্বতী শিশুটিকে মায়ের বুকের কাছে ধরিয়া বলিয়া উঠিল, ধর, ধর।

মাতা নিতান্ত অপ্রস্তুত ভাবে শিশুকে কোলে লইলেন। তাহার পরই শিশুর শরীরের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, মাগো এ কি রে? সর্ব্বনাশ করেছিস্! এ আবার কোথা থেকে কুড়িয়ে এনে বিপদ ডাক্‌লি? ধর, ধর।

পার্ব্বতী হাত তালি দিতে দিতে মা'র সম্মুখে ছোট বালিকার মত হাসিতে হাসিতে বলিল, মন্দিরে পেয়েছি মা, খুব ভোর বেলা উঠে আমি আর সুরো মন্দিরে গিয়েছিলাম।

মা বিপন্নভাবে শিশুকে কাপড়ে ঢাকিয়া লইলেন। তাহার পর পার্ব্বতীকে বলিলেন, আগুন জ্বাল, আগুন জ্বাল্—এ আবার কি আপদ জোটালি! মাগো, কার কি, ঠিক্ নেই। এনে ত ঘরে ঢোকালি!

পার্ব্বতী আগুন জ্বালিল। তাহার মাতা শিশুকে সেঁকিয়া পরিষ্কার করিয়া পার্ব্বতীর কোলে দিয়া, পুনরায় স্নান করিতে গেলেন।

পার্ব্বতী শিশুকে ভাল করিয়া আচ্ছাদন করিয়া কোলে করিয়া রৌদ্রে বসিয়া রহিল। বালক সুরো, মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শিশুর দিকে চাহিতে লাগিল।

বাহিরের দিকে চাহিয়া হঠাৎ সুরো চেঁচাইয়া উঠিল, বাবা এসেছে, বাবা এসেছে।

পার্ব্বতী শিশুকে আরও বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া বসিল। পার্ব্বতীর বসনাঞ্চল সহসা যেন উতলা হইয়া উঠিল, তাহার মনে-প্রাণে যেন কাহার চিরন্তন ধ্যান নিরাড়ম্বর স্তব্ধতা হইতে বাহিরে আসিয়া প্রভাত-বাতাসে জাগিয়া উঠিল।

সুরো মায়ের কাঁধের উপর মুখ রাখিয়া আবার বলিল, মা, বাবা এসেছে।

পার্ব্বতীর মা স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলেন, পার্ব্বতীর স্বামী বামাপদ ঘরের ভিতর চৌকির উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সুরো দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একবার বাহিরে মায়ের দিকে চাহিতেছে, আবার ঘরের ভিতরে বামাপদর মুখের দিকে তাকাইতেছে; পোষা বিড়ালটা আসিয়া সুরোর পা ঘেঁষিয়া ল্যাজ তুলিয়া করুণ সুরে ডাকিতে লাগিল। সুরো তাহার হাতের অর্দ্ধভুক্ত মুড়ীর মোয়াটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিল, নে, খা।

পার্ব্বতীর মা বামাপদর কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অসুখ করেছে বামাপদ? পথে বুঝি ঘুমোতে পারনি? শীগ্‌গির নেয়ে নাও, আমি ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি, ভাত হলে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়, তাহলেই শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে।

বামাপদ মুখ তুলিল না। চৌকি হইতে নামিয়া একবার শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া আবার চৌকিতে বসিয়া পড়িল।

মা ডাকিলেন, ও পার্ব্বতী! ওখানে বসে আছিস্ কেন? এখানে উঠে আয় না।

পার্ব্বতী উঠিয়া ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। কোলের শিশুটি নাড়া পাইয়া একটু কাঁদিয়া উঠিল।

পার্ব্বতীর মা সুরোকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে যাইবার সময় আবার বলিয়া গেলেন, তুমি নেয়ে নাও বাবা, এখনি আমার ভাত হয়ে যাবে।

তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। পার্ব্বতী কোমল স্বরে বামাপদকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, এমন করে বসে রইলে যে! কাপড় বের করে দেব?

বামাপদ বলিল, না। শরীরটা ভাল না, স্নান করব না।

—স্নান না কর, কাপড়-চোপড় ত ছাড়বে?

ভাত খাব—না, মনে কর্‌ছি।

ভাত না খেলেও আর কিছু খাবে—ত? রুটি করে দেব?

বামাপদ তারও কোন উত্তর দিল না। পার্ব্বতী শিশুটিকে বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়া বামাপদকে বলিল, তুমি একটু দেখো, আমি রুটি করে আনি।

পার্ব্বতী চলিয়া গেল। বামাপদ একটু সরিয়া বসিল। শিশু তাহার পিছনে অঘোরে ঘুমাইতেছিল। পোষা বিড়ালটা আবার আসিয়া বামাপদর পা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। বামাপদ তাহাকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল। বিড়ালটা আবার উঠিয়া আসিয়া বামাপদর পিঠের কাছে গা ঘষিতে লাগিল। বামাপদ একেবারে লাফাইয়া উঠিল। একটু চাহিয়া দেখিয়া হাত দিয়া বিড়ালটাকে ঠেলিয়া আবার বসিয়া পড়িল। তাহার শূন্য দৃষ্টি থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে পার্ব্বতী ঘরে আসিলে বামাপদ প্রশ্ন করিল, এ কার ছেলে?

পার্ব্বতী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, কেন, বলেছি ত, আমার।

বামাপদ কপাল কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মানে?

পার্ব্বতী উত্তর করিল, আমার মানে আমার! মানে, আমি ওর মা।

বামাপদ কয়েক-বৎসর পরে কর্ম্মস্থল হইতে ছুটী পাইয়া বাড়ী আসিয়াছে। পার্ব্বতীর কথায় তাহার সমস্ত চৈতন্য যেন লোপ পাইতে বসিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, ঘরের ভিতরে অবরুদ্ধ সিংহের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পার্ব্বতী নম্রভাবে বলিল, আজ সকালেই মন্দিরে একে কুড়িয়ে পেয়েছি।

বামাপদ বলিল, কাল রাত্রেও ত তুমি অনেকক্ষণ মন্দিরে ছিলে?

পার্ব্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ, ছিলাম। কিন্তু তখন এ মন্দিরে ছিল না।

বামাপদ গম্ভীর স্বরে ডাকিল, পার্ব্বতী! তাহার স্বর কাঁপিয়া গেল।

পার্ব্বতী বামাপদর হাত ধরিয়া চৌকিতে বসাইয়া বলিল, কি বলছিলে?

—এ ছেলে কার?

পার্ব্বতী উত্তর করিল, কার ছিল তা জানি না। দেবতার কাছে পেয়েছি, এখন এ আমার।

—কোন্ জাত, কার ছেলে জানো না, তাকে তুমি কি বলে আন্‌লে ? কার ছেলে, তুমি কিছুই জানো না ?

পার্ব্বতী তেমনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, বলেছি তো, জানি না। তবে আমি যা চেয়েছিলাম, তা' পেয়েছি। এ আমারই দেবতার।

বামাপদ ক্ষেপিয়া উঠিল, দেবতা ! দেবতা কে ? কে সে ? কার এ ছেলে, বল ? তা নইলে হয় তুমিএ বাড়ী ছেড়ে যাবে, নয় আমি চলে যাব। তুমি না আমার সন্তানের মা ?

পার্ব্বতীও এবার যেন ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, হাঁ, তাতে কি হয়েচে ? এ শিশু আমার কাছে থাকবে। তোমাদের তাতে ক্ষতি হয়—

বামাপদ বাধা দিয়া বলিল, ক্ষতি হয় ? তুমি বল্‌তে পারছ, ক্ষতি হয় ? এ যদি তোমার সন্তানও না হয়, তবু এ কে, তা জান না ! একে ঘরে রাখলে সমাজ কি বল্‌বে ?

—তারা না বুঝে যদি কিছু বলে, সে দোষ আমার নয়, এ শিশুরও নয়।

—তুমি একে মন্দিরে কুড়িয়ে পেয়েছ বলছ, বুঝতে পারছ এ কোন দুশ্চরিত্রার সন্তান ? এ সব করলে তাদের কুকীর্ত্তিকে পোষণ করা হবে। ওকে মন্দিরে রেখে এস !

পার্ব্বতী ছুটিয়া শিশুর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর সে রুদ্র-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, দুশ্চরিত্রার সন্তান কিনা তা জানি না। সন্তান, সন্তান। কার, কিসের ফল, তার বিচার কে করবে ? সুরো আমাদের কারো দুশ্চরিত্রের ফল কি না, কে জানে ? কে তা স্বীকার করবে, কে তার বিচার করবে ? সুরো জন্ম লাভ করে তার যদি কোন অপরাধ না হয়ে থাকে, তা হলে এ শিশুরও কোনও অপরাধ নেই। আমি একে ফিরিয়ে দিতে পারব না। দেবতা একে আমার কোলে তুলে দিয়েছেন। এর ঠাঁই আমারই বুকে। এর বেশি আমি বুঝি না। সন্তান বলেই একে মানুষ করব, তার জন্য তোমার ইচ্ছায় যদি আমাকে সব ছেড়ে চলে যেতে হয়, তাও পারব ! দেবতার মন্দিরে একে নিয়ে আশ্রয় নেব !

বামাপদ অধীর হইয়া উঠিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে পার্ব্বতীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিয়া ফেলিল, সর্ব্বনাশী, যাও তবে, ঐ পাপের বোঝা বুকে করে পুড়ে মরগে।

পার্ব্বতীর চক্ষু দুইটি নিরুদ্ধ অশ্রু-আবেগকে ধরিয়া রাখিতে লাল হইয়া উঠিল। সে শিশুকে বুকে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুরো দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া মায়ের আঁচল ধরিয়া টানিল, মা কোথায় যাচ্ছ, মন্দিরে যাচ্ছ আবার ?

পার্ব্বতীর মা হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত বেলাতে কোথায় চললি আবার ?

বামাপদ ঘরের দরজার কাছে আসিয়া বলিল, যাক্, যেতে দিন্।

পার্ব্বতীর মা এবার বুঝিতে পারিলেন, ব্যাপার কিছু গুরুতর হইয়াছে। তিনি ছুটিতে ছুটিতে গিয়া পার্ব্বতীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। পার্ব্বতী মায়ের কাঁধের উপর মুখ রাখিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সুরোর চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে তাহা বারে বারে মুছিতে লাগিল আর মাঝে মাঝে একটা ম্লান হাসি মুখে ফুটাইয়া বামাপদর দিকে চাহিতে লাগিল।

বামাপদ ডাকিল, সুরো ! এদিকে এস।

পার্ব্বতীকে লইয়া মা ঘরে আসিলেন। পার্ব্বতী কিছুক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তাহার দুই চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু মাটিতে টপ টপ করিয়া পড়িতে লাগিল। ব্যথায় দুঃখে তাহার বুক ভরিয়া দীর্ঘশ্বাস ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল; তাহাই ঢাকিয়া রাখিতে গিয়া তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে একটু পরে শিশুকে আবার বিছানায় শোওয়াইয়া দিল। তারপর মুখ চোখ মুছিয়া বামাপদর দিকে চাহিয়া বলিল, আমি যাব না। এই ঘরেই একে নিয়ে থাকব। আর তুমি একে বাঁচিয়ে রাখবার খরচ দেবে। আমি নিজেই তার যোগাড় করতাম, কিন্তু তোমার তাতে অপমান হবে।...ভেবেছিলাম, চলে যাব। কিন্তু তা করব না। তুমি আমাকে যতখানি অপমান করেছ, তা' না বুঝেই করেছ। চলে গেলে লোকেও কোন দিন বুঝত না, তুমিও বুঝতে না।

পার্ব্বতীর মা বামাপদর পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন,

আমি ত বুড়ো মানুষ বাবা, কিন্তু পার্ব্বতী এমন কি করেছে যার জন্য তুমি ওকে তাড়িয়ে দিলে, তা ত বুঝ্‌তে পারলাম না।

বামাপদ উত্তর করিল, পারবেন কি করে? আপনার মেয়ের দোষ দেখ্‌বেন কেন! পার্ব্বতী কিছু করেনি? জাতের ঠিক্ নেই, কুলের ঠিক্ নেই, তাকে এনে ঘরে পুষ্‌তে হবে!

পার্ব্বতীর মা ধীরে ধীরে আবার বলিলেন, তা বলোনা বাবা, আমিও প্রথমে পার্ব্বতীকে ঐ বলে গাল দিয়েছিলাম। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লাম, মা হয়ে ছেলে তুলে নিয়েছে, তাতে আর কি হয়েছে! জাত! জাত তো জন্মাবার পর ঠিক হয় বাবা! পার্ব্বতী ওর মা। তুমিও তোমার কাজ করবে, ওকে রক্ষে করবে। বাস্, ফুরিয়ে গেল!

সুরো একটু দূরে দাঁড়াইয়া সভয়ে বলিল, কেন বাবা, অত রাগ করছ? ও তো আমারই মত দেখ্‌তে।

পার্ব্বতী সুরোকে কোলে তুলিয়া লইয়া বামাপদর কাছে আসিয়া বলিল, এ ছেলে তোমার, আর ও ছেলে আমার জীবন-দেবতার। তা হলে হলো ত? তার চেয়ে ত কুল-শীল আর কিছু বড় নেই? তুমি অমন করোনা, একটু ভেবে দেখ, কেউ না নিলে ও কি করে বাঁচবে?

পার্ব্বতীর মা বামাপদর বুকে হাত দিয়া বলিলেন, নে বাবা, নে। কেউ ফেলে দেয়, কেউ তাই কুড়িয়ে নেয়, এই ত সংসারে এতকাল দেখছি। যা হবার হবে, এখন তো রাখ্।

বামাপদ সুরোকে পার্ব্বতীর কোল হইতে নামাইয়া লইয়া বাহিরে যাইতে যাইতে বলিল, তবে থাক্!

পার্ব্বতী লাফাইয়া গিয়া নিদ্রামগ্ন শিশুকে চুম্বন-ধারায় প্লাবিত করিয়া দিল। তাহার চোখের জল পড়িয়া শিশুর মুখঅন্ধকার-রাত্রির শিশিরে-ভেজা ফুলের মত দেখাইতে-ছিল।

বাহির হইতে বামাপদ ডাকিল, মা, ওকে ত কিছু কাপড় করে দিতে হবে। কাপড় এনে দিলে পার্ব্বতী পারবে না শেলাই করে দিতে?

পার্ব্বতীর মা বাহিরে আসিতে আসিতে চোখের জল আর হাসি মিলাইয়া উত্তর করিলেন, তা আর পারবে না বাবা! ঐটুকু ত প্রাণ, কাপড়-চোপড় না হলে বাঁচ্‌বে কেন?

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ।

নারীর অবস্থা

"নারী দেবী" এ কথা পুরুষ নারীকে ভুলাইবার জন্য বলিয়াছে, না, পুরুষের সত্যই বিশ্বাস যে নারী দেবী? শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দেবী নামক গল্পে দেখিতে পাই, শ্বশুর ও সকলের নিকট আপনাকে "দেবী" বলিয়া পূজা পাইতে পাইতে নায়িকা দয়ার শেষে বিশ্বাস হইল যে সে সত্যই দেবী। নারীরও তেমনি আপনাদের দেবীত্বে বিশ্বাস হইয়াছে। কিন্তু সত্যই কি নারী মানব-সুলভ সকল দুর্ব্বলতার বহির্ভূত? সত্যই কি আমরা—হিন্দুনারীরা ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত? না, পুরুষের ন্যায় এই সবের বশীভূত? যদি নারী মাত্রেই এই সব দুর্ব্বলতা—যাহা মানব-জীবনে অতি সহজ ও স্বাভাবিক, মানুষ মাত্রেই যাহাতে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত—তাহা হইতে মুক্ত হইত, তবে নারীকে দেবী বলা অত্যুক্তি হইত না।

কূপমণ্ডুকের ন্যায় কেবলমাত্র কূপের জল মাপ করিলে জগতের খাল, বিল, নদ, নদী, সাগর মহাসাগর প্রভৃতির জল সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে না। চিরবন্দিনী, চির-দুঃখিনী হিন্দু-নারীর অবস্থাই যে নারী-জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা', এরূপ মনে করা ভুল। কৈ, হিন্দুনারী ভিন্ন তো জগতের আর কোন নারীকে—সভ্য, অসভ্য স্বাধীন পরাধীন যে কোন জাতীয় নারী—এরূপ বন্ধনের মধ্যে অটল নিষ্কম্প হইয়া

থাকিতে দেখা যায় না। হিন্দু সমাজে যেরূপ জগতের কোন তরঙ্গ নারীর নিকট পৌঁছে না, কোন হিল্লোল নারীকে কাঁপায় না, চির-পরিবর্ত্তনশীল জগতে অজানা গণ্ডীর মধ্যে অটল নিষ্কম্প হইয়া হিন্দুনারী যেরূপ একভাবেই রহিয়াছে, বিশাল জগতে আর কোন নারীই তো এরূপ থাকে না। এ বিচিত্র ও অদ্ভুত পার্থক্য দেখিয়া বলিতে কি ইচ্ছা হয় না যে ভগবান সারা জগৎ হইতে তফাৎ করিয়া বঙ্গনারী সৃষ্টি করিবেন কেন? নীরোগের পার্শ্বে রোগী রাখিয়া নীরোগের উৎকৃষ্টতা বুঝাইবার জন্য নীরোগকেও রোগী করিতে? কিন্তু এস্থানে রোগী কে? হিন্দুনারী, (এখানে 'হিন্দু' নারী অর্থে বঙ্গনারীই কথিত) না, সারা জগতের যাবতীয় নারী-সঙ্ঘ!

সমাজে নারীর জন্য যে-সকল বিধি-ব্যবস্থা রহিয়াছে অন্য কোন সমাজে এরূপ নাই। পশ্চিম জগৎ—ইউরোপ আমেরিকার কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যাক, ভারতবর্ষের পার্শী, মহারাষ্ট্র, রাজপুতনা প্রভৃতি দেশেও নারী প্রায় একভাবেই পুরুষের তুল্য-অধিকার ভোগ করিতেছে। পার্শী মারহাট্টা রাজপুতনা বিলাত নহে। বর্ব্বর ও দস্যু-প্রধান আরবেও শুনিয়াছি পুরুষরা নারীকে শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে পুরুষ হইতে দুর্ব্বল মনে করে; যে সকল অপরাধে পুরুষের কঠোর শাস্তি বিধান আছে, (যেরূপ নৈতিক জীবনে পদস্খলন প্রভৃতি) সেই অপরাধেই নারীকে দুর্ব্বল বলিয়া তাহারা অনায়াসে ক্ষমা করে। আর এ দেশে? যে কার্য্যে পুরুষের অপরাধ বা শাস্তি হওয়া দূরে থাক তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে না সেই কার্য্যেই—তাহাপেক্ষা শতগুণ লঘু অপরাধেও—নারীর কি নির্ম্মম শাস্তি সমাজ নির্দ্দেশ করিয়াছে! অন্য কোন সমাজে তো নারীর পাপ এরূপ অমার্জ্জনীয়, কোন ধর্ম্মে তো নারীর পাপ এরূপ অক্ষয় হয় না।* আপনাদের দুর্ব্বলতা পুরুষ সহ্য করিবে, ক্ষমা করিবে; কিন্তু নারীর দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিতে পারিবে না, ইহাই বুঝি নারীর প্রতি দেবীত্বের সম্মান!

বুঝিতে হইবে যে "দেবী" বলিতে কি বুঝায়। সকল প্রকার নিন্দা স্তুতি, যত্ন-অত্যাচার, পূজা অবজ্ঞা প্রভৃতি অনুকূল-প্রতিকূল সকল অবস্থাতেও যে নর বা নারী অপরিবর্ত্তন-মন হইয়া থাকিতে পারে, তাহাকে দেবত্ব প্রদান করা যায়। হিন্দু সমাজের প্রত্যেক নারী যদি শত অত্যাচার, সহস্র প্রলোভন সত্ত্বেও অটল অবিচলিত থাকিত, যদি পাখা কাটিয়া উড়তে না পারার বড়াই না করিয়া হিন্দু-পুরুষ নির্ভীকচিত্তে পাখা রাখিয়া জোর গলায় বলিতে পারিত যে পাখা সত্ত্বেও হিন্দুনারী উড়িতে চাহে না, যদি হিন্দুনারীর সতীত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া পুরুষ তাহাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়া অটল থাকিতে দেখিত, তবে তাহাকে "দেবী" বলিয়া বড়াই করা পুরুষের পক্ষে সঙ্গত হইত। কিন্তু পাছে ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে যে হিন্দু কাঁচের খেলনার ন্যায় নারীকে অন্ধকারে লুকাইয়া রাখিয়াছে, অপরের চোখে পড়া দূরে থাক্, নিজেরাও যাহাকে ভালরূপে দেখিবার সাহস পায় না; কি জানি, তাহাদের মনে কি লুকাইয়া আছে, খোঁচা দিলে না পাছে তা' বাহির হইয়া পড়ে এই ভয়ে নারীর অন্তরের তলদেশ পর্য্যন্ত চাহিতে যাহারা সাহস করে না, তারাই আবার "আমাদের নারী দেবী" বলিয়া গর্ব্ব করে? সোনাকে অগ্নি-পরীক্ষা দিয়া আপনার স্বর্ণত্ব প্রমাণ করিতে

---

* আশ্বিনের ভারতীতে অনুরূপা দেবী বলিয়াছেন যে, "অভয়ার ন্যায় নারীর জন্য কুলমহিলার এত মাথা ব্যথা কেন? তাহার পথ তো সে নিজেই বাছিয়া লইয়াছে।......লেখিকা ভগিনী কি তাহাকে আপনার পুত্রবধূর আসন দিতে পারিবেন?" বড় দুঃখে হাসিয়া বলিতে হইতেছে যে ততখানি উদারতাই যদি আমাদের থাকিবে; তবে অভয়াকে 'তাহার স্থান' নির্দ্দেশ করিবার জন্য আমাদের দ্বারস্থ হইতে হইবে কেন? অভয়াকে পুত্রবধূর স্থানে বসাইতে আমাদের মন না সরিতে পারে, কিন্তু যদি আমাদের কোন এক হতভাগিনী কন্যা বুদ্ধির দোষে বা অন্য কারণে অভয়ার মতই পিছলিয়া পড়ে, তবে আমাদের মায়ের হাতও কি তাহাকে তুলিয়া ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইবে না! সমাজের ভয়ে হাত উঠিতে না পারে, কিন্তু মায়ের মনও কি সেই হতভাগিনী মেয়েকে পাপের পথই নির্দ্দেশ করিয়া দিবে? মায়ের মন কি ইহাই চাহিবে না যে 'আহা এর যদি একটা ব্যবস্থা থাকতো' ইহাই কি চাহিবে না যে সে একবার ভ্রমের জন্য আজীবন পাপের মধ্যে ডুবিয়া না থাকিয়া আবার ভাল হইয়া ভাল ভাবে থাকুক? মন্দ ছেলের জন্য তো মা ভাল ছাড়া মন্দ চাহেন না। অভয়াকে কন্যার স্থানে রাখিয়া তাহার প্রতি কোন কর্ত্তব্য আছে কি না যতীন্দ্রবাবু ও অনুরূপা দেবী ভাবিয়া দেখিবেন।

হয়। পরীক্ষার সাহস পর্য্যন্ত যাহাদের নাই, তাহাদের মুখে "দেবী" শুনিয়া নারীও সত্য ভুলিয়াছে!

পুরুষের বিশ্বাস যে পুরুষের প্রতি নারীর ভক্তি অসীম, নারীর অন্তরে পুরুষের আসন অটল, পুরুষের প্রতি নারীর ভালবাসা অগাধ; কিন্তু উহা "সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়" ভিন্ন অন্য কিছু নহে! হিন্দুনারীর একনিষ্ঠত্ব স্বাভাবিক ও সত্য বলিয়া বোধ হইলেও তাহা স্বাভাবিক বা সত্য নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন বস্তুর স্ব-ভাব বুঝিতে হইলে স্থান বা দেশ-বিশেষের আবদ্ধ বস্তু দ্বারা বিচার করিলে তাহার সত্য মীমাংসা হয় না। জগতের নারী-প্রকৃতির দ্বারা বিচার করিলে বুঝা যায় যে নারীমাত্রেই পুরুষ হইতে সন্তানের প্রতি স্নেহশীলা ও সন্তানের জন্য নারী জীবন ত্যাগ করিতে পারে; সুতরাং এই বিশেষত্ব নারীর স্বাভাবিক ও সত্য। কিন্তু যে পক্ষে সতীত্ব বা একনিষ্ঠত্ব হিন্দু-নারীর সত্য অবস্থা বলিয়া ব্যক্ত করা হয় তাহা জগতের সকল নারীতে নাই, এবং একনিষ্ঠত্বই যে সতীত্ব, এরূপ বিশ্বাসও নাই। সুতরাং ইহা মিথ্যা। মুসলমান ধর্ম্ম-শাস্ত্রের "জয়নাব" দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু জয়নাবের তুল্যা সতী কি হিন্দুরও বন্দনীয়া নহে? 'এনক আর্ডেনের' য়্যান পত্যন্তর গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু কাহারও কি সাধ্য হইবে যে য়্যানকে অসতী বলে? শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়েরও একটি গল্পে বিধবা মুসলমান নারী দ্বিতীয়বার পতি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু লেখক তাঁহাকে সতী বলিয়াই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং একনিষ্ঠত্বই যে সতীত্ব নয়, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। যে একনিষ্ঠত্বের জন্য হিন্দুনারী জগতে উচ্চ বলিয়া পরিচিতা সত্যই কি সেই একনিষ্ঠত্ব হিন্দুনারীর মজ্জাগত? তাহা হইলে তো হিন্দু সমাজে পতিতা বা পুনর্ব্বিবাহিতা নারী একটিও থাকিত না! (একজন বিখ্যাত বঙ্গীয় ঔপন্যাসিক লিখিয়াছেন, যত বাজারে বেশ্যা সকলেই কি মুসলমান?) কিন্তু সমাজে পতিতা পুনর্বিবাহিতা যখন কাল্পনিক নহে, তখন একনিষ্ঠত্ব ওরফে সতীত্ব যে হিন্দুনারীর মজ্জাগত নহে তাহা বুঝা যায়। সঙ্গত না হইলেও ইহাই স্বাভাবিক, কারণ ইহাই জগতের রীতি। নিছক ভাল কোন বস্তুতেই নাই।

এই সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এ নয় যে পুরুষ পাপ করিতেছে, আমরা করিব না কেন? "পুরুষ বাইজি লইয়া বাগানে গিয়াছে, আমরাও বাবুজি লইয়া রাস্তায় যাইব।" তাহা নহে, পাপের অন্যায়ের অনুচিতের বখরা লইয়া বিবাদ করা নহে। মানুষ মাত্রেই ভুল-ভ্রান্তির বশবর্ত্তী। পুরুষের ন্যায় নারীও ইহা হইতে মুক্ত নয়। যতই বিধি-ব্যবস্থা, মনু-পরাশর উপস্থিত হউন না কেন, মানুষ চিরদিন মানুষই থাকিবে। পুরুষের পাপ ক্ষয় হয়, ভ্রম যখন সংশোধন হয়, তখন নারীর ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিলে, নারীর পাপ ক্ষমা করিলে সৃষ্টি রসাতলে যাইবে না। যাহারা নারীকে ক্ষমা করিয়াছে, তাহারা সৃষ্টি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। পুরুষ উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া "আমরাও উচ্ছৃঙ্খলতার দাবী আনিতেছি না। এ পর্য্যন্ত তো কাহাকেও বলিতে শুনা যায় নাই, যে, তোমরা মন্দ অতএব আমরাও মন্দ হইব। এ সব কথা বলাইয়া গায়ে পড়িয়া ঝগড়া কেন? আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, পুরুষ যে চায় নারী সংযত, সাধুশীলা ও বাধ্য থাকে, নারীও ঠিক সেইরূপ চাহে। নারীকে যখন পুরুষ সৎ থাকিতে উপদেশ দ্যায়, তখন সতের যে কি মর্য্যাদা তাহা পুরুষ বেশ জানে। নারীর পাপ পুরুষ যেরূপ ঘৃণা করে পুরুষের পাপও সেইরূপ ঘৃণাকর। তবে সমাজ তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাই তাহার গুরুত্ব বুঝিতে বিলম্ব হয়।

অপরাধী নারীকেও শোধরাইতে অবসর দেওয়া চাই। তাহাকে তুলিয়া ধরিবার জন্য উদার হস্ত প্রসারিত হওয়া চাই। "তাহার পথ সে তো বাছিয়া লইয়াছে" বলিয়া পঙ্কের মধ্যেই তাকে রাখিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। আবার ভাল হইব এ আশা মহাপাপীও করে। "বাইজি" বা "বারবনিতা" বলিয়া যে এত ঘৃণা, তাহার সৃষ্টি করিল কে? উহাদের কি ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, না তাহারা স্বয়ম্ভু? অভাগিনী নারীর এই পথ ভিন্ন আর কোন পথ নাই, কাজেই তাহারা এই একটী মাত্র পথই অবলম্বন করিয়াছে।

প্রচ্ছন্ন সত্যকে সহসা নগ্ন-মূর্ত্তিতে পূর্ণ প্রকাশিত দেখিলে বোধ হয় উহা সত্য নহে; কারণ তাহা দেখিতে আমরা

অভ্যস্ত নহি, এজন্য দেখিতে ভাল লাগে না। কিন্তু ভাল না লাগিলেও এবং প্রচ্ছন্ন থাকিলেও সত্য চিরদিনই সত্য। এক গণ্ডী ভিন্ন জগতের সকল নারীতেই যাহা স্বাভাবিকরূপে হইতেছে, বঙ্গনারীতে যে তাহা হয়না, তাহা কেবল পথ রুদ্ধ বলিয়া। রুদ্ধ অবস্থা সত্য বা স্বাভাবিক নহে। পুরুষ উচ্চ কথা বলিয়া নারীকে ভুলাইয়া তাহার ভক্তি গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু ইহা পুরুষের প্রাপ্য নহে, এবং নারীও তাহা জ্ঞানতঃ পুরুষকে প্রদান করে নাই; নারীকে ভুলাইয়া তাহা আদায় করা হইয়াছে।

এই যে নারী এতকাল পতির চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, মুখ বুজিয়া পুরুষের অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, খাদ্যের উদ্বৃত্তাংশ খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছে, কিন্তু এই পদপতিতাগণের প্রতি পুরুষ কি কোন দিন সস্নেহ দৃষ্টি পাত করিয়াছে? পুরুষের জন্য নারী সুখ ও আয়ু প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু পুরুষ কি কোন দিন নারীর শরীর বা মনের প্রতি চাহিয়াছে? মানুষের প্রাপ্য কোন অধিকার কি দিয়াছে? পুরুষের কথা ছাড়িয়া দিই,—নারীর কি ইহাতে কোন উন্নতি হইয়াছে? সেই প্রপিতামহীর যুগের নারী হইতে বর্ত্তমান যুগের নারী কি জ্ঞানে সাহসে, শিক্ষায় কোন উন্নতি লাভ করিয়াছে? না, যুগের পর যুগ নারী বদ্ধ জলরাশির পঙ্কিল জলের ন্যায় জ্ঞানহীন হইয়া এক অবস্থাতেই রহিয়াছে! মান্ধাতার আমল হইতে এ-পর্য্যন্ত আহারে, রন্ধনে, বসনে, ভুষণে, কাজে কর্ম্মে, কথাবার্ত্তায় নারী ঠিক একরূপই রহিয়াছে। নদী, পাহাড় সূর্য্য, চন্দ্র, জগৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু নারীর পরিবর্ত্তন নাই। নারীর পরিবর্ত্তন মহাপাপ! খাড়ু, কঙ্কণ থাকিতে হিন্দুনারী "ক্রচ-ব্রেসলেট" পরিবে কেন? বীণা থাকিতে হারমোনিয়ম, পিয়ানো কেন বাজাইবে? এমনি যুক্তি এবং এই যুক্তি লইয়া তর্কে অবতীর্ণ হওয়া দুইই অদ্ভুত!

শাস্ত্রের বড় বড় কথা চিরদিনই শুনিতেছি, হিন্দু স্ত্রীতে ও শ্রীতে প্রভেদ দেখেন না। পথে নারী দেখিলে (তাহা হইলে হিন্দুনারী সেকালেও পথে বাহির হইত নাকি? ইহা মেম-সাহেবদের দেখাদেখি নহে!) হিন্দু মুখ ঢাকিয়া পয়ঃপ্রণালী দিয়া চলিয়া যান, (চাবুক লইয়া তাহাকে অন্তঃপুরে খেদাইয়া মুখ ঢাকিয়া দেন না!) যে গৃহে নারীর সম্মান নাই, সে গৃহে দেবতা আশীর্ব্বাদ করেন না। কথাগুলি বড় চমৎকার! হিন্দু সমাজে নারীর সম্মান এত অধিক বলিয়াই সর্ব্বত্র নারী এত নির্য্যাতিতও হইতেছে, পরে যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তাহাকে আত্মহত্যা করিতে হইতেছে। বর্ত্তমানে সময়ে নারীর মান এতই অধিক যে তাহার সঙ্গে ঘুষ না দিলে তাহার বিবাহ বন্ধ হয়। যেহেতু বিবাহ কেবল নারীরই প্রয়োজন, পুরুষের তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই!

নারীর প্রতি পুরুষের বড়ই সদ্বিবেচনা। "আমরা মরিব আর তোরা বাঁচিয়া থাকিবি, হইবে না! ভগবান যখন আমাদের মারিলেন, তোদের মারিলেন না, তখন আমরাই তোদেরে মারিব, তোদের সঙ্গে করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইব, একা স্বর্গে যাইবার সাধ্য তো তোদের নাই। মুখ বাঁধিয়া জীবন্ত পুড়িয়া মর, বিধবা হইয়া বাঁচিয়া থাকিলে কি করিয়া বসিস্ তাহার ঠিক কি! তাহাতে নরকে যাইব, সুতরাং তোদের ভালর জন্যই তোদের পুড়াইয়া মারিতেছি, নতুবা ইহাতে আমাদের লাভ কি?" সত্যই তো পুরুষের ইহাতে লাভ কি? কেবল নিঃস্বার্থ নারী-সম্মান! এমন প্রথাও কি না ম্লেচ্ছ রাজার আইনে উঠিয়া গেল!

যতীন্দ্র বাবু "তপস্যা" নামক পুস্তকে এবং শ্রীমতী অনুরূপা দেবী "ভারতবর্ষে" বাল্য-বিবাহের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। দূরদর্শী সমাজপতিগণ অনেক বিবেচনা করিয়া বাল্যবিবাহ-প্রথা প্রচলন করিয়াছেন। বাল্যবিবাহে দাম্পত্য প্রেম বড়ই দৃঢ় হয়, তাহা বড়ই সুন্দর কিন্তু যখন সেই বালবধূ শরীর ও মন পূর্ণ গঠিত হইবার পূর্ব্বেই অকালে সন্তান প্রসব করিয়া চিররুগ্ন হইয়া পরে তখন তাহাও বড়ই সুন্দর! অথবা যখন অকালে প্রসব হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা আরও সুন্দর; কারণ স্বামী-পুত্র রাখিয়া মরা সে তো জোর কপালের কাজ, কয়জন এরূপ মরিতে পারে! অথবা যখন বাল্য কাল হইতে অবরোধ ও প্রসবহেতু বধূ চিররুগ্ন হইয়া দুর্ব্বলতা বশতঃ গৃহকার্য্য করিতে পারেনা এবং

সেই অজুহাতে প্রৌঢ় পুরুষ মৃত্যুর পূর্ব্বসময়ে পুনরায় বিবাহ করে তখন তাহাও বড় সুন্দর! আর প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের বিবাহ বালিকার সহিতই হইবে, কারণ যুবতী-বিবাহ মহাপাপ—তারপর বৃদ্ধ পতির মরিবার বয়স হইয়াছে দুই চার বৎসর পরে সে মরিলে বালিকা বধূ যখন বিধবা হয় তখন তাহা আরও সুন্দর, আরও মধুর! তারপর সে চিরজীবন একাহার ও একাদশী করিয়া আপনার চিত্তকে পুড়াইয়া পুরুষের ভোগের মন্দিরে সারা জীবন নিস্ফলভাবে যাপন করুক অথবা অধর্ম্মের পথে গমন করুক, সে দৃষ্টান্ত জগতের সভ্যতা ও সুবিচারের ইতিহাসে অতুলনীয়!

বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকিলে বিপত্নীক পুরুষগণ আপনার অনুরূপ বয়সের স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত বা বৃদ্ধ পতির মৃত্যু হইলে তরুণী বিধবা পুনরায় বিবাহ করিতে পারিত। ৫০।৬০ বৎসর বয়স্ক বিপত্নীক পুরুষের ১৩।১৪ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করা ভিন্ন উপায় নাই। তারপর ৬০।৭০ বয়সে মৃত্যু হইলে তাহাকে অকালমৃত্যু বলা যায় না। কিন্তু বালিকার বয়স তখন ২৬ বা ২৮ বৎসর মাত্র। ৬০।৭০বৎসর সংসার ভোগ শেষ করিয়া মরিবার সময়, কিন্তু ২৬।২৮ বৎসর বয়সে তো সংসার-ভোগের ইচ্ছা শেষ করিয়া সন্ন্যাস লইবার ইচ্ছা বা বয়স হয়না। এই দিকটা যতীন্দ্র বাবু ও অনুরূপা দেবী ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? নিশ্চয় নহে। দেখিলে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেই কথা কহিতেন।—কাহারও ঘরে যদি অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যা বা বধূ থাকে তবে সে ঘরের পিতা-মাতা প্রাণ ভরিয়া সংসারের আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন না। অনেক মা মেয়ের সঙ্গে একবেলা খান, একাদশী করেন অর্থাৎ মেয়ের কষ্টের অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু মা সমদুঃখী হইলেও ইহাতে মেয়ের দুঃখের বা দুর্ভাগ্যের কিছুমাত্র উপশম হয় না।

যতীন্দ্র বাবু "অনুপমা" উপন্যাসের উপদেষ্টার আসনে বসিয়া বলিয়াছেন, "পত্নী-বিয়োগের পর পুরুষ যে বিবাহ করে, সে তাহার দুর্ব্বলতা"। আমরা এইজন্যই বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী। দুর্ব্বলা বিধবাগণকে সে বিবাহে অধিকার দেওয়া হইবে না? নারীমাত্রেই তপস্যা করিয়া সর্ব্বসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তো জানি না। নারীতে কি দুর্ব্বলতা নাই? আর তিনি "বিধবার প্রেম" বলিয়া শিহরিতেছেন কেন? অর্থাৎ বিধবার অধিকার নাই কিন্তু বিপত্নীকের আছে। স্বভাবকে রুদ্ধ করিলেই তাহা পঙ্কিল হয় এবং স্বাভাবিক সরল পথ না পাইলে যে-কোন পথ দিয়া তাহা বাহির হইবার চেষ্টা করে, ইহাই জগতের নিয়ম। সকলেই স্বীকার করিবেন যে তরুণী বিধবা বা যে সকল বিবাহিতা কন্যাকে বিধবার ন্যায় আজীবন পিতৃগৃহে থাকিতে হয় তাহারাই কলহ-পরায়ণ ও কটুভাষিণী হইয়া থাকে। হৃদয়ের প্রেমকুসুম শুষ্ক হইয়া যাওয়াতেই তাহাদের স্বভাব নীরস হয়। কারণ প্রেম ও প্রণয় মানব-জীবনের অতি সুন্দর সুকোমল বৃত্তি, সর্ব্বাপেক্ষা সুখময় বস্তু। প্রেম বিকশিত হইলে পর হৃদয়ের অন্য কোমল বৃত্তিগুলি বিকশিত হয়। এই যে নারীর সন্তান-স্নেহ, জগতে যাহার তুলনা নাই, তাহাও প্রেম বা প্রণয়ের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হয়। যে সকল নারীর প্রেম-পিপাসা মিটে নাই, পথ রুদ্ধ বলিয়াই তাহারা ওরূপ কটুভাষিণী হয়।

"তপস্যায়" যতীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, "পাশ্চাত্য সমাজে প্রেমকে অতিমাত্রায় স্বাধীনতা দিতে দিতে এখন তাহার পাখা হইয়াছে, সে এখন সাধারণ ঘরকন্নারূপ খুঁটিনাটির মধ্যে অবরুদ্ধ ও আবদ্ধ থাকিয়া নিজকে ধূলি মলিন করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। পাশ্চাত্য সমাজে স্বামী স্ত্রীর নিকটে আদর-অনুরাগ সবই পাইতেছেন, কেবল পান না সেই অদ্ভুত রহস্যময় বস্তুটি অর্থাৎ Love বা প্রেম।"

কোন বস্তুর প্রতি যদি অন্তরে বিদ্বেষ বদ্ধমূল থাকে তবে তাহার বিচার ন্যায়পূর্ণ হয় না। যতীন্দ্র বাবুর তাহাই হইয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজের প্রতি তাঁহার অন্তরে বিদ্বেষ এত বদ্ধমূল বলিয়া তাঁহার নিকট সত্য প্রকাশিত হইতেছে না। সার্ব্বজনীন উদার মত ভিন্ন সত্য নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। অন্ধ আবেগ বা অন্ধ বিশ্বাস, ইহার কোনটিই ভাল নহে। কোন্ প্রমাণে তিনি এই মত প্রকাশিত করেন? বোধ হয় পাশ্চাত্য নারীকে বৈধব্যের পর পুনর্বিবাহিত হইতে দেখিয়া। কিন্তু গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া বিচার করিলে তিনি বুঝিতেন যে তাঁহার মত

কিরূপ ভ্রমপূর্ণ। হিন্দু পুরুষ তো বিপত্নীক হইলে পুনরায় বিবাহ করে, তাই বলিয়া কি সে স্ত্রীকে ভাল বাসেনা? পাশ্চাত্য সমাজে স্ত্রী-পুরুষ তুল্য স্বাধীন। আমাদের প্রাচীন যুগেও তাহাই ছিল। এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। কেবল ইহাই বলিতেছি যে, তিনি প্রাচীন ভারত-নারীর উদাহরণ দিয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন,অনেক উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এক তরফা বিচার করিলে সুবিচার হয় না। তিনি পুরুষকে তো কোন উপদেশ দেন নাই! কই আজকাল সে রামচন্দ্র, সে সত্যবান, সে অজ কই? যে অজের বিলাপ সংস্কৃত সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়াছে, যে রামের স্বর্ণসীতা রামায়ণকে ধন্য করিয়াছে, যে সত্যবানের গুণে তপোবন স্নিগ্ধ হইয়াছে, সে সব পুরুষ কই? পত্নীর মৃত্যুর পর-মুহূর্ত্তেই যে আত্মসর্ব্বস্ব পুরুষ "অবলীলাক্রমে" পর-স্ত্রীতে আসক্ত * হইয়া সন্তান ত্যাগ করে, তাহারাই কথায় কথায় সীতা সাবিত্রী, সতীর উদাহরণ দেয় কেন? পতির নিন্দা শুনিয়া সতী প্রাণ ত্যাগ করিলেন, তাঁহার সতীত্ব কি উজ্জ্বল! আবার এদিকেও আদর্শ পতি মহাদেব স্ত্রীর মৃত-দেহ মস্তকে ধরিয়া ভুবন পর্য্যটন করিলেন! ইহার নিকট তুচ্ছ তাজমহলের মর্য্যাদা কোথায় লাগে! সতীরমণী সতীকে পতির এই অমৃত প্রেমই অমর করিয়া রাখিয়াছে। কোথায় আজকাল সেই সব পুরুষ! "সধবা অথবা বিধবা রমণী অমুক প্রতিবেশীর সহিত গৃহ ত্যাগ করিল" এ স্থলে যতীন্দ্রবাবু "রমণীর" উপরেই যত শাস্তি দান করিয়াছেন; কিন্তু কই "অমুক প্রতিবেশী"কে তো কিছুই বলেন নাই! তিনি বর্ত্তমান নারীগণের প্রতি খড়্গহস্ত, কিন্তু পুরুষের কোন দোষ দেখিতে পান না! (ঠক বাছিতে গ্রাম উজাড় হইবার ভয়ে কি?) সমানভাবে বিচার করুন, তাঁহার বিচার সকলে মাথা পাতিয়া লইবে। বিচারকের এরূপ পক্ষপাতিতা কেন?

যৌবন-বিবাহের 'কনে' কিরূপ 'লজ্জা-ভূষণা' তাহা অনুরূপা দেবী ভাবিয়া পান না! কিন্তু আমাদের চির-উপমেয় সীতা, সাবিত্রী, উমা প্রভৃতি মায়ের কোলে বসিয়া তো বিবাহ করিতে আসেন নাই। মায়ের বা ধাত্রীর কোলে চড়িয়া স্বয়ংবরাও হন নাই। তাঁহারা পূর্ণ যৌবনেই বিবাহ করিয়াছিলেন। তারপর পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী, সংযুক্তা ইহারাও যৌবনেই বিবাহিতা হইয়াছিলেন। বোধ হয় ইহারা বিলাতী আদর্শেই এরূপ "লজ্জাহীনা" হইয়াছিলেন! নতুবা শ্বশুড় শাশুড়ীর সম্মুখে কোন্ লজ্জায় স্বামীর সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন? কোন্ লজ্জায় প্রকাশ্য সভায় বর মনোনীত করিতেন? বিবাহার্থীকে সগর্ব্বে প্রত্যাখ্যান করিতেন? সাবিত্রী তো নির্লজ্জতায় সকলের উপর টেক্কা দিয়াছেন! প্রকাশ্য রাজসভায় বুড়া পুরুত, বাপ, মন্ত্রী সকলের নিকট নিজের বর মনোনয়নের কথা প্রকাশ করিলেন! আর ইহারা সকলেই বোধ হয় "বিবাহের পর শ্বশুড়-বাড়ীতে" শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধন-রত্ন-সমন্বিতা॥

এখানে তো কন্যাকে পিতৃগৃহে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিয়া তবে বরের হস্তে সমর্পণ করিতে বলা হইয়াছে। তবে মনু-ঠাকুরটি কি সাগর-পারের সাহেব ছিলেন! নতুবা এ কথাই বা কেন বলিবেন, "অজ্ঞাত পতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতি-সেবনাম্। নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম॥" পতি-মর্য্যাদা ও পতিসেবা শিক্ষা দেওয়া পিতারই কর্ত্তব্য, এই শিক্ষা দিয়া পরে পিতা কন্যার বিবাহ দিবেন। মনু তো এ শিক্ষার ভার মেয়ের শ্বশুড়-বাড়ীতে ফেলিয়া দেন নাই। না, ছোট্ট মেয়েটাকে পুতুলখেলা হইতে টানিয়া আনিয়া পতি-মর্য্যাদা ও পতিসেবা শিক্ষা দিতে হইবে!

অনুরূপা দেবী কি হিন্দু বলিতে বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজ ভিন্ন অন্যত্র চাহিতে নিষেধ করেন? তিনি কি জানেন না যে "বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ, গুর্জ্জর, পাঞ্জাব, রাজপুতান" এ সবাই হিন্দু। এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও যে তিনি এতখানি বলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।

বাল্যবিবাহের পক্ষপাতিনী হওয়ার অনুরূপা দেবীর কারণ আছে। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাল্য-বিবাহের

---

* কথাটি যতীন্দ্রবাবুরই। তিনি দ্বিতীয় বিবাহের পতিকে "পর-পুরুষ" বলেন। সে হিসাবে দ্বিতীয় বিবাহের স্ত্রীও পরস্ত্রী বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার এ পিতামহ-ভক্তি প্রশংসনীয় হইলেও সকলেই যে তাঁহার মত-অনুসারে চলিবে, এ বিশ্বাসের কারণ কি?

বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর, মুনি-ঋষিকেও ছাঁটিয়া ফেলিয়া ভূদেব বাবুকে উচ্চ আসন দিয়াছেন, কথায় কথায় তিনি ভূদেব বাবুর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই যে মুনি ঋষি অপেক্ষাও ভূদেববাবুর মতই গ্রহণ করিবেন, এ মনে করা অন্যায়। ভূদেববাবু সামাজিক রীতি-নীতি আলোচনা করিয়া তাঁহার অনেক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার অনেক উপদেশ বা চিন্তা উঁচুদরের এবং সমাজের উপযোগী হইলেও সকল বিষয়েই কি তিনি নির্ভুল?

ভূদেববাবু একস্থানে বলিয়াছেন, "মাতা দুর্ব্বল হইলেও পিতা যদি সবল হয়, তবে সন্তানের কোন ক্ষতি হয় না, সন্তান সবল হইবে। কারণ দুর্ব্বল গাভী ও বলিষ্ঠ ষাঁড়ের বৎস সবলই হইয়া থাকে।" কিন্তু এ স্থলে ষাঁড় ও গাভী উভয়ই যদি সবল হয় তবে বৎস অতি বলিষ্ঠ ও মহাকায় হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ ইয়োরোপ ও আমেরিকার গো-কুল। মানব সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযুজ্য। পিতামাতা দুই সবল সুস্থ হইলে সন্তানও অতি সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়; ইহার প্রমাণ ইয়োরোপ ও আমেরিকার মনুষ্যজাতি।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী যত শাস্ত্রজ্ঞই হউন চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁহার কিছুমাত্র অধিকার থাকিলে তিনি বাল্য-বিবাহের সমর্থন করিতেন না। তবে তিনি বলিতে পারেন যে স্ত্রীলোকের চিকিৎসা শিখিবার আবশ্যকতা কি? দেশে তো বহু পুরুষ-চিকিৎসক রহিয়াছে, তাহারা কি না খাইয়া মরিবে!

অনুরূপা দেবী বাল্য বিবাহ প্রবন্ধে স্বাধীনতার বাধা না মানিয়া কলমের মুখের পর্দ্দা সরাইয়া যে-সব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা কেবল মেয়ে-মজলিসেই (মহিলা-সমিতিতে নহে) চলিতে পারে। মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় তা সাজে না। সে বিষয়ের পুনরালোচনা করিলে সুরুচির সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়।

এ কথা আরও অদ্ভুত যে "মেয়ের বাল্য বিবাহই হওয়া উচিত, কিন্তু যদি সুপাত্র পাওয়া না যায়, তবে তাহাকে চির-কুমারী রাখাও ভাল, তবু কুপাত্রে দিবে না।" যুক্তি ভাল। এখন বাল্যকাল কত বৎসরের মধ্যে? ১২? তাহা হইলে ১২ বৎসরের মধ্যে সুপাত্র খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে খুঁজিতে খুঁজিতে যদি আরও ২।৪ বৎসর কাটিয়া যায়, তবে আর সে মেয়ের বিবাহ দেওয়া চলিবে না। কারণ তখন বাল্য অতীত হইয়া যায়। দিতে হইলে সুপাত্রে ১২ বৎ- মধ্যে; তখন সুপাত্র না মিলিয়া ২।১ বৎসর প- আর দিও না। কারণ তখন যে মেয়ে যৌব-. বিবাহ হইলে বাল্য বিবাহ হয় কিরূপে? যুক্তি অনিন্দনীয়!

অতি প্রাচীন কালেও আমাদের দেশে পূর্ণ যৌবন ক. বিবাহ হইত। যখন আমাদের দেশে পূর্ণ-যৌবনা কন্যা স্বয়ম্বরা হইতেন, স্বাধীনভাবে পতি নির্ব্বাচন করিতেন, সভামধ্যে পতি-গ্রহণের মতামত অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতেন, তখনই আমাদের দেশে ভীম-অর্জ্জুনের ন্যায় বলবান, ভীষ্মের ন্যায় সংযমী, রামের ন্যায় সত্যপ্রিয়, অজের ন্যায় পত্নী-প্রেমিক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন নারীগণের শারীরিক গঠন-কার্য্য সম্পূর্ণ হইত, তখন তাঁহারা মাতা হইবার জন্য বিবাহিত হইতেন। পূর্ণ-গঠনা মাতার গর্ভজাত সন্তানগণও সুগঠিত, বলশালী ও মনস্বী হইতেন। তারপর বাল্য বিবাহ ও অবরোধ প্রচলিত হইলে পুরুষগণ দিন দিন দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইতেছে। অসম্পূর্ণদেহা মাতার সন্তান যে সুগঠিত মনুষ্য হইতে পারে না তাহা সহজেই বুঝা যায়। বৃক্ষ, লতা হইতেও এ সত্য সকলে বুঝিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ের খর্ব্বদেহ, শীর্ণকায় পুরুষ দেখিয়াও তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। —আর পশ্চাত্য-জগতের প্রতি চাহিলে দেখা যায়, তাহাদের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই কি সুগঠন উন্নতমূর্ত্তি! কি স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, বলিষ্ঠ, সম্পূর্ণ মূর্ত্তি। ইহার কারণ কি? তাহারা দুর্ব্বল দেহ, অন্ধকারে চাপা-পড়া মায়ের গর্ভে জন্মে না, তাহাদের মায়েরা পুরুষের ভুক্তাবশিষ্ট খাইয়া জীবন ধারণ করে না।

নারীর প্রতি অত্যাচারের ফলে পুরুষ বল, বুদ্ধি, আয়ু, স্বাধীনতা সব হারাইয়াছে, তবু তাহাদের চৈতন্য নাই!

পাশ্চাত্য জগতে নর-নারীর তুল্য ব্যবহারে তাহাদের

জাতীয় কোন অবনতি হইয়াছে কি? দিন দিন কোটী কোটী নূতন আবিষ্কারে ইয়োরোপ জগৎকে চকিত করিতেছে। তাহাদের বাহ্যিক আচরণ যতই বিলাসিতাপূর্ণ হউক না কেন, অন্তরে মহাশক্তির অধিকারী না হইলে ইহা অসাধ্য হইত। আর আমাদের 'বাল বিধবা দেবী' "অন্ধকূপ" প্রভৃতিতে দেশের কি উন্নতিই হইয়াছে! যখন আমাদের দেশে দ্রৌপদী, কুন্তী, সত্যবতীর ন্যায় নারী ছিলেন, তখন আমাদের দেশ উন্নত ছিল, না এখনকার 'দেবী' যুগের দেশ উন্নত? নর-নারীর স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিকশিত হইলে দেশ বা জাতির কখনও অবনতি হয় না। স্নেহ প্রেম, দয়া, প্রভৃতি মানসিক বা বলবীর্য্য প্রভৃতি শারীরিক গুণ স্বাধীনতাতেই বিকশিত হইয়া উঠে। চাপিয়া রাখিলে কোন বস্তু বিকাশ লাভ করিতে পারে না।

নারীকে পুরুষ ভোগের জন্য বিলাসিনী সংসার ও সুবিধার জন্য দাসী করিয়া রাখিয়াছে; জ্ঞানে শিক্ষায় আপনার সমকক্ষ করে নাই। সেজন্য নারী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছে যে সুযোগ দেওয়া হয় নাই, সেই জন্যই নারী বিকশিত হইতে পারে নাই। কিন্তু পুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না, নারীর পথ নারীকেই মুক্ত করিতে হইবে।

পুরুষ যদি নারীকে কিছুমাত্র শ্রদ্ধা, সম্মান বা বিশ্বাস করিত তবে আজ নারীর এ দশা হইত না। 'মেয়েদের পেটে কথা থাকে না' 'মেয়ে-মানুষ এর কি বুঝবে?' স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী এ সব বুঝি নারীর প্রতি উচ্চ সম্মানের কথা? কোন স্ত্রীর বুদ্ধিতে কেহ লয় প্রাপ্ত হইয়াছে কি? যাহাকে দেবী বলিয়া সম্মান করা যায়, এই সব কথা বুঝি তাহার প্রতি উক্ত হয় নাই! যাহারা নারীকে" বল, বীর্য্য, রক্ত, মাংস,ধন, সুখ শোষণকারী জোঁক মনে করে, তাহারা আবার দেবী বলিয়া সম্মান করে কি? যাহারা নারীকে নরকের দ্বারা মনে করে (দ্বারং কিমেতন্নরকস্য?—নারী) উহারাই কি তাকে দেবী বলে?

এক মুখে যাহার দুই প্রকার কথা, তাহার কোনটি সত্য? আরও—

"ন দানেন, ন মানেন নার্জ্জনেন ন সেবয়া।
ন শাস্ত্রেন ন শস্ত্রেণ সর্ব্বদা বিষমাস্ত্রিয়ঃ॥"

যে কাণে 'দেবী' শুনিতে অভ্যস্ত সেই কাণে এই কথাগুলি শুনিলে আর সন্দেহ থাকে না, যে, "দেবী" মস্ত একটা পরিহাস মাত্র! নারীর প্রতি পুরুষের ব্যবস্থা, সমাজে নারীর অবস্থা ও অধিকার আলোচনা করিলে বুঝা যায়, নারীর "দেবীত্বে" পুরুষের আদৌ বিশ্বাস নাই। নারীর চরিত্রে পুরুষের সুপ্রচুর অবিশ্বাস বলিয়াই নারীকে অবগুণ্ঠনের মধ্যে ও অবরোধে রাখিয়াও পুরুষের সন্দেহ যায় নাই, সেজন্য পুরুষ নারীকে পুড়াইয়া মারিয়াছে। কেবল নারীকে ভুলাইয়া কাজ হাঁসিল করিবার জন্য মুখে নারীকে দেবী বলিয়াছে। পুরুষ বেশ জানে যে নারী দেবী নহে।

আজ একযোগে আমরাও বলিতেছি যে আমরা দেবী নহি। দেবীর আসন তোমরা কোনদিন আমাদের দাও নাই, দেবীর সম্মানও দাও নাই, কেবল দেবী নাম দিয়াছ। আমরাও এমনি নির্ব্বোধ যে তাহাতেই ভুলিয়া ছিলাম। ভুল মানুষ করে কিন্তু ভুল চিরদিন থাকে না, আমাদের ভুলও ভাঙ্গিয়াছে। আমরা মানুষ, দেবী নহি, তোমাদের হাতে কোনদিন দেবী হইতে পারিবও না।

শ্রীউষাপ্রভা সেন।

সঙ্কলন

বঙ্গদেশে বর্ত্তমান শিক্ষাবিস্তার

৺রামমোহন রায়ের পত্র

বাঙলার শিক্ষাপ্রবর্ত্তন সম্বন্ধে সে যুগে ৺রামমোহন রায় গবর্ণর জেনারেলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা বঙ্গদেশবাসীদের একটি গৌরবের বস্তু ; সে পত্র সমগ্র উদ্ধৃত করা হইল। মূল পত্রখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। এটি তার অনুবাদ।

"যদিও রাজকীয় কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে স্বকীয় মত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গবর্ণমেন্টের গোচরে আনিতে ভারতবাসীরা আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান-বশতঃ তুষ্ণীম্ভাবাপন্ন, কিন্তু স্থলবিশেষে ঐ প্রকার সম্মানসূচক তুষ্ণীম্ভাব দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সুতরাং উপস্থিত বিষয়ের ন্যায়, সমস্ত গুরুতর বিষয়ে, শাসনকর্ত্তাদিগকে দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধনোপযোগী কোন বিধান উদ্ভাবন ও অবলম্বনে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাদিগকে যথার্থ অবস্থাজ্ঞাপনে উপেক্ষা করিলে এবং দেশের হিতার্থে তাঁহাদের প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে, আমাদের স্থানীয় অবস্থাজ্ঞান ও বহুদর্শিতা দ্বারা সহায়তা না করিলে আমাদিগের ঔদাসীন্য জন্য তাঁহারা যথার্থই অনুযোগ করিতে পারেন এবং আমাদিগকেও কর্ত্তব্যতা বর্জ্জন হেতু অপরাধী হইতে হয়।

দেশের লোকের উন্নতিবিধান-কল্পে কলিকাতায় গবর্ণমেন্টের একটি নূতন সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প তাঁহাদের প্রশংসনীয় সদভিপ্রায়ের পরিচায়ক। দেশের লোক এজন্য চিরকৃতজ্ঞ। মানবজাতির প্রত্যেক হিতাকাঙ্ক্ষীর এই বাসনা যে উহার উন্নতিবিধায়ক সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা উন্নতনীতি অনুযায়ী চালিত হউক, যেন জ্ঞানস্রোত শ্রেষ্ঠতম উপকার-সাধনোপযোগী প্রণালীতে প্রবাহিত হইতে পারে।

এই বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হওয়ার সময় আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম যে ইংলণ্ডে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের ভারতবাসী প্রজাবৃন্দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক অল্পাধিক অর্থব্যয়ের আদেশ দিয়াছেন। আমরা বড়ই আশান্বিত হইয়াছিলাম যে বিজ্ঞ ইউরোপীয় শিক্ষক দ্বারা এদেশীয় লোককে গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন ও শরীরগঠনবিদ্যার শিক্ষাদানে এই অর্থ ব্যয়িত হইবে, কেননা ইউরোপীয় জাতিসমূহ ঐ সকল বিদ্যার এতদূর উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন যে কেবল তদ্দ্বারাই তাঁহারা পৃথিবীর অন্যান্য অংশের লোক অপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশের উদীয়মান সম্প্রদায়ের জ্ঞানোদয় আশায় আমরা উৎফুল্লচিত্ত হইয়াছিলাম এবং আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় আমাদের অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম উদারনীতিপরায়ণ ও উন্নতিশীল ইংরেজ জাতি এসিয়া-খণ্ডে ইউরোপের বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান,সাহিত্যাদির বীজ রোপণ দ্বারা গৌরবাভিলাষী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়াছি।

কিন্তু আমরা এখন জানিতে পারিলাম যে, হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা, প্রচলিত দেশীয় বিদ্যায় শিক্ষাপ্রদানার্থই গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। লর্ড বেকনের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে ইউরোপেও এই শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের শিক্ষায় ছাত্রদের মন কেবল দর্শন ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রের কূট তর্কের জ্ঞানে পূর্ণ হওয়া ব্যতীত আর কিছুর প্রত্যাশা করিতে পারে না। এ প্রকার জ্ঞান, যাহারা প্রাপ্ত হইবে তাহাদের, কিম্বা সাধারণের যৎসামান্য বা কোনই উপকারে আসিবে না। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে লোকে যাহা জানিত ছাত্রেরা কেবল তাহাই শিক্ষা করিবে এবং তৎসঙ্গে পরবর্ত্তী কালের ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিদের উদ্ভাবিত শূন্যগর্ভ আরও কতকগুলি কূটত্বপূর্ণ যুক্তি ইত্যাদি (যাহা এখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শিক্ষা দেওয়া হয়) শিক্ষা করিবে।

সংস্কৃত ভাষা এতই দুরূহ যে উহা আয়ত্ত করিতে সমস্ত জীবন কাটিয়া যায় ; এবং সেই কারণেই বহুকাল ব্যাপিয়া উহা জ্ঞানবিস্তারের অন্তরায় বলিয়া লোকের ক্ষোভের বিষয় হইয়াছে। আর উহার দুর্ভেদ্য আবরণাভ্যন্তরে নিহিত জ্ঞান কখনই তাহার প্রাপ্তির পরিশ্রমের সম্যক পুরস্কারও হইতে পারে না। এই ভাষা হইতে যে মূল্যবান জ্ঞান সংগ্রহ হইতে পারে, তজ্জন্যই কেবল যদি উহার সংরক্ষণ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়, তবে নূতন আর একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন না করিয়া অন্য উপায়েও তাহা সংসাধিত হইতে পারে। দেশে সর্ব্বত্রই অনেকানেক অধ্যাপক পূর্ব্বাপরই সংস্কৃত ভাষা ও প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় সকল বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। ঐ সকল বিশেষ অভিনিবেশ-সহ অনুশীলনই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে বর্ত্তমান অধ্যাপকগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে সম্প্রতি কিছু কিছু বৃত্তিদান ও পরে পুরস্কারপ্রাপ্তির আশা প্রদর্শন করিলে, যে শিক্ষাদানকার্য্য এখন তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিতেছেন, তাহাতেও তাঁহাদের অধিকতর চেষ্টা উদ্দীপিত হইতে পারে।

উল্লিখিত কারণে - ভবদীয় উচ্চাসনযোগ্য সম্মানপুরঃসর আমি এই নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি যে শিক্ষা দ্বারা ভারতবাসীদের উন্নতিবিধান জন্য ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ যে স্বতন্ত্র অর্থব্যয়ের আদেশ করিয়াছেন, প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বন সে উদ্দেশ্য-সাধনের সম্পূর্ণ প্রতিযোগী হইবে। কারণ দেশীয় যুবকবৃন্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর শিক্ষায় জীবনের দ্বাদশ-

বর্ষ ব্যয় করিলে উহাদের কোনই উন্নতি লাভ হইবে না। ব্যাকরণের সূক্ষ্ম তর্কের দুই একটি দৃষ্টান্ত এই :—খাদ্য অর্থে খাওয়া, প দতি অর্থে যে (স্ত্রী বা পুরুষ অথবা ইহা) খায় বুঝায় ; এক্ষণে প্রশ্ন এই যে খাদতি বলিলে সমস্ত অর্থ (অর্থাৎ পুরুষ, স্ত্রী বা অন্য কেহ খায়) বা আংশিক অর্থ বুঝাইবে ? যেমন ইংরেজী ভাষায় eats শব্দের cat ও s এই দুই ভাগের প্রত্যেক নিহিত অর্থ কি এবং শব্দটীর সম্যক অর্থ উভয়াংশে একত্রে বা প্রত্যেক অংশ পৃথকভাবে প্রকাশ করে, এই প্রকার প্রশ্নও প্রশ্নেরও উপরের প্রশ্নের অনুরূপ।

বেদান্তদর্শনে যে সকল প্রসঙ্গের সূচনা আছে তাহাদের আলোচনায়ও বিশেষ কোন উন্নতির আশা করা যায় না। আত্মা কি প্রকারে ঈশ্বরে লীন হয় ; ঐশ্বরিক সত্তার সহিত উহার কি প্রকার সম্বন্ধ, ইত্যাদি ঐ সকল প্রসঙ্গের দৃষ্টান্ত। বেদান্ত মতে দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব নাই ; সুতরাং যখন পিতা, ভ্রাতা, প্রভৃতির সত্তার অভাব তখন তাহারা প্রকৃত স্নেহপাত্র হইতে পারে না, সুতরাং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সংসার হইতে যত শীঘ্র পলাইতে পারি ততই আমাদের শুভ। বেদান্তের এই সকল মত আলোচনা করিয়া যুবকেরা কখনই সমাজে উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আবার মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন করিয়া এই প্রকার বিদ্যালাভ দ্বারাই বা শিক্ষার্থীর কি প্রভূত উপকার হইতে পারে ; যেমন, বেদের কয়েকটি বাক্যের আবৃত্তি করিলে ছাগহত্যা পাপ হইতে কেন মুক্ত হয় ? বেদের বাক্য বিশেষের প্রকৃত তত্ত্ব ও কার্য্যকরী ক্ষমতাই বা কি ? ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ীরাই বা নিম্নোক্ত বিষয় শিক্ষাদ্বারা জ্ঞানের কি উন্নতি করিতে পারে ? বিশ্বস্থিত পদার্থসমূহ কতগুলি কাল্পনিক শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে ? আত্মা ও শরীরের, শরীর ও আত্মার, চক্ষু ও কর্ণ ইত্যাদির মধ্যে পরস্পর কি মনঃকল্পিত সম্বন্ধ লক্ষিত হয় ? উপরে বর্ণিত কল্পনাসম্ভূত বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ বর্দ্ধন করিলে যে প্রকৃত উন্নতি কিছুই হইতে পারে না তাহার সম্যক উপলব্ধি জন্য ভবদীয় সকাশে প্রার্থনা যে অনুগ্রহপূর্ব্বক ইউরোপে লর্ড বেকনের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কালের সাহিত্য বিজ্ঞানের অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিতে আজ্ঞা হয়

প্রকৃত জ্ঞান সম্বন্ধে ইংরেজ জাতিকে অজ্ঞ রাখাই যদি উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে দেশে মূর্খতা বজায় রাখিবার পক্ষে উপযোগী (ইউরোপের মধ্যযুগের) স্কুলম্যানদের দর্শনবিদ্যাকে স্থানচ্যুত করিয়া বেকন প্রবর্ত্তিত (নূতন) দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা প্রচলন করা হইত না। ইংরেজ শাসন-নীতির উদ্দেশ্য যদি সেই প্রকারে এদেশে মূর্খতান্ধকার স্থায়ী-করণই হইত তাহা হইলে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষা তৎপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী হইত। কিন্তু এদেশবাসীদের উন্নতি বিধানই যখন গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য, তখন অবশ্যই গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত জ্ঞানালোকপ্রদানোপযোগী উদার শিক্ষা-রীতি অবলম্বন করিবেন। গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন, শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষাদান উক্ত শিক্ষারীতির অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। এজন্য একটি উচ্চবিদ্যালয় বা কলেজ স্থাপনের, তাহার দরকারী পুস্তক ও উপকরণাদি সংগ্রহের, এবং ইউরোপে শিক্ষিত কয়েকজন পারদর্শী শিক্ষকের ব্যয় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অর্থদ্বারাই নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

আমার ধারণা এই যে ভবদীয় সকাশে এই বিষয় উপস্থিত করিয়া আমি দেশবাসীদের প্রতি আমার একটি গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করিলাম। এই দেশের অধিবাসীদের উন্নতিসাধন উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া ইংলণ্ডের যে উদারচেতা রাজা ও শাসক-সম্প্রদায় তাঁহাদের শুভানুযায়ী মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন, আমার এই নিবেদন-পত্রদ্বারা তাঁহাদের নিকটও আমার কর্ত্তব্য পালন করিতেছি। অতএব ভবদীয় সকাশে বিনীত প্রার্থনা, আমি যে এই প্রকার মনোভাব ব্যক্ত করিতে সাহসী হইয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

শিক্ষক, মাঘ ১৩৩০। রামমোহন রায়।

গাউন—শাড়ী

মেয়েদের শিক্ষার কথা উঠলেই এ দেশের অনেকেই শিক্ষিতা মেয়েদের সম্বন্ধে তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন, কোন একটি বিশেষ শিক্ষিতা মেয়ের অপরাধ ত্রুটী নিয়ে সেইটাই সমস্ত শিক্ষিতা মেয়ের লক্ষণ বলে ধরে নিয়ে কন্যাকে শিক্ষাদানই অন্যায় বলে প্রমাণ করতে চান।

এতে করে আর যাই হোক্ এই সমালোচকদের বুদ্ধির প্রশংসা কোনও বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবে করতে পারে না।

এই শ্রেণীর সমালোচকদের মধ্যে একটা ধারণা দেখা যায় যে মেয়ে শিক্ষিতা হলেই সে দিনের বেলায়ও বিলাতী ইভনিং ড্রেস পরে উঁচু হিলের বুট্ পরে রাস্তায় চল্‌বে। একটা দিন ছিল যখন স্ত্রী-স্বাধীনতার নূতন প্রবর্ত্তকদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই বিলাতী পোষাকে দেহ সজ্জিত করতেন। পোষাকটার প্রতি তাঁদের গভীর ভালবাসা থেকে কিম্বা এটাকেই শিক্ষার ও স্বাধীনতার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে তাঁরা এই পোষাককে গ্রহণ করেননি। পোষাকটা ইংরাজী ন্যায়-শাস্ত্রের কথায় accident, তাও invariable নয়, এর বিশেষ কোনও মূল্য নাই, কারণ এ সর্ব্বদাই বদলানো চলে, কিন্তু এটাকে তখন তাঁদের মতের বাহ্যিক প্রকাশ বা symbol হিসাবে তাঁরা ধারণ করেছিলেন এঁদের মত রাস্তায় গলা জাহির করে চেঁচিয়ে না বলে, পোষাক দ্বারাই সাধারণের কাছে ব্যক্ত করতেন, যেমন নাকি আজকার এই গান্ধীযুগে অসহযোগীর দল খদ্দর পরে তাঁদের মত প্রকাশ করছেন।

পোষাকটা যেখানে জাতীয়তার বিরোধী ভাব প্রকাশ করে বলে মনে হয়েছে সেখানে শিক্ষিত পুরুষ বা শিক্ষিতা নারী তাকে ব্যবহার করতে চাননি তার প্রমাণ তো অনেকবারই পাওয়া গেছে। অধিকাংশ শিক্ষিতা মেয়ে শতকরা ৯৯ জন বল্লে অত্যুক্তি হবে না, শাড়ীকে যে রকম রুচির ও শোভন মনে করেন গাউনকে সে রকম করেন না। আমাদেরই পরিচিতা গাউন-পরিহিতা ভারতবর্ষীয়াদের জিজ্ঞাসা করে এই উত্তর পেয়েছি, 'ভাই আমাদের কাজের খাতিরে পথে চলা-ফেরা করতে হয়, শাড়ী পরে চলা ফেরা করলে নিজেদের সম্মান বজায় রাখতে পারি না, তাই গাউন পরি।" এটা যে কত বড় দুঃখের ও লজ্জার কথা, দেশের পুরুষদের কত বড় গ্লানিকর হীনতার পরিচায়ক, যাঁরা শিক্ষিতাদের বুট-গাউন পরা নিয়ে সমালোচনা করেন, তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি? গাউন পরলে কিন্তু ঐ গাউন বুটের জুতোর ঠোকর, আর চাবুকের বাড়ি আছে, তার আইন আদালত কর্ব্বার সম্ভাবনা আছে, তাই আমরা "মাতৃবৎ পরদারেষু" "নারীকে দেবীবৎ" জ্ঞান করবার দল তাদের সমীহ করে চলতে জানি, কিন্তু শাড়ী পরে খালি পায়ে চলা ঐ মেয়েটীর সঙ্গে অভদ্র আচরণ করতে কুণ্ঠিত হই না। সে যে কোন কুল-প্রদীপের মা তা ভুলে যাই।

আমরা যারা গাউন পরি না, শাড়ীর সঙ্গে ব্লাউস জুতো পরি, আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি, রাস্তায় আপন দেশ-ভাইয়ের সঙ্গে চলার দুঃখ কতখানি। খবরের কাগজে তো নীহার-কণার দুর্দ্দশার কথা ছাপার অক্ষরে কালো কালীতে দেশের কলঙ্ককে অক্ষয় করেছে। ঐ নীহারকণা যদি শাড়ী না পরে গাউন পরতেন এবং বঙ্গ সন্তানটী কামরায় প্রবেশ করলে পরে রুক্ষ স্বরে ইংরাজীতে বলে উঠতেন, "Who are you? What do you want here you blackie nigger, in the middle of the night?" "এই কালা আদমি, তুমি কে? কি জন্য এই দুপুর রাত্রে আসিয়াছ?" তবে কি ঐ বাংলা মায়ের অন্নপুষ্ট জীবটী বেঞ্চে হেসে বসে পড়তেন? পিছনে নীহারকণাকে কালো মেম বলে যতই না গাল দিতেন, সামনে মাথা চুলকিয়ে অ্যাঁ অ্যাঁ করতে করতে যে নেমে পড়তেন তা গাউন বুটের সমালোচক-দলও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করবেন বলেই নিঃসংশয়ে জানি।

এদেশে লজ্জা-কুণ্ঠিতা মেয়েদের বাহিরের কাজে না আনাই ভাল। "বাঙ্গালী" ছেলে যারা মানুষ হতে শেখেনি, তাদের কাছে, সহজ সরল ভাব নিয়ে নারী কর্ম্মক্ষেত্রে আসে যদি তো বিপদে পড়ে—তাদের কাছে হতে হয়—aggressive কাজে কাজেই বঙ্গনারীকে বাহিরে অনেক সময় ফিরিঙ্গিয়ানায় মণ্ডিত দেখা যায়।

বাঙ্গালীত্ব বজায় রেখে শাড়ী পরে যে-সব মেয়ে বাহিরের কাজে একাকিনী এসেছেন, তাঁদের অনেককেই অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়েছে।

পথে চলছে মেয়েটী, তার গায়ের উপর এসে পড়া, তাকে একটু ছুঁয়ে যাওয়া, ট্রামে যাচ্ছে তার মুখে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়া, বিকট চীৎকার করে তার অন্যদিকে বদ্ধ দৃষ্টি নিজের দিকে ফেরানো, নানা প্রকারের হাব-ভাব অঙ্গ-ভঙ্গীর দ্বারা তার প্রতি অমর্য্যাদা প্রকাশ করা, এ সবও অনেক দুর্বৃত্ত বাঙ্গালী যুবকের ব্যবহারে দেখা যায়।

মাতৃমন্দির, মাঘ ১৩৩০। শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়।

নিখিল-বঙ্গ কংসবণিক-সম্মেলন ও শিল্পপ্রদর্শনীর সভাপতি

বিজ্ঞানাচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়ের বক্তৃতার সারাংশ

জনৈক প্রবন্ধ-পাঠক বলিলেন, কংসবণিক জাতিই কাঁসা ধাতুর আবিষ্কার করেছেন। হইতে পারে কংসবণিক জাতি কাঁসার আবিষ্কার-কর্ত্তা, কিন্তু সেই গৌরব লইয়া থাকিলেই চলিবে না। একসময়ে ইস্পাত ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইত। Damascus Sword ভারত হইতেই আরবে যাইত। Hardening of steel আজও ভারতে আছে এবং বহুকাল পূর্ব্বে সাঁওতাল পরগণায় কোল-ভীলদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। তাহারাও বাঁশের চোঙ্গার ভিতর দুই এক সের পরিমাণে লৌহ তৈয়ার করিত, কিন্তু এক্ষণে Electric Processএ অল্প সময়েই যে কত সহস্র মণ লৌহ প্রস্তুত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমেরিকায় কত বড় বড় কারখানা রহিয়াছে—তাদের মালিকগণ বড় বড় ধনী হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে Copper-King বলে। They are multi-millionaires. অনেক টাকা মূলধন এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী ভিন্ন তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা কখনই সম্ভবপর নহে। কাশীপুর Ammunition Factory যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বিজ্ঞানের আধুনিক প্রক্রিয়া কিছু উপলব্ধি করিতে পারিবেন। Germany's Krupps Factory প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় বিশ্বকর্ম্মা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া এক্ষণে ইউরোপকে আশ্রয় করিয়াছেন। তামা বলুন, রাং বলুন সমস্তই বিদেশ হইতে আসিতেছে। সুতরাং প্রতিযোগিতা-হিসাবে তাহারা আমাদের শত্রু। আমিও এক হিসাবে আপনাদের শত্রু। কেন না পলতার Bengal Enamel Worksএর আমিও একজন Director, Aluminium অপবিত্র বলিয়া হিন্দুরা পূর্ব্বে কিনিত না, কিন্তু উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়

না বলিয়া এবং মূল্যও খুব সস্তা বলিয়া তাহারও কাট্‌তি হইয়াছে। আমেরিকার Niagara Fallsএর তড়িৎ দ্বারা, এক প্রকার মাটী হইতে উহা তৈয়ারী হইয়া এদেশে আসিতেছে। এ কাজটাও যদি আপনাদের হাতে থাকিত, তাহা হইলে প্রতিযোগিতা হিসাবে আপনাদিগকে দুর্ব্বল হইতে হইত না। জীবনলাল ভাটিয়া মুর্গীহাটা, শিয়ালদহ, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে ছাইয়া পড়িয়াছেন। বন্যাপীড়িতের সাহায্যের জন্য আহাম্মাদাবাদের ভাটিয়া সওদাগর অনেক টাকা সাহায্য করায় আমি তাঁহাদিগকে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা বাঙ্গালীর জন্য কেন এত টাকা দিতেছেন, তাঁহারা হাসিয়া উত্তর করিলেন, আমরা বাঙ্গালীর নিকট হইতে যাহা পাই তাহার সিকি অংশও ফেরত দিই না। আহাম্মাদাবাদের ঐশ্বর্য্যও বাঙ্গলার কৃপায়। ১৯০৩ সালে যখন স্বদেশীর হাওয়া বাঙ্গলায় খুব জাগিয়াছিল তখন শোলাপুর মিল শতকরা হাজার টাকা ডিভিডেণ্ড দিয়াছিল। উহার একজন ডিরেক্টর আমায় বলিয়াছিলেন আমাদের অর্থ অধিকাংশ বাঙ্গলা হইতে আইসে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সঙ্গে ব্যবসা-বুদ্ধি চাই। যাঁহার যে পেশা তাহা ভিন্ন অন্য পেশা অবলম্বন না করিলে আধুনিক অন্নসমস্যার দিনে কষ্ট পাইতে হইবে। ছেলেবেলায় দেখিয়াছি Cook কোম্পানীর কত বড় আড়ম্বড়া ছিল। Milton কোম্পানীরও ঘোড়ার ব্যবসা ছিল—কিন্তু এক্ষণে Motorএর অত্যধিক চলন হওয়ায় তাঁহারা ঘোড়া ছাড়িয়া Motor-Garage খুলিয়াছেন। দেখুন তাঁহাদের adaptability—they can march with the time.

আসল কথা, শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজন। বাঙ্গালা দেশে শিক্ষার কি দুরবস্থা। বোধ করি শতকরা ছয় সাতজন লোক লেখাপড়া জানেন। বিদ্যা শিক্ষা কোন জাতি-বিশেষের একচেটিয়া জিনিষ নহে, সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রতিভাবান্ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের ন্যায় অপর সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রতিভাবান পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন আপনাদের মধ্যে রায় বাহাদুর আছেন, তেমনি তিলি, তন্তুবায় প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যেও কৃষ্ণদাস পাল, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাঃ রসিকলাল দত্ত, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, মেঘনাথ সাহার নাম উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহারা সকলেই স্বীয় প্রতিভাবলে যশস্বী হইয়াছেন। Grey বলিয়াছেন :—

"Full many a gem of purest ray serene." ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"

গুণ কখনও বংশগত হয় না। বিদ্যাসাগরের ছেলে কখনও বিদ্যাসাগর হয় না। কেশব সেনের ছেলে কেশব সেনের মত হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। নৈকষ্যকুলীনও বর্ণজ্ঞানশূন্য হইতে পারেন। Emerson যেমন বলিয়াছেন "The talent is the calling"—"Knowledge is power" অর্থাৎ "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।" বিদ্যা বুদ্ধিবলেই আজ জগৎ হইতেছে। পার্শিজাতি কেমন বাণিজ্য-কুশল। E. B. Ry. এর Sorabjeeর হোটেলের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা বলিতে পারেন, তাঁহাদের management কেমন সুন্দর। টাটা কোম্পানী বুদ্ধিবলে কত বড় ব্যবসা চালাইতেছেন। তাঁহাদের organisationই বা কি সুন্দর! আমরা বাঙ্গালী, আমাদের সে সব adventure নাই। তাহা না হইলে লোটাকম্বলধারী মাড়োয়ারী আজ বাঙ্গালা জয় করিয়া বসিবে কেন? বাঙ্গালা দেশ যদি কেউ জয় করে থাকে—সে ঐ মাড়োয়ারী। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, উন্নতির পথ বলিয়া আমার মনে হয় না। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমি শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর সহযোগে মাত্র ১০০ শত টাকা মূলধন লইয়া বালিগঞ্জে একটী Sulphuric Acidএর কারখানা খুলিয়াছিলাম। পর বৎসর অনেক টাকা লোকসান যাওয়ায় চন্দ্রবাবুর পরামর্শমত তাহার কয়েক বৎসর পরে অধিক টাকার capital লইয়া Bengal Chemical and Pharmaceutical Works স্থাপন করি। উহার কার্য্য এক্ষণে এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে উহার মূলধন এক্ষণে ১॥০ লক্ষ টাকার স্থলে ১৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। Co-operative Society'র কর্ত্তা রায় যামিনীমোহন মিত্র বাহাদুর এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি একটু চেষ্টা করিলে সিমলা, ভবানীপুর, দাঁইহাট, লোহজং, পালং, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রাণাঘাট প্রভৃতি অঞ্চলের কংসবণিক শিল্পী ও শ্রমিকগণের যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন। Co-operative principles-এ পাইকারী খরিদ করিয়া যাহাতে জমা করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিলে বোধ হয় মন্দ হয় না। ভবানীপুর অঞ্চলের কংসবণিকগণ ভাল ভাল Surgical Instruments প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আমি ভূতনাথ বাবুর (স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পালের পুত্র) মুখে শুনিয়াছি বি, কে পাল কোম্পানী অনেক টাকার জিনিস তাঁহাদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই সকল স্থানে apprentice শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে ফলে বোধ হয় মন্দ হয় না। এখনও যথেষ্ট field আছে, এখনও চেষ্টা করিলে আপনাদের জাতীয় শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর হইবে। এখনও আধুনিক প্রণালীতে কারখানা স্থাপন, Technical Scholarshipএর বন্দোবস্ত ও Apprentice শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে এমন অনেক জিনিস প্রস্তুত হয়, যাহার একটু পরিবর্ত্তন করিলে অধিক কাটতি হইতে পারে এবং এমন কি সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত তাহার কাট্‌তি হইতে পারে। এই যে সম্প্রতি রায় বাহাদুর মিত্র বিলাত যাচ্ছেন, তিনি চেষ্টা করলে আপনাদের জিনিসের সে দেশেও কাট্‌তি করিয়ে দিতে পারেন। হিন্দুসমাজ থাকিতে পিতল কাঁসার লোপ হইবে না।

কংসবণিক পত্রিকা, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।
কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৩০।

গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় "মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে" ভাগীরথীর গতিপথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "রামায়ণে লিখিত আছে যে ভগবান শঙ্কর ভগীরথের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে স্বীয় জটাটবী হইতে বিন্দু সরোবরের অভিমুখে পরিত্যাগ করেন, তথা হইতে গঙ্গা সপ্তধারে প্রবাহিত হন। তাঁহার হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নাম তিন স্রোত পূর্ব্বদিকে, স্বচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু নামে তিন স্রোত পশ্চিমদিকে এবং অবশিষ্ট আর একটি স্রোত মহারাজ ভগীরথের পশ্চাত পশ্চাত চলিয়া সমুদ্রে পতিত হয়। এই স্রোতই গঙ্গা বা ভাগীরথী, সুতরাং ভাগীরথী ও নলিনী যে দুইটী বিভিন্ন নদী, তাহা রামায়ণ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে। উক্ত নলিনী যে পদ্মার নামান্তর মাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।" নিখিল বাবু আরও বলেন—"কৃত্তিবাসী রামায়ণে ও গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, গঙ্গা ভগীরথের পশ্চাত ধাবিত হইয়া ভাগীরথীর মোহানার নিকট প্রতারিত হওয়ায় পূর্ব্বমুখে গমন করিয়াছিলেন, পরে পুনর্ব্বার উজানে প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীরূপে সমুদ্রে পতিত হন।"

বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাস বাল্মীকির উপর কলম ধরিয়া গঙ্গার ভৌগোলিক অবস্থার কেমন সুন্দর কবিত্বময় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদ "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী"তে এই প্রাকৃতিক ব্যাপারের সুন্দরতর ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন।

"তাঁর নিকটে গঙ্গা আইলা ফিরিয়া।
চলিলা কিরীটকোনা দক্ষিণে রাখিয়া॥
মহাপীঠ সতীর কিরীট সেইস্থানে।
ভগীরথে দেখাইলা ভৈরব যেখানে।"

ইহার পর গঙ্গা "দক্ষিণ সমাজে" আসিলেন।

দুর্গাপ্রসাদ যে প্রণালীতে "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচনা করিয়াছেন তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে তিনি মুকুন্দরামের রচনা-প্রণালী আলোচ্য কাব্যে অনুসরণ করিয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদ যে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি তাহার ইহাও একটি প্রমাণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারত-চন্দ্রপ্রমুখ কবিরা সপ্তদশ শতাব্দীর বঙ্গভাষার সুদীর্ঘ বৃহদায়তন গীতি-কাব্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাব্য-শিল্পের ইতিহাসে নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে কালকেতু ও সদাগরের দুইটি স্বতন্ত্র দীর্ঘ উপাখ্যান একটিমাত্র সূত্রে গ্রথিত। শুধু তাহাই নহে, উক্ত প্রত্যেক উপাখ্যানের ভিতর অনেক-গুলি নাতি-ক্ষুদ্র কথার সমাবেশ দেখা যায়, কিন্তু কাব্যের বর্ণনীয় সকল বিষয়গুলিই একটি অবিচ্ছিন্ন গানের অঙ্গীভূত। দুর্গাপ্রসাদের "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী"তেও আমরা দেখিতে পাই যে, গঙ্গার ইতিহাসের শেষে বামন-ভিক্ষার উপাখ্যান জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; আর উক্ত দুইটি বিষয়েরই বর্ণনাতে ছোট-খাট অনেক ব্যাপার কবি বুনিয়া দিয়াছেন। মুকুন্দরাম ও দুর্গাপ্রসাদের গানের ধুয়া আরম্ভ ও শেষ, এমন কি ভণিতাতেও একই প্রকার শিল্প-নৈপুণ্য লক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দরে বর্ণিত প্রত্যেক ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বিষয় এক একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কবিতার আকারে রচিত। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবিরা কাব্য রচনা করিতে বসিয়া কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়গুলিকে ভাগ করিয়া লইয়া খণ্ড কবিতার আকারে সেগুলিকে রচনা করিবার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতে-ছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হইতেন তাহা হইলে তিনিও তাঁহার "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী" কাব্যকে খণ্ড কবিতার ছাঁচে ঢালিয়া উক্ত প্রকার নূতন ধরণের গীতি-কবিতা রচনা করিতেন। এতদ্ব্যতীত, ভারতচন্দ্রের যুগে বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যে আদিরসের যে তরঙ্গ বহিয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছিল দুর্গাপ্রসাদের কাব্যে তাহার অনুরূপ কিছু দেখা যায় না। দুর্গাপ্রসাদের রচিত "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী" কাব্যে অশ্লীলতার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। আলোচ্য কাব্যে দুই এক স্থান ব্যতীত ঘটনা-বৈচিত্র্যেরও অভাব দেখা যায়। দুর্গাপ্রসাদের যুগে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে একটানা স্রোত বহিতেছিল। মানসিংহ কর্ত্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে প্রতাপাদিত্যের বাঙ্গালী বাহিনী ধ্বংস হইবার পর কচুরায় ও ভবানন্দ মজুমদারের বংশধরগণ মোগল-শাসিত বাঙ্গালায় বিশ্বাসঘাতকতার পারিতোষিক স্বরূপ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাপ্ত জমিদারী রক্ষা করিয়া বৎসর বৎসর খাজনা আদায়ে মোগল সম্রাটের তুষ্টিসাধন পূর্ব্বক বেশ সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছিলেন। বাঙ্গালার যে চিত্র দুর্গাপ্রসাদ অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে শান্তিপ্রিয় বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের কোমল ভাবগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে। অগ্রদ্বীপের চিত্রে বাঙালীর বৈষ্ণবতা, উলার চিত্রে তাহার নৃত্যগীতপ্রিয়তা, চাকদহের চিত্রে বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীর উৎসাহ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা বঙ্গদেশে যুদ্ধ বিগ্রহ ও ষড়যন্ত্রের যুগ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ইহার পর কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর পরে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে আবার আমরা বাঙ্গালার ইতিহাসে ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতক বাঙ্গালীর পরিচয় পাইব; আবার আমরা বাঙ্গালীকে মুসলমান রাজা সিরাজু-দ্দৌল্লার অত্যাচার হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে দেখিতে পাইব। সে সময়ে কিন্তু বাঙ্গালী বিলাসিতার পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া কৌলীন্যের ছায়াবাজি রচনা করিতেছিল, আর মাঝে মাঝে গোপাল ভাঁড়ের রসিকতায় উচ্চহাস্য করিয়া জাতীয় হৃদয়ে উচ্চাভিলাষের নূতন দেবতার আরতি করিতেছিল। সেই কারণে তাঁহার উদ্যম বঙ্গদেশে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী

না হইয়া বিদেশী নূতন প্রভুর সাহায্যে অত্যাচারের প্রতিকার করিয়া পৈত্রিক সম্পত্তি নূতন বন্দোবস্তে ভোগ দখল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যে সেইজন্য আমরা যে ঘটনা-বৈচিত্র্যের পরিচয় পাই তাহাতে আবিলতার গন্ধ ও স্বার্থের অভিনয় ছাড়া আর বড় বেশী কিছু নাই। বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালীর ইতিহাসে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী যে দুইটি অধ্যায় রচনা করিয়াছে, সেই দুইটী অধ্যায় মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের যুগের ঠিক মধ্যবর্ত্তী সময়ে দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

অর্চ্চনা, পৌষ ১৩৩০।   শ্রীপ্রিয়লাল দাস।

সম্রাট শাহ্‌জহানের দৈনন্দিন জীবন

সমসাময়িক ইতিহাস হইতে মুঘল বাদশাহ্‌গণের দৈনন্দিন জীবনযাপন সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। আগ্রার প্রিয় প্রাসাদে শাহ্‌জহান কিরূপে দিন কাটাইতেন তাহা নিয়ে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সম্রাটের দৈনন্দিন সময়-বিভাগ ও কার্য্য

সকাল ৪টা—শয্যাত্যাগ, নমাজ, পাঠ।

" ৬-৪৫ মিঃ—দর্শনদান, হাতীর লড়াই দেখা, অশ্বারোহী সৈন্যের কুচ।

" ৭-৪০ মিঃ—দেওয়ান-ই-আমে প্রকাশ্য দরবার।

" ৯-৪০ মিঃ—দেওয়ান-ই-খাসে বাছা বাছা লোকের দরবার।

" ১১-৩০ মিঃ—শাহ্-বুরুজে গোপন পরামর্শ।

১২টা—হারেমে গমন, মধ্যাহ্নভোজন, দিবানিদ্রা, স্ত্রীলোকদের বখশিশ দান।

বিকাল ৪ টা—সাধারণকে দর্শন দান, বিকালের নমাজ।

" ৬-৩০ মিঃ—দেওয়ান-ই-আমে সান্ধ্যসম্মিলন।

রাত্রি ৭ টা—শাহ্-বুরুজে গুপ্ত বৈঠক।

" ৮-৪০ মিঃ—হারেমে গমন, নৃত্যগীত।

" ১০ টা—পাঠ শ্রবণ।

" ১০-৩০ মিঃ—৪টা—নিদ্রা।

সকালের নমাজ

সূর্য্যোদয়ের দু'ঘণ্টা পূর্ব্বে সম্রাট শয্যাত্যাগ করিতেন। হাত-মুখ ধোয়ার পর কিছুক্ষণ উপাসনায় কাটাইতেন। তারপর তিনি মক্কার দিকে মুখ করিয়া কোর-আন্ আবৃত্তি করিয়া ভগবদ্-চিন্তায় রত

মুসলমানদের প্রথানুযায়ী বাধ্যতামূলক দিনের প্রথম 'ফজর্' নমাজ পড়িতেন। উপাসনার পর রাজকার্য্যে যোগ দিতেন।

দর্শন

দিবসে তাঁর প্রথম কাজ ছিল দর্শন দান। আগ্রা দুর্গের পূর্ব্বদিকের প্রাচীরে যমুনার উপর একটি জানালা বাহির হইয়াছিল। এই জানালার নাম ছিল ঝারোখা-ই-দর্শন। প্রত্যহ সকালে যমুনার তীরে বহুলোক সমবেত হইত। সূর্য্যোদয়ের প্রায় ৪৮ মিঃ পরে সম্রাট ঝারোখায় দর্শন দিতেন এবং সমবেত জনসঙ্ঘ সম্রাটকে সেলাম দিত; সম্রাটও প্রতিনমস্কার করিতেন। এইখানে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় কাটিত। এই সময়টা শুধু দর্শন-দানেই অতিবাহিত হইত না। এই সময় রাজকার্য্য এবং আমোদ-আহ্লাদও হইত। লোকজন যে মাঠে সমবেত হইত তাহা দুর্গ-প্রাচীরের বাহিরে ছিল, সেইজন্য সকলেই সেখানে আসিতে পারিত। এখানে অত্যাচারিত ও দুঃখীজন সরাসরি সম্রাটের কাছে বিচার প্রার্থনা করিতে পারিত। তাহা না হইলে আইন আদালত ও পাহারাওয়ালাদের খোসামোদ না করিলে সম্রাটের কাছে দরখাস্ত পেশ করা সম্ভবপর ছিল না। এইরূপে সম্রাট স্বয়ং জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ জানিতে পারিতেন। সময়ে সময়ে ঝারোখা হইতে নীচে দড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হইত; তাহাতে দরখাস্ত বাঁধিয়া দিলে সম্রাটের অনুচররা তাহা টানিয়া তুলিয়া তাঁহার হাতে দিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে সময় এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ ছিল তাহাদের নাম ছিল দর্শনিয়া; তাহারা দিনের প্রথমে সম্রাটকে দর্শন না করিয়া কোনও কাজ আরম্ভ করা পাপ মনে করিত।

দর্শন সম্পন্ন হইলে লোকজন সরিয়া যাইত। তারপর সেই মাঠেই হাতীর লড়াই হইত। এই হাতীর লড়াই শুধু সম্রাটের অনুজ্ঞা ছাড়া অপরের এমন কি শাহ্‌জাদাদের অনুজ্ঞায়ও হইতে পারিত না। হাতীর লড়াই দর্শন শাহ্‌জহানের খুব প্রিয় ছিল। এই হাতীর লড়াইএর মাঠেই সম্রাটকে নবধৃত ও মত্ত যুদ্ধের হাতী দেখান হইত। নবধৃত হাতীদিগকে দুর্গাভ্যন্তরে লইয়া যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। কি করিয়া অশ্বারোহী সৈন্যকে আক্রমণ করিতে হয় এখানে হাতীকে তাহাও শেখান হইত এবং এইরূপে ঘোড়াদেরও ভয় ভাঙ্গান হইত। এইখানেই রাজকীয় অশ্বারোহী সৈন্য ও ওমরাহ্‌গণের অধীনস্থ পল্টনদের কুচ্‌কাওয়াজ হইত। এই স্থান লড়াইএর পক্ষে বিশেষ নিরাপদ ছিল।

দেওয়ান-ই-আম

ইহার পর দেওয়ান-ই-আমে দরবার বসিত। ঠিক এই স্থানেই আক্‌বর ও জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌গণও দরবার করিতেন, কিন্তু আক্‌বর ও জাহাঙ্গীরের দরবার সামিয়ানার তলায়

১৬৩৮ খৃঃ বর্ত্তমান দেওয়ান-ই-আম নির্ম্মিত হয়। দেওয়ান-ই-আম লাল পাথরের, শাদা চুণকাম করা। ৪০টী থামের উপর ছাদ, তিন দিক খোলা। বন্ধদিকের মাঝখানের দেওয়ালের তাকে শাদা মার্ব্বেল পাথরের আচ্ছাদিত উচ্চ সিংহাসন। তাহাতে নানারূপ ফুল ফল পাতা খোদিত আছে। এই সিংহাসনে সম্রাট বসিতেন।

প্রধান দরবার

সম্রাটের সিংহাসনের বামে ও ডাহিনে শাহ্‌জাদারা বসিতেন; ইঁহারাও রাজ আজ্ঞা না পাইলে বসিতে পারিতেন না। দরবারে আমীর ওমরাহগণ, রাজকর্ম্মচারীগণ উপস্থিত জনসাধারণ নিজেদের পদমর্য্যাদানুযায়ী একে একে দরবারগৃহের খোলা দিকে পিঠ করিয়া সম্রাটের দিকে মুখ করিয়া থাকিতেন। সম্রাটের শরীর-রক্ষীগণ ঐ উচ্চ তাকের নিকটস্থ দুইটী থামের কাছে দেওয়ালের দিকে পেছন করিয়া সম্রাটের ডাহিনে বাঁয়ে দাঁড়াইত। সম্রাটের বাঁ দিকে দেওয়ালের দিকে পিঠ করিয়া রাজকীয় পতাকাবাহীগণ সোনার পতাকা, 'তুগ' ও 'কুর' (Standards) হস্তে দাঁড়াইয়া থাকিত।

এইরূপে ২০১ ফিট লম্বা ও ৬৮ ফিট চওড়া দরবার-গৃহ লোকে ভরিয়া যাইত; ইহাতেও সকল লোকের স্থান সংকুলান হইত না অবশিষ্ট দু'হাজারের নীচের মন্‌সব্‌দারগণ, তীরন্দাজ রক্ষীগণ, ওমরাহগণের রক্ষীগণ প্রভৃতির জন্য বাহিরের খোলা প্রাঙ্গণে মখমলের সামিয়ানা টাঙাইয়া কাঠের রেলিং দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইত। প্রধান দরবার-গৃহের খোলা তিন দিক রূপার রেলিং দিয়া ঘেরা থাকিত। এই রূপার রেলিংএর তিনদিকে তিনটী মাত্র ছোট ছোট প্রবেশ-পথ ছিল। দরবার-গৃহের সদর দরজায় এবং রূপার ও কাঠের রেলিংএর প্রবেশ-পথে মুল্যবান জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক পরিহিত বিশ্বাসী আশাসোটাধারী ও অস্ত্রধারী প্রহরী থাকিত। ইহারা অপরিচিত লোককে ভিতরে ঢুকিতে দিত না।

সমবেত জনসঙ্ঘ প্রস্তুত হইয়া আশা প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিত। ৭-৪০ মিঃ সময় সম্রাট পশ্চাতের দরজা দিয়া সেই তাকে আসিয়া বসিতেন তখন সভার কার্য্য আরম্ভ হইত।

প্রথমেই প্রধান বখ্‌শী, মন্‌সব্‌দারগণের দরখাস্ত সম্রাট-সকাশে পেশ করিতেন। সম্রাট শীঘ্র এই সব দরখাস্তের হুকুম দিতেন। তারপর যে সকল রাজকর্ম্মচারী দূর হইতে আসিতেন তাঁহারা সম্রাটের সহিত দেখা করিতেন। পরে নুতন নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণ স্ব স্ব বিভাগের প্রধানগণের দ্বারা সম্রাটের সম্মুখে উপনীত হইতেন। উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে কিছু বখ্‌শিষ্‌ দিবার জন্য এই সকল প্রধানগণ সম্রাটকে অনুরোধ করিতেন। যাঁহারা বখ্‌শিষ্‌ পাইতেন তাঁহারা সেলাম করিয়া বিদায় লইতেন—খিলাৎ জহরৎ কিম্বা অস্ত্রশস্ত্র অথবা ঘোড়াও এই সঙ্গে

তারপর সম্রাটের খাস মহালের ও গার্হস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীরা আসিত। মীর-ই-সামান ও দেওয়ান্‌-ই-বেয়ুতাৎ এই খাস বিভাগের সম্বন্ধে হুকুম লইয়া কর্ম্মচারীদের জানাইতেন।

তারপর সম্রাটের অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরা, শাহ্‌জাদা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, ফৌজদার, দেওয়ান, বখ্‌শী প্রভৃতি প্রেরিত পত্র কিম্বা পেশকেশ সম্রাট সকাশে নিবেদন করিতেন।

শাহজাদাগণের ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণের চিঠি-পত্রাদি সম্রাট স্বয়ং পড়িতেন কিংবা সম্রাটের সম্মুখে পড়া হইত। অন্যান্য পত্রাদির চুম্বক সম্রাটকে জানান হইত। এ কাজ হইয়া গেলে প্রধান 'সদর' প্রাদেশিক 'সদর'দের চিঠির প্রয়োজনীয় অংশে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তিদের, শেখসৈয়দ, ফকীরগণের সাহায্য ভিক্ষা পেশ করিয়া হুকুম লইতেন। দানধ্যানের কার্য্য শেষ হইলে ইতিপূর্ব্বে মন্‌সবদারদের ও জায়গীরদারগণদের সম্বন্ধে যে সব হুকুম দেওয়া হইয়াছিল তাহা পুনরায় সম্রাটের নিকট দৃঢ়ীকরণ মানসে দ্বিতীয়বার উপস্থিত করা হইত। এই কার্য্যের জন্য একজন বিশেষ কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহার পদের নাম ছিল আরজ্‌-ই-মকর্‌রোর দারোগা।

ইহার পর ঘোড়া ও হাতীর আস্তাবলের হিসাব ঐ ঐ বিভাগের কর্ম্মচারীরা দাখিল করিতেন। ঐ প্রথা সম্রাট আক্‌বরের সময় প্রচলিত হয়। দানাপানি চুরি করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইত। কোনও হাতী কিংবা ঘোড়া রুগ্ন শীর্ণ দেখাইলে তাহার দানাপানির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লওয়া হইত ও ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে তিরস্কার ও জরিমানা করা হইত। ইহার পর সম্রাটের সম্মুখে আমীরগণের অধীনস্থ নূতন সৈন্যগণকে যোদ্ধবেশে কুচ্‌ করিতে হইত। সাধারণতঃ দরবারে ঘণ্টা দুই সময় কাটিত। তবে কাজকর্ম্মের কম বেশী অনুসারে সময়ের কম বেশীও হইত।

দেওয়ান-ই-খাস

১০টার কিছু পূর্ব্বে সম্রাট দেওয়ান-ই-খাসে যাইতেন। (সকলে বলিত সম্রাট গোসলখানায় গিয়াছেন কারণ আক্‌বরের গোসলখানা দেওয়ান-ই-খাসের অতি নিকটেই ছিল।) এইখানে সম্রাট নিজহাতে বিশেষ দরকারী চিঠিপত্রাদি লিখিতেন। উজীর অথবা ভারপ্রাপ্ত উচ্চ কর্ম্মচারীরাও কিছু কিছু চিঠিপত্রাদি পড়িয়া সম্রাটকে শুনাইত। তাহার উত্তরে সম্রাটের মৌখিক হুকুম অনুযায়ী তাহারা ফর্‌মান লিখিত। এই সকল ফর্‌মান সম্রাট নিজে দেখিয়া পরিবর্ত্তন ও কাটাকাটি করিতেন। এই কাটাকুটী ফর্‌মান পরিষ্কার করিয়া লেখা হইলে হারেমে প্রেরিত হইত। সেখানে ফর্‌মানে সম্রাটের শীলমোহর দেওয়া হইত। এই শীলমোহর সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের জিম্মায় থাকিত। এই শীলটী ছিল ছোট্ট গোলাকার—শুধু সম্রাটের নাম তাহাতে অঙ্কিত

এইবার প্রধানগণ খাসমহল, সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে প্রদত্ত জায়গীর প্রভৃতি সম্বন্ধে হুকুম লইতেন। সরকারী দান বিভাগের কর্ত্তা এবার দুঃস্থদের আবেদন পেশ করিতেন। প্রায়ই নগদ টাকা দান করা হইত। কেহ কেহ জমি ও দৈনিক সাহায্যও পাইত। সম্রাটের জন্মদিনে প্রতি বৎসর সম্রাট 'ওজন' হইতেন। এই "তুলার" দরুণ সোনারূপা জহরৎ এবং আমীর-ওমরাহগণ সম্রাটের মঙ্গল প্রার্থনায় যে তাসাদ্দুক্ (দান) দিত তদ্বারা একটী দান তহবিল সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

ইহার পর নিপুণ শিল্পী প্রভৃতিদের কাজ পর্য্যবেক্ষণ করা হইত। প্রস্তাবিত রাজপ্রাসাদের নক্শা দেখিয়া প্রয়োজন বোধ করিলে সম্রাট কোথাও কোথাও পরিবর্ত্তন ও কোথাও বা সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির আদেশ দিতেন। যে নক্শা মঞ্জুর হইত তাহাতে প্রধান মন্ত্রী আসফ খাঁ শিল্পীদের জন্য সম্রাটের আদেশ বিশদ্ভাবে লিখিয়া দিতেন কোথায় কি করিতে হইবে। সম্রাট শাহ্জহানের ইহা এক প্রধান কাজ ছিল। পূর্ত্ত বিভাগের কর্ত্তা তাঁহার দলবলসহ স্বয়ং খাস দরবারে উপস্থিত থাকিয়া সম্রাটের সঙ্গে পরামর্শ করিতেন।

এই সব কাজ শেষ হইলে সম্রাট মাঝে মাঝে তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য যে সকল পশুপক্ষীকে শিকার শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা পরিদর্শন করিতেন। এবং খাসমহলের প্রাঙ্গণে সম্রাটের সম্মুখে নূতন তেজস্বী ঘোড়াদের বিচক্ষণ সওয়াররা শিক্ষা দিত।

শাহ্-বুরুজ

দেওয়ান-ই-খাসের কাজ শেষ হইতে প্রায় দু'ঘণ্টা লাগিত। ইহার পর সম্রাট শাহ্-বুরুজে আসিতেন। অতি গোপনীয় পরামর্শ ও কাজ এইখানে সম্পন্ন হইত। শাহজাদাগণ ও একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছাড়া অপর কেহ বিনা অনুমতিতে এখানে প্রবেশ করিতে পাইত না। এমন কি খানসামাগণকে পর্য্যন্ত ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইত, না ডাকিলে তাহারাও ঘরে ঢুকিতে পাইত না।

এখানে প্রধান উজীরের সঙ্গে এমন সব রাজকীয় গুপ্ত কথার পরামর্শ হইত যাহা বাহিরের লোক জানিতে পারিলে ক্ষতির কারণ হইবে। যে সকল গোপনীয় চিঠিপত্রাদি লিখিত হইবে তাহার একটী চুম্বক এখানে তৈরী হইত। আম ও খাস দরবারে খাসমহাল, সৈন্য-সংক্রান্ত ব্যয় প্রভৃতির যে সকল বিষয় সম্রাট-সকাশে জানান হইয়াছিল তাহার মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়গুলি উজীর তখন সম্রাটকে আবার নিবেদন করিয়া হুকুম লইতেন। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা এই কাজে ব্যয় হইত। কাজের কম বেশীর উপর সময়ের কম বেশী নির্ভর করিত।

দ্বিপ্রহরে হারেমে

এইরূপে দুপুর হইয়া যাইত। সম্রাট তখন হারেমে প্রবেশ করিতেন। 'জুহর্' নমাজ শেষ করিয়া, খাওয়া-দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক তিনি দিবানিদ্রা উপভোগ করিতেন। মুঘল সম্রাটদের অনেকেরই পক্ষে হারেম ছিল বিশ্রাম ও প্রমোদালয়, কিন্তু সম্রাট শাহ্জহান সেখানেও কাজ করিতেন। হারেমে বহু ভিক্ষুক সমবেত হইত। বিধবা, পিতৃমাতৃহীনা, বর্ত্তমানে হীনাবস্থা বড় ঘরের মেয়েরা, পণ্ডিত, ফকীর ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের কন্যারা সম্রাটের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিত। সম্রাজ্ঞীর কাছে নারী নাজীর সিত্তী উন্নিসা এদের দরখাস্ত পেশ করিতেন। সম্রাজ্ঞী আবার তাহা সম্রাটের কাছে জানাইতেন। সম্রাট কাহাকেও জমি, কাহাকেও পেন্সেন, কাহাকেও একেবারে কিছু দান, কাহাকেও পোষাক-পরিচ্ছদ, গয়নাগাঁঠি বা কাহাকেও বিবাহের জন্য যৌতুকাদি দান করিতেন। প্রত্যহ এই কাজের জন্য বহু অর্থ ব্যয়িত হইত।

বৈকালিক দর্শন

৩ টার পর সম্রাট 'আসার' নমাজ শেষ করিয়া মাঝে মাঝে আম-দরবারে উপস্থিত হইতেন। উপস্থিত লোকজন সম্রাটকে প্রণাম জানাইত। এখন খুব সামান্য কাজই হইত। প্রাসাদরক্ষী চৌকীদার-গণকে সম্রাটের সম্মুখে সারিবন্দীভাবে দাঁড় করান হইত ও তাহারা অস্ত্র ধরিয়া সম্রাটকে সেলাম করিত। তারপর সম্রাট দরবারস্থ লোকদের সঙ্গে করিয়া দেওয়ান-ই-খাসে সান্ধ্য উপাসনায় যোগ দিতেন।

দেওয়ান-ই-খাসে সান্ধ্যসম্মিলন

দেওয়ান-ই-খাস সুগন্ধি মোমবাতি দ্বারা আলোকিত হইত। দীপাধারগুলি মণিমুক্তাখচিত ছিল। সম্রাট ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বিশেষ প্রিয়পাত্ররা এখানে সমবেত হইতেন। রাজকার্য্য-সমাপনান্তে তাঁহারা আমোদ প্রমোদে মত্ত হইতেন। এই আমোদপ্রমোদ উচ্চশ্রেণীর ছিল। সম্রাট কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত শুনিতেন এবং সময়ে সময়ে নিজেও তাহাতে যোগ দিতেন। সম্রাট শাহজহান উর্দ্দু সঙ্গীতে এত পারদর্শী ছিলেন যে, এইখানে অনেক ধার্ম্মিক সুফীর মন তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া পৃথিবী হইতে স্বর্গ রাজ্যে ভ্রমণ করিতে এবং ভাবাবেশে অনেকে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন।

গুপ্ত বৈঠক

'ইশা' নমাজের পর সম্রাট পুনরায় শাহবুরুজে গমন করিতেন। সরকারী যে সকল গোপনীয় কাজ তখনও বাকী থাকিত তাহা প্রধান উজীর ও বখশীদের ডাকিয়া সম্পন্ন করিতেন। পরের দিনের জন্য কোন কাজই ফেলিয়া রাখিতেন না।

হারেমে নৃত্যগীত ও পাঠ

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় সম্রাট হারেমে প্রবেশ করিতেন। এখানে নারী-কণ্ঠের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া দু'তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইত। ইহার পর তিনি শয়ন করিতেন। সম্রাটের শয়ন-কক্ষ হইতে পর্দ্দা দ্বারা পৃথক্ করা আর একটি ঘর ছিল। এই ঘরে সুকণ্ঠ পাঠক

বসিত। সম্রাট শয়ন করিলে পাঠক ভাল ভাল উপদেশপূর্ণ বই পাঠ করিতেন; তাহা শুনিতে শুনিতে সম্রাট ঘুমাইয়া পড়িতেন। এ পাঠ্য পুস্তক ভ্রমণকাহিনী ধার্ম্মিকদের জীবনী, পূর্ব্বতন সম্রাটদের জীবনী প্রভৃতি ছিল। তৈমুরলঙ্গের জীবনী ও বাবরের আত্ম-জীবনী ছিল বিশেষ প্রিয় পাঠ্য। ১০টায় সম্রাট ঘুমাইয়া পড়িতেন। প্রায় ছঘণ্টা তিনি ঘুমাইতেন।

বুধবারে বিচার

ইহাই ছিল প্রাত্যহিক কার্য্য। শুক্রবার জুম্মাবার বলিয়া ছুটি থাকিত। বুধবার দিন বিশেষভাবে বিচারের জন্ম নির্দ্দিষ্ট ছিল। দেওয়ান-ই-আমে কোন দরবার বসিত না। সম্রাট দর্শন দরওয়াজা হইতে প্রায় ৮টার সময় একেবারে দেওয়ান ই-খাসে উপস্থিত হইতেন ও বিচারের সিংহাসনে বসিতেন। ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান ও বহুদর্শী লোকদের কাজী ও আদিলের পদ দেওয়া হইলেও সম্রাট স্বয়ং ছিলেন ন্যায় বিচারের উৎস এবং শেষ আপীলের কর্ত্তা। বুধবার দিন আইন-সম্পর্কিত কর্ম্মচারীরা, ফতওয়ার জ্ঞানী ব্যক্তি, ধর্ম্মপরায়ণ সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতরা ও যে সকল ওমরাহরা সদাসর্ব্বদা সম্রাটের পার্শ্বচররূপে থাকিতেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর কাহারও দরবারে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। আইন-কর্ম্মচারীরা একে একে ফরিয়াদীদিগকে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন ও তাহাদের নালিশ নিবেদন করিতেন। সম্রাট অতি ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া সত্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক উলেমাদের নিকট এই সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি বিধান আছে জানিয়া লইয়া রায় দিতেন। বহু দূর দূর দেশ হইতেও লোক দেশের সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তির নিকট হইতে ন্যায়-বিচার-লাভার্থ সমবেত হইত। ইহাদের নালিশ সম্বন্ধে বিশেষ-রূপে অনুসন্ধান করিবার জন্য তত্রত্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে সম্রাট আদেশ করিতেন ও সম্ভব হইলে সেইখানেই ন্যায়বিচার করিতে বলিতেন নচেৎ তাহাদিগকে পুনরায় সম্রাট সকাশে পাঠাইতে লিখিতেন।

দিল্লী ও আগ্রার প্রাত্যহিক জীবন এইরূপই ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিত। বৈকালে সময় সময় যমুনায় বাদ্‌শাহী নৌকায় বাচখেলা হইত; কখনও বা বাদ্‌শাহ শিকারে যাইতেন; কখনও বা বিভিন্ন প্রদেশে সমস্ত দরবারীদের সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইতেন। মুঘল বাদ্‌শাহরা অনলস কর্ম্মী ছিলেন। তখন রাজাসন পুষ্পাকীর্ণ ছিল না। রাজার অনেক কর্ত্তব্য-কর্ম্ম ছিল এবং সেই সকল কর্ম্মে বাদশাহরা উদাসীন ছিলেন না। সম্রাট শাহজহান বিপুল পরিশ্রম করিতেন। তাঁর সময়ে দেশের লোক সুখ শান্তিতে ছিল। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীর পুরাতন হস্তলিখিত একখানা ফারসী পুঁথিতে সম্রাট শাহজহানের দৈনিক কার্য্যাবলীর ফর্দ্দ দিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী লেখক সম্রাটকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন:—

খাল্‌ক্ শবুক্ দিল জে গীরাণ বারিয়শ
ফিতনা গীরাণ খাব জে বিদারীয়শ।

অর্থাৎ, হে সম্রাট তোমার প্রকৃতিপুঞ্জ ফুর্ত্তিতে আছে কারণ তুমি তাদের ভারি বোঝা নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছ; তোমার সাম্রাজ্যে অত্যাচার অবিচার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, যেহেতু তুমি নিজের চক্ষু হইতে ঘুমকে নির্ব্বাসিত করিয়াছ।

প্রভাতী, পৌষ ১৩৩০। শ্রীযদুনাথ সরকার।

পতিতার ব্যথা

পায়ে-পায়ে দিন চ'লে যায়,—আকাশ আসে রঙীন হ'য়ে,—
সন্ধ্যা হ'ল; একটি দোয়েল গাইচে হোথা তমাল বনে।
সুরের একি মাদকতা! প্রাণ-ঢালা গান র'য়ে র'য়ে
শান্তি-সুধা ভরচে যেন সব-মানুষের মনে-মনে!

ফসল-কাটা সাঙ্গ ক'রে ঐ অদূরে চল্‌চে চাষা,
মাথাতে ওর ধানের বোঝা কেমন দোলে নুয়ে নুয়ে!
আমার ফসল হয়নি তোলা; ঘিরেছে কোন সর্ব্বনাশা
মোহের জালে,—ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে এই কঠিন-ভূঁয়ে!

মন-মরা মোর মন ভাঙে যে কত-কিসের চাপে চাপে,
হোক্‌না কেন তানটা মধুর, আকাশখানি সোনা-গালা;
অশান্ত এ হৃদয় আমার,— এ কোথা হায় শান্তি পাবে?—
কে বোঝে এর অন্তরালে কতখানি বিষের জ্বালা!

আস্‌চে বুঝি নিশীথিনী,—তা'র আসা বেশ বুঝতে পারি,—
সবার চোখে আঁজন লাগায়, আমার চোখে আগুন খালি!
সাঁচ্চারি কাজ তা'র শাড়ীতে,—ভুলিয়ে ঝুটায় চটকদারী,—
আমায় ডুবায় রোজ নিরয়ে!—ইচ্ছা করে পাড়্‌তে গালি।

শ্রী[illegible] মিত্র।

রবিবারের দিন কোনরকমে মধ্যাহ্ন-ভোজন সারিয়া অনুপম মণিমালিনীর বাড়ী চলিয়া গেল। সারা সকালটা ঘুরিয়া যে-একটা বড় ফুলের তোড়া জোগাড় করিয়াছিল, সেটাকে লইয়া, হাট-বাজার এড়াইয়া সে নীচের রাস্তা দিয়া ষ্টেশনের পিছন দিয়া পলাইয়া গেল।

মণিমালিনী তখন একটা জানালার কাছে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল, অনুপম কখন আসিল তাহা সে দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া সে দেখিল, দূরে অনুপম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ঘরে আর কেহ নাই। অনুপমের হাতে ফুলের তোড়া দেখিয়া মণির মুখ আবার লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। অনুপম তাহা দেখিয়া কাছে সরিয়া আসিয়া তোড়াটা মণির সম্মুখে রাখিল। মণি মুখখানা ফিরাইয়া বলিল, "নেড়া দা যে, বসুন।"

অনুপম একটু হাসিয়া বলিল, "আজ আবার বসুন কেন?"

মণি আরও লজ্জা পাইয়া বলিল, "ভুলে গেছি—বসো না নেড়া দা?"

অনুপম একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া মণির কাছে বসিল। অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা না বলিয়া বসিয়া রহিল। তখন অনুপম অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোড়াটা কেমন হয়েছে, একবার দেখলে না?"

মণি চাপা গলায় বলিল, "বেশ তোড়াটি।" তখন আবার অনেকক্ষণ ধরিয়া অনুপম কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। সে মণির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, আর মণি জানালার বাহিরে পাহাড়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে অনুপম আবার ডাকিল, "মণি—"

মণি মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, "কি?"

"এমন করেই দিন কাটবে?"

"কার দিন?"

"এই তোমার কথাই বলছি।"

মণি তখন অনুপমের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার দিন এমন করে যদি কেটে যায়, তবে জানবো যে জীবনটা বড় সুখেই কেটে গেল।"

"এ কি সুখের জীবন, মণি?"

"সুখের জীবন বৈ কি নেড়া দা। যে-ভাবে আমার অতীত জীবন কেটে গেছে তার তুলনায় বড় সুখেই আছি। মাসিমাকে পেয়ে মায়ের অভাব ভুলে গেছি, তোমাদের স্নেহে ভাইয়ের অভাব বুঝতে পারিনি! বড় সুখেই আছি নেড়া দা।"

অনুপম মণির কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে আবার অনেকক্ষণ কথা খুঁজিয়া পাইল না। অনেকক্ষণ পরে সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু এভাবে কত দিন কাটাবে মণি? মাসিমা বুড়ো হয়েছেন,—বেবি দুদিন বাদে বড় হবে, তার বিয়ে হবে, সে শ্বশুর-বাড়ী চলে যাবে, তখন তুমি কোথায় যাবে?"

মণি একটু হাসিয়া বলিল, "দেখ নেড়া দা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান। যখন চাকরী নিয়ে এখানে এসেছিলুম, তখন মাসিমা কোলে তুলে নিয়েছিলেন,—সে আশ্রয় যখন যাবে, তখন ভগবান আর একটী আশ্রয় নিশ্চয় জুটিয়ে দেবেন।"

"কেন, এখন থেকে একটী সংসার পাতলে হয় না?"

"আমার আবার সংসার কি নেড়া দা? দুনিয়ায় যার কেউ নেই, তার আবার সংসার কি? আমি একা কোথায় যাবো, সে আমার পক্ষে অসম্ভব।"

"মণি, বাবা আমার বিয়ে দেবার চেষ্টা কচ্ছেন। এই যে হালদার সাহেব স্ত্রী-কন্যা নিয়ে এসেছেন, আমি এখন বুঝছি, উনি বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে মেয়ের বিবাহ দিতে এসেছেন।"

"বেশ তো, তাতে তোমার আপত্তি কি নেড়া দা?"

"কিছু না, কিছু না। কেবল তিনি যখন কন্যারত্নটি আমার স্কন্ধে চাপাবার চেষ্টা করেন, তখনই আমার ভীষণ

মণি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; অনুপম অপ্রতিভ হইয়া গেল। মণি তখন বলিল, "মেয়েটি তো বেশ, বিয়ে করে ফেল না, নেড়া দা।"

রাগে অনুপমের মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি কখনই বিয়ে করবো না। বাবা যত রকমেই চেষ্টা করুন না কেন, এ রকম করে কিছুতেই আমার বিয়ে দেওয়াতে পারবেন না! কেন যে তিনি এ রকম করে আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছেন, তা তো বুঝতে পাচ্ছি না।"

"মেয়েটির দোষ কি? লেখা পড়া-জানে, আচার-ব্যবহার ভাল, সেকেলে ধরণের নোলক-পরা ঘোমটা-টানা কনেটি তো নয়!"

"দোষ আমার অদৃষ্টের—বুঝলে মণি, আর কারও দোষ নয়, আমার চোখে আর কাউকে যে ধরে না, সে কথা কি বুঝতে পারো নি? আমি—"

মণির মুখখানা জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "মাসিমাকে ডেকে আনি নেড়া দা।"

মণি উঠিতে যাইতেছিল, অনুপম তাহার হাত ধরিয়া বসাইল; মণির সর্ব্বাঙ্গ তাহার স্পর্শে স্পন্দিত কম্পিত হইয়া উঠিল। অনুপম বলিল, "একটু বোসো, আমার একটা কথা শুনে যাও। আজ এই কথাটা বলবার জন্যেই এসেছি মণি।"

মণি মুখ ফিরাইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এই সময়ে পিছন হইতে হারাণ বলিয়া উঠিল, "এই যে নেড়া, তুই এখানে! সকাল থেকে হালদার সাহেব আর আমি সারা দার্জ্জিলিঙ্গ সহরটা, তোকে গরু খোঁজা করে বেড়াচ্ছি।"হারাণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে কথা কয়টা বলিয়াই থপ করিয়া বসিয়া পড়িল। মণি হারাণকে দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কিন্তু ক্ষোভে আর রাগে অনুপমের লাল মুখখানা আরও লাল হইয়া উঠিল। হারাণ তাহা দেখিতে পাইল না, সে মণিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মণি দি, মাসিমা কোথায়?"

মণি বলিল, "নিজের ঘরে আছেন, বোধ হয় শুয়ে হারু দা, আমি মাসিমাকে ডেকে আন্‌ছি।" মণি উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেল, আর ফিরিল না।

মণি চলিয়া গেলে হারাণ অনুপমকে বলিল, "নেড়া, বিষম বিপদেই পড়েছি ভাই।" অনুপম তখনও হারাণের উপর রাগিয়া ছিল; সে বলিল, "তোর আবার বিপদ কি! বিশুখুড়ো তোকে আমার পেছনে লাগিয়েছেন বুঝি? তুই হালদার সাহেবকে বলিস যে আমি রোজ রোজ যেতে পারবো না। তাঁর মেয়েটা এমন নির্ল্লজ্জ বেহায়া যে তার গায়ে-পড়া ভাব দেখলে আমিই লজ্জা পাই।"

হারাণ চোখ মেলিয়া অনুপমের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি নেড়া দা, আমরা ভেবেছিলুম তোর কনে মনে ধরেছে, হালদার সাহেব বলছিলেন যে এই মাসেই বিয়েটা দিয়ে ফেলবেন।"

অনুপম রাগিয়া বলিল, "এই মাসেই আমার পিণ্ডি চট্‌কাবেন! আমি আর তার ত্রিসীমানায় গেলে তো?"

"যাবিনি কি রে? তিনি যে এইখানেই আসছেন।"

"আসুন এইখানে, তিনি দুটো-একটা শক্ত কথা না শুন্‌লে ঢিট্ হবেন না।"

এই সময়ে মাসিমা আসিয়া পড়ায় তাহাদের কথা বন্ধ হইয়া গেল। হারাণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "মাসিমা বড় বিপদেই পড়েছি। কি করি, বলুন দেখি?"

মাসিমা হাসিয়া বলিলেন, "তোর আবার বিপদ কি' রে! নেড়ার বিপদের কথাই তো শুনছি।" এই সময়ে নেপালী ঝি আসিয়া বলিল, "একজন সাহেব নেড়া বাবুকে ডাকছেন।" অনুপম বলিয়া উঠিল, "তুই বল্‌গে যা, আমি যাব না।" মাসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা কে?"

হারাণ বলিল, "হালদার সাহেব।" তখন মাসিমা বলিলেন, "ভদ্রলোক যখন এতদূর এসেছেন, তখন অভদ্রতা করিস কেন বাপু, যা দেখা করে আয়।"

অনুপম অগত্যা উঠিয়া গেল।

১০

অনুপম বাহিরে চলিয়া গেলে হারাণ বলিল, "মাসিমা মেয়েরা বড়ই বাড়াবাড়ি করে তুল্‌ছে, আমার তো বাড়ীতে

রগড়াইতে বলিলেন, "মেয়েরা কি কর্ব্বে বাপু ? তুই বুঝি ঝগড়া-ঝাটি করে গাল-মন্দ দিয়েছিস ?" হারাণ বলিল, —"আপনার দোহাই মাসিমা, আমি এ-পর্য্যন্ত কিছুই বলি নি।" বলিতে বলিতে হারাণ মাসিমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মাসিমা তখন বুঝিলেন যে ব্যাপার গুরুতর ; তিনি হারাণের চোখ মুছাইয়া তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে হারু ? কাঁদিস্ নে, এখন কি আর ছেলেমানুষটী আছিস্ ?"

হারাণ শান্ত হইয়া বলিল, "মাসিমা, কি করে কি বলি, তাই ভেবে পাচ্ছি না। আপনাকে মায়ের মতন দেখি, ভক্তি করি, সে কথা কেমন করে আপনার কাছে মুখে আনবো !"

"বৌমা আমার বড় শান্ত মেয়ে, হারু, যেন লক্ষ্মীর প্রতিমাখানি, তিনি তোকে এমন কি কথা বলেছেন যা তুই আমার সাম্‌নে বলতে পারিস্ নে ?"

"তোমার সে বউ আর নেই মাসিমা। পাড়ার বজ্জাত মাগীগুলো লাগিয়ে লাগিয়ে তাঁকে এমন ক্ষেপিয়ে তুলেছে যে তাঁর কথা আর কানে তোলা যায় না।"

"মোদ্দা কথাটা কি বলে হারু ? তুই আমাকে ঠারে ঠোরে একটু বোঝাতে পারিস ?"

"বলে আমার মাথা আর মুণ্ডু! মাগীগুলো তাকে শিখিয়ে দিয়েছে যে ব্রাহ্মদের দলে মিশে আমার চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে, আর আমার চরিত্র-দোষের প্রধান কারণ মণি দিদি।" বলিতে বলিতে হারাণের চোখ আবার জলে ভরিয়া আসিল। মাসিমা তাহার চোখ মুছাইয়া তাহাকে শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, বউমাকে এমন মন্ত্র কে দিলে ? আমার বউ-মা কখনই নিজের ইচ্ছায় এমন কথা মুখে আনতে পারে না।"

"ভাল কথা মনে করে দিয়েছেন, আমাদের দার্জ্জিলিঙের বাঙ্গালী মাগীরা সব রণরঙ্গিনী হয়ে উঠেছে। কোথা থেকে এক মা-ঠাকরুণ এসেছেন, আর বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অশান্তি প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। শুন্‌চি, তিনি সধবা, কিন্তু স্বামী ত্যাগ করেছেন, তাঁর সঙ্গে আর একজন পুরুষ আছেন তিনি নাকি তাঁর ধর্ম্ম-ভাই। শুন্‌তে পাই মা-ঠাকরুণ যোগিনী, সংসার-ত্যাগিনী, কিন্তু তাঁর ভোগ-বিলাসের মাত্রা দেখলে তাঁকে ঘোর সংসারী বলেই বোধ হয়। এই মা-ঠাকরুণের মন্ত্রেই মাগীগুলো সমস্তই বিগড়েছে, একেবারে রণরঙ্গিনী হয়ে নাচ্‌তে আরম্ভ করেছে। মা-ঠাকরুণ নাকি তোমার বৌকে শিখিয়ে দিয়েছেন যে স্বামী উচ্ছৃঙ্খল হলে তাঁকে শাসন করবার অধিকার হিন্দু স্ত্রীর পূর্ণ মাত্রায় আছে। আমি নিষ্ঠাবান হিন্দুর ছেলে হয়ে যখন ব্রাহ্মদের সঙ্গে এত মিশি তখন নিশ্চয় আমার চরিত্র-দোষ জন্মেছে। মা ঠাকরুণ নাকি যোগ-বলে জান্‌তে পেরেছেন যে মণি দিদি—"

হারাণের কথা রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে আর বলিতে পারিল না ;—কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া মাসিমা হাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "বৌমার রোগটা যত কঠিন ভাবছিস হারু, তত কঠিন নয়। তোর মেসোমশায় বল্‌তেন যে মেয়েদের উৎকট ধর্ম্ম-পিপাসা এক রকম হিষ্টিরিয়া।"

হারাণ বলিল, "রোগটা অত সোজা নয় মাসিমা। মাগীরা স্থির করেছে যে দল বেঁধে মা-ঠাকরুণের সঙ্গে মণি দিদিকে তাঁর মহাপাপের কথা বোঝাতে আস্‌বে।"

"বটে, এতদূর হয়েছে ? হারু, তুই আজই আমাকে একবার সেই মা ঠাকরুণের কাছে নিয়ে চল্।"

"আপনি যাবেন মাসিমা ?"

"ভয় কি বাবা ? কিসের ভয় ? কাকে ভয় ?"

"আপনাকে যদি কোন অন্যায় কথা বলে, তা' আমি সহ্য কর্‌তে পার্ব্বনা।"

"এই পঞ্চাশ বৎসর ধরে অনেক কথাই শুনে এসেছি হারু। আমাকে যা বল্‌বে তার জবাব আমিই দেবো, তুই পুরুষ মানুষ, মেয়ে মানুষের কথায় কেন আস্‌তে যাবি ?"

"তা হলে কখন যাবেন মাসিমা ? ধার্ম্মিকার দল হয়ত আজ-কালের মধ্যেই মণি দিদিকে শাসন করতে আস্‌বে, আর তারা যদি আসে মাসিমা, তাহলে আমাকে তিন পুরুষের বাস ছেড়ে দার্জ্জিলিং থেকে উঠে যেতে হবে।"

"আমি আজই যাবো, এখনি যাবো, এই নেড়া ফিরে আসুক্, তার পরই যাবো।"

এই সময়ে মণিমালিনী সেই ঘরে আসিয়া পড়ায় তাহাদের কথা বন্ধ হইয়া গেল। মণি মাসিমার শেষের কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল, সে বলিয়া বসিল, "কোথায় যাবে, মাসিমা? আমি তোমার সঙ্গে যাবো।"

হারাণের মুখ শুকাইয়া গেল। মাসিমা বলিলেন, "আমি একটু কাজে যাবো, বাছা, তুই সেখানে কি করতে যাবি?"

"আমার এবেলা কাজ-কর্ম্ম কিছু নেই, ফুল কালিম্পঙ্গে গেছে, বেড়াবার একটা সঙ্গী অবধি নেই। তুমি সেখানে কাজে যাবে, আমি নয় বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবো।"

"তুই কি পাগল মেয়ে বাছা। বৌমা হারুর সঙ্গে ঝগড়া করেছে, চাঁদমারির মেয়েরা তা'কে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, আমি গিয়ে তাকে দুটো কথা বলে শান্ত করে আস্‌বো। তুই সেখানে কি করতে যাবি?"

"হারুদার সমস্ত মিথ্যা কথা মাসিমা—বৌ কক্ষনো ঝগড়া করেনি। সে বৌ ঝগড়া কর্ত্তে এখনো শেখেনি। তুমি তো জানো মাসিমা, সে বউ গুণে লক্ষ্মী, রূপে সরস্বতী। আর এ কথা যখন উঠেছে, তখন আমার যেতেই হবে, কারণ হারুদার মিথ্যে কথাটা ধ'রে দিতেই হবে।"

মাসিমা বিষম বিপদে পড়িলেন, অবস্থা বুঝিয়া পলায়নের চেষ্টায় হারাণ উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন মণি ধরিয়া বসিল, "তুমি আমায় নিয়ে যেতে চাচ্ছো না কেন, মাসিমা?"

মাসিমা বলিলেন, "ওরে পাগলী, একটু কারণ না থাকলে তোকে নিয়ে যেতে চাইবো না কেন? আজ আর তোর সেখানে গিয়ে কাজ নেই।"

"কেন কাজ নেই, বল? তুমি যদি আমায় বোঝাতে পারো, মাসিমা, তা'হলে আমি যাবো না।"

"সে কথাটা তোকে পরে বলবো মা, কথাটা বড় গুরুতর কথা, এখন আর তোর তা শুনে কাজ নেই।"

"গুরুতর কথা যখন বলছো মাসিমা, তখন আমায় শুন্‌তেই হবে।" মণিমালিনী এই বলিয়া দুই জনের হাত চাপিয়া ধরিল। এই সময় রাগে মুখখানা তাহা দেখিয়া ভয় পাইয়া মাসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নেড়া ঝগড়া করে এলি বুঝি?"

অনুপম বলিল, "হাঁ মাসিমা, আজ মনের কালী ধুয়ে দিয়ে এসেছি। হারু, আমি আজ থেকে দিনকতক তোর বাড়ী থাকবো।" হারাণ সঙ্গী পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল, "তা'হলে তো বাঁচি ভাই। বিশুখুড়ো বুঝি বড় জ্বালাতন আরম্ভ করেছে?" অনুপম বলিল, "কেবল বিশুখুড়ো নয়, জগৎ-শুদ্ধ লোক।" মণিমালিনী তখন মাসিমার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিল, "ওঠো মাসিমা, গুরুতর কথার বিলম্ব ক'রে কাজ নেই।"

১১

হারাণের বাড়ী লোকে লোকারণ্য; সে-অরণ্যটাকে লোকারণ্য না বলিয়া রমণী-অরণ্য বলাই সঙ্গত; কারণ, তাহার মধ্যে একজনের বেশী পুরুষ ছিল না। সে পুরুষটী হারাণের ঘরের এক কোণে বসিয়া ঘন ঘন তামাকু সেবন করিতেছিল। তা, ছাড়া, হারাণের সদরে ও অন্দরের ঘরে এবং বাহিরে সর্ব্বত্রই ভক্তি-ব্যাকুল-চিত্ত রমণীকুল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই সময়ে মণি, হারাণ ও অনুপমকে লইয়া মাসিমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া দলের কেহ কেহ একটু দমিয়া গেল। সে রাগটা কাহারো স্পষ্ট প্রকাশ না পাইয়া মনের ভিতরেই রহিয়া গেল। মাসিমা কিন্তু ক্রোধের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি একেবারে বাড়ীর ভিতর গিয়া ডাকিলেন, "বৌমা—"

তখন হারাণের শুইবার ঘরে এক প্রকাণ্ড সভার অধিবেশন হইতেছিল। মৃগচর্ম্মে বসিয়া গেরুয়া কাপড় পরা মধ্য-বয়সী এক স্থূলাঙ্গিনী গীতার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন আর ভক্তিগদগদ-চিত্তারা তন্ময় চিত্তে তাহা শুনিতেছিলেন। "আমার গুরু বল্‌তেন যে গীতা পড়াওয়ে কোন্ শালা আর পড়ে কোন্ শালা? তিনি লোকজনকে গালি-গালাজ করতেন বটে, কিন্তু তিনি মহাপুরুষ ছিলেন, তা' নইলে গীতা সম্বন্ধে এত বড় কথা কি কেউ বলতে সাহস করে? গীতার মোট কথাটা হচ্ছে—সর্ব্বধর্ম্মান

অনেক রকম করে, কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে, এখন যে যা করছ তা ছেড়ে-দিয়ে ব্রজে এসে আমার স্মরণ কর। তোমরা বোধ হয় বুঝতে পারলে না ? এই মনে কর, স্ত্রী ভক্তিমতী, স্বামী ভয়ানক পাপী,—এ ক্ষেত্রে সে স্ত্রীর স্বামী পরিত্যাগ করে ব্রজে যাওয়া উচিত, আর স্ত্রী যদি পাপিনী হয় তা'হলে ধর্ম্মমতি স্বামীর তৎক্ষণাৎ ব্রজে যাওয়া উচিত।"

মাসিমা দুয়ারে দাঁড়াইয়া গীতার ব্যাখ্যা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কথা সরিল না। হারাণের স্ত্রী তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ব্বের অভ্যাস-মত ছুটিয়া আসিল, কিন্তু অন্যান্য ভক্তারা তাঁহার দিকে এমন কটমট্ করিয়া চাহিয়া রহিল যে সে বেচারা অৰ্দ্ধপথেই থামিয়া গেল! তখন মাসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌ, আমি জুতো খুলে ভিতরে আস্‌তে পারি ?" হারাণের স্ত্রী বাধ্য হইয়া বলিল, "আসুন, আসুন,—"কিন্তু মাসিমার পিছনে মণিমালিনীকে দেখিয়াই সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মণি কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "বৌদি, আমিও গরদের কাপড় পরে এসেছি, ভিতরে আসবো কি ?" মণিকে দেখিয়া হারাণের স্ত্রী রাগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল সে উত্তর দিতে পারিল না; কিন্তু গীতা-শিক্ষয়িত্রী প্রসন্ন বদনে বলিলেন,—"এসো না মা, এখানে ভগবানের কথা হচ্ছে,—এখানে কি বাচবিচার আছে ?" মণি জুতা মোজা বাহিরে রাখিয়া ঘরের এক কোণে গিয়া বসিল। তাহার দিকে চারিধার হইতে যে ক্রুর দৃষ্টি বর্ষিত হইতেছিল, তাহাতে কলিযুগে দৃষ্টির যদি দাহিকা-শক্তি থাকিত তো তাহা হইলে সে বেচারা ভস্মসাৎ হইয়া যাইত।

ব্যাখ্যা চলিতে লাগিল, "ভগবান বলেছেন যে পাপী তার আর রক্ষা নেই।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।"

ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

এর মানে সাধুদের পরিত্রাণের জন্ত আর পাপীদের বিনাশের জন্ত ভগবান যুগে যুগে অবতার হবেন। যে-পাপী, ভগবানই তাকে বিনাশ করবেন, কোন মতেই তার রক্ষা নাই।" মণি থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "একটা কথা ত্যাগ করে যে তাঁতে শরণ নেবে, তিনি তাঁকে সর্ব্বপাপ থেকে মোচন কর্ব্বেন। সুতরাং পাপী যদি অনুতাপ করে, তা'হলেও কি তার বিনাশ হবে ?"

"নিশ্চয় হবে। ভগবান বলেছেন,

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু "—

অর্থাৎ যে মদের ভক্ত সে যদি আমার পূজারীও হয় তা' হলেও মন-মরা হয়ে তাঁকে নমস্কার করো না।" ব্যাখ্যাটা করিয়াই ব্যাখ্যাকারিণী চারিদিকে চাহিলেন, ভক্ত-মহলে ভ্রমর-গুঞ্জনের মত একটা শব্দ শোনা গেল! মণি কিন্তু না থাকিতে পারিয়া হাসিয়া ফেলিল; বর্ষীয়সী মাসিমা বহুকষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিলেন। মণি জিজ্ঞাসা করিল, "গীতা কি এখানে আছে ?" ভক্তমহল হইতে শোনা গেল, একজন বলিতেছেন, "মাগীর আস্পর্দ্ধা কি ভাই ? বিম্মি হয়ে গীতা চাওয়া ?' আর একজন বলিলেন,—"মা-ঠাকরুণের কথায় সন্দেহ! পোড়ারমুখী এখানে এসেছে কেন ?"

ভক্তমণ্ডলীর কাছে উৎসাহ পাইয়া মা-ঠাকরুণ বলিলেন, "দেখ মা, পাপ-মুখে বলতে নেই, গীতা আমার কণ্ঠে। যতদিন গুরুর পদে মতি থাক্‌বে, ততদিন আমায় বই দেখতে হবে না। তবে তোমার যখন সন্দেহ হচ্ছে, তখন বইখানা দেখানো উচিত।" এই বলিয়া মা'ঠাকরুণ একজন ভক্তাকে বলিলেন,—"ভাই-ঠাকুরকে একবার ডাকো তো মা!" তাহার পর মণির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার গীতা-টীতা পড়া আছে, তাহলে ধর্ম্ম ত্যাগ কর্লে কেন মা? বিশেষ এ মা তো বুড়া হয়েছেন, এঁর এখন ধর্ম্মে-কর্ম্মে মতি দেবার বয়স। ভগবান্ বলেছেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ—আমাদের ধর্ম্মের চাইতে আর কি ধর্ম্ম আছে মা ?" মণি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমরা ধর্ম্ম ত্যাগ কর্ত্তে যাব কেন ?"

"ব্রাহ্ম হলে কি আর ধর্ম্মে থাকা যায় মা ?" পিছন হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "বেহ্ম না হ'লে কি আর এত কীর্ত্তি চলে!" মণি রাগিয়া বলিল,—"কে বলে আমরা ব্রাহ্ম ?" পিছন হইতে আবার কে বলিয়া উঠিল,—"হিন্দুর

না।" এই সময়ে ভাই-ঠাকুর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মণি কি একটা কঠিন উত্তর দিতে যাইতেছিল, তাহা তাহার মুখেই রহিয়া গেল। ভাই-ঠাকুরও যেন সম্মুখে বিষধর সর্প দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইলেন।

মণি উঠিয়া গলায় কাপড় দিয়া ভাই-ঠাকুরকে প্রণাম করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি—তুমি এখানে ?" মণি বলিল, "যখন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন রোজগার করে খেতে বলেছিলেন, তাই এখানে এসে রোজগার করে খাচ্ছি।"

অনুপম এতক্ষণ দুয়ারে দাঁড়াইয়াছিল, সে ভাই-ঠাকুরকে ঠেলিয়া দিয়া ভিতরে আসিয়া মণিকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে মণি—এ কে ?"

অবিচলিত স্বরে উত্তর দিল, "নেড়াদা ইনিই আমার স্বামী।"

১২

ঠিক সেই সময়ে ধীরেন্দ্রচন্দ্রের বিপুল উদরে প্রচণ্ড ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় সে শীকার খুঁজিতেছিল। হঠাৎ বাজারের মধ্যে তাহার সঙ্গে হালদার সাহেবের দেখা হইয়া গেল। হালদার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ধীরেন বাবু, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?" ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ধীরেনের মেজাজটা গরম থাকিত, সে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে, গরীব মানুষের আর কি কাজ থাকে, বলুন ? পেটের চেষ্টায় যাচ্ছি।" হালদার সাহেব একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "ধীরেন বাবু, আপনি তো বেশ ভাল চাকরী করেন।" ধীরেন আরও চটিয়া বলিল, "চাকরীতে কি পেট ভরে মশাই ? তার উপর মেসের বামুনের রান্না।"

হালদার সাহেব সুচতুর; তিনি বুঝিয়া লইলেন ব্যাপারটা কি। তিনি বলিলেন, "ওঃ, নিমন্ত্রণে যাচ্ছেন বুঝি ?" ধীরেন অত্যন্ত চটিয়া বলিল, "আর কি সেকাল আছে মশায় ? সদ্‌ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে কে ?"

হালদার সাহেব বলিলেন, "এই ধরুন আমিই যদি করি ? আপনি যদি এখন আমার বাসায় পদার্পণ করেন, তা' হলে ভূরি-ভোজনে তৃপ্ত হবেন।"

ইচ্ছামত বাজারের খাবার কিনিয়া হালদার সাহেব তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেনিটরিয়মে ফিরিলেন।

ক্ষুধা শান্ত হইলে ধীরেনের মেজাজ বদলাইয়া গেল। সে নস্য লইয়া পাণের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ কাশীর জর্দ্দা মুখে পুরিয়া এবং হালদার সাহেবের একটা বর্ম্মা চুরুট ধরাইয়া একখানা ইজি চেয়ার দখল করিয়া বসিল; কৃতজ্ঞতা-রসে তাহার দেড়হস্ত পরিমিত বক্ষ তখন আপ্লুত হইতেছিল। অবসর বুঝিয়া হালদার সাহেব বলিলেন, "এত খরচ-পত্র করে দার্জ্জিলিং আসা গেল, কিন্তু মেয়েটার শরীর সারলো না। বর্ষাকাল হলেও দার্জ্জিলিঙের স্বাস্থ্যটা এবার ভালই আছে, কিন্তু আমার অদৃষ্টের দোযে সমস্তই বৃথা হয়ে গেল।"

ধীরেন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে ?"

"একটু যদি বেড়াতে যেতো, তা'হলে শরীরটা একটু একটু করে ভাল হতে পারতো, কিন্তু বেড়াতে সে একেবারেই যায় না।"

"কেন বেড়াতে তো যান।"

"যেতো। অনুপম বাবাজীবন যে ক'দিন নিয়ে যেতেন, সে ক'দিন বড় আনন্দেই বেড়াতে যেতো। বাছার আমার শরীরটাও একটু শুধরে ছিল, গাল দুখানিতে যেন একটু রক্তও দেখা দিয়েছিল।"

"কেন, নেড়া কি বেড়াতে নিয়ে যায় না আর ?"

"বাবাজীবন এ ক'দিন মিস্ মণিমালিনী মুখুজ্জেকে নিয়ে বড় ব্যস্ত আছেন—"

"তার মিথ্যা কথা, সে বোধ হয়, অন্য কোথাও গেছে। মণি আমার বোনের মত, পরোপকার আর রোগীর সেবা তার জীবনের ব্রত—কোন কাজ পড়লে সে আমাকেও ডাক্‌তো। নেড়াটা ভয়ানক মিথ্যাবাদী, সে বোধ হয় ক'দিন মণির নাম করে ক্রমাগত বায়োস্কোপ দেখছে।"

"বাবাজী সিনেমা দেখতে ভাল বাসেন বুঝি ?"

"ভয়ানক—"

"এ খবরটা আগে পেলে বড়ই উপকার হতো। মেয়েটাকে না হয় অনুপম বাবাজীবনের সঙ্গে রোজ সিনেমাতেই পাঠিয়ে দিতুম।"

"তা যদি সম্ভব হোত ধীরেন বাবু, তা'হলে তো কোন চিন্তার কারণই ছিল না। কিন্তু মেয়েটা রোগে জীর্ণ হয়ে বড় বেশী রকম জেদী হয়ে পড়েছে। অনুপম বাবাজীবনকে দেখে অবধি আর কারও সঙ্গে কথা কয় না, বেড়াতে যেতে চায়না, বললে চটে যায়।"

"তাই না কি! নেড়াটা ভয়ানক পাজী হয়েছে তো! এমন স্ত্রী-রত্ন চিনতে পারছে না! আমি এখনই তাকে ধরে নিয়ে আসছি।"

ধীরেন পর্য্যাপ্ত ভোজনের কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়াছিল, সুতরাং সে হালদার সাহেবের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমে সে উপরে উঠিয়া দুইটা সিনেমা থিয়েটার খুঁজিয়া আসিল; তাহার পরে বাজারে হারাণের আপিস দেখিয়া চাঁদ-মারীতে নামিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে—চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে হাজার হাজার আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বাজারের মোড়ে তাহার সহিত মণি-মালিনীর দেখা হইল। মণি সকলের আগে তর-তর করিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছিল, মাসিমা, অনুপম ও হারাণ তাহার পিছনে পড়িয়াছিল। ধীরেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মণি, নেড়া কোথায়?"

মণি না দাঁড়াইয়াই বলিল, "ঐ যে পিছনে আসছে।" আরও একটু নীচে নামিয়া ধীরেন, মাসিমা হারাণ ও অনুপমকে সে দেখিতে পাইল। সে যখন তাহাদের কাছে পৌঁছিল, তখন হারাণ বলিতেছে, "মণি দিদি নিজে বলছে তার স্বামী, আর তুই বলবি, না? দেখুন তো মাসিমা, নেড়ার কি রকম বেয়াদবী!"

মাসিমা বলিলেন, "কি পাগলামো করিস্ বাছা, রাস্তার মাঝখানে ও-কথার আলোচনা করে কাজ নেই। মণির কথা শুনে আমার অঙ্গ হিম হয়ে গিয়েছে,—যা কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয় বাড়ীতে এসে করিস্। দেখলি না, মণি কি রকম করে চলে গেল? সে কি কোন দিন আমায় পথের মাঝখানে ফেলে গেছে?"

অনুপম তখনও উত্তেজিত হইয়া ছিল; সে বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা, মাসিমা, ঐ বাঁদর গাঁজাখোর মণির স্বামী? অসম্ভব।"

মাসিমা বলিলেন, "তুই একটু স্থির হ' বাপু, আমাকে পাগল করে তুলিস্ নে আর। যা কিছু বলতে হয় বাড়ীতে এসে বলিস্।" তাহাদের হাবভাব দেখিয়া ধীরেন আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, সে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তখন হারাণের বাড়ীর অন্দরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অভিনয় চলিতেছিল। শিষ্য ও ভক্তাদের পরিত্যাগ করিয়া মা-ঠাকরুণ চেলার হাত ধরিয়া বলিতেছিলেন, "তুই আগে বলিসনে কেন? ও মাগী এখানে আসে জানলে আমি কখ্খনো এখানে আসতুম না! তোর মনে নিশ্চয়ই কু-মতলব ছিল।" চেলা গুরুর শাস্ত্রজ্ঞানের খ্যাতি ভুলিয়া বলিয়া উঠিল, "মাইরি বলছি, কোন্ শালা মিথ্যা কথা বলে? ক্ষিরি, তোর পায়ে পড়ি, এ কথা নিয়ে আর কেলেঙ্কারী করিসনে। যা হবার তা হয়ে গেছে, চল, কালই এখান থেকে চলে যাই।"

"যাব?—কখ্খনো যাব না, এই দার্জ্জিলিং সহরের মাঝখানে হাটে হাড়ি ভাঙ্গবো, তবে আমার নাম ক্ষিরি নাপ্তিনী!" এই কথা শুনিয়া শিষ্যা ও ভক্তারা যে যেখানে পারে ছুটিয়া পলাইল। হারাণের স্ত্রী বিষম বিপদে পড়িল। মা-ঠাকরুণ যে তাহার উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না, তাহা সে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বুঝিল। সে তখন নেপালী চাকরকে ডাকিয়া বলিল, "বাবুকে যেখানে পাস্, ডেকে নিয়ে আয়।"

তখনও মা-ঠাকরুণের ঘর হইতে বিধি-বর্জ্জিত দাম্পত্য কলহের আওয়াজ ও প্রচুর পরিমাণে গঞ্জিকার ধূম নির্গত হইতেছিল।

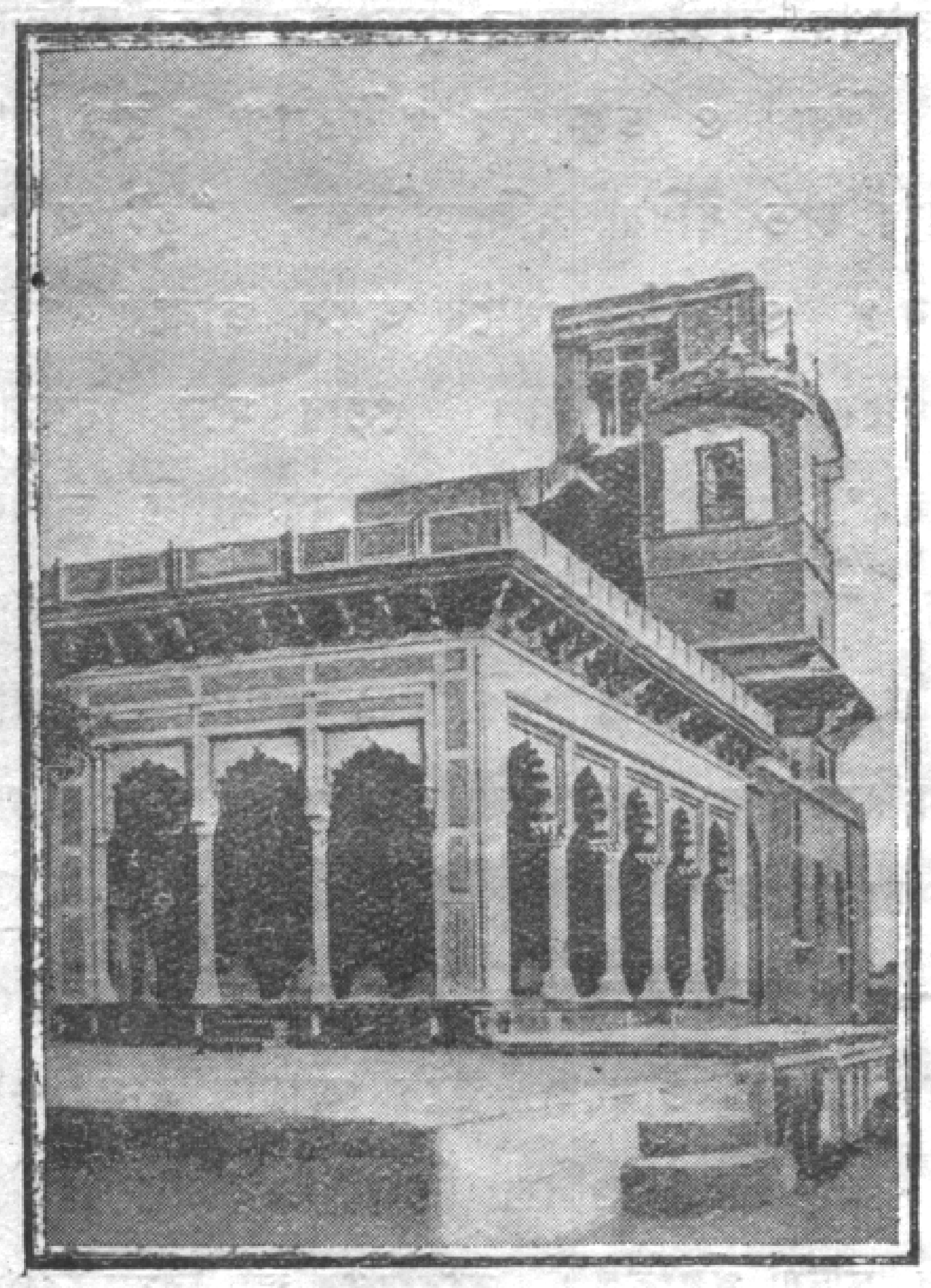
ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

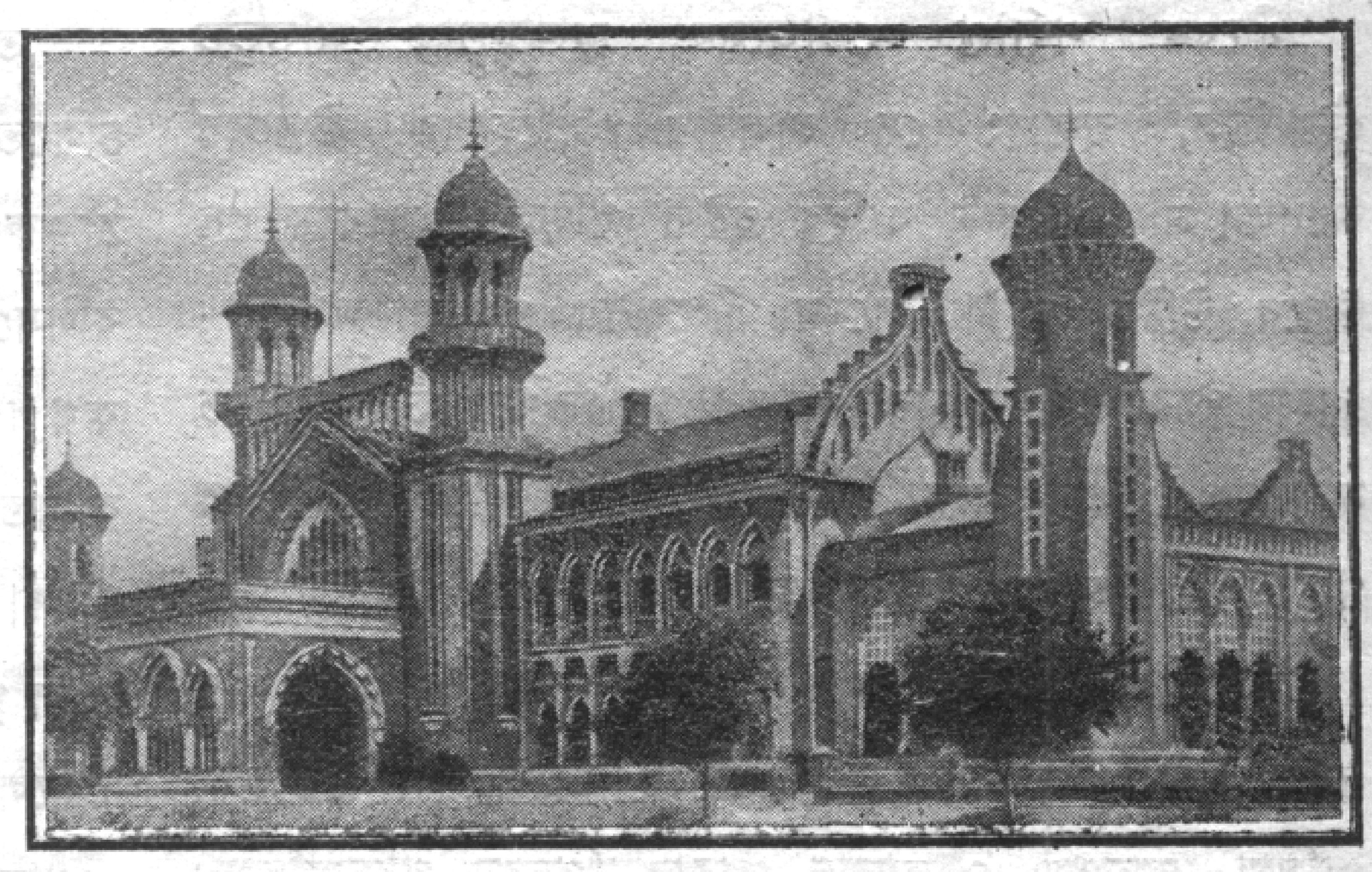
পঞ্চনদ

পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিল শিখ
নির্ম্মম নির্ভীক!

সে এক গৌরবের মহিমাময় ইতিহাস! ভারতের তোরণ এই পঞ্চনদের চারিধারে নানা জাতির সংঘর্ষের বিষাণ বাজিয়াছে চিরদিন; এইখানেই ভারতের বীরত্ব আর মহত্ত্ব পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছে চিরদিন; মনুষ্যত্বের বিজয়-দুন্দুভিও এইখানে বাজিয়া ভারতের বাণী সারা বিশ্বে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে! এইখানেই গ্রীসের সঙ্গে ভারতের মিলন, পাঠান মোগলের সঙ্গে হিন্দুর কোলাকুলি! এই পঞ্চনদই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের সঙ্গম-তীর্থ!

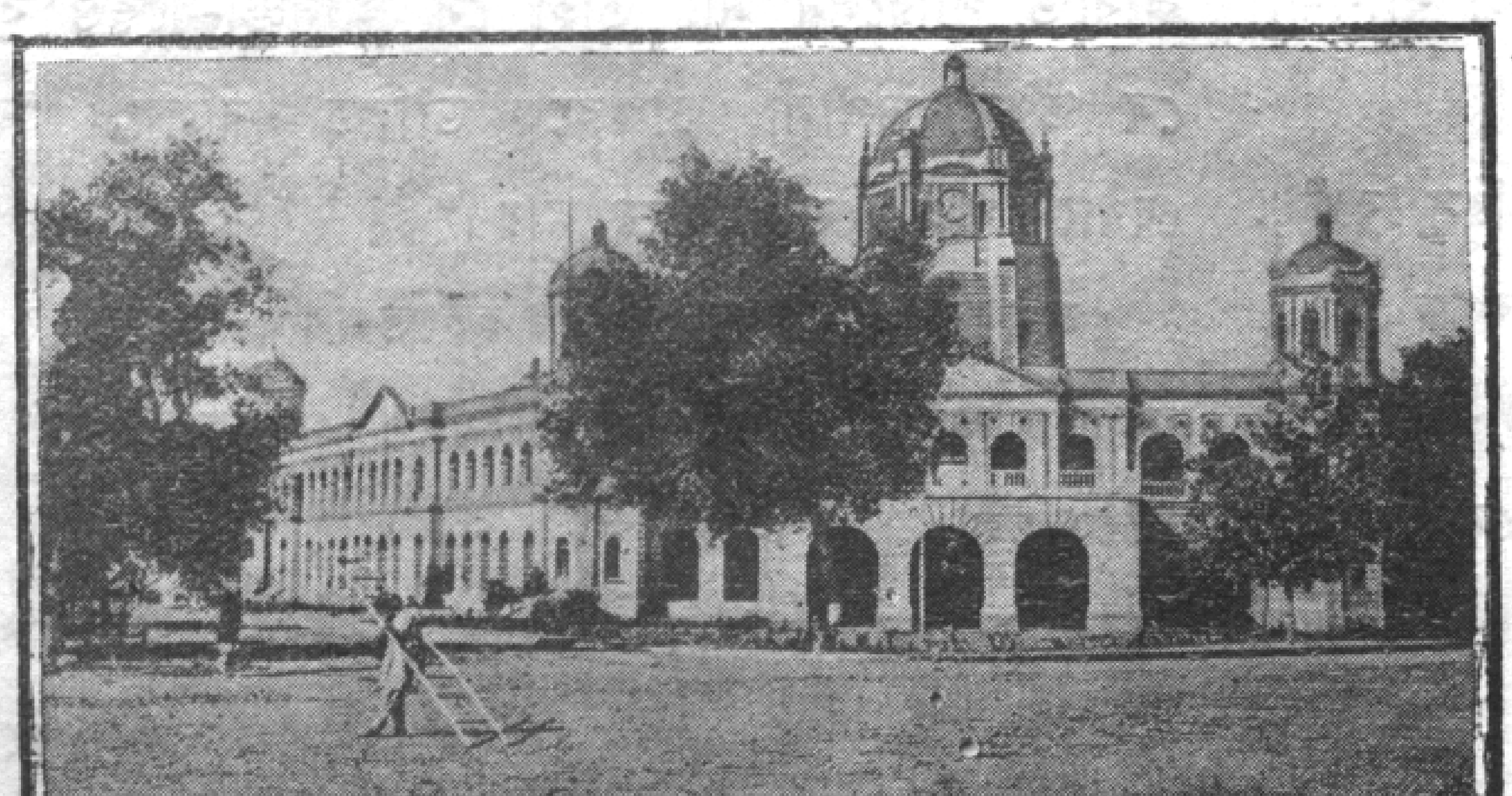


লাহোর শীষ্‌মহল দুর্গ



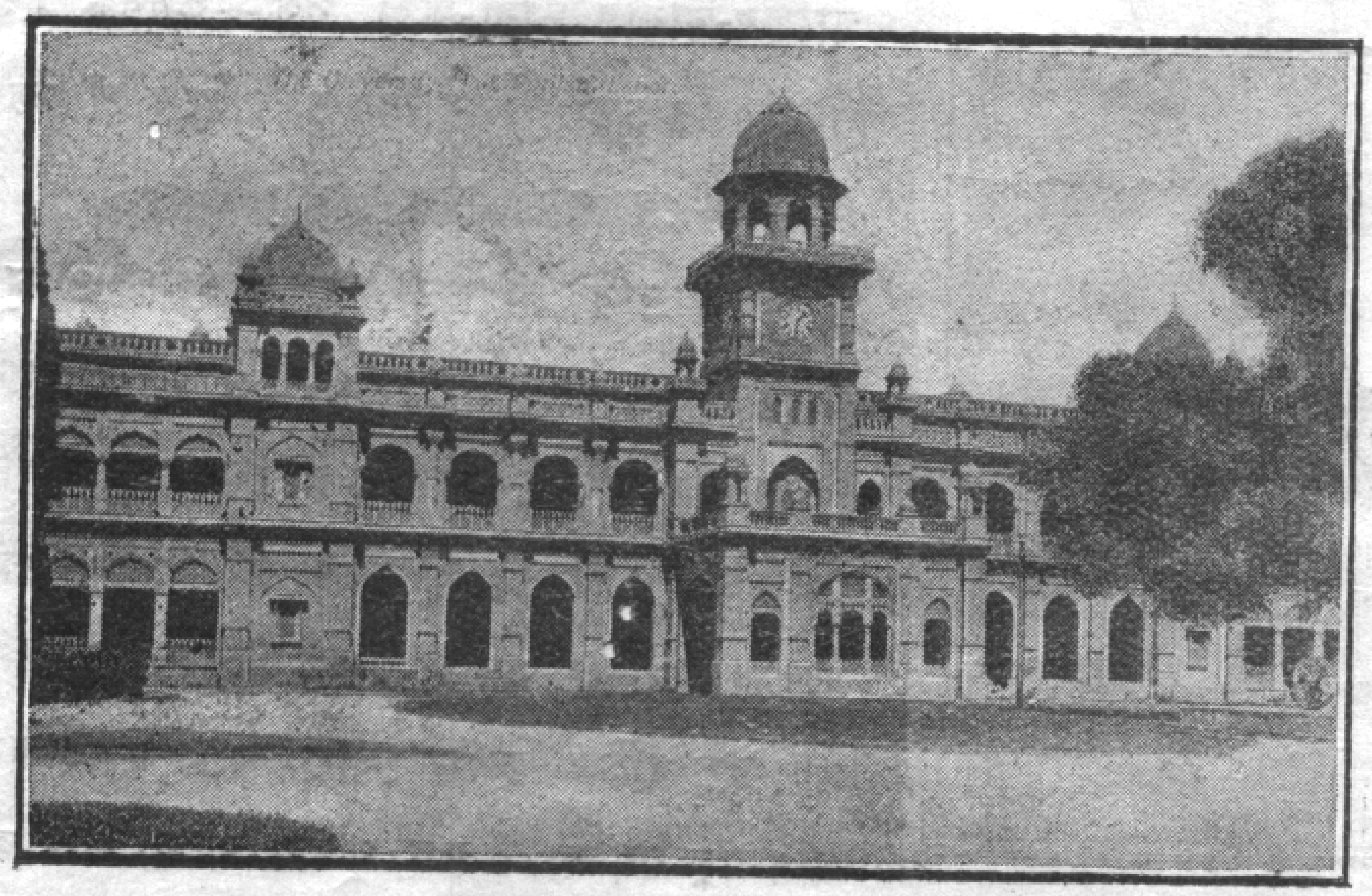
লাহোর হাইকোর্ট

নানা যুগ ধরিয়া নানা জাতি মিলিয়া এই পঞ্চনদকে সাজাইয়া তুলিয়াছে। পঞ্চনদে পৃথিবীর নানা জাতি আজ পরস্পরের প্রতিবেশী হইয়া বাস করিতেছে। এই পঞ্চনদেই বিপাশার তীরে পুরুরাজ আর সেকন্দর মিলিত হইয়াছিলেন, অনঙ্গপালের বীরত্ব যবনকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। আর্য্যগণ এইখানেই প্রথমে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, 'প্রথম সামরব' এই পঞ্চনদের বনে-বনেই ধ্বনিত হয়!



লাহোর জেনারেল পোষ্টাফিস

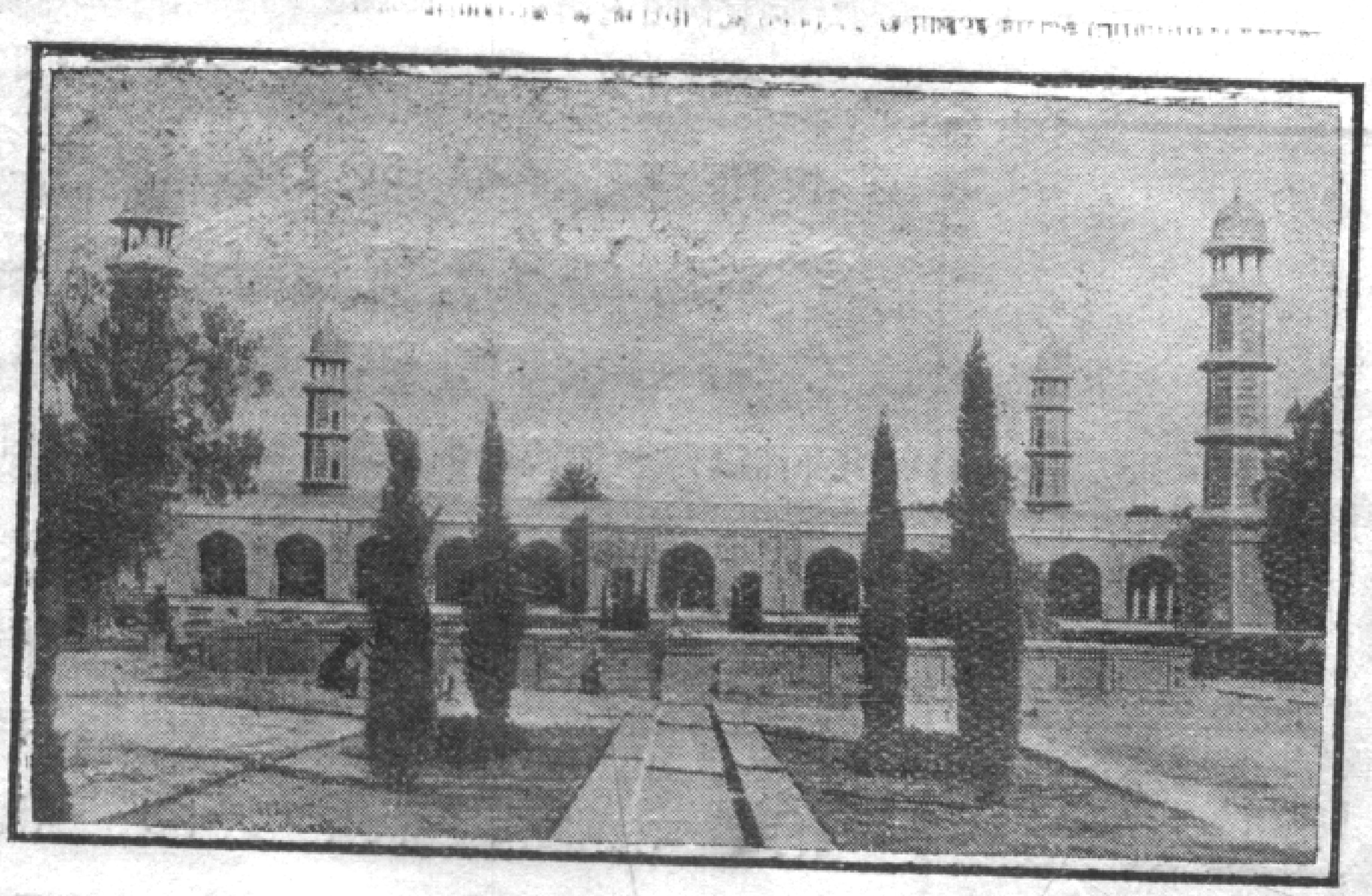
দিল্লী ছাড়াইলেই পঞ্চনদের ক্রোড়। তারই সীমানায় পাণিপথ বা প্রাচীন কুরুক্ষেত্র —ভারতীয় বীরগণের চিরভাগ্য-নিয়ন্তা বিশাল প্রান্তর; এখন ঘন জঙ্গলে আবৃত। কুরুক্ষেত্রের পর সাট্‌লেজ্‌ বা শতদ্রু নদী। এই নদীর পরই পঞ্চনদের রাজধানী লাহোর। বর্ত্তমান লাহোর প্রকাণ্ড সহর। পথ-ঘাট সব



পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি হল, লাহোর

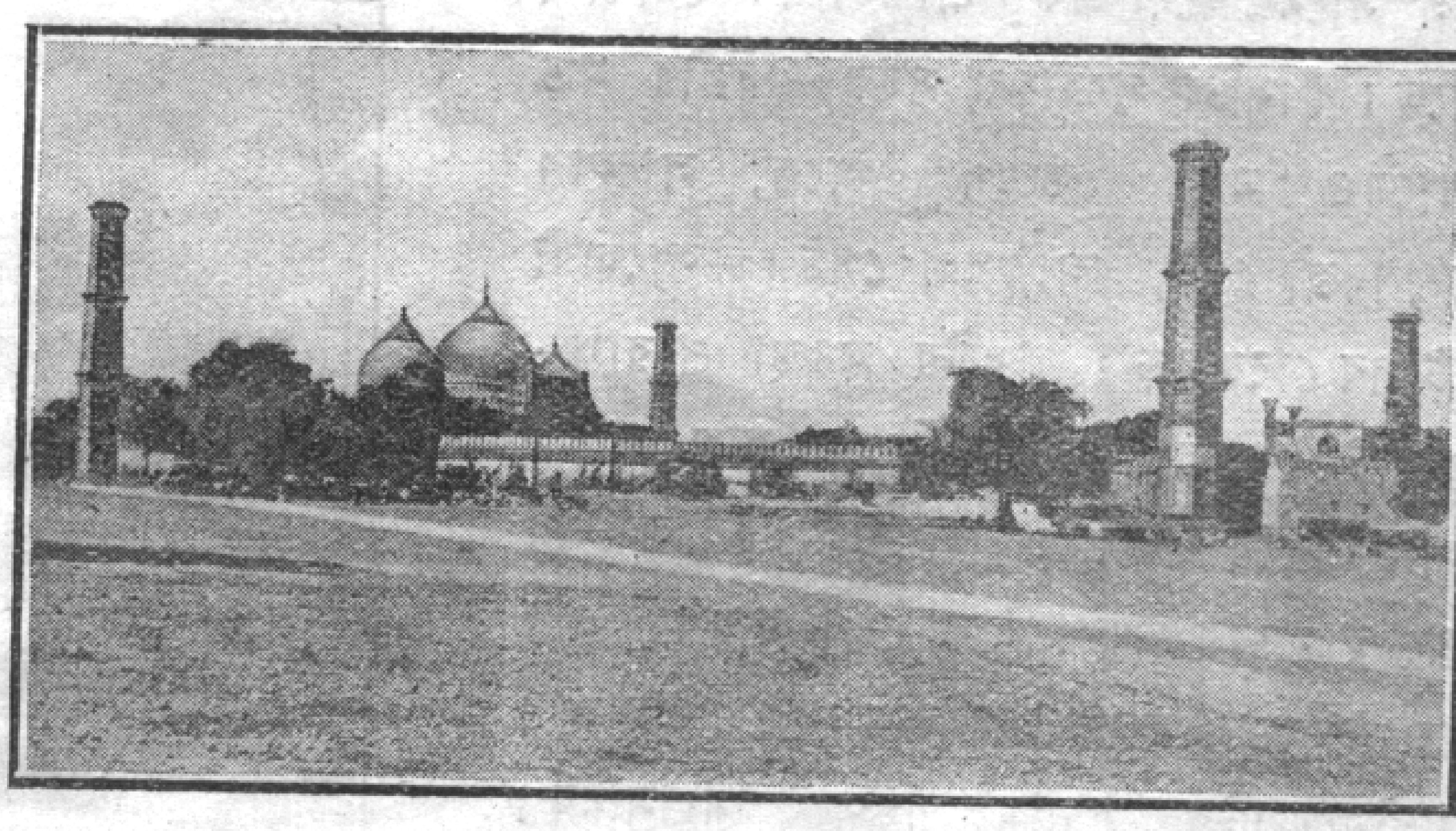
কলিকাতার মত, তবে প্রাচীন হর্ম্ম্যরাজি অতীতের গৌরব-মহিমার স্তম্ভস্বরূপ দিকে দিকে মাথা খাড়া করিয়া আছে, এইটুকুই এ সহরের বিশেষত্ব।

কলিকাতায় যেমন চৌরঙ্গী, লাহোরে তেমনি মল্‌। এই মলের উপরই আধুনিক কালের যত বড় বড় অট্টালিকা আর দোকান। জেনারেল পোষ্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, গভর্ণরের গৃহ, হাইকোর্ট, লরেন্স গার্ডেন, জু—সর্ব্ব বিষয়েই আধুনিক লাহোর সহর-কলিকাতাকে



শাহদরা, লাহোর

টেক্কা দিতেছে। লাহোরে একটি মিউজিয়মও আছে—এই মিউজিয়মে খড়্গ সিংহের বাড়ীর ফটক, কৃত্রিম কোহিনুর, বহু প্রস্তর মূর্ত্তি এবং প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্র কামান-বন্দুক প্রভৃতি সুসজ্জিত রাখা হইয়াছে। মিউজিয়মের পাশে পঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সামনে রক্ষিত 'জম্‌জমা গান্‌' একটি দেখিবার বস্তু। লাহোরের বাজার একদিকে একালের আব-হাওয়ায় ভরা অপর দিকে আরব্য উপন্যাসের একখানা ছেঁড়া পৃষ্ঠা বলিয়াও মনে বিভ্রম জাগে। শাল-দোশালা, আলোয়ান, কাশ্মীরী কার্পেট বেশ সুলভে পাওয়া যায়, দোকানে দোকানে পাহাড়-প্রমাণ শালের বস্তা; তবে ফলমূলের

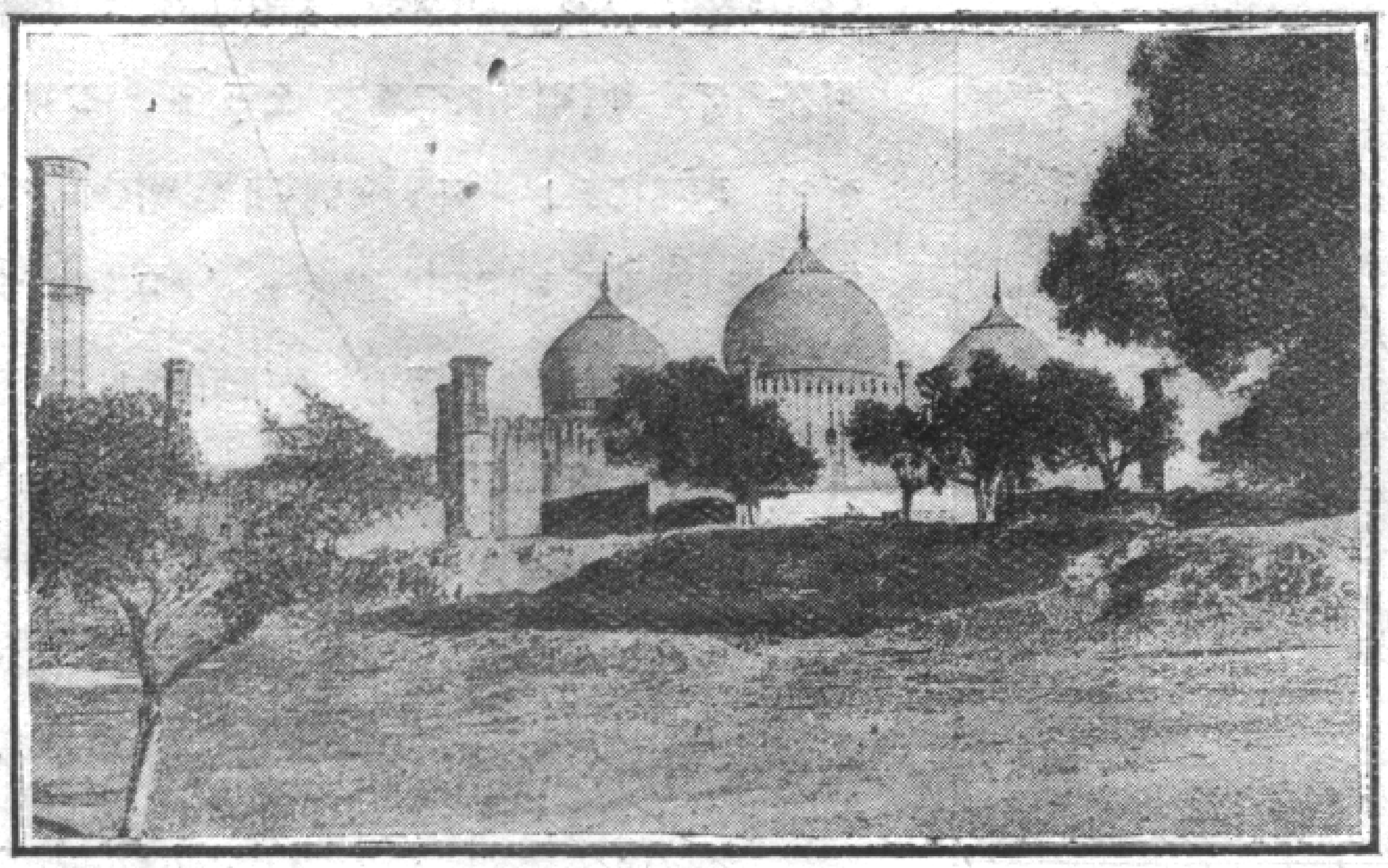


লাহোর বাদসাহী গির্জ্জা

দর লাহোরে খুব চড়া—কেবল আঙুর, আপেল, নাশপাতি, খেজুর, ডালিম, বেদানা এগুলিই শস্তা।

এখানকার পথে ঘাটে নানা বেশভূষায় সজ্জিত নানা জাতির লোক, রামধনুর মতই তাদের বৈচিত্র্য! মেয়েরাও পথে ঘাটে বাহির হন্‌—তাঁদের সাধারণ পোষাক ঢিলা পায়জামা, তার উপর সার্ট, মাথায় বেণী, তার উপর ওড়ণী। ঘাগরার রেওয়াজও আছে, তবে কম।

কলিকাতায় যেমন তিনটি ভাগ আছে, উত্তর সহর, চৌরঙ্গী আর দক্ষিণে সহরতলী, লাহোরেও তেমনি—আনারকলি, সিটি ও ক্যান্টনমেণ্ট। 'আনার



লাহোর বাদশাহী গির্জ্জা

কলি' নামের মধ্যে একটু ঐতিহাসিক রোমান্স আছে। সিটিই পুরোনো সহর—দিল্লীর মত এখানেও নানা তোরণ আছে, লাহোর গেট, দিল্লী গেট, আকবরী গেট। লাহোরী গেট সব চেয়ে বড়। সিটির অবস্থা খারাপ; পথ-ঘাট নোংরা, গলি-ঘুঁজিরও অন্ত নাই। কোন একটা রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে এর উপরেই মৃত্যুর পক্ষপাতিতা দেখা যায়। এবং তার জন্য মৃত্যু বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না। ক্যান্টনমেণ্টের নাম ছিল মিয়ানমির। এইখানেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মিয়ানমিরের যুদ্ধ হয়।

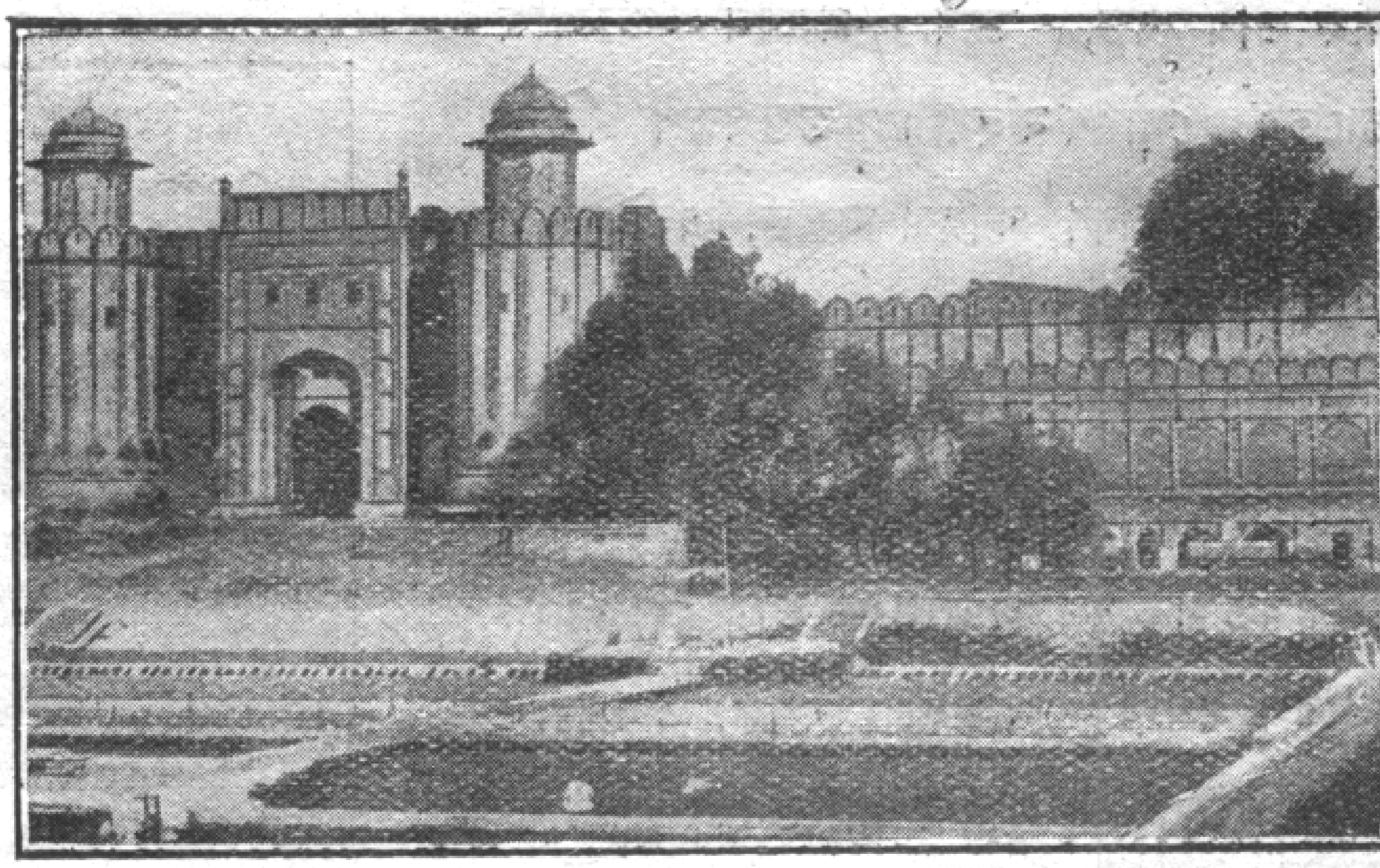
লাহোরের শাহাদ্রা একটি দর্শনীয় স্থান।



রণজিৎ সিংহের সমাধি ও হুজরি উদ্যান, লাহোর

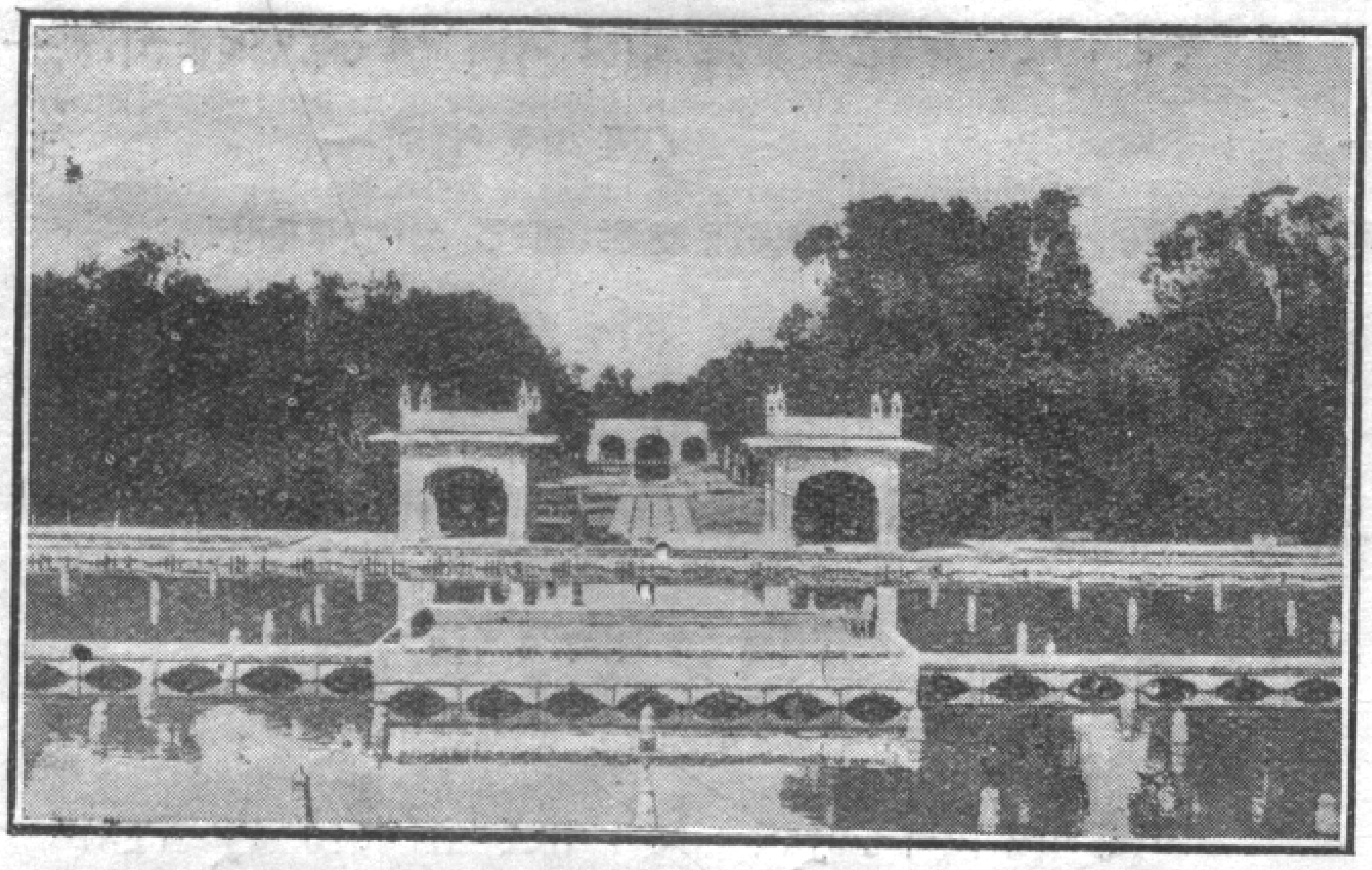
শাহাদ্রায় জাহাঙ্গীরের সমাধি। রাভী নদীর সেতু পার হইলেই শাহাদ্রা। ফোয়ারা ও ফুলবনের কেয়ারি—মাঝখানে গাছের-ছায়ায় ছায়া-করা পথ—কবরটি শ্বেত পাথরে রচিত। সমাধির চারিদিকে পাঁচতলা মিনার—সে যেন জীবন্ত ছবি!

শাহাদ্রার কাছেই নুরজাহান ও নূরজাহানের ভ্রাতা আশফ খাঁ ও নূরজাহানের কন্যার সমাধি। সমাধি-ভবনের চারিপাশে বন-জঙ্গল। দেখিলে চোখে জল আসে, এমনি অবস্থা। এই সমাধি-ভবনের দেওয়ালে বহু মণি-রত্ন খচিত ছিল—লোকে বলে, সেই সকল মণি-রত্ন রণজিৎ সিংহ খুলিয়া লইয়া তার দ্বারা অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দির সুশোভিত করেন।



লাহোর দুর্গ

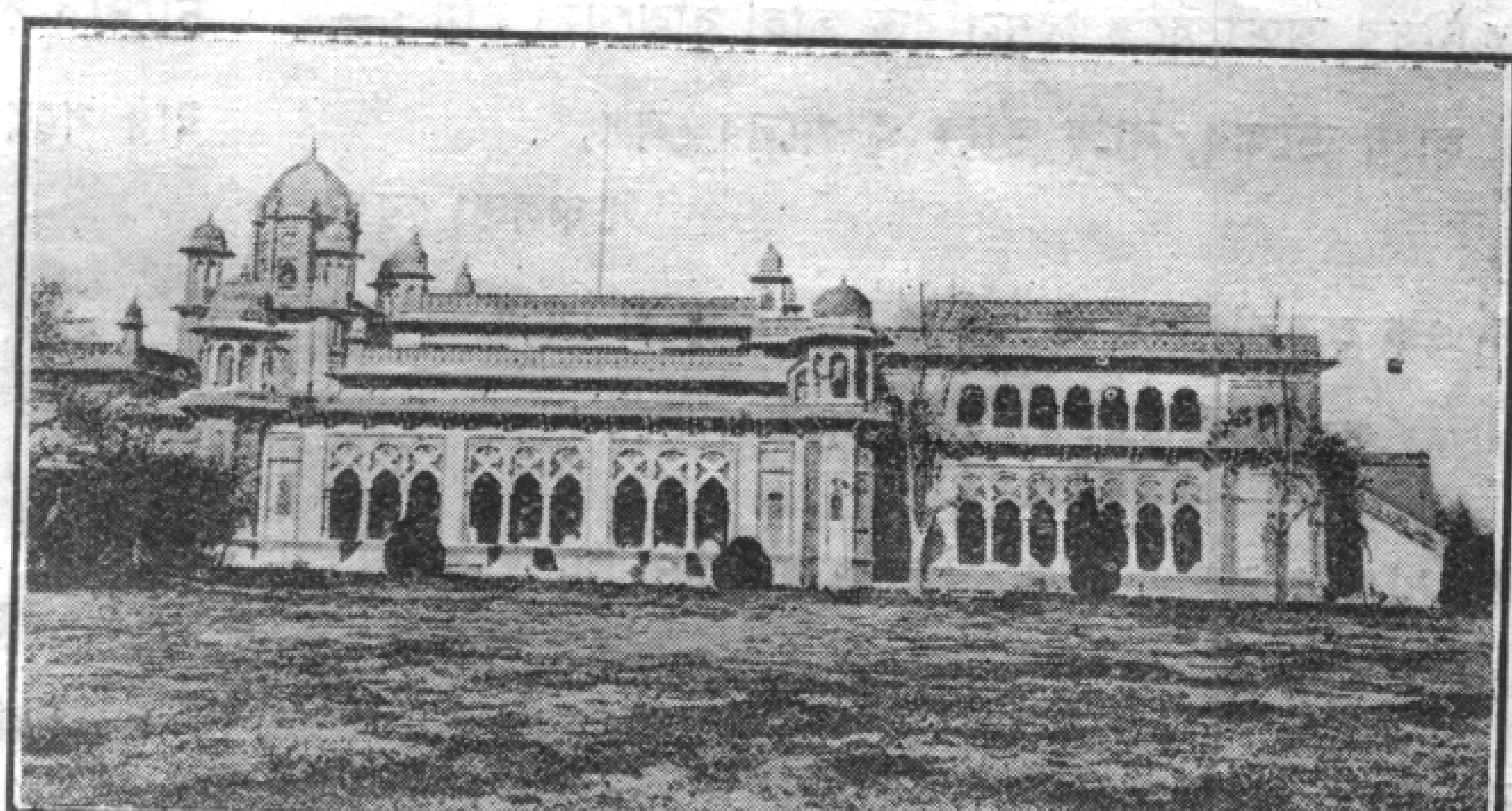
লাহোরে মসজিদের সংখ্যা প্রচুর; তন্মধ্যে বাদসাহী মসজিদ সব চেয়ে সেরা। এ মসজিদ ঔরংজীব নির্ম্মান করান্। এই মসজিদের সামনেই হাজারাবাগ নামে উদ্যান। ফুল ও ফোয়ারার বাহারে পরীস্তানের মতই রমণীয়! এই মসজিদের মিনারগুলি খুব উঁচু। এই মসজিদে মহম্মদের কেশ, পাদুকা, পদচিহ্ন ও তাঁর কন্যা ফতেমা বিবির রুমাল ও স্বহস্ত-রচিত আলোয়ান সকল রক্ষিত আছে। এই মসজিদে নাকি রণজিৎ সিংহ অস্ত্র-শস্ত্র রক্ষা করিতেন। মসজিদের পর শিখ-গুরু অর্জ্জন সিংহের সমাধি—এই সমাধি ঠিক রাভীর তীরে। অর্জ্জুন সিংহের সমাধির পর রণজিৎ সিংহের সমাধি—



শালিমার উদ্যান, লাহোর

আর এগুলির সামনে লাহোর দুর্গ। এই দুর্গে বহু প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্র সংরক্ষিত আছে। শুনা যায় এ দুর্গ অনঙ্গপালের আমলে নির্ম্মিত হয়। এখন এইখানে বৃটিশ সৈন্য বাস করিতেছে।

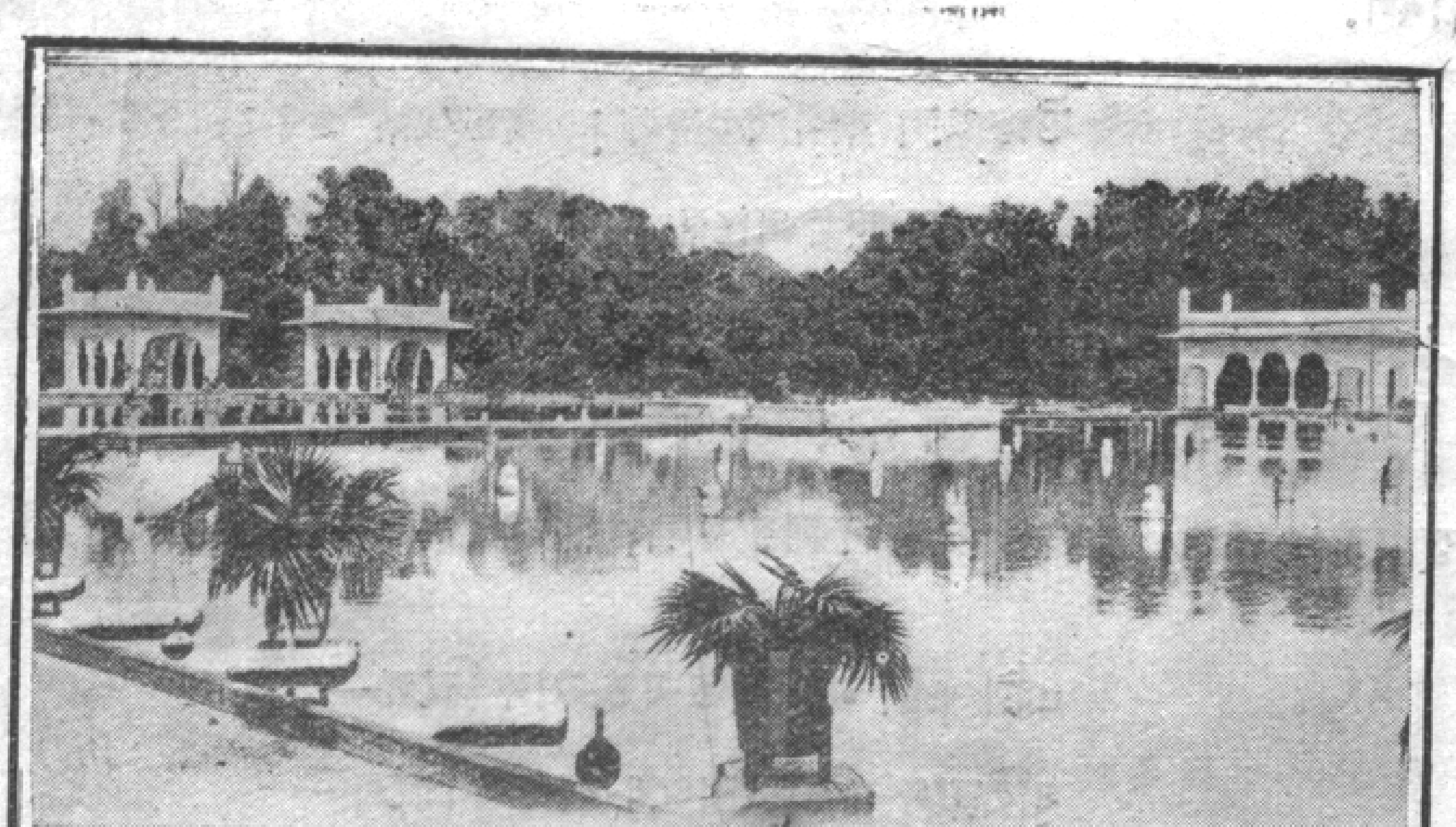
লাহোরে মসজিদের ন্যায় উদ্যানের সংখ্যাও বহু। তন্মধ্যে 'শালিমার-বাগ' ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এই উদ্যানের গা ঘেঁষিয়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে—এ পথ হাবড়ার সেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। সম্রাট শাহ্‌জহান্ শালিমার বাগ্ তৈয়ার করান্। শালিমার বাগে বাদশাহ বেগমদের লইয়া বাস করিতেন--তাঁদের আরাম-উপভোগের জন্য পাশা খেলার ঘর আছে। স্নানাগারের নল দিয়া ঠাণ্ডা ও গরম জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল—তা ছাড়া স্নানাগারে অসংখ্য চৌবাচ্ছা—কোনটিতে গোলাপ, কোনটিতে অন্য সুগন্ধি জল রক্ষিত হইত। এই আদি ও অকৃত্রিম শালিমার বাগের নকলে আর একটি আধুনিক শালিমার উদ্যান আছে—এই বাগে কমলা লেবুর অসংখ্য গাছ আছে। এটি স্থানীয় এক ধনীর সম্পত্তি। লাহোরে বাঙ্গালীরা এক কালী-বাড়ী তৈয়ার করাইয়াছেন। তাছাড়া এখানকার সহরের প্রধান শোভা ও সম্পত্তি যে বিদ্যালয়, কলেজ, লাহোরে তার সংখ্যা বড় অল্প নয়।



লাহোর চীফ্‌স্ কলেজ

একদিকে প্রাচীন হর্ম্ম্যরাজি, বিশাল ভবন, সমাধি- ভবন প্রাচীন মহিমার বিরাট স্মৃতি-স্তম্ভ, অপর দিকে আধুনিক সভ্যতার লীলাক্ষেত্র—পঞ্চনদকে সেকাল আর একালের বিচিত্র সঙ্গম-তীর্থে পরিণত করিয়াছে।

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।



শালিমার উদ্যান, লাহোর

শিশুর প্রতি কঙ্কাল

দুরন্ত শিশুর দল খুঁজি মোরে করিয়া বাহির
সুকুমার কঙ্কালে আমার টানি ফেরে কৌতুকে অধীর—
শ্বেতশুভ্র অস্থিগুলি এতদিন ছিল যা গোপনে অন্ধকারছায়
অগোচরে, ভাগ্যহতা সন্ন্যাসিনী প্রায়,
শতাব্দীর সূর্য্যচন্দ্র খুঁজিয়াছে যাদের বৃথায়,
একদা যা বায়ুসম পক্ষসম দুর্নিবার ছিল ওগো হায়!

দীর্ঘকাল ধরি দীর্ঘকেশ রচিয়াছে ধূলির জঞ্জাল
ছিঁড়ে ফেল সেই কেশজাল!
আঁখিকুক্ষি হতে মোর ধূলা ঝাড় ভাই,
নির্নিমেষ গভীর দৃষ্টিতে দিবসের পানে আমি তাকাইতে চাই
বিস্ফারিত হাসি হেরি অবাক বিস্ময়ে যবে হেরিবে আমায়,
ওষ্ঠাধর অভাবেতে বিস্ফারিত তাহা বুঝিবেনা হায়;—
স্থির হাসি ভয়ঙ্কর, নাহি তাহে কম্পনের লেশ,
চঞ্চলতা রেশ,
যেন এক হতভাগ্য ভাঁড় রসিকতা সব ভুলে গিয়ে
সহসা থামিয়া গেছে ফাঁপরে পড়িয়ে!

আমার এ জানুসন্ধি সকৌতুকে বাজাও গো তবে!
নারী নামে একদিন পরিচিত ছিনু আমি যবে
নৃত্যচ্ছন্দে ফিরিত তাহারা তরুপরে পল্লবের মত;
এবে হায় সেইদিন হইয়াছে গত!
সে দিন ছিল গো তারা পেলব মাংসের মাঝে কুসুমকোমল,
এ উৎকট শব্দে তবে করিত না শ্রবণে বিকল!

আজি এই উচ্চভূমি পরে
ফুটিয়াছে রক্তরাগ পুষ্প থরে থরে।
শুষ্কশীর্ণ কঙ্কালে আমার রাখিলে সেথায়—
নিটোল ও পরিপূর্ণ ছিল যে একদা পানাহারে সুস্বাদু সুরায়!
ধূলা খেয়ে কেবা বাঁচে প্রাণে?
অতি বড় মূঢ় সে-ও জানে
অতিদীর্ঘ বিরামের ফলে
পলে পলে
শীর্ণ হয় হৃষ্টপুষ্ট অলস যে জন
অচল যে রহে অনুখন।

কে বলিবে, কঙ্কালে রচিত খাঁচা নিশিদিন রেখেছিল ঢাকি—
যেন এক পাখী—
কামনায় ওতঃপ্রোত প্রাণ কমনীয়
অতি রমণীয়,
যার মাঝে স্পন্দিত ধমনী বাহি ছুটিত অস্থির
নদীসম রক্তিম রুধির!

আজি কে বলিবে হায়,
এই সে-ই, উচ্চশিরে যে চলিত আকাশের ছায়;
বাণী যার ছিল বেণুসম—ছিল যাহে পাপিয়ার মধু অফুরান—
রোষে যাহা গরজিত সিংহের সমান;
শান্ত যবে, ঘুঘুসম অতি সকরুণ!
চাঁদেরি-সুধায়-গড়া বুকে যার ছিল যুগ্মফল—অপূর্ব্ব তরুণ,
যার পরে পড়ি হেলে প্রেমিক সে নিবেদিত ভালবাসা তার
ভয়ে ভয়ে, নেহারি সে অতুলন সৌন্দর্য্য অপার!

রে অবোধ শিশুদল! তোমরা এখন
ধন্যবাদ নাহি দিয়া, অনুমতি না করি গ্রহণ
কর হট্টগোল, অস্থি দিয়া ঢোল বাজাও কৌতুকে
পরাইয়া দাও বন্যফুল মূকমৌন পাপিয়ার মুখে,
তারপর, ছিন্ন কর হেলাভরে পাঁচটি আঙুল
মনস্বিনী নারীহস্ত হতে—রহস্য-আকুল!

উচ্ছৃঙ্খল বালখিল্যদল! তোমরা এখন
ফুলদল মাঝে মোরে করিয়া স্থাপন
কর মোরে নমস্কার হাস্যকর সঙের মতন!
ব্যঙ্গ করে' বল সবে—নাম বল, বল নাম এই মানুষের,
ক্ষীণকায় কদাকার অস্থি-ফানুষের!

এটা ওটা নানামত যত নাম দিলে—
ধূলিম্লান কঙ্কালের যে-নাম করিলে—
মোর নাম কেহ নাহি বলিতে পারিলে!*

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* রচয়িত্রী মার্কিন কবি Rose O'neill

চয়ন

ম্যাজিক কার্পেট

আমেরিকার আকাশতত্ত্ববিদ্‌গণ সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন যে পৃথিবীর প্রায় ৭।৮ মাইল উর্দ্ধে শূন্যস্থল আছে, যেখানে অহরহ এমন বায়ু বহিতেছে, যার গতির বেগ ঘণ্টায় ৩০০ মাইল।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই শূন্যস্থলের বিচিত্র বায়ুমার্গটাকে কোনো কাজে খাটানো সম্ভব হয় কি না! অর্থাৎ এই বায়ু-মার্গে উড়ো-জাহাজ ছাড়িলে—যে উড়ো-জাহাজের গতি ঘণ্টায় ৯০ হইতে ১০০ মাইল করিয়া—সে জাহাজ আট ঘণ্টায় নিউ ইয়র্ক হইতে আরোহীদের লণ্ডনে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে।

এ যদি ঘটে, তাহা হইলে আরব্য উপন্যাসের ম্যাজিক কার্পেট বা যাদু-গালিচার গল্প আর গল্প থাকিবে না!

তবে এ ব্যাপার কাজে খাটাইতে গেলে একটা প্রশ্ন প্রথমেই মনে জাগে; সেটি এই—বায়ুর চাপে মানুষের নিশ্বাস লওয়া এবং উড়ো জাহাজের এঞ্জিনের পক্ষে চলা কতদূর সম্ভব হইবে?

তাঁরা বলেন, এ অসুবিধাও দূর করা সম্ভব। বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া খুব উঁচুতে উঠিবার জন্য সাধারণতঃ এঞ্জিনে অক্সিজেনের জন্য যে বিশেষ যন্ত্র লাগানো হয়, তাহার সুব্যবস্থা করিলে আরোহী বা এঞ্জিন কাহারো পক্ষে উপরের ঐ দমকা হাওয়ায় কোনরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধা ঘটিবে না। আমেরিকায় বৈজ্ঞানিকেরা এখন ঐ পথে উড়ো-জাহাজ ছাড়িবার চেষ্টা সত্যে পরিণত করিবার পক্ষে উদ্যোগ সুরু করিয়াছেন।

— রেণু দেবী

কৃত্রিম সূর্য্যালোক

লণ্ডনে সেণ্ট-টমাস্ হাসপাতালে বালক-বালিকাদের জীর্ণতা, গলনালী সংক্রান্ত রোগ ও হাড়-পাঁজরায় বিকৃতি প্রভৃতি রোগ এবং বয়স্কদের বহু ব্যাধি বিনা-ঔষধে বিনা অস্ত্রে কৃত্রিম সূর্য্যালোক দ্বারা আরোগ্য করা হইতেছে। সেখানকার ডাক্তার ম্যরে লিউ-ইক বলেন, আমরা সব সময়ে করিয়াছি—তাহাতে ফল সমানই পাইতেছি। কতকগুলি ল্যাম্পের সহিত মার্কারি-ভেপর (mercury-vapour) ল্যাম্প মিলাইয়া যে কোন স্থানে ইচ্ছামত আমরা কৃত্রিম সূর্য্যালোকের সৃষ্টি করিতেছি। এবং তাহার দ্বারা যখন যেমন ভাবে ইচ্ছা তেমনি ভাবেই রোগীর চিকিৎসা করিতেছি। যে-সব রোগী ধুঁকিতে ধুঁকিতে আসিয়া উপস্থিত হয়, ক্ষুধা নাই, ঘুম নাই—যাহাদের দেখিয়া মনে হয়, এখনই বুঝি তাদের প্রাণবায়ুটুকু বাহির হইয়া যাইবে, তাহারাও অনতিবিলম্বে এই কৃত্রিম সূর্য্যালোক-স্পর্শে সচেতন হইয়া ওঠে এবং বড়-জোর একমাসের নিয়মিত চিকিৎসায় তারা বাড়ী ফেরে একেবারে সুস্থ শরীর ও স্বচ্ছন্দ মন লইয়া। শরীর ও মন সম্বন্ধে তখন আর তাহাদের কাহারো কোন অনুযোগ থাকে না! সূর্য্যালোকের উপকারিতা আমাদের দেশে সেকালে সকলে বুঝিত খুব—কচি ছেলেমেয়েদের তেল মাখাইয়া সেকালে রৌদ্রে বেশ করিয়া তাপ দেওয়া হইত, তাই সেকালে মানুষের শরীরও মজবুত গড়িয়া উঠিত। একালে এসব ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়ায় শিশু-মৃত্যুর হার বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না তো। হাড় শক্ত করিতে ও রৌদ্র বা হিম সহ্য করাইতে সূর্য্যালোক যে খুবই সক্ষম, এ কথা আজ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের কথায় দেশের লোক আবার যদি হৃদয়ঙ্গম করেন, তবেই মঙ্গল।

— সৌম্যেন্দ্র

দেশের কাজে নারী

ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে দেশের শাসন-কার্য্যে নানা বিভাগে কত নারী কাজ করিতেছেন, সম্প্রতি তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। তালিকা হইতে দেখা যায়,—

সহর-সদস্যের পদে (town-councillors) আছেন, ২২৬ জন, কাউন্টি-সদস্য ৭০ জন। তদ্ভিন্ন মেট্রোপলিটান-বরোর কাউন্সিলরের সংখ্যা ১১৯; বোর্ড অব গার্জেন্স-এর সদস্য ২৩২৩ জন; গ্রামিক গার্জ্জনস্ ৩৫৩ জন। লর্ড-মেয়র একজন; মেয়র ৫ জন এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা ৮৯৫ জন।

ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!

কুষ্ঠ-ব্যাধির প্রতিষেধক

আমাদের যে-কোন তীর্থ বা মেলায় ভিড় জমিলে তথায় কুষ্ঠরোগীর প্রাচুর্য্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। এই রোগের প্রকোপ যে বাড়িয়া চলিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সহরের পথেও ভিখারীদের মধ্যে বহু কুষ্ঠরোগী আমরা দেখিতে পাই।

কুষ্ঠরোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে। তবে বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির মত ততটা ছোঁয়াচে নয়, তাই রক্ষা! নহিলে কুষ্ঠ-রোগ আজ দেশ ছাইয়া ফেলিত!

কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে এক গৃহে দীর্ঘকাল বাস করিলে এ রোগের কবলে পড়িতেই হইবে। এ রোগের ছোঁয়াচ লাগে বেশী করিয়া শিশুদের।

কুষ্ঠব্যাধির ঔষধ নাই বলিয়াই লোকের ধারণা। ঔষধ ছিল না, সত্য—সম্প্রতি প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঔষধ ছিল না বলিয়াই সমাজ ও আইন কুষ্ঠ-রোগীকে লোকালয় হইতে একরূপ নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াই আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

কুষ্ঠরোগীর যাতনার সীমা নাই। অনিদ্রা, অক্ষুধা, এ-সব তো আছেই— তা ছাড়া ক্ষতের যাতনা! দেহ হইতে মাংসগুলা ছিন্নভিন্ন হইয়া খসিয়া পড়ে; এবং আঙুল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই ক্ষতের বাড়ের সঙ্গে সঙ্গে খসিয়া রোগীকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করে। এমন সর্ব্বনেশে রোগ আর নাই—এ কথা বলিলে একটুও অত্যুক্তি হয় না।

গত সেনসাস্ রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা এক-লক্ষেরও উপর। রোগের সূত্রপাত হইলে পাছে অপরে ঘৃণা করে, এই ভয়ে রোগী রোগের কথা লুকাইয়া রাখে; কাজেই সে-সব রোগীর সংখ্যা কোন রকমেই ধরা যায় নাই।

মধ্যযুগে ইউরোপে কুষ্ঠরোগের প্রকোপ খুবই বাড়িয়াছিল—ইংলণ্ড, ফ্রান্স কুষ্ঠ রোগীতে ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে কুষ্ঠাশ্রম খুলিয়া রোগীদের সেইখানে আশ্রয় দেওয়া হইল,—যাহাতে অপরকে ছোঁয়াচ না লাগে, এই আশায়; এবং এই তফাৎ করিয়া দেওয়ায় রোগ আর ছড়াইতে পারে নাই। আইন-কানুনও ক্রমে তৈয়ার হইল—কুষ্ঠরোগীরা যাহাতে গোয়ালার কাজ করিতে বা খাবারের দোকান খুলিতে না পারে। কুষ্ঠরোগীকে এ সব কাজ করিতে দেখিলে তাহাদের শাস্তিরও ব্যবস্থা হইল। এই উপায়ে রোগটাকে এক বদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে রোগের পরিমাণ কমিয়া গেল, এবং নূতন আক্রমণও রুদ্ধ হইল।

এখানেও রোগীকে আশ্রমে রাখার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এবং আইনও পাশ হইয়াছে রোগীকে সামলাইয়া রাখিবার জন্য এ তো গেল রোগের প্রকোপ কমানো ও নূতন আক্রমণ হইতে মানুষকে রক্ষা করার কথা। রোগীকে আরোগ্য করা যায় কি করিয়া, তাহা লইয়া স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন বিভাগে নানা গবেষণা চলিল। গবেষণায় স্থির হইল, রোগীর চাই পুষ্টিকর আহার, বিশ্রাম, ব্যায়াম এবং মুক্ত বায়ুতে বসবাস! বয়স এবং রোগের ভোগকাল ধরিয়া এই ব্যবস্থা পালন করিতে হয়। ইহাতে আরোগ্য লাভ সুনিশ্চয় হইবে।

যক্ষারোগের ন্যায় কুষ্ঠরোগেরও শক্ত হইয়া দাঁড়াইতে কিছু সময় লাগে অর্থাৎ উভয় রোগের বীজাণুরই পূর্ণ-শক্তি-তেজ লাভে একটু দীর্ঘ সময় লাগে। রোগের সম্ভাবনা জাগিলেই বাড়ীর সকলের সঙ্গে রোগীর সঙ্গ ছাড়াইয়া একটু স্বতন্ত্রভাবে তাকে রাখা দরকার এবং রোগ না লুকাইয়া যদি মুক্ত বায়ুতে বাস, নিয়মিত ব্যায়াম ও পুষ্টিকর খাদ্যের দিকে নজর রাখিয়া রোগীকে পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, তবে সুরুতেই রোগ সারিবার সম্ভাবনা থাকে। রোগ বাড়িলে কুষ্ঠাশ্রমে গিয়া সেখানকার নিয়মাধীন থাকিয়া চিকিৎসা করানো কর্ত্তব্য। আশ্রমে এ রোগে মৃত্যুর হার এখন পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ২০ ভাগ কমিয়াছে—ইহা খুবই আশার কথা, সন্দেহ নাই।

— সুধীন্দ্র

কর্ণবেধ

মেয়েদের কাণ ফুঁড়িয়া মাকড়ি বা ইয়ারিং পরার রেওয়াজ আমাদের দেশে বহুদিন হইতে প্রচলিত; পুরুষদেরও কর্ণবেধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত। মেয়েরা সম্প্রতি পাশ্চাত্য আদর্শে কর্ণবেধ ব্যাপারটাকে বর্ব্বরতার চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেছেন।

বহু প্রাচীন জাতির মধ্যে কর্ণবেধের প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে কোনো কোনো জাতির মধ্যে এ ব্যাপার নৃশংসতার দিকে ঝোঁক দিয়াছিল, সন্দেহ নাই। বহু প্রাচীন যুগে পেরুতে প্রত্যেক বালককে কাণ বিঁধাইতে হইত—রাজ-বংশীয়েরা সোনার পিন্ দিয়া কাণ বিঁধিত। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য বালকের উপনয়নের সময় আজও সোনার কাঠি দিয়া কাণ বিঁধিয়া দেওয়া হয়। তাছাড়া রাজপুত প্রভৃতি উচ্চ জাতি-সমূহের মধ্যে এ প্রথা আজও প্রচলিত। যাঁরা বাইবেল পড়িয়াছেন তাঁরা জানেন, সেকালে দাসদের কাণ বিঁধিয়া দেওয়া হইত। এদেশে যে বালিকাদের কর্ণবেধ-প্রথা উঠিয়া যাইবার মত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া সম্প্রতি জনৈক পাশ্চাত্য লেখক লিখিয়াছেন, এ ঠিক হইতেছে না। কারণ তিনি এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে কর্ণবেধ করিলে মানুষের—তা কি পুরুষ, কি স্ত্রী—স্বাস্থ্য ভালো হয়, চোখের জল পড়া বন্ধ হয়, দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, বুদ্ধি খোলে, চিন্তাশক্তিও বিকাশ লাভ করে।

— সুজাতা দেবী

কালোকে সাদা

ব্রেজিলের কোন তরুণ যুবা বৈজ্ঞানিক কায়দায় গায়ের কালো রং শাদা করিবার এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। উপায়টী বিশেষ কঠিন নয়। একটী পাম্প দিয়া কোনলোকের হাত কিংবা পা হইতে রক্ত বাহির করিয়া লইয়া কতকগুলি রবারের নলে রাখা হয়। নলে করিয়াই রক্তকে উত্তপ্ত এবং অন্যান্য নানা প্রক্রিয়া দ্বারা শোধন করা হয়। পরে অন্য হাত-পা ফুঁড়িয়া ঐ রক্ত আবার পাম্প করিয়া শরীরের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। এ ভাবে একমাস সময়ের মধ্যেই কালো মানুষকে সাদা মানুষে পরিণত করা যায়। অর্থাৎ—রক্তের কালো কণাগুলি (বীজাণু) উঠাইয়া লইয়া উহার বদলে সাদা কণা মিশাইয়া দেওয়া হয়। ইন্দুরের রং বদলাইবার কালে পরীক্ষা হইয়াছিল এবং মাত্র পনের দিনের মধ্যেই একটী ইন্দুরের রং সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছিল।

— শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সব-চেয়ে বড় বোমা

সম্প্রতি আমেরিকার সামরিক বিভাগে এক রকম বোমা তৈয়ার করা হইয়াছে, যাহার মত বড় বোমা পৃথিবীর আর কোথাও প্রস্তুত হয় নাই। ইহার ওজন হইতেছে দুই হাজার সের। এই ভীষণ বোমাটী উড়ো-জাহাজে ব্যবহার করা হইবে।

গত যুদ্ধের সময় সব-চেয়ে বড় বোমা ওজনে ইহার অর্দ্ধেক ছিল। এই সর্ব্বনাশী বোমার মধ্যে অনেক রকম সূক্ষ্ম কল-কব্জা আছে। ইহার পলিতা দুইটী; একটী ব্যর্থ হইলেও অপরটী কার্য্য সাধন করিবে। ইহা এমন কৌশলে প্রস্তুত যে উড়ো জাহাজ হঠাৎ পড়িয়া গেলে বা কল না টিপিয়া আছড়াইয়া ফেলিলেও ইহা কিছুতেই ফাটিয়া যাইবে না। হাওয়া কাটিয়া যাহাতে ঠিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়া পৌছিতে পারে, সেজন্য বোমার গায়ে চারখানা ইস্পাতের পাখনা লাগানো আছে। এই বোমাটীকে মাটিতে দাঁড় করাইয়া রাখিলে খুব ঢ্যাঙ্গা লোকও হাত বাড়াইয়া তাহার চূড়া ছুঁইতে পারিবে না—কারণ উচ্চতায় এই বোমা সাড়ে তেরো ফুট, বেড় দুই ফুট। বোমার গহ্বরটী এত বড় যে তাহার মধ্যে বারুদ ঠাসিতে সময় লাগে পুরা এক সপ্তাহ। বারুদ ঠাসার পরও বোমাটী ঠাণ্ডা হইতে চারদিন সময় লাগে। ছোড়া হইলে বোমাটী যেখানে পড়িবে সেখানে একটী পঁয়ষট্টি-ফুট গোল ও উনিশ ফুট গভীর গহ্বর রচিয়া উঠিবে এবং সেই গর্ত্তের চারিদিকে মাটী জমা হইবে পাঁচ ফুট উঁচু। অদ্যাবধি কোন বোমা বা কামানের গোলা মাটীর ভিতরে এত বড় গহ্বর খুঁড়িতে পারে নাই।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

কর্ম্মবীর লেনিন্

রাশিয়ার প্রজাতন্ত্র যাঁর প্রভাবে জাগিয়া রাশিয়াকে দারুণ দুর্দ্দিনের কবল হইতে রক্ষা করিয়া তার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, রাশিয়ার সেই জন-গণ-মন-অধিনায়ক কর্ম্মবীর ভ্লাডিমির লেনিন আর ইহলোকে নাই! তাঁহাকে হারাইয়া রাশিয়া তার গগন-সূর্য্য হারাইল!



লেনিন্।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ১০ই এপ্রিল তারিখে এক কৃষাণের ঘরে লেনিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজদ্রোহের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। লেনিনের বয়স তখন ১৭ বৎসর। তিনি তখন কাজান্ ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র; এ ঘটনায় তাঁকে ইউনিভার্সিটি ছাড়িতে হয় এবং বিপ্লবকারীদের সহিত সম্পর্ক থাকার দরুণ সেন্ট-পিটাসবার্গ হইতেও তাঁকে নির্ব্বাসিত করা হয়। সেন্টপিটার্সবর্গে তিনি আইন পাশ করিয়াছিলেন।

তারপর ১৯০৫ খৃঃ অব্দে লেনিন আবার আসিয়া সেন্ট-পিটার্সবর্গে উদয় হইলেন; কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না বলিয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আবার তিনি চলিয়া যান। তারপর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আবার তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন তিনি গণতন্ত্র সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। বিগত মহাযুদ্ধে কেরেনস্কির পতনের পরই তাঁর সাধনার ফল তিনি লাভ করিলেন—রাশিয়ায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। উদার সহানুভূতি আর বিরাট ত্যাগেই তাঁর এ তপস্যা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। আপনার পানে কখনো তিনি চাহিয়া দেখেন নাই—সভিয়েট-রাজ্য-স্থাপনে তাঁর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ছিল অসাধারণ। তিনি বলিতেন, দেশের অবস্থার সহিত নিজের জীবন মিলাইয়া না চলিলে দেশের সত্ত্বালাভ করা যায় না। রাশিয়ার মুক্তিই ছিল তাঁর ইষ্ট-মন্ত্র এবং এই মন্ত্রের সাধনায় তিনি লক্ষ বিপদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কত ভ্রূকুটী সহ্য করিয়াছেন। একবার কৃষকের দলই তাঁকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়; তিনি তাহাদের সম্মুখে গিয়া বুক পাতিয়া বলেন,—এই আমি তোমাদের সামনে, আমায় হত্যা কর।

দেশই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, কর্ম্ম। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যে তাঁর ধ্যানের রাশিয়াকে জাগ্রত দেখিয়াছেন, এই পরিতৃপ্তি বুকে লইয়াই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, দেশপ্রাণ মহাত্মার পক্ষে ইহার চেয়ে কাম্য আর কি থাকিতে পারে! তাঁর আত্মা বিশ্বে শান্তি, কল্যাণ ও আনন্দের সৃষ্টি করিয়া পরিতৃপ্ত হোক্।

সমালোচনা

কমলাকান্তের পত্র।—প্রকাশক, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় এম, এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর, সাধনা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত যদি একটা মানুষ হতো তো এতকাল ধরে সে বেঁচে থাকতেই পারতো না—কিন্তু সে নাকি একটা ধুমকেতুর মতো, তাই থেকে থেকে আসে এবং চলে যায় পৃথিবীর গায়ে আলোর ঝাঁটা বুলিয়ে দিয়ে। বঙ্কিমের যুগে এই ঝাঁটা একবার এদেশের উপরে পড়ে ছিল। এখন এযুগের পালা, তাই ঝাঁটা আবার এসেছে। শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে নতুন যুগের নতুন পাতা বা খাতা খুল্লেন চারুবাবুর কমলাকান্ত। এজন্যে অল্প লোকের কাছেই ধন্যবাদ পাবেন তিনি, কিন্তু ঝাঁটার দৌলতে চারুবাবুকে প্রায় সকলের কাছেই গালাগালি সইতে হবে এটা দেখতে পাচ্ছি। যারা—'উলঙ্গ সত্য' বলে কথাটা সহজে মুখ থেকে বার করে কিন্তু কথার উলঙ্গতাকে একেবারেই মার্জ্জনা করতে রাজি নয় তারা পত্রের ভাষার খুঁৎ ধরবেই ধরবে—এবং তাই ধরেই থাকবে, ভাবটা ধরবার দিকেও যাবে না। কমলাকান্তের পত্র কথানার আগাগোড়াই উলঙ্গ এবং সত্য; অতএব সত্যটা পরিত্যাগ করে উলঙ্গতারই সমালোচনা করবে কাগজওয়ালারা এবং যারা রুচিবাগীশ তারা। কমলাকান্ত এক মাত্রা আফিং এবং এক পোয়া ঘন দুধ এই নিয়েই থাকবে, বই বেচে পয়সা পাবে না নিশ্চয়—এটা যে উলঙ্গ সত্য তা বইটা পড়লেই সকলে বুঝবে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—

বেদবাণী।—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স্, ৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য তিন টাকা। এই গ্রন্থখানিতে খুব সহজ ভাষায় সরলভাবে ঋগ্বেদে যত রকমের দেবতা, দেবতাত্মা বস্তু ও অন্যান্য বিষয়ের সূক্ত আছে সেই সকলের বিশদ পরিচয় বিবৃত হইয়াছে; দুই তিনটি বিষয়—যেমন রোগ-প্রতিকার ও গর্ভরক্ষার মন্ত্র প্রভৃতির বিশদ পরিচয় দেওয়া হয় নাই, তবে সেই-সব 'মন্ত্রের প্রাপ্তিস্থান নির্দ্দেশ' করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের সম্বন্ধে যতগুলি গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলির বিভিন্ন পাঠ অনুধাবন করিয়াই এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ পৃথিবীর মানব-সমাজের প্রাচীনতম গ্রন্থ। সেই গ্রন্থের এমন বিশদ পরিচয় একখানি গ্রন্থে এমন সহজ করিয়া পূর্ব্বে কোথাও দেওয়া হয় নাই। এ গ্রন্থখানি বাঙলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। গ্রন্থের ভাষা ও রচনাপ্রণালী এমন সরল ও প্রাঞ্জল যে অতখানি পাণ্ডিত্য-ভরা বই উপন্যাসের ন্যায়ই মধুর মনোরম হইয়াছে। এ গ্রন্থ পাঠ করিলে সেকালের সভ্যতার কথা, সমাজের নানা দিকের ইতিহাস, সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিশদ পরিচয়, এমন কি সংসারের খুটিনাটি নিয়ম-কানুনগুলিরও সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। সেকালের সভ্যতার একটা গোটা ছবি চমৎকার প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

—

দোলন-চাঁপা।—শ্রীযুক্ত কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনরেশচন্দ্র গুহ, বি, এ, আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা চেরী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। এই তরুণ কবির রচনার যা প্রধান গুণ, ছন্দের দোদুল লীলা, ভাবের বাঁধন-হারা চপল উল্লাস-প্রবাহ, ভাষার রঙীন ফুলঝুরি, সে-সমস্তই এ গ্রন্থের কবিতাগুলিতে আছে। ছন্দের বৈচিত্র্যে কবিতাগুলি এমন উপভোগ্য যে একটির পর অপরটি বিদ্যুতের মত প্রাণ-মনের উপর দিয়া চকিত নৃত্যে ছুটিয়া যায়। কবিতাগুলির সর্ব্বত্রই বাহিরের মুক্তির ডাকে বাঁধন কাটিবার এক দুরন্ত আগ্রহ এমন তেজে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, যা কেবল পরিণত মনই উপভোগ করিতে পারে। ভাবের ঐশ্বর্য্যে কবির অন্তর ভরপুর—এবং সে ভাব প্রকাশের শক্তিও তাঁর অসাধারণ। দোলন-চাঁপার শোভায় গন্ধে বাণীদেবীর চরণ-শ্রী সমুজ্জ্বল হইবে এ কথা অবিসম্বাদী সত্য। বহিখানির ছাপা কাগজ বাঁধাইও উৎকৃষ্ট।

—

স্বরাজের পথে।—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীরামেশ্বর দে। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য লিখিত দেখিলাম না। এই গ্রন্থে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত যুগের কথা, নেশনের মূল্য, স্বদেশী ও বিদেশী, ইউরোপের দান, মহাযুদ্ধের শিক্ষা, স্বরাজ ও স্বারাজ্য, সমষ্টি পুরুষ, চাই স্বরাজ্য, অন্তরাত্মার ফল এবং বর্ত্তমানের সমস্যা—এই দশটি সন্দর্ভ সংগৃহীত হইয়াছে। এই তরুণ লেখক অল্পকালমধ্যেই এমন অপূর্ব্ব চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন যে তাঁর রচনা দেশের নানা ব্যাপারে বহু পাঠককে চিন্তার প্রচুর খোরাক জোগায়। এই সন্দর্ভগুলিতে তিনি খুব নিপুণভাবে আমাদের মনের অলিতে-গলিতে যে সব ত্রুটি আছে, সেগুলির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কি করিয়া সে ত্রুটি সারিয়া লইয়া আমরা আবার মানুষ হইতে পারি, তাহারও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সন্দর্ভ-গুলিতে পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার সঙ্গে স্বদেশ-প্রাণতার যে পরিচয়

পাই, তাহা উঁচু দরের। কোনরূপ metaphysical speculation বা utopian theory না খাড়া করিয়া তিনি কঠিন নির্ম্মম সত্য লইয়াই সমাজের ও লোকজনের মাপ করিয়াছেন এবং ত্রুটি বিচ্যুতি সারিয়া লইলে আমরা খাঁটী যে বস্তু লাভ করিব, তাহারও আভাষ দিয়াছেন। এই Practical সত্য লইয়াই তাঁর কারবার—বাজে জলুষ দিয়া ফলটাকে তিনি বকাণ্ড-প্রত্যাশার সামগ্রী গড়িয়া তোলেন না,—এইটুকুই তাঁর চিন্তার বিশেষত্ব।

—

শিখ-পরিচয়।—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বি, এ, প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্র ভাণ্ডার, গোন্দল পাড়া, চন্দননগর। বিপ্র প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় শিখগুরুগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহজ ভাষায় কাহিনীচ্ছলে বিবৃত হইয়াছে।

—

কবির স্বপ্ন।—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস প্রণীত। পাবনা রজনীকান্ত পুস্তকাগার হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সাথী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। রবীন্দ্রনাথের খেয়া কাব্যের আলোচনা করিয়া এই সন্দর্ভটি লিখিত। লেখায় চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতা আছে।

—

মনুষ্যত্ব লাভ।—প্রণেতা শ্রীসত্যাশ্রয়ী। প্রকাশক, শ্রীপঞ্চানন মিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পাবনা, হিমাইতপুর সরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। পারিপার্শ্বিক নানা অবস্থার মধ্য দিয়া কি-ভাবে জীবন যাপন করিতে পারিলে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ হইতে পারে এ গ্রন্থে কয়েকটি অধ্যায়ে লেখক তাহারি আলোচনা করিয়াছেন। জ্ঞানে কর্ম্মে, আচারে ব্যবহারে, আহারে বিহারে মানুষ কিরূপ সংযত হইবে, জগৎবরেণ্য বুদ্ধ যীশু কবীর লুথার প্রভৃতির জীবনাদর্শের সঙ্গে তাহার আলোচনা করিয়া লেখক বলিয়াছেন, প্রেমচর্চ্চাই মানুষের প্রধান লক্ষ্য হইবে—সকল সমস্যায় সমাধান প্রেমে। প্রেমিক অলস নহে, অকর্ম্মণ্য নহে, অনভিজ্ঞ অদূরদর্শী কলাকৌশলহীন নহে,—প্রেমিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সত্যের নির্ম্মল মূর্ত্তি। প্রেমের সাধনা কর—প্রেমিক হও।

—

শান্তি।—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। কয়েকটি গান ও খণ্ড কবিতার সংগ্রহ। "দেশে বিদেশে সংসারে দুঃখশোকে কণ্টকের আঘাতে অন্তঃস্থল যখন ক্ষতবিক্ষত হইবার উপক্রম হইত, তখন এই সকল কবিতা লিখিয়া" লেখক প্রাণে শান্তি লাভ করিতেন। 'তাই ইহার নাম শান্তি'। এ গ্রন্থে এমন বিষয় নাই, যার উপর লেখক কবিতা লিখিতে ছাড়িয়াছেন। ব্রাহ্মসভার হাসপাতাল একটি গান—অবশ্য আধ্যাত্মিক। লেখক গাহিয়াছেন,—

রাজাবাবু সিবিল সার্জ্জন ;
এসিষ্টাণ্ট দেবেন্দ্র হন্ রে ;
নেটিব রামচন্দ্র আর কেশব
আনন্দ যে কম্পাউণ্ডার রে।
রাজাবাবুর সুযশ ভাল ;
কতশত রোগী ছিল রে—
তাদের বিষম জ্বর ছেড়ে গেল
একটী মিক্‌স্‌চারে।"

—

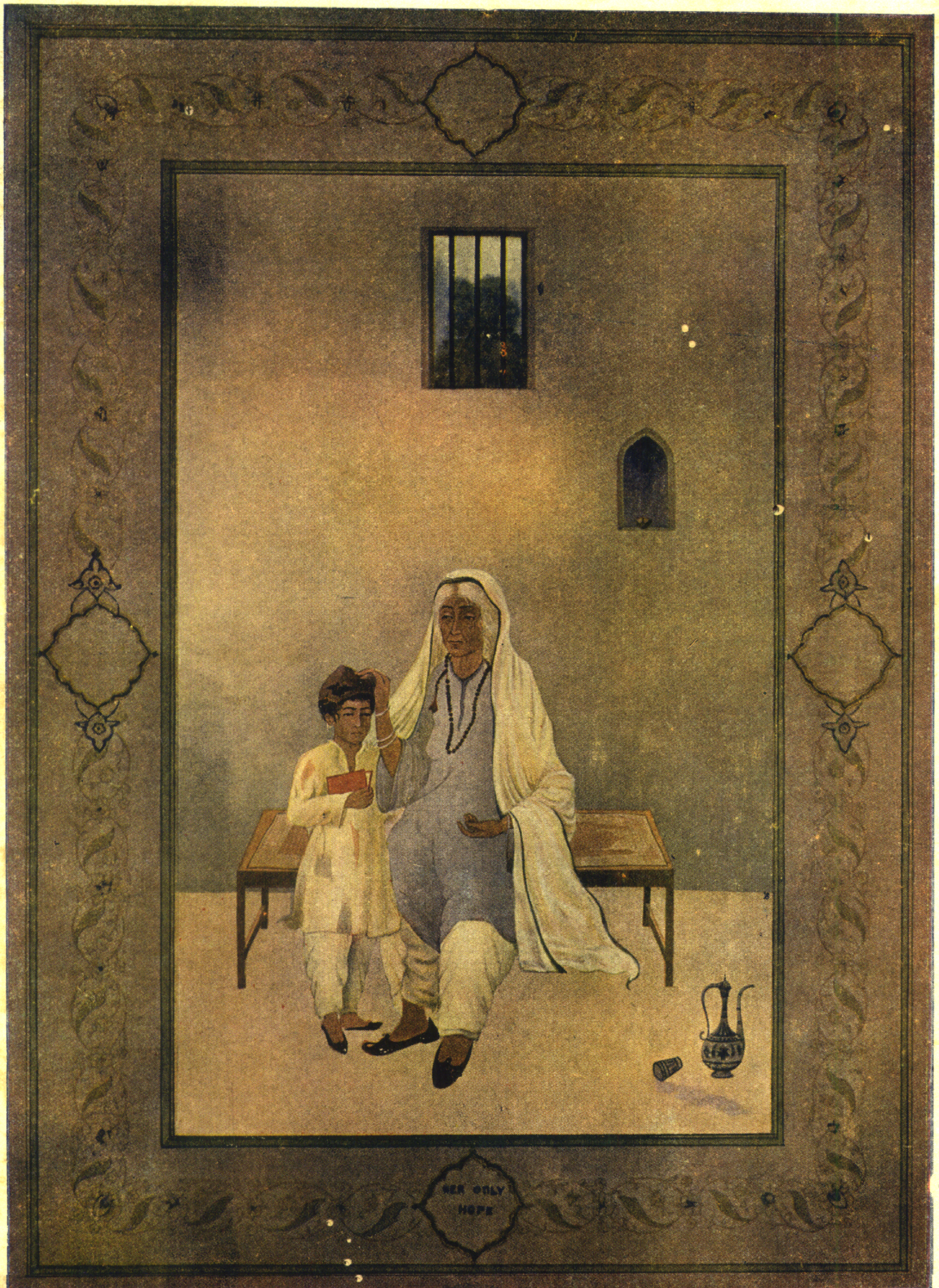
প্রতিভা। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ প্রণীত,। চন্দননগর পুস্তকাগার হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা, প্রতিভা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি নাটক। 'সংসার রঙ্গক্ষেত্রে সচরাচর যে-সব অভিনয় দেখা যায় তাহারই একটা অপরিস্ফুট অঙ্ক' এই নাটকে লেখক "ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ঘটনার তরঙ্গে নাটকখানিতে উদ্দেশ্য এত ফেনাইয়া উঠিয়াছে যে ইহার গভীরতার পরিমাপ করা একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। তায় উপর নাটকখানিতে এত অসম্ভব ব্যাপারের সমাবেশ আছে যে পাঠকের তাক্ লাগিয়া যায়, এ কোন্ দেশের কাহিনী পড়িতেছি। তা ছাড়া রচনায় মোটেই কোন কৌশল নাই। এত চেষ্টাতেও বইখানির কোথাও এতটুকু নাটক গড়িয়া ওঠে নাই।

—

ঐশ্বর্য্য।—শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ বিশ্বাস প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। সিদ্ধেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এখানি উপন্যাস। উপন্যাসের মর্ম্মকথাটুকু উপভোগ্য—তবে তাহা বুঝাইতে গিয়া প্লটে লেখক অনেকখানি জটিলতার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। ঘটনা-সংস্থানের প্রাচুর্য্যে পাঠকের মন মাঝে মাঝে হাঁপাইয়া ওঠে। লেখকের রচনাভঙ্গী ভালো ; কয়েকটি চরিত্রও স্বভাব-সঙ্গতরূপে ফুটিয়াছে মন্দ নয়—তবে সম্ভবে অসম্ভবে মিশিয়া ঘটনার সূত্র মাঝে মাঝে এমন বে-রঙা বে-কায়দা হইয়া পড়িয়াছে যে সেই খুঁতে উপন্যাসের প্রাণ-বস্তুটিও চাপা পড়িতে চায়। মাঝে মাঝে পল্লীর ঘাটবাটের ছবি বেশ ফুটিয়াছে। দোষেগুণে জড়িত হইলেও উপন্যাসখানি নেহাৎ অপাঠ্য হয় নাই।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



শেষ-অবলম্বন

ভারতী

৪৭শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৩০ { দ্বাদশ সংখ্যা

উৎসবের বাঁশি

ভয় নিত্য জেগে আছে
প্রেমের শিয়র কাছে,
মিলন-সুখের বক্ষোমাঝে।
আনন্দের হৃৎস্পন্দনে
আন্দোলিছে ক্ষণে-ক্ষণে
বেদনার রুদ্র দেবতা যে!
তাই আজ উৎসবের ভোর-বেলা হ'তে
বাষ্পাকুল অরুণের করুণ আলোতে
উল্লাস কল্লোলতলে ভৈরবী রাগিণী কেঁদে বাজে
মিলন-সুখের বক্ষোমাঝে।

নবীন পল্লবপুটে
মর্ম্মরি' মর্ম্মরি' উঠে
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস;
উষার সীমন্তে লেখা
উদয়-সিন্দুর-রেখা
মনে আনে সন্ধ্যার আকাশ।
আম্রের মুকুলগন্ধে ব্যাকুল কি সুর
অরণ্য-ছায়ার হিয়া করিছে বিধুর;
অশ্রুর অশ্রুত-ধ্বনি ফাল্গুনের মর্ম্মে করে বাস,
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস।

দিগন্তের স্বর্ণদ্বারে
কতবার বারেবারে
এসেছিল সৌভাগ্য-লগন।
আশার লাবণ্যভরা
জেগেছিল বসুন্ধরা,
হেসেছিল প্রভাত-গগন।
কত না উৎসুক বুকে পথপানে ধাওয়া,
কত না চকিত চক্ষে প্রতীক্ষার চাওয়া
বারেবারে বসন্তেরে করেছিল চাঞ্চল্যে-মগন,
এসেছিল সৌভাগ্য-লগন।

আজ উৎসবের সুরে
তারা মরে ঘুরে ঘুরে,
বাতাসেরে করে যে উদাস।
তাদের পরশ পায়,
কি মায়াতে ভরে যায়
প্রভাতের স্নিগ্ধ অবকাশ!
তাদের চমক লাগে চম্পক-শাখায়,
কাঁপে তারা মৌমাছির গুঞ্জিত পাতায়,
সেতারের তারে তারে মূর্চ্ছনায় তাদের আভাস
বাতাসেরে করিল উদাস।

কালস্রোতে এ অকূলে
আলোচ্ছায়া দুলে দুলে
চলে নিত্য অজানার টানে।
বাঁশি কেন রহি' রহি'
সে আহ্বান আনে বহি'
আজি এই উল্লাসের গানে?
চঞ্চলেরে শুনাইছে স্তব্ধতার ভাষা,
যা'র রাত্রি-নীড়ে আসে যত শঙ্কা আশা।
বাঁশি কেন প্রশ্ন করে, "বিশ্ব কোন্ অন্তরের পানে
চলে নিত্য অজানার টানে?"

যায় যাক্, যায় যাক্,
আসুক দূরের ডাক,
যাক্ ছিঁড়ে সকল বন্ধন!
চলার সংঘাত-বেগে
সঙ্গীত উঠুক জেগে
আকাশের হৃদয়-নন্দন।
মুহূর্তের নৃত্যচ্ছন্দে ক্ষণিকের দল
যাক্ পথে মত্ত হয়ে বাজায়ে মাদল;
অনিত্যের স্রোত বেয়ে যাক্ ভেসে হাসি ও ক্রন্দন,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাব্‌লা

২০

পাঁচ দিন পরে শৈল সারিয়া স্নান করিয়া উঠিলে বাবলা তার এতদিনকার রুদ্ধ আবেগকে এক নিমেষে উৎসারিত করিয়া মাকে একেবারে আকুল করিয়া তুলিল। মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মাকে দলিয়া পিষিয়া সে এমন কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল যে শৈল হাসিয়া বলিল,—ওরে থাম্ রে পাগলা ছেলে, করিস কি? আমায় চট্‌কে মেরে ফেল্‌বি যে!

বাবলা বলিল,—না মা, আমায় বড্ড ভালো লাগছে মা—কিছু বলো না মা, আমাকে। একটু খেলা কর্‌তে দাও মা আমায় তোমায় নিয়ে...

শৈল বলিল,—আমায় কি ময়দা পেয়েছিস্ রে যে যেমন-খুসী ঠাস্‌চিস্, চটকাচ্ছিস্!...

বাবলা মাথা ঝাঁকানি দিয়া বলিল,—হ্যাঁ মা, তুমি ময়দাই!

কিন্তু তার পরেই সেই সঙ্গীন মুহূর্ত্ত আসিয়া উদয় হইল। বেলা সাড়ে নয়টা বাজিতে মা বলিল,—এইবার গিয়ে নেয়ে নাও বাবা, ইস্কুলে যেতে হবে তো!

ইস্কুল! সেই কারা-কক্ষ!...এতদিন মার এই অসুখের আড়ালে বন্ধনহীন মুক্ত হাওয়ায় গা ভাসাইয়া বাবলা কি আরামেই ছিল! ঘড়ি ধরিয়া খাওয়া-দাওয়ার পাট ছিল না—ঘরের চৌকাঠে বসিয়া মার পানে চাহিয়া থাকিত—আশে-পাশে সকালের স্নিগ্ধ রৌদ্রের ঝলক কখন যে তপ্ত ঝাঁজে ফুটিয়া উঠিত, সে গিয়া স্নান করিত, তারপর এই ঘরের সামনে বসিয়াই ভাত খাইত—খাইতে খাইতে কত ছলে ফিরিয়া-ঘুরিয়া মার সঙ্গে কত কথাই যে কহিত,—আবার খাওয়া সারিয়া এই দোর চাপিয়াই পড়িয়া থাকিত! দুপুরের তপ্ত রৌদ্রের উপর অপরাহ্ণের ম্লান ছায়া ঝরিয়া নামিয়া আসিত—সেও ছুটিত রাস্তায় নালুর কাছে! সেখানে সেই ভিড়ের ঝাপটার মাঝে কাগজ লইয়া ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি—কি যে মুক্তির আভাষ চারিদিকে ফুটিয়া উঠিত—সে এক নূতন জীবন! আজ সে জীবনের পরে ছেদ টানিয়া দিয়া আবার তাকে সেই বাঁধা-ধরা গণ্ডীর মধ্যে চলিতে হইবে—সেই পথ, সেই ভিড়, সেই সঙ্গী, সেই মাষ্টার, সেই স্কুল—অসহ্য!

বাবলা বলিল,—আমি ইস্কুলে যাব না মা।

শৈল বলিল,—ইস্কুলে যাবি না কি রে! মুখ্যু হয়ে থাকবি!

বাবলা বলিল,—মুখ্যু হব কেন! ঢের পড়া তো শিখেছি—কত বই পড়তে পারি আমি...

শৈল বলিল,—ওকে কি পড়া বলে। ছি, ইস্কুলে যাবে বৈ কি বাবা—পাশ করবে, কত প্রাইজ পাবে, কত বিদ্যা শিখে ফেলবে, কত টাকা রোজগার করবে—গাড়ী-ঘোড়া চড়বে...সে কি সুখ হবে আমার, বল দিকি। যাদের কিছু নেই, কেউ নেই, সেই-সব গরীব-দুঃখীকে খেতে পরতে দেবে...

বাবলা বলিল,—মামা তো কত পয়সা আনে কাগজ বেচে! আমিও কাগজ বেচবো মামার সঙ্গে।

শৈল বলিল,—না বাবা, কাগজ বেচে কত পয়সা হয়! মামার কত কষ্ট, বল দিকি! সকাল হলেই চলে যায়—একবারটি এসে দুটী খেয়েই আবার ছোটে, তারপর সেই কত রাত্রে বাড়ী ফেরে! আহা, বাছারে...

বাবলা বলিল,—আমার বেশী পয়সার দরকার কি মা! তুমি আর আমি - কাগজ বেচে যা পাওয়া যাবে, তাতে খুব চলে যাবে। এই তো মামা আর ঠাকুমা—ওদের তো চলে যাচ্ছে...

শৈল বলিল,—বড় হলে বৌ আসবে যখন, তাকে তাকে গয়না দিতে হবে না? না হলে শাশুড়ী মেরে পিঠ ভেঙ্গে দেবে যে! তখন··?

বৌয়ের কথায় লজ্জায় লাল হইয়া বাবলা বলিয়া উঠিল,—ধেৎ! বৌ আবার কি! বিয়ে করছি কি না আমি! বয়ে গেছে আমার বিয়ে করতে!

শৈল বলিল,—তাই ভালো, বিয়ে করিস্ নে, ইস্কুলে যাবার ভয়ে বৌ আনিস্ নে...

এমন সময় ভগবতী আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইলেন, হাতে তাঁর এক বাটি দুধ। ভগবতী বলিলেন,—দুধটুকু খেয়ে নাও তো বৌমা...

শৈল বলিল,—কেন মা, তুমি আবার এ সব কাণ্ড করতে গেলে! দুধ কি হবে! আমি এখন সেরে উঠেছি—ভাত হলে দুটী ভাত খাব। দুধ আর কেন, কচি খুকীর মত?

ভগবতী মুহূর্ত্তের জন্য শৈলর মুখের উপর দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন,—তোমার চেহারা যা হয়েছে—

সত্যই শৈল এ কয় দিনে একেবারে এমন রোগা হইয়া গিয়াছে যে তাকে দেখিলে প্রাণটা তখনই কাতর হইয়া বলিয়া ওঠে, আহা! গলার নীচে হাড়-পাঁজরা ঝিঁকের মত উঠিয়া পড়িয়াছে, চোখের কোলে কালো দাগ,—তাকে দেখিলে মনে হয় কোন মতে একটা প্রবল শক্তির আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সে পলাইয়া বাঁচিয়াছে!

শৈল বলিল,—আর্শীর পাট তো বহুদিন উঠিয়ে দিছি মা—আজ ক'বচ্ছর আর্শী কেমন, তা চোখেও দেখিনি!... চেহারা? শৈল একটা নিশ্বাস ফেলিল; পরে একটু থামিয়া বলিল,—চেহারা যাই হোক, তেমন কাহিল হইনি কিন্তু আমি!

ভগবতী বলিলেন,—তা না হও, এ দুধটুকু খেতে হবে তোমায়!

শৈল নিঃশব্দে দুধের বাটি মুখে তুলিল।

ভগবতী বলিলেন,—আমার বাবলা-ধনের কি হচ্ছে গা? এবার ওঠো, উঠে চানটান কর—ইস্কুলের বেলা হয়ে যাবে যে...

শৈল দুধটুকু পান করিয়া বাটিটা এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিল,—সেই কথাই হচ্ছিল। ও ইস্কুলে যাবে না, মামার সঙ্গে কাগজ বিক্রী করবে। পয়সা রোজগার করতে চায় ওরা দুজনে মিলে, মামাতে আর ওতে।

ভগবতী হাসিয়া বলিলেন,—বটে, বৌ আসছে না কি রে! তাড়াতাড়ি রোজগারের কথা ভাবছিস...

বাবলা বলিল,—বারে, মামার কি বিয়ে হয়েছে না কি? মামা তো পড়া ছেড়ে কাগজ বিক্রী করছে...

ভগবতী বলিলেন,—মামার কথা আলাদা! সে পড়া পারছিল না ভালো—তাই! তা নালু কি বলে, জানো বৌমা? সে বলে, পিসিমা, আমার পড়াশোনা হলো না, কি করবো! তা আমি পয়সা রোজগার করি, বাবলা লেখাপড়া শিখুক। লেখাপড়া শিখে ও খুব বড়লোক হোক্—সে বেশ হবে! বাবলা কত পাশ-টাশ করবে—তার পাশের খবর আমার কাগজে ছেপে দিয়ে বিক্রী করবো যখন...এ কথা বলবার সময় তার মুখে যেন খই ফোটে।

বাবলা বলিয়া উঠিল,—তা নৈ কি! তা কক্‌খনো হবে না। মামা বেশ পথে পথে কাগজ বিক্রী করবে, আর আমি বুঝি একলাটি ঘরে বসে বসে পড়বো আর ইস্কুলে যাব—বাবাঃ, ত্রাহিবাবু স্তরের যা চোখ-রাঙানি...! তা হবে না। আমি আর ইস্কুলে যাব না! আমি মামার কাছে যাব আজই, খেয়ে-দেয়ে। পথে কেমন মজা, কত লোক কাগজ কেনে, পয়সা দেয়...

ভগবতী বলিলেন,—এ তো তোমার ভারী আশ্চর্য্যি কথা, দাদা! লেখাপড়া করবে না কি! আর বছর কেমন প্রাইজের বই পেয়েছে···পড়বে না কি?

বাবলা বলিল,—তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুমা, আমায় ইস্কুলে পাঠিয়ো না আর—কাজ নেই আমার পাশ করে বড় লোক হয়ে। আমার ভালো লাগে না। যখন খুসী বাড়ী এসে তোমাদের দেখে যাব, তা, না, ইস্কুলে বন্ধ থাকা ভালো লাগে না।···তার চেয়ে দুজনে মিলে যদি অনেক অনেক কাগজ বিক্রী করি, তাহলে কত পয়সা হবে, দেখো, মামাতে আর আমাতে মিলে এই এত-এত কাগজ বিক্রী করবো—কত পয়সা চাও তুমি, নিয়ো!

ভগবতী হাসিয়া বলিলেন,—বয়ে গেছে আমার তোদের দুজনের পয়সা নিতে!...আমার তো আর কাজ নেই,তোদের কাগজ-বেচা পয়সায় খেতে হবে! কথা ভাখো না, সব!

বাবলাকে সেদিন কোনমতেই স্কুলে পাঠানো গেল না! স্কুলের কথা মনে হইলেই বাবলার মনে হয়, এই অবাধ মুক্তি ছাড়িয়া সেই দেওয়ালে-ঘেরা একটা বড় কুঠরির মধ্যে নিজেকে বন্দী রাখো! সেখানে ঘড়ি ধরিয়া একবার এ-বই খোলো, পরক্ষণে ও-বইটা দেখো—খানিক লেখা, তারপর আবার পড়া...ইহার মধ্যে বৈচিত্র্য মোটেই নাই—একেবারে তিক্ত, একেবারে নীরস!...সে কথা মনে হইলে সারা প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে, বুক যেন কে চাপিয়া ধরে!...তার চেয়ে ঐ পথে নালুর সঙ্গে কাগজের বস্তা লইয়া ছুটাছুটি,—ফাঁকা রাস্তা—গাড়ী-ঘোড়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ট্রাম চলিয়াছে, বিচিত্র লীলায় লীলায়িত বিচিত্র জন-তরঙ্গ···মুখে-চোখে বিদ্যুতের রেখা ফুটাইয়া চলিয়াছে,—কেবলি সব চলিয়াছে—অসীমের পথ লক্ষ্য করিয়া যে তাদের সে অবিরাম চলা... ঘর-বাড়ীর কোন বাঁধন নাই! কেবলি মুক্তির পথ ধরিয়া চলিয়াছে! তাদের হাওয়া গায়ে লাগিলেও প্রাণটার মধ্যে কি মুক্তির সুর যে জাগিয়া ওঠে!...এরই নাম তো জীবন!

২১

পরের দিন কিন্তু বাবলাকে স্কুলে যাইতে হইল। শৈল বলিল, বাবলা যদি স্কুলে না যায় তো সে ভারী রাগ করিবে, তার ভারী দুঃখ হইবে—সে খালি কাঁদিবে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া রোগা শরীরে আবার অসুখ ডাকিয়া আনিবে! ভগবতী বলিলেন,—আরো কিছুদিন পড় দাদা—মামার মত বড় হও,—বেশ, তখন কাগজ বেচেই বেড়িয়ো। এত ছোট বয়সে মামা তো পয়সা রোজগার করতে যায় নি। তাছাড়া পথে গাড়ী-ঘোড়ার ভয় আছে, মোটর গাড়ীর ভয় আছে। আগে আর একটু বড় হও, নাচলে সামলাতে পারবে কেন? এখন যে তুমি খুব ছোট···

রাগে অভিমানে ফুলিয়া বাবলা তখন নিতান্ত নিরাশ হইয়াই আবার বই খুলিয়া বসিল এবং যথারীতি স্কুলে যাতায়াত সুরু করিয়া দিল।

সেদিন বৈকালের দিকে শৈল বিছানায় চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। বাহিরে তখন বর্ষার মাতন চলিয়াছে। শ্রাবণের আকাশ ফাটিয়া যত জল সব একেবারে মুষলধারে পৃথিবীর বুকে ঝরিয়া পড়িতেছিল। বাড়ীর উঠান জলে জলময় হইয়া গিয়াছে, যেন একটা ছোট পুকুর! বাবলা দাওয়ায় বসিয়া কাগজের নৌকা তৈয়ার করিয়া উঠানের জলে ভাসাইতেছিল। আকাশে মেঘের রাশ জমাট বাঁধিয়া সমস্ত আলোটুকুকে যেন চাপিয়া কষিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে।

বিছানায় পড়িয়া শৈল ভাবিতে ছিল, সেই বহুদিন অতীত এক দুর্দ্দিনের সন্ধ্যার কথা! সেই ট্রেনের কামরা, বাহিরে বর্ষার এমনি অজস্র ধারাপাত, মেঘের এমনি ঘনঘটা! তবুও বুকে তার সেদিনকার সে মেঘ চাপিয়া বসিতে পারে নাই! সেই জমাট কালো অন্ধকারের মাঝেও কি আশার বিদ্যুৎ না বুকটায় আলো করিয়া রাখিয়াছিল!·· তারপর ট্রেণ ছাড়িয়া সেই ছবির পটে

কলরব-গুঞ্জন—তারি মাঝে তার দুই তৃষিত আঁখির দৃষ্টি আর-এক জোড়া চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টির পিয়াস লইয়া কি আকুল আবেগে চারিদিকে ছুটিয়া ছিল! সেই নিমেষ-হারা আকুল আঁখির দৃষ্টি-পিপাসা তার মিটিল না, তার পরিবর্ত্তে কি বাজ সে মাথায় পড়িল!…এ বজ্রাঘাত সহিয়া আজো সে বাঁচিয়া আছে, নিতান্ত একা, অসহায় হইয়াও! মনের মধ্যে তার আজ যে-সব চিন্তা পাক্‌ খাইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে তা সে প্রকাশ করিয়া বলে, এমন জন কেহ নাই!…বাবলা? সে দিনে দিনে কথা কহিতে শিখিল, বড় হইল, তার সুখ-দুঃখের বিচিত্র লীলা-ভঙ্গী, তার দুষ্টামি, তার বুদ্ধি কেমন ফুটিয়া উঠিল! এ-সব দেখিয়া মনে যখন বড় আনন্দ হয়, হায়রে, সে আনন্দ তার নিজের মনের মধ্যেই মধ্যেই ফুলের মত একান্তে ফুটিয়া নিঃশব্দে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে! তা দেখিবার কেহ নাই, দেখাইবারও উপায় নাই…এ যে কি অসহ্য দুঃখ! কি বেদনার পাহাড় যে তার বুকের উপর সেজন্য থাকিয়া থাকিয়া চাপিয়া বসে!… শৈলর প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি সে ডাকিল,—বাবলা—

সে ডাক বাবলার কাণে গেল না। ঘরের মধ্যকার এই নির্জ্জনতায় অতীতের রাশ রাশ বেদনা তাল পাকাইয়া শৈলকে এমন চাপিয়া ধরিল, যে তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় শৈল উঠিয়া বাহিরে আসিল। তার মাথা ঘুরিতেছিল, পা টলিতেছিল, বুঝি পড়িয়া যাইবে! তাড়াতাড়ি সে দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

বাবলা ফিরিয়া চাহিল, মাকে দেখিয়া মার কাছে আসিয়া কহিল,—এখানে এসে বসলে কেন মা?

শৈলর মাথা ঘুরিতেছিল। প্রাণের গভীর হতাশা মুখে-চোখে এমন জাগিয়া উঠিয়াছিল যে মার মুখের পানে চাহিয়া বাবলার বুক শিহরিয়া উঠিল। সে বলিল,—তোমার অসুখ করেছে মা?

শৈল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

বাবলা শৈলর মুখে হাত দিয়া বলিল,—এই তো গা তোমার গরম। সে অমনি ভগবতীর উদ্দেশে ডাকিল—ঠাকুমা…

ভগবতী তাঁর ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। বুঝি তাঁর প্রাণেও এই বর্ষায় ঘনঘোর মেঘের আড়াল ভেদ করিয়া বহুদিনকার হারাণো কথাগুলা ঢেউ ছুটাইয়া দিয়াছিল! তিনি জবাব দিলেন—কেন দাদা?

বাবলা বলিল,—মার আবার অসুখ করেছে।

ভগবতী উঠিয়া আসিলেন, এবং আসিয়া শৈলকে ও-ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন,—সত্যি অসুখ করেছে বৌমা?

শৈল বলিল, না।

ভগবতী তার মুখের ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন; কাছে সরিয়া আসিয়া তার কপালে হাত রাখিয়া বলিলেন,—এই যে, গা গস্‌ গস্‌ করছে। অসুখই তো করেছে দেখ্‌চি!

ততক্ষণে কোনমতে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া শৈল ধীর কণ্ঠে বলিল,—অমন আমার রোজই হয়।

ভগবতী বলিলেন,—আমায় তো বলনি বৌমা! তাই বটে খাওয়ায় তোমার রুচি নেই, খেতে পার না…

শৈল সে কথার জবাব দিল না। ভগবতী বলিলেন,—কদ্দিন এমন হচ্ছে?

শৈল বলিল,—সেই অসুখের পর থেকেই তো। রোজই বিকেল হলে চোখ জ্বালা করে, গা ভারী হয়ে ওঠে, মাথা ধরে, তবে শেষ রাত্রে খুব ঘাম দিয়ে এ ভাবটা আবার কেটে যায়।

শুনিয়া ভগবতী শিহরিয়া উঠিলেন, পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন,—শেষ রাত্রে ঘাম হয়?

শৈল বলিল,—হ্যাঁ, খুব ঘাম হয়। তারপর একটু কাহিল বোধ করি, আবার নাইতে-খেতে সেটা সেরে যায়।

ভগবতী শৈলর মুখের পানে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন,—এ তো ভালো কথা নয় বৌমা…আমায় না বলে ভালো করনি!…অসুখ তা হলে সারলো কৈ? অত-বড় অসুখের পর…

শৈল বলিল,—ব্যস্ত হয়ো না মা। একটু জ্বর এ তো রোজই হয়, নাইতে খেতেই এটুকু সেরে যাবে'খন।

ভগবতী বলিলেন,—কাল সকালে নালু ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনুক।

শৈল বলিল,—তোমার পায়ে পড়ি মা, একে তো তুমি তোমার জ্বালায় জ্বলে মরছো, তার ওপর তোমায় নিজের এই-সব নিয়ে জ্বালাবো! তুমি যদি ব্যস্ত হও, তাহলে আমি যেখানে ছ'চক্ষু যায় চলে যাব,—সত্যি বলছি! তোমায় জ্বালাবার জন্তেই কি এখানে এসে ঢুকেছিলুম!

ভগবতী তার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন,—বৌমা...

শৈল বলিল,—নিজের ওপর ঘেন্না হয়ে গেছে মা, আমার। তোমার এই বয়সে কোথায় তোমায় সাহায্য করবো, তা দুরে গেল, তুমি ঐ ভাঙা বুকে আমাদের এমন করে আগ্‌লে রেখেছ, তাতেও সোয়াস্তি দেব না,—তোমায় এমনি রোগ নিয়ে জ্বালাব অষ্টপ্রহর!

ভগবতী ভৎর্সনার সুরে বলিলেন,—চুপ কর বৌমা। তুমি কেন এ-সব কথা বল, বল দিকিন। তোমরা কি পর, না, আমি তাই ভাবি! তোমাদের তো আমি একটুও আলাদা ভাবতে পারি না মা। আমার মনে হয়, এই নাড়ীরই তোমরা, নাড়ীছেঁড়া ধন আমার! তোমরা ভাল আছ দেখলেই আমার সুখ। ছি, ও-সব কথা বলো না, ওতে আমার মনে বড় বাজে! এখন এক কাজ কর, ঠাণ্ডা পড়েছে, বাইরে এই জল—একখানা র‍্যাপার এনে দি, সেইটে গায়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে থাকো, বাইরে বেরিয়ো না।

রাত্রে কৈলাস আসিলে ভগবতী তাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন; তার উপর আরো বলিলেন,—কাল সকালে বাবা, একবার ডাক্তার বাবুকে ডেকে এনো। বৌটোর জন্তে বড় ভাবনা হয়েছে আমার। নিত্যি এই ঘুষঘুষে জ্বর, এ তো ভাল কথা নয়। এই বেলা এর বিহিত না করলে ঐ একরত্তি ছেলেটার একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে যে!

কৈলাস বলিল,—কাল সকাল হলেই আমি গিয়ে ডাক্তার বাবুকে ধরে আনবো।...বাবলা কোথায়?

ভগবতী বলিলেন,—তার মার ঘরে বসে সে ইস্কুলের পড়া পড়ছে।...নালু এখনো ফিরলো না? এই জলে কোথায় মাতামাতি করে বেড়াচ্ছে, সে-ই জানে! এত জল, ঘরে আয় না বাপু! এই জলে কে মানুষ আছে পথে যে কি অখণ্ড পেরমাই নিয়েই যে বসে আছি!...আমার পানে তো নজর নেই, রোগের যত নজর ঐ সব পুঁচকে কচি ছেলে-মেয়েগুলোর উপর...! তাও ওর কি আছে আর! এই বয়সেই সব চুকিয়ে বসে আছে!ঐ একরত্তি ছেলেটা... তা তার পানে চেয়েও কি ভগবানের দরদ হয় না!

ভগবতীর নয়ন-প্রান্ত আর্দ্র হইয়া আসিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জোর করিয়া সে অশ্রুর প্রবাহ রোধ করিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। কৈলাস ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২২

পরদিন সকালে কৈলাস গিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার রোগীর অবস্থা শুনিয়া রোগী দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন ও আরো নানা পরীক্ষার পর কৈলাসকে একদিন যে রায় শুনাইয়া দিলেন, তাহাতে কৈলাসের মুখ এক নিমেষে মরার সাদা হইয়া উঠিল। সে ধীর পদে বাড়ী আসিয়া ভগবতীর কাছে ডাক্তারের অভিমত প্রকাশ করিলে ভগবতী একেবারে যেন আছাড় খাইয়া পড়িলেন! তাঁর মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। তাঁর সমস্ত প্রাণে ঝড় বহাইয়া একটা তুমুল আর্ত্তনাদ উঠিল। উপায়? বিশেষ, ঐ বাবলার...

তিনি নীরবে চোখ মুছিয়া কৈলাসের পানে চাহিলেন, বলিলেন,—ডাক্তার বাবুকে একটু ধরে পড় বাবা—ওকে সারাতেই হবে। একটা অনাথ ছেলের নাহলে সব আশ্রয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে ...

কৈলাস গুম্ হইয়া ঘরের কোণে বসিয়া পড়িল। তার পায়ের নীচে ঘরের মাটী তখন প্রচণ্ড দোলে দুলিয়া উঠিয়াছে!

ভগবতী বলিলেন,—কি ক্ষণেই যে ছেলেটার জন্ম হয়েছিল! এই বয়সে মা-বাপ দুই হারিয়ে ওর গতি যে কি হবে! আর কি দরদে ভরা মনটি যে ওর—

বাবলা আসিয়া ডাকিল,—ঠাকুমা...

তাকে দেখিয়া ভগবতীর প্রাণের রুদ্ধ আবেগ একেবারে ফুলিয়া উঠিয়া বুকটাকে তোলপাড় করিয়া দিল। অতি-কষ্টে সে ভাব চাপিয়া তিনি সহজ কণ্ঠে বলিলেন,—কেন দাদা?

ঠাকুমা। মার বড্ড কষ্ট হচ্ছে…মা মাটীতেই শুয়ে পড়েছে।

তার মুখ-চোখের সে উৎকণ্ঠিত ভাব দেখিয়া ভগবতীর মনটা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার পায়ে এমন শক্তি নাই যে ছুটিয়া যান্! তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পা দুইটা ঝঞ্ঝাহত পল্লবের মত কাঁপিয়া উঠিল। তিনি জোর করিয়া ছুটিয়া শৈলর কাছে গেলেন। শৈল মেঝের উপর চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। ভগবতী গিয়া শৈলর মুখে-চোখে জল দিয়া তার মাথা নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া ডাকিলেন,—বৌমা…

ডাগর চোখদুটি তুলিয়া ভগবতীর পানে করুণ দৃষ্টি মেলিয়া শৈল ডাকিল,—মা…

শীর্ণ কঙ্কালসার তার মুখের মধ্যে এই চোখ দুটীই শুধু আজো দীপ্ততায় জ্বলজ্বল করিতেছে!

ভগবতী বলিলেন,—ভুঁয়ে শুয়ে কেন মা! উঠে বিছানায় শোও।

শৈল বলিল,—শুচ্ছি।…বড্ড কষ্ট হয়েছিল কি না…

ভগবতীবলিলেন,—উঠে শোও। আমি তুলে শুইয়ে দেব?

শৈল কষ্টে বলিল,—না, আমি নিজেই শোব'খন। ঘরটা বমিতে নোংরা করে ফেলেছি, পরিষ্কার করি আগে…

ভগবতী বলিলেন,—সে আমি ঠিক করছি। তুমি উঠে শোও দিকি।…রসো মা, আমি কোলে করে শুইয়ে দি। শুইয়ে দিয়ে ঘর আমি মুক্ত করে ফেল্‌ছি…

শৈল ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—না মা, তুমি ওতে হাত দেবে না! আমিই করছি।

ভগবতী বলিলেন,—ছি, পাগলামি করে না মা,—আমার সঙ্গে লৌকিকতা করছো! আমার রোগ হলে তুমি যে দু'হাতে সব সাফ করেছিলে, মা, আমি তো কোন কথা কইনি!…ছি, ওঠো, উঠে বিছানায় শোও! এসো দিকি, আমি কোলে করে শুইয়ে দি…

শৈলর নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া ভগবতী তাকে বুকে করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। বাবলার মুখে হাসি ফুটিল। শৈল তাহা দেখিয়া বলিল,—হাসছিস্ কেন রে? ঠাকুমা আমায় কোলে করেছে বলে…?

ভগবতী বলিলেন,—মার কোলে মেয়ে উঠেছে…তুমি ওঠো না তোমার মার কোলে…?

বাবলা হাসিয়া বলিল,—হ্যাঁ, মা তো বড় হয়েছে, আমি যে ছোট…!

শৈলকে বিছানায় শোয়াইয়া ভগবতী ঘর সাফ করিতে লাগিলেন—চাপ-চাপ কফ্, তার সঙ্গে রক্তের ছিটও রহিয়াছে যে! ভগবতীর দুই চোখ ঠেলিয়া জল আসিল। তিনি মুখ নীচু করিয়া সে অশ্রু গোপন করিলেন। তার পর ঘরটা সাফ করিয়া তিনি কৈলাসকে বলিলেন—ডাক্তার বাবু আজ আসবেন তো বাবা?

কৈলাস বলিল,—আসবেন তো বলেছেন।

ভগবতী আসিয়া শৈলর মাথার শিয়রে বসিলেন। শৈল বলিল,—তুমি যাও না মা,—এখানে এসে বস্‌লে কেন আবার! কাপড়-চোপড় কেচে পুজা-আহ্নিক সেরে নাও তো—

ভগবতী তার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। শৈলর মুখের উপর দুই-চারি গাছা চুল উড়িয়া আসিয়া পড়িয়াছিল; সেগুলাকে সস্নেহে সরাইয়া দিতে দিতে ভগবতী বলিলেন,—সে সব হবে'খন। এখন তোমার কি কষ্ট হচ্ছে বল দিকি…

শৈল বলিল,—বুকটার মধ্যে কি-রকম করছে…যেন হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে উঠছি।

ভগবতী বলিলেন,—জ্বর এখন নেই দেখচি। গা তো পাথরের মত ঠাণ্ডা।

শৈল বলিল,—সকালে জ্বর থাকে না। শেষ রাত্রে খুব ঘাম দিয়ে জ্বরটা ছাড়ে কি না! কি ঘাম সে! একেবারে কুলকুল করে, যেন নাইয়ে দেয়—বিছানা ভিজে ওঠে!

ভগবতী বিছানার চাদরটায় হাত দিয়া বলিলেন—ওমা, তাইতো এ যে বেশ ভিজে, শপ্‌শপ্ করছে। তা এটা রোদ্দরে দি না বৌমা। আর-একটা চাদর বার করে আনি। কেমন? এটা কেচে শুকোতে দি…এত ভিজে চাদরে শুলে গা-হাত টাটিয়ে উঠবে যে! একে রোগা শরীর!

শৈল বলিল,—এ তো জলে ভেজেনি, ঘামে ভিজেচে!

ভগবতী বলিলেন,—যাতেই হোক্ ভিজে তো! আমি

চাদর নিয়ে আসি। অসুখের সময় সব পরিষ্কার রাখা ভালো।

ভগবতী ফর্সা চাদর বাহির করিয়া আনিলেন—এবং অতি সাবধানে শৈলকে নাড়িয়া চাড়িয়া বিছানায় চাদর-খানা বিছাইয়া ময়লা চাদরটাকে টানিয়া বাহির করিয়া লইলেন। সেটা দাওয়ায় ফেলিয়া রাখিয়া হাত ধুইয়া তিনি আবার আসিয়া শৈলর শিয়রে বসিয়া তার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

ঘরের মধ্যে মার এই আচ্ছন্ন ভাব দেখিয়া বাবলার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। এই সেদিন মার অসুখ সারিল, আবার অসুখ! তার মনটা যেন গুঁড়াইয়া গেল। সে মার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ভগবতীর পানে চাহিয়া কহিল,—আবার মার অসুখ হলো কেন, ঠাকুমা?

ভগবতী চট্ করিয়া এ কথার জবাব দিতে পারিলেন না।

বাব্লা বলিল,—মার অসুখ হলে আমার ইস্কুলে যেতে ভাল লাগে না। আমি আর ইস্কুলে যাব না!

ভগবতী এবারো কোন জবাব দিলেন না। শৈল বলিল,—তা হলে আমার অসুখ হওয়া ভালো, না রে? বেশ পড়াশোনা বন্ধ যাবে—

এ কথায় বাব্লার রুদ্ধ বেদনা রুদ্ধ অভিমান অশ্রুর আকারে ফাটিয়া পড়িল! সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল,—যাও, আমি বুঝি তাই বলছি! আমার ভাবনা হয় না বুঝি, বা রে?

ভগবতী বাবলাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—না বৌমা, অমন করে কিছু তুমি বলো না ওকে, ওর বয়সে বাছা! ছেলেরা এই বয়সে মা-বাপের কি আদরেই ডুবে থাকে। তা ওর একটা দিক তো ও বুঝলেও না, তার পর একটা মা—তুমিও অসুখে পড়ে থাকলে ওর মনটা কি হয় বল দিকি! না দাদা, তোমার ইস্কুলে যেতে হবে না! আগে লেখাপড়া, না, আগে মনের স্বাচ্ছন্দ্য!

শৈল বলিল,—বেশ মজা হয়েছে এবার তোর—আর ইস্কুলে যাস্নে!

বাব্লা বলিল,—তুমি সেরে না উঠলে আমি ইস্কুলে যাব না তো, কখ্খনো যাব না! বারে, তুমি রোজ রোজ অসুখ করবে, আর আমি···বাবলা কথাটা শেষ করিতে পারিল না। বুকের মধ্যে একরাশ অশ্রু ঠেলিয়া উঠিয়া তার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

ডাক্তার আসিয়া ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু এ শিবের অসাধ্য রোগ, সারিবার নয়। শৈল কখনো মনে জোর করিয়া স্ফূর্তি আনে,—তার ফলে একটু ভাল থাকে, আবার যখন ভুগিয়া ভুগিয়া সারিবার সব আশা হারাইয়া ফেলে, তখন অত্যন্ত নিরুপায় হইয়াই মুষড়াইয়া পড়ে, রোগও তখন মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া তাকে চাপিয়া ধরে! এমনিভাবে বিছানায় পড়িয়া রোগ ভোগ করিয়া নিজের উপর তার বিরক্তি ধরিল। সে একদিন বাঁকিয়া বসিল, বলিল—ওষুধ আর খাব না আমি। কেবল পয়সা খরচ—কি হচ্ছে ওষুধ খেয়ে!

ভগবতী নিস্পন্দভাবে ঔষধের শিশি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, বলিলেন,—না খেলে চলবে কেন মা!

শৈল বলিল,—এত পয়সা খরচ কেন করছো মা, এই ছেঁড়া প্রাণটুকুর জন্যে?

ভগবতী বলিলেন,—তোমার জন্যে করছি না বৌমা—ঐ এক ফোঁটা ছেলেটার জন্যেই...

শৈল বলিল,—কি পাপই যে তোমার ঘরে এসে সেঁধিয়েছিলুম! তোমায় হাড়ে-নাড়ে জ্বালিয়ে খেলুম···

ভগবতী রাগিয়া উঠিলেন,রাগিয়া একটু ঝাঁজালো সুরেই বলিলেন,—আবার ঐ কথা! বুঝেছি বৌমা, আমি পর, তাই ও কথা আমার মুখের উপর তুমি বলতে পারলে! আমি যদি তোমার যথার্থ আপন-জন হতুম, তাহলে কি তুমি এমন করে বলতে পারতে! তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

ভগবতীর চোখে জলও ছাপাইয়া আসিল। শৈল তাহা লক্ষ্য করিয়া কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; ম্লান কণ্ঠে সে বলিল,—না মা, আমায় মাপ কর,—আর আমি এমন অপরাধ করব না। ওষুধ দাও, খাই। তোমার বরাতে আছে যা, তা কর!

ভগবতী ঔষধ ঢালিয়া দিলেন; শৈল তাহা পান করিয়া নিঃশব্দে শুইয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

রূপমতী

মালবের শেষ বাদশা বজ বাহাদুর ইংরেজী ১৫৫৪ থেকে ১৫৬৩ খঃ পর্য্যন্ত মাণ্ডবগড় বা মণ্ডুতে রাজত্ব করে গেছেন। বজ বাহাদুর ছিলেন বিলাসী, মৃগয়াপ্রিয়, সঙ্গীত-লোলুপ রাজা, তাঁরই হৃদয়-রাণী ছিলেন—রূপমতী; এঁদের একনিষ্ঠ প্রেম-কাহিনী মালবের নীরস ইতিহাসকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করে রেখেছে।

উজ্জয়িনী থেকে ৫৫ মাইল দূরে সারংপুরে রূপমতীর জন্ম হয়; তাঁর জন্ম ও বাল্যজীবনের ইতিহাস প্রায় মেঘাচ্ছন্ন। সার জন ম্যালকম বলেন, সারংপুরের নর্ত্তকী সারংনয়নার অতুলনীয় রূপ বজ বাহাদুরকে উন্মত্ত করেছিল। আর একজন ইংরেজ বলেছেন, "রেবা-তীরের মণ্ডলেশ্বর-বাসী এক রাজপুতের মেয়ে ছিলেন রূপমতী।" ফল কথা—রূপমতী ছিলেন হিন্দুর মেয়ে আর অপূর্ব্ব রূপসী, সঙ্গীত-বিদ্যায় তাঁর মত পারদর্শিনী নারী ভারতে তখন আর একটিও ছিলেন না, তাঁর বীণা-নিন্দিত সুরের ছন্দে বনের পশুও নিমেষের জন্য থমকে দাঁড়াত।

জীবনের এক মধুময় মুহূর্ত্তে বজ বাহাদুর গেছলেন—শীকারে। নর্ম্মদার দুই কূল তখন সৌন্দর্য্যের মহিমায় ভরে উঠেছিল; একটা গাছের ডালে,—সেই বিকশিত সৌন্দর্য্যের মাঝে বসে রূপের রাণী রূপমতী খুলে দিয়ে ছিলেন তাঁর গানের ঝর্ণা। শীকার ছেড়ে স্বরের অনুসরণে বজ বাহাদুর এসে দাঁড়ালেন, তাঁর পায়ের তলায়। বাদশা মুগ্ধ হয়েছিলেন যার সুরের ঝঙ্কারে, পাগল হয়ে উঠলেন তার রূপ দেখে। তন্বী-তরুণীর দিকে চেয়ে রাজা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন—এত রূপ! এ যে ধ্যানের ধারণা, কবির কল্পনা! তিনি রূপমতীকে বিয়ে করে প্রধানা বেগম করতে চইলেন। তরুণী রাজাকে বল্‌লেন,—আমি রাজপুত-বালা,—মুসলমানকে বিয়ে করতে পারব না। মালবরাজ তাঁর পায়ে ধরে অনুনয়-বিনয় করলেন,—রূপমতীকে না পেলে তিনি বাঁচবেন না। কিশোরী বল্লে—"বেশ! যদি মণ্ডু-দুর্গে নর্ম্মদার ধারা-প্রবাহ নিয়ে যেতে পার,—তাহলে আমি তোমার বেগম হব।"

১২০০ ফুট উঁচু মণ্ডু-দুর্গে নর্ম্মদার ধারা নিয়ে যাওয়া ছেলে-খেলা নয়। প্রেমান্ধ মানুষ অসাধ্য সাধন করেছে! মালবেশ্বর উন্মুক্ত করে দিলেন তাঁর ধন-ভাণ্ডার,—দুর্গে নর্ম্মদাকে আনবার জন্য। কেল্লার একদিক দিয়ে নর্ম্মদাকে জোর করে উপরে আনবার প্রাণপণ চেষ্টা ও বিপুল উদ্যম চলতে লাগল, দুর্গের এক প্রান্তে নদীর একটা ক্ষীণ ধারাও এসে দেখা দিলে।

রূপমতীর প্রতি বজ বাহাদুরের ঐকান্তিক ভালবাসা দেখে নর্ম্মদা নদী নাকি তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন,—খুসি হয়েছি আমি তোর প্রাণের পরিচয় পেয়ে! কেল্লার উপরে আমাকে আনবার ব্যর্থ চেষ্টা না করে, দুর্গের যেদিকে আমার ক্ষীণ ধারাটি এসেছে, সেইখানে একটা বড় পুকুর কাটা—তাতে আমার ধারা প্রবাহিত হবে শত মুখে, আর তোদের মিলনের মধুময় বাসর-সজ্জায় তার দুকূল উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এই স্বপ্নাদেশের পর মালব-রাজ রূপমতীকে বিয়ে করে ছিলেন।* আজও সে রেবাকুণ্ড প্রণয়ী যুগলের মধু-মিলন-স্মৃতি বুকে করে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে, আর তারই পাশে বজ বাহাদুরের প্রাসাদ ও রূপমতী-মহল দাঁড়িয়ে কালের ঢেউ গুণছে। তাদের সে সৌন্দর্য্যে ভাঙন ধরেছে,—সংস্কার করাবে কে? ধ্বংসোন্মুখ রূপমতী-মহলের ঝরোখায় দাঁড়ালে আজও নর্ম্মদার ক্ষীণ ধারা রূপার তারের মত চোখে পড়ে, আর রম্য বনানীর অপূর্ব্ব শ্রী-সৌন্দর্য্য প্রাণে এক করুণ রাগিণীর ঝঙ্কার তুলে দেয়।

---

* বজ বাহাদুর ও রূপমতীর মিলন সম্বন্ধে জন-প্রবাদ এই যে বজ বাহাদুর রূপমতীর বাপের (ধর্ম্মপুরের ঠাকুর) কাছে, তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করেন। রূপমতীর বাবা এ প্রস্তাবে অসম্মত হলেন। তিনি স্থির করলেন, মুসলমানকে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে তাকে মেরে ফেলা ভাল। নর্ম্মদার কূলে এনে রূপমতীকে—বিষ খেতে দেওয়া হল। বিষের বাটি হাতে করে মধুর স্বরে রূপমতী স্বরচিত পদ্যে নর্ম্মদার স্তব আরম্ভ করেন। সহসা বজ বাহাদুর এসে তাঁকে উদ্ধার করে মণ্ডুতে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন। বিষের বাটি হাতে করে তিনি যে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, তার ইংরেজী অনুবাদ পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হলো।

King of the crystal depths ! Ah ! where,
Nurbudda, shall thy sparkling wave
The young Rajpootnie's ashes bear ?
Leave them where thy ripples lave
The emerald marge, and lilies wave
Their deathless petals. Let the chime
Of thy glad wave sound o'er her grave,
Cut off in virgin prime."

*   *   *   *

"And if, perchance, of foreign blood,
But kindred soul, a warrior come
To ponder o'er they twilight flood,
And seek the form for ever gone,
Tell him the maid of Rajasthan,
True to her faith nor false to him,
Thus binds her bridal garland on,
Cut down in virgin prime."

১৫৫৭খৃঃ বজ বাহাদুর রূপমতীকে বিয়ে করেছিলেন, তারপর রূপমতীর রূপের উপাসনাতেই ব্যস্ত ছিলেন তিনি; হারেম ছেড়ে বাইরে পর্য্যন্ত আসবার অবসর পেতেন না; রাজকার্য্য দেখা ও রাজ্য-পরিচালন করা ত দূরের কথা। এই ভাবে সাত বছর কেটে যাবার পর ১৫৬৪ খৃঃ মোগল-সম্রাট আকবর মালব আক্রমণ ও জয় করেন, সঙ্গে সঙ্গে রূপমতী ও বজ বাহাদুরের মধুময় স্বপ্নও ভেঙে গেল।

সুজালপুরের কাজী সাহেবের কাছে, সেই সময়ের হাতে লেখা একখানা ফার্শী তারীখ আছে, আমি তার নকল নিয়েছি। লেখক আকবরের সঙ্গে বজ বাহাদুরের যুদ্ধের কারণ ও কথা বেশ গুছিয়ে লিখেছেন। তিনি বলেন,—"বজ বাহাদুরের সভায় মানখাঁ নামে একজন গাইয়ে কোন কারণে মালবেশ্বরকে ত্যাগ করে সম্রাট আকবরের কাছে যায়, আর সম্রাটকে রূপমতীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা বলে। মোগল-সম্রাট মালবেশ্বরকে চিঠি লিখ্‌লেন, যেন পত্রপাঠ রূপমতীকে দিল্লীর হারেমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চিঠি পেয়ে বজ বাহাদুর চিন্তিত হলেন,—অন্তর তাঁর বিদ্রোহী হয়ে উঠল,—সম্রাটের এই ঘৃণ্য প্রস্তাবে। তিনি জবাব দিলেন,—"মহারাণী ধোকল বাঈকে (তারীখকার হয়ত ভুল করে ধোকল বাঈ লিখেছেন, ওটা যোধা বাঈ হওয়াই সম্ভব)! আমার কাছে পাঠালে, রাণী রূপমতীকে দিল্লী পাঠাতে পারি।" বজ বাহাদুরের এই ঔদ্ধত্যে সম্রাট রেগে আগুন হলেন। ক্ষমতার মদিরা মানুষকে এমনি মাতাল করে তোলে, যে নিজের দোষ সে দেখতে চায় না বা দেখতে পায় না। তিনি যখন বজ বাহাদুরের কাছে রূপমতীকে চেয়েছিলেন, তখন তাঁর বোঝা উচিত ছিল—এ প্রস্তাবে মরা মানুষও নড়ে ওঠে!

ক্রুদ্ধ সম্রাটের আদেশে আদম খাঁ সসৈন্যে মালব জয় করতে গেলেন, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। বজ বাহাদুর আদম খাঁর সঙ্গে সারংপুরে প্রাণপণে যুঝেছিলেন, কিন্তু মোগলের বিপুল বাহিনীর চাপে, মালবের মুষ্টিমেয় সেনা ধূলির মত উড়ে গেল, বজ বাহাদুর হত হলেন,* মোগল মালবের সর্ব্বস্ব অধিকার করলে। কাফি খাঁ বলেন, রূপমতী মোগল সেনাপতি আদম খাঁর হাতে পড়ে ছিলেন; রূপমুগ্ধ আদম খাঁ রাণীকে অঙ্ক-শায়িনী করবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। বজ বাহাদুরের বিরহে রূপমতী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তিনি অসংখ্য কবিতা রচনা করেছিলেন বজ বাহাদুরকে লক্ষ্য করে। আজও মধ্য ভারতের পথে-ঘাটে লোকে সে সব গান গেয়ে বেড়ায়! বিষ খেয়ে মরবার আগে প্রিয়তমকে লক্ষ্য করে তিনি একটা কবিতা রচনা করেছিলেন, রাণীর শেষ কবিতার দুটি ছত্র এই:—

"তুম্‌ বিন্‌ জিয়রা রহত হত্‌, মাঙত হৈ সুখরাজ।
রূপমতী দুখিয়া ভই বিনা বহাদুর বাজ্‌।"

বাংলায় এর অনুবাদ করলে, এই দাঁড়ায়,—
তোমারে হারায়ে বিফল জীবন, ব্যর্থ সকলি মোর—
বাহাদুর বিনা রাণী রূপমতী,—দুঃখের নাহি ওর!

* কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন,—বজ বাহাদুর দেখলেন, রূপমতী মোগলের হাতে পড়বেন, তখন তলওয়ারের ঘায়ে তিনি প্রিয়তমাকে অপমানের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন,—রাণীকে নিজের হাতে হত্যা করেছিলেন।"

রূপমতীর কবিতা আজও ছাপার অক্ষরে বেরোয় নি, লোকের মুখে মুখে তার অনেকগুলি এখনও বেঁচে আছে। কাযেই এ কথা স্বীকার করতে হবে যে রূপমতী হিন্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। কানিংহাম রূপমতীর কবিতার এই রকম অনুবাদ করেছেন,

Friend ! let others boast their treasure
Mine's a stock of true love's pleasure ;
Safely cared for every part,
Neath that trusty lock, my heart;
Safe from other women's peeping,
For the key's in mine own keeping ;
Day by day it grows a little ;
Never loses e'en a tittle ;
But through life will ever go,
With Baz Bahadur, weal or woe."

একজন ইংরেজ লেখক রূপমতীর সম্বন্ধে লিখেছেন,--She was a high-minded woman who did not choose to survive the loss of her honour, and who bore such enthusiastic attachment to her lord that she deemed her existence insupportable without him. The end of her career has some resemblance to that of Cleopatra, but her history is more romantic as well as much more moral. "The Calcutta Reveiw."

প্রবাদ, রূপমতী ভূপ-কল্যাণ রাগের সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

পরমহংসদেব

ধর্ম্ম যেথা খণ্ড স্বার্থে দুর্ব্বলের গড়েছে প্রাচীর
চাহনিক' তুমি তার পানে ; ঊর্দ্ধে নীলকান্ত ধীর
নির্ম্মল আকাশ,—তুমি তার কোলে সস্মিত চন্দ্রমা,
আপনার হাস্যে হর্ষে ছড়াইলে শান্তি মনোরমা !

ব্যভিচারে দিলে দীক্ষা অভেদের মন্ত্র পড়ি কাণে ;
'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পূর্ণাহুতি পেল তব প্রাণে।
ব্রহ্মতেজে কেটে গেছ গোঁড়ামির কুজ্ঝটিকা ঘোর,
সর্ব্ব সমন্বয়ে দিলে মিলনের পুণ্য রাখী-ডোর।

শঙ্করের ভিক্ষাপাত্রে এনে দিলে করুণা যীশুর,
মহম্মদী দরগায় কাম্যফল ঝরা'ল প্রচুর
বোধিবৃক্ষ, মিশে গেল তপোবনে ফকিরের গাথা,
বোস্তনের গন্ধ মধু দুলাইল মন্দিরের পাতা।

বিশ্ব-রূপ পড়ে ধরা ধ্যানমগ্ন তব আঁখি-পাতে ;
আপনি প্রচ্ছন্ন রহি ফিরিয়াছ বিবেকের সাথে।
এ নিখিলে তুমি দেব। মৌনে তব কর্ম্ম-পারাবার
হ'ল সৃষ্টি, হে স্থিতধী ! তব কীর্ত্তি দূর সিন্ধুপার।

হে মনস্বী ! মহা-সত্ত্ব ! মানবের পূর্ণ পরিচয়
অন্তরের মাঝখানে,—সেথা তব সাধনা অক্ষয়
ছিল, জানি—তার সনে তব আত্মীয়তা। তব প্রীতি
আত্মার অনন্ত-রূপে খুঁজে পেল মহিমার গীতি।

নিয়ন্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবের অনাদি লীলায়
সঞ্চরি ফিরেছ রূপ হ'তে প্রেমে আনন্দে আত্মায়
কভু নারী, জ্ঞান-বৃদ্ধ, কভু শিশু হাস্যে সুদুর্লভ !
মানবে বেসেছ ভাল, তাই তুমি অখণ্ড মানব !

যুগ-যুগন্ধর ঋষি ! এসেছিলে অবিশ্বাসে দহি,
অগস্ত্যের তৃষা বুকে পার্থ-সারথির প্রেম বহি ;
ক্ষুদ্র দেহে ব্রহ্মে তুমি দিলে রূপ, দিলে যে আকার
হে তপস্বী ! ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ! অনাবিল আনন্দ সাকার।

ভাষা তব আশা-পথ রচি গেল কণ্টকের বনে !
জ্ঞান-তত্ত্ব বাণী তব দৈনন্দিন কর্ম্মীর জীবনে
রেখে যায় সরল প্রাণের দান ; জাগে স্বচ্ছ হিয়া ;
তাই তুমি নিত্য-সত্য সহজে সরল মৃত্যুঞ্জয়া !

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী।

চাঁদের আলো

— এক —

দিনের আলোয়

নর। ওগো দাঁড়াও, শোনো...

নারী। কি ?

নর। তোমায় একটু দেখি···

নারী। কেন তুমি রোজ আমায় বিরক্ত কর ? আমি তোমায় চাই না !

নর। আমি যে তোমায় চাই, সখি ! তুমি কি সুন্দর—

নারী। তুমি কি কুৎসিত !

নর। তাই তুমি আমাকে ভালবাসো না ?

নারী। হাঁা, তাই !

নর। কেন, প্রেম কি কিছু নয় ?

নারী। যে প্রেম রূপে ফুটে ওঠেনি, তার মূল্য কি ! তা অসম্পূর্ণ !

নর। তেমনি যে সৌন্দর্য্য প্রেমে ঝরে পড়চে না, তাও যে অপূর্ণ।

নারী। রূপের মাঝে মধু নিশ্চয় আছে, ফুল তা পতঙ্গকে দেয় না। ভ্রমরই তা কেবল নিতে জানে !

নর। বেশ, ভ্রমর ফুলকে চায়, ফুলও তো তাকে চায় ! সে তো বলে না, তুমি কালো—

নারী। ফুল বলে না, আমি বলি। আমি ত কেবল ফুল নই !

নর। তবে তুমি কি ?

নারী। আমার মাঝে যেমন মধু দেবার প্রেরণা আছে, তেমনি আমি নিজেও যে মধু-পিয়াসী !

নর। হায়, যদি কেবল ফুল হতে !

নারী। এখন বুঝলে তো, আমি কেন তোমাকে চাই না ! আমি চাই এমন ভ্রমর—যা ফুল আর ভ্রমর দুই !

— দুই —

চাঁদের আলোয়

নর। এখন আর এক। জগৎ !

নারী। চাঁদের আলো যেন কি—কি যেন—ভাষায় বোঝানো যায় না। যেন কি রহস্য, কি মায়া, কি মোহ !

নর। দিনের আলোয় সবাই স্বতন্ত্র, চাঁদের আলোয় আবার তারা মিলে যাচ্ছে প্রাণে-প্রাণে, গানে-গানে······

নারী। সবাই যেন এক স্বপ্নডোরে বাঁধা পড়েচে !

নর। একখানা রূপার চাদর গায়ে ঢাকা দিয়ে সবাই এক হয়ে যাচ্ছে। ওঃ, আমার মন বেজায় উতলা হয়ে উঠছে ! কেন, জানিনা।

নারী। আমার মনেও কি যেন মোহ ছড়িয়ে পড়চে, যেন কোন অনাদি সুর, অসীম প্রেম আমার মনের তারে আঘাত করচে···

নর। যেন দূর থেকে ভেসে-আসা একটা গান··· আমিও শুনচি !

নারী। কেন এমন হলো ! আমি আর সামলাতে পারব না !

নর। তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে ! যে সুন্দর, চাঁদের আলোয় তাকে কত বেশী সুন্দর দেখায়, কে বলবে !

নারী। তুমিও সুন্দর !

নর। সত্য ? তা হতে পারে—চাঁদের আলোর গুণ ওটা ! চাঁদের আলোয় মনের রঙ বাইরে প্রকাশের পথ পায় !

নারী। তুমি ত এমন সুন্দর ছিলে না ! তুমি তবে সুন্দর !

নর। তোমার চোখদুটা ! কি তোমার চোখদুটী—এমনি মোহময় যে বিরাগ-ভরে চাইলেও মনে হয় যেন তুমি ভালবাসচ !

নারী। আমি তোমায় ভালবাসছি !

নর। ভালবেসে চাইলে সে চোখ দুটীর মোহ কেমন হয়, কে বলবে! তোমার চোখদুটী আমায় উতলা করেচে!

নারী। তবে চেয়ো না! না, চেয়ে থাকো,—তোমার চোখ দুটীর মাঝেও আমি যেন কার দেখা পাচ্ছি! যেন দুটী চোখে কি-এক স্বপ্ন!

নর। আজ ইচ্ছা করচে, সারা রাত কেবল পথে পথে ঘুরে বেড়াই!

নরী। আমারও ইচ্ছা করচে, তোমার হাত ধরে...

নর। আমায় তুমি পাগল করে দেবে!

নারী। এ আর কিছু না, চাঁদের আলো! আমি বেশ বুঝতে পারচি! চাঁদের আলোয় ভাল না বেসে থাকা বড় শক্ত।

— তিন —

দিনের আলোয়

নারী। আবার তুমি এসেচ!

নর। থাকতে পারলুম না! মনটা কেমন করল, তাই...

নারী। চলে যাও!

নর। শক্তি নেই!

নারী। কি হল আবার! কাল তোমায় বলে দিয়েছি যে আমি তোমাকে চাই না—তোমাকে ভালবাসতে পারব না!

নর। কিন্তু কাল রাতে?

নারী। কাল রাতে আবার কি?

নর। সেই...তোমার মনে পড়চে না?

নারী। হ্যাঁ—পড়চে! সে কি? একটা স্বপ্ন, না, সত্য কিছু?

নর। কাল রাতে তুমি আমার তৃষিত অধরে সুধার ধারা ঢেলে দিয়েছিলে, সখি!

নারী। ছি, ছি! সত্যই কাল রাতে তোমাকে ভালবেসেছিলুম?

নর। তোমার সৌন্দর্য্যের সোনার পাত্রে প্রেমের তপ্ত মদিরা ভরে আমার মুখে ধরেচ।

নারী। আর তুমি?

নর। নিঃশেষে তা পান করেচি!

নারী। ছি, ছি—এ গ্লানি রাখবার স্থান নেই! আমি পাগল হয়ে যাব!

নর। হায় স্বপ্ন, না হেঁয়ালি, না অভিনয়!

নারী। যদি কিছু ঘটে থাকে কাল, তা আমার অজানতে, আমার অনিচ্ছায়—জেনে রাখো। আমি তোমায় ভালবাসতে পারি না! বাসা অসম্ভব!

নর। তবে কি চাঁদের আলো...

নারী। কে জানে! চলে যাও, আর এসো না! এমন দেশে চলে যাও, যেখান থেকে আসা যায় না, যেখানে আমি কোনদিন পথ ভুলেও যাব না।

নর। তুমি আমায় এত ঘৃণা কর!

নারী। হ্যাঁ!

— চার —

চাঁদের আলোর

নর। তুমি যে এলে আবার!

নারী। থাকতে পারলুম না। তোমার গল্প আমার ভাল লাগে। তোমার কথাগুলি যেন কথা, আবার গান!

নর। কিন্তু তুমি যে আমায় ভালবাস না!

নারী। কে বল্লে? কবে?

নর। আজ বলেচ, দিনে!

নারী। আমার মনে নেই। যদি বলে থাকি তবে আমার অজ্ঞাতে, আমার অনিচ্ছায়।

নর। আমি হেঁয়ালি ভালবাসি না! আমার মাথা জ্বলচে, বুক গলচে...

নারী। তবে আমি চলে যাই—

নর। না, না, যেয়ো না! তোমায় আমি দেখতে চাই, শুধু দেখব, প্রাণ-ভরে জন্মের মত দেখা দেখে নেব!

নারী। তবে যে বল্লে, তুমি আমায় ভালবাস না?

নর। কখন বল্লুম? না, না! তুমি হেঁয়ালি, তাই তোমাকে আমার কেমন লাগে, তাই খুব ভাল লাগে।

নারী। এইখানে বসি! কেমন চাঁদের আলোর স্রোত বয়ে যাচ্ছে! আচ্ছা, চাঁদের আলোর স্রোত, না, চাঁদের আলোর হাওয়া! কোন্‌টা ঠিক?

নর। ছুটোই। কিন্তু তুমি যে আমার পাশেই বসে পড়লে, আমার গায়ে গা দিয়ে!

নারী। তাতে কি! তোমার গায়ে আমার গায়ে মিললে যেন কেমন সুর শুনতে পাই—যেন সেতার বাজে! কেন এমন হয়?

নর। কে জানে! এ কি, তুমি আমার গলা জড়িয়ে ধরচ!

নারী। আমি, না, আমি! কে আমায় বলচে, জড়িয়ে ধরতে, আমি সামলাতে পারছি না!

নর। কে বলছে!

নারী। বোধ হয় চাঁদের আলো। চাঁদের আলো কি কথা কয়?...তুমি কি ভাবচ?

নর। একটা উদাস তটকে মাতাল ঢেউ এসে কেড়ে নিচ্ছে,...নিল বলে! তাহলেই মহাপ্লাবন হয়ে যাবে। সে ভাল কি মন্দ হবে, বুঝতে পারচি না।...কিন্তু আমি সাম্‌লাতে পারব না!

নারী। আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন হারিয়ে গেছি!

নর। আমিও গেলুম বলে। তার পর যে কি ঘটবে, জানি না!

নারী। তুমি যদি এখন তোমার বাহু দিয়ে আমার কণ্ঠ জড়িয়ে ধর...

নর। কি তাতে?

নারী। আমি বারণ করতে পারব না। তার পর যদি আরো কিছু...যদি চুমো দাও, একটা, দুটো, তিনটে, হাজারটা—আমার বাধা দেবার শক্তি নেই!

নর। আমি দেব না।

নারী। কেন দেবে না?

নর। রূপার কাঠির স্পর্শে তুমি ঘুমিয়ে পড়েচ, কাল সোনার কাঠির ছোঁয়ায় যখন জাগবে, তখন বড় ব্যথা পাবে। তোমাকে ব্যথা দিতে চাই না।

নারী। (নিশ্বাস ফেলিল)

নর। রাগ করলে! আচ্ছা, আমার বাহুর মালা তোমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছি!

নর। এবার হাত ছাড়,—আমি যাই এবার।

নারী। সারা রাত এমনি আমার কণ্ঠ জড়িয়ে থাকো। আমার বুকের মধ্যে কি হচ্ছে, যদি জান্‌তে! আমি তোমায় খুব ভালবাসি।

নর। সত্য আমায় ভালবাসো! আমি তোমায় ভালবাসি—চাঁদের আলো ধরণীকে যত ভালবাসে তার চেয়েও ঢের বেশী! অনেক বেশী!

নারী। চাঁদের আলো যেন উস্‌কে উঠ্‌ল! আজ রাতটা কি মিষ্টি!

নর। আমি তোমায় চুমো দেব। তোমার ঐ চোখদুটীতে—কেমন ঐ চোখদুটী, কে বল্‌বে—ঐ চোখ-দুটীতে চুমো দেব!

নারী। দাও।

নর। তোমার ঐ গোলাপের মতো রাঙা, গোলাপের মত নরম গাল দুটীতেও চুমো দেব।

নারী। দাও!

নর। অনেক চুমো দেব। আমার অনন্ত তৃষা! তোমার ঐ প্রবালের মত রাঙা আর ফুলের চেয়ে কোমল, মদের মতন মাতাল-করা ঠোঁটদুটী, ঐ ঠোঁট দুটীতেও—

নারী। নাও!

নর। তোমার মুখখানি আমার মুখের এত কাছে! এ কি সত্য, না, স্বপ্ন! কি জানি, আমার মাথার ঠিক নেই!...তোমার ঠোঁটদুটী আমার ঠোঁটের এত কাছে—ভাবতেও পারছি না!

নারী। সব সত্য,—এই যে আমরা দুজনে চোখে-চোখে চেয়ে রয়েচি...?

নর। সত্য চেয়ে রয়েচি?

নারী। তোমার চোখ থেকে যেন কিসের কিরণ ঝরে পড়চে! চাঁদের আলোর মত! হয়তো চাঁদের আলোই!

— পাঁচ —

দিনের আলোয়

নর। তোমার জন্যে মালা এনেছি সখি! ভোরের

জড়িয়ে আছে! স্বপ্নের মত সুন্দর, তেমনি মিষ্ট, তেমনি গন্ধ!

নারী। তোমার মালা আমি চাইনে!—না, না, দাও——

নর। এ কি, পায়ে দল্‌লে?

নারী। দল্‌লুম, তোমার মালার সঙ্গে তোমার প্রেমকেও।

নর। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—

নারী। যাক্!

নর। যেন একটা অনন্ত দীর্ঘশ্বাস, যেন একটা অফুরন্ত হাহাকার...

নারী। তোমাকে চাইনে, তোমার ভালবাসাও চাইনে।

নর। আমার ভালবাসার অপমান করলে! তার চেয়ে আমায় কেন খুন্ করলে না!

নারী। তুমি আমার পথের কাঁটা, আমার জীবনের অভিশাপ...

নর। আমি চিরদিনের মতো যাচ্ছি। শুধু বল, কাল-রাতে চাঁদের আলোয় আমায় সত্যই চেয়েছিলে!

নারী। মিথ্যা সে!

নর। কে বল্‌বে কোন্‌টা সত্য? হায়, কাল রাতে—

নারী। কাল রাতে কি?

নর। আমি বুঝতে পাচ্ছিনে, কাল রাতে কি করেচি, আমরা আত্মদান করেচি, না, আত্মহত্যা করেচি!

নারী। আত্মদান! আমরা! সে কি...?

নর। হায় নারী, কাল রাতে তুমি কি করেচ, তা যদি জান্‌তে!

নারী। কি করেচি?

নর। আমার কাছে আত্মদান করেছ! আমার গলা জড়িয়ে ধরেছ তুমি! আমি তোমায় অনন্ত আবেগে আমার বুকে টেনে নিয়েছি! তোমার চোখদুটীতে, তোমার গাল-দুটীতে, তোমার ঠোঁটদুটীতে চুমো দিয়েছি...মনে নেই?

নারী। বল কি! আমি আত্মদান করেচি, তোমার কাছে? কি লজ্জা, কি গ্লানি, কি ঘৃণা! আত্মহত্যা করব আমি!

নর। তুমি কেন করবে? আমিই করব। কিন্তু তবু তোমায় ভালবাসি! তোমার মুখ চেয়ে আমি মরতে পারি। আমার প্রেম দিনের আলোর মত সত্য, চাঁদের আলোর মত মধুর!

নারী। মরণ ছাড়া আমার জ্বালা জুড়োবে না! সমস্ত মনটা তেতো হয়ে যাচ্ছে, জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠ্‌চে! কেন তুমি আমার সর্ব্বনাশ করলে! তুমি কাল-সাপ, তোমার চাউনিতে, তোমার নিশ্বাসে আমি জ্বলে যাচ্ছি, পুড়ে যাচ্ছি, মরে যাচ্ছি! ওঃ...

নর। হায়, চাঁদের আলো... (মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল)

নারী। কি কুৎসিত! সাপের মত, লালসার মত শুয়োরের মুখের মত! তোমার এ মূর্চ্ছা যেন না ভাঙ্গে!

— ছয় —

চাঁদের আলোয়

নারী। এ কি, মরে গেছে? সত্য, সত্য? না, না, এখনি জেগে উঠবে। স্বর্গ থেকে অমৃতের ধারা ঝরবে, এখনি জেগে উঠবে!......কৈ, জাগছে না ত! আর কি তবে চাইবে না? সেই চোখদুটী থেকে চাঁদের আলোর মত কিরণ ঝরত! ঐ ঠোঁট-দুটী কি আর নড়বে না, আর কি কথা বল্‌বে না?...বাহুদুটী শীতল হয়ে গেছে... ভালবাসা কি তবে ভুল! ও ভুল যদি জীবনে না ঘটে, তবে জীবনটাই যেন মস্ত ভুল...কে জানে। ও হাসচে! যেন কি স্বপ্ন দেখচে! হয়ত কালকের রাতের কথাই ও স্বপ্নে দেখচে, তাই হাস্‌চে! কালকের রাত কি আর ফিরে পাওয়া যায় না! একটী রাতে কি একটা জীবন ভরে কখনো?...কী সুন্দর ও! ও কি আর চুমো দেবে না?... চাঁদের আলো আজ প্রাণহীন ঠেক্‌চে! বাতাস যেন বাঁশের বনে কেঁদে ফির্‌চে!...তবে আমিই চুমো দিই!

যবনিকা

শিবরাম চক্রবর্ত্তী।

১৬

মাসিমা বাড়ী আসিলে মণি তাহাকে বলিল—"মাসিমা আমি রাঁধতে যাই।" মাসিমা প্রফুল্ল মুখে বলিলেন,—"যাও।" অনুপম কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মাসিমা তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"ওর যা ইচ্ছা হয়, তাই করুক, আজ তোরা ওকে কিছু বলতে পাবি নে।"

অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। পরে হারাণ জিজ্ঞাসা করিল,—"মাসিমা এখন আমি কি করবো?"

"মিসেস মজুমদার বলিলেন,—"তুই বাড়ী ফিরে যা। কি পাগলামি করছিস হারু! ঐ স্ত্রীলোকটী এসে বৌমার মাথায় একটু বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছিল; কিন্তু আজকে তোর বাড়ীতে যে প্রহসনের অভিনয় হয়ে গেছে, তাতে বোধ হয় এতক্ষণ বৌমার ঝোঁক কেটে গেছে। তুই বাড়ী গিয়ে দেখবি, যে তিনি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছেন।"

মাসিমার কথায় কিন্তু হারাণ মন ঠাণ্ডা করিতে পারিল না। সে বসিয়াই রহিল দেখিয়া অনুপম বলিয়া উঠিল,—"তুই উঠবি না? বাড়ী যা না!"

হারাণ রাগিয়া বলিল, -"আমি বসে আছি, তাতে তোর কি ক্ষতি হচ্ছে!"

অনুপম মনের রুদ্ধ আবেগটাকে মিসেস মজুমদারের সম্মুখে প্রকাশ করিবার চেষ্টায় ছিল, বাধা পাইয়া সেও চলিয়া গেল। সে কোনমতে সাহসে ভর করিয়া হারাণের সম্মুখে বলিতে পারিতেছিল না যে, সে এতদিন মণি-মালিনীর অনুপাতে তাহার মানস-সুন্দরীর আদর্শ গড়িয়া রাখিয়াছিল এবং আজ মণির বিবাহের পরিচয়ে সে আদর্শটাকে একটা নিষ্ঠুর কালাপাহাড়ের মত চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। তখনও কিন্তু আশা তাহাকে প্রলুব্ধ করিতেছিল, তার কাণে মাঝে মাঝে কে আসিয়া বলিতেছিল যে, কথাটা মিথ্যা। হালদার সাহেব অথবা অন্য কোন কন্যাদায়-গ্রস্ত ব্যক্তি তাহাকে ভুলাইয়া বিবাহ করিতে বাধ্য করিবার জন্য হারাণের বাড়ীর এই ঘটনাটা রঙ্গালয়ের অভিনয়ের মত সাজাইয়া রাখিয়াছিল।

হারাণ ও অনুপমকে লইয়া মাসিমা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। রান্নাঘর হইতে রন্ধনের শব্দ আসিতেছিল, তাহা শুনিয়া তিনজনেই স্থির করিল যে, মণি একটা কাজ লইয়া ভুলিয়া আছে। অল্পক্ষণ পরে হারাণের নেপালী চাকর আসিয়া বাহির হইতে ডাকিল—"মাইজী!"

মাসিমা উত্তর দিলেন,—"কেন রে? হারাণকে খুঁজতে এসেছিস, বুঝি?" হারাণ তাহা শুনিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল,—"মাসিমা, আমি কিন্তু সেই শত্রু পুরীর মধ্যে এখন একা যেতে পারবো না।"

ধীরেন এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সে এইবার হাসিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া অনুপম আবার চটিয়া গেল; সে বলিল,—"আচ্ছা ধীরুদা, তুই এখানে কেন বসে আছিস? তোর তো আমাদের মতন বিপদ হয় নি! তুই কেন হারুর সঙ্গে যা' না।" ধীরেন বিপদে পড়িল, ক্ষুধার সময়ে হালদার-সাহেব-প্রদত্ত অন্ন সে তখনও জীর্ণ করিতে পারে নাই। সে বলিল, "ভাল রে ভাল, তোর শ্বশুর আমায় পাঠিয়ে দিলেন তোকে ধরে নিয়ে যেতে। আমি সেই জন্যে কাঁদবাড়ী থেকে জগা পাহাড় পর্য্যন্ত উঠে এলুম। তুই যদি তোর মনের কথাটা আগে ব্যক্ত করতিস্, তা'হলে তোকে আসতেই দিতুম না।" ধীরেন এইবার চটিল; সে বলিয়া উঠিল, "নেড়া তোর মত নিলর্জ্জ বেহায়া আর ভূ-ভারতে নাই। তুই যে সেই ভদ্রলোকের মেয়েকে বাগ্‌দত্তা করে রেখেছিস্, আর এখন—"কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অনুপম বলিয়া উঠিল,—"বাগ্‌দত্তা করে রেখেছে কে? মাইরি বলছি ধীরুদা—"

মিসেস মজুমদার বলিয়া উঠিলেন, "নেড়া আমার সামনে ও কি বলতে আরম্ভ করলি!" অপরাধের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া অনুপম চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

সেই সময়ে হারাণের নেপালী চাকর আবার বলিল,—"মাইজী, বহুমা বোলা—"

হারাণ তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "কেন—

বোলা! কুছ নেহি বোলা।" মিসেস মজুমদার হারাণকে থামাইয়া বলিলেন,—"বৌমা কি বলে দিয়েছেন, বলতেই দে না বাছা!" নেপালী বালক ভরসা পাইয়া বলিল, "বহুমা বোলা, মাইজী আউর উসকো চেলা বহুৎ ঝগড়া করতা, বাবুজীকো জল্দি ঘর লে আও।"

হারাণ তাহার চাকরের কথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা দেখিয়া মিসেস্ মজুমদার বলিলেন,—"বৌমা তাদের কাণ্ড-কারখানা দেখে ভয় পেয়েছে হারু, তুই শীগ্গির বাড়ী ফিরে যা। ধীরুকেও সঙ্গে নিয়ে যা। মা-ঠাকৃরুণ আর তার চেলার যে পরিচয় বেরিয়ে পড়েছে, তাতে তারা আর এদেশে মুখ দেখাতে পারবে না। কালকেই বোধ হয় পালাবে। বৌমা ছেলেমানুষ, তিনি এ জাতের মা-ঠাকৃরুণ তো কখনো দেখেন নি, তাই ভয় পেয়েছেন। হিন্দু ধর্ম্মের নামে দেশে যে কত ব্যভিচার চলে যায়, তা আমি যে বুড়ো মানুষ, আমিই বুঝতে পারিনে, বৌমা তো ছেলে মানুষ! তুই আর দেরী করিস্ নে হারু, উঠে পড়্।"

হারাণ উঠিয়াই ছিল, সে ধীরেনের হাত ধরিয়া টানিতেই ধীরেন বলিয়া উঠিল, "আমি কেমন করে যাবো মাসিমা! আমি যে হালদার সাহেবকে এক রকম বলেই এসেছি যে, নেড়াকে যেমন করে পারি আজ তাঁর কাছে পৌঁছে দেব।"

মিসেস মজুমদার বলিলেন, "তোর কথা রাখবার জন্য আমি নিজে নেড়াকে সঙ্গে করে নীচে নেমে যাব, তুই হারুর সঙ্গে যা।" ধীরেন ও হারু চলিয়া গেলে অনুপম হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে একসঙ্গে মিসেস মজুমদারকে অনেকগুলি কথা বলিয়া ফেলিল। রুদ্ধ বর্ষার প্রবাহের মত তাহার মনের গোপন কথাগুলি মিসেস মজুমদারের সমস্ত বাধা-বিপত্তি ভাসাইয়া লইয়া গেল।

অনুপম বলিল যে, ক্ষিরি নাপতিনীর চেলা কখনই মণিমালিনীর স্বামী হইতে পারে না। দেশের সমাজের অথবা মণির আত্মীয়-স্বজনের ভুলে যদি মণিমালিনীর সহিত সে বর্ব্বরের বিবাহই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সেটা বিবাহ নহে, সে বিবাহ অনেকদিন পূর্ব্বে অসিদ্ধ হইয়া গেছে। সে সে-বর্ব্বরকে কখনই মণির অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিবে না, তাহা হইলে দেবতার অপমান হইবে! সে মণিকে লইয়া দূর দেশে চলিয়া যাইবে, যেখানে সে বর্ব্বর যাইতে পারিবে না, বা সমাজ-শাসন ও রাজার শাসন মণিকে সেই বর্ব্বরের সহিত তাহাকে স্ত্রীরূপে বাস করিতে বাধ্য করিবে না, সে সেই দেশেই চলিয়া যাইবে।

মিসেস মজুমদার স্থির হইয়া বসিয়া অনুপমের সমস্ত কথাই শুনিয়া গেলেন, কিন্তু অনুপমের মানসিক উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া তিনি তখন কোন তর্ক তুলিলেন না। অনুপম আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিল। সে যেমন করিয়া পারে, মণির বিবাহের বন্ধন মুক্ত করিবে, সে মণিকে স্বাধীন করিয়া দিবে, তার পর মণির যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিবে। সংসারে কণ্টকময় বনপথে সে মণির পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিতে দিবে না!

আপন-মনে অনেকক্ষণ ধরিয়া বকিয়া অনুপম যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন মিসেস মজুমদার বলিলেন,—"নেড়া, আজ আর ও-কথায় কাজ নেই। এখন চ, তোকে একবার হালদার সাহেবের কাছ থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। আমি বুড়ো মানুষ, কথা দিয়ে ফেলেছি বাবা, আমাকে মিথ্যাবাদিনী করিস্‌নে!" মিসেস মজুমদার ধীরেনকে যাহা বলিয়াছিলেন অনুপম তাহা শুনিয়াছিল; সুতরাং সে আর তর্ক করিতে পারিল না, কেবল বলিল,—"আমি সেখানে গিয়ে কি বলব মাসিমা?"

মাসিমা বলিলেন, "তোর যা মুখে আসে, তাই বলিস। আমি দূরে দাঁড়িয়ে থাকব।"

"মণি বাড়ীতে একা থাকবে?"

"আমি ও-বাড়ী থেকে ফুলকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি।"

টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, ঘন কুয়াশা প্রকাণ্ড তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়া তীব্র বিদ্যুতালোকে স্যানিটেরিয়মের চারিদিকে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। স্যানিটেরিয়মের ডাক্তার একা আপন ঘরে বসিয়া ঘন ঘন নস্য লইতেছিলেন। কুয়াশার মধ্য হইতে অনুপমের সঙ্গে বৃদ্ধা মিসেস মজুমদারকে বাহির হইতে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। মিসেস মজুমদার তাঁহার ঘরে

বসিয়া অনুপমকে বলিলেন, "নেড়া, তুই মিষ্টার হালদারের সঙ্গে দেখা করে আয়। তুই যতক্ষণ না আসবি, আমি ততক্ষণ এইখানেই বসে আছি।"

অনুপম চলিয়া গেলে বৃদ্ধা ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, মিষ্টার হালদার সকলের কাছেই বলিয়াছেন, অনুপম তাঁহার সাক্ষাতে তাঁহার কন্যা লালিকে বিবাহ করিবার অনুমতি চাহিয়াছে এবং তিনিও সে অনুমতি দিয়াছেন। ডাক্তারের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিঃ হালদার বৃষের মত গর্জ্জন করিতে করিতে ডাক্তারের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুপমও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। মিঃ হালদার মিসেস মজুমদারকে বলিলেন, "আপনি আমার জামাইটিকে নিয়ে যেতে চান কেন?" অনুপম আরও চড়া গলায় বলিল,—"আমি আপনার জামাই নই এবং কখনো হব না।" মিঃ হালদার সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন,—"আপনি জানেন যে, আপনি এই ছোকরার কুরুচিকে প্রশ্রয় দিয়ে তাকে অধঃপাতের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনার চরিত্র কি রকম জানিনে, কিন্তু আপনি যে আমার জামাইয়ের চরিত্র দূষিত করে দিচ্ছেন, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি।" হঠাৎ মিঃ হালদারের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, স্যানিটেরিয়ামের শান্ত শিষ্ট নির্ব্বিবাদী ডাক্তার এমন ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন যে, তাঁহার আর কোন কথা বলিতে ভরসা হইল না। ডাক্তার বলিলেন,—"আপনি কার সঙ্গে কথা কচ্ছেন, তা বোধ হয় জানেন না। আমি উপস্থিত না থাকলে নেড়াই বোধ হয় আপনাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে কুকুর দিয়ে খাওয়াতো—। নেড়া যখন আপনার কন্যাকে বিয়ে করতে রাজী নয়, তখন দারজিলিংএর সকলের সম্মানিতা এই বৃদ্ধ মহিলাটিকে অকারণ অপমান করে কেন আর বংশ-পরিচয় দিচ্ছেন!" মিঃ হালদার ব্যাপার বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন।

১৪

সকাল বেলা রৌদ্র উঠিবার পূর্ব্বে বাড়ীর বাহিরে চাঁদমারীর মা-ঠাকরুণের চেলাকে দেখিয়া বৃদ্ধা মিসেস মজুমদার কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। যে স্বচ্ছন্দে প্রায়-বিগত-যৌবনা নারীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন তাহার মনে যে লজ্জা, সম্ভ্রম দয়া ও মায়ার লেশমাত্র থাকে না, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি চেলা বাবাজীকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নাম কি?"

চেলা বাবাজী বলিলেন, "আমার নাম নিতাইসুন্দর চট্টোপাধ্যায়।"

"কি উপলক্ষে আসা হয়েছে?"

"শুনলুম, আমার স্ত্রী এখানে আপনার বাড়ীতেই থাকেন, সেইজন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"বটে, বটে! কাল হারুর বাড়ী মণি বলেছিল বটে যে, আপনি তার স্বামী। বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।"

মণিমালিনী রন্ধন করিতেছিল; তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া মিসেস মজুমদার দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্ত্রী আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া স্বামীকে প্রণাম করিল। স্বামী বলিলেন,—"প্রণাম করাটা যে এখনো ভোলোনি, দেখ্‌চি!"

মণি উঠিয়া দাঁড়াইল; বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, প্রণাম করা ভুলতে যাবো কেন?"

"বিবি হয়েছ, জুতো পায়ে দিয়ে ইস্কুলে মাষ্টারী করতে যাও, অথচ প্রণাম কর্‌তে ছাড়নি!"

"আপনি যে দিন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সে দিন রোজগার করে খেতে বলেছিলেন। কিন্তু আপনি যে ভাবে রোজগার করতে বলেছিলেন, সেভাবে রোজগার করতে পারিনি, মায়ের মুখখানা মনে করে। পিণ্ডলোপের ভয়টা মরণের দিনও তাঁর মন থেকে যায় নি, সেই জন্যে আপনার আদেশ পালন করতে পারিনি।"

"রাগের মাথায় একটা কথা বলে ফেলেছিলুম, বুঝলে গো। সেটা কি এমন করে ইষ্টমন্ত্রের মত মনে করে রাখতে হয়?"

"ঠিক এই ভাবেই মনে করে রাখতে বলেছিলেন বলেই মনে করে রেখেছি।"

"দেখ, যা হয়ে গিয়েছে তা হয়ে গিয়েছে, এখন তুমি

"কোথায় যেতে হবে বলুন ?"

"বাড়ী-ঘর তো সমস্তই ঘুচিয়ে ফেলেছি—তা না হয় আমি এইখানেই আসি। তুমি যখন এ-বাড়ীতে আছ, তখন আমার আর আসতে দোষ কি ?"

"দেখুন, কাল সমস্ত বাঙালী ভদ্রলোকের মেয়েদের সম্মুখে আপনাদের যে পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তাতে আপনার বোধ হয় দারজিলিংএ বাস করা উচিত হবে না।"

"তাতে আর দোষ কি ! পুরুষ মানুষ এ রকম করেই থাকে।"

"আপনার লজ্জা হতে না পারে। কিন্তু আমি তো আর আপনার স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে এখানে বাস করতে পারব না।"

"দেখ মণিকা, বেম্ম বেটাদের সঙ্গে মিশে বিম্মি হয়ে তুমি নিজের অবস্থা ভুলে যাচ্ছ। তোমার মত স্ত্রীকে আমি যে আবার গ্রহণ করছি, এ নিতান্ত অনুগ্রহ করে।"

"আজ্ঞে, আমিও ঠিক তাই মনে করছি, তবে আমি ব্রাহ্মসমাজে মিশলেও বিম্মি হই নি, মাসিমাও ব্রাহ্ম নন—তিনি হিন্দুর মেয়ে, পূজা-জপ-তপ সমস্তই করে থাকেন, কেবল পাহাড়ে দেশ বলে দড়ির জুতো পায়ে দেন। হিন্দুর ঘরে স্ত্রীকে স্বামী অনুগ্রহ করেই নিয়ে থাকেন, সে কথা আমি একদিনও ভুলিনি। তবে এ কথাও আমার মনে আছে যে ঐ ক্ষীরোদা মা, আমার শাশুড়ী-জায়ের পায়ে আলতা পরাতে আসত, আপনি প্রথম দারজিলিংএ এসেছিলেন ঐ ক্ষীরোদাকে গুরু বলে, আর এখন সেই ক্ষীরোদা গুরুগিরি বিসর্জ্জন দিয়ে সমস্ত দারজিলিংএ আপনার সঙ্গে যে সম্পর্ক প্রচার করে বেড়াচ্ছে, তার পরেও আপনি পুরুষ মানুষ, আপনি হয়তো এখানে বাস করতে পারবেন, কিন্তু আমি মেয়ে মানুষ, আমি পারব না।"

"তুমি বচন দিয়ে বুঝি আমায় তাড়াবার চেষ্টায় আছ ! দেখ মণিকা, আমি সমস্তই শুনেছি। তোমার স্বভাব-চরিত্রও যে কিরকম, সে কথাও আমার জানতে বাকী নেই। তোমার জন্য দারজিলিংএর হিন্দুর মেয়েরা স্বামী-পুত্র নিয়ে নির্ব্বিবাদে ঘর করতে পারে না।"

"শুনেছেন যখন, তখন আর কি বলব। আমার

চরিত্র যদি খারাপ হয়, না হয় আমাকে আর নেবেন না। আপনি এসেছেন, তাও আমি জানতুম না। আমি আপনাকে আপনার সংসারে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করতে যাই নি। যে দিন আপনাদের সংসার থেকে দূর করে দিয়েছেন, তার পর থেকে আপনার ছায়াও মাড়াইনি ! আপনি যদি আপনার সংসারে যেতে হুকুম করেন, তবে যাব, তা নাহলে এই পনেরো বৎসর যে ভাবে কাটিয়ে দিয়েছি, সেই ভাবেই আমার দিন কাটবে।"

"দেখ মণিকা, তুমি ভট্চায্যিদের মত লম্বা লম্বা কথা আওড়াতে শিখেছ বটে, কিন্তু আমার চোখে ধুলো দিতে পার্‌বে না। আমি অনেক মেয়েমানুষ চরিয়ে এলুম !"

"তা আমি জানি।"

"দেখ, তুমি যে আমায় বিদেয় করে দিয়ে দারজিলিংএ বিবি সেজে এই ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে ঢলাঢলি করবে, তা হচ্ছে না। আমি এই দারজিলিংএ বসলুম।"

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মণিকা যখন বলিল, "যে আজ্ঞে," তখন তাহার স্বামী আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

নিতাইসুন্দর কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহে। সে ধরিয়া বসিল যে ক্ষীরোদাকে বিদায় করিয়া দিয়া সে দারজিলিংএ এই মণিকার সহিত বাস করিবে কিন্তু মণিও এক কোট্ ধরিয়া বসিয়া রহিল, স্বামীর সঙ্গে সে সর্ব্বত্র যাইতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু দারজিলিংএ বাস করিতে পারিবে না। নিতাই যখন জিজ্ঞাসা করিল, "আমি চলে গেলে তুমি দারজিলিংএ থাকবে তো ?" তখন মণি দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল, "না।"

এই সময়ে গৈরিকমণ্ডিতা মাতাজী ওরফে ক্ষীরোদা আসিয়া দাম্পত্য কলহের মীমাংসা করিয়া দিল। মিসেস মজুমদার দ্বারের অন্তরাল হইতে ছুটিয়া আসিতে আসিতে ক্ষীরোদা ঘরের ভিতরে আসিয়া বলিল, "ফাঁক পেয়ে এসে জুটেছিস্ স্কো! ওঠ্ এখন, আর মাগের সঙ্গে পিরীত কর্‌তে হবে না।"

মিসেস মজুমদার তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "মা, তুমি ঐ বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। এটা হিন্দুর বাড়ী। নিতাই

ক্ষিরোদা একবার মিসেস মজুমদারের মুখের দিকে চাহিল, তার পরে নিতাইসুন্দরের হাত ধরিয়া রাস্তায় চলিয়া গেল।

তুইজনে দূরে অদৃশ্য হইয়া গেলে মিসেস মজুমদার মণিমালিনীর হাত ধরিয়া বসাইলেন। ততক্ষণ পর্য্যন্ত মণি কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়াই ছিল। সে কিন্তু কাঁদিল না। মিসেস্ মজুমদার যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণি, এখন তুই কি করবি?" তখন সে শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "তোমার আশ্রয়ে বাস ঘুচলো মাসিমা। ইস্কুলের চাকরিটা আজই ছেড়ে দেব, কারণ সেখানে আর মুখ দেখাতে পারব না।"

মাসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় যাবি?"

"বন্যার মুখে তৃণের মত ভাস্তে ভাস্তে আপনার তুয়োরে এসে উঠেছিলুম, আবার ভাস্তে আরম্ভ করে দেখি, কোথায় গিয়ে কূল পাই!"

তাহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু মণি কাঁদিল না। সে মাসিমার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, "কেঁদে কি হবে মাসিমা? যে যেমন বরাত নিয়ে আসে, তুনিয়ায় সে সেইভাবেই থাকে। আমরা হিন্দুর মেয়ে, আমাদের সব সহ্য হয়। আমি রাঁধতে যাই—তুমি বেবীকে দিয়ে ইস্কুলে একখানা চিঠি লিখে দাও।"

মিসেস্ মজুমদার তখনই চিঠির কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলেন বটে, কিন্তু এগারোটার সময় বেবী যখন ইস্কুলে চলিয়া গেল, তখনও তাঁহার পত্র শেষ হইল না। মণি আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া স্নান করাইল। তখন মাসিমা দেখিলেন যে সে জামা-জুতা ছাড়িয়া একখানা মোটা তসরের শাড়ী পরিয়াছে। বুদ্ধিমতী মিসেস মজুমদার কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। বিকাল বেলায় হারাণ, ধীরেন ও অনুপম একত্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৫

কাশীর বাঙ্গালীটোলায় এক সঙ্কীর্ণ গলির ভিতরে বড় একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী তথায় বাস করিতেন। মহল্লার লোকে কেহ তাঁহাকে চিনিত না, ধর্ম্মে কর্ম্মে কখনও তাঁহাকে দেখা যাইত না। সেইজন্য কাশীর লোকে তাঁহার নাম রাখিয়াছিল, "বেম্ম বাবু"। ব্রাহ্ম হইয়া লোকে যে কেন কাশীবাস করিতে আসে, এ কথা কাশীবাসীরা বুঝিতে পারিত না। তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা কল্পনা জল্পনা সমস্ত হইয়া গেলেও যখন তাঁহার পরিচয় পাওয়া গেল না, তখন কাশীর লোক ক্রমশঃ তাঁহাকে ভুলিয়া গেল। জ্বালামুখীর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার রন্ধন করিত এবং কুমাউনের এক খাসিয়া অন্য কাজ করিত; কাশীর মজুরনী পর্য্যন্ত তাঁহার বাসন মাজিতে পাইত না। জিজ্ঞাসা করিলে পাচক মণিরাম বা ভৃত্য বীরবল বলিত, বাবু স্ত্রীলোক পছন্দ করেন না। সে বাড়ীতে ডাক হরকরা কোনদিন একখানি পত্রও আনিত না।

একদিন বেলা একটার সময় এক সুন্দরী সধবা স্ত্রীলোক যখন এক মুটের সঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দেবনাথপুরের সমস্ত লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। পাড়ায় পাড়ায় খপর রটিয়া গেল। বিখ্যাত গেজেট্-জাতীয়া মহিলারা দেবনাথপুরের সঙ্কীর্ণ গলির সম্মুখে আসিয়া জমিয়া গেলেন। যে সকল পুরুষ দিবা-নিদ্রার মায়া কাটাইতে পারিলেন, তাঁহারাও বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনেক ডাকাডাকির পর বীরবল আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল এবং মোট লইয়া সকলের সম্মুখে বাড়ীর দ্বার আবার বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। এক ঘণ্টা, তুই ঘণ্টা ক্রমে সমস্ত দিনটা কাটিয়া গেল, তখনও কেহ দেখা দিল না দেখিয়া কাশীর লোকে মণিরামের বাবুকে নিন্দা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

মণিমালিনী যখন আসিল, তখন তাহার মাতুল তারাপদ বাবু আহারান্তে তামাক টানিতেছিলেন। স্ত্রীলোক দেখিলেই তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন। সুতরাং দূর হইতে মণিকে চিনিতে না পারিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং বীরবলকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। মণি আসিয়া তাহাকে যখন প্রণাম করিল, তখন আর তাঁহার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এলি তো খপর দিয়ে এলি না কেন?"

"খপর দেবার কি সময় পেলুম, মামা?" বলিয়াই

মণি নিতাইসুন্দরের দার্জ্জিলিংয়ে আবির্ভাব হইতে ক্ষীরোদা নাপতিনীর সিংহাসনচ্যুতির সংবাদ সবই বলিয়া ফেলিল। তারাপদ বাবু সমস্ত শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চাকরি কি তবে ছেড়ে দিয়ে এসেছিস্?"

"কি করবো মামা? ঐ কীর্ত্তির পরে দার্জ্জিলিংয়ে মুখ দেখানো ভার। তিনি থাকতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু আমি পারিনি।"

"বেশ করেছিস। এখন নাইতে যা।" বলিয়া তারাপদ বাবু সট্‌কার নলে মনঃসংযোগ করিলেন। মণি তখন হইতে এই নীরব পরিবার-ভুক্ত হইয়া গেল।

কাহাকেও না বলিয়া মিসেস্ মজুমদারের সাহায্যে মণি একা দার্জ্জিলিং হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। সে যে বেশে আসিয়াছিল, সে বেশে কেহই তাহাকে দার্জ্জিলিংএর মেম-ডাক্তার বলিয়া চিনিতে পারে নাই। কারণ সে জুতা-মোজা ছাড়িয়া একখানা মোটা শাড়ীর উপরে মোটা চাদর মুড়ি দিয়া পর্দ্দানশীন গৃহস্থের কুলবধূর বেশেই দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করিয়াছিল।

অনুপম আসিয়া মণিকে দেখিতে না পাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। মগবাজার ভুটীয়া বস্তী প্রভৃতি ঘুরিয়া আসিয়া সে দেখিতে পাইল যে ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে মিসেস্ মজুমদার বেবিকে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। যতদিন মণি দার্জ্জিলিংএ ছিল, ততদিন এ কার্য্যটা সেই করিত। বেবির তত্ত্বাবধানের জন্য মিসেস্ মজুমদারকে কোন দিন পরিশ্রমও করিতে হয় নাই। অনুপম তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া মিসেস্ মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মাসিমা, আজ মণি কোথায় গেল?"

মাসীমা বলিলেন—"মণি চলে গেছে, বাবা।"

"সে কি! কোথায় গেল, কখন গেল?"

"কালকের মেলে চলে গিয়েছে।"

সংবাদটা শুনিয়া অনুপম বসিয়া পড়িল। তাহার শুষ্ক মুখ আর নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক দৃষ্টি দেখিয়া বৃদ্ধা মনে বড়ই কষ্ট অনুভব করিলেন। অনুপম যখন শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "যাবার সময় আমাদের একবার বলে গেল না?"

বাবা, সে অবস্থায় তোমরা হয়ত তাকে যেতেই দিতে না! তোমাদের মনে কষ্ট হবে বলে সে লুকিয়ে চলে গেছে। যাবার সময় সকলের নাম করে তার বিদায়ের নমস্কার জানাতে আমাকেই বলে গেছে।"

"সে কোথায় গেল?"

"সে কথা তো বলে যায়নি বাবা। সে অনাথা। স্বামী এসে তাকে আশ্রয়চ্যুত করেছে,—সে যে কোথায় আশ্রয় পাবে, তা কে বল্‌তে পারে! সে বলে গেছে যে যেখানে আশ্রয় পাবে, সেখানকার ঠিকানা তোমাদের জানাবে।"

অনুপম আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারিল না, তাহার মাথার ভিতরে তখন আগুন জ্বলিতেছিল। সে মাসিমাকে প্রণাম না করিয়াই আনমনে চলিতে আরম্ভ করিল এবং পরে বিশ্বনাথ রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে একটা কুকথা বলিয়া দূর করিয়া দিল।

বাজারে তাহার সহিত হারাণের দেখা হইল। সে হারাণের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া তার বাসায় গিয়া উঠিল। শ্রীশ্রী১০৮ মাতাজী তপস্বিনী ওরফে ক্ষীরোদা সুন্দরী নাপিতানী তখনও হারাণের গৃহ পরিত্যাগ করে নাই এবং মণিমালিনী বা মাসিমা যে তাহাদের ভয়ে দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এ কথা জানিতে না পারায় তখনও নিতাই-সুন্দরের উপর খর দৃষ্টি রাখিয়াছিল। গুরু-শিষ্যের প্রণয়-কলহে হারাণের স্ত্রী পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। নিতাইসুন্দর পূর্ণ-যৌবনা পত্নী লাভের আশায় প্রায়-বিগত-যৌবনা মাতাজীর কবল হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টায় ছিল। তাহা জানিতে পারিয়া ক্ষীরোদা তাহার শিথিলিত প্রণয়-বন্ধন প্রাণপণে টানিয়া ধরিয়াছিল। বিগতানুরাগ নিতাইসুন্দরের সহিত তাই সে ঘোর কলহে প্রবৃত্ত ছিল এবং সে অশ্রাব্য কলহ শুনিতে শুনিতে হারাণ পাগল হইয়া উঠিয়াছিল।

হারাণের গৃহে প্রবেশ করিয়া অনুপম সম্মুখেই নিতাই সুন্দরকে দেখিতে পাইল। তাহাকে দেখিয়া তাহার মাথার আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। সে নিতাইসুন্দরের সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই যে এখনও

তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া নিতাই বলিয়া উঠিল, "এই যাচ্ছি বাবা।"

"এখনও যাসনে কেন ?"

অনুপমের প্রবল টানে নিতাই চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ও ক্ষিরীরে, মেরে ফেল্লে।"

আহ্বান শুনিয়া ক্ষীরোদা ছুটিয়া আসিতেছিল কিন্তু সে আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই অনুপম মুক্ত দ্বার-পথে নিতাই-সুন্দরের গৌরবর্ণ দেহ পদাঘাতে খেদাইয়া দিল।

নিতাই ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরোদা সেই মুহূর্ত্তেই হারাণের গৃহ পরিত্যাগ করিল। ক্ষীরোদা তাহাদের জিনিষ-পত্র গুছাইবার জন্য বাড়ীর ভিতরে আসিল বটে, কিন্তু কুল-পুঙ্গবের আর অনুপমের সম্মুখে আসিতে সাহস হইল না। এইরূপে হারাণের চরিত্র-সংশোধন নামক মহাকার্য্যের পরিসমাপ্তি হইল।

হারাণকে সমস্ত কথা বলিয়া অনুপম মনের ভাব নাকচ করিল বটে কিন্তু সে নিজে শান্ত হইতে পারিল না। হারাণ মণির কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল; কারণ সত্য সত্যই সে এই আশ্রয়-বিহীনা দরিদ্র রমণীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাহারা সকলেই জানিত যে মণি অবিবাহিতা হারাণ বা ধীরেন কোনদিন মণিকে দুষ্টচরিত্রা কল্পনাও করে নাই। তাহার দান দরিদ্রসেবা ও পরোপকার তাহাদিগের দুজনকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহারা মণিকে ছোট বোনের মতই ভালবাসিত। অনুপম প্রথম হইতেই ইহাদিগের দুইজনের সঙ্গে ছিল কিন্তু ক্রমশঃ মণি তাহার মনের মানসী-প্রতিমা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রীতি ক্রমশঃ প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। অনুপমের মনের কথা হারাণ জানিত ধীরেন, অনেকটা আন্দাজ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা তিনজনে এ কথা প্রকাশ হইতে দেয় নাই।

অনুপমের পিতা গোবিন্দ বাবু আবগারী বিভাগে চাকরী করিয়া এবং পাহাড়ীদের নিকট প্রচুর পরিমাণে সুদ আদায় করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ধনের খ্যাতি যে বিবাহ-কালে তাঁহার একমাত্র পুত্রের মূল্য বৃদ্ধি করিবে তাহা তিনি জানিতেন এবং প্রচুর ধনের সঙ্গে সুন্দরী

অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কন্যার উপর কন্যা জুটিতেছিল কিন্তু অনুপম বিবাহ করিতে রাজী না হওয়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মনের আশা মনেই রহিয়া গেল। ক্রমশঃ তাঁহার কুল-প্রদীপের উপর ক্রোধ বাড়িতে লাগিল; কিন্তু হিন্দুর সংসারে ক্রোধের মাত্রা নানা কারণে প্রকাশ হইতে পায় না, সুতরাং তাঁহার মনের ক্রোধ মনেই রহিল। নানা কথার সঙ্গে মণিমালিনীর সহিত অনুপমের ঘনিষ্ঠতার কথা তাঁহার কাণে আসিয়া পৌছিল বটে কিন্তু গৃহিণী যখন বলিলেন যে বয়সকালে এ-জাতীয় দোষ মার্জ্জনীয় তখন আর তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

কিছুদিন পরে মিসেস্ মজুমদার মণির পত্র পাইলেন। সে পত্রে যে তাহার কাশীর ঠিকানা জানাইয়া তাহার দাদা তিনজনকে প্রণাম জানাইয়াছে। যে দিন মণির পত্র আসিল, তাহার পরদিন অনুপম দারজিলিং পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। হারাণ ও ধীরেন পরেরদিন তাহার অফিসে সন্ধান করিয়া জানিল যে অনুপম চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বিশ্বনাথ রায় মহাশয় গোবিন্দ বাবুর সুদের টাকা হইতে তিন টাকা খরচ করিয়া তাঁকে একখানি টেলিগ্রাম করিয়া ফেলিলেন।

১৬

দেবনাথপুরার মোড়ে একখানা অতি পুরাতন ত্রিতল অট্টালিকায় অনেকগুলি কাশীবাসিনী একত্র বাস করিয়া যথাসম্ভব ধর্ম্ম ও পরচর্চ্চায় দিন কাটাইতেন। অট্টালিকার দ্বিতলে ও ত্রিতলে অনেকগুলি ঘর খালি পড়িয়া থাকিত—যাত্রীরা আসিয়া কখনও কখনও সেই সমস্ত ঘর ভাড়া লইত। এই বাড়ীর মালিক ত্রিপুরা ঠাকুরাণী। তিনি ব্রাহ্মণ-কন্যা। বর্ণ ঘনশ্যাম, বয়স চল্লিশের উপর, কিন্তু ঊর্দ্ধরেখা অনির্দ্দিষ্ট। শুনিতে পাওয়া যায়, ত্রিপুরা দিদির বিবাহ হইয়াছিল। সে কথা বিস্মৃত হইয়াও তিনি সধবার লক্ষণ পরিত্যাগ করেন নাই। ত্রিপুরা দিদি দেবনাথপুরার সাধারণ দিদি এবং সমস্ত বাঙ্গালীটোলার ত্রিপুরা দিদি। তাঁহার কতকগুলি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সেইজন্য তিনি কাশীবাসিনীদিগের সমাজ বহুপূর্ব্বে অনায়াসেই জয়

উঠিত, আর কাহারও তেমন উঠিত কিনা সন্দেহ। সময় সময় তিনি সত্য সত্য পরোপকার করিয়া ফেলিতেন এবং ইচ্ছা করিয়া কাহারও অপকার করিতেন না। দরিদ্রা মরণ-পথের যাত্রী তাঁর আশ্বাস-বাণী স্মরণ করিয়া নিশ্চিন্ত-মনে অকূলের পরপারে যাত্রা করিত। অন্নহীনা অনাথিনা তাঁহার আশ্রয় পাইয়া অন্নপূর্ণার ক্ষেত্রে অন্নের অভাব বোধ করিত না। এই সমস্ত গুণে কাশীবাসিনীর সমাজ তাঁহার প্রতি সত্যই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তবে যাহারা তাঁহাকে ঈর্ষা করিত তাহাদিগের বুদ্ধির অভাব হইলেই তাঁহার সংস্পর্শে আসিত।

তারাপদ বাবু যে বাড়ীতে থাকিতেন সেটিও ত্রিপুরা দিদির বাড়ী। ত্রিপুরা দিদি যে বাড়ীতে থাকিতেন তাহা তারাপদ বাবুর বাড়ীর দুই-তিনখানা বাড়ী পরে। তারাপদ বাবুকে লইয়া ত্রিপুরা দিদির কোন দিন কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। কারণ তিনি নিজে বাড়ী মেরামত করাইতেন এবং বীরবল মাসের প্রথমে ভাড়ার টাকা দিয়া যাইত। দশ বৎসর কাশী-বাসের পরেও সেইজন্য ত্রিপুরা দিদি তাঁহার বড় ভাড়াটিয়াকে দেখিতে পান নাই। মণি আসিবার পরে হঠাৎ একটা সামান্য কি ব্যাপার উপলক্ষে সকলে ত্রিপুরা দিদির পরিচিত হইয়া গেলেন।

মণি পূর্ব্বে কখনও কাশীতে আসে নাই; সুতরাং রাস্তায় বাহির হইবার ইচ্ছা তাহার অত্যন্ত প্রবল হইলেও সে প্রবৃত্তি তাহাকে তারাপদ বাবুর ভয়ে দমন করিতে হইয়াছিল। তিনি অবশ্য কোনদিন মুখে কিছু বলেন নাই। কিন্তু মণি তাহার মাতুলের স্বভাব জানিত বলিয়াই গঙ্গাস্নানে পর্য্যন্ত যাইত না। নীচের তলায় মণিরাম ও বীরবল বাস করিত বলিয়া মণি নিজে জল উঠাইয়া ত্রিতলের একটী কক্ষে স্নান করিত। কাশীর বানর যে কাশীর অনেক মানুষ অপেক্ষাও বুদ্ধিমান তাহা সে জানিত না এবং মণিরাম ও বীরবল বহুবার সাবধান করিয়া দিলেও সে কথা সে মনে রাখিতে পারিত না। একদিন স্নান করিবার সময় সে তাহার শুষ্ক কাপড়খানা স্নানের ঘরের বাহিরে ফেলিয়া গিয়াছিল। স্নান করিয়া আসিয়া সে দেখিল যে একটী বড় [illegible]

লইয়া ছাদের উপর বসিয়া আছে। বানর যে সাবেক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মতন অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টায় কাপড়খানা লইয়াছিল এবং তাহার অর্থ যে খাদ্য, মণি তাহা জানিত না এবং সে বীরবলকে না ডাকিয়া নিজেই তাকে তাড়া দিতে গেল। কপিরাজ নিশ্চিন্ত মনে তাড়া খাইয়া তারাপদ বাবুর বাড়ীর দুইখানা বাড়ী পরে আর একটা বাড়ীর ছাদে গিয়া বসিয়া রহিল। কারণ ওয়ারেন হেষ্টিংসের মত সে জানিত যে বাঙ্গলা দেশে পীড়ন না করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয় না। কাপড়খানা কোলে করিয়া সে মণির দিকে চাহিয়া রহিল। কারণ সে জানিত যে ওয়ারেন হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদ ও কাশী হইতেই শুষ্ক দেহ পুষ্ট করিয়া গিয়াছিল এবং বীরবল তখনই খাদ্য লইয়া আসিল। এ সময় হঠাৎ বানর-পুঙ্গবের পশ্চাতে একটী স্থূলকায় কদলী পড়িয়া থাকিয়া তাহার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল। এ আসফ্-উদ্দৌল্লাটী ত্রিপুরা দিদি স্বয়ং। কারণ বানর তাঁহার বাড়ীর ছাদের উপরেই আসিয়া বসিয়াছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস যেমন করিয়া বলবন্ত সিংহের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিল বানরও সেইরূপই মণির কাপড়খানি ছাড়িয়া দিয়া আবার তারাপদ বাবুর বাসার দিকে ছুটিল, কারণ সেখানে বীরবল তাহার জন্য ছোলা ভাজা লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

এই সময় ত্রিপুরা দিদি কাপড়খানি হাতে তুলিয়া দেখাইলেন—এবং বীরবল তাহা দেখিয়া নীচে নামিয়া গেল। মণি তখনও সিক্ত বস্ত্রে দাঁড়াইয়া ছিল। সে দেখিল যে ছাদের উপর দিয়া ত্রিপুরা দিদির বাড়ীতে যাইবার একটী পথ আছে। সাহস থাকিলে সে পথে চলিয়া যাওয়া যায়। বীরবল গিয়াছে জানিয়া সেও ছাদের আঙ্গিনা দিয়া ত্রিপুরা দিদির নিকটে চলিয়া গেল। মণির কাপড়খানি হাতে করিয়া ত্রিপুরা দিদি তখনও ছাদে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মণি তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, "কাপড়খানা আমার।" ত্রিপুরা দিদি কিন্তু কাপড় না দিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নতুন এসেছ বুঝি?" মণি বলিল, "আজ্ঞে হঁ্যা।"

"তারাপদ বাবু তোমার কে হন?"

"তোমার নাম কি ভাই ?"

"আমার নাম মণিমালিনী ।"

এই সময় বীরবল নীচে আসিয়া ডাকিল, "ঘর-ওয়ালী মাই ।"

ত্রিপুরা দিদি বলিলেন—"উপরে আয়না মুখ-পোড়া !"

সাদর সম্ভাষণে কৃতার্থ হইয়া বীরবল যখন উপরে আসিল, তখন সে দিদিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। মণিকে পাইয়া ত্রিপুরা দিদি নানা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মণিও অনেকদিন পরে কথা কহিবার লোক পাইয়া বাঁচিল। বীরবল দুই চার মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল, মণি দাঁড়াইয়া রহিল।

ত্রিপুরা দিদি যদি ওকালতি ব্যবসায় করিতেন তাহা হইলে তাহার তাঁর প্রচুর অর্থাগম হইত। তিনি বিচক্ষণ উকিলের মত শওয়াল-জবাব করিয়া জানিবার চেষ্টা করিলেন, সীঁথার সিন্দুর লইয়া মণি কেন আসিয়াছে! কিন্তু এ রকম ক্রশ-একজামিনেশন দশ পনের বৎসর ধরিয়া সহ্য করিয়া আসিয়াছে বলিয়া মণি ধরা দিল না। মণি বলিল যে সে অনাথা, তাহাকে অন্ন দিবার কেহ নাই—সেই জন্যই সে মাতুলের আশ্রয়ে আসিয়াছে। তাহার স্বামী কুলীন; তাঁহার ধর্ম্মপত্নীর অভাব নাই, উপরন্তু অধর্ম্মপত্নী আছে। তিনি মণিকে গ্রহণ করেন না; তাহার মাতুলের কেহ নাই। তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা জামাতা পুত্রবধূ সমস্তই ছিল; কিন্তু একে-একে তারা পরিত্যাগ করিয়া গেলে তিনি কাশীবাস করিয়াছেন। তাহার মাতুল আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম বা ক্রিয়াকর্ম্মে বিশ্বাস করেন না, সেই জন্যই তিনি কাশীবাস করিয়া দেবদর্শনে যান না।

ত্রিপুরা দিদিকে কতক পরিমাণে সন্তুষ্ট করিয়া মণি যখন আঙ্গিনা ডিঙ্গাইয়া বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইল, তখন সে মাথার কাপড় টানিয়া দিতে গেল। তাহাদিগের বাড়ী ও ত্রিপুরা দিদির বাড়ীর মধ্যে যে দুই তিনখানি বাড়ী ছিল তাহার প্রথমটাতেই দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক ঘনকৃষ্ণবর্ণ যুবক সতৃষ্ণ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। মণির পূর্ণ যৌবনে সুগঠিত দেহ সিক্ত বস্ত্রের বেষ্টনীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার সিক্ত কেশ-পাশ সিক্ত বস্ত্রকে এমন ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল যে সেই যুবার দৃষ্টি রুদ্ধ করিবার জন্য মণি মাথায় কাপড় টানিয়া দিতে পারিল না। সেই বিপদ-সঙ্কুল ছাদের পথ দিয়া সে দৌড়াইয়া পলাইতে বাধ্য হইল; কিন্তু তাহার ঘন চঞ্চল দেহের মাধুরী যুবার তৃষ্ণাকে ব্যাঘ্রের ক্ষুধায় পরিণত করিল। সে ভদ্র-মহিলাকে লজ্জিত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিল না; বরং দ্রুতপদে ছাদে উঠিয়া আসিল। মণি তখন চলিয়া গিয়াছে।

মনসা যখন কুপিতা হইয়াছিলেন, তখন বজ্রের ঘর বাঁধিয়াও চাঁদ সদাগরের পুত্র অব্যাহতি পায় নাই। তারাপদ বাবুর সুরক্ষিত দুর্গের মত গৃহ এখন অরক্ষিত হইয়া পড়িল। যুবার ব্যাঘ্রের ক্ষুধা তারাপদ বাবুর গৃহের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে ব্যাপৃত হইল। অর্থের লোভে বীরবল ও মণিরাম টলিল না, কিন্তু সম্মুখের বাড়ীর এক কাশী-বাসিনী টলিলেন। তিনি তারাপদ বাবুর বাড়ীর সম্মুখের ঘরটা এক বৎসরের ভাড়া পাইয়া এক মাসের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বিকালের গাড়ীতে গঙ্গাপুত্র শিবদাস এক বাঙ্গালীকে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। যাত্রীর পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া ত্রিপুরা দিদি ত্রিতলের ভাল ঘরটা দৈনিক এক টাকায় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া নিজে তাহার রন্ধনের ভার লইলেন। ব্যাঘ্র তখন উৎকট ক্ষুধার তাড়নায় সম্মুখের ঘরে ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে।

ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিশর-কাহিনী

সভ্যতা-হিসেবে মিশরের নাম ভারতবর্ষের পরই উল্লেখ-যোগ্য। তবে অনেকের যে ধারণা মিশর অর্থে শুধু ধূ ধূ-মরু, আর তার বুকে পিরামিডের উচ্চ শির, তা নয়।



বাদশাহ্ ফাদ্

প্রাকৃতিক দৃশ্য-বৈচিত্র্যেও মিশরের মহিমা অত্যুজ্জ্বল। রাজনীতির দিক দিয়াও ভারতের সহিত মিশরের তুলনা করা যাইতে পারে। বহু প্রাচীন যুগ হইতে বিদেশীয় আক্রমণে ভারত যেমন জর্জ্জরিত হইয়াছে, মিশরও ঠিক তেমনি। ভারতের ঐশ্বর্য্য-কাহিনী অনেক বিদেশীয়কে তার দিকে যেমন প্রলুব্ধ করিয়াছিল, মিশরের ঐশ্বর্য্যও তেমনি বহু বিদেশীকে চিরদিন প্রলুব্ধ করিয়াছে—অথচ ভারতের ন্যায় মিশর আজো তার এমন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে, যা' অপর কোথাও দেখা যায় না। ভারত আজ ইংরাজের অধীন, মিশরের ভাগ্যও তাই—কিন্তু সম্প্রতি একটু হাওয়া ফিরিয়াছে!

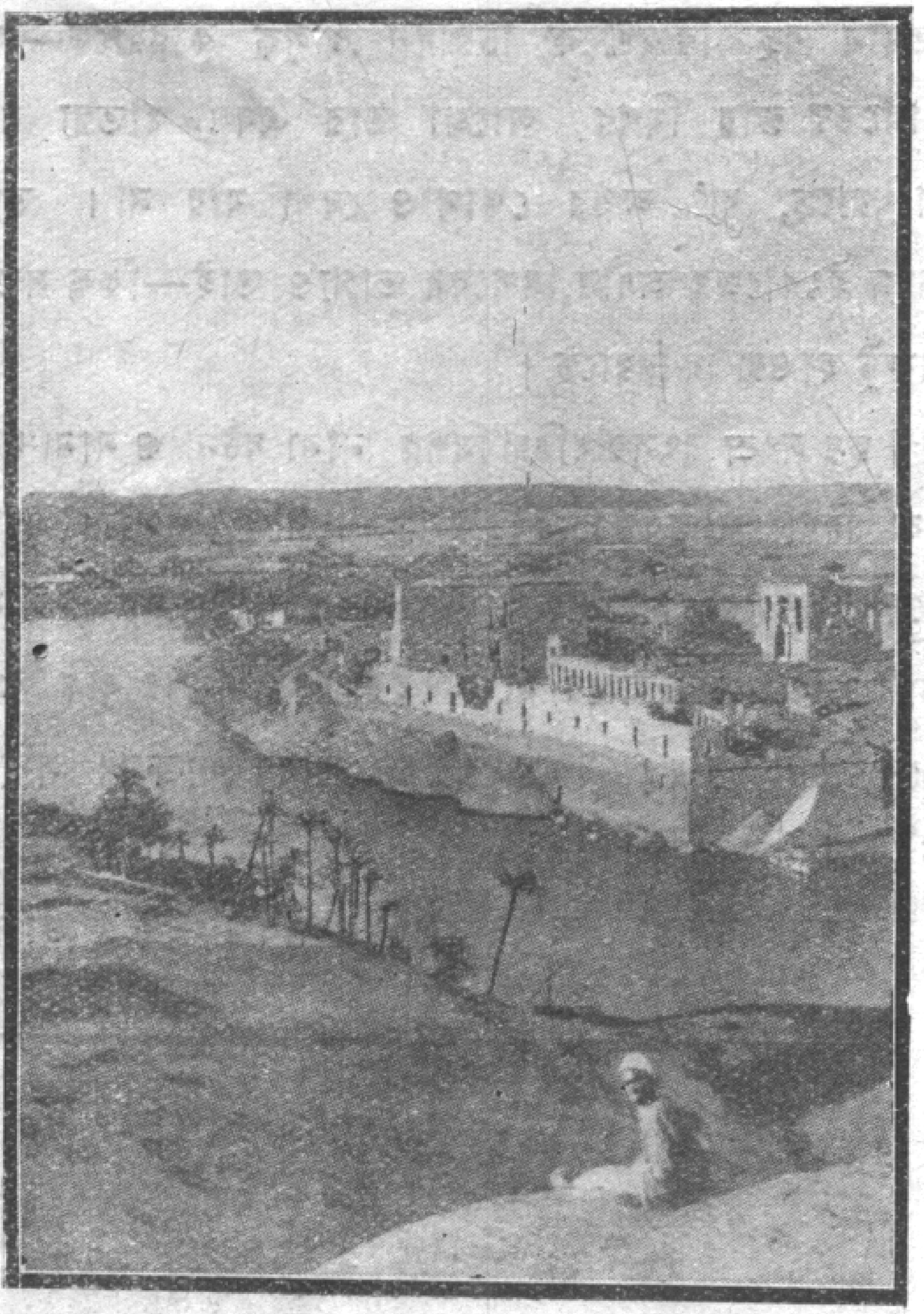
ছয় সহস্র বৎসর ধরিয়া মিশর নানা ঘটনা ও নানা দশার মধ্য দিয়া আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে। নানা জাতির সঙ্গে মিশরীর প্রবল সংঘর্ষ বাধে—এবং মিশরের এমন সঙ্কট কালও আসিয়াছিল যে মনে হইয়াছিল, মিশর বুঝি এবার একেবারেই যায়! কিন্তু মিশর সে-সব আক্রমণ সহিয়াও টিঁকিয়া রহিয়াছে!

এখন মিশরী অধিবাসীরা অধিকাংশই জাতিতে



কাইরো—মরুর তরী

মুসলমান। আরব হইতে মিশরে মুসলমান ধর্ম্ম আসিয়া প্রভাব বিস্তার করে। তার পূর্ব্বে মিশর ছিল ইশাইয়ের রাজ্য। এই ইশাই জাতি ছিল প্রাচীন মিশরীয় বংশ-



ফিলই-দ্বীপ

সম্ভূত। মুসলমান-প্রভাব আজ মিশরকে ছাইয়া ফেলিলেও প্রাচীন ইশাই ও ইহুদী জাতি এখনো মিশর হইতে লোপ পায় নাই।

মিশরে সভ্যতা প্রথম জাগে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে। সর্ব্বপ্রথম মিশরকে আক্রমণ করে ইরাণী জাতি। সে আক্রমণে ইরাণী জয় লাভ করে ও মিশর তাহাদের কর-কবলিত হয়। তারপর য়ুনানীর হাতে ইরাণীর পরাজয় হয়। বর্ত্তমান আলেকজান্দ্রিয়া নগরের পত্তন করেন দিগ্বিজয়ী সেকন্দর শাহ। য়ুনানী অধিকারের কালে মিশর ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা খুব সমৃদ্ধ হইয়া ওঠে। তারপর রোমান্ আক্রমণে য়ুনানীর পরাভব হয়; এই সময় মিশর জাতি ইশাই ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এবং রোমানদের হাতে মিশরের প্রাচীন ভাষাও বিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তারপর ৬৭৯ খৃষ্টাব্দে আরব আক্রমণ হঠাইতে মিশর অক্ষম হয় এবং আরবী প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে মিশরী জাতি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এই সময়ই আলেকজান্দ্রিয়ার সুবিখ্যাত পাঠাগার আরব-সৈন্যের হাতে ভস্মস্তূপে পরিণত হয়। আরবীর পর মিশরে তুর্কীর প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তারপর ফরাসী বীর নেপোলিয়ন তুর্কীকে হারাইয়া মিশর জয় করেন। পরে ইংরাজ তুর্কীর সঙ্গে মিলিয়া ফরাসীর হাত হইতে মিশর ছিনাইয়া লয়। আজ মিশর ইংরাজের অধীন।

ইংরাজ-অধিকারের সময় মিশরে মহম্মদ আলির প্রভাব ছিল বিলক্ষণ। মিশরের মমলুক-সেনা ছিল মহম্মদ আলির অধীন। সেই সৈন্য-দলের সহায়তায় মহম্মদ আলি তুরস্কের সহিত সম্পর্ক কাটিয়া স্বাধীনভাবে মিশরের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। তুরস্কের সুলতান তাঁকে শাসক বলিয়া মানিয়া লন এবং তাঁকে উপাধিও দেন পাশা। তার উপর 'খেদিভ্' বা বাদশার উপাধিও 'পাশা'কে দেওয়া হয়। কর-হিসাবে তুরস্ককে মিশরের খেদিভ্ নামেমাত্র কিছু উপঢৌকন পাঠাইতেন।



ফিলই দ্বীপের মন্দির

মহম্মদ আলির সময় মিশরের বহু রাজনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। শিক্ষা-প্রচার, উত্তরাধিকার আইন, এ দুইটা মিশরে প্রচলিত হয় এই সময়। মহম্মদ আলির পর চারিজন খেদিভের হাতে মিশর শান্তিতেই দিন কাটাইয়া-



অস্থুয়ানের বাজার

ছিল; কিন্তু ষষ্ঠ খেদিভের সময় য়ুরোপীয় বণিকের প্রাধান্য মিশরে অত্যন্ত বাড়িয়া ওঠে। তার ফলে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ এখানে আপন অধিকার কায়েমী করিয়া ফেলে। খেদিভ্ নামে মাত্র শাসক ছিলেন। তারপর বিগত মহাযুদ্ধের সময় তুর্কীর বিরুদ্ধে মিত্ররাজ্যগুলি যুদ্ধ ঘোষণা করিলে ইংরাজ মিশরের রাজদণ্ড হাতে তুলিয়া লয়। খেদিভ্ তৌফীক তখন ছিলেন তুরস্কে। উঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁর ছোট ভাই হুসেন পাশাকে ইংরাজ সিংহাসনে বসাইয়া দেয়। ভূতপূর্ব্ব খেদিভ্ তুরস্কের পক্ষে থাকায় ইংরাজ হুসেন পাশাকে খেদিভ্ করিয়া রাজ্যপরিচালনার জন্য এক হাই-কমিশনার নিযুক্ত করেন। এ-সময় আবার মিত্ররাজ্যগুলিও ইংরাজকে প্রভূত সহায়তা করে।

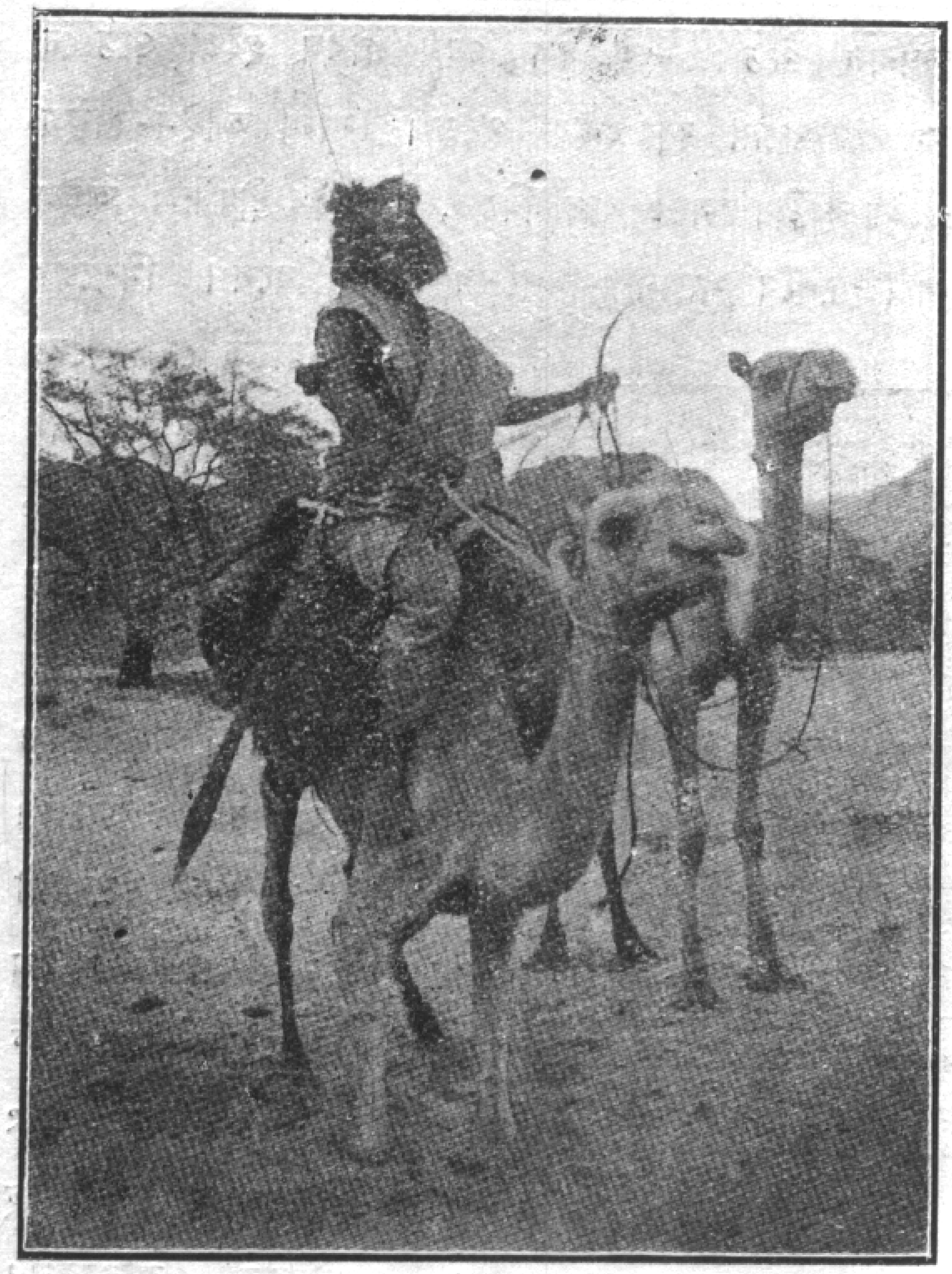
তারপর যুদ্ধ শেষ হইলে মিশরের রাষ্ট্রীয় নেতা জগলুল পাশার নেতৃত্বাধীনে মিশরে স্বাধীনতার জন্য প্রবল আন্দোলন ওঠে। এই দল এমন প্রবল হইয়া ওঠে যে তাকে ঠেকানো দায় হইয়া পড়ে। নানা আইন-কানুন খাড়া হয় রাষ্ট্রীয় দলকে বাধা দিতে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় দল অটল রহিল। শেষে মিলনার-মিশনের বৈঠক বসে। মিশরের রাষ্ট্রীয় দল উহাতে যোগ দেয় নাই—অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করিল। লর্ড মিলনার ব্যর্থ-মনোরথ হইলেন—মিল্‌নারের বৈঠকে সাক্ষ্য সংগ্রহ হইল না। ওদিকে মিশরীর দলে অসন্তোষও অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। তখন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরাজ আপন শাসন উঠাইয়া লইতেছেন বলিয়া এক ঘোষণা জারি করিলেন এবং মিশরের সুলতানকে বাদশাহ বলিয়া স্বীকার করিলেন।



নীল নদী—স্নানের ঘাট

এই সময় মিশরের সিংহাসনে ছিলেন বাদশাহ ফাদ্।

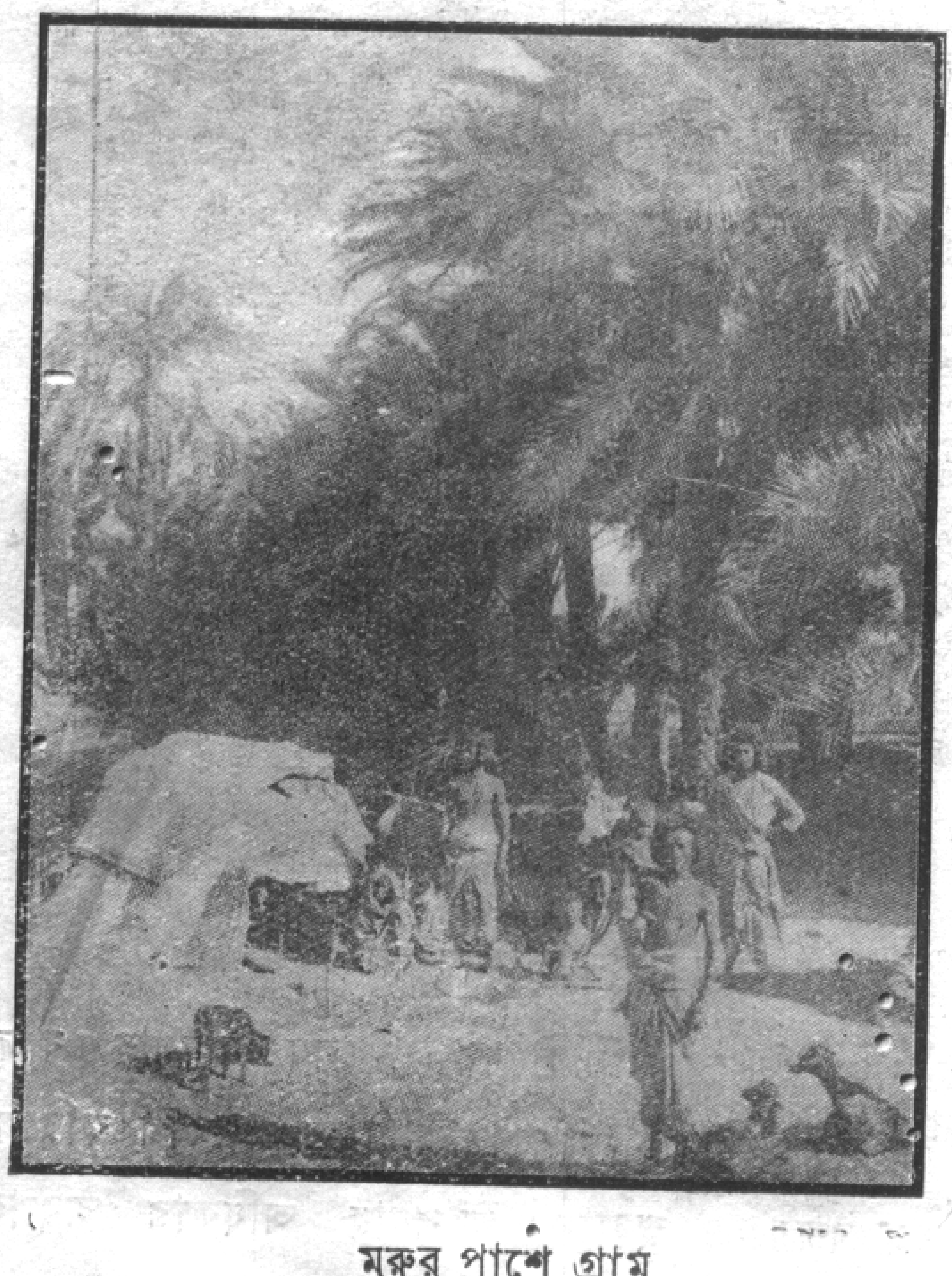
ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মিশরের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেও সুয়েজ বন্দর ও সুদানে আপনার অধিকার অব্যাহত



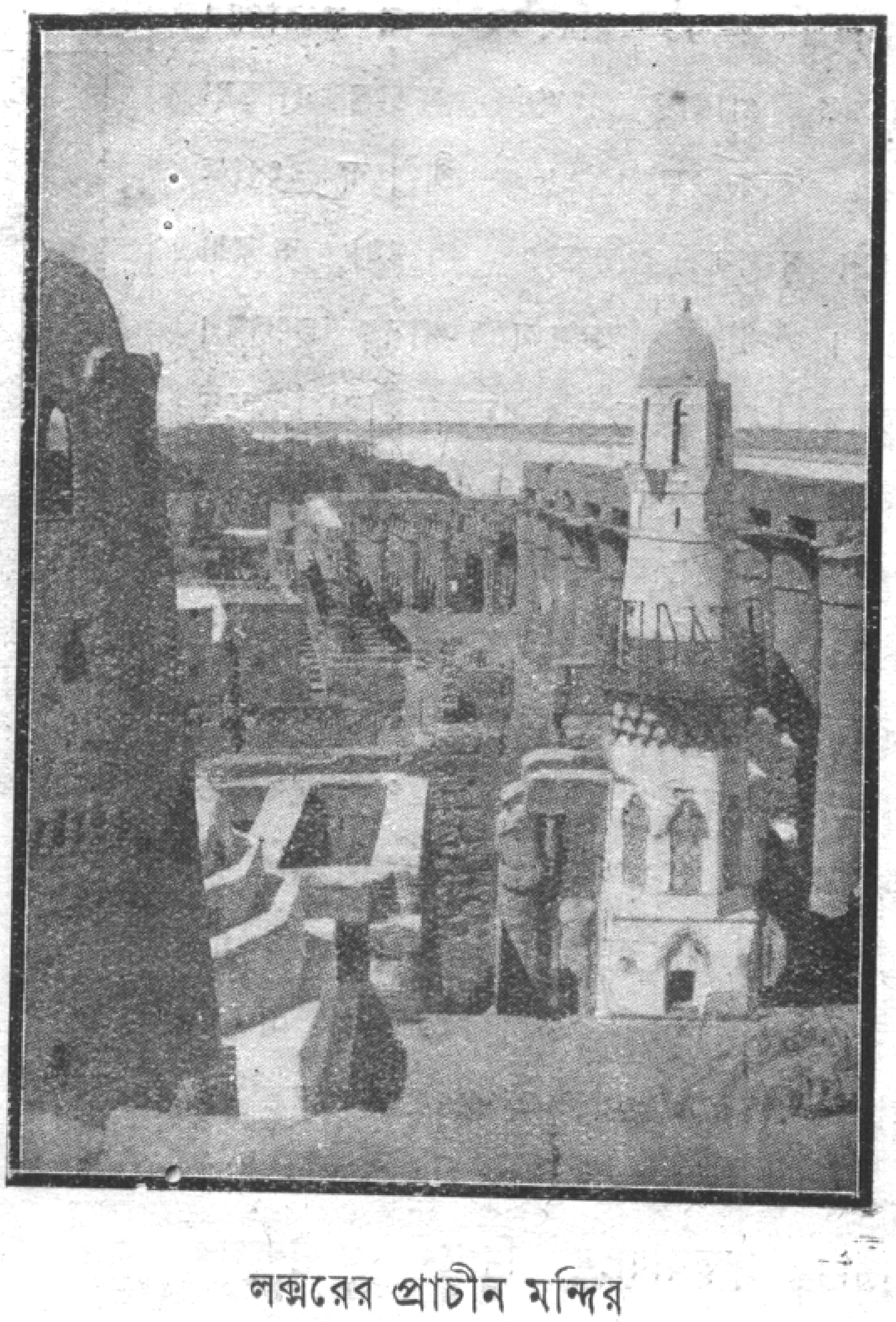
মরুর বুকে ডাকু



থীব্‌সের এক প্রাচীন মন্দির



মরুর পাশে গ্রাম

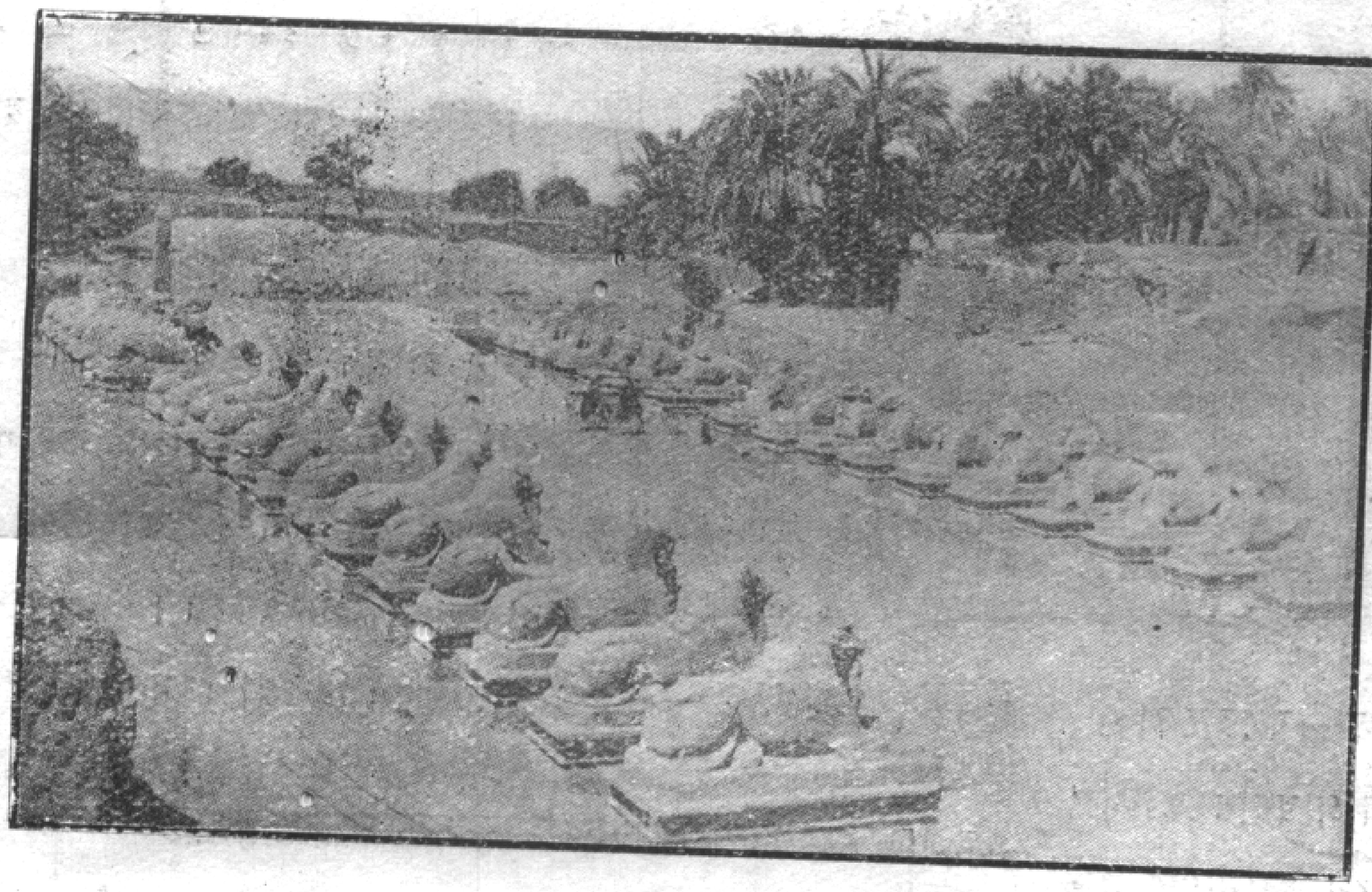


লক্সরের প্রাচীন মন্দির

রাখিয়াছেন। মিশরের শাসন-ভার এখন মিশরীর হাতে; শাসন-সভার মতানুযায়ী রাজকার্য্য পরিচালিত হয়। শাসন-সভার সদস্যেরা অধিকাংশই মিশরী; জগলুল পাশা তাঁহাদের নেতা।

মাইল ফসলের ক্ষেত—বাকী মরুভূমি। এই ডেল্টা-প্রদেশ-সমূহে যত ধনী ব্যবসায়ীর বাস।

মিশরে ইংরাজ-প্রভাবের সঙ্গে রেলোয়ে লাইন পাতা হইয়াছে চতুর্দ্দিকে প্রচুরভাবে। একটা লাইন নীলের তীর ধরিয়া চলিয়া গিয়াছে বরাবর—সৌখীন বিলাসী যাত্রীর পক্ষে এ পথে ভ্রমণ বড় আরামের। রেলের গাড়ীতে আরামের আসন, আর বাহিরে প্রকৃতির অপরূপ লীলা-মাধুর্য্য! পাশ্চাত্য যাত্রীরা প্রায়ই কাইরো অবধি নৌকায় বেড়ান। নৌকাও নানা গড়নের আছে। কাইরো সহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য কাশী ও কাশ্মীরের কতক অনুরূপ। কাইরোর কাছেই লক্সর। এই লক্সরে প্রাচীন মিশরের কীর্ত্তির বহু স্মৃতিচিহ্ন পড়িয়া আছে; ইহার কাছে প্রাচীন থীব্‌সের ধ্বংস-স্তূপ।



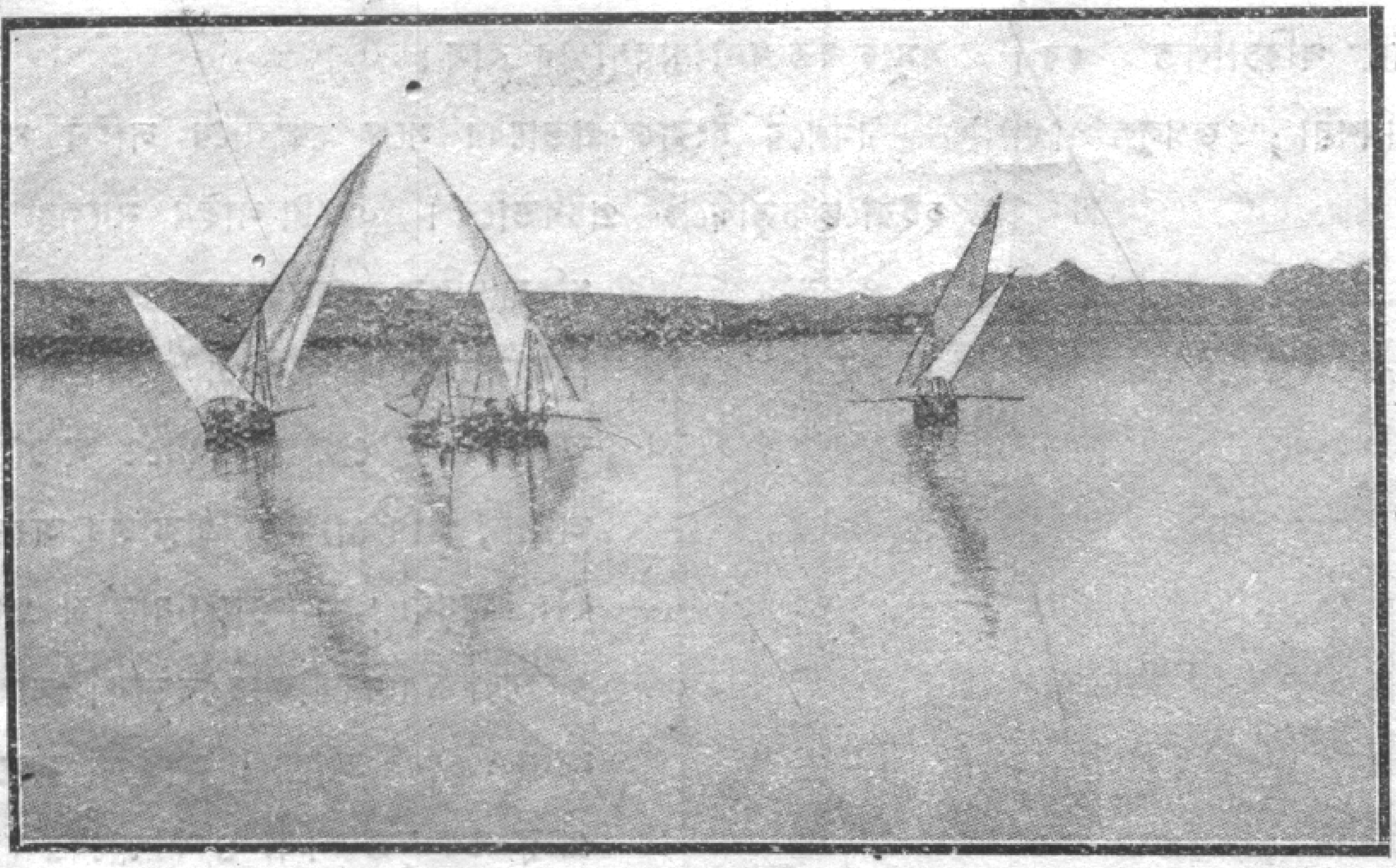
মিশরের স্পিন্‌ক্‌স্‌-মূর্ত্তি

নীল নদীর নাম হইতে মিশরের নামের উৎপত্তি। নীলের বহু ধারা মিশরের প্রকাণ্ড ভূ-ভাগের বক্ষ বহিয়া চলিয়া গিয়াছে। এইজন্য মিশরে কৃষির উপযোগী বহু ভূখণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। নীলের তীরে তীরে বিস্তীর্ণ ভূভাগ-সমূহ কুবেরের ধন-ভাণ্ডারের মতই সমৃদ্ধ। নানা ফসল এই-সব স্থানে প্রচুর ভাবে উৎপন্ন হয়। নীলে প্রতি বৎসর বন্যা আসে—এই বন্যার জল নীলের তীর ছাপাইয়া বহু স্থল জলমগ্ন রাখে; এক সপ্তাহ পরে জল নামিয়া গেলে সেই সব স্থানে এক রকম পলি পড়ে, তার উপর বীজ বুনিলে বিনা-পরিশ্রমে প্রচুর ফল পাওয়া যায়। নীলের ডেল্টা-প্রদেশে বারো মাস ফসল ফলে। এই প্রদেশের পরিধি একলক্ষ বর্গ মাইল। তার মধ্যে বারো হাজার



ইস্‌নের পথ

এই থীব্‌সের মত মনোহর স্থান পৃথিবীতে খুব অল্পই আছে। সেকালের প্রাচীন মন্দির এখানে আজও বর্ত্তমান। তা ছাড়া বড় বড় পথ, ঘাট, আর বিচিত্র মন্দির-শ্রেণী,—নিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া বহু মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ চারু হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার এক বিরাট



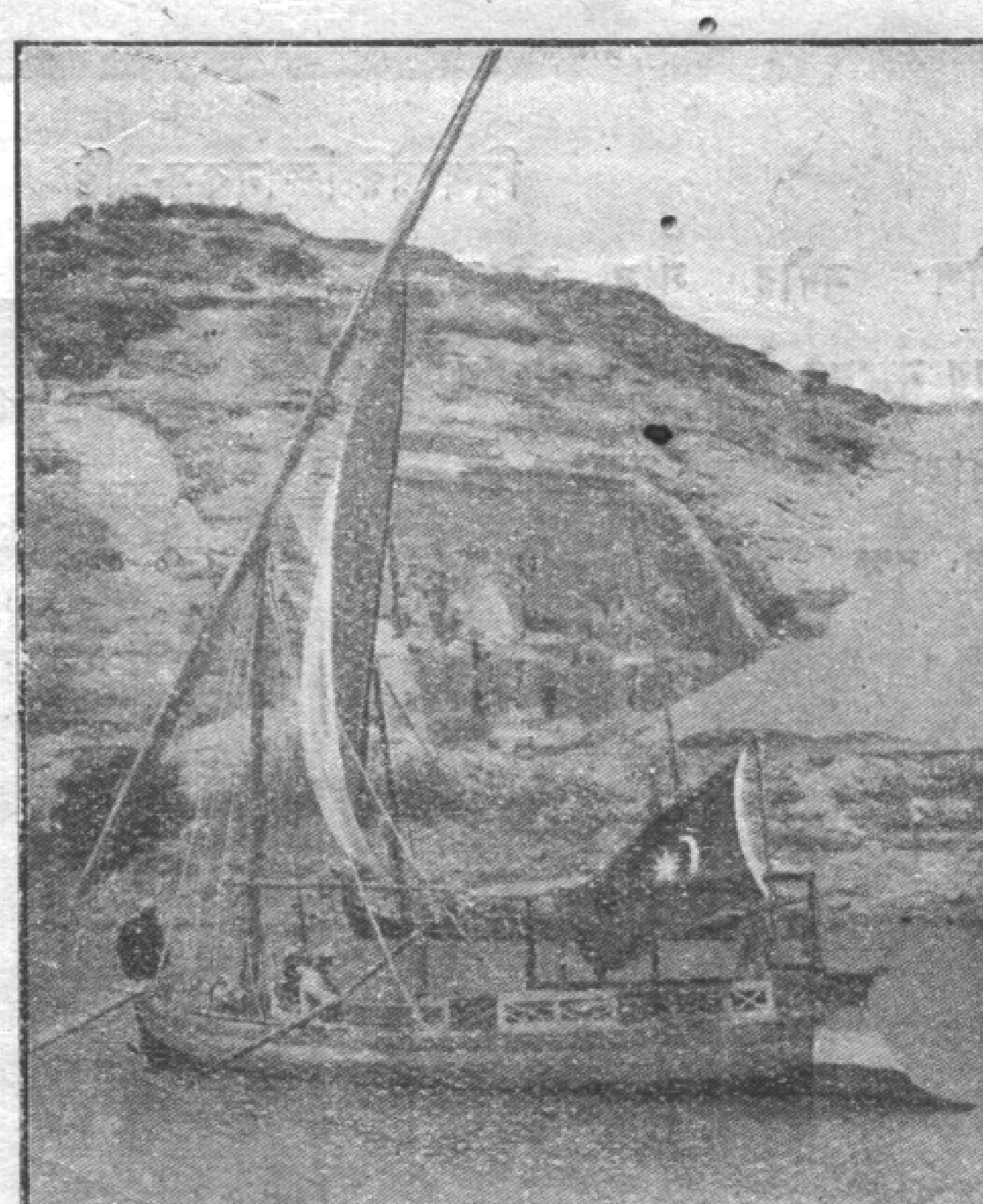
নীল নদীবক্ষ—করোস্কো

যে দেখিলে মনে হয়, সদ্য তৈয়ারী! এখানে চারজন ফ্যারোর পাথরে-গড়া প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে—এই মূর্ত্তি লইয়া যাইবার জন্য হজরত মূশা এক-কালে নিউবিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন।

মিশরীর অতিথি-পরায়ণতা ভুবন-প্রসিদ্ধ। এখনো মিশরের গ্রামে গ্রামে বহু অতিথিশালা আছে—সেখানে আহারেরও ব্যবস্থাও চমৎকার। এদেশে গ্রীষ্মকালে হিন্দুরা যেমন জলসত্র খুলিয়া পুণ্যসঞ্চয় করেন, মিশরে বারো মাস ধরিয়াই তেমনি পান্থদের পানের জন্য গৃহস্থেরা মিষ্ট সরবৎ বিতরণ করেন।

সভ্যতার মৌন সাক্ষ্য স্বরূপ আজো অপূর্ব্ব গরিমায় জাগিয়া আছে—"প্রথম প্রচারিত" এই "বন-ভবনে, জ্ঞান-ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী!" পুরাকালে এই থীব্‌স্‌ই ছিল মিশরের রাজধানী! সিংহদ্বারের অংশ-বিশেষ এখনো বর্ত্তমান আছে।

মিশরের দক্ষিণ প্রান্তে অসুয়ান খুব সমৃদ্ধিশালী নগর। মিসর-যাত্রীরা অসুয়ানে আসিয়া আরামে বাস করে—এখানে বড় বড় হোটেল আছে; থাকিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হয় না। এই নগরের দক্ষিণে এক বাঁধ আছে—বাঁধের কাছে ফিলই দ্বীপ, পৃথিবীর বুকে কে যেন ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে! এই দ্বীপে বহু প্রাচীন মন্দির আছে—কতকগুলি জলটুঙির মত—সেগুলির নির্ম্মাণ-পারিপাট্য দেখিয়া সমঝদার আর্টিষ্টেরও তাক্ লাগিয়া গিয়াছে। অসুয়ানে পূর্ব্বে অসভ্য জাতিরা বাস করিত; এর কাছেই নিউবিয়া। নিউবিয়ার প্রধান নগর করোস্কো। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচীন মিশরীয় রীতি-নীতি এখনো কিছু বিদ্যমান আছে। এখানকার আবু সিম্বলের মন্দির আগাগোড়া পাথরে গড়া; মিশরী মিস্ত্রীর পাকা হাতের কারিগরি—এমনি নির্ম্মাণ-কৌশল যে এইটাই মিশরের সেরা মন্দির বলিয়া পরিচিত। কত হাজার বৎসর পূর্ব্বে এ মন্দির রচিত হইয়াছে, কিন্তু কালের ভ্রূকুটি সহিয়া আজো এ মন্দির এমনু অটুট রহিয়াছে



আবু সিম্বলের মন্দির ও মিশরের নৌকা

মিশরে পায়রার বড় আদর। সেখানে ডাকের চিঠি-পত্র



মিশরের এক প্রাচীন মন্দির

বহিত এই পারাবতের দল। মিশরে পারাবত কেহ মারিতে চাহে না; মারিলে তাকে দণ্ড দিতে হয়। পারাবত প্রতিপালন করা মিশরে ধর্ম্ম-বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পারাবতের দল যাহাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, এ জন্য প্রায় প্রতি গৃহেই টঙ তৈয়ার করা আছে।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

মরাঠা সমাজের উদারতা

রাষ্ট্র, সমাজ বা জাতি যখন স্বাধীন-ভাবে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়, তখন সে জাতীয় জীবনের ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান বুঝিয়া নিজের সমাজ-শরীরকে উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র ও স্বাস্থ্য-সম্পন্ন করিয়া গড়িয়া তুলিতে একটুও দ্বিধা বা সঙ্কোচ করে না। মহারাষ্ট্রের জাতীয় জীবনে এমনি এক গৌরবের দিন আসিয়াছিল, যখন এক নবীন প্রেরণায় সমগ্র জাতীয় জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং গতানুগতিকের পন্থা ছাড়িয়া, তাহার নির্য্যাতিত, পতিত ভাইগুলিকে সাগ্রহে আবার বুকে তুলিয়া লইয়াছিল। আজকাল যদি কেহ বাধ্য হইয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং পরে আবার স্বধর্ম্মে ফিরিয়া আসিতে চায়, অমনি সমাজ তাহাদের চোখ রাঙাইয়া বলে, সরে যাও, পতিত তুমি, ম্লেচ্ছ তুমি—ছুঁয়ো না।" কিন্তু যেদিন মরাঠার জাতীয় জীবনে স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল, যেদিন মরাঠার বিজয়-দুন্দুভি ভারতকে কাঁপাইয়াছিল, সে দিন সে তাহার ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত মরাঠাদের আবার সমাজে পুনর্গ্রহণ করিয়াছিল। তৎকালীন উদার মরাঠা সমাজের সৎসাহসের দুইটি উদাহরণ আমরা উল্লেখ করিব।

ফলটনের সুবা লইয়া ১৬৪৪ সনে শিরবলের নিকট মুধোজী নিম্বালকরের সহিত বীজাপুরের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মুধোজী হত এবং তাঁহার পুত্র বজাজী নিম্বালকর বন্দী হন। পিতার অপরাধে সুলতান, পুত্র বজাজীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন; পরে সামন্ত সর্দ্দারগণের অনুরোধে সুলতান বলিলেন, বজাজী যদি ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে এবং তাহাকে কতকগুলি জায়গীরও দেওয়া হইবে। প্রথমে বজাজী ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, পরে বুঝিয়া দেখিলেন, যদি তিনি সুলতানের আদেশ-মত মুসলমান না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। চারশ' বৎসর ধরিয়া বংশানুক্রমে যে জমীদারি তাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন, তাহা বাজেয়াপ্ত হইবে, তিনি প্রাণ হারাইবেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুত্র-কন্যাকেও নৃশংসভাবে ঘাতকের হস্তে মরিতে হইবে। নানারূপ বিবেচনার পর তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণে সম্মত হইলেন এবং সুলতান-কন্যার পাণি-প্রার্থনা করিলেন; সুলতান সানন্দে বজাজীকে কন্যাদান করিলেন। যৌতুক-স্বরূপ মরাঠা সর্দ্দার অনেকগুলি জায়গীরও প্রাপ্ত হন।

মুসলমান হইবার পর বজাজীর প্রাণে অশান্তির আগুন

জ্বলিয়া উঠিল। নিজের সমাজে নিজের জাতির মধ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রাণ তাঁহার ছটফট করিতে লাগিল, অনুতপ্ত হৃদয়ে তিনি স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন ছত্রপতি শিবাজীর জননী জীজা বাঈয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া বজাজী তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন এবং সমাজে একটু স্থান প্রার্থনা করিলেন। বজাজীর মত রণ-নিপুণ বীর মুসলমান হইয়া পরের মত দূরে সরিয়া থাকিলে, মরাঠা শক্তি যে কত ক্ষীণ হইয়া পড়িবে, তাহা ভাবিয়া জীজাবাঈ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। শিবাজী তখন মরাঠা-শক্তি সংগঠন করিতেছেন; অন্ধ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, এই নব বল-দৃপ্ত মরাঠা শক্তিকে দুর্ব্বল করা, জীজা বাঈ যুক্তি-সঙ্গত মনে করিলেন না; বজাজীকে পুনরায় সমাজে গ্রহণের জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। শিঙ্গনাপুরের শম্ভু মহাদেবের মন্দিরে মহারাষ্ট্র সমাজ-নেতাগণকে একত্র করিয়া সকলকে তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, বজাজী স্বেচ্ছায় ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই এবং ইহাতে তাঁহার নিজের কোন দোষ নাই; সুতরাং তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অতঃপর শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া মরাঠা সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিল। তবু জীজাবাঈ নিঃশঙ্ক হইতে পারেন নাই। পাছে কোন মরাঠা বজাজীর সহিত অন্যায় আচরণ করে, সেজন্য তিনি বজাজীর পুত্র মহাদাজীর সহিত ছত্রপতির কন্যা সখুবাঈএর বিবাহ দিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, যে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই বজাজী ঘৃণা বা উপেক্ষার পাত্র নহেন। কন্যার বিবাহের পর শিবাজী জামাতাকে কয়েকখানি গ্রামের প্রধান পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই নিয়োগ-পত্রে তিনি প্রজা সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়া দিলেন, যেন কেহ মহাদাজীর সহিত মন্দ ব্যবহার না করে।*

ছত্রপতি শাহুর রাজত্ব কালেও এইরূপ একজন মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত মরাঠাকে পুনরায় সমাজে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

চাণ্ডার গোদ পরগণার জিন্তীর পুতাজী বীন মুধোজী, মরাঠা সর্দ্দার দাবলজীর অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৭১৬ সনে দাবলজী সুরাট আক্রমণ করেন, এই যুদ্ধে পুতাজী মোগল কর্ত্তৃক বন্দী হন। মোগলরা জোর করিয়া পুতাজীকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। প্রায় এক বৎসর পুতাজী মুসলমানদের সঙ্গে ছিলেন।

ইতিমধ্যে পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ সসৈন্যে দিল্লীতে আসিলেন। এই সময় পুতাজী গুপ্তভাবে মরাঠা সৈন্যের সহিত মিলিত হন এবং স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। মুসলমানেরা তাঁহাকে জোর করিয়া ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছে, এ কথা তিনি গ্রামের সকলকে বলেন এবং তাঁহাকে পুনরায় সমাজে লইবা'র জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধে জিন্তী, হিঙ্গনী, ভাঁবোরে প্রভৃতি গ্রামের সমাজ-পতিগণ একযোগে ছত্রপতি শাহুর নিকট, পুতাজীর ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম গ্রহণের বিশদ বর্ণনা দিয়া, তাঁহাকে পুনরায় স্বধর্ম্মে গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া গ্রামের প্রধানগণকে পুতাজীকে পুনরায় স্বধর্ম্মে গ্রহণ করিবার জন্য শাহু বিভিন্ন আদেশ-সূচক পত্র দিয়াছিলেন। পত্রের শেষাংশ এইরূপ,—"পুতাজী মজকুর ইয়াজবর মোগলানে বলাৎকার করূন ভ্রষ্ট কেলে। হে কাঁহী আপলে সন্তোষে ভ্রষ্ট জাহলা নাহী। ইয়া করিতা ইয়াস গোতা মধ্যে ঘ্যাবয়াচি আজ্ঞা কেলী আহে। তরী তুমি সমস্ত গোত মিলোন, শাস্ত্র প্রমাণে শুদ্ধ করূন, গোতামধ্যে ঘেনে, আনি পূর্ব্ববৎ বর্ত্তন করণে। ছ ১৪ জিল্কাদ্ ইসন্নে অশরীন মায়াব অলফ।"

ইহার পর পুতাজী সমাজে স্থান পাইয়াছিলেন।

ইহা তৎকালীন মরাঠা সমাজের উন্নত অবস্থার নিদর্শন বলিয়াই মনে হয়। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু সমাজ বর্ত্তমান সমাজের মত অনুদার ছিল না। জীজাবাঈএর মত নারী সহর্ষে এই কার্য্য-সম্পাদনে সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলেন, সে সময়ের মেয়েদের উঁচু মনের ইহা শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

---

* শিবাজীর মূল আদেশ লিপির কিয়দংশ এইরূপ,—"শিবাজী রাজেসাহেব ইয়াঙ্কী তাকীদ, সুমাসমান—খমসৈন—অলফ (অর্থাৎ—অরবীসন ১০৫৮, ইংরাজী সন ১৬৫৭) * * * * * এনে প্রমাণে পৈকী দেউন, পাটিলকী বিকত ঘেউন, রাজশ্রী মহাদাজ নিম্বালকর, আমচে জাঁবাই, ইয়াস মৌজে মজকুরচী পাটিলকী করতালি তুমি ত্যাস রাজী হউন অসনে। তালকী লেহন ঘেউন, আসল নাইক মশারনি হলে ইয়াস ফিরূণ দেনে। শকে ১৫৭৯ হেমলম্বী নাম সম্বৎসরে, কার্ত্তিকশু ॥৯, মোর্ত বসুদ।"

কৈলাস পর্ব্বত

কৈলাস-পর্ব্বত—নাম শুনিলেই মনে হয় এ যেন কোন্ সুরলোকের বার্ত্তা! যেন বর্ত্তমান ছাড়িয়া পার্থিব জগৎ অতিক্রম করিয়া সুদূর অতীতের কোন্ কল্পলোকে চলিলাম! যখন দেবতারা ভূতলে নামিয়া আসিতেন, যখন দেব-মানবে নানা বিষয়ে আদান-প্রদান চলিত এ যেন সেই স্বর্ণযুগের কাহিনী! আমাদের দেশের অতি-পুরাতন সাহিত্যে—কাব্যে পুরাণে প্রচুরভাবে এই পর্ব্বতের উল্লেখ আছে। সে-সব স্থলে কৈলাস পর্ব্বত পার্থিব লোকের আবাস-ভূমি নয়—উহা ব্রহ্মার স্বর্গ, ইন্দ্রের রাজধানী, হর-পার্ব্বতীর বিহার-ভূমি এবং দেবতাদের বাসস্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। গ্রীক পুরাণের অলিম্পাস (Olympus) এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পুরাণের অসগার্ড (Asgard) ঠিক ইহারই অনুরূপ। শুধু প্রভেদ এই যে অসগার্ড প্রকৃতপক্ষেই কল্পলোকের কথা, উহার ভৌগোলিক অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না।

কৈলাস পর্ব্বতের ভৌগোলিক অস্তিত্ব সত্য হইলেও আমাদের দেশে উহা অনেকের নিকটই অজ্ঞাত। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলে অনেককেই এ বিষয়ে সন্দিহান হন্। তাহার কারণ কৈলাস পর্ব্বত ভারতবর্ষের বাহিরে যে-প্রদেশে অবস্থিত, তাহার বিস্তৃত ভুগোল-বিবরণ আমাদের জানা নাই; যাহা ভুগোলের পৃষ্ঠায় পড়ি নাই, তাহা যে অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে, সেটা আমাদের দেশে এমন কিছু আশ্চর্য্য কথা নয়—হউক না তাহা শত সহস্র রূপে প্রসিদ্ধ।

বেদে এবং পুরাণে এক-একটা সৃষ্টিকাহিনী থাকে, সেই সকল সৃষ্টি-কাহিনীতে সুমেরু পর্ব্বতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুমেরু পর্ব্বত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান। এই পর্ব্বত হইতে এসিয়ার দিকে দিকে পাঁচটি পূর্ণসলিলা বিশাল নদী প্রবাহিত ছিল। বর্ত্তমানে এই সুমেরু-পর্ব্বতের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেকের মতে সুমেরু পর্ব্বত ছিল হিমালয়ের উত্তরে সমগ্র পর্ব্বত প্রদেশ লইয়া চীনদেশের কিউনলেন (Kuenlen) পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত! এই সুমেরু পর্ব্বত যেমন হিন্দুদের নিকট দেবতাদের অধিষ্ঠান-ভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত, তেমনই চীনদেশীয়েরাও সুমেরুর অন্তর্গত কিউনলেন পর্ব্বতকে তাহাদের আদি কালের মুনি-ঋষিদের আবাসভূমি বলিয়া অত্যন্ত সম্ভ্রমের চক্ষে দেখেন! ব্রহ্মদেশবাসীদেরও বিশ্বাস যে মৃত্যুর পরে তাহাদের আত্মা তাহাদের দেশের উত্তরে চিরহিমানী-মণ্ডিত এই সকল পর্ব্বত-শিখরে আসিয়া বাস করে।

সুমেরু পর্ব্বতের পরেই কৈলাস পর্ব্বতের প্রাধান্য—অবশ্য হিমালয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া! সুমেরু বর্ত্তমানে ঐরূপ অনির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়িলেও কৈলাস-পর্ব্বত সশরীরে জাজ্বল্যমান। মৎস্য-পুরাণে এবং বিশেষভাবে স্কন্দপুরাণে কৈলাস পর্ব্বতের অনেক কথা আছে। মৎস্য-পুরাণে আছে—কৈলাস পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে শীতল জলরাশিপূর্ণ মন্দোদক * নামক একটি সরোবর উৎপন্ন হইয়াছে। প্রসন্ন-সলিলা ভাগীরথী সেই সরোবর হইতে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার তীরে মনোরম এবং পবিত্র একটি নন্দনবন আছে। যক্ষাধিপতি কুবের যক্ষ ও অপ্সরাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা এই পর্ব্বতে বাস করেন।

পুরাণাদির পরে মহাভারতেও কৈলাস পর্ব্বতের উল্লেখ আছে। তারপরেই ঐতিহাসিক যুগ। এই যুগে কৈলাস পর্ব্বতের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় কালিদাসের কাব্যে। কালিদাসের মেঘদূত জগতে অতুলনীয়, সভ্য জগতের বিভিন্ন ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে। শুনিতে পাই সুদূর আইসলণ্ডীয় (Iceland) ভাষায় পর্য্যন্ত ইহার অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। মেঘদূত কাব্যে কৈলাস পর্ব্বত এবং মানস সরোবর অতি প্রধান কথা।

---

* এই সরোবর হয়তো মানস-সরোবর। কারণ বর্ত্তমান যুগেও অনেকদিন পর্য্যন্ত মানস-সরোবরই গঙ্গার উৎপত্তি স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। কৈলাস পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে, ঠিক পাদদেশে, কোন সরোবর বর্ত্তমানে আছে বলিয়া জানা যায় নাই।

এই সকল কাব্য-পুরাণাদিতে যাহা আছে তাহাতে জানা যায় যে উত্তরে কৈলাস পর্ব্বত, দক্ষিণে গন্ধমাদন * পর্ব্বত, এই দুই পর্ব্বতের মাঝখানে মানস সরোবর; এই সমস্ত প্রদেশই হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত। স্কন্দ পুরাণে মানস সরোবরের একটা সৃষ্টি-কাহিনী আছে। দেবতারা কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া ধ্যান-ধারণা করিতেন; সেখানে বৃষ্টিপাত খুব কম হওয়াতে, তাঁহারা জলের অভাবে বড়ই অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা ব্রহ্মার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি চাও?" দেবতারা বলিলেন, "আমরা কৈলাস পর্ব্বতে ধ্যান ধারণা করি; কিন্তু স্নানের জন্য আমাদিগকে মন্দাকিনী-তীরে যাইতে হয়। নিকটে কোন জলাশয় না থাকাতে আমাদের বড় অসুবিধা হয়।" ব্রহ্মা তখন তাঁহার ইচ্ছাশক্তি হইতে এক সরোবরের সৃষ্টি করিয়া দেবতাদের ব্যবহারের জন্য তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ব্রহ্মার মানস বা ইচ্ছাশক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহার নাম হইল মানস সরোবর। ইহা হইতে মনে হয় যে কৈলাস পর্ব্বতের নিকট কোন নদ নদী বা জলাশয় ছিল। কিন্তু মৎস্য পুরাণে কৈলাস পর্ব্বতের পাদদেশে সরোবর এবং সেই সরোবর হইতেই ভাগীরথীর উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণে একস্থানে একটা কথা আছে। "কৈলাস-শিখরে জাহ্নবী যথা।" অতএব দেখা যাইতেছে যে পুরাণাদির বিবরণে একের সহিত অন্যের অসঙ্গতি-দোষ আছে। মেঘদূতের বিবরণেও দেখা যায় গঙ্গা কৈলাস পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতেছে। নদ-নদীর উৎপত্তি স্থান লইয়া অসঙ্গতি-দোষ থাকিলেও হিমালয়, গন্ধমাদন, কৈলাস পর্ব্বত এবং মানস সরোবরের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে পুরাণে-পুরাণে এবং পুরাণে-কাব্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। মেঘদূতে আর একটি কথা এই পাওয়া যায় যে বর্ষাকালে (অন্তত আষাঢ় মাসে) মেঘের গতি ছিল দক্ষিণ হইতে উত্তরে—যেমন বর্ত্তমান যুগেও—দক্ষিণে ভারত মহাসাগর হইতে উত্থিত হইয়া দাক্ষিণাত্যের উপর দিয়া উত্তর ভারত অতিক্রম করিয়া হিমালয়ে এবং কৈলাস পর্ব্বতের অভিমুখে,—ভৌগোলিক তথ্য হিসাবে এটা বেশ একটা বড় খবর।

কাব্য-পুরাণাদির পরে কৈলাস পর্ব্বত সম্বন্ধে ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না।

তিব্বতীয় ও চীনা সাহিত্যে এবং হয়ত নেপালী সাহিত্যেও এবিষয়ে অনুসন্ধানের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে; কিন্তু সেখানে দন্তস্ফুট করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। যেটুকু ভাষান্তরিত হইয়া ইউরোপীয় সাহিত্যের যোগে আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিতেছে, শুধু সেইটুকুই আমরা জানিতে পাই আর সবটা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। কাজেই বিদেশীয় পর্য্যটকদের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া ইউরোপীয় সাহিত্যের উপরেই আমাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইতেছে।

পুরাণাদিতে কৈলাস পর্ব্বতের যতই প্রসিদ্ধি থাকুক ঐতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষের সহিত উহার ততটা যোগাযোগ দেখা যায় না। যুগে যুগে যে সকল অভিযান ভারতবর্ষে আসিয়াছে—সেকন্দর সাহ, সুলতান মামুদ, তৈমুর, চেঙ্গিজ খাঁ, বাবর, নাদির সাহ—ইহারা সকলেই খাইবর Khyber অথবা বোলান Bolan গিরিবর্ত্ম দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কাজেই ইহাদের অভিযানে বা অভিযান-কাহিনীতে কৈলাস পর্ব্বতের উল্লেখ পাওয়া যায় না—আর তা পাইবার কথাও নয়।

প্রাচীন ভৌগোলিকদের মধ্যে টলেমীর (Ptolemy 2nd Century A. D.) নাম বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। পরবর্ত্তী কালে ইহার উপর ভিত্তি করিয়া আরবদের এবং ইউরোপীয়দের ভূগোল-জ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত মধ্য যুগ ব্যাপিয়া যেন টলেমীর যুগই চলিয়াছিল। টলেমীর পূর্ব্বে মেগাস্থিনিস্ প্লীনি প্রভৃতির বিবরণে শুধু হিমালয়ের কোন কোন অংশের উল্লেখ পাওয়া যায়—হিমালয় তাঁহাদের বিবরণে Emodus, Iemus প্রভৃতি নামে পরিচিত! টলেমীর গ্রন্থে হিমালয়ের পশ্চিমাংশ এবং হিন্দুকুশ পর্ব্বতের বিবরণ আছে, পামীরের (Pamir) কথা এবং পামীরের পূর্ব্বসীমানার পর্ব্বতশ্রেণীর বিবরণ আছে কিন্তু তার পরই পূর্ণচ্ছেদ! কাজেই কৈলাস পর্ব্বত এবং তিব্বতও তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল। টলেমীর গ্রন্থই যখন

* কাহারও কাহারও মতে বর্ত্তমান গুর্লা মান্ধাতা (Gurla Mandatta) পর্ব্বতই গন্ধমাদন পর্ব্বত।

মধ্যযুগের একমাত্র প্রদীপশিখা, তখন ইহা সহজেই অনুমেয় যে ইহার পরে অনেকদিন পর্য্যন্ত কৈলাস পর্ব্বতের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বৌদ্ধযুগের সহিত কৈলাস পর্ব্বতের কতটা পরিচয় ছিল তাহা বোধ হয় এখনও অনুসন্ধান-সাপেক্ষ।

মার্কো পোলো মধ্যযুগের একজন প্রসিদ্ধ পর্য্যটক। তিনি বিশ বৎসর (১২৭৫—৯৫) প্রাচ্য ভূমে,—বোধ হয় ইয়ারকাণ্ডে (Yarkand)—ক্যাটাইয়া তিব্বতেরও একটা বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন কিন্তু তিনি কৈলাস পর্ব্বত সম্বন্ধে কিছু বলিয়া যান নাই।

জিসুইট্ সম্প্রদায়ের Father Kircher Chine-Illustra নামে একখানা পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ১৬৭০ খৃঃ এই পুস্তকের একখানা মানচিত্রে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম কৈলাস পর্ব্বতের নিদর্শন পাওয়া যায়।

ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ার ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালে ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের উত্তরে পর্ব্বতশ্রেণীর যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা ভৌগোলিক তথ্য হিসাবে টলেমীর সমকক্ষতা করিবার যোগ্য; কিন্তু তিনিও কৈলাস পর্ব্বত বা মানস সরোবরের সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়া কোন নিদর্শন নাই।

তার পরেই D'Anvilleএর প্রসিদ্ধ মানচিত্র ১৭৩৩ খৃঃ চীন সম্রাট কাংহী (1662-1722 A D) সমস্ত তিব্বত প্রদেশটা জরীপ করিবার জন্ত লামাদের নিয়োগ করেন। তাঁহারা জরীপ করিয়া যে মানচিত্র প্রকাশ করেন ১৭১৭ খৃঃ তাহা লইয়া চীন এবং তিব্বতের একখানা প্রকাণ্ড মানচিত্র তৈয়ারী হয়। ১৭১৮ খৃঃ এই মানচিত্রের একখানা প্রতিলিপি ফরাসী সম্রাটের নিকট প্রেরিত হয়, ইহাই D'Anvilleএর মানচিত্রের ভিত্তি। D'Anvilleএর মানচিত্র—তথা কাংহীর মানচিত্র—তিব্বতের ভূগোল বিবরণে নবযুগের প্রবর্ত্তন করে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্তও ইউরোপীয় ভৌগোলিকগণ চীনদের এই প্রতিষ্ঠানের উপর ততটা আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই—টলেমীই তখনো পর্য্যন্ত তাঁহাদের গুরু। কিন্তু তারপরেই টলেমীর

সর্ব্বত্র গৃহীত হয়। এই মানচিত্রে অবশ্য কৈলাস পর্ব্বতের কথা আছে। উত্তরে কৈলাস পর্ব্বত, দক্ষিণে মানস সরোবর ও রাবণ হ্রদ এবং এই দুই হ্রদের উপর দিয়া শতদ্রু নদীর প্রবাহ ইত্যাদি—এই মানচিত্রে এই প্রদেশের হ্রদ, নদ, নদী পর্ব্বত-শ্রেণীর যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা অতি প্রকৃত পরিচয়—বর্ত্তমান যুগের অনুসন্ধানেও উহা স্থূলতঃ গৃহীত হইয়াছে। সেই সময়ের পরে প্রায় বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত যখন এই প্রদেশের নদ-নদীর অবস্থান সম্বন্ধে নানা জনে নানা প্রকার অসমঞ্জস বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তখন সেই সময়কার মানচিত্রের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

ইউরোপীয়দের মধ্যে কৈলাস পর্ব্বতের সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম বিবরণ (মানচিত্র) লিপিবদ্ধ করেন ফাদার ডেসিডারী। তাহার পূর্ব্বে আর কোন ইউরোপীয় কৈলাস পর্ব্বত স্বচক্ষে দেখেন নাই। ডেসিডারী ১৭১৫—১৬ খ্রীঃ লাডাক হইতে লাসা পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়া তিব্বতের উত্তর ও পূর্ব্বদিকের সীমানা এবং রাজধানী লাসা ও সীগাজী (Shigatse) সম্বন্ধে অনেক বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। লাসার পথে তিনি মানস সরোবর এবং কৈলাস পর্ব্বত দেখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলেন, কৈলাস চির-তুষারাবৃত এবং অত্যুচ্চ পর্ব্বত। ডেসিডারীর মতে কৈলাস পর্ব্বত শুধু সিন্ধুনদের নয়, গঙ্গানদীরও উৎপত্তি-স্থান। তিনি বলেন, কৈলাস পর্ব্বত এ-প্রদেশের সর্ব্বোচ্চ স্থান। ইহার পশ্চিম দিক হইতে যত জলস্রোত বাহির হইয়াছে, তাহাতেই সিন্ধুনদের সৃষ্টি হইয়াছে। আর পূর্ব্বদিকের সমস্ত জলধারা মানস সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে, এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া গঙ্গানদীর সৃষ্টি করিয়াছে। সিন্ধু নদের উৎপত্তি-স্থান সম্বন্ধে অনুমান বরং অনেকটা ঠিক; কিন্তু গঙ্গার উৎপত্তি স্থান কৈলাস পর্ব্বত এবং মানস সরোবরে আনিয়া ফেলাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহাতে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের ভিত্তি ততটা দৃঢ় নয়, যতটা অনুমানের উপর নির্ভর করা হইয়াছে। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে সকল খবরই তাঁহার পর্য্যটন-লব্ধ নয়, অনেক সংবাদ তিনি স্থানীয় লোক অথবা তীর্থ-পর্য্যটনকারীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি

যে পরিচয় দেন তাহাতে মনে হয় যে তিনি নিজেও তীর্থপথে কৈলাস পর্ব্বত পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। নিজে সমস্ত পর্ব্বত পরিক্রমণ করিয়া থাকিলে অন্ততঃ নদনদীগুলি সম্বন্ধে ভুল হইবার কথা নয়; কিন্তু সেই সময়ে হয়ত সমস্ত প্রদেশটা তুষারাবৃত থাকায় তাঁহার প্রত্যেক্ষ দর্শন ততটা সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। তিনি প্রত্যক্ষ দর্শনে যাহা পান নাই হয়ত অনুমানে সেইটুকু পুরণ করিয়া গিয়াছিলেন। তথাপি ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ডেসিডারী যতটা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন, সেক্ষেত্রেও তিনি অতুলনীয়।

১৭২৯ সালে Father Geubil-এর এক মানচিত্র প্রকাশিত হয়—চীন এবং তিব্বতীয় মানচিত্র অনুসরণে। এই চিত্রে কৈলাস পর্ব্বতের উত্তর পশ্চিম হইতে সিন্ধুনদীর প্রবাহ দেখানো হয়। কৈলাস পর্ব্বতের দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে গঙ্গানদীর তিনটি মূল ধারা মানস সরোবরে আসিয়া পড়িয়াছে। এই সব বিবরণ হইতে স্পষ্টই মনে হয় যে D'Anville এর মানচিত্রের যাহা মূল ভিত্তি, Geubilএর মূলও সেইখানে—কাংহীর লামাদের প্রস্তুত মানচিত্র।

ভারতের গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌-এর নিয়োগে জর্জ্জ বোগ্‌ল্‌ (George Bogle) ১৭৭৪ সালে তিব্বতে গিয়াছিলেন; স্যামুয়েল টার্ণার গিয়াছিলেন ১৭৮৩-৮৪ সালে। তাঁহারা তিব্বতে গেলেও কৈলাস পর্ব্বত হইতে অনেক দূরে ছিলেন, কাজেই তাঁহাদের বিবরণে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

বারাণসীতে পুরানাপুরী নামে উর্দ্ধবাহু এক সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি এসিয়ার অনেক প্রদেশে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। এই পর্য্যটনে (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে) মানস সরোবর এবং কৈলাস পর্ব্বতের বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, কৈলাস পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শিখরে একটি ভূর্জ্জ পত্রের বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষের মূল হইতে একটা ক্ষুদ্র জলস্রোত বাহির হইয়াছে। লোকে বলে যে এই স্রোতই ভাগীরথীর মূল ধারা; এবং—যেমন পুরাণে আছে, এই স্রোত-ধারা বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়াছে বলিয়া উক্ত হয়। এইরূপ বিবরণ তীর্থ-যাত্রীরই পক্ষে উপযুক্ত, ভৌগোলিক তথ্য নয়। পুরানগীর নামে আর একটি ব্রাহ্মণের তথ্য পাওয়া যায়—যিনি পরে বোগ্‌ল্‌ এবং টার্ণারের সহিত অভিযানে দোভাষীর কাজ করিয়াছিলেন—তিনি তীর্থ পর্য্যটনে মানস সরোবরের দিকে গিয়াছিলেন, ১৭৭৩ সালের কিছু পূর্ব্বে। তিনিও বলেন যে গঙ্গানদী কৈলাস পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া মানস সরোবরে আসিয়া পড়িয়া আবার বাহির হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ইঁহারা তীর্থ-যাত্রী; তীর্থ-যাত্রী ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে ভৌগোলিক তথ্যের আশা করা চলে না।

১৮১২ সালে টমাস ম্যানিং নামে এক ব্যক্তি লাসাতে গিয়াছিলেন। ইনি যে-সব প্রদেশের উপর দিয়া গিয়াছেন তাহার বিবরণ আলোচনা করিয়া হেডিন সাহেব (Dr. Sven Hedin) বলেন, the bold but very ignorant Thomas Manning. His report of the journey is marvellous for its emptiness and stupidity. His path to the mysterious city is like the tracks of a sailing ship on the sea, where the waves close up again behind the vessel. এরূপ লোকের নিকট খুব বেশী আশা করা যায় না। তবে কৈলাস পর্ব্বত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত—কারণ তিনি ওদিকে ত যান নাই, কৈলাস পর্ব্বতের কথা কাহারো নিকট শুনিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ নাই।

এই সময়কার একজন প্রসিদ্ধ পর্য্যটক মূর ক্রফট্‌ (William Moorecroft)। তিনি ছিলেন একজন পশু-চিকিৎসক। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের আমন্ত্রণে ভারতবর্ষে আসিয়া ১৮০৮ সালে তিব্বতে যান। মূর ক্রফট তিব্বতে, বিশেষ মানস সরোবরের দিকটা বিস্তৃতভাবে পর্য্যটন করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে আলোচনাও করিয়াছেন যথেষ্ট। তাঁহার বিবরণে অবশ্য কৈলাস পর্ব্বতের কথা আছে। তাঁহার প্রকাশিত মানচিত্রে দেখা যায় মানস সরোবরের উত্তরে এক বিশাল পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে কৈলাস পর্ব্বত অবস্থিত। মানচিত্রের এই পর্ব্বতশ্রেণী দেখিয়া মনে হয় যেন উহা একটা মালভূমি, এই দিককার সীমানা—মানস-সরোবরের দিকে ঢালু।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কয়েকজন ইংরেজ

নেপালে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ফ্রান্সিস্ হ্যামিল্টন নামে একজনের বিবরণে কৈলাস পর্ব্বতের উল্লেখ আছে।

কার্ল রিটার নামে একজন জার্ম্মাণ Klaproth কৃত চীন সাহিত্যের অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া ১৮৩৩ সালে একখানি ভৌগোলিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি চীন সাহিত্যের মূল সূত্রগুলি শৃঙ্খল-বদ্ধ করিয়া এবং নূতনরূপে সাজাইয়া পাশ্চাত্যদের নিকট অধিকতর গ্রহণোপযোগী করিয়া দেন। এই বিবরণে প্রকাশ যে কৈলাস হইতে পর্ব্বতের শ্রেণী-পরম্পরা পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়া তিব্বত এবং মঙ্গোলিয়ার মধ্যে সীমারেখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সময়কার আর একজন জার্ম্মান ও প্রসিদ্ধ Alexander Von Hemnboldt, তাঁহারও মূল ভিত্তি Klaproth কৃত চীন-সাহিত্যের অনুবাদ। তিনি দেখাইয়াছেন (১৮৪৪ খৃঃ) যে গ্রীক, রোমীয়,আরবীয় এবং ভারতবর্ষীয় হইতে চীনদের বিবরণ অধিকতর প্রামাণিক। তাঁহার বিবরণ হইতে মনে হয় যে কৈলাসের পর্ব্বত-শ্রেণী দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে (মানস-সরোবরের পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত) প্রসারিত হইয়া উত্তর পশ্চিমে সিন্ধু ও শতদ্রু এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র এই উভয়ের মধ্যে জল-বিভাজক রেখারূপে বিস্তৃত। এই বিবরণে তথা চীনদেশের বিবরণেও এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তথ্য সংগ্রহের নিদর্শন নাই। ইহার চেয়ে বোধ হয় D'Anville এর মানচিত্র প্রকৃত তথ্য-জ্ঞাপক। পরে নির্ণীত হইয়াছে যে Rennel এবং Anguotil উভয়েই D'Anville এবং Tiffenthaler এর মানচিত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভুল করিয়া বসিয়াছেন।

Sir Alexander Cunningham মানস সরোবরের উত্তরের পর্ব্বত-শ্রেণীকে কৈলাস পর্ব্বত-শ্রেণী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মূল কৈলাস হইতে পর্ব্বতের শ্রেণী যে কোন্‌দিকে বিস্তৃত, সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই।

Henry Strachey অনেক বৎসর ব্যাপিয়া তিব্বতের ভূগোল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৮৪৬ সালে মানস সরোবরে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি উত্তর দিকে Gangri পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যভাগে তুষার-মণ্ডিত কৈলাস পর্ব্বত দেখিতে পাইয়াছিলেন। কৈলাসের পর্ব্বত-শ্রেণী অনেক বিবরণে Gangri পর্ব্বত-শ্রেণী বলিয়া পরিচিত। Strachey'র মতে এই পর্ব্বত শ্রেণী হিমালয় পর্ব্বতের মূলশ্রেণী সমূহের মত অত উচ্চ নয়।

Minkhol Khutukhtu নামে এক মঙ্গোল-দেশীয়ের কাহিনী (১৮৩৯ এর পূর্ব্বে) হইতে Prof. Vasilief তিব্বতের এক বিবরণ প্রকাশ করেন (St. Petersburg ১৮৭৬); এই বিবরণে কৈলাস পর্ব্বতের উল্লেখ দেখা যায়। Richttrofen এর গ্রন্থে (১৮৯৬ খৃঃ) কৈলাস পর্ব্বতের উল্লেখ আছে।

Christian Lassen তাঁহার পুস্তকে (১৮৬৭ খৃঃ) এসিয়ার পর্ব্বত শ্রেণীগুলির একটা ধারা দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে কারাকোরম (Karakorum) পর্ব্বত—কিউনলেন্ পর্ব্বত হইতে প্রলম্বিত তাহারই একটা অংশ বিশেষ। Trans-Himalaya পর্ব্বত শ্রেণীর পশ্চিম দিকের একটা অংশ যাহা কৈলাস অথবা Gangdisiri পর্ব্বত শ্রেণী বলিয়া পরিচিত, তাঁহার মতে সেই কৈলাস Karakorum পর্ব্বতেরই একটা শাখা। Lassen বলেন যে Gangdisiri পর্ব্বতশ্রেণী হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর অন্তর্গত না হইয়াও কৈলাস শিখরে আসিয়া হিমালয়ের সহিত মিশিয়াছে।

প্রসিদ্ধ ভারতীয়* পর্য্যটক নয়ান সিং Montgomerier নির্দ্দেশ-অনুসারে তিব্বতে অনেক পর্য্যটন করিয়াছিলেন; তিনি কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত না গেলে মানস সরোবরের উত্তর তীর দিয়া চলিয়া যাইবার সময় (১৮৮৩-৮৬) দূর—হইতে কৈলাসের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মানচিত্রে কৈলাস পর্ব্বতের উল্লেখ আছে।

Col. Surrard তিব্বত এবং হিমালয় প্রদেশের একখানা ভূগোল-বিবরণ প্রকাশ করেন ১৯০৭ সালে। এই বিবরণের মানচিত্রে দেখা যায় যে উপর-সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্রের উত্তর দিয়া একটি পর্ব্বতশ্রেণী পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। এই পর্ব্বত-শ্রেণীর পশ্চিমের অংশ কৈলাস পর্ব্বত, পূর্ব্বের অংশ Nien-chen-tongla পর্ব্বত শ্রেণী।

---

* ভারতীয় অর্থে এস্থলে হিন্দুস্থানের লোক নয়। ইনি বোধ হয়

বিখ্যাত এসিয়া-পর্য্যটক Sri Thomas Holdich তাঁহার পুস্তকে বলিয়াছেন যে কৈলাস পর্ব্বতের গাত্র হইতে সিন্ধু-নদীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং কৈলাস পর্ব্বতেরই দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে শতদ্রু বাহির হইয়াছে।

Charles Sherring মানস সরোবরে গিয়াছিলেন ১৯০৫ সালে; তিনি কৈলাস পর্ব্বতকে সিন্ধু নদীর উৎপত্তি-স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

জাপানী শ্রমণ Kawaguchi মানস সরোবরের তীর দিয়া কৈলাস পর্ব্বত পরিক্রমণ করিয়া গিয়াছেন (১৮৯৭-১৯০৩)। তিনি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বিস্তৃত ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু ভৌগোলিকের আসন গ্রহণ করিয়া কোন কথা বলেন নাই।

বাঙ্গালীর মধ্যে দেখিতে পাই শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় কৈলাস পর্ব্বত দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি কি খবর দিবেন তাহা এখনও ভবিষ্যতের কথা।

গত দুই শতাব্দীতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, রুশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে অনেক পর্য্যটক তিব্বতে ঘুরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই হয়ত কৈলাস পর্ব্বতের সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটে নাই। কিন্তু যাহারা অন্তত গৌণ ভাবেও তিব্বতের ভূগোল আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কৈলাস পর্ব্বত কখনও অপরিচিত নয়। কারণ D'Anville-এর আমল হইতে এ পর্য্যন্ত যত মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সকল স্থলেই কৈলাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। দক্ষিণ তিব্বতের প্রায় সমস্ত প্রদেশ ব্যাপিয়া এক বিশালকায় পর্ব্বত-শ্রেণী পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। এই পর্ব্বত শ্রেণী হিমালয়ের সমান্তরাল ভাবে অবাস্থত এবং Trans-Himalaye নামে পরিচিত। হিমালয় এবং Trans Himlaya এই দুই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্য প্রদেশে ব্রহ্মপুত্র বা সাম্‌পূ প্রবাহিত। কতকাল হইতে ব্রহ্মপুত্রের পবিত্র স্রোত-ধারা এইরূপে বহিয়া চলিয়াছে মানবের ইতিহাসে তাহা লিখিত নাই; কিন্তু এই ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা-ভূমিতেই তিব্বতের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান যুগেও তিব্বত বলিতে আমরা যাহা বুঝি,

Trans Himalayas-এর প্রকৃত পরিচয় বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত খুবই অনির্দ্দিষ্ট ছিল; চীনা সাহিত্যে এ সম্বন্ধে কতটা তথ্য আছে তাহা জানা নাই। ইউরোপীয় সাহিত্যে ইহার পরিচয় ছিল না বলিলেই হয়। এই বর্ত্তমান শতাব্দীতেই বিখ্যাত সুইডীস্ পর্য্যটক হীডিন (Sven Hedin) যথা-সম্ভব বিস্তৃতভাবে পর্য্যটন করিয়া Tran Himalaya-কে রূপ দান করিয়াছেন। বর্ত্তমান মানচিত্রে Trans-Himalay যে এরূপ সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে দেখা দিয়াছে তাহার জন্য কৃতিত্ব প্রায় সবটুকুই Hedinএর প্রাপ্য। Hedinএর পূর্ব্বে প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া বহু পর্যটক এবং উৎসাহশীল ব্যক্তি তিব্বতের এই প্রদেশটার দিকে দিকে বিভিন্ন প্রকার পর্ব্বত-রেখা অঙ্কিত করিয়া মানচিত্র বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছেন। এই ব্যাপারে অনেকে এতটা কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াছেন যে তাঁহাদের মানচিত্র নির্ভর-যোগ্য হইয়া উঠে নাই।

Trans Himalayaর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে মধ্য প্রদেশটা যতই অজ্ঞাত থাকুক ইহার দুই পার্শ্বে পূর্ব্বে এবং পশ্চিমে দুইটি পর্ব্বত অচল-প্রতিষ্ঠ দুই কেন্দ্রস্থলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়া অনেক কাল হইতে ভৌগোলিকদিগকে দিক নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে; পূর্ব্বদিকে Nienchen-tanglu, পশ্চিমে কৈলাস পর্ব্বত। অতএব দেখা যাইতেছে যে শুধু পৌরাণিক হিসাবেই নয়, ভৌগোলিক হিসাবেও ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে।

যেমন হিমালয় তেমনি Trans-Himalayaও একটা পর্ব্বতশ্রেণী মাত্র নয়। ইহারা প্রত্যেকেই কতকগুলি পর্ব্বতশ্রেণী-পরম্পরার সমষ্টি। কৈলাস পর্ব্বত এই শ্রেণী-পরম্পরার মধ্যে Trans Himalayaর পশ্চিমাংশের একটি শ্রেণীমাত্র। কৈলাস পর্ব্বতকে অনেকস্থলে একটা পর্ব্বত শ্রেণী বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়। কিন্তু একটা পর্ব্বত শ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও তুষার-মণ্ডিত শুভ্র শীর্ষ লইয়া মূল কৈলাস পর্ব্বতের স্বাতন্ত্র্যও বেশ পরিস্ফুট। এই পর্ব্বতের পূর্ব্ব পশ্চিম এবং উত্তর দিকে তিনটি স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া যেন প্রাকৃতিক ভাবে ইহার সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। তীর্থ পরিক্রমণের একটা পথও এই সীমা-রেখা-

কৈলাস পর্ব্বতের ভৌগোলিক অবস্থান উত্তর অক্ষরেখা (North Latitude) ৩০'৫৫' হইতে ৩১'৫' এর মধ্যেএবং পূর্ব্বদ্রাঘিমা (East Meridian) ৮১'১৮' হইতে ৮১'২৮ এর মধ্যে ; ইহার বিস্তৃতি উত্তর-দক্ষিণে ৮ মাইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭ মাইল। কৈলাস শিখরের উচ্চতা, বিশ্বকোষ, Encylopaedia প্রভৃতির মতে ২২০০০ ফিট। Hedin এর গণনায় ২১৮১৮ ফিট। কাহারও কাহারও মতে ২২০২৮ ফিট পর্য্যন্তও দেখা যায়। যে মার্গভূমির উপরে এই পর্ব্বত দণ্ডায়মান তাহার উচ্চতাও বড় কম নয়—১৫।১৬ হাজার ফিট।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, শতদ্রু—অনেক কাল হইতে এই চারিটি নদীর উৎপত্তি-স্থান হয় মানস সরোবর,না হয় কৈলাস পর্ব্বত বলিয়া দেখানো হইয়াছে। গঙ্গার উৎপত্তি-স্থল যে মানস-সরোবর পর্য্যন্ত আসিয়া স্পর্শ করে নাই তাহা সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে ১৮০৮ সালে * Nelson's Encyclopedia এবং বাংলা বিশ্বকোষে দেখান হইয়াছে যে কৈলাস পর্ব্বত হইতে সিন্ধু, শতদ্রু এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি-স্থান মানস-সরোবরে বলিয়াই সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। বর্ত্তমান কালের এই সকল আভিধানিক গ্রন্থে কৈলাস পর্ব্বতে কি করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি স্থান দেখানো হয় তাহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়। পূর্ব্বে যে সকল মানচিত্র বা বিবরণের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে সিন্ধু শতদ্রুর কথা আছে কিন্তু ব্রহ্মপুত্র কৈলাস পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এমন কথা কেহ বলেন নাই। Hedin ১৯০৭সালে তাঁহার তিব্বত-পর্য্যটনের সময় প্রত্যক্ষ-ভাবেঅনুসন্ধান করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করিয়াছেন, (১) তিনি যে সকল হিমধারা (glacier) হইতে ব্রহ্মপুত্র উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই স্থল মানস-সরোবর হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমানে প্রচলিত (ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রকাশিত) সকল মানচিত্রেই ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থল মানস-সরোবর হইতে একটু দূরে, পূর্ব্বদিকে দেখানো হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে ৺শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের মানচিত্রে দেখা যায় ব্রহ্মপুত্র মানস সরোবর হইতে উৎপন্ন—তবু কৈলাস পর্ব্বত হইতে নয়। Hedin সাহেব শতদ্রু নদীর উৎপত্তি-স্থলও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (২)। এই নদী মানস-সরোবর হইতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে Gunglung Glacier হইতে উৎপন্ন হইয়া মানস-সরোবর এবং, রাবণ হ্রদের উপর দিয়া প্রবাহিত, কৈলাস পর্ব্বতের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। Hedin সাহেব সিন্ধুনদীর উৎপত্তি-স্থলও নিজে গিয়া প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া আসিয়াছেন। উহা কৈলাস পর্ব্বত হইতে প্রায় ৩০।৪০ মাইল দূরে উত্তর-পূর্ব্বদিকে। Hedin ই ইহার আবিষ্কার-কর্ত্তা। অতএব দেখা যাইতেছে যে কৈলাস পর্ব্বত হইতে বাস্তবিক পক্ষে কোন নদীই বাহির হয় নাই।

কৈলাস পর্ব্বতের উত্তর সীমা হইতে প্রায়৭।৮মাইল উত্তরে Tseti-la (la অর্থ গিরিবর্ত্ম) উহার উচ্চতা ১৮৪৬৫ ফিট, আরও ৪ মাইল দূরে Tseti-lachen-la (১৭৭৩০)। Trans Himalaya'র যে পর্ব্বত শ্রেণীর উপরে এই দুইটি গিরিবর্ত্ম অবস্থিত তাহা উত্তরে সিন্ধু নদী এবং দক্ষিণে শতদ্রু এই উভয়ের মধ্যে জল-বিভাজক রেখা (water-shed)। দক্ষিণের প্রায় সমস্ত জলস্রোতই শতদ্রু নদীতে গিয়া পড়িয়াছে অথবা রাবণ হ্রদ বা মানস সরোবরের যোগে শতদ্রু নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই হিসাবে কৈলাস পর্ব্বতও শতদ্রু নদীর অববাহিকার মধ্যে পড়ে।

সমস্ত তিব্বত দেশটা এক বিস্তৃত মালভূমি, ইহার গড় উচ্চতা ১০,০০০ ফিট। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সভ্যতা এবং লোক-বসতি-হিসাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাই ইহার প্রধান অংশ। এই প্রদেশের উপর দিয়া একটি রাজপথ লাসা হইতে লাডাক পর্য্যন্ত প্রায় সহস্র মাইল বিস্তৃত। প্রধানতঃ এই পথের উপর দিয়া দেশের তীর্থ-যাত্রা এবং বাণিজ্য স্রোত প্রবাহিত। এই পথের উপরেই প্রধান প্রধান নগর এবং বাণিজ্য-কেন্দ্র…লাসা গীয়াংসী (Gyangtse, 13120 ft) সিগাজী (Shigatse, 12850 ft) লাশীজঙ্গ

* মানস-সরোবর, ভারতবর্ষ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

(১) ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থান ; ভারতবর্ষ [illegible]

(Lhaise-jong, 128) রাগা-তাসান (Raga-Tasan, 16233) সাকা-জঙ্গ (Saka-dzong, 15144) ত্রাডুম (Tradum, 15c62), তুকসাম (Tuksum), শামসাং (Shamshang 15410), টকচেন Tokchen), পরকা (Porka 15102) তীর্থপুরী (Tirtapuri), গারটক (Gartok, 14655), লিহ (Leh)। এই পথের দেশীয় নাম তাসাম। তিব্বতের পশ্চিম অংশে আসিয়া এই পথ মানস সরোবর ও কৈলাস পর্ব্বতের মাঝখান দিয়া চলিয়া গিয়াছে—দক্ষিণে মানস সরোবর ও রাবণ হ্রদ, উত্তরে কৈলাস পর্ব্বত। এই তাসামের কতকটা অংশ মানস সরোবর হইতে অতি নিকটে—দুই-তিন মাইলের মধ্যে। এই খানে তাসাম কতকদূর পর্য্যন্ত (৫।৬ মাইল) মানস সরোবরের উত্তর তটভূমির সহিত সমান্তরালভাবে চলিয়া, পরে একটু উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে গিয়া Gymna-chu স্রোতস্বতীর ধারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই স্থান হইতে রাজপথ সোজা পশ্চিমে ৮॥মাইল গিয়া Parka—এদিককার একটি প্রধান কেন্দ্র এবং দূরত্ব হিসাবেও কৈলাস-পর্ব্বত, মানস সরোবর এবং রাবণ হ্রদের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। মানস-সরোবর এবং রাবণহ্রদের মধ্যে একটি সংযোগ-প্রণালী তাহার নাম গঙ্গা (Ganga ; Nganga) রাবণ হ্রদের সহিত এই প্রণালীর সংযোগস্থল Parka হইতে সোজা দক্ষিণে ৪ মাইল দূরে রাবণ হ্রদের নিকটতম (উত্তরপূর্ব্ব) তীর —Parka হইতে ৩ মাইলের মধ্যে। মানস সরোবরের সহিত যে স্থানে গঙ্গা-প্রণালীর সংযোগ, সেই সংযোগস্থলই Parka হইতে মানস-সরোবরের নিকটতম তীর—৭ মাইল। এই Parka হইতে তাসাম উত্তরাভিমুখী হইয়া ৭ মাইল দূরে তরচেন (Torchen) বা দরচেন (Dorchen) নামক স্থানে গিয়া কৈলাস পর্ব্বতের পাদদেশ স্পর্শ করিয়াছে। এখান হইতে রাজপথ পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। কৈলাস পর্ব্বত এখান হইতে উত্তরদিকে বিস্তৃত।

পূর্ব্বকথিত Tseti-lachen-la হইতে একটি স্রোতস্বতী বাহির হইয়া কৈলাস পর্ব্বতের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া আসিয়া রাবণ হ্রদের দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই নদীই কৈলাস পর্ব্বতের পশ্চিম দিককার সীমানা—নাম Dunglung Tarchen হইতে তাসামের পথে ৩ মাইল আসিলেই Dunglung নদী পাওয়া যায়। Tarchen এই পর্ব্বত পরিক্রমণ পথের আরম্ভ। এই পথ Dunglung পর্য্যন্ত তাসামের পথেই আসিয়াছে, তার পরেই উত্তরাভিমুখে Dunglung নদীর উপত্যকা-পথে চলিয়াছে। Dunglung এর উপত্যকায় অধুনা অবলুপ্ত কোন্ অতীত যুগের হিমধারার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলে পথের দুই দিকে পর্ব্বতশ্রেণী সবুজ এবং বেগুনী রংএর conglomerate প্রস্তরে গঠিত। কোথাও বা sandstone এর conglomerate উভয়ই আছে। পদপ্রান্তে কত অসংখ্য বৃহদাকার প্রস্তর সমূহ পর্ব্বত গাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে দেখা যায়। নদীর পূর্ব্বতীরে যেখানে Tarchen হইতে পথ আসিয়া মিশিয়াছে সেখানে একটি ত্রিকোণাকৃতি ঘর এবং কতকগুলি মণি এবং চৈত্যের শ্রেণী—ইহা যে তীর্থ-পর্ব্বত প্রদক্ষিণের পথ তাহারই নিদর্শন। পথ কতকদূর পর্য্যন্ত নদীর পূর্ব্বতীরেই চলিয়াছে ; তার পরে তাসাম হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে একটি সেতু পার হইয়া আবার তীরে গিয়া পড়িয়াছে। সেতু পার হইয়া গেলেই পথের বাঁ-দিকে, কাজেই নদীরও পশ্চিম তটে অনেকটা উপরে পর্ব্বত গাত্রে একটি মঠ। এই মঠের ছাদ হইতে কৈলাস পর্ব্বতের শুভ্র তুষার-কিরীট দেখিতে বড়ই সুন্দর। মঠ হইতে নামিয়া এই পথ নদীর পশ্চিম তীর ধরিয়া উত্তর-উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়াছে। মঠ হইতে নামিয়া পথে পড়িলেই কৈলাসের শিখর একবার আড়ালে পড়ে ; একটু অগ্রসর হইলেই আবার দেখা যায়। এখান হইতে চারিদিককার দৃশ্য খুবই চিত্তাকর্ষক। পথের দক্ষিণ দিকে পর্ব্বতের উচ্চতা যেন দুটি স্তর-বিন্যাসে সম্পূর্ণ হইয়াছে—প্রথমে একটি পর্ব্বত, তাহার উপরে সম্মুখভাগে কতকটা খোলা জায়গা রাখিয়া যেন আর একটি পর্ব্বত দণ্ডায়মান। বামদিকে পর্ব্বতের উচ্চতা নিরবচ্ছিন্নভাবে সোজা উঠিয়া গিয়াছে ; কিন্তু পর্ব্বত-গাত্রে আকারের বিভিন্নতা বিচিত্রভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—একস্থানে যেন একটা দুর্গের দৃশ্য, কোথাও মন্দিরাকৃতি, কোথাও বা বরফাবিষ্ট পার্ব্বত্য ঝরণার দৃশ্য, মাঝখানে হয়ত ঊর্দ্ধ হইতে

বিলম্বিত একটা রেখাকারে পর্ব্বত যেন মুখব্যাদান করিয়া আছে। পথে দেখা যায় উর্দ্ধ প্রদেশের তুষাররাশি গলিয়া পর্ব্বতের গা বহিয়া নীচে নামিয়া যাইতেছে। এক স্থানে এইরূপ একটা ঝরণার প্রলম্বিত দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০০ ফিট পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। পথে দুইধার হইতেই ঝরণার জল নামিয়া নদীর জলের পুষ্টি সাধন করিতেছে। এই নদী (Dunglung) এইরূপে পুষ্ট হইয়া কখন কখন প্রতি সেকেণ্ডে ২৮০ ঘন ফুট জল বহন করে। Nyandi Gomfe হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে উত্তর দিক হইতে একটি স্রোতস্বতী আসিয়া Dunglung-এ পড়িয়াছে—ইহার নাম Chamo-leng-chen। এই সঙ্গম-স্থলের পরেই Dunglung একটু পূর্ব্বদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-উত্তরে, এখন দুই দিকে granite প্রস্তরের পর্ব্বত। এ স্থান হইতে কৈলাস পর্ব্বতের দৃশ্য চতুষ্কোণাকৃতি, তার পরেই আবার কৈলাস আড়ালে পড়িয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অনেক স্থান হইতেই কৈলাস পর্ব্বত যেন একটির উপরে আর একটি এইরূপ দুইটি পর্ব্বত-স্তরে গঠিত বলিয়া মনে হয়; নীচেকার পর্ব্বতটি যেখানে একটু বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানেই কৈলাসের শিখর আড়ালে পড়ে।

পূর্ব্বোক্ত নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল হইতে ২ মাইল দূরে বাঁ-দিকের পর্ব্বত-গাত্রে Diri-pu মঠ। মঠে যাইবার পথে মণি এবং চৈত্যের শ্রেণী। এখান হইতে কৈলাসশিখর সোজা দক্ষিণে। Diripu'র পরেই এই পথ একটী সেতু দ্বারা মূল Dunglung নদী পার হইয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণাভি-মুখী হইয়াছে, আবার এইখানেই আর একটি স্রোতস্বতী পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া Dunglung-এ মিশিয়াছে। এই স্রোত কৈলাসের হিমধারা হইতেই উৎপন্ন এবং আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বেশ পুষ্ট। এখান হইতে পথ আরও খাড়া এবং পর্ব্বত-গাত্র হইতে স্খলিত granite প্রস্তরের ইতস্ততঃ বিক্ষেপে অধিকতর দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে। এই পথটুকু ছাড়াইলেই কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরে অবস্থিত একটি হিমধারা দেখা যায়—এই হিমধারা কৈলাসের তুষার-রাশি হইতেই পুষ্ট। এখানকার দৃশ্য বৈচিত্র্য বড়ই চমক-প্রদ। মূল কৈলাস পর্ব্বত হইতে একটি পর্ব্বত-রেখা (Ridge) পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে, ইহার উত্তর দিকটা তুষারে আচ্ছন্ন। সকল দিককার তুষাররাশি হইতেই ঝরণা বহিয়া পড়িতেছে। এখানে সকল পর্ব্বতই Granite প্রস্তরে গঠিত। কৈলাস পর্ব্বতও Granite প্রস্তরে বেষ্টিত কিন্তু মূল পর্ব্বতের উপাদান conglomerate বলিয়া মনে হয়। এই সকল পর্ব্বত নীচে রাখিয়া কৈলাসের গিরিশৃঙ্গ যেন উর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত। এখান হইতে উহার দৃশ্য ষট্-কোণা-কৃতি।

ইহার পরেই Dolma-la গিরিবর্ত্ম—উচ্চতায় ১৮৫৯৯ ফিট। Diripu হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৩ মাইল। এই গিরিবর্ত্ম পার হইয়া আসিলেই ১৮৫০০ ফিট উচ্চে একটি ক্ষুদ্র হ্রদ, প্রায় গোলাকার ইহার স্থানীয় নাম Tso Kavala (Tso অর্থ হ্রদ); তীর্থ-যাত্রীদের—নিকট ইহা গৌরী কুণ্ড নামে খ্যাত। এই হ্রদের জল বরফে পরিণত হইয়া আছে; কথিত হয় এই বরফ কোন ঋতুতেই গলে না। এ-সম্বন্ধে একটা কাহিনীও আছে। Dolma-la হইতে তুষার-মণ্ডিত কৈলাস পর্ব্বতের যে দৃশ্য দেখা যায় তাহাকে দেশীয় লোকেরা যে নামে অভিহিত করে তাহার অর্থ—কুবেরের প্রাসাদ। গৌরীকুণ্ড সম্বন্ধে কাহিনী এই যে কুবের এবং তাঁহার পত্নীগণ স্নানাদির জন্য এই সরোবরের জল ব্যবহার করিতেন—সে যুগে গ্রীষ্ম ঋতুতেও এ জল কমিত না। একদিন এক তীর্থ-কামা রমণী তাহার শিশু-সন্তান সঙ্গে লইয়া সরোবরের জলে হাত ধুইতে গেলে হঠাৎ তাহার শিশু জলে পড়িয়া প্রাণ হারায়; দেবতারা ইহাতে একটু অপ্রতিভ হইলেন এবং ইহার একটা ব্যবস্থা করিতেও প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক চিন্তার পর বিধান দিলেন যে এই সরোবরের জল সকল ঋতুতেই জমিয়া বরফ হইয়া পড়িয়া থাকিবে। এই ত গেল কাহিনী. কিন্তু বর্ত্তমান যুগেও যে লোকে এই সরোবরের জলে স্নান করিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই সরোবরের জলে স্নানে পুণ্য আছে বলিয়া তীর্থকামীদের বিশ্বাস। তবে মোটের উপর বৎসরের অধিকাংশ সময়েই যে সরোবরের জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হ্রদের উত্তর তীর দিয়া পথ। এখন পথ চলিয়াছে দক্ষিণ

পূর্ব্বাভিমুখে। হ্রদ হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে আর একটি পর্ব্বত-উপত্যকা। এই উপত্যকায় একটি স্রোতস্বতী উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। এই নদীর উপরের অংশের নাম Tse-leung, তার পরে Lam-chycker, এই Lam-chyker কৈলাস পর্ব্বতের পূর্ব্বদিককার সীমানা। এই নদীর ধারে ধারে পথ সোজা দক্ষিণে চলিয়াছে। এই থান হইতে পর্ব্বতের উপাদানে Granite ছাড়িয়া আবার Conglomerate আরম্ভ হইয়াছে। Lam chyker এর উপত্যকা হইতে ৪ মাইল দক্ষিণে আসিলে পূর্ব্বদিক হইতে আর একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আসিয়া Lam-chyker-এ পড়িয়াছে। এইখানে Tsumtul-pa Gompa মঠ। এই স্থান হইতে নদী এবং পথ দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছে। আরও ৪ মাইল আসিয়া পথ নদীর সঙ্গ ছাড়িয়া উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া ২ মাইল দূরে Tarchen এ আসিয়া মিশিয়াছে। এই Tarchen-এ একটি মঠ আছে।

কৈলাস পর্ব্বতের এই যে সীমানা দেখানো হইল, ইহা একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সীমানা অপরদিকে তীর্থ-পরিক্রমণের পথও ইহার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তীর্থ পরিক্রমণ অর্থ প্রদক্ষিণ; অর্থাৎ পরিক্রমণের সময় তীর্থস্থান, তা সে সরোবরই হউক, মন্দিরই হউক বা পার্ব্বতই হউক—সর্ব্বদাই পরিক্রমণ-কারীর দক্ষিণে থাকিবে। ভারত-বর্ষে তীর্থ-প্রদক্ষিণ খুবই প্রচলিত। কিন্তু আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছে যাহারা বিপরীত দিকে তীর্থ পরিক্রমণ করে,—ইহারা পেম্বো (Pambo) বলিয়া পরিচিত। সনাতন-ধর্ম্মীরা ইহাদিগকে হীন চক্ষে দেখে। কৈলাস পর্ব্বতের সম্পর্কে সনাতন-ধর্ম্মী এবং পেম্বো-গামীর একটী কাহিনী আছে। প্রাচীন কালে কৈলাস পর্ব্বতের পাদদেশে একদিন এক সনাতন-ধর্ম্মী লামার সহিত এক পেম্বো লামার সাক্ষাৎ হয়। পেম্বোরা সনাতন-ধর্ম্মীর বিরোধী। এই তীর্থ পরিক্রমণ করা পেম্বোদের মধ্যেও পুণ্য কার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য সনাতন ধর্ম্মীদের সংখ্যা পেম্বোদের চেয়ে বহু পরিমাণে অধিক। পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া দুই লামার মধ্যে প্রতিযোগিতায় স্থির হইল যে পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে যিনি সর্ব্বাগ্রে কৈলাস পর্ব্বতের শিখরে গিয়া পৌঁছিতে পারিবেন, কৈলাস পর্ব্বত চিরকালের জন্য তাঁহারই অধিকারে থাকিবে। পেম্বো লামা তৎক্ষণাৎ পর্ব্বতের দক্ষিণ স্কন্ধ বাহিয়া আরোহণ করিতে লাগিলেন। সনাতনী লামা তখন নিদ্রায় মন দিলেন। অতি প্রত্যুষে পেম্বো লামা পর্ব্বত-শিখরের অনেকটা নিকটে পৌঁছিয়াছেন দেখিয়া সনাতনী লামার ভৃত্য প্রভুকে জাগাইয়া দিল; প্রভু বলিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সূর্য্যোদয় হউক ত—তখন দেখা যাইবে। যখন চক্রবাল-রেখায় সূর্য্য প্রথম দেখা দিল তখন সনাতনী লামা সূর্য্য কিরণের একটী রশ্মিতে আরোহণ করিয়া পর্ব্বত শিখরে গিয়া হাজির হইলেন; তখনও পেম্বো লামা তুষারের উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি যাইতে যাইতে একবার শিখরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যখন দেখিলেন যে তাঁহার প্রতিপক্ষ শিখরে দাঁড়াইয়া, তখন তিনি এমনই অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে আর তাঁহার স্থির হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না, তিনি পর্ব্বতের স্কন্ধ বাহিয়া নীচে গড়াইয়া পড়িলেন। পেম্বো লামা তখন প্রতিপক্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পবিত্র পর্ব্বত শিখরের স্মারক-স্বরূপ একটা কিছু প্রার্থনা করিলেন। সনাতনী লামা পর্ব্বত শিখর হইতে এক মুষ্টি তুষার লইয়া দক্ষিণে পণ্ডি (Pundi) পর্ব্বতের উপর নিক্ষেপ করিলেন; সেই সময় হইতে পণ্ডি পর্ব্বতের শিখরে সকল সময়েই অন্ততঃ কতকটা তুষার থাকেই। কথিত আছে, যখন এই তুষার নিঃশেষে গলিয়া যাইবে তখন কৈলাস পর্ব্বতের আবরণও খসিয়া পড়িবে। কারণ এই যে পণ্ডি এ কৈলাসেরই প্রতিরূপ; আর এই ঘটনা সংঘটিত হইলে বুঝা যাইবে যে কল্পের অবসান হইয়াছে; তখন পৃথিবীও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এখনও কৈলাস পর্ব্বতের দক্ষিণ স্কন্ধে তুষার-বিহীন উন্মুক্ত প্রান্তরের একটা রেখা দেখা যায়—অনেকদূর পর্য্যন্ত উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে—পর্ব্বতের শিখর পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই। এই রেখাই পেম্বো লামার পর্ব্বতে আরোহণের পথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

এই পথ ২৮ মাইল দীর্ঘ এবং পরিক্রমণ করিতে সাধারণতঃ দুই দিন সময় লাগে। পরিক্রমণ অর্থ অবশ্যই পদ-

ব্রজে পর্য্যটন, তবে আমাদের দেশের মত নগ্ন পদে যাইবার কোন বাধা-বাধকতা নাই। যে রকম শীতের দেশ, নগ্ন-পদে যাওয়া চলেও না। Hedin-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে আছে, তিনি যখন কৈলাস পর্ব্বতের দিকে যাইতেছিলেন, তাঁহার তিব্বতীয় অনুচরেরা সকলেই কৈলাস পর্ব্বতের দর্শন পাইবা মাত্র লম্ফ প্রদান করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। Hedin অবশ্য অশ্বপৃষ্ঠেই ছিলেন। পথে অশ্বপৃষ্ঠে বা চমরী-পৃষ্ঠে যাওয়ার যথেষ্ট হেতু আছে। এই পথ স্থানে স্থানে এমনই দুর্গম ও দুরারোহ এবং স্থল-বিশেষে উহার উচ্চতা এত বেশী যে সে-সব স্থলে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে এমনিই কষ্ট হয়, তার উপরে আবার এত চড়াই উৎরাই করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। দেশীয় লোকদের কথা স্বতন্ত্র। কারণ তাহারা জন্মগত শক্তিতে এবং চিরকাল এত উচ্চ প্রদেশে বসতির জন্য অনেক পরিমাণে ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই পথে চারিটি মঠ আছে—উত্তরে Diripu, দক্ষিণে Tarchen, পূর্ব্বে Tsu-tul-pu এবং পশ্চিমে Nyandi। যেমন মানস সরোবরের তীরে তীরে, তেমনই এই সকল স্থানেও হিন্দুদের কোন প্রতিষ্ঠান নাই—সমস্তই বৌদ্ধ মঠ। এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বত-রাজ্যে বৌদ্ধ মঠের কথা শুনিলেই রবীন্দ্র নাথের বসুন্ধরা কাব্যের কয়টা ছত্র মনে পড়ে,—

"—তিব্বতের গিরিতটে নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরীমাঝে বৌদ্ধ মঠে করি বিচরণ।"

বৌদ্ধ-মঠে যেমন থাকে—এই সকল মঠেও তেমনি বুদ্ধের মূর্ত্তি আছে, অস্ত্র-শস্ত্র আছে, বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে, লামা সন্ন্যাসীরা থাকেন এবং তীর্থ-যাত্রীরা এই সকল মঠে আসিয়া বিশ্রাম করিতে পায়। একটু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মঠগুলি সমস্তই ভূটানের রাজার, তিব্বতীয়দের নয়।

মঠ ছাড়াও পথে স্থান-বিশেষে বৌদ্ধ চৈত্য এবং মণির শ্রেণী আছে। বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রস্তরে খোদিত অথবা পতাকায় অঙ্কিত বৌদ্ধদের মন্ত্র কথা শোভা পাইতেছে—ওঁ মণি-পদ্মে হুঁ। এই মন্ত্র উঁহাদের জীবনের প্রধান কথা—প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, প্রত্যেক মঠে মন্দিরে পর্ব্বতে উপত্যকায়, নদী এবং সরোবরের তট-ভূমিতে, তীর্থ স্থানে বা প্রান্তরে, লোকালয়ের প্রতি গৃহে লোকের মুখে মুখে এই মন্ত্র অবিশ্রাম ধ্বনিত হইতেছে।

এই পথে পরিক্রমণের সময় তীর্থযাত্রীদের অনেক প্রকার অনুষ্ঠান আছে। যে সব স্থলে পথে উপলখণ্ডের ছড়াছড়ি, সেখানে ছোট ছোট প্রস্তর-স্তূপ গড়িয়া উঠিতেছে, তীর্থ-যাত্রীরা সকলেই সেখানে অন্ততঃ একটি করিয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়া কোন না কোন স্তূপের উপর রাখিয়া যায়। সুবিধামত কোন কোন স্থলে এত-প্রস্তর-স্তূপ গড়িয়া উঠিয়াছে যে মনে হয় যেন এক বিস্তৃত সমাধিক্ষেত্রে এগুলি এক একটি সমাধিস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। অনেক সময় স্থল বিশেষে এই সকল প্রস্তর স্তূপ পথিককে পথ-নির্দ্দেশে সাহায্য করে।

Diri-pu মঠের পরে পথে এক প্রকাণ্ড প্রস্তর-খণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে—তীর্থযাত্রীদের নিকট উহা পাপ-পুণ্যের কষ্টি-পাথর। প্রস্তর-খণ্ডের মধ্য দিয়া এক ছিদ্র পথ। যে এই পথ নির্ব্বিঘ্নে পার হইতে পারে সে সাধু ব্যক্তি আর যে পাপী সে নিশ্চয়ই এই পথে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে—এখানে স্থূলকায়-সূক্ষ্মকায়ের কোন কথা নাই।

Dolma-la-র উপরে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর-খণ্ড, তীর্থযাত্রীরা যাইবার সময় প্রস্তরের গায়ে একটু মাখন মাখাইয়া নিজের একগাছি চুল প্রস্তরে আটিয়া দিয়া যায়—অর্থাৎ নিজের শরীরের কিছু অংশ এবং সম্পত্তির একটু অংশ উৎসৃষ্ট হইল। অনেকে আবার ঐ প্রস্তরের ফাঁকে একটি করিয়া দন্ত উৎপাটন করিয়া রাখিয়া যায়—অবশ্য যাহাদের দন্ত প্রায় স্খলিত থাকে। অনেক স্থলে ছিন্ন বস্ত্র-খণ্ড পর্ব্বত বা উপত্যকা-পথে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। তীর্থ-যাত্রীরা যাতায়াতের সময় প্রত্যেকেই আর এক টুকরা যোগ করিয়া যায়, আবার অনেকে এক টুকরা কাটিয়া লইয়াও যায়—পবিত্র বস্তু-জ্ঞানে। এই সকলই নদ-নদী, পর্ব্বত, উপত্যকা-ভূমি, সরোবর প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে একবার পর্ব্বত প্রদক্ষিণে হইবে

সময় লাগে এ গেল সাধারণ কথা। কিন্তু প্রদক্ষিণ করিবার আর এক প্রকার প্রণালী আছে—ইহাতে প্রদক্ষিণকারী সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে অগ্রসর হয় অর্থাৎ ভূমিতে সমস্ত শরীর লুটাইয়া দিয়া হাত বাড়াইয়া যতটা নাগাল পায়, সেই পর্য্যন্ত একটা রেখা টানিয়া দেয়, তারপর উঠিয়া আসিয়া সেই রেখার উপরে পা রাখিয়া দাঁড়ায়; পরে আবার প্রণিপাত করে, আবার রেখা টানে ইত্যাদি। এইরূপে সমস্ত পথ অতিক্রম করিতে হয়। পথটা পদব্রজে প্রদক্ষিণ করাই রীতিমত আয়াস-সাধ্য তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ সাষ্টাঙ্গ প্রদক্ষিণে যে কত কৃচ্ছ্র সাধনা করিতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাতে সময় লাগে ২০ দিন এবং পুণ্য অর্জ্জনও হয় সাধারণ প্রদক্ষিণের তের গুণ।

এই ২৮ মাইল পথ হইল প্রদক্ষিণ করিবার বৃহত্তম কক্ষ। আর একটি পথ আছে তাহার কক্ষবৃত্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, পথও অপেক্ষাকৃত দুর্গম ও দুরারোহ। তার পরে আরও একটি পথ আছে, তাহার কক্ষবৃত্ত আরও ক্ষুদ্র এবং পথও আর দুর্গম, আরও দুরারোহ। এই তৃতীয় পথে প্রদক্ষিণ যে সাধারণের পক্ষে শুধু অসাধ্য তা নয়, সাধারণের ইহাতে অধিকারও নাই। যাহারা সাধারণ পথে অন্ততঃ একুশ বার প্রদক্ষিণ করিয়াছে, শুধু তাহারাই মঠের অধ্যক্ষের নিকট হইতে অনুমতি পাইলে তৃতীয় পথে প্রদক্ষিণ করিতে পারে।

এই তীর্থ-প্রদক্ষিণে যে পুণ্য অর্জ্জন হয়, তাহা যে শুধু পরকালের জন্যই মুলতুবী থাকে এমন নয়। ইহকালেও তাহারা নানাপ্রকারে ইহার ফলভোগ করে। এই পুণ্যের ফলে তাহারা রোগ-শোক হইতে মুক্তি লাভ করে, চোর-দস্যুর উৎপাত এবং অন্যান্য বিপৎপাত হইতেও রক্ষা পায়। এই পুণ্যের জোরে তাহাদের ক্ষেতে প্রয়োজন-মত বৃষ্টিপাত হয়, এবং প্রচুর পরিমাণে ফসল ফলে এবং তাহাদের গৃহ-পালিত পশুর দলে আশানুরূপ বংশবৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ এই পুণ্য একদিকে সকল প্রকার বিপদের ক্ষেত্রে তাহাদের রক্ষা-কবচের কাজ করে, অপর পক্ষে প্রয়োজন-মত তাহাদিগকে সকল প্রকার মঙ্গলের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রদান করে।

এই তীর্থ পরিক্রমণে বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা বলা কঠিন; কিন্তু ইহাতে তাহাদের নিষ্ঠা এতই দৃঢ় যে কোন প্রকার শারীরিক কষ্ট, পথের অসুবিধা বা শীতাতপের জ্বালা কিছুই তাহারা গ্রাহ্য করে না। এমনই প্রশান্ত-চিত্তে তাহারা পথ চলিতেছে যেন এই পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করাই তাহাদের জীবনের প্রধান ব্রত। আর এই ব্রত উদ্যাপনের জন্য যে শুধু বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধারাই বেশী উৎসুক তা নয়—স্ত্রী পুরুষ এবং বালক-বালিকা হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকল বয়সের লোকই আছে। এমনও দেখা যায় যে পীড়িত শিশুর মঙ্গলার্থে তাহার পিতা-মাতা টাকা খরচ করিয়া লোক নিযুক্ত করিয়া দেয়; তাহারা শিশুকে লইয়া পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করাইয়া আনে। ইহাদের মধ্যে পুণ্য-কামী অনেকে বহুবার করিয়া পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করে। তিব্বতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দিক হইতে দূর-দূরান্তের সকল প্রান্ত হইতেই শত সহস্র তীর্থ-যাত্রী আসিতেছে—কত গৃহস্থ পরিবার, কত যাযাবরের দল, কত সন্ন্যাসী, লামা, কৃষক, পশুপালক, ভিক্ষুক, সরকারী কর্ম্মচারী এমন কি দস্যু-তস্কর পর্য্যন্ত।

কাওয়াগুচির ভ্রমণ-বৃত্তান্তে আছে যে তিনি দেখিয়াছিলেন একজন ক্ষামা (khama) প্রদেশের লোক পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই প্রদেশের লোকেরা প্রায়ই পরস্বাপহারী লুণ্ঠনকারী দস্যু। ঐ লোকটি পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিবার সময় অনবরতই প্রার্থনা করিতেছে, "হে দেবতা, আমাকে পাপ হইতে মুক্তি দাও, আমি জীবনে কত নরহত্যা করিয়াছি, কত লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছি, সে সব অপরাধের জন্য আমাকে ক্ষমা কর। আমার ভবিষ্যৎ জীবনে আবার আরো কত পাপ করিব, কত নরহত্যা করিব, কত লোকের সর্ব্বনাশ করিব—সেই সব ভবিষ্যৎ পাপ হইতেও আমাকে মুক্ত কর।" অনেক চোর দস্যু নিজের পাপ-অভিসন্ধি যাহাতে সিদ্ধ হয় সেজন্য দেবতাদের সাহায্য প্রার্থনা করে এরূপ শুনা যায়—ভারতবর্ষে ত এরূপ প্রচলিত আছে। কিন্তু এ-ব্যক্তির পাপ পুণ্য সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ মৌলিক।

এই তীর্থ-পর্য্যটনে ইহাদের নিষ্ঠা দেখিয়া বিদেশীয়

পর্য্যটকেরা অবাক হইয়া গিয়াছেন। Hedin তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণে বলিয়াছেন—We, who in our superior wisdom smile at these exhibitions of fanaticism and self-mortification, ought to compare our own faith and convictions with theirs... whatever may be our own convictions, we must advise those who, however erroneous their views may be in our opinion, yet possess faith enough to remove mountains.

এককালে হয়ত ভারতবর্ষের সহিতও কৈলাস পর্ব্বতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তখন হয়ত এখান হইতেও তীর্থযাত্রীগণ মানস সরোবরের পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া সেখান হইতেই কৈলাস পর্ব্বতের দর্শন লাভ করিতেন এবং পরে যথাক্রমে সরোবর এবং পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া জীবন সার্থক করিতেন। এখনও যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ না যান এমন নয়। হিমালয়ের অন্তর্গত পার্ব্বত্য প্রদেশ-সমূহের হিন্দুরা ত অনেকেই যান।

কেহ কেহ বলেন যে কৈলাসের তুষার-মণ্ডিত গিরিশিখর দূর হইতে যেমন বৌদ্ধচৈত্যের ন্যায় দেখায় তেমনি আবার হিন্দুর শিবলিঙ্গের সহিতও উহার খুব সাদৃশ্য আছে। এই কারণেই উভয় সম্প্রদায়ের নিকট এই পর্ব্বত এরূপ ভাবে পূজা পাইয়া আসিতেছে। Hedin বলেন যে মানস সরোবর এবং কৈলাস পর্ব্বত লইয়া এ স্থানের নৈসর্গিক দৃশ্য এমনই চিত্তহারী যে দুইটি প্রধান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নিকট যে এই স্থান এমন পবিত্র এবং ক্রমে তীর্থস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই! কৈলাস তিব্বতীয়দের দেশের অন্তর্গত; কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে ইহার দূরত্ব এবং পথে হিমালয়ের ন্যায় দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতের অন্তরায়ের কথা মনে করিলে কিরূপে যে কৈলাস পর্ব্বত ভারতবর্ষের নিকট এত পরিচিত হইয়া উঠিল তাহা একটু ভাবিবার বিষয় বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে এটুকুও মনে রাখা দরকার যে যখন ভারতের সুদিন ছিল, যখন ভারতের প্রভাব জগতের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তখন কেহই তাহার গতি রোধ করিতে পারে নাই—দুস্তর সাগরও নয়, দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতও নয়।*

শ্রীসত্যভূষণ সেন।

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে পঠিত।

পোড়ো বাড়ী

গৃহস্থ তার ছেড়ে গেছে হয়নি অনেক দিন,
ছ' মাস ন' মাস না হয় নেহাৎ বছর খানেক হবে;
ঘর কন্নার চিহ্নগুলো হয়নি আজো লীন;—
ঠায় বসে সব ভাব্‌ছে যেন ফিরবে কিষাণ কবে!...

রৌদ্রভাজা পোড়ো ভিটের ফাটল-ধরা মাটী—
আকাশ পানে চেয়ে যেন ধুঁকছে বুড়োর মত;
কী যাতনায় বক্ষ তাহার চৌচিরই আজ ফাটি';
গুম্‌রে মরে অতীত স্মৃতির দুঃখে অবিরত!...

যেথায় ছিল স্নিগ্ধ-শীতল ছোট্ট কুঁড়েখানি,
যেথায় কিষাণ শ্রান্ত দেহে ফিরত দিনের শেষে;—
কিষাণ-বধূ শান্ত-কোমল স্নেহের পরশ দানি,'
জুড়িয়ে দিত সকল গ্লানি সেবাময়ীর বেশে;—

সেথায় আজি তপ্ত ধূলি তপ্ত হাওয়ার রথে
নেচে নেচে উড়ে বেড়ায় হাহাকারের মত;
অত্যাচারের জ্বালায় কিষাণ বাহির হল পথে,—
তারি দারুণ বিদায়-বাণী জাগিয়ে অবিরত!...

যেথায় ছিল আঙ্গিনাটি লক্ষ্মীমন্ত বেশে—
কিষান-বধূর শান্ত হাতের স্নিগ্ধ পরশ পেয়ে;
আল্‌পনা আর দেয় না তো হায় কিষাণ-বধূ এসে,
হায়রে তাহা ক্রমেই গেল আবর্জ্জনায় ছেয়ে!...

একটি ভাঙা মাটীর কলস হেথায় আছে পড়ে,—
স্তব্ধ হয়ে ভাব্‌ছে যেন অতীত দিনের কথা;
নিত্য সাঝে কিষাণ-বধূ কক্ষে তাহায় ধরে;
ফিরত [illegible]

বক্ষ তাহার ছল্‌ছলিয়ে উঠ্‌ত কেঁপে কেঁপে—
কিষাণ-বধূর কোমল হাতের পরশ-সুধা পেয়ে,
আজ যে পাঁজর-ভাঙা নিশাস বক্ষটি তার ব্যেপে,
নাই সে কোমল পরশ, দেহ ধুলায় গেছে ছেয়ে !···

হেথায় বুঝি তুলসীতলা, নিত্য আপন করে
জ্বালিয়ে দিত কিষাণ-বধূ মাটীর প্রদীপখানি ;
গৃহ-স্বামীর কল্যাণেতে লুটিয়ে মাটীর পরে,
গড় কর্‌ত মনে মনে কতই শুভ মানি'।—

সেথায় আজি 'বন-চাঁড়ালের' হয়েছে মর্ম্মভূমি,
মাটীর প্রদীপ উল্টে আছে, আবর্জনাই কত ;
গোবর-ছড়ায় নিকায় না কেউ শ্যাওলা পড়া ভূমি ;
সাঁঝের প্রদীপ নিভেছে হায় চিরদিনের মত।

* * * * *

আজো হেথায় তপ্ত হাওয়া আর্ত্তনাদি ফেরে,
আছুড়ে পড়ে পোড়ো ভিটের দগ্ধ মাটীর বুকে ;
বক্ষে চাপি যে যাতনা কিষাণ গেছে ছেড়ে—
তর দরদের বিদায়-বাঁশী বাজিয়ে দারুণ দুখে !!

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়।

শিখিবার কলা-কৌশল

(তৃতীয় ভাগ)

২

আমার শৈশবে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক দেখিয়াছিলাম—আকারে "পকেট ডিক্‌সানারির" মতো :—নাম, "দশ লক্ষ তথ্য।" তখন এই নামে, গ্রন্থের বিপুলতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। কি! দশ লক্ষ তথ্য! তাছাড়া দশ লক্ষ তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি যেন গর্ব্বের সহিত বলিতেছে,—যাহা কিছু শিখিবার আছে, সমস্তই ইহার ভিতর সংক্ষিপ্তভাবে আছে।

আমি জানিনা, আজিকার দিনে এখনও আমার এই শৈশবের গ্রন্থটির নূতন নূতন সংস্করণ বাহির হয় কি না। যদি বাহির হয়, তাহা হইলে আমি মনে মনে ভাবি, বর্ত্তমান কালের বাস্তব অবস্থার উপযোগী করিয়া, এই গ্রন্থের নাম ও বিষয়-তালিকা সম্বন্ধে কিছু বদল-সদল করা হইয়াছে কি না।

দশ লক্ষ তথ্য ? তথ্যের এই সংখ্যা ত খুবই কম। অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া তথ্য-বিভাগের ন্যায় আর কোনও বিভাগই তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। পরিপুষ্ট কিংবা সৃষ্ট—পর্য্যবেক্ষণের বিজ্ঞান সমূহ, তন্ন তন্ন করিয়া সংগৃহীত ভুগোল বৃত্তান্ত, আগাগোড়া পুনর্নবীকৃত ইতিহাস :—

এইরূপ তথ্যের অভিবৃদ্ধি আমরা পূর্ব্বেই প্রশংসা করিয়াছি।

যখন এত তথ্য জানিবার আছে, তখন যে-ব্যক্তি অধ্যয়নপরায়ণ অথচ সুবিবেচকের ন্যায় কষ্টলাঘবের অভিলাষী—এই রাশি রাশি তথ্যের সম্মুখে, সেই ব্যক্তির চিন্তার ধরণটা কিরূপ হইবে ? সে-কি বলিয়া উঠিবে :—"তথ্যগুলা সংখ্যায় বড় বেশী !" এবং যুদ্ধে পিছু হটিয়া, হার মানিয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবে ? অমুক অমুক শ্রেণীর তথ্য সে কি বিসর্জ্জন করিবে ? তাহার মনোভাব কি এইরূপ হইবে ? যথা :—

আমি ইতিহাস শিখিব এবং প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ থাকিব ?

অথবা :—

যাহা কিছু স্বদেশ-সংক্রান্ত, ইতিহাসে আমি শুধু তাহাই শিখিব ?

এ ত গেল একপক্ষের মনোভাব। যাই হোক না, আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা কিংবা মাথার ভিতরে সংগৃহীত তথ্যের একটা খিচুড়িই ভাল। কিন্তু এ রকম মনোভাব একজন শিক্ষিত লোকের, একজন আধুনিক "ভদ্রলোকের" মনোভাব নহে। যে ব্যক্তি পিট্রল-চালিত মোটরের মূলতত্ত্ব না জানে, মেরুপ্রদেশকে জয়-করা সম্বন্ধে কোন খবর না রাখে, যদি Listerএর নাম মনের মধ্যে কোন প্রকার স্মৃতি জাগাইতে না পারে, তাহা হইলে সে আধুনিক "ভদ্রলোক" বলিয়াই গণ্য হইবে না।

বেশ কথা! কিন্তু তাহা হইলে, এই সকল বিভিন্ন রকমের বৈজ্ঞানিক তথ্য শিখিবার ও মনে রাখিবার অবশ্য কোন উপায় আছে ?

হাঁ।

শিখিবার কলা-কৌশলের বড়-বড় নিয়মগুলা, অন্য ক্ষেত্রের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও অব্যর্থরূপে জয়লাভ করে। কেবল, অন্যত্র অপেক্ষাও এই স্থলে শৃঙ্খলা ও সময়ের নিয়ম-শাসন, আরও বেশী করিয়া মানিতে হইবে।

কোনও তথ্য-গুচ্ছের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এই প্রশ্নটি নিজের সম্মুখে উপস্থাপন করা আবশ্যক :

—আমি মনে মনে কী সংকল্প করিয়াছি ? জড়-জগতের কোনও বিভাগে পণ্ডিত হওয়া কিংবা বিশেষজ্ঞ হওয়াই কি আমার মনোগত অভিপ্রায় ? কিংবা শুধু, এই বিভাগ সম্বন্ধে একজন ভদ্রলোকের যাহা জানা উচিত, সে বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ না থাকা ?

যদি প্রথমটা হয়, তাহা হইলে, উক্ত অনুশীলন, তোমার বুদ্ধিগত প্রয়াসের প্রধান বিষয় হইবে; সমস্ত জীবনেও তাহা শেষ হইবে না। যাহা হোক এ স্থলে আমরা দ্বিতীয়টার কথাই অনুমান করিব। আমরা অনুমান করিব, —অন্যান্য অনুশীলনের মধ্যে ইহা একটি অনুশীলন সাধারণ মানসিক চাষ-আবাদের রাজ্যে যে সকল ক্ষেত্র আছে তাহার মধ্যে ইহা একটি ক্ষেত্র...এক্ষণে, কাজটা বিবেচনার সহিত করিতে হইবে। পূর্ব্ব হইতেই বলিতেছি, অন্যান্য অনুশীলনের মধ্যে এই অনুশীলনের জন্য খুব কম সময় দেওয়া যাইতে পারে (সময়ের কথা); কাজেই

তথ্য সযত্নে বাছিয়া লইতে হইবে, যাহা সংখ্যায় অল্প ও অল্প পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ, কিন্তু খুব ঠিক্-ঠাক, হার-হারিক রকমের ও সমগ্রের সহিত যুক্ত হওয়া চাই (শৃঙ্খলার কথা)। প্রত্যেক তথ্য-প্রধান বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত যে সকল তথ্য শিখিতে হইবে তাহার সংখ্যা খুব কড়াকড়ভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা চাই (তথ্য-বিজ্ঞান যথা :—ইতিহাস, ভূগোল, ভৌতিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান);—খুব যত্নপূর্ব্বক বাছিয়া লইয়া এবং পূর্ব্বাপর সমন্বয় করিয়া—তবে এই সকল তথ্য শিক্ষা করা চাই :—ইহাই অপরিহার্য্য ও অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম। যদি আশা ভঙ্গ ও নিষ্ফলতা এড়াইতে চাও তাহা হইলে এই নিয়মটি পালন করিতেই হইবে।

সীমাবদ্ধ করা! তুমি যদি কতকগুলি সমসাময়িক শিক্ষকের নিতান্ত অনিষ্টকর বাতুলতা গুলা অঙ্গুলীর দ্বারা স্পর্শ করিতে চাও, তবে অন্য বিজ্ঞান ছাড়িয়া দিয়া শুধু "তথ্য" বিজ্ঞানের সংখ্যাটা একবার দেখ। আমি যে এই পুস্তক লিখিতেছি এই সময় যে সকল গ্রন্থ কোন আধুনিক ছাত্রের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যাটা একবার শোনো, এবং তাহার আয়তনটা কিরূপ একবার বুঝিয়া দেখ। কোন ব্যক্তি-বিশেষের অনিষ্ট না করিয়া, আমি শুধু গ্রন্থকার ও সম্পাদকদিগের নামের আদ্যক্ষর নির্দেশ করিব।

দর্শনে :—

P...,প্রাকৃতিক ইতিহাস। in octo ৬৪০ পৃষ্ঠা। D.. সম্পাদক। V..., ও I..., ধারাবাহিক ইতিহাস। ৮১২ পৃষ্ঠা। G..., সম্পাদক। F, D...ভৌতিকবিদ্যা—৮০৪ পৃষ্ঠা। M. সম্পাদক ইত্যাদি—কিন্তু এই সকল গ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্তাগণ আপত্তি করিবেন, তাঁরা ত এ কথা কখনো বলেন নাই যে, "মহাপ্রভুর প্রার্থনার"মতো আমাদের ৩০০ পৃষ্ঠা, আমাদের ৫০০ পৃষ্ঠা, আমাদের [illegible]০০ পৃষ্ঠা ছাত্রদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে—উহার সার বাহির করিয়া লইয়া আত্মসাৎ করিবার জন্য শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক।

বাজে কথা! ছাত্র তোমার গ্রন্থের সার-তথ্য সংগ্রহ

অবসরের কাজ, যে ছাত্র খুব অধ্যয়ন-পরায়ণ সেও উহা বাহির করিতে পারিবে না। এবং যদি শিক্ষক ছাত্রের হইয়া এইরূপ সারসংগ্রহের কাজটা করিয়া দেন, তাহলে চুলোয় যাক তোমার গ্রন্থ! তাহা হইলে গ্রন্থের কাজটা শিক্ষকই করুক না কেন।

*
* *

তথ্য-বিজ্ঞানের অনুশীলন কেবল সারতত্ত্বে সীমাবদ্ধ করিলেও, যদি কতকগুলা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন তথ্য শিখিতে হয়, তাহা হইলে মনোযোগ ও স্মৃতির এতটা খরচ হয় যে তাহাতে মন আবার হতোদ্যম হইয়া পড়ে।

সৌভাগ্যক্রমে, প্রত্যেক বিজ্ঞান-গুচ্ছে, প্রত্যেক বিজ্ঞানে তথ্য-সমূহের শ্রেণী বন্ধনের দ্বারা, মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তির কতকটা আসান্ হয়।

প্রাকৃতিক, ভৌতিক, রাসায়নিক বিজ্ঞানের অনেকগুলি নিয়ম, কাঠাম ও সংক্ষিপ্তসূত্র গণিতের নিকট হইতে ধার করিয়াছে। আমরা একটু পরেই দেখিতে পাইব, বুঝিবার কাজটা সহজ করিবার জন্য, স্মৃতিকে সাহায্য করিবার জন্য গণিতের মতো এমন উৎকৃষ্ট সাধন আর কিছুই উদ্ভাবিত হয় নাই। গাণিতিক নিয়মের অভাবে, কতকগুলি বিজ্ঞান,—বড়-বড় অনুমান সিদ্ধান্তের দ্বারা তথ্যগুলায় শ্রেণীবন্ধন করে; অবশ্য গাণিতিক নিয়মের মতো অতটা ধ্রুবনিশ্চিত না হইলেও, ঐ সকল আনুমানিক সিদ্ধান্ত মনের একটু শ্রমলাঘব করে। ভূতত্ত্ববিদ্যাতে বিশ্ববিধান বিদ্যাতে, (Cosmography) চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, শব্দ-বিজ্ঞানে, এই সব বড় বড় অনুমান-সিদ্ধান্তর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তথাপি, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে কোন কোন বিজ্ঞানে না-আছে গাণিতিক নিয়ম, না-আছে Laplace এর মত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বড়-বড় অনুমান-সিদ্ধান্ত।

জাতি-বিশেষের ইতিহাস, রাষ্ট্রনৈতিক ভূগোল, তাহাও ইহারই দৃষ্টান্ত-স্থল; এই অনুমান সিদ্ধান্তগুলি খুবই ভিন্ন ভিন্ন রকমের, খুবই খামখেয়ালি ধরণের। যাহাকে উহাদের নিয়ম কতকগুলি পদ্ধতি বলা যাইতে পারে,—ভূগোলবেত্তা ও ঐতিহাসিকের মনের একটা আগন্তু প্রতিবিম্ব বলিলেও হয়। যাক্ তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। উহাদের প্রয়োজনীয়তা অবিসম্বাদী; বুদ্ধির দ্বারা একসূত্রে গ্রথিত করিবার অন্ততঃ একটু চেষ্টা না করিয়া, সারিবন্দী তথ্যগুলা শিক্ষা করা অতি ভয়ানক। যে শিক্ষক, যে পুস্তক এই দুর্বিনীত কাজটা করিতে বলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর। যারা জোর করিয়া তথ্যগুলা'কে একটা পদ্ধতির দ্বারা শৃঙ্খলিত করে, তাহাদের মধ্য হইতে কেবল সেই পুস্তক ও সেই শিক্ষককে বাছিয়া লও—যাহারা আজগুবী মতাবলম্বী নহে, যাহাদের কোনো বিশেষ খেয়াল বা বাতিক নাই। যেরূপ নম্রভাবে তাহারা নিজ পদ্ধতির প্রস্তাব করে, সেই নম্রভাব দেখিয়াই তাহাদিগকে তুমি চিনিতে পারিবে। যেই মাত্র কেহ একটা অনুমান-সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিয়া, তোমার টুঁটি ধরিয়া, একটা ঝাঁকানি দিয়া, চোখ রাঙাইয়া,তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে,—তখনই একটু সুযোগ পাইলেই তুমি তাহার পাশ কাটিয়া সরিয়া পড়িবে এবং বলিবে:—

"সত্যের নাহিক এই "হুড়্ দুমে" ভাব।"

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সকল তথ্য কোনও বিদিত গাণিতিক নিয়মে বাঁধা পড়ে নাই, এবং তর্কবিতর্কের বিষয়ীভূত কতকগুলা অনুমান-সিদ্ধান্তের দ্বারা কৃত্রিমভাবে একত্র গ্রথিত হয় নাই, সেই তথ্য সমূহের একটা দৃষ্টান্ত—ঐতিহাসিক তথ্য। Bossuet তাঁহার "বিশ্বজনীন ইতিহাস" সংক্রান্ত সন্দর্ভে, এই খৃষ্টানী অনুমান-সিদ্ধান্ত হইতে যাত্রা সুরু করিয়া বলিয়াছেন যে, সকল জাতির মধ্যে ঈশ্বরের একটা বিশেষ-জাতি আছে, এবং সেই জাতির উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ঈশ্বর ঘটনা সকল নিয়মিত করিয়াছেন। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করিতে কখনই স্বীকৃত হইবে না। তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে এই সিদ্ধান্ত বয়সের ধর্ম্মব্যাখ্যানে একটা জীবন দান করে, একটা তীব্র কৌতূহল জাগাইয়া তুলে, মনকে সজাগ করে, স্মৃতির ভার কমাইয়া দেয়।

*

সংক্ষেপে আবার বলিতেছি :—

কোনো মাঝামাঝি বুদ্ধির পক্ষে কোনো তথ্যমূলক বিজ্ঞান শিক্ষা করা অসম্ভব—যদি অল্পসংখ্যক তথ্যে উহাকে সীমাবদ্ধ করা না হয়, যদি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন তথ্য সকল পৃথকভাবে শিখিবার চেষ্টা করা হয়—সেই সকল তথ্য যাহা নিয়মের দ্বারাও পরিশাসিত নহে, অনুমান-সিদ্ধান্তের দ্বারাও সন্নিবদ্ধ নহে।

সুতরাং :—সেই সব পুস্তককে (কিংবা সেই-সব শিক্ষককে) পরিত্যাগ করিবে যে পুস্তক বা শিক্ষক পারিভাষিক শব্দাবলীর আকারে কোনো তথ্য-বিজ্ঞান তোমার নিকট আনয়ন করে। তাছাড়া অতি স্থূলাকায় গ্রন্থ, অতি বিপুলায়তন গ্রন্থও পরিত্যাগ করিবে। তবে বড় বড় স্থূলকায়, বিপুলায়তন গ্রন্থ থাকাও ভাল ; কেন না, একটা বিজ্ঞানের সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক কোন একটা স্থানে উহার ব্যাখ্যা থাকা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের সুবুদ্ধি এই কথা বলে যে, গোড়ায় বিজ্ঞানের বড় বড় তথ্য ও তথ্যের শ্রেণীবিভাগগুলি পরিপাক করিয়া তবে এই সব গ্রন্থে হাত দেওয়া উচিত। আমি দেখিয়াছি, কত নব-শিক্ষার্থী দশ বালামের বৃহদায়তন কোন পুস্তক আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া, দ্বিতীয় বালামের মাঝখানে আসিয়াই একেবারে কাবু হইয়া পড়ে! একটা বড় রকম কিছু দেখিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করা—ইহা একটা বড় মনের চিহ্ন নহে।

ইহা ক্ষুদ্র বুদ্ধির চিহ্ন, আজ্‌গুবী বুদ্ধির চিহ্ন।

দ্বিতীয় বিষয়টির সম্বন্ধে (অর্থাৎ তথ্য সমূহের সমশ্রেণী নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে) আর একটা ভাল কথা টুকিবার আছে। সব শৃঙ্খলাই শৃঙ্খলা নহে—তাহার মধ্যে ইতর বিশেষ আছে।

পল্লীগ্রামে এক বৃদ্ধাকে আমি জানিতাম ; পরিত্যক্ত জীর্ণ বুটযোড়াই হোক্, অসম্পূর্ণ অ-মিল খেলার তাসই হোক্, পেন্‌সিলের শেষ-টুকরাই হোক্—আশ-পাশের সমস্ত জিনিষের উপরেই টিকিট মারিবার দিকে তাঁর একটা ঝোঁক ছিল। তাহার পর সেগুলা তাঁহার ভাঁড়ারে জমা জিনিস্ পুনরায় বাহির করিতে হইলে তুলক্রাম্ বাধিয়া যাইত ; উহা বাজে-কাগজ রাশির তলায় পড়িয়া থাকিত, অকেজো জিনিসের ক্যাটালগের ভিতর ডুবিয়া থাকিত। কতকগুলা ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ, এই অতিসন্দিহান অতিনাবধানী বৃদ্ধাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

শৃঙ্খলাটা ভাল, শৃঙ্খলাটা খুব কাজের ; শৃঙ্খলা সংক্রান্ত চিহ্নের অপব্যবহারই—শৃঙ্খলার বিপরীত। ইহা গোলযোগ বাধাইয়া দেয়, বিহ্বলতা উৎপাদন করে। আজিকার দিনে ও সকল যুগের অনেক পণ্ডিতী গ্রন্থই বিভাগের আতিশয্য, নম্বর-দেওয়া প্যারাগ্রাফের সন্নিবেশ, গ্রন্থপৃষ্ঠার কিনারায় বিষয়-নির্দ্দেশ—এই সমস্ত দোষে দুষ্ট। ইহাকে শৃঙ্খলা বলিতে চাও ত বলো ;—কিন্তু উহা সরকারী আফিসী ধরণের শৃঙ্খলা; ফল দেখিয়াই জানা যায় উহার মূল্য কী। তবে, একথা বলিব যে, এই খারাপ পথে জর্ম্মানেরা আমাদিগকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে এমন-সব "সাহিত্যিক" গ্রন্থ আছে, যাহাতে বিষয়কে বিভক্ত উপবিভক্ত করিবার দরুণ, পর-পর ল্যাটিন বর্ণমালার বড় হরফ, পরে ছোট হরফ ব্যবহার করিতে হইয়াছে ; তাহা ফুরাইলে গ্রীক্ বর্ণমালা, সবশেষে বাধ্য হইয়া হিব্রু বর্ণমালাও ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

দূর করিয়া দেও এই সব বাজে জিনিস! nurseline-nunদিগের ঘরের গৌরবই হচ্চে চুম্বকচিত্র ; আমাদের মা-রা ঐ সব ঘরেই শিক্ষিত—কাজেই ছবিটা অর্দ্ধ-পৃষ্ঠা অপেক্ষা বেশী হইলেই আমি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি। এইরূপ চিত্রে যদি কোন কাজ হয়, তবে দুই একটা লেক্‌চার মনোযোগ দিয়া শুনিতে হইবে—তাহার পর তোমার চক্ষু, প্রকৃত চিত্রের ন্যায়, উহার সমস্তটাকে একদম এক নজরেই দেখিতে পাইবে।

*
* *

যেহেতু—যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা আবশ্যক তাহা মনে ধারণ করিয়া রাখা কষ্টকর অতএব এই সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযোজ্য :—ভাল করিয়া শিক্ষক কিংবা পুস্তক বাছিয়া লইয়া তাহার পর—প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করিয়া উহাদিগকে বদ্‌লাইবে না।

*

তথ্যমূলক বিজ্ঞানের অনুশীলনক্ষেত্রে আবিষ্কার, গবেষণা, উদ্ভাবনা—ইহাদের কাজটা কী ?

পণ্ডিত-সুলভ অভিনিবেশের কথা, শিক্ষিত বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার কথা একপাশে সরাইয়া রাখো। উহা সর্ব্বস্থলেই প্রয়োজনীয়—এবং একই কারণে। কিন্তু কোন-কোন তথ্যমূলক বিজ্ঞানে—যথা বিশ্ববিধান বিদ্যা, প্রাকৃতিক ইতিহাস, পদার্থ বিজ্ঞান ও পরীক্ষাসিদ্ধ রসায়ন—শুধু পুস্তক ও শিক্ষক বাস্তবিকই যথেষ্ট হইবে না—যদি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পর্য্যবেক্ষণ তাহাতে যুক্ত না হয়। প্রথমে এই পর্য্যবেক্ষণকে পথ দেখাইয়া ঠিক পথে লইয়া যাইতে হইবে, তাহার পর তাহাকে আর একটু স্বাধীনতা দিতে হইবে—অথচ তাহার উপর শিক্ষকের নজরও থাকিবে। যে ব্যক্তি দীপ্তিমান নক্ষত্র-জগতে স্বচক্ষে ভ্রমণ না করিয়াছে, যে ব্যক্তি অক্টোবরের দিগ্‌বলয়ের উপর সমুদিত নীল Sirius নক্ষত্রের সহিত সংকেত-স্থানের মত প্রেমালাপ না করিয়াছে, তাহার কাছে গ্রহ নক্ষত্রাদি পুঁথিগত নামমাত্র থাকিয়া যাইবে। যে অধ্যাপক ছাত্রের সম্মুখে Archimedis-এর নিয়মসূত্র, পদার্থাদির পতন-নিয়ম, বায়ুর বিশ্লেষণ জাগাইয়া তুলিতে না পারিবে, সে অধ্যাপক শিক্ষাদানের অযোগ্য। মানুষের প্রাকৃতিক ইতিহাসের প্রথম পাঠ দেওয়া হয় একটা কঙ্কালের সম্মুখে। এবং যে ব্যক্তি উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে জানুয়ারী মাসে—সে অতি নির্ব্বোধ।

মোট কথা, তথ্য শিখিতে হইলে সবস্থলেই এই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে...পর-পরিচ্ছেদে যখন যুক্তিমূলক বিজ্ঞানের কথা আলোচনা করা যাইবে, তখন দেখিতে পাইবে কোন না কোন প্রকারে এই একই নিয়ম প্রযুজ্য।

* * *

একটা কিছু শেখা হইয়া গেল—সে ত বেশ কথা; কিন্তু যাহা শেখা গিয়াছে তাহা যদি মনে রাখিতে না পারা যায়—তাহা হইলে সে শেখা প্রায় নিরর্থক। স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি—তাহা স্মরণ করিয়া দেখিবে, তথ্যের অনুশীলনে উহা নিতান্তই প্রযুজ্য।

ক্রমশঃ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বন্দিনী

নীলিমার কথা

জগতে ঐ একটা জিনিষের অস্তিত্ব আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না। প্রেম বলে' কোন সত্যকার বস্তু তৈরী করে' ভগবান্ তাঁর বিশ্বে পাঠান নি! আমরা যাকে প্রেম মনে করে ভাবে বিভোর হই, সে একটা বিরাট ভুল, তা ছাড়া আর কিছুই নয়! ভিতরটা তার সবই ভুয়ো!

মানুষের বুকের মাঝে এই মন, শুনতে পাই, এরও নাকি ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে! তা কতক মানি। কিন্তু আমার মনে হয়, অলস মনের সে একটা সখ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই যেখানে আলস্যের স্থান নেই, সেখানে এই সব অলীক সোনার স্বপ্ন দেখ্‌বার অবসর

এ কথাটা আমি এখন জোর করে বল্‌তে পারি। কেন না, আমার সেই কিশোর জীবনের ইতিহাসটাকে আজও আমি ভুল্‌তে পারি নি...কিন্তু, সেদিনে আর এদিনে কত তফাৎ! মা আমার ছেলেবেলায় মারা গেলেও তখনো বাবা বেঁচে—একাধারে বাপ-মায়ের স্থানটুকু তিনিই পূরণ করেছিলেন! বাবা কলেজে অধ্যাপনা করতেন আর আমি বেথুনে পড়তুম। তখন আমার বয়স পোনের বছর হবে। শরতের হাল্কা মেঘের মতই হৃদয় আমার তখন এ জগতের মাঝে হেসে-হেসে নেচে-নেচে বেড়াচ্ছিল; কখনো অভিমানে ফুলে উঠে খানিকটা বর্ষণও হয়ে যেত, কখনো বা স্বচ্ছ হাসির অরুণাভায় আমার সমস্ত বুক প্রদীপ্ত

কিন্তু আজ! আজ এই সারা দুনিয়ায় আপনার বলে দুটী স্নেহের কর বাড়িয়ে দিয়ে অবলম্বন করবার মত আমার কেউ নেই। তবে হ্যাঁ, আছেন একজন… আমার স্বামী।……স্বামী? কথাটা মনে করতেই আমার হাসি পায়। যাকে একটা দিন, একটা মুহূর্ত্তের জন্য আমি ভালবাস্‌তে পার্‌লুম না, সে আমার স্বামী! একটা সামাজিক বিধি-বন্ধনের অনুরোধে এই দেহখানাকে নির্ব্বিকারে একজন লোকের কাছে বিলিয়ে দেওয়া ছাড়া ভিতরকার হৃদয়ের সঙ্গেও যদি এর কিছু সম্বন্ধ থাকে, তাহলে বল্‌বো, সে আমার স্বামী নয়।……… এ হৃদয় আমার একেবারেই নিজস্ব। এখানে আর সে বসন্তের ফুল ফোটে না, মলয়ের হিল্লোল ছোটে না, অশোক-ফুলের রক্তরাগে আর এ হৃদয়ের বৃত্তিগুলো রঞ্জিত হয়ে ওঠে না। সে উৎসব-রজনী তার অনেক—অনেক দিন কেটে গেছে!…তবু কেন যে ঐ লোকটীকে আমি আমার স্বামী বলে' স্বীকার করলুম, তার কৈফিয়ৎ হয়তো আমি ঠিক দিতে পার্‌বো না। কিন্তু, পরলোকগামী পিতার সেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে আর কি-ই বা বল্‌বার ছিল? তাঁর স্নেহ-করুণ বুকের মাঝে আমি যে এতটুকু শান্তি দিতে পেরেছিলুম, তাই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়?…কিন্তু, এ বিবাহের প্রকৃত তাৎপর্য্য ভাবতে গেলেই আমি শিউরে উঠি! এ যে একটা প্রাণহীন পুতুলের বিবাহ ছাড়া আর কিছুই নয়!

এই পুরুষ জাতিকে আমি আর বিশ্বাস করি না। এরা যখন গদ্‌গদ প্রেমের কথা বলে, তখন ভিতরটা যেন আমার উদ্ধত বিদ্রোহের নিশান তুলে দাঁড়ায়! একদিন একজনের এমনি প্রেমের অভিনয় দেখে আমি মনে করেছিলুম, পুরুষ দেবতার জাতি, আর নারী তার জন্ম-জন্মান্তরের সেবিকা মাত্র! এইটুকুতেই নারীর সার্থকতা! …কিন্তু, দেবতার মুখোস্ যখন খসে' পড়ে' গেল, তখন চম্‌কে উঠে দেখ্‌লুম, সে আমার কিশোর-হৃদয়ের সেই কুসুমিত উপবনের যা-কিছু সম্পদ, সমস্তই চুপি চুপি হরণ করে' নিয়ে গেছে,—যা রেখে গেছে, সে কেবল একটা ধু-ধু মরু!

কিন্তু কেন, কেন কেন যে আজ আমার সেই বিগত প্রেমের প্রহসনখানিকে জগতের সামনে মুক্ত করে' দেবার এমন অদম্য আকাঙ্ক্ষা বুকের ভিতর ঠেলে উঠ্‌ছে, তাও বুঝতে পারি না। দিন পনের হলো, হাতে কোন কাজ নেই, তাই বুঝি?…না, এ কুৎসিত আলস্য আর সহ্য হয় না! তার চেয়ে বরং কোথাও ঘুরে আসি একবার!………

চাবুক মেরে মনের এই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়ে দিয়ে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হতে যাচ্ছি, অম্‌নি স্বামী ঘরে ঢুকলেন, হাতে তাঁর একখানা চিঠি। চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন,—একটা ভারী কেশ্ এসেছে নীলিমা। মধুপুরে এক টাইফয়েড রোগীর নার্সিং কর্‌তে হবে।…যাবে?

চিঠিখানা পড়ে' সাগ্রহে বল্‌লুম,—নিশ্চয় যাবো। আমি এখনি ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা কচ্ছি গিয়ে!

আমার বুকের উপর থেকে যেন একখানা পাথর নেমে গেল।

সুকুমারের কথা

শীতের আয়ু শেষ—বসন্তের দুন্দুভি বেজে উঠেছে। জগতের সকলেই আজ হাস্‌চে, কাঁদ্‌চি শুধু একা আমি। বুঝি বা এই বসন্ত-উৎসবের দিনেই শীতের প্রচণ্ড নীহার-পাতে আমার জীবনের পুষ্পিত মালঞ্চখানি একেবারেই শুকিয়ে যায়!

…বাইরে ঐ আমগাছটার উপর বসে কোকিল অশ্রান্ত-রবে ডেকে যাচ্ছে, আর, ঘরের মধ্যে মৃত্যুশয্যায় পড়ে' শুভা আমার অসহ্য যন্ত্রণায় ভুল বক্‌ছে! এ, দৃশ্য যে আর সইতে পারি না! নিজের বুকের ভিতরটা দাউ দাউ করে' জ্বলে' যাচ্ছে, অথচ সে জ্বালা চেপে দিন-রাত আর সকলকে মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিয়ে রাখতে হচ্ছে! যদি ঐ অসহায়া নারীদের মত খানিকটা হা-হুতাশ করে' কাঁদ্‌তেও পার্‌তুম!…

দিনের পর দিন রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই

দেখুন, এ-সব রোগে মন বেঁধে শুশ্রূষা করে' যাওয়াটাই হলো একমাত্র চিকিৎসা। কল্‌কাতা থেকে একজন ভাল সিক্‌-নার্সকে আনাবার ব্যবস্থা করুন, নইলে রোগিণীকে বাঁচানো দায় হবে।

দুদিন পরে 'তারে' খবর পাওয়া গেল, সন্ধ্যার ট্রেণে একজন ভাল সিক-নার্স এখানে এসে পৌঁছবেন, তাঁর নাম, মিসেস্ দাস। শুনে আমার বুকের ভেতরটা যেন একটু হাল্কা বোধ হ'তে লাগ্‌ল। জমাট অন্ধকার ভেদ ক'রে যেন একটু আলোর দীপ্তিও দেখতে পেলুম।

সন্ধ্যার পর মিসেস্ দাস যখন ঘরে এসে ঢুক্‌লেন, তখন শুভার শিয়রের কাছে বসে একা আমি। তিনি আমায় নমস্কার কর্‌তে আমিও প্রতি নমস্কার করে' তাঁকে বস্‌তে বল্‌লুম। একপাশে বাতিদানে মিট্‌ মিট্‌ করে' বাতি জল্‌ছিল। মিসেস্ দাস শুভার বিছানার ওদিকটায় বসে' আমায় বল্‌লেন'—আপনারই স্ত্রী বুঝি ?—বলে' তিনি বাতিদানটা তুলে নিয়ে শুভার মুখের পানে চেয়ে দেখলেন। শুভা প্রায় অচেতন পড়েছিল। মিসেস্ দাস আমার মুখের পানে চেয়ে বল্‌লেন,—আজ ক'দিন হলো ?

আমি বল্‌লুম,—বারো দিন। কিন্তু জবাবটা যেন তাঁর কাণে গিয়ে পৌঁছুল না। তিনি সেই বাতিদানের আলোয় আমার মুখের পানে মুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বাক তাকিয়ে রইলেন। পরে তাড়াতাড়ি আলোটা নামিয়ে রেখে মাথা নীচু করে' বলে' উঠলেন,—ও!

আমার ছোট বোন্ মণি ঘরে ঢুকে বল্‌লে,—দাদা এখন ত' রয়েছেনই, আপনি মুখ-হাত ধুয়ে কিছু খাবেন আসুন।

যাই—বলে' মিসেস্ দাস তাড়াতাড়ি উঠে মণির সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এই অপরিচিতা রমণীর প্রথম-আগমনেই আমার বুকের সাহস যেন অনেকটা বেড়ে উঠেছে।

...খানিক পরে হঠাৎ শুভা ভুল বকতে সুরু করতেই আমি দু'হাতে দুটো বরফের ব্যাগ নিয়ে তার মাথায় আর ঘাড়ে চেপে ধরলুম। সে কিন্তু দু'হাত দিয়ে সে দুটো ছিনিয়ে তার এই অস্থিরতায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়্‌লুম। দরজার পানে তাকিয়ে মণিকে ডাক্‌তে গিয়ে দেখি, কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে মিসেস্ দাস। ধীরে ধীরে তিনি কাছে এসে বল্লেন,—ভুল বকাটা দেখ্‌ছি খুব বেশী। আপনি এখন যান্, আমি কাছে রয়েছি। বলে' বরফের ব্যাগদুটো তিনি নিজের হাতে টেনে নিলেন।

শুভা তার সেই পলক-হীন বড় বড় চোখদুটী মিসেস্ দাসের মুখের ওপর তুলে ধর্‌তে আমি তার মুখের কাছে মুখ এনে বল্‌লুম,—কে এসেছেন, বল তো শুভা ?

শুভা আমার পানে চোখ ফেরালে; জড়িত স্বরে শুধু বল্‌লে,—দিদি।

মিসেস দাসের গম্ভীর মুখখানার পানে ব্যথিত দৃষ্টি তুলে বল্‌লুম,—আজকাল সকলকে ভাল চিন্‌তেও পার্‌ছি না!

শুভার বুকের কম্বলখানাকে আরও একটু টেনে দিতে দিতে তিনি বল্‌লেন,—হ্যাঁ।

শুভা এই অপরিচিতার কোলের ওপর তার শীর্ণ হাতখানি রেখে বল্‌লে,—কখন্ এলে দিদি ?

রমণীর মুখ যেন কেমন একটু উত্তপ্ত লাল হয়ে উঠল। কিন্তু, তখনি সে-ভাব সাম্‌লে নিয়ে শুভার কপালের উড়ো চুলগুলিকে সরিয়ে দিতে দিতে তিনি বল্‌লেন,—এই আস্‌ছি। তুমি একটু ঘুমোও ত' ভাই, লক্ষ্মীটি!

কি স্নিগ্ধ স্বর!...আমি মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম, রমণীর সেই মুখের পানে!

নীলিমার কথা

আমারই জীবনের উপর ভগবান তাঁর অভিশাপের সমস্ত গরল এমন করে' কেন ঢেলে দিলেন, তা বুঝতে পারিনে। এই এত বড় সৃষ্টিটার ভিতর আমিই কি তাঁর কাছে সব-চেয়ে বেশী অপরাধী ?......

......সেই সুকুমার, আর এই আমি! সেই একদিন, জ্যোৎস্নায়-ধোওয়া সেই এক নিভৃত সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ীর জানলায় দাঁড়িয়ে সে যখন হঠাৎ আবেগভরে তার

দিয়েছিল, তখন আমি মনে করেছিলুম, সে পীযূষ-ধারা বুঝি সত্যই স্বর্গের জিনিষ। বুঝি তা' সত্যই তার বুকের তপ্ত রক্ত দিয়ে তৈরী!···কিন্তু আজ? আজ যখন সে তার ঐ রুগ্না স্ত্রীর মুখের পানে আকুল ভাবে চেয়ে বসে' থাকে, তখন তাকে দেখে মনে হয়, জন্ম-জন্মান্তর ধরে' ঐ মেয়েটীই ওর সর্ব্বস্ব!

······মিথ্যা, মিথ্যা,—এর আগাগোড়া সমস্তই মিথ্যায় ভরা! আজ সে যাকে প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় বস্তু মনে করে' তার বিচ্ছেদের আশঙ্কায় এমন শুকিয়ে উঠছে, দুদিন বাদে হয়ত' তার স্মৃতির অস্তিত্বটুকুও আর তার ঐ বিরাট হৃদয়-রাজ্যের ভেতর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন যাকে সে হৃদয়ের একচ্ছত্র অধীশ্বরী বলে' গর্ব্ব করছে, কালই যদি নিয়তির কঠোর আদেশে সে সিংহাসন শূন্য হয়...

···না, কেন এই হিংস্র কুৎসিত চিন্তা! মনের এ ছেলেমানুষী কি এখনো গেল না? আমি আমার কর্ত্তব্য করে' যাই না কেন! এখানে এসেছি আমি কল্‌কাতার এক নগণ্য সিক-নার্সের বেশে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার পিতার সে স্নেহের দুলালী নীলিমার সঙ্গে আজ তার কোন সম্পর্ক নেই!······

মেয়েটা আবার ভুল বকছে! ডাক্তার বলে' গেলেন,—এই সপ্তাহটাই একটু ভয়ের কারণ!···উঃ—যদি তাই হয়—! আহা বেচারী! এই বয়স, এই আনন্দ-সংসার, স্বামীর বুকে এই অপর্য্যাপ্ত ভালবাসা······

না, এ কথা অস্বীকার করতে আমি কিছুতেই পার্‌বো না। অনেক সংসারের সঙ্গেই ত' আমি মিশেছি, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি এমন ভালবাসা আমি জীবনে কখনো দেখিনি। এই সুধার সমুদ্র যার সেবার জন্য নিরন্তর তার পায়ের কাছে উথলে পড়্‌ছে, সুখী বল্‌তে যদি কেউ এ পৃথিবীতে থাকে, তবে সে-ই!—এ কথা আমি বল্‌বো, হাজার বার বল্‌বো—এইটুকু স্বীকার করেই আজ আমার সুখ! এইটুকু মনে করেই আজ আমার শান্তি যে, একদিন এই সুধার অর্ঘ্য ভগবান এই হতভাগীর সামনে ধরেছিলেন! আমি তা আকণ্ঠ

সেই সুধা আমার ভাগ্যে বিষ হয়ে দাঁড়াল। আমরা যে ব্রাহ্ম, আর সে—

হঠাৎ তারই গলার স্বরে আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম। চেয়ে দেখি, শুভার বিছানার ওপাশে সে কখন্ চুপি চুপি এসে বসেছে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলুম; কেন না, এতক্ষণে চমক ভাঙ্গতেই বুঝতে পারলুম, দু' ফোঁটা চোখের জল আমার দুই চোখের কোলে টল্‌টল্ কর্‌ছে। ছি!

সে বল্লে, আপনি অমন করে' বসে' ছিলেন কেন? ঠিক করে' বলুন আমায়, অবস্থা কি কিছু খারাপ দেখচেন? গলার স্বরটা আমার কাছে এক চাপা আর্ত্তনাদের মত মনে হোল।

কিন্তু, আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা বিদ্রোহ সাড়া দিয়ে উঠল। বল্‌লুম,—না, ভাল-মন্দর বিষয় আমরা আর কেমন করে' কি বুঝব? ডাক্তারবাবু এলেই জিজ্ঞাসা কর্‌বেন।

এই শুষ্ক উত্তরে সে যেন বেশ একটু দমে' গেল। আমি এই সুযোগে আঘাতের ওপর আঘাত দিয়ে বল্‌লুম,—আপনি দিন-রাত কেবল হা-হুতাশ কর্‌ছেন বুঝি? মন্দ নয়! কিন্তু, আপনাদের মুখে এই শোকের বাড়াবাড়িটা কেমন যেন একটু বেখাপ্পা ঠেকে, না?

তার মুখখানি শুকিয়ে গেল। সেমাথা নীচু করে' বল্‌লে,—জানি না, আমার মত অবস্থায় পড়্‌লে মানুষ কেমন করে' নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে! আমি তো ভেবে পাইনে মিসেস্ দাস!

হঠাৎ এই সম্বোধনটা যেন এক প্রবল কশাঘাতের মত ঠিক আমার হৃৎপিণ্ডের ওপর ঘা বসিয়ে দিলে। সে আঘাত সহ্য কর্‌বার ক্ষমতা আমার ছিল না······মাথা তুলে বল্‌লুম,—দেখুন, আপনি ও-নাম করে' আমায় ডাক্‌বেন না। ওটা ভুল! আমার নাম মিস্ সেন, মিস নীলিমা সেন!

সে যেন কেমন থতমত খেয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি যেন তার হঠাৎ কুণ্ঠায় ভ'রে এল······তারপর বল্‌লে,—কিন্তু আপনি ত বিবাহিতা! স্বামীর নামে পরিচয় না দিয়ে পিতার

বাধা দিয়ে বললুম,—হ্যাঁ, কারণ, বাবার স্মৃতিটাকেই আমি যতদিন বাঁচি, বজায় রাখতে চাই। এ জগতে তিনিই আমার সব, এবং আমিই তাঁর সব ছিলুম।

…আমাদের কথাবার্ত্তায় বাধা দিয়ে শুভা যন্ত্রণাধ্বনি করে' উঠল। একবার মাত্র স্ত্রীর মুখের পানে তাকিয়েই সে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সুকুমারের কথা

নীলিমা,—মিস্ নীলিমা সেন! এ আশ্চর্য্য অঘটন কি সম্ভব? জগতে আরো অনেক রমণী ঐ নাম আর উপাধি নিয়ে জন্মাতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু এর মুখে যেন তার মুখের দীপ্ত সাদৃশ্য ধরে' ফেলেছি!

…সত্যই কি তাকে আমি ভালবেসেছিলুম! সে যদি ব্রাহ্ম না হয়ে আমাদেরই মত হিন্দুর ঘরের মেয়ে হতো, তাহলে কি তাকে ঘরে এনে ঐ শুভারই আসনে বসাতুম? …কি জানি, এ সমস্যার মীমাংসা বোধ হয় যুগ-যুগান্তরেও হবে না!

…কিন্তু, সেই মাধুর্য্যময়ী কিশোরীর কোমল কর হতেই একদিন আমার এই হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রেমের প্রথম বীজ ছড়িয়ে পড়েছিল, তার মুখের পানে চেয়েই আমি ভালবাসার পুষ্পিত তোরণে প্রবেশ-অধিকার পেয়েছিলুম। এ কথা আমি স্বীকার করবো!……

কিন্তু, এ কি আশ্চর্য্য দেখা-সাক্ষাৎ! শুভারই রোগ-শয্যার পাশে আমার প্রথম যৌবনের প্রেমের কাহিনী আমার চোখের সামনে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল! একদিকে শুভার অসুখের দারুণ দুশ্চিন্তা, তার উপর কোথা থেকে এই প্রবল ধাক্কা এসে সে দুশ্চিন্তাকেও ছাপিয়ে উঠতে চায়!…

…মনটাকে নিরন্তর কে বাড়ীর মধ্যে টানছে, অথচ, বেশীক্ষণ এক জায়গায় বসে' থাকতেও পাচ্ছিনে।…সমস্ত বিকালটা তাই এই মাঠের মাঝে এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর কাতর কণ্ঠে বল্‌ছি,—হা ভগবান! এ অকূল সমুদ্র থেকে আমায় তীরে ওঠবার শক্তি দাও!……

…স্মিথ রোডের বাঁক ফিরতেই দেখি, সামনে হাত-কয়েক দূরে নীলিমা,—সে এইদিকেই আস্‌ছে। সমস্ত দুর্ব্বলতার কণ্ঠ রোধ করে' নিজেকে তাঁর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলুম।…

খানিক চুপ করে' থেকে সে হঠাৎ বলে' উঠল,—দেখুন, আর তো আমি এখানে থাকতে পাচ্ছিনে। এদিককার একটা ব্যবস্থা করে' নিয়ে কালই আমায় ছুটী দিতে হবে।

ছুটী!…মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। হয় তো কি সব বলতে যাচ্ছিলুম,—সাম্‌লে নিয়ে অন্যমনস্কভাবেই শুধু বললুম,—কিন্তু, শুভা যে এখনো—

সে একটু নীরব থেকে চলতে চলতেই বল্লে,—আপনার শুভা, আপনার কাছে থাকলেই সে সেরে উঠবে। এ বিশ্বাস আমার খুব আছে।

…এই অপরিচয়ের ব্যবধান আর আমার সহ্য হলো না। স্পষ্ট করেই বললুম,—কিন্তু নীলিমা,—

বিদ্যুতের মত সে তার আনত দৃষ্টি আমার মুখের উপর তুলে ধরলে।…তারপর উচ্ছ্বসিত স্বরে বল্লে,—চিনেছ? তবে আর কেন! এ জেনেও কি আমার হাতে তোমার শুভাকে ফেলে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার?…এ ভার আর আমার মাথায় চাপিয়ো না গো, তোমরা আমায় ছেড়ে দাও!…

নীলিমার কথা

সত্যই আমি ছাড়ান্ চাই! অদৃষ্টের এই কঠোর প্রহসনের অভিনয় আমার পক্ষে একেবারেই অসহ্য!

…স্পষ্ট করে' ঐ কথা তাকে বলে' ফেলার পর কোনো কিছুই আর সে বলতে পার্‌লে না। একান্ত নীরবে মাথাটী নীচু করে' ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে এল। হয়তো তার মনে কষ্টও হলো' একটু! তার জন্য আমার দুঃখ বই সুখ নেই। …কিন্তু আমি যে নিরুপায়!

মেয়েটার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে যখন সেই বিগত দিনের অগ্নিময় স্মৃতিগুলো আমার ভিতরটা জ্বালিয়ে দিতে থাকে, তখন এ উন্মত্ত মনের মাঝে কত বীভৎস চিন্তাই যে মাথা ঠেলে ওঠে!…মনে হয়, সে যেমন আমার এই সর্ব্বনাশ করেছে, তেম্‌নি আমিও কি তার কোনো কিছু একটা বড় রকম অনিষ্ট করে' যেতে পারিনে?

...না, না, না, এখানে থেকে এমনি করে' পাগল হতে আমি চাইনে। এ আহত মনকে আমি বিশ্বাস করি নে। এর বিষাক্ত নিশ্বাসে সবই সম্ভব!

...চুপ করে' শুভার বিছানার ধারে বসে' নানা কথাই ভাব্ছিলুম। আজ সে একটু ভাল হয়ে ঘুমুচ্ছে।...হঠাৎ জেগে উঠতে একটু জল নিয়ে তার মুখে দিলুম। সে তার ক্ষীণ স্বরে ছেলে মানুষটির মত বল্লে,—দিদি!

কি জানি, কেন, তার এই 'দিদি' ডাক শুনে আমার চোখ ফেটে জল আস্বার মত হলো। মেয়েটা যেন কোন্ স্বপ্নদেশের মায়াবিনী!

খানিক পরে আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল।...আপনার মনে একখানা বাংলা বই খুলে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় সে ঘরে ঢুক্‌ল। আমি জড়সড় হয়ে বসে দেখলুম, মুখখানি তার আষাঢ়ের আকাশের মত কালো হয়ে এসেছে।......

সে চেয়ারে বস্‌ল। অনেকক্ষণ দুজনেই নীরব। তারপর সে হঠাৎ মুখ তুলে বল্‌লে,—তাহলে সত্যই তুমি যাবে?

গলার স্বর শুনে আমি তার মুখের পানে চাইতে পার্‌লুম না। মুখ নীচু করেই বল্‌লুম—সে কথা তো তোমায় বলেছি? এখন তোমরা ছুটী দিলেই আমি যাই!

তার গলার স্বর হঠাৎ অত্যন্ত দৃঢ় হয়ে উঠল।...সে বললে,—আমরা? অপরের কথা জানিনে নীলিমা, কিন্তু আমার নিজের কথা আমি বল্‌তে পারি।...আমি স্বেচ্ছায় তোমায় ছুটী দিতে পার্‌বো না, সে কথা বোধ হয় তুমিও জানো।...আমি তোমার কাছে যে অন্যায় করেছি, তার মার্জ্জনা নেই। তবুও আমার বিশ্বাস আছে, আমার এ মিনতিটুকু পায়ে দলে চলে যাবার মত শক্তি তোমার কিছুতে হবে না।...নীলিমা, আমার এই দারুণ বিপদে আমি শুধু তোমার সাহায্য চাচ্ছি।...আমার মনে হচ্ছে, তুমি চলে গেলে আর আমি শুভাকে বাঁচাতে পার্‌বো না।......

......এ কি করুণ কণ্ঠস্বরে তার এ কি আকুল আবেদন! আমার সাম্‌নে বসে' এমনি করে আমার সাহায্য ভিক্ষা করছে—আর কেউ না,—সুকুমার!... আমার দুই কাণে যেন কে একটা তরল পদার্থ ঢেলে সমস্ত দেহ-মন অবশ করে' দিলে। আর, সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, যেন কে আমার চতুর্দ্দিকে একটা দুর্লঙ্ঘ্য গণ্ডী এঁকে দিয়ে গেল।...হা ঈশ্বর, এ মৃত্যুব্যূহ আমি কেমন করে' এড়িয়ে যাবো!

...মুখ তুলে চেয়ে দেখি, কি আশ্চর্য্য! এই আদেশটুকু করেই সে চুপি চুপি কখন্ ঘর থেকে চলে' গেছে!......

.........হা নিষ্ঠুর, এটুকু অত্যাচার না করে' নিলে কি তোমার নিষ্ঠুরতা পূর্ণ হচ্ছিল না?

........বুকের নীচে যে ঝড় বইছিল, তাকে সাম্‌লে নিতে গিয়ে হঠাৎ এক দুরন্ত অশ্রু-প্রবাহ আমার বুক ঠেলে ঝাঁপিয়ে এল। তাড়াতাড়ি বরফের ব্যাগটা শুভার মাথায় ঠিক করে' ধরে কাঠ হয়ে বসে রইলুম।...

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

ভারতের নার-সৈন্য

মেয়ে-সৈন্য বা নারী-সেনাপতির নাম শুনে, মেয়েরা আমাদের দেশের চমকে উঠবেন, কেউ বা হয় ত মূর্চ্ছা যাবেন,—কেন না ফিট-হিষ্টিরিয়া আজকাল ঘরে ঘরে,—মেয়েরা আমাদের ফুলের ঘায়ে জ্ঞান হারান! কিন্তু এক সময় ভারতে মেয়ে-সৈন্যের দল ছিল,—তারা দস্তুর-মত ঘোড়ায় চড়ে তলওয়ার বল্লম নিয়ে যুদ্ধ করতো, আর তাদের সেই আশ্চর্য্য শৌর্য্যের পায়ে অনেক বীরপুরুষকে সেলাম ঠুক্‌তে হয়েছে। বাদল-জননী জবাহির বাঈ, রাণী দুর্গাবতী,—এঁরা যুদ্ধকে তুচ্ছ মনে করতেন। যোধপুরের বিধবা রাণী মহামায়া তাঁর শিশুকে বুকে করে ঘোড়ায় চড়ে

তলওয়ার চালাতে চালাতে বিপক্ষ সৈন্য-শ্রেণীর মধ্য দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেছলেন। বাংলার বীর কেদার রায়ের ভগ্নী আশ্চর্য্য বিক্রমে মোগলদের আক্রমণ করেছিলেন,—তাঁর নৈপুণ্যে মোগল-সৈন্য ভীত ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। যশোবন্তরাও হোলকারের মেয়ে ভীমা বাঈয়ের কাছে সার জন ম্যালকমের মত বীর পুরুষকেও হার মানতে হয়েছে। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন,—"তিনি (ভীমাবাঈ) ঘোড়ায় চড়ে আশ্চর্য্য কৌশলে অস্ত্র চালাতেন"।* একজন ইংরেজ বিপুল জনতার সামনে পেশবার স্ত্রীকে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিতে শুনেছিলেন।† ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর অদ্ভুত রণনৈপুণ্য দেখে বৃটিশ বীর সার হিউ রোজ স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর চিঠিপত্র আর লেখার সব জায়গায় মুক্ত কণ্ঠে লক্ষ্মী বাঈএর অপূর্ব্ব বীরত্বের প্রশংসা করে গেছেন। তাহলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মেয়েরা আমাদের নিতান্ত অবলা নন।

নারী-সেনাদল-সংগঠনের স্পষ্ট উল্লেখ ঔরংজেবের রাজত্বের আগে কোথাও পাওয়া যায় না,—মেয়ে-ফৌজের সৃষ্টি-কর্ত্তা হচ্ছেন ঔরংজেব। তাঁর রাজত্বকালে মানুশী নামে এক ইটালিয়ন ভারতবর্ষে আসেন। তিনি ভরিতের সে সময়কার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিশদ বর্ণনা করে গেছেন। সে সময় মোগল সম্রাটের হারেম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খোজার বদলে নারী-সৈন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে মোগল বাদশা মেয়ে-সৈন্যদলও গঠন করেছিলেন। এই মেয়ে-পল্টনের মেয়ে-সেনাপতির নাম ছিল, উর্দ্দূ বেগী। মানুশীর বইয়ে (Manucci's Storia do Mogor—Irvine) উর্দ্দূ বেগীর ছবি আছে। মোগল সম্রাটের মেয়ে-সৈন্যদের পোষাক কেমন ছিল, ছবিখানা দেখলেই তা বোঝা যায়। মুসলমানী কায়দায় মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ বোরখায় ঢেকে তলওয়ার হাতে মেয়েরা ঘোড়ায় বসত, দরকার হলে আবার বোরখা ফেলেও তারা আশ্চর্য্য কৌশলে যুদ্ধ করত।

হায়দ্রাবাদের নিজাম আলিও স্ত্রী-সৈন্যদল গঠন করেছিলেন। সতারা-অধিপতি ছত্রপতি প্রতাপসিংহ মেয়ে-সেনাদল তৈরি করেন, স্বয়ং সতারা-অধীশ্বরী ছিলেন সে দলের অধিনেত্রী। গোয়ালিয়রের মহারাণী বায়জাবাঈ সিন্ধিয়া নিজের অধ্যক্ষতায় শ্রেষ্ঠ নারী-সৈন্যদল গড়েছিলেন। বীরাঙ্গনাদের মধ্যে অহল্যাবাঈ হোলকার অন্যতম।

বিপদে-আপদে মেয়েরাও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন, যদি তাঁদের ঠিক উপযুক্তভাবে আমরা গড়ে তুলতে পারি। ভারতীয় নারী-সৈন্যের বিস্তৃত বিবরণ ও চিত্র সংগ্রহ করতে পারলে আমাদের ইতিহাসের একটা মস্ত বড় অভাব পূর্ণ হয়।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়

* She rode with grace, and few excelled her in the management of the spear." Central India by Sir John Malcolm.

† "I have seen the Peshva's late wife lunging her horse before a crowd of spectators," History of the Mahrattas by Waring 1810. P. 213.

প্রেমের আলো

প্রেমের আলো যখন ফোটে
চোখের চাওয়াতে,
একটি গোপন রাজ্য পাতে
সুরের হাওয়াতে।

কবি যখন তন্দ্রা-ভরে,
লুটায় আপন শয্যা পরে,
কোন্ পরীতে স্বপ্ন দেখায়
ঘুমের ছাওয়াতে!

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

জ্যোতির্বিজ্ঞার ক্রমোন্নতি

২। টাইকো

কোপার্ণিকের মত তাঁহার মৃত্যুর পর এক শতাব্দীরও অধিক কেবল অল্প কয়েক জন বৈজ্ঞানিকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সাধারণ, এমন কি বৈজ্ঞানিক জগৎও তাহা গ্রহণ করে নাই। তাঁহার বিপক্ষ দলের প্রধান ছিলেন টাইকো ব্রাহি (Tycho Brahe)। টাইকোর কাছে বাইবেলের কথা ছিল অকাট্য। আর তাঁর কুসংস্কারও বড় কম ছিল না। অথচ কোপার্ণিকের মতে সুবিধাও বড় কম নয়। তাই তিনি দুইই বজায় রাখিবার জন্য এক আজগুবি মতের সৃষ্টি করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি সমেত সমস্ত নভঃমণ্ডল পৃথিবীর চারিদিকে দৈনিক একবার ঘুরিতেছে আর অন্যান্য গ্রহেরা সেই সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এ কতকটা মাথার চারিদিকে মাছি ঘুরিতেছে না বলিয়া মাছির চারিদিকে মাথা ঘুরিতেছে বলার মতই হাস্যকর। তবে সুখের বিষয় অন্য বৈজ্ঞানিকেরা ইহাতে আস্থা স্থাপন না করায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ইহার শেষ হইয়াছিল।

যাহাহউক টাইকোর অঙ্কশাস্ত্রে জ্ঞান ও চিন্তাধারা নিতান্ত অপরিণত হইলেও তাঁহার যন্ত্রনির্ম্মাণ ও পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। তাঁহার সময় অবধি জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন রকম নির্ভুল যন্ত্র ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ যন্ত্র সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা অনুমানের সত্যতা নির্দ্ধারণ ব্যতীত জ্যোতির্বিদ্যা কোনও রকমেই কার্য্যকরী হইতে পারে না। অকিঞ্চিৎকর হইলেও টাইকো এই অভাব কতকটা দূর করিয়াছিলেন।

কোপার্ণিকের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে ১৫৪৬ খৃঃ টাইকো ডেনমার্কে এক অভিজাত-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় বড় লোকে লেখাপড়া শেখা বা বিজ্ঞান চর্চ্চা করা গরীব আধপাগলা লোকদের বা পাদ্রীদের কাজ বলিয়াই মনে করিতেন, নিজেরা আমোদ প্রমোদ, শিকার, দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রভৃতি লইয়াই [illegible]

নিজে ছিলেন বিদ্বান ও তাঁহাকে লইয়াছিলেন পোষ্যপুত্র। তাই টাইকোর সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করার কথা হইলেও তিনি আইন শিক্ষা করিবার জন্য তাঁকে Copenhagen Universityতে তের বৎসর বয়সে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

সেকালের লোকের কুসংস্কারের অন্ত ছিল না। আকাশে যা কিছু ঘটিত সবই তাদের ভাগ্য নির্ণয় করিত। একটা ধূমকেতুর উদয় হইল ত দেশে অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী! দুটী গ্রহ (conjunction) সমসূত্রপাতে থাকিল ত মহামারী না হইয়া যায় না! গ্রহণ হইল ত এমনি একটু কিছু হইবেই! টাইকো এই রকম একটা গ্রহণ লিপজিগ হইতে নির্দ্দিষ্ট দিনে হইতে দেখিয়া এই আশ্চর্য্য বিদ্যা শিক্ষা করিতে আকৃষ্ট হন্। অতি প্রাচীন কাল—এমন কি হিপার্কসের সময় হইতেই পণ্ডিতেরা গ্রহণের সময় অনেকটা আন্দাজে বলিতে পারিতেন। ১৫৬০ খৃঃ ২১ অগষ্ট গ্রহণ হইবে বলিয়া কোনও পণ্ডিত প্রচার করেন ও সেই দিন গ্রহণ হয়। তাহা দেখিয়া সেই দিন হইতে টাইকো যন্ত্রপাতি লইয়া পূর্ণ উদ্যমে গ্রহদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তখনকার যন্ত্র ও সময়-নিরূপণ-তালিকা সমস্তই ভ্রমপূর্ণ। তাই সেগুলি নিজেই তিনি করিতে থাকেন।

ইহার পর ১৫৬৫ খৃঃ তাঁর কাকা মারা যাইলে তিনি ডেনমার্কে যান, কিন্তু নীচলোকের ন্যায় বিজ্ঞান চর্চ্চা করার অপরাধে তাঁহার আত্মীয়দের বিদ্রূপে আবার জার্ম্মানির রষ্টকে (Rostock) আসিতে বাধ্য হন। কিন্তু এখানে তাঁকে তাঁর রুক্ষ ও একগুঁয়ে স্বভাবের ফল পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে হইয়াছিল! ডিসেম্বরের শেষাশেষি এক ভোজের উৎসবে কোনও লোকের সহিত অঙ্কশাস্ত্র বিষয়ের একটী তর্ক ক্রমশঃ দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিণত হয় ও ফলে তাঁর নাকটী সমূলে সাফ হইয়া যায়; এবং তিনি সোনা ও রূপা মিশাইয়া এক কৃত্রিম নাক প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই নাকের জন্য তাঁকে লোকের

এই দুর্ঘটনার পর তাঁর আর রষ্টকে থাকা পোষাইল না বলিয়া (Ausburg) তিনি অস্‌বর্গে আসেন ও সেখানে কয়েকজনের সহানুভূতি ও উৎসাহে নিজের তত্ত্বাবধানে এক প্রকাণ্ড Quadrant প্রস্তুত করেন। ইহাতে তিনি পাঁচ বৎসর ধরিয়া নক্ষত্রদের উচ্চতা পর্য্যবেক্ষণ করেন।

তারপর তিনি ১৫৭১ খৃঃ আবার ডেনমার্কে ফিরিয়া আসিয়া নানা কৌশলে-সোনা প্রস্তুত করার উপায় বাহির করিতে চেষ্টা করেন। আর লোকেরও তখন ধারণা ছিল সোনা রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর উৎপত্তি চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি নক্ষত্রের উপর নির্ভর করে। এখনও আমরা Silver nitrate কে lunar caustic বলিয়া থাকি। যাহা হউক ইহার কিছু পরেই ১৫৭২ খৃঃ এক নূতন তারার আবির্ভাব হইলে তিনি এই পণ্ডশ্রম হইতে অব্যাহিত পান। টাইকো ইহার উৎপত্তি হইতে লয় পর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থাই পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি ইহাকে প্রায় দেড়বৎসর পর্য্যন্ত বৃহস্পতির মত উজ্জ্বল দেখিয়াছিলেন। এখনও প্রায় ২০ বৎসর অন্তর এই রকমের উজ্জ্বল পদার্থ দেখা যায়। এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে ইহা নভঃমণ্ডলের কোন কিছুর সংঘর্ষের ফল ভিন্ন আর কিছু নয়।

এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে তিনি (University of Copenhagen) কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হন্‌ ও দ্বিতীয় ফ্রেডারিক তাঁহাকে নরওয়েতে এক জমিদারী, বাৎসরিক ৪০০ পাউণ্ড পেন্সন ও হিউয়েন দ্বীপে এক মানমন্দির নির্ম্মাণের জন্য ২০,০০০পাউণ্ড দেন। এই মান-মন্দিরের নাম হইল ইউরানিয়েনবার্গ (Uranienburg). এখানে টাইকো নিজের তত্ত্বাবধানে নক্ষত্রদের উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র (Quadrant), গ্রহনক্ষত্রদের পরস্পরের (angular) দূরত্ব নির্ণয় করিবার যন্ত্র Sextant প্রভৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত পদ্ধতে নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হইতেছে তাঁহার Transit circle এর আবিষ্কার। এই যন্ত্রসাহায্যে পৃথিবীর অপরিবর্ত্তনীয় (Uniform) গতির কল্যাণে গ্রহনক্ষত্ররা যখনই মস্তকোর্দ্ধরেখা (meirdian) অতিক্রম করে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া তাহার উচ্চতা ও সময় লিপিবদ্ধ করা যায়। আজও সমস্ত মান-মন্দিরে তাঁহারই পদ্ধতি অনুসারে কাজ হয়।

ইউরানিয়েনবার্গে টাইকো ২০ বৎসর যাবৎ গবেষণা করেন ও ইউরোপের তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। এখন নানা দেশ হইতে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজা মহারাজরা তাঁহার মানমন্দির দেখিতে আসিতে লাগিলেন। তবে তিনি সাধারণকে সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি না দেখাইয়া কতকগুলি স্বনির্ম্মিত খেলনা দেখাইয়াই সন্তুষ্ট করিতেন, ও নিজের দাম্ভিক স্বভাবের দোষে নামজাদা উপাধিধারী লোকদের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অসারতা প্রকাশ করিয়া মনে মনে আনন্দিত হইতেন। আরও তিনি আভিজাত্যের সমস্ত গর্ব্ব অভিমান ত্যাগ করিয়া সাধারণ চাষাভুষার সহিত মিশিতেন, ও তাহাদের বিপদে ক্ষমতার অতিরিক্ত সাহায্য করিতেন; এমন কি শেষে এক চাষার মেয়েকে বিবাহও করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে তাঁহার শত্রু হইল অনেক। কিন্তু রাজা ফ্রেডারিকের ভয়ে কেহই তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। তাই ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক ছেলে রাজা হইলে, শত্রুদের কুপরামর্শে তাঁহার জমিদারী কাড়িয়া লওয়া হইল এবং পেন্সন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। টাইকোও অভাবের তাড়নায় জার্ম্মানিতে চলিয়া আসিলেন ও বোহেমিয়ার রাজা রোডল্‌ফের (Rudolph II) বদান্যতায় (Prague) প্রেগে একটী মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখানে নানা স্থান হইতে তাঁহার অনেক ছাত্র আসিয়া জুটিতে লাগিল। কেপলারকেও (Kepler) তিনি এখানে সহযোগী শিষ্যরূপে পান এবং দুইজনে একত্রে এখানে কিছুদিন ধরিয়া নূতন উদ্যমে গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থিতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া Rudolphine Tables নামে প্রসিদ্ধ তালিকা প্রস্তুত করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার এই আরব্ধ কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই ১৬০১ খৃঃ ২৪ অক্টোবর তারিখে তাঁর মৃত্যু হয় ও এই ভার তাঁর প্রিয় শিষ্য ও সহযোগী কেপলারকে তিনি দিয়া যান।

২। কেপলার

টাইকো এবং কেপলারে কোন বিষয়েই মিল ছিল না। টাইকো ছিলেন ধনী, রাগী; কেপলার ছিলেন গরীব, ধীর। টাইকোর অঙ্কশাস্ত্রে অধিকার বা সূক্ষ্ম চিন্তা করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও যন্ত্রনির্ম্মাণ ও তাহার ব্যবহারের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ; আর কেপলারের যন্ত্রনির্ম্মাণ ও তাহার ব্যবহারের ইচ্ছা বা ক্ষমতা না থাকিলেও অঙ্কশাস্ত্রে অধিকার ও চিন্তা-শক্তি ছিল অপরিসীম। টাইকো হাত, কেপলার মাথা। তাই টাইকো ও কেপলারের পরিশ্রমের ফল একত্রীকৃত হইয়া জ্যোতির্বিদ্যার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে।

কেপলার এত গরীবের ঘরে জন্মিয়াছিলেন যে তিনি যে কখনও লেখা পড়া শিখিয়া একজন জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত হইবেন, ইহা কেহ ভাবিতেও পারে নাই। শরীরও ছিল তাঁর অতি রুগ্ন, সারা জীবনই কোন না দুরারোগ্য রোগে ভুগিয়াছেন। যে সময় সাধারণ বালকে ভবিষ্য-জীবনের উন্নতির কত-না রঙীন আশা লইয়া পরমানন্দে পাঠাভ্যাসে রত হয় তাঁহাকে সেই ন' দশ বৎসর বয়সে এক হোটেলে অতি হীনভাবে বয়ের কাজ করিতে হইত। কিন্তু পরে এক অবৈতনিক বিদ্যালয়ে পড়িয়া (Tubingen University) টুবিঙ্গেন বিদ্যালয় হইতে অঙ্কশাস্ত্রে উপাধি লাভ করিয়া Graz-এ জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কোপার্নিকের একজন গোঁড়া ভক্ত হইয়া ওঠেন। আরও তাঁহার অনুসন্ধিৎসা এবং গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তাধারা তাঁহাকে নানাবিধ অচিন্ত্য-পূর্ব্ব ভাবনায় ফেলিয়াছিল। তিনি প্রথম হইতেই ভাবিতে থাকিলেন 'গ্রহদের সংখ্যা কি ঠিক ছয়টাই?' 'তার বেশী কি হইতে পারে না?' 'ইহাদের আকাশ-পথের দূরত্ব ও পরিক্রমণের সময়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কি?' আমরা হয়ত মনে ভাবিতে পারি এ আর বেশী কি? এত আমরা এখন সকলেই সব বিষয়েই ভেবে থাকি। কিন্তু কেপলারের যুগ ও এ যুগে রাত্রিদিন প্রভেদ। তখন লোকে একটা প্রচলিত মতের সমর্থন করিতে নানারকম আজগুবি কথা বলিতে একটুও দ্বিধা বোধ করিত না। কেহ

পরস্পর গুণ-ফল ও যোগ-ফল যখন সবই ছয়, তখন ছটা গ্রহ না হইয়া আর উপায় কি? আবার টলেমির শিষ্যেরা বলিতেন যে মানুষের মাথায় যখন মুখ,চোখ,নাক, কান লইয়া সাতটি ছিদ্র আছে তখন আকাশে সাতটি গ্রহ না থাকিলে কি করিয়া চলে? কেহ বা বলিতেন যে ৭টা গ্রহ আছে তাই ৭টা ধাতু। আবার কেহ-বা বলিতেন যে সপ্তাহের ৭টা দিন ৭টাগ্রহের নাম হইতেই হইয়াছে। এখন এই গ্রহের সংখ্যা যদি বাড়ে বা কমে তাহা হইলে যে মহা বিপদ। এই সমস্ত হাস্যকর মতেরই যে যুগে আধিপত্য, সে যুগে কেপলারের বিপরীত চিন্তাধারা একটা বিশেষ-কিছু নয় কি?

যাহা হউক কেপলার ভাবিলেন, বোধ হয় গ্রহদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্বের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে-গ্রহ সূর্য্য হইতে বেশী দূরে থাকে, সে কম বেগে ঘোরে। তাই গ্রহদের গতি ও দূরত্বের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিবেই মনে করিয়া ইহার একটা কিছু সমাধান করিতে তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। প্রথমে দূরত্বকে নিয়মাধীন করিবার চেষ্টা-কালে তাঁহার খেয়াল হইল যে জ্যামিতিতে একটী বৃত্তের মধ্যে অঙ্কিত অসংখ্য সমকোণ ত্রিভুজের বাহুগুলি আর একটী বৃত্তের সৃষ্টি করে ও বৃত্ত দুইটির ব্যাসার্দ্ধের অনুপাত সকাবস্থাতেই একটি অপরিবর্ত্তনীয় সংখ্যা (constant). এখন এই দুইটি বৃত্ত ও-দুটী গ্রহের আকাশ-পথ হইতে পারে ত। অন্যান্য সমতল চিত্র দিয়াও পরীক্ষা করিলেন,কিন্তু ফল কিছুই হইল না। তারপর তিনি সম্পূর্ণ আন্দাজেই নানা রকম ঘন-ক্ষেত্র চিত্র (Solid figures) লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে আশ্চর্য্য রকমে গ্রহদের দূরত্বের হিসাব জানিতে পারিলেন। তাঁহার এই ঘনক্ষেত্র লইয়া পরীক্ষার কারণ এই যে (Euclid) ইউক্লিডের মতে ৫টী অভঙ্গ ঘনক্ষেত্র হয় আর ছয়টি গ্রহের অবস্থিতির মধ্যে পাঁচটী শূন্য স্থান থাকে; আরও গ্রহগুলি সব ঘনক্ষেত্র বিশিষ্ট (solid) তখন ইহাদের সঙ্গে গ্রহদের কিছু সম্বন্ধ থাকিতেও পারে। যাহা হউক সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার অন্ধকারে আন্দাজে ছোড়া ঢিল ঠিক স্থানেই আঘাত করিয়াছিল। এই আবিষ্কারের ফল তিনি ১৫৯৭ সালে

তারপর তিনি গ্রহদের গতির কারণ নির্ণয়ে মাতিয়া উঠিলেন। মানুষের সফলতা তার উদ্যমকে নূতন শক্তি দান করে। তাঁহার পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে পরীরা গ্রহদের বহন করিয়া বেড়ায়। তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক ভাষায় অনেক গবেষণার পর-ব্যক্ত করিলেন যে সূর্য্য হইতে কোন শক্তি নির্গত হইয়া গ্রহদের ঘুরিতে বাধ্য করে। মোটের উপর গ্রহদের গতি সম্বন্ধে তাঁহার মত যেন কতকটা এ রকম যে গ্রহেরা ঘুরে বলিয়াই ঘুরে।

ইহার কিছু পরে তিনি টাইকোর সহিত পরিচিত হন্ ও টাইকোর মধ্যস্থতায় Rudolph তাঁহাকে উচ্চ বেতনে প্রেগে Imperial Mathematican নিযুক্ত করেন। তবে শীঘ্রই রাজ্যের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় এই বেতন তাঁহার খুব কমই হস্তগত হইত। তাই তিনি কিছুদিনের জন্য জ্যোতির্বিদ্যা ছাড়িয়া দিয়া আলোকবিজ্ঞান লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি মানুষের চোখের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করেন। আলোক-রেখাদির দিক্‌বিবর্ত্তনের নিয়ম (Laws of refraction) লইয়াও কিছুদিন গবেষণা করেন, কিন্তু বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ডি কার্টেই (Des cartes) বছর কয়েক পরে ইহা আবিষ্কার ও সুন্দরভাবে আলোচনা করেন।

এখন আমরা কেপলারের সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কারের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। তিনি প্রেগে যতদিন ছিলেন, তার বেশীর ভাগই টাইকো লিখিত মঙ্গলের বিভিন্ন সময়ের অবস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার গতি সম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এরিষ্টট্‌ল সেই কবে বলিয়া গিয়াছেন যে বৃত্তাকার গতিই সম্পূর্ণ নিখুঁত ও অকৃত্রিম, তাই গ্রহরা বৃত্তাকারে না ঘুরিয়া যায় না। এই ধারণা লোকের মনে এতটা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, কেহ ভাবিতেও পারিত না যে ইহা ভুল। সেজন্য হিপার্কস্ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা যখন দেখিলেন যে গ্রহরা ঠিক সহজ বৃত্তাকার পথে চলে না, তখন তাঁহারা অন্য কোন বক্ররেখা (curve) লইয়া চেষ্টা করেন নাই। গিয়া আরও জটিল করিয়া ফেলিলেন। কোঁপার্নিক তবু সূর্য্যকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহা কতকটা সরল করেন; কিন্তু কেপলার টাইকোর নির্ভুল পর্য্যবেক্ষণের ফর্দ দেখিয়া ইহার অসারতা বিলক্ষণ বুঝিলেন ও ইহার সমাধানে বদ্ধপরিকর হইলেন।

মঙ্গল সূর্য্যের খুব নিকটে থাকায় অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার অবস্থিতির নানা রকম পরিবর্ত্তন ঘটে। তাঁহার সমস্যার বিষয় হইল এই যে পৃথিবী ও মঙ্গলের এমন ভ্রমণ পথ ও এমন গতির নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইবে যে তাহাদের সংযোজক রেখাকে আকাশে বাড়াইয়া দিলে ইহা সব সময়েই মঙ্গলের দৃশ্যমান অবস্থিতিস্থান নির্দ্দেশ করিবে। তিনি তাঁহার সুবিধামত নানা রকম বৃত্তাকার ভ্রমণ-পথ লইয়া চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। তারপর তিনি অপরিবর্ত্তনশীল (Unifrom) গতির স্থানে পরিবর্ত্তনশীল (Varying) বৃত্তাকার গতি লইয়া পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার এই গণনা কিছু সহজ করিবার জন্য বৃত্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমক্ষেত্রফলযুক্ত ত্রিভুজে ভাগ করিয়া লইয়া হইতে পারে কি না পরীক্ষা করিতে করিতে সৌভাগ্যক্রমে দেখিলেন যে গ্রহরা অপরিবর্ত্তনশীল গতিতে ঘুরে বটে, কিন্তু সেটা ক্ষেত্রফল, বৃত্তাংশ নয়।

যাহা হউক গতির নিয়ম কতকটা স্থির হইলেও ভ্রমণ পথের আকার সম্বন্ধে কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার মনে হইল তবে কি য়্যারিষ্টটলের মত ভ্রান্ত! গ্রহরা কি বৃত্তাকারে না ঘুরিয়া অন্য কোন আকারের পথে ঘোরে। তার পর থেকেই তিনি ডিম্বাকার (oval) curves লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে আবার এক নুতন বিপদ হইল। তাঁহার পূর্ব্ব-আবিষ্কৃত গতির নিয়ম এই curvesএ আবার টেঁকে না। এইরূপে ক্রমাগত ছয় বৎসর ধরিয়া দিনরাত নানা রকম সত্য মিথ্যা অনুমানের উপর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার সমস্যা যেন ক্রমশঃ জটিলতর হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি কোন দিনই আশা ছাড়েন নাই। অবশেষে তাঁহার একদিন রাতে ঘুমের ঘোরে বৃত্তাভাসের (Ellipse) কথা মনে হওয়ায় তৎক্ষণাৎ উঠিয়া

জানিতে পারিলেন গ্রহরা সূর্য্যকে একটী অধিশ্রয়ণবিন্দু (Focus) করিয়া অপবৃত্তাকার (Elliptic) পথে ভ্রমণ করে। ইহাতে তাঁহার আবিষ্কৃত গতির নিয়মও বজায় থাকে। বাস্তবিক তিনি কি রকম অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া, নানারূপ ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়া, কত বড় এলোমেলো গোলমেলে ব্যাপারকে একটা নিয়মাধীন করিলেন! তাঁহাকে নভঃমণ্ডলের আইন-কারক বলা যায় না কি ?

তাঁহার এই সাধনার ফল তিনি ১৬০৯ খৃঃ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন ও Rudolph এর কাছে অন্যান্য গ্রহদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য কিছু অর্থ সাহায্য চান। কিন্তু Rudolph এর ১৬১২ খৃঃ মৃত্যু হইলে তিনি আবার দারুণ অর্থকষ্টে পড়েন। এ সময় তিনি অন্যত্র চলিয়া যাইবেন ভাবিলেন ; কিন্তু তাহা হইলে টাইকোর যন্ত্রাদির ও পরীক্ষিত ফলের আর সাহায্য পাইবেন না বলিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার স্ত্রী ও এক ছেলের অতি কষ্টে চিকিৎসা বিভ্রাটে মৃত্যু হইলে তিনি এ স্থানের ১১ বৎসরের মায়া ত্যাগ করিয়া Linz এ অধ্যাপক হইয়া গেলেন। এই সময়ে তাঁর আর এক বিপদ হয়! তাঁহার মা যাদুবিদ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হন ও স্বেচ্ছাকৃত স্বীকারোক্তি করাইবার জন্য অযথা অমানুষিক দণ্ডে দণ্ডিত হইতে আদিষ্ট হন। কেপলার তাঁকে এই অযথা-পীড়ন হইতে রক্ষা করিতে পারিলেও তাঁকে এক বৎসরের জন্য জেলে থাকিতে হইল।

এত বিপদের মাঝে থাকিয়াও তিনি গ্রহদের দূরত্বের ও সময়ের মধ্যকার সম্বন্ধ নির্ণয়ে এক দিনের জন্যও বিরত হন নাই। অবশ্য এবার আর তাঁকে পূর্ব্বের মত অন্ধকারে হাৎড়াইতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে, যে কোন গ্রহের সূর্য্য হইতে দূরত্বের ঘনফল ($distance^3$ ও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণের সময়ের বর্গফলের $(time)^2$ অনুপাত সমান। ইহাই হইল কেপলারের আবিষ্কৃত গ্রহদের তৃতীয় আইন।

ইহার পরেই তিনি এই সমস্ত বিষয় পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই পুস্তক কতকটা সরল ও সুন্দর ভাষায় সে জন্য গভর্ণমেন্ট শীঘ্রই কোপার্ণিকের De Revolutionibus Quroium এর সঙ্গে ইহারও প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহার ফলে কেপলারকে আরও কষ্টে পড়িতে হইল। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি টাইকোর Rudolphine Tables এর জন্য পরিশ্রম করিতে লাগিলেন ও শীঘ্রই তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া মুদ্রন-ব্যয়ের জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে আবার আবেদন করিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কোন সাহায্য না করায় ঐ অর্থকষ্টের সময়েও তিনি নিজ ব্যয়ে তাহা মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি অনুরাগ কি অতুলনীয় নয়! এই Rudolphine Tables আজকালকার Nautical Almanack এরই অনুরূপ।

এত বড় একজন বৈজ্ঞানিকের শেষ জীবনে জার্ম্মানি-গভর্ণমেণ্ট কোন সাহায্য করিলেন না, ইহা কি তাঁহাদের পক্ষে কম লজ্জার কথা! কিন্তু তাঁহার আদর করিলেন ইটালির গভর্ণমেণ্ট। ইটালিতে তখন গ্যালিলিওর (Galileo) খুব প্রতাপ। তাঁহারই অনুরোধে তৎকালীন ইটালীর গভর্ণমেণ্ট কেপলারের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে একটী স্বর্ণ শৃঙ্খল উপহার দেন। কিন্তু কেপলার এত কষ্টে আর বেশী দিন বাঁচিলেন না। ৫৯ বৎসর বয়সে নিতান্ত দুঃখের মধ্যে ই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বাস্তবিক টাইকো ও কেপলারের একযোগে কাজে কি জ্যোতির্বিদ্যার কম উন্নতি হইয়াছে! কেপলারকে যদি এই রকম অভাবের সঙ্গে সারা জীবন যুদ্ধ করিতে না হইত, তাহা হইলে তিনি আরও কত না আবিষ্কার করিতে পারিতেন। তবে তাঁর আবিষ্কার টাইকোর পর্য্যবেক্ষণ-ফলের উপর নির্ভর করে! তাই তিনি দরিদ্র না হইয়া যদি টাইকো হইতেন তবে তাঁহারা বোধ হয় বেশী কিছু করিতে পারিতেন না।

কেপলারের এই লেখার ভঙ্গীও স্বতন্ত্র রকমের। তিনি অসংখ্য ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন। তাই বলিয়া তিনি কেবল সোজা পথই পুস্তকে বিবৃত করেন নাই। তাঁর যখন যে সমস্ত ভাব মনে হইয়াছে তাহা ভুলই হউক বা ঠিকই হউক সমস্তই বিবৃত করিয়াছেন।

কলম্বস যেমন তখনকার অজ্ঞাত দেশ আমেরিকা আবিষ্কার করিবার সময় কত অপথ-বিপথ দিয়া কত আশা-নিরাশার মধ্য দিয়া চলিয়া তবে আমেরিকায় পৌঁছিয়াছিলেন, তিনিও তেমনই এই নভঃমুণ্ডলের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার এই অক্লান্ত পরিশ্রম, সারাজীবনব্যাপী কেবল গণনা আর গণনা, কখনও আশা কখনও নিরাশা, তার উপর অর্থকষ্ট ও পারিবারিক অশান্তি,—সে যে কি কষ্টকর ও দুঃসহ, তাহা আমাদের পক্ষে ভাবাও কঠিন নয় কি? কিন্তু সত্য নির্ণয় করিবার জন্য তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও জ্ঞান-লাভের ইচ্ছা এত প্রবল ছিল যে তিনি সে সমস্তই অম্লানবদনে সহ্য করিয়া শেষে নিজের অভীষ্ট লাভ করিলেন।

শ্রীঅমরনাথ প্রামাণিক।

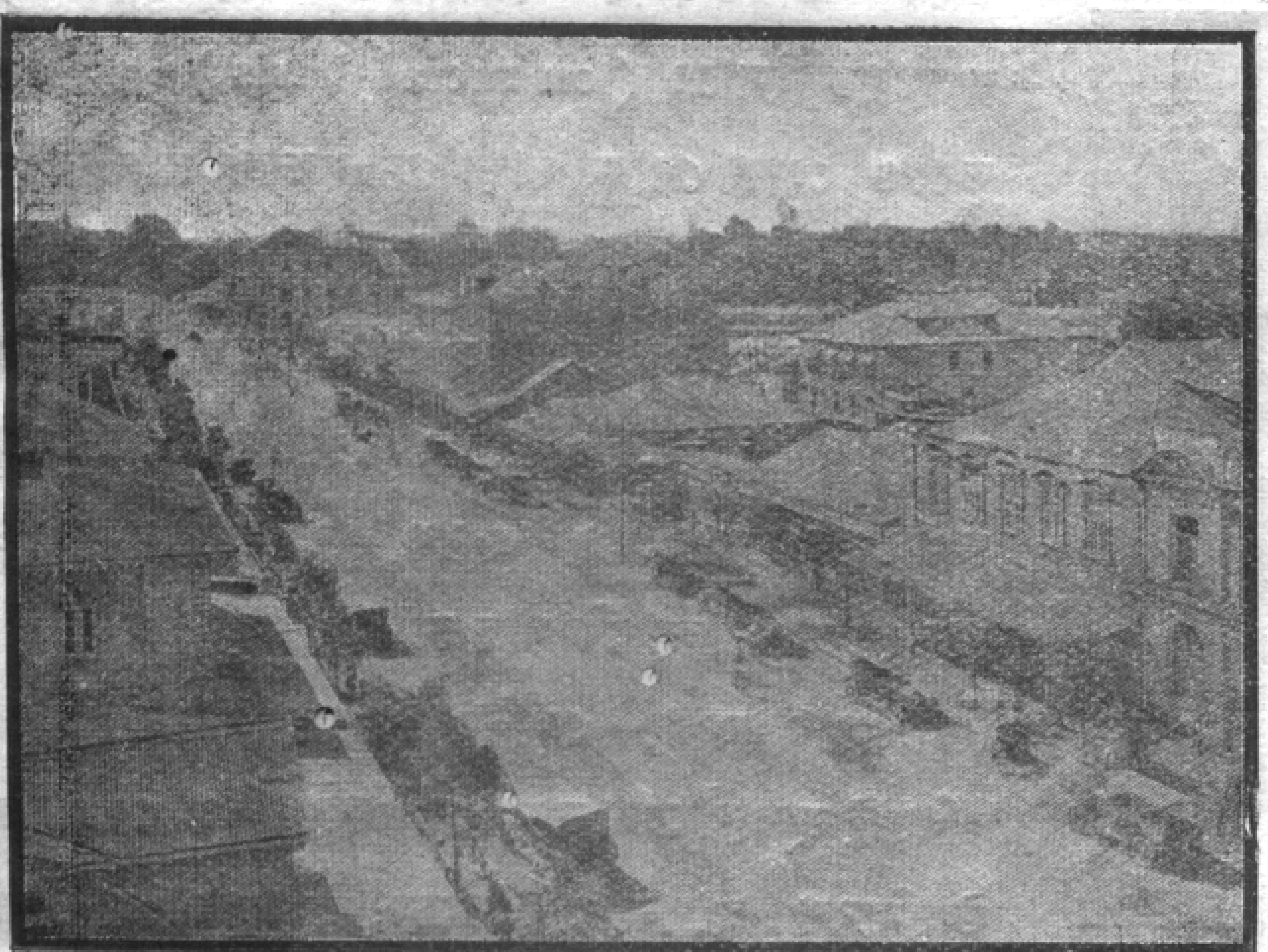
কেনিয়া

আফ্রিকায় ইংরাজ-অধিকারে কেনিয়া প্রদেশ। আফ্রিকার পূর্ব্বভাগ হইতে আরবের মস্কট অবধি প্রদেশ পূর্ব্বে ইমামের অধিকার-ভুক্ত ছিল; জান্‌জিবারের সুলতান মস্কটের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীন বলিয়া নিজেকে প্রচার করেন; পরে তিনি নির্ব্বল হইলে জর্ম্মানি ও গ্রেট-বৃটেন এই কেনিয়া-উপনিবেশ ভাল করিয়া অধিকার-ভুক্ত করে। গত যুদ্ধের পর কেনিয়ায় জর্ম্মান-প্রভাব লোপ পায় এবং কেনিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়।



পার্লামেণ্ট-গৃহ

কেনিয়া ইংরাজের সংস্পর্শে আসার সময় হইতেই এখানে চাষ-আবাদের কাজ আরম্ভ হয় এবং এই কার্য্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে কুলি সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ কেনিয়ায় পাঠাইত। মোম্বাসা হইতে ভিক্টোরিয়া নায়ঞ্জা পর্য্যন্ত ছশো মাইল এক রেলোয়ে লাইন বসানো হয়, ভারতীয় কুলিদের লইয়া যাইবার জন্য। এইরূপে ভারতীয় শ্রমিকদলের রক্তে কেনিয়ায় চাষ-আবাদ করিয়া ইংরাজ ব্যবসায়ীরা প্রভূত অর্থ লাভ করিতে থাকে। কুলিদের অনেকেই কেনিয়ায় বসবাস



বড় রাস্তা

তারা দেখিল, এসিয়াবাসীরা তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিব্য অংশীদার হইতেছে, এ তো ভাল কথা নয়। তারা তখন প্রবল আন্দোলন তুলিল। এদের আন্দোলনে যোগ দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল স্মাট্‌স্। দক্ষিণ-আফ্রিকা স্বায়ত্ত-শাসন পাইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও কেনিয়া ভারতবাসীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইল; এককাট্টা হইল,—ভারতীয়দের ন্যায়সঙ্গত অধিকারও তাদের দেওয়া হইবে না! সম্প্রতি সাম্রাজ্য-কনফারেন্সে তেজ বাহাদুরের সহিত স্মাট্‌সের এ বিষয়ে নানা কথা হইয়া গিয়াছে। সে সব কথা যাঁরা খবরের কাগজ পড়েন, তাঁরা জানেন। তবে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে

সুরু করিয়া দেয়। তার পর ভারতবর্ষ ও এশিয়ার নানা প্রদেশ হইতে বহু লোক ক্রমে জীবিকার সন্ধানে কেনিয়া যাইতে সুরু করে এবং কেনিয়ায় এসিয়া-বাসীর সংখ্যা দাঁড়ায় পঁচিশ হাজারের উপর। এদের জীবিকার উপায় ছিল মজুরী, সরকারী চাকুরী ও ব্যবসা। ব্যবসা করিতে আসিয়া কেহ কেহ জমি কিনিয়া সেখানে সম্পত্তি খাড়া করিল; কেহ কেহ উকিল ব্যারিষ্টারও হইল। এসিয়াবাসী ও ভারতবাসী একটু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলে কেনিয়ার শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের প্রাণে হিংসা হইল, এবং ঔপনিবেশিকেরা তাদের প্রতি বিমুখ হইল।



বাজার

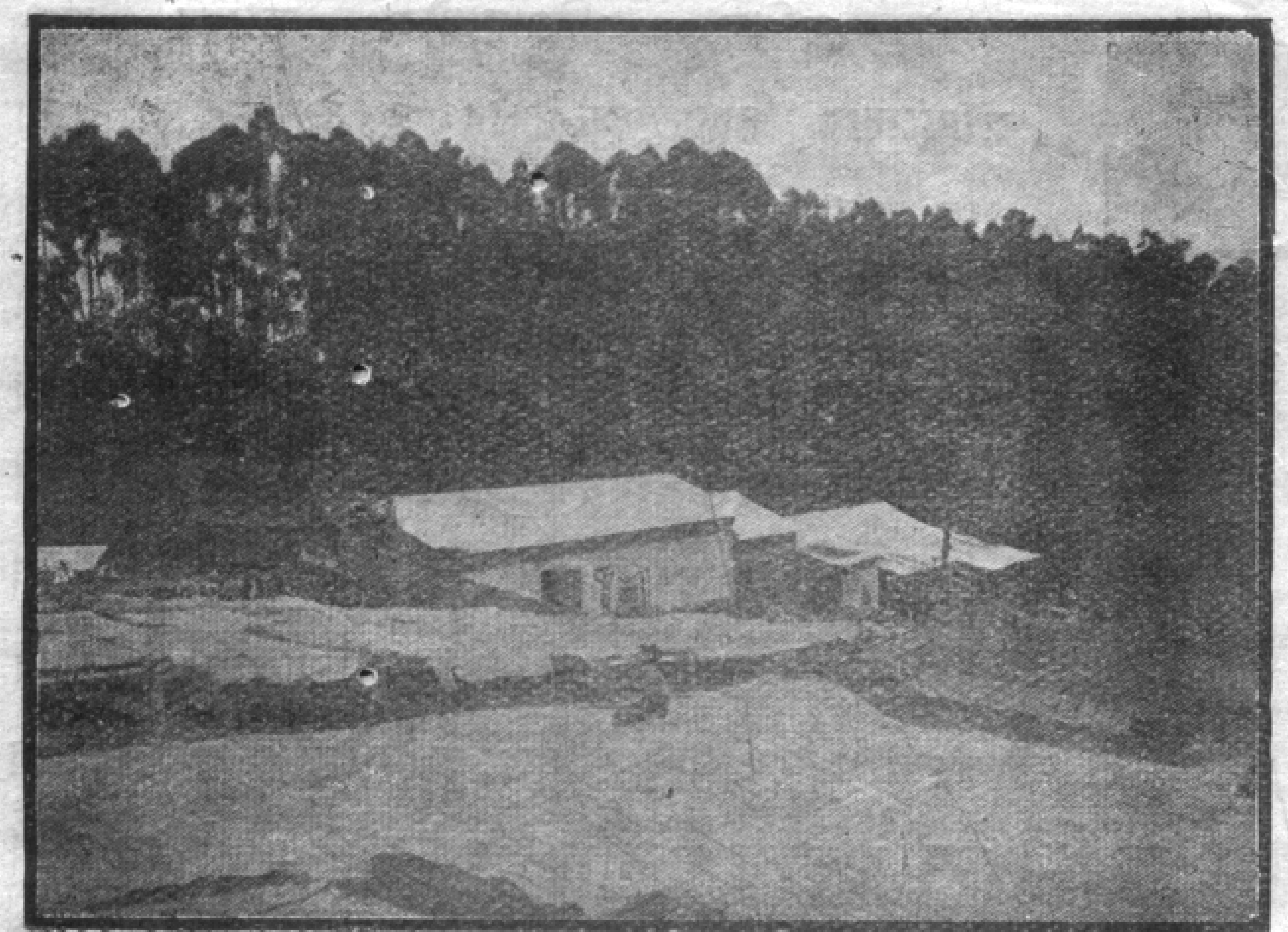


মধ্যবিদ্ ভারতবাসীর গৃহ

এ সম্বন্ধে যে দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছিল তার মোদ্দা কথা এই,—

কেনিয়া-উপনিবেশ আত্ম-শাসন পায় নাই! কেনিয়ার শাসন-ভার এখন ইংরাজের হাতে। অতএব ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া ভারতীয়ের অধিকার এখানেও অব্যাহত থাকিবে না কেন? অপর য়ুরোপীয় সেট্‌লাররা যে-সব সুবিধা পায় ভারতীয়েরাই বা তা না পাইবে কেন? ভারতীয়েরা ট্যাক্স জোগাইতেছে, তাদের হক রক্ষা করা হইবে নাই বা কেন? মিউনিসিপালিটি ও কৌন্সিলেও তাদের তুল্যাধিকার দেওয়া হউক, এ প্রার্থনা তার ন্যায়সঙ্গত।

কেনিয়ার লোক-সংখ্যা এখন এইরূপ:—আফ্রিকান



কফির কারখানা

২৫ লক্ষ, ভারতবাসী ২২৮২২; আরব ১০১০২; য়ুরোপীয় ৯৬৫১। য়ুরোপীয়েরা সেখানকার কলোনিয়াল ঔপনিবেশিক।

কেনিয়ার উচ্চ-ভূভাগ কয়েকজন এসিয়াবাসীকে এই সর্ত্তে দেওয়া হইয়াছে যে সে-সব ভূমিতে তাদের কোন স্বত্ব দাঁড়াইবে না; যে সব জমি দেওয়া আছে, সে সব জমির প্রভূত উন্নতি করিতে হইবে এবং এ-সব ভূমিখণ্ড বিশ বৎসর পরে ভারতীয়েরা ছাড়িয়া দিবে। কেনিয়া প্রস্তাব করিল—

১। কেনিয়ায় ভারতবাসীদের আর আসিতে দেওয়া



গোরা পল্লী

হইবে না; ২। যে-সব ভারতীয়েরা চারিধারে ছড়াইয়া বিস্তৃতভাবে বাস করিতেছে, তাদের দে-হাতায় পুরিয়া দেওয়া হইবে; ৩। মিউনিসিপালিটি ও কৌন্সিলে খুব পরিমিত ভাবে ভারতীয়দের নির্ব্বাচিত করা হইবে; জাতিগত হিসাবে (on racial basis) ৬। উচ্চ ভূখণ্ডে গোরা লোক ছাড়া কোন ভারতীয় থাকিতে পারিবে না। অর্থাৎ কেনিয়ায় সাদায়-কালোয় ভীষণ তফাৎ রাখিতেই হইবে। তবে জেনারেল স্মাটস্ বলিয়াছেন, এ তফাৎ বর্ণভেদের জন্য নয়, অর্থ-নৈতিক কারণে। এ-সব কথা শুনিয়া হাসিও পায়। শাক দিয়া কি মাছ ঢাকা যায়!

শাদার কথা,—কেনিয়া স্বায়ত্ত শাসন পাইবে বলিয়াই য়ুরোপীয়েরা নানা সুযোগ ছাড়িয়া কেনিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে; তাদের দাবী না



ভারতীয় বাজার

পূরাইলে তারা বিদ্রোহ করিবে। গরিব কালারাও কি দেশ-ভুঁই সব ছাড়িয়া যায় নাই? গায়ের চামড়া কালো বলিয়া তাদের দাবীও ত সাদার চেয়ে কম নয়!

দেখা যাইতেছে, লোক-সংখ্যার তুলনায় ভারতীয় প্রতিনিধি কৌন্সিলে যা থাকিবে তা খুবই কম। আর ঐ উচ্চ ভূখণ্ডে ভারতীয়ের অধিকার থাকিবে না বলিয়া যে ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহার চেয়ে হীনতার ছাপ্ ভারতীয়ের ললাটে আর কি লাগানো যাইতে পারে!

এই সব গোলযোগ মিটাইবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে উপনিবেশ-সমূহ পরিদর্শনে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াছেন—"কেনিয়ার ব্যাপার সম্বন্ধে মীমাংসা ভারতের পক্ষে খুবই গ্লানিকর। ইণ্ডিয়া অফিস ও ভারত-গবর্ণমেণ্ট কেনিয়ার বহু

লোকের স্বার্থরক্ষার যে ভার পাইয়াছেন, সে স্বার্থ তাঁদের দ্বারা রক্ষিত হওয়া দূরে থাক, অবজ্ঞাতই হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তুল্যাংশের অংশীদার নয়, তারা বৃহর সাম্রাজ্যে দাসমাত্র।"

এ ব্যবহার রদ করিতে না পারিলে নাটাল ও ট্রান্সভালের মতই কেনিয়ায় ভারতবাসীর দুর্দ্দশাও ঘুচিবে না! এই দুর্দ্দশা মোচনের ডাক্তার গৌর কৌন্সিলে এক বিল পেশ করাইয়াছিলেন—তাহা আইন-বদ্ধ হইয়াছে। কেনিয়ায় ভারতবাসী সম্প্রতি ঘোষণা দ্বারা ট্যাক্স বন্ধ করিয়াছে। সারা ভারত জুড়িয়া প্রবল আন্দোলন জাগাইতে পারিলে ভারতবাসীর এ গ্লানির উচ্ছেদ হইবে,' নচেৎ কেনিয়ায় ভারত "হীনতা-পঙ্কে" মজ্জিতই থাকিবে।

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

অভিযোগ

উপন্যাসে একটা ব্যর্থ জীবনের করুণ দুঃখময় কাহিনী পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখি—

বালিশটা অশ্রুময় অভিযোগের সুরে বলচে—তোমার চোখের জলে আমার সারা অন্তর ভিজে গেল! নিষ্ঠুর তুমি, কেন এনেচ তুমি আমাকে তোমার ঘরে? আমার অন্তরের আকাশে আর হাসি নেই, পাখী গায় না, চাঁদ ওঠে না, ফুল ফোটে না! তোমার জন্য আমিও ব্যর্থ হলাম। ঐ যেখানে মিলনের নহবৎ বাজ্‌চে, ফুলশয্যা রচনা হচ্ছে নব পরিণীত দম্পতির মিলন-রাত্রে, আমিও তো সেই-খানেই স্থান পেতাম, তুমি যদি নিষ্ঠুরের মত এখানে আমাকে বন্দী করে না রাখতে! শৈশবে কত স্বপ্ন দেখেছি, রঙ-বেরঙের ফুলের মত, কত হাসি, কত আনন্দ, কত গান! কিন্তু হায়, তোমার কাছে এসে আমার সব ফুরাল! ময়লা বিশ্রী ছেঁড়া পড়ে আছি—কারো যত্ন নেই আমার উপর! যদি পাশের বাড়ীর ঐ মেয়েটির ঘরে থাকতাম তা হলে সে আমাকে কত যত্নে রাখত। ভারী স্বার্থপর নিষ্ঠুর তুমি! শীতে আমার সারা অঙ্গ হিম হয়ে আছে, তার উপর আবার তোমার চোখের জল! ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে ছুটি দাও। তোমার ব্যর্থতায় আমার রিক্ত করো না।

বিছানা বল্লে,—তুমি কেন আমায় দোকান থেকে কিনে এনেছিলে? তোমার বুকের বেদনায় আমার সমস্ত হাসি আনন্দ ঐশ্বর্য্য ম্লান হয়ে ছটফট করছে! তোমার জন্য একটা আরামের নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলতে পারি না! কি কুশ্রী তুমি! তোমার এ তো ঘর নয় যেন কোন নরককুণ্ডের একটা জ্বালাময় কুঠ্‌রী—! আলো নাই, বাতাস নাই, শুধু নৈরাশ্য, শুধু হতাশা। হায় হতভাগ্য, তোমার জন্য আমার জন্ম নয়। আমায় মুক্তি দাও, ওগো আমায় মুক্তি দাও।

ঝঙ্কার দিয়ে ঘরের মেজ বলে উঠ্‌ল,—হেঁটো না হেঁটো না আমার বুকে তোমার ঐ কঠিন পা দুটো দিয়ে আর হেঁটো না। বুক আমার ভারী হয়ে আসছে তোমার ঐ নিষ্ঠুর কঠিন চরণের আঘাতে। এখান থেকে তুমি চলে যাও, চলে যাও। আঃ, সেই মেয়েটি সেদিন আমার চোখের মাড়িয়েছিল। কী মিষ্টি তার আলতা-ধোওয়া পায়ের চুমা! তুমি ছিলে, তাই সে চলে গেল। বেরিয়ে যাও, আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। তাকে আসতে দাও, আমি নিজেকে ধন্য করে তুলি, সার্থক করে তুলি। কী স্বার্থপর কুশ্রী দরিদ্র তুমি!

ঘুম ভেঙে গেল। চাঁদের জ্যোৎস্না তখন ঘরময় লুটিয়ে পড়েচে! মনটা কি রকম করে উঠ্‌ল। আজ অনেকদিন পরে পাশের লোকটির সুষুপ্ত ঠোঁট দুখানির ওপর একটি সস্নেহ চুম্বন বুলিয়ে দিলাম।

শ্রীসুবোধ দাশ গুপ্ত।

আলোচনা

পুরুষ ও নারী

পুরুষ সহনশীল, পুরুষ দেবতা, পুরুষ পরিশ্রমী—অসাধ্য-সাধনক্ষম, পুরুষ বোঝা বইতে এসেছে—যে বোঝা বয় সে মানুষ, যে না বইতে পারে সে পশু। পুরুষ কাণ্ডারী, পুরুষ মানুষ।......

নারী সহনশীলা, নারী মায়াবিনী—নারী স্নেহ-মমতার আধার। তবে নারী বোঝা বইতে পারে না কেন?

বইতে দেওয়া হয় না।

এ দেওয়া না দেওয়ার কর্ত্তা কে?

পুরুষ।

নারী কি বোঝা বইতে পারে না বলেই তাকে বোঝা বইতে দেওয়া হয় না?

পারবার যোগ্য নারী এ যুগে পায় না বলেই নারী পারে না।

আর দেখা যায় যেখানে নারী বোঝা বইতে শিখেছে—সে বোঝা নিজের বোঝা। সে বোঝা বইতে নারী আপনাকেই চিনে রেখেছে আর নিজের বোঝা বইবার সোজা পথ এ জাতি পেয়েছে—নরক।

তবে পুরুষ কেন নিজে আদর্শ হয়ে নারীকে গড়ে তুলছে না? তুলছে না, কারণ—পুরুষ জানে, নারী কোমলাঙ্গী। কোমল দেহখানি তার একটু ভারেই এলিয়ে পড়ে।

তবে যে বলা হলো নারী পরিশ্রমী!

নারী পরিশ্রমী ঠিকই! তবে কেমন পরিশ্রমী—না, নারী পরিশ্রমী মায়া ও মোহের খাতিরে।

সন্তানের মায়ায় আকৃষ্টা নারী সন্তানের দুঃখ সইতে না পেরে পরিশ্রম করেন—সন্তান বড় হ'য়ে খেতে-পরতে দেবে এই আশায়। সে সন্তানের জন্য তিনি পরিশ্রম করেন না, করেন শুধু মায়ার খাতিরে—তার কষ্ট দেখলে এ জাতির প্রাণ হতে মায়ারস শুকিয়ে যায়। তবে নারী পুরুষের পান সাজা, খাবার তৈরী, ঘর সাজানো প্রভৃতি করেন কেন?

মন ভুলিয়ে নিত্য নূতন বায়না হাজির করতে।

নারী গর্ভধারিণী বলেও কি পরিশ্রমী আখ্যা পেতে পারেন না?

সে আখ্যা তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য নয়। তবে সন্তানের মনে রাখা উচিত যে নারী গর্ভধারিণী জননী—দশমাস দশ দিন বোঝা ব'য়েছেন, ক্ষিধে পেলে—মুখের কথায় না প্রকাশ করতে পারলেও নারী সহানুভূতি দেখিয়ে খাইয়েছেন—নিজ-দেহ পাত করে সন্তানকে লালন-পালন করেছেন—তাই সন্তানের উচিত নারীকে দেবীর চেয়েও আরাধ্যা মনে করে পূজা করা।

নারী গর্ভধারিণী বলে পরিশ্রমী আখ্যার দাবী করতে পারেন না কেন?

পারেন না, কারণ, নারী কি বলতে পারেন, দশমাস দশ দিন ধরে এ বোঝা বইতে হবে বলেই দাম্পত্য জীবনের সহবাস কামনা করেছিলেন—কখনও পারেন না, এ কথা বলতে।

তবে এ জাতি নিজের উন্নতির জন্য মাথা তুলছে না কেন? পুরুষ কেন নারী-স্বাধীনতা নিয়ে এত ব্যাকুল হয়েছে!

নারী মাথা তুলতে পারছে না, কারণ—সাধারণতঃ নারী দুই শ্রেণীর, শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা। যাঁরা শিক্ষিতা নন তাঁরা বাক্চাতুর্য্যে পুরুষকে ভুলিয়ে সংসারের কাজ থেকে অবসর পান না—সংসারের কাজ করে, ছেলে-মেয়ে খাইয়ে মাথা তোলবার সুযোগ তাঁদের ভাগ্যে ঘটে না।

আর যাঁরা শিক্ষিতা—তাঁরা যৌবনের লাবণ্যে ও নব নব প্রেম-জালে পুরুষকে মুগ্ধ করে নিজেদের মত বড় বোঝা পুরুষের মাথায় চাপাতে থাকেন; তখন পুরুষ বোঝেন—আগুনের জাল এ নারীর সহ্য হবে না—নিজ-হস্তে সেবা-পরিচর্য্যা এ নারীর কোমল অবয়বে সম্ভব নয়, তাই হলো তাঁদের জন্য চাকর, বামুনের বন্দোবস্ত।

ধীরে ধীরে নারী সন্তানের জননী হলেন—এখন খাওয়া-বেড়ানোর অসুবিধা হলো। সন্তানকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তার যৌবনশ্রী বিবর্ণ হয়ে যাবে তাই হলো ঝীর বন্দোবস্ত। ব্যস! সে নারী যে সদ্যঃসন্তান-প্রসূতি, এ কথা কে বিশ্বাস করে? সন্তানের জননী বলে আখ্যাত হতে রইল ঝী আর সদ্য-প্রসূত শিশুর জীবন-রক্ষার একমাত্র সম্বল, যাকে আমরা ভগবানের অস্তিত্বের একমাত্র নিদর্শন বলে জানি, সেই স্তন-দুগ্ধের অনুকরণে চুষি, মুখে ফিডীং-বোতল। নারী ছোটেন থিয়েটারে বায়োস্কোপে ময়দানে বাগানে। এই হ'ল ধনী ও মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহিণী-নারীদের কথা। গরীবদের ত কথাই নাই—তারা এ-সব সুখ থেকে বঞ্চিত, ঝী-চাকর জোটাই তাঁদের ভার। তাঁরা সংসারের হাটখোলা নিয়েই ব্যস্ত। তাঁদের আর সময় কোথা!

আর যাঁরা উচ্চশিক্ষা-প্রণোদিতা হয়ে দেশের, দশের ও এ জাতির উন্নতি-সাধনে তৎপরা তাঁদের মধ্যে শতকরা একজন সংসার-বিপণীর ধার ধারেন কি না সন্দেহ।

তবে কেউ কি সমাজ-ধর্ম্মের বসবাস করে প্রকৃত-ভাবে অন্তঃকরণের সহিত এ জাতির উন্নতি কামনা করেন না?

করেন ক'জন, জানি না—অতীত ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিন, যাদের চোখে দেখিনি তাদের কথা শুনে বা বলে লাভ? তবে বর্ত্তমানে একজনকে জানি, যিনি উচ্চ বংশে জন্ম নিয়ে, উচ্চ ঘরে প্রবেশ করেও

উচ্চশিক্ষায় সম্মানিত হয়েও আজ দেশে দেশে প্রাণে-মনে জাতীয়তার উদ্বোধন কচ্ছেন —তাঁর পরণে বহুমূল্য বসন-ভূষণ, আর সেই অবস্থাতেই তিনি জাতীয় গর্বের চরম 'চরকা' দেবীর সেবা-রতা।

'মা' নামে যদি মাধুর্য্য থাকে, আর সেই সীমাহীন ভক্তি প্রবণ সুধার আধার 'মা' নাম সম্বোধনে যদি আমার প্রাণ-মন উচ্ছ্বসিত হয়ে কখনো ওঠে, তবে সপ্তকোটী কণ্ঠের স্বর এক আমারই কণ্ঠে তুলে ডাকি সেই নারীকে,—মা, মা, মা!

শ্রীঅমিয় মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক বাংলা ভাষার গতি

নূতনের সঙ্গে পুরাতনের দ্বন্দ্ব আজ নূতন নয়। আদিকাল থেকে এ বিরোধ চলে আসছে। আজকাল সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও দুটি দল আছে, একদল চায় সন্ধি-সমন্বিত সমাস-বিজড়িত ভাষা, আর একদল চায় বিপরীত। শেষের সম্প্রদায় নব্য দল। কোন জিনিষের পরিবর্তন হঠাৎ হয় না, হতেও পারে না। ভাষার আকস্মিক পরিবর্তন কিছুই আশা করা যায় না, কিন্তু ক্রম-পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তা না হলে কিম্ভূত-কিমাকার Anglo-saxonএর বর্তমান ইংরাজীতে রূপান্তর হতো না। এক সময়ে এর জটিলতা আমাদের দাঁড়া-ভাঙ্গা সংস্কৃত থেকে কোন অংশে তফাৎ ছিল না। বিভক্তি সমাসের ঘটার অন্ত ছিল না। সংস্কৃত ভাষারও যে মোটে রূপান্তর হয়নি, তা বলা চলে না। বৈদেশিক যুগের সংস্কৃত নিয়ে কালিদাসের সময়ের কোন সংস্কৃত কাব্যের পাশেরাখলে তা বেশ বোঝা যায়। তবে পরিবর্তনের গতিটা যে খুব দ্রুত হয়নি, সে গবেষণার এখানে প্রয়োজন নেই।

সব ভাষার মূলে একটা নিয়ম রয়েছে, সেটা হচ্ছে ক্রম-পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ছোট-বড় অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে দুটী আসল। একটা হচ্ছে, জাতির সঙ্গে জাতির সংমিশ্রণ। এই সংমিশ্রণের ফলে হয় দুটী ভাষার সংঘর্ষ। আর একটী কারণ বিভিন্ন উচ্চারণ। একই জাতির মধ্যে বিভিন্ন উচ্চারণের ফলেও ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয়। এক কথায় বলতে গেলে, ভাষার গঠনের মূলে রয়েছে, সংমিশ্রণ। এর প্রমাণের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার তাই এত পরিবর্তন হয়েছে। জার্ম্মান্ ভাষার গতি এদের চেয়ে মন্দ, তার কারণ এদের মধ্যে সংঘর্ষ প্রথমেই বেশী হয়েছিল, ইদানীং অল্পই হয়েছিল। লাটিন্ ও সংস্কৃতের কথা প্রায় একরকম। আমাদের বাংলা ভাষাতে এর ব্যতিক্রম হয়নি। আমাদের বাংলা দেশের স্থানভেদে অনেক রূপান্তর হয়েছে। এই সব নানা স্থানীয় পার্থক্য কলকাতায় এসে মিশে যায়, তার ফলে কলকাতার ভাষার ক্রমোন্নতি ঘটে। পূর্ববঙ্গের সমস্ত ভাষার চেয়ে চট্টগ্রামের ভাষায় বাংলায় চিহ্ন প্রায় নেই বললেই হয়। চট্টগ্রামের কোন কবির ছড়ার নমুনা—'উত্তরথুন (উত্তর থেকে) আইএর ময়না (আসছে) পাখ লাড়ি, লাড়ি, বড়ই গাছত বৈস্তে ময়না করে চতুরালী।' আমরা যেটাকে 'কলকাত্তার ভাষা', নাম দিয়েছি, সেটা খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, অথচ এটা বেশ মার্জ্জিত। মজা হচ্ছে এ ভাষা, বলতে গেলে, কারুর নিজস্ব নয়, সব দেশের ভাষার সংঘর্ষে এর জন্ম। এটা যেন একটা সরকারী জিনিষ হয়ে পড়েছে। ঢাকা বরিশাল ফরিদপুরের নিজস্ব বলে একটা ভাষা আছে, সেগুলোরও দিন দিন অল্পবিস্তর রূপান্তর ঘটছে। তাদের ভাষার মধ্যে সংস্কৃতর চিহ্ন এখনও বেশ দেখা যায়। আমরা 'শকড়ির' সৃষ্টি করেছি, কিন্তু, তারা একটা বেশী শব্দ পেয়েছে সেটা 'ওঠ'। রেলষ্টীমারের কৃপায়, কলকাতার হাওয়া একটু একটু সেখানে বইতে আরম্ভ হয়েছে।

এই যে ক্রম-পরিবর্তন হচ্ছে, এর স্রোত কোন্ দিকে? লাভের দিকে, না, লোকসানের দিকে? এইখানেই তর্কের আরম্ভ, এইখানেই বিরোধের সৃষ্টি। আমি আধুনিক বাংলার তরফ থেকে দু-একটা কথা বলতে চাই। ক্রম-পরিবর্তন যে ঘট্‌ছে ও চিরকাল ঘটবে, সেইটাই আমার বক্তব্য। তবে বিশেষ ওকালতী আমার ক্ষমতার মধ্যে নয়। সকলে দেখতে পাচ্ছেন, বাংলা ভাষা যতই চলেছে, ততই সে আড়ম্বর ত্যাগ কচ্ছে, সরলতা শিখছে; সমাস-সন্ধির পথ ছেড়ে অন্য পথ নিচ্ছে। এটা লাভ বলেই বোধ হয়, কেননা, সমাস-সন্ধির দাম যদি ভাষার স্বভাব-সৌন্দর্য্যের বা স্বচ্ছন্দ গতির চেয়ে বেশী হত, তা হলে ভাষার চেয়ে ব্যাকরণের উঁচু আসন নির্দ্দিষ্ট হতো। ব্যাকরণ আমাদের তত গৌরবের জিনিষ নয়, যত আদরের জিনিষ ভাষার সরল সৌন্দর্য্য। পাণিনি বা সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর চেয়ে কুমার-সম্ভব বা শকুন্তলা বোধ হয় সকলে বেশী ভালবাসেন। ভাষার সৃষ্টি আগে হয়েছিল, তার পর ব্যাকরণের। এতে পণ্ডিত মহাশয়দের ওপর কোন বিদ্বেষের কথা বলছি না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঋণ আমরা শোধ করতে পারবো না, তা আমরা জানি। বাংলা ভাষায় তাঁর দান অসীম। তিনি বাংলা ভাষার জন্মদাতা, তাঁর প্রতি বিদ্বেষের ভাব কারো থাকতে পারে না। তবে তাঁর যুগ যে চলে গেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখন আমরা অন্য ভাষায় কথা কইতে সুরু করেছি। বঙ্কিমবাবুর যুগও এখন নয়, তাই তাঁর অনুকরণে লিখতে চেষ্টা করলে, চিন্তার ধারায় ভাঁটা পড়বে, স্বচ্ছ গতি হারিয়ে কৃত্রিম ভাষা হয়ে উঠবে। কৃত্রিমতা আমাদের বাঞ্ছনীয় নয়। আধুনিক সাহিত্যের মৌলিকতা ওজন করা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু জোর করে বলা যায়, ভাষার পক্ষে এটা একটা ক্রমোন্নতির যুগ। ভাষা এখন অবাধ গতিতে বইতে শিখছে। তবে ভাষাকে শুধু আকারে কমাবার উদ্দেশ্য হলে চলবে না, এটাও লক্ষ্য করতে হবে, যে, ভাবের অনুযায়ী ভাষাও অনেক সময়ে আয়তনে বড় হতে পারে। অনেক দুরূহ কথা বড় হলেও মানে বোঝা সহজ, আবার কখনো কখনো ছোট কথার অর্থ-বোধের জন্য

অভিধান খুলতে হয়। সাহিত্যিকদের কিন্তু চলিত ভাষা ও সাহিত্যিক ভাষার মধ্যে একটু ব্যবধান রাখা উচিত।

জন্ম থেকেই বাংলা ভাষা বেশ গতিশীল। এখন সে গতি আরও দ্রুত হয়েছে, তার কারণ এখন সে অবাঙ্গালীর সঙ্গে মিশতে শিখেছে। এখানে আবার সেই দ্বন্দ্ব। পৃথিবী থেকে সব সমাসের লোপ সম্ভবপর হলেও 'দ্বন্দ্বের লোপ হবার আশঙ্কা নেই। কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে নন্-কো-অপারেশন্ ভাল নয়। তাবলে 'খিচুড়ীর সৃষ্টি'ও আমাদের লক্ষ্য নয়। কথাবার্ত্তায় 'খিচুড়ী' ভাল হতে পারে, কিন্তু কাগজে-কলমে একটু বুঝে সুঝে করা ভাল। যে শব্দগুলো বাংলা পোষাকে বেশ মানিয়ে গেছে, যেগুলোর অর্থ সাধারণে শিখে ফেলেছে, সেগুলো ব্যবহার করলে ভাষার শক্তি বাড়ে বই কমে না। যেখানে সেখানে বিদ্যা ফলাবার জন্য বিদেশী ভাষাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। যেখানে বিদেশী ভাষার সাহায্যে অর্থটা বেশী পরিস্ফুট হয়, সেখানে সেইটা ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। এই সব জায়গায় স্বদেশভক্তি দেখাতে গেলে অনেক উদ্ভট, শ্রুতিকটু শব্দের সৃষ্টি কত্তে হয়। 'মোটর' গাড়ীর বাংলা না বলাই ভাল। পোষ্ট অফিসকে 'ডাকঘর' বলা উচিত, কিন্তু ট্রাম গাড়ীর প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। জাতীয়তা শুধু ভাষার ওপর দিয়ে সেরে নেওয়া শুভ লক্ষণ নয়। বাংলা ভাষায় এর মধ্যে যত বিদেশী শব্দের প্রবেশ লাভ ঘটেছে, সেগুলো ছেঁটে ফেলে আমাদের মুখ বন্ধ করতে হবে। ইংরাজী কথার ত সংখ্যা নেই, হিন্দী আরবী ও পার্শী শব্দের ফর্দ্দ দিলুম—

হিন্দী।—কোরা (নূতন), খালি, খোলা, গরজ, জামিন্, দাম, পছন্দ, পাল্কী, ফসল, বাচ্চা, বেহুঁস্, রঙ, সন্ (অব্দ), বেহারা, গাল (গণ্ড), আন্দাজ, নাওয়া, ফুস, রোজ (প্রত্যহ) ইত্যাদি।

আরবী।—আম্লা (কর্ম্মচারী), আহাম্মক, ওয়ারিশ, ওক্তে, কলম, খবর, খাতির, দুনিয়া, মজবুৎ, মঞ্জুর, শরম্, সাবেক (পুরাতন) ইত্যাদি।

পার্শী।—ইজ্জৎ, ইয়ার (বন্ধু), কাগজ, কারিগর, খরচা, খরিদ, খুসি, চেহারা, জোর, তাকিয়া, তল্লাস, তলব, দম্ (শ্বাস), দরকার, দরাজ (প্রশস্ত) দস্তুর, দাগ, নালিশ, পেশা (জীবিকা), বদ্ (মন্দ), বরফ, মেহনৎ, রাজি, রেহাই, হুঁসিয়ার, ইত্যাদি।

ভাষার শিষ্টতা বা, সৌন্দর্য্যের জন্য আমাদের সব করা চাই, দেশভক্তির চূড়ান্ত সেখানে চলবে না। বিশেষ, সত্যের রূপ ফুটিয়ে তোলবার জন্য বা সৌন্দর্য্যের খাতিরে আমাদের একটু উদারচিত্ত হতে হবে।

বিজ্ঞান বিষয়ে প্রায় সব শব্দই অধিকাংশ ইংরাজী। বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ, আর পাশ্চাত্য জগৎই তার লীলাভূমি। বৈজ্ঞানিক অম্লজন ও উদজনের কথা আছে, কিন্তু 'রেডিয়ামে'র (Radium) প্রতিশব্দ কই? বাংলাভাষার পক্ষে এই একটা মস্ত অসুবিধা। আবার ইংরাজী নামগুলোও উৎকট। এর একমাত্র উপায়, সহজ বাংলা ভাবে উচ্চারণ। আর এক উপায় আছে, যদি বাংলা দেশে বিজ্ঞানটা ঘরোয়া জিনিষ হয়ে পড়ে, অর্থাৎ যদি ঘরে ঘরে বৈজ্ঞানিকের জন্ম হয়। কিন্তু তার এখন ঢের দেরী আছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বাংলা ভাষায় উদ্ভিদ্বিজ্ঞানের কথা লিখে দেশের কাজ করেছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রও এ বিষয়ে একজন অগ্রণী। আর 'পাখীর কথা' লিখে শ্রীযুক্ত লাহা মহাশয়ও বাংলা ভাষার সম্মান বাড়িয়েছেন।

এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, 'কোন্ ভাষা আদর্শ হতে পারে?' এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া চলে না। কার ভাষা আদর্শ বলে মনে নেওয়া যায়, সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। বিদ্যাসাগরের ভক্তের সংখ্যা নেই বল্লেও চলে, কিন্তু বঙ্কিমের চেলারও অভাব নেই। তাঁরা যে অপদার্থ ছিলেন তা' নয়, তাঁরা এক একজন দিকপাল ছিলেন। বাঙ্গালী বা বাংলার লেখকদের শুধু মনে রাখা দরকার, সামঞ্জস্য চাই। শরৎচন্দ্রকেই আদর্শ মানুন, বা রবীন্দ্রনাথকে মানুন, আগাগোড়া যেন সমান ধরণের হয়, নয়ত হাস্যাস্পদ হবেন। 'প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে বিদগ্ধ হইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া গেলাস গেলাস জল খাইলেন' এ-রকম লেখা বাতুলতা মাত্র। এতটা না হোক্, কিছু কিছু অসামঞ্জস্য নব্য লেখকদের লেখায় দেখা যায়। সেটা খুবই স্বাভাবিক। (Provincialism) প্রাদেশিকতা যেন না হয়, এদিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এক মণের মধ্যে এক তোলা Provincialism বিশেষ দোষের নয়। 'গেলুম-গেল ম' 'করলেম-করলুম' বা 'কচ্ছি-করছি, নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধানো ভাল দেখায় না। কিন্তু যদি যশোহর জেলার কোন লেখক লিখে থাকেন, 'রাত্রি চোয়াস্ (প্রভাত) দিয়াছে, শীঘ্র চল! নতুবা, ছর্কোই গোলযোগ লাগিবে' তা'হলে সমূহ বিপদ।

অতীতের মোহ বলে জিনিষটা ভাষার গঠনের পক্ষে অনিষ্টের কারণ। যেখানে দুঃখের প্রকৃত কারণ নেই, সেখানে দুঃখের সার্থকতা কোথায়? ভাষা পিছনে পড়ে থাকবে, এটা কোনো লেখকের বা সাহিত্যিকের ইচ্ছা যেন না হয়। মানুষ দিনের পর দিন সাম্নের পথে ছুটে চলেছে, তার ভাষাও কেন তার সঙ্গে ছুটবে না? বাংলা ভাষা এখন মঙ্গলের পথে ছুটছে, তার পথ আজ সরল, স্বচ্ছ; অবাধ তার গতি। হুতোম পেঁচার নক্সার লেখকের মনস্কাম আজ পূর্ণ হয়েছে। সাহিত্যিক মাত্রেরই আজ লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন ভাষায় আবিলতা ও পঙ্কিলতা স্থান না পায়, উদ্ভাবনী শক্তি ক্রমেই যেন বৃদ্ধি পায়, ভাষা যেন ভাবের গতি রোধ না করে।

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ।

বাল্যবিবাহ ও মেয়েদের শিক্ষা

"স্ত্রীশিক্ষা,স্ত্রীস্বাধীনতা"ইত্যাদির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আগেই করা হইয়াছে। বাল্যবিবাহটী এতই প্রাথমিক বিষয় যে আজকালকার দিনে আলোচনা-ক্ষেত্রে ওটীকে আর টানিয়া আনিতে বড় ইচ্ছা হয় না। বিশেষতঃ ও সম্বন্ধে প্রতিবাদ অনেকেই করিয়াছেন। আর শ্রীযুক্ত 'পদ্মনাভের" পর তাহার কোনও আবশ্যকতা বোধ হয় নাই। কিন্তু তথাপি উহার জের মিটিতেছে না দেখিয়া দু-চারিটী কথা বলিতে চাই। বিশেষতঃ তিনি যাহা রহস্যাবৃত রাখিয়াছেন তাহার আরও কিছু খোলাখুলি আলোচনা দরকার বোধ হইল। মেয়েদের শিক্ষা পিতৃ-গৃহে না হইয়া শ্বশুরগৃহে হওয়া উচিত কি না ইহাই তাহার মধ্যে প্রধান। এটী যে-অভিনব" তাহা লেখিকাও স্বীকার করিয়াছেন। কারণ পূর্ব্বে বাল্যবিবাহের স্থলেও বিবাহের পর বালিকাদের প্রথম কিছুকাল পিতৃ-গৃহে বাসেরই রীতি ছিল। কিন্তু আধুনিক অবস্থার বিশেষরকম উপযোগী বলিয়াই তাঁহার এই নূতন সৃষ্টির অবতারণা জানা যায়। লেখিকার শাস্ত্রবিশ্বাসের গভীরতা সর্ব্বত্রই প্রকট ; তাই তাঁহাকে "কন্যাপ্যেবম্ পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ" এই সর্ব্বত্র কথিত শাস্ত্রবাক্যটী প্রথমে স্মরণ করাইয়া ইহা সত্যই আধুনিক অবস্থার বিশেষ-রকম উপযোগী কি না তাহাই দেখা যাক।

প্রথমতঃ বলিতে হয় শ্বশুর-শাশুড়ীর "পুত্রবধূটীকে নিজমনের মত গঠনের সাধ" হইতে পারিলে পিতা-মাতারও কন্যাটীকে "নিজ-মনের মত গঠনের সাধ" হইতে পারে কি না ? কাহারও কি তাহা হইলে আপনার কন্যাকে "নিজ-মনের মত" শিক্ষা দেওয়ায় অধিকার নাই ? তাহার পর মেয়েদের শিক্ষা যদি শ্বশুর-বাড়ীতেই দিতে হয়, তাহা হইলে ১১।১২ বছরে বিবাহ দিলেও কুলাইবে না দেখা যাইবে। কারণ ১১।১২ বৎসরে হাতে খড়ি দিতে হইলেই বা বধূর শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হইবে ? যাঁহারা সত্যই তাঁহার শিক্ষা চান, তাঁহারা ইহাতে "নিজ-মনের মত" শিক্ষা কখনই দিয়া উঠিতে পারিবেন না। আরও আগে হইতেই তাহা আরম্ভ করা আবশ্যক হইবে। পিতা-মাতারও তাহা হইলে পুত্র, পুত্রবধূর শিক্ষা ও লালন-পালনের ভারই গ্রহণ করিতে হইবে। কন্যা-সন্তান বৃথা সন্তান, তাহার কেবল জন্ম দিয়াই তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন,—আর কোন আপদ পোহাইতে হইবে না। তবে তাহা হইলেও তাহার সহিত আর কিছু সারতর পদার্থও দিয়া চলিতে হইবে না ত ? কিন্তু উহা সত্ত্বেও "এক্ষণে" কয়জন শ্বশুর-শাশুড়ী এতদূর আদর্শবাদী হইতে প্রস্তুত আছেন ? আর যদি ১১।১২ বৎসরে বিবাহই থাকে, তাহা হইলে ঐ বয়স পর্য্যন্ত কন্যার পিতামাতা করিবেন কি ? কারণ ঐ সময়ের মধ্যে যেটুকু লেখাপড়া, গান-বাজনা ইত্যাদি শেখানো যায়, তাহাতেও যে-পরিবারে "মেয়েমানুষে লেখাপড়া করে কি আফিসে যাবে না কি ? বাইজী না কি যে গান শিখেছে" বলা হয়, সেখানে মেয়েকে ঐ সব কথা শুনিতেই হইবে। কাজেই সে বাড়ীর ফরমাস-মত মেয়ে তৈরী করিতে হইলে ঐ বয়স পর্য্যন্ত মেয়েকে গোমূর্খ করিয়া গোশালাতেই রাখা উচিত তবে তাহা হইলেও উক্ত শাশুড়ীর "ফুটী গাছটী নাড়া" হইয়া উঠিবে কি না সন্দেহ। ইহা অপেক্ষা আদর্শভিন্ন পরিবারও আছেন। তাঁহাদের সকলের ফরমাসমত মেয়ে গড়িতে হইলে বিশ্বকর্ম্মার দরকার হইবে। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে প্রধানতঃ কি গড়িতে হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিলেই হয়। তবে মেয়ে গড়ার হাঙ্গামা হইতে তিনি পিতামাতাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন বটে ! ঐ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহারা মেয়েদের কেবল জিয়াইয়া রাখিবেন। (কিন্তু জমি অকর্ষিত রাখিলেও তাহাতে গাছা, আগাছা জন্মিয়া থাকে, সুতরাং তবুও যে তাহা সম্পূর্ণ খালি থাকিবে এমন বোধ হয় না।)—তাহার পর শ্বশুর-বাড়ী গেলে তাহার উপর হাতুড়ি বাটালি চালানো হইবে। কিন্তু তাহাতে যে-শাশুড়ীটীর উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহার যদিই বা কিছু সুবিধা হয়, যিনি "বউমার পেটে ছেলে এলো, নইলে একটু গানবাজনা শেখাই, ইচ্ছা ছিল" বলিয়া খেদ করিয়াছেন, তাঁহার সে সাধ মিটিবার কোন আশা নাই। কারণ "বউমার" ছেলে আসিয়াই থাকে,—ইহা স্বভাবেরই নিয়ম। ছেলেমেয়েদের "ব্রহ্মচর্য্য" করাইতে হইলে তাহার অনুকূল অবস্থাই দিতে হয়। তাহার অস্বাভাবিক পরীক্ষায় কোনই লাভ নাই।

তাহার পর এ-রকম বিবাহে "সদ্যসমাগত কৈশোর জীবনের নূতনত্বের নেশা, স্কুল কামাই এবং পড়া-ফাঁকির আমোদের" সহিতও ত এ মতবাদটী খাপ খায় না। কারণ স্কুল-কামাই ও "পড়া-ফাঁকি" দূরে থাক, মেয়েদের ঐ সময় হইতে "স্কুল" ও "পড়া" আরম্ভের ব্যবস্থাই হইতেছে। কিন্তু এই বয়সের বালিকা-বধূদের কিছুমাত্র খোঁজ যাঁহারা রাখেন, তাঁহারাই ও কথাগুলির সত্যতা স্বীকার করিবেন। "নূতনত্বের নেশা" ও অকাল-জাগ্রত প্রবৃত্তির উত্তেজনায় তাহারা কি রকম ইঁচড়ে পাকিয়া উঠে ও তখন তাহাদের শুষ্ক পুঁথি-পত্রের মধ্যে বসাইবার চেষ্টা যে কি বিড়ম্বনা তাহাও তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন। "আদর্শ" ভাবে রাখিলেও ঐ মেয়েগুলিকে দেখিয়া কৌতুকমাত্র বোধ হইতে পারে। কিন্তু কিছুতেই স্বাভাবিক বালিকা বলিয়া মনে হইবে না। এবং একটু ভাল করিয়া দেখিলে দুঃখই হইবে। আর এই যে কেবল পুত্রবধূকে "নিজ-মনের মত" শিক্ষা দেওয়ার কথা হইতেছে, আপন পুত্রকন্যাকেই বা কে কত "নিজ-মনের মত" শিক্ষা দিয়া উঠিতে পারেন ? অন্য পরিবারের অন্যরকম শারীরিক-মানসিক-প্রকৃতি-বিশিষ্ট যতই "সাত-সকালে" হউক, অল্পাধিক-গঠিত-চরিত্র বধূর ত কথাই নাই। আমার "নিজ-মনের মত" শিক্ষাই যে তাহার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা হইবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ? প্রত্যেকে আপনাপন শারীরিক মানসিক প্রকৃতির

তাহার যথাসম্ভব সুবিধা করিয়া দেওয়াই বালক-বালিকার অভিভাবকদের কাজ। বধূটিকে আমার পুত্রবধূ করিয়াই পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন নাই, ইহাও মনে রাখা উচিত। সব বিষয়েই মানুষকে এইরূপে কেবল ঘর-কন্নার মাপে দেখিতে ও গড়িতে গড়িতেই আমাদের সমস্ত জাতিটাই ঘরোয়ামাত্র হইয়া পড়িয়া বিশ্বমানব-সঙ্ঘে যোগ দিবার যোগ্যতা হারাইয়া বসিয়াছে।—তাহার পর আমার "নিজ-মনের মত" হইলেও পুত্রটীর "নিজ-মনের মত" নাও হইতে পারে। আর মেয়েরা "যথার্থ শিক্ষিতা" নয়,—শাশুড়ীরা বটেন ত?—যে তাঁহারা বধূকে ছাঁটিয়া কাটিয়া গড়িবার সাহস করিতে আসেন? পিতামাতা অপেক্ষাও তাঁহার বধূর যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং তাহার প্রতি স্নেহ-মমতাও তাঁহার বেশী আছে ত?

১৫।১৬ বৎসরের বালিকাটিকে নিরুপায় পাইয়া যিনি এবং যাঁহার পুত্ররত্ন "ধেড়ে বয়সের ও অমনোনীত শিক্ষার ত্রুটি ধরিয়া তাহাকে উঠিতে বসিতে সদাসর্ব্বদা খোঁটা দিয়া দিয়া পাগল" "করেন," ভগবান তাঁহাদের হাত হইতে আমাদের মেয়েদের উদ্ধার করিবেন কবে? ইহার একমাত্র উপায় তাহাদের এমন নিরুপায়, বালিকা ও অশিক্ষিত না রাখা।—আরও বালিকাবস্থায় তাঁহাদের হাতে সমর্পণ করিয়া দেওয়া নয়। এমনিই মেয়েরা আর ততটা অশিক্ষিত ও শিশু থাকিতেছে না বলিয়া ইঁহাদের কিছু মুস্কিল হওয়ায় "ধেড়ে মেয়ে"ও "শিক্ষিতার" কথা শোনা যাইতেছে। তবে পিতামাতার বিবেচনার অভাব ও ভীরুতা, মেয়েদের নিরুপায়ত্ব এবং শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও সুযোগের অভাবে "খোঁটা" তাঁহাদের এখনও খাইতে হইতেছে বটে। আর মেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয় বলিয়াও যখন তাঁহার এ নব বিধানের পরিকল্পনা তখন তাহা বাধ্যতামূলক করিলেই ত গোল মিটিয়া যায়। যাঁহারা সত্যই বধূর শিক্ষা চান, তাঁহাদের ইহাতে ভয়ের কিছুই নাই। আর যাঁহাদের ভয় আছে, তাঁহাদের তাহা হওয়াই দরকার। বধূর শিক্ষা যদি সকলে সত্যই চান, তাহা হইলে রাজবিধি হইবার আগেও মেয়েদের শিক্ষা প্রচলিত হইতে একটুও দেরী হইবে না। কিন্তু তাহা না হইয়া "ধেড়েবয়সের" দলের একাধিপত্যের জন্যই যে ১।৪ জন চান, তাঁহারা তাহা পান না। কিন্তু চিরকাল তাঁহাদের রাজত্বই কিছু চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না।

"মধ্যবিত্ত ও ধনীর ঘরের" জন্যও বিশেষ করিয়া এই বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের শিক্ষা প্রধানতঃ অগ্রসর হইতেছে না কেন? ধনীর ঘরে বাল্যবিবাহের অভাব-বোধ তাহার কারণের মধ্যে নয়। ধনীরা বিপুল অর্থব্যয়ে "সাত-সকালে" কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইতে এখনও কালবিলম্ব করিতেছেন না। কিন্তু সেইজন্যই লেখাপড়া শিখাইবার অধিকতর সুবিধা ও সামর্থ্য সত্বেও তাঁহাদের মেয়েরাও শিক্ষালাভে বঞ্চিত থাকিতেছে। এদিকে দরিদ্রেরা তাহার কোন সুবিধা ও উপায়ই করিয়া উঠিতে পারেন না। কারণ বিশেষ অর্থব্যয় না করিতে পারিলে মেয়েদের ঠিকমত লেখাপড়ার সুবিধা এখন সামান্যই আছে। বিশেষতঃ মফঃস্বলে তাহা ত একরকম অসম্ভব বলিলেই হয়। তারপর তাঁহার পূর্ব্বনিবন্ধে আছে," মেয়েদের বাল্যকালে বিবাহের পরই"এক্ষণে শ্বশুর-গৃহবাসের প্রয়োজনীয়তা বর্দ্ধিতই হইয়াছে।" পরবর্ত্তী "জেরে" কিন্তু বাল্যবিবাহের কথায় দেখা যায় "ইহার প্রয়োজনীয়তারও দিনে দিনে হ্রাস হইয়া আসিতেছে।" এ দু'য়ের সামঞ্জস্য কি করিয়া হইবে, বোঝা গেল না। তবে সঙ্গতির অপবাদ তাঁহাকে কোথাও দেওয়া যায় না বটে!

তাহার পর এই বাল্যবিবাহে বাল্যত্বের আবশ্যকতা কেবল কন্যাপক্ষেই বলিয়া বোধ হয়। কারণ "পুরুষের বয়স অধিক এবং স্ত্রীর বয়স কম রাখিয়া বিবাহ দেওয়াই বিধেয়" একস্থলে উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়। তাহা হইলে "ছেলেবেলা হইতে" "তাহারা একত্র থাকিতে থাকিতে ক্রমে ক্রমে দুইটী নবীন লতিকার ন্যায় পরস্পর গায়ে গায়ে জড়াইয়া এক হইয়া উঠিবে" কি করিয়া? সৎপ্রকৃতির হইলে বিজ্ঞ স্বামীর তাহাকে দেখিয়া বাৎসল্যের ভাবই আসিবে। আর তাহা না হইলে যে ভাব ও ব্যবহার আসিবে ও আসিয়া থাকে, তাহার কথা উল্লেখ না করাই ভাল। আর যাহাই হউক, "নবীন লতিকার ন্যায়" "জড়াইয়া এক হইয়া উঠা" তাহাদের পক্ষে কিছুতেই অবশ্য সম্ভব হইতে পারে না। তাহার পর স্বল্পায়ুত্বের জন্যও যখন তাঁহার এ উপদেশ, তখন ত ইহাতে মেয়েটীর জননী হইবার বয়স হইতে হইতেই বৈধব্য ঘটিবার সম্ভাবনা! আর উভয়েরই অল্পবয়স থাকিলে ঐরূপে "ছেলেবেলা হইতে" জড়াইতে গেলে ছেলেটীর স্ত্রীর উপর ভগিনী-ভাব আসিয়া পড়িবে না ত? বিশেষতঃ যখন তাহার "কল্পনাশক্তি তেজস্বিনী" হইয়া উঠিবে, তখন তাহাকে পুরাতন ও বৈচিত্র্যশূন্য বলিয়া বোধ হইবার আশঙ্কাও কিছু নাই কি? এগুলি ত কেবল ছেলের দিক,—ইহা ছাড়া মেয়ের দিকও একটা আছে বোধ হয়।

আর "পরিণত বয়সে উভয়তঃ সর্ব্ববিষয়ে মনের মিলন, মতের মিলন হইয়া যে বিবাহ" সে বড় উচ্চাঙ্গের বিবাহ উদ্ধৃত হইতে দেখিয়া তিনিও উহা স্বীকার করেন বলিয়াই বোধ হয়। তাহা হইলে তাহার সম্ভাবনার মূলেই কুঠারাঘাত করিতে চাহেন কিরূপে? "আদর্শটাকে উচ্চ" রাখার দিকে অনুরাগের পরিচয়ও তাঁহারও অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

তিনি যে "আশাহীন দুর্দ্দিনের" কথা বলিয়াছেন, বাল্যবিবাহই কি তাহা হইতে উদ্ধারের উপায়? না, "যৌবন বিবাহ" হইয়া তাহার আগে স্ত্রীরও কিছু উপার্জ্জন-ক্ষমতা-অর্জ্জনেই তাহার কতক প্রতিকার আছে? "পাঁচ বছরের মেয়ে"থাকিলেও "বছর কতক পরে" "নিজের" সমস্ত "অলঙ্কারগুলি" দিয়া বিবাহ দেওয়ার বাধ্যতা দূর হইয়া ("বাধ্যতা-মূলক নিয়মটা" "নিজেদের ইচ্ছামত" কি না তাহাও তাঁহাকে তর্ক

কুরিয়া জানাইতে হইলে অবশ্য কিছুই বলা চলে না।) তাহারও অর্জ্জন-ক্ষমতার উপায় হইলে আরও কিছু সুবিধা হইতে পারে। আর একটী উপায় রাষ্ট্র সাহায্যের ব্যবস্থা পরাধীন দেশে যদি কখনই হয় উত্তরাধিকারে ন্যায়বিচার স্থান পাইলেও "দুর্দ্দৈব" এতটা "আশাহীন" থাকে না। আর ঐ অবস্থায় "২৪ বৎসরের মায়ের কোলে একটী চার বৎসরের শিশু" থাকিলে তাহাকে মানুষ করা বরং সম্ভব, কিন্তু বাল্যবিবাহের ফলে তখন দুইগণ্ডা অপোগণ্ড থাকিলে "দুর্দ্দৈব" আরও ঘনীভূতই হইবে না কি? "মেয়েটী পাঁচ বৎসরের" হইলেও কোলে যে আর একটী "একবৎসরের" থাকিত না, তাহারও কি কোন নিশ্চয়তা আছে? বরং একাধিক থাকাই ত বেশী সম্ভব বোধ হয়। "দিন কাটানোর" জন্য "অলঙ্কার গুহীন" ও ভবিষ্যৎ জামাইয়ের চিন্তা ছাড়া আরও কিছু উন্নততর ও প্রয়োজনীয় অবলম্বনও তাহাকে দিতে হয়।

তাহার পর "দেশের প্রজাবৃদ্ধিই" কি সমস্যা হইয়াছে? "প্রজা" যাহা জন্মিতেছে, তাহ ও থাকিতেছে কি? সুতরাং "বৃদ্ধি" না হইয়া "রক্ষাটাই ত সমস্যা দেখা যাইতেছে। আর "দীর্ঘজীবী" হইলে "বাল্যবিবাহ অতল জলে তলাইয়া" যাওয়াতে যখন তাঁহার আপত্তি নাই, তখন দীর্ঘজীবী হইবার জন্যও যদি লোকে তাহা বর্জ্জন করিতে চায়, তাহাতে তিনি কি বলিবেন? কেবল বাল্যবিবাহই অকাল-মৃত্যুর কারণ যদি নাই হয়, তাহার একটী বলিয়া সন্দেহ করিবার থাকিলেই বা লোকে তাহা করিবে কেন? বিশেষতঃ তাহা যদি অন্য সকল উন্নতি এবং কালেরও বিশেষ রকম উপযোগী না হইয়া প্রতিকূলই হয়?

বাস্তবিক এখন কিছুই যে আর গোঁজামিল দিয়া সকল আরাম, সুবিধা ও অভ্যাস-গুলির কোন কিছুতে আঁচড়টী মাত্র না লাগাইয়া চোখ বুজিয়া চলিয়া যাইবার দিন নাই, এ সকলে কেবল তাহাই প্রকাশ করে মাত্র। "গোলক-ধাঁধার" মধ্যেই ঘুরপাক খাইবার সময়ও আর নাই। "অন্ধ অনুকরণ" যেমন, "অন্ধ অনুসরণও তেমনি ছাড়িতে হইবে। "মস্তিষ্কহীন" হইয়া কিছুই আর করা চলিবে না। অন্যায় ও দূষিত বিধি-ব্যবস্থার ফলে যে সব পাপতাপের সৃষ্টি হয়, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যাহাতে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ভাবে আপাত স্বার্থ, সুবিধা ও সান্ত্বনা মিলে তাহাতেও তাহার প্রতিকার নাই। স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় দূর করাই সকল সংস্কারের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাহার পর মানুষের স্বভাবের অসম্পূর্ণতা, দুর্ব্বলতার জন্য যে সকল সমস্যা আসিয়া থাকে, তাহার নিবারণ অন্যভাবে করিতে হয়। দাসকে শিক্ষা দেওয়াতে মুস্কিল আছে। কারণ তাহা হইলে সে দাস থাকিতে চায় না। কিন্তু স্বাধীন নাগরিককে তাহা না দেওয়াই বিপজ্জনক। কারণ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার ও মর্য্যাদারক্ষা শিক্ষাসাধ্য। মেয়েদেরও এই অবস্থা চালাইতে গেলে শিক্ষার অবস্থাও ইহাই থাকিবে, এবং যে ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে সেখানে "খোঁটা" খাইতেই হইবে। কাজেই শিক্ষা চাহিলেও স্বাধীনতা ভিন্ন উপায় নাই। বাল্যবিবাহ এ দুয়েরই প্রধান কণ্টক। "শিক্ষা, সঙ্গ, আদর্শের" "সঙ্কীর্ণতাতে"ও গৌরব করিবার কিছু নাই। তাহার পর তাঁহার এত কষ্টের সেকেলে হিঁদুয়ানীও যে একেলে ও অশুচি বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে, তাহার পরিচয়ও মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে" তাঁহার সমর্থনের মধ্যেই পাইবেন। শেষে বলিতে হয়, নারীপ্রচেষ্টার সূচনামাত্রে মেয়েদেরও আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ যেমন লজ্জাকর তেমনি দুঃখের বিষয়। তবে ইহাতেই অবশ্য তাঁহাদের দুর্দ্দশার পরিমাণও টের পাওয়া যায়।

বঙ্গনারী।

জন্ গল্স্‌ওয়ার্দি

আজকালকার ইংরেজী-লেখকদের মধ্যে গল্স্‌ওয়ার্দি একজন ওস্তাদ লিখিয়ে।

সাহিত্যে দু-রকম আর্টিষ্ট্ আছেন; একদল, যাঁরা সোজাসুজি স্পষ্টাস্পষ্টি বলে যান, আর একদল আছেন যাঁরা শুধু ইঙ্গিত করেন, খোলাখুলি কিছু বলেন না। বার্ণার্ডশ এবং এইচ্ জি ওয়েল্‌স্ প্রথম শ্রেণীর,—এঁরা কিছু ভাণ বা গোপন করেন না; আর গল্স্‌ওয়ার্দি দ্বিতীয় শ্রেণীর—ইনি শুধু একটু ইসারা করে যান।

গল্স্‌ওয়ার্দির রচনায় একটা বৈরাগ্য, বীতস্পৃহা ও ব্যথা আছে; কিন্তু তার মধ্যে জ্বালা বা বিদ্রোহের সুর নেই। সব জায়গাতেই তিনি অন্যায় দেখ্‌চেন, দুর্ব্বল ও গরীবের কান্না, অত্যাচার, ভণ্ডামি, লোভ, সভ্যতার মিথ্যা আড়ম্বর! কিন্তু তিনি সে-সব অন্যায়ের প্রতিকারের উপায় বলে দেন-না; তিনি শুধু সমাজের ক্ষতটুকু উস্কে দেখান এবং বুকের দরদ দিয়ে তাতে রং ফলান। তাঁর এই সৌম্য শান্ত নীরবতাতেই তাঁর আর্টের বিশেষত্ব ফুটে উঠ্‌চে।

যারা সমাজের তলায় বসে কাৎরাচ্ছে, তাদের প্রতি গল্‌স্‌ওয়ার্দির অপরিসীম সহানুভূতি আর শ্রদ্ধা। এইখানে তিনি রুশিয়ার ভাবে অনুপ্রাণিত। কিন্তু ডষ্টয়ভ্‌স্কির মতো সোজা সুরে তিনি কিছু বলেন না; তাঁর বলার মধ্যে বিশেষ একটি সূক্ষ্মতা আছে। টুর্গেনিভের সঙ্গে তাঁর লেখার মিল্ আছে ঢের। তিনি টুর্গেনিভ্ ও জর্জ্জ ইলিয়ট্-এর লেখার খুব প্রশংসা করেন এবং মেরিডিথ্ ও ব্রাউনিংকে একদম পছন্দ করেন-না।

স্যুরে প্রদেশের Coombeতে ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে তিনি ওকালতী করতে আদালতে ঢোকেন; কিন্তু আদালত তাঁর ভাল লাগে নি। তিনি দেশ-ভ্রমণ করেছেন অনেক—আমেরিকা, ঈজিপ্ট, অষ্ট্রেলিয়া, রশিয়া, ফিজি দ্বীপ--কিছুই বাকী রাখেন নি; কিন্তু ভারী আশ্চর্য্য, তাঁর লেখার মধ্যে এ সমস্ত ভ্রমণের একটু ছায়া পড়েনি। এম্‌নি দেশ বেড়াতেই একবার জাহাজে Joseph Conradএর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। এই Conrad এখন গল্‌সওয়ার্দির সঙ্গেই সাহিত্যের রাজ্যে সমান আসনের দাবী করে' থাকেন।

গল্‌স্‌ওয়ার্দি তাঁর নাটকে ও নভেলে problem নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসেন—সবই নৈতিক বা সামাজিক সমস্যা। তাঁর Strife-এ উপবাসী মজুরদের প্রতি মর্ম্মস্পর্শী সমবেদনা উথলে উঠেচে! সেখানে Roberts তাদের দলপতি,পরিচালকদের কর্ত্তা Anthonyর বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ। নাটকের শেষটা ভারী করুণ। দু' দল মিলিত হয়ে গেল, তাদের দলপতিদের ঝগড়া-কোলাহল আমোলে না এনে। তাঁর Justice-এও আজকালকার শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইঙ্গিত আছে। কারা-জীবন Falderকে কী-রকম দুঃস্থ মরণোন্মুখ করে' ছিল, তাতে তা বেশ ফুটেচে। তিনি বিচারক বা কারা-রক্ষীদের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি, আজকালকার শাসন-পদ্ধতিকেই দুষেচেন। এর বদলে কি হওয়া উচিত,সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেন নি; তিনি তা বলেনও না, শুধু ফল দেখিয়ে যান, ভালো বা মন্দ, উচিত বা অনুচিত, সে বিষয়ে চড়া গলায় কোনো মত জাহির করেন না।

Silver-box এ তিনি দেখিয়েছেন, এক দিন-মজুরনীর স্বামী চুরি করে' জেলে গেল, আর এক পার্লামেণ্টের মেম্বরের ছেলে চুরি করে রেহাই পেলে,—শুধু তার অর্থ ও পদমর্য্যাদার বলে। তাঁর Fugitive ইবসেনের Doll's House ও Synge-এর The Shadow of the Glen-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে Clare Dedmond তার ধনী স্বামীকে ছেড়ে Malise-এর কাছে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে। কিন্তু এই বইখানি Doll's House-এর মত আর্টিষ্টিক নয়। ইবসেন্ Noraকে স্বামীর ঘর থেকে বাহিরে এনে ছেড়ে দিলেন, গল্‌স্‌ওয়ার্দি তাতে তৃপ্ত হলেন না; তা তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেখানো—ছেড়ে আসবার পর কি হলো। Clareএর জীবন Noraর চাইতে বড় করে আঁক্‌লেও তার মাঝে পরিপূর্ণতা ও প্রসারতা নেই। Clareএর মৃত্যুটা একদম অস্বাভাবিক হয়েচে। তাকে তিনি যে রকম চরিত্র ও প্রকৃতি দিয়েচেন, তাতে সেই গণিকাদের আশ্রম তার পক্ষে মরা নিতান্তই অসম্ভব। সে Maliseকে ভালবাসে, অথচ তার জীবনটা সে নষ্ট করে' দিচ্ছে বলে' সে Malise-কেও ছেড়ে গেল,—এইখানেই গল্‌স্‌ওয়ার্দির আর্ট চরম পূর্ণতা লাভ করেচে। মোট কথা, তিনি ভাবতে চেয়েছেন অনেক, কিন্তু প্রকাশ করেছেন খানিকটা মাত্র।

বার্ণার্ড শর সঙ্গে তুলনা করলে গল্‌সওয়ার্দির ভাবটা অনেকখানি বোঝা যাবে। গল্‌সওয়ার্দি Justice-এ Falderকে জেলে পাঠিয়ে তাকে একদম্ ব্যর্থ নিরবলম্ব করে' দিলেন, আর শ তাঁর Fanny's First Playতে Margaret Knox ও Bobby Gilbortকে জেলে পাঠিয়ে তাদের জীবন মহান্ ও উদার করে' তুললেন। যে সব ঘটনা গল্‌সওয়ার্দিকে ভগ্নোৎসাহ করে, তাই শকে সঞ্জীবিত করে' তোলে। জেলকে গল্‌স্‌ওয়ার্দি মনে করেন, একটা বীভৎস নরক, আর শ মনে করেন, আশ্রম; ওখানেই তাঁর মতে চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়, মনের কলুষ দূর হয়ে যায়। গল্‌স্‌ওয়ার্দি বলেন, দুঃখ মানুষকে ভেঙ্গে দেয়। শ বলেন, দুঃখ মানুষকে বড় করে' তোলে।

Joy, Mob ও A bit o' Love-এ কোন problem নেই; এ নাটকগুলি একদম্ ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে। Joyকে

একদিকে যেমন মনে হয়, একটা অশরীরী মূর্ত্তি, আবার মনে হয় সে যেন একটা সুর! এই দুইয়ের মিলনে বইটী অপরূপ হয়েচে। তাকে যে ভালবাসে Dick—তার মধ্যেও ঐ একটা হাওয়া আছে। অনেক গুমোট থাক্‌লেও বইটার গতি খুব স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর। Joy আর Dickএর ভালোবাসা, Mrs Guyn ও Leverএর ব্যথাময় অথচ উত্তেজনাপূর্ণ প্রণয় খুব ভালো আঁকা হয়েছে। যে দৃশ্যে Joy তার মা Mrs Guyn-এর লুকানো ব্যাপারটা জেনে ফেললে সেই দৃশ্যে গল্সওয়ার্দি আর্টের চূড়ান্ত দেখিয়েছেন।—A Bit o' Loveএ গল্স্ওয়ার্দি এক নূতন ভাব এনেচেন। তিনি তাতে বিশেষ একটী জায়গাকে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় করেচেন। এক ছোট গাঁ, তারই কথা। তিনি দেখিয়েচেন, মানুষের বিভিন্ন চরিত্রের উপর এ গাঁ-টির কি অদ্ভুত ক্ষমতা—এই দিকে তাঁর চলার ঢের পথ আছে। তাঁর Pigeon-এ তিনি ব্যঙ্গের হিল্লোলে এনেচেন। সেখানে মাতলামি পাপ দারিদ্র্য আত্মহত্যা থাক্‌লেও বেশ একটি স্বাস্থ্যকর হাসিরও স্রোত আছে। তিনি জীবনের ঝড়ের উপর হাসির একটি পাৎলা আবরণ টেনে দিয়েছেন—দুঃখের চোখ ফেটে যাতে জলের সঙ্গে হাসির ঝিলিক্ ছুটে আসে, এ দিকে তাঁর বিশেষ চেষ্টা সার্থক হয়েই ফুটেচে। Little Dream রূপক। জীবন ও আনন্দের সন্ধানে আত্মা অভিসারে বেরিয়েচে। এতে গল্স্ওয়ার্দি তাঁর ভাষার মাধুর্য্য ও কবিত্বের সরসতা ঢেলে দিয়েছেন।

তাঁর সমস্ত নভেলেও এই বিশেষত্ব। তিনি নিজে কোনো চরিত্রকে পরিণত করেন না। শুধু ঘটনার আবর্ত্তের মধ্যে তাদের ছেড়ে দিয়ে তিনি দর্শকদের মতোই দূরে দাঁড়িয়ে দেখেন। তাঁর মতো নিরপেক্ষ লেখক প্রায় দেখা যায় না। লেখকেরা প্রায়ই নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা সুরু করেন, কিন্তু তাঁর লেখায় নিজের কথা একটুও নেই। তবে তাঁর নভেলের চরিত্রগুলি নাটকের চরিত্রের মতো প্রাণবান্ নয়; তার কারণ, নভেলে গল্স্-ওয়ার্দি ঠিক মানুষ না এঁকে একটা type দিয়ে নাড়াচাড়া করেন। কিন্তু তা হলেও তাঁর মতো এমন ললিত স্বাভাবিক ভাষা, এমন সুন্দর সম্পূর্ণ চরিত্রব্যঞ্জনা, এমন স্বাভাবিক ঘটনা-সন্নিবেশ আর সমারোহ আর কারো লেখায় নেই, আজকালকার বিলিতি লিখিয়েদের মধ্যে।

তাঁর নভেলের মধ্যে সেরা হচ্ছে The Man of Property; তার পরেই Fraternity। এর মাঝে একটি মহান্ সৌন্দর্য্য ও লীলা আছে। এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সেই অতি পুরোনো কথা—বড়লোক-গরীবের problem। কিন্তু গল্পটি এমন নিপুণভাবে করুণ স্নিগ্ধ ও সুন্দর করে' ফোটানো হয়েচে যে techenique-এ তো এ পরিপূর্ণতা পেয়েছেই, আর্টেও চরম পরিণতি লাভ করেচে। Mr Stone-এর জীবনের সুর সন্ধ্যার মতো করুণ, সে Fraternityর কথা লেখে, কিন্তু কোনো ভাইয়ের একখানা হাতের পরশ সে পায় নি! সমস্ত বইখানি জুড়ে একটি কাতর হতাশের সুর ছড়িয়ে আছে।...

গল্স্ওয়ার্দি যখন লেখেন, তখন প্রাণ দিয়ে লেখেন। তাঁর সমস্ত কথায় আবেগ উদ্বেল হয়ে ছুটেচে, কিন্তু অতি ধীরে, সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের মতো নয়। যদিও তিনি সামাজিক বা আধ্যাত্মিক সমস্যা নিয়ে চর্চ্চা করেন, তবু তিনি এ-কথা ভোলেন না যে, মানুষের বুদ্ধি-বিচার আইন-কানুনের চাইতেও তার আবেগ ও উত্তেজনা ঢের বেশী শক্তিমান্।...তাঁর Dark Flowerএ এই আবেগই মূল কথা। প্রথমে দেখি, একটি ছেলের বুকে এই আবেগের জাগরণ; তারপর দেখি তরুণ ও তরুণীর বুকে এর দাহ; পরে দেখি, বৃদ্ধের বুকে সেই আগুনের আভাস, যৌবন তাকে ফের ডাকচে! Mark-এর সঙ্গে Sylvia-র দৃশ্যগুলি বারে-বারে Joy-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর In Chancery-তে Soames Forsyte-এর চরিত্রের নৈরাশ্য ও হতবুদ্ধিতা সুন্দর আঁকা হয়েচে। স্ত্রী পরিত্যাগ করেছে, তবুও Irene-এর জন্য প্রেম,—এই করুণ অবিমিশ্র ব্যথাটি খুব গভীরতার সঙ্গে লেখা।... গল্স্ওয়ার্দির নারী-চরিত্রের মধ্যে অফুরন্ত আত্মসম্মান রয়েচে। নিজেদের প্রচার করতে যাবার বেলায় যে-নারীরা আত্মমর্য্যাদা ও সংযম ভুলে যায়, তাদের প্রতি গল্স্ওয়ার্দির কোনো সহানুভূতি নেই।.. তাঁর মন যখন বেদনায় ভরে' থাকে, তখনই তাঁর লেখায় পাই গভীরতা, যখন তাঁর

স্বর বিরক্তিতে বিষিয়ে ওঠে, তখনই পাই তীব্রতা ও তেজ, আর যখনই তাঁর মন ব্যঙ্গে ও কৌতুকে টলমল করে, তখনই পাই সুমধুর করুণ হাসির এক গভীর সুর!

তাঁর A Commentary-তে গরীবের জীবনের কথা আকুল সম্ভ্রম ও সহানুভূতি দিয়ে লেখা। তাঁর A Mother-এ তিনি দেখিয়েছেন, রোজ কত জীবন ভয় ও অপমানে বিক্ষত হয়ে নেতিয়ে পড়চে। One More নীচু জাতের জীবন-কাহিনী। সব জায়গাতেই নীচু জাতের উপর তাঁর অক্ষুণ্ণ প্রীতি ও দরদ,—পশু হোক মানুষ হোক, যারা ভুগচে, তাদেরই জন্য তাঁর সমস্ত মমতা আর স্নেহ। তাঁর গদ্য পদ্য হয়ে লীলা করে; যা কিছু সুন্দর, তা পঙ্কেই হোক, প্রাসাদেই হোক, যা সরল সহজ অনাড়ম্বর—তাকেই তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন।...

তাঁর দৃশ্যজ্ঞান চমৎকার, এবং তিনি আবহাওয়ার ছবিও আঁকতে পারেন অতি-সুন্দর। তিনি বিষবৃক্ষের ডালপালা কাট্‌তে চান্ না, একেবারে তার মূলোচ্ছেদের পক্ষপাতী। তিনি একজন নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদ; কিন্তু বাইরে তিনি তা বেশী রকম ফুটিয়ে তুল্‌তে গিয়ে মাঝে মাঝে গম্ভীরতা আর স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেন। তাই তাঁর অনেকগুলি চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে নি। তাদের শুধু চিনি বলেই মনে হয়, বন্ধু বলে' সম্ভাষণ কর্‌তে পারি না। গল্‌স্‌ওয়াদির আর্টের এই অর্থ যে, তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষের একটু ছোট্ট অঙ্গ-ভঙ্গী, একটি চাউনি, একটি কথা, একটু ছোঁয়া—এতেই মানুষের সত্যকার চরিত্র বেশী জানা যায়। নিজের মুখে খুলে বক্তৃতা দেওয়ার চাইতে তাই তিনি মনের কথা মুখের ভাষা দিয়ে প্রকাশ কর্‌তে চান্-না; যে-টুকু তিনি বলেন, তার মধ্যে অনেক-কিছু না-বলার রহস্য-ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকে। বুদ্ধিমান্ পাঠকদের তা খুঁজে বার করে তবে বুঝতে হয়। তিনি সংযমের সঙ্গে লেখেন, ভাবের উচ্ছ্বাসে ছাপিয়ে পড়েন-না, কিন্তু তাঁর সেই জীর্ণ আঁকা-বাঁকা পথে আবেগ-আনন্দের অভাব নেই! তিনি আকাশের ঝড়-ঝাপ্‌টা প্রভৃতি নিয়ে লেখেন না; তাঁর কাছে প্রকৃতি শক্তি নয়, প্রেরণা। তিনি প্রকৃতির উচ্ছ্বসিত রূপে মোটেই মুগ্ধ নন। তিনি চান বিষণ্ণ সন্ধ্যা, অস্পষ্ট প্রভাত, স্নিগ্ধ আলো, ম্লান গন্ধ! তাই তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে এই শান্তি ও সারল্যের সুর, এই ভূষণহীন স্নিগ্ধতা, এই পূত নির্ম্মল বিষাদ—মাঝে-মাঝে মেঘলা আকাশে রোদের ঝিলিকের মতো একটি ছোট্ট ইসারা! এই ইসারাটুকুতেই গল্‌স্‌ওয়াদির যা-কিছু মুন্সিয়ানা।...তিনি একটিও বাজে কথা বলেন না, এইখানে তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা; যা বলেন, তা সুন্দর সহজ দুটি কথায়, এখানে-সেখানে দুটি তুলির টানে! আর তাঁর সমস্ত কথা তাদের অর্থ ছেড়ে একটুও এদিক-ওদিক হয় না। তাঁর লেখার ছন্দের মধ্যে একটুও এবড়ো-খেবড়ো ভাব নেই, যেন সে একতারার সুর, মধুর উচ্ছ্বাস! গল্‌স্‌ওয়াদি আমাদের ছায়া দেখান বটে, কিন্তু চোখ দিয়ে একটু ইসারা করে' যান্ যে ওর পিছনে আলো আছে! গল্‌স্‌ওয়াদি একজন চমৎকার আর্টিষ্ট এবং সে আর্টিষ্টের চোখ ভবিষ্যতের দিকে নয়, আজকার এই পায়ে-চলার পথের উপরে।...

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত।

নেশা

প্রেমিক কর গো মোরে, এ জীবনে আমি
আর কিছু নাহি চাই! শুধু দিনযামী
শিরায় শিরায় যেন নেশার আবেশে
চঞ্চলিত করে' তোলে নব নব বেশে
অশেষ প্রেমের ঘোর; পুলক-বিহ্বল
ভুলে যেন যাই চিন্তা, কর্ম্ম, ফলাফল
ভালো-মন্দ সত্য-মিথ্যা। শুধু ক্ষণে ক্ষণে
ঘন হয়ে আসে যেন নয়নে নয়নে
মুগ্ধ স্বপ্নমদিরতা, দক্ষিণ সমীরে
চন্দ্রমার মায়াজালে আসে যেন ঘিরে
তন্দ্রিমা-রসিত লাস্য; স্বর্ণ-আলোধারা
প্রাণ ভরি' পিয়ে যেন হই আত্মহারা!
নিজ সৃষ্টিমদে মত্ত, ওগো ভোলানাথ,
রূপের মাতাল মোরে কোরো দিনরাত!

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

চয়ন

য়ুরোপের নূতন আশ্চর্য্য

ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার চার্লস বার্ণিয়ে সমগ্র অর্লিয়ন্স্ রেলওয়ের বৈদ্যুতিক শক্তি যোগানের জন্য লাক্রুজ নদীর গতি ফিরিয়ে দেবার সঙ্কল্প করেছেন। একটা নদীর গতি ফেরানো বড় সহজ কথা নয়। এ জন্য তিনি ক্রুজ নদীর উপর একটা এক-হাজার ফিট লম্বা, একশ সত্তর ফিট চওড়া এবং দু'শ' ফিট উঁচু এক বাঁধ তৈরী করবেন। এই কাজে তিনি লোক লাগিয়েছেন সাত শ'; কাজের উপযোগী ন'টা মালগাড়ী-বোঝাই যন্ত্রপাতি ও সাত মাইল লম্বা রেলের লাইন তাঁর কর্তৃত্বাধীনে আছে। এই লাক্রুজ নদীর দু'ধারে পাহাড়। তাই যাতে সাতশ' লোক এই বাঁধ তৈরী কর্‌তে পারে, সে জন্য একটা পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ তৈরী করা হয়েছে। এই বাঁধটা দু'শ ফিট উঁচু করার উদ্দেশ্য এই যে নদীর জল দু'শ ফিট উঁচু থেকে যাতে পড়ে। আর এই জল বেরুবে এই কাটা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া। যেখানে এই জল দু'শ ফিট উঁচু থেকে পড়বে সেইখানে ছ'টা জল-চাকা (turbines) বসান হবে। এতে নাকি ৫০,০০০ পঞ্চাশহাজার অশ্ব-শক্তি সমতুল তাড়িত শক্তির কাজ হবে, এবং ৬০,৫০০ যাটহাজার হেকেটা-ওয়াটসের তাড়িত প্রবাহের উদ্ভব হবে। তারপর জেনভিলিয়াসে তাড়িৎ শক্তি চলনের যে কেন্দ্র আছে—যার মত কেন্দ্র জগতে আর নাই তার সঙ্গে এটা যোগ করে দেওয়া হবে। এই দু'টির মিলনে যে তাড়িত প্রবাহের সৃষ্টি হবে তাতে ৩০০,০০০ তিন লাখ টন কয়লার খরচ বেঁচে যাবে। কিন্তু এতে ক্রুজ প্রদেশের ভৌগোলিক আকৃতি আর একরূপ হয়ে যাবে ও ক্রুজ নদীর সুন্দর উপত্যকাভূমি বিসদৃশ হয়ে দাঁড়াবে। বার্ণিয়ে মহোদয়ের এই কার্য্য শেষ হলে ইহা য়ুরোপের মধ্যে এক নতুন আশ্চর্য্য জিনিষ হয়ে দাঁড়াবে।

অদ্ভুত ভাষা

ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের ভাষা সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অদ্ভুত। স্প্যানিয়ার্ডরা প্রথমে এই দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সংখ্যা একরূপ লোপ পেয়ে এসেছে বল্‌লেই চলে। স্প্যানিয়ার্ডদের সঙ্গে রক্তের সংমিশ্রণ হলেও তারা যে একটা আলাদা জাত তা বেশ বোঝা যায়। তাদের এক আশ্চর্য্য রকমের বিশেষত্ব। এ-পর্য্যন্ত কোনও য়ুরোপবাসী তা দেখতে পায় নি।

বিশেষত্বটা হচ্ছে এই যে তারা শিস দিয়ে তাদের সব কথাবার্ত্তা চালায়। অর্থাৎ তাদের ভাষাই হচ্ছে শিস দেওয়া। এই দ্বীপপুঞ্জ এরূপ পাহাড়ময় যে একমাইল যেতে হলে তিন মাইল বেড় দিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে হয়। ঘাড় বেড় দিয়ে কাণ ধরার মত। এই দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের গঞ্চ বলে। তাদের মাতৃভাষা যদি শিস দেওয়া না হয়ে আমাদের দেশের ভাষার ন্যায় হতো, তাহলে তাদের পরস্পরের কথাবার্ত্তা বলা একরূপ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। গঞ্চদের এই ভাষা একরূপ সাঙ্কেতিক ভাষা। এতে কোনও যন্ত্রপাতির দরকার হয় না। তারা তাদের স্বাভাবিক কৌশলে মুখে শিস দিয়ে পঞ্চাশ যাট হাত দূরে নয়, এক মাইল আধ মাইল দূরে নয়—অতি সহজে তিন-চার মাইল ব্যবধানে দাঁড়িয়া কথাবার্ত্তা চালাতে পারে। এ পর্য্যন্ত কেউ এ ভাষার গূঢ় রহস্য ভেদ করতে পারে নি। কিন্তু অনুমান হয় যে শিসের হ্রস্ব দীর্ঘ হওয়ার উপর যতটা নির্ভর করে ততটা আর অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না। কোনওরূপ থেমে যাওয়া বা টেনে টেনে শিস দেওয়ার উপর—যাতে নাকি এক-একটা বাক্য তৈরী করা চলে—এরূপ কোন-কিছুর উপর নির্ভর করে না। এই ভাষার রহস্য-ভেদের জন্য এক বৈজ্ঞানিক একজন গঞ্চকে তারা যেরূপ সাধারণ ভাবে শিস দিয়ে কথা বলে সেরূপভাবে তাঁর কাছে শিস দিতে বলেন। তার ফলে ভাষার রহস্য এমন তার কাণের ভিতর ঢুক্‌ল যে তিনি প্রায় মাস দুই যাবৎ একরূপ কালা হয়ে গিয়েছিলেন।

ঘাতক গাছ

আমরা জানতুম যে আমাদের মত উদ্ভিদরা আমিষাশী। এখন আমরা শুনছি যে মনুষ্য-সমাজে যেমন গুণ্ডা, নরঘাতক আছে উদ্ভিদ-সমাজেও তেমনিধারা ঘাতক গাছ আছে। লণ্ডনের কিউ গার্ডেন্সে এক জাতীয় গাছের একটা নমুনা আছে, যাকে যথার্থই ঘাতক গাছ (Murder Tree) বলা য়েতে পারে। তার আসল নাম হচ্ছে ক্লসিয়া (Clusia)। এই নমুনাটি সংগ্রহ করা হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশ থেকে।

আমাদের দেশে বটগাছ যেমন ঝুরি নামায়, এ গাছও তেমনি ঝুরি নামায়। বটের ঝুরি যেমন মাটী থেকে রস নিয়ে গাছের পুষ্টিসাধন করে ও বটগাছটাকে শক্ত করে তুলে ধরে থাকে এ ঝুরি তেমন ঝুরি নয়। এ গাছ হাত বাড়িয়ে প্রতিবেশী উদ্ভিদের গলা টিপে তাদের মেরে ফেলে।

এদের বংশ ছড়িয়ে পড়ে পাখীদের সাহায্যে। তারা ত আর জানে না যে এ-গাছের বীজ বনের অন্যান্য উদ্ভিদের কি ক্ষতি করে। তারা এই গাছের উপর বসে আর অজ্ঞাতসারে উড়ে যাবার সময় এই গাছের বীজ নিয়ে ফেলে অন্যান্য গাছের শাখা-প্রশাখায় বা কোটরে। তা থেকে ঝুরি বেরোয়—মাটীর দিকে সে ঝুরি নেমে পড়ে—মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে তারপর শাখা-প্রশাখা, ঝুরি ছড়িয়ে ফেলে আর এই সব শাখা প্রশাখা নিজেদের প্রকৃতি মত পাশ-পাশের উদ্ভিদকে মরণ-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে। জড়িয়ে-জড়িয়ে তাদের গলা টিপে সত্যই তাদের দফা রফা করে দেয়।

সিগনালের উৎপত্তি

রেলগাড়ীর সিগনাল আমরা সবাই দেখেছি। দিনে সিগনাল উঠানো নামানো হয়,কারণ দিনে অনেক দূর থেকে সিগনালটা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাত্রে ঐ সিগনাল দেখতে পাওয়া যায় না তাই সিগনালে রঙ্গীন আলো-লাগানো থাকে। রাত্রে সেগুলি জ্বালা হয়। এই রঙ্গীন আলো দেখে গাড়ীর ড্রাইভার বুঝতে পারে লাইন clear আছে কি বন্ধ আছে। আর সিগনালগুলি ষ্টেশন থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে থাকে। অতএব সিগনালারকে (যে সিগনাল উঠায় নামায়) সেখানে বসে থাকতে হবে নতুবা ষ্টেশন থেকে ছুটে ছুটে গিয়ে দরকার-মত সিগনাল উঠান-নামান করতে হবে। যিনি সিগনাল আবিষ্কার করেন তিনি ঐরূপ সিগনাল উঠান-নামান কর্ত্তেন। তিনি আবার ছিলেন বেজায় রকম কুড়ে। তাই তাঁর পক্ষে অনবরত গাড়ী আসা-যাওয়ার সময় ছুটোছুটি করা পোষাত না। সে জন্য তিনি এক ফিকির খাটালেন। যাতে বসে বসে কাজ হাসিল হবে অথচ নড়তে হবে না,—তাই সিগনালের সঙ্গে বেশ এক শক্ত দড়ি তিনি বেঁধে দিলেন। যেই নামাবার দরকার হতো অমনি দড়িটা টেনে ধরতেন আর যেই ওঠাবার দরকার হত অমনি দড়িটা ছেড়ে দিতেন। সেই থেকে আজকালকার এই সিগনালের উৎপত্তি হয়েছে। আমরা জানতুম যারা অধ্যবসায়ী তারাই আবিষ্কারক ; কিন্তু কুড়ে আবিষ্কারকের কথা এই আমরা প্রথম শুনছি।

শ্রীশশিভূষণ বারিক।

উদ্দেশ্য-মূলক নাটক

থিয়েটারের বহু দর্শকই চায়,নাটকে moral থাকিবে,—তা সে ধর্ম্ম সম্বন্ধেই হৌক, কি সমাজ বা অপর-কোন নীতি সম্বন্ধেই হৌক! অর্থাৎ নাটকের প্রধান লক্ষ্য হইবে, গুরুর আসনে বসিয়া দর্শককে কোন একটা কিছু শিক্ষা দেওয়া। এটা কি ঠিক ?

বড় বড় সমালোচকেরা বলিয়াছেন, ঠিক নয়। তাঁদের মতে,নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য রস সৃষ্টির দ্বারা আনন্দ দেওয়া। থিয়েটারে যে দর্শক নাটক দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতে যায়, সেই খাঁটী-মনের দর্শক। তবে এই আনন্দ আবার নানা ভাবের আছে। দর্শকের রুচি ও শিক্ষার উপর এই আনন্দের মাত্রা নির্ভর করে। গ্যালারির দর্শক ও ড্রেস-সার্কেলের দর্শকে প্রভেদ এইখানে।

সম্প্রতি বিলাতে একখানি নাটকের অভিনয় হইয়াছিল,—সে নাটকের মূল বক্তব্য ছিল, টীকা লওয়া অন্যায়। তিন অঙ্ক ধরিয়া নাটকের নানা ঘটনার মধ্য দিয়া লেখক প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ডাক্তারেরা আহাম্মক; এই সুস্থ শরীরে রোগের বীজ ঢুকাইয়া তাকে রোগার্ত করিয়া তোলার।

দর্শকের দলে এ নাটকের খুব তারিফ পড়িয়া যায়! তাই তো, এত বড় আহাম্মকি সকলে বেমালুমসহিয়া যাইতেছিলাম —আজ নাট্যকার কলমের খোঁচায় ভাগ্যে সকলের চোখ ফুটাইয়া দিল!

এমনি যে কোন সমস্যাই নাটকে দেখানো হয়, তার গোড়াতেই যে একটা সমস্ত ন্যায়ের ফাঁকি থাকে, সেটা সহসা কাহারো চোখ পড়ে না! গল্প এবং ঘটনাগুলা তো শ্রেফ্ বানানো—তাকেই মূল ধরিয়া বাজে খানিকটা তর্ক তুলিয়া সেটারই সেরা ভাগ লেখক দেখান্, বাকী দিকটাকে একেবারে ঢাকা দিয়া। এ যেন কোন ব্যাপার লইয়া এক-তরফা ওকালতি করা। ইহার মধ্যে প্রতিপক্ষের যুক্তি-তর্ক, বাদানুবাদ কৈ? তুমি বলিলে, বাল্য-বিবাহ ভালো, বেশী-বয়সে বিবাহ দিলেই সর্ব্বনাশ! ঐ বদ্ধ সংস্কার ধরিয়া তুমি বাল্য-বিবাহের খুব একটা সুন্দর ছবি, ও তার পাশে বেশী-বয়সের বিবাহের একটা কুৎসিত ছবি আঁকিতে বসিলে। তোমাকে জবাব দিবার সহস্র কথা থাকিলেও একটা কথাও উঠিল না। তাই বলিয়াই কি বলিব, তুমি মস্ত সামাজিক সমস্যার সমাধান করিয়া দিলে? আমিও ঠিক তার উল্টা ছবিখানা অমনি দীপ্ত বর্ণে ছকিয়া দিতে পারি তো! কাজেই তুমি যে সমস্যার সমাধান করিয়া বসিলে, কেমন করিয়া তা মানিব বল!

আর ঐ সব টাটকা সামাজিক সমস্যা লইয়া যতই নাটক লেখ, দুদিন পরেই ও-সব মত সেকেলে হইয়া যাইবে। ওগুলা ক্ষণিক উত্তেজনায় দুদণ্ডের মত মানুষের মনের উপর নাচিয়া উঠিতেছে এবং পরক্ষণেই মিলাইয়া যাইতেছে। তোমার নাটক লেখা তবেই সার্থক হইবে, যদি তুমি মানব-চিত্তের এক চিরন্তন সত্যকে ফুটাইতে পারো—দেশ-কালের ব্যবধান ঠেলিয়াও যাহা শাশ্বত সত্য! লীয়রের স্নেহ ও অভিমান, ম্যাকবেথের প্রবল শক্তি-পিপাসা—এগুলার মধ্যে মানবচিত্তের চির-সত্য লীলায়িত বলিয়া জগতের নাট্য-সাহিত্যে তাদের আর তুলনা নাই এবং তা যতদিন মানুষ বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিনই 'অজরামরবৎ' মানুষের চিত্তে সাড়া তুলিবে।

তাই বলিয়া নাট্যকার কোন সমস্যারই কি মীমাংসার চেষ্টা করিবেন না? তা নয়—তবে সে নাটক বিশ্ব-সাহিত্যর অংশ হইবে না, চিরন্তনও হইবে না। Uncle Tom's Cabin বা নীল-দর্পণের দাম ততদিন ও সেইখানে, যেখানে এবং যখন দাসপ্রথা এবং নীলকরের অত্যাচার। তারপর সেগুলা রহিত হইলে ও-সাহিত্য ছায়াবাজির ছবির মতই চিত্তপট হইতে মুছিয়া যাইবে—শুধু এক বিস্মৃত দিনের অত্যাচার-কাহিনীর মতই সেগুলা লোকের মনে প্রতিভাত হইবে। যেন খবরের কাগজে ছাপা পুরাকালের একটা পুরানো খবর! গল্স্ওয়ার্দ্দির Strife, ডিকেন্সের Oliver Twist সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে।

কিন্তু শেলীর Queen Mab;—এ শুধু বিশেষ কালের বিশেষ বিবরণ নয়; এ কাব্য চিরকালের,ইহার সত্য শাশ্বত।

নাটক রচনার সময় নাট্যকার মনে রাখিবেন, তাঁর চাই একটি প্লট, তারপর তার পরিণতি ও শেষ। তাঁর একটা সৃষ্টি করা চাই—চরিত্র,—তা পাপ হউক, পুণ্য হউক, সেটি মানব-চিত্তের চিরন্তন প্রতিচ্ছবি হওয়া চাই!

তাই বলিয়া নাটক কি কোন শিক্ষাই দিবে না? দিবে। তবে সে শিক্ষা দিবে বেত্রহস্ত গুরুর মত নয়! নাটক যে শিক্ষা দিবে, তা সে দিবে নিঃশব্দে, গোপনে, বিনাড়ম্বরে; বাজে কথায় নয়; নাটকের লাইন ধরিয়া সে শিক্ষা কেহ খুঁজিতে যাইবে না—সমগ্র নাটকের মধ্যে সে শিক্ষা প্রচ্ছন্ন থাকিবে, বিশাল বালুকারাশির মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়

মিশ্‌ল্‌টো

আমাদের দেশে পূজা বা উৎসবাদিতে গৃহ-দ্বার আম্র-পল্লবে সজ্জিত করা একটা চিরন্তন প্রথা। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেও এমনি প্রথা আজও প্রচলিত আছে। বড়দিনে তারা তাদের ঘর-দ্বার সাজায় হোলি মিশ্‌ল্‌টো এবং আরো নানা সবুজ তৃণ-গুল্মে। এ প্রথার মধ্যে বহু প্রাচীন সংস্কারের ছাপ দেখা যায়। ড্রুইডেরা পূজায় পার্ব্বণে এবং বিশেষ করিয়া ডিসেম্বর মাসে ঘর-দ্বার মিশ্‌ল্‌টোর তরুণ শাখা-পল্লবে সজ্জিত করিত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে দেব-দেবীরা পর্য্যন্ত দুরন্ত শীত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঐ সব শাখা-পল্লবে আশ্রয় ...

সকলে সংগ্রহ করে—কারণ এই গাছ যীশুমাতা মেরীর অত্যন্ত আদরের ছিল। বাড়ীর বাহিরে সেজন্য সকলে হোলির শাখা-পল্লব সাজাইত এবং ভিতরটা সাজাইত আইভি দিয়া। হোলি চির-সবুজ এবং এ গাছ শুধু গ্রেট-বৃটেনে জন্মায়।

মিশ্‌লটোর কাহিনীর মধ্যে নানা কথা জড়িত আছে। মিশ্‌লটোর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করিলে কথা দাঁড়ায়, শীতের ম্লানিমা যে ঘুচাইতে পারে। মিশ্‌লটোর জন্ম কাহিনী নরওয়েয় মতে এইরূপ—লোকি ছিল এক দুষ্ট দৈত্য। তার আদেশে অন্ধ হোড়ুর সূর্য্য বা বলডারকে মিশ্‌লটোর পল্লব ছুড়িয়া মারিয়া ফেলে। বলডার স্বপ্নে মৃত্যু-বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিত; তাই তার মা ফ্রিগা (তিনি ওয়ালহাহার রাণী ছিলেন) জল, ধাতু, অগ্নি, প্রস্তর ও গাছপালার পূজার্চ্চনা করিয়া বর মাগিয়া ছিলেন, তারা যেন তাঁর পুত্রের কোন অনিষ্ট না করে। দেবতারা রাজী হইলেন, কিন্তু তাঁরা বলডারকে ইট পাটকেল ছুড়িয়া মারিতেন, এটা ছিল বলডারকে লইয়া দেবতাদের খেলা। কারণ ইহাতে বলডারের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল না।

দেবতারা বলডারকে খেলার সঙ্গী করিয়াছে, ইহা দেখিয়া দৈত্য লোকির হইল রাগ আর হিংসা। সে মৃত্যুর পিতার সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া একদিন রমণীর ছদ্মবেশে গিয়া ফ্রিগার সঙ্গে দেখা করিল; এই খেলার কথা বলিয়া ভয়ও দেখাইল। ফ্রিগা বলিলেন, ও খেলায় তাঁর ছেলের কোন ক্ষতি হইবে না; কারণ দেবতারা বর দিয়াছেন, এ সব জিনিষ হইতে বিপদের ভয় নাই। তিনি আরো বলিলেন, শুধু ওয়াল্‌হালার পূর্ব্বদিকে একটা ছোট গাছ জন্মায়, মিশ্‌লটো—তার কাছেই কোনদিন তিনি বর মাগেন নাই। তা সে অতটুকু গাছ, সে আর তাঁর ছেলের কি করিবে! লোকি তখন ফিরিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিয়া এই মিশ্‌লটোর পল্লব ভাঙ্গিয়া দেখে, বলডারের সঙ্গে দেবতাদের খুব খেলা চলিয়াছে। অন্ধ হোড়ুর সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। লোকি বলিল,—তুমি খেলছ না যে?

হোড়ুর বলিল,—আমি যে অন্ধ!

লোকি বলিল,—বেশ, এই নাও একটা ডাল, তুমিও ওর

এই কথায় হোড়ুর মিশ্‌লটোর পল্লব ছুড়িয়া বলডারের গায়ে নিক্ষেপ করিল। সেই পল্লব গায়ে লাগিতেই বলডার ঘুরিয়া পড়িয়া মরিয়া গেল! সেই অবধি মিশ্‌লটোকে কেহ তুচ্ছ করিতে সাহস করে না—তাকে আনিয়া সকলে ঘরে রাখিয়া তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া বিপদ কাটাইতে প্রয়াস পায়।

সেক্সপীয়র তাঁর Titus Andronicus নাটকে মিশ্‌লটোকে এই কারণেই 'baleful' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নর্স গল্পে আছে, বল্‌ডারের মৃত্যুর পর সকলে সতর্ক হয়, যেন এর পল্লব কখনো মাটীতে কেহ না নিক্ষেপ করে। বোধ হয়, এই গল্প-অনুযায়ী ড্রুইডেরা যখন মিশ্‌লটোর পল্লব গাছ হইতে কাটিত, তখন দুইজন পুরোহিত গাছতলায় প্রকাণ্ড কাপড় বিছাইয়া ধরিত, পাছে এতটুকু ডাল পালা কি লতা-পাতা মাটীতে পড়ে; পড়িলেই দেশে মড়ক হইবে!

এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া পরে মিশ্‌লটোর শাখাপল্লব সকলে বাড়ীতে টাঙ্গাইয়া রাখিত।

মিশ্‌লটোর শাখাপল্লব ভাঙ্গিবার সময় তাদের চুমা দিতে হয়। এইটাই মিশলটোকে শ্রদ্ধা ও পূজা করার পদ্ধতি এবং এখনো মিশলটোর শাখাপল্লব ভাঙ্গে তরুণী বালিকার দল এবং প্রত্যেক শাখা বা পল্লব ভাঙ্গিবার সময় তাদের কাছে যে-সব তরুণ গিয় দাঁড়ায়, তাদের প্রতিবার যে-তরুণী শাখাপল্লব ভাঙ্গিবে তাকে প্রত্যেকবার একটী করিয়া চুমা দিতে হয়। তা সে তরুণ-তরুণীর মধ্যে কোন পরিচয় বা সম্বন্ধ থাক বা না থাক! যেই পাড়া শেষ হয় চুমারও বিরাম হয়। এ প্রথা ড্রুইডদের প্রথারই অনুবর্ত্তন। ইহার অর্থ মিশ্‌লটো ভাঙ্গার সময় তাকে কোনরূপে উপেক্ষা না করা হয়! চুমার ধারায় তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোই উদ্দেশ্য!

বড়দিনের বহু প্রথা 'কুসংস্কার' বলিয়া উঠিয়া গিয়াছে। কেবল এই মিশ্‌লটো ও চুমা রহিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে মৃত্যু-বিভীষিকা যতই লুকানো থাক, রোমান্সও বেশ ফুটিয়া আছে। চিরশ্যামল চির-তরুণ শাখা-পল্লব, তার সঙ্গে তরুণ-তরুণীর এই অধরে-অধরে মিলন—কাব্যের মতই উপাভোগ্য।

শ্রীশিশিরকুমার রায়।

মনের গড়ন

বিলাতের প্রসিদ্ধ বায়লজিষ্ট প্রোফেসর টমসন সম্প্রতি বালকদের শিক্ষারীতির সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—এই যে স্কুলে অসংখ্য বই ছেলেদের পড়ানো সুরু হইয়াছে, ইহাতে ছেলেদের মাথা খাইবার চূড়ান্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। এতগুলা বিষয়ের পড়া তৈরী করিতে দিলে ছেলেরা মুখস্থ ধরিবেই। তা ছাড়া ছোট মনে এতগুলা জিনিষ ঢোকানো সম্ভবও নয়। আর এই না-বুঝিয়া মুখস্থ করার ফলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি খেলিয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে না—কতকগুলা বইয়ের লেখা মনে ঠাসানো হয় মাত্র। এবং তার ফলে মনের স্বতঃউৎসারিত স্ফূর্ত্তির ভাব লোপ পায় ও মন একটা যন্ত্রের মত হইয়া উঠে।

আর পাঠ্য-নির্ব্বাচনেও কর্ত্তৃপক্ষের অসামান্য ঔদাসীন্য দেখা যায়। সৎসাহিত্য কাহাকে বলে, তার ধারণা তাদের নাই, ছেলেদেরও কাজে কাজেই সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা ধারণা হয় না। মন তাদের স্বাস্থ্য হারায়, এবং কোনমতে বাহির হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া নিজের মনের মধ্যে ভরাট করিতেই তারা ব্যগ্র থাকিতে শেখে।

এই বোঝা-চাপানোর ফলে মনে দারুণ বিশৃঙ্খলা জাগে। নানা বিষয় এমনি তাল-গোল পাকাইয়া ছেলেদের মন ভরাট করিয়া তোলে যে তার সুশৃঙ্খল বিন্যাস মনের পক্ষে অসম্ভব হইয়া ওঠে এবং ওধারে দৃষ্টিশক্তিও তারা হারাইয়া বসে। এই ঠাসের চাপে ছেলের স্বাস্থ্যও চলিয়া যায়। এই বইয়ের বোঝা আয়ত্ত করিতে ছেলেদের পড়িতে হয় প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই। বাহিরের আলো হাওয়া দূরে সরাইয়া তারা কেবল বইয়ের পাতাতেই চোখ রাখিয়া নির্জীবের মত পড়িয়া থাকে—মনে একমাত্র চিন্তা, কোনোটা ঠাসিতে না ত্রুটি হয়!

তিনি বলেন, তেরো হইতে ষোল বৎসর বয়সের ছেলেরাও ৭টার পূর্ব্বে বই খুলিবে না—৭টা হইতে ৯।৯৷৷০ অবধি পড়িবে এবং শয়ন করিবার পূর্ব্বে কোন রকম খেলা-ধুলা গল্পসল্প করিয়া মনটাকে হাল্‌কা করিয়া তবে শুইতে যাইবে। তেরো চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের ছেলেরা সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টা অবধি পড়িবে; ইহার মধ্যে যেটুকু পড়া সারা যায়, সেইটুকুই তাদের পড়ার মাত্রা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া দরকার, তার বেশী একটা লাইনও পড়ানো ঠিক নয়।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

নাৎনী ও পিতামহী সংবাদ

ইংরাজের ঘরে পিতামহী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, নাৎনীদের অতিরিক্ত স্বচ্ছন্দ আহার-বিহার গল্প-গুজবের ধুম দেখিয়া। রাগিয়া তিনি বলিলেন,—রীতিনীতি, ভোল এমন বদলাইয়াছে যে দেখিয়া তাঁর তাক্ লাগিয়া গেছে। পুরুষের সঙ্গে এমনভাবে মেয়েদের মেশামেশি চলিয়াছে যে এটা তাঁর কাছে বেহায়াপনার চূড়ান্ত বলিয়া মনে হয়। নাৎনীকে তিনি শাসাইলেন।

নাৎনী বলিল,—তোমাদের আমলে, অর্থাৎ তোমরা যখন তরুণ ছিলে, তখন বাড়ীতে কি পুরুষ মানুষ আস্‌তো না ঠাকুমা? না, তাদের সঙ্গে মিশতে না তোমরা?

পিতামহী বলিলেন,—আসতো, কিন্তু এমন টাটু ঘোড়ার মত কেউ ছুটোছুটি করত না—তারাও না, আমরাও না। চা দিলুম,—খেয়ে সে বল্‌লে, বেশ চা! কিম্বা বল্‌লে, আজকে বেশ হাওয়া বইছে! আমিও বল্লুম, হাঁ। ব্যস্—! তোমাদের মত পুরুষ মানুষের হাত ধরে ঝুলতে ঝুলতে অমন যেখানে-সেখানে ঘুরতে যেতুম না!

নাৎনী বলিল—কেন ঠাকুমা, তখন পুরুষ মানুষগুলো বুঝি ভারী বদ্ ছিল? অসভ্য ছিল? বুনো-গোছের ছিল?

পিতামহী বলিলেন,—তা নয়, তারা ছিল আদর্শ বিনয়ী—মুখ তুলে মেয়েদের পানে তারা চাইতে জানতো না! তার পর মেয়েরা এখন যেমন ধিঙ্গী হয়েছে—মিটিংয়ে যাচ্ছে, ঘোড়দৌড়ে যাচ্ছে—সর্ব্বত্র অবাধ গতি, আমাদের কালে তেমন ছিল না—বাড়ীতে বসে থাকতো সব আর চব্বিশ ঘণ্টা কাজকর্ম্ম করত নিজেরা।

নাৎনী বলিল—তখন যুদ্ধ হলে তোমরা দেশের জন্যে কি করতে? দেশের পুরুষেরা যুদ্ধে গেলে বাহিরের কাজ চলতো কি করে?

পিতামহী বলিলেন,—বাহিরের কাজের খোঁজে আমাদের দরকারও ছিল না। আগে ঘর, তার পরে বার!

নাৎনী দেশের নানা সমস্যার কথা পাড়িল, পিতামহীর এক কথা,—দেশের কথা পুরুষ ভাবুক, আমরা ঘরের কাজ লইয়া-থাকিব।

নাৎনী বলিল, কিন্তু ঘরে তো খালি রাঁধা-বাড়া কাজই কাজ নয়, ছেলে-মেয়ে মানুষ করা চাই, তারা যাতে ভালো থাকে, তাদের সবদিকে চোখ রেখো। সব দিকেই নজর চাই!

পিতামহী বলিলেন,—তোর বাপ মানুষ হয় নি কি?

নাৎনী চুপ করিয়া গেল—ঠাকুমার মন যে অনেক জিনিষের ধারণাও করিতে পারে না, অথচ সে পারে—রোগে শোকে ঠাকুমা ধৈর্য্য হারান্, সে হারায় না—এটা ভালো হইয়াছে, না, মন্দর দিকে চলিয়াছে!

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

চীনের বাজার

চীনের প্রায় প্রত্যেক সহরেই ব্যবসাদাররা দোকানের নাম দেয়, যে জিনিষ বিক্রি করে তা থেকে নয়, বাছাই বাছাই ধর্ম্মের কথায়। মাংসর দোকানের নাম দিলে তারা Virtue and Abundance; চায়ের দোকানের নাম রাখলে Made prosperous by Heaven; কয়লা ও জ্বালানি কাঠের দোকানের নাম হোল Health and Happiness.

সহরের ভিতরে দেখা যায়, দোকানের গায়ে কোন বিজ্ঞাপন নেই বটে, কিন্তু অদ্ভুত অদ্ভুত নোটীশ টাঙানো আছে। যেমন "No credit given. Former customers have taught Caution" যেমন—Gossipings and long sitting injure business"। ব্যবসা সম্বন্ধীয় এ-রকম বহু উপদেশ ছড়াছড়ি যাচ্ছে। এই সমস্ত কাগজগুলি এমন ভাবে চিত্রিত যে দেখলেই বোঝা যায় এতে কোন্ জিনিসের বিজ্ঞাপনের ইঙ্গিত আছে। দোকানের মাথাতেও যে সমস্ত sign-board থাকে, তাতে ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ থাকলেও এই একটি ছবিও রঙের টানে বিক্রেয় জিনিসের পরিচয় দেয়।

চীনের দোকানের এই বিশেষত্ব যে তারা একই জায়গায় জিনিষ তৈরী করে, বিক্রিও করে। তারা কোন factoryর selling agency খুলে-আলাদা ব্যবসা করে না।

ব্যবসাদার যিনি দোকানের মালিক, সাধারণতঃ তিনি দোকান-ঘরেই থাকেন। চীনের রাস্তা দিয়ে হাঁটলে প্রায়ই দেখা যায়,এই সমস্ত দোকানদাররা দোকানের বাইরে রাস্তায় চেয়ার টেনে বসে মুখ ধুচ্ছেন, দাঁত মাজচেন, দাড়ি কামাচ্ছেন, আর তাঁদের ঘিরে যে অদ্ভুত অদ্ভুত ভবঘুরে জমে' যাচ্ছে, তাতে নজরও দিচ্ছেন না একটুও।

চীনের বাজারের আর একটা বিশেষত্ব এই যে একই রকম জিনিষের সমস্ত দোকান এক রাস্তায় থাকবে। সেই রাস্তার নামও হবে সেই সব জিনিষের অনুকরণে, যেমন Sweet-Meat Road ইত্যাদি। এতে একটা বিশেষ সুবিধা হয় এই যে, কোথায় কি পাওয়া যায় খুঁজে খুঁজে কোন পথিককে হায়রান্ হতে হয় না।

যে সমস্ত দোকানে কোন বিচিত্র সামগ্রী (curios) বিক্রী হয়, তারা সাধারণত সব দেশেই জিনিষগুলি রাস্তার সামনে Show-caseএ রেখে থায় দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য। কিন্তু চীন-ব্যবসাদাররা সব-চেয়ে যে-জিনিষগুলি অল্প-দামী,সেগুলিকে সাম্‌নে রেখে অধিকতর মূল্যবান দ্রব্যগুলিকে ক্রমশঃ পিছনে সাজাতে থাকে। এই সমস্ত দোকান চীনে চার-পাঁচ-খানা ঘর নিয়ে। আস্তে আস্তে লোভ দেখাতে-দেখাতে তারা ক্রেতাদের একেবারে শেষের ঘরে টেনে নিয়ে যায়, যার মাঝখানে গিয়ে পড়লে কেউ কিছু না কিনে আর ফিরতে পারে না।

অচিন্।

ব্যায়াম বিষয়ে কতিপয় উপদেশ

নিম্ন-লিখিত নিয়মগুলি ব্যায়াম-কারীর পক্ষে অবশ্য-পালনীয়। অজ্ঞতা-বশতই হউক অথবা জানিয়া অগ্রাহ্য করিয়াই হউক অনেকে এই নিয়মগুলি পালন করেন না। কিন্তু এই নিয়ম-গুলি না মানিয়া ব্যায়াম করিলে স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি হয়।

১। অতিরিক্ত ব্যায়াম কখনও করিবে না। ডাঃ ইউজেন স্যাণ্ডো বলেন, "ব্যায়াম একেবারে না করা ভাল তথাপি অতিরিক্ত ব্যায়াম করা ভাল নহে।" অতিরিক্ত ব্যায়াম হইতে নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়। অতিরিক্ত-ব্যায়ামে আয়ুঃক্ষয় হয়।

২। ব্যায়ামের অব্যবহিত পরে কখনও বসিবে না। ব্যায়ামের পর শরীরে রক্ত-চলাচল খুব দ্রুত গতিতে হইতে থাকে। ঐ সময়ে বসিলে শরীরের বক্রতার সহিত ফিমারাস নামক শিরা (femurus artery) চাপিয়া যায়, তাহাতে নিম্নাঙ্গে রক্ত-প্রবাহে বাধা পড়ে ও মাথায় অতিরিক্ত রক্ত চলিয়া যায়। ব্যায়ামের পর মিনিট ১০।১৫ পায়চারি করা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

৩। যে-স্থানের বায়ু দুর্গন্ধ-যুক্ত অথবা ধূম্র-পূর্ণ, সে স্থানে কদাচ ব্যায়াম করিবে না। ব্যায়ামের সময় শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া খুব দ্রুত চলিতে থাকে। ধূম-পূর্ণ স্থানে ব্যায়াম করিলে ফুসফুসের মধ্যে ধূম প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত অপকার করে। নির্ম্মল মুক্ত বায়ুতেই ব্যায়াম করা উচিত।

৪। একেবারে ৮।১০ ঘণ্টা কিছু না খাইয়া খালি-পেটে ব্যায়াম করিবে না। এরূপ করায় অপকার হয়। প্রাতঃকালে ব্যায়াম করিবার অন্ততঃ ১৫।২০ মিনিট পূর্ব্বে কিছু আহার করা উচিত। কিন্তু আহার যেন অধিক না হয়; সামান্য দুখানা বিস্কুট, একটু কোকো (চা নহে) অথবা একটু গরম দুধ কিম্বা একটা সন্দেশ কি দুটি ভিজা ছোলা হইলেই যথেষ্ট।

৫। আহারের পর অন্তত ২॥ ঘণ্টার মধ্যে ব্যায়াম করিবে না। এরূপ করিলে ভুক্ত-দ্রব্য পরিপাক হয় না ও নানাবিধ রোগ জন্মায়। আহারের পর ২॥০ ঘণ্টার মধ্যেই ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া যায়, তাহার পর ব্যায়াম করিলে অপকার হয় না। আহারের পর অপেক্ষা প্রাতঃকাল ও সায়ংকালই ব্যায়ামের পক্ষে শ্রেয়ঃ।

৬। ব্যায়ামের পর দুই ঘণ্টার মধ্যে আহার করিবে না। ব্যায়ামের পর শরীরে রক্ত-সঞ্চালনের গতি দ্রুত হয় ও ঐ গতি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগে। রক্ত-চলাচলের গতি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে ভোজন করিলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে।

৭। ব্যায়াম করিবার সময় কথা কহিবে না বা অন্য কোন চিন্তা করিবে না। এরূপ করিলে পেশী-সমূহের উপর ইচ্ছা-শক্তির ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে হয় না; ইচ্ছা-শক্তি-শূন্য ব্যায়ামে বিশেষ ফল হয় না।

৮। পাশ্চাত্য চিকিৎসক এবং ব্যায়াম-বীরগণ ব্যায়ামের অব্যবহিত পরেই স্নান করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু শীত-প্রধান দেশের শারীর-বিধান-প্রণালী সকল সময়েই এই উষ্ণ-প্রধান দেশের উপযোগী নয়। শীত-প্রধান দেশে অগ্নিতাপ এবং ব্যায়ামাদির দ্বারা রক্তের উষ্ণতা রক্ষা করিতে হয়। সেই জন্য ঐ সকল দেশে ব্যায়ামের অব্যবহিত পরেই স্নান করিবার বিধি; নতুবা অত্যন্ত শীতের জন্য ঠাণ্ডা জলে স্নান অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। আমাদের উষ্ণ-দেশে ব্যায়ামের পর বিশ্রাম না করিয়া স্নান করিলে সর্দ্দীগর্ম্মী হইতে পারে। অতএব ব্যায়ামের পর বিশ্রাম না করিয়া কদাচ স্নান করিবে না।

স্নানের সময় সর্ব্বাগ্রে মাথা এবং ঘাড় ভিজাইবে। তৎপরে বক্ষঃস্থলে জল আছড়া দিবে, এবং সর্বশেষে সর্ব্বশরীর জলসিক্ত করিবে।

শ্রীশ্যামসুন্দর ঘোষ

সঙ্কলন

"যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি"

যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি',
হে ভোলা সন্ন্যাসী?
চঞ্চল চৈত্রের রাতে
কিংশুকমঞ্জরী সাথে
শূন্যের অকূলে তা'রা অযত্নে গেল কি সব ভাসি'?
আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণশুভ্র মেঘের ভেলায়
গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায়?

একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,
গেছ কি পাসরি'?
দস্যু তারা হেসে হেসে
হে ভিক্ষুক, নিল শেষে
তোমার ডম্বরু শিঙ্গা, হাতে দিল মন্দিরা, বাঁশরী।
গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন রসে
ভরি' তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে
মাধুর্য্যরভসে।

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেল ভেসে
শুষ্কপত্রে ঘূর্ণবেগে গীত-রিক্ত হিম-মরুদেশে,
উত্তরের মুখে।
তব ধ্যানমন্ত্রটিরে
আনিল বাহির তীরে
পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।
সে মন্ত্রে উঠিল মাতি' সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা
সে মন্ত্রে নবীনপত্রে জ্বালি' দিল অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা।

বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের হ'ল অবসান
জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রুকলতান
শুনিলে তন্ময়।
সেদিন ঐশ্বর্য্য তব উন্মেষিল নব নব,
অন্তরে উদ্বেল হ'ল আপনারি আপন বিস্ময়।

আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য্য উদার,
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ম্ময় পাত্রটি সুধার
বিশ্বের ক্ষুধার।

সেদিন, উন্মত্ত তুমি, যে নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে
সে নৃত্যের ছন্দে লয়ে সঙ্গীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে
তব সঙ্গ ধরে'।
ললাটের চন্দ্রালোকে নন্দনের স্বপ্ন-চোখে
নিত্য নূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভরে'।
দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা,
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা,
রূপ-তরঙ্গিমা।

সেদিনের পানপাত্র, আজ তা'র ঘুচালে পূর্ণতা?
মুছিলে, চুম্বনরাগে চিহ্নিত বঙ্কিম রেখা-লতা
রক্তিম-অঙ্কনে?
অগীত সঙ্গীতধার, অশ্রুর সঞ্চয়ভার
ধুলায় লুণ্ঠিত সে কি ভগ্নভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে?
তোমার তাণ্ডব নৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধূলি?
নিঃস্ব কাল-বৈশাখীর নিশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি'
লুপ্ত দিনগুলি?

নহে নহে, আছে তারা; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সঙ্গোপনে।
তোমার জটায় হারা গঙ্গা আজ শান্তধারা,
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে।
আবার কি লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে;
অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহিরে—
"নাহিরে! নাহিরে!"

কালের রাখাল তুমি সন্ধ্যায় তোমার শিঙ্গা বাজে,
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহমাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জ্জন প্রান্তরতলে আলেয়ার আলো জ্বলে
বিদ্যুৎবহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিবদ্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
শান্ত হয়ে আসে।

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।
বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে ; আমি রচি তা'রি সিংহাসন,
তা'রি সম্ভাষণ।

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী।
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়মালা পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী ;
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি
মোর গান হানি'।

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে অগ্নিতেজে দগ্ধ করে'
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।
বারে বারে তা'রি তূণ সম্মোহনে ভরি' দিব বলে'
আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে'
মৃত্তিকার কোলে।

জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা,
নূতন উৎসাহে।
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে বিলীন বিরহতলে,—
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখদাহে।
ভগ্নতপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি।

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি'
দেখে মোর সাজ।
হেন কালে মধুমাসে মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি ল'য়ে, সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।
ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্তআঁখি
দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি'
প্রাতঃসূর্য্যরুচি।
অস্থিমালা গেছে খুলে
মাধবী-বল্লরী-মূলে,
ভালে মাখা পুষ্পরেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি।
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে ;
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি গানে
কবির পরাণে।

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩০ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা
অন্ধকারের ললাট মাঝে পরানু রাজটীকা।
তার স্বপনে মোর আলোর পরশ
জাগিয়ে দিল গোপন হরষ,
অন্তরে তার রইল আমার
প্রথম প্রেমের লিখা॥
আমার নির্জন উৎসবে
অম্বরতল হয়নি উতল পাখীর কলরবে
যখন তরুণ রবির চরণ লেগে
নিখিল ভুবন উঠবে জেগে
তখন আমি মিলিয়ে যাব
ক্ষণিক মরীচিকা।

শান্তিনিকেতন, মাঘ ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আয়রে মোরা ফসল কাটি।
মাঠ আমাদের মিতা, ওরে আজ তারি সওগাতে
মোদের ঘরের আঙন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে।

মোরা নেব তারি দান
তাই যে কাটি ধান,
তাই যে গাহি গান,
তাই যে সুখে খাটি।
বাদল এসে রচেছিল ছায়ার মায়াঘর
রোদ এসেছে সোনার যাদুকর।
শ্যামে সোনায় মিলন হল মোদের মাঠের মাঝে,
মোদের ভালবাসার মাটি যে তাই সাজল এমন সাজে।
মোরা নেব তারি দান,
তাই যে কাটি ধান,
তাই যে গাহি গান,
তাই যে সুখে খাটি।

শান্তিনিকেতন, মাঘ ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—

গান

কণ্ঠে নিলেম গান—
আমার শেষ-পারাণীর কড়ি।
একলা ঘাটে রইব না পড়ি।
আমার সুরের রসিক নেয়ে
তারে ভোলাবো গান গেয়ে
পারের খেয়ায় সেই ভরসায় চড়ি।
পার হব কি নাই হব, তার
খবর কে রাখে,
সুরের হাওয়ায় ডাক দিল এই
সুরের পাগলাকে।
ওগো তোমরা মিছে ভাব,
আমি যাবই যাবই যাব
ভাঙ্‌লো দুয়ার কাট্‌লো দড়াদড়ি।

বিজলী, ২৪ ফাল্গুন ১৩৩০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—

জল

এদেশের লোকেরা, অধিকাংশ স্থলেই, মুখে "আপো নারায়ণঃ" বলিলেও, নানা রকমে জলকে দূষিত করে। অজ্ঞানতা বশতঃই, "অগভীর" কূপের ও সর্ব্বপ্রকারে কলুষিত পুকুরের জল ব্যবহার করে; তাহার ফলে, একটি কোনও ওলাউঠা ব্যারামী গ্রামে থাকিলে, উহা হইতে সমস্ত গ্রামে ঐ জাতীয় ব্যারাম সংক্রমিত হয়।

সমবেত-চেষ্টার ফলে, অথবা তাহার ইংরাজী ছাঁদ মিউনিসিপ্যালিটির দ্বারা, প্রত্যেক গ্রামে একাধিক পুকুর বা "গভীর" পাতকুয়াকে reserve বা পানার্থ জল-সংগ্রহের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখা উচিত। সকলেই সেই reseverd tank বা well (অর্থাৎ মাত্র পানীয় জল সরবরাহের জন্য স্বতন্ত্রীকৃত কূপ বা পুকুর) হইতে ভিন্ন অপর কোথাও হইতে জল লইতে পারিবে না।

সকলেরই খুব ভাল করিয়া স্মরণ রাখা উচিত এই কথাগুলি ঃ—

(ক) ঘোলা জলকে ছাঁকিয়া, থিতাইয়া, ফটকিরি মিশাইয়া নির্ঝালী ঘষিয়া বা কলসীর অপর সাধারণ ফিল্টারের সাহায্যে পরিষ্কার করা যায় মাত্র—সে জল পান-করা কথনো নিরাপদ নয়।

(খ) দেখিতে যতই পরিষ্কার হউক না কেন; পান করিতে যতই সুস্বাদু হউক না কেন, এবং গন্ধের-লেশ কিছু না থাকিলেও কোনও জলকে "নিরাপদ" বলা যায় না।

(গ) জলে যে "অদৃশ্য" রোগ-জীবাণু ও মলমূত্রের কণা (organic impurities) থাকে, সেইগুলিই মারাত্মক জিনিষ—তাহা হইতেই রোগের সৃষ্টি হয়।

(ঘ) একমাত্র ফুটান জলই রোগ-জীবাণু-শূন্য ও নিরাপদ। অতএব পল্লীগ্রামবাসীরা কি কি করিবেন তাহা একত্র করিয়া বলিলাম ঃ—

(ক) যে যে পাত্রে করিয়া জল সংগ্রহ করিবেন, ও যে পাত্রে জল ধরিয়া রাখিবেন, সেগুলি সর্ব্ববিধায় পরিষ্কার "হওয়া" চাই। তাহাদের ভিতরটা বিশেষ করিয়া পরিষ্কার "রাখা" আবশ্যক। মৃৎপাত্রকে মাঝে মাঝে বদলাইতে হয়, অথবা পোড়াইয়া লইতে হয়; প্রত্যেক জল-পাত্রের জন্য আলাদা সরা থাকা চাই এবং কখনো পাত্রের সরাটিকে মাটিতে রাখিতে নাই—যদি একান্তই ঐরূপ করার প্রয়োজন হয়, তাহাকে উপুড় করিয়াই রাখিতে হয়।

(খ) "স্বতন্ত্রীকৃত" পুকুর বা কূপ হইতে জল আনিয়া, তাহাকে থিতাইয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত। জলে প্রত্যহ ফটকিরি না দেওয়াই ভাল; কারণ, ফটকিরি-গোলা জল ক্রমাগত পান করিলে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হয়।

(গ) জলকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া তাহাকে ফুটাইতে হয়—অন্ততঃ বিশ মিনিট ধরিয়া ফুটাইতে হয়। ফুটাইলে জলের সকল দোষ নষ্ট হয়। এইজন্য, একমাত্র ফুটান জল পান করা নিরাপদ। "ফুটান" বলিলে, অন্তত: বিশ মিনিটকাল ধরিয়া ফুটান বুঝায়। এবং "পান" করিবার জল বলিলে, রন্ধনার্থ জলকেও বুঝায়।

(ঘ) জলকে ফুটাইলে তাহা হইতে কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাস নামক (carbon dioxide) যে বাষ্প থাকে, তাহা উপিয়া যায়। ঐ গ্যাসটি জলে থাকার ফলে জল "সুস্বাদু" হয়; আর ঐ গ্যাসটি উবিয়া যাওয়ায়, জলের "বোদা" স্বাদ হয়। এইজন্য ফুটান জল,

ঠাণ্ডা হইলে, উপর হইতে অপর পরিষ্কার পাত্রে দু-চারবার ঢালা-ঢালি করিলেই, জলে ঐ গ্যাস আবার প্রবেশ করিয়া জলকে সুস্বাদু করে।

(ঙ) জলে কখনো আঙ্গুল ডুবাইয়া দেখিতে নাই যে, সে জল ঠাণ্ডা কি গরম। আবশ্যক হইলে, হাতে ঢালিয়া দেখা ভাল। জলের ভিতর ভাঁড়, ঘটি প্রভৃতি ডুবাইতে নাই। জলের পাত্রের সরা, ভাঁড় প্রভৃতিকে কখনো মাটিতে চিৎ করিয়া রাখিতে নাই। যে-সে ন্যাতা দিয়া জলপাত্র, ভাঁড়, সরা প্রভৃতিকে মুছিতে নাই। এঁটো গ্লাস কুঁজোর মুখে রাখিতে নাই বা পীতাবশিষ্ট জলকে কুঁজোর মধ্যে ঢালিতে নাই।

স্বাস্থ্য, ফাল্গুন ১৩৩০ শ্রীরমেশচন্দ্র রায়।

গৃহ ও স্ত্রী-শিল্প

শিল্পের প্রয়োজনীয়তা কি, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন, আজকাল কলিকাতায়, প্রায় অধিকাংশ ভদ্রলোক ৩০।৪০ টাকা মাসিক বেতনে আফিসে চাকরি করেন। তাঁহাদের বাটীভাড়া, ছেলের দুধ প্রভৃতিতে মাসিক বেতনের অধিক খরচ পড়ে; সেক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে প্রায়ই কাবুলিওয়ালার শরণাপন্ন হইতে হয়। এ ক্ষেত্রে গৃহশিল্পের প্রয়োজনীয়তা আছে। ধরুন, বাটীতে স্ত্রী বা অন্যান্য স্ত্রীলোক যদি তাঁহাদের অবসর-মত, পরনিন্দার সহিত কোন কাজ করেন, তাহা হইলে সংসারের কত উপকার হয়। সেই কাজটা কি?

আমাদের মতে চরকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়

অনেক বিদ্যালয়ে জামা, রুমাল, সেমিজ, লেস প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেন, ইহাও ভাল; কিন্তু যে দেশের লোকের অধিকাংশই পেটে খাইতে পায় না, সেই দেশের লোকের আবার রুমাল সেমিজ কেন? তবে যদি বলেন যে দেশ বিলাতী হইয়া গিয়াছে, রুমাল সেমিজেরই বেশী দরকার; তবে অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ রাখিবেন আমি যে শিল্পের কথা বলিতেছি, তাহা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জন্য; প্রজার রক্তমণ্ডিত, ধনকুবের জমিদার গৃহিণীদিগের জন্য নয়, যদিও তাঁহাদের শিক্ষা করা দরকার, কেননা কাল-গতি চক্রশীল।

চরকার উপকারিতা—চরকার প্রধান ও বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহা দ্বিপ্রহরের মহিলা-মজলিসে, তাস প্রভৃতি খেলিতে খেলিতেও সূতা কাটা যায়, এবং ইহা এতই স্বল্প ক্লেশদায়ক যে বালক-বালিকারা অক্লেশে ইহার দ্বারা সূতা কাটিতে পারে। পূর্ব্বে যে জমিদার-গৃহিণীদের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদেরও চরকা চালান উচিত, কেননা তাঁহাদিগকে কোন কাজ করিতে হয় না, ইহাতে তাঁহাদের শরীর বাতের আশ্রয়-স্থল হইতে পারে, চরকা চালাইলে অনেকটা ব্যায়ামের কার্য্য হয়। বিশেষতঃ নিজের পতি-পুত্রকে স্বহস্ত-নির্ম্মিত বিশুদ্ধ কাপড় পরাইতে সাধ কার না হয়! তাঁহাদিগকে সংসারের সাহায্য নিমিত্ত চরকা চালাইতে বলিতেছি না, কিন্তু তাঁহারা যদি সংসারের কাপড়ের উপযুক্ত সূতা নিজে প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে সংসারের একটা আয় বাঁচিয়া যায়, (যদিও সেটা তাঁহাদের নিকট বেশী কিছুই নয়; কিন্তু একটী দরিদ্র পরিবারকে সেইটা সাহায্য করিয়া, ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করা সেটা কিছু কম নয়: আর হৃদয়ে বিমল আনন্দ, সেটা কি কিছুই নয়?)

দরিদ্র পরিবার ঐ চরকার সূতা দ্বারা নিজেদের ভরণ-পোষণ সংস্থান করিতে পারেন। এটা এমন একটা জিনিষ যে প্রতি গৃহে বালক-বালিকাদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য। চরকার দ্বারা দেশের উন্নতি করুন।

বালিকা, বিশেষ সংখ্যা

স্কন্দোপাখ্যান

স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয় আমাদের একজন পৌরাণিক দেবতা। মহাভারতে বনপর্ব্বে ইঁহার যেরূপ জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, আখ্যানভাগের সহিত নক্ষত্রবিশেষের যথেষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং মনে হয়, নক্ষত্রাদি বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করাই এই আখ্যান রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বিবিধ পুরাণে স্কন্দের জন্ম-বৃত্তান্ত বিভিন্নাকারে বর্ণিত হইলেও মূল আখ্যানভাগ সর্ব্বত্র প্রায় একই। তেজোময় স্কন্দরেতঃ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উঁহার নাম স্কন্দ। ইঁহার ছয় মস্তক, দ্বাদশ চক্ষু, দ্বাদশ কর্ণ, দ্বাদশ হস্ত, এক গ্রীবা ও এক জঠর। প্রতিপদ তিথিতে বহ্নিতেজ কাঞ্চন-কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়াতে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুব্যক্ত, তৃতীয়াতে সুস্পষ্ট শিশুর ন্যায় প্রতীত, চতুর্থীতে ইঁহার সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হইয়া উঠে, পঞ্চমীতে দক্ষ-কন্যা দেবসেনার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়, এবং ষষ্ঠীতে ইনি মাতৃগণ-সমভিব্যাহারে জগৎ পূজিত হন।

স্কন্দের অপর নাম কার্ত্তিকেয়। কৃত্তিকা নক্ষত্র কর্ত্তৃক পালিত বলিয়াই তাঁহার এই কার্ত্তিকেয় নামকরণ করা হইয়াছে। আমরা কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছয়টি উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাই। এই ছয়টি উজ্জ্বল তারা ছয় ঋষিপত্নী; এবং এই ছয় ঋষি-পত্নী কর্ত্তৃক পালিত বলিয়াই স্কন্দের ছয় মস্তক; এবং তিনি ষড়ানন নামে অভিহিত।

দেবরাজ ইন্দ্র স্কন্দকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই উপাখ্যানটি যে জ্যোতিষ-তত্ত্ব লইয়া রচিত তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

"অনন্তর কার্ত্তিকেয় দেবরাজকে বিমর্ষ দেখিয়া কহিতে লাগিলেন,—'সুররাজ! কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।' ইন্দ্র কহিলেন,—'হে মহাত্মন! রোহিণীর কনিষ্ঠা ভগিনী অভিজিৎ স্পর্দ্ধা করিয়া জ্যেষ্ঠা

হইবার বাসনায় তপোনুষ্ঠান করিতে বন গমন করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমি নক্ষত্র সংখ্যা-পূরণে অসমর্থ হইয়াছি, অতএব এক্ষণে তুমি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া গগনচ্যুত অভিজিতের পরিবর্ত্তে অন্য নক্ষত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় চিন্তা কর।' স্কন্দ ইন্দ্র কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে, তিনি ধনিষ্ঠাদি কালের কল্পনা করিলেন। সেই কালই পূর্ব্বে রোহিণী নক্ষত্রে হইয়াছিল। এদিকে কৃত্তিকাগণ ইন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নক্ষত্র-সংখ্যা পূরণ করিবার নিমিত্ত স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহারা ছয় জন গারুড়ীর সহিত মিলিত হইয়া সপ্তশীর্ষাভ নক্ষত্ররূপে দীপ্তি পাইতেছেন।"

সর্ব্বপ্রথমে নভোমণ্ডলে ২৮টি নক্ষত্র পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। পরে যখন দেখা যায় যে, অভিজিৎ নক্ষত্র, নক্ষত্র-চক্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত, তখন ইহাকে নক্ষত্র তালিকার মধ্যে পরিগণনা না করিয়া, সর্ব্বসমেত ২৭টি নক্ষত্র লইয়া নক্ষত্র-চক্র গঠন করা হয়। এই কারণেই বোধ হয় এই আখ্যানে অভিজিতের বনগমন পরিকল্পনা করা হইয়াছে। যে সময়ের ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই আখ্যান রচনা করা হইয়াছে, সেই সময়ের পূর্ব্বে বিষুবন্ রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থান করিত, অর্থাৎ রোহিণী নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থান-কালীন দিবা ও রাত্রি সমান হইত। প্রকৃতির এই যে, বিষুব বিন্দু ৬৬⅔ বৎসর অন্তর (ইংরাজি মতে ৭১·২ বৎসর অন্তর) এক অংশ করিয়া পশ্চাতে সরিয়া আসিতেছে। কালক্রমে যখন বিষুবন্ রোহিণী নক্ষত্র হইতে পিছাইয়া আসিয়া কৃত্তিকা নক্ষত্রে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ কৃত্তিকা নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থান-কালীন দিবা ও রাত্রি সমান হইতে থাকে, তখন বৎসরাদি গণনার পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তনটাকেই রূপক ছলে বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়েই বোধ হয় এই স্কন্দোপাখ্যান রচিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মহাভারতের উক্তিতে বলা হইয়াছে, 'স্কন্দ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে তিনি ধনিষ্ঠাদি কালের কল্পনা করিলেন।' কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের দূরতা প্রায় ৯০° অংশ, অর্থাৎ কৃত্তিকা নক্ষত্রে বিষুব সংক্রমণ হইলে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে উত্তরায়ণ হইয়া থাকে। অধুনা আমাদের বিষুব-সংক্রান্তি) হইতে বৎসর গণনা করা হইলেও, পূর্ব্বে উত্তরায়ণ হইতে বৎসর গণনা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল যে সময়ে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বিষুবন্ পিছাইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ের-উত্তরায়ণ অর্থাৎ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ করা হইয়াছিল। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে ধনিষ্ঠা হইতে বৎসর গণনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভূত, এবং সেই জন্যই পুরাণে ব্রহ্মা ধনিষ্ঠাদি কালের কল্পনা করিলেন বলিয়া উল্লিখিত।

তাহার পর এই আখ্যান-প্রসঙ্গে মহাভারতে কথিত আছে;—"দেবরাজ ইন্দ্র স্কন্দের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন এই বিদীর্ণ পার্শ্বদেশ হইতে দিব্য সুবর্ণ কুণ্ডল ও শক্তিধারী এক যুবা-পুরুষ নির্গত হইলেন। বজ্র প্রহার দ্বারা নির্গত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম বিশাখ হইল। আমরা দেখিতে পাই, কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রায় ১৮০ অংশ দূরে অর্থাৎ সম ক্রান্তিপাতে বিশাখা নক্ষত্র অবস্থিত। কৃত্তিকা নক্ষত্রে যদি বিষুব সংক্রমণ হয়, তাহা হইতে বিশাখা নক্ষত্রেও অপর বিষুব সংক্রমণ হইয়া থাকে। এই হিসাবে কৃত্তিকার সহিত বিশাখার সম্বন্ধ আছে; কিন্তু পুরাণে ইহাকে কৃত্তিকা হইতে সঞ্জাত বলিবার উদ্দেশ্য কি? পূর্ব্বকালে গ্রহনক্ষত্রাদি লক্ষ্য করিবার জন্য এখনকার মত যন্ত্রাদি ছিল না। সূর্য্য যখন যে নক্ষত্রে অবস্থান করেন, সূর্য্যালোকে সে নক্ষত্র নয়নগোচর হয় না; কাজেই আর্য্যঋষিগণ সূর্য্যাস্তের সময় উদয়গামী নক্ষত্র হইতে হিসাব করিয়া সূর্য্য কোন নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছেন তাহা নির্ণয় করিতেন। যেদিন দিবা ও রাত্রি সমান হইত, সেই দিন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বগগনে বিশাখা নক্ষত্র উদিত হইতে দেখিয়া, ঋষিগণ স্থির করিতেন, সূর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছেন; অপর পক্ষে সূর্য্যাস্তের সময় পূর্ব্বগগনে কৃত্তিকাকে উদিত হইতে দেখিয়া জানিতে পারিতেন সূর্য্য বিশাখা নক্ষত্রে অবস্থিত। এই কারণেই বোধ হয়, বিশাখ বা বিশাখা নক্ষত্র স্কন্দ বা কৃত্তিকা হইতে সঞ্জাত বলা হইয়াছে। একদিকে পুরাণে বিশাখ কার্ত্তিকেয় হইতে সঞ্জাত, অপর দিকে নভোমণ্ডলে কৃত্তিকা ও বিশাখা সমক্রান্তিপাতে অবস্থিত, ইহা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না।

বাসব বা ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে সূর্য্য ও চন্দ্র যখন একত্র অবস্থান করেন, তখন আদি যুগ, মাঘ মাস, তপঃ ঋতু, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে পূর্ণিমান্ত মাস ও রোহিণী নক্ষত্রে বিষুব সংক্রমণ অনুসারে বৎসর গণনা করিবার রীতি ছিল; পরে এই রীতি যখন পরিবর্ত্তিত হইয়া অমান্ত মাস ও কৃত্তিকায় বিষুব সংক্রমণ অনুসারে বৎসর গণনা করিবার প্রথা প্রচলিত হইল, তখন সূর্য্যের বিষুব সংক্রমণ কালীন অমাবস্যা দিনের একটা বিশেষত্ব ঘটিল। এই বিশেষত্বটাকেই বোধ হয় স্কন্দোপাখ্যানে রূপক ছলে বর্ণিত হইয়াছে। দেবসেনা প্রজাপতি দক্ষের কন্যা। পুরাণে ২৭টি নক্ষত্রকেই প্রজাপতির কন্যা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং মনে হয়, এই ২৭টি নক্ষত্রই আমাদের আখ্যানের দেবসেনা। অমাবস্যার দিন সূর্য্যের বিষুব সংক্রমণ অনুসারে স্কন্দ বা কৃত্তিকা নক্ষত্র অমাবস্যার দিন উৎপন্ন এবং ইনি নক্ষত্র-চক্রের আদি নক্ষত্র বলিয়া পরিগণিত। এই কারণেই ইনি নক্ষত্র মণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দেবসেনাপতি। মহাভারতে কথিত আছে;—"ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে ষষ্ঠী, সুখপ্রদা লক্ষ্মী, সিনীবালী, অপরাজিতা, ও কুহু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই দেবসেনা স্কন্দের মহিষী হইলেন। * * * ভগবান কার্ত্তিকেয় পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এইজন্য ঐ তিথি শ্রীপঞ্চমী এবং ষষ্ঠীতে তাঁহার প্রয়োজন সকল সুসম্পন্ন

হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ষষ্ঠী মহাতিথি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।"—(মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ) এখানেও দেখা যাইতেছে যে, কৃত্তিকায় বিষুব সংক্রমণ অনুসারে ধনিষ্ঠাদি কালের অর্থাৎ উত্তরায়নের পঞ্চমীই আমাদের শ্রীপঞ্চমী পুরাণ অনুসারে দেবসেনা কার্ত্তিকেয়ের মহিষী, জ্যোতিষ অনুসারেও কৃত্তিকা নক্ষত্র-চক্রের আদি নক্ষত্র; অথচ কেহ কেহ দেবসেনাপতি শব্দের দেবগণের সেনাপতি অর্থ করিয়া কার্ত্তিকেয়কে কেন যে অবিবাহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, বুঝিলাম না। মনে হয়, কার্ত্তিকেয়ের কুমার নামকরণ দেখিয়াই এরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে অগ্নিপুত্রের নাম কুমার; কার্ত্তিকেয় অগ্নিপুত্র, এবং সেই জন্যই ইঁহার নাম কুমার;—অবিবাহিত বলিয়া ইঁহার নাম কুমার নয়। কার্ত্তিকেয়-মহিষী দেবসেনা অধুনা ষষ্ঠীদেবী নামে খ্যাতা এবং ষষ্ঠী মহাতিথিতে পূজিতা।

যদি চন্দ্র ও সূর্য্যের সঙ্গমের স্কন্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে অগ্নিও স্বাহা, ও অন্যান্য পুরাণে রুদ্র ও রুদ্রাণী, হরও পার্ব্বতী প্রভৃতির কথা কোথা হইতে আসিল? মহাভারত বলা হইয়াছে, হুতাশন সূর্য্য-মণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বশিষ্ঠাদির যজ্ঞে আগমন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই আখ্যানে বহ্নি সূর্য্যতেজ হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ সূর্য্য বহ্নি একই। যাস্ক ও শায়ন বলেন, রুদ্র অগ্নির নামান্তর। পৌরাণিক হর, শিব, মহাদেব প্রভৃতি রুদ্ররই অপর নাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই আখ্যানের হর, শিব, রুদ্র, অগ্নি ও সূর্য্যতেজ একই। রুদ্র ও অগ্নি যে একই তাহা মহাভারতে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। মহাভারতে কথিত আছে,—"সন্তানার্থী ও পুত্রবান ব্যক্তি সকল প্রদোষ সময়ে অগ্নিরূপ রুদ্র ও স্বাহারূপ উমাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। * * * ব্রাহ্মণগণ অগ্নিকে রুদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এই রুদ্ররূপ অনল কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট শুক্রে শ্বেত পর্ব্বতে কৃত্তিকাগণের প্রযত্নে স্কন্দদেব জন্মগ্রহণ করেন, এইজন্য ইনি রুদ্রপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন।" [মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ]

পুরাণ-বিশেষে শরবনের পরিবর্ত্তে গঙ্গাগর্ভে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, কৃত্তিকা নক্ষত্রের উপরেই ছায়াপথ (Milky way); ইহাই পুরাণ-বর্ণিত স্কন্দের জন্মস্থান শরবন বা স্বর্গগঙ্গা। আর্দ্রার অধিপতি রুদ্র; এই আর্দ্রা নক্ষত্রও ছায়াপথের ঠিক নিম্নে কৃত্তিকার অনতিদূরে অবস্থিত। এই সকল কারণে মনে হয়, স্কন্দই আমাদের কৃত্তিকা নক্ষত্র। মহাভারতে স্কন্দের স্তোত্রে বলা হইয়াছে,—'তুমিই সম্বৎসর, তুমিই ছয় ঋতু, তুমিই মাস, অর্দ্ধমাস ও অয়ন।" কৃত্তিকায় বিষুব সংক্রমণ অবলম্বন করিয়া যদি এই স্কন্দোপাখ্যান না রচিত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে, স্কন্দের স্তোত্র এ সকল কথা কোথা হইতে আসিল?

অর্চ্চনা, মাঘ ১৩৩০　　শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মুঘল শাহ্‌জাদার শিক্ষা

আদাব-ই-আলমগিরী নামক ফার্সী হস্তলিপিতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের অনেক চিঠি সংগৃহীত আছে। এই সকল চিঠি পাঠে সপ্তদশ শতাব্দীর ভদ্রতা ও শীলতাজ্ঞান এবং মুঘল শাহ্‌জাদাগণ কিরূপভাবে শিক্ষিত হইতেন তাহার অনেক খবর জানা যায়। ১৬৫৪ খৃঃ অক্টোবর মাসে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর পুত্র মুহম্মদ সুলতানের বয়স তখন পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। আওরঙ্গজেবের পুত্র তখন সম্রাট শাহ্‌জহান সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য আজমীরের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়াছিলেন। যাহাতে পুত্র সম্রাটের কাছে সুনাম অর্জ্জন করিতে পারে সে জন্য আওরঙ্গজেব উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন; পুত্রের জন্য পিতার এরূপ ঔৎসুক্যও স্বাভাবিক। শাহাজাদার প্রত্যেক কাজ বিশেষরূপে বলিয়া পাঠান হইয়াছিল এবং প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক ঘণ্টার কাজে একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যথা:—

বাড়ীতে কিম্বা কুচের সময় যে সময়ই হোক না কেন সূর্য্যোদয়ের ৭২ মিঃ পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিবে। স্নান ও প্রসাধনের নিমিত্ত ৪৮ মিঃর অধিক সময় ব্যয় করিবে না। স্নান প্রসাধন সারিয়া সকালের ফজর নমাজে যোগদান করিবে। নমাজের শ্লোক আওড়াইয়া কুরাণের একটী অধ্যায় প্রত্যহ পড়িবে। যদি কুচের অবস্থায় থাক তবে ৬৮ মিঃ পরে অশ্বারোহণে যাত্রা করিবে। যদি পথে শীকার করিতে ইচ্ছা হয় তবে সাবধান হইবে, যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়েই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পার। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া যদি ইচ্ছা হয় কিংবা সময় পাও তবে আরবী ভাষায় কিছু পাঠ করিবে। তারপর বিশ্রাম লইবে। দুপুরের ২৪শ মিঃ পরে "তোমার শিবির হইতে বাহির হইয়া জোহর নমাজে উপস্থিত সকলের সঙ্গে করিবে। তারপর আহার করিয়া দিবানিদ্রা উপভোগ করিবে সূর্য্যাস্তের ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে উঠিয়া আসর নমাজ পড়িবে। যদি আহার করিয়াই শরীরের সমস্ত গ্লানি দূর হয় তবে আর নিদ্রা যাইও না। সেই সময়টা হাতের লেখা ভাল করা, চিঠি পত্রাদি লিখিতে অভ্যাস করা, এবং ফারসী গদ্য পদ্য পাঠ করিও। আসর নমাজের পর কিছুক্ষণ আরবী পাঠ করিও। তার পর সূর্য্যাস্তের ২৪শ মিঃ পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত মণ্ডলী (select audience) লইয়া ৫৮ মিঃ রাত্রি পর্য্যন্ত এই দরবারে থাকিবে। তারপর নিজ গৃহে ফিরিয়া কুরাণের এক অধ্যায় পড়িবে। রাত্রি ৯টার সময় শুইতে যাইবে।

কুচের পূর্ব্বে সেদিন বিশ্রামের দিন হয় তবে যে সব কাজ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সেই সব কাজ করিবে। অশ্বারোহণের পরিবর্ত্তে ৪৮ মিঃ ধরিয়া তীর ছোড়া ও বন্দুকের গুলি দ্বারা লক্ষ্যভেদ করা অভ্যাস করিবে। সূর্য্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ৪৮ মিঃ পরে দরবার বসাইবে। দরবার-কাল ৪৮ মিঃ বা কাজের কম বেশী সময় হইবে। যদি কোন বিশেষ প্রয়োজনীয়

কাজ থাকে তবে বিশ্বস্ত প্রধান কর্ম্মচারীদের লইয়া ঘণ্টা খানিক একটী গুপ্ত বৈঠক বসাইবে। এইরূপ কোন কাজ না থাকিলে এই চার ঘড়ী সময় আরবী পাঠে ব্যয় করিবে।

কুচের দিনে কুরাণের দুই অধ্যায় ও বিশ্রামের দিনে তিন অধ্যায় পাঠ করিবে। যদি দূর পথ হয় তবে ফজরা নমাজের পরই অশ্বারোহণে যাত্রা করিবে। পথেই আহার করিবে। তাহা সম্ভব না হইলে আহার শেষ করিয়া যাত্রা করিবে। সকালের আধ আলো আধ আঁধার অথবা ৯টার পর কখনও কোথাও যাত্রা করিবে না। পথে শীকারের ইচ্ছা হইলে সৈন্যদলকে সব চেয়ে সোজা পথে প্রধান বখ্শীর অধীনে গন্তব্যপথে প্রেরণ করিবে। কএকজন অনুচরকে সঙ্গে লইয়া শীকারে যাইবে।

ভারতবর্ষে মুঘল রাজত্ব সামরিক শক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিংহাসনের স্থায়িত্ব সৈন্যদলের ও শাহজাদাগণের রণপাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করিত। সুতরাং আওরঙ্গজেবে পুত্রকে এ সম্বন্ধে উপদেশ দেন যে "অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া থাকিতে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইও। শীকারের সময়ের পরিশ্রমজনিত ঘাম না শুকাইবার আগে পোষাক পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিও না বা শুইতে যাইও না। এইরূপ না করিলে অসুখ করিবে।" সৈন্যদের দৃঢ় নিয়মানুবর্ত্তিতা বজায় রাখা বিশেষ দরকার এবং প্রত্যেকে যাহাতে স্ব স্ব স্থানে ঠিক থাকে সে দিকেও নজর দিতে হইবে। এই সম্বন্ধে আওরঙ্গজেবের আদেশ ছিল এই যে :—

কুচের সময় আমার কর্ম্মচারীগণের মধ্যে মুহম্মদ তাহির (শাহজাদার অভিভাবক) ভিন্ন এবং সম্রাটের কর্ম্মচারীগণের মধ্যে দু'হাজারী মনসবদারগণের নিম্নপদস্থ কাহাকেও অশ্বপৃষ্ঠে সৈন্যগণের পুরোভাগে অগ্রসর হইতে দিবে না। নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীরা শাহজাদার ডানে বাঁয়ে থাকিবে ; তাহাদের সঙ্গে দুজনের অধিক খানসামা থাকিবে না।" শাহজাদাকে এ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আদেশ দেওয়া ছিল "কারণ ছোটলোকদের সামনে ভীড় করিতে দিলে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইতে পারে।

সৈন্যাধ্যক্ষগণের সৈন্যদের সঙ্গে কখনও অধিক মাত্রায় মেলামেশা করা উচিত নয়। ফলে তাহারা হুকুম গ্রাহ্য করিতে চায় না। সব সময়েই কুচকালীন কিংবা দরবারের সময় যা বলা দরকার তার বেশী কথা বলিবে না, যাদের সঙ্গে তোমার কথা বলা শোভা পায় না কৌশল করিয়া ভদ্রভাবে তাহাদের সহিত বাক্যালাপ এড়াইয়া চলিবে। এইরূপ করিলে তাহারা ভয় ও ভক্তি করিবে। এই সঙ্গে একটী নক্শা পাঠান হইল। তাহা হইতে বুঝিবে আম ও খাস দরবারের সময় কিভাবে আমীর-ওমরাহগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বসাইতে হইবে।"

শাহজাদা সুলতান শীকার খুব পছন্দ করিতেন। পড়াশুনায় তাঁহার মনোযোগ ছিল না। সেই জন্য পিতা দুঃখিত চিত্তে লিখিতেছেন,—আজ আমার দুঃখ হইতেছে এ কথা ভাবিয়া যে অত অল্প বয়সে আমি উহাকে সঙ্গে করিয়া শীকারে লইয়া কি অন্যায় করিয়াছি। শীকারের আমোদ একবার পাইয়া বসিলে লেখাপড়া আর ভাল লাগে না। ইহার হইয়াছেও তাই।

মুঘল সরকারের অধীনে বহু তুর্কী সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল। সেইজন্য মুঘল শাহজাদাগণের তুর্কীভাষা শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। মুহম্মদ সুলতান তুর্কী ভাষার উপর বিশেষ বিরূপ ছিলেন। উত্তর ভারতে গমনকালে নিজের তুর্কী শিক্ষককে ফেলিয়া রাখিয়া যাওয়ার জন্য তিরস্কৃত হইতে হইয়াছিল। তিরস্কারের উত্তরে শাহজাদা জানান যে, শিক্ষকমহাশয় অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, দীর্ঘ পথ ভ্রমণের ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহাকে রাখিয়া আসা হইয়াছে। আওরঙ্গজেবের রাগান্বিত হইয়া ইহার উত্তর দেন যে, আওরঙ্গাবাদে ঘরে থাকার সময় শাহজাদা শিক্ষককে তেমন আমল দেন নাই। শিক্ষক মহাশয় এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বহু অর্থ অনর্থক মাহিয়ানা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তুমি তাঁর কাছে পড়ায় মনোযোগ দাও নাই ; এর পর শাহজাদার উপর হুকুম হয় শিক্ষককে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতে এবং তাঁহার সহিত তুর্কীভাষায় কথা কহিতে। রাগান্বিত পিতা লেখেন, "রাজা বা ভদ্রলোকের গুণাবলীতে ভূষিত হইতে তুমি চাও না। তাতে আমার কিইবা আসে যায়? তোমার বয়স হইয়াছে, তুমি নিজেই এখন সব ভালমন্দ বুঝিতে পার।"

শাহজাদাকে রীতিমত উপদেশ দেওয়া ছিল নির্ব্বাচিত মণ্ডলীতে কাহাকে আসিতে দেওয়া হইবে, দরবারে মনসবদারদের কি পর্য্যায়ে বসিতে দেওয়া হইবে, কাহার সঙ্গে কথা কহিতে হইবে, কাহার সঙ্গে নয়। পোষাক সম্বন্ধেও উপদেশ দেওয়া ছিল। "তোমার পিতা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন যে, তুমি এক রকম খালি গায় —কেবল মাত্র ওয়েষ্ট কোট ও পায়জামা পরিয়া—নমাজে যাও। একটা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুমি তোমার পিতার সঙ্গে অনেক দিন বাস করিয়া তাঁহার আচার ব্যবহার ও স্বভাব লক্ষ্য করিয়াও সেরূপভাবে চলিতে পার না।

কথাবার্ত্তার ধরণের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত। সময় ও সুযোগ মত 'অকবরনামা' পড়িবে, তাহা হইলে তোমার লেখার ও কথার ভাষা সুন্দর ও শুদ্ধ হইবে। তুমি যে পর্য্যন্ত কোন কথা কোথায় প্রযুজ্য হইয়াছে এবং তাহার প্রকৃত অর্থ কি তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পার, সে পর্য্যন্ত সেই সব কথা চিঠিপত্রাদিতে কিম্বা আলাপে কোথাও প্রয়োগ করিবে না। যা বলিবে বা লিখিবে তাহা বেশ করিয়া ভাবিয়া বলিও ও লিখিও।"

এই উপদেশের ফলে একটা বড় হাস্যকর ঘটনা ঘটিয়াছিল।

'আকবরনামার' লিখনপদ্ধতি জড়িত, পাণ্ডিত্য ও বাক্যালঙ্কারে পূর্ণ ও সফেন। সেইজন্য ইহা পাঠকদেরও ভাল লাগে না ও সমালোচকদের তীব্র সমালোচনার কারণ হয়। ১৪ বৎসর বয়সের একজন বালকের লিখন-পদ্ধতির ইহা আদর্শ হইতে পারে না। মুহম্মদ সুলতান এই শেষোক্ত উপদেশের ফলে পিতাকে যে চিঠি লেখেন তাহা পড়িয়া আওরঙ্গজেব অবাক হইয়া যান। আবুল ফজলের মুশাবিদানুযায়ী আকবর প্রজাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন কুমার সুলতান নিজ পিতাকে হুবহু তাহাই লিখিয়া পাঠান! চিঠির মাথায় প্রচলিত "বিশমুল্লা" লিখিয়া আকবরের প্রথানুযায়ী "জিল্ল-ই-জালালুহু" লেখা হইয়াছিল এবং যে সকল রাজকীয় শব্দ ও সম্বোধন ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহাও এ স্থলে ব্যবহৃত হয়। যদিও পুত্র পিতাকে এ পত্র লিখিতেছেন! ইহাতে অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া আওরঙ্গজেব পুত্রকে লেখেন, "আমি তোমাকে আবুল ফজল লিখিত 'আকবরনামা' পড়িতে বলিয়াছি এই উদ্দেশ্যে যে ইহার লিখনপদ্ধতি অনুকরণ করিবে। আবুল ফজল বিধর্ম্মীদের অনেক প্রথা ধর্ম্মে ঢুকাইয়া পবিত্র মুস্লিমধর্ম্মকে নষ্ট করিয়াছে। আমি তোমাকে তোমার ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবুল ফজলের ধর্ম্মবিশ্বাস গ্রহণ করিতে বলি নাই। তুমি তোমার চিঠিখানায় সম্রাটের চিঠি (নিশান-ই-ওয়ালা) ও তোমার মোহরকে সম্রাটের মোহর (মোহর-ই-খাস) বলিয়া বর্ণনা লইয়াছ তাহাই যদি হয় তবে সম্রাটের চিঠি ও মোহরের কি নামকরণ করিবে?"

প্রভাতী, মাঘ ১৩৩০।　　　　শ্রীযদুনাথ সরকার।

সমালোচনা

জলধর-গ্রন্থাবলী।—প্রথম খণ্ড। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর প্রণীত। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। জলধর বাবু বাংলা-সাহিত্যের একজন পাকা ওস্তাদ লিখিয়ে; তাঁর রচনা বাঙালী পাঠক-পাঠিকা সাগ্রহে পাঠ করেন; এবং তাঁর জনপ্রিয়তারও নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। এই জনপ্রিয় প্রবীণ লেখকের গ্রন্থরাশি সুলভে প্রকাশের চেষ্টা সকলেই সানন্দে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন, সন্দেহ নাই। এ গ্রন্থাবলীর বিশেষত্ব এই যে এর আকার বেশ সুশোভন,—দুর্ব্বহ বা বেঢপ নয়। কাগজ ভালো, ঘুড়ির কাগজে ছাপা নয়,—ছাপা পরিষ্কার; অথচ মূল্য অত্যন্ত সুলভ। এই খণ্ডে নিম্নলিখিত বইগুলি আছে,—হিমাদ্রি, ভ্রমণ-কাহিনী; পাগল,-উপন্যাস; প্রবাস-চিত্র ভ্রমণ কাহিনী; চোখের জল-উপন্যাস; পুরাতন পঞ্জিকা—গল্পগুচ্ছ; করিম সেখ-উপন্যাস; আশীর্ব্বাদ-উপন্যাস। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬২৪। প্রকাশক মহাশয় আশা দিয়াছেন, বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণ এই গ্রন্থাবলী সাদরে গ্রহণ করিলে "জলধর বাবুর গ্রন্থাবলীর অন্যান্য খণ্ড এবং অপর সুলেখকগণের গ্রন্থাবলী প্রকাশের আয়োজন' করিবেন। বিলাতে ও আমেরিকায় জনপ্রিয় সুলেখকগণের গ্রন্থের নানা মূল্যের নানা সংস্করণ বাহির হয়—এ দেশে এ চেষ্টা এই প্রথম। আমাদের আশা আছে, এই গ্রন্থাবলী পাঠক-পাঠিকার সাদর অভিনন্দন-লাভে বঞ্চিত হইবে না। যাঁরা শুধু ভার দেখিয়াও বই কেনেন, তাঁদের তো পোয়া বারো! ৬২৪ পৃষ্ঠার প্রকাণ্ড বই দুই টাকা মূল্যে পাওয়া—এ যে দুরাশার বস্তু ছিল!

মাছ ব্যাঙ সাপ।—শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। কলিকাতা, আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। সরল ভাবে সহজ বিজ্ঞানের বই লিখিতে জগদানন্দ বাবুর আর জোড়া নাই। এই ... শুধু মাছ, ব্যাঙ, সাপ নয়, টিকটিকি, গিরগিটি, কচ্ছপ, কুমীর প্রভৃতি ... এমন পরিপূর্ণ পরিচয় তিনি দিয়াছেন, যে বইখানি হাতে লইয়া ... এক নিশ্বাসে শেষ না করিয়া উপায় নাই। বর্ণনার মধ্যে ... সুশৃঙ্খলা ও পারম্পর্য্য বজায় আছে—আর লেখার গুণে ... বইখানি সরস ও উপাদেয় হইয়াছে। ছেলেমেয়েরা এ বই ... ও শিক্ষা তো প্রচুর পাইবেই; তাদের অভিভাবকেরাও ... জানিতে পারিবেন যে, তার আর সীমা নাই। গ্রন্থে ... ছবি আছে এবং ছাপা বাঁধাই কাগজ এত চমৎকার যে এ গ্রন্থ স্কুলে প্রাইজ দিবার যোগ্য,—সব দিক দিয়াই।

শক্তি-লীলা।—পৌরাণিক নাটক। ৺ গুণময় গঙ্গো... প্রণীত। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সা... গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, বেঙ্গল প্রিণ্টার্স...

কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। গ্রন্থকার চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গগত; তাঁর পুত্রেরা এই নাটক প্রকাশ করিয়াছেন।

সখা।—শ্রীমৎ অন্নদা ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীমন্মথনাথ পাল, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, দক্ষিণেশ্বর। কলিকাতা, হেয়ার প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। সঙ্গীত-গুচ্ছ।

মিবার-কলঙ্ক।—কাব্য। শ্রীনরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, পি, প্রণীত। প্রকাশক, পুলিশ ড্রামাটিক ক্লাব, মেদিনীপুর। কলিকাতা, বেঙ্গল প্রিণ্টার্স লিমিটেড। মূল্য বারো আনা।

শ্রী১০৮ স্বামী রামদাসকাঠিয়া বাবাজী।—তদীয় শিষ্য মহন্ত শ্রীসন্তদাসজী ব্রজবিদেহী প্রণীত। ২য় সংস্করণ। প্রকাশক, শ্রীআশুতোষ দেব। কলিকাতা, ঝামাপুকুর, বি, পি, এম্‌স্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। এই সাধু-চরিতখানি সুলিখিত; এবং জীবন-কাহিনীটি বৈচিত্র্যে ভরা, কৌতূহলোদ্দীপক।

দেয়ালি।—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীজগদানন্দ রায় বিশ্ব-ভারতী, শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ—পঞ্চাশটি খণ্ড কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতাগুলিতে বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে; ছন্দে ভাবে বৈচিত্র্য আছে। প্রাণের লীলায় কবিতাগুলি লীলায়িত—আর সব-চেয়ে ভালো লাগিয়াছে প্রকাশের স্বচ্ছ সরল ভঙ্গী। হালকা সুরের মুখে প্রাণের স্নিগ্ধ দীপ্তিটুকু চমৎকার উপভোগ্য। দেয়ালি নামটি সার্থক হইয়াছে।

খোকা।—শ্রীযুক্ত ললিতলোচন দত্ত প্রণীত। প্রকাশক, তারাভূষণ পাল। মডার্ণ আর্ট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য লিখিত দেখিলাম না। এটি একটি মাঝারি গল্প; ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা। রচনায় প্রাণ নাই, নিতান্ত নীরস নির্জীব। ভাষা জড় স্তূপের মত। ছেলেমেয়েদের রস-বোধ আছে, তারা এ বই পড়িয়া আনন্দ পাইবে বলিয়া মনে হয় না। বইখানি সচিত্র।

পল্লী ছায়া।—শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার গণ প্রণীত। কলিকাতা ...টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস দ্বারা মুদ্রিত ও ...ল্য ছয় আনা। কবিতার বই। পল্লীর আর সে শ্রী ঐশ্বর্য্য নাই, সে শোভা নাই, তাহাই লেখক ছন্দোবন্ধে ...না বিশেষত্ব-হীন।

...র্ণ।—পৌরাণিক নাটক। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। মেদিনীপুর কালেক্টরেট রেক্রিয়েশন ক্লাব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মেদিনীপুর ... মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এ নাটকখানির বিশেষত্ব—লম্বা লম্বা বক্তৃতা আছে—কল্পনা আর পুরাণ মিলিয়া মহা-...লাকে লইয়া নৃত্য করিয়াছে, তবু চরিত্র ফোটে নাই, ... চাপা পড়িয়া আছে। আর সব চেয়ে খাসা হইয়াছে অধিকাংশ গানের লাইনই প্রচলিত কয়েকটি নাটকের গানের চুরি! এই শক্তি লইয়া নাটক লিখিবার দুঃসাহস একটা উপভোগ্য ব্যাপার, সন্দেহ নাই!

কাঞ্চনমালা।—নাটক। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এখানি ক্ষুদ্র নাটক—ইহার গানেও চোরাই কাণ্ড আছে; তবে নাটকে লেখক এক বিচিত্র ছন্দ রচিয়াছেন! নাটকখানি ছোট হইলে কি হয়, ইহার ললাট-পটে গ্রন্থকার ছাপাইয়া দিয়াছেন,—"গ্রন্থকারের স্বাক্ষর ব্যতীত কোন পুস্তক আসল নহে। অনুবাদের স্বত্ব রক্ষিত হইল। গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতিরেকে এই পুস্তক কেহ অভিনয় করিতে পারিবেন না। সর্ব্বস্বত্ব রক্ষিত হইল।—" এ নাটকের ললাট-পটে আঁটা এই কয়টি ছত্র শুধু পাঠ করিয়াই যা আনন্দ পাওয়া গেল, বাকী অংশ না ছাপিলেও ক্ষতি ছিল না। তবে পাঠকের তরফ হইতে একটা ছত্র ছাপিয়া দিলে ভালো হয়—সে ছত্রটি, "পাঠকের সময়ের মূল্য আছে—এরূপ নাটক-অস্ত্রে সে সময়-হত্যার স্বত্ব লেখকের নাই।"

প্রাণের ভাষা।—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীদুর্গাগতি চক্রবর্ত্তী, বর্দ্ধমান। কলিকাতা মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি উচ্ছ্বাসের বই—যখন যা মনে আসিয়াছে, লেখক তাই লিখিয়া গিয়াছেন। এ উচ্ছ্বাসের ভঙ্গী এমনি এলোমেলো যে তার মধ্য হইতে লেখক কি যে বলিতে চান তাহা বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য।

আবোল তাবোল।—৺সুকুমার রায়, বি-এস্-সি; এফ্, পি, এস কর্ত্তৃক লিখিত ও চিত্রিত। ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত। মূল্য চৌদ্দ আনা। এ বইখানি শিশু-সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি—আকারে অবয়বে ছবি লেখায় ও বাহারে এমন বই বাঙলায় আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ বইখানিতে অনেকগুলি কবিতা আছে। কল্পনার উদ্ভটত্বই কবিতাগুলির জান,—আর সে উদ্ভটত্ব এমন স্বতঃ-উৎসারিত, এমন হালকা যে আগাগোড়া প্রাণের হিল্লোলে ভরপুর। মজার কবিতা বলিলে যাহা বুঝায়, এ গুলিতাই। কবিতাগুলির কল্পনায় মজা, ব্যঞ্জনায় মজা,—আবার সেগুলির চিত্রদ্যোতনাতেও তেমনি মজা! কবিতাগুলির কল্পনা আর প্রকাশ-ভঙ্গী যেমন বিচিত্র, তেমনি লেখকের এ একেবারে নিজস্ব—এ ছন্দের এ ধরণের কবিতার লেখকই আবিষ্কারক। দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন বয়স্কদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য হাসির কবিতায় ও হাসির গানে বাঙলায় এক অপরূপ বৈচিত্র্য আনিয়াছিলেন, ৺সুকুমার রায়ও তেমনি শিশু-চিত্ত-বিনোদনের জন্য এই নূতন ছন্দের নূতন ধরণের কবিতাগুলির মধ্য দিয়া তেমনি বৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছেন। এগুলির ভঙ্গী সুর প্রভৃতি সব তাঁর নিজস্ব—কাহারও কাছে ধার করা নয়। আবার শুধু ... ছবিগুলি ... কিয়া গিয়াছেন

তাও তাঁর প্রতিভার ছাপ-মারা, সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গীর। এ বই প্রত্যেক অভিভাবক বাড়ীর ছেলেমেয়েদের জন্য একখানি করিয়া কিনিয়া দিন, এ বই পড়িয়া, এ বইয়ের ছবি দেখিয়া তারা আনন্দ তো প্রচুর পাইবে, তার উপর তাদের চিত্তে কল্পনার যে রঙীন বিকাশ হইবে, তার দাম লাখ টাকা।

জয়-পতাকা।—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকরুণাকান্ত ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা বারো আনা। এখানি উপন্যাস। রচনার উদ্দেশ্য, হৃদয়ে উদার ধর্ম্মভাবের আসন প্রতিষ্ঠা করা।

কাঁটার ফুল।—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক এম সি, সরকার এণ্ড সন্স, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি উপন্যাস। নায়িকা কুতুয়া দোসাদের ঘরের মেয়ে—কিন্তু রূপের ডালি। নথনী মোতিহারীর এক উকিলবাবুর বাড়ীতে মালীর কাজ করে। সে কিছু টাকা ধার করিয়া কুতুয়ার বাপকে দিয়া কুতুয়াকে বিবাহ করিল। কুতুয়ার রূপে-পাগল নথনীর স্ত্রীকে সাজাইবার সাধ—কিন্তু টাকা নাই। শেষে একদিন সে একছড়া চন্দ্রহার চুরি করিয়া কুতুয়াকে পরাইল—কিন্তু তিন দিন পরে পুলিশ আসিয়া তাকে ধরিল এবং তার দুই বৎসর জেল হইল। কুতুয়াও বাপের বাড়ী ফিরিল। তার বাপ রামসেবক কুতুয়ার জন্য আবার পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিল। ব্রাহ্ম পিতার ছেলে তরুণ অবনী নানাস্থানে ঘুরিয়া এই সময় মোতিহারীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জঙ্গলের পথে একদিন তার এই কুতুয়ার সঙ্গে দেখা হইল। যেমনি দেখা, অমনি প্রেম। তার পর প্রায়ই দুইজনে দেখা হয়। একদিন কথাও হইল। কুতুয়ার বাপের কাছে গিয়া অবনী একদিন বলিল, হাজার টাকা দিয়া সে তার কন্যাকে বিবাহ করিবে। কুতুয়ার বাপ কুতুয়াকে লইয়া কাশী গেল এবং কয়েকদিন পরে বাড়ী ফিরিয়া বলিল, কুতুয়া কাশীতে মরিয়া গিয়াছে। তারপর কাঁদিয়া কাটিয়া সে গৃহ-সংসারে মন দিল ও অল্পদিনের মধ্যে কতকগুলি জমীন ও গরু-মহিষাদি কিনিয়া বেশ জমাইয়া বসিল। অবনী ওদিকে কুতুয়ার নাম বদলাইয়া তার নূতন নাম দিল কুন্তলা এবং ছয়মাস একসঙ্গে থাকিয়া তাকে বিবাহ করিল, রেজেষ্ট্রী করিয়া। বিবাহ করিয়া অবনী দেশে ফিরিল না— কুন্তলাকে মেম দিয়া লেখাপড়া শিখাইতে লাগিল। ক্রমে তাদের একটি মেয়েও জন্মিল। অবনীর মা এ বিবাহে চটিয়া গেলেন, তিনি রাগিয়া অবনীকে চিঠি লিখিয়া তার সঙ্গে সম্পর্কই কাটিয়া দিলেন; এবং তাকে গৃহে ফিরিতে নিষেধ করিলেন। অবনী কুন্তলাকে লইয়া …াবাদে বাস কা… …কিছুকাল পরে ব্যাপার জানা- …খন কুন্তলাকে লইয়া অবনী কলিকাতায় আসিল। এখানে শিক্ষায়-গড়া কুন্তলার মন বি… ভরিয়া থাকিত—নথনীর অমন প্রাণভরা প্রেমের সে অপমান করিয়াছে! এমনিভাবে থাকিতে থাকিতে স্বামী-স্ত্রীর মনের মাঝে পাহাড় উঠিল, এবং কুন্তলার কঠিন পীড়া হইল। অসুখ সারিলে অবনী কুন্তলাকে লইয়া মধুপুরে আসিল। এখানে এক অনাথা তরুণীর সঙ্গে তাদের আলাপ হইল—তার নাম করুণা। করুণা খৃষ্টান। সে বাগ্‌দত্তা—যে তাকে বিবাহ করিবে, সেও খৃষ্টান, তবে দরিদ্র; তার নাম এলবার্ট। বিবাহের জন্য এলবার্ট টাকা জমাইতেছে, এ কথাও করুণা খুলিয়া বলিল। তারপর এক বৎসর তারা মধুপুরে থাকিয়া গেল। কিছু দিন পরে রামসেবক আসিয়া খপর দিল, নথনী জেল হইতে ফিরিয়াছে এবং রাজবাড়ীতে সে সহিসের কাজ করিতেছে। নথনী তারপর সন্ধান করিয়া আসিয়া কুন্তলাকে দেখে; কুন্তলাও তাকে দেখে এবং উত্তেজনায় তার ফিট হয়। নথনী পরে মকর্দ্দমা করে অবনী কুতুয়া আর কুতুয়ার বাপের নামে। এবং মকর্দ্দমা দায়রায় গেলে নথনী হলফ লইয়া বলিল, তার সঙ্গে কুতুয়ার বিবাহ হয় নাই; এক-সঙ্গে দুইজনে শুধু বাস করিয়াছিল। তাছাড়া কুতুয়া রামসেবকের ঘরে মানুষ হইয়াছিল মাত্র—সে এক নীলকর সাহেবের মেয়ে—কুতুয়ার মার সঙ্গে সাহেবের অবৈধ প্রণয় ছিল, তার ফলে কুতুয়ার জন্ম হয়। এই ব্যাপারে অবনী আর কুন্তলার মনে খুব ঝড় বহিল এবং কলিকাতায় আসিয়া তারা ছাড়-ছাড় ভাবে এক গৃহেই বাস করিতে লাগিল। করুণার বিবাহ হইয়া গেল নথনীর সঙ্গে। নানা ঘটনার মধ্যে প্লটটী প্রচণ্ড নাড়া পাইয়াছে। অবনীর চরিত্র খু… জীবন্ত হইয়া ওঠে নাই। তাছাড়া কুন্তলাকে কলমের খোঁচায় মাত্র দোসাদের ঘরে লেখক ছাড়িয়া রাখিয়াছেন,—নামে দোসাদের ঘরের মেয়ে—কিন্তু গোড়া হইতেই তাকে ব্রাহ্ম বা উদারনৈতিক ঘরের মেয়ে করিয়াই আঁকা হইয়াছে। সুতরাং কুন্তলা বা কুতু… চরিত্রেও অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য দোষ ঘটিয়াছে। বইখানির সমস্ত… রোমাণ্টিকভাবে মশগুল; সেই জন্যই তারা একেবারে … হইয়াছে। তাদের প্রাণের সে সহজ গতি কোথাও উৎসারিত হয়… তাদের রক্ত-মাংসের জীব বলিয়া মনে হয় না। উদ্দেশ্যটাকে বড় করার দরুণই ব্যঞ্জনায় দৈন্য ঘটিয়াছে। অবনীর ইতিহাসও… যে তাকে গোটাভাবে আমরা পাই নাই; সে শুধু ক… তরঙ্গে কাঠিকুটার মত ভাসিয়া বেড়াইয়াছে… নিতান্ত… উদ্দেশ্যহীন-প্রাণহীনের মত।

ভদ্রা।—শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা শাস্ত্রপ্রচার প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এখা… গোড়াতেই লেখক পাঠকের মনে যে-একটা কৌতূহল

...ছেন, সে কৌতুহল আগাগোড়া বেশ বজায় থাকে। ভুবনেশ্বরের ...জীর্ণ প্রান্তরে ভদ্রাকে প্রথম যখন দেখি, তখন সে যেন একটা ছবি— অশরীরী একটা আইডিয়া। তারপর অজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তার নির্জ্জনে-গঠিত চিত্তের উপর রোমান্সের যে রঙীন কিরণ বিচ্ছুরিত হইল সেটুকুও বিশেষ উপভোগ্য। তারপর বিধবা মাকে লুকাইয়া অজয়ের সঙ্গে তার বিবাহ—এটুকুও বেশ। এই বিবাহের উপর, মার কঠিন নিষেধ অনেকখানি mysteryরও সৃষ্টি করিয়াছে। তারপর কলিকাতায় ইংরাজপাড়ার বাসায় অজয় ও ভদ্রা একসঙ্গে বাস করিতে লাগিল; হঠাৎ পটলডাঙ্গার বাড়ীর ঝী আসিয়া ভদ্রার বুকের মাঝে যে দুঃস্বপ্ন আঁকিয়া দিল, তাহাও অনেকখানি সমস্যা ও কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছে। অজয়ের বিবাহ হইয়াছিল পূর্ব্বে নীহারের সঙ্গে—নীহার তার পটলডাঙ্গার বাড়ীতে বাস করিত, তার একটি মেয়েও হইয়াছিল, মেয়ের নাম ধীরা। ভদ্রাকে বিবাহ করিয়া অজয় সেটুকু গোপন রাখিয়াছিল! নীহার ও ভদ্রা অজয়ের দুইটা বিবাহের কথা জানিত না। ঝীয়ের কথায় ভদ্রা জোর করিয়া একদিন পটলডাঙ্গার বাসায় গিয়া হাজির হইল, এবং সেখানে শুনিয়া আসিল, তাকে সকলে অজয়ের 'রক্ষিতা' বলিয়াই জানে। তারা তাকে তেমনি ভাবেই অভ্যর্থনা করিল; অথচ অজয়ের সামনেই! প্রাণে ব্যথা পাইয়া ভদ্রা তখনই তার মার কাছে ভুবনেশ্বরে ফিরিয়া আসে। স্ত্রী কন্যা সব ছাড়িয়া অজয় তার খোঁজে বাহির হয় এবং এই সূত্রে মোসাহেব রাসবিহারীর খর্পরে পড়ে ও ক্রমে অধঃপাতে যায়। এই অবধি সমস্যার মাঝ দিয়া কৌতুহলও ...শ সাড়া পাইয়াছে। তারপরই কিন্তু ঘটনার সূত্র অত্যন্ত এলোমেলো হইয়াছে এবং সন্ন্যাসী, তিলক মহারাজ, কাশীতে জোটবাঁধা, প্রকাণ্ড ...ম্পর্ক বাহির হইয়া পড়া—এমনি আজগুবি ব্যাপারে বইখানির ...জমা রসটুকু একদম খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। বইয়ের ভাষা স্থানে ...নে কটমট; একটা নমুনা দিই,—ভদ্রা বলিতেছে,—'আমার আততায়ী চক্ষু, আমার আততায়ী হৃদয়ই আমার সর্ব্বনাশ করিল' (৯৯-১০০ পৃষ্ঠা)। এই 'আততায়ী চক্ষু' কথাটা বাংলা নয়, ইংরাজীর ...ইক তর্জ্জমা। ভাষায় এ দোষ মাঝে মাঝে ঘটিয়াছে—তাছাড়া কথ্য ভাষার সঙ্গে লিখিত ভাষাও মিশানো হইয়াছে। এ ত্রুটিগুলি দ্বিতীয় ... পরিহার করিতেই হইবে—কারণ এ মিশ্রণে ভাষার সুর কাটিয়া ...

...লভাঙ্গা।—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক, ...নাথ দত্ত অমর লাইব্রেরী, কলিকাতা। নিউ বৃটানিয়া প্রেসে ...। মূল্য দুই টাকা। সামাজিক উপন্যাস।

নতুন খাতা।—শ্রীযুক্ত কিরণধন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও ...কলিকাতা, চেরী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচসিকা। ...৬৪টি খণ্ড কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে—কবিতাগুলি বিচিত্র রসের, বিচিত্র সুরের। কবি কিরণধন বাংলার কাব্য-কুঞ্জে সুরের এক বিচিত্র কিরণ ফুটাইয়াছেন—অত্যন্ত ঘরোয়া সাধারণ জিনিষগুলিও তাঁর ওস্তাদী হাতে এমন মিঠা, এমন সরস হইয়া ফোটে, যে যেমন বিচিত্র তার বর্ণচ্ছটা, তেমনি তার মাধুর্য্য আর লালিত্য। এমন শ্রী বাংলায় আর কোনো কবির তুলিতে বড় ফোটে নাই। কবিতাগুলি যেন হীরার কুচি—প্রতিভার জ্বলজ্বলে কিরণ প্রত্যেকটি কবিতায় দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভণ্ডামি, ধাপ্পাবাজি, জুয়াচুরির বিরুদ্ধে কবির তুলি শাণিত ছুরির মত যেমন ঝকিয়া উঠিয়াছে, তেমনি ঘরের কোণের ছোট্ট আব্দারটুকুও অজস্র দরদে অশ্রুর বিন্দুর মতই ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। রঙ্গে-ব্যঙ্গে কবির তুলিতে হাসির ফিনিক ফুটিয়াছে—অবহেলা-উপেক্ষায় ঐ তুলিই আবার তেমনি অশ্রুর বন্যা ঝরাইয়া দিয়াছে। এমন বিচিত্র সুরে কবিতাগুলি আগাগোড়া ভরপুর যে এ যেন তিনি সুরের ফুলঝুরি রচিয়াছেন! ভাবে ভাষায় সুরে এ যেন কোন্ পরীর দেশের বিচিত্র স্বপন্ কবি জাগাইয়া তুলিয়াছেন! সে স্বপ্নে যেমন মাধুর্য্য, সে স্বপ্ন ফুটানোর কারিগরিও তেমনি বিচিত্র। ছন্দ, ভাষা, সুর কবির ইঙ্গিতে এমন স্বচ্ছন্দ লীলায় ফুটিয়াছে যে তার গতি আগাগোড়া হালকা, সহজ ও সরল —কোথাও আড়ম্বর নাই—প্রজাপতির মতই বিচিত্র তার বর্ণ, সহজ তার ভঙ্গী। এই। এই কবিতাগ্রন্থখানি বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত হইবে, এ আশা আমাদের বিলক্ষণ আছে।

সতীত্বের মূল্য।—শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীশিশিরকুমার বসু, শিশির পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা, শিশির প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি সামাজিক উপন্যাস। মাধব ঘোষ পল্লী-গৃহস্থ—তার দুই স্ত্রী যাদুবালা ও ধীরা। ধীরা তরুণী, দেখিতে সুশ্রী। মাধব তাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে; যাদুবালাও তাকে ভালবাসে। ধীরা মেয়েটিও বেশ ভালো। কয়েকটা দুর্বৃত্ত মুসলমান ছোকরা এক রাত্রে স্বামীর বাহুপাশ হইতে তাকে ছিনাইয়া লইয়া যায়—এবং তার উপর অত্যাচার করে। তিনদিন পরে এক সন্ধ্যায় ছাড়া পাইয়া ধীরা ঘরে ফিরিয়া আসে—যাদু তাকে সাদরে ঘরে ডাকিয়া লয়—কিন্তু মাধব ধীরাকে ভালবাসিলেও এবং তাকে নির্দ্দোষ জানিলেও ধীরাকে ঘরে লইতে রাজী হয় না। এ কথা ধীরা শোনে, এবং সে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করে। তাদের দেশে তখন কলিকাতা হইতে একদল তরুণ আসে কালাজ্বরের টীকা দিতে; বিমল ছিল তাদের দলে। ধীরা পলাইয়া ষ্টেশনে এই বিমলের কাছে আশ্রয় চায় এবং তার সঙ্গে বিমলের কলিকাতার বাসায় আসিয়া বাস করে। বিমল তার লেখাপড়া শেখার বন্দোবস্ত করে এবং তার প্রতি বিমলের আচরণও আগাগোড়া সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় ভরা। বিমল তার পরিচয় শোনে-এবং তাকে বুঝাইয়া যাতে সে ঘরে ফেরে...

হয়। কিন্তু ধীরার নিষেধে সে সে-ব্যাপারে অগ্রসর হয় নাই। তারপর বহুকাল এমনি থাকিবার পর ধীরা স্বামীর কাছে যাইতে চাহিলে, বিমল তাকে লইয়া যায়। মাধব ঘোষ তখন মৃত্যু-শয্যায়। ধীরাকে মাধব সেবার ভার দিল না। মাধব ত মরিল—ধীরাকে লইয়া বিমল ষ্টেশনে চলিয়া আসে। ধীরা তখন নিরবলম্ব হইয়া বিমলের পায়ে পড়িল আশ্রয়ের জন্য—সমাজে আশ্রয়, সংসারে আশ্রয়। বিমল তাকে বুকে ধরিয়া বলিল, সে আশ্রয় ধীরাকে সে দিবে। এইখানেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। উপন্যাসখানির রচনা-ভঙ্গী ভালো, ভাষার প্রবাহ স্বচ্ছ, সহজ। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণেও নিপুণতার পরিচয় পাই। সমাজে এত বড় সমস্যার কথা তুলিয়া লেখক দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এ দুর্দ্দিনে এ সমস্যার সমাধানের সময়ও আসিয়াছে। লেখক সমস্যাটি ভালো করিয়াই সমাজের সামনে ধরিয়াছেন এবং আদেশের ছলে কোথাও তিনি একটা কথা বলেন নাই, সংস্কারকের মত কোনো হদিশ বা উপদেশ দিবার চেষ্টাও করেন নাই, এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। তবে বিমলের কাছে ও-ভাবে ধীরার আশ্রয় চাওয়াটা কতখানি সঙ্গত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে—তবু লেখক এ-কথা এভাবে সমাজের সামনে ধরিয়া যে অকুতোভয়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তারিফের যোগ্য। বইখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই বেশ পরিপাটী হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

রাগের গঠন শিক্ষা * ।—বইখানির নাম "রাগের গঠন শিক্ষা", কিন্তু গ্রন্থকার বলেন নি যে 'রাগ' কাকে বলে, তার সঙ্গে সাধারণ সুরের প্রভেদ কি। এটি শিক্ষার্থীকে বুঝানো দরকার ছিল, কারণ সাধারণ স্বর ও রাগ এক জিনিষ নয়। গ্রন্থকার যদি পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে ভেবে থাকেন যে দুটিই এক জিনিষ, তা হলে সেটি তাঁর ভুল। আমরা এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরাজ সঙ্গীতজ্ঞ Captain N. A. Willard সাহেব যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করলেম। বিদেশী পণ্ডিতগণ আমাদের রাগকে কি ভাবে দেখেন এ থেকে বোঝা যাবে :—

"It is true that a Rag or a Ragini, is not to be considered strictly in the same situation, as a tune is amongst us. It is not strictly a tune according to the acceptation of the word, as its definition given hereafter will shew. A "That" (ঠাট) comes nearest to what with us is implied by a "mode" and consisting in determining the exact relative distance of several sounds which constitute an octave with respect to each other; while a Rag or a Ragini disposes of these sounds in a given succession and determines the principal sounds."

রাগ এবং রাগিণী এক জিনিষ নয়। যদিও সামান্যত দুইয়ের মানেই সুরকে বুঝায়, তবুও, রাগ বলতে গেলে, প্রথম সৃষ্ট প্রধান নির্দ্দিষ্ট ছয়টি সুরকেই বুঝায়। এই ছয়টি principal authentic melodies হতেই বাকি যে-সব সুরের উৎপত্তি হয়েছে তাদের বলে রাগিণী।

গ্রন্থকার গ্রাম এবং মূর্চ্ছনাকে এক জিনিষ বলেছেন। আমাদের মতে তা ঠিক নয়, এবং দুটি পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। গ্রাম বলতে গেলে, কতকপরিমাণে পাশ্চাত্য স্কেল্‌কেই বুঝায়, সম্পূর্ণ ভাবে নয়, কতকটা মাত্র। আমাদের হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রের মতে গ্রাম তিনটি, যথা :—

অথ গ্রামাত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ স্বরসন্দোহরূপিনঃ
ষড়জ, মধ্যম, গান্ধার, সজ্ঞাভিস্তে সমন্বিতা ॥

ইতি সঙ্গীত-দর্পণ।

অর্থাৎ, গ্রাম সব-সমেত তিনটি, এবং তাদের নাম হচ্ছে, ষড়জ গ্রাম, মধ্যম গ্রাম এবং গান্ধার গ্রাম। Equal temperament basisএ এই গ্রাম তিনটি analyse করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, এই তিনটি গ্রাম থেকেই দ্বাদশ বিকৃত স্বরের উৎপত্তি হয়েছে। যথা—সা গ্রাম থেকে পাওয়া গেল সাতটি শুদ্ধ স্বর, মা গ্রাম দিলে একটি কোমল স্বর, যথা—কোমল নি, এবং গান্ধার গ্রামের দান হচ্ছে একটি কড়ি স্বর যথা কড়ি-মধ্যম, এবং তিনটি কোমল স্বর, যথা কোমল রে, কোমল গা, এবং কোমল ধা। এখন এই তিন গ্রামের সংমিশ্রণে দ্বাদশটি অর্দ্ধ স্বর পাওয়া গেল, যথা :—শুদ্ধ সাত+কোমল চার+কড়ি এক—বারো। এই তিনটি গ্রাম থেকেই বিলাতি Chromatic scaleই বলুন আর দেশী বিকৃত স্বরগ্রামই বলুন, তার উৎপত্তি।"

পাশ্চাত্য স্কেলের সঙ্গে আমাদের গ্রামের প্রভেদ এই, যে, স্কেল্ বলতে গেলে, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট কম্পনের (vibration) স্বরকে বুঝায় (determined pitch); যথা—সি স্কেল্, ই ফ্ল্যাট্ স্কেল ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের সঙ্গীতে absolute pitch বলে কিছু নেই, কাজেই নির্দ্দিষ্ট কম্পনের স্বরের স্কেল্ কি করে থাকতে পারে? সেই জন্যই আমরা আমাদের কণ্ঠের বা বাদ্য-যন্ত্রের শক্তি অনুযায়ী সুরকেই

* গান, গৎ ও আলাপ সম্বলিত রাগের গঠন-শিক্ষা। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন সেন প্রণীত। হেয়ার প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য তিন টাকা।

সা বা ষড়জ ধরে নি। যখন absolute pitch নেই, তখন বিলাতী স্কেলের সঙ্গে আমাদের গ্রামের সৌসাদৃশ্যও নেই বল্‌লেই চলে। আমাদের শাস্ত্রের মতে গ্রামের লক্ষণ এই রকম, যথা—

গ্রামঃ স্বরসমূহঃ স্যান্মূর্চ্ছনাদেঃ সমাশ্রয়ঃ।

ইতি সঙ্গীত-দর্পণ।

অর্থাৎ ; মূর্চ্ছনা, তান প্রভৃতির আশ্রয় স্বরসমূহকে গ্রাম বলে।

মূর্চ্ছনা বলতে গেলে, মীড় কিংবা বিলাতি সঙ্গীতের Slideকে বুঝায়। অর্থাৎ, এক সুর থেকে আর এক সুরে অবিচ্ছেদভাবে গমনাগমন করাকে মূর্চ্ছনা বলে। যথা—

আরোহশ্চাবরোহশ্চ স্বরাণাং জায়তে যদা

তাং মূর্চ্ছনাং তদা লোকে আহুর্গ্রামাশ্রয়ং বুধাঃ॥

ইতি সঙ্গীত পারিজাত।

অথবা—ষড়জাদি স্বরাৎ ঋষভাদি স্বরোত্থানে, যত্র স্বরো বিরমতি সা মূর্চ্ছনেতিহনুমন্মতে।

গ্রন্থকার বিজ্ঞ ও বহুদর্শী, গ্রাম ও মূর্চ্ছনা সম্বন্ধে তাঁর এরকম গোল হওয়া ঠিক নয়।

গ্রন্থকারের মতে, বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী ও বিবাদী প্রভৃতি স্বরের বিশেষ কিছু significance নেই। এ ধারণা ভুল। কারণ, বাদী, সম্বাদী প্রভৃতি এই চতুর্ব্বিধ সুর ভিন্ন রাগের রূপ ঠিক মত প্রকাশ করা ও রাগ পরস্পরের পার্থক্য রাখা আমরা দুরূহ বিবেচনা করি। গ্রন্থকার লিখেছেন,—(পৃ ৩০) "যে সুর, কোন রাগে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় বা যাহার দ্বারা রাগের রূপ প্রকাশ পায় তাহাকে সেই রাগের বাদী সুর কহে। বাদী অপেক্ষা অল্প ব্যবহৃত সুরকে সম্বাদী, সম্বাদী অপেক্ষা অল্প ব্যবহৃত সুরকে অনুবাদী এবং অব্যবহার্য্য সুরকে বিবাদী কহে।"

"অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, সকল রাগেরই বাদী সম্বাদী অনুবাদী সুর আছে ; কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্তিমূলক ; কারণ, যদিও কোন কোন রাগে একটী মাত্র সুরের দ্বারা রূপ কতকটা প্রকাশ পায় যথা,—কেদারায় ম সুরের দ্বারা, ঝিঁঝিটে গ সুরের দ্বারা ; কিন্তু এরূপ কয়টী রাগ ঘটিয়া থাকে? অধিকন্তু শিক্ষার্থীরা এই দুই রাগ শিক্ষা করিবার সময় দেখিবেন যে, ঐ দুইটী রাগের রূপ প্রকাশে ঐ দুইটি সুর ব্যতীত অন্যান্য স্বর-বিন্যাসেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে।" ইত্যাদি—। প্রথমতঃ গ্রন্থকার এই সম্বাদী অনুবাদী স্বরের স্বল্প ব্যবহার কথাটি কোথায় পেলেন? দ্বিতীয়তঃ একটিমাত্র স্বরের দ্বারায় রাগের রূপ প্রকাশ পায় এ কথাই বা তিনি শুনলেন কোথায়? আমাদের হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রে এ কথা নেই যে কেবল বাদী স্বরের দ্বারাই রাগের রূপ প্রকাশ পায়। রাগের রূপ প্রকাশ করতে হলে এই চতুর্ব্বিধ স্বরের সমান প্রয়োজন ; যথা :—

চতুর্ব্বিধঃ স্বরোবাদী সংবাদী চ বিবাদ্যপি

অনুবাদী চ বাদী তু প্রয়োগে বহুল স্বরঃ॥

ইতি সঙ্গীত রত্নাকর।

অর্থাৎ :—

বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী ও বিবাদী নামে চার রকম স্বর আছে। রাগে যেটি বাদীস্বর হয় সেটির প্রয়োগ বহুল। শাস্ত্রকার একথা বলেন নি যে আর সমস্ত স্বরের প্রয়োজন নেই বা তারা বাদী স্বরের চেয়ে অল্প প্রযুক্ত হবে। আমাদের মতে বাদী স্বর হল রাগের প্রাণ, সংবাদী স্বর তাকে পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলে প্রকাশ করে, আর অনুবাদী স্বরগুলি এদের প্রাধান্য মেনে চলতে থাকে। বিবাদী স্বর, ষাড়ব এবং ওড়ব রাগ গঠনের প্রধান বস্তু। যথা :—কেদারা রাগটী সম্পূর্ণ, এর বাদী স্বর হল ষড়জ, সংবাদী হল মধ্যম ও পঞ্চম, এবং আর সকল স্বর অনুবাদী। এখন এর রূপ প্রকাশ করতে ষড়জ মধ্যম ও পঞ্চমই প্রধান এবং সমান দরকারী। গ্রন্থকার বলেছেন, "কেবল মধ্যমই এর রূপ প্রকাশ করে থাকে," এ ধারণা তাঁর ভুল। যথা— কেবল যদি বলি "সা মা," এটী বসন্ত রাগ হতে পারে, যেমন :— সা মা গা মা ধা ক্ষা ধা না সা, র্সা না ধা মা গা পা মা গা ঋ সা। আবার এটী ভৈরব রাগ হতে পারে যথা সা মা গা মা না দা পা মা গা ঋ সা। কেবল মধ্যমের দ্বারাই অতএব কেদারার রূপ প্রকাশ করা যায় না, সম্পূর্ণভাবে দূরের কথা কতকটাও না। কিন্তু যদি সা মা, এবং পা সমানভাবে লাগানো যায় তবেই কেদারার রূপ প্রকাশ পাবে, যথা :—সা মা গা পা ক্ষা ধা পা ক্ষা পা র্সা না ধা মা গা পা মা রা সা। এটীকে analyse করলে দেখা যাবে যে বাদীস্বর ষড়জের চেয়ে সম্বাদী স্বর মধ্যম এবং পঞ্চম বেশী লাগছে, অতএব যে স্বরের প্রয়োগ অন্যের চেয়ে বেশী সেইটী যে বাদীস্বর এমন কথা বলা চলে না। প্রধান সুরকেই বাদী বলে। কেদারায় এই প্রধান সুরকে ফুটিয়ে তুলছে মধ্যম ও পঞ্চম, এবং এই তিনটী সুরের দ্বারাই তার রূপ পূর্ণ প্রকাশ হয় যথা :— সা মা পা ক্ষা পা সা মা। গ্রন্থকার লিখেছেন—যে—"যদি কেহ স্বরূপ বলেন যে, অধিক পরিমাণে ব্যবহার্য্য সুরকে বাদী, তদপেক্ষা স্বল্প ব্যবহার্য্য সুরকে সম্বাদী এবং তদপেক্ষা স্বল্প ব্যবহার্য্য সুরকে অনুবাদী বলে, শিক্ষার্থীরা দেখিবেন যে এরূপ রাগ আছে, যেগুলিতে একাধিক স্বর সমান পরিমাণে ব্যবহৃত হয়—।...এরূপ স্থলে কোন কোন স্থোন স্বর বাদী সম্বাদী ও অনুবাদী তাহা স্থির লইতে পারে না।" এ কথা ঠিক নয় এবং হিন্দুসঙ্গীত গ্রন্থগুলা পড়ে কেবল practical জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হয়ে হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে Theoretical বই লিখতে গেলেই এই সব গোলমাল হবেই। বাদী সম্বাদী স্বর কি করে ধরা যায়, তা নীচের formula টি পড়লেই বোঝা যাবে :—

শ্রুতয়োদ্বাদশাষ্টৌ বা যয়োরন্তরগোচরাঃ
মিথঃ সংবাদিনৌ তৌ নি-গাবন্যবিবাদিনৌ।
ইতি সঙ্গীত রত্নাকর।

অর্থাৎ যে সকল স্বর পরস্পর দ্বাদশ এবং অষ্ট শ্রুতির ব্যবধানে থাকে তারা পরস্পর বাদী সংবাদী—যথা কেদারার বাদী স্বর সা, এবং অনুবাদী স্বর মা এবং পা, কেন, তা নিচের অনুপাতটি দেখলেই বোঝা যাবে :—

সা থেকে রে চার শ্রুতি, রে থেকে গা তিন শ্রুতি, গা থেকে মা দুই শ্রুতি।— সা· · · · রা· · · গা· · মা·। সা যে শ্রুতিতে ধ্বনিত হল, তার পরের শ্রুতি থেকে, মা যে ধ্বনিত হ'ল তার পূর্ব্বের শ্রুতি পর্য্যন্ত, শ্রুতি সমষ্টির সংখ্যা ৮, অতএব সা থেকে মা পর্য্যন্ত আট শ্রুতির Interval, কাজেই শাস্ত্রানুযায়ী পরস্পর বাদী সংবাদী।

আবার, সা থেকে রে চার, রে থেকে গা তিন, গা থেকে মা দুই এবং মা থেকে পা চার শ্রুতির তফাতে—

১২ শ্রুতি
সা· · · · রে· · · গা· · · মা· · · পা

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সা থেকে পা পর্য্যন্ত বারো শ্রুতির intervol, কাজেই পরস্পর বাদী সম্বাদী। এখন বলবার কথা এই যে, মা, অথবা পা বাদী না হয়ে 'সা'টিই বাদী হল কেন? এর উত্তর এই যে, যেমন, আমাদের দেহে প্রাণ একটি শক্তি, এবং সেই প্রাণশক্তিকে ক্রিয়াশীল করে রেখেছে বৃত্তি-সমূহ, তেমনি রাগের প্রাণ শক্তি হল একটিমাত্র স্বর যেটিকে বাদী বলা হয়, এবং সেটিকে ক্রিয়াশীল করে তুলছে সম্বাদী স্বর, তা একটিও হতে পারে—দুটিও হতে পারে। যেমন, প্রাণশক্তি ইচ্ছা-শক্তিকে প্রেরণ করলে, ইচ্ছাশক্তি কর্ম্মশক্তির উপর প্রবল হয়ে আমাদের দেহকে বাহ্য কর্ম্মে নিয়োগ করলে, এবং এই তিন শক্তির সংমিশ্রণে—বাহ্য ক্রিয়ার আবির্ভাব, অথচ প্রাণশক্তি যদিও গোপন রইল এবং কর্ম্মশক্তি প্রকট হয়ে উঠল, তথাপি প্রাণশক্তিই হল প্রধান, তেমনি রাগের প্রাণ বাদী, আর ইচ্ছা সংবাদী, এবং কর্ম্ম অনুবাদী, বাদীকে প্রকাশ করলে সংবাদী এবং বাদী ও সংবাদীকে ক্রিয়াশীল করে তুললে আর সমস্ত স্বর যারা হল অনুবাদী, এবং এই সমস্তের মিলনে রাগের বাহ্য রূপের প্রকাশ।

বাদী এবং সংবাদীর ভেদাভেদে দুটি রাগ কতটা পরস্পর পৃথক হয়ে পড়ে, নীচের উদাহরণ দেখলেই তা বোঝা যাবে—যথা :—ললিতা ও পূরবী—। শাস্ত্রানুযায়ী এ দুটির formula এই :—

মধ্যমাংশগ্রহন্যাসা পূর্ণা ললিতা মতা॥
সম্পূর্ণা পৌরবী জ্ঞেয়া গান্ধারাংশন শোভিতা॥

ললিতের ঠাটঃ— সা ঋা গা মা হ্মা পা ধা না র্সা।
পূরবীর ঠাটঃ— সা ঋা গা মা হ্মা পা ধা না র্সা। } এক রকম ঠাট—

ললিতের বাদী স্বর মধ্যম, সম্বাদী স্বর ষড়জ। পূরবীর বাদী স্বর গান্ধার, স্বর নিখাদ। স্বর দুটি রাগে একই রকম ব্যবস্থার হয় অথচ পরস্পর কত প্রভেদ; যথা—

ললিতা—

সা ন্া ঋ মমা মগা গা পা গপা গঋা সন্া সা ন্া ঋ গা পা গা ঋ সা। গা হ্মা ধা মা ধা না র্সা র্সর্সা র্সা র্সনা র্ঋা র্গা র্পা র্গা র্গা র্ঋা র্সা নর্সা নধা পা মা গা হ্মা ধা মধা পধা মা পা গা গা পা গা ঋা সা ন্া ঋা গা পা গা গা ঋা সা॥

পূরবী—

সা ন্া ঋা গা মা গা গা হ্মা পা না পা হ্মা গা মা গা গা হ্মা ধা পা হ্মা গা ঋ সা ন্া ঋ গা॥ গা পহ্মা ধা র্সা র্সা র্সা র্সা না র্ঋা র্গা র্পা র্গা র্গা র্ঋা র্সা র্সা না ধা পা হ্মা গা না হ্মা গা ঋ সা॥

এ ক্ষেত্রে বাদী সম্বাদী অনুবাদী প্রভৃতি স্বরে কোন প্রাধান্য নেই, এ কথা আমরা অস্বীকার করি।

গ্রন্থকার পদ বা Phrase সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন কিন্তু গ্রহ, অংশ ও ন্যাস সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নি। পদ-বিন্যাসের জন্য গ্রহ ও ন্যাস অতি আবশ্যক। অথচ, সংস্কৃত শাস্ত্রানুযায়ী প্রত্যেক রাগের formula য় সেগুলি দেওয়া আছে। গ্রন্থকার একটু কষ্ট স্বীকার করে দেখে লিখলেই পারতেন।

গ্রহ অংশ ও ন্যাসের formula শাস্ত্রানুযায়ী এই-যথাঃ—

গ্রহ স্বরাঃ সাইত্যুক্তা যো গীতাদৌ সমর্পিতা,
ন্যাস স্বরাস্ত সা প্রোক্তা যো গীতাদি সমাপ্তিকা।
যো ব্যক্তিব্যঞ্জকো গানে, যস্ত স্বর্ব্বেনুগামিনা—
যস্ত সর্ব্বত্র প্রাবল্যাদ্ বাদী অংশোপি নৃপোত্তমা॥
ইতি সংগীত নারায়ণ।

অর্থাৎঃ—যে স্বর থেকে গান বা রাগ আরম্ভ হয় তাকে বলে গ্রহস্বর, যে স্বরে রাগের পদ এবং রাগের অন্যান ক্রিয়াসমূহ সম্পূর্ণ (final cadence) বা আংশিক (half cadence) ভাবে সমাপ্ত হয় তাকে বলে ন্যাস স্বর, এবং যে স্বর রাগের প্রাণস্বরূপ প্রধান তার নাম অংশ, অথবা বাদী অথবা রাজা স্বর।

গ্রন্থকার রাগের form বোঝাতে গিয়ে কেবল স্বরান্তর স্বরান্তর করেই অস্থির হয়েছেন। অথচ এই স্বরান্তরগুলি মূর্চ্ছনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এগুলিকে তিনি বাঁধা নিয়মে আনবার চেষ্টা করেছেন, যা তাঁর কৃত নিয়মে বাঁধা যেতে পারে না। এ সম্বন্ধে সোমেশ্বর কৃত 'রাগ বিবোধ" গ্রন্থের মূর্চ্ছনা ও কূটতানের অধ্যায়টি তাঁকে ভাল করে পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। তাঁর ওই স্বরান্তরের বাহুল্যে বইখানি একটু জটিল হয়ে পড়েছে; প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে একটু গোলমাল হবার আশঙ্কাও আছে।

গ্রন্থকার ষড়জ-সঞ্চরণ প্রণালী বা মজুলেসান্ (মডুলেসান্) এর-অর্থাৎ

কোন একটি নির্দিষ্ট সা থেকে অপর কোন স্বরকে সা ধরে বাজানো বা গান করার নাম Modulation.) আমাদের সঙ্গীতে কি সার্থকতা বুঝলেন জানি না। তিনি নিশ্চয়ই Harmony বা counter point সম্বন্ধে বই লিখছেন না, যে chord of the dominant seventh বা diminished seventh বা augmentod fourth বা added ninth সম্বন্ধে ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। রাগের গঠন শিক্ষায় এগুলো সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। Harmonyর বিষয় হলে আলাদা কথা। যে হেতু primitive harmoy যে এই fundamental discord গুলি সর্ব্ব প্রধান এবং Modnlation এর একমাত্র নিয়ম। তাও কেবল primitine harmonyতেই প্রাধান্য বেশী কিন্তু advanced harmonyতে abrupt modulation এর বেলায় অন্য বহু বৈচিত্র্য ঘটতে পারে, সে ক্ষেত্রে ঐ একমাত্র fundamental discord এর উপর নির্ভর করা চলে না। যথাঃ—ধৈবতের স্কেল্ থেকে কোমল ঋষভের স্কেলে যাওয়া, অথবা ষড়জের স্কেল থেকে গান্ধারের স্কেলে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে কি করে tonic triad থেকে diminished seventh বা augmented fourth দিয়ে Modulation সম্ভব? Diminished seventh H দিয়ে চতুর্থ স্বরের স্কেলে এবং augmented fourth দিয়ে পঞ্চম স্বরের স্কেলে গিয়ে পড়তে হবে। অতএব ওই একমাত্র নিয়মে সমস্ত Modulation বা ষড়জ সংক্রমণ সম্ভব নয়। যদি মডুলেসান্ সম্বন্ধে লিখতেই হয়, ত' তার সমস্ত বিষয় বলা উচিত ছিল। রাগের শিক্ষায় -এর কোন দরকার নেই, এ সম্পূর্ণ বৈদেশিক ব্যাপার এবং য়ুরোপীয় সঙ্গীতেই প্রযুজ্য, যে সঙ্গীতের প্রাণ-বস্তুই হল Harmony.

গ্রন্থকার বইখানি য়ুরোপীয় Harmony ও counterpoint theoryর গ্রন্থের অনুকরণে লেখবার চেষ্টা করেছেন এবং হিন্দু সঙ্গীতে তাঁর practical experience যতটুকু আছে, তারই উপর নির্ভর করে লিখেছেন। এখানি ক্রিয়াসিদ্ধ তৌর্য্যত্রিক, উপপত্তিক তৌর্য্যত্রিক নয়।

রাগের বিশ্লেষণগুলি সুন্দর হয়েছে, এ থেকে যথেষ্ট শিক্ষা করা সম্ভব। স্বরবিন্যাস সম্বন্ধে যে সব নিয়ম বেঁধে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলি অভ্রান্ত নয়। তবে মোটামুটি হিসাবে চলতে পারে। রাগ বা রাগিণীকে অলঙ্কার-যুক্ত করতে গেলে ওই বাঁধা নিয়মে চলা অসম্ভব। সে বিরাট বৈচিত্র্যকে Harmony বা counterpoint এর মত নিয়মের বশীভূত করতে যাওয়া ভুল ও দুঃসাধ্য। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক Bhule বলেছেন :—

"It is impossible to bound down any true art into rules and iaws, hence, rules and laws to music are nothing more than folse application and death-blow to this swee child of nature. The works of Shakespeore were not produced by strict adderence to the rules of Old Greek dramas The musical works of Beethovhn, Mozart, Chopin, Haydn, not to speak of many other great Europeon composers, were not produced by strict observance to the rules and laws of composition. Rules to fine arts may be compared to telescope, which helps the sight of those who already see. With the help of that telescope when the vast region of music will appear before our vision, we will never require that instrument any more."

গ্রন্থকার যদি আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে বইখানি লিখতেন ত' আমাদের বিশ্বাস এখানি খুব সরল হত। যথা, আমাদের সংগীত শাস্ত্রের মতে রাগিণী মালশ্রীর বা মালবশ্রীর formula এই রকম :—

ঋ ধ হীনা মালশ্রীস্যাৎ শুদ্ধমেলা সমুদ্ভবা—
মধ্যমাদি স্বরোগ্রাসাৎ পঞ্চমাংশযুতা স্মৃতা॥
ইতি সংগীত পারিজাত—

অর্থাৎ—মালবশ্রী রাগিণীটি ঋ এবং ধ হীনা, মধ্যম স্বর উগ্র হবে অর্থাৎ কড়ি মধ্যম লাগবে, আর সব স্বর শুদ্ধ, অর্থাৎ কোমল বা কড়ি হবে না, এবং পঞ্চ স্বর এর অংশ অথবা বাদী হবে। এটির স্বগ্রাম বা ঠাট যথাঃ—সা গা ক্ষা পা না র্সা।

এর চেয়ে সহজ ও সরল ভাবে বোঝানো যায় কি না, তা আমরা জানি না। কিন্তু গ্রন্থকার এ ভাবে না গিয়ে কেবল প্রথমান্তর, দ্বিতীয়ান্তর প্রভৃতি করে বেশী বোঝাতে গিয়ে জটিলতা এনে ফেলেছেন। তাঁর চতুঃস্বারিক গ্রাম Greek Tetrachordal system এ লিখিত হয়ে আরো জটিল হয়ে পড়েছে। মোট কথা সঙ্গীত-শিক্ষার বই, শুধু সঙ্গীত কেন, যে কোন শিক্ষার বই যতদূর সম্ভব সহজ সরল হওয়া উচিত। কিন্তু এ বইখানির ভাষা ও ব্যাখ্যা একটু জটিল হয়ে পড়েছে।

যাই হোক দক্ষিণা বাবুর এ চেষ্টা প্রশংসনীয়। আমাদের দেশে সঙ্গীত এখন মৃতকল্প, এ সময় এ গ্রন্থ প্রকাশ করায় আমরা তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সঙ্গীতের বই যত বেশী প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

শরাব-খানা

(সুফী কবিতা)

আহা সে তরুণী তর্ করে দিল্ ! মদ বেচে শুধু—
সে যে কাফেরের মেয়ে !
তারি সন্ধানে শুঁড়িপাড়া পানে যেতেছিনু কাল,
গুণ্ গুণ্ গান গেয়ে ;
মোড় ফিরে দেখি, আসে মোর কাছে সুন্দরী হুরী !—
ছিপ্-ছিপে এক ছুঁড়ী,
বেইমান পারা !—গোছা-এলোচুল পৈতার মত
পড়িয়াছে বুক জুড়ি' !

কহিনু ডাকিয়া, "কে গো তুমি, হাঁ গা ? ও ভুরু-ভঙ্গে
বাঁকা-চাঁদ পায় লাজ !
কোথায় আসিনু ? এটা কোন্ পাড়া ? কোথা থাক তুমি,
নারীদের মম্‌তাজ !"
কহে সুন্দরী, "কাঁধে পর' দেখি কাফেরের সুতা,
ফেলে দাও জপমালা !
পেয়ালায় মদ ভরপুর পিও, চলে এস ভেঙ্গে
ধর্ম্মেরি আটচালা !
চুর হয়ে শেষে চুমাটি বাড়াও, গালে গাল দিয়ে
কথা কব কাণে-কাণে,
—একটি সে কথা, জান্ তর্ হ'য়ে তরে' যাবে তার,
যদি বোঝ তার মানে !"

দিল্ খুলে' গেল, ফুর্ত্তির বেগে বেবুভুল হয়ে,
গেনু তার পিছু পিছু—
এক লহমায় ছুটিল সেথায় ধরম-শরম
ছিল মোর যত-কিছু !
এ্যাটু তফাতে বসে' আছে, দেখি, ইয়ারের দল
একদম মাতোয়ারা !—
উন্মাদ যত, নেশায় বেহুঁশ—প্রাণ্ ভরে' পিয়ে
পীরিতির রস-ধারা !
নাই করতাল, বেহালা, সারং—মজ্‌লিসে তবু
হাসি-গান কমি নাই !
বোতল, গেলাস, মদ দেখি না যে—তবু ঢালে, আর
পান করে একজাই !

মনের বাঁধন-দড়িটি যখন হাত হ'তে শেষ
খসে' গেল একেবারে,
শুধা'তে চাহিনু একটি বচন, নিবারিল মোরে
'চুপ কর'—ঝঙ্কারে !
বলে, 'ঠেলা দিলে অমনি খুলিবে—এত' নয় সেই
মন্দির চার-কোণা !
মস্‌জিদও নয়,—হুড়াহুড়ি করি' ঢুকিবে হেথায়,
—নাই থাক্ জানা-শোনা !
অবিশ্বাসীর আসর এটা যে,—সুরা দিয়ে হয়
অতিথির সৎকার !
সুরু হ'তে সেই আখের অবধি হেথায় কেবলি—
অবাক্-চমৎকার !
পূজা-নমাজের ঘর ছেড়ে দিয়ে বসে' পড় এই
শরাব-খানার মাঝে,
খুলে ফেলে ওই দরবেশ-বেশ, সাজ' দেখি এই
ফুর্ত্তিবাজের সাজে !"—

করিলাম তাই ! চাও যদি ভাই আমারি মতন
দিল্‌খানা লালে-লাল,
এক ফোঁটা এই খাঁটির লাগিয়া, খোয়াও সকলে
ইহকাল পরকাল !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রায়শ্চিত্ত

গল্প

জমিদার পীতাম্বর রায় চৌধুরীর একমাত্র পুত্র নীলাম্বরের উপর্য্যুপরি তিন-তিনটি মাষ্টার চলিয়া যাওয়ার পর নরেশচন্দ্র যখন টি*ঁ*কিয়া গেল, তখন সকলেই অল্প-বিস্তর বিস্মিত হইল।

নরেশ বিশেষ সুখ্যাতির সহিত বি, এ পাশ করার পর পিতার অনুযোগ-সত্ত্বেও এম, এ, বা বি-এল না পড়িয়া, দুই বৎসর সভা-সমিতি প্রভৃতিতে বেশ সময় নষ্ট করিল। হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে তার ভগ্ন-মনোরথ ও ভগ্নস্বাস্থ্য পিতা যখন ইহলোক ত্যাগ করিলেন, নরেশের মা তখন স্বামী-পরিত্যক্ত অল্প সম্পত্তি ও প্রচুর দেনার মধ্যে পড়িয়া নরেশকে একদিন হাত ধরিয়া বলিলেন,—বাবা একটা চাকরি-বাকরির যোগাড় করে দেনাগুলো শোধের ব্যবস্থা কর।

ঠিক সেই সময়ে পীতাম্বর রায় চৌধুরীর ছেলের জন্ত গার্জ্জেন টিউটরের চাকরি খালির বিজ্ঞাপন তার নজরে পড়িল।

নরেশের ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা সাহিত্যে অভিজ্ঞতা, এবং সকল রকম ব্যায়াম-কার্য্য পারদর্শিতার জন্ত, পীতাম্বর বাবু তাহাকেই কার্য্যে বাহাল করিলেন।

সে পড়াইতে আসিয়া বুঝিল, জমিদার খুব দুর্দ্দান্ত এবং ছেলেটী একগুঁয়ে। তবু ছেলেটিকে বশ করিতে তার বেশী দেরী হইল না। অল্প সময়ের মধ্যেই নীলুকে শীকার, অশ্বারোহণ, বাইসাইকেল ও ফুটবল খেলায় নরেশ মজবুত্ করিয়া তুলিল। তার চেহারা হইতে ননীর পুতুলের সে গো-বেচারীর ভাব কাটিয়া সে বেশ মানুষের মত হইয়া উঠিল।

এই রকমে দুই বৎসর কাল নীলুর মায়ের অনাবিল স্নেহে, কর্ত্তার যত্নে ও নীলুর ভালবাসায় সে যেন এই বাড়ীরই একজন হইয়া উঠিল। নীলুর মা তাকে ছেলের মত দেখিতেন, আর নীলু তাকে বড় ভাইয়ের মতই ভাল বাসিত।

একদিন—দোলের বড় বেশী দেরী নাই। বাড়ীতে উৎসবের খুব আয়োজন হইয়াছে। হঠাৎ নরেশ নীলুর মাকে বলিল,—মায়ের বড় অসুখ, আজই আমায় যেতে হবে।

মার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—তা, কবে আসবে বাবা?...তুমি ভাল হলেই চলে এসো।

নরেশের মুস্কিল হইল কিন্তু নীলুকে লইয়া। নীলু বলিয়া বসিল, সেও তার সঙ্গে যাইবে।

তা কখনো হয়? আর কর্ত্তাই বা তাকে ছাড়িবেন কেন!—তার উপর বাড়ীতে দোল।

নরেশ বলিল,—আমি যাব, বেশী কিছু নিয়ে যাবো না। তোমাদের সব জিনিষ-পত্তর রইলো। আর আমার কথা অমান্ত করো না। চলে গেলে এই চিঠিখানা পড়ো সন্ধ্যা বেলায়। পড়ে ছিঁড়ে ফেল্‌বে, আর এ সম্বন্ধে কাকেও কিছু বল্‌বে না।

নীলুর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। আসন্ন বিদায়ের বেদনায় তার বুক ভারী হইয়া উঠিল। সে বলিল,—আচ্ছা।

এক ঘণ্টার পর নরেশ যেন ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

নীলু আর সেদিন বেড়াইতে গেল না,—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিজের ঘরেই বসিয়া রহিল। এলোমেলো বাতাস ঘরের মধ্যে আসিয়া তার মনটাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। পাশের বাগান হইতে আম্র-মুকুলের সৌরভ আসিয়া তাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। তার একবার মনে হইল, হায়রে, নরেশের ন্তায় ঝড়ের মত যদি সব মায়া কাটাইয়া যাইবার ক্ষমতা তারো থাকিত আজ!

সে বাহিরে আকাশের পানে চাহিল। কোথা হইতে আকাশের কোলে মেঘ ঘন হইয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল। নীলু ভাবিল, এ তারই মনের বেদনা-রাশি আঁধার কালো মেঘের মতন আকাশটাকে ঘিরিয়া আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সন্ধ্যার পর খুব ঝড় উঠিল। নীলু নরেশের লেখা চিঠি খুলিয়া বসিল। নরেশ লিখিয়াছে—

"সমস্ত প্রতিজ্ঞা মনে রেখো আর আমার ছবি ও হাতের লেখা যা-কিছু আছে সব পুড়িয়ে ফেলো, নাহলে তোমাদেরই বিপদ হতে পারে। আর এ-সব কথা কাকেও বলো না। মায়ের অসুখের কথা মিছে। তোমাদের এখানে আসবার আগে যে-দলে ছিলাম, সেখান থেকে আজ ডাক এসেছে, যেতেই হবে। আমার সাধ্য নেই, সে ডাক অমান্য করি। নরেশদা।"

নীলু স্বদেশী বিপ্লব-বাদীদের কথা নরেশের কাছে শুনিয়াছিল। ভক্তিতে হউক, ভয়ে হউক, সে তার সব লেখা, ছবি নষ্ট করিয়া ফেলিল। তারপর কাহাকেও কিছু না বলিয়া শুধু মাকে বলিল,—মা, নরেশ দা বোধ হয় আর ফিরে আসবে না—

মা বলিলেন,—কেন রে! তোকে কিছু বলে গেছে?

নীলু বলিল,—না, আমার তাই মনে হচ্ছে।

* * *

তার পর অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে—প্রায় দুই বৎসর। নীলু আরও একটা পাশ করিয়াছে—খুব সমারোহে তার বিবাহও হইয়া গেছে। নরেশের কোন সংবাদ নাই। শুধু বিবাহের দিন নব-দম্পতীকে শুভ আশীর্ব্বাদ জানাইয়া একটা তার আসিল। আর বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রখানা মাস-খানেক পরে বুকের উপর নানা ডাক-ঘরের ছাপ আঁটিয়া ফিরিয়া আসিল।

সেদিন সন্ধ্যায় নীলু চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া আছে। শরীরটা তেমন ভাল নয়—আবার সেই ফাল্গুন মাস। দিকে দিকে গন্ধে বর্ণে অপূর্ব্ব মাদকতা ভরিয়া উঠিয়াছে।

এমনি দিনে যখন আমের মুকুলের গন্ধে সারা বন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন নরেশ সেই ঝড়ের মত চলিয়া গিয়াছিল! কৈ, সে ত আর একখানা পত্রও দিল না! নীলুর চোখে এক ফোঁটা জল আসিল। সে যে তাকে ভাইয়ের মত ভাল বাসিয়াছিল! সেই নরেশদা তাকে এমনি করিয়াই ভুলিয়া গেল! আশ্চর্য্য!

নীলুর শ্বশুর-বাড়ী কলিকাতায় বালিগঞ্জে। শ্বশুর খুব বড়লোক। তাঁর মস্ত বাড়ী। চার-পাঁচ দিনের জন্য সে এখানে আসিয়াছিল নিমন্ত্রণে।

সন্ধ্যা হইয়া গেছে। বৈঠকখানায় বসিয়া সে একখানা বাঙ্‌লা কাগজ পড়িতেছিল। নীলুর শ্বশুর বেড়াইতে গিয়াছেন।

সহসা… ও কি ভীষণ আওয়াজ! দরওয়ানের আর্ত্তনাদ, —তার পর ক্ষণিক স্তব্ধতা! পরে কতকগুলা পদশব্দ,… কতকগুলা মুখোস-পরা লোক ছুটিয়া গেল—আর তারই মধ্যে একজন আসিল নীলুর ঘরে, হাতে তার পিস্তল। সে বলিল,—চুপ। ভয় নেই,—বলিয়াই মুখোসটা চকিতে সে খুলিয়া ফেলিল। দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া নীলু বলিয়া উঠিল,—এ কি, নরেশ দা!

—চুপ! একটি কথা নয়—বলিয়া সে টেবিলের উপর হইতে একটা কাগজ টানিয়া কি লিখিল। লিখিয়া কাগজখানা নীলুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—আমি চলে গেলে এটা পড়ো…এখন, এই নাও পিস্তল—দুটো আওয়াজ কর, এখনি। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আওয়াজ কর…

যন্ত্র-চালিতের মত নীলু পিস্তলে দুইটা আওয়াজ করিল। করিতেই, মুখোস-পরা লোকগুলা বাহির হইয়া গেল, নরেশ সকলের পিছনে। যাইবার সময় পিস্তলটা সে লইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে বাহিরে আর-একবার পিস্তলের আওয়াজ শুনা গেল। নীলু তাড়াতাড়ি পুলিশকে টেলিফোন করিয়া দিল। লোক-জন তখন পলাইয়াছে। সে চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল।

"নীলু, এ কাজে সর্দারি করবার ভার আমার উপর পড়্‌লো। কিন্তু এসেই জান্‌লুম, এটা তোমার আপনার লোকের বাড়ী,—তখন সে কথা বল্‌বার উপায় নেই, পেছুবারও উপায় নেই! কারণ এদের হুকুম নির্ম্মম,—তাই স্থির করলুম এটা পণ্ড করে দেবই। আর প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য যা করবো তা বাহিরের ফটকের কাছেই দেখ্‌তে পাবে। চিঠিটা নষ্ট করে ফেলো।

ইতি ন—

নীলু ছুটিয়া গেল ফটকের দিকে, সেখানে তখন লোক জমিয়া গিয়াছে। পথের উপর নরেশের রক্তাক্ত দেহ

—একটা গুলি ঠিক বুকের উপর। পিস্তলটা দূরে পড়িয়া আছে!

রাত্রি গভীর। নীলু তখনও বাহিরের ঘরে জাগিয়া বসিয়া আছে। তার দেরী হইতেছে দেখিয়া স্ত্রী পারুল আসিয়া বলিল,—হ্যাঁগা বীরপুরুষ, এখনও জেগে বসে যে! ও কি গা, তুমি কাঁদছ! দেখি,——

নীলু বলিল—ও কে, জানো? যে ফটকের কাছে পড়েছিল—?

—কে?

—নরেশদা—

—এ্যাঁ!

—হ্যাঁ, আমাদের ওখান থেকে এসে এই দলে ঢুকেছিলেন,—আজকের কাজের ভার তাঁর ওপরে পড়েছিল কিন্তু আমার আপনার লোকের বাড়ী জান্‌তে পেরে, আমাদের বাঁচিয়ে, নিজের শপথ-ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তও করে গেছেন!

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

বিদায়-বেলায়

ভারতীর সম্পাদন-ভার হইতে আজ আমরা অবসর লইতেছি। দীর্ঘ নয় বৎসর ভারতীর সম্পাদনে ব্রতী থাকিয়া কর্ত্তব্য-পালনে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। তবে ত্রুটি-বিচ্যুতির হাত এড়ানো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের যে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহা আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়। সে ত্রুটির জন্য সকলের কাছে আজ মার্জ্জনা চাহিতেছি।

সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া হয়তো কাহাকেও ক্ষুণ্ণ করিয়াছি; সে জন্য যে অপরাধ হইয়াছে, তাহাও ইচ্ছাকৃত নয়। যাঁহাদের কাছে এমন অপরাধে অপরাধী তাঁহাদের-কাছেও আজ মার্জ্জনা চাহিতেছি।

ভারতীর সেবায় আমরা বহু পূজারীর সাহায্য পাইয়াছি। তাঁদের সে সাহায্য না পাইলে ভারতী সম্পাদন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। আজ আমরা তাঁহাদের সকলকে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার জানাইতেছি।

ভারতীর সম্পাদন-ভার আজ গ্রহণ করিতেছেন পূজনীয়া শ্রীমতী সরলা দেবী। তাঁর কাছেই ভারতীর পূজায় আমরা দীক্ষা লাভ করি। তাঁর ভারতীকে আবার তাঁর হাতেই অর্পণ করিয়া আমরা আজ নিশ্চিন্ত হইলাম।

তবে সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিলাম বলিয়াই যে ভারতীর সহিত আমাদের সব সম্পর্ক চুকাইয়া দিলাম, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। ভারতীর পূজায় আমরা কোনদিনই বিমুখ নই। পূজার প্রাঙ্গণে সকলের সঙ্গে আমাদের এমনি দেখা-শুনাই চলিবে। ভারতীর পূজায় আমাদের পুষ্পাঞ্জলি শ্রদ্ধায়-সম্ভ্রমে চিরদিন আমরা নিবেদন করিব।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ ঔষাবলী

মূল্য—মাত্র ৭টী ঔষধ, পুস্তক ও কেস সহ ৪৲ টাকা মাত্র, মাশুল স্বতন্ত্র। ইহা দ্বারা সকল ব্যাধি অতি সহজে আরোগ্য হইবে। চিকিৎসা আবশ্যক হইবে না গৃহলক্ষ্মীগণও পুস্তক দেখিয়া পারিবারিক সমস্ত চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন। চিকিৎসকের ত কথাই নাই—পত্র লিখিলে চিকিৎসা প্রণালী বিনামূল্যে পাঠান হয়।

ইলেক্‌ট্রো-আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, রুম নং ২১ ফার্ষ্ট ফ্লোর; কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত রসময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ প্রণীত নূতন গল্পের বই

দেবীর দুয়ারে

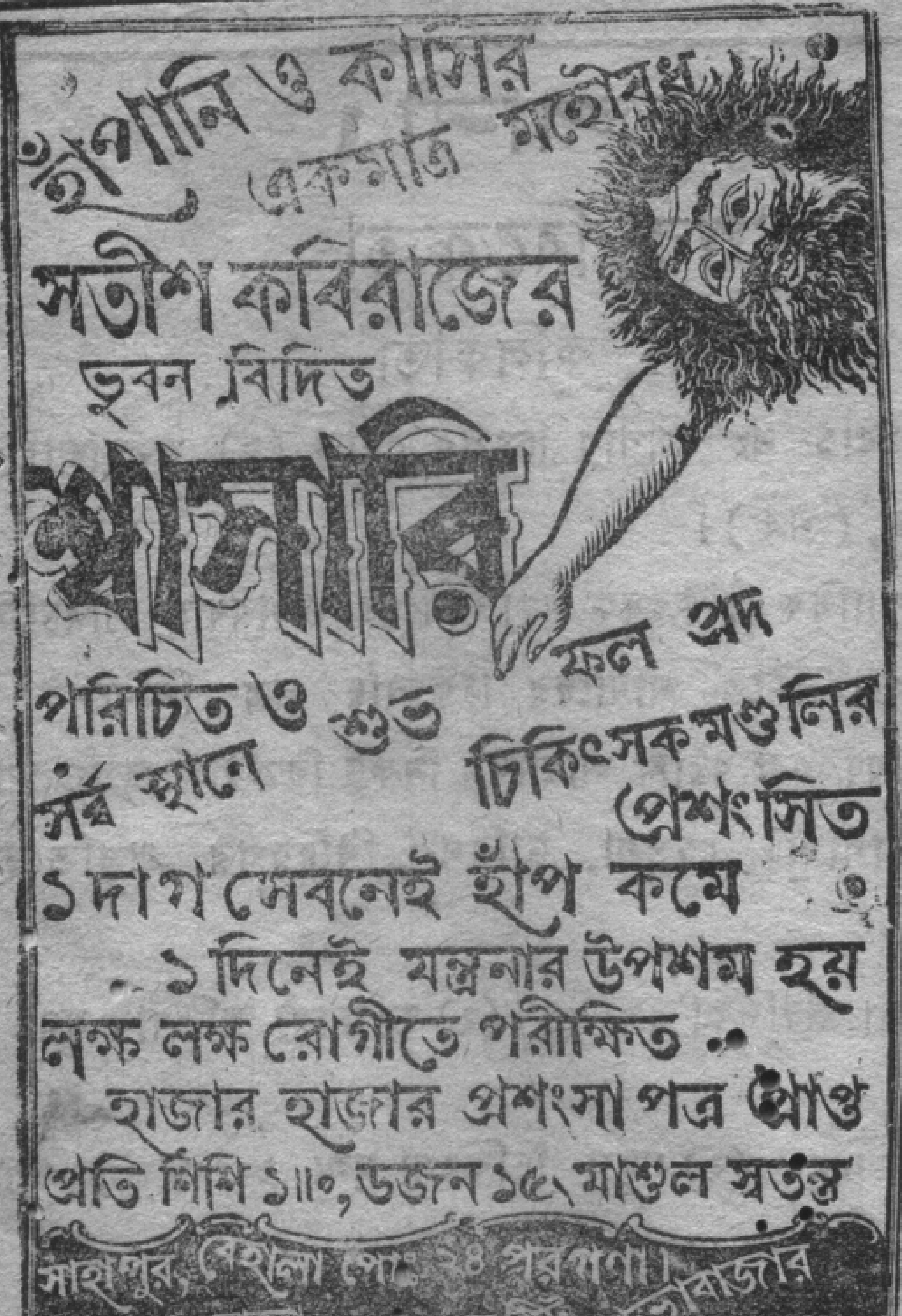
বাহির হইয়াছে

ঝক্ ঝকে তক্ তকে সোনার জলে বাঁধাই

মূল্য এক টাকা

রায় এণ্ড রায় চৌধুরী

২৪নং (দোতালা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।



আর, লগিন এণ্ড কোং

হিলিংবাম

সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের জগদ্বিখ্যাত মহৌষধ। হিলিংবাম ২৯ বৎসরের পুরাতন ঔষধ জগদ্বিখ্যাত এ ঔষধের ন্যায় স্থায়ী ও আশুফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। হিলিংবাম একমাত্রা সেবনে উপকার অনুভব করিবেন। হিলিংবাম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেহ ও প্রমেহ রোগের যাবতীয় যন্ত্রণা দূর করিবে। হিলিংবাম এক সপ্তাহে জটিল যন্ত্রণাদায়ক রোগ উপশম করে। অসরল যন্ত্রনাসহ প্রস্রাব, জীবনের কর্ত্তব্যসাধনে অক্ষমতা, স্নায়বিকদৌর্ব্বল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য ধারণাশক্তির হীনতা, মস্তকঘূর্ণন শারীরিক ও মানসিক জড়তা হিলিংবাম সেবনে আরোগ্য হয়।

গণকোকাই নামক কীটাণু মেহ ও প্রমেহ রোগের মূল কারণ। উক্ত কীটের বিনাশোপযোগী উপাদান হিলিংবামে আছে বলিয়াই হিলিংবাম স্থায়ীরূপে আরোগ্যকারী মহৌষধ। হিলিংবাম তিন সাইজে বিক্রীত হয়—বড় শিশি ৩৲ মাঝারি ২৸৹ ও ছোট ১৸৹ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রশংসা-পত্র

১। ইণ্ডিয়ান ল্যানসেট নামক চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র বলিয়াছেন এই ঔষধ অনেকগুলি রোগীকে পরীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সমধিক আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে, প্রত্যেক পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হইয়াছে।

২। কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, আই, এম, এস, এম-এ এম ডি, এফ-আর-সি, এস; (এডিন) এস, এস সি, ডিগ্রী (কেম্ব্রিজ), পি, এইচ, ডি, (ক্যান্টাব), ভারতের ভূতপূর্ব্ব স্যানিটারি কমিশনর বলিয়াছেন,—"হিলিংবাম মেহ প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ। কষ্টকর এবং দুশ্চিকিৎস্য মেহ ও প্রমেহরোগাক্রান্ত লোকদিগকে আমি ইহা নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

৩। ডাক্তার টি, ইউ, আমেদ, এম, আর, সি. এস, এল, এস, এ, (লণ্ডন) ভারত সম্রাটের ভাইস্-কনসল বলেন,—মেহ ও প্রমেহে হিলিংবাম প্রশস্ত।

আর, লগিন এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

১৪৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলিকাতা।

স্বর্ণ ঘটিত

অমৃত সালসা

এই স্বর্ণঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহ সবল ও মোটা হয়। পারদজনিত রক্ত বিকৃতির পরিণাম কুষ্ঠ, সুতরাং যে কোন প্রকারে রক্ত দূষিত হউক না কেন পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা—তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি প্রায় ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের অমৃত সালসা সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজের পারা মিশ্রিত সালসা নহে, ইহা কেবল গাছ গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত। গুণের পরীক্ষা—অমৃত সালসা সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পরে হস্ত পদের অঙ্গুলী টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আশায় বুক ভরিয়া যাইবে। শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ আনা। ৩ শিশি ২॥০ টাকা, মাশুল ৸৵০ আনা, ৬ শিশি ৪॥০ টাকা, মাশুল ১।০ টাকা।

শ্রীগোপাল তৈল

মৃগনাভি ঘটিত "শ্রীগোপাল তৈল" ব্যবহারে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও যৌবন-শক্তি ফিরিয়া আসে, শরীর সতেজ হয়। সকল প্রকার শক্তিহীনতা, এক শিশিতেই আরোগ্য হইবে। সুস্থ অবস্থায় ব্যবহার করিলে দ্বিগুণ শক্তি লাভ হয়, মূল্য এক শিশি ১৲ টাকা, মাঃ ।৵০ সাত আনা, তিন শিশি ২॥০, মাঃ ৸৵০ তের আনা।

শ্রীমদনানন্দ মোদক

মহাদেব লঙ্কেশ্বর রাবণকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আনন্দ বৃদ্ধির জন্য এই শ্রীমদনানন্দ মোদক মহৌষধ দান করিয়াছেন। রাত্রি বেলার আনন্দ ও ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য সন্ধ্যা বেলা একমাত্রা ঔষধ সেবন করিবেন। প্রাণে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি পাইবেন। ক্ষুধা দ্বিগুণ হইবে; একমাত্রা সেবনে যে কি আনন্দ কি স্ফূর্ত্তি তাহা অনির্ব্বচনীয়। মূল্য ২১ মাত্রা পূর্ণ কৌটা ১৲ এক টাকা, মাশুল ।৵০ পাঁচ আনা, তিন কৌটা ২৲ মাশুল ।৵০ সাত আনা, এক সের ৮৲ টাকা।

সর্ব্ববিধ জটিল ও দুঃসাধ্য স্ত্রীরোগনাশক মহৌষধ

অশোকারিষ্ট

শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি স্ত্রীব্যাধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ।

আমাদের "অশোকারিষ্ট" যাবতীয় স্ত্রীব্যাধি প্রশমনে অদ্বিতীয়; কেন না আয়ুর্ব্বেদোক্ত স্ত্রীব্যাধিনাশক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ অশোকছাল ও অন্যান্য মূল্যবান ভেষজ উপাদানে আমাদের অশোকারিষ্ট প্রস্তুত হওয়ায় স্ত্রীব্যাধিনাশে ইহার অসীম ক্ষমতা। ইহা সেবনে ঋতুর গোলযোগ, কাপড়ে সাদা সাদা বা হরিদ্রাভ দাগ লাগা, জল ভাঙ্গা, ক্লেদাদি নির্গম, রক্তপ্রদর, বাধক প্রভৃতি সত্বর দূরীভূত হয়। অধিকন্তু ইহাতে পাকাশয়ের গোলযোগ দূর হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, দাস্ত পরিষ্কার রাখে, শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করে। কিছুদিন সেবনেই রোগাবশীর্ণ জীর্ণ কঙ্কালসার দেহ নধর ও স্নিগ্ধ হয়, নষ্টশ্রী ফিরিয়া আইসে, বন্ধ্যা রমণীগণ পুত্রবতী হইয়া সংসারের সুখ বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। খাইতে কোন ক্লেশ নাই, শীত গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই সেবন করা চলে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।৵০ আনা। তিন শিশি ২॥০ আড়াই টাকা, মাশুল ৸৵০ তের আনা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়। ১৪৪।১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বসিয়া স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যদি বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে চান্ তো

ক্রুপ-আর্ণামান্ কোম্পানির কিনক্স

বায়োস্কোপ

। দাম খুব শস্তা, অথচ নিজে-নিজেই ছবি দেখিতে ও দেখাইতে পারিবেন। অপারেটারের ...ন নাই।

KRUPP-ERNEMANN WONDERS OF THE CINEMA WORLD.

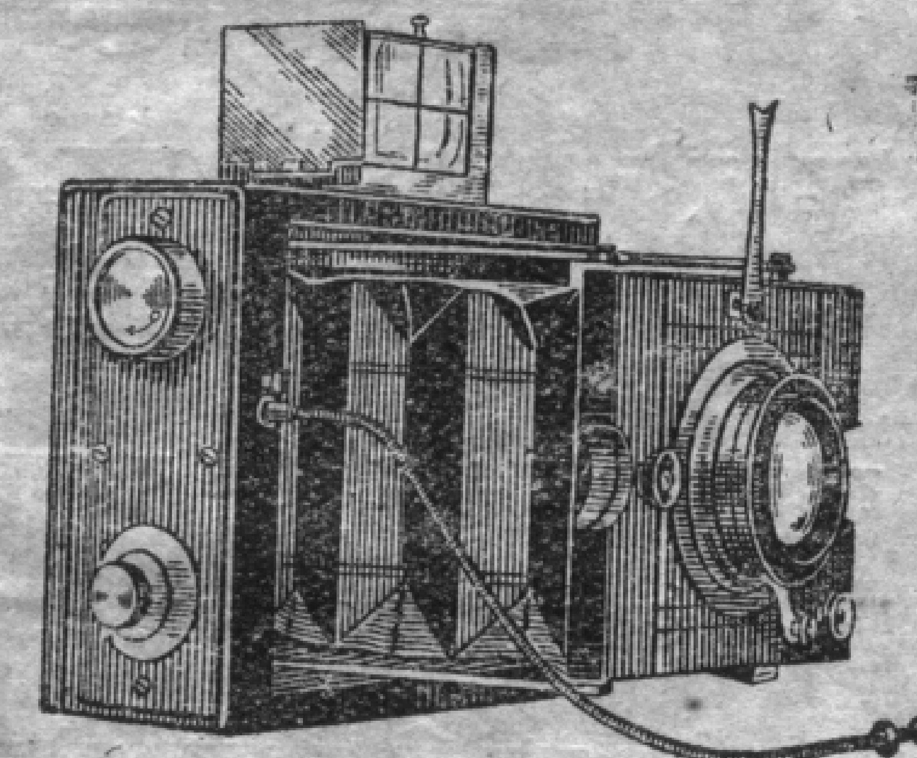
শক্ত ফ্রেমে, ইণ্টারমিটেণ্ট স্প্রকেট, ক্র্যাঙ্ক-সমেত ফীড্ স্প্রকেট, ফিল্ম-স্পুল, থ্রী-ফোল্ড কন্‌ডেন্সার ও ...মেত। ফিল্ম খারাপ জোড়া হইলেও ছবি ভালো হইবে। ৭-৮ ফুট ছবি হইবে, আর তা খুব স্পষ্ট, খুব জেরিালো। হাতে চালানো বায়োস্কোপ পাইবেন; তা ছাড়া মোটরে চালানোও পাইবেন। অর্থাৎ দু'রকম মডেলের চার ...মেশিন।

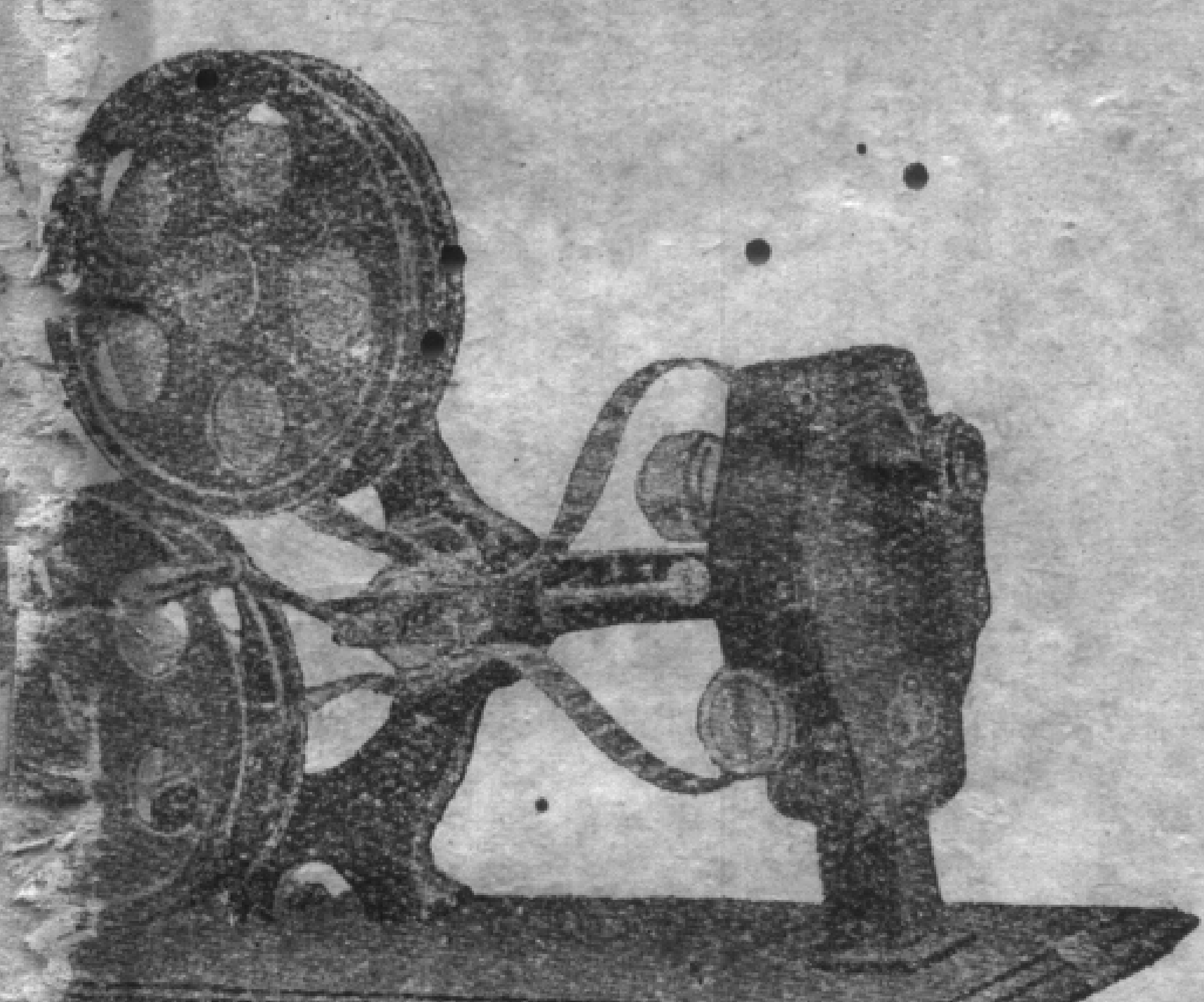
মডেল ১ :—এক-একবারে ৬৫০ ফুট লম্বা ...র ফিল্ম দেখানো যায়।

...াতে চালানো, এবং ইলেক্ট্রিকে চালানো দুই রকম ...স্কোপ—

হাতে চালানো মেশিনের দাম—২২৫৲ টাকা

...লেক্‌ট্রিকে চালানো মেশিনের দাম—৪৫০৲ টাকা





মডেল ২ :—এই মেশিনে ১৩৩০ ফুট লম্বা স্পুলের ফিল্ম দেখানো যায়।

হাতে চালানো মেশিনের দাম—৪৭৫৲ টাকা

ইলেক্‌ট্রিকে চালানো মেশিনের দাম—৫০০৲ টাকা

নানারকম ফিল্মও পাওয়া যায়। দাম খুব শস্তা

ক্যামেরা

সাধারণ ক্যামেরা, পকেট ক্যামেরা, সিনেমেটোগ্রাফ ক্যামেরা, সর্ব্বপ্রকারের ক্যামেরা পাওয়া যায়। দাম ৮৲ টাকা হইতে ৫২৫৲ টাকা অবধি। কলকব্জা সর্ব্বোৎকৃষ্ট অথচ এত সহজ যে একজন বালকেও ...সে এই ক্যামেরায় ছবি তুলিতে পারে।

...টালগের জন্য পত্র লিখুন। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে একমাত্র এজেণ্ট ও বিক্রেতা—

জে, এফ, ম্যাডান এণ্ড কোং

৫নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Reg. No. C. 523

Cover Printed at the KANTIK PRESS, 22, Sukea Street, Calcutta.